নব্যভারত

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

চতুস্ত্রিংশ খণ্ড—১৩২৩।

কলিকাতা,

২১০।৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও

"কাত্যায়নী-প্রেস" ৩৯।১নং শিবনারায়ণ দাসের লেন,

শ্রীঅমৃতলাল সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

চতুস্ত্রিংশ খণ্ড নব্যভারতের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

নব্যভারত

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

চতুস্ত্রিংশ খণ্ড।

স্বদেশ-ভক্তি।

"বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমার প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।"

বঙ্কিমচন্দ্র।

"দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।" দ্বিজেন্দ্রলাল।

ঈশ্বর-ভক্তি জগতে দুর্লভ হইতে পারে, কিন্তু পিতৃমাতৃভক্তি এবং স্বদেশ-ভক্তি এ জগতে দুর্লভ নহে। পিতা, মাতা এবং স্বদেশকে ভালবাসে না, এমন লোক জগতে বড় অধিক নাই। এদেশের শাস্ত্র পিতা মাতাকে ধর্ম্ম ও স্বর্গ এবং জন্মভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া থাকেন। কঠোর শাসন ও স্বার্থের জন্য পিতামাতাকেও লোকে ভক্তি করিতে না পারে, কিন্তু স্বদেশকে ভালবাসে না, এরূপ লোক কুত্রাপি মিলে না। স্বদেশ, পুণ্যভূমি, সকল সাধনার সার সাধনা। স্বদেশের উন্নতি অবনতিতে মানুষের উন্নতি অবনতি সমসূত্রে গ্রথিত। স্বদেশের প্রতি ভক্তি মানবের সহজাত। ম্যাটসিনির জীবন এ কথার জীবন্ত সাক্ষী।

"Mazzini, in fact, believed it to be our duty to love and reverence our fatherland as the home wherein God has placed us, among brothers and sisters linked to us by the family ties of a common religion, history, and language."

এক পরিবার, এক ধর্ম্ম, এক ভাষা, এক ইতিহাস মানবকে মাতৃভূমির সহিত চির-জড়িত করিয়া রাখিয়াছে।

আমাদিগকে কোন বন্ধু এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি, আজীবন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া শুধু স্বদেশ স্বদেশ করিয়া খাটিয়া মরিতেছ কেন?" এখনও এই বার্দ্ধক্যে, কত শত ব্যক্তি এরূপ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেন। কোন্ কামনা এবং বাসনা লইয়া দিবারাত্রি খাটিতেছি এবং চিন্তা করিতেছি, এবং সর্ব্বস্ব পণ করিয়া মরিতেছি, তাহা আমরা জানি না, কি উত্তর দিব? তবে অনেক সময়ে দেখিয়াছি, মাতৃভূমির কোনরূপে উন্নতির পরিচয় পাইলে আমাদের হৃদয়ে আনন্দধারা বহিতে থাকে, নয়নে আনন্দাশ্রু পড়িতে থাকে। স্বদেশ, বুঝি বা আমাদের সকল কামনার সার কামনা, সকল স্বর্গের চরম স্বর্গ;—অথবা স্বদেশের মঙ্গলই যেন আমাদের জীবনের একমাত্র নিষ্কাম সাধনা। স্বদেশের উন্নতির চিন্তা লইয়া মরিতে পারিলেই যেন জীবন সার্থক হয়। এক মহামায়ায় স্বদেশের সহিত জড়িত রহিয়াছি।

আমরা বাল্যকাল হইতে জাতীয় ভাষার উন্নতির স্বপ্নে মাতিয়া যে খাটিতেছি তাহা আমাদের সুখের জন্য নহে, শুধু স্বদেশের ঋণ পরিশোধের জন্য। বহু সভাসমিতি করিয়াছি,শুধু দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য,—দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছি, শুধু মাতৃভূমির উন্নতির ব্যাকুল প্রার্থনা লইয়া; কত কাঁদিয়াছি,কত নির্য্যাতন সহিয়াছি, কত অনাহার-ক্লেশ সহ্য করিয়াছি, শুধু মাতৃভূমির কালিমা অপনোদনের জন্য। ফল কি পাইয়াছি? উপেক্ষা, গালাগালি, নির্য্যাতন, নির্ম্মম ব্যবহার অর্জ্জন করিয়াছি। তবুও ব্রত পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। এখন মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইতেছে, এখনও স্বদেশের উন্নতির বাসনাগ্নি নির্ব্বাপিত হইতেছে না। আমরা যেমন, সকলেই এইরূপ স্বদেশের মায়ায় জড়িত। পিতামাতার নিন্দা যেমন কেহ সহিতে পারে না, জন্মভূমির নিন্দাও, সেইরূপ, কাহারও সহ্য হয় না। কি আকর্ষণ, কি মায়া!

কেহ কেহ বলেন, পঞ্চাশের পরে বনে যাওয়াই শ্রেয়। তা ত বটেই, কিন্তু এই যে মাতৃভূমি আঁধারে মগ্ন, আমাদের স্বদেশ অনুন্নতির ঘনাচ্ছাদিত গহন অরণ্যে পরিণত, এরূপ অরণ্য আর কোথাও আছে কি? তাই এই অরণ্যেই আছি। আমাদের একমাত্র ইচ্ছা এই অরণ্যে জন্মিয়াছি, এই অরণেই স্বদেশের উন্নতির চিন্তা লইয়া, বৃদ্ধ ম্যাৎসিনের মত যেন দেহত্যাগ করিতে পারি। ম্যাট্‌সিনি বলিতেন—"My spirit was crushed by the impossibility I then felt of even conceiving by what means to reduce it to action...in the midst of the noisy, tumultuous life of the scholars around me, I was sombre and absorbed and appeared like one suddenly grown old. I childishly determined to dress always in black, fancying myself in mourning for my country."

রক্তাক্ত কলেবরে যে পুণ্যভূমিতে পড়িয়াছিলাম এবং যে পুণ্যভূমি সুদীর্ঘকাল জল, বায়ু এবং অন্ন দ্বারা দেহ রক্ষা করিয়াছে, তাহার সম আদরের জিনিস আর কি আছে? সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়া খাটিলেও বুঝি বা, তাহার ঋণ পরিশোধ হয় না। চিরপূজ্য পিতামাতার দেহাবশেষ যে পুণ্যভূমিতে বিলীন হইয়াছে, তাহাই জীবনের স্বপ্ন চিরাদৃত দেবভূমি, তাহার সমতুল এই সংসারে আর কি আছে? পিতামাতার প্রতি ভক্তি এবং জন্মভূমির প্রতি ভক্তি মানবের সহজাত।

চির সম্মানিত কত মহাজন এই স্বদেশের মঙ্গলসাধনের জন্য এই পুণ্যভূমিতে দেহ রাখিয়াছেন,তাহাই জীবের চিরাদৃত অনুকরণের দৃষ্টান্ত এবং দেহাচ্ছাদন। তাহার ধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া পুণ্যশ্লোক হওয়ার ন্যায় উচ্চ কামনা জীবের আর কি আছে?

আর সুজলা সুফলা-শস্য-শ্যামলা স্বদেশের প্রকৃতিই মানবের বাল্যের ক্রীড়াভূমি, যৌবনের বলবীর্য্য, প্রৌঢ়ের সাধন-ভজন, বার্দ্ধক্যের একমাত্র সম্বল মাতৃভূমির প্রতি গভীর আকর্ষণ সর্ব্ব দেশের নরনারীর মধ্যেই দেখা যায়, তাহার নামই স্বদেশ ভক্তি। স্বদেশভক্তি সর্ব্বদেশে সকলের চরম লক্ষ্য।

ইষ্ট-ধ্যান, ইষ্ট-জ্ঞান এবং ইষ্ট-সাধন জ্ঞানী মূর্খ সকলেরই কাম্য বস্তু। ধর্ম্মে দলাদলি আছে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মতভেদ আছে,সমাজে সমাজে আপন-পর জ্ঞান আছে, কিন্তু স্বদেশ চিন্তায় যেন সে সকল কিছুই নাই। সুতরাং দেহধারীর স্বদেশ-প্রেমই

জপ, তপ, সাধন, ভজন। ইহা লইয়া জীব চির প্রমত্ত। স্বদেশ, জীবের চির-অমিয়া-মাখা প্রীতির-মূর্ত্তি। দেহধারী সকলেই স্বদেশের জন্য পাগল। স্বদেশ যেন স্বর্গের সিঁড়ি;—স্বর্গে যাইবার জন্য এইখানেই আসিয়াছি, এই খানেই বর্দ্ধিত হইতেছি, এই খানেই দেহ রাখিবার আয়োজনে আছি। এই স্বদেশের মূর্ত্তি গড়িয়া মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার পূজা অর্চ্চনায় নরনারী জীবনপাত করিতে যেন চির লালায়িত। কি গভীর সম্মোহন!

স্বদেশকে কি দিব? আমরা দরিদ্র, শক্তি-হীন, আমাদের কোন কিছুই নাই। সারা জীবন খাটিয়াছি, কিন্তু কিছুই দিতে পারি নাই। এখন ভাবিতেছি, কিছু নাই বটে কিন্তু চক্ষের জল ত আছে। এই পবিত্র চক্ষের জল কত অভাবগ্রস্তের নয়ন হইতে দিবারাত্রি স্বদেশের মঙ্গলের জন্য পতিত হইতেছে। হায়, তাহাতে কি এদেশের অশেষ কালিমা বিধৌত হইবে না?

নববর্ষের নব প্রভাতে ভাবিতেছিলাম, হায়! এদেশের কত অভাব! কত নদনদী শুষ্ক হইতেছে, কত গ্রাম জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইতেছে, কত দরিদ্র অন্নাভাবে জীবন ত্যাগ করিতেছে, কত নরনারী নিরক্ষর, কত বিধবার অশ্রুতে ধরা সিক্ত, কত কত রিপু-সংগ্রামে পরাজিত নরনারী বিষাদে পরিম্লান;—কত নরহত্যা, কত লুণ্ঠন, কত সতীত্ব নাশ, কত ভ্রূণহত্যা, কত ম্যালেরিয়া—কত পাপে জন্মভূমির মৃত্তিকা উষ্ণ এবং অনুর্ব্বর। এই উষ্ণতা ও অনুর্ব্বরতা দিন দিন বাড়িতেছে, দুর্ভিক্ষ যেন দেশে চিরস্থায়ী হইতেছে! এই অভাবরাশি কত পুণ্যসঞ্চয়ে কত সাধনায় যে বিদূরিত হইবে, তাহা কেহ জানে না। কত দেহপাতে যে এ দেশের উষ্ণতা ঘুচিবে, কেহ বলিতে পারে না। মহা মহা যোগী ঋষির মহা তপস্যা এখানে ব্যর্থ। তবে নরনারীর আশা কোথায়? কিছুই আশার আলোক দেখা যাইতেছে না, কিন্তু তবু কেন বিলাসিতা ও অহঙ্কার! কেন মানুষ দেশের অভাবের কথা ভাবে না? কাঁদিতে কাঁদিতে ভারত-ভূমিতে আগমন, কাঁদিতে কাঁদিতেই জীবন শেষ হইয়া আসিল। চক্ষের জলই যেন মহাত্মা-দের একমাত্র সম্বল। ভাই, কোটীনয়নে দিবা-রাত্রি নীরবে যে জলধারা বহিতেছে, তাহা সহানুভূতি পূত হইয়া অবিরত নীরবে বহিতে থাকুক। হয় ত কালে তাহাতে দেশের অশেষ কালিমা বিধৌত হইতে পারে।

ভাই, তুমি বল, পর পর, আমরা বলি, ভাই ভাই। তুমি আমাদের, আমরা তোমার। একই মাতৃভূমিতে জন্মিয়াছি। এস ভাই, সকলে মিলিয়া মহাত্মাদের ন্যায় মায়ের কালিমা-স্মরণে শুধু কাঁদি। বোম্বে মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষের সময় স্বদেশবাসীকে কাঁদিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলাম, সুদীর্ঘ কাল পরে আবার স্বদেশের জন্য কাঁদিবার জন্যই সকলকে আহ্বান করিতেছি। আমাদের সোণার দেশ অভাবরাশিতে পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। কিছুই করিতে পারা যাইতেছে না, আমাদের যেন আর কোন সম্বল নাই, চক্ষের জলই যেন একমাত্র সম্বল। বুঝি বা, এই অশ্রু দেশের অভাবের উষ্ণতা ঘুচাইয়া উর্ব্বরতা আনয়ন করিতে পারিবে। শিশু কাঁদিয়া আব্দার করিলে পিতামাতার সন্তুষ্টি পায়, আমরা কি পাইব না?

মণিকার চক্ষের জলে আগষ্টাইন পুণ্য-জীবন লাভ করিয়াছিলেন। শচী ও মেরীর চক্ষের জলে শ্রীচৈতন্য এবং খ্রীষ্ট দেবত্বলাভ

করিয়াছিলেন। জননীর চক্ষের জল-স্মরণে ম্যাট্‌সিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। হায়, আমরা কাহার চক্ষের জলে উদ্ধার পাইব? আমরা পরস্পর পরস্পরের জন্য যদি কাঁদি, তাহাতে হয় ত কালিমা বিধৌত হইতে পারে। চক্ষের জলের কত ক্ষমতা, তাহা জান নাকি? ভক্ত-হৃদয়ের চির-সম্বল, কেবল চক্ষের জল। এই চক্ষের জল নয়নে নয়নে মুক্তার ন্যায় ঔজ্জ্বল্য লাভ করুক, তবেই ভারতের সকল প্রার্থনা পূর্ণ হইবে।

খাটিয়াছি ত আরো খাটিব, অত্যাচারিত হইয়াছি ত আরো হইব! ভয় ভাবনা কিসের? ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার দেহপাত অধিক কথা কি? মাতার জন্য পুত্রের জীবনপাত, অধিক কষ্টকর কি? আমাদের সর্ব্বস্বই যে স্বদেশ;—স্বদেশ আমাদের অন্ধের যষ্টী, দরিদ্রের আঁধারের মাণিক, বিধবার কুঁড়ে, অনাথের একমাত্র সম্বল। এই স্বদেশের জন্য জীবনপাত করা অধিক কথা নয়। এই পূতভূমিতে মহা মাতৃ-যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে; জ্ঞানী, কর্ম্মী, প্রেমিক, সকলে এই ক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছেন। রাজা প্রজা, বিদ্বান মূর্খ, ধনী নির্ধন সমবেত হইয়াছেন,—এই পবিত্র মহা-যজ্ঞে আসুন সকলে অশ্রু হব্য অর্পণ করি। আমি মরি, তুমি থাকিও; তুমি যদি মর, সে যেন থাকে। সেও যদি যায়, অনন্ত মানব-পরিবার যেন শূন্যকে পূর্ণ করিয়া পরে পরে দণ্ডায়মান হয়। রবার্ট এমেটের উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য, পরে পরে অসংখ্য মাতৃভক্ত সন্তান যেন নবোত্থিত হয়। এক, শত হউক; শত, সহস্র হউক, সহস্র, কোটী হউক—কোটী অসংখ্য হউক। মাতৃযজ্ঞে অসংখ্যের অশ্রু-হব্য অর্পিত হউক। এই মহাযজ্ঞে দুঃখ দারিদ্র্য, দুর্নীতি ও দুষ্কৃতি সব ভস্মীভূত হইয়া যাইবে, দেশে জাগিয়া উঠিবে, শুধু পবিত্রতা-মূলক একতা। সেই আত্মিক পবিত্রতা-মূলক একতা ভিন্ন আর স্বাধীনতা জগতে কিছুই নাই। এক-ধ্যান, এক-জ্ঞান, একতত্ত্ব সুধাপান—"আমরা সবাই মায়ের ছেলে উঠি পড়ি হেসেখেলে" এইরূপ যদি হয়, সকল হোতার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। আমরা চাই শুধু পবিত্রতা-মূলক কোটী কোটী নয়-নের পূত বারিধারা।

জাতীয়-সাহিত্য পবিত্রতার ছায়ায় যদি পূর্ণ হয়, নেতৃবর্গের হৃদয় যদি পবিত্রতায় ভূষিত হয়, মাতৃভূমির উদ্ধারের আর অবশিষ্ট কিছুই থাকিবে না। কিন্তু তাহা কি হইবে?

আশার স্বপ্ন দেখিতেছি, নিশ্চয় পবিত্র-তায় এদেশ ভূষিত হইবে। রামকৃষ্ণ পরম-হংসের উত্থান, থিয়সফির অভ্যুদয়, আর্য্য-সমাজের আবির্ভাব, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পুন-রুত্থান এবং সর্ব্বোপরি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায় এ কথার জ্বলন্ত পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে এমন এক সময় উপস্থিত হইয়া-ছিল, যখন ধর্ম্মের কথা শুনিলে, লোকেরা ভ্রূকুঞ্চিত করিত। এখন আর সে দিন নাই। এখন ধর্ম্মচর্চ্চা অল্লাধিক পরিমাণে প্রায় সকলেরই অবলম্বন হইয়াছে। ধর্ম্মচর্চ্চার অর্থ আর কিছুই নয়, কেবল সংযম ও পবিত্রতার সাধন। সংযম ও পবিত্রতার সাধনে যদি এদেশ জয়ী হয়, তবে ভারত-বর্ষ আবার প্রাচীন দুর্দ্ধর্ষ বলে বলীয়ান হইবে। তখন সকল অসাধ্য অনায়াসে সুসিদ্ধ হইবে। দেশোন্নতির চরম সাধন, সংযম ও পবিত্রতার সাধন। ব্রহ্মচর্য্য সাধন ভিন্ন পবিত্রতার সাধনের আর কোন অর্থ

নাই। ব্রহ্মচর্য্য সাধন ভিন্ন মহাবল লাভের আর উপায় নাই। ইন্দ্রজিৎ বধের মহা অস্ত্র লক্ষ্মণের ব্রহ্মচর্য্য-সাধনার্জ্জিত। সংক্ষেপে বলিতেছি, অসংখ্য অসংখ্য ব্রহ্মকুমার ও ব্রহ্মকুমারীর ব্রহ্মচর্য্য সাধনের মূলে এদেশের ভাবী উন্নতি নিহিত রহিয়াছে। বিধাতার মহা ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

আমরা সেই ভাইবোনের পক্ষপাতী, যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য সাধনে বদ্ধপরিকর। ধর্ম্মচর্চ্চা ভিন্ন ব্রহ্মচর্য্য সাধনে কেহই সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন না। এদেশের এবং সর্ব্বদেশের শাস্ত্রে একথা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মচর্য্য সাধন ভিন্ন আর কিছুতেই মানবের শক্তি সাধনের অধিকার জন্মে না। রাজনীতিজ্ঞ, সাহিত্যিক, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক যদি ব্রহ্মচর্য্য সাধনে বদ্ধপরিকর হন, দেশে এমন শক্তি অবতরণ করিবে যাহাতে সকল অসাধ্য সাধিত হইবে।

ম্যাটসিনি এবং লক্ষ্মণ ব্রহ্মচর্য্য সাধনবলে অজেয় শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য্য-সাধন বলে শ্রীচৈতন্য এবং খ্রীষ্ট এ জগতে অজেয় হইয়াছেন। আর সে দিন দেখিয়াছি, ব্রহ্মচর্য্য বলে রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ অজেয় শক্তি বলে অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন। বিবেকানন্দ প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মচারী-দল কি ভারতের সর্ব্বমঙ্গলের নিদান হইবে না? কে জানে, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে?

আমরা ভারতের উন্নতি চাই, কিন্তু এনারকিজম দ্বারা যে উন্নতির কল্পনা, তাহা আমরা ঘৃণ্য বলিয়া মনে করি। আমরা ভারতের মঙ্গল চাই, কিন্তু পবিত্রতাশূন্য সাহিত্যের দ্বারা তাহা কখনও পাওয়া যাইবে না, মনে করি। আমরা ভারতের কল্যাণ চাই, কিন্তু নরহত্যা, দস্যুবৃত্তি এবং নানা দুষ্কৃতির দ্বারা দেশের কোন কল্যাণ অর্জ্জিত হইতে দেখিলে দুঃখে অবসন্ন হই। আমরা চাই নিষ্কামসেবা,—চাই,পবিত্র ভক্তিতে দেশ পূর্ণ হউক। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যবিহীন দেশভক্তিকে সদা পরিহার্য্য মনে করি। তাহাতে দলাদলি, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা জাগে, কিন্তু জাতীয় একতা সুদূর-পরাহত হয়। আমরা কঠোর ব্রহ্মচর্য্যসাধনকে ভারতের সর্ব্ববিধ উন্নতির একমাত্র উপায় মনে করি। ব্রহ্মচর্য্যের নেতা বিবেকানন্দের দল এই কার্য্যে ব্রতী বলিয়া আমরা সকল সময়ে এই দলের গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকি। আমাদের সকল আশা ভরসা, ব্রহ্মচর্য্য-সাধন-নিরত দলে নিবদ্ধ।

নব্যভারত উপেক্ষিত, চির উপেক্ষিতই যদি থাকে, তাহাতে দুঃখ নাই। কিন্তু নব্য-ভারত যদি থাকে, তবে সে যেন ব্রহ্মচর্য্য এদেশে জাগাইতে পারে। স্বদেশ-ভক্তির মূল ব্রহ্মচর্য্যে নিহিত। যাহার হৃদয়ে আর কোন কামনা নাই, সে-ই স্বদেশভক্ত। সকল কামনা বর্জ্জিত হইলে তবে স্বদেশ-ভক্তি জাগিতে পারে। অনন্য-কর্ম্ম, অনন্য-চিন্তা, অনন্য কামনা ভিন্ন স্বদেশ-ভক্তি জাগিতে পারে না। কবি বলেন,

"রিপুর অধীন যেবা বার মাস,
স্বদেশ-উদ্ধার তার কার্য্য নয়"।

অসংযত-চিত্ত হইয়া কেহ কখনও দেশ উদ্ধার করিতে পারে নাই। যদি কোন নিষ্কাম কর্ম্ম থাকে, তবে স্বদেশের কর্ম্মই সেই কর্ম্ম। যদি কোন দুর্জ্জয় শক্তি থাকে, স্বদেশের মঙ্গলের চিন্তার শক্তিই সেই শক্তি। যদি নিঃস্বার্থ প্রেম থাকে, স্বদেশের প্রতি গভীর ভালবাসাই সেই প্রেম। যদি অহেতুকী জ্ঞান থাকে, শয়নে স্বপনে, আহারে বিহারে

স্বদেশের কল্যাণ জ্ঞানই সেই জ্ঞান। এক-প্রেম, এক-ধ্যান, এক-জ্ঞান লইয়া ব্রহ্মচর্য্য সাধনে যে দিন ভারতের নরনারী সিদ্ধি লাভ করিবে, সেই দিন ভারতে স্বদেশভক্তি জাগিবে। "নান্যপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" বিধাতা এই করুন, এ দেশে শুধু নিষ্কাম স্বদেশ ভক্তি যেন জাগিয়া উঠে, আর কিছুই চাই না

ত্রিশ কোটী নরনারী মলিন ভারতের কালিমা-স্মরণে যে দিন দিবারাত্রি অশ্রু ফেলিবে, সেইদিন নিষ্কাম স্বদেশভক্তি এদেশে জাগিবে। সেই নিষ্কাম ভক্তি, যাহাতে কৈবল্য এই ধরায় অবতরণ করে। দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিতেছে, আশা ভরসা সব নির্ব্বাপিত, চতুর্দ্দিকে হাহাকার, আরো কত কি? এই দুর্দ্দিনে ত্রিশ কোটী নরনারীর অশ্রুতে দেশ প্লাবিত হইয়া যাক্, এই ভারতে আবার স্বদেশ ভক্তি জাগিবে। মায়ের মহা ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

বেদান্তদর্শন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাবয়ব জড় বস্তুগুলির মধ্যে যে কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার নিয়ম দৃষ্ট হয়, তাহাতে আমরা এই দেখি যে, পূর্ব্বাবস্থার (antecedent) নাশ হইয়া, অবস্থান্তরে পরিণত হওয়াই জড়ীয় বস্তুর নিয়ম। পূর্ব্বের বস্তুটীই বিকৃত হইয়া নূতন আকার ধারণ করে। পূর্ব্বের বস্তুটীকে 'কারণ' ও পরবর্ত্তী আকার যেটী, সেইটীই উহার 'কার্য্য'। কার্য্য আর কিছুই নহে, পূর্ব্ববর্ত্তী কারণেরই একটী নূতন আকার মাত্র। কার্য্যে এমন কিছু থাকিতে পারে না, যাহা উহার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণটীতে ছিল না জড়ীয় দ্রব্যগুলির ইহাই নিয়ম কার্য্য দ্রব্যটীতে নূতন কোন কিছু আসিল না, যাহা উহার কারণ দ্রব্যটীতে ছিল না। কেন না, কারণ দ্রব্যটীতে যে অণুপরমাণু ছিল, সেই অণুপরমাণুগুলিরই একটা নূতন সংস্থান বা অবস্থান্তর ঘটিয়াই কার্য্য দ্রব্যটী উৎপন্ন হইল। অতএব জড়ীয় দ্রব্যে পূর্ব্বাবস্থার নাশ হইয়াই, পরবর্ত্তী অবস্থা উৎপন্ন হয়। কিন্তু চেতন ব্রহ্মকে এরূপ 'কারণ' বলিতে পারা যায় না। কেন না, কার্য্যাকার উপস্থিত হইলেও ব্রহ্মের স্বরূপের নাশ হয় না; তিনি স্বরূপে অবিকৃতই রহিয়া যান। সমগ্র ব্রহ্ম-চৈতন্যই নিজস্বরূপে অবিকৃত থাকিয়াই কার্য্য-জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। নিজে অবিকৃত থাকিয়াও কিরূপে ব্রহ্ম-চৈতন্য, এই বহুত্বময় জগৎ সৃষ্টি করিলেন?—এটী একটী বিশেষ সমস্যা!! ঐন্দ্রজালিক কি নিজে অবিকৃত থাকিয়া আপনার প্রভাবে লতা সর্পাদি বিবিধ বস্তু সৃষ্টি করে না? স্বপ্নদর্শনকালে আমাদের আত্মাতে কি রথ, হয়, হস্তী প্রভৃতি বিচিত্র বিচিত্র পদার্থ প্রতিভাত হয় না? সুতরাং স্বরূপে অবিকৃত থাকিলেও ব্রহ্মবস্তুকে, এই বহুত্বপূর্ণ জগতের 'কারণ' বলিলে কোন দোষ আসিতে পারে না। তিনিই তাঁহার মায়া-শক্তিকে এই জগতের আকারে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সৃষ্টিতে তাঁহার নিজের স্বরূপের কোন বিকৃতি উপস্থিত হয় নাই। তিনি ব্যতীত, এই প্রকৃতি স্বাধীনভাবে জগতের আকার ধারণ করিতে পারিত না। অতএব ব্রহ্মকে জগতের 'কারণ' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেই যে তাঁহার সমগ্র স্বরূপটা বিকৃত হইয়া পড়িবে,

এরূপ আশঙ্কা করিবার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। তিনি জগতের 'পরিণামী উপাদান' নহেন, তিনি জগতের 'বিবর্ত্ত-উপাদান'। তাঁহার প্রকৃতি বা মায়াশক্তি-কেই জগতের পরিণামী-উপাদান বলা যাইতে পারে। এই মায়াশক্তি,—ব্রহ্ম ব্যতীত স্বতন্ত্র স্বয়ং সিদ্ধ কোন বস্তু নহে। উহা ব্রহ্ম-ই।

অতএব, এক নিরবয়ব ব্রহ্ম চৈতন্যে বিচিত্র শক্তির সত্তা স্বীকার করিলে তাঁহার নিরবয়বতার কোনই ক্ষতি হয় না। বেদান্তে এই জন্য, ব্রহ্মের নিতান্ত অনুগত, মায়াশক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। সাংখ্যকারদিগের 'প্রকৃতির' ন্যায়, অথবা ন্যায়কারদিগের 'পরমাণুর' ন্যায়, এই মায়াশক্তি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে। সুতরাং এই মায়াশক্তির বিচিত্রতা হইতে জগতেও বিচিত্রতা উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং তদ্দ্বারা ব্রহ্ম চৈতন্যের নিরবয়বতার ক্ষতি হইবে কি প্রকারে? অতএব ব্রহ্মকে সর্ব্বশক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। এই জন্যই শ্রুতিতে ব্রহ্মবস্তুকে 'সত্যসঙ্কল্প', 'সত্যকাম', 'সর্ব্বজ্ঞ', 'সর্ব্ববিৎ' বলা হইয়াছে। তিনি মায়াশক্তির অধিষ্ঠান বলিয়াই, এই সকল বিশেষণ ব্রহ্মে সঙ্গত হইতে পারে। বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাশক্তি বা প্রাণশক্তি, ব্রহ্মে অবস্থিত থাকিয়াই তদ্দ্বারা উহা ক্রিয়াশীল হইয়া, জগতের আকারে পরিণত হইয়াছে,—ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত।

কিন্তু এ স্থলে আর একটী আপত্তি উপস্থিত হইতেছে। তিনি সর্ব্বশক্তিযুক্ত হইলেও, তাঁহার যখন কোন প্রকার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নাই, তখন তাঁহার দ্বারা কার্য্যবর্গের উৎপত্তি কি প্রকারে সম্ভব হইবে? যাহার দেহ ও ইন্দ্রিয় আছে, তাহাতেই কোন কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয়; কিন্তু যাহার দেহেন্দ্রিয়াদি নাই, তাহাকে কিরূপে কার্য্যের কারণ বলা যাইতে পারে? সুতরাং ব্রহ্মকে জগতের 'কর্ত্তা' বলা যায় না। দেহ ও ইন্দ্রিয় না থাকিলে, তাহা হইতে কার্য্য উৎপন্ন হইবে কিরূপে?

কিন্তু এ আপত্তিটী অকিঞ্চিৎকর। মনুষ্যাদি জীববর্গ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকে বলিয়া সর্ব্বত্রই যে এই নিয়ম খাটিবে, এমন কোন কথা নাই। দেহেন্দ্রিয়াদি না থাকিলেও ক্রিয়া করিবার বিবিধ সামর্থ্য (শক্তি) থাকিতে পারে।

অপর একটী আপত্তিও এস্থলে আসিয়া পড়িতেছে। প্রয়োজন ব্যতীত, কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত কাহারও কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। নিতান্ত ক্ষুদ্র কার্য্য করিতে গেলেও বিনা প্রয়োজনে লোক তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না। এই বিশাল ও বিচিত্র জগৎ-সৃষ্টিকার্য্যে, ব্রহ্ম-চৈতন্য কোন্ কোন্ প্রয়োজনে, কি উদ্দেশ্যে, প্রবৃত্ত হইবেন? ব্রহ্মের আবার প্রয়োজন কিসের? তাঁহার কি কোন অভাব আছে যে সেই বস্তুটীর তাঁহার প্রয়োজন হইবে? তাঁহার ত কিছুরই অভাব নাই। তিনি নিত্য পূর্ণ ও নিত্য তৃপ্ত। সুতরাং তাঁহার আবার প্রয়োজন কি? কোন্ অভাব পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, কোন্ বিষয়ের প্রয়োজনে তিনি এই জগৎ-সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন? যাঁহার কোনই প্রয়োজন নাই, তাঁহার কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি উপস্থিত হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্মকে যদি নিত্য-পূর্ণ বলিতে হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্টিরও সম্ভাবনা সিদ্ধ হয় না। অতএব ব্রহ্মকে এই জগতের কারণ বলিতে পারা যায় না।

আমরা এই আপত্তির মীমাংসা করিতেছি। এ আপত্তি তত গুরুতর আপত্তি নহে।

বিনা প্রয়োজনে কোন বিশেষ ফললাভের প্রত্যাশা না করিয়াও কি কার্য্যে প্রবৃত্তি উপস্থিত হয় না? এই যে রাজা বা রাজামাত্যেরা কখন কখন মৃগয়া-বিহার, উদ্যান-বিহার প্রভৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, এগুলির আবার উদ্দেশ্য কি আছে? 'দুইটা মৃগ মারিয়া আনিয়া রসনা তৃপ্তি করিব' মৃগয়া-বিহারে কি রাজার এই ফলাকাঙ্ক্ষাই থাকে? না, ঐ সকল কার্য্যে প্রবৃত্তি কেবল তাঁহাদের 'লীলামাত্র'? ব্রহ্মেরও জগৎ-সৃষ্টি ঐরূপ একটা লীলামাত্র। আর যদিই বা স্বীকার করা যায় যে, ঐ লীলাতেও সূক্ষ্মরূপে সুখ বা উল্লাসাদি প্রাপ্তি প্রয়োজন নিহিত থাকে, ইহা স্বীকার করিলেও এই যে আমরা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকি, ইহাতে কি কোন বিশেষ প্রয়োজন বা ফল থাকে? লোকে কি কোন উদ্দেশ্য করিয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লইয়া থাকে? স্বভাবই উহার কারণ। জীবের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লওয়াই 'স্বভাব'। যেটা যাহার স্বভাব, সেটার কি অন্যথাচরণ করা যায়? অতএব সৃষ্টি করাই ব্রহ্মের স্বভাব, তাই জগৎ-সৃষ্টি সম্পাদিত হইয়াছে। মায়াশক্তিই ব্রহ্মের স্বভাব। বিশেষ কাল উপস্থিত হইলেই মায়াশক্তি সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। জীবের অদৃষ্ট, কাল ও মায়াশক্তি—ইহারা যখন উপস্থিত আছে, তখন আপনা আপনি বিনা প্রয়োজনে জগৎ সৃষ্টি হইবেই, কেহই তাহাতে বাধা দিতে পারিবে না, ইহাই ব্রহ্মের মায়াময়ী লীলা। এই লীলা হইতেই জগৎ সৃষ্টি। জগৎ সৃষ্টি ব্যাপারটা আমাদের নিকটে একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড মনে হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু যাঁহার শক্তি অপরিমিত এবং শক্তিই যাঁহার স্বভাব, তাঁহার পক্ষে সৃষ্টি-ব্যাপার একটা লীলা ব্যতীত বিশেষ কোন গুরুতর ব্যাপার নহে। অতএব সৃষ্টি-ব্যাপারের অন্য কোন প্রয়োজন বা ফল নাই। যাহার কোন প্রয়োজন নাই, ফল নাই,—যাহা নিষ্ফল,—তবে কি এই সৃষ্টিব্যাপার নিতান্তই একটা অনর্থক ব্যাপার? না, ইহা নিরর্থক হইতে পারে না। ব্যবহারিকভাবে এই সৃষ্টজগৎ নিতান্তই সার্থক, নিতান্তই সফল, নিতান্তই সত্য। আমরা এই সৃষ্টজগতে সকল প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছি, সকল ব্যবহার সম্পন্ন হইতেছে; সুতরাং ইহাকে ব্যর্থ বলা যায় না। এই সৃষ্ট ব্যবহারিক জগৎ হইতেই আমরা সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্ম-চৈতন্যের স্বরূপবোধে সমর্থ হইতে পারি। সুতরাং জগৎ, ব্রহ্মবস্তুকে বুঝাইতে সমর্থ বলিয়াই ইহার সার্থকতা—ইহার সফলতা। সৃষ্টজগৎ না থাকিলে, আমরা ব্রহ্ম বস্তুকে জানিতে পারিতাম না। অতএব ব্রহ্মচৈতন্যে বিবিধ শক্তির সদ্ভাব সিদ্ধ হইতেছে। এই সকল শক্তির বিচিত্রতা স্বীকার করিলে, ব্রহ্মের নিরবয়বতার বা অদ্বৈতের কোন ক্ষতি হয় না। এই সকল শক্তিই বিবিধ কার্য্যের উপাদান হইতেছে *। পরব্রহ্মে এই সকল শক্তি অবিভক্তভাবে বিলীন থাকে। সৃষ্টিকালে তাঁহাতে থাকিয়াই শক্তিগুলি বিভক্ত হইয়া ক্রমে বিকাশিত হইতে থাকে। এই শক্তিগুলি স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। ব্রহ্মই ইহাদিগকে সৃষ্টিব্যাপারে নিযুক্ত করেন। সুতরাং ইহাদিগের স্বতন্ত্র সত্বা ও স্বতন্ত্র স্বাধীন ক্রিয়া নিষিদ্ধ হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী।

---

* এই সকল শক্তির বিচিত্রতাকে Bergson এর ভাষায় Interpenetrating tendencies বলা যাইতে পারে। ইহারা পরস্পর বিভক্ত নহে, সূক্ষ্মরূপে লীন মাত্র।

রামানন্দ স্বামীর খাতা। (২)

ভক্তিসুধা।

ভগবান্ বলিয়াছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

মন! এস, ইহার অর্থটা আমরা ভাল করিয়া বুঝি। ইহা গুহ্যতত্ত্ব। "ইহার অর্থ এই, সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তি দ্বারাই সমস্ত সম্পন্ন হয়, এই দৃঢ় বিশ্বাসে, বিবিধ দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ লও।—ঈশ্বরের শরণ কেমন করিয়া লইব? লোকে কিরূপে কোন মহৎ জনের আশ্রয় লয়? শরণাগত ব্যক্তি আশ্রয়-দাতার অনুগত হয়, বশীভূত হয়, তাঁহার আজ্ঞাপালন করে, তাঁহার প্রিয় কার্য্য করে, তাঁহার কোন অপ্রিয় কার্য্য করে না, তাঁহার ক্ষমতাতে দৃঢ় বিশ্বাস করে, তিনি তাহাকে রক্ষা করিবেন, বিপদে ত্যাগ করিবেন না, ইহাতে তাহার দৃঢ় প্রতীতি থাকে;- আর বিপদে পড়িলে আশ্রয়দাতার সাহায্য প্রার্থনা করে। শরণের তিনটী প্রধান অঙ্গ—আনুগত্য, বিশ্বাস ও প্রার্থনা। ঈশ্বর পক্ষেও তাহাই। এখন বুঝিলে কি? বুঝিলাম। আরও পরিস্কার করিয়া বুঝিতে চাহি। ভাল। শাস্ত্রে কি আছে, দেখা যাউক—"অনুকূল বিষয়ের সংকল্প প্রতিকূল বিষয়ের বর্জ্জন, রক্ষা করিবেন এই বিশ্বাস, রক্ষকত্বে বরণ, আত্মনিক্ষেপ, অকার্পণ্য, এইরূপ ছয় প্রকারের শরণাগতি (১)। অনুকূল বিষয়ের সঙ্কল্প; অর্থাৎ ঈশ্বরাধনার অনুকূল বিষয় গ্রহণ। রক্ষকত্বে বরণ, অর্থাৎ ভগবান্ই আমার রক্ষক, অপরে নহে। আত্মনিক্ষেপ, আপনার স্থূল সূক্ষ্মদেহের সহিত আপনাকে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ। অকার্পণ্য—আর কাহারও নিকট আপনার দৈন্য জ্ঞাপন না করা। সুতরাং ঈশ্বরের শরণ লইতে হইলে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে। সতত তাঁহাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে; তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য অর্থাৎ পাপ কার্য্য ত্যাগ করিতে হইবে; বিহিত কার্য্য, সদনুষ্ঠানই তাঁহার আরাধনা, এই মনে করিয়া ভগবানকে স্মরণ করিয়া বিহিত কার্য্য করিতে হইবে; ঈশ্বর-ভক্তিদ্বারা, ঈশ্বরাধনা-যুক্ত কর্ম্মদ্বারা, তাঁহাকে লাভ করিব, এই বিশ্বাসে কার্য্য করিতে হইবে; এবং অন্য কাহারও নিকট দৈন্য জ্ঞাপন না করিয়া, কাহারও নিকট প্রার্থনা না করিয়া, কেবল মাত্র ঈশ্বরের নিকট নিজের দৈন্য, নিজের দুর্ব্বলতা, নিজের পাপ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার কৃপার জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে।

অরে আমার মন! তুমি যে কর্ম্ম করিবে, তাহা ঈশ্বরের আরাধনা রূপে করিবে, ঈশ্বরের কৃপার জন্য, তাঁহার সন্তোষের জন্য করিতেছ, এইরূপ ভাবে করিবে ঈশ্বর ভক্তিদ্বারা অবশ্যই উদ্ধার পাইব, এইরূপ নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধি সহ কার্য্য করিবে। বিশ্বাস, আনুগত্য, ধ্যান, সাহায্য যাচঞা, ইহাই শরণের লক্ষণ। এই করিয়া দেখ; ঈশ্বরের কৃপা পাইবে, ভালবাসা পাইবে, শান্তি পাইবে।

কিন্তু হে ভগবন্! আমার পাপ মন যে

(১) বায়ুপুরাণ।

তোমাতে সতত শরণাগত থাকে না; তোমাকে সতত স্মরণ করে না; তোমার নিকট সতত প্রার্থনা করে না। এই জন্য তোমার নিকট বল চাহি, উপদেশ চাহি। জানি, তুমি বলিয়াছ— বিষয়-কামনা সতত তোমার ধ্যান ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিবে। ইন্দ্রিয়গণ পরিতৃপ্তি লাভের জন্য প্রয়াস পাইবে। ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিবার জন্য মহান্ প্রযত্ন কর্ত্তব্য।' কিন্তু কেমন করিয়া বিদ্রোহি ইন্দ্রিয়গণকে কার্য্যতঃ সংযত করিতে পারিব, আমাকে বলিয়া দেও। শাস্ত্রোপদেশত কতক পাঠ করিলাম, তবুত ইন্দ্রিয়সংযমে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছিনা। ইন্দ্রিয়গণ আমাকে বড়ই টানাটানি করে, দেহের সম্ভোগসুখাকাঙ্ক্ষা আমাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করে। রিপুগণ—কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহ মাৎসর্য্য—সুন্দরী যুবতী কুলটার ন্যায়, নানা হাবভাবদ্বারা আমাকে প্রলোভিত করে। আমার হৃদয়মন্দিরে যেখানে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছি,—সেখানে এই সব পিশাচীগণ উঁকি ঝুঁকি দেয়, তাহাদের মোহময় ইন্দ্রজাল বিস্তার করে; একটু খুঁত পাইলেই তথায় প্রবেশ করিয়া তাহা অপবিত্র ও মলমালিন্যময় করিয়া দিয়া যায়। ইহার প্রতিকারের উপায় কি, নাথ, আমাকে দয়া করিয়া বলিয়া দেও। আমি তোমার শরণাগত, দীনহীন দুর্ব্বলজন, অধমমতি; তুমি এই সকল প্রবল শত্রুগণ হইতে আমাকে রক্ষা কর।

তোমার নিকট অন্তরের সহিত ব্যাকুলচিত্তে প্রার্থনা করিলে, তুমি সমুদয় অভাব কষ্ট দুঃখ দূর কর, এই প্রত্যয় আমার মনে দৃঢ় করিয়া দেও; যেন সংসার-সাগরে বিপদ্ তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত, নিক্ষিপ্ত হইলেও তোমার নিকট অবিচলিত চিত্তে প্রার্থনা করিতে পারি।

তুমি ত কতবার আমাকে তোমার কার্য্যে, তোমার সেবায়,নিযুক্ত করিবার জন্য আহ্বান করিলে। আমি দুই পা এগোই, আবার পিছোই। তোমাতে বিশ্বাস করিয়া, তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, সংসারের সমুদয় সাহায্য ত্যাগ করিতে সাহস করিলাম না। তাই ত্যাগের পথে, সন্ন্যাসের পথে, একটু অগ্রসর হইলাম—কিছুকাল দূরদেশে, বনে, ভাগীরথীতটে, প্রান্তরে, তীর্থস্থানে অশান্ত হৃদয়ে ভ্রমণ করিলাম। কিন্তু সংসারের প্রলোভনে আবার গৃহে ফিরিলাম। "হয়" কি 'নয়' এই সংশয়ে মরিলাম; করিব কি না করিব, এই দ্বৈধভাবে দোলায়মান হইয়া কোন কাজই হইল না। আধ্যাত্মিক উন্নতিও হইল না, সাংসারিক উন্নতিও হইল না। তুমি আমাকে বুদ্ধি বল শিক্ষা দিয়াছিলে। দেবতুল্য সাধু পিতার দৃষ্টান্ত আমার সমক্ষে ধরিয়াছিলে। কিন্তু আমি তাহার কি সদ্ব্যবহার করিলাম? কেবল স্বপ্নময়, কল্পনাময়, আলস্যময় জীবন দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল। এখন আয়ু শেষ হইয়া আসিতেছে, এখন কপালে হাত দিয়া কাঁদিতে বসিয়াছি। কোন মহৎ কার্য্যই করিলাম না, সমাজের কোন উপকারই করিলাম না। এখন শেষ বয়সে জীবিকা নির্ব্বাহের সম্বলও হারাইলাম। তবে, নাথ, তুমি যে আমাকে বলিয়াছ, আমারই মঙ্গলের জন্য আমাকে বর্ত্তমান পার্থিব কষ্ট দিতেছ। আমার মূঢ় মনকে, আমার জড়বৎ আত্মাকে চেতন করিবার জন্য, তোমার দিকে ফিরাইবার জন্য আমাকে নানাবিধ যন্ত্রণা দিয়া কশাঘাত করিতেছ। যে যন্ত্রণা দিলে আমার প্রকৃত

মঙ্গল হয়—তোমাতে মতি হয়, দুঃখ যন্ত্রণা আমাকে দেও, আমি যেন ধীরভাবে তাহা সহ্য করিতে পারি, যেন তাহা তোমার আশীর্ব্বাদ মনে করিয়া লইতে পারি।

হে ভগবন্, একদিন তুমি আমার হৃদয়ে তোমার দূত স্বরূপ একটা অতি সাধুভাব পাঠাইলে। সেই বিষয়ে আমার মন আলোকিত করিলে। দুঃখী অজ্ঞ ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য আমার কি ব্রত ধারণ করা উচিত, আমাকে বলিয়া দিলে। সেই সদনুষ্ঠানের জন্য মাসিক ব্যয়ের টাকা আমার হাতে দিলে। এক বৎসর সেই কাজ চলিল। কিন্তু আমি বিষয় বাসনা ত্যাগ করিয়া তাহাতে আবার সমগ্র মন ও হৃদয় সমর্পণ করিতে পারিলাম না। সুতরাং ঐ কাজ একবৎসর পরে আর চলিল না। যিনি টাকা পাঠাইতেন, তাহাকে টাকা পাঠাইতে নিষেধ করিলাম. "ধরি মাছ, না ছুঁই পাণি" এইরকম ভাবে তোমার কাজ হয় না। তুমি ঐ সৎকার্য্যে সহজেই টাকা যোগাইয়া, আমাকে ইঙ্গিত করিয়াছিলে—"বৎস, আইস, তোমার জন্য মহৎ স্থান নির্দ্দেশ করিতেছি ; সংসারের মোহ ত্যাগ করিয়া ; সব ছাড়িয়া,আমার সেব কর, মামেকং শরণং ব্রজ। এই মহৎ কার্য্য চলিবে ; আর প্রথমে কিছু কষ্ট হইলেও, পরে তোমার জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে। কিন্তু আমার এই বাণী শুনিয়াও তুমি চিত্তদুর্ব্বলতা ত্যাগ করিয়া নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিতে পারিলে না। তাই তোমাকে এখন অতি কঠিন, অতি কষ্টদায়ক শিক্ষা দিতেছি। বৎস, দেখিতেছ না. কি, প্রথমে এই অবস্থা যত কষ্টদায়ক, যত ভয়ানক অনুভব করিয়াছিলে, এখন আর তত কষ্টদায়ক, তত ভয়ানক অনুভব করিতেছ না। এখন কষ্টে তোমার চক্ষু অশ্রুতে তত ভরিয়া যায় না। এখন আমার উপর নির্ভর করিতে শিখিতেছ।

"হে পুত্র,ভয় নাই, চিন্তা নাই। আমি তোমাকে রক্ষা করিব। কিন্তু অধ্যবসায় চাহি,বিবেক পরায়ণ হওয়া চাহি। লোকে, আত্মীয় বা পরে, যে কোন ব্যক্তি তোমার সাহায্য করিতেছে বা করিবেন, সে আমার প্রেরণায় তোমার প্রতি আমার কৃপায়, করিতেছেন বা করিবেন, ইহা জানিও। যদি আবার তোমার বিপদ্ বৃদ্ধি হয়, ভীত হইও না, ভগ্নহৃদয় হইও না। বরঞ্চ অধিকতর উদ্যমের সহিত আমার সেবা করিবে, আমার নিকট প্রার্থনা করিবে। সদনুষ্ঠান যোগে চিত্ত শুদ্ধ করিয়া আমার ভজনা করিবে। তাহা হইলে হে, পুত্র, তোমার বিনাশ হইবে না, সর্ব্ববিধ মঙ্গল হইবে।"

হে ভগবন্, তোমার এই অসীম কৃপামূলক উপদেশের জন্য তোমাকে সহস্র সহস্রবার নমস্কার করি। আমার কোনও গুণ নাই। তোমার এই উপদেশে যেন আমার সদা মতিগতি থাকে। হে পিতঃ, আমার বোধ হইতেছে যে,আমি আর কাঙ্গাল নহি ; বোধ হইতেছে যেন যদি আপনি আমাকে বৃক্ষতলে দাঁড় করান, তাহাতে আমার ভয় বা শোক হইবে না। কেন না ; নাথ, তুমিত আমার সঙ্গে থাকিবে। ছিন্ন কন্থায় দেহ আবরণ করিয়া বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াও তোমার ভক্ত প্রসন্ন চিত্ত থাকেন। তোমার শরণাগত হইলে সর্ব্ববিধ অমঙ্গল দূর হয়, ইহা ধ্রুব সত্য। ধ্রুবের চরিত্র ইহার সাক্ষী। তিনি সিংহাসন চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তুমি তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলে। তখন তিনি বলিয়াছিলেন,

নাথ, আমি তোমার সাক্ষাৎ চাহিয়াছি, আমি আর সিংহাসন চাহি না।

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং,
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্র গুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং,
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি, বর ন যাচে।*(১)

ধ্রুব হরিকে বলিয়াছিলেন, হে প্রভো! মানুষে কাচ অনুসন্ধান করিতে করিতে যেমন দিব্যরত্ন প্রাপ্ত হয়, আমিও সেইরূপ রাজসিংহাসন লাভার্থে তপস্যা করিয়া—মুনীন্দ্র দুর্লভধন তোমাকে পাইয়াছি। বিভো! তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইলাম। অন্য বর যাচ্ঞা করি না। এমন ভাগ্য কি আমার হইবে? এ অধম কি কখন তোমার সাক্ষাৎ পাইবে?"

"পুত্র, ভক্তি পূর্ব্বক আমাকে সতত আরাধনা কর, আমার সাক্ষাৎ পাইবে।"

মন, তুমি বলিতেছ, ভক্তি কাহাকে বলে? ভক্তিতে ঈশ্বরে ভালবাসা আছে; ঈশ্বর যে অতি মহৎ, আমি যে অতি ক্ষুদ্র, তাহার জ্ঞান আছে। ভালবাসা ও মহিমা-জ্ঞান ভক্তির লক্ষণ সা-পরানুরক্তি ঈশ্বরে। পরমানুরক্তিই ভক্তি। "অনুরক্তি" শব্দের অর্থ, অনু, পশ্চাৎ ও রক্তি-আসক্তি—অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ ও মহিমা জ্ঞানের পর তাঁহার প্রতি যে আসক্তি আইসে।

ভগবন্মহিমাদি জ্ঞানাদনু পশ্চাজ্জায়-
মানত্বাদনুরক্তিরিত্যুক্তম্ (৩)

মন, তুমি বলিতেছ "ভগবানের স্বরূপ কেমন করিয়া জানিব। তাঁহাকে কখন দেখি নাই, তাঁহার কণ্ঠধ্বনি একদিনও শুনি নাই, তাঁহাকে কদাপি স্পর্শ করি নাই, তাহার স্বরূপ কি প্রকারে কল্পনা করিব?"

হাঁ. এ কথা সত্য। চক্ষু দ্বারা পরমাত্মা গ্রাহ্য নহেন, ন চক্ষুষা গৃহ্যতে (৪) তাঁহাকে ধারণা করা বড়ই কঠিন। তবে কিছু কিছু বুঝিবার চেষ্টা করি। মন, ঈশ্বরের বিষয় কি কিছুই জান না? জান বই কি। তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, পালন করিতে-ছেন, সংহার করিতেছেন, তাহাত জান।—জন্মাদ্যস্য যতঃ, অর্থাৎ যাঁহা দ্বারা জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় হইতেছে, তিনিই ঈশ্বর! "তজ্জলান"—"তজ্জ" অর্থাৎ তাহা হইতে জগৎ জাত; "তল্ল" অর্থাৎ তাঁহাতে জগৎ অবস্থিত; "তদন" অর্থাৎ তাঁহাতে জগৎ লীন। ইহাকে ঈশ্বরের তটস্থ লক্ষণ বলে। ঈশ্বরের আর কিছু লক্ষণ কি জানা যায় না? জানা যায়? ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ—সত্যজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, (৫)। আর বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম, তিনি জ্ঞানস্বরূপ, তিনি, আনন্দস্বরূপ, তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ বলে। ইহা ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ, এখন আমরা ঈশ্বরের তটস্থ লক্ষণ, আর স্বরূপলক্ষণ পাইলাম। আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে চাহ? বেশ। তোমার দেহে আত্মা আছে। সেইরূপ, এই দৃশ্যমান জগৎ ঈশ্বরের দেহ, ঈশ্বর জগৎস্বরূপ, এই দেহের আত্মা, পরমাত্মা—প্রাণ, শক্তি, বুদ্ধি। সংক্ষেপে ব্রহ্মাণ্ড দেহ, ব্রহ্ম আত্মা। এ কথা ধারণা করিতে পার?

হাঁ, কতক পারি।

(১) হরিভক্তি সুধোদয়।
(২) শাণ্ডিল্য।
(৩) শাণ্ডিল্যসূত্র, ১ম আহ্নিক, ২৮ সূত্র। স্বপ্নেশ্বর টীকা।
(৪) মুণ্ডকোপনিষৎ—৩।১।৮।
(৫) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।

তবে এখন কতক ধারণা হইল। ঈশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কর্ত্তা; তিনি সচ্চিদানন্দ; তিনি ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা। এইরূপে তাঁহাকে ধ্যান কর, এই তিনটী রূপ ধ্যান কর। যদিও পরমাত্মা চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যের গ্রাহ্য নহেন, অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহেন, তথাপি তুমি বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইলে ধ্যান করিতে করিতে সেই নিরবয়ব পরমাত্মাকে দর্শন করিবে—তোমার আত্মাতে যে তাঁহার সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ আছে, তাঁহার ক্ষুদ্র বিম্ব আছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। এস মন, আমরা এই ভাবে তাঁহাকে ধ্যান করি।

আমি বুঝিতেছি, ভগবানের স্বরূপ বিভূতি আদি না জানিলে তাঁহার প্রতি কখন অনুরাগ হইতে পারে না। কেবল স্বরূপ বিভূতি জানিলেই তৎপ্রতি অনুরাগ জন্মে না। পুনঃ পুনঃ তাঁহাতে চিত্ত স্থাপন ও ভজন বন্দনাদি দ্বারা অনুরাগ স্থিরতর করা প্রয়োজন। বুঝিলেত, আমার মন?

হে ভগবন্, তোমার ঐশ্বর্য্য, তোমার বিভূতি, তোমার মহিমা, দয়া করিয়া আমার নিকট প্রকাশ কর। তোমার সহিত আমার যে সম্বন্ধ, তাহা আমাকে বলিয়া দেও, আমাকে ভাল করিয়া অনুভব করাইয়া দেও। তুমি বলিয়াছ যে, তুমি আমার পিতা, মাতা, ধাতা, ভর্ত্তা, প্রভু, স্বামী, আশ্রয়, রক্ষক, সুহৃৎ। এই কথা যেন আমার সতত মনে থাকে। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, দয়া করিয়া আমাকে উদ্ধার কর।

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে। (৭)

তোমাকে সহস্র সহস্র নমস্কার, পুনরায় সহস্র সহস্র নমস্কার, আবারও সহস্র সহস্র নমস্কার।

রামানন্দ স্বামি-বিরচিত
"ভক্তি-সুধার"
সম্পাদক শ্রীজ্ঞানেন্দ্র লাল রায়।

নবীনা বর্ষ বধূ।

নিজেরে মানিয়া মানী,
করে পর কুৎসা গ্লানি,
একটী বছরে আজ নিলাম বিদায়,
পুরাতন অনন্তের মাঝারে মিলায়।

২

ওই এলো নব বর্ষ,
মুখে ঘোর মহাহর্ষ,
অভাবে হৃদয় পৃষ্ট অশ্রু ফেল দূরে
আদরে জড়ায়ে ধর নবীনা বধূরে।

নবীনা এসেছে আজ
ধরিয়া মোহন সাজ
মুখ হ'তে নিকলিছে আশার কিরণ
গুরু গৌরবের পালা হবে সমাপন।

নব বর্ষ এলো জেঁকে
গত বর্ষ গেছে রেখে
উচ্ছৃঙ্খল কীর্ত্তি রাজি ধরার উপর
'স জীবতি' বল সবে খুলিয়া অন্তর।

(৭) গীতা।

বীরতা হুঙ্কার করি,
উঠিতেছে জগভরি,
মরি মরি হরি হরি ! কিবা উন্নয়ন
নভস্পর্শী দম্ভ ওই করে আস্ফালন।

৬

হায় মেকি আস্ত ঢেঁকী
চিরকাল রবি নেকি,
নিরঙ্কুশে অরুচির করিলি আবাদ,
গুড়ের গুড়ত্ব নাই, আছে শুধু গাদ।

৭

দর্প তোলে রুক্ষশির,
শুষ্ক দেহ ধরণীর,
মন্থুগতি করুণায় নাহি শৈত্য আর,
শ্যামলতা গেছে দূরে শ্যামাবসুন্ধার।

৮

প্রেম আবিলতাময়
সহৃদয়—অহৃদয়,
উপচারে অনাচার প্রতারণা ভরা
পিত্তলে সোণার দাগ, লৌহ গিল্টি করা।

৯

প্রীতি নাই প্রেম নাই,
নাহি অগ্নি আছে ছাই,
সেই তোলে নিজ শির যে যত চতুর
সেরা পণে বাড়ে মান নবীনা বধূর।

১০

কোথা সে মালিনীতট
কোথা সেই বংশীবট !!
কোথা সেই তপোবন শান্তির মন্দির
কোথা সেই কণ্ব কুঞ্জ কোথা যদুবীর ?

১১

ছায়া-স্নিগ্ধ মনোলোভা,
কোথা সেই পল্লী-শোভা,
উষারাগে অঙ্গুলিপ্ত স্বাস্থ্যের বরণ,
ব্যাধি-জীর্ণ শুষ্ক হাসি বিরস বদন।

১২

স্বর্ণ রেণু ঝরে-পড়া
চিত্ত ক্লান্তি দূর-করা,
না আসে তেমন উষা তেমন প্রদোষ,
স্বভাবে অভাব ভরা আলাময় রোষ।

১৩

ব্যর্থতার চলস্রোতে
অদৃঢ় সংকল্প পোতে,
আশাহীন স্পৃহাহীন আরোহী দুর্ব্বল,
প্রাণে মরণের ভয় নয়ন সজল।

১৪

যৌবনে বার্দ্ধক্য রেখা,
স্পষ্ট ভাবে আছে লেখা,
জীবন, না মরণের দ্যোতক লক্ষণ ?
এসেছো নবীনা তুমি কর নির্দ্ধারণ।

১৫

ওই সাহারার মাঝে
আশার মরীচি রাজে,
জীবন কি আছে হোথা ও যে মরীচিকা,
প্রচ্ছন্ন শোভার মাঝে ঘোর বিভীষিকা।

১৬

এলো গেল বর্ষ কত
সঙ্গে লয়ে দৈন্য শত,
তবু তবু মিলিল না দূর রসাতল,
দীর্ঘ শ্বাস হাহাকার শুনি প্রতিপল।

১৭

ওরেরে আশার শিখা,
দেখ নাকি হেন দৃশ্য
প্রলয় পয়োধি নীরে কে দেয় সাঁতার ?
কোথা ভূমা, কোথা শুদ্ধি, সব ব্যভিচার !!

১৮

ভক্তি শ্যামিকায় ভরা,
কোথা প্রেম আকাঙ্ক্ষরা,
কোথা নারী মাতৃময়ী ? এবে বিলাসিনী
সদা আত্ম সুখ-লুব্ধা, ঘোর গরবিনী।

১৯

এস এস ও নবীনা,
করে তুলে লয়ে বীণা,
গাও ধনি মধু কণ্ঠে অপার সঙ্গীত,
ছুটুক সহস্র চিত হয়ে পুলকিত।

২০

ভাঙ ভাঙ, ভেঙে গড়,
হৃদয় কঠিন বড়,
ফুৎকারে উড়ায়ে দেও ভক্তির পরাগ,
ঢেলে দেবে দলে দলে গাঢ় অনুরাগ।

২১

ওরাতো চাহেনা পিছু
পুরাতন যাহা কিছু,
অকল্যাণে ভরা বলি, করে কোলাহল,
গণ্ডপ্লাবি বহে যায় উষ্ণ অশ্রুজল।

২২

সমাজ যাইবে ভেঙে,
দীনা লবে বস্ত্র মেঙে,
লোক সঙ্ঘ-নেতা যারা, তুলিবে পতাকা,
বালি দিয়া বিজয়ীর মূর্ত্তি রবে আঁকা।

২৩

গৃহে গৃহে হাহাকার,
মস্তকে অভাব ভার,
'নাই নাই' তবু চাই সদা—এই রোল,
ভরি উঠিছে প্রাণে অশান্তি কল্লোল।

২৪

সারল্যের পরকাশ,
সাদাহাসি রসোচ্ছ্বাস,
প্রাণ ঢালা ভালবাসা কোথায় এখন ?
সত্য করে রোষ ভরে আয়ুধ ধারণ।

২৫

দূরে অশান্তির সোর,
হৃদয়ে স্পন্দন ঘোর,
বিকম্পিত কলেবর হৃদয় অধীর
থেকে থেকে ছুটে আসে দুনয়নে নীর।

(২৬)

জীবনে নাহিক অর্থ,
সব চেষ্টা হ'ল ব্যর্থ,
উদ্দেশ্য নিকটে নাই সে গিয়াছে দূর,
সঙ্গীতে বিকট ধ্বনি, রাগিণী বেসুর।

২৭

মনোহারিকার বেশে,
এসো তুমি হেসে হেসে,
ভবিষ্যৎ দূতী তুমি নবীনা অতিথি,
তব আগমনে প্রাণে জাগে উঠে ভীতি।

২৮

পশ্চিমেতে রুদ্রোৎসব,
মার মার তীব্ররব,
জলে স্থলে স্বহৃদয়ে ছুটিছে মরণ,
প্রলয় বিষাণ রাবে কম্পিত ভুবন।

২৯

কোথা তুমি হে নির্ম্মল,
হে প্রণব উর্জ্জ্বল!
শান্তিবারি ঢেলে দাও ধরার উপর,
কত নর কত নারী কাঁদে নিরন্তর।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

চিত্র দর্শন।

আলঙ্কারিক নিয়মানুসারে ভবভূতির উত্তররামচরিত বিপ্রলম্ভ করুণাখ্য আদি-রসাশ্রিত নাটক। এই বিপ্রলম্ভকরুণ করুণ রস নহে। করুণ রসের স্থায়ীভাব শোক। এই বিপ্রলম্ভ করুণের স্থায়ীভাব শোক হইতে পারে না। সংস্কৃত নাটক বিয়োগান্ত করিবার রীতি নাই, কাজেই অবসানে শোক স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সংস্কৃত নাটক মাত্রেই মিলনান্ত, কাজেই বিপ্রলম্ভ করুণেরও শেষফল রতিই হইয়া থাকে বলিয়া উহাকে আদি রসেরই মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এক্ষণে এই বিপ্রলম্ভকরুণ বাঙ্গলা ভাষায় করুণরস বলিয়াই ধরা হয়' তজ্জন্যই উত্তররামচরিতকে করুণরসাশ্রিত নাটক বলা হইয়া থাকে। সংস্কৃত রামায়ণ সীতার পাতাল প্রবেশ জন্য বিয়োগান্ত; উত্তররামচরিত সীতারামের মিলন সংঘটন জন্য মিলনান্ত। এই বিপ্রলম্ভাখ্য আদি রসটীকে আমরা বাঙ্গালা রীতি অনুসারে বিপ্রলম্ভাখ্য করুণরস বলিয়াই ব্যবহার করিব।

এই করুণবিপ্রলম্ভের তথাকথিত করুণ-রসের উদ্দীপনা করাই উত্তরচরিতের কার্য্য। এই রসের যথাযথ সঞ্চারেই নাটকত্ব, রামসীতার অলৌকিক মিলন উপলব্ধি না করিলে তাঁহাদের বিরহ যে কি মর্ম্মভেদী, তাহা বোঝাই যাইবে না, মিলনের সূর্য্য অস্তগত না হইলে বিরহের অমাবস্যা ফুটিবে না; কাজেই মিলন ও বিরহ সমভাবে চিত্র-দর্শনের বর্ণিতব্য বিষয়। সীতা বিসর্জ্জনেই উত্তরচরিতের আরম্ভ; আর সেই সীতা বিসর্জ্জন বুঝিতে হইলে তাঁহাদের দাম্পত্য প্রেম কিরূপ ছিল, তাহা জানা আবশ্যক। আর সীমাবদ্ধ প্রতিকারার্হ সীতাবিরহ দুঃখ যদি এরূপ মর্ম্মভেদী, তাহা হইলে সীতা বিসর্জ্জন দুঃখ কত ভীষণ, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। তাই চিত্র দর্শনের অবতারণ।

প্রণয়ের গভীরতাই বিরহের তীব্রতার মাপকাঠি। মিলনের পাশাপাশি বিরহ দাঁড়াইলেই তাহার তীব্রতা অনুভব হয়। এই অনুভবের উপরে বিপ্রলম্ভ করুণরসের আস্বাদন নির্ভর করে। রাম সীতার দাম্পত্য প্রেম যখন অনন্যসাধারণ, সীতাহরণ জন্য প্রতিকারার্হ নির্দ্দিষ্ট দুঃখ ভোগ যখন অপরিসীম, তখন সীতা বিসর্জ্জনরূপ স্বহস্তে হৃৎপিণ্ডচ্ছেদের তুলনা কোথায়? সীতা বিসর্জ্জন যে কি বস্তু, তাহাতে রামের কি আত্মত্যাগ, কি অপরিসীম অব্যক্ত যন্ত্রণা, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন অনুভূতি করান উদ্দেশ্যেই এই চিত্র দর্শন। রাম সীতাকে কত ভাল-বাসিতেন, গৃহে বনে কি ভাবে সীতাকে লইয়া তিনি দিন কাটাইতেন, সীতা হারাইয়াই বা কিরূপ উন্মত্তের মত বনে বনে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন, কি পাষাণ বিদ্রাবী ক্রন্দন উহার অস্থি মজ্জা ভেদ করিয়া প্রতি-নিয়ত উত্থিত হইত, তাহার জ্বলন্ত চিহ্ন এই চিত্র দর্শনে বর্ত্তমান।

রাম কাছে থাকিলে যাঁর বনস্থলীই নগরী, শ্মশানই নন্দনকানন, দুঃখই সুখ— সেই আদর্শ পতিপ্রাণা সীতার কাছে রামের ভালবাসা, রামের কথা, রামের স্মৃতি, এমন

কি রামের দুঃখ যত প্রিয় অত প্রিয় আর তাঁহার কি আছে? তাই লক্ষ্মণ চিত্র দর্শনই সীতার বিনোদনোপায় স্থির করিয়াছিলেন। আর কবি স্পষ্টতঃ বলিয়া না দিলেও বুঝিতে পারা যায় যে, সীতা অবশ্যই মধ্যে মধ্যে প্রীতিবিস্রব্ধ সাক্ষী পঞ্চবটীর কথা পাড়িতেন, সীতা বিরহে রাম কি করিয়াছিলেন, কিরূপ কষ্ট পাইয়াছিলেন, তাহা শুনিবার অদম্য লালসাও কখনই তিনি ত্যাগ করিতে পারিতেন না। আর শ্রুতিসুখকর সেই সকল শুনিয়া শুনিয়াও যে তৃপ্তির শেষ হইত না, তাহাও বেশ বোঝা যায়। যথার্থই রাম বলিয়াছেন—

জানাসি বৎস? দুর্মনায়মানমানাং
দেব্যাঃ বিনোদয়িতুং"

সীতাপহরণজন্য বিরহে আর সীতা বিসর্জ্জনজনিত সম্ভাবিত চিরবিচ্ছেদে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সীতাপহরণ দৈবকৃত, সীতা বিসর্জ্জন স্বেচ্ছাসম্পাদিত। সীতা হরণে সীতালাভের আশা ছিল, সীতা-বিসর্জ্জনে আর প্রাপ্তির আশা ছিল না। যে আশা পতনোন্মুখ প্রাণের একমাত্র বন্ধনী তাহার অভাবই সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর। আশাশূন্য জীবনের সুখ শান্তি মরীচিকায় জলপানেচ্ছার মত ব্যর্থ। সীতাপহারজনিত বিরহ সীমাবদ্ধ, সীতাবর্জ্জনজন্য চিরবিচ্ছেদ অসীম। সীতাহরণের পর তাহার উদ্ধারের জন্য রামকে নানা উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, অনেক সময়ই তাঁহার সেই কার্য্যে কাটিয়া যাইত, শোক দুঃখের তাদৃশ অবসর ছিল না। সীতাকে বনবাস দিবার পর সীতার জন্য রামের করিবার কিছুই নাই, চিত্তবিনোদনের সকল উপায়ই রুদ্ধ। বহ্নি ও তীর্থসলিলং স্বতঃপবিত্রো. জানিয়া নিরপরাধা জানকীকে পূর্ণগর্ভাবস্থায় বনে বিসর্জ্জন দেওয়ায় রামের যে যন্ত্রণা, তাহার শতাংশের একাংশও সীতাপহরণে হয় নাই।

রামের জীবনের প্রথমাংশ মহাবীর-চরিত নামক নাটকে বর্ণিত হইয়াছে। উত্তররামচরিতে জীবনের শেষাংশই বর্ণনা করাই হইতেছে। সীতা উদ্ধারান্তে অযোধ্যার সিংহাসনে অভিষেক ক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন হওয়ার পরবর্ত্তী ঘটনাই উত্তরচরিতের বর্ণিতব্য। পূর্ব্বচরিত সংক্ষেপে বর্ণিত না হইলে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য ও পূর্ব্বাপর সংযোগ ঠিক হয় না। চিত্র দর্শনস্থলে সেই উদ্দেশ্যও সাধিত হইয়া গেল।

জৃম্ভকাস্ত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে লবকুশের জন্মসিদ্ধ জৃম্ভকাস্ত্রলাভের হেতুটি পাওয়া গেল 'সর্ব্বথেদানীং ত্বৎপ্রসূতিমুপস্থাস্যন্তি"। রঘুকুলদেবতা ভাগীরথির মহিমা কীর্ত্তন দ্বারা বাল্মিকী আশ্রমে লবকুশের অবস্থিতি, ও ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার লাভ ও শিক্ষা প্রাপ্তির কারণটি বোঝা গেল "সা ত্বমম্ব স্নুষায়ামরুন্ধতীব সীতায়াং শিবানুধ্যান পরাভব।" পাঁচমাস গর্ভাবস্থায় সীতার বনবাস বাল্মিকি রামায়ণে আছে, ভবভূতি এই পাঁচমাস স্থলে দশমাস বলিয়াছেন। দশমাসে কঠোর গর্ভা সীতার বনবাস অধিকতর করুণ—এইজন্যই যে ইহা করিয়াছেন তাহা নহে। বাল্মিকির সীতা যে ছাঁচে, যে জাতীয় শিরীষ কোমল উপাদানে গঠিতা, তাহাতে নিন্দনীয় নির্ব্বাসনরূপ প্রবল আঘাত সহ্য করিবার মত তাঁহার শক্তি ছিল না। বনবাস দিয়া লক্ষ্মণ প্রতিনিবৃত্ত হইবা মাত্র সীতা প্রবল দুঃখ শোক সংবেগে তৎক্ষণাৎ ভাগীরথি বক্ষে ঝাঁপ দিলেন। ভাগীরথি রামের সেই প্রার্থনার জন্যই সলিলপ্রসূত যমজ পুত্রদ্বয়কে

রক্ষা করিলেন। স্নেহময়ী জননী ধরিত্রী-দেবী দুঃখিনী কন্যাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। মাতা কন্যাকে রসাতলে লইয়া গেলেন। স্তন্যত্যাগের পর ভাগীরথি দেবী পুত্রদ্বয়কে বাল্মীকির আশ্রমে বিদ্যাশিক্ষার্থ ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারলাভার্থ রাখিয়া ছিলেন। প্রকারান্তরে কবি চিরসহবাস বিশ্রস্ত সাক্ষী পঞ্চবটীর, গোদাবরী মুখরকন্দর প্রস্রবণ গিরির, রমণীয় পম্পাভিধান সরোবরের এবং অন্যান্য পরিচিত স্থানের চিত্রগুলিও ঐন্দ্রজালিক তুলিকাস্পর্শে সজীব করিয়া ফুটাইয়া দিলেন।

এই চিত্রদর্শন ফলেই সীতার বনবাস-স্পৃহা পুনরায় জাগিয়া উঠিল। সীতা বিসর্জ্জনের ছলের আর অনুসন্ধান করিতে হইল না। চারু বনস্থলী ভাবপ্রবণা সীতার নিকট তখন প্রত্যক্ষ দৃশ্যবৎ অবভাসিত। সীতার মনে পড়িতে লাগিল সেই পুত্রস্থানীয় করিশাবকের কর্ণপুর হইতে লবলী পল্লব কর্ষণ, পুত্র নির্ব্বিশেষে পালিত শিখণ্ডীর করতালির সহিত নাচিয়া নাচিয়া সেই মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ; সমসুখদুঃখ ভাগিনী প্রিয়সখী বাসন্তীর সেই করুণ স্নেহময় মুখচ্ছবি। সীতা তন্ময় হইয়া দেখিতেছিলেন —তিনি আর্য্যপুত্রের হাত ধরিয়া দক্ষিণারণ্যে প্রবেশ করিতেছেন স্নেহময় পতি গুরুভার আতপত্র রৌদ্র নিবারণার্থ মাথার উপর ধরিয়াছেন; সীতা চক্ষু মুদিয়া স্পর্শালস-বিভোর থাকিয়া সেই সুখানুভব করিতে-ছিলেন। অকস্মাৎ গোদাবরী তটে সৈকত-লীন হংসশ্রেণীর ডাকে সীতার চমক ভাঙ্গিল সম্মুখে হংসের দল তাঁহারই গতি অনুকরণ করিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে খেলিয়া বেড়াইতেছে।

কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসত্তি যোগা
দবিরলিত কপোলং জল্পতোরক্রমেণ।

সেই কি যেন কি যেন—গাঢ়ালিঙ্গন বশে অবিরলিত কপোলে ক্রমশূন্য আলাপ সে কি ভোলা যায়?

অশিথিল পরিরম্ভ ব্যাপৃতৈকৈক দোষ্ণো।
রবিদিতগতযামা রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ॥

অশিথিল আলিঙ্গনে দুই জনেরই একটী একটী বাহু পরস্পরের কাছে বাঁধা, সেই ভাবে অবিদিত গতযামা সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল, সে কি মনে না পড়িয়া যায়? রাত পোহাইয়া গেল, প্রহর গুলি কোথা দিয়া চলিয়া গেল তাহার উদ্বোধই হইল না —কি সুন্দর প্রেমবিহ্বল ভাব! কি উন্মাদক স্পর্শ-সুখ-মহিমা, কি বা দাম্পত্য-রসালাপ। সীতা রামের নিকট আপনার বনগমনাভিলাষ জানাইলেন—

"জানে পুনো কি প্রসন্নগম্ভীরাসু বনরাজিষু বিহরিষ্যং পবিত্রসৌম্যা শিশিরাবগাহাং ভগবদীং ভাগিরথীং অবগাহিস্মং" আমার বড় ইচ্ছা, আবার আমি সেই প্রসন্নগম্ভীরা বনভূমিতে বিহার করি, পুণ্য শীতল শিশিরাবগাহা ভগবতী ভাগীরথীতে অবগাহন করি।

"গর্ভদোহদোহচিরাৎ সম্পাদয়ি তথ্য" রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণকে গর্ভাবস্থার উপযোগী অস্খলিত রথ ঠিক করিতে আজ্ঞা দিলেন। রামচন্দ্রের এই বনবাস আকস্মিক আঘাত জন্য উত্তেজনার যে ফল নহে, তাহা সম্পূর্ণ অনুত্তেজিত সীতা সহ রহস্যালাপে নিযুক্ত রামচন্দ্রের "স্নেহ, দয়া, সৌখ্য, এমন কি জানকীকে পর্য্যন্ত লোকারাধনার জন্য ত্যাগ করিতে আমার বাধা নাই" এই কথায় বেশ বোঝা যায়।

চিত্র দর্শনের আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য এখনও বলা হয় নাই। ভবভূতি প্রথম যে মহাবীর চরিত নাটকে শ্রীরামের বাল্যচরিত বর্ণনা করেন, তাহাতে তিনি অনেকস্থলেই বাল্মীকি-প্রদর্শিত পথ ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই নূতন পথে চলার সময়ে তিনি অনেক-স্থলেই পথ হারাইয়া বিপথে গিয়াছিলেন. গর্ত্তকণ্টকময় কষ্টকর স্থলে পড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নূতন সৌন্দর্য্যের অবতারণা করা দূরে থাক, পুরাতন সৌন্দর্য্যকেই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। সেই নূতনত্বের মোহে উত্তরচরিতকার কবির ওরূপ পদস্খলন বাস্ত-বিকই দুঃখের ও আশ্চর্য্যের, তাহাতে সন্দেহ নাই। উত্তরচরিত পাঠের পর যাঁহারা মহাবীর চরিত পাঠে অগ্রসর হইবেন, তাহারা রত্ন আশায় আসিয়া লবণাক্ত জলপান করিতে বাধ্য হইবেন। মহাবীরচরিতে কবি যে বিফলকাম হইয়াছেন, এবং ঐ নূতন পদ্ধতি যে পরে তাঁহারই পছন্দসই হইতে পারে নাই, তাহা উত্তরচরিত পাঠ করিলেই বোঝা যায়। মহাবীরচরিতে কবি রামচন্দ্রের বাল্য-লীলায় যে সকল ত্রুটি করিয়া ফেলিয়াছিলেন, উত্তররাম চরিতে সেই বাল্যলীলা বর্ণনাচ্ছলে তাহা শুধরাইয়া লইয়াছেন। মহাবীরচরিতের অন্যায়ের উত্তর চরিতে প্রায়শ্চিত্ত করা হইয়াছে। চিত্র দর্শনচ্ছলে মহাকবি এত গুলি উদ্দেশ্য সাধিত করিয়া লইলেন।

মহাবীরচরিতে বিশ্বামিত্রের নিমন্ত্রণে রাজর্ষি জনকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজ সীতা ও উর্ম্মিলা সমভিব্যবহারে বিশ্বামিত্র তপো-বনে সমাগত। তথায় হরধনু-ভঙ্গের পূর্ব্বেই তাড়কা-বধ। তৎপরে বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক জৃম্ভকাস্ত্র লাভ। তারপর শিবধনু ভঙ্গ। শিবধনু ভঙ্গান্তে সকলের মিথিলা রাজ্যে গমন। তথায় বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইবার পরই ভার্গবের আগমন। বলা বাহুল্য, বাল্মীকি রামায়ণে অগ্রেই বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক জৃম্ভকাস্ত্র লাভ। তৎপরে তাড়কা বধ। মিথিলা নগরীতে হরধনু ভঙ্গ। তারপর বিবাহোৎসব। মিথিলা ও অযোধ্যার মধ্যবর্ত্তী পথের মধ্যে ভার্গব পরশুরামের আবির্ভাব। উত্তরচরিতে রামায়ণানুযায়ী বর্ণনা করিয়া কবি মহাবীর-চরিতোক্ত নূতন মতগুলির খণ্ডনই করিয়াছেন।

উত্তরচরিতে জৃম্ভকাস্ত্র লাভের পরই "এষ মিথিলাবৃত্তান্ত" মিথিলা বৃত্তান্ত আরব্ধ হইল। সীতারমুখে প্রকাশ পাইল—

(বিষ্ফ অথিমিদতাদদীসমাণ সোম্যসুন্দরসিরী অনাদর কুড়িতসঙ্করসরাসনে সিহণ্ডমুদ্ধমুহ-মণ্ডলো অজ্জউত্ত আলিহিদো")

জনক তথায় উপস্থিত আর আর্য্যপুত্র কর্ত্তৃক অবহেলাক্রমেই শঙ্কর শরাসন খণ্ডিত।

লক্ষ্মণ মিথিলা-চিত্র দেখাইয়া "ভবতস্ততঃ সঙ্কারযামি" বলিয়া অন্য চিত্রে ভগবান ভার্গবের আগমনের কথা পাড়িলেন 'অয়ঞ্চ ভগবান, ভার্গবঃ" তার পরই এতে বয়ম-যোধ্যাং "প্রাপ্তা"। মিথিলা ও অযোধ্যার মধ্যস্থলেই ভার্গবের পরাভব মানিয়া গেলেন।

মহাবীরচরিতে ভবভূতি কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা উঠাইয়া দিয়া কৈকেয়ী চরিত্র ভাল করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। রাবণের মাতামহ এবং প্রধান সচিবের কূট রাজ-নীতিতে শূর্পনখাই আলমন্থরা সাজিয়া রামচন্দ্রের বনবাসের ব্যবস্থা করে। এটী সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া উত্তরচরিতে কবি বাল্মীকির অনুসরণই করিয়াছেন।

লক্ষ্মণ "এষা মন্থরা" বলিয়া যখন মন্থরার দিকে রাম সীতার দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন, তখন রামচন্দ্র গুরুজন-নিন্দা এড়াইবার জন্য শৃঙ্গবের পুরে নিষাদপতি গুহকের সহিত মিলনের কথা বলিলেন, তখন লক্ষ্মণ হাসিতে হাসিতে বলিয়া "অয়ে মধ্যমাখ্যাবৃত্তমন্তরিত মার্য্যেণ" মধ্যম মাতার বৃত্তান্ত আর্য্য ঢাকা দিলেন।

এই সকল নানা উদ্দেশ্য এক চিত্র দর্শনে কবি সাধিত করিয়া লইয়াছেন। কোনটী সর্ব্বপ্রধান, কোনটী কবির অভিপ্রেত, তাহা নির্দ্দেশ করা বড়ই কঠিন। এ বিষয়ে সকলের একমত হওয়াও সম্ভব নহে। আমরা সকল মত গুলিই বিবৃত করিলাম।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ।

গ্রীক-দর্শন।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

প্লেটো।

২। জড়প্রপঞ্চের উপর আদর্শের ক্রিয়া।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আদর্শের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এইবার সৃষ্টির উপর আদর্শের ক্রিয়া কি, তাহাই বিচার্য্য। পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে যে, আদর্শ নিরপেক্ষ সত্তা, স্বয়ংসিদ্ধ, সক্রিয় এবং স্থাবর জঙ্গমাত্মক স্থূলজগতের কারণরূপে অবস্থিত। যাহাকে স্থূল বা জড়জগৎ বলা হয়, তাহার স্বকীয় অস্তিত্ব নাই, যেহেতু উহা আদর্শের প্রতিরূপ, নকল বা ছায়া। এস্থলে প্রশ্ন এই, আদর্শ যদি একমাত্র সত্য হয় এবং অপর কোন বস্তুর অপেক্ষা না রাখে, আদর্শ-সত্ত্ব যদি পূর্ণসত্তা হয়, তাহা হইলে তাহার সহিত অপর একটী মিথ্যা, অসম্পূর্ণ, প্রত্যক্ষজগতের প্রয়োজন কি? নকল যদি আসলের প্রকৃতিলাভে সমর্থ এবং আসলের জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত না হইল, তবে সে নকলকে আসলের পার্শ্বে দাঁড় করান কেন? স্থূল জগৎ যদি কেবলই নশ্বর এবং পরিণামে দুঃখপ্রদ হয়, তবে সে জগতের ত কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। এই আসল ও নকল, সত্য ও মিথ্যা, আদর্শ ও জড়ের সামঞ্জস্য সাধন করা প্লেটোর পক্ষে পারমেনাইডিস অপেক্ষা কম কষ্টকর হয় নাই। কেবলমাত্র আদর্শের কল্পনা হইতে এই বিবাদের মীমাংসা হয় না। আদর্শ ব্যতীত এমন কোন দ্বিতীয় সত্তার প্রয়োজন, যাহা জড় হইলেও সত্যাংশে মনেরই সমকক্ষ। কিন্তু এরূপ বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলে আদর্শের স্বাধীন অস্তিত্ব বা একনিষ্ঠতা হারাইতে হয়; কারণ, আদর্শ ব্যতীত অপর সত্যের আবশ্যক হইলে, আদর্শকে আর পূর্ণ সত্য বলা চলে না। উহাকে তখন পূর্ণসত্যের অংশরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, জড়জগৎকে 'কিছু না' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও অসম্ভব। এজগৎ যতই অসার হউক, উহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই; বরং সাধারণের নিকট উহা এতই শ্রদ্ধার বিষয় যে, তাহারা এক মুহূর্ত্তও উহার অস্তিত্ব ভুলিতে পারে না। সর্ব্বাংশে অসম্পূর্ণ হইলেও জড়জগৎ

সৃষ্টিনৈপুণ্যের জ্বলন্ত সাক্ষ্য; কি আদর্শবাদী, কি প্রত্যক্ষবাদী, সকলেই উহার রূপে, ঐশ্বর্য্যে এবং অনন্ত শৃঙ্খলায় মুগ্ধ। এই অনন্ত রূপ, অসীম সৌন্দর্য্য, অনির্ব্বচনীয় কলাকৌশলের রহস্যোদ্ঘাটন মানবের সাধ্যাতীত হইলেও মানবমাত্রেরই তজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত। এই রহস্যের মূলমন্ত্র বা সন্তোষজনক মীমাংসা কোথায়, তজ্জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম এবং আজীবন অধ্যবসায় আবশ্যক। প্লেটো একমাত্র পরম মঙ্গলের ধারণা হইতে এই রহস্যের সমাধান করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। ইহাই তাঁহার ভাবজগৎ এবং প্রত্যক্ষজগতের সন্ধিস্থল এবং এ সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা-প্রণালী এইরূপ:—

আদর্শ নিরপেক্ষ মঙ্গল; ঈশ্বর পরম মঙ্গল। মঙ্গলের কার্য্য মঙ্গলবিধান। পক্ষান্তরে, ঈশ্বর প্রাণময় এবং প্রাণের কার্য্য সৃষ্টিবিধান। অতএব, আদর্শ, পরম মঙ্গল অথবা ঈশ্বর, সৃষ্টি করিতে বাধ্য। তাঁহার সৃষ্টির বিষয় কি? আদর্শ ব্যতীত আর কিছুই নহে; আদর্শ আপনি আপনাকে সৃষ্টি করিতেছেন। আত্মসত্তার পুনরুৎপাদনই আদর্শের কার্য্য।

আদর্শ একমাত্র সৎ বা সত্য বলিয়া, আদর্শ ব্যতিরিক্ত আর যদি কিছু থাকে, তাহা নিশ্চয়ই অসৎ। আবার, আদর্শ পরম সত্য বলিয়া পরম শক্তিও বটে। শক্তির ধর্ম্ম আত্মবিকাশ, অর্থাৎ শক্তি নিষ্ক্রিয় থাকিবার নয়। এজন্য, আদর্শ আত্মশক্তি প্রভাবে সৎ হইতে অসতে আত্মসংক্রমণ করিতে বাধ্য। আত্মসংক্রমণের ফলে, অসৎও সত্তাবাপন্ন হইতেছে। সত্তাবিহীন অসতের নিকট আদর্শ স্বয়ং স্রষ্টা এবং সৃষ্টির উপাদান। পূর্ব্বে যাহা অসৎ ছিল, তাহা সতের সংস্পর্শে সত্তাস্থানীয় এবং আদর্শের নিরপেক্ষ অস্তিত্বের অংশভাক্ হয়। অসৎ এইরূপে সত্তার ধর্ম্ম লাভ করিয়া উপাদানে পরিণত হইলে পর, আদর্শ আত্মদৃষ্টান্তানুসারে এইটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং পবিত্র বিশ্বের রচনা করিয়াছেন। প্লেটোমতাবলম্বী দার্শনিকগণ সত্তাভাবাপন্ন অসৎকে জড় নাম দেন, কিন্তু জড় বলিতে মূর্ত্তি বা রূপেরই কল্পনা আসে। প্লেটোর মতে এবং তদীয় আদর্শবাদে, অসৎ জড় স্থানীয় হইলেও প্রথমতঃ উহা নিরবয়ব ছিল। পরে আদর্শের নিকট রূপ বা অবয়ব লাভ করে। আদর্শের রূপপ্রদায়িকা ক্রিয়ার ফলে অসৎ মূর্ত্তিবিশিষ্ট হইলে, তখন তাহা প্রকৃতপক্ষে জড়পদবাচ্য হয়। সাকার দ্রব্য মাত্রে সীমাবিশিষ্ট, সগুণ এবং গুণবাচ্য। আদর্শ-প্রদত্ত রূপ হইতে পৃথকভাবে কেবল মাত্র অসতের ধারণা হয় না। এরূপ অবস্থায় অসৎ সর্ব্ব গুণবর্জ্জিত, নাম বা সংজ্ঞা রহিত, অব্যক্ত এবং অতীন্দ্রিয়। স্বয়ং অনির্দ্দিষ্ট, অমূর্ত্ত এবং অতীন্দ্রিয় হইলেও, আদর্শের সংস্পর্শে আসিয়া, অসৎ সর্ব্বপ্রকার রূপ ও গুণের (determinations) অধিকারী হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় অসৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যসমূহ বা জগতের আধার স্বরূপ, জল স্থলব্যোমের সহিত অভেদ। অসৎ, আদর্শ কিম্বা ঈশ্বরের সৃষ্টি বলিলে ভুল হয়। কেননা, প্রথমতঃ, সৎ হইতে অসতের উৎপত্তি হয় না; সৎ এবং অসৎ বিরুদ্ধধর্ম্মী। দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টির অর্থ ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার মূলে ক্রিয়ার আধার প্রয়োজন। ঈশ্বর বা আদর্শের ক্রিয়াশীলতা হইতে ক্রিয়ার অবলম্বনজ্ঞান হওয়া স্বাভাবিক। অসৎ যদি ঈশ্বরকৃত না হইল, তবে উহার উৎপত্তি কোথায়? উহা আদর্শের

ক্রিয়াশীলতা বা অভিব্যক্তির ধর্ম্ম (condition) রূপে ঈশ্বরের সমসাময়িক, অর্থাৎ অনন্তকাল বিদ্যমান। প্লেটো আদর্শের 'ব্যাসিলিয়া' (Basileia বা সম্রাজ্ঞী আখ্যা দিয়াছিলেন। অসৎ অনন্ত হইলেও তাহার নিকট আদর্শের সম্রাটত্ব বা একাধিপত্য খর্ব্ব হয় না। আদর্শ বিশ্বসম্রাটরূপেই অবস্থিত করেন এবং অসতের অনন্তভাবও অক্ষুণ্ণ থাকে।

অসৎ কর্ত্তৃক আদর্শের শক্তি নষ্ট না হইলেও, তদ্দ্বারা আদর্শ বিশ্বরচনার যে ব্যাঘাত জন্মে না, এমন নয়। অসৎ আদর্শের ক্রিয়াসাধক হইয়াও ক্রিয়াপ্রতিবন্ধক, আদর্শের পক্ষে উহা একাধারে পরম মিত্র এবং পরমশত্রু। অসৎ স্বয়ং শক্তিহীন হইলেও বাধা প্রদানে অপটু নহে; বাধা প্রদান করাই উহার স্বভাব এবং সহায়তার অর্থই প্রতিবন্ধক জন্মান। স্বয়ং অমূর্ত্ত এবং অসীম, বলিয়া অসৎ মূর্ত্ত এবং সীমাবিশিষ্টের বিরোধী। সুনিপুণ বিশ্বশিল্পী যে কোন বস্তুকে ইচ্ছানুসারে পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে চাহেন, অসতের স্পর্শে তাহা অসম্পূর্ণই থাকিয়া যায়। এখানে ঈশ্বরের ইচ্ছা বাধা প্রাপ্ত হইতেছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার ইচ্ছা শক্তি প্রতিহত হইতেছে না, এইরূপ বুঝিতে হইবে। বস্তু সকলের নিশ্চেষ্টত্ব, গুরুত্ব; অসৌষ্টব, কুরূপতা এবং মূঢ়তা প্রভৃতি গুণ অসতের লক্ষণ। স্বাভাবিক বৈপরীত্য বশতঃ যাহা কিছু সত্য, স্থায়ী, বা অপরিবর্ত্তনীয়, অসৎ তাহারই প্রতিদ্বন্দ্বী। দ্রব্যসকলের অসম্পূর্ণতা; দৈহিক, মানসিক এবং নৈতিক অপকর্ষ; অস্থায়িত্ব বা পরিবর্ত্তন; জগতের যাহা কিছু অনিশ্চিত, নশ্বর বা ধ্বংস প্রবণ, সমস্তই অসতের ফল।

জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে প্লেটোর মত এইরূপ। মূলে দুইটী শক্তির মিলন হইতে বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। এই দুই শক্তির একটী পুরুষ বা জনক স্থানীয়, অপরটী প্রকৃতি বা জননীরূপিণী। পরিদৃশ্যমান বিরাট ব্রহ্মাণ্ড একেবারেই গঠিত হয় নাই। জগৎ সর্ব্ব প্রথম পরমমঙ্গলের প্রতিনিধি স্বরূপ একটীমাত্র পুরুষ রূপে উদ্ভূত হইয়াছিল। সেই আদিপুরুষ প্রথমতঃ দেবতারূপে আত্ম প্রকাশ করিতে থাকেন। সৃষ্টির তুলনায় তিনি পূর্ণকল্পিত হইলেও তাঁহার পূর্ণতা, নিরপেক্ষ পরমপিতার তুলনায় আপেক্ষিক জ্ঞান করিতে হইবে। তিনি প্রাণময়, অনন্ত এবং আদর্শ জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা। এই পুরুষই আদি বিশ্ব। তাঁহার দেহ নিয়তি-পরিচালিত অর্থাৎ আত্মবিকাশ তাঁহার ইচ্ছাধীন নয়, মন উদ্দেশ্যময়, অর্থাৎ জগতের পূর্ণাভিব্যক্তি তাঁহাতে বীজরূপে নিহিত, এবং তাঁহার আত্মা জগতের বিরুদ্ধ শক্তি সমূহের কেন্দ্র স্বরূপ। স্রষ্টার অভিপ্রেতানুসারে, সৃষ্টির অন্তরায় স্বরূপ নিয়তিকে বশীভূত করা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-জগৎকে আদর্শের অধীনে আনাই এই আত্মার ক্রিয়া। বিশ্বের আকার বর্ত্তুল সদৃশ, মনোরম এবং সর্ব্বসৌষ্ঠবসম্পন্ন; জগৎ সেই আদর্শ বা আদিবিশ্বের অবিকল প্রতিরূপ। স্বীয় মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে বলিয়া, উহা আপনাতেই আপনি প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে। বিশ্বের এই গতি সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ এবং নিখুঁত। অবিরত কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইতে থাকায়, কেন্দ্রপ্রদেশ গতিশূন্য হইয়া নিস্পন্দভাব ধারণ করে। সেই জন্য উহাই পরমাদর্শের অবস্থিতির একান্ত উপযোগী এবং তদীয় অপরিবর্ত্তনীয়তার চরম দৃষ্টান্ত। আদর্শ বিশ্ব জরা-

রহিত এবং যাবতীয় শক্তির একমাত্র আধার বলিয়া বহিঃস্থ কোন শক্তিই উহার ক্ষতি করিতে পারে না। জগৎ পরমাদর্শের ন্যায় স্বয়ং অনন্ত নহে; ঈশ্বরই জগতের অনন্তত্বের কারণ; অর্থাৎ যতটুকু সম্ভব উহাকে অনন্ত করিয়া সৃষ্ট করিতেছেন। জগৎকে অনন্ত করিয়া সৃষ্ট করার অর্থে ইহাও বুঝাইতেছে যে, তিনি অনন্ত কালেরও সৃষ্টিকর্ত্তা। বিশ্বের মন বা আত্মায় যে উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, তাহারই প্রকট বা ব্যক্ত অবস্থার নাম জগৎ, বিশ্বের আদিকারণই জগৎরূপ কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। পিথাগোরিয়ানদিগের মতে বিশ্বের আত্মা মূল সংখ্যা 'এক' সদৃশ এবং এই একের শক্তিতে শৃঙ্খলাবিহীন 'বহু' অর্থাৎ দ্রব্যজাত, সামঞ্জস্য এবং সৌষ্ঠবের অধীনে আসিতেছে।

পরমাণুবাদিগণ জগতের উদ্দেশ্য স্বীকার করেন না বলিয়া পরমাণুসংক্রান্ত জড়বাদে উদ্দেশ্যসাধক কারণ সমূহ পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্লেটোর আদর্শবাদে আনাক্সাগোরাসের 'নুস' শব্দের প্রকৃত অর্থ পাওয়া যায় এবং সৃষ্টি মাত্রই উদ্দেশ্য-মূলক, এই তথ্যটী প্রতিপন্ন করা প্লেটোর প্রধান লক্ষ্য ছিল। উহাতে প্রাকৃতিক কারণ গুলি (Physical causes) ও পরিত্যক্ত হয় নাই, তবে প্লেটো তাহাদিগকে গৌণস্থানীয়, অর্থাৎ উদ্দেশ্যসাধক কারণ সমূহের সহায়রূপে কল্পনা করিয়াছেন। মূল উপাদান সম্বন্ধে তিনি এম্পিডক্লিসের অনুবর্ত্তন করিলেও, তাঁহার মতে প্রত্যেক উপাদানই উদ্দেশ্য-পরতন্ত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অগ্নি ও মৃত্তিকা দুইটী উপাদান। দর্শনের নিমিত্ত অগ্নি এবং স্পর্শানুভাবের নিমিত্ত মৃত্তিকার উদ্ভব। এই দুইটী উপাদান আদি ও অন্তস্থানীয় ইহাদের, মধ্যে আর দুইটি উপাদান, বায়ু ও সলিল, যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয়স্থান অধিকার করিয়াছে। সৃষ্টির নিমিত্ত ন্যূনকল্পে চারিটী উপাদান একান্ত প্রয়োজন; তাহার কারণ চতুঃসংখ্যাদ্বারাই দেহ সূচিত হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্লেটোর আদর্শবাদ জ্যামিতিক নিয়মে প্রতিষ্ঠিত। এই প্রণালী তিনি পিথাগোরিয়ানদিগের নিকট পাইয়াছিলেন; তাই তাঁহার নিকট জড় (Matter) এবং বিস্তার (Ex'en·ion) উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নাই, উহাদের দ্বারা একই অর্থ প্রকাশিত হয়। জড় এবং বিস্তার স্বতন্ত্রভাবে কল্পিত হইলে, তাহা হইতে শূন্য বা অবকাশের কল্পনা আসিত। বিস্তার যদি জড়েরই নামান্তর হয়, তাহা হইলে আর শূন্যের ধারণা জন্মিতে পারে না। এখানে তিনি ইলিয়াটিকদিগের ন্যায় শূন্যের কল্পনা পরিহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং ডিমক্রিটাসের সহিত তাঁহার প্রভেদও এইখানে।

জড়, স্থানের (বিস্তারের) সহিত অভিন্ন এবং স্থান সর্ব্বত্র এক বলিয়া, জড়োপাদানভূত দ্রব্য সমূহও সমধর্ম্মাক্রান্ত। বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইলেও স্থান মূলতঃ একই জিনিষ। যাহাকে আমরা দ্রব্য আখ্যা দেই, তাহা স্থানেরই অংশ এবং যাহাকে আকাশ বলিয়া গণ্য করি, তাহাও পূর্ণগর্ভ স্থান। জগতে শূন্যস্থান বা কেবলমাত্র শূন্য বলিয়া কিছুই নাই। আকাশ এবং দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য এই যে, একটী ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অপরটী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। স্থানের কল্পনায় প্লেটোর মত পিথাগোরাসেরই অনুরূপ। জড় বিভিন্ন আকারের বটে, কিন্তু তাহার গঠন সমধর্ম্ম বিশিষ্ট কোষ সমূহের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। কোষগুলি পরমাণুর ন্যায় অসমান বা এলোমেলো

নয়। পরন্তু, সম্পূর্ণ নিটোল এবং নিখুঁত; জ্যামিতিক ক্ষেত্রের ন্যায় উৎকৃষ্ট অবয়ব সম্পন্ন এবং পরিণামদর্শী। জড়ের কঠিনাংশ ষড়স্রঘনক্ষেত্র, তরল ভাগ বিংশতাস্রঘনক্ষেত্র, বায়বীয়ভাগ অষ্টত্রিভূস্রাবচ্ছিন্ন ঘনক্ষেত্র এবং ঈথারভাগ পিরামিডাকৃতি ক্ষেত্র দ্বারা গঠিত।

সৃষ্টিসাধনোদ্দেশ্যে স্রষ্টা জড়কে প্রথমতঃ ভিন্ন ভিন্ন আকার প্রদান করিয়া, তৎপরে সেই সাবয়ব জড় হইতে ক্রমশঃ গ্রহনক্ষত্র এবং পৃথিবী রচনা করিয়াছেন। এইসকল পদার্থ সৃষ্টদেবতারূপে পরিগণিত, এজন্য ইহারা স্বভাবতঃ নশ্বর হইয়াও, ঈশ্বর অর্থাৎ পরম মঙ্গলের গুণে অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহারই আদেশানুসারে খণ্ড দেবতা সকল, বিশেষতঃ পৃথিবী, হইতে দেহধারী অপরাপর জীবের উদ্ভব হইতেছে। জীব-মধ্যে মানব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পার্থিব সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ; এ কারণ, পৃথিবীস্থ যাবতীয় দ্রব্য তাহারই প্রয়োজনসাধক। মানবের পুষ্টিসাধনহেতু উদ্ভিদের সৃষ্টি এবং পাপগ্রস্ত মানবাত্মা যাহাতে পুনর্দ্দেহধারণ দ্বারা অর্থাৎ পশুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, পুনরায় ঊর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য পশুর সৃষ্টি। পৃথিবীর প্রথম সন্তান পুরুষ, নারী তাহারই আত্মজা এবং অবনতির ফল। মানব বিশ্বেরই ক্ষুদ্রাবয়ব, বিশ্বের যাবতীয় গুণ মানবে সংক্রমিত হইয়াছে। মানবাত্মা প্রথমে কেবল বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়াছিল, দৈহিক আবরণ পরবর্ত্তী সৃষ্টি। দেহের প্রত্যেক অংশ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিরূপিত এবং সকলেই একটী মুখ্য উদ্দেশ্যের অনুকূলে সজ্জিত। বর্ত্তুলরূপ মূর্ত্তির মধ্যে পূর্ণতায় শ্রেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনসাধক, এজন্য বুদ্ধির আধার মস্তক, গোলাকৃতি। মস্তক-সাহায্যে দেহ চালিত হয় বলিয়া উহা দেহের শীর্ষ-দেশে স্থাপিত হইয়াছে। গতিবিধির জন্য পদদ্বয়ের প্রয়োজন, এজন্য উহারা দেহের নিম্নভাগে সংলগ্ন। হস্তের গঠন-কৌশল দেখিলেই বোধ হয় যে, ধারণের নিমিত্তই উহার সৃষ্টি। হৃদয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষাসমূহ স্থান পাইয়াছে। হৃদয় মস্তকের নিম্নে স্থাপিত, তাহার কারণ এই যে, প্রবৃত্তিগুলি বুদ্ধির দ্বারা সংযত থাকে। গ্রীবা দ্বারা উহা মস্তক হইতে পৃথক্ থাকার কারণ, প্রবৃত্তি বুদ্ধির সহিত যেন মিশ্রিত না হয়। নীচ প্রবৃত্তি বা পাশবিক ভাবগুলি কটীদেশে স্থান পাই-য়াছে। যাহাতে তাহারা হৃদয়ের উচ্চ ভাব-সমূহের সহিত মিশিতে না পারে, তজ্জন্য উভয়ের মধ্যে ঝিল্লির ব্যবধান। পাশবিক ভাবসমূহকে বুদ্ধির অধীনে আনা এবং উচ্চ ভাবসমূহের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই দেহের এই অংশে যকৃতের সৃষ্টি। যকৃৎ মসৃণ ও দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল, উহাতে চিন্তার প্রতিবিম্ব পড়ে। যকৃৎ কটু ও মধুর রসযুক্ত। কটুরসের ক্রিয়ায় অসংযত প্রবৃত্তি-গুলি বাধা প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধির অনুকূল পথে চালিত হয়, তৎপরে মধুর রসসংযোগে সৎ প্রবৃত্তিতে পরিণত হইয়া মানবকে সৎকার্য্যে প্রণোদিত করে। মধুর রসের ক্রিয়া কখনও কখনও ভবিষ্যৎ কথনরূপ দৈব-ক্ষমতাও প্রাপ্ত হয়। উদরে কুণ্ডলীকৃত দীর্ঘ অন্ত্রেরও উদ্দেশ্য আছে। অন্ত্রের কুণ্ডলাকৃতি এবং দীর্ঘতার কারণ এই যে, ভুক্ত দ্রব্য শীঘ্র শীঘ্র দেহ হইতে নির্গত হইতে পারে না। তাহার ফলে, অপরিমিত ভোজনপ্রবৃত্তি সংযত থাকে। অতিরিক্ত ভোগলালসা হইতে জ্ঞানানুরাগ ও বিবেকশক্তির হ্রাস হয়।

সংক্ষেপে, প্লেটোর মতে মানবদেহ আত্মার নৈতিক উৎকর্ষহেতু গঠিত এবং সজ্জিত, এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত দেহের সর্ব্বদা পরিশুদ্ধি আবশ্যক।

মানবাত্মা জগদাত্মার অংশ। সুতরাং উহাতে নশ্বরত্ব এবং অমরত্ব, উভয়গুণই বিদ্যমান। এই দুই গুণের সংমিশ্রণে মানবাত্মার উদ্ভব বলিয়া, মানবজীবনে এই দুইটী গুণের (সৎ এবং অসতের) ক্রিয়া অল্প বিস্তর লক্ষিত হয়। বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা নিত্য, বিষয়ানুভূতি অনিত্য। ইচ্ছা, মানসিক বল বা সাহস, প্রজ্ঞা এবং বিষয়ানুভূতি উভয় গুণ সঞ্জাত। ইচ্ছা দ্বারাই আত্মার স্বাতন্ত্র্যভাব রক্ষা পায়। পরমাত্মা অবিনাশী, কেননা, উহা মৌলিক, মঙ্গলগুণময় এবং শুদ্ধচৈতন্য। আত্মার নিত্যতা সম্বন্ধে কতক গুলি প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রমাণ গুলি এইরূপ, (১) সাধুগণ জ্ঞান-জগতের সাক্ষাৎ লাভে ব্যাকুল হন; (২) মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্ম রূপ সংস্কার; (৩) পূর্ব্বজন্মে বিশ্বাস; (৪) আত্মা সত্য বা স্বরূপাবধারণে সমর্থ; আত্মা স্বয়ং নিত্য না হইলে নিত্যতার ধারণা করিতে পারিত না; এবং (৫) আত্মা যদি দেহেরই গুণ সমষ্টি হইত, তবে তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয় জনিত ভাব সমূহ সংযত থাকিত না।

প্রকৃতির সহিত আত্মার (পুরুষের) ঐকান্তিক ঘনিষ্টতা বশতঃ আত্মার ক্রিয়াকলাপ বা স্বরূপ সম্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ হওয়া কঠিন। দ্রব্য সমূহের পরিবর্ত্তনশীলতা জড়বিজ্ঞানের প্রধান অন্তরায়। আদর্শের বিজ্ঞান বা অধ্যাত্ম শাস্ত্রই একমাত্র বিজ্ঞান; কেননা, আদর্শের পরিবর্ত্তন নাই, আদর্শ অনন্ত, অবন্ধ এবং অবশ্যম্ভাবী। জড়বিজ্ঞান সম্ভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত, অতএব বিশ্বাসই উহার মূল ভিত্তি।

৩। শ্রেষ্ঠ আদর্শ বা জগতের চরম উদ্দেশ্য।

প্রকৃতির চরম উদ্দেশ্য মানব এবং মানবের চরম উদ্দেশ্য, আদর্শে পরিণতি। প্লেটো খাঁটী আদর্শবাদী ছিলেন বলিয়া আণ্টিস্থিনিস এবং সিনিকদিগের মতই ভোগবিলাসের ভিতর পরম মঙ্গলের সন্ধান পান নাই। পরম মঙ্গলের সাক্ষাৎকার একমাত্র সাধনা-সম্ভূত চরিত্রোৎকর্ষের উপর নির্ভর করে। সক্রেটিস এবং প্লেটোর মতে পাপসমূহ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হয় না; কেননা, মঙ্গলের বিরোধাত্মক অমঙ্গলজনক কিছু থাকাই প্রকৃতির নিয়ম। অন্যায় বা পাপ সমূহ স্বর্গে দেবতাদিগের নিকট স্থান না পাইয়া মর্ত্ত্যধামেই বিচরণ করে, তজ্জন্য পাপ-পঙ্কিল ধরা-পৃষ্ঠ হইতে যত শীঘ্র সম্ভব প্রস্থান করাই মঙ্গলজনক, কিন্তু আত্মোৎকর্ষ বা চরিত্রোন্নতি পাপমোচনের একমাত্র উপায়। সুতরাং যতদিন চরিত্রশুদ্ধি না ঘটিতেছে ততদিন পাপের হাত হইতে কুত্রাপি পরিত্রাণ নাই। ঈশ্বর সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, এবং ন্যায়পরতাই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া মানবসমাজে যে যত অধিক ন্যায়পরায়ণ, সে তত অধিক ঈশ্বরত্ব অর্থাৎ পবিত্রতালাভ করিতে সমর্থ। মানবাত্মা ত্রিগুণাত্মক; তিনটী গুণ যথাক্রমে (১) প্রজ্ঞা (Intelligence), (২) সংকল্প (Will) এবং (৩) বিষয়জ্ঞান (Sensibility)। এই তিনটী গুণই ন্যায়পরতা দ্বারা অন্বিত। ন্যায়পরতা আত্মার প্রতিনিধিরূপে সকল গুণের উপরেই আধিপত্য করে। ন্যায়পরতা দ্বারা বুদ্ধি সংযত থাকে, অর্থাৎ চিন্তা বিপথগামিনী হইতে পারে না। ন্যায়পরতা দ্বারা সংকল্প বা ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয়, অর্থাৎ সংকল্প হইতে সাহস এবং সাহস হইতে

কার্য্যোৎপত্তি। ন্যায়পরতা দ্বারা বিষয় বাসনার সংযম ঘটে, অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি বিষয়মদে মত্ত হইতে পারে না। মনের ন্যায়পরতার ফলে জ্ঞান, হৃদয়ের ন্যায়পরতার ফলে সাহস এবং ইন্দ্রিয়ের ন্যায়পরতার ফলে মিতাচার লাভ হয়। দেবতার সহিত মানবের সম্বন্ধ রক্ষার জন্য পবিত্রতা প্রয়োজন। পবিত্রতা এবং ন্যায়পরতায় বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।

ন্যায়পরতা সাধনের ফল, এবং ন্যায়পরতাবলে মানব দেবত্বলাভে সমর্থ হয়। এই গুণ এককভাবে মানবের আয়ত্ত হয় না। উহা মানব সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং যৌথ চেষ্টার ফলে সমাজেরই আয়ত্তাধীন হয়, সমাজেই উহার ক্রিয়া সম্যক প্রকাশ পায়। প্লেটোর আদর্শ সমাজ (Ideal State) ব্যক্তি বিশেষের ন্যায় তিনটী অংশে বিভক্ত। মানবদেহের ঊর্দ্ধাংশ প্রজ্ঞা বা সত্ত্বগুণ প্রধান, মধ্যাংশ সংকল্প বা রজঃ গুণ প্রধান এবং নিম্নাংশ তমোগুণ প্রধান। দেহের এক এক অংশে এক এক গুণের প্রাধান্যহেতু, এইরূপ বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সমাজের পক্ষেও সেই নিয়ম। * (১) দার্শনিকগণ অর্থাৎ সত্ত্বগুণ প্রধান ব্যক্তিগণ সমাজের শীর্ষস্থানীয়; তাঁহারা বুদ্ধি বৃত্তিতে সর্ব্বপ্রধান, এজন্য তাঁহারা দণ্ড মুণ্ডের বিধাতা এবং তাঁহাদের দ্বারাই সমাজ শাসিত হইতেছে। (২) যৌধেয়গণ সমাজের হৃদয়স্বরূপ; তাঁহারাই শত্রুর আক্রমণ হইতে সমাজকে রক্ষা করিতেছেন। (৩) শ্রমজীবী অর্থাৎ তমোগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ, সমাজ-দেহের সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর বলিয়া পরিগণিত। ব্যবসায়ী, শিল্পী, কৃষক এবং দাসগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। শাসক-শ্রেণী জ্ঞান প্রধান, যৌধেয়শ্রেণী শৌর্য্য-প্রধান এবং ব্যবসায়ী শ্রেণী কর্ম্ম প্রধান। শেষোক্ত শ্রেণী অপর শ্রেণীদ্বয়ের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য। জাতি অর্থে মানব

---

*প্লেটোর সমাজ সম্বন্ধে বিলাতের প্রসিদ্ধ "Mind" পত্রে Mr. J. L. Stocks একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"To some it has been a matter of surprise that Plato counted so confidently on finding these three characters,—the love of knowledge, of honour and of profit, graven in 'larger letters' on the life of his Ideal State. But if these are the three characteristic pursuits and preoccupations of humanity, a State in which any is lacking would be incomplete. Any society whatever is bound in some degree to exhibit all three, even though the social organisation which is called the State, refused explicit recognition to one or another. The healthy State which does no violence to nature must needs recognise all three; and the only question for Plato is in what form they are to be expressed. He is not relying on any haxardous parallel between the soul of man and the soul of the State, but on the plain fact that state-organisation must take account of every need and demand of man's nature. The activities of the community then will necessarily fall into these classes. There will be the work of production—the economic or profit-seeking activity,—the work of self-protection and self-assertion, inspired by the love of honour, and the search for truth inspired by the love of wisdom. Every State has these three interests, and in forming the ideal State we must see that the organisation makes due provision for each. So far the doctrine of the tripartite soul will carry us, and Plato does not attempt to push it any further"—Mind, April, 1915.

এবং মানব সমাজ, উভয়ের প্রভেদ নাই। সমাজের একতা রক্ষার জন্য ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ সাধারণ স্বার্থের সহিত মিলিত হওয়া আবশ্যক। ব্যক্তিকে বংশের সহিত, বংশকে সমাজের সহিত এবং সমাজকে বৃহত্তর সমাজ বা জগতের সহিত, মিলানই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। সমাজে একেবারে নিজের বলিয়া কিছুই দাবী করিবার নাই। সমাজ একটী সুবৃহৎ পরিবার, এজন্য সন্তানগণ সমাজের বংশ স্বরূপ। সমাজ তাহাদের পিতৃস্থানীয়; কেন না, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষা দীক্ষার ভার সমাজের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। সামাজিক জীবন গঠনের জন্য বালকদিগের নিম্নলিখিতরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। জন্ম হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত শিশুর শিক্ষা তাহার শরীর রক্ষণেই পর্য্যবসিত হইবে। চারি হইতে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত উপদেশচ্ছলে তাহার নৈতিক শিক্ষা, সাত হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত ব্যায়াম, এগার হইতে তের পর্য্যন্ত বিদ্যার্জ্জন, চৌদ্দ হইতে ষোল পর্য্যন্ত শিল্প শিক্ষা, ষোল হইতে আঠারো পর্য্যন্ত অঙ্ক শাস্ত্র এবং আঠারো হইতে বিংশ বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষার সময়। বালকগণ বিংশ বৎসরে পদার্পণ করিলে সমাজ তাহাদের মধ্য হইতে বাছাই করিয়া যোগ্যতানুসারে কতক গুলিকে শাসন বিভাগে নিযুক্ত করিবে এবং অপর কতক গুলিকে সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত করিবে। শাসন বিভাগে নিয়োজিত হইয়া যুবকগণ, ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন। এই বয়সে তাঁহাদের মধ্যে দ্বিতীয়বার মনোনয়ন আবশ্যক। যাঁহারা রাষ্ট্রনীতিতে কুশল নহেন, তাঁহাদিগকে যোগ্যতানুসারে সাধারণ বিচার কার্য্যে নিযুক্ত করা বিধেয়। প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ প্রথমতঃ কয়েক বৎসর যাবত 'ডায়ালেকটিকস্' বা তর্কশাস্ত্রসম্মত অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনা করিয়া তৎপর নীতি বিজ্ঞান পাঠে শিক্ষা সমাপন করিবেন। এইরূপে অধীত শাস্ত্র হইয়া পরম মঙ্গল সম্বন্ধে যখন জ্ঞান জন্মিবে, তখন তাঁহারা শাসন সংক্রান্ত সর্ব্বোচ্চ দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য পালনের উপযুক্ত হইবেন। সমাজ বা রাজ্য প্রকৃতপক্ষে একটী বিরাট শিক্ষা মন্দির; মঙ্গল ও ন্যায় বিধানই তাহার চরম উদ্দেশ্য। কেবল মাত্র অর্থকরী বিদ্যা (Art) সমাজে আদর পায় না, তবে সেই বিদ্যার যে টুকু সমাজের পক্ষে হিতকরী এবং পরম মঙ্গলের উদ্দেশ্যানুসারে নিয়োজিত, সেই টুকুই সমাজ কর্ত্তৃক আদৃত হইয়া থাকে।

উপরোক্ত মন্তব্যগুলি অক্ষরে অক্ষরে প্লেটোর আদর্শবাদ-সম্মত এবং উহাদের আলোচনা হইতে পুনরায় তাঁহার মূল অধ্যাত্ম তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সত্যের সহিত ইন্দ্রিয়জ সংস্কার বা পরিবর্ত্তনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। সত্য, আদর্শ কিম্বা বস্তুজাতের অন্তর্নিহিত অপরিবর্ত্তনীয় রূপ,—প্রজ্ঞালভ্য পরমার্থেরই প্রকৃতি। দ্রব্য সমূহের চাক্ষুষ বাস্তবতা আদর্শের উপরে নির্ভর করে, অর্থাৎ যে দ্রব্যটী যে পরিমাণে আদর্শরূপ অনুকরণ করিতে পারিয়াছে, সেই দ্রব্যটী সেই পরিমাণেই সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। সূর্য্য যেমন ইন্দ্রিয়-জগতের অস্তিত্ব জ্ঞাপক, সর্ব্বোচ্চ আদর্শ ও তেমনি আদর্শ জগৎ বা সত্য জগতের প্রকাশক। এই আদর্শ পরম মঙ্গল, সর্ব্ব মঙ্গলের মূলাধার, সর্ব্ব ভূতের আদি এবং অন্ত্যকারণ; সুতরাং উহা কেবল মাত্র সত্তা অপেক্ষাও প্রাচীন এবং শ্রেয়ঃ। তাপ বিকীরণ যেমন অগ্নির

স্বভাব, সত্তাবিকাশও তদ্রূপ সর্ব্বোচ্চ বা মূলাদর্শের স্বভাব।

এবম্বিধ তত্ত্বজ্ঞানকে অদ্বৈত মঙ্গলবাদ (Monism of the good) বলা যায়। ইহাপেক্ষা মহত্তর কল্পনা দর্শনের সাধ্যাতীত। দর্শন শাস্ত্রে যিনি যতই ব্যুৎপন্ন বা অগ্রসর হউন, অদ্বৈত মঙ্গলের ধারণাকে অতিক্রম করিতে কেহই সমর্থ নহেন। মহামতি ক্যাণ্ট প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রজ্ঞার (Intellect) দ্বারা দ্রব্যসমূহের অস্তিত্ব নিরূপিত হয় এবং তাহাদের আন্তর্জাতিক সাধারণ সত্তা নির্দ্ধারণের জন্য কেবলমাত্র বিচারবুদ্ধির (Reason) প্রয়োজন বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। পরে, তাঁহাকে ইহাও স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, কেবলমাত্র এই সকল মানসিক বৃত্তি দ্বারা সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয় না; ইহাদের উপরে পরম মঙ্গলের কার্য্যকারিতাও স্বীকার করিতে হইবে। সত্য, মঙ্গলেরই রূপ; সত্য এবং মঙ্গলে প্রকৃতিগত পার্থক্য নাই। ক্যাণ্টের এই তত্ত্বটী প্লেটোর মতেরই পুনরাবৃত্তি; প্রভেদের মধ্যে, উহাতে প্লেটোর ন্যায় কবিত্বের প্রভাব নাই। আধুনিক বিজ্ঞানসমূহ নামমূলক (Nominalistic), তথাপি উহাতে আপেক্ষিক সত্যসমূহের জ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান, এবং সাধারণ, বা শ্রেণীবাচক বিধি-নির্ণয়ও উহার উদ্দেশ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নরতত্ত্ববিৎ যখন পিটার বা পলের বিষয় চিন্তা করেন, তখন সে চিন্তার উদ্দেশ্য এই যে, 'মানব' এই শ্রেণীবাচক শব্দে যাহা প্রকাশ পায়, তাহারই নির্ণয় করা। বৈজ্ঞানিক যখন বৃক্ষ হইতে ফল পতন, শূন্যে ভাসমান তুষারপুঞ্জ এবং কঠিন বরফখণ্ড সমূহের অধোগতির বিষয় চিন্তা করেন, তখন সে চিন্তার উদ্দেশ্য, এই সকল নৈসর্গিক ঘটনাবলম্বনে দ্রব্যসমূহের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা। বৈজ্ঞানিকগণ প্লেটোর মতই দ্রব্যের পরিবর্ত্তনশীলতা এবং যে বিধির দ্বারা দ্রব্যসমূহ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহা যে দ্রব্যাপেক্ষা অধিক স্থায়ী বলিয়া অধিক সত্য, এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। বিশেষ অপেক্ষা সাধারণের অধিক স্থায়িত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্লেটো এবং বৈজ্ঞানিকদিগের মতভেদ নাই। মতভেদ এইখানে যে, প্লেটো দ্রব্যসমূহের নিয়ামক বিধিগুলিকে আধ্যাত্মিক হিসাবে গণ্য করিয়াছেন; কেন না, তাঁহার মতে ঐ সকল বিধির অন্তরালে নিরপেক্ষ সত্য নিহিত; নিয়মগুলি মূল সত্যপ্রকাশক, অথবা সত্য নিয়মগুলির ভিতর দিয়া আত্ম প্রকাশ করে। বৈজ্ঞানিকগণ সাধারণতঃ এরূপ সত্য বা স্বরূপের প্রমাণাভাব বলিয়া, তদনুসন্ধানে ব্যর্থশ্রম আবশ্যক মনে করেন না। জাতি এবং তদন্তর্ভূত দ্রব্য বা ব্যক্তি, সাধারণ নিয়ম এবং নিয়মপ্রকাশক ঘটনাবলী, ইহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ইহারা জ্ঞাতার নিকট ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশ পায়। জাতি কিম্বা সাধারণ নিয়ম অবগত হইবার জন্য দ্রব্য, ব্যক্তি কিম্বা ঘটনার অবধারণ আবশ্যক। অবধারণ এবং বিচার (observation and reasoning) একই চিন্তার দুটী বিভিন্ন স্তর। জ্ঞানলাভার্থ এই দুই স্তরের ভিতর দিয়া সত্যানুসন্ধান করিতে হইবে। কেবলমাত্র অবধারণ বা কেবলমাত্র বিচার দ্বারা বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইতে পারে না এবং বিশেষকে ছাড়িয়াও সাধারণের জ্ঞান জন্মে না। চিন্তার আরোহণ-প্রণালী (Inductive method) অবধারণ ক্রিয়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং আরোহণ-চিন্তাপ্রণালী হইতে

বিচার-সাহায্যে সাধারণ বিধি প্রাপ্ত হওয়া যায়?

ওয়েবার * বলেন যে, প্লেটোর সময়ে দার্শনিক শব্দভাণ্ডার পুষ্টতা লাভ করে নাই বলিয়া প্লেটো তাঁহার আদর্শকে দ্রব্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, বাস্তব এবং অতীন্দ্রিয় বা অলৌকিক কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বস্তু সমূহের জাতিগত রূপ, মূর্ত্তি বা আকার স্বীকার করিয়া সেই রূপ মূর্ত্তি বা আকারকে সত্যস্বরূপ কল্পনা করার পরিবর্ত্তে যদি বিজ্ঞানসম্মত কেবল মাত্র নিয়ম বা বিধি (Laws) শব্দ প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার পার্থক্য জ্ঞানসুলভ (Separtistic) ভ্রান্তি ঘটিত না। ওয়েবার আরও বলেন যে, কেবল শব্দাভাবই এই ভ্রমের একমাত্র কারণ নয়। কবিত্বানুরাগও আদর্শকে বাস্তব সত্তা বলিয়া গণ্য করার একটী কারণ। জগদ্বিখ্যাত অরিষ্টটল এবং প্লেটোর কয়েক জন শিষ্য প্লেটোর স্বরূপ বা আদর্শবাদের সমালোচনা করিতে গিয়া অত্যুক্তি দোষ ঘটাইয়াছেন, অর্থাৎ প্লেটোর নিজের বর্ণনায় আদর্শের যতটুকু স্বরূপত্ব কল্পিত হইয়াছে, তদপেক্ষা তাঁহারা বেশি প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ফলে, তাঁহাদের মতেও স্বরূপবাদ বড় কম প্রকাশ পায় নাই। আদর্শকে পূর্ণসত্য বলিয়া কল্পনা করার দোষ এই যে, আদর্শপূর্ণ বা অখণ্ড সত্য হইলে,তাহাতে আর পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, এবং আকাঙ্ক্ষার অভাবে অনন্ত সৃষ্টি প্রকরণেরও সম্ভাবনা থাকে না। সৃষ্টির মূলে যদি পরম সত্যের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় এবং সেই সত্যের যদি পরিণতি বা পূর্ণতা প্রাপ্তির প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে যাহাকে সৃষ্টি বলা হইতেছে, তাহা অর্থাৎ অগ্নি-বায়ু-সলিল-মৃত্তিকা রূপ দৃশ্যমান জগৎ, স্বয়ংই পূর্ণ সত্য বা দেবতা ; আদর্শের সহিত তবে আর জগতের তফাৎ কি? যাহাকে জড় জগৎ বলা হইয়াছে, তাহা স্বয়ংই পরম সত্য বা বিশুদ্ধ আদর্শের প্রবাহ; এখানে সবই সত্তা এবং সত্য ; অসৎ অসত্তা বা মিথ্যার চিহ্ন নাই, এইরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। প্লেটো আদর্শকে শক্তি অভিধাও দিয়াছেন। মূল আদর্শ বা পরম সত্যের সহিত আদর্শের মাতা-পুত্রের সম্বন্ধ। এরূপস্থলে আদর্শকে পূর্ণ জ্ঞান করিলে জগতের যদি কোন অর্থ থাকে, তবে তাহাকে দেবতারই লীলাভূমি, মঙ্গল, ন্যায় ও পূর্ণতার রাজ্য বলিতে হইবে। পরন্তু, জগৎ যে কেবল মাত্র দেবতার আবাসভূমি নয়, অথবা তথায় যে কেবল মঙ্গল, ন্যায় এবং পূর্ণতা নিত্য বিরাজ করে না, তাহাতে সন্দেহ নাই। সৎ, আত্মা এবং মঙ্গলের পার্শ্বে অসৎ, অনাত্মা এবং অমঙ্গলের প্রভাবও যথেষ্ট রহিয়াছে। জগৎ সৎ ও অসৎ, জড় ও আত্মা এবং মঙ্গল ও অমঙ্গলের সংমিশ্রণ। এই অসৎ অনাত্মা বা অমঙ্গলরূপ দ্বিতীয় বস্তুটী কোথা হইতে আসিল? আদর্শ হইতে? কখনই নহে। আদর্শ—সত্তা, মন বা আত্মা এবং মঙ্গলেরই কারণ। যে বস্তুর যে প্রকৃতি, আদর্শ নিজে যখন সৎ তখন তাহা হইতে অসৎ বা অমঙ্গলের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। অতএব, সৃষ্টিব্যাপারে আদর্শের সহিত দ্বিতীয় সত্তারও কার্য্যকারিতা অবশ্য স্বীকার্য্য। অদ্বৈত মঙ্গল

* Professor Weber (কেহ কেহ 'বেবার' বলিয়া থাকেন)।

তাহা হইলে আর একক রহিলেন না, আদর্শ ও জড়, সৎ ও অসৎ, এই দ্বিবিধ মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন। এই দ্বিতীয় সত্তার সংস্পর্শে আসিয়া আদর্শ অথবা আদর্শজাত মন বা বুদ্ধি, বিকৃত, ক্ষুদ্রত্বপ্রাপ্ত এবং সুপ্ত-তেজঃ হইতে থাকিল; জড় বুদ্ধির শত্রু স্থানীয় এবং অমঙ্গলের কারণ হইল। মন যে জড় বেষ্টনীরূপ শত্রু-ব্যূহ অতিক্রম করিতে, ইন্দ্রিয়-জগৎ হইতে জ্ঞান জগতে প্রয়াণ করিতে ব্যাকুল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আদর্শ সুখ-কল্পনায় প্রতিষ্ঠিত উইটোপিয়ান (Utopian System of Politics) রাষ্ট্রনৈতিক সম্প্রদায়, জ্ঞানপন্থী ভিক্ষু সম্প্রদায়, *তত্ত্ববাদী খ্রীষ্টান সম্প্রদায় †; এমন কি, ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে যেসকল জড়-ভীতি দৃষ্ট হয়, ঐ সকল সম্প্রদায়ের লোক যে মায়ামোহের কল্পনায় অধীর হইয়া উঠেন, সে সমস্তই ধারণাকে আদর্শ, সাধারণ নিয়ম বা বিধিকে সত্যস্বরূপ জ্ঞান করার ফল।

প্লেটোর পরে স্পিউসিপাস (Speusippus) খ্রী পূঃ ৩৪৭ হইতে ৩৩৯ অব্দ পর্য্যন্ত আটবৎসর কাল অ্যাকাডেমিতে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তিনি 'এক' অর্থাৎ আদর্শ এবং 'বহু' অর্থাৎ জড়, উভয়ের সামঞ্জস্যকল্পে পিথাগোরিয়ানদিগের সৃষ্টির ক্রমবিকাশ ও শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতিটী সমীচীন মনে করিতেন। তাঁহার মতের মর্ম্ম এই যে, কেবল মাত্র কল্পিত ঐক্যে পূর্ণতার নিদর্শন পাওয়া যায় না। সংযোগ-বিয়োগাত্মিকা ক্রিয়ার ফলে, মূল সত্তা বা শক্তি যখন দেহরূপে প্রকাশ পায়, তখনই তাহাতে পূর্ণতার সূত্রপাত। সৃষ্টির উদ্দেশ্যই পূর্ণতা প্রাপ্তি, সৃষ্টির প্রারম্ভে আদর্শ যদি পূর্ণরূপেই বিরাজ করিতেন, তাহা হইলে আর সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকিত না। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধ হইলেও গুরুর অপ্রমেয় যশঃসৌরভে এবং গুরুর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবশতঃ তিনি প্লেটোর মতের অসঙ্গতি দোষ প্রদর্শন করেন নাই। জেনেক্রেটিস (Xenocratis), পোলিমো (Polemo), ক্র্যান্টার (Crantor) এবং ক্রেটিস (Crates) সম্বন্ধেও এই উক্তি খাটে। প্লেটোর শিষ্যদিগের মধ্যে প্রথিতযশঃ নব্যসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিতা আরিষ্টটল অ্যাকাডেমি-প্রচলিত আদর্শবাদের যে সংস্কার সাধন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেবতামূলক বিশ্বাসের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

শ্রীদিগ্বিজয় রায়চৌধুরী।

* Neo-Platonists, † Gnostics.

নীতি ও সাহিত্য।

নীতি দুই প্রকার, সুনীতি ও কুনীতি। সুনীতি কাহাকে বলে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, মানবমনের ধর্ম্মশক্তির বিষয়ে দুই এক কথা বলা আবশ্যক। সুখার্জ্জন এবং দুঃখার্জ্জনই মনুষ্য মাত্রের কর্ম্মের চরম-লক্ষ্য। মানুষের যত কিছু চেষ্টা, সমস্তের মূলে এই দুইটী ভাব বর্ত্তমান আছে। যে কর্ম্ম করিলে প্রথমে সুখসম্ভোগ করা যায়

এবং পরে উৎকট কষ্টের সম্ভাবনা,সেই কর্ম্মে মনুষ্যের হস্তক্ষেপ করা অবিধেয়। এইরূপ কর্ম্ম বর্জ্জন করাই সুনীতির উপদেশ। আমাদিগের জ্ঞান সর্ব্বদা মায়া মোহ আচ্ছন্ন। ভবিষ্যতের ভাবনা না ভাবিয়া বর্ত্তমান সময়ে সুখস্বচ্ছন্দে জীবন পাত করিতে পারিলেই অনেকে সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করেন। মৃত্যুর পশ্চাতে যে অনন্ত জীবন আছে, তাহার ভাবনা না ভাবিয়া আমাদিগের কার্য্যাকার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিলেই, আমাদিগের জীবন উৎকৃষ্ট নৈতিক আদর্শ স্বরূপ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? বিভিন্ন ধর্ম্মোপদেষ্টা অনন্ত জীবন স্রোতের দিকে চাহিয়াই তাঁহাদিগের উপদেশামৃত রচনা করিয়াছেন। তাই তাঁহাদিগের উপদেশাবলী আমাদিগের প্রাণে সন্তোষ সঞ্চার করে। পার্থিব স্নেহে অন্তরের আকাঙ্ক্ষা মিটে না, কাম-কলুষিত প্রেমে প্রাণের অভাব পূরণ হয় না। ভৌতিক সুখভোগে আত্মার তৃপ্তি অসাধ্য। মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাতে ছুটিয়া কৈশোর যৌবন বৃথায় কাটাইলে, ক্লান্তপদে বার্দ্ধক্যের বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া অনুতাপের বৃশ্চিক-দংশন ভোগ করিতেই হইবে। সম্মুখে অসীম অন্ধকার, পশ্চাতে মরুভূমি সদৃশ নিষ্ফল জীবন ফেলিয়া মহাপ্রস্থান করিতে কাহার অন্তরাত্মা না কাঁপিয়া উঠে? পর জীবনের কথা ছাড়িয়াদিলেও, এজীবনে সুখভোগ করিতে হইলে স্বার্থপরতা এবং আপাতরম্য বিষয়-বাসনা অনেক পরিমাণে সংযত করিতে হয়। চালাকির দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্য সাধন হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ এবং মহাবীর্য্যের মহাবতারে সমস্ত গুরুতর কার্য্যোদ্ধার হয়। সুনীতির একটী বিশিষ্ট উপদেশ পরোপকার। কিন্তু পরোপকার যে আত্মোন্নতিমূলক, তাহা অনেকেই ভুলিয়া যান। কোন ক্রমে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য বিশিষ্ট আত্মত্যাগের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু জীবনযাত্রা মধুর এবং সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে হইলে বিশেষ অধ্যবসায় এবং আত্মত্যাগ সাপেক্ষ। যাহারা স্বভাবতঃ নিতান্ত আত্মপ্রিয়, তাহারাও বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়া স্ত্রীপুত্রের নিকট আত্মসমর্পণ করে, এজন্য তাহারা সুখী। নচেৎ তাহারা কিছুতেই সুখী হইত না। পরের জন্য আত্ম বিসর্জ্জন ভিন্ন সংসারে স্থায়ী সুখের অন্য কোন ভিত্তি নাই। ধন যশঃ ইন্দ্রিয়াদি লব্ধ সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহারা স্থায়ী নহে। এ সকল প্রথমবারে যে পরিমাণে সুখদায়ক হয়, দ্বিতীয়বারে সে পরিমাণে হয় না, তৃতীয়বারে আরও অল্প সুখদায়ক হয়। ক্রমে অভ্যাসে তাহাতে কিছুই সুখ থাকে না। কিন্তু দুইটী অসুখের কারণ জন্মে; প্রথমতঃ অভ্যস্ত বস্তুর লাভে সুখ না হউক, অভাবে গুরুতর অসুখ হয়; এবং অপরিতোষণীয়া আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধিতে যন্ত্রণা হয়। লৌকিক হিসাবে যে সকল কাম্য বস্তু বলিয়া পরিচিত, তাহা সকলই অতৃপ্তিকর এবং দুঃখের মূল। ইন্দ্রিয় সুখের অনুগামী রোগ, ধনের সঙ্গে ক্ষতি এবং মনস্তাপ, কান্তবপুঃ জরাগ্রস্ত বা ব্যাধিদুষ্ট হয়; সজ্জনেরও মিথ্যা কলঙ্ক রটে। মান-সম্ভ্রম মেঘমালার ন্যায় শরতের পর আর থাকে না। আত্মোৎসর্গ সুনীতির চরম লক্ষ্য বলিয়াই, এত আদর। সুনীতির পথে চলিলে আমাদিগের সুখশান্তি বর্দ্ধিত ভিন্ন কখনও হ্রাস হইতে পারে না। নৈতিক বল যে শারী-

রিক বলের অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট, তাহা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা অনাবশ্যক। মহাবীর নেপোলিয়ন্ বলিতেন, সমর ক্ষেত্রে নৈতিক বল শারীরিক বলের অপেক্ষা দশ গুণ বেশী। নেপোলিয়ন্ আর একটী কথা সদা সর্ব্বদা বলিতেন, যে জাতির মধ্যে বহু সংখ্যক উন্নতমনস্কা নারী বিদ্যমান আছেন, সে জাতির উন্নতি কেহই রোধ করিতে পারে না। একটী সমাজে যদি গুটিকতক নৈতিক আদর্শ চরিত্রের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে শত অপরাধ এবং অক্ষমতা সত্ত্বেও সেই সমাজের সর্ব্ববিধ কল্যাণ হয়। সমগ্র ব্যক্তির সমক্ষে যদি উজ্জ্বল নৈতিক আদর্শ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে, ব্যক্তি-গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ এবং দুর্নীতি সামাজিক উন্নতির পরিপন্থী হইতে পারে না। আজ ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজ অবনতির নিম্নতর স্তরে নিপতিত, কিন্তু মৈত্রেয়ী, গার্গী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতির উচ্চাদর্শ আজিও সমাজের শীর্ণ কঙ্কালকে অনুপ্রাণিত করিতেছে বলিয়াই তাহার অস্তিত্ব লোপ হয় নাই। আমাদিগের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে সমাজকে জীব-দেহের সহিত তুলনা করা হইয়া আসিতেছে। বেদে সমাজকে বিরাট পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ইহার মস্তক, ক্ষত্রিয় ইহার হস্তদ্বয় ও বক্ষঃ, বৈশ্য ইহার উদর এবং শূদ্র ইহার চরণ, এই কথা বেদেই বলিয়াছেন। কোনও অঙ্গ কিম্বা প্রত্যঙ্গ ব্যাধিগ্রস্ত অথবা বিকল হইলে, মস্তিষ্ক তাহার স্বাস্থ্য বিধান করে। উজ্জ্বল নৈতিক আদর্শই যে সমাজের মস্তিষ্ক, উক্ত উপমায় তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। বেগবান্ অশ্বের বল্‌গা রজ্জু ছিন্ন হইলে চালকের যেরূপ অশেষ দুর্গতি হয়, নৈতিক আদর্শের উপেক্ষা কিম্বা অবমাননা হইলে, সমাজ এবং জাতীয় জীবনের সেইরূপ সমূহ বিপদ অবশ্যম্ভাবী। শনির অভিসম্পাতে নলরাজার অশেষ দুর্গতি হইয়াছিল। রাজ্য ধন পরিজন সকলেই লোপ পাইল। এমন কি, প্রাণপ্রিয়া দময়ন্তীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হইল। লক্ষ্মীর অন্তর্ধানে একে একে রাজকীয় গুণনিচয় তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। সাহস আসিয়া যখন বলিল, মহারাজ! আপনার হৃদয়ে অনেক দিন বসবাস করিতেছি, এখন বিদায় দিন। মহারাজ নল বজ্র-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, তাহা হইতে পারে না। ভাগ্যের বিপর্য্যয়ে যদিও রাজকীয় গুণ নিচয় আজ আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে, তথাপি আমি কিছু-মাত্র বিচলিত হই নাই। তোমাকে অব-লম্বন করিয়া আমি আবার রাজ্যৈশ্বর্য্য লাভ করিব। রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র সর্ব্ব-সাধারণের পক্ষে নৈতিক বলের সমান আবশ্যক। সুখাগম এবং দুঃখ-বিমোচনের এক মাত্র উপায় নৈতিক বল। এমন কোন লোক নাই, যাঁহাকে শোক কিম্বা দুঃখ ভোগ করিতে হয় নাই বা হইবে না। দুগ্ধফেন-নিভ শয্যায় শায়িত বিলাসী কিম্বা পর্ণকুটীর-বাসী ভিক্ষুকের নৈতিকবল না থাকিলে, দুঃখদুর্দ্দশার তাপ সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হয়। যাহা সুনীতি, তাহাই ধর্ম্ম এবং যাহা দুর্নীতি, তাহা অধর্ম্ম। ধর্ম্মের মূলে ঈশ্বর-বিশ্বাস নিহিত আছে। তবে নাস্তিকও নীতির উপদেশ পালন করেন। সমাজ-শাসন এবং সমাজ-রক্ষণ করিবার জন্য সুনীতির প্রবর্ত্তিত পথা-অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক। সুনীতির অনুজ্ঞা অবহেলন করিলে শীঘ্রই রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। ধর্ম্মের দুইটী অঙ্গ আছে।

ব্যবহারিক অঙ্গ ও অন্তশুদ্ধি বিধি। যে সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিলে আমাদিগের আত্মার উন্নতি হয়, তাহাই অন্তশুদ্ধির অন্তর্গত। পূজা হোম যাগ প্রতিমা অর্চনা প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ করিলে আমাদিগের মন পবিত্র হয় এবং পরিশেষে ব্রহ্মানন্দের আভাস পর্য্যন্ত পাইতে পারে। হিন্দুধর্ম্মের একটী বিশেষত্ব এই যে, অন্তর্যজনে কর্ত্তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। যিনি যে স্তরে অবস্থিত, তিনি সেই স্তর হইতে উর্দ্ধে গমন করিবার জন্য বিহিত ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে পারেন। এমন কোনও বিধি নাই—যে সর্ব্ব সাধারণকে কোন দেবতাবিশেষেরই উপাসনা করিতে হইবে। ইচ্ছামত আমরা শক্তি কিম্বা বিষ্ণুর উপাসনা করিতে পারি। সন্ন্যাসী কিম্বা গৃহীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারি। মন্ত্র গ্রহণ না করিলেও মৌখিক হিসাবে কোন প্রত্যবায় হয় না যদিও আমাদিগের অন্যদেশের সহিত তুলনায় অন্তর্যজন সম্বন্ধে অনেকটা স্বাধীনতা আছে, কিন্তু ধর্ম্মের ব্যবহারিক অঙ্গে আমাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে শাস্ত্র মানিয়া চলিতে হয়। মৌখিক আচারে আমাদিগের কোন স্বেচ্ছাচার লক্ষিত হয় না। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া সমাজের অপ্রথা কুপ্রথা অনুমোদন করিবার অভিলাষ নাই, তবে এইটুকু বলিতে চাই যে, সুনীতির শাসন সুদৃঢ় করিবার জন্যই হিন্দুধর্ম্মের ব্যবহারিক অঙ্গ এত কঠোর এবং অমার্জ্জনীয়। আমাদিগের মুনি ঋষিরা নৈতিক আচারের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা সমাজ-শাসন এত কঠোর করিয়াছিলেন। অবশ্য কাল-ক্রমে তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত নিয়ম, অনেকাং-শেই অযথা কঠোরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু সমাজকে যে কোন দিক্ দিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, সুনীতির বন্ধন সুদৃঢ় করিবার জন্যই আমাদিগের পুরাতন নেতৃগণ রক্তমাংসের দৌর্ব্বল্যের প্রতি এত-দূর তীব্র দৃষ্টি রাখিয়াছেন। নাস্তিক কিম্বা আস্তিক ধনী কিম্বা নির্ধনীকে সর্ব্বসময়ে সুনীতির শাসন মানিয়া চলিতে হয়। মিথ্যা-কথা কিম্বা জুয়াচুরী করিয়া কিঞ্চিৎ সুবিধা লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু আমাদিগের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান কিম্বা অধিক সতর্ক লোক যে আমাদিগের বিদ্যা আমাদিগকে শিখাইবে না, এরূপ আশা করা যায় না। সমাজে থাকিতে হইলে সুনীতিকে অবলম্বন করিতেই হইবে। তবে ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকিলে সুনীতির শাসন মানিয়া চলা অনেক বিষয়ে সহজ হয়। আস্তিক দুর্নীতিকে সর্পবৎ বর্জ্জন করেন, তাহার প্রধান কারণ, তাঁহার বিশ্বাস দুর্নীতি ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। দুই একজন প্রকৃত নাস্তিক স্বচ্ছন্দমনে নৈতিক আদেশ পালন করিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা কখনও সুনীতি অবলম্বন করিতে পারিতেন না। আমাদিগের মনে যে সকল পশুবৃত্তি নিত্য নিত্য তোলাপাড়া করিতেছে, তাহা-দিগকে সংযত এবং নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রকৃষ্ট উপায় ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ভক্তি। সমাজে যখন নাস্তিকতায় ঢেউ থাকে, তখনই দুর্নীতি তাহার গর্ব্বিত মস্তক উত্তোলন করে। কিন্তু যখন ধর্ম্ম এবং পরা ভক্তির আনন্দময় প্রবাহে সমাজ আপ্লুত হয়, তখন দুর্নীতি অতি নগণ্য ব্যক্তির মত সমাজের এক কোণে পড়িয়া-থাকে। ধর্ম্মের সহিত সুনীতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সুনীতির আদেশ যখন ধর্ম্মের

মৃদুমন্দ বোলে নিনাদিত হয়; তখন তাহা সমধিক চিত্তহারী হয়। নাস্তিকতা-প্রবণ সমাজ অনিচ্ছার সহিত সুনীতির অনুসরণ করে। এই অনিচ্ছা দেখিয়া আমাদিগের মনে হয় যে, রোগিকুল দলবদ্ধ হইয়া মুদিত-নেত্রে নিম্ব ভক্ষণ করিতেছে। ধর্ম্মের আদেশ নীতি শিক্ষায় ভরপূর। সে শিক্ষা আশার অমৃত মাধুরীতে আপ্লাবিত। সেই শিক্ষা কেবল মৌখিক নয় তাহা আনুষ্ঠানিক। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলিয়াছেন;

আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে।

আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে।

বস্তুতঃ ধর্ম্মের দৈনিক অনুষ্ঠানকে অবলম্বন করিয়াই সুনীতি সর্ব্বদা দাঁড়াইয়া আছে। আচার এবং অভ্যাসের দ্বারা আমরা যে আমাদিগের পাশবিক বৃত্তি-নিচয়কে দমন করিতে পারি, তাহা আমাদিগের সকলেরই প্রত্যক্ষ প্রমাণগ্রাহ্য।

মানব সমাজের নৈতিক অবনতি দেখিয়া অনেক সাহিত্যিক নৈতিক উন্নতি সাধন সংকল্প করিয়া কাব্য উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল লেখকের রচনা বহুদিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। ভাষার তাৎপর্য্য এবং কবিত্ব সত্ত্বেও তাঁহাদিগের রচনা বহুদিন সমাদৃত হয় নাই। সমালোচকগণ তাহার একটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কোন একটী বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া তাহাই বিচার এবং অনুশীলনের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলে, সাহিত্য ন্যায়ের কাষ্ঠকঠোরতা প্রাপ্ত হয়। সাহিত্যিকের আসন নৈয়ায়িক অপেক্ষা অনেক উচ্চে। ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রতিজ্ঞায় প্রমাণ করিতে হইলে যেরূপ ধারাবাহিক যুক্তিমালার আবশ্যক, সাহিত্যে তাহার অনুরূপ যুক্তি-সোপান একান্ত বিসদৃশ। প্রতিভার স্ফুরণ না হইলে কোন লেখক চিরস্থায়ী যশোলাভ করিতে পারেন না। কোন বিশিষ্ট অভিমুখ্যের দিকে প্রতিভাকে চালিত করিতে চেষ্টা করিলে প্রতিভার তেজঃ ম্রিয়মাণ হইয়া যায়। তটপ্লাবি নদীর স্বচ্ছন্দ-গমনে আমরা যে স্ফূর্ত্তি এবং লীলা-বৈচিত্রের আভাস পাই, প্রাকারাবদ্ধ ধারাস্রোতের মৃদুমন্দ গতিতে তাহার ছায়া উপলক্ষিত হয় না। প্রতিভাকে কোন গণ্ডী বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহাও একটী যন্ত্রের মত প্রাণহীন হইয়া পড়ে। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ যেমন ক্ষণেকের জন্য জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ, নৈতিক উদ্দেশ্যরূপ গুরুভার-গ্রস্ত প্রতিভা অল্পক্ষণের জন্য জ্বলিয়া নিবিয়া যায়। ইংরাজী সাহিত্যের মহারথী মিলটন্ পোলক্, ইয়াং এবং পোপ প্রভৃতি কবিগণ কবিতার নৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করিতে প্রয়াস করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছেন। সাহিত্য গগনের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী যে কার্য্য সাধন করিতে পারেন নাই, তাহাতে হস্তক্ষেপ করা খদ্যোতের অসার আস্ফালন মাত্র। বাণার বাণায় প্রত্যেক তন্ত্রী আনন্দের অফুরন্ত সুধাধারার সঞ্চার করে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, ন্যায় অন্যায়ের বিচার বাণীর প্রত্যাদেশে নাই। সাহিত্যিকের মুখ্য উদ্দেশ্য আনন্দদান। সেই উদ্দেশ্য সফল হইলে সাহিত্যের পরাকর্ষ হইয়াছে বলিতে হইবে। আনন্দ দানের জন্য যতটুকু নীতি-মূলক কথা বলা আবশ্যক সেইটুকু বলিলেই সাহিত্যিকের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হয়। তাহার বেশী বলিতে গেলেই তাঁহাকে গোলে পড়িতে হয়। নীতিমূলক সন্দর্ভের আলোচনা করিলে বিষ্ণুশর্ম্মার পঞ্চতন্ত্রের সুষম

হইতে পারে, কিন্তু কালিদাস কিম্বা ভবভূতির চিত্তাহারিণী কবিতার মদিরা তাহাতে পাইব না। নীতি কথা প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ না করিয়া তাহাকে কাব্য কিম্বা উপন্যাসের মূলভিত্তি করিলে লেখকের চিরস্থায়ী প্রতিপত্তি লাভ করা অসম্ভব।

পাপের একটী চিত্র অঙ্কিত না করিয়া ন্যায় এবং সুনীতির মার্জ্জিত মার্গের—রেখামাত্র অতিক্রম না করিলে মহাকাব্যের রচনা অসম্ভব। চিত্রকর যেরূপ আলোকচ্ছায়া সমাবেশে চিত্র অঙ্কন করেন; মহাকবি সেইরূপ পাপ এবং পুণ্যের সংমিশ্রণে মহাকাব্যের চমকপ্রদ চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন। পাপ আছে বলিয়াই সংসারে পুণ্যের এত আদর, অন্যায় আছে বলিয়াই ন্যায়ের মর্য্যাদা এবং কুনীতি সংস্পর্শেই সুনীতির দীপ্তি বিচিত্র রসের সমাবেশ করিতে হইলে পাপপুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম লইয়া -নায়ক নায়িকা এবং তাহাদিগের অন্তরঙ্গ এবং বিপক্ষগণের যথাযথভাবে চরিত্রাঙ্কন করিতে হইবে। সাহিত্যে অনাবিল পুণ্যের ছবি মুদ্রিত করিলেই যে লোকশিক্ষা বা পুণ্যের প্রতি সর্ব্বসাধারণের অনুরাগ বর্দ্ধিত হইবে, এইরূপ ধারণা করা ভুল। এই সংসারে দুই একজন এরূপ লোক আছেন, যাঁহাদিগের জীবনের মসৃণ পথে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিনের জন্যও পদস্খলন হয় নাই। তাঁহারা নরদেবতা। কিন্তু মনুষ্য মাত্রকেই সর্ব্বদা বিরুদ্ধভাব অনুপ্রাণিত করিতেছে। এইক্ষণে যে লোকের মুখচ্ছবি ক্রোধের পৈশাচিক জ্বালায় বিকৃত হইতেছে, পরক্ষণেই আবার প্রেমের স্বর্গীয় কুসুম-সৌরভে অপার শান্তি এবং প্রীতির সুষমা তাঁহারই মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে। স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা আজ যাঁহাকে নিবদ্ধ ভাব-প্রবাহের দূষনীয় বিষে জর্জ্জরিত করিতেছে, কাল তাঁহারই হৃদয় মৈত্রী এবং করুণার সর্ব্ব প্রসারিণী শুভেচ্ছার আকরস্বরূপ। সর্ব্বসাধারণ মানবকুল যখন বিরুদ্ধ ভাবদ্বন্দ্বের সঙ্গমস্থলে দণ্ডায়মান, তখন কিরূপে তাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন পুণ্যের আলেখ্য উপভোগ করিতে পারেন? মানুষ মাত্রেরই জন্মাবধি যে সকল সংস্কার আছে, তাহাদিগকে অতিক্রম করা একেবারে অসম্ভব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কল্পনা উচ্চৈঃশ্রবার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া জগত ছাড়িয়া যাইতে পারা যায়, একথা সত্য, কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য? অতি অল্প সময়ের মধ্যে কল্পনার স্রোতে ভাঁটা পড়ে এবং ভাবুক পুনর্ব্বার জগতে আসিয়া বিশেষ মর্ম্মাহত হ'ন। সুনীতিসম্মত নিখুঁত পুণ্যের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কন করিলে তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া আমাদিগের প্রীতিপ্রদ হইবে না। মিষ্ট এবং অম্লের সংমিশ্রণেই আমাদিগের রসনা পরিতুষ্ট হয়। পাপ পুণ্যের সংমিশ্রণে যে মহাকাব্যের উদ্ভব হয়, তাহাই আমাদিগের সমধিক চিত্তাকর্ষণ করে। নায়ক নায়িকাকে প্রলোভনের মরীচিকায় বিমুগ্ধ না করিলে সাহিত্যিক কিরূপে তাঁহাদিগের চরিত্রোৎকর্ষ বর্ণনা করিবেন? কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদিগের দেশে ঘটককুল যেরূপ কুলীনের গুণপণার ব্যাখ্যা করিয়া স্বীয় কার্য্যোদ্ধার করিতেন, সেইরূপ নিখুঁত গুণাবলীর বর্ণনা কোন ক্রমে সাহিত্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কোন নায়কের চরিত্র-গরিমা সম্যক পরিস্ফুট করিতে হইলে, তাহাকে বিপাকের জালে নিবদ্ধ করিয়া নানা মোহ এবং প্রলোভনের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে। তিনি যদি নিজবুদ্ধিবলে

এবং বিচারগুণে প্রলোভন জয় করিয়া সুনীতির সম্বর্দ্ধনা করেন, তাহা হইলেই তিনি নমস্য। আর যদি তিনি অতল জলে ডুবিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার সৃজন নিষ্ফল। সাহিত্যিক যদি তাঁহার নায়ক নায়িকাকে প্রলোভন হইতে বাঁচাইতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি বৃথা লেখনী ধরিয়াছেন। প্রতিভাহীন লেখক সতর্ক অভিভাবকের মত সর্ব্বদা তাঁহার নায়ক নায়িকাকে প্রলোভনের দূরে রাখেন। তাহাতে তাঁহার নায়ক নায়িকার মনুষ্যত্ব সম্যক্ পরিপক্ক হয় না। অতিযত্নে এবং সন্তর্পণে লালনপালন করিয়া প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রকে যদি অবরোধের বাহির করিতে সর্ব্বদা শঙ্কা হয়, তাহা হইলে, অভিভাবকের সমূহ যত্ন এবং শ্রম ব্যর্থ হইয়াছে মাত্র বলিতে হইবে। লেখক তাঁহার বরণীয় নায়ক ও নায়িকাকে পাপের ঘূর্ণাবর্ত্তে ছাড়িয়া দিয়া যদি অমলহৃদয়ে বাহির করিয়া আনিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার চরিত্রাঙ্কনের সাফল্য হয়। নিম্নদরের লেখক তাঁহাদিগের নায়ক নায়িকার উদ্ধার সাধন করিবার জন্য একটী সহজ উপায় অবলম্বন করেন। বর্ণিত ঘটনাবলী যখন ক্রমশঃ জটিলতর হইয়া উঠে, কর্ণধার-বিহীন নৌকার মত যখন নায়ক এবং নায়িকা তীব্র প্রলোভনের বশে ভাসিয়া যান, তখন পাপের পঙ্কিল হস্ত হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য লেখক বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহাদিগকে যবনিকার অন্তরালে লইয়া যান। এইরূপ তিরোভাব আমাদিগের মনে লেখকের অক্ষমতার ছবি গভীর প্রোথিত করে। শ্রেষ্ঠ বিয়োগান্ত নাটকে আমরা একটী অকাল মৃত্যু বা অযথা মৃত্যু দেখিতে পাইনা। কেবল পুণ্য কিম্বা সুনীতি দিয়া উচ্চদরের সাহিত্য রচনা করা অসম্ভব। নিখুঁত পাপের ছবি আমাদিগের মনস্তুষ্টি করিতে পারে না। মানবমনে যেরূপ পাপ পুণ্যের সংমিশ্রণ আছে, তাহারই অনুরূপ সংমিশ্রণ সাহিত্যে প্রকাশ করা সাহিত্যিকের লক্ষ্য। রূপ-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নিতে নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে। এই বহ্নির দাহ কবিত্বময় পদাবলীতে বর্ণিত হইলেই মহাকাব্যের সৃজন হয়। মহাভারতকার মান-বহ্নির সৃজন করিয়া দুর্য্যোধন-পতঙ্গকে পোড়াইলেন,—জগতে অতুল্য মহাকাব্যের সৃজন হইল। জ্ঞানবহ্নি-জাত দাহের গীত প্যারাডাইজ লষ্ট। ধর্ম্ম-বহ্নির অদ্বিতীয় কবি সেণ্টপল্। ভোগ-বহ্নির পতঙ্গ "আণ্টনি ও ক্লিওপেত্রা"—রূপ-বহ্নির "রোমিও ও জুলিয়েট"। ঈর্ষাবহ্নির "ওথেলো"। গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে প্রেমের দাবানল জ্বলিতেছে। স্নেহবহ্নিতে সীতা-পতঙ্গের দাহের জন্য রামায়ণের সৃষ্টি। পাপ এবং পুণ্যের, সুনীতি ও কুনীতির মিশ্রণ আমরা সাহিত্যে পাইয়া থাকি। কিন্তু সে মিশ্রণ এরূপ হওয়া উচিত যে, সমগ্র পুস্তক খানি পড়িয়া যেন আমাদিগের মনে পুণ্যের প্রতি শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হয়। আজকাল আমাদিগের দেশে একটা কথা শুনিতে পাওয়া যায় যে, যদি কবিতাটী বা উপন্যাসটী আর্ট বা সুকুমার কলার হিসাবে ভাল হইল, উহা সুনীতি অথবা দুর্নীতির পরিপোষক কি না, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমানযুগে ইয়ুরোপীয় সাহিত্যেও এই ধূয়া উঠিয়াছে। আজকাল পাশ্চাত্য দেশে অনেক ঔপন্যাসিক ফরাসী ঔপন্যাসিক জোলার আদর্শে উপন্যাস রচনা করিতেছেন। সাহিত্য যদি কেবল একটী আসবাব হইত, তাহা হইলে, তাহাকে এইরূপ যদৃচ্ছা গঠন করা যাইতে

পারা যাইত। কিন্তু সাহিত্য তাহা নহে। সাহিত্য মনুষ্যের বংশ পরম্পরার মন ও হৃদয় গঠিত করিয়া তুলিবার জিনিস।

সাহিত্যে পাপ এবং পুণ্যের বিহিত সংমিশ্রণ করিয়া পুণ্যের আদর বর্দ্ধিত করাই সাহিত্যিকের সিদ্ধি। গভীরতম পাপের আলেখ্য যদি যথাযথ ভাবে অঙ্কন করা যায়, তাহা হইলে, তাহা কখনও দুর্নীতির পৃষ্ঠ পোষক হইতে পারে না। লেখকের সূক্ষ্ম-দর্শনের অভাবে যদি তিনি সমস্ত ঘটনা সম্যক রূপে অভিব্যক্ত করিতে না পারেন, তাহা হইলেই পাপের পথ সুযোগদর্শী মানবের নিকট অধিকতর সুখগম্য বলিয়া মনে হয়। এ সংসারের এইরূপ নির্ম্মাণ-কৌশলের পারিপাট্য যে, পাপ করিয়া কেহই উপযুক্ত পরিতাপের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। নরকের কীটেরও জীবন যদি সত্যানুরূপ বর্ণিত হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ক্ষণস্থায়ী সুখের মাত্রা অতিশয় অল্প, পরন্ত তাহার পাপের ফলস্বরূপ বিহিত দণ্ড তাহার ভাগ্যসূত্রেই লম্বমান। যাহা ধর্ম্মের পরিপন্থী, যাহা নীতির পরিপন্থী, তাহাকে মাথায় তুলিয়া লইয়া কেহই ধন্য এবং কৃতার্থ মনে করিতে পারে না। সত্যং শিবং সুন্দরং", যাহা সত্য তাহাই শিব, সুন্দর। সাহিত্যিক সত্য শিব সুন্দরেরই সাধনা করেন। সুনীতির বিহিত মার্গ পরিত্যাগ করিলে সকলকেই যে সাজা পাইতে হয়, সেই সাজা ও সুখের মাত্রা যদি তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া নির্দ্ধারণ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, দুর্নীতির সুখ অতি অসার এবং অকিঞ্চিৎকর। সর্ব্বসাধারণের ধারণা ঈশ্বর দয়ালু, কিন্তু ঈশ্বর যে ন্যায়বান্, এ কথা ধারণা করিতে আমরা সকলেই একটুকু পরাঙ্মুখ হই। বস্তুতঃ দয়া অপেক্ষা ন্যায়ের ভিত্তির উপর এই সংসার-চক্র প্রতিষ্ঠিত। ন্যায়ের বিচার অতি সূক্ষ্ম. আজ কিম্বা কাল স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে। কথিত আছে, মহম্মদ ঘোরী সপ্তদশবার ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিয়া প্রভুত ধনরত্ন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। আসন্নকাল উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার ভৃত্যবর্গকে তাঁহার কোষাগারস্থিত হেমরত্ন সমূহ তাঁহার সমক্ষে আনয়ন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন স্তুপীকৃত রত্নরাশি দেখিয়া তিনি দরবিগলিতধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে অনুতাপের তুষানলে তাঁহার ক্ষীণ প্রাণ জর্জ্জরিত করিয়াছিলেন নর-শোণিত স্রোতে বসুধা কলঙ্কিত করিয়া তিনি যে রত্ন রাজি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই পড়িয়া রহিল। কিছুই তাঁহার পথের সাথী হইল না। এই পরিতাপ যে কিরূপ মর্ম্মভেদী তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এইরূপ যন্ত্রণা ক্ষণস্থায়ী হইলেও যমযন্ত্রণা অপেক্ষা যে সহস্র গুণ ভীষণ, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। যদি কোন সাহিত্যিক মহম্মদ ঘোরীর জীবনের ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া একখানি কাব্য রচনা করেন, তাহা হইলে, এই যন্ত্রণার, তীব্র বেদনার সম্যক্ অভিব্যক্তি না করিলে, তাঁহার কাব্যে সত্যের অপলাপ হইবে এবং সঙ্গে নীতিরও অবমাননা হইবে। রামায়ণ মহাভারতে পাপের বিভিন্ন মূর্ত্তির উজ্জ্বল চিত্র সমূহ অঙ্কিত আছে। কিন্তু এই দুই মহাকাব্য আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, কোন পাপী অনুতাপের অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারে? পুণ্যের শ্লাঘা বর্দ্ধন করিবার জন্য যে মহাকবি পাপ পাংশুল চরিত্রের অবতারণা করিয়া-

ছেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু নৈতিক উদ্দেশ্য ভুবনমোহিনী কবিতার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন থাকিয়াই যেন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে। পাপী মাত্রেরই তাহাদিগের পাপের অনুপাতে উপযুক্ত দণ্ড বিধান করা হইয়াছে। হিংসাদ্বেষ মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপুগণের প্রচণ্ডতায় ধর্ম্মের মহিমাই পরিস্ফুট হইয়াছে। কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধারের মত মহাকবি পাপের বর্ণনায় পাপীর হৃদয় বিশুদ্ধ করিয়াছেন। মহাভারত এবং রামায়ণ পাঠে যে পতিতের উদ্ধার হয়, ইহা প্রত্যক্ষ ঘটনা। স্মৃতি-শাস্ত্রে উল্লেখ আছে;—

খ্যাপনেনানুতাপেন তথা দানেন চাপধি।
পাপকৃন্মুচ্যতে পাপাৎ তপসাধ্যয়নেন চ॥

ভার্গবনীতি, বৃহস্পতির নীতি এবং চাণক্য নীতি পড়িয়া কয়জন পাপী উদ্ধার হইয়াছে? কিন্তু কবিত্বময় পাপের বর্ণনাই পাপের একমাত্র প্রতিষেধক।

সংসারে আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত পাপ পুণ্যের সহিত পাশাপাশি বসবাস করিয়া আসিতেছে। পাপের স্রোতের বিভিন্ন গতি এবং তাহার বেগ ও প্রসার মানব বুদ্ধির একটী অনুশীলনের বিষয়। আজ পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন দেশের আদালতে যে সকল অতি হীন-পাপীর বিচার হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগের পাপের কাহিনী সঙ্কলন করিয়া মেধাবী ভাবুক Science of Crimnology রচনা করিয়াছেন। তত্ত্বজিজ্ঞাসু কোন বিশিষ্ট পাপের ধারাবাহিক প্রসার এবং ঐতিহাসিকতা বৈজ্ঞানিক বিধিমত আলোচনা করিলে, তাঁহার গ্রন্থ কখনও নীতি-দুষ্ট হইবে না। সত্যের সীমা অতিক্রম করিয়া কল্পনার বশে পাপীর সুখ শান্তির ছবি অতিরঞ্জিত করিলেই দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। আজকাল ইউরোপীয় সাহিত্যে যে আমরা দাম্পত্য প্রেমের ব্যভিচারের ছবি অতিরিক্ত উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত দেখি, তাহার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল সত্যের অনাদর এবং বৈজ্ঞানিক বিধির উপেক্ষা। স্কট, ডিকেন্স্ এবং থেকারী যে সুনীতির একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন, সত্যসন্দর্শনই তাহার একমাত্র কারণ। দাম্পত্য প্রেমের ব্যভিচারে ইউরোপীয় সমাজের স্তরে স্তরে যে লোল অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে, তাহার প্রকৃত অনুভূতি, আজকালকার সাহিত্যিকের নাই বলিয়াই সাহিত্যে দুর্নীতির প্রভাব লক্ষিত হইতেছে। আমরা এমন কোন বিশল্যকরণী ভাবিয়া পাই না, যাহার দ্বারা ব্যভিচারগ্রস্ত সমাজের আধিব্যাধি নিরাকৃত হইতে পারে। অতএব বর্ত্তমান সাহিত্যে দাম্পত্য প্রেম বিষয়ক বর্ণনা মিথ্যা এবং বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ বলিয়াই দুর্নীতিবর্দ্ধক। এখন বিচার করিয়া দেখা যাউক, সাহিত্যিকের কোন্ দোষ সাহিত্যে দুর্নীতিবর্দ্ধক। এক কথায় বলিতে গেলে, শঠতা এবং কপটতা সাহিত্যে ঘোর দুর্নীতিবর্দ্ধক। লৌকিক আচারে শঠতা যে অতি ঘৃণ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। তেজশালী পুরুষসিংহ যে কাজ করেন, তাহাই শোভন হয়। কিন্তু শঠতা দুর্ব্বলের ব্রহ্মাস্ত্র। বীর্য্যশালী পুরুষ কখনই শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করেন না। ফেরুপাল বনে অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সিংহ এবং ব্যাঘ্রের বিরক্তি উৎপাদন করে। কিন্তু সাহিত্যিকের শঠতাই দুর্নীতি এবং দুর্নীতিই শঠতা। কোন একটী বিষয় আলোচনা করিয়া সাহিত্যিক যে সত্যের উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই ভাষায় ব্যক্ত করিলে সাহিত্যিকের কোন

দোষ হইতে পারে না। মনে করুন, কোন সাহিত্যিক লৌকিক আচারের বিরুদ্ধাচরণ করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যে সকল যুক্তিবলে তিনি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা অসঙ্কুচিত ভাবে ভাষায় ব্যক্ত করিলে তাঁহার কোন দোষ হইতে পারে না। তাঁহার সিদ্ধান্ত যদি ভ্রমাত্মক হয়, তাহা হইলে অধ্যবসায়ী পাঠক সহজেই তাঁহার ভ্রম প্রমাদ ধরিয়া ফেলিবেন যদি জন কতক ভাবপ্রবণ পাঠক স্বীয় চিত্তবৃত্তির পরিচালনা না করিয়া তাঁহার যুক্তি স্রোতে গা ভাসাইয়া দেন, তাহাতেই বা বিশেষ ক্ষতি কি? গ্রন্থকারের সহিত পাঠকালীন একমত হইলেও যে তাঁহারা সকলেই যে তাঁহার সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করিবেন, এইরূপ শঙ্কা অযথা। আর যদি দুই একজন উদ্ভ্রান্ত পাঠক বাস্তবিকই তাঁহার ভ্রান্তিমূলক সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলেও তাঁহারা যে অচিরাৎ ঠকিয়া শিখিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু যদি কোন লেখক তাঁহার হৃদয়ের সিদ্ধান্তের অবতারণা করেন, তাহা হইলে, তিনি প্রকৃত মিথ্যাচারী। তাঁহার দ্বারা সমাজের প্রভূত অকল্যাণ হইতে পারে। শঠতার মায়াজাল বিস্তার করিয়া তিনি যে সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন, তাহার একটীরও উত্তর প্রকৃত নয়। দুগ্ধের আশায় আসিয়া পাঠক তাঁহার গ্রন্থে হলাহলের আস্বাদ পাইতেছেন। পারিজাত ভ্রম ভ্রমে মন্দার বৃক্ষে গাত্র ঘর্ষণ করিতেছেন। ইহার অপেক্ষা ঘোরতর বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্রষ্টার এই রূপ বিচিত্র নিয়ম যে, পাপের আলেখ্য যদি সত্যের অনুবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে, তাহা কখনও আমাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে না, বরং সেই আলেখ্য দর্শন করায় আমাদিগের পাপের প্রতি ঘোর বিতৃষ্ণা হয়। ইহা অতি অভ্রান্ত সত্য। যে সাহিত্যের বর্ণিত বিষয় লেখকের অনুভূতির বিষয়ীভূত নয়, তাহা অপ্রাকৃত এবং ভ্রান্তিপ্রদ। সত্য-মূলক সরল বর্ণনা কোন কালে দুর্নীতি-বর্দ্ধক হইতে পারে না। যত বড় পাপ হউক না কেন, বাণীর অভয় আশ্বাস পাইলে, লেখক তাহার অবতারণা করিতে পারেন। সেলী তাঁহার সেন্‌সী নামক কাব্যে যে পাপের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর কি হইতে পারে? কিন্তু এইরূপ ধিক্কারজনক পাপের বর্ণনা করিয়াও কবিত্ব শক্তির উদ্দীপনায় কাব্যের হিসাবে সর্ব্বাঙ্গ বজায় রাখিয়াছেন। সেন্‌সী নামক কাব্য যে দুর্নীতিবর্দ্ধক নয়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। যে লেখকের কাব্য শক্তি কিম্বা সূক্ষ্ম দর্শন নাই, তাঁহার পক্ষে পাপ পুণ্যের যথাযথ সংযোগ করিয়া কাব্য রচনার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। নিখুঁত পুণ্যের কি। নিখুঁত পাপের ছবির বাস্তব বর্ণনায় তাঁহার কবিতাকে সীমাবদ্ধ করাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়। গ্রীক্‌দেশের জগৎ বিখ্যাত ভাস্করগণ নগ্ন নারী মূর্ত্তি প্রস্তরে খোদিত করিতেন। সেই সকল নগ্ন মূর্ত্তি দেখিয়া মনে পবিত্র ভাব ভিন্ন অন্য কোন ভাব জাগিতে পারে না। এই সকল মূর্ত্তি সকলের ভাব এবং ভঙ্গী এরূপ স্বাভাবিক যে, তাহাদিগকে নির্লজ্জ বলিতে পারা যায় না। নগ্নতা স্বাভাবিক হইলে কোন ক্রমে দুর্নীতি বর্দ্ধক হইতে পারে না। তবে নগ্নতা যদি অস্বাভাবিক এবং

কপটতা পরবশ হয়, তাহা হইলেই তাহা দুর্নীতির প্রবর্ত্তক হইতে পারে। এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী উপাখ্যান উল্লেখ করিব। এই উপাখ্যানটী কিছু দিন পূর্ব্বে বিলাতি সংবাদ-পত্রে বাহির হইয়াছিল। জার্ম্মেণীর অন্তর্গত হাম্‌বার্গ্‌ নগরে একজন বিখ্যাত চিত্রকর একটী নগ্ন স্ত্রী মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। সহর কোটালী হইতে ঐ চিত্রকরের নামে অশ্লীলতা প্রচারের অভিযোগ আনা হয় চিত্রকর আদালতে বলিলেন, যে তাঁহার চিত্রে সঙ্কোচ এবং অভিপ্রায়ের কোন ও চিহ্ন নাই, সুতরাং তিনি শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করেন নাই তাঁহার মত সমর্থন করিবার জন্য তিনি এক জন বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্য প্রদান করেন। বিশেষজ্ঞ বলিলেন যে চিত্র অশ্লীল নয়। হাকিম কিন্তু গোঁ ধরিলেন যে চিত্রটী কুরুচি-মাখা অশ্লীল। বিশেষজ্ঞ চিত্রটী আদালত নিকট চাহিয়া লইলেন এবং তাহার রঙ্গের বাক্স হইতে তুলি বাহির করিয়া তাহার পদদ্বয় মোজায় আবৃত করিলেন। সর্ব্বাঙ্গ পূর্ব্ববৎ নগ্ন রহিল। হাকিক পুনর্ব্বার চিত্রটী দেখিয়াই বলিলেন যে, চিত্রকর সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। অভিপ্রায়, লালসা এবং বাসনা যে নগ্নতায় পরিস্ফুট নয়, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সুরুচি বর্দ্ধক।

কপটতা এবং মিথ্যাচার সাহিত্যেকের পক্ষে অতি মারাত্মক। লেখার শঠতায় কোনও প্রকার প্রশ্রয় পাইলেই, তাহা যে দুর্নীতিবর্দ্ধক তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাবের ঘরে চুরি আজ কাল অনেকেই করেন। সাহিত্যিক যদি তাঁহার বিশ্বাস এবং ধারণার উপর নির্ভর না করিয়া, কাল্পনিক পাপ পুণ্যের মিশ্রণে কাব্য রচনা করিতে প্রয়াস পান, তাহা হইলে তাঁহার প্রকৃত কবিত্ব থাকা আবশ্যক। কবি যখন ভাবের সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করেন, তখন তিনি ভগবানের নীতির আভাস পাইয়া থাকেন। আমরা লোক-পরম্পরের মুখে যে নীতি কথা শুনিতে পাই, তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। পাপ বলিয়া লোকে যাহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে, তাহা সর্ব্ব সময়েই যে পাপ, এরূপ বলা যায় না। পাপ বলিয়া লোকে যাহার প্রতি ভ্রূকুটি করে, তাহাতেই পুণ্যের আভা নিহিত থাকিতে পারে। সেক্সপীয়রের মহাকাব্যে অলৌকিক হিসাবে নিরপরাধী অনেক নর নারীকে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে দেখি। পাবক শিখাবৎ পাপের সংস্পর্শে যে কেহ যাইবে, সে অঙ্গারসার হইবেই হইবে। সংসারে শত সহস্র নিরাপরাধ ব্যক্তিরও যে অশেষ পীড়ন হইতেছে। সংসবে নৈতিক নিয়মের বিপর্য্যয় দেখিয়াও কোন্ ব্যক্তির দুর্নীতির প্রতি আস্থা হয়? সেক্সপীয়রের কাব্যাবলীতে নিরপরাধের প্রতি অত্যাচার দেখিয়া আমাদিগের মনে হয়, তাঁহাদিগের নিগ্রহ প্রাক্তনের ফল স্বরূপ। কুন্দধবল পবিত্র চরিত্রের নিপীড়ন দেখিয়া, আমাদগের মনে দুর্নীতির প্রতি কোনরূপ অনুরাগ হয় না। সেক্সপীয়রের নায়ক নায়িকার বর্ণনা পড়িয়া আমাদিগের মনে হয়, অদৃষ্ট ভাগ্যদেবী তাঁহাদিগের জীবন-সূত্র ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে নানা ভঙ্গীতে নাচাইতেছেন। কাল্পনিক পাপ পুণ্যের অবতারণা করিয়া পাপের অনল শিখা মহাকাব্যের প্রতি স্তরে স্তরে জ্বালাইয়া, সরলতা, সত্যপ্রিয়তা এবং বিশ্বস্ততাকে সেই বহ্নিতে স্বাহা, বষট বলিয়া আহুতি দিয়াও সেক্সপীয়র সুনীতির অমর্য্যাদা করেন

নাই। ন্যায়ের ছবি সত্যের মুকুরে প্রতিফলিত করিয়াছেন বলিয়া সেক্ষপীয়রের অমর গ্রন্থাবলী আজ নৈতিক আদর্শরূপে সমগ্র জগতের মুকুটমণি বলিয়া গণ্য হইতেছে। কবিত্বের পরশ পাথরে অয়স্কান্তমণিও চন্দ্রকান্ত মণির জ্যোতির্ম্ময় আভা ধারণ করে। যাঁহার কবিত্ব শক্তি নাই, তাঁহার পক্ষে পাপপুণ্যের সংমিশ্রণে মহাকাব্যের রচনা করা অসম্ভব।

লেখক সরল মনে সত্য কথা বলিতেছেন, কি মিথ্যার বাগুরা বিস্তার করিতেছেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অতএব দুর্নীতিমূলক এবং সুনীতিমূলক পুস্তকের মধ্যে পার্থক্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এমন কি, যাঁহারা সামান্য লেখা পড়া জানেন, তাঁহারাও লেখকের সরলতা এবং কপটতা সহজেই বুঝিয়া লইতে পারেন। একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। এইরূপ দৃষ্টান্ত আমাদিগের পুরাণ এবং উপপুরাণে একান্ত বিরল নহে। পুণ্যের গরিমা বাড়াইবার জন্য কোন সাহিত্যিক হয়ত তিলকে তাল করিয়া বলিলেন। একজন পাপী আজীবন পাপপঙ্কে নিমগ্ন থাকিয়া কোন সামান্য পুণ্যকার্য্য করিলেন। সেই জন্য তিনি হয়ত সাহিত্যে স্বশরীরে স্বর্গে গমন করিলেন। এইরূপ বর্ণনা আমাদিগের শাস্ত্রে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এই বর্ণনা যে সত্যসম্মত নয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। যদিও সাহিত্যিকের উদ্দেশ্য সৎ, তথাপি যে উপায় তিনি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা একান্ত ভ্রমাত্মক। লোকে বর্ণনা পাঠ করিয়া যখন বুঝিতে পারিবে যে, সাহিত্যিক নিজ উদ্দেশ্য সাধন জন্য মিথ্যা কথা বলিয়াছেন, তখন তাঁহার উপর তাঁহাদিগের আস্থা অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে। লঘু পুণ্যের অপরিমেয় পুরস্কার হইলে পাপীর আর ভাবনা কি? আজীবন সুখের অন্বেষণে পরের সর্ব্বনাশ করিয়া অন্তিমে একবার হরিনাম বলিলেইত সব গোল মিটিয়া যাইবে। এইরূপ বিশ্বাস ত আজ কাল আমাদিগের দেশে ঘোর নৈতিক অবনতি ঘটাইতেছে। কুশীদজীবী খাতকের রক্ত মোক্ষণ করিতে করিতে মালা জপ করিতেছে। বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী সাজিতেছে। সাহিত্যিক স্বল্প পুণ্যের প্রভূত পুরস্কার ঘোষণা করিলে সর্ব্বসাধারণ যদি তাঁহার কথায় বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে, তাঁহারা আর একটী মহা ভ্রমে নিপতিত হইবেন। টাকার বিনিময়ে লোকে যখন অজস্র জিনিস পাইত, তখন অনেকেই রৌপ্য মুদ্রার মুখ দেখিতেন না। সেইরূপ সামান্য পুণ্যের অযথা মাহাত্ম্যে আস্থাবান্ হইলে আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি গুরুতর পুণ্যের কঠোরতা স্বীকার করিতে কেহই ইচ্ছুক হইবে না। ফলে সমাজের যে কিরূপ দুর্গতি হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সামান্য সামান্য পাপের জন্য সাহিত্যিক যদি যমদণ্ডের ব্যবস্থা করেন, অপুত্রক দানশৌণ্ডিককে যদি হাস্যমুখে রৌরবে পাঠান, তাহা হইলেও দুর্নীতির প্রসার বৃদ্ধি হইবে। যাঁহারা তাঁহার বর্ণনাকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবে, তাঁহাদিগের কথা ছাড়িয়া দিলে, তাঁহার গ্রন্থপাঠে দুই দশ লোকের নৈতিক অবনতি হইতে পারে। পাপী মনে করিতে পারে যে, কৃত দুষ্কর্ম্মের জন্য মৃত্যুর পর যখন অনন্ত নরক যাতনা পাইতেই হইবে, তখন আর বোঝার উপর শাকের আটির ভয় করিয়া

কি ফল! মৃত্যুর পর নরকে যাইতেই হইবে, হাজার পুণ্য করিলেও আমার যখন নিস্তার নাই, তখন যে কয়দিন এখানে আছি, হেসে খেলে যাওয়াই ভাল। পুণ্যবান্ এইরূপ সাহিত্য প'ড়িয়া মনে করিবেন, পুণ্যের পথ কি পিচ্ছিল। একবার পদস্খলন হইলেই তো সব ফুরাইল। এতদিন কষ্ট করিয়া যে পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছি, তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে পণ্ড হইয়া যাইতে পারে। আর মনের অগোচর পাপ নাই। কত শত পাপ করিয়াছি, তাহার সম্পূর্ণ স্মৃতি জাগরুক রহিয়াছে; তবে আর বৃথা কেন পুণ্যের কণ্টকাকীর্ণ পথে ক্ষতবিক্ষত হইয়া অগ্রসর হই। রামেও মারিয়াছে, রাবণেও মারিয়াছে। রাবণের হাতেই বা মরিলাম। এই দুইটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বোধ হয়, পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন, পুণ্যের ছবি অতিরঞ্জিত করিলে সাহিত্যিক কিরূপে নৈতিক হিসাবে অপরাধী হইতে পারেন। সাহিত্যিক যদি পাপের গরিমা প্রচার করেন, তাহা হইলে, তিনি যে নীতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন, একথা উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে হইবে না। অতএব কিছুই অতিরঞ্জিত না করিয়া সাহিত্যিক যদি পাপ এবং পুণ্যের উপযুক্ত প্রতিদানের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তিনি নীতির মর্য্যাদা বজায় রাখিতে পারিবেন। নতুবা মিথ্যার অবতারণা করিয়া পাপ কিম্বা পুণ্যের মহিমা অযথা বাড়াইলে নৈতিক উন্নতি প্রত্যাহত হইবেই হইবে।

শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ রায়।

রায় সাহেব রত্নমণি গুপ্ত।

বিক্রমপুর বঙ্গ দেশের মুকুট মণি। এই স্থান বঙ্গের ইতিহাসে অতি বিখ্যাত। এই স্থানের সন্তানগণের অনেকে গুণগৌরবে ভারতে সুপরিচিত। এই স্থানেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রভৃতি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানেই সেন বংশীয় স্বাধীন নরপতিগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই স্থানেই কেদার রায় প্রভৃতি বারভূঁইয়া ভূম্যধিকারী দক্ষতার সহিত শাসন-দণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। এই স্থানেই রাজা রাজবল্লভের এক বিংশতিরত্ন শোভমান থাকিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠে স্থান লাভ করিয়াছিল। অধুনাতন কালেও অনেক লোক বরেণ্য স্বনামধন্য পুরুষ আবির্ভূত হইয়া জন্মভূমিকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। অবশেষে যে মহাপুরুষ অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে প্রকৃতির গূঢ় রহস্য ভেদ করিয়া প্রাচীন আর্য্য ঋষির তপোলব্ধ জড় চৈতন্যের মহা সিদ্ধান্তকে বিশ্বমানবের মহাসভায় বৈজ্ঞানিক প্রমাণে প্রতিপন্ন করতঃ বাঙ্গালী জাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সেই দেশের গৌরব জগদ্বিখ্যাত জগদীশচন্দ্র বসু এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

এই বিক্রমপুরের অন্তর্গত মুলনা নামক গণ্ডগ্রামে প্রসিদ্ধ বৈদ্যবংশে ইংরেজী ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রত্নমণি গুপ্ত মহাশয়ের জন্ম হয়। বঙ্গদেশে মুসলমানদিগের আধিপত্যকালে মধ্য বঙ্গ হইতে যে সকল বৈদ্য পরিবার পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন, মুলনার গুপ্ত পরিবার তাহাদের মধ্যে অন্যতম। মুলনার গুপ্ত পরিবার বিক্রমপুরের বৈদ্যসমাজে বিশেষ সম্ভ্রম ও প্রতিষ্ঠা লাভ

করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রচুর ভূ-সম্পত্তি ছিল। যেই কীর্ত্তিনাশা নদীর নির্ম্মম আক্রমণে বিক্রমপুরের ইতিহাস-বিখ্যাত কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি একে একে তাহার অতল জলে নিমজ্জিত ও চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে। সেই কীর্ত্তিনাশা কালক্রমে গুপ্ত পরিবারের সমুদয় ভূ-সম্পত্তি ও মুলনার ভদ্রাসন আপন কুক্ষিগত করিয়া স্বীয় ঘৃণিত নামের সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছে। এই সময়ে রত্নমণিবাবু মাত্র ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার পিতা রামদুলাল গুপ্ত ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত কোঁয়রপুর নামক স্থানে সপরিবারে আসিয়া নূতন বসতি স্থান নির্দ্দেশ করেন। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয় এবং চারি বৎসর কাল গ্রামে থাকিয়াই গ্রাম্য পাঠশালায় তিনি বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করেন। তৎপর পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার পিতাও পারস্য ভাষায় বড় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, ভাবী উন্নতির প্রত্যাশায় তিনি পুত্রকে যত্নের সহিত পারশী শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান্ সময়ে যেমন এ দেশীয় লোকে জ্ঞান ও অর্থ উপার্জ্জনের জন্য অতি যত্নে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন, মুসল শাসনকালে পারস্য ভাষারও ঠিক এই প্রকার গৌরব ছিল। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম সূত্রপাতেও পারস্য ভাষার প্রচলন ছিল, এখন ইংরেজী ভাষার পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাহা হউক, রত্নমণি বাবু গ্রামে মুসলমান মৌলবী নিকটে পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়া ইংরেজী শিক্ষার্থ বরিশালে প্রেরিত হইলেন। এই খানে তাঁহার বেশী দিন থাকা হইল না, তিনি শীঘ্রই ঢাকা কলেজে প্রবেশ করিলেন। এখন যেমন উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার জন্য বি-এ, এম-এ ইত্যাদি উপাধি দেওয়ার বন্দোবস্ত রহিয়াছে, তৎকালে সেরূপ ছিল না। তখন জুনিয়র ও সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই ছাত্রগণ প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত হইত এবং তাহাদের কলেজের অধ্যয়ন শেষ হইত। আট বৎসর কাল কলেজে অধ্যয়ন করার পর রত্নমণি বাবু সিনিয়ার পরীক্ষা প্রদান করেন এবং তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রশংসা-পত্র প্রাপ্ত হন। যে বৎসর জুনিয়র-ক্লাসে অধ্যায়ন করিতেছিলেন, সেই বৎসরই ১৮৫৪ খ্রীঃ তাঁহার জীবনের একটী প্রধান ঘটনা সংঘটিত হয়; সেটী তাঁহার বিবাহ। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া চাকরীর অন্বেষণে তিনি বরিশাল গমন করিলেন। বরিশাল গমন করিয়া অল্পদিন মধ্যেই সেখানকার কালেক্টরীতে মাসিক ২০৲ টাকা বেতনে সামান্য কেরাণীর পদে নিযুক্ত হইলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বরিশাল জিলা স্কুলে ৪র্থ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। যে কার্য্যে তিনি এত যশস্বী হইয়াছিলেন যে, কার্য্যে তিনি রাজপুরুষগণের নিকট হইতে এত সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী থাকিয়া তিনি দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন, সেই কার্য্যে নিয়োগ তাঁহার এই প্রথম।

বাল্য ও কৈশোর অতিক্রম করিয়া রত্নমণি বাবু এখন জীবনের যৌবন সীমায় উপনীত হইয়াছেন। এখন তাঁহার জীবনের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ছিলেন বালক, এখন যুবক; ছিলেন গ্রামে, এখন সহরে; ছিলেন ছাত্র, এখন শিক্ষক; ছিলেন একাকী, এখন সংসারী। এই সময় হইতে তিনি যত্ন পূর্ব্বক তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন

করিতে লাগিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যে সেখানকার ছাত্র শিক্ষক সমস্ত লোকের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কুমিল্লা গবর্ণমেণ্ট স্কুলে ৩য় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন। দুই বৎসর পরে পুনরায় বরিশাল জেলা স্কুলে বদলী হন। এই সময়ে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের নানাবিধ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে লাগিল। কলিকাতায় হিন্দুকলেজ সংস্থাপিত হওয়ার পরে ডিরোজিও নামক এক প্রতিভাশালী ফিরিঙ্গী যুবক উহার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তিনি এতদ্দেশীয় ছাত্রগণের মনে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া দিলেন যে, প্রাচ্য সভ্যতা কুসংস্কারমূলক।

পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকে যুবকদল সর্ব্বিষয়ে চাহিয়া দেখিল, তাহাদের দেশের শাস্ত্র, সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, আচার ব্যবহার প্রায় সমস্তই ভ্রান্ত ও কুসংস্কারপূর্ণ। বঙ্গের শিক্ষিত উৎসাহবান্ যুবকদল দেশের এই সকল রীতিনীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল এবং সামাজিক জীবনে এক বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইল। সময় বুঝিয়া যীশুখ্রীষ্টের ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত খ্রীষ্টান মিশনরী দল তাহাদের সমুন্নত ধর্ম্মমত লইয়া ইউরোপ হইতে ভারতক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। যীশুখ্রীষ্টের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, তাঁহার মানব-প্রেম ও ধর্ম্মার্থে অনন্ত আত্মোৎসর্গ, তাঁহার নরসেবার অমরবাণী, তাঁহার দীনতা ও বৈরাগ্য, শিক্ষিত ধর্ম্মাপিপাসু লোকের হৃদয় প্রবলভাবে আকর্ষণ করিল। দেশের গৌরব স্থানীয় অনেক ইংরেজী শিক্ষিত লোক খ্রীষ্ট ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিল। বৈদেশিক ধর্ম্মের প্রচণ্ড আঘাতে, নিদ্রিত হিন্দুসমাজ জাগরিত হইয়া উঠিল। এই সময়ে জ্বলন্ত প্রতিভামণ্ডিত ধর্ম্মবীর কেশবচন্দ্র সেন রামমোহন রায়ের বিজয়পতাকা হস্তে করিয়া বিপুল বিক্রমে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। কেশবচন্দ্র আপনার প্রচারকবর্গকে সঙ্গে করিয়া যে অদমনীয় উৎসাহে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য ভারতবক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সেই দিনে ভারতের জাতীয় জীবনের সুপ্রভাত ঘটিয়াছে। সেই দিনে ভারতের জাতীয় ইতিহাসের নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে। কেশবচন্দ্রের অগ্নিময় উপদেশ শুনিবার জন্য ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় উৎকর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি মহোৎসাহে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মবল-প্রসূত বিজয়িনী শক্তি প্রভাবে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারকগণ বিস্মিত ও হতমান হইলেন, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইলেন, ইংরেজী শিক্ষিত নব্যসম্প্রদায় তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইলেন। তৎকালে শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশ লোক কোন না কোন প্রকারে ব্রাহ্মসমাজের সহিত যুক্ত ছিলেন। রত্নমণি বাবুর জীবনের সহিত সম্পর্ক ঘটিয়াছিল বলিয়াই, আমরা প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপতঃ তাৎকালিক দেশের অবস্থা ও ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলনের কথা বলিলাম। তাঁহার পিতা মাতা নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। সুতরাং ধর্ম্মনিষ্ঠা তিনি পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,একথা মনে করা যাইতে পারে। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে রত্নমণি বাবুর বিশ্বাস টলিল, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে আকৃষ্ট হইলেন। পরিণত বয়সে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সমাজের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুভাবে হিন্দুসমাজে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তথাপি ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার কত

আত্মীয় আছেন তাঁহাদের সঙ্গে তিনি সদ্ভাব রক্ষা করিতেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম-সংস্থাপক রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি তাঁহার যে অটল ভক্তি ছিল, এবং ব্রাহ্মসমাজের কত লোক যে তাঁহার আশ্রয়ে বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিব।

যে সময়ে বরিশালে কর্ম্ম করিতেছিলেন, তখন মধ্যে মধ্যে বাড়ী যাইতেন। গ্রামে ভাল রাস্তা ছিল না, রত্নমণি বাবু একটী রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া দেন ঐখানে সামান্য একটী মধ্যবাঙ্গালা স্কুল ছিল, রত্নমণিবাবু সময়ে সময়ে ছাত্রগণের পরীক্ষা করিতেন এবং তাহাদিগকে উৎসাহ দিতেন। ঐ স্কুলের চারিটী দরিদ্র ছাত্রের বেতন দেওয়ার ভার অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি বহন করিয়া ছিলেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মাসিক ৭০ সত্তর টাকা বেতনে ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের ২য় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া বরিশাল হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়কালে বরিশালের ছাত্রগণ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছিল। রত্নমণি বাবু ময়মনসিংহে আসিলেন, তাঁহার কর্ম্মজীবনের অধিকাংশ সময়, প্রায় একুশ বর্ষ কাল এই ময়মনসিংহেই অতিবাহিত হইয়াছিল। এই খানেই তাঁহার যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই খানেই জনসাধারণ তাঁহার অমায়িক চরিত্র ও বিনয় সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই খানেই রাজপুরুষগণ তাঁহার কর্ত্তব্য পরায়ণতা ও কার্য্যদক্ষতা শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সম্মান ও প্রশংসা করিতে শিখিয়াছিলেন। এই খানেই তিনি সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভ্য ছিলেন এবং এইখানেই তিনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে বহুদিন বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন এবং ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে উক্ত পদে স্থায়ী হন। তাঁহার সময়ে ময়মনসিংহ জিলা স্কুল উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। ছাত্রগণের নৈতিক জীবনের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, শিক্ষাদান কার্য্যের নৈপুণ্য, স্কুল পরিচালনে দক্ষতা ও উন্নত চরিত্রের প্রকাশে,এই সময়ে, কি দেশীয় কি এতদ্দেশবাসী ইউরোপীয় সমস্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক তাহার উচ্চ প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক গণ্যমান্য পুরুষ এইখানেই তাঁহার আশ্রয়ে প্রতিপালিত ও তাঁহার নিকটেই বিদ্যাশিক্ষা করিয়া নানা বিভাগে উন্নতি লাভ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহাদের কয়েক জনের নাম উল্লেখ করিতেছি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, ভক্তিভাজন প্রচারক শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র হোম, শ্রীযুক্ত নবকুমার সমাদ্দার শ্রীযুক্ত গোলোক চন্দ্র দাস,এবং ঢাকার নবপ্রতিষ্ঠিত ইষ্ট-বেঙ্গল-ইন্‌ষ্টিটিউসান্ নামক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সুযোগ্য হেড্‌মাষ্টার প্রবীণ ও বহুদর্শী শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশ চন্দ্র রায় বি-এ, বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি। ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার যে সকল আত্মীয় লোক আছেন, তাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধি, পদমর্য্যাদা ও ধনসম্পত্তিতে দেশ-বিখ্যাত। কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল বদান্যবর স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস ও কালীমোহন দাস, বরিশালের ব্যারিষ্টার মিঃ নলিনীভূষণ গুপ্ত, ইন্দুভূষণ গুপ্ত, রত্নমণি বাবুর মাসতুত ভাই।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রত্নমণি বাবু ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া ঢাকায় আগমন করেন। ময়মনসিংহের ছাত্রগণ ও নাগরিক ভদ্র সমাজ এক মহতী সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন দান করেন এবং তাঁহার একটী তৈল চিত্র ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের লাইব্রেরি গৃহে রক্ষা করেন। রত্নমণি বাবু নয় বৎসর কাল ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছেন; এই সময়ে শিক্ষকতা কার্য্যে তিনি এরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কার্য্য কালের নয় বৎসরের মধ্যে আট বৎসরই উক্ত স্কুল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকার পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। এবিষয় কলেজিয়েট স্কুলের প্রাচীন বাটিকার দ্বারদেশে মার্ব্বল প্রস্তরে খোদিত রহিয়াছে। গুণগ্রাহী গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কৃতকার্য্যতার পুরস্কার স্বরূপ ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে "রায় সাহেব" উপাধি দান করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ষষ্টি বৎসর বয়সে পেন্‌সান্ লইয়া তিনি সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করার পরে যতকাল জীবিত ছিলেন, জীবনে অনেক লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, একে একে তাহাদের উল্লেখ করিব। তিনি দরিদ্র বিদ্যার্থিগণের পিতৃ স্থানীয় ছিলেন। কত ছাত্র তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছে, কত দরিদ্র নিরুপায় ছাত্র তাঁহার অর্থসাহায্যে বিদ্যা-শিক্ষা করিয়া এখন উচ্চ পদে আরোহণ করিয়াছে, তাহা কে বলিবে? লোকের বিদ্যাশিক্ষার জন্য অকাতরে তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার বাসগ্রাম কোঁয়রপুরে "রত্নমণি ভিক্টোরিয়া পাঠশালা" নাম দিয়া একটী পাঠশালা স্থাপন করতঃ গ্রামস্থ দরিদ্র বালকগণের প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। উক্ত পাঠশালার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ তিনি ফরিদপুর জেলা বোর্ডের হাতে এক কালীন সহস্র টাকার কোম্পানির কাগজ অর্পণ করিয়াছিলেন। যে সকল সংস্কৃত-শিক্ষার্থী পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগকে রৌপ্যপদক প্রদান করিবার জন্য তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর সারস্বত সমাজের হস্তে একশত টাকা করিয়া দিতেন। কোঁয়রপুর গ্রামে লোকের জলকষ্ট দেখিয়া রত্নমণি বাবু তাঁহার স্বর্গীয় জননী দেবীর নামে প্রায় তিন সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে একটী জলাশয় খনন করাইয়া দিয়াছেন। অবশেষে যেই কার্য্যের জন্য তিনি দেশের সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, তাহার সংকল্প তাঁহার মনে উদিত হইল। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি তাঁহার গভীর ভক্তি ছিল। এক্ষণে উক্ত মহাত্মার নামে একটী সাধারণ পাঠ-গৃহ স্থাপন করার জন্য তিনি পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজের হস্তে এককালীন পাঁচ সহস্র মুদ্রা প্রদান করেন। ব্রাহ্মসমাজ উক্ত অর্থের দ্বারা ইংরেজী ১৯১০ সালে, সমাজ-মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে একটী দ্বিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি রামমোহন রায় লাইব্রেরি নামক একটী পাব্‌লিক্ লাইব্রেরি স্থাপন করেন। পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব মহামান্য স্যার কে, জি, গুপ্ত ঐ লাই-

ব্রেরি গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এক্ষণে নগরের নানা শ্রেণীর লোক এই লাইব্রেরিতে আসিয়া বিবিধ প্রকার জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেছে। আজ ছয় বৎসরে লাইব্রেরির কত উন্নতি হইয়াছে। রত্নমণি বাবু জীবনে যত লোকহিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে এইটীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাস্তবিকই এই কার্য্য দ্বারা তিনি তাঁহার প্রকৃত মহত্ত্ব ও ঔদার্য্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া ঢাকায় পাটুয়াটুলীতে ৭৭ নম্বর বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। পুণ্যকার্য্যে উপার্জ্জিত অর্থের যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করিয়া, বহুদিন শান্তিময় জীবন যাপন করিয়া, বাঙ্গালা ১৩২২ সালের ১৬ই মাঘ রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় তাঁহার পবিত্র আত্মা নশ্বর জগৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিব্যধামে গমন করিয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার প্রায় একাশী বৎসর বয়স হইয়াছিল।

রত্নমণি বাবু জীবনে মিতাচারী ও মিতব্যয়ী ছিলেন, এবং ইহার গুণেই দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন। তিনি যদিও নগরে বাস করিতেন, কিন্তু নগরের কর্ম্মকোলাহল হইতে যথাসাধ্য দূরে থাকিয়া নীরব শান্ত সাধকের ন্যায় জীবনের অবশিষ্টাংশ যাপন করিয়া গিয়াছেন। সংসারে সচরাচর ইহাই দেখা যায় যে বুদ্ধিকৌশলী মানুষই উন্নতি লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু রত্নমণি বাবু, কোন প্রকার কৌশলকে অবলম্বন না করিয়া কেবল আপনার প্রতিভাবলে ও চরিত্র-গৌরবে কুড়ি টাকা বেতনের সামান্য কেরাণীগিরি হইতে আরম্ভ করিয়া চারিশত টাকা গ্রেডের হেড্‌মাষ্টারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। আজ তিনি চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বহুতর শিষ্য পুত্র ও পোষ্য পুত্র দেশের নানা বিভাগে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহার মহৎ জীবনের মহিমা প্রচার করিবে। আজ তিনি চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কত কত কীর্ত্তিস্তম্ভ পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, যাহার জন্য তাঁহার দেশবাসী বহুদিন পর্য্যন্ত ভক্তিভরে তাঁহার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতার অঞ্জলী প্রদান করিবে। আজ তিনি চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তৎপ্রতিষ্ঠিত রাম মোহন রায় লাইব্রেরি জ্ঞানপিপাসু লোকের নিকটে চিরকাল জ্ঞানচর্চ্চার পীঠস্থান রূপে বর্ত্তমান্ থাকিয়া কৌতুহলাক্রান্ত পরিব্রাজকদিগকে তাঁহার পবিত্র কীর্ত্তি স্মরণ করাইয়া দিবে।

শ্রীরোহিণীকুমার নাথ।

পীঠস্থানের ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

পীঠস্থানের উৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক আখ্যান, সকলেরই সুপরিজ্ঞাত। কিন্তু ইহার ঐতিহাসক তত্ত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ সন্ধান হইয়াছে বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায় না। সেই ঐতিহাসিক তত্ত্বের কোন সন্ধান পাওয়া যায় কিনা, তাহাই আমরা এখানে অনুসন্ধান করিয়া দেখিব।

আমরা প্রথমে পীঠস্থানের পৌরাণিক আখ্যানটীই বলিয়া নিব :—

"সতী দক্ষের কন্যা—শিবের স্ত্রী। দক্ষ

এক বিরাটযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাহাতে সকল দেবতারই নিমন্ত্রণ ছিল, কেবল শিবেরই নিমন্ত্রণ হয় নাই। স্বামীর নিমন্ত্রণ না হইলেও সতী পিতার যজ্ঞ বলিয়া বিনা নিমন্ত্রণেই তাহাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সতীকে দেখিয়া দক্ষ, শিবের যথেষ্ট নিন্দাবাদ করেন। তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া সতী, যজ্ঞস্থলেই প্রাণবিসর্জ্জন করেন। তাহা জানিতে পারিয়া বীরভদ্র প্রমুখ শিবানুচরগণ আসিয়া দক্ষের মুণ্ডপাত করে এবং দক্ষযজ্ঞ সম্পূর্ণরূপে পণ্ড করিয়া দেয়। শিব, সতীর মৃতদেহ মস্তকে লইয়া উন্মত্তবৎ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে, বিষ্ণু চক্রযোগে তাহা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলেন। সতীর সেই সমস্ত দেহখণ্ড যে যে স্থলে পতিত হইয়াছে সেই সেই স্থলই পীঠস্থানরূপে পরিণত হইয়াছে।

উল্লিখিত উপাখ্যানে আর্য্যদিগের ভ্রাতৃবিরোধেরই একটী চিত্র রূপকে অঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। শিবোপাসক আর্য্যগণ, অনার্য্যপক্ষাশ্রিত হইয়াছিলেন; আর বিষ্ণুপাসক আর্য্যগণ তাহাদের ঘোরতর বিরোধী হইয়াছিলেন। ক্রমে এই বিরোধ এরূপই চরমসীমা প্রাপ্ত হয় যে, দক্ষযজ্ঞে আর্য্যপক্ষ অনার্য্যাশ্রিত পক্ষের সহিত সমস্ত সামাজিক সংশ্রব ছিন্ন করিতে উদ্যত হয়। তাহাতেই দক্ষযজ্ঞে অনার্য্যপক্ষাশ্রিত শিবোপাসকদিগের নিমন্ত্রণ হয় নাই। শিবানুচরগণ আসিয়া দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করেন বলিয়া যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে বিষ্ণুপাসকদিগের সহিতই যে শিবোপাসকদিগের প্রকৃত বিরোধ সঙ্ঘটিত হয়, পরন্তু ইহা যে বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে বিরোধ নহে, তাহা স্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হয়। সতীও আমাদের নিকট শিবের প্রকৃত পত্নী বলিয়া বোধ হয় না। পরন্তু শিবের পরমভক্ত লোকবিশ্রুত স্ত্রীলোক বিশেষ বলিয়াই বোধ হয়। উপাস্য দেবতার নিন্দায় দেহত্যাগ করিয়া তিনি ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। পক্ষান্তরে বিষ্ণুপাসকগণ কেবল শিবনিন্দা করিয়াই বিরত হন নাই; যজ্ঞ নষ্ট হওয়াতে সাতিশয় রুষ্ট হইয়া, শিবোপাসকদিগের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্যই, তাঁহারা শিবভক্তের মৃতদেহ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলেন। ইহাই, বিষ্ণুচক্রের দ্বারা সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করা হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শিবোপাসকগণ, শিবভক্তের প্রতি এরূপ অপমানজনক বিরূপ ব্যবহারে শোকে দুঃখে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া সেই সমস্ত খণ্ড লইয়া সর্ব্বত্র ভক্তির অক্ষয় পবিত্রতার স্তম্ভরূপে স্থাপিত করেন। তৎসমস্তই পুণ্য পীঠ স্থান রূপে চিরস্মরণীয় হইয়াছে।

প্রত্যেক পীঠস্থানের সহিত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভৈরব ও ভৈরবী নাম সংযুক্ত রহিয়াছে। ইহাতে পীঠস্থান সকল যে বিচ্ছিন্ন সতীদেহাঙ্গ সকলের উপর প্রতিষ্ঠিত শৈব ও শাক্তধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রস্থল ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহাই বুঝিতে পারা যায় এবং সতী যে শিবের প্রকৃত পত্নী ছিলেন না, পরন্তু শিবেরই পরম ভক্ত মর্ত্ত্য স্ত্রীলোক ছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহা না হইলে প্রত্যেক পীঠস্থানে ভৈরবীর পরিবর্ত্তে 'সতী' নামেরই উল্লেখ থাকিত।

পীঠস্থান সকলের অবস্থানের যেরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে উত্তরে হিমালয় হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে লঙ্কা পর্য্যন্ত; পশ্চিমে প্রভাস হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বে

কামরূপ পর্যান্ত, ভারতের সর্ব্বত্রই পীঠস্থান সকল আস্তীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে পীঠস্থান সকল যে প্রথম শৈবশাক্ত ধর্ম্মপ্রচারের স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহাই অনুমিত হয়।

সতীর দেহত্যাগ, শৈবধর্ম্মের জন্য আত্মোৎসর্গেরই চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। খ্রীষ্টধর্ম্মে martyrdom বা ধর্ম্মার্থ প্রাণোৎসর্গের যে সকল ঘটনার কথা জানা যায়, সতীর শিব ভক্তিতে জীবন বিসর্জ্জন তদনুরূপই আত্মোৎসর্গের ঘটনা। সতীর প্রাণ বিসর্জ্জনে শৈবধর্ম্মে যে নবপ্রাণের সঞ্চার হয়, তাহা হইতেই অভিনব শাক্তধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। সতী এই প্রকারে আপনার প্রাণদিয়া শক্তিধর্ম্মের প্রাণ সঞ্চারকারিণী হইয়াছিলেন বলিয়াই তদঙ্গ সকলের সংযোগে যেমন পীঠস্থান সকল শৈব শাক্তধর্ম্মের মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে, তেমনই তদীয় অষ্টোত্তর শত নাম যোগে বহুস্থান শাক্তধর্ম্মের প্রভাবে পবিত্র হইয়াছে।

সতীর দেহত্যাগের ঘটনা কোন্ সময়ে সঙ্ঘটিত হয়; তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সতীর পিতা দক্ষ, বৈদিক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। কারণ তাঁহার নাম বেদেই বিদ্যমান রহিয়াছে। সতীর দেহ খণ্ড সকলের উপর প্রতিষ্ঠিত পীঠস্থান সকলের সহিত যে ভৈরব ও ভৈরবীর যোগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে, শৈবধর্ম্মের প্রথম বিকাশ সময়েই সতী আত্মোৎসর্গ করেন। বেদের রুদ্রদেব হইতেই শিবের বিকাশ হইয়াছে। 'রুদ্র' নাম ভীষণ অর্থেরই বাচক। 'ভৈরব' নামও সেই ভীষণ অর্থই প্রকাশ করে। 'শিব' নাম মঙ্গল ও শান্তভাবের দ্যোতক। রুদ্র বা প্রচণ্ডভাব, তৎপর ভৈরব বা ভয়ঙ্করভাব এবং শেষে শিব বা মঙ্গল ও শান্তভাব, ইহাই শিবের স্বাভাবিক বিকাশক্রম বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং রুদ্রভাবের পর ভৈরবভাব বিকাশের সময় বেদের শেষযুগেই পড়ে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। বৈদিক যুগের পরই তান্ত্রিক ও পৌরাণিক যুগ। সতীর দেহত্যাগ তান্ত্রিক যুগেরই প্রবর্ত্তক ঘটনা।

সতী যেরূপভাবে ধর্ম্মের জন্য আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন, পৃথিবীতে তাহার তুলনা নাই। তাহাতেই ইহাতে তাঁহার নিজের মাহাত্ম্য যেরূপ অভাবিতরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাঁহার ধর্ম্মের মাহাত্ম্যও তদ্রূপ অভাবিতরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি প্রকৃতই মূর্ত্তিমতী শক্তিধর্ম্মরূপে পূজিতা হইয়াছিলেন। ইহা হইতেই তদীয় দেহখণ্ড সকল দেবতার পবিত্রতা লাভ করিয়া পূজার জন্য সর্ব্বত্র সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

সতীর দেহখণ্ড সকলের সমাধির উপর পুণ্য পীঠস্থান প্রতিষ্ঠার এই মহান্ দৃষ্টান্ত পরবর্ত্তী ধর্ম্ম সকলেও বিশেষ প্রভাব প্রখ্যাপিত করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ যে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন স্থানে সমাহিত হওতঃ পুণ্য বৌদ্ধ মহাতীর্থ সকলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহাতে আমরা উল্লিখিত সতীদেহের দৃষ্টান্ত স্পষ্টরূপেই অনুকৃত দেখিতে পাই।

খ্রীষ্টধর্ম্মে মহাজনদিগের (Saints) দেহাস্থি সকলের (relics) সংরক্ষণ ও তৎসমস্তের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের যে প্রথা প্রচলিত আছে, তাহাতেও সতীদেহের প্রতি অর্হণারই অনুকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, মহাজনার্থক Saints শব্দটীতেও

সতীশব্দের মূল সৎশব্দের বহুবচনের রূপ সন্তঃ (সন্তস্) শব্দেরই সম্পূর্ণ অনুরূপতা পরিলক্ষিত হয়। এই প্রকারে অন্যধর্ম্মের ঐতিহাসিক তত্ত্বের মধ্যেও আমরা পীঠ-স্থানের ঐতিহাসিক সত্যের সমর্থন প্রাপ্ত হইতেছি।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পৃথিবীর উৎপত্তি। (৩)

ভূপৃষ্ঠ গঠন।

পৃথিবীর উৎপত্তি-প্রসঙ্গে আমরা দেখিলাম, সম্ভবতঃ আমাদের এই বিশাল গ্রহটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শীতল উল্কারাজির সমবায়ে গঠিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা ইহার বস্তু সমষ্টির সন্নিবেশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আমরা দেখিব, সমষ্টি-বদ্ধ উল্কাসমূহের উপাদান গুলি কিরূপে পৃথিবী শরীরের ভিতরে ও বাহিরে বিন্যস্ত হইল।

পূর্ব্বতন অধ্যায়ে আমরা বলিয়াছি, স্বতন্ত্রভাবে উল্কা সমূহ যতই শীতল অবস্থায় থাকুক না কেন, ইহারা যখন পরস্পরের আকর্ষণে একত্র মিলিত হইয়া, জমাট বাঁধিয়া একটী গ্রহের সূচনা করিল, তখন তাহাদের এই সংঘর্ষণে বিপুল তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। আবার গণিত সাহায্যে জর্ম্মন-দেশীয় বৈজ্ঞানিক-প্রবর হেলম্‌হোলট্‌জ (Helmholtz) দেখাইয়াছেন যে, আকুঞ্চনশীল পদার্থের আকুঞ্চন ক্রিয়া হইতেও প্রভূত তাপ উৎপন্ন হয়। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ নিঃসংশয়িত ভাবে স্বীকার করিতেছেন যে, সৌর দেহের বিপুল তাপও এই আকুঞ্চন ক্রিয়া দ্বারা পোষিত হইয়া আসিতেছে। যাহা হউক, আকুঞ্চনবাদ (Contraction theory) হইতেও আমরা দেখিতেছি যে, আদিম অবস্থায় পৃথিবী অতিশয় উত্তপ্ত ছিল। এক্ষণে আমরা পৃথিবী দেহের এই আদিম উত্তাপের কার্য্যপরম্পরা আলোচনা করিব।

যাঁহারা খনিজ হইতে তাপ দ্বারা ধাতু বাহিষ্করণ দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, প্রভূত তাপে কঠিন খনিজ শিলা যখন তরল অবস্থায় পরিণত হয়, তখন উপযুক্ত রাসায়ণিক ক্রিয়া দ্বারা ধাতুটী বিশ্লিষ্ট অবস্থায় আনীত হইলে, উহা গুরুত্ব বশতঃ "চুল্লীর" (Hearth ; Furnace ; Crucible etc.) তলদেশে অবস্থান করে, আর তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পূর্ব্বে যে সমস্ত লঘু শিলা মিশ্রিত ছিল, তাহারা তরল অবস্থায় তদুপরি ভাসমান্ থাকে। এক্ষণে উপরের এই গাদ্ (slag) কাটিয়া ফেলিয়া দিলেই ধাতুটী সংগৃহিত হয়। ঠিক এই উপায়েই, খনিজ লৌহ শিলা হইতে লৌহ নিস্কাষণ হইয়া থাকে।

যাহা হউক, ক্ষুদ্র চুল্লীতে, সামান্য তাপে মানুষ আজকাল খনিজদেহে যে পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে, পৃথিবীর শৈশবাবস্থায় এক বিশাল চুল্লীতে, বিপুল উত্তাপে, পৃথিবী দেহেও ঠিক এইরূপ পরিবর্ত্তন পরম্পরা সংঘটিত হইয়াছিল। তাহার নিয়ন্তা, ক্ষুদ্র মানুষ নহে ;—বিরাট প্রকৃতি।

গণিত সাহায্যে পণ্ডিতগণ পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, সম-আয়তন জলরাশি অপেক্ষা আমাদের এই ভূমণ্ডল প্রায় সার্দ্ধ পাঁচ গুণ ভারী। আর পৃথিবী পৃষ্ঠে আমরা যে সকল শিলা দেখিতে পাই, ইহারা গড়ে, সময়াতন জল অপেক্ষা মাত্র সার্দ্ধ দ্বিগুণ ভারী। কাজেই সমগ্রভাবে পৃথিবীর যে গুরুত্ব,তাহার উপযুক্ত কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, আমাদিগকে এক বাক্যে বলিতে হইবে যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর ইহার পৃষ্ঠদেশ অপেক্ষা গুরুতর পদার্থে পরিপূর্ণ।

সম্প্রতি, রুদারফোর্ড-প্রমুখ নব্য বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর তাপ পোষণের আর একটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, —রেডিয়াম্, থোরিয়াম্ প্রভৃতি অনেক গুলি ধাতু হইতে অবিরাম শক্তি-তরঙ্গ নির্গত হইতেছে। আর ইহারাও পৃথিবীর তাপ সংরক্ষণে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া আসিতেছে। অধ্যাপক ষ্ট্রাট্ (Prof. Strutt) বলেন - পৃথিবীতে সচরাচর রেডিয়ম জাতীয় শক্তি বিকীরণশীল (Radio-active) ধাতু যে পরিমাণে দেখা যায়, তাহাতে পৃথিবীর পৃষ্ঠের নিম্নে ৪৫ মাইল পর্য্যন্ত যদি ইহাদের অস্তিত্ব ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাই পৃথিবী-পৃষ্ঠের উত্তাপ সংরক্ষণের পক্ষে যথেষ্ট। ইহা অপেক্ষা বেশীদূর যদি ভূগর্ভে এই বিকরণশীল ধাতু সমূহের সমাবেশ থাকিত, তবে ভূপৃষ্ঠ নিশ্চিত আরও উত্তপ্ত হইত এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন যে, পৃথিবী গর্ভে ৪৫ মাইলের নিম্নে এইরূপ শক্তি বিকীরণশীল ধাতু নাই। আর লৌহ নিকেল প্রভৃতি কয়েকটী ধাতুই মাত্র এই পর্য্যায়ের বহির্ভূত, কাজেই ইহা হইতেও অনুমান করা যায় যে, পৃথিবী-গর্ভ লৌহ প্রভৃতি গুরুতর ধাতুময়।

যাহা হউক, তাহা হইলে আমরা দেখিলাম যে, প্রভূত তাপে উল্কারাজি গলিয়া, পৃথিবী যখন এক বিরাট পিণ্ডে পরিণত হইল, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে উল্কাসমূহের উপাদানও বিভক্ত হইয়া, গুরুতর ধাতুময় পদার্থ সমূহ ভূগর্ভে রহিল, আর অপেক্ষাকৃত লঘুশিলা সমূহ ক্রমান্বয়ে উপরে আসিয়া ভূ-পৃষ্ঠ রচনা করিল।

এক্ষণে আমরা এই ভূ-পৃষ্ঠ রচনাকারী শিলার পরিণতি আলোচনা করিব।

উত্তপ্ত লঘুশিলা যখন, তরল অবস্থায় পৃথিবীর বহির্ভাগে ভাসিয়া উঠিল, তখন হইতেই তাহার তাপ বিকীরণ ক্রিয়া আরব্ধ হইল। যতই তাপ বিকীর্ণ হইতে লাগিল, ততই তাহার শিলারাজির আবার কঠিন অবস্থায় পরিণতির সম্ভাবনা আসিল।

গলিত শিলা-সলিল (Rock-magma) হইতে কঠিন শিলা (Rock) বা খনিজের (Mineral) অভিব্যক্তির একটা ক্রম বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, এরূপ অবস্থায় সর্ব্বপ্রথমে খনিজ লৌহশিলা (Iron-ores), তৎপরে, লৌহ ও ম্যাগনিসিয়ম-ঘটিত খনিজ শিলারাজি (Ferro magnesium minerals)তৎপরে চূণ, সোডিয়াম-সংশ্লিষ্ট খনিজ(Li ne and Alkali silicates) এবং সর্ব্বশেষে বিশ্লিষ্ট শিলক (Free Silica) সমূহ আকার প্রাপ্ত হয়। এই ক্রম অনুসারে আমরা দেখিতেছি যে, ভূপৃষ্ঠ-রচনাকারী শিলা-সলিল প্রধানতঃ দুইটী ভাগে বিভক্ত হইল।

একভাগ লৌহ-ম্যাগনিসিয়ম-বহুল—

এই ভাগ প্রথমে কঠিন হইয়া লৌহশিলা, বেসল্ট-শিলা (Basalt) প্রভৃতির সৃষ্টি করিল। অপর ভাগ তৎপরে, এবং সম্ভবতঃ তন্নিম্নে—শিলক (Silica) গ্রাণাইট্ প্রভৃতিতে পরিণত হইল।

তাহা হইলে, আমরা দেখিলাম, পৃথিবী জমাট বাঁধিবার সময় দুইভাগে বিভক্ত হইল—ভূগর্ভ এবং ভূপৃষ্ঠ।

ভূগর্ভ—লৌহ প্রভৃতি গুরুতর ধাতুসমূহের সমাবেশে উৎপন্ন। আর ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষাকৃত লঘু শিলাস্তর দ্বারা গঠিত। ভূপৃষ্ঠ আবার জমাট বাঁধিবার সময়ে দুইটী পর্য্যায়ে বিভক্ত হইল। প্রথম পর্য্যায়ে লৌহ ম্যাগনিসিয়ম্ প্রভৃতি ধাতুঘটিত ব্যাসল্ট্ প্রভৃতির সমাবেশ হইল, আর দ্বিতীয় পর্য্যায়ে, সোডিয়াম্, পটাসিয়াম্, শিলক প্রভৃতিজনিত শিলা-সমূহ অবয়ব প্রাপ্ত হইল।

শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

আরও উক্ত হইয়াছে ;—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শন ? ॥

গীতা, ৬।২৯।

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন ;—

"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং সং যোগী পরমোমতঃ।

গীতা, ৬।৩২।

এইরূপে যোগজ প্রজ্ঞা দ্বারা সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন হয়, সুখ বা দুঃখ সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বত্র আত্ম-উপমেয় সমদর্শন হয়। ইহার মূল নিদিধ্যাসন—বা যোগাভ্যাস রস। ইহার দ্বারাই অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হওয়া, যায় সর্ব্বভূতের সহিত সহানুভূতি বা সমবেদনা (Sympathy) ঘনীভূত হয়, কাহার আপন আত্মা হয়—সর্ব্বত্র একাত্মত্ব সিদ্ধ হয়।

এইরূপে জ্ঞান জ্ঞেয় সকলকে আপন করিয়া লয়। জ্ঞান তখন অনন্ত হয়, জ্ঞেয়—যাহা জ্ঞানের বাহিরে থাকে, তাহা অল্প হইয়া যায়। পাতঞ্জলদর্শনে আছে।

"তদা সর্ব্বাবরণমালা পেতস্য জ্ঞানস্য
আনন্ত্যাৎ জ্ঞেয়মল্পম্।"

পাতঞ্জলদর্শন, ৪।৩১।

ইহাই পাতঞ্জলদর্শনোক্ত যোগ বৃষ্টির ফল—চিত্তশুদ্ধি নির্ম্মল হইলে ধ্যান অভ্যাস দ্বারা তাহার পরিপাকে বা সংযম জয়ের যে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞালোক প্রকাশিত হয়, এই সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন বা সমদর্শন ও জ্ঞানের এইরূপ অনন্ত সম্প্রসারণ, তাহারই ফল। কিন্তু ইহাই শেষ নহে। ইহা অনন্ত সম্প্রজ্ঞাত সমাধির শ্রেষ্ঠ ফল। কিন্তু এই সমাধিতেও দ্রষ্টা-দৃষ্ট ভেদ থাকে, জ্ঞাতা-জ্ঞেয় ভেদ থাকে। চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ না হইলে সমাধি নির্ব্বীজ বা অসম্প্রজ্ঞাত না হইলে—দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান সিদ্ধ হয় না। এই প্রজ্ঞার পারে (যে প্রজ্ঞাপারমিতা) না যাইলে কেবল দ্রষ্টাস্বরূপে বা নিত্যবোধ স্বরূপ আত্মাতে অবস্থান সিদ্ধ হয় না। পাতঞ্জলদর্শনে আছে ;—

"তস্যাপি নিরোধে সর্ব্ব নিরোধাৎ
নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ।" পাতঞ্জল সূত্র, ১।৫১।

অর্থাৎ যে সমাধি দ্বারা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা সম্যক্ প্রকারে লাভ হয়, সেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির পর আরও এক অবস্থা আছে. তাহা নির্ব্বীজ সমাধি। তাহা উক্ত সবীজ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থার অতীত। তাহাতে প্রজ্ঞা-লব্ধ সংস্কার সমুদায়ের ও বীজ সকলও আর থাকে না, তাহাতে আর ব্যুত্থানও হয় না। এজন্য তাহা নির্ব্বীজ সমাধি। তখন পুরুষ শুদ্ধমুক্ত বুদ্ধ স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহাই সাংখ্য ও পাতঞ্জলদর্শন অনুসারে কৈবল্য মুক্তি। ইহার তত্ত্ব গীতার দ্বিতীয় ষটকে বিবৃত হইয়াছে, তাহা বলিয়াছি।

কিন্তু ইহাই শেষ নহে। সেই কথা না বুঝিলে গীতোক্ত সাধনাতত্ত্ব বুঝা যাইবে না এবং গীতোক্ত এই যোগ-দৃষ্টির কথাও বুঝা যাইবে না। সে কথা বুঝিতে হইলে উপ-নিষদোক্ত যোগতত্ত্ব বুঝিতে হয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে আমরা তাহা বিবৃত করিয়াছি। এস্থলে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে হইবে।

পাতঞ্জলদর্শনোক্ত সবিকল্প সমাধির পরিপাকে 'সংযম জয়ে' যে প্রজ্ঞালোক প্রকাশিত হয়, তাহা সকাম বিশেষ ভূমিতে বিনিযুক্ত হইলে, সেই ভূমিসম্বন্ধে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার প্রকাশ হয়, তাহা বলিয়াছি। ধ্যান-কালে ধ্যাতা ও ধ্যেয় পৃথক থাকে। এই ধ্যেয় বস্তু যদি ঈশ্বর হন, ঈশ্বরতত্ত্ব শ্রবণ ও মননের পর যদি তাঁহার সম্বন্ধে নিদিধ্যাসন হয়, যদি ধ্যানাভ্যাস রসে তাঁহাতে নির্ম্মল শুদ্ধ সাত্ত্বিক চিত্তকে আপ্লুত করা যায়, — যদি তাঁহার সম্বন্ধে ভাবসমন্বিত একতান চিন্তাপ্রবাহ স্থাপিত হয়, তবে সেই ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রজ্ঞালোক প্রকাশিত হয়, তখন বিজ্ঞান সহিত তাঁহাকে জানা যায়। পাতঞ্জল-দর্শনে এই জন্য সেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভের—বা চিত্তবৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক দ্রষ্টা-স্বরূপে অবস্থান জন্য 'ঈশ্বর প্রণিধান' এক প্রধান উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা ভাবসমন্বিত ভজনা দ্বারা ঈশ্বর-প্রণিধানরূপ যোগযুক্ত হন, তাঁহারাই ঈশ্বরযোগী। গীতা অনুসারে এই ঈশ্বর-যোগীই শ্রেষ্ঠ। গীতায় উক্ত হইয়াছে ;—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

গীতা, ৬।৪৭।

ইহার কারণ সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমেই উক্ত হইয়াছে,—

"ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তৎ শৃণু॥"

অর্থাৎ নির্ম্মল সাত্ত্বিক চিত্তে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় যখন ঈশ্বর ধ্যেয় হন, ঈশ্বরে যখন যোগজ প্রজ্ঞার আলোক বিনিয়োগ হয়, তখন বিজ্ঞানসহিত ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই ঈশ্বর-ধ্যান সম্বন্ধে অন্য ধ্যেয় বস্তু ধ্যানের বিশেষত্ব আছে। সে বিশেষত্ব এই যে, এই ধ্যানের মূল আশ্রয় ভক্তি। এ জন্য ইহার নাম ভক্তিযোগ। এই ভক্তি, যোগে ধ্যানাভ্যাস রসে আপ্লুত হওয়া যায়। ঈশ্বরে নিদিধ্যাসন করিতে হইলে এই ভক্তি-এই ভাবসমন্বিত ভজনাই তাহার প্রধান সাধন। এ তত্ত্ব আমরা নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, যখন এই মন সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ব্রহ্ম আমাদের ধ্যেয় হন, বেদান্ত-বিহিত উপায় দ্বারা যখন তিনি উপাস্য হন, যোগী যদি অক্ষর অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত কূটস্থ ধ্রুব ব্রহ্মতত্ত্ব ধ্যান করেন, যদি তাঁহার প্রজ্ঞালোক এই

ব্রহ্মতত্ত্বে বিনিযুক্ত হয়, তবে ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রজ্ঞালোক তাঁহার নিকট প্রকাশিত হয়, তিনি সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে বিজ্ঞান সহিত জানিতে পারেন।

কিন্তু ইহাও বাহ্য। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যে প্রজ্ঞার আলোক প্রকাশিত হয় ও সেই আলোকে যে ধ্যেয় বস্তুতে বিনিযুক্ত হইয়া তাহার স্বরূপ যে প্রকাশিত হয়, তাহাও বাহ্য। কেননা, এ প্রজ্ঞা সম্প্রজ্ঞাত সমাধিজ। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে দ্রষ্টা দৃষ্ট, জ্ঞাত জ্ঞেয়, বা ধ্যাতা ধ্যেয় ভেদ থাকে। কেবল অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে সে ভেদ দূর হইয়া যায়। চিত্ত অসম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হইলে, নির্ব্বীজ হইলে, তবে দ্রষ্টা কেবল স্বস্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন। সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে, শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত পুরুষ বা আত্মা তখন স্বস্বরূপে অবস্থান করেন, তখন তিনি জ্ঞাত-জ্ঞেয় ভেদের অতীত শুদ্ধ নির্ব্বিকল্প 'জ্ঞ' স্বরূপ হন। কিন্তু ইহাও শেষ নহে, তাহা বলিয়াছি। সেই তত্ত্ব আমরা উপনিষদ ও গীতা হইতে বা বেদান্ত হইতে জানিতে পারি।

কঠোপনিষদে যোগের লক্ষণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, যখন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি স্থির হয়, কোনরূপে বিচলিত না হয়, তাহাই যোগ।

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চন বিচেষ্টতে তমোহুঃ পরমাং গতিম্॥
তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয় ধারণম্।
(কঠ ৬।১০-১১)।

এই যোগের দ্বারা যাঁহাকে বাক্য মন বা চক্ষুর দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তিনি যে 'আছেন'—সেই নির্ব্বিশেষ অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। তাহাই আত্মা। এই আত্মা জ্ঞানাত্মার অতীত, মহা আত্মার অতীত—শান্ত অক্ষয় কূটস্থ অচল ধ্রুব আত্মা। সেই আত্মভাবস্থ হইতে হইবে। কঠোপষিদে আছে

যচ্ছেদ্ বাঙ মনসি প্রাজ্ঞস্তদ যচ্ছেদ জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তয়া যচ্ছেদ্ শান্ত আত্মনি॥
(কঠ উপঃ ৩।১৩)।

যাহার সম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা প্রজ্ঞালোক প্রকাশিত হয়, সেই প্রাজ্ঞ যদি এই শান্ত আত্মাতে যোগযুক্ত হইতে পারেন, তখন তাঁহার সমাধি নির্ব্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত হয়, তিনি দ্রষ্টা স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন বেদান্ত অনুসারে এই শান্ত আত্মা সর্ব্বাত্মা সর্ব্বান্তর পরমাত্মা পরম অক্ষর ব্রহ্ম-একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম।

এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় যখন আত্মস্থ হওয়া যায়, দ্রষ্টা স্বরূপে অবস্থান সিদ্ধ হয়, তখন সেই অবস্থায় সমাহিত হইলে সেই আত্মতত্ত্বের মধ্যেই ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমেশ্বরতত্ত্ব উপলব্ধি হয়। তখন আত্মা আপনার পরম স্বরূপে সমাধিস্থ হয়, তাহাতেই অবস্থান করেন। পূর্ব্বে এ তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে "প্রণবরূপ ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে আত্মারূপ শর সন্ধান করিয়া ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিতে হইবে। (মুণ্ডক ২।২।৪)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—

"যদাত্ম তত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং
দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥"
(শ্বেতাশ্বতর উপঃ ২।১৫)।

অর্থাৎ যোগী যখন দীপ উপমার ন্যায় আত্মতত্ত্ব (দীপ) দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকৃষ্টরূপে দর্শন করেন, তখন তিনি অজ ধ্রুব ও সর্ব্বতত্ত্ব দ্বারা বিলব্ধ সেই দেবকে (সর্ব্বাত্মা সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরকে) জানিয়া সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে (বা সর্ব্ব পরিচ্ছেদ বা Limitations হইতে) ও পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বভাব হইতে বিমুক্ত হন।

এইরূপে উপনিষদ হইতে আমরা এই যোগদৃষ্টির তত্ত্ব জানিতে পারি। প্রথম যোগে সর্ব্ববৃত্তি নিরোধ করিয়া বিজ্ঞানাত্মাতে অবস্থান করিতে হয়, পরে বিজ্ঞানাত্মার অতীত শ্রেষ্ঠ মহানাত্মাতে নিরোধ করিতে হয়, তাহার পর সেই ভূমি অতিক্রম করিয়া শান্ত আত্মাতে নিরোধ করিতে হয় সেই শান্ত আত্মা স্বরূপে অবস্থান করিতে হয়। সেই আত্মতত্ত্বের দ্বারা তখন ব্রহ্মতত্ত্ব আত্মাতে প্রকাশিত হয়, ব্রহ্মভাব লাভ হয় এবং আত্মাতেই তখন পরমাত্মার পরমেশ্বরতত্ত্ব প্রকাশিত হয়, পরমেশ্বরভাব লাভ হয়, তখন সর্ব্ববন্ধন—যে সকল পরিচ্ছেদ হেতু জীবত্ব বা ব্যক্তিত্ব, সেই সকল (Principium Individuation) হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

অতএব যখন অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে সর্ব্বচিত্তবৃত্তি নিরোধ হেতু,—চিত্তের সর্ব্বরূপ সংস্কার বীজের ধ্বংসহেতু যখন দ্রষ্টা স্বরূপে অবস্থান সিদ্ধ হয়, যখন 'শান্ত' আত্মাতে যোগস্থ হওয়া যায়; যখন কোন দৃষ্ট থাকে না—বা দ্রষ্টা-দৃষ্ট একীভূত হইয়া তাহার উপরের ভূমিতে অবস্থান হয় যখন দ্রষ্টাই আপনায় দৃষ্ট হন, তখন সেই শান্ত আত্মার স্বরূপ তাহার নিকট প্রকাশিত হয়। সেই আত্মা যে পরমাত্মা, তাহার স্বরূপ যে অক্ষয় পরমব্রহ্ম, তাহার স্বরূপ যে সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর, সেই ভাব সেই ব্রহ্মভাব ও পরমেশ্বর ভাব সেই আত্মাতেই প্রকাশিত হইতে থাকে। এই আত্মা যে কেবল 'জ্ঞ' স্বরূপ নহেন, তিনি যে প্রতি দেহে স্বতন্ত্র নহেন, তিনি যে সর্ব্বত্র একই অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মা, তিনি যে অচিন্ত্য অনন্ত 'শক্তিস্বরূপ এবং এই পরাশক্তিহেতু তাঁহারই যে এ বিশ্বরূপে অভিব্যক্তি হয়, তিনিই যে দেব মনুষ্যাদি নানাভাবে আপনাকে প্রকাশ করিয়া তাহার অন্তরালে তাহার আধার রূপে অবস্থিত থাকেন, তাহা তিনি তখন আত্মাতে উপলব্ধি করেন। তিনি তাঁহাতেই সমস্ত জগৎ একত্র সংস্থিত অনুভব করেন। তিনি যে এক হইয়াও তাঁহার সেই স্বাভাবিক জ্ঞানবল ক্রিয়াত্মিক পরাশক্তি বলে বহু হন, অনন্ত প্রকার ভাবে অভিব্যক্ত হন, সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া, সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বনিয়ন্তা হন, তাহা তিনি আপনাকেই ঈক্ষণ করেন।

আমাদের 'আত্মার' এই বিরাট সম্প্রসারণ, এই বিশ্বরূপ ভাব আমাদের পরম আদর্শ আমাদের পরমগতি, পরম ধাম। ইহা আমাদের শান্ত-পরমাত্মাভাবের নিত্য, অব্যয় পরম অক্ষয় স্বরূপের ও পরমাত্মার পরম পুরুষ ভাবের অন্তর্ভূত। কিন্তু এই পরম আদর্শ আমরা কি কখন লাভ করিতে পারি? আদর্শ কেহ কখন লাভ করিতে পারে না। আমরা যতই আমাদের এই প্রকৃষ্ট পরম আদর্শের সন্ধান পাইয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হই, ততই যেন তাহা দূরে সরিয়া যাইতে থাকে। আমরা মনে সাধনা বলে তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিলেও, তাহা বুঝি কখন ধরিতে পারি না।

আমাদের এই যে পরম আদর্শ, পরম গতি, পরম ধাম, তিনিই আমাদের পরমাত্মা পরমেশ্বর, তিনি আমাদের হৃদয়ে নিত্য অবস্থিত থাকিয়া, আমাদের অন্তরে সেই আদর্শ প্রকট করিয়া দেন, তিনি কখন বা আমাদের অনুকল্পার্থে সেই পরম আদর্শ, পরম আরাধ্যরূপে পরম প্রাপ্যরূপে শরীরী হইয়া প্রকট হন। আমরা যখন আমাদের এই পরম আদর্শকে শরীরীরূপে কখন কোথাও দেখিতে পাই, তখন আমরা তাঁহাকে পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরের অবতার বলিতে বাধ্য হই। কেন না, বলিয়াছিত, আমাদের সিদ্ধান্ত যে, মানুষ সাধনা দ্বারা, যতই অগ্রসর হউক, কখন সে আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারে না যিনি এই পরমাদর্শের অবতার, পরমেশ্বর ভাবযুক্ত, তিনিই যোগদৃষ্টিতে আপনার এই স্বরূপ আপনাতে দেখিতে পান। সাধনাসিদ্ধ মানুষ পরমেশ্বরের অনুকল্পনা লাভ করিয়া, তাহা বাহ্য ভাবে যোগদৃষ্টিতে দেখিতে পারেন মাত্র।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা এবং বর্ত্তমান জীবন-সংগ্রাম।

আমাদের যাহা ছিল, তাহা এখন নানা কারণে নাই, তাই আমাদের এত অধিক অন্নকষ্ট। শুক্রনীতি প্রভৃতি পুস্তক পাঠে এবং দশমভাগ ভারতীর ৫৮৭ পৃষ্ঠায় লিখিত কশ্চিৎ লেখকের প্রবন্ধ পাঠে আমরা বেশ অবগত হই যে, আমাদের প্রাচীন ভারতে সভ্যসমাজে ৬৪ কলা বিদ্যার সবিশেষ এবং বহুল চর্চ্চা ছিল; এই কলা বিদ্যা-সমূহে পারদর্শিতা লাভ না করিলে তাৎকালীন ভদ্র ও উচ্চ সমাজে চলা যাইতে পারিত না। আজকাল আমাদের যেমন গোঁপ কামাইয়া অকৃসন ছাত্রের অনুকরণ করা সংক্রামক রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, চোকে চশমা পরা, হাতে আংটী, মাথায় সোজা টেরি, মুখে সিগারেট, পায়ে পাম্পশু, গায়ে পাঞ্জাবী, চাদর ত্যাগ, অথবা সেপটী-পিন-গ্রথিত ডবলব্রেষ্ট কপ যুক্ত শার্ট পরিধান করা, চার পেয়ালা পান করা, বিশকুট্ তদ্‌সঙ্গে আঙ্গুলে করিয়া করিয়া ধরিয়া খাওয়া,—বর্ত্তমান সভ্য বাবু যুবক, বালক, বৃদ্ধের, পাশ্চাত্য ভাবের অনুকরণ করা যেমন একটা সংক্রামক রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেইরূপ, প্রাচীনকালে চৌশট্টি কলাবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করা সভ্যসমাজে বিচরণকারী ভদ্রলোকের একটী গুণ বলিয়া পরিগণিত হইত। এই কলা-বিদ্যাগুলি কি, তাহা আমাদের জানা উচিত, ইহার মধ্যে অনেকগুলি আমাদের বিশাল মহাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে প্রচলিত আছে। এইগুলি ১৩১৯ সালের ভারতী পত্রিকায় একস্থানে সংগৃহীত আছে, তাহা ব্যক্তি-মাত্রেরই জানা উচিত। ধনুর্ব্বেদ, গুচি-কার্য্য, বেশ পরিবর্ত্তন, চারত্ব, (Espionage) ইত্যাদি ইত্যাদি বহুপ্রকার বিদ্যা লোপ পাইয়াছে। এইগুলির পুনরুদ্ধার করিলে আজকালকার জীবন-সংগ্রামের

দিনে কত শতসহস্র দীনদরিদ্রের জীবনোপায়ের পথ সহজে উন্মুক্ত হইতে পারে, সে দিকে আমরা দেখিয়াও দেখি না! আমাদের কুম্ভকর্ণী নিদ্রা কি সহজে ভাঙ্গিবে? আমাদের দেশে প্রাচীনকালে লৌহ ঢালাই, অস্ত্র নির্ম্মাণ প্রভৃতি কতপ্রকার "ইণ্ডাষ্ট্রি" ছিল, সবই এখন চর্চ্চাভাবে ও শিক্ষাভাবে তিরোহিত হইয়াছে। সিংহলে লৌহ ও ইস্পাত ঢালায়ের ভাল কারখানা ছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এ সম্বন্ধে ২।৪ কথা এখানে বলা বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।

জগতের পুরাবৃত্ত লিখিত হইবার বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতেই সিংহলবাসিগণ লৌহের ব্যবহার ও বিগলিত লৌহে অঙ্গার মিশ্রিত করিয়া যে পদার্থ উৎপাদিত হয়, অর্থাৎ যাহাকে আমরা বর্ত্তমানকালে ইস্পাত বলি, তাহারও ব্যবহার অবগত ছিলেন। আমাদের প্রাচীন পুরাণ ও ইতিহাস আদিতে সিংহল লঙ্কা নামে অভিহিত হইয়াছে। লঙ্কা কিরূপে সিংহল হইল, তৎসম্বন্ধে ডাক্তার বারো তাহার "Buried Cities of Ceylon" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ৫৩৩ খ্রীঃ পূঃ অব্দে বিজয় নামক কোন রাজপুত্র এবং তাঁহার পার্শ্বচরগণ লঙ্কাদ্বীপে বর্ত্তমান পুত্তলমের নিকটে অবতরণ করেন। তিনি গঙ্গাতীরবর্ত্তী কোন নৃপতির নির্ব্বাসিত পুত্র। ইনি লঙ্কায় রাজ্য স্থাপন করেন। লঙ্কার ইতিহাস সমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, বিজয় কোন এক সিংহ বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেই জন্য এই দ্বীপের সিংহল, এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

লৌহ ও ইস্পাত অতি সহজে বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সহিত যৌগিক উৎপাদন করিয়া নষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ মড়িচা পড়িয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া কোনরূপ প্রাচীন লৌহ যন্ত্রাদির অস্তিত্ব আবিষ্কার করা কষ্টসাধ্য। কাজেই প্রাচীন কালে কিরূপ ইস্পাত বা লৌহ প্রস্তত হইত, তাহার কোনরূপ প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে সিংহলের যাদুঘরে যে সমস্ত প্রাচীন লৌহ যন্ত্রাদি রক্ষিত হইয়াছে, তাহাদের বর্ণনা হইতে আমরা অতীত যুগে লৌহ সম্বন্ধে ভারতীয় কর্ম্মকারগণের অভিজ্ঞতার অনেক আভাস পাইয়া থাকি।

ইউরোপীয়গণ স্বতঃই মনে করেন যে, খনিজ-মিশ্রিত পদার্থ হইতে মৌলিক ধাতু নিষ্কাশিত করিবার যাবতীয় প্রণালীর উদ্ভাবন তাঁহারাই করিয়াছেন। আমরাও অনেকটা তাহাই মনে করিয়া থাকি, কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধ পাঠ করিলে আমাদের ও ইউরোপীয়গণের সে ভ্রমপ্রমাদ অবশ্যই বিদূরিত হইতে পারে। আমাদের এই প্রাচ্যভূখণ্ডে লৌহ যন্ত্রাদির চিহ্নসমূহ অতি যৎসামান্য হইলেও, যাহা অল্প এখনও পাওয়া যায়, তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, কেবল কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে নহে, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাচ্য জগতে অনেক উন্নত প্রণালীর ধাতব যন্ত্রাদির উৎপাদন বা খনিজ পদার্থ হইতে মৌলিক ধাতুর নিষ্কাশন সম্বন্ধে লোকের প্রভূত জ্ঞান ও কর্ম্মদক্ষতা ছিল।

১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দের ১১ই জুন তারিখে ডাক্তার জর্জ্জ পিয়ার্সন্, বিখ্যাত Royal Societyর জনৈক সভ্য, একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়;— "Experiments and Observations to investigate the nature of a kind of

steel manufactured at Bombay, and there called 'Wootz' with remarks on the properties and composition of the different states of Iron"—ইহার তাৎপর্য্য এই যে বম্বে প্রদেশে উৎপাদিত "উজ" নামক ইস্পাতের গঠন, প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ক গবেষণা ও পরীক্ষা।

সিংহলে যে সমস্ত প্রাচীন নগরাবলী বর্ত্তমান কালে কালবশে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে, সেই সমস্ত স্থান হইতে এই লৌহযন্ত্র সমূহ উত্তোলন করিয়া কলম্বো যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে। এই সমস্ত বিলুপ্ত নগর অন্ততঃ৫০০পূঃ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিল। অতএব এই সময় হইতে যে সিংহলে সুসভ্য মানব জাতি বসবাস করিয়া আসিতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ২৫০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত কোন কোন নগরের ইতিহাস পাওয়া যায়।

কলম্বো যাদুঘরে কেবল অতি প্রাচীন লৌহ যন্ত্রাদিই রক্ষিত হইয়াছে, তাহা নহে, তাহাদের সহিত অপেক্ষাকৃত আধুনিক যন্ত্রাদিও রক্ষিত হইয়াছে। এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রাদি ১৩৭৪ হইতে ১৪১৬ খ্রীঃ অব্দে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাদের গাত্রে সিংহলের পৌরাণিক উপাখ্যান সমূহ খোদিত রহিয়াছে। যাঁহারা খনিজমিশ্রিত লৌহ হইতে বিশুদ্ধ লৌহ নির্ম্মুক্ত করিবার ও এই লৌহ হইতে যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিবার প্রণালী অবগত আছেন, তাঁহাদের নিকট এই পর্য্যন্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগের যন্ত্রপাতির বিবরণ যে বিশেষ আদরণীয় হইবে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কেননা, এই সমস্ত প্রাচীন যন্ত্রপাতি জগতের মধ্যে অসাধারণ ও ইহার নির্ম্মাণ-প্রণালী সম্পূর্ণ দোষশূন্য। নিম্নে কয়েকটী দ্রব্য সম্বন্ধে ডাক্তার উইলির অভিমত উল্লিখিত হইল ;—

(১) একটী ইস্পাতের বাটালী খুব সম্ভবতঃ ৫ম খ্রীঃ শতাব্দীতে প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার দৈর্ঘ্য ১০ ইঞ্চ।

(২) একটী প্রাচীন পেরেক। ইহার সূচ্যগ্র প্রান্ত ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। দৈর্ঘ্য ১৩১/২ ইঞ্চ। ইহারও উৎপাদন কাল ৫ম খ্রীঃ শতাব্দী। খুব সম্ভবতঃ ইহা সাইবিরিয়ায় পাওয়া গিয়াছে। ইহার কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নাই। কিন্তু ইহা সিংহলের ধ্বংসীভূত নগরী সমূহের যে একটা প্রধান শিল্পদ্রব্য ছিল, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

(৩) একটী দেশজ দা বা "কেট্টা"। ইহা কতকটা আধুনিক।

এই প্রবন্ধে অতি প্রাচীন কালের লৌহ বা ইস্পাত নির্ম্মিত দ্রব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। কেননা বর্ত্তমানকাল যে সমস্ত লৌহদ্রব্য বিনির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহাদের প্রস্তুতপ্রণালী বর্ণনা করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। লৌহ দ্রব্যাদি অধিককাল রক্ষিত হওয়া কিরূপ অসম্ভব, তাহা প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে, কাজেই বর্ত্তমানকালে ইহাদের অস্তিত্বই আশ্চর্য্যজনক ; এতদ্ব্যতীত প্রাচীন জগৎ যে ইস্পাতের অর্থাৎ লৌহ ও অঙ্গারের মিশ্রণজাত পদার্থের ব্যবহার জানিত না লোকের যে এইরূপ একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে, তাহা এই সমস্ত লৌহজাত পদার্থ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সংশোধিত হইতে পারে বলিয়া প্রাচীন তথ্য-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের— এমন কি, জনসাধারণের নিকটও এই সিংহলীয় লৌহময় পদার্থগুলি অত্যন্ত আদরণীয়।

ইজিপ্টের নাম প্রায় সকল শিক্ষিত

লোকেই অবগত আছেন। প্রাচীন প্রস্তর-কীর্ত্তিতে ইজিপ্ট অতুলনীয়। কিরূপ যন্ত্রাদি সাহায্যে মূর্ত্তিমতী কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ হইয়া এই সমস্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তম্ভ বা প্রস্তরগৃহ গঠিত হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন যে, প্রাচীন ইজিপ্‌সীয়গণ তাম্রের ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, এমন কি, তাম্রকে কিরূপে লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও কঠিন করিতে হয়, তাহাও তাঁহারা জানিতেন। এই সমস্ত যন্ত্রাদিতে ক্ষুরধারও উৎপাদন করা যাইতে পারিত। কিন্তু কাইরো নগর হইতে খার্টুম নগর বা আরও অনেক দূরবর্ত্তী প্রদেশ পর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রস্তর-গৃহ বা প্রস্তরস্তম্ভ বিদ্যমান রহিয়াছে ও তাহাদের নির্ম্মাণ-কৌশল অদ্যাপি যেরূপ অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তাম্রযন্ত্রপাতিকে যতই দৃঢ় করা হউক না কেন, কিছুতেই প্রস্তর-কাঠিন্যের তুল্য অর্থাৎ সেই সমস্ত যন্ত্রদ্বারা প্রস্তরকে কাটিয়া অলঙ্কৃত করা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। এই সমস্ত প্রস্তর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবার জন্য অসংখ্য পরিমাণে রাজ-মজুরের অবশ্যই আবশ্যক হইয়াছিল। আর এই সমস্ত রাজ-মজুর বিনা যন্ত্রপাতিতে বা বিনা অস্ত্রে কিছুতেই প্রস্তর গঠন করিতে সক্ষম হন নাই, ইহাও নিশ্চয়। বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন যে, লৌহ অনায়াসে কর্ত্তন করিতে পারে, তাম্রকে এরূপ ভাবে দৃঢ় করিবার প্রণালী তৎকালে ইজিপ্‌সীয়গণ আদৌ জানিতেন না। সম্প্রতি Institution of Mechanical Engineers নামক বৈজ্ঞানিক আগারে ডাক্তার রসেন্‌হেইন ও মিষ্টার ল্যাণ্টসবেরি একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, তাম্র অন্যান্য ধাতবপদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া এরূপ কঠিন করা যাইতে পারে যে, তদ্দ্বারা লৌহ পর্য্যন্ত কর্ত্তিত হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ইজিপ্ট নগরের প্রাচীন প্রস্তরগৃহে যে সমস্ত প্রকাণ্ডকায় কঠিন প্রস্তর রহিয়াছে, এই সুদৃঢ় তাম্র তাহাদিগকে কিছুতেই কর্ত্তন করিতে সক্ষম নহে।

এই সমস্ত দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, হয় মিশরবাসিগণ লৌহ ও ইস্পাত সম্বন্ধে সম্যক অভিজ্ঞ ছিলেন, অথবা লৌহ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ অন্য কোন জাতির সহায়তায় লৌহ যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করাইয়া আনিয়া তৎসাহায্যে এইরূপ প্রকাণ্ডকায় প্রস্তর স্তম্ভ গঠন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক এরূপ বহু প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারে, যদ্দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ইজিপ্‌সীয়গণ বাস্তবিক লৌহের ব্যবহার জানিতেন না। লৌহযন্ত্রাদির জন্য তাঁহাদিগকে ভারতীয় বা চীন দেশীয় কর্ম্মকারগণের মুখাপেক্ষী হইতে হইত। মিশরের কোনরূপ লৌহযন্ত্রাদির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, বা এরূপ কোন প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই, যদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, ইজিপ্সীয় লৌহযন্ত্রাদি ইজিপ্‌ট হইতে অন্য দেশে রপ্তানি হইয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের যাদুঘরে একটী কাস্তে রক্ষিত হইয়াছে। সেটীতে এরূপ মরিচা পড়িয়াছে যে, তাহা লইয়া কোনরূপ পরীক্ষা করা অসম্ভব। তবে যে ইহা লৌহ, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই ইহা এত ভঙ্গুর ও পাতলা হইয়াছে ও ইহাতে এত মরিচা ধরিয়াছে যে, হাতে করিতেও ভয় হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

৺শরচ্চন্দ্র শা

"দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ", "শঙ্করাচার্য্য-চরিত", "রামানুজ-চরিত", "রচনাসোপান", প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা; "চারুসন্দর্ভ", "নীতি-সন্দর্ভ" প্রভৃতি গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা; "মাধ্যামিকাবৃত্তি", "করুণাপুণ্ডরীক" "লঙ্কাবতার সূত্র" প্রভৃতি সংস্কৃত দার্শনিক গ্রন্থ এবং "কবিকল্পলতা" নামক সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রীয় গ্রন্থের সম্পাদক, এতদ্ব্যতীত কালিদাস, মাঘ, ভারবি প্রভৃতি কবির জীবনচরিত এবং জাতিতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, সামাজিক বিবরণ, বাঙ্গালা ব্যাকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয়াবলম্বনে যাবতীয় প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রে বহু প্রবন্ধ রচয়িতা; তদ্ভিন্ন নানা বিষয়ে বহু সংস্কৃত কবিতার রচয়িতা মহাত্মা শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় আর ইহজগতে নাই!

জন্ম—১৭৮৪ শকাব্দের ৮ই শ্রাবণ, বুধবার, বাঙ্গালা সাল—১২৬৯, ৮ই শ্রাবণ—দিবা ৯ দণ্ড ৪০ পলের সময়।

ইংরাজী সাল—১৮৬২, ২৩শে জুলাই—

মৃত্যু—১৮৩৭ শকাব্দের ৩১শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার, রাত্রি প্রায় বারটার সময়।

ইং১৯১৬,১৩ই এপ্রিল। বাং ১৩২২,৩১শেচৈত্র।

বংশপরিচয় ও শৈশবশিক্ষা।—তিনি ৺পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশের চারি পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রথম পুত্র ৺ বিশ্বম্বর জ্যোতিষার্ণব মহাশয় পঞ্জিকা রচনা প্রভৃতির জন্য বঙ্গদেশে সুবিখ্যাত। তৃতীয় পুত্র, সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান প্রিন্সিপাল স্বনামধন্য মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্-এ, পি-এইচ্-ডি। চতুর্থ পুত্র, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রভূষণ আচার্য্য। ইনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা জ্যোতিঃশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য বঙ্গদেশে সুপ্রসিদ্ধ। গৌড়াধিপ রাজা শশাঙ্ক গ্রহবৈগুণ্য বশতঃ পীড়িত হইয়া উঁহার শান্তি বিধানের জন্য সরযূতীর হইতে যে দ্বাদশজন বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তাঁহারা গ্রহের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দান গ্রহণ করায় "গ্রহবিপ্র" নামে পরিচিত হন এবং রাজার আদেশে বঙ্গদেশে বাস করেন। তাঁহাদের অন্যতমের বংশে জ্যোতিষের প্রসিদ্ধ টীকাকার কমলাকরের জন্ম হয়। এই কমলাকর পশ্চিম রাঢ় হইতে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। তিনি ইহাদের আদিপুরুষ। কমলাকরের অধস্তন পঞ্চমপুরুষ রাজীবলোচন বিদ্যাসাগর একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় রামরুদ্র বিদ্যানিধি, নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ও পঞ্জিকাকার হইয়া, অনেক সময় কৃষ্ণনগরের রাজসভায় থাকিতেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বাধীনচেতা, তিনি কোন রাজা বা ভূম্যধিকারীর বৃত্তি গ্রহণ না করিয়া চতুষ্পাঠী করেন। তাঁহার চতুষ্পাঠীতে জ্যোতিষ ব্যতীত ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার ও স্মৃতিও অধ্যাপিত হইত। রাজীবলোচন বিদ্যাসাগরের পাঁচটী প্রপৌত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ শতানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, তাঁহার কোন আত্মীয়ের অনুরোধে কিছুদিনের জন্য গোয়ালন্দের সন্নিহিত ধরমাঠী গ্রামে গিয়া অবস্থান করেন। তাঁহার আত্মীয় নাটোরের রাজার জ্যোতির্ব্বিদ্ সভাপণ্ডিত ছিলেন। শেষে তিনি আর নবদ্বীপে ফিরিতে পারেন নাই, পাঁচটী পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র উমাকান্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয় সুপণ্ডিত ও অতিশয় বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। জ্যোতিঃশাস্ত্রের ব্যবসায় ব্যতীত দুই তিন খানি গ্রামের খাজনা তহশীলের কার্য্যও তাঁহার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইত। জমিদারে জমিদারে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় তিনি প্রবীণবয়সে উক্ত গ্রাম ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর একটী গ্রামে বাস করেন। উক্ত গ্রামটীর নাম খালকুলা। উহা স্রোতস্বতী চন্দনা নদীর তীরে অবস্থিত। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের চারিপুত্র ও দুই কন্যা ছিল। তন্মধ্যে তিনি দ্বিতীয় পুত্রকে বাটী রাখিয়া, তিন পুত্র এক কন্যাকে লইয়া নৌকারোহণে তীর্থ যাত্রা করেন। বারাণসী ক্ষেত্রে দুই দিবস যাপন করিয়া, তৃতীয় দিন অরুণোদয় কালে মণিকর্ণিকার ঘাটে ১০৩ বৎসর বয়সে তিনি সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন।

এই বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র ৺ পিতাম্বর বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ই ৺ পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর পিতা। ৺ শাস্ত্রি-মহাশয় শৈশবে কিছুকাল বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া কোঁড়কদীর ৺ কৈলাসচন্দ্র তর্করত্ন ও নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺ কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, উহার টীকা, ধাতুপাঠ, অমরকোষ, ও ভট্টি, রঘু, কুমার প্রভৃতি কয়েক খানি কাব্য অধ্যয়ন করেন। পরে বেনারস কলেজে সিদ্ধান্তকৌমুদী এবং মাঘ, ভারবি, নৈষধ প্রভৃতি কাব্য ও দর্শন, জ্যোতিষ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অতঃপর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৺ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পরামর্শে তৎকালে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নূতন প্রবর্ত্তিত উপাধি পরীক্ষা প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু নবদ্বীপের ৺ কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন, ৺ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি সুবিখ্যাত অধ্যাপকগণ নবদ্বীপের পাণ্ডিত্য-গৌরব বিলোপের আশঙ্কায় নবদ্বীপের ছাত্রগণের উক্ত পরীক্ষা প্রদানের বিরোধী ছিলেন। নবদ্বীপ হইতেই তাঁহারা উপাধি প্রদান করিতেন, সুতরাং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ছাত্র পাঠাইতে প্রথম সম্মত হন নাই। এজন্য ইনি পূর্ব্বস্থলী-নিবাসী ৺ যদুনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠী হইতে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

জ্ঞানার্জ্জন প্রভৃতি। তাহার পর আর্থিক অসচ্ছলতা প্রযুক্ত রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নওগাঁ মহকুমাস্থ উচ্চশ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিতের কার্য্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। সেখানে অবস্থান কালেও তিনি শাস্ত্র চর্চ্চায় বিরত হন নাই। কাশী, বোম্বাই প্রভৃতি নানাস্থান হইতে প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থ আনাইয়া অধ্যয়ন করিতেন। ঐ স্থানে অবস্থান কালে তিনি একবার মিথিলায় গমন করেন এবং তদানীন্তন মিথিলেশ মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুরের পণ্ডিত-সভায় শাস্ত্রার্থ করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকের বিদায় প্রাপ্ত হন। কয়েক বৎসরের পর তিনি গ্রীষ্মাবকাশে কাশীতে গিয়া ভয়ানক জ্বরে আক্রান্ত হন এবং আরোগ্য লাভ করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্যে ছয় মাসের অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক আর্য্যাবর্ত্তের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন এবং উদয়পুরের মহারাণার পণ্ডিত-সভায় প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপকের বিদায় প্রাপ্ত হন।

তাহার পর নওগাঁর কার্য্য ত্যাগ করিয়া কলিকাতা সিটি-কলেজিয়েট্ স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন। এবং ঐ পদে অবস্থান কালে একবার গ্রীষ্মাবকাশে দক্ষিণাপথে গমন পূর্ব্বক উজ্জয়িনী, ইন্দোর, বড়োদা, বোম্বাই, পুণা, নাসিক প্রভৃতি বহু সংখ্যক ঐতিহাসিক স্থান সন্দর্শন করেন। ঐ যাত্রায় বড়োদা রাজধানীর পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক তিনি বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছিলেন এবং পুনা বেদ-শাস্ত্রোত্তেজক সভায় পরীক্ষা প্রদান করিয়া "শাস্ত্রী" এই উপাধি সহ প্রশংসা পত্র ও পুরস্কার লাভ করেন। আর্য্যাবর্ত্তে ও দক্ষিণাপথে ভ্রমণ কালে তিনি পণ্ডিত ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের সহিত নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিতেন। তিনি নানাস্থানে চাকরী করিয়া অবশেষে হিন্দু স্কুলের অন্যতম সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। শৈশব হইতেই তাঁহার সংস্কৃত কবিতা রচনায় অনুরাগ ছিল। কি পাঠাবস্থায়, কি অধ্যাপনার সময়,যখন তিনি সময় পাইতেন, সংস্কৃত কবিতা ও বাঙ্গালা প্রবন্ধাদি লিখিতেন। "নীতি চম্পূ" নামক গদ্য পদ্যাত্মক সংস্কৃত কাব্যখানি এযাবৎ অপ্রকাশিত রহিয়াছে। তিনি উপরি-উক্ত বাঙ্গালা গ্রন্থ কয়খানি রচনা করিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহার রচনার এইরূপ মাধুর্য্য আছে, যে, তাঁহার প্রণীত ভ্রমণবৃত্তান্ত ও জীবনচরিতগুলি উপন্যাসের ন্যায় সুখপাঠ্য। তাঁহার রচিত "দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা রচনারীতির আদর্শরূপে পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হইয়াছে। তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাঙ্গালার পরীক্ষক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধ্যাপক-সদস্য ও কলিকাতা সাহিত্য সভা ও ফরিদপুর সুহৃদ্ সভার সভ্য ছিলেন।

তাঁহার আয় অধিক ছিল না, তথাপি যাহা আয় হইত, তাহা দ্বারা তিনি পুত্রদের সুশিক্ষা দিতেন ও দরিদ্র আত্মীয় স্বজন ও বিপন্ন ব্যক্তিদের সাহায্য করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺শৈলেশচন্দ্র আচার্য্যের অকাল মৃত্যুতেই ইঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয় এবং ঐ ঘটনায় চারিবৎসরের মধ্যেই স্বর্গগমন করেন।"

শাস্ত্রী মহাশয়ের এম-এ উপাধিধারী গুণধর পুত্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তদীয় পিতৃদেবের যে সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লিখিয়াছেন, তাহা উপরে উদ্ধৃত করিলাম। যে সকল গুণধর পুত্রের জন্মভূমি বলিয়া ফরিদপুর গৌরবান্বিত, তন্মধ্যে এই শাস্ত্রী মহাশয় অন্যতর। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন, পল্লবগ্রাহী শিক্ষা-বহুল দেশে এ হেন গভীর পাণ্ডিত্য দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বমুখী ছিল, সর্ব্ব বিষয়ে তিনি মন্তব্য প্রকাশ ও আলোচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার সংস্কৃত কবিতা রচনার অসামান্য ক্ষমতা দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিমোহিত হইতেন এবং বলিতেন,"যে দেশে এরূপ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিতেছেন, সে দেশ সামান্য দেশ নহে।" পাশ্চাত্য এবং প্রতীচ্যের সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব মানসী শক্তি যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। তাঁহাতে দয়া ছিল, দাক্ষিণ্য ছিল; নিষ্ঠা ছিল, ভক্তি ছিল; পুণ্য ছিল, দেশানুরাগ ছিল; সরলতা ছিল, অমায়িকতা ছিল তাঁহাতে কি যে ছিল না,আমরা জানি না হিন্দু স্কুলের শত শত ছাত্র সাক্ষ্য দিতে বর্ত্তমান। আছেন যে, তাঁহাকে ক্রোধান্বিত হইতে কেহ

কখনও দেখেন নাই। ঐ স্কুলের শিক্ষকগণ সাক্ষ্য দিতে রখিয়াছেন যে, সামান্য অশ্লীলতা বা দুর্নীতিপূর্ণ বাক্য শুনিলেও তিনি অধীর হইতেন। আর ফরিদপুর-সুহৃদ্ সভার সভ্যগণ সাক্ষ্য দিতে পারেন, এরূপ অকপট দেশানুরাগ এযুগে বড় অধিক দেখা যায় না। কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম, সেবা এবং নিষ্ঠা জ্ঞান এবং প্রতিভা এমন ভাবে তাঁহাতে বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, এরূপ নৈষ্টিক জীবন এ যুগে বড় অধিক দেখা যায় নাই। তাঁহাকে বন্ধুরূপে, সহায় রূপে পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছিলাম, আজ তাঁহাকে হারাইয়া হাহাকার করিতেছি। বিধাতা শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

যশোহরের আবাহন।*

স্বাগত হে সুধীগণ !
লহ প্রীতি-আবাহন,
স্বাগত সতীশচন্দ্র বিদ্যা-বিভূষণ !

মনস্বী যশস্বী ধীর !
প্রিয় পুত্র ভারতীর,
তোমা সবা নিরখিয়া কৃতার্থ এ মন।

বিধির স্নেহের দান,
এই সব সু-সন্তান,
বিজ্ঞান-দর্শন-বিদ্ সুকবি ভুবনে,

নাশিতে বিষাদ তমঃ
ফুটেছ জ্যোতিষ্ক সম,
আলোকিত হিয়া মম ভাস্বর কিরণে।

কি দেখিছ চাহি চাহি ?
আর যে সেদিন নাহি—
ধন-জন-ফল-পুষ্প-ভরা নিরন্তর,

গৌড়ের সুযশঃ হরি
জননী যশোরেশ্বরী
সাজাইয়া দিয়াছিলা মম কলেবর।

খুলনা আমারি সঙ্গে
মিশামিশি এক অঙ্গে,
আজি যদি গেছে দূরে তবু নহে পর ;

কতই গৌরবে বিধি,
ভরি দিলা মম হৃদি,
সেই "রত্ন-প্রসবিনী" আমি যশোহর।

কত সেন, পাল, গুপ্ত,
একে একে হ'ল লুপ্ত,
আছে সেই রাজ-চিহ্ন আমার সকাশে ;

পীর খাঁজাহান আলি,
কত কীর্ত্তি গেল ঢালি,
সেই সব ভাঙা গড়া কত মনে আসে !

স্মরিতে আকুল চিত্ত,
নাহি সে প্রতাপাদিত্য,
নাহি আর সীতারাম, বীর পুত্র সব,

ধাম্মিক সরল শান্ত,
নাহি সে বরদাকান্ত,
নলডাঙ্গা, নড়াইল, ন'পাড়া নীরব !

সেই যে ভিষক্‌বর,
কবিরাজ গঙ্গাধর,
শমন সভয়ে যারে ছিল কৃতাঞ্জলি,

ভারতে সুখ্যাতি যার

* বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের নবম অধিবেশনে পঠিত। কোন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত, কিন্তু ইহাতে ২টী প্যারা নূতন আছে এবং স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

"চরকের টীকাকার"
সে আমার সুখ-স্বপ্ন পুত্র ধন বলি !

আমারে যে নিতি নিতি,
শুনা'ত মধুর গীতি,
স্বরগ-কিন্নর-কণ্ঠে সে মধু কিন্নর ;
সাহিত্য-গগন-রবি,
শ্রীমধুসূদন কবি
জনমি, আমারে বাছা করেছে অমর !

প'ড়ে পাওয়া নিধি সম,
কোথা দীনবন্ধু মম,
কোথা মোর যদুনাথ ধাত্রী-শিক্ষা-কার,
নিষ্কাম সন্ন্যাসী সম,
কৃষ্ণচন্দ্র নিরুপম,
গেছে সব কোল খালি করিয়া আমার !

সেনহাটী, কালিয়ায়,
তারা আজি নাহি হায়,
সেই ধন্বন্তরি সম সুবৈদ্য সকল,
সাহিত্যে যে সুপ্রকাশ
গেছে সে ঠাকুর দাস,
তারক, সুরেন্দ্র গেছে ভাতি হৃদিতল !

অমৃতবাজারে সেই,
সোণার শিশির নেই,
হেমন্ত বসন্ত সবে বিদায় করিয়া,
এবে আছি জীব-লোকে,
বরষা লইয়া চোখে,
স্মৃতির শ্মশান আছে মরমে পড়িয়া !

বলিব কি সবিশেষ
যারা আছে অবশেষ
সঙ্কোচে সে নাম ক'টি আনি না আননে,
ভয়ে ভয়ে বলি তবে,
যদুনাথ আদি সবে,
সাধিছে এ মহা যজ্ঞ জীবনের পণে !

লোকে বলে—ঋষি সম
দেবতা, প্রফুল্ল মম,
আমি বলি—ষাট্ ষাট্ বুকে থাক লুকি,
কাতরে সবারে সাধি,
ললিত, গিরিজা আদি
দরিদ্রের ধনে, কেহ দিও না'ক উঁকি।

আজি আমি দীনা ক্ষীণা
শত তাপ বিমলিনা,
আজি কি সে সকলের দিব পরিচয় ?
দুর্ভিক্ষ-জ্বলিত হিয়া,
তাহে জ্বর ম্যালেরিয়া,
আত্মদ্রোহ, অহরহঃ করিতেছে ক্ষয়।

এখন যকৃৎ পিলে,
সদা রক্ত মাংস গিলে,
করিছে কঙ্কাল সার নশ্বর শরীর,
জগত-জীবন বায়ু,
গরাসিছে পরমায়ু,
কালিয়ের বিষভরা আজি হেথা নীর !

হেন দৈন্য-ক্ষুণ্ণ দেশে,
তোমরা মিলিলে এসে,
বঙ্গের অমূল্য মণি ভারত-গৌরব !
কেমনে কোথায় রাখি,
অশ্রুজলে রুদ্ধ আঁখি,
ক্ষমা কোরো প্রাচীনার দোষ ত্রুটি সব।

বসো বাপ ! তরু-ছায়
শষ্পাসন স্নিগ্ধতায়
শ্রম দূর কর মম অঞ্চল বীজনে,
বনফল দাও মুখে,
তৃপ্তি পাই ভাঙা বুকে,
শ্রীরাম অতিথি এবে শ্রমণা-সদনে !

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী।

আমাদের সম্মেলন।

মুখবন্ধ।

পুরুষের মধ্যে আমি উত্তম। আমার দেশ-ঘর-বাড়ী, ভাইবেরাদার, বন্ধুবান্ধব, পাড়াপড়শী সবই উত্তম। আমার বহুবচন আমরা। অতএব আমাদের যাহা, তাহা আরও উত্তম। আমাদের যশোহরে এবার আমাদের সম্মেলন হইয়া গিয়াছে, তাহার তুলনা ভূভারতে নাই। তাহা অতি-অতি- উত্তম, কেননা তাহা যে আমাদের!

যশোহর আমাদের। আমরা হাজারবার বুকে টোকা দিয়া চিরদিন বলিব, যশোহর আমাদের। নাটোরের রাণীভবানীর চরণ-তলে যেদিন যশোহর রাজকর অর্ঘ্য দিত, বাঙ্গালার মান ভূষণার ভূইঞা মুকুন্দদেব রায়ের প্রতাপে যেদিন বাঘে মহিষে একঘাটে জল খাইত, মহম্মদপুরের সীতারাম রায় যেদিন এপার ওপার একসূত্রে বান্ধিয়া চন্দনা-মধুমতীর স্রোতে প্রেমধারা বহাইয়াছিলেন, প্রতাপাদিত্যের বিক্রমতরুতলে যেদিন চন্দ্রদ্বীপ, বিক্রমপুর ও ফতেয়াবাদ সমাজ ভাঙ্গিয়া যশোহরে নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল, ইংরাজরাজ্যের প্রথম যৌবনে যশোহর কলেক্টরীর সীমা যেদিন পদ্মার তীরে টেপাখোলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যশোহরের নীলকর সাহেবদিগের ক্ষমতা ও শ্রীবৃদ্ধির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে যেদিন কানাই-পুর ও সৈদপুরের বাঙ্গালী জমীদারেরা নীলের কুঠী স্থাপন করিয়া সাতডিঙ্গা সাজাইয়া বিলাতের মোণা ঘরের কোণায় উলুধ্বনি দিয়া তুলিয়া রহিয়াছিলেন, নিরক্ষর কবি তারক কাঙ্গাল যেদিন কবির দল হইতে গণিকানর্ত্তকী নিষ্কাশিত করিয়া বেড়কের কবিত্বে, গোষ্ঠগানের মাধুর্য্যে ও ছড়ার লালিত্যে প্রতিদ্বন্দ্বী গোবিন্দতাঁতীকে পরাজিত করিয়া দিগ্বিজয়ী হইয়াছিল, মধুকানের টপ্পার মধুতে যেদিন গুল্মতরু মুঞ্জরিত হইত, রসিক চক্রবর্ত্তীর মধুর নামকীর্ত্তন শুনিয়া যেদিন ছোট বড় সবাই ছুটিয়া আসিয়াছিল, পাগলা কানাইর বয়াৎ শুনিতে যেদিন মাঠের মাঝে গাছেরতলায় হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান হাতের কাজ ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিত, মধুসূদনের মধুচক্রে যেদিন গুন গুন রবে সাধু গৌড়জন মধু হরণ করিতে আসিয়াছিলেন, দীনবন্ধুর 'পুঙ্গির বাই' হালা যেদিন 'পুলিন্দার মদ্দি যাইবেন আপাইবেন না ত' ভাবিয়া অস্থির হইতেছিলেন, সেদিন যশোহর আমাদের ছিল। আমার সেই মথুরাপুরী, শ্বশুর-সুতার জন্মভূমি, শ্রীমানের মাতুলালয়, মধুময় যশোহরধাম আজও আমাদেরই আছে।

আমাদের যশোহরে সাহিত্যসম্মেলনও আমাদের। 'নবফুলবাক্যবনে নবমধুমতী' বঙ্গবাণীর জননী 'সংস্কৃত, দেবভাষা মানব-মণ্ডলে।' অতএব আমাদের ফরিদপুরের গৌরব, সংস্কৃত কলেজের মহামহোপাধ্যায় অধ্যক্ষ মহাশয়ের অধ্যক্ষতায়, আমাদের অন্যতম শাখাসভাপতি ভট্টপল্লীর মহামহো-পাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে, আমাদের কাব্য-স্মৃতির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্পাদক-তায়, আমাদের দর্শনাধ্যাপক বন্ধুবর দিব্য-কান্তি মহেন্দ্রচন্দ্রের আইনজ্ঞ আইনতঃ পিতা (father-in-law) বেদান্তবাচস্পতি রায়

বাহাদুর যদুনাথের অভ্যর্থনায় ও পরিচালনায় আমাদের মুসলমান ভাইসাহেবদিগকে লইয়া আমাদের জনসাধারণ সাহিত্যসেবকগণের যে বৈঠক বসিয়াছিল, তাহার তুলনা তাহাই এ মহীমণ্ডলে। সেখানে ছিলনা জাতিভেদ, বর্ণভেদ, 'ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।' সেখানে ছিল আবালবৃদ্ধবনিতা পুরুষনারী, উকীল-বিচারক, হাস্যকরুণবীর ভয়ানক রৌদ্র প্রভৃতি নব রসের ধারা, বাঙ্গালীচরিত্রনাট্যের পূর্ণ অভিনয়, মিলন-বিরহ-মান-মানভঞ্জন, ম্যালেরিয়া ও কৈডিস্ব। আমরা সমালোচকদিগের মুখবন্ধ করিয়া আমাদের কথা সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ কহিতে চাই। অনেক কথা আমরা ধামাচাপা দিব, কারণ ঘরের কথা পরের কাছে কহিতে নাই। তবে ঠারে ঠোরে চতুরে কি বুঝিতে কি বুঝিবেন, বলিতে পারি না।

উদ্যোগ।

গতবৎসর বর্দ্ধমানে সীতাভোগের পাতে কৈডিস্বের নিমন্ত্রণ রটিয়া গিয়াছিল। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ যশোহরের সভায় প^তিত্ব করিবেন, এরূপ কথাও উঠিয়াছিল। তদবধি একটী বৎসর সারাবঙ্গে যশোহরের সাড়া পাওয়া গিয়াছে। আমাদের সে মহারাজাধিরাজ 'তোদের সে কানাই'রাখালরাজ সাজিতে নারাজ হইলেন। কেহ মুচকি হাসিয়া আঁখি ঠারিয়া বাঁকীপুরের দিকে ইশারা করিয়া কহিল, মহারাজ যশোহর যাইবেন কেন? দ্বারে দ্বারে সভাপতির পদ ঘুরিয়া গেল। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর শরীর সহিবে না বলিয়া মুখ ফিরাইলেন। পণ্ডিত শিবনাথের শরীর নায়কের ভয়ে অধিকতর কাতর হইল। বাঙ্গালা জানিনাও যশোহরের পথ চিনিনা বলিয়া দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথও মাথা নাড়িলেন। ফিরে যাই, ফিরে যাই, বলিতে বলিতে রায় বাহাদুর যদুনাথ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যম পরীক্ষায় বাঙ্গালার প্রধান পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ জৈনসিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের গলে মাল্য দান করিয়া যশোহরের মান বজায় রাখিলেন। ইতিহাসে নগেন্দ্রনাথ, দর্শনে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ এবং বিজ্ঞানে গোবর-ডাঙ্গার মিঃ, পি, এন, বসু শাখাসভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। যশোহরের কলিকাতা-প্রবাসী সাহিত্যসেবকেরা বলিলেন, কাহার কথায় যদুবাবু এসব ডিক্রীডিসমিস, বহাল বরখাস্ত করিতেছেন? আমরা কি যশোহরের কেউ নই? কার্য্যতঃ যদুবাবু বলিলেন, 'আমিই যশোহর।' 'বাঙ্গালী' বলিলেন যশোহর বারুজীবী। 'বসুমতী' থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন। 'যশোহর' কাবুলী দাওয়াই ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের ঐতিহাসিকগণ বিক্রমপুরের দেহে কাঁটার আঁচড় লাগিয়াছিল বলিয়া বিশ্বকোষের বিরাট অঙ্গে কুলিশ নিক্ষেপের আয়োজন করিলেন। উত্তর বঙ্গের শরৎকুমার, রমাপ্রসাদ, এমন কি, অক্ষয়কুমারও সে ধোঁয়ার বাতাস দিতে লাগিলেন। স্বয়ং রাখাল, হেমেন্দ্র ও খগেন্দ্র যে তাহাতে একেবারে যোগ দিলেন না, এমন কথা বলিতে পারিনা। তবে খবর-সন্ধানী অলি গুঞ্জন করিয়া কহিয়া গেল,খগেন্দ্র নাথের সহিত শরৎকুমারের নাকি একটু খরবায়ু (breeze) বহিয়াছিল। তাহাতে কেহ veer round করিয়াছিল কিনা, জানি না। আসর জমকাইয়াছিল বেশ। অনেক

চা উদরস্থ হইল, অনেক তাম্বুল দন্তে নিষ্পিষ্ট হইয়া বরজ পর্ণশূন্য হইল, অনেক তাম্রকূট ধূম্রে পরিণত হইল। কিন্তু মীমাংসা কিছুই হইল না। ম্যালেরিয়া-ভয়ভীত সাহিত্য-সেবকগণ ফাঁপরে পড়িয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। অনেকেই ভাবিলেন, এবার যশোহরের কথা আমাদের মাথায় থাক্। যদু বাবুর জাতিকুল তুলিয়া খোটা দিয়া বাঙ্গালার সাহিত্যসেবকগণ সুরুচির পরিচয় দিলেন! কিন্তু তাহাতে আমরা কেহই Shocked হইলাম না। পুনঃ পুনঃ বরজ ও বারুজীবীর কথা শুনিয়া আমার মনে সেই বাটাভরা পাণের পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। যশোহরের প্রতি অনুরাগ বাড়িল বই কমিল না। হঠাৎ বেঙ্গলীতে সংবাদ বাহির হইল, এবার মহিলারা সাহিত্য-সম্মিলনে যোগদান করিবেন। বাঙ্গলার দুই তিন খানা মাসিকপত্র মহিলারা চালাইতেছেন, কলিকাতায় তাঁহারা প্রায়ই সভাসমিতিতে আসেন, বাঙ্গালার কবিকাননে মহিলাদের আসন উচ্চে, গত-পূজার ভারতবর্ষ মহিলাদের রচনাদ্বারা পরিপুষ্ট ও শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল, মহিলারা মানকুমারীকে অগ্রে লইয়া যশোহরে সাহিত্য-সম্মিলনের চিকের আড়ালে আসিয়া বসিবেন, একথায় নূতনত্ব না থাকিলেও, আনন্দের কারণ যথেষ্ট আছে। বসুমতী ব্যঙ্গ করিলেন, 'মজার কথা।' সুবুদ্ধি সেকথা হাসিয়া উড়াইলেন; মহিলারা অভিমান করিয়া আসিবেন না, বলিলেন; কিন্তু কয়েকজন পুরুষ ঘোট করিলেন, বসুমতী গেলে আমরা যাইব না। নায়কের মুখে তুবরী ছুটিল। ঘুটে পোড়ে গোবর হাসে। যখন নায়ক আমাদের কাহাকেও বিঁধিবা দেয়, তখন আমরা খুব খুসী। যখন নায়ক আমাদের শত্রুপক্ষের দাড়ীতে দিয়াশলাইর কাঠী জালিয়া ধরে, তখন আমরা খুব মজা বোধ করি। কিন্তু আমাদের গায় নায়ক জলের ছিটা দিলেই আমরা নায়ককে ইতর অভদ্র বলিয়া নাক সিট্কাই। ইহাই আমাদের প্রকৃতি। বঙ্গবাসী চিরকাল ব্যঙ্গ করিয়া আসিয়াছে, তথাপি আমরা বঙ্গবাসীকে একঘরে করিবার আয়োজন করি নাই। রবিবাবু হিন্দুসমাজের পর্দ্দায় পর্দ্দায় আঙ্গুল দিয়া তাহার বন্ধন শিথিল করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাকে কেহ একঘরে করে নাই। নায়কও কতবার কতপ্রকারে রমণীকুলের ও পুরুষকুলের কুৎসা করিয়া রেহাই পাইয়াছিলেন, কিন্তু এবার শক্ত মরদের হাতে পড়িয়া, তাঁহাকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে হইল। অভ্যর্থনা-সমিতি বিবাদ মিটাইবার ভার শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্তের উপর প্রদান করিলেন। বসুমতী নাকে খত দিল বটে, কিন্তু তোকে ছেড়ে মোকে ধরিল; তোমরা কাহারা সুধাইতে সুধাইতে কুলের কথা টানিয়া বাহির করিয়া বিষম খোটা দিয়া ফেলিল। পাঁচকড়ি বাবু বলিলেন, অপরাধ আমার। অভ্যর্থনাসমিতি নায়ক-সম্পাদক পাঁচকড়ি বাবুর ও বসুমতী সম্পাদক শশীবাবুর নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করিলেন। পাঁচকড়ি বাবু সম্মিলনে জাতির বিচার টানিয়া আনিয়া, বারুজীবীর অন্ন খাইব না বলিয়া, মনকে প্রবোধ দিলেন। সাহিত্য-পরিষদ্ পাঁচকড়ি বাবুকে যথারীতি প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া বিবাদের ষোলকলা পূর্ণ করিলেন।

যাত্রা।

২০শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার, বার বেলায় যশোহর যাত্রা করিলাম। বাসায় শুনিলাম,

রায়সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ ৩টা হইতে ষ্টেশনে বসিয়া আছেন, গাড়ী ছাড়িবে রেলের ৫॥০ টায়। তিনি যশোহরবাসী, অতএব গরজ কিছু বেশী। পথে রজনীগুপ্ত-স্মৃতি-পুস্তকালয়ের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত অনিল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং আমাদের তর্কভূষণ-নন্দন অধ্যাপক শ্রীমান্ বটুকনাথ ভট্টাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শ্রীমান্ বিছানা ও মশারী বহন করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে আমাদের গাড়ী গুলজার হইয়া উঠিল। সম্মিলনের মনোনীত সভাপতি মহাশয় ব্যতীত, সেখানে ডাক্তার পি, সি, রায়, শ্রীযুক্ত ধর্ম্মপাল, সিংহলবাসী ভিক্ষু সিদ্ধার্থ, শ্রীযুক্ত শশধর রায়, রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ ও হিতবাদী আফিসের পণ্ডিত শ্রীধীরানন্দ কাব্যনিধি প্রভৃতি ছিলেন। তাহার পার্শ্বের ঘরেই বাগ্মী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, ৺ দীনবন্ধু বাবুর সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র, অমৃত-বাজারের শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্রদাস গুপ্ত এবং হেমেন্দ্রবাবুর মধুর সম্পর্কের মোহিনী বাবু প্রভৃতি ছিলেন। একটী রেলের ডাক্তার গাড়ীতে উঠিয়া জনতা বৃদ্ধি করিলেন। উষ্ণতায় ও জনতায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল। ঈশানবাবু নবোদ্যমে মনোনীত সভাপতি মহাশয়ের সহিত শব্দতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সেই অপরিচিত ডাক্তারটীও সাহিত্য-রসে বঞ্চিত থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া ঈশান বাবুর সহিত ভূতের গল্প করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্থানাভাবে এবার পাঠকবর্গকে সে রসামৃত পানে বঞ্চিত করিতে বাধ্য হইলাম। শশধর বাবু একখানা মুদ্রিত অভিভাষণ লইয়া গাঢ় মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন। এত কি পড়িতেছেন,জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর করিলেন, এবারকার সভাপতির অভিভাষণ সকলকেই মন দিয়া শুনিতে হইবে। ইহাতে অনেক গবেষণার ফল 'জ্ঞাতব্য নূতন কথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।' ঈশানবাবু ব্যাখ্যা-করিলেন, যশোহর জিলাই এদেশে কলেরা ও ম্যালেরিয়ার জন্মভূমি। তৎপর যশুরে ডাকাতের কথা আলোচনা হইল —বাকী রহিল কেবল বেচারা ছারপোকা ও মশা। কে বলিলেন, নড়াইলের বাবুরা নাকি সম্মেলনের জন্য এক লক্ষ কৈ মৎস্য পাঠাইয়াছেন। ঈশানবাবু বলিলেন, সুন্দরবন হইতে কৈমাছ আনিবার সময় নৌকা চড়ায় লাগিলেই সমস্ত মাছ মরিয়া যায়। বিজ্ঞান ইহার কি ব্যাখ্যা দিবেন? ইতোমধ্যে পাশের ঘরের ও আমাদের মাঝখানের কাঠের দেওয়াল অপসৃত হইল। পাঁচকড়ি বাবুর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের কথা সে ঘরে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় বলিলেন, পাঁচকড়ি বাবু তাঁহাকে তার দেখাইয়াছেন, তাঁহার নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করা হইয়াছে, অতএব তিনি যাইবেন না। ডাঃ রায় গোলযোগ দেখিয়া রুমালে উভয় চক্ষু বাঁধিয়া বেঞ্চের উপর বিশ্রামের চেষ্টা করিলেন। পাশের ঘরের সভায় শশধর বাবুর ও আমার ডাক পড়িল। ললিত-বাবু ও হেমচন্দ্র দাস মহাশয় বলিলেন, তাঁহারা পাঁচকড়ি বাবুর ক্ষমা প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগকে না জিজ্ঞাসা করিয়া নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহারা অপমানিত বোধ করিতেছেন। বিপিনবাবু বলিলেন, পরিষদের প্রতিনিধিকে সম্মেলন হইতে প্রত্যাখ্যান করিবার কাহারও অধিকার

নাই। অতএব পাঁচকড়ি বাবুকে তার দেওয়া হউক। আমি বারবেলা ফলিতে আরম্ভ করিল দেখিয়া, হাল ছাড়িয়া দিলাম। বিপিন বাবুকে বলিলাম, গাড়ী যশোহরে পৌঁছিবে কিনা সন্দেহ। তিনি বলিলেন, এই লাইনে কি প্রতি সপ্তাহেই accident হয়? আমি বলিলাম, কেন? তিনি বলিলেন, বৃহস্পতিবার ত কেবল এই একটা নয়। পিপাসায় গলা শুকাইল দেখিয়া বিনা অনুমতিতে কালকুজো হইতে জল ঢালিয়া প্রায় একগ্লাস কণ্ঠসাৎ করিলাম। বিপিন বাবুর সতৃষ্ণ দৃষ্টি দেখিয়া বুঝিলাম, সেই জলপাত্রটী তাঁহার। গর্জ্জনের পর বর্ষণ আরম্ভ হইল, ধরিত্রী শীতল হইল। পাশের গাড়ীতে আমরা সকলে বনগায় পৌঁছিয়া এক এক শিকি খরচ করিয়া চা-দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করিলাম। তাহাতে চিনি ও দুধের অভাব ছিল। আরদালী গাড়ী ছাড়িবার সময় মূল্য গ্রহণ করিতে আসিয়া সৌজন্য দেখাইয়া চিনি ও দুধ দিতে চাহিল! যশোহরের লোকেরা বেশ ভদ্র বটে!

যশোহর।

মধুসূদনের 'জন্মভূমি স্তনে দুগ্ধ স্রোতোরূপী' কপোতাক্ষ নদ পার হইয়া ঝিকারগাছিঘাট ষ্টেসনে গাড়ী দাঁড়াইল। ঈশান বাবু যশোহরের সেই অঞ্চলের পরিচয় বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। যথাসময়ে রাত্রি প্রায় ৯৷৷০টায় যশোহর ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। মহেন্দ্রবাবু ও পণ্ডিত রাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ আমাদিগকে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করিলেন। বহু ভলণ্টিয়ার ও ভদ্রলোক অভ্যর্থনা করিতে উপস্থিত ছিলেন—ছিলেন না কেবল অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, আর ছিল না মনোনীত সভাপতি মহাশয়ের সাংশেষ অভ্যর্থনার আয়োজন। যাহা হউক, সমস্ত অভ্যাগত, নিমন্ত্রিত ও প্রতিনিধি সভ্যগণের জিনিষপত্র যদুবাবুর বাড়ীতেই লইয়া যাওয়া হইল। তথা হইতে বন্দোবস্ত করিয়া যাহার যেখানে বাসা হইবে, তথায় মালপত্র সুশৃঙ্খলার সহিত প্রেরিত হইল। সভাপতি মহাশয়ের বাক্সটী 'হারাই হারাই' করিয়াও যথাস্থানে সুস্থ শরীরে ফিরিয়া আসিয়াছিল, তজ্জন্য কোন প্রকার বিশেষ চেষ্টা বা অনুসন্ধান করিতে হয় নাই। যদুবাবুর গৃহে দ্বিতলে সভাপতি মহাশয়, তর্কভূষণ মহাশয়, তাঁহার পুত্র ও জামাতা, বিদ্যাভূষণ মহাশয়, ধীরানন্দ কাব্যনিধি মহাশয়, বিপিনবাবু, শশধরবাবু এবং এই দীনহীন প্রভৃতির বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। নিম্নে ধর্ম্মপাল, সিদ্ধার্থ, পীযূষকান্তি, কবি ভূজঙ্গধর প্রভৃতিকে দেখিয়াছিলাম। সম্মিলন স্কুলে, জিলাস্কুলে, জেলাবোর্ড আফিসে এবং অন্যান্য বহুস্থানে চারি শতাধিক প্রতিনিধি ও নিমন্ত্রিতদিগের বাসস্থান দেওয়া হইয়াছিল।

রাত্রিতেই সদাহাস্যমুখ হেমেন্দ্রপ্রসাদ আসিয়া সভাপতি মহাশয় এবং অন্যান্য আগন্তুক ভদ্র মহাশয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গেলেন। আমাকে বলিয়া গেলেন, কাল প্রাতে আমার বাসায় চা-পানের নিমন্ত্রণ। তিনি Motor service আফিসে নীড় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

পরদিন ২১শে এপ্রিল গুডফ্রাইডে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ব্রহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া প্রথমে তাঁহার দাদা তর্কভূষণ মহাশয়ের পরে অন্যান্য সকলের নিদ্রা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া ভঙ্গ করিলেন। সুতরাং আমরা প্রত্যুষে উঠিয়া সম্মিলন স্কুলে গেলাম। তথায়

বক্তা শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সতাং সঙ্গের প্রভাসবাবু এবং পণ্ডিত শ্রীরাম সহায় কাব্যতীর্থ প্রভৃতির সহিত ভেট মোলাকাত হইল। একজন ভলণ্টিয়ারের নিকট শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদের বাসার পথ জিজ্ঞাসা করিলাম। ভলণ্টিয়ার শিশুটী আমাকে গাড়ী চ'ড়িয়া যাইতে পুনঃ পুনঃ জিদ করিতে লাগিল। আমি হাটিয়া যাইতে দৃঢ়সংকল্প। বেচারী অবশেষে পরাস্ত হইয়া ক্ষুণ্ণমনে একজন স্বেচ্ছাসেবক বালককে আমার পথপ্রদর্শক রূপে নিযুক্ত করিয়া দিল। অপরিচিত দীনদরিদ্র অভ্যাগতের প্রতি স্বেচ্ছাসেবকের এরূপ আদরযত্ন আমি আর কোথায়ও দেখি নাই।

হেমেন্দ্রবাবুর বাসায় আদর যত্ন ও সৌজন্যের কিছুমাত্র ত্রুটী কোন দিন দেখি নাই। আপনাকে পশ্চাতে চাপিয়া রাখিয়া অভ্যাগতের মান বাড়াইতে বুনিয়াদী ঘরের বংশধর না হইলে এমন করিয়া কে পারে? সেখানে চা, বিস্কুট, কেক, রুটি ধ্বংস করিতে করিতে অনেক তর্কবিতর্কের পর সকলে সিদ্ধান্ত করিলেন, যশোহরের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি যদুবাবুর আদালতের কর্ত্তা জজসাহেব যদি পাঁচকড়ি বাবুকে আসিতে তার দিতে বলেন, তবেই তাঁহাকে টেলিগ্রাম করা হইবে। বঙ্কিমবাবু (মিত্র, রায় বাহাদুর) জজ সাহেবের বন্ধু ও host, শশধরবাবু অগ্রণী হইয়া তথায় গমন করিলেন। হেমেন্দ্রবাবুর জ্যেষ্ঠ কলিকাতায় পুরাতত্ত্বের ভাণ্ডার স্বরূপ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রপ্রসাদ সম্মিলনপ্রসঙ্গে যদুবাবুর উদ্যোগ, আয়োজন ও স্বার্থত্যাগের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। আমাকে ঈশানবাবু ও হিতবাদীর সম্পাদক বঙ্গবিনোদ মহাশয় বন্দী করিয়া গতবর্ষের সম্মেলনসভাপতি শাস্ত্রী মহাশয়ের বৈবাহিক আলয়ে লইয়া গেলেন। শাস্ত্রী মহাশয় চিরদিনই রসিক সুজন এবং মিষ্টভাষী। তাঁহার আসর ত্যাগ করিয়া ঈশানবাবু ও আমি জিলাস্কুলে কৃষ্ণবাবুর সন্ধানে গেলাম। তথায় ফরিদপুরের প্রতিনিধি, উকীল শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। জিলাস্কুল হইতে গাড়ী করিয়া অঘোরবাবু ও ঈশানবাবুর সহিত আমরা বাসায় ফিরিলাম। ঈশানবাবুর বাসা রায় রাধিকাপ্রসাদ দত্ত বাহাদুরের বুকে, অঘোর বাবু আসিলেন যদুবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে। সে সাক্ষাতের বিবরণ লিখিয়া কর্ম্ম-ব্যস্ত যদুবাবুকে অপ্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করি না। বাসায় আসিয়া দেখি, শ্রীযুক্ত রাখাল রাজ রায় প্রতিনিধিদিগের নাম লিখিয়া লইতেছেন। তিনি দুই মুদ্রা দর্শনী আদায় করিয়া একটী প্রতিনিধিচিহ্ন অর্পণ করিলেন এবং নাম লিখিয়া আমাকে বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতিতে ভোটের অধিকার দিয়া গেলেন।

অবগাহন স্নান করিয়া ভোজনে বসিলে মহেন্দ্রবাবুর ভালবাসার অত্যাচার সহিয়া উদরের স্কন্ধে গুরুভার চাপাইতে হইয়াছিল। পীযূষকান্তি হাঁকিলেন, পাতে লবণ নাই। আমি উত্তর করিলাম, যদুবাবু অতি সুবিবেচকের কার্য্যই করিয়াছেন। আমাদের অনেকেই নিমক খাইয়া তাহা ভুলিতে বাধ্য হইবেন। দেখিলাম, কৈমাছের নৌকা চড়ায় ঠেকে নাই। এবার সম্মেলনের ভোজনের বিশেষত্ব প্রত্যেকের পাতে প্রতি বেলা একটী সজিব কৈমৎস্য আমার পাতে সেবেলা প'ড়িয়াছিল যোড়া কৈ?

সম্মেলন।

অপরাহ্ণ ২টার সময় আমরা মণ্ডপে সমবেত হইলাম। বন্ধু খগেন্দ্রনাথ প্রভৃতি এক একটী কমল কলিকা হাতে দিয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। তালের পাখা হাতে হাতে বিলি করা হইল। সহস্রাধিক লোক মণ্ডপে সমবেত হইয়াছিলেন। পর্দা অদৃশ্য হইয়াছিল, তখন বুঝিলাম, মহিলারা আসিবেন না। বসুমতী ও নায়ক বিতাড়িত হইলেন, মহিলারাও আসিলেন না। যশোহর তাতিকুল বৈষ্ণবকুল, দুইই হারাইল। যদুবাবুর অশীতিবর্ষবয়স্কা বৃদ্ধা জননী মণ্ডপে উপবিষ্ট ছিলেন। প্রধান প্রধান সকলে আসন গ্রহণ করিলে কার্য্যারম্ভ হইল। পীতবসন বালকবালিকাদিগের মধুর সঙ্গীত, মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন ও পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রিকর্তৃক সংস্কৃত স্তব ও বেদ পাঠ, ভিক্ষু সিদ্ধার্থ কর্তৃক পালি স্তোত্র পাঠ, জনৈক মুসলমান মৌলবী কর্তৃক আরবী স্তোত্র পাঠ, মাল্যদান, বাণীবন্দনা প্রভৃতি শেষ হইলে, মানকুমারী-রচিত একটী সুন্দর কবিতা জনৈক যুবক পাঠ করিলেন। যদুবাবুর জননী সকলের অনুরোধে উঠিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, 'আমার গোপালের সখাদের ভাল হউক।' আমাদের মহেন্দ্র বাবু সার্ব্বজনীন প্রার্থনা আবৃত্তি করিলেন। তৎপর শাস্ত্রী মহাশয় অতি সংক্ষেপে কয়েকটী সারগর্ভকথায় উদ্বুদ্ধ সাহিত্যসম্মেলনের উদ্বোধন করিলেন। অনন্তর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয় অভিভাষণ পাঠ করিলেন। তাঁহার ভাঙ্গাগলায় বীররস বেশ শুনাইতেছিল। যশোহরের প্রাচীন গৌরব ও বর্ত্তমান দৈন্য বর্ণনা কালে তাঁহার করুণ রসই আমাদের অধিক ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু অতিরিক্ত সংস্কৃত শ্লোক, তাহার পদ্যানুবাদ ও অনেক অবান্তর কথা গলাধঃকরণ করিতে আমাদিগকে রসগোল্লার ও কৈড়িম্বের মধুর আস্বাদ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার ওঙ্কার উচ্চারণের অপূর্ব্ব ধরণ অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লক্ষ্য করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। অভিভাষণ পাঠকালে প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ বাবু তাঁহার একটী বালিকা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। তৎপর একখানি মোটর গাড়ীর শব্দ শুনিয়া যদুবাবু বলিয়া উঠিলেন, "আপনারা সব উঠুন উঠুন" অনেকে উঠিলেন,কিন্তু কোন রাজা মহারাজই আসিলেন না। মধুময় অভিভাষণ শেষ হইতে হইতে প্রায় দিবা অবসান হইয়া গেল। তৎপর যেটুকু অবশিষ্ট ছিল,তাহা সভাপতি বরণ করিতে উঠিয়া রায় বাহাদুর পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় জজ সাহেব তাঁহার লিখিত বক্তৃতায় বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত আলোচনা করিতে নিঃশেষ করিলেন। এই সম্বন্ধে তিনি স্বতন্ত্রপ্রবন্ধ সাহিত্যশাখায় পাঠ করিলে, তাঁহার মূল্যবান কথা কয়টী মাঠে মারা যাইত না। তৎপরেও সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠের অবসর আসিল না। শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর কবিতা পাঠ করিলেন। কবিতা দুইটাই মনোরম ও সুশ্রাব্য। তৎপর হেমেন্দ্রপ্রসাদ আশাবল্লী কবিতা পাঠ করিলেন, তাহা শুনিয়া অনেকের চক্ষুই আর্দ্র হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী-প্রমুখ বর্ত্তমান বাঙ্গালা লেখকদিগের অনেকের নাম বাদ পড়িয়াছে। সভাপতি মহাশয় ভ্রাতৃশোকে কাতর হইয়া

তাড়াতাড়ি প্রবন্ধ শেষ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়াই এরূপ হইয়াছে, শুনিলাম। যাহা হউক, তাঁহার অভিভাষণ শেষ হইলে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, ডাক্তার গফুর ও মিঃ ধর্ম্মপাল বর্ত্তমান যুদ্ধে সম্রাট মহোদয়ের জয়কামনা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। ডাঃ গফুর স্বর্গীয় পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন এবং তাঁহার ভ্রাতা সভাপতি মহাশয় শোকের অবস্থায়ও কর্ত্তব্য পালন করিতে যশোহরে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া, ধন্যবাদ ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। অতঃপর স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার দুঃস্থ পরিবারের সাহায্যের জন্য সকলের নিকট অর্থ সাহার্য্য প্রার্থনা করা হয়। দুই তিনজন সহৃদয় মুসলমান সাহিত্যসেবক তৎক্ষণাৎ কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিলেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত এই অর্থ সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিঃ ধর্ম্মপালের ইংরাজী বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের কেশহীন মস্তক একবার উত্থিত হইতে দেখা গেল। কিন্তু তাঁহার প্রতিবাদে কেহ অনুমতি বা উৎসাহ না দেওয়াতে, তিনি বোধ হয় সেই রাত্রিতেই 'লম্বা দিয়াছিলেন। অনন্তর যদুবাবুর গৃহে সকলের সান্ধ্যসমিতিতে আমন্ত্রণ হইল। আমরা মণ্ডপের অতি সন্নিকটে হেমেন্দ্র বাবুর গৃহে চা পান করিতে গমন করিলাম। তথায় রামানন্দ বাবুর কন্যা বিশ্রাম করিতেছিলেন। সকন্যক রামানন্দ বাবু তখনই গাড়ীতে ষ্টেশনে গমন করিলেন। প্রবাসীর চারুবাবু প্রভৃতি সেদিন যশোহরে অবস্থান করিলেন।

সেদিন সম্মিলনে দেখি নাই, নব্যভারতের দেবীপ্রসন্ন বাবুকে, ভারতবর্ষের প্রকাশক বা সম্পাদককে, মধুস্মৃতি বা মধুজীবন চরিত লেখকদিগকে, মানসীর কাহাকেও, সাহিত্যের সুরেশ বাবুকে, সবুজপত্রের তৃণ শস্প কিছুই, বসুমতীর শশিভূষণ ও নায়কের পাঁচকড়ি বাবুকে, সঞ্জীবনীর কৃষ্ণকুমার বাবুকে সময়ের অমরেন্দ্রকে, সুপ্রভাতের কুমুদিনী বসুকে, তত্ত্ববোধিনীর ক্ষিতীন্দ্রনাথকে, দর্পণের বীরেন্দ্র বাবুকে, বঙ্গবাসীর বিহারীবাবুকে, বিজয়ার মনোরঞ্জন বাবুকে, রায় বাহাদুর চুণীলালবাবুকে, উত্তর বঙ্গের রমাপ্রসাদ, শরৎকুমার ও অক্ষয়কুমারকে, গৌহাটীর পদ্মনাথকে, পণ্ডিতবর যাদবেশ্বর তর্করত্নকে ঢাকার যতীন্দ্রমোহন ও যোগেন্দ্রনাথকে, অধ্যাপক ললিতকুমার ও বন্ধুবর বিপিনবিহারীকে, বহরমপুরের নিখিলনাথ ও চুঁচুড়ার অক্ষয়কুমারকে, কবিকুলপতি রবীন্দ্র, সত্যেন্দ্র, দেবেন্দ্র, প্রমথনাথ, দেবকুমার, কুমুদরঞ্জন, কালিদাস প্রভৃতি কবিবৃন্দকে, সত্যেন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র প্রভৃতি ঠাকুরবাড়ীর সাহিত্যসাগরদিগকে, দত্ত হীরেন্দ্রনাথ-শীল, ব্রজেন্দ্রনাথ, ডাক্তার প্রসন্নকুমারকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দীনেশচন্দ্রকে, নূতন সাহিত্যিক সার আশুতোষকে, ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীকে, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রকে, আর দেখি নাই, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে।

সম্মিলনে দেখিলাম কাহাকে? সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার বিদ্যাভূষণ, শাখা-সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, [illegible] প্রমথনাথ ও নগেন্দ্রনাথ, স্বর্গীয় আর্য্যাবর্ত্তের ও বর্ত্তমান বসুমতীর হেমেন্দ্রপ্রসাদ, তস্য ভ্রাতা দেবেন্দ্রপ্রসাদ, তস্য শ্যালক মোহিনীমোহন, হিন্দু পত্রিকার রায় যদুনাথ বাহাদুর, নারায়ণের

বিপিনবাবু, হিতবাদীর পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ, পরিষদের মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, অধ্যাপক হেমচন্দ্রদাসগুপ্ত, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি, পণ্ডিতরামসহায় কাব্যতীর্থ, পণ্ডিত ধীরানন্দ কাব্যনিধি, অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ, স্বনামখ্যাত রাধাকুমুদ ও রাধাকমল, ডাক্তার গফুর, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, অধ্যাপক সমাদ্দার, চারু-বন্দ্যো ও শ্রীমণিলাল গঙ্গো, উড়িষ্যাচিত্রের যতীন্দ্রমোহন সিংহ, নবাবী আমলের কালীপ্রসন্ন, হেতমপুরের রাজকুমার, ৺ আনন্দবাজারের মৃণালকান্তি, অমৃতবাজারের পীযূষকান্তি, কবি বঙ্কিমচন্দ্র ও ললিতচন্দ্র, ডাক্তার পি, সি, রায়, যশোহর-সম্পাদক আনন্দবাবু, রায়সাহেব ঈশানচন্দ্র প্রভৃতি। যদুবাবু চিরজীবন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পদরজ শিরে ধারণ করিয়া 'হিন্দু'র সেবা করিয়া আসিয়াছেন। তাই তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মুখে এবার বাঙ্গালাভাষার কথা দেশবাসী বাঙ্গালীকে শুনাইয়া দিয়াছেন। তাহা শুনিবে না কে? সামান্য সামান্য ক্রটী-অবহেলায় যদি তাঁহাকে দুর্ব্বাসা ব্রাহ্মণের কোপানলে দগ্ধ হইতেও হয়, তাঁহার ন্যায় সংরক্ষক হিন্দুর পক্ষে তাহাত শ্লাঘার বিষয়।

সান্ধ্যসমিতি।

হেমেন্দ্র বাবুর বাসায় মুক্ত গগনতলে বৃহৎ বৈঠক বসিয়াছিল। তথায় চা হাতে করিয়া মুক্ত কণ্ঠে আলোচনা চলিল। জজ সাহেব রাজি হইতে পারেন নাই বলিয়া, পাঁচকড়ি বাবুকে হেমেন্দ্র বাবু নিজের দায়িত্বে বন্ধুভাবে আসিতে অনুরোধ করিয়া তার দিয়াছিলেন। কিন্তু বঁধু আসিল না। আমি ঈশান বাবুর সঙ্গে আঁধার পথ খুঁজিয়া সান্ধ্য-সমিতিতে চলিলাম। চলিতে চলিতে যদু বাবুর গৃহে মহেন্দ্র বাবুর আদর আপ্যায়নের এবং ভূরিভোজনের গল্প করিয়া যশোহরবাসীর প্রশংসা করিতেছিলাম। একটী কৃষ্ণকায়, পল্লীবাসী, নগ্নদেহ ব্রাহ্মণ আমাদের পশ্চাতে নীরবে আসিতেছিলেন, তিনি মনে মনে খুসী হইয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'আপনারা কি সাহিত্য?' 'আজ্ঞা হাঁ।' 'কোথা হইতে আসা হয়েছে!' 'কলিকাতা হইতে।' 'তা আপনারা দয়া করেত আমাদের যশোরে এসেছেন।' 'কেন আস্‌ব না? এ-ত আমাদেরই সম্মেলন। যশোর কি আমাদের পর?' 'না-তা-বটে, তবু কত কি শুনেছিলাম, বসুমতী বলিয়াছিল, যশোরে আবার কে যাবে? সেখানে ম্যালেরিয়া, গেলে মারবে।' 'বসুমতী আর যশোর পত্রিকায়ই ত আর বাঙ্গালার সকল সাহিত্যসেবক নয়। তাহাদের ঝগড়ায় কি সকলের কাণ দিতে আছে?' তা কি সকলে বোঝে? আমাদের ক্রটি আপনারা ধরবেন না।' আমরা যদুবাবুর বাসায় যাইব শুনিয়া, সেই গ্রাম্য ব্রাহ্মণটী বলিলেন 'চলুন আপনাদিগকে আমি সেখানে রাখিয়া আসি।' 'আপনি কি যশোরে থাকেন?' 'না,' 'অপনার নিবাস?' 'বাঘুটিয়া'। 'তাহা হইলে আপনি যাবেন কেন, আমরা পথ চিনিয়া যাইতে পারিব।' 'না আপনারা অতিথি, আপনাদের যত্নকরা প্রত্যেক যশোহরবাসীর কর্ত্তব্য।' ঈশান বাবু বলিলেন,

'আমিও যশোহর-বাসী।' 'তা হোক, আপনি ত আর যশোরে থাকেন না।' আমরা তাঁহাকে উকিল কিরণ বাবুর বাসার নিকট হইতে জিদ করিয়া বিদায় দিয়াছিলাম। সান্ধ্য-সামতিতে কিছু কমলালেবুর অংশ আদায় করিয়া আবার আঁধারে আঁধারে পথে ভীম-ভৈরবের কালভৈরব মূর্ত্তি দেখিয়া মণ্ডপে বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতিতে যোগদান করিতে গিয়াছিলাম।

বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি।

বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতিতে যদুবাবু অনুপস্থিত ছিলেন। সেখানে যে সকল কথা, তর্কবিতর্ক, আলোচনা, রঙ্গরস, মনকষাকষি, চাতুরীকৌশল, কথাকাটাকাটি, ভ্রুকুটি-ভ্রূভঙ্গী, বাহু-আন্দোলন মুষ্টি-প্রদর্শন, আসন-গুদ্ধ-পতন প্রভৃতির অভিনয় হইয়াছে, তাহা আইন অনুসারে গোপন রাখিতে লেখক বাধ্য। তবে যদি কাহারও কৌতূহলের মাত্রা অতিবৃদ্ধি হইয়া পড়ে, তিনি গোপনে এই প্রবন্ধ-লেখকের সহিত সাক্ষাৎ করিলে কাণে কাণে রহস্যভেদ করিতে লেখকের কিছুমাত্র আপত্তি হইবেনা। বিষয় নির্ব্বাচন-সমিতির সভাপতি পাঁচকড়ি বাবুকে সম্মেলনে উপস্থিত হইতে তাঁহার অধিকার আছে, এই কথা তারযোগে জানাই-য়াছিলেন। সম্মেলন কাহার? প্রতিবৎসরই সম্মেলন-স্থানেই পর বৎসরের জন্য সভ্যদিগকে মৌখিক আমন্ত্রণ করা হয়। এ অবস্থায় ত নিমন্ত্রণ হইয়াই গেল। তারপর চিঠি দেওয়া একটা নিয়মরক্ষা মাত্র। যাঁহারা আহ্বান করিবেন, তাঁহারা আগন্তুকদিগের যথাসাধ্য বাসস্থান ও আহারের বন্দোবস্ত করিতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই ভার গ্রহণ করিবেন। প্রতি-নিধি সভ্যগণ তাঁহাদের নিমন্ত্রণের ভরসায় থাকিবেন না। কে আসিলে কে আসিবেন না, সে সকল সামাজিক দলাদলির প্রশ্ন অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ বিচার করিবেন না। সে সকল কথা প্রয়োজন হইলে, সম্মেলনে সভাপতি মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে মীমাংসিত হইবে। বসুমতীর অশিষ্টতা বা নায়কের অপরাধ সম্মেলনে সভ্যগণ মিলিত হইবার পূর্ব্বে, ঘরে ঘরে বিচার করিয়া গোপনে গোপনে বাদ ছাড় হইলে, একদিন হয়ত সকলকেই এই ভাবে বাদ পড়িয়া যাইতে হইবে। অশ্লীলতা বা শিষ্টাচারের অভাব ধরিয়া বিচার করিতে গেলে, আমাদের দেশে ঠিক বাঁচিতে গাঁ উজোড় হইবে। আজ সে কথা আমাদের বক্তব্য নহে। অভ্যর্থনা সমিতির হাত পা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া সামাজিক মান-অভিমান সাহিত্যসম্মেলনে উপস্থিত করা, আমাদের কাহারও পক্ষে সুবিধাজনক নহে। মান্দ্রাজ কংগ্রেসে সেবার নর্টন সাহেবকে লইয়াও এইরূপ তর্ক উঠিয়াছিল। জয়দেব, ভারতচন্দ্র, কালিদাস, ফিল্ডিং, বায়রণ, শেলি প্রভৃতি সাহিত্যসেবকগণ উপস্থিত হইলে যদি আমরা দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিতে চাই, তাহা হইলে মিলন করিব কি ইউক্লিড, টড্-হাণ্টার ও গৌরীশঙ্করকে লইয়া? প্রতিনিধির অধিকার Wilkesকে লইয়া যেভাবে হঠ-কারিতার সহিত বিচার করা হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বসীমা সা ব্রাড্লার সময় হইয়া গিয়াছে। আমাদের যুক্তিতেও আমরা সেইরূপই বুঝি। তবে সভায় প্রবেশ-কালে কোন প্রতিনিধি বা নিমন্ত্রিত সভ্য যদি অপ্রকৃতিস্থ বা সভায় বসিবার অনুপযুক্ত অবস্থায় থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি প্রবেশ করিতে

না দিতে পারেন। কিন্তু সভাপতি মহাশয় সম্মেলনের কার্য্যারম্ভ করিয়া দিবার পর, সম্মেলনের প্রশ্ন তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় একমাত্র সরকার বাহাদুরই বিচার করিতে পারেন। পাঁচ কড়ি বাবু ও শশী বাবু নিজের অধিকার নিজেরা দাবী না করিলে, অপরে অনুরোধ-উপরোধ করিয়া দাবী করিতে বাধ্য করেন আমাদের ইচ্ছা ছিল না। তবে পরিষদের সভ্য ও প্রতিনিধিরূপে পরিষদের মান ইজ্জত বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতে আমরা বাধ্য। বস্তুতঃ সম্মেলন পরিষদেরই একটী প্রসারিত রূপবিশেষ। কোন সমিতির নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিকে প্রত্যাখান করিতে হইলে, সেই সমিতির দ্বারাই সে সংবাদ জ্ঞাপন করা ভদ্রতাসঙ্গত ও নিয়মানুযায়ী বলিয়া মনে হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ স্থানীয় প্রতিনিধি। অতএব মতপ্রকাশে (ভোট দিতে) তাঁহাদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও অধিকার আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। পাঁচকড়ি বাবু কিন্তু এবার আগাগোড়া তাল ঠিক রাখিতে পারেন নাই। মহিলাদের সম্বন্ধে ওরূপ ভাবে হিন্দুর পক্ষে লেখা কিছুতেই সঙ্গত নহে। হিন্দুর পূজাপার্ব্বণে, আমোদে-উৎসবে, যাত্রাথিয়েটারে, এমন কি, কবিরগানে পর্য্যন্ত মহিলারা পর্দ্দার আড়ালে উপস্থিত থাকেন। সাহিত্যসম্মিলনে মধুসূদনের আত্মীয়া সুকবি মানকুমারীর ন্যায় নমস্যা মহিলা পর্দ্দার আড়ালে উপস্থিত থাকিলে, আমাদের সম্মেলনের গৌরব খর্ব্ব হইত না, বরং অনেক বাড়িত। যাহা হউক, যদি পাঁচকড়ি বাবু কিছু সরল বা কুটিল ভাবে লিখিয়াই থাকেন, নিমন্ত্রণের লোভে তাহার জন্য ক্ষমা চাহিয়া তৈল ও থালী দুইই হারান, তাঁহার পক্ষে উচিত হয় নাই। জাতিও গেল, পেটও ভরিল না। শেষকালে এখন হৈ হৈ করিতে যাইয়া আরও তিনি হাল্‌কা হইয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া, আমাদের দুঃখ হয়। সাহিত্যোদ্যানে তিনি অদ্বিতীয় 'মুন্সী'; তিনি চুপ করিয়া গেলে অনেকে আসিয়া হয়ত তাঁহার চরণ ধরিয়া কান্দিত; আর যদি অন্যায় বুঝিয়া ক্ষমাই চাহিলেন ত ষোল আনা ক্ষমা চাহিয়া, unconditional surrender করিয়া সুবোধ গোপালের মত যশোহরের কৈফিয়ৎ উদরস্থ করিয়া আসিলেই ভাল হইত। শুনিলাম, অনেকে তাঁহাকে সম্মেলনে আসিতে দিতে আপত্তি করিয়া নামসহি করিয়াছিলেন। তাঁহারাই আবার সকলের অগ্রে তাঁহাকে সম্মেলনে আনিবার প্রস্তাবে নাম স্বাক্ষর করিতে ছুটিয়া গিয়াছিলেন। দুনিয়া এক আজবখানা। বিষয়নির্ব্বাচনসমিতিতে কৌশলী খগেন্দ্রনাথ, পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এবং স্থির, শান্ত, নির্ব্বিকারচিত্ত সভাপতি মহাশয় না থাকিলে ঘটোৎকচ ব্যাপার হইয়া যাইত। সভাপতি মহাশয় জোর জুলুম করিয়া নিজের ক্ষমতা চালাইতে গেলে পলকে প্রলয় হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। যাহা হউক, All's well that ends well. বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতির বৈঠক ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে, খগেন্দ্রবাবু প্রদীপের কোল অন্ধকার করিয়া যশোহর হইতে চম্পট দিয়াছিলেন এবং কলিকাতা হইতে নাটোরে রঘুনন্দনে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। বিপিন বাবুও শেষ পর্য্যন্ত সভাস্থলে অপেক্ষা করেন নাই।

রাত্রি প্রায় ১২টায় আমরা উঠিলাম। সভাপতি মহাশয়ের যান বাদে আর এক খানা গাড়ী ছিল। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ও আমরা সে গাড়ীতে চড়িয়াছিলাম।

কিন্তু কয়েকজন সভ্য পদব্রজে যাইতেছেন দেখিয়া,বিদ্যাভূষণ মহাশয় ক্ষিপ্র গতিতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে চলিলেন। আমরাও অনিচ্ছাস্বত্বেও তদবস্থ হইলাম। গাড়ী আমাদের পশ্চাতে দেবীচৌধুরাণীর রাণীগিরির মত মন্থর গতিতে চলিল। বাসায় আমাদের ঘরে কাহারও শয্যায় মশারি ছিলনা। সেরাত্রিতে যাইয়া দেখি, তর্কভূষণ মহাশয় একটী মশারী টাঙ্গাইয়া বিশ্রাম করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, "রসিকবাবু, Reception committeeর অনুমতিক্রমে আমি এই মশারিটী টাঙ্গাইয়াছি, দেখিবেন আপনাদের Subject committee যেন দয়া করিয়া এটী রদ না করেন!"

দ্বিতীয় দিন।

২১শে এপ্রিল শনিবার নিশাশেষে জাগিয়া নরসুন্দরের নাম শুনিয়া দুর্গানাম স্মরণ করিয়া ভাবিলাম, 'আজ সম্মেলন জমিবে ভাল।' সে দিন সম্মেলন জমিয়াছিল ভাল, তবে শনিবারের বারবেলায় একটু বিপরীত ফল ফলিয়াছিল। সেটা মধুরেণ সমাপয়েৎ। প্রাতে মণ্ডপে সাহিত্য ও ইতিহাস এবং জজ আদালতে বিজ্ঞান ও দর্শন বসিয়াছিল। ইতিহাসের আসর জমিয়াছিল বেশ, তবে চলিয়াছিল অপরাহ্ণ ৪॥• পর্য্যন্ত। শুনিলাম, অনেক ভূতের গল্পও নাকি সেখানে পড়া হইয়াছিল। প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মহাশয় বোধ হয় কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই। সাহিত্যে শ্রীমান্ বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যশোহরসম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ এবং মুসলমান লেখকদিগের দুইটী প্রবন্ধও মন্দ হয় নাই। মহারথেরা কেহই লক্ষ্যভেদ করিতে আসরে নামেন নাই। দর্শনের ফরাস বিছানায় প্রাচ্যদর্শনের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে তর্কভূষণ মহাশয় ব্যস্ত ছিলেন। বৈজ্ঞানিক বন্ধু মহাশয়ও এজলাস জমকাইয়া বসিয়াছিলেন। আমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া বাসায় ফিরিলাম। মধ্যাহ্ন-ক্রিয়ার কথা না বলাই ভাল। কারণ মাংস পোলাউ বাদ দিলে সে বিরাট আয়োজন বর্দ্ধমানের সীতাভোগও পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে চায়। মহেন্দ্রবাবু আহ্বান করিয়া মধ্যাহ্নভোজনে বসাইয়া দিলেন। ক্রমে তথায় স্বয়ং যদুবাবু আসিয়া দক্ষিণে বিপিনবাবু এবং বামে পীযুষ কান্তিকে লইয়া সমন্বয় ভোজনে বসিলেন, সম্মুখে মিত্রপুত্র ললিতবাবু। পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় একবার তাঁহাদের রন্ধনশালার মধুর রস উপভোগ করাইয়া গেলেন। তাঁহাদের পাচক ছিলেন,সেদিন মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্ন মহাশয়। তাহার একটু পূর্ব্বেই কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'পণ্ডিত মহাশয়ের বাসা কোথায়?' তিনি উত্তর করিলেন 'আমার বাসা হয় নাই, আমি কাকপুষ্ট।' 'থাকা হয় কোথায়?' 'সম্মিলনী স্কুলে।' 'আহার কি তর্কভূষণ মহাশয়ের এখানে?' 'তর্কভূষণ মহাশয়ের আহারই আমার ওখানে।' অর্থাৎ তিনি সেদিন রন্ধনশালার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সকলে হাসিয়া গড়াগড়ি।

ভোজনের পর বহুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সভায় যাইতে উদ্যত হইলাম। যাঁহাদের বরাত ভাল, তাঁহারা মোটরে গেলেন, আমরা ছ্যাকরা গাড়ী হইতে একবার নামিয়া, আবার উঠিয়া মণ্ডপে প্রবেশ

করিলাম। তখন মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী আসিয়াছেন। অতএব যদুবাবুও আসিলেন। কয়েক জন মুসলমান যুবক অনেক কাজের কথা বলিতেছিলেন। কিন্তু নূতনব্রতী ও অপরিচিত বলিয়া তাঁহাদের কথা আমাদের সুবুদ্ধিরা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছিলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজের পুরস্কারের প্রস্তাব সারদাবাবু উড়াইয়াছিলেন, কেননা বৎসর ১২০০৲ সুদ আসিতে পারে, এমন টাকা না পাইলে আমাদের সম্মেলন টাকা গ্রহণ করিতে পারে না। বলিহারি আমাদের বিচারবুদ্ধি! হিন্দী ও মরাঠি সাহিত্য-সম্মেলনে সাহিত্যের অভাব ও তাহা পরিপূরণের উপায় সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদিগের নিকট হইতে প্রবন্ধ আহ্বান করিয়া তাহার প্রতীকারের উপায় অবলম্বন করা হয়; বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের মূল্যবান্ গ্রন্থসকল অনুবাদ করা হয়; সৎসাহিত্যের মুদ্রণ ও প্রচার করা হয় এবং ভাষাসাহিত্যের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া উপাধি বিতরণ করা হয়। আমরা কি করিতেছি? আমি বাহির হইয়া নগেন্দ্রবাবুর ভাঙ্গাহাটে আসিয়া একটু বিশ্রাম করিলাম। বাঁকীপুরে আগামী বৎসরের জন্য নিমন্ত্রণ হইয়াছে। আগামী বৎসরের জন্য শশধরবাবুই বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অন্যান্য শাখায়ও পতি নিয়োগের কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু বাঁকীপুরের তাঁহারা স্বয়ংবরা হইবেন বলিয়া, সে প্রস্তাব বাতিল হইয়া গেল। শুনিলাম, তাহারপর যদুবাবু পাঁচকড়ি বাবুর 'নায়ক' আনিয়া তাঁহার বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের কুৎসা করা হইয়াছে বলিয়া অভিমান করিয়া বলিলেন, 'পাঁচকড়ি বাবু সম্মিলনপরিচালনসমিতির সভ্য থাকিলে আমি থাকিব না।' কোমর-বান্ধিয়া সকলে পাঁচকড়িবাবুর নাম কাটিয়া দিলেন আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম না, উপস্থিত থাকিলেও পাঁচকড়িবাবুকে সমর্থন করিতে পারিতাম না। তবে যদুবাবুর অভিনয়টা একটু অতিরঞ্জিত ও হাস্যোদ্দীপক হইয়াছিল বলিয়া লোকে কাণাকাণি করিতেছিল। তাঁহার ন্যায় পদস্থ ও কৃতবিদ্য ব্যক্তির এরূপ ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়া উচিত হয় নাই। বিশেষতঃ বৃহৎ কর্ম্মে পাঁচ কথা উঠিয়াই থাকে। আমরা তাঁহার বাড়ীতে অতিথি ছিলাম, কিন্তু আমাদের সহিতও যদুবাবু আলাপ করিবার প্রয়োজন ও অবসর বুঝিতে পারেন নাই কেন্দ্রে কেন্দ্রে অনুসন্ধান করিয়া অভ্যাগত ভদ্রলোক সাহিত্য সেবকদিগের সহিত আলাপ করাত দূরের কথা। এ বিষয়ে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের সৌজন্য, তিনি যতটুকু পারেন, অনুকরণের চেষ্টা করিলে ভাল হইত। সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার স্কন্ধে যে বিষম ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার আহার নিদ্রা ত্যাগ হইয়াছিল এবং উদ্বেগে ও দুর্ভাবনায় তাঁহার মস্তিষ্কও হয়ত চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল। দেখিয়াছি, তাঁহার বাড়ীর মহিলারা সকল বাড়ীঘর অতিথিদিগকে ছাড়িয়া দিয়া ভাণ্ডারে ও রন্ধনশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদুবাবু এবার যশোহরের মুখ রক্ষা করিয়াছেন, এই তাঁহার যথেষ্ট পুরস্কার।

পলায়ন!

প্রায় পাঁচটার সময় সারদাবাবু ও যতীন্দ্র বাবুর জুড়িতে চড়িয়া কায়স্থ সভার মণ্ডপে

গমন করিলাম। তথায় ন স্থানং তিল ধারণং। সহস্রাধিক লোকসংঘ সঙ্কীর্ণ মণ্ডপে গরমে জীবনী শক্তির পরিচয় দিতেছিলেন। প্রায় ৬টায় তথা হইতে বাহির হইয়া, আনন্দবাবুর সহিত কেশববাবুর গাড়ীতে জিলাস্কুলে গমন করিলাম। তথা হইতে বাহির হইয়া, গুটি গুটি অন্ধকারে পলায়ন করিয়া, সম্মেলন মণ্ডপ লক্ষ্য করিয়া, কোনমতে কায়ক্লেশে মোটরসার্বিস আফিসে আসিয়া, কুইনাইন যোগে উপর্যুপরি দুই পেয়ালা চা পান করিয়া, জীবন রক্ষা করিলাম এবং জনৈক ভলান্টিয়ার পাঠাইয়া যদুবাবুর বাড়ী হইতে বিছানা ও অব্যবহৃত মশারিটী আনাইয়া ষ্টেসনে যাইবার উদ্যোগ করিলাম, যেহেতু 'যঃ পলায়তি সঃ জীবতি।' সেখানে সংবাদ পাইলাম, সভাপতি মহাশয় শনিবারের বারবেলায় সন্ধ্যার গাড়ীতেই কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। ভলান্টিয়ারেরা তখন অনেকে একত্র হইয়া মণ্ডপে আলোর কাছে Pandamonium সভা করিয়া বাবুদিগের অনুকরণে বক্তৃতা ও করতালিধ্বনি করিতেছিল। দেবেন্দ্রপ্রসাদ মাংসমুখ করাইয়া দিয়া যশোহরের মান রক্ষা করিলেন। গাড়ী আসিবার অনেক পূর্ব্বে ষ্টেসনে যাইয়া পৌঁছিলাম। ষ্টেসনে কুলীর মতন দুই তিনজন স্বেচ্ছাসেবক মাল নিতে ছুটিয়া আসিলেন। একজন দীর্ঘকায় যুবক মাল প্লাটফর্ম্মের উপর যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কাপ্তেন কিনা। তিনি বলিলেন, না। তিনি কি করেন, জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন যে, তিনি তার আফিসে কর্ম্ম করেন। যশোহর সাহিত্যসম্মেলনের জন্য প্রায় দুই শত স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। তাঁহারা ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতেছিলেন। প্রতি দশ জন স্বেচ্ছসেবকের উপর একজন করিয়া কাপ্তেন (প্রধান) ছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকেরা সাহিত্যসেবকদিগের কাছে কোন শিক্ষা পাইয়াছেন কিনা, জানি না, কিন্তু সাহিত্যসেবকেরা স্বেচ্ছাসেবকদিগের নিকট যথেষ্ট শিক্ষা পাইতে পারিতেন। তাঁহাদের নিরহঙ্কার সেবা, তাঁহাদের সৌজন্য, তাঁহাদের কর্ত্তব্যপরায়ণতা, তাঁহাদের ত্যাগ, তাঁহাদের সম্মিলিতভাবে কর্ম্ম করিবার শক্তি তাঁহাদিগকে মহৎ হইতেও মহত্তর করিয়াছিল। আমাদের কঙ্কাল-স্তূপের উপর দাঁড়াইয়া আমাদের আশা ও ভবিষ্যৎ তাঁহারা, মিলনমন্দির প্রতিষ্ঠা করুন। আমাদের বাণীর আবরণের ভিতর দিয়া তাঁহাদের কর্ম্মের ও সাধনার অস্থিমজ্জা জাগিয়া উঠুক। আমাদের সম্মেলনের চেষ্টা ঐভাবেই সফল হউক, হে ভগবন্।

গাড়ী আসিতে বিলম্ব আছে দেখিয়া বিশ্রাম ঘরে অবস্থান করিতেছিলাম। সেখানে আরও কয়েকজন সাহিত্য সম্মেলনের নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ শশধরবাবু আসিয়া বলিলেন, 'জজ সাহেব আসিয়াছেন!' আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম দেখিয়া এবং বাহিরে তাঁহাদের বসিবার ব্যবস্থা হইতেছিল না. দেখিয়া বোধ হয় তিনি আবার গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, 'জজ পঙ্কজবাবু ও বঙ্কিমবাবু রায়বাহাদুর আসিয়াছেন।' আমি সংক্ষেপে বলিলাম, 'বেশ'! সেই সিওয়ান-আলীগঞ্জের ও ছাপরার মুন্সেফ পঙ্কজবাবুকেও চিনিতাম এবং আমাদের মদন মিত্রের লেনের বঙ্কিমবাবুকেও চিনিতাম। কিন্তু আমি তখন নিম-

স্থিত, প্রতিনিধি সাহিত্যসেবক। তাঁহাদের একজন অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্য, অপরে আমারই মতন অবস্থাপন্ন নিমন্ত্রিত যশোহরবাসী, বিশেষতঃ আমি ওকালতী ব্যবসায় করি না। অতএব আমার চঞ্চল হইবার কোনই কারণ দেখিতে পাইলাম না। গাড়ী আসিলে, আমি পশ্চাতের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়া মহাসুখে একখানা বেঞ্চ দখল করিয়া শয্যা রচনা করিলাম। স্বেচ্ছাসেবকেরা আমার বিছানা তুলিয়া দিলেন, আমাকে কিছুতেই আমার মাল-পত্রে হাত দিতে দিলেন না। গাড়ী ছাড়িল, সেই দুপ্রহর রাত্রিতেও প্রায় ২৫জন ভলেন্টিয়ার একত্রে মিলিতকণ্ঠে বিদায় ধ্বনি করিলেন, "বন্দে মাতরম্।" আমি জানালা হইতে রুমাল উড়াইয়া রোমাঞ্চিত শরীরে প্রতিধ্বনি করিলাম, "Three cheers for Jessore! Three cheers for Volunteers !!"

শ্রীরসিকলাল রায়।

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও জীবন-সংগ্রাম। (২)

ভারতের সীমানার মধ্যেও বহু স্থানে খুব ভাল লৌহ ঢালাই হইত। স্থাপত্য বিদ্যা, পূর্ত্ত বিদ্যা, Archiology, Architecture প্রভৃতি যাবনিক বিদ্যা বলিয়া অবলোকিত হইলেও প্রাচীন ভারতে যে খুবই উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ ও বৌদ্ধোত্তর যুগের প্রস্তরলিপি ও প্রস্তর-খোদিত মন্দিরগুলি কোন্ পাষাণ-ভাষা-অনুসন্ধিৎসুর চিরপোষিত হৃদয়-বাসনার তৃপ্তি সাধন না করে? আমাদের দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে ক্রমশঃ ক্রমশঃ বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রসার হইতেছে। ইহার ফলে তড়িত, ফটোগ্রাপ্, সিনেমা, পাখা, আলো প্রভৃতি সব সাংসারিক ব্যবহার্য্য বিষয়গুলি সৌদামিনীর কৃপায় পরিচালিত হইয়া আমাদের বিলাসভোগ বর্দ্ধিত করিতেছে। গয়ার বিষ্ণু মন্দির, কণারকের মন্দির সমূহ ও ভুবনেশ্বরের মন্দির এবং পুরীমন্দিরের নির্ম্মাণ কৌশল, প্রস্তর-কারু-কার্য্যে, বজ্রলেপ সাহায্যে সহযোগ কোন্ দর্শককে মুগ্ধ না করে? বজ্রলেপ আমাদের আজকালকার সিমেণ্ট ভিন্ন অপর কিছুই নহে। মিঃ নিয়োগী ১৩১৯ সালের ভারতী পত্রিকার ১১৪ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে বেশ গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া অতীতের ইতিহাসের দ্বার কতকটা উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে বজ্রলেপ প্রস্তুত করণ এক প্রধান কলা বিদ্যারূপে পরিগণিত হইত। আজকাল বড় বড় বাটী, সেতু ইত্যাদি বিলাতানীত সিমেণ্ট রূপ বজ্রলেপে প্রস্তুত হইয়া, দেশের ধন বিদেশে নীত করিয়া, স্বর্ণপ্রসূ ভারতকে দিন দিন নিঃস্ব করিতেছে, কিন্তু আমাদের দেশের মধ্যে তাহা অপেক্ষা বহু গুণ উৎকৃষ্টতম সিমেণ্ট বা বজ্রলেপ প্রস্তুত হইত, তাহা কেহ জানে না। বরং তাহার প্রস্তুত-বিধি আমাদের দেশের কারিকরগণের অজ্ঞতা

ও অপরিবর্ত্তনশীলতা দোষে conservatism লোপ হইতে বসিয়াছে ও হইয়াছে। তাহা পুনরুদ্ধারে আমাদের সবিশেষ চেষ্টিত হইলেও তাহা কার্য্যে পরিণত করা সহজ ব্যাপার নহে।

আমাদের যে যে বিষয়ে, যে যে ধর্ম্মে, যে যে কলা বিদ্যায় অধিকার ছিল তাহা আমরা নানা কারণে এক এক করিয়া ছাড়িয়া দেওয়ায় সেই গুলি ক্রমশঃ লোপ পাইয়াছে ও পাইতেছে, কাজেই চলনশীল জগতে আমরা সকল বিষয়েই পশ্চাৎপদ্ হইয়াছি এবং তাহার ফলে আমাদের ঘোর জীবন-সংগ্রামের আবর্ত্তনে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। তাই বলি যে, হিন্দু ধর্ম্মের একটী মূল রহস্য হইতেছে, অধিকার। অধিকার ভেদেই হিন্দুধর্ম্ম। হিন্দুর ধর্ম্মকে বুঝিতে হইলে অগ্রে এই অধিকার কথাটীকেই বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। কতকগুলি সোপানের উপর এই বিরাট হিন্দু জাতির হিন্দুত্ব অবস্থিত। হিন্দুর এই অধিকার যথায় উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে, তথায় নানা বিপত্তি ও জাতীয় ধ্বংসের সূত্রপাত হইয়াছে। অনধিকার চর্চ্চা করিয়াই জগতে আজ যত বৈষম্যের সৃষ্টি। যাহার যে গণ্ডী, সেই গণ্ডীর ভিতর থাকিয়া তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহা না পালন করিলে একটা ব্যক্তিগত জীবনেও যে অশান্তি, সামাজিক জীবনেও সেই অশান্তি। স্ব স্ব অধিকারকে চরিতার্থ করিয়াই প্রত্যেক মানব তাহার জাতীয় সমষ্টিকে পুষ্ট করিতেছে। যেখানে মানব তাহার স্বধর্ম্ম এবং অধিকার হইতে বঞ্চিত, সেখানেই মানব আত্মদ্রোহী ও সমাজদ্রোহী হইয়া পড়ে;— সেই অধিকার-ভ্রষ্ট ব্যক্তি সমাজ অঙ্গের হানি করে। যতদিন এই হিন্দুজাতি চতুর্ব্বর্ণ নির্ব্বিশেষে স্বাধিকারে ছিল, ততদিন ইহার সমাজ-অঙ্গ পুষ্ট হইতেছিল। আর যেমনি ইহার মস্তক, হস্ত, পদ, উদর স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে, অমনি এই হিন্দুত্বের অন্তরে মহা অনর্থের আগ্নেয়গিরি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সে দিন হইতে হিন্দু জাতি তাহার শ্রমের সম্মান ভুলিয়াছে—ব্রাহ্মণ তাহার আদর্শ হারাইয়া স্বার্থপর হইয়াছে, ক্ষত্রিয় তাহার বাহুবল হারাইয়া রমণীর অঞ্চল ধরিয়াছে, বৈশ্য তাহার বাণিজ্য এবং ব্যবসা ভুলিয়া গমনাগমনের সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে, শূদ্র তাহার সেবাধর্ম্ম ভুলিয়া উপরের দিকে পদোত্তোলন করিয়াছে। তাহাতে ধর্ম্মের ধারণ-শক্তি শিথিল হইয়াছে, সমাজ-শৃঙ্খলা বিক্ষিপ্ত পুষ্পের ন্যায় ঝরিয়া পড়িয়াছে। অনধিকার চর্চ্চা হেতু হিন্দু তাহার কাঁধ মিলাইবার শক্তি, মালা গাঁথিবার কৌশল, চিরদিনের মত হারাইয়া ফেলিয়াছে।

একদিকে আমরা যেমন জাতীয় অধিকারকে পদদলিত করিয়াছি, অন্যদিকে তেমনি মোহাচ্ছন্ন হইয়া জাতীয় প্রতিভাকে উঠিবার সুবিধা দেই নাই। কত প্রতিভাশালী ব্যক্তি এই অধঃপতিত হিন্দু-ধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিয়া অর্থাভাবে, অন্নাভাবে, উৎসাহাভাবে আপনার ঈশ্বরদত্ত ধনকে বিকাশ করিতে পারে নাই। জাতীয় প্রতিভাকে পদে পদে অবমানিত করিয়াই হিন্দুর আজ উত্থানশক্তি-রহিত অধঃপতন।

হিন্দুর অধঃপতনের আর একটী কারণ হইতেছে, যুগধর্ম্মের সঙ্গে যোগ রাখিয়া না চলা। অভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আবশ্যকতা আসে। ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলেই, সমাজ-বক্ষে আবর্জ্জনা জমিলেই, অবতার

(super-man) আসিয়া সময়োপযোগী বিবেকবাণী প্রচার করিতে আসেন। পারলৌকিক ধর্ম্ম এক হইলেও ব্যবহারিক ধর্ম্ম বিভিন্ন প্রকৃতির। এই জন্যই হিন্দু-ধর্ম্মের দুইটা দিক আছে, তন্মধ্যে একটী ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার দিক, অপরটী ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার দিক। এই শেষোক্ত দিকটীতে কর্ম্ম ষোল আনা অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। কর্ম্ম না করিলে ধর্ম্ম হয় না।

মানব স্বধর্ম্ম-চ্যুত হইয়া কর্ম্ম করিলে ব্যবহারিক ধর্ম্মে গ্লানি উপস্থিত হয়। অবতার সেই গ্লানির প্রতিকার-কল্পে ভগবানের অংশ বিশেষ হইয়া ধরার পাপ ভার লাঘব করিতে আসেন। যখন যে শক্তির প্রাধান্য বা অহমিকা বৃদ্ধি পায়, তখন তাহার দমন করিতে আসেন এবং লাঞ্ছিত শক্তিগুলির পুনরুদ্ধার করিয়া যান।

ব্রাহ্মণ যখন সত্ত্বগুণ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণেতর বর্ণের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, তখন অবতার ব্রাহ্মণের এই ব্যভিচারকে দমন করেন, ক্ষত্রিয় যখন দুর্ব্বলকে এবং সাধুকে পীড়ন করিতে উদ্যত হন, তখন তিনি—

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম"

বলিয়া অবতীর্ণ হন। বৈশ্য যখন অতিভোগী হইয়া জগতের নানারূপ অশান্তি উপস্থিত করে, তখন তিনি বৈশ্যকেও শাস্তি বিধান করিতে আসেন, শূদ্র যখন তাহার মার্গ পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহের সৃষ্টি করে, তখন অবতার জগতে শান্তি ও ধর্ম্ম স্থাপন করেতে আসেন।

যুগে যুগে স্থান কাল পাত্রভেদে অবতারের প্রয়োজন হয়। তিনি পথভ্রান্ত মানব পথিককে মার্গ-নির্দ্দেশ করিয়া দেন। ভারতবর্ষে যে সব অবতার জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিভিন্ন আবশ্যকতা লইয়া আসিয়াছিলেন। শঙ্কর, বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, কবীর, রামকৃষ্ণ সকলেরই আসিবার আবশ্যকতা ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনকালে যে গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল, শঙ্কর তাহা বিতাড়িত করিতে আসেন। তন্ত্রে যে ব্যভিচার উৎপন্ন হইয়াছিল, চৈতন্যদেব তাহা উঠাইতে আসিয়াছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্মে যে গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল,রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ তাহা সংশোধিত করিতে আসিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ যে আদর্শ লইয়া এই হিন্দুধর্ম্মের মৃতপ্রায় ধমনীতে নবসঞ্জীবনীশক্তি সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, তাহার কার্য্য এখনও অনেকটা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আদর্শই হিন্দু ধর্ম্মের এবং হিন্দু জাতির পুনরুত্থান ঘটাইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রভৃতি কতকগুলা সমসাময়িক উপধর্ম্ম এই চিরসহনশীল হিন্দু ধর্ম্মের কোনরূপ হানি করিতে সমর্থ হইবে না—বরং এই ভোগমূলক ব্রাহ্মধর্ম্ম রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রণোদিত উদার-স্বভাব হিন্দু ধর্ম্মের আশ্রয়ে আসিয়া শান্তভাব ধারণ করিবে।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আদর্শ গ্রহণ করিতে হইলেই হিন্দুধর্ম্মকে বর্ত্তমান সঙ্কীর্ণ-প্রথা ত্যাগ করিয়া উদারস্বভাব হইতে হইবেই। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান ঘটিবে সেইদিন, যেদিন বৃদ্ধগণের সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামির মূলচ্ছেদ ঘটিবে, যেদিন আমাদের উদীয়মান যুবকগণ হিন্দুত্বের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের উদার আদর্শে স্ব স্ব জীবনকে উৎসর্গীকৃত করিবে। যে দিন হিন্দু আপন অধিকার

বুঝিয়া লইয়া যথার্থকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। যে দিন হিন্দু বুঝিবে "ভারত কর্ম্মভূমিস্তু অন্যেতু ভোগভূময়!" সেদিন হইতে আবার ভারতে ত্যাগের মন্ত্র জাগিয়া উঠিবে—সে দিন হইতে ভারতের অনৈক্য অবাধ্য হিন্দু সন্তান মন-প্রাণ এক করিয়া সনাতনী ধর্ম্মজননীকে অপরাপর উপধর্ম্মের হস্ত হইতে মেঘমুক্ত শশীর ন্যায় উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে।

তাই বলি, ভাই হিন্দু, তোমার স্বরূপ, তোমার অধিকার, তোমার প্রতিভা, তুমি কি ছিলে, কি হইয়াছ,তাহা একবার চিন্তা কর। তুমি আত্মবিস্মৃত হইয়া আর বৃথা কাল কাটাইও না। হে হিন্দু, তুমি যে এই ব্রহ্মাবর্ত্তের সন্তান, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ যে তোমার পূর্ব্বপুরুষ, তোমাদিগের চতুর্ব্বর্ণের ভিতর যে ব্রাহ্মণের শুদ্ধ সত্বগুণ ক্রম-বিকাশ প্রাপ্ত, তাহা একবার ধারণা কর। ভাব তুমি ক্ষুদ্র শূদ্র নহ, তুমি যে মোক্ষাভিলাষী মহা ব্রাহ্ম। The great pride of man in himself! তুমি যে নিজেকে ক্ষুদ্র শূদ্র করিয়াছ, আজ চতুর্ব্বর্ণ নির্ব্বিশেষে দাসের জাতি শূদ্র হইয়া পড়িয়াছ। স্বকর্ম্মজনিত এই গভীর দুর্দ্দশার জন্য অনুতাপ কর এবং বল ওই তেজস্বী বিবেকানন্দের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া—ভারতের আচণ্ডাল সমস্তকে ব্রাহ্মণ করিতে হইবে।

২৪-পরগণা বার্ত্তাবহের প্রখ্যাত লেখক বাবু অকিঞ্চন দাসের উপরোক্ত মত আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। আমি সেইজন্য পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত লোকের শিরে এই ঘোর দুর্দ্দিনের জীবন সংগ্রামের কশাঘাত অধিকতর তীব্রবেগে সদা পতিত হইতেছে।

বাঙ্গালা দেশের মধ্যবিত্ত ভদ্র সম্প্রদায়ের অবস্থা দিন দিনই শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইয়া দাঁড়াইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে নিত্য দুর্ভিক্ষের জ্বালায় দেশ যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা বস্তুতঃই এক মহা সমস্যাজনক হইয়া উঠিয়াছে। অহার্য্য বস্তু মাত্রই এক্ষণে মহার্ঘ। দুগ্ধ, ঘৃত, প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য দূরের কথা, আজ মধ্যবিত্ত ভদ্র বাঙ্গালীর পক্ষে উদর পূর্ণ করিয়া দুই বেলা অন্নাহার করাও কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থাদি জাতির মধ্যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সংখ্যাই বেশী। এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যে দিন দিনই একান্ত দুর্ব্বল ও অসার হইয়া পড়িতেছে, একথা অনেকেই মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছেন, কিন্তু কেহই প্রতিকারের পন্থা খুঁজিতেছেন না। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দুর্ব্বলতা ও অসারতা বৃদ্ধির সঙ্গে যে সমগ্র জাতি ও সমাজের অশেষ অকল্যাণ হইতেছে একথা আজ অনেকেই বিস্মৃত হইতেছেন। সমাজ সংস্কারগণ অন্যান্য নানা বিষয়ে গলাবাজি করিতেছেন, কিন্তু মধ্যবিত্ত ভদ্র সম্প্রদায়ের মহা শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করিয়াও আজ সকলেই তৎ প্রতীকারে উদাসীন—নিশ্চেষ্ট ও নীরব। বস্তুতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থার উন্নতি বিষয়ে এইরূপ উদাসীনতা, হিন্দু সমাজের পক্ষে যে বিশেষ অমঙ্গলকর,তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। দুর্ভিক্ষ আজ বঙ্গদেশের নিত্য সহচর। এই দুর্ভিক্ষে নিরুপায় হইয়াছে একমাত্র মধ্যবিত্ত ভ সম্প্রদায়। আহার্য্য দ্রব্যাদি সমস্তই দুর্মূল্য বলিয়া সকলেরই ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু তদনুপাতে আয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পায় নাই। এই নিমিত্ত সকলের আর্থিক

অবস্থাই অবচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সমাজে তিন সম্প্রদায়ের লোক বর্ত্তমান। এক ধনী বা জমিদার সম্প্রদায়, দ্বিতীয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, তৃতীয় শ্রমজীবী সম্প্রদায়। জমিদার বা ধনী সম্প্রদায়ের অবস্থা এক্ষণে পূর্ব্বের মত না থাকিলেও, এই দুর্ভিক্ষে তাহাদের তেমন কোন দুর্ভাবনার বিষয় নাই, শ্রমজীবি-সম্প্রদায়েরও নানারূপে আয়ের পথ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির দরুণ শ্রমজীবীগণের উপার্জ্জন বৃদ্ধি পাইয়াছি। সুতরাং দেশের বর্ত্তমান দারুণ দুর্ভিক্ষ শ্রমজীবীদিগকেও বিচলিত করিতে পারে নাই। উপায় নাই, কেবল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের। সামাজিক রীতিনীতি ও চালচলন বাঙ্গালী হিন্দুর এমন অস্থি মজ্জাগত হইয়াছে যে, সকল সম্প্রদায়ের লোক সকল শ্রেণীর পরিশ্রম করিয়া জীবিকার্জ্জনের সুবিধা করিয়া লইতে পারে না। তাহা করিলে সমাজে নিন্দা হয়। পূর্ব্বে প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি-ব্যবস্থা ছিল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্যও কতকগুলি বিধিব্যবস্থা ছিল। কিন্তু দেশ কালের পরিবর্ত্তনে সেই বিধিব্যবস্থায় আজ আর মধ্যবিত্ত ভদ্র সম্প্রদায়ের পেট ভরিতেছে না। কিন্তু পেটের জ্বালায় অহোরাত্র অস্থির থাকিয়াও আজ তাহারা প্রাচীন সংস্কার ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। সকল শ্রেণীর মধ্যবিত্ত ভদ্র সম্প্রদায় পরিশ্রম করিতে নারাজ। খাইতে না পাইয়া মরিয়া যাইবে, তথাপি হলকর্ষণ, মোট বহন অথবা মজুরীকরণে তাঁহারা স্বীকৃত হইবেন না। কেন না, উহাতে সমাজে তাহাদিগের স্থান নাই। হিন্দুশাস্ত্রে চাকুরীকে শ্ববৃত্তি অর্থাৎ কুক্কুরবৃত্তি দিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সেই চাকুরী বৃত্তির জন্য সকলেই লালায়িত। কিন্তু কৃষি ও বাণিজ্য প্রভৃতি স্বাধীন বৃত্তির দিকে কাহারও আগ্রহ নাই। চাকুরীই আজ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ জাতীয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একমাত্র জীবিকার্জ্জনের পন্থা হইয়াছে। কিন্তু সেই চাকুরীর বাজার সুলভ নহে। আর চাকুরীর পথও একমাত্র মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত নহে। আর একটী কথা এই যে, বর্ত্তমানে এই দুর্ভিক্ষের দিনে ব্যয়ের মাত্রা কাহারও নির্দ্দিষ্ট নহে—কিন্তু চাকুরীর আয় সর্ব্বত্রই সীমাবদ্ধ এবং নির্দ্দিষ্ট। দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাকুরীর আয় বৃদ্ধি পায় নাই। কাজেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় দিন দিনই নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে। এক্ষণে প্রতিকারের উপায় কি? আমাদিগের মতে ব্যবসা, বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যাবলম্বনই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা উন্নত করিবার উপায়। আর এই বিষয়ে আমরা বিশেষ ভাবে সমাজের নেতৃবৃন্দেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আমি দুইটী প্রবন্ধে আমাদের লুপ্ত গৌরব প্রাচীন আর্য্যজাতির স্বর্ণযুগের ব্যবহারিক (Economical) হাস্যমুখী ছবির প্রতিকৃতি এবং বর্ত্তমানযুগের হাহাকারধ্বনি-পূরিত তীব্র জীবন-সংগ্রামের সর্ব্বগ্রাসকারী ভীতিপ্রদর্শক মুখব্যাদানের আশাহীন মূর্ত্তি দেখাইয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে খাদ্যাভাবে ও নানাকারণে আমরা নির্জীব হইয়া এবং রোগগ্রস্ত হইয়া ক্রমশঃ ধরণী পৃষ্ঠ হইতে অন্তর্ধ্যান হইতেছি, তাহার প্রধান কারণ অবসাদ, জাতীয়তাহীনতা, ঈর্ষা, লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি বহু কথা কিছু কিছু আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমরা এই মরণোন্মুখ বাঙ্গালী কেন? এই প্রশ্নের সদুত্তর আমি

পূর্ব্বেই দিয়াছি। কিন্তু পুনশ্চ বলা কর্ত্তব্য যে খাদ্যাভাব, ধনহীনতা, সমাজে বিচ্ছিন্নতাই আমাদের এই জাতীয় হীনতার প্রধান কারণ। আমরা আদর্শ হারাইয়াছি,লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছি। সাঁচ্চা ছাড়িয়া মেকী লইয়া মজিয়াছি। তাই আমাদের এই দুর্দ্দিন উপস্থিত, তাই আমরা পদদলিত এবং নির্য্যাতিত। এ অবস্থা হইতে উদ্ধার ভগবৎকৃপা বিনা হওয়া দুষ্কর। কৃষি, বাণিজ্য, কলাবিদ্যাসমূহের পুনরুদ্ধার, গোপালন, গোউৎপাদন, পক্ষি-চাষ ও পক্ষি-ব্যবসা, এবং গব্যজাত পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রীর ব্যবসা দেশে বহুল প্রবর্ত্তন বিনা আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবন-সংগ্রামে উত্তীর্ণ হওয়া সুদূরপরাহত। এবিষয়ে আমাদের লাটসভার সদস্য মহোদয়গণ বঙ্গীয় এবং ভারতীয় সভায় এই সকল বিষয়ে প্রশ্ন সমাধান করিলে দেশের মহীয়সী হিত সাধিত হইতে পারে

পক্ষিচাষ আমাদের দেশের কুড়ে, বৃদ্ধ ও বালক,কৃষক-কন্যা ও পুত্রগণের জীবনোপায়ের পথ উন্মুক্ত করিবার এক প্রকৃষ্ট উপায়। সে সম্বন্ধে আমি বহু চেষ্টা করিয়াও দেশের লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিতেছি না। এবিষয়ে হিন্দু ও মুসলমান, এই উভয় সম্প্রদায়ের মনোযোগ প্রদান করা কর্ত্তব্য। কয়েক সপ্তাহ হইতে মোসলেম-হিতৈষী পত্রিকা পক্ষি-চাষ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া দেশের লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া আমি যার পর নাই প্রীত হইয়াছি এবং এদিকে গভর্ণমেণ্টের কৃপা দৃষ্টি পড়িলেই সোণায় সোহাগাযোগ উপস্থিত হয়। নিম্ন মুসলমান ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু অধিবাসী, যাহাদের অন্নরূপ জীবনোপায়ের পথ রুদ্ধ, তাহাদের জন্য গভর্ণমেণ্ট যদি মি G. C. Mookerji প্রভৃতির মত কৃতবিদ্য লোকগণের কর্তৃত্বে পুল্‌ট্রী ফার্ম্মিং ব্যবসা ও স্কুল শিক্ষা দিবার জন্য দেশের কৃষি কেন্দ্রের মধ্যে মধ্যে এবং কলিকাতা প্রভৃতি নগরের মত বড় বড় নগরে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা হইলে প্রকৃতই দেশের হিত হয় এবং দেশের হাহাকার রব ঘুচে। অধিকন্তু অশান্তির মাত্রাও বিশেষ প্রশমিত হয় বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। শাসকগণকে পরামর্শ দিবার এত লোক দেশে আছেন, যাঁহারা তগমা ও খেলাত পাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব, তাঁহারা এ দিকে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া সৎপরামর্শ দান করেন না কেন, তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিলাম না। পক্ষি ও গব্যজাত সামগ্রীর পাশ্চাত্য দেশে নয়ন-শুল্ক খুবই সামান্য, গোপালকদের সুবিধার জন্য ঐসকল দেশে বিধির দ্বারা বিশেষ ব্যবস্থা ব্যবস্থিত আছে। আমাদের এই বিশ্বাস, কৃষি প্রধান দেশে তাহার কিছুই নাই। সংবাদপত্রের স্তম্ভে এবিষয়ে আন্দোলিত হইলে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করিয়া দেশের মার্জ্জিত রুচি ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাহা একবার পাঠ পর্য্যন্ত করেন না !!! ব্যবস্থাপক সভায় এ বিষয়ে আন্দোলন করাত সুদূরপরাহত !! বিলাতের "এগ্রিফি বোর্ড" এবং আমাদের দেশের "কৃষি বিভাগের' কার্য্যকলাপে আকাশ ও পাতাল প্রভেদ !! ডেনমার্ক, এমেরিকা, বিলাত প্রভৃতি দেশে কৃষিডেয়ারি এবং পক্ষি-ব্যবসা বা ডিম্ব ব্যবসা কো-অপারেটিভ ভিত্তিতে পরিচালিত হয় বলিয়া দেশের কৃষকগণের গৃহে যথেষ্ট ধনাগম করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে কৃষি-সমিতি বা কৃষকের হিতকল্পে কোনরূপই সমিতি আদি নাই। আমাদের দেশের কোন ব্যবস্থাপক সভায় কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিও নাই, কিন্তু বিলাতে ঠিক বিপরীত বিধি বর্ত্তমান।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার

পৃথিবীর উৎপত্তি। (৪)

ভূপৃষ্ঠে খনিজ-সংস্থান।

আমাদের এই পৃথিবীর অন্যতর নাম বসুন্ধরা। অতি প্রাচীন কাল হইতেই মানুষ আত্মরক্ষার উপযোগী অস্ত্র-শস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া, তাহার ব্যবহার্য্য অনেক বস্তুই, ভূগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া আসিতেছে। মানব-সভ্যতার বর্ত্তমান যুগে ত' খনিজ ছাড়া আমাদের একপদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই।

এ অধ্যায়ে আমরা দেখিতে চাই, কিরূপে পৃথিবী-পৃষ্ঠে নানা জাতীয় খনিজ সমূহ একত্র হইল।

ধীরে ধীরে শীতল হইয়া ভূস্তর যখন জমাট বাঁধিয়া আসিল, তখন ত' আমরা দেখিয়াছি, তপ্ত শিলা-সলিল হইতে প্রথমে, লৌহ-ম্যাগনিসিয়াম্-সংশ্লিষ্ট শিলাসমূহ এবং পরে গ্রাণাইট্, শিলক প্রভৃতি পৃথক হইয়া পড়িল। এখন আমরা সংক্ষেপতঃ দেখিব, পৃথিবী-পৃষ্ঠের আদিম শিলা কি প্রকারে নানা রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া পরিশ্রুত হইয়া, বিধি খনিজ পদার্থে (Minerals) পরিণত হইল। আর কিরূপেই বা এই সকল খনিজ-সম্ভার পৃথক হইয়া ধরাবক্ষে স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত বা স্তরে স্তরে সজ্জিত হইল!

পৃথিবীর শিলারাজিকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে—মুখ্য (Primary) এবং গৌণ (Secondary rocks) তরল অবস্থা হইতে উত্তাপ বিকীরণ করতঃ জমিয়া যাহারা পৃথিবী-পৃষ্ঠে প্রথম অভ্যুদিত হইল, তাহারাই মুখ্যশিলা (Primary rocks) আর, পরবর্ত্তীকালে, এই সকল শিলা পরিবর্ত্তিত হইয়া, আবার যে সকল নবতর শিলার সৃষ্টি করিল, তাহারাই গৌণ-শিলা (Secondary rocks)।

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা মুখ্য-শিলা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি, বর্ত্তমানে আমরা গৌণ-শিলার উৎপত্তি ও বিন্যাস বুঝিবার চেষ্টা করিব।

মুখ্য-শিলা যখন ধরণী-পৃষ্ঠে অনাবৃত উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে, তখন তাহার উপরে জল, বাতাস এবং শীতাতপের কার্য্য অবাধে চলিতে থাকে।

বায়ুমধ্যস্থ অম্লজান ও অঙ্গারাম্লজান বাষ্প, নানা প্রকারে মুখ্য-শিলার বহিরংশে, রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা ক্ষয়-সাধন করিতে থাকে। মুখ্যশিলার গাত্র হইতে ক্ষয়জাত এই নবতর শিলাসমূহ, আবার, বেগবান বায়ু-প্রবাহে ভাসিয়া অথবা বৃষ্টিবারি-বিধৌত হইয়া, স্থানান্তরে স্তরে স্তরে সজ্জিত হইতে থাকে। এইরূপে মুখ্যশিলার বহির্ভাগ হইতে ক্রমশঃ অন্তরদেশ পর্য্যন্তও ধ্বসিত হইতে থাকে। ফলে—স্তর বিন্যস্ত (Stratified) গৌণ শিলারাজির সৃষ্টি হয়।

ঠিক এইরূপেই আমাদের ভারতের আদিম শিলাসমূহ ক্ষয়িত হইয়া মধ্যভারত ও রাজপুতানা প্রভৃতি প্রদেশে বিস্তীর্ণ বালুকা ও চূর্ণ প্রস্তর সমূহ (Lime and Sand-stones) উৎপন্ন হইয়াছে। মোগল বাদশাহগণ বিপুল অধ্যবসায় ও অর্থব্যয় করিয়া এই সকল প্রস্তর-সম্পদ উত্তোলন করত দুর্গ নির্ম্মাণ, মস্‌জিদ স্থাপন, সমাধি-মন্দির গঠন প্রভৃতি নানাবিধ স্থায়ী স্থাপত্য-শিল্পে এ দেশকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন।

বালুকাপ্রস্তর ও চূর্ণপ্রস্তরের ন্যায়

কর্দ্দম-প্রস্তরও (Clay) এক প্রকার গৌণ-শিলা। শিলক ও এলুমিনিয়ম্ বহুল জটিল শিলাসমূহ জল ও বাতাসের সংস্পর্শে থাকিলে, ইহাদের বহির্ভাগ ধীরে ধীরে রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে; আর এই ক্ষয়জাত নবতর শিলা, বর্ষণ-বিধৌত হইয়া কর্দ্দম আকারে (Clay, Shale etc) জলাশয় গর্ভে বিস্তীর্ণ হয়। কর্দ্দম আবার চাপগ্রস্ত হইয়া শ্লেটশিলায় (Slate) পরিণত হয়। গুরুতর চাপে আবার স্থানে স্থানে শ্লেটকে অভ্রতেও (Mica) পরিণত হইতে দেখা গিয়াছে। আমরা সচরাচর যাহাকে "চীনামাটী বলিয়া থাকি, তাহাও কর্দ্দম হইতে উৎপন্ন। রাজমহল পাহাড়ে এই জাতীয় কর্দ্দম প্রচুর বর্ত্তমান।

পাথুরিয়া কয়লা প্রভৃতিও গৌণশিলা। ইহারা অসীম ভূপৃষ্ঠের ক্ষয় হইতে উৎপন্ন হয় নাই, স্রোত-তাড়িত বৃক্ষকাণ্ডাদি যুগ-যুগান্তর ধরিয়া পলির নীচে ধীরে ধীরে কয়লায় পরিণত হয়। কাজেই, আমরা দেখিতেছি, খনিজকয়লা ভূপৃষ্ঠস্থ বৃক্ষাদির পরিবর্ত্তনের ফল। এবং এই অর্থেই ইহারা গৌণশিলা।

জীবদেহের পরিবর্ত্তনে শিলান্তরের উৎপত্তি কেবল পাথুরিয়া কয়লার দৃষ্টান্তেই আবদ্ধ নহে। প্রবাল দ্বীপের (Coral-reefs) নাম আমরা সকলেই শুনিয়াছি। ইহা আর কিছুই নহে,—একজাতীয় সামুদ্রিক কীটের কঙ্কাল-সমাবেশ মাত্র।

যাহা হউক, এ পর্য্যন্ত আমরা তাহা হইলে দেখিলাম,—অহরহ পৃথিবীবক্ষে নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। আর তাহারই ফলে পৃথিবীর শিলাসমূহ কি গঠনে, কি উপাদানে, নব নব ভাব ধারণ করিতেছে। এইরূপে পৃথিবীর আদিম অবস্থায়, যে সকল শিলা অত্যন্ত জটিল-রাসায়নিক উপাদান-সম্পন্ন ছিল, তাহাই কালক্রমে, ক্ষয়িত এবং বিশ্লিষ্ট হইয়া, মানবের ব্যবহার-উপযোগী নানাবিধ খনিজ প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে।

ভূপৃষ্ঠের ক্ষয় ও তাহার পূরণ।

আমাদের এই পৃথিবীর বুকের উপর জলের সহিত স্থলের একটা চিরন্তন সংগ্রাম চলিতেছে। নানা আকার ধরিয়া, নানাভাবে জল অহরহ পৃথিবীর স্থলভাগের ক্ষয় সাধন করিতেছে। আর ইহারই ফলে, ধীরে ধীরে পৃথিবীর স্থলভাগ অবনমিত হইতেছে; আর সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র-বক্ষ উন্নীত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত বাতাস এবং তাপও অবিশ্রান্ত ভূপৃষ্ঠের ক্ষয় সাধন করিতেছে। এই ক্ষয়জাত পদার্থও অবশেষে সমুদ্রগর্ভে সঞ্চিত হইতেছে।

কাজেই আমরা দেখিতেছি, পৃথিবীর জলভাগের পরিমাণ স্থলভাগ অপেক্ষা যেরূপ বেশী, তাহাতে অন্যকোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে, কালক্রমে আমাদের এই দৃশ্যমান ভূপৃষ্ঠ সমস্তই সমুদ্র গর্ভে বিলীন হইয়া যাইবে। আমাদের এই মহাদেশগুলি ত আর কিছুই নহে, বিপুল জলধিবক্ষে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটী দ্বীপমাত্র। এখন এই দ্বীপগুলি যদি ক্রমাগতই বারিবিধৌত হইয়া ক্ষরিত ও অবনমিত হইতে থাকে, তাহা-হইলে, ভবিষ্যতে সমুদ্র যে ইহাদিগকে ছাপিয়া ফেলিয়া আপনার কুক্ষিগত করিবে,—ইহাত সুনিশ্চিত।—বস্তুতঃ পৃথিবীর স্থানে স্থানে এরূপ প্লাবন দেখাও গিয়াছে।

কিন্তু ভূতত্ত্বের আলোচনায় বৈজ্ঞানিকগণ দেখাইয়াছেন, এই অবিরাম ক্ষয়ের ঔষধও

পৃথিবীতেই রহিয়াছে। একদিকে পৃথিবী-পৃষ্ঠ যেমন নিরন্তর ক্ষয়িত হইয়া সমভূমি হইয়া আসিতেছে; অপর দিকে আবার তেমনি, কখনও বা মৃদুকম্পনে, কখনও বা বিপুল আলোড়নে স্থানে স্থানে ভূপৃষ্ঠ স্ফীত, উন্নত হইয়া উঠিতেছে। ইহাদের ক্ষয়ে, ভূতল আবার নবমৃত্তিকার সঞ্চারে, সমুদ্রবক্ষ অপেক্ষা উচ্চতর হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার জললীন হইবার সম্ভাবনাও হইতেছে।

স্থানে স্থানে দেখা গিয়াছে যে, ভূপৃষ্ঠ ক্ষয়ের সহিত তাল রাখিয়া স্বতঃই ধীরে ধীরে নীরবে উন্নত হইতেছে। পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন, নরওয়ে,সুইডেন ঠিক এইরূপেই প্রাচীন যুগ হইতে এতাবৎকাল সমুদ্র-কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছে।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ আবার পৃথিবীর নানাস্থানের স্তর-পর্য্যায় বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পলি-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণতঃ সমুদ্রগর্ভও অবনমিত হইতে থাকে এবং এইরূপে অগভীর সমুদ্রগর্ভেও অত্যুচ্চ স্তর-পর্য্যায়ের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমাদের ভারতবর্ষেই বিদ্যমান। পৃথিবীর ইতিহাসের অতীব পুরাকাল হইতে মধ্যযুগের শেষভাগ পর্য্যন্তও উত্তর-ভারত বিশাল এক মহাসাগর-গর্ভে নিহিত ছিল। উত্তরে এসিয়া মহাদেশের কিয়দংশ, আর দক্ষিণে ভারত উপদ্বীপ স্ব স্ব দেহ ক্ষয় করিয়া সেই পুরাকাল হইতে এই মহাসাগর গর্ভে পলি যোগাইয়া আসিতেছিল। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ এই পলিস্তর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, স্থানে স্থানে ইহার উচ্চতা ১০ হাজার ফুটেরও অধিক। আর বিভিন্ন স্তরের পলির প্রকৃতি আলোচনা করিয়া ইহাও নিঃসংশয়িত রূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে এই স্তর সমূহ সকলেই প্রায় সমগভীর সমুদ্র গর্ভে গঠিত হইয়াছে। কাজেই, পণ্ডিতেরা বলেন, এক্ষেত্রে পলি সমাবেশের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র গর্ভও ধীরে ধীরে অবনত হইতেছিল। আমাদের বঙ্গদেশে গঙ্গার পলি পর্য্যবেক্ষণ দ্বারাও পণ্ডিতগণ পলিসঞ্চারের সঙ্গে নদী গর্ভের ক্রমাবনতি দেখাইয়াছেন।

যাহা হউক, এই ব্যাপারটীর ব্যাখ্যানে গিকী (Sir Archibald Geikie)-প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ বলেন—একদিকে যেমন উপরিবিন্যস্ত পলির চাপে তাহাদের তলদেশস্থ পৃথিবী তল ধীরে ধীরে অবনমিত হইতে থাকে, অপরদিকে আবার তেমনি উপরিভাগের ক্রমাগত ক্ষয়ে, এবং ক্ষয়জাত পদার্থের স্থানান্তরণে, সন্নিহিত প্রদেশ সমূহ চাপমুক্ত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে উন্নীত হয়। উন্নীত প্রদেশ ক্ষয়িত হইয়া আবার নবতর পলির সঞ্চার এবং তাহার চাপে আবার আধার ভূমির পুনরবনতির সূচনা হয়। এইরূপে উপরিতন চাপের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত তাল রাখিয়া যথাক্রমে, পলির জন্ম স্থানের উত্থান, ও সমাবেশ স্থানের অবনমন হইয়া থাকে; আর তাহারই ফলে, অগভীর জলাশয়-গর্ভেও অত্যুন্নত স্তর-সমাবেশ সম্ভব হয়।

সময়ে সময়ে গলিত ধাতু ও শিলা উদ্গীরণের দ্বারাও ভূপৃষ্ঠ উন্নত হয়। পৃথিবীতে দুই প্রকারের অগ্ন্যুৎপাৎ দেখা যায়। প্রথম—যাহাকে আমরা আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাৎ বলি। স্বল্প স্থানে আবদ্ধ বলিয়া ইহা হইতে উথিত গলিত শিলারাজি স্তূপাকারে পরিণত হইয়া কালে পর্ব্বতের সৃষ্টি করিয়া থাকে। দ্বিতীয় প্রকারের

অগ্ন্যুৎপাৎ স্বল্পায়তনে আবদ্ধ নহে, ইহাতে পৃথিবী-পৃষ্ঠে বহু সংখ্যক বিশাল ফাটল সৃষ্ট হয়, আর সেই সকল ফাটল-মুখে, ভূগর্ভ হইতে, গলিত শিলারাশি উত্থিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। আমাদের দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ও মধ্যভাগে সহস্র সহস্র যোজক ব্যাপিয়া এই প্রকৃতির আগ্নেয় শিলার সমাবেশ দৃষ্ট হয়।

যাহা হউক, তাহা হইলে আমরা দেখিলাম, অপ্, তেজঃ ও মরুতের স্বতন্ত্র ও সমবেত চেষ্টায় আমাদের ক্ষিতি অহরহই ক্ষয়িত হইতেছেন। কিন্তু, তাই বলিয়া, ভাবী মানবের বাসস্থানের জন্ত আমাদের বিশেষ চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই। পৃথিবী আবার নানা নৈসর্গিক উপায়ে থাকিয়া থাকিয়া এই ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতেছে।

ভূপৃষ্ঠে জল ও স্থলের অবস্থা বিপর্য্যয়।

পৃথিবীর পরিণতি অনুসরণ করিতে করিতে আমরা দেখিলাম, কিরূপে যুগ-যুগান্তরের আকর্ষণের ফলে ঘূর্ণায়মান উল্কা-সমূহ মিলিয়া একটী গ্রহে পর্য্যবসিত হইল; দেখিলাম, মিলনের তপ্ত আলিঙ্গনে কিরূপে শীতল উল্কারাজি গলিত এক বিশাল পিণ্ডে পরিণত হইল; কিরূপে সেই গলিত গোলকে আবার বাহ্য অভ্যন্তর ভেদে বিভিন্ন বস্তুর সন্নিবেশ হইল। তারপর দেখিলাম, কঠিন শিলাস্তৃত পৃথিবীর পৃষ্ঠ-দেশ কিরূপে আভ্যন্তরিন্ আকুঞ্চনের সহিত তাল রাখিয়া অসমতল হইতে লাগিল; এবং কিরূপে পৃথিবী পৃষ্ঠের জলভাগ ক্রমে নিম্নভূমিতে আশ্রয় লইয়া পৃথিবীতে প্রথম মহাসাগর ও মহাদেশের সৃজন করিল। এক্ষণে আমরা ক্রমশঃ এই মহাসাগর ও মহাদেশের অবস্থান বা সমাবেশ আলোচনা করিব।

পূর্ব্বতন অধ্যায়ে আমরা পৃথিবীর জল ও স্থলভাগের যে সংগ্রামের কথা বলিয়াছি, তাহার ফলে পৃথিবীর ইতিহাসে জল ও স্থলের সীমারেখা যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কখনও বা স্ফীত উচ্ছ্বসিত জলরাশি বেলা অতিক্রম করিয়া দেশ নিমজ্জিত করিয়াছে; আবার কখনও বা উন্নত স্থলভাগ অগ্রসর হইয়া জলরাশিকে দূরে অপসৃত করিয়া দিয়াছে ভূতত্ত্ব পণ্ডিতেরা ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইয়াছেন। আমাদের ভারতবর্ষের ভূতত্ত্বেও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

সুদূর অতীত যুগে ভারতের উত্তরাংশ যখন পর্ব্বতমালার পরিবর্ত্তে, পূর্ব্বপশ্চিম-প্রসারী নীলাম্বু-বলয় ভূষিত ছিল—তখনকার স্তর পর্য্যায় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই সমুদ্র কখনও বা রাজপুতনা, কচ্ছ প্রভৃতি প্লাবিত করিয়াছে, আবার কখনও বা বেলুচীস্তান, আফগানীস্তান প্রভৃতি দূরবর্ত্তী প্রদেশের সঙ্গে অপসৃত হইয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, জল ও স্থলভাগের এই যে যুদ্ধ,—উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পণ্ডিতগণ বিস্তর গবেষণা করিয়া ইহার একটা সীমানির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা একবাক্যে বলিয়াছিলেন যে, জল ও স্থলের এই সংগ্রাম, শুদ্ধ উভয়ের সীমান্ত প্রদেশ সমূহেই আবদ্ধ।—ইহার ফলে তটচুম্বী জলভাগ এবং সমুদ্র-লগ্ন-স্থান ভাগেরই অবস্থা বিপর্য্যয় হয়। তাঁহাদের মতে বিশাল সমুদ্রের মধ্যদেশ সমূহ এবং মহাদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থানসকল সৃষ্টির আদি হইতে অচঞ্চল অব-

স্থায়ই আছে। সুগভীর মহাসাগরের নিম্ন-শায়ী রসাতল কখনও উন্নীত হইয়া মহাদেশে পরিণত হয় নাই, কিংবা সুবিস্তৃত মহাদেশও কখনও নিমজ্জিত হইয়া অনন্ত প্রসারী মহাসাগরে পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

পণ্ডিতগণের এই অনুমান গভীর সাগরের তল সঞ্চিত পলি পর্য্যবেক্ষণের উপর স্থাপিত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে গভীর সমুদ্রের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণের একটা বিপুল প্রচেষ্টা গিয়াছে। ইংরাজ মার্কিন, জর্ম্মান প্রভৃতি বিজ্ঞান দীপ্ত জাতি সমূহের নিয়ন্ত্রিত Lightning, Porcupine, Challenger, Tuscarra, Blake, Gazelle প্রভৃতি নৌ অভিযান এই প্রচেষ্টারই ফল। এই সকল অভিযানে দেশবিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ, উপযুক্ত যন্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া, জাহাজে সাগর পরিভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষণ করত স্ব স্ব সিদ্ধান্ত সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের লিখিত বিবরণই মহাসাগর সমূহের প্রকৃতি অধ্যয়নের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত Challenger-Expeditionএর ফলে, ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ গভীর পলির সহিত পরিচিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, গভীর সমুদ্রে সঞ্চিত পলি তটভূমির সন্নিকটস্থ পলি হইতে সমূহ বিভিন্ন প্রকৃতির। এই পলি সাধারণতঃ উজ (Ooze) নামে পরিচিত। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জৈবদেহ, লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ-সংশ্লিষ্ট কর্দ্দম-কণিকা, আগ্নেয়গিরি-নিক্ষিপ্ত ভস্মকণা প্রভৃতির সহযোগে উজ গঠিত। সমুদ্রগর্ভে ইহারা অতি ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয়। ইহাদের সঞ্চার বেগ এতই মন্থর যে, বহুযুগের অতীত এবং বিলুপ্ত জলচর প্রাণীর দন্ত ও অস্থি সমূহ এখনও এই সকল পলির উপরিভাগে বিক্ষিপ্ত দেখা যায়।

যাহা হউক, গভীর সমুদ্র-জাত এই পলি তখনকার বৈজ্ঞানিকগণের নিকট এই অভিযানের পূর্ব্বপর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। আর তৎকালে, ভূপৃষ্ঠে, ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বহু স্তর-পর্য্যায় উদ্ঘাটিত ও আলোড়িত করিয়াছিলেন, কিন্তু কোথাও উজ জাতীয় পলির সন্ধান পান নাই। প্রধানতঃ ইহা হইতেই পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর এই দৃশ্যমান স্থলভাগ কখনও গভীর সমুদ্রের তলশায়ী হয় নাই। কারণ, তাহা যদি হইত, তবে আমরা ভূস্তরে উজ জাতীয় পলি মাঝে মাঝে পাইতাম। পণ্ডিতগণ তৎকালে দেখাইয়াছিলেন যে, পৃথিবীপৃষ্ঠে আবিষ্কৃত স্তর সমূহ সকলেই অগভীর বা তীরলগ্ন সমুদ্রের তলসঞ্চিত পলিরই সমাবেশ।

কিন্তু ভূতত্ত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অধুনা তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি ক্রমেই শিথিল হইতে শিথিলতর হইয়া আসিতেছে।

এখন আর স্থলভাগে উজ পলি অপ্রাপ্য নহে। বরবাডো, কিউবা, বোর্ণিয়ো এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের কতিপয় দ্বীপে এই পলি আবিষ্কৃত এবং আলোচিত হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে এক্ষণে পৃথিবীর ইতিহাসে মহাদেশ ও মহাসাগরের অবস্থা বিপর্য্যয় সম্ভবপর বলিয়াই স্বীকৃত হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত, পৃথিবীর অতীত এবং বর্ত্তমানের জীব-সমাবেশ পর্য্যালোচনা করিয়াও বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, পৃথিবী-পৃষ্ঠের জল ও স্থলের সমাবেশ যুগে যুগে পরিবর্ত্তনশীল।

পণ্ডিতেরা বলেন, সুদূর অতীতযুগে অষ্ট্রেলিয়া, ভারত-উপদ্বীপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা —ইহারা সকলে এক বিশাল মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্ত্তীকালে এই বিশাল ভূমিখণ্ড স্থানে স্থানে অবনত হইয়া ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের তলশায়ী হইয়াছে।

প্রাণি-সমাবেশ পর্য্যালোচনা করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ কিরূপে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—এখন আমরা তাহাই দেখিব।

পৃথিবীর মনুষ্যেতর প্রাণিবৃন্দের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহারা কখনও সমুদ্র অতিক্রম করিয়া দেশ দেশান্তরে গমনাগমন করে না। কি সরীসৃপ কি বিহঙ্গম, কেহই এ নিয়মের বহির্ভূত নহে। স্থলপথে কিন্তু এরূপ কোন বাঁধাবাঁধি নাই। সময়ে সময়ে স্থলচর প্রাণী খাদ্যের সন্ধানে, অথবা শত্রুকুল হইতে আত্মরক্ষার জন্য গিরি মরু অতিক্রম করিয়া বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন, এরূপও দেখা যায়।

প্রাণি-জগতের এই অভিজ্ঞতাটী খাটাইয়াই এক্ষণে বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর নানাস্থানের প্রাণি-বৈচিত্র্যের একটা সঙ্গত মীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, জীব সম্প্রদায়ের অভিযান ও উপনিবেশ স্থাপন সর্ব্বদাই সমুদ্রদ্বারা ব্যাহত হইয়াছে; এবং তাহার ফলেই সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন কূলে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর বিকাশ এবং প্রসার হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিকগণের উপযুক্ত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া একথা বলাও নিতান্ত অসঙ্গত নয় যে, যদি পৃথিবী-পৃষ্ঠে সমুদ্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন দুইটী স্থানে একই প্রকার জীব-সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে, সম্ভবতঃ পৃথিবীর ইতিহাসের কোনও এক সময়ে ঐ স্থানদ্বয় পরস্পরের সহিত সংলগ্ন ছিল। এবং তখনই উহাদের আদি পুরুষেরা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার জীব-সমাবেশ আলোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ ইহাদের মধ্যে সাধারণ এমন কতকগুলি জীব শ্রেণী দেখিতে পাইতেছেন, যাহা পৃথিবীর উত্তর খণ্ডে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এই সকল জীবের পূর্ব্বপুরুষগণ যদি উত্তর ভূভাগ প্রদক্ষিণ করত এই সমুদয় দক্ষিণস্থ মহাদেশে আসিত, তবে পথিমধ্যে তাহাদের বংশধর অথবা ধ্বংসাবশেষ নিশ্চয়ই দেখা যাইত;—কিন্তু তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। কাজেই, ইহাদের বিস্তারের ব্যাখ্যানের জন্য পৃথিবীর দক্ষিণাংশে আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া জড়াইয়া একটা বিশাল স্থলভাগের অস্তিত্বের অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

আবার পৃথিবীর উত্তরাংশের (ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, এসিয়া ও আফ্রিকার কিয়দংশ) জীব-সমাবেশ আলোচনা করিয়াও পণ্ডিতগণ এমন কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীর সন্ধান পাইয়াছেন, যাহাদের অস্তিত্ব দক্ষিণাংশে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

এইত গেল, বর্ত্তমান যুগের প্রাণী-জগতের সাক্ষ্য। ইহা ছাড়া অতীতকালের লুপ্ত ও সমাধিস্থ জীবদেহ দ্বারাও নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, আমেরিকা, আফ্রিকা দাক্ষিণাত্য, অষ্ট্রেলিয়া—ইহারা সকলে এককালে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া এক বিরাট মহাদেশ রচনা করিয়াছিল।

স্তর-মধ্যস্থ উদ্ভিদ্-অবশেষ পর্য্যালোচনা করিয়াও পণ্ডিতগণ দেখিয়াছেন যে, সুদূর অতীত যুগে দক্ষিণস্থ এই ভূভাগে একই

সময়ে একই প্রকার উদ্ভিদের বিকাশ হইয়াছিল; আবার তৎসময়ে উত্তর ভূখণ্ডেও সর্ব্বত্র অপর এক জাতীয় উদ্ভিদের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে, এই সকল স্তর-পর্য্যায়ের সমাবেশ কালে পৃথিবীর উত্তরে ও দক্ষিণে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে দুইটী বিশাল মহাদেশ বর্ত্তমান ছিল।

মধ্যভারতের প্রাচীন গণ্ড-রাজ্যের নামানুসারে ভূতত্ত্বে এই বিলুপ্ত মহাদেশকে গণ্ডভূমি (Gondwana Land) নাম দেওয়া হইয়াছে।

যাহা হউক, তাহা হইলে আমরা দেখিলাম, পৃথিবীতে জল ও স্থলের সমাবেশ পরিবর্ত্তনশীল। পৃথিবীর ইতিহাসে মহাদেশ ও মহাসাগরের নানাভাবে অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। পৃথিবীর মানচিত্র বহুপরিবর্ত্তন পরম্পরার মধ্যদিয়া তবে বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। শ্রীবরদাচরণ ঘোষ।

মাদাম ব্লাভাস্কির জীবন-কথা।

ভগ্নস্বাস্থ্যে য়ুরোপ-গমন।

গুরুকৃপায় ব্লাভাস্কি গতবারের পীড়ায় আসন্নমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইলেন সত্য, কিন্তু উহা ভগ্নগৃহের জীর্ণ সংস্কার মাত্র। পুনরায় তাঁহার অস্বাস্থ্যের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। সমুদ্র-বায়ু সেবনে উপকার হইতে পারে চিকিৎসক এইরূপ মত প্রদান করিলে, তিনি অনকষ্ট সহ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে য়ুরোপ যাত্রা করিলেন। তাহাজে অবস্থান কালে তিনি "আইসিস অন্‌ভিল্ড"(Isis unveiled) গ্রন্থ ফরাসিস্‌ভাষায় অনুবাদ করিতেছিলেন। তাঁহার য়ুরোপ যাত্রার সংবাদ পাইয়া লণ্ডন হইতে অনেক নিমন্ত্রণ-পত্র আসিতে লাগিল। লণ্ডনে যাইবার কল্পনা পূর্ব্বে তাঁহার ছিল না। তিনি উত্তরে এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন,--"তোমাদের সাদর আহ্বান পত্র গুলি পাইয়াছি। আমা, হেন অযোগ্য ব্যক্তিকে দেখিবার জন্য তোমাদের আগ্রহের এই প্রমাণ আমার চিত্ত স্পর্শ করিয়াছে। কিন্তু ইহা হইবার নয়। নিয়তির বিরুদ্ধে গিয়া কোন ফল নাই। সমুদ্রে যত দিন ছিলাম, ভাল ছিলাম। কিন্তু ভূমিতে পদার্পণ করিবামাত্র শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা অসুস্থ বোধ করিতেছি। মার্সেল্‌স্ (Marseilles) নগরে যে দিন নামিলাম, সেই দিন হইতেই শয্যাগত আছি। এখানকার গো-শুকরমাংস পূর্ণ প্রথম শ্রেণীর ইউরোপীয় হোটেলোত্থিত বাষ্প কি দুষ্কারজনক। তোমরা আমাকে লণ্ডনে যাইতে বল কেন? তোমাদের চির কুয়াসার মধ্যে, অত্যুন্নত সভ্যতার দুর্গন্ধময় বায়ুমণ্ডলে গিয়া আমি কি করিব, কি করিতে পারি? একটু ভাল হইলেই প্যারি (Paris) যাইবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু সেখানেও স্থির থাকিতে পারিব না। তোমাদের মত 'সভ্য' নরনারীদিগের কাছে আমার সঙ্গ কেমন লাগিবে? আমার এই কদাকার স্থূল দেহ লইয়া লণ্ডনে যাইবার মুহূর্ত্তমধ্যেই আমি তোমাদের অপ্রীতিকর হইব। দূর হইতেই বস্তু সুন্দর দেখায়। আমি উপস্থিত হইবা মাত্র তোমাদের কল্পনা-

চিত্রিত সৌন্দর্য্যের চিহ্ন মাত্রও অবশিষ্ট থাকিবে না। ইত্যাদি।"

ব্লাভাস্কি প্যারি নগরে আসিলেন। সেখানে তাঁহার স্বদেশীয় কয়েকজন আত্মীয়ের সহিত মিলন হইল। তন্মধ্যে তাহার ভগ্নী সুলেখিকা জেলিহোবাস্কিও ছিলেন। পাঁচ বৎসর পরে ভারত হইতে ব্লাভাস্কির আগমন সংবাদ পাইয়া রুসিয়া, জর্ম্মাণী, এমন কি, আমেরিকা হইতেও সমিতির বহু সভ্য তাঁহার দর্শনার্থ প্যারি নগরে উপস্থিত হইলেন। জেলিহোবাস্কি বলেন, এক্ষণ আর ব্লাভাস্কি ব্যক্তিমাত্রের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য অলৌকিক ক্রিয়া করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, বরং উহা ঘৃণা করিতেন। ইহাতে তাঁহার অনেক শক্তিক্ষয় হইত ফলে, নিজ শক্তি ব্যয় করিয়া কোন ক্রিয়া সম্পাদনের পর তাঁহাকে কয়েক দিন পর্য্যন্ত রোগ ভোগ করিতে হইত। তবে এমন ক্রিয়া হইত, যাহাতে তাঁহার নিজের শক্তিব্যয় আবশ্যক হইত না। এই সকল ক্রিয়ার বিবরণ এখানে অনাবশ্যক; কারণ আমরা পূর্ব্বে বহুতর দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছি, ব্লাভাস্কি যখন যেখানে থাকিতেন, তখনই সেই স্থানে অলৌকিক ব্যাপার, অতিপ্রাকৃত ঘটনার বিচিত্র সমাবেশ হইত। একান্ত প্রয়োজন স্থলে দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করিতে হইবে। বস্তুতঃ অলৌকিক ক্রিয়াপেক্ষা ব্লাভাস্কি সেই সময়ে আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান দর্শন লইয়াই অধিকতর ব্যাপৃত থাকিতেন।

৭ই এপ্রেল সন্ধ্যাবেলা সকলের অপ্রত্যাশিতভাবে ব্লাভাস্কি প্যারি হইতে একেবারে লণ্ডনে সমিতির অধিবেশন স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ যাত্রা এক সপ্তাহ পরেই তিনি প্যারিতে ফিরিয়া গেলেন। অলকট সমিতির কার্য্যোপলক্ষে পূর্ব্বেই লণ্ডনে আসিয়াছিলেন। এই কার্য্য সম্বন্ধে অলকট মহাত্মাগণের সারগর্ভ উপদেশপূর্ণ একখানা পত্র পাইয়াছিলেন। ১৮ই মে তিনি লণ্ডন হইতে প্যারি গমন পূর্ব্বক ব্লাভাস্কি ও অন্যান্য সভ্যগণকে যে পত্রখানা দেখাইলেন, তাহা প্রায় দেড়মাস পূর্ব্বে একদিন রেলগাড়ীতে ভ্রমণ কালে অনেক লোকের সাক্ষাতে হঠাৎ তাঁহার জানুর উপর পতিত হয়। পত্রখানা একটী অপূর্ব্ব চিনা খামের ভিতরে ছিল এবং জনৈক মহাত্মা লিখিত। আদিয়ারে যে ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতার সূচনা হইতেছে, সে বিষয়ে ঐ পত্র দ্বারা তাঁহাকে সতর্ক করা হইয়াছিল। ব্লাভাস্কি ইহার প্রতি তত মনযোগ দিলেন না। কিন্তু দুই মাস পরে পত্রোল্লিখিত বিবরণ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে তিনি বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন।

ব্লাভাস্কি ২৯শে জুন পুনরায় লণ্ডনে আসিলেন, এবং মাসাধিক কাল তথায় অবস্থান করিলেন। তাঁহার দর্শনার্থ অনিবার জনস্রোত তাঁহার গৃহাভিমুখে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সকলের জন্যই তাঁহার গৃহ উন্মুক্ত। লণ্ডনে যখন তিনি মিসেস্ অরুণ্ডেলের Mrs. Arundale) গৃহে ছিলেন, সেই সময়ে জুলাইমাসের এক অপরাহ্নে তথাকার কয়েকজন বিখ্যাত আচার্য্য (Professor Barret, Oliver. Lodge, Cones প্রভৃতি) ব্লাভাস্কিকে অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইবার জন্য জোর করিয়া ধরিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সম্মত হয়েন নাই। সেই স্থানে উপন্যাসলেখিকা Mrs Campbell Praed উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই অপরাহ্নের ঘটনা, আচার্য্যদিগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এবং ব্লাভাস্কির ক্রমাগত প্রত্যা-

খ্যান, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, এমন কি, ব্লাভাস্কির ভৃত্য বাবুলার গৃহপ্রবেশ পর্য্যন্ত, তৎকৃত Affinities নামক উপন্যাসে মনোহর ভাষায় চিত্রিত করিয়াছেন।

লণ্ডনে অবস্থানকালে উপরোক্ত অধ্যাপকগণ ব্যতীত স্থানীয় "মনস্তত্ত্বসন্ধিৎসু সভা"র আরও অনেক সুপ্রসিদ্ধ সভ্যের সহিত ব্লাভাস্কি ও অলকটের পরিচয় হয়। পরস্পর আদর আপ্যায়ন, ভোজ নিমন্ত্রণ যথেষ্ট হইয়াছিল। এই বন্ধুত্বের ফলে অলকট ইহাদের অলৌকিক ক্রিয়ানুসন্ধানের জন্য একটী 'কমিটি' আহ্বান করিবার, এবং তথায় স্বয়ং সাক্ষীরূপে উপস্থিত হইবার প্রস্তাবে সম্মত হয়েন। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, ইহা ব্লাভাস্কির অনুমোদিত ছিল না। কারণ দেখিতে পাই, অতঃপর কমিটি এই সাক্ষ্যকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ব্লাভাস্কির বিরুদ্ধে আক্রমণের যন্ত্ররূপে প্রযুক্ত করিলে, তিনি অলকটকে তীব্র ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। অহম্মন্য বৈজ্ঞানিকগণের নিকট আধ্যাত্মিক গূঢ় রহস্য ঘটিত ব্যক্তিগত ঘটনা ঐরূপে প্রকাশ করিয়া অলকট যে অপরাধ করিয়াছিলেন, ব্লাভাস্কি উহা ক্ষমার অযোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। সরলমতি অলকট অবশ্যই কমিটির ভবিষ্যৎ অভিসন্ধির বিষয়ে পূর্ব্বে কোন প্রকার সন্দেহ করেন নাই। অনেক প্রসিদ্ধব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল। ১১ই মে হইতে অলকটের সাক্ষ্য আরম্ভ হয়। অনুসন্ধানের বিষয় ছিল এইগুলি—"জীবিত মনুষ্যের ছায়ামূর্ত্তি, স্থূল শরীর হইতে সূক্ষ্ম শরীরের নির্গমন ও স্থূল বিকাশ, সূক্ষ্মশরীরে সংবাদ আদান-প্রদান, জীবিত মহাত্মাগণের দর্শনলাভ, গুরুভার জড়বস্তুর গমনাগমন, সূক্ষ্ম ঘণ্টাধ্বনি, অলৌকিক উপায়ে লিখিত পত্রাদিপ্রাপ্তি, আবরণবদ্ধ পত্র ডাকযোগে একস্থান হইতে অন্যস্থানে নীত হইবার সময় তদভ্যন্তরে মহাত্মাগণের লিখন," ইত্যাদি। এই সকল বিষয় সম্বন্ধে অলকট ও সমিতির অন্যান্য কতিপয় সভ্য মুক্তকণ্ঠে আপনাদের অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেবল সাধারণের উপকারের উদ্দেশ্যেই ইহারা আপনাদের অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়, এমন কি, যাহা যত্রতত্র লোক সমক্ষে বলা অবিধেয়, এরূপ ব্যক্তিগত ঘটনাও,—উক্ত কমিটির নিকট প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বন্ধুভাবে প্রদত্ত ইহাদের সাক্ষ্য যে পরে উক্ত কমিটী কর্ত্তৃক ইহাদিগেরই, প্রধানতঃ ব্লাভাস্কির বিরুদ্ধেই, ব্যবহৃত হইবে, ইহা ঘুণাক্ষরেও ইহারা জানিতেন না। উক্ত কমিটি ইহাঁদের এই সরল বন্ধুত্বের কিরূপ প্রতিদান করিয়াছিলেন, তাহা পর অধ্যায়ে বক্তব্য।

আগষ্ট মাসের প্রারম্ভে, ব্লাভাস্কি সমিতির কতিপয় সভ্য (শ্রীযুক্ত বার্টাম কিটলি, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, মিসেস অরুণ্ডেল ও তাঁহার কন্যা প্রভৃতি) সহ জর্ম্মাণির অন্তর্গত এলবারফেল্ড (Elberfeld) নামক স্থানে গমন করিলেন। তথায় তিনি গেভার্ড নামক জনৈক ভদ্রলোকের অতিথি হইলেন। জর্ম্মাণিতে পরাবিদ্যাসমিতির একটী শাখা স্থাপিত হইল, এবং অনেক খ্যাতনামা জর্ম্মাণ পণ্ডিত সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন।

এই সময়ে,—ব্লাভাস্কির অনুপস্থিতিকালে,—ভারতবর্ষে তাঁহার ও পরাবিদ্যা-সমিতির উচ্ছেদ-কল্পে এক ভয়ানক আয়োজন আরম্ভ হইতেছিল। এই ঘটনার সহিত মান্দ্রাজের খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণের

ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। ইহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

ব্লাভাস্কির গেভার্ডগৃহে অবস্থানকালে সংঘটিত দুই একটী অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ আবশ্যক। উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল। গেভার্ডের পুত্র রুডল্‌ফ গেভার্ড (Rudolf Gebherd) বর্ণিত ঘটনার মর্ম্ম এই :—

'যাদুবিদ্যায় আমার চিরদিন আগ্রহ। লণ্ডনে বাসকালীন বিখ্যাত ইন্দ্রজাল-বিদ্যা-বিশারদ প্রফেসর ফিল্ডের (Prof. Field) নিকট আমি শিক্ষা লাভ করি। তাঁহার শিক্ষাগুণে আমি অল্প সময় মধ্যে উক্ত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলাম। তদবধি আমি যেখানে গিয়াছি, সখ করিয়া সকলকে ভোজবাজি দেখাইয়াছি। তদুপলক্ষে প্রায় সমস্ত বিখ্যাত বাজীকরদিগের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে, এবং তাঁহাদের সহিত বিদ্যার বিনিময় করিয়াছি। প্রত্যেক যাদুকরই কোন একটি বিশেষ খেলায় অপর সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমি সেই বিশেষ বিশেষ খেলা গুলি সম্পূর্ণ আয়ত্ব করিবার জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত প্রত্যেকটী পর্য্যবেক্ষণ করিতাম। এই নিমিত্ত ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়ায় আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। কোন অলৌকিক ক্রিয়া আমার চক্ষুর সম্মুখে ঘটিলে উহার কৃত্রিমতা সম্বন্ধে আমি কোন মতামত প্রকাশ করিলে অন্যায় হইবে না।

"দুটী অলৌকিক ক্রিয়া আমাদের এলবারফেল্ডের বাটীতে ঘটে। মাদাম ব্লাভাস্কি, কর্ণেল অলকট এবং আরও কয়েকজন বন্ধু তখন আমাদের বাটীতে বাস করিতেছিলেন। প্রথমটী আমার পিতার নামে মহাত্মা কৌথুমী-প্রেরিত এক খানি চিঠি সংক্রান্ত। রাত্রি নয়টা। আমরা বৈঠকখানায় বসিয়া নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছি। হঠাৎ মাদাম ব্লাভাস্কির মনযোগ যেন গৃহ মধ্যে কোন একটা বিশেষ ব্যাপারে আকৃষ্ট হইল। কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, মহাত্মাদের আগমন হইয়াছে। যদি কাহারও কিছু দেখিবার ইচ্ছা থাকে ত সেইরূপ প্রার্থনা জানাইলে তাঁহারা বোধ হয় উহা পূরণ করিতে প্রস্তুত আছেন। কি প্রার্থনা করা যাইবে, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার পর স্থির হইল যে, আমার পিতা মনে মনে যে প্রশ্ন করিবেন, মহাত্মাগণ পত্র দ্বারা তাহাকে সে বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন। তখন আমেরিকা প্রবাসী আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতার জন্য পিতা বড়ই উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি সেই বিষয়েই (অবশ্য মনে মনে) মহাত্মাগণের উপদেশ প্রার্থী হইলেন। মাদাম ব্লাভাস্কি পীড়া নিবন্ধন একখানি সোফায় শুইয়া গৃহের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি হঠাৎ বলিলেন, পিয়নোর উপরিভাগে প্রাচীরে যেখানে তৈল চিত্রটী রহিয়াছে, সেইস্থানে যেন একটা কিছু হইতেছে, এবং একটা জ্যোতিরেখা উক্ত চিত্রটীরদিকে বিসর্পিত হইতেছে। গৃহস্থ অপর একজন মহিলাও ইহা দেখিতে পাইলেন। মাদাম ব্লাভাস্কি তাঁহাকে, কি হইতেছে ভালরূপে দেখিয়া বলিতে অনুরোধ করিলেন। উক্ত মহিলা বলিলেন চিত্রটীর উপরে যেন কি একটা বস্তু প্রস্তুত হইতেছে,—বস্তুটা কি, তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছেন না। উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি দেয়ালের দিকে স্তব্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলেন। কেহ কেহ আলোক দেখিতে পাইলেন। আমার সূক্ষ্ম-দর্শন ক্ষমতা নাই,

নূতন কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমরা এতক্ষণ বসিয়াছিলাম। কিন্তু আমি পরীক্ষার্থ দণ্ডায়মান হইলাম। পিয়নোটার উপর চড়িয়া প্রাচীর-গাত্র হইতে চিত্রটী সরাইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া উহার পশ্চাদ্ভাগে বিশেষরূপে দেখিলাম, কিন্তু কিছুই পাইলাম না। চিত্রটী পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া বলিলাম, আমি কিছুই দেখিতে পাইলাম না কিন্তু মাদাম ব্লাভাস্কি বলিলেন, নিশ্চয়ই কিছু আছে। আমি আবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। চিত্রটীর দুই ধারে গ্যাসের আলোক জ্বলিতেছিল। উহার নিম্নভাগ দেয়াল হইতে বিলগ্ন করিলে সকল দিক সুন্দররূপে আলোকিত হইল কিন্তু আমি কোন দ্রব্যের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলাম না। পুনঃরায় চিত্রটি ঠিক করিয়া রাখিয়া আমি মাদাম ব্লাভাস্কির দিকে চাহিয়া বলিলাম, আর কি কর্ত্তব্য আছে? তিনি বলিলেন, -ঐ ত একখানা পত্র রহিয়াছে! আমি তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম চিত্রটীর পশ্চাৎ দিক দিয়া একখানা পত্র পিয়নোর উপর পড়িল। আমি পত্র খানা কুড়াইয়া লইলাম। পত্র পিতার নামে ছিল, এবং উহা তাঁহার প্রার্থিত বিষয়ের উত্তর। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলাম। আমার ইন্দ্রজাল বিদ্যায় কুলাইল না দেখিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন। 'হাতের সাফাই' প্রভৃতি যত কিছু যাদু-কৌশল আমি জ্ঞাত আছি, কিছুতেই এ ব্যাপার বুঝিয়া উঠা যায় না। ইহা একটী সম্পূর্ণ অলৌকিক কাণ্ড বলিয়া আমার ধারণা। * * *

"পর দিন মাদাম ব্লাভাস্কি যখন নিজ প্রকোষ্ঠে একটী স্ত্রীলোকের সহিত কথা-বার্ত্তায় নিমগ্ন, আমি সেই সময় পূর্ব্বোক্ত বৈঠকখানা গৃহে গিয়া চুপি চুপি আর একবার স্থানটী পরীক্ষা করিয়া দেখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু কোন লোক যে চিঠিখানা চিত্রের পশ্চাতে রাখিয়া আসিতে পারে, এ বিশ্বাসের কোনই হেতু পাইলাম না অপরাহ্নে যখন আমরা সকলে একত্রিত হইলাম, তখন মাদাম ব্লাভাস্কি আমাকে বলিলেন,—'অদ্য মহাত্মাগণ তোমার পরীক্ষাকাণ্ড দেখিয়া ভারি আনন্দিত হইয়াছেন। গোপনে কেহ চিঠি লুকাইয়া রাখিয়া আসিতে পারে কিনা, তাহাই তুমি পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলে,—নয়?' আমি নিশ্চিত বলিতেছি, আমি যখন বৈঠকখানায় উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত, তখন তথায় কেহই ছিল না, আমার এই কার্য্যের কোন কথাও আমি বাটীর কাহাকে বলি নাই। সূক্ষ্ম দর্শন ক্ষমতা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে মাদামের ইহা জানিবার সম্ভাবনা ছিল না।"

কিছুদিন পরে যখন কুচক্রীগণ মাদামের বিরুদ্ধে নানা অপবাদ প্রচার করিতে লাগিল, তখন এই পত্রের কথাও উঠিয়াছিল। তাহারা বলিল ঐ সকল পত্র ব্লাভাস্কির নিজ হস্ত-লিখিত, এবং তাঁহার প্রতারণার সাহায্যকারী কোন ব্যক্তি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিক্ষিপ্ত বা স্থাপিত হইত। ইহার প্রমাণার্থ তাহারা কোন কোন হস্তলিপি পরীক্ষকের সাক্ষ্য উপস্থাপিত করিয়াছিল। রুডলফ গেভার্ড এ বিষয়েও নিঃসন্দিগ্ধ হইবার জন্য মহাত্মা-প্রেরিত এই পত্র এবং মাদাম ব্লাভাস্কির স্বহস্ত-লিখিত একখানা সুদীর্ঘ পত্র পরীক্ষার্থ জর্ম্মাণির রাজকীয় লিপি-পরীক্ষকের নিকট প্রেরণ করেন। এই সুবিখ্যাত লিপি-পরীক্ষক

পত্রদ্বয় পরীক্ষান্তে মিঃ গেভার্ডকে জানাইলেন,—

"আমি লিপিগুলি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া আপনাকে নিশ্চয় সহকারে জানাইতেছি যে, আপনি যদি উভয় পত্র একই ব্যক্তির হস্ত লিখিত মনে করেন, তাহা হইলে আপনি যারপরনাই ভ্রান্ত হইয়াছেন। ইহা আমি শপথ পূর্ব্বক বলিতেছি। (৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬ খ্রীঃ)।"

কুচক্রীগণের উপস্থাপিত সাক্ষ্য কতদূর বিশ্বাসযোগ্য ও এইরূপ তুচ্ছ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কোন ব্যক্তির চরিত্রের উপর আক্রমণ করা কতদূর ন্যায়সঙ্গত তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

ব্লাভাস্কির বিরুদ্ধবাদীরা বলিয়াছেন, তাঁহার প্রতারণার সাহায্যকারী কতকগুলি লোক ছিল। এ কল্পনাটী আরও চমৎকার, এবং ইহার পরিধি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ব্লাভাস্কি যখন পীড়িত হইয়া দার্জ্জিলিং অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন রামস্বামীয়ার নামক একজন পদস্থ ভদ্রলোক তাঁহার সঙ্গলাভার্থ বহির্গত হইয়া কিরূপে বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন, তাহা ইতঃপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। রাম স্বামীয়ার ব্লাভাস্কির কয়েক দিন পরে দার্জ্জিলিঙ্গে উপস্থিত হইয়া পরে বহুদূর অগ্রসর হইয়া সিকিম প্রান্তে গিয়া তাঁহার গুরুর দর্শনলাভ করেন। তিনি গুরুর দর্শনলাভে চরিতার্থ হইয়া আনন্দোচ্ছ্বাসে এই ঘটনার বিবরণ উজ্জ্বল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। * বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, রামস্বামীয়ার গুরু সেই মহাত্মা আর কেহই নহেন, ব্লাভাস্কির একজন গুপ্তচর মাত্র। যেন লোককে ভুলাইবার জন্য ব্লাভাস্কির বেতনভোগী গুপ্তচরগণ পৃথিবীর নানাস্থানে,—এমন কি, অরণ্যে, পর্ব্বতে, মরুভূমিতে পর্য্যন্ত, ঘুরিয়া বেড়াইত! আর ইহাই বিরুদ্ধবাদীরা জগৎবাসীকে বিশ্বাস করাইতে চাহেন! চমৎকারিত্বে এই 'গুপ্তচর' মতটি খুবই অপরাজেয় বলিতে হইবে!!

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ

বেদান্ত-দর্শন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

চেতন ব্রহ্মকে এই জড়জগতের উৎপত্তির কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে যে সকল দোষ সম্ভবে, সেই সকল দোষের উল্লেখ করিয়া, সে গুলির খণ্ডন করা হইয়াছে। এই বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা আর একটী গুরুতর দোষের উল্লেখ করিতেছি।

ঈশ্বরকে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিতে গেলে, তাঁহাকে নিষ্ঠুর এবং পক্ষপাতী—এই দুইটীই বলিতে হয়। পক্ষপাত ও নিষ্ঠুরতার হস্ত হইতে তিনি উদ্ধার পাইতে পারিবেন না। এই সংসারে আমরা চারিদিকে কি দেখিতে পাই? যেদিকেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে, সেই দিকেই আমরা দুঃখের হাহারব, যন্ত্রণা ও রোগাদির আর্ত্তনাদ শুনিতে পাই। এই দুঃখ ও যাতনার মধ্যেও আবার তারতম্য লক্ষিত হয়। কেহ বা জন্মাবধি সুখ ও স্বচ্ছন্দতার মধ্যে লালিত

* "Five years of Theosophy" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পালিত হইয়া, সারা জীবন সুখের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া মহানন্দে কাল যাপন করিতেছে। ইহারা স্বর্গসুখকেও তুচ্ছ বোধ করিতেছে। কেহ বা দুঃখ-দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে পরিপীড়িত হইয়া সমগ্র জীবন দীর্ঘশ্বাসের উত্তপ্ত বহ্নিতে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। জীবের অবস্থাগত এই মহৎ তারতম্য সর্ব্বদাই আমরা দেখিতে পাইতেছি। পশু ও মনুষ্যেও কি তারতম্য কম ? ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি ও সুখের ভোগ যদি ধরা যায়, তাহা হইলে, মানুষ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি দ্বারা যেরূপ সুখ অনুভব করিয়া থাকে পশুর ঐন্দ্রিয়িক ভোগে সুখের মাত্রা তদপেক্ষা কত কম ? কেন এই সুখ দুঃখের তারতম্য ? মনে হয় যেন ঈশ্বর, বিদ্বেষ-বুদ্ধি দ্বারা প্রেরিত হইয়াই কতকগুলি জীবের পক্ষে দুঃখ ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন ? আর কতকগুলি জীবকে ভালবাসিয়া, উহাদিগের প্রতি সুখলাভের বিধান করিয়াছেন ? অথচ, কেন তাঁহার এই অকারণ ভালবাসা এবং অহৈতুক বিদ্বেষ,—ইহা বুঝিতে পারা যায় না। অথচ, শ্রুতিতে ঈশ্বরকে নিতান্ত নির্ম্মল স্বভাব এবং রাগ-দ্বেষ-বর্জ্জিত বলিয়াই ত বর্ণনা করা হইয়াছে। যিনি কতকগুলি প্রাণীর অদৃষ্টে কেবল হাহাকারেরই ব্যবস্থা করিয়া সংসারে প্রেরণ করিলেন, তাঁহাকে অতি ক্রূর ও দারুণ নিষ্ঠুর না বলিব কেন ? আকস্মিক ভূমিকম্পের প্রকোপে ও আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতে, হঠাৎ কত হাস্যমুখর জনপদ অতর্কিতভাবে, একই সময়ে, ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যাইতেছে, ঈশ্বরের ব্যবস্থা দেখিয়া, কেহ কি তাঁহাকে নির্ম্মল-স্বভাব বলিয়া মনে করিতে পারে ? এই যে আকাশমণ্ডলে, দুইটা বড় বড় গ্রহ, আকর্ষণের প্রভাবে অতিবেগে একটী অপরটীর উপরে পড়িয়া গিয়া, দুইটী গ্রহই যুগপৎ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া গেল, এবং উহাতে ঐ সকল গ্রহের মধ্যগত কত কত জীব জন্তু একই সময়ে বিধ্বস্ত হইয়া গেল,—ইহা কি ঈশ্বরের অতি বড় ক্রূরতা ও রোমাঞ্চজনক নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতেছে না ? ইহাতে কি তাঁহার ভীষণ পক্ষপাতিতা প্রকটিত হইতেছে না ? এমন জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিধানকর্ত্তা যদি ঈশ্বরকে বলিতে হয়, তাহা হইলে, তাঁহার পক্ষে ক্রূরতা ও পক্ষপাতিতার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া কখনই ত সম্ভব হইবে না !!

এই যে সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত হইল, ইহারও সুন্দর মীমাংসা আছে। এখন আমরা সেই মীমাংসার কথা বলিব।

তিনি বিনা কারণে, পক্ষপাত করিয়া যে নিষ্ঠুর হইয়াছেন এবং সেই পক্ষপাত ও নিষ্ঠুরতার ফলেই যে তিনি কতকগুলি জীবকে দুঃখী ও কতকগুলি জীবকে সুখী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা নহে। বিনা কারণে জীবের অদৃষ্টে এ ব্যবস্থা হয় নাই, জানিবে। এইরূপ ব্যবস্থার জন্য ঈশ্বরকে দায়ী করিতে পার না। জীবই ইহার জন্য দায়ী। প্রাণীদিগের স্বকৃত কর্ম্মই এই নিষ্ঠুরতা ও পক্ষপাতিতামূলক ব্যবস্থার একমাত্র কারণ। যে প্রাণী যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, সেই প্রাণী সেইরূপই ফলভোগ করিবে। ইহাতে ঈশ্বরের পক্ষপাত কোথায় ? তুমি নিতান্ত অন্যায় করিয়া, তোমার আত্মীয়কে বঞ্চনা করিয়া, তাহার সম্পত্তিটী নিজে ভোগ করিতে পারিবে আশা করিয়া, তাহার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া,

তাহাকে 'পথের কাঙ্গাল' করিয়াছিলে; এমন কি, তুমি সেই আত্মীয়ের মাথায় লাঠি মারিতেও কুণ্ঠিত হইলে না; তোমার এই দারুণ দুষ্কর্ম্মের ফলে যদি তুমি সারাজীবন দুঃখ ও হাহাকারের নিষ্ঠুর কষাঘাত লাভ করিতে থাক, তবে এই দুঃখের জন্য তুমি দায়ী করিতে চাও কাহাকে? তোমার স্বকৃত ঐ দুষ্কর্ম্মইত এই দুঃখলাভের মূল! জীবের স্বকৃত দুষ্কর্ম্ম ও সুকর্ম্মের ফলে যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সঞ্চিত হয়, জীবের এই ধর্ম্মাধর্ম্মই, সৃষ্টির বৈষম্যের একমাত্র হেতু। এই ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতেই জীব ফলভোগ করিয়া থাকে। ঈশ্বর এই ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুযায়ী, জীবের ফলভোগের ব্যবস্থা করেন। একটী ক্ষেত্রে ব্রীহী, যব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শস্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বীজ রোপণ করা হইল। এই ক্ষেত্রের উপরে যদি ক্রমাগত তীক্ষ্ম সূর্য্যকিরণ পড়িতে থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল বীজ শুষ্ক হইয়া যাইবে। সুতরাং বৃষ্টিধারার বর্ষণ ঐক্ষেত্রে পতিত হওয়া আবশ্যক। বৃষ্টিধারা পাইয়া ঐ ক্ষেত্র সরস হইলে, ঐ সকল বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মিতে থাকিবে। যে বীজটী যে জাতীয়, সেই বীজ হইতে সেই জাতীয় অঙ্কুরই জন্মিবে। এখানে এই যে অঙ্কুরগুলিতে বৈষম্য দেখা যাইতেছে, স্ব স্ব বীজগত সামর্থ্যই এই বৈষম্যের কারণ নহে কি? ব্রীহীর বীজ হইতে ব্রীহীই জন্মিয়াছে, যব জন্মে নাই; আবার যবের বীজ হইতে যবই উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রীহী উৎপন্ন হয় নাই। এই যে জাতিগত বৈষম্য বা পার্থক্য, ইহার মূলে স্ব স্ব বীজগতশক্তিই নিহিত আছে। অতএব বীজগত শক্তিই এই বৈষম্যের কারণ। মেঘ হইতে পতিত বৃষ্টিকে এই বৈষম্যের সাধারণ কারণ বলিতে পার। কেননা, গোড়ায় বৃষ্টি না হইলে, কোন বীজই অঙ্কুরিত হইতে পারিত না। এই দৃষ্টান্তটীর সাহায্যে আমরা সুখ দুঃখ ভোগের তারতম্যটীও সহজে বুঝিতে পারিব। জীবগত কর্ম্মই, জীবদিগের সুখদুঃখাদি বৈষম্যের কারণ। ঈশ্বর সাধারণ কারণ মাত্র। যে জীব যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, সে জীব সেইরূপ সুখ বা দুঃখভোগ করিতেছে। কেহ যে আজন্ম দুঃখভোগ করিতেছে, দুঃখী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে,—ইহার কারণ উহার নিজকৃত কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। কেহ যে সুখের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কর্ম্মই তাহার কারণ। ঈশ্বর, এই কর্ম্মানুযায়ী, দুঃখ ও সুখের বিধানকর্ত্তা মাত্র। জীব যে প্রকৃতি লইয়া জন্মিয়া থাকে, ঐ প্রকৃতিতেই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের সংস্কার নিহিত থাকে। সেই সংস্কার থাকে বলিয়াই তদনুরূপ প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়; সেই প্রবৃত্তি বশতঃই পুনরায় কর্ম্ম করিতে থাকে। অতএব, জীবের প্রকৃতি বা স্বভাব (Tendency or Impulse) উহার নিজকৃত। নিজে যে প্রকার প্রকৃতির গঠন করিয়াছে, সেই প্রকার প্রকৃতি লইয়াই জীব জন্মগ্রহণ করে। তদনুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। অতএব, ঈশ্বরকে তজ্জন্য দায়ী করিতে পারা যায় না।

কিন্তু এস্থলে, আর একটী প্রশ্ন আসিয়া পড়িতেছে। সৃষ্টির পূর্ব্বেত কাহারই বিভাগ হইয়াছিল না। শ্রুতি বলিয়া দিতেছেন যে, "সৃষ্টির প্রাক্কালে, কেবল এক, অদ্বিতীয় সৎবস্তুই ছিলেন, অপর কিছু ছিল না"। সুতরাং তখন, জীবই বা কোথায়? আর তৎকৃত কর্ম্মই বা কোথায়? সৃষ্টির পরবর্ত্তী কালেই ত, সেই সৎ-বস্তু হইতে কর্ম্ম ও জীবগুলি বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। যদি জীবের

সুখ দুঃখাদি বৈচিত্র্যের মূলে, কর্ম্ম-বৈচিত্র্য-কেই স্বীকার করা যায়; তাহা হইলে তখন ত সেই কর্ম্ম-বৈচিত্র্য ছিল না। তবে কেমন করিয়া ঈশ্বর, কর্ম্ম-বৈচিত্র্য অনুসারে নানা ভাবে এই জীবগুলিকে সৃষ্টি করিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর কি?

আমরা এই প্রশ্নের উত্তরে, এ সংসার অনাদি,—এই উত্তর প্রদান করি। সংসারের আদি নাই। সৃষ্টির আবার আদি-কাল কোথায়? সৃষ্টি যে কখন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? সৃষ্টির প্রথম নাই; সুতরাং জীবেরও প্রথম নাই। অনাদিকাল হইতে এই সংসার চলিয়া আসিতেছে—এই সৃষ্টি-প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। সংসারের ও সৃষ্টিপ্রবাহের যদি একটা প্রথম কাল স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে দুইটী দোষ হয়। হঠাৎ কোথাও কিছু নাই, একদিন বিনা কারণে অকস্মাৎ জীব সৃষ্টি আরম্ভ হইল,—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে, যাহারা জীবন্মুক্ত হইয়া গিয়াছেন, একরূপ জীবও ত পুনরায় উৎপন্ন হইতে পারেন! তাহাদের উৎপত্তিতেই বা বাঁধা কোথায়? আর, তাহা হইলে, কেহই কোন কর্ম্ম করিল না, কিন্তু হঠাৎ একটা সময়ে সকলে সুখদুঃখাদি ফলভোগ করিতে আরম্ভ করিল, ইহাও ত স্বীকার করিতে হয়!! আবার,—এই যে সংসারে সুখদুঃখাদির তারতম্য ও বিচিত্রতা,—এই বৈষম্যেরও কোন হেতু থাকে না। অতএব, সংসারকে অনাদি বলাই যুক্তিসঙ্গত হইতেছে।

অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারিতেছি। রাগ-দ্বেষের সংস্কার হইতে কর্ম্ম-প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। সুখকর বস্তুর প্রতি অনুরাগ এবং দুঃখজনক পদার্থের প্রতি বিদ্বেষ হইতেই জীব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। অবিদ্যা বা মায়াশক্তিতে এই সকল রাগ-দ্বেষের সংস্কার বা অন্তর্নিহিত থাকে। এই অবিদ্যা হইতেই সংসারের বিকাশ। এই অবিদ্যাবশতঃই জীবের স্ব স্ব স্বভাব গঠিত হয় এবং তজ্জন্যই জীবের সুখদুঃখাদি বৈচিত্র্য দেখা দেয়। অতএব, এই অবিদ্যাসহকৃত ঈশ্বর, অনাদিকাল হইতে জগৎসৃষ্টিতে নিযুক্ত রহিয়াছেন। সুতরাং, ব্রহ্মচৈতন্য এই মায়া শক্তিদ্বারাই জীবের দেহ গঠিত করিয়া তুলিয়াছেন। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়া দিয়াছেন যে, -'আমি জীবরূপে প্রবিষ্ট হইয়া বহু হইব; নামরূপে বিভাগ করিব ইত্যাদি' ইহা সংসারের ও জীবদেহের অনাদিত্বেরই প্রমাণ। সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই 'জীব' না থাকিলে,—সৃষ্টির সময়ে কিরূপে "জীবরূপে প্রবিষ্ট হইব" একরূপ উক্তি সম্ভব হয়? অতএব এ সংসারে অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত রহিয়াছে।

তবেই আমরা দেখিতেছি যে, ব্রহ্ম-চৈতন্যকে এই জড় জগতের কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করায় কোন আপত্তিই দাঁড়াইতে পারিতেছে না।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, এম্-এ।

ভক্তিবাদ ও নামসঙ্কীর্ত্তন।*

চিত্তবৃত্তিভেদে মানবের রুচি বহুবিধ, শক্তিভেদে মানবের কার্য্য অনেকরূপ। শাস্ত্রের অধিকারভেদ এই রুচি ও শক্তিভেদের উপর দণ্ডায়মান। কাল ও দেশ ভেদেও পদ্ধতির তারতম্য কেহ সার্ব্বভৌম চৈতন্য অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক, কেহ সগুণ সাকার পরমেশ্বরাধনার অভিলাষী, কেহ অবতার রূপী শ্রীভগবানের শক্তিমান,কেহ বা দেবমূর্ত্তির পূজক। একেবারে কারণ জ্ঞানের অনুশীলনই কাহাদের অভিপ্রেত কাহাদের বা কার্য্যের মধ্যদিয়া কারণে পৌঁছানই লক্ষ্য। কাহারা মূর্ত্তি গড়িয়া তাহাকে তাহার সেবা করিয়া শ্রীভগবৎ রসাস্বাদন করেন, কাহারা শব্দ লক্ষ্যে চিন্তাশক্তি লইয়া তাদাত্ম্যসুখ অনুভব করেন, কাহারা নাম গাহিয়া চক্ষুর জলে বক্ষ ভাসাইয়া করুণ ক্রন্দনে পরমপিতার স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা পান। সুললিত সংস্কৃত স্তোত্রপাঠে, সুরলয় সমন্বিত সঙ্গীত তানে, স্বহৃদয়োত্থিত ভাবময়ী প্রার্থনায় হৃদয়ে ভক্তিভাব ফুটাইতেই অনেকেই ভালবাসেন।

জ্ঞান ও ভক্তি, এই দুইটী প্রধান পথ। অন্তর্ভূতই হউক আর পৃথকই হউক, আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপায়ও বিদ্যমান, যথা ধ্যান, যোগ, কর্ম্মানুষ্ঠান, কীর্ত্তন ইত্যাদি। যাহার যেটী উপযোগী,তিনি সেইটীই লইবেন, যেটী যাঁহার ভাললাগে, তিনিই সেইটী গ্রহণ করিবেন। বংশানুক্রমে গুরুজনাদেশে যাহা চলিয়া আইসে, সেইটী অবলম্বন করিবার চেষ্টা করাও ভাল, আর তাহাতেই চিত্তটী যাহাতে শ্রদ্ধাবান্ থাকে, তাহার উপায় করাই সর্ব্বাগ্রে উচিৎ।

যাঁহাদের চিত্ত সংশয় দোলায় দোদুল্যমান, নাস্তিকতার প্রবল তরঙ্গে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল, তর্কজনিকা চিন্তা যাহাদের অস্থিঃমজ্জায় বিদ্যমান, তাঁহাদের জ্ঞানপথ অনুশীলন ব্যতীত উপায় নাই। সংশয়ই জিজ্ঞাসার উৎপাদক, আর সেই জিজ্ঞাসা জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারাই চরিতার্থ করা আবশ্যক। জ্ঞানচর্চ্চা ব্যতিরিকে নাস্তিকতা প্রায়শঃ দূর হয় না। আপনার বুদ্ধিবল অনেকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া মনে করেন, সেই বুদ্ধিবল পরীক্ষা না হইলে কেহই ভ্রান্তি দেখিতে পায় না, পরিদৃশ্যমান্ সত্যের সেবা করিবার জন্য প্রবৃত্তও হন না। জড় ও চৈতন্য কি, তাহায় স্বরূপ ও বিকাশ কিরূপ,পরিদৃশ্যমান বিশ্বের গতি স্থিতি ও পরিণামই বা কি, মানবের মৃত্যুর পর পরিণতি কোথায়, এই সকল প্রশ্ন অনেকেরই মনে সমুদিত হয়। তাঁহাদের জন্যই দর্শন শাস্ত্র, তাঁহাদের জন্যই জ্ঞানপথ। চিন্তাশীল রাসায়নিক বৈজ্ঞানিক, নাস্তিক ও সন্দেহাকুল ব্যক্তিরা জ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা ক্রমে সত্য সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হন। শ্রদ্ধা যাহাদের নাই তাঁহাদিগকে তর্কদ্বারা আয়ত্তীকৃত না করিতে পারিলে কখনই তাঁহারা আধ্যাত্মিক সত্য অনুসন্ধানে মন দিবেন না। বিশ্বের গতি, স্থিতি ও পরিণতি বিষয়ে চিন্তাধারা লইয়া যাইতে যাঁহারা ইচ্ছুক, ইহা ব্রহ্ম নহে, উহা ব্রহ্ম নহে, বিশ্বের যাবতীয় পদার্থই ব্রহ্ম নহে—এইরূপ ধারণায় যাহারা আকাঙ্ক্ষী, একমাত্র কারণ জ্ঞান হইলে পৃথক্ করিয়া আর কার্য্যজ্ঞানের আবশ্যক

* কাঁচড়াপাড়া "হরিসাধন-সমিতিতে" প্রদত্ত বক্তৃতা অবলম্বনে লিখিত।

করেন না—ইহাতে যাহারা বিশ্বাসী তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞানপথ ভিন্ন অন্যপথ গ্রহণ সংকল্প নহে।

আমরা কি, তাহা জানি না। আমরা ভক্তি পথের পক্ষপাতী, ভক্তিপথই সহজ বলিয়া আমরা জানি। শ্রদ্ধা বিশ্বাস তাদৃশ না থাকিলেও নাই বলিয়া মনে করি না। আমরা সমস্বরে ভক্তিবাদী বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতীর সহিত একবাক্যে বলি –

"ধ্যানাভ্যাসসুনির্ম্মল অন্তরে যে যোগী
নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম পারেন ভাবিতে
ভাবুন তাঁহারা তবে আমরা কখন
কালিন্দী বিহারী শ্যামপদ কোকনদ
ভুলিব না নিরবধি পূজিব হরষে।

মানবের মনোবৃত্তি যতই দুর্ব্বল হইয়া আইসে, হৃদয় যতই সংসার মায়াবদ্ধ হইয়া পড়ে, বিশ্বও যতই বার্দ্ধক্য দশায় উপস্থিত হইতে থাকে, নানা দর্শনাদি প্রণীত হইয়া মানবের আধ্যাত্মিক প্রশ্নের যতই মীমাংসা হইয়া যায়, ততই ভক্তিবাদের শ্রেষ্ঠতা উদ্বোধিত হইতে দেখা যায়। আর জিজ্ঞাসার উত্তর পাইয়াও মানব যখন অভিপ্রেত জিনিষটী খুঁজিয়া পান না, চিত্তের প্রকৃত সন্দেহের নিরসন, সত্যের সন্ধান করিতে পারেন না, তখনই মানব ভক্তিপথের পক্ষপাতী হইয়া পড়ে। কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র পিতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য পালন করিয়াই সন্তুষ্ট, পিতার অভিপ্রেত কার্য্যগুলি সম্পাদন করিয়াই কৃতকৃত্য, তখন আর বাক্যদ্বারা পদসংবাহনাদি দ্বারা, তোষামোদ দ্বারা পিতাকে সন্তুষ্ট করার আর প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু যখনই পুত্র পিতার প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করিতে অসমর্থ হয়, অভিপ্রেত ও আদিষ্ট কার্য্যগুলির সম্পাদনে অক্ষম হয়, তখন বাক্যাদি দ্বারা পিতাকে যতটা সম্ভব সন্তুষ্ট করা ব্যতীত উপায় থাকে না। প্রকৃত কর্ম্মী জ্ঞানবান সন্তান অপেক্ষা অক্ষম মূর্খ সন্তান পিতামাতার প্রতি অধিকতর ভক্তিমান্, এই কথাটীর মূলে অনেক ক্ষেত্রে উপরোক্ত কারণটী বিদ্যমান।

এইরূপে যতই দিন যাইতেছে, লোকে ততই যে ভক্তিবাদের পক্ষপাতী হইতেছে, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহা বোঝা যায় না যে, মানবের চিত্তবৃত্তি অধিক উন্নত, সংস্কৃত ও প্রেমভাবময়ই হইতেছে। সত্য সন্ধানেই অধিক মতি জন্মিতেছে, ইহা মনে করাও ঠিক নহে। বিশ্বের নিয়মে, প্রকৃতির গতিতে, উপাসনার ক্রমবিকাশে যাহা অবশ্যম্ভাবী, তজ্জন্য মানবের কোন বাহাদুরী নাই। উপনিষদে ভক্তিবাদ প্রধানভাবের স্বতন্ত্ররূপে ব্যবস্থিত হইতে দেখা যায় নাই, অনেক স্থলে শ্রদ্ধার মধ্যে ভক্তির অন্তর্ভাব করা হইয়াছে। কচিৎ দুই একটী স্থলে ভক্তির উল্লেখ দেখা যায় মাত্র, যস্য দেবে পরা ভক্তিরিত্যাদি। তবে ভক্তিভাবে যে ফল্গুর মত অন্তঃশীলা প্রবহমান তাহা বেশ বোঝা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখান যাইতে পারে—ইত্যাদি "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাং" ইত্যাদি।

ধ্যান, যোগ, পূজা, কর্ম্মানুষ্ঠান, কীর্ত্তন প্রভৃতি উপায় গুলির মধ্যে কোন উপায়টী আমাদের পক্ষে অধিকতর উপযোগী সাধারণে কোনটী সহজে গ্রহণ করিতে পারেন, ঝটিতে কোন্‌টীতে মন আকৃষ্ট হয়, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। পূজা ব্যতীত ব্রত নিয়মাদিরূপ শাস্ত্রীয় কর্ম্মানুষ্ঠান উপায়টীর মধ্যে ধরা হইয়াছে, ইহা জানিয়া রাখিবেন।

উপাস্যে একাকার চিত্তবৃত্তির নামই ধ্যান। একাগ্র চিত্তবৃত্তিপ্রবাহ উপাস্য বা ধ্যেয়ে তৈল-ধারাবৎ অপরিচ্ছিন্ন রাখারই নাম ধ্যান। "তৎপ্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যান্"। বিক্ষিপ্ত চঞ্চল, বাহ্য ভাবমুগ্ধ দুর্ব্বল অশ্রদ্ধাযুক্ত মানব জপে বসিতেই চাহে না, বসিলেও একাগ্রতার অভ্যাস করিতে চাহে না, আপতিত কুচিন্তা সাংসারিক ভাবনাগুলি মন হইতে দূর করার জন্য যত্ন লয় না। মোটকথা ইহার প্রয়োজনীয়তা উপকার অনেকেই বিশ্বাস করেন না, অভ্যাস ও প্রতিকারের উপায় জানেন না, জানিবার সেরূপ চেষ্টাও পান না। হৃদয়ে সে গৌরববুদ্ধি জন্মে না, সে আকুলতা উপস্থিত হয় না। সে শ্রদ্ধা বিশ্বাস স্থান পায় না; কাজেই করিবে কে? জানিবে কে? চিন্তা শক্তির উন্মেষ ও স্থির করার অভ্যাস করিলে কতটুকু সফলকাম হওয়া যায়, তাহার পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুকই বা কয়জন? যাহা হউক, আমরা উপাস্য বা ধ্যেয়ে চিত্ত একাগ্র ও স্থির করিতে আদৌ পারি না, আর সে চেষ্টাও নাই, কাজেই ধ্যান অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ধ্যানে দূরের জিনিষটীকে নিকটে আনিতে হয়। অমূর্ত্তকে মূর্ত্তি দিয়া সামনে দাঁড় করাইতে হয়, বাহিরকে ভিতরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, ভিতর ও বাহিরকে এক করিয়া দূর ও নিকটকে সমীকৃত করিয়া, বাহ্য ও আন্তরকে অব্যবধান করিয়া তবে ধ্যানে সিদ্ধিলাভ করিতে হয়। কাজেই কঠিন বোধে ধ্যান উপায় আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে।

তাহার পর যোগ। চিত্তবৃত্তিরূপ যোগে কৃতকার্য্য হওয়া আমাদের মত সংসারীর পক্ষে সুদূরপরাহত। যোগ অর্থে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান, জীবাত্মার পরমাত্মাসহ সংমেলন প্রভৃতি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সাধারণতঃ পতঞ্জলি-কথিত প্রাণায়ামাদি কঠোর ক্রিয়াই বুঝিতে হয়। পতঞ্জলির যোগতত্ত্ব শিখাইবে কে? শিখিবে কে? প্রথমতঃ সাত্বিক আহারই মেলে না, দেহেরও সে শক্তি নাই, ইন্দ্রিয়েরও সে বল নাই, চিত্তের তেজ নাই যে যোগ করিব। সে স্থান, সে সময়, সে যোগী শিক্ষক, সে যোগমার্গে গমনোৎসুক শিষ্য নাই। অনধিকারীর যোগমার্গে গমনে নানারূপবিপৎ, এমন কি, মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে, আর বিঘ্ন ত পদে পদেই আছে। বায়ুর নিরোধ করিতে যাইয়া কি আত্মহত্যা পাপের ভাগী হইব, উন্মত্ত হইব? কাজ নাই—যোগের ভার যোগীর উপর দিয়া আমরা সহজ উপায় কি আছে, তাহাই খুজিয়া দেখি। "অসংযতাত্মনা যোগ দুষ্প্রাপ্য ইতি মেমতিঃ" ভগবানের মুখেই যখন এই কথা, তখন আমাদের অসংযতাত্মার ভরসা কোথায়? বাল্যকাল হইতে ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা সুগঠিত দেহেন্দ্রিয়চিত্ত ব্যক্তিগণ যোগী গুরুর কৃপায় হিমালয়ে যাইয়া যোগ করিতে পারেন করুন, আমরা পারিব না।

এক্ষণে পূজাই দেখিতেছি সহজ উপায়। সুন্দরমূর্ত্তি গড়িয়া তাহাকে মনোমত সাজাইয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা দ্বারা চৈতন্যময় করিয়া মন্ত্রদ্বারা পূজা করিতে ভালই লাগে; নানা সুগন্ধি কুসুমচন্দনে চর্চ্চিত করিয়া শ্রদ্ধাভরে সেই সম্মুখে সমাসীন সুন্দর দেবমূর্ত্তির চরণে দিতে তৃপ্তি হয়। তথাপি সত্য কথা বলিতে কি, অধিকাংশ ব্যক্তি এই পূজা করেন না, করিতে ভালবাসেন না। আহারে বিহারে সংযমী হইয়া আরাধ্যদেবতার পূজাতেও কৈ সকলের মন বসে? রজোভাবে আচ্ছন্ন

বাহ্যসুখলালসায় উন্মত্ত বিক্ষিপ্ত চঞ্চল চিত্ত লইয়া সকলে যখন পূজা করেন না, অন্তত ততটা পছন্দ করেন না, তখন ইহা অপেক্ষাও সহজ কিছু আছে কিনা, দেখা আবশ্যক। জপ পূজা করিতে বসিলেই সংসারের নানা ঝঞ্ঝাট আসিয়া জুটে, ঘুরিয়া তৃষ্ণায় প্রাণ ছটপট করে,আর একাগ্রতার অভাবে তেমন সুখ ও তৃপ্তিও হয় না।

কর্ম্মানুষ্ঠানে জানি উপকার, কিন্তু তাহাতেও সকলকে লিপ্ত দেখি না। অনুষ্ঠানই কঠিন বাহিক উন্নতি,পারলৌকিক উপকার, চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে, এ শ্রদ্ধা বিশ্বাস কম। জীবিকার জন্য ঘুরিব না—কর্ম্মানুষ্ঠান করিব। যাহাতে পয়সা নাই, পয়সার ক্ষতি বরং আছে, তাহাতে লোকে সহজে যাইতে চাহে না। আহার চালাইয়া অর্থ এমন থাকেনা যে, ব্যয় করি। সময় এমন বেশী থাকে না যে বিশ্রাম ও আরাম না করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করি। সকাম আমরা নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার অধিকারী নহি। অন্তর কামনায় ভরা, মুখে সর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পণমস্তু” বলিয়া ফল কি? সকাম কর্ম্মফলে স্বর্গ, জন্মান্তরে সুখ, ইহকালে তৃপ্তি, বিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী আমাদের সে বিশ্বাস তত প্রবল নহে। আর বিশ্বাস থাকিলেও সকাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা প্রাণের ক্ষুধা চিত্তের অতৃপ্তি দূর হইবে না। কাজেই নিষ্কাম ও সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানও আমাদের পক্ষে ততটা সহজ নহে। লোকে যা অর্থ যো অর্থ করিয়াই বেড়াইতেছে, দৈহিক, ইন্দ্রিয়িক বাহ্যসুখ লালসায় ছুটাছুটি করিতেছে, ধর্ম্মকর্ম্ম করিবে কে? স্বেচ্ছাচারে চলিবার,যথেচ্ছা আহার বিহার করিবার লোক অনেকে আছেন।

আমরা চাই মেশামেলা, আমরা চাই স্ফূর্ত্তি, আমরা চাই নাচ গান, হো হা, আমরা চাই হুজুক। রজোরাগের উজ্জ্বল চিত্রই আমাদের প্রিয়, আনন্দোল্লাসের বাদ্যধ্বনি আমাদের শ্রুতিসুখকর। অথচ আমরা ধর্ম্ম করিব, আনন্দের সঙ্গে ভগবানের উপাসনা করিব, সঙ্গীতের মধ্য দিয়া গুণগান গাহিব, ভাবের ভিতরে ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনের আশীর্ব্বাদ লইব, এই আশাও করিয়া থাকি। ক্রমে ক্রমে মন বসিলে পর যদিই ভক্তিভাব ফুটে, তৃপ্তিবোধ হয়, রসাস্বাদ ঘটে। তাই আমরা মণ্ডলী উপাসনার সার সঙ্কীর্ত্তন উপায়টী গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। সঙ্গীতের সুরতান লয়ে চিত্ত মাতোয়ারা হইলে তখন ভগবানের নাম মাহাত্ম্যে কৃপাগুণে সত্ত্বভাব ফুটিয়া উঠিতে পারে, ভক্তিবীজ রোপিত হইতে পারে, মনও তদ্ভাবে বিভোর হইতে পারে। বক্তৃতা দ্বারা মণ্ডলী উপাসনা করিয়া দেখিলাম, সমবেত প্রার্থনার দ্বারা মন দ্রবীভূত করিবার যত্ন পাইলাম—তাহাতে তেমন সুখ পাইলাম না; রস জমিল না। তাই খোল করতাল লইয়া সঙ্কীর্ত্তনরূপ উপায়টী আজ পরীক্ষা করিয়া দেখিব। পরে নির্জ্জনে একা করিতে যত্ন পাইব।

ধ্যানের রাজ্য আন্তর। পূজার রাজ্য আন্তর ও বাহ্য। যোগমার্গে ত দুষ্প্রবেশ্য, আর কর্ম্মের গতিও গহন। বাহ্য আর তাহা সুপ্রবেশ্য ও সরল হওয়াই চাই—এই কারণে সঙ্কীর্ত্তনরূপ উপায়টী বাছিয়া লইয়াছি। যেমন কোন শিল্পকার্য্য পুরুষানুক্রমে ক্রমশঃ সহজ অথচ সুন্দর হইয়া আইসে, উপাসনাও ক্রমে ক্রমে কালে তদ্রূপ সরল ও হৃদয়গ্রাহী হইয়া আসিয়াছে। উপাসনার ইতিহাস

আলোচনা করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়।

প্রথম জল, বায়ু, সূর্য্য, মেঘ, অগ্নি নক্ষত্র প্রভৃতি প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান দেবতার উপাসনা প্রচলিত হয়। প্রথমাবস্থায় এইরূপ প্রকৃতি উপাসনাই মানবের রুচিকর হইয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণের এই প্রকৃতি উপাসনা জড়োপাসনার মত অকিঞ্চৎকর বোধ হওয়ায় "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং চক্ষুষশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনঃ যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" স্বপ্রকাশ ব্রহ্মই একমাত্র উপাস্য বলিয়া বোধ হইল। তখন ঐ অগ্নি বায়ু সেই ব্রহ্মেরই স্বতন্ত্র বিকাশ, ব্রহ্মচৈতন্যের অগ্নির স্ফুলিঙ্গবৎ অধ্যস্ত অংশমাত্র, মূর্ত্তি ভেদ মাত্ররূপে স্থিরীকৃত হইল। এইরূপে কার্য্যরূপে কারণের, জড়ের মধ্যে চৈতন্যের উপাসনা চলিল। এইরূপে এক জড়কে ত্যাগ করিয়া খাঁটী চৈতন্য নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা আর জড়াবলম্বনে প্রকাশমান এক চৈতন্যের আরাধনা প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রথমটী ত সর্ব্বসাধারণ ধারণাই করিতে পারিল না, অসম্ভব বোধে ত্যাগই করিল। দ্বিতীয়টীই ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত হইয়া নানাবিধ উপাসনায় বিভক্ত হইয়া গেল। এই দ্বিতীয়টীও যখন তাদৃশ হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিল না, মানব যথার্থ উপাসক হইতে পারিল না, এ দিকে দেশ ধর্ম্মবিপ্লবে ও অন্যবিধ উপদ্রবে উৎপীড়িত হইয়া পড়িল, তখনই শ্রীভগবান্ অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। বিশ্বসমক্ষে পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষরূপ প্রকটিত হইয়া গেল, উপাসনার সৌকর্য্য সাধিত হইল। সাধারণের সাধন পথ সরল করিয়া দিয়া পরমেশ্বর পিতা, মাতা, প্রভু, বন্ধু ও গুরুর কার্য্য একাই সাধিত করিলেন। ফলে তাঁহাকে পিতৃরূপে মাতৃরূপে সখারূপে প্রভুরূপে ও গুরুরূপে লোকে উপাসনা করিতে লাগিল।

নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম আর সগুণ সাকার পরমেশ্বর উভয় ভাবই অবতারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। নির্গুণ বলিতে গুণহীন, কিম্বা বিশেষ গুণবান্ নহেন এইরূপ বিভিন্ন অর্থও লোকে বুঝিতে লাগিল। মায়াসহ মিলনে সগুণ সাকার স্বরূপতঃ নির্গুণ এইরূপে সমন্বয়ের পন্থাও আবিষ্কৃত হইল। সগুণ সাকার পরমেশ্বরই বৈকুণ্ঠাধিপ কৈলাসবাসী,আবার ভক্তানুকম্পার্থ ধৃত বিগ্রহ-এইরূপ ভাবে ভক্তচক্ষুতে প্রকটিত হইলেন।

এইরূপে মানব নির্গুণ নিরাকারকে সগুণ সাকাররূপে, তারপর আপনাদের মত মানবেরই আকারে পাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইল। বিশ্বরূপ অপেক্ষা দ্বিভুজ শান্ত শ্রীকৃষ্ণই অধিক প্রিয় হইয়া উঠিলেন। ভগবান্ আপনাদেরই একজন এই ধারণায় মানব তাঁহার সমীপে যাইতে ভরসা পায়, তত ভয় পায় না, অন্তরঙ্গ ভাবিতে পারে।

অবতারবাদের পর সেই আকারই কোথাও মূর্ত্তিরূপে উপাস্য হইল, কোথাও সাধক-হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত চিন্ময় মূর্ত্তিই প্রতিমায় পরিবর্ত্তিত হইল। মানবের চক্ষু মন প্রাণ সবই সৌন্দর্য্যমুগ্ধ। সৌন্দর্য্য অতি সহজেই জীবকে আকৃষ্ট করে। দেবমূর্ত্তি সৌন্দর্য্যময়ী হওয়াই ঠিক। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে ভয়ও অনেক কার্য্য করে, কথায়ও বলে ভয়ে ভক্তি। মূর্ত্তি কোথাও কোমল সৌন্দর্য্যপূর্ণ, কোথাও ভীষণ অথচ শান্ত, কোথাও অনন্তৈশ্বর্য্য সহস্র বাহুদর চক্ষু কর্ণ। ভক্ত সাধক যে আকারেই

ভাবিল.চাহিল, ভক্ত-কামনাপূর্ণকারী ভগবান্ সেই আকারেই আসিলেন, ভক্তের কাছে ধরা দিলেন। সেই আকারই ভগবান বলিয়া আমরা উপাসনা করিতে লাগিলাম। সমুদ্রে যাইতে হইলে নদী-মুখ দিয়া যাইতে হয় সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা করিতে হইলে তাহার একাংশ দেখিতে হয়। জগতের মধ্যেই জগৎপতিকে ধরা যায়। জড়ের মধ্যেই চৈতন্যের বিকাশ। যে আকারে, যেরূপে, যে ভাবে, আমরা তাঁহাকে ডাকিব, অন্তর্য্যামী তিনি সেই ডাকই শুনিবেন। চাই, তাঁহার জন্য আকুলতা, চাই তাঁহার প্রতি প্রাণ।

ভক্তিবাদে যতগুলি উপায় আছে, তাহার মধ্যে সঙ্কীর্ত্তন উপায়টী যে সরল ও হৃদয়গ্রাহী, তাহাতে সন্দেহ নাই। সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ক্রমে ভক্তিভাব ফুটিয়া উঠে, ক্রমে অন্তরচ ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয়, ক্রমে নাম-মাহাত্ম্যে অনুর্ব্বর মরুভূমিও শস্যশ্যামলা হইয়া উঠে। এই ভক্তি-মন্দাকিনী যাহাতে অনুর্ব্বর হৃদয়-ক্ষেত্রকে সরস করিয়া ভগবৎ কৃপারূপ শস্য ফলাইতে পারে তজ্জন্যই এই সঙ্কীর্ত্তন উপায় অবলম্বন আমাদের পরম ধর্ম্ম। এই সঙ্কীর্ত্তনই হৃদয়ের যাবতীয় মালিন্য দূর করিয়া অন্তরটীকে নির্ম্মল ভগবদধিষ্ঠানের উপযুক্ত করিয়া তুলে। কঠোর চিত্তকে কোমলায় করিতে, মরুভূর মত রুক্ষ প্রাণে মরুদ্যানরূপ সদ্ভাব সৃষ্টি করিতে, সকল ভাবকে এক, অচিন্ত্য, অপূর্ব্ব খাদে বহাইতে সঙ্কীর্ত্তনই আমাদের নিকট শ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

ভক্তি-কুসুম যখন অন্তর উদ্যানে বিকসিত হইবে, তখন বাহ্যবিষয়াসক্তির দুষ্ট বাতাস কুসুম-পরাগ-সুরভি নির্ম্মল সুবাতাসরূপে দেখা দিবে। অন্তঃকরণ যতটুকু সময়ের জন্য ভগবদ্ভাবময় ও আত্মস্থ হইবে, ততক্ষণের জন্য বাহ্য-প্রাবল্য অপসারিত হইয়া যাইবে। ভক্তিধন বহু সাধনার ফল, এই ভক্তিধন পাইবার জন্য সঙ্কীর্ত্তনরূপ সহজ সাধনায় আমরা অগ্রসর। একদিন সামবেদ-ঝঙ্কারে তপোবন মুখরিত হইত, ভগবানের মহিমা-গুণ কীর্ত্তিত হইত,সে দিন আর নাই। সে উদ্গাতা সে সামশ্রবী আর নাই। সে সুরসংযোজন-নৈপুণ্য আর দৃষ্ট হয় না। আমরা মাতৃভাষার সঙ্গীত দ্বারাই কাজেই ভগবানের গুণগান করিব, আনন্দের মধ্য দিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইবার চেষ্টা পাইব।

সঙ্কীর্ত্তন কলিযুগের একমাত্র সরল উপায়। আর ইহাই শেষ সংস্করণ। ভক্তি নাই, সঙ্কীর্ত্তনে ফল কি—ইহা বিষম ভ্রান্তি। ভক্তি যদি থাকিবে, তবে আর আমাদের ভাবনা কি? ভক্তিই আমাদের ফল, ভক্তিই আমাদের প্রাপ্তব্য, ভক্তিই আমাদের সাধনার ধন। এই ভক্তি কি সহজে জন্মে?

এই সঙ্কীর্ত্তন মণ্ডলী-উপাসনার সার। ইহা ভাবমূলক উপাসনা। ইহাতে ঝটিতে মন আকৃষ্ট হয়, আর ইহা আপামর-সাধারণের সেব্য। খোল করতাল আর ভক্তের কণ্ঠজাত সঙ্গীত—এই তিনের মিলনে একদিন নবদ্বীপে যে ঘনামৃতধারা উৎপন্ন হইয়াছিল, যাহার সৌরভ আজি দিগদিগন্তে ছুটিতেছে, সেই সঙ্কীর্ত্তন তোমার আমার কল্পনা নহে। নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য তাহার বিশেষভাবে প্রচারক। স্বয়ং ভগবান্ কলিযুগে মানবের উদ্ধারের অব্যর্থ ঔষধ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই নাম ব্যতীত কলিযুগে উদ্ধারের আর অন্য গতি নাই। এই

সঙ্কীর্ত্তন নামসঙ্কীর্ত্তন। এই নামসঙ্কীর্ত্তন প্রচারার্থ গৌরাঙ্গদেবের জন্ম—ইহা তাঁহার জীবনেই সুস্পষ্ট প্রতিভাত।

ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন আত্মনাম কীর্ত্তন নাম না দিয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন নামটাই প্রচলিত। কেন না, হরিনামই মহাজন-অবলম্বিত, ভক্ত-জন-কীর্ত্তিত। শ্রীহরি ব্রহ্মের নাম, ভগবানের নাম, তথাপি এই বিশেষ নামেই আমাদিগকে ডাকিতে হইবে। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

বস্তু ও প্রতিবিম্বের মত শ্রীহরি ও তাঁহার নাম অভিন্ন। নাম তাঁহারই নাম, তথাপি নামই অধিক প্রিয়। নামরূপের মধ্য দিয়া না যাইলে অনন্ত অরূপ ব্রহ্মের ধারণা সম্ভব নহে। তিনি সর্ব্বনাম ও বিশ্বরূপ, তাহা উপনিষৎ ও গীতায় ভূয়োভূয় কীর্ত্তিত ও উদাহৃত হইয়াছে। শ্রীহরি আমাদের কাছে অনেকে দূরে; অন্ততঃ দূরে বলিয়া প্রতীত, নাম কিন্তু খুবই নিকটে। যে মুহূর্ত্তে মনে করি নাম লইতে পারি, নাম লইয়া তৃপ্তি ও শান্তিলাভ করিতে পারি।

নামের স্বতন্ত্র সত্তা না থাকিলেও, উপলব্ধি ক্ষেত্রে নাম ও নামী দুইটী জিনিষ আছে বুঝিতে পারি। কথায় বলে নাম ভগবান্ অপেক্ষা বড়। ভগবান্ বড় কি ছোট, শান্ত কি বিশ্বরূপ, ইহা আমাদের প্রত্যক্ষীকৃত হইতেছে কৈ? যাঁহার লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত, সেই বিশ্বরূপ, সেই অপ্রতর্কৈশ্বর্য্য, সেই অচিন্ত্যশক্তির আমরা নাগালই পাই না; কিন্তু নামের পাই। কাজেই আমাদের কাছে নামই বড়। লক্ষ্য খুবই দূরবর্ত্তী থাকিলে প্রতিবিম্ব দৃষ্টে শর সন্ধান করিতে হয়। অর্জ্জুন মৎস্য-চক্রভেদ করিবার সময় জলে তাহার প্রতিচ্ছবি দেখিয়া লন, ইহা সকলেই অবশ্য জানেন।

বাস্তব তত মধুর ঠেকে না, কিন্তু তাহাই যখন কবি-কল্পনায় চিত্রিত হয়, তখন তাহার মাধুর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি পায়। বাস্তব বিশ্বের মাধুর্য্য যেমন আছে,রুক্ষতাও তদ্রূপই আছে। মনোহারিতা ও ভীষণতা। নিস্তব্ধতা ও মুখরতা পাশাপাশি দাঁড়াইয়া থাকে। কবি কল্পনায় চিত্রিত বিশ্বে, মানব-সংস্কারজ ভাবে তাহারা আগাগোড়া ভালটাই শুধু চোখে পড়ে। অমাধুর্য্য রুক্ষতা ভীষণতা প্রভৃতি অংশ যে আছে, তাহা আদৌ মনে পড়ে না।

পদ্মের নাম মনে পড়িলে মনে পড়ে শুধু তাহার বর্ণ,রূপ, আকৃতি আর সৌরভের কথা। বৃন্তের কার্কশ্য, গাত্রের কণ্টক কাহারও মনে আসে না, পদ্মবনে সর্প বাস করে, তাহাও মনে আসে না। দুর্গোৎসব আসিতেছে—ইহাতে যত সুখ, আসিলে তত সুখ হয় না। সুখ অপেক্ষা সুখের আশাই মধুর।

শ্রীহরি সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্ত্তা। একাধারে বিশ্বরূপ শান্ত আকৃতি; ভক্তের পিতা, দুষ্টের যম। সাধুর নিকট অমৃত হ্রদ, অসাধুর চক্ষুতে ভীষণ রাজদণ্ড। কোমল ও উৎকটভাব তুল্যরূপই তাঁহাতে বর্ত্তমান। পাপী শ্রীহরির কাছে যাইতে ভয় পায়, মনে করে, কি ভয়ানক দণ্ড না লইতে হইবে। শ্রীহরিকে অনন্যচিত্তে না চাহিলে তিনিও কাহাকে কোলে টানেন না। একান্তাশ্রয় ব্যক্তিই,পাপী হউক তাপী হউক, তাঁহার কৃপার পাত্র। ভগবান্ পাপীকেও কোল দেন, তাহার তাৎপর্য্য ইহাই। পাপ-মলা অনুতাপ দ্বারা ধুইয়া গেলে পর, পাপী

আকুল ভরে তখন ভগবান্‌কে আশ্রয় করে, ফলে চরণচ্ছায়া লাভ করে। সাধারণতঃ শাস্তা, বিশ্বের বিচারক, ন্যায়বান্ বলিয়াই পাপী ভগবান্‌কে ভয় করে। মহাপাপী যখন মুমূর্ষু, তখন যদি তাহার সমুখে ভগবান্‌কে (যদিও সম্ভব নহে) দাঁড় করান যায়, সে ত ভয়ে কাঁপিতেই থাকিবে। পরম ভক্ত অর্জ্জুন সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ করিয়াও বিশ্বরূপ অধিকক্ষণ দেখিতে পারেন নাই। ভগবান্ শ্রীহরিকে পাপী লোকে ভয় করিতে পারে, সেই সহস্রপাদ, সহস্র বাহু, সহস্র চক্ষু, সেই তেজোময় দেহ দেখিলে,ভাবিলে ভয় জন্মিতে পারে, কিন্তু তাঁহার নামে ত এ সব ভয় কিছু নাই। শ্রীহরির নামে ভয় জন্মিবার কোন কারণ নাই। বিশ্বের ন্যায়বান্ বিচারক শ্রীহরির কাছে ভালমন্দের বিচার আছে, ভক্তের অভক্তের,সাধু অসাধুর প্রভেদ আছে, স্থানাস্থানের পার্থক্যও আছে। কিন্তু নামের কাছে এসব নাই। নামে আছে শুধু কোমলতা ও মাধুর্য্য,সুখ ও শান্তি। শান্তভাবই নামে বিদ্যমান। নাম গান গাহিতে গাহিতে, সুর তান লয়ের গুণে, ভক্তের সংসর্গে ভগন্নামের মহিমায় ক্রমে ক্রমে চিত্ত আকৃষ্ট হইবে, একজনের কোমল ভক্তিময় তড়িৎ তত্রস্থ সকলকার দেহে ভক্তিময় তড়িতের সৃষ্টি করিবে। নাম-সঙ্গীত-ফলে এক মনে এক প্রাণে একসুরে যখন সকলে "দয়াল হরি" বলিয়া গগন ফাটাইয়া দিবে, প্রাণের বেদনা ও আকুলতা তাঁর চরণে পৌঁছাইবার জন্য উন্মাদক হইবে, তখন সকলকার চক্ষুতে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িবে, দেহে রোমাঞ্চ ফুটিয়া উঠিবে, স্বর গদ্গদ, কণ্ঠ ভগ্নপ্রায় হইয়া আসিবে। বুঝিতে হইবে, কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সকলকে এক সুরে বাঁধিতে, একপ্রাণ করিতে, এক জাতীয় তড়িৎ উৎপাদন করিতে নাম গানই শ্রেষ্ঠ উপায়। এই নামগান অনেক প্রকার। তথাপি সঙ্কীর্ত্তনই যে সর্ব্বাপেক্ষা উপকারক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীহরি অপেক্ষা তাঁহার নাম আশ্রয়ের অধিক উপকারিতার কথা বলা যাইতেছে, তাহার কারণ, নাম তাঁহার অপেক্ষা বড়। আমাদের কাছে অত্যন্ত বড়, অধিকতর উপকারী। শ্রীহরিকে পাইবার নামই যখন প্রকৃষ্ট উপায়, তখন আমাদের নামকেই অগ্রে আশ্রয় করিতে হইবে। নাম মূল্যে শ্রীহরিকে ক্রয় করা যায়। নাম মূল্য সর্ব্বদা তাই কাছে রাখিও, যখন ইচ্ছা তাহার দ্বারা শ্রীহরিকে ক্রয় করা যাইবে। নাম ভুলিলে হরিভক্তি ও হরিপ্রেমের আর আশা নাই, নাম ভুলিলে যে পরিচয়-বন্ধন একেবারে শেষ হইয়া যায়। তাই শ্রীহরিকে ভোলা অপেক্ষা নাম ভোলাই অধিক ক্ষতিকর। সত্যভামা নারদকে কৃষ্ণদান করিলে পর, দেবর্ষি শ্রীকৃষ্ণকে ত লইয়া যান্; তখন সত্যভামা কাঁদিয়া আকুল। ব্যবস্থা হইল শ্রীকৃষ্ণকে মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া লইতে হইবে। পার্থিব ধনরত্ন কৃষ্ণের সহিত তুলাদণ্ডে সমান হইতে পারে না। কৃষ্ণের দিক ভারী থাকে, নামেই না। তখন কৃষ্ণপ্রেমময়ী রুক্মিণীদেবী তুলসী পত্রে শ্রীকৃষ্ণ নাম লিখিয়া তাহা তুলাদণ্ডে স্থাপন করিলেন; নামের দিকই ভারী হইল। কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণের নামই যে বড়, তাহা স্বয়ং ভগবানই আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া গেলেন।

ওঙ্কার পরমব্রহ্মের নাম, বীজমন্ত্র কুলদেবতার নাম। এই নামের জপ,

উচ্চারণ, স্তুতি, গান, সকলগুলিই মানবের গ্রহণীয়। তবে এই নামসঙ্গীত অনেক কারণে অধিক উপকারক বলিয়া, আমাদের বেশী উপযোগী। আমোদপ্রমোদের মধ্য দিয়া, বন্ধুবর্গের সহিত মিলিয়া মিশিয়া, নাম গান করা যায় বলিয়া, আমরা সহজেই করিতে পারি, আর ঝটিতি ইহা চিত্তাকর্ষক। রজোরাগে আমাদের আপাদমস্তক আলোড়িত, কাজেই রজোগুণের আশ্রয় লইতেই হইবে, নচেৎ উপাসনায় প্রবৃত্তি জন্মিবে না। ঢাক ঢোল শঙ্খ উলু খোল করতাল সবই ত রজোগুণের কার্য্য। এ-গুলির মধ্য দিয়া না গেলে আমরা যে খাঁটী সত্ব ধরিতে পারি না, বোধ হয়, অভ্যস্ত সংস্কার গুণে চাহি না। এই রজোভাবের অভ্যন্তরেই সত্বের শুভ্র আকার ক্রমেই আমাদের চক্ষুর সম্মুখে গড়িয়া উঠিবে। সঙ্কীর্ত্তন ফলে যখন নামের ঘনামৃত ধারার আস্বাদ পাওয়া যাইবে, তখন কেহই নাম ছাড়িতে চাহিবে না; নাম গানেই সবাই পাগল, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া উঠিবে। ভাব জন্মিলে তখন এই আমোদ প্রমোদ, মেলামেশার কথা আর মনে পড়িবে না। শ্রীহরির করুণ চক্ষু আরতির প্রদীপের মত আমাদের সম্মুখে দেখা দিবে। গীত বাদিত্রের ঝঙ্কারের মধ্যে তাঁহার আশীর্ব্বচন সুস্পষ্ট শ্রুত হইবে। ভাই সকল, এই সহজ মনোগ্রাহী বাহ্য উপায় অগ্রে অবলম্বন করিয়া ভালই করিয়াছ, ভরসা করি, আন্তরভাব ক্রমে বিকসিত হইয়া উঠিতে পারে। কলিতে হরিনামই একমাত্র উদ্ধারের উপায়—এই বিশ্বাসটী রাখিও। স্ত্রী পুত্রের মৃত্যুতে আমরা কত কাঁদিতে পারি, সংসারের কত কষ্টে চক্ষু জলে ভরিয়া আসে; ভগবানের জন্য রোদন কি এতই কঠিন? ভাইগণ, প্রাণ খুলিয়া এস কিছুদিন আমরা এই হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করি, ভাল না লাগে ছাড়িয়া দিও। ঔষধ মিষ্ট কি তিক্ত, তাহা একবার পরীক্ষা কর। সুখ শান্তি আছে কিনা, প্রীতি জন্মে কিনা, রসানুভব হয় কিনা, অচিরেই পরীক্ষা শেষ হইবে। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, চণ্ডাল, ম্লেচ্ছ, সবাই হরিনামের অধিকারী। ইহাতে জাতি বিচার নাই, পণ্ডিত মূর্খের ইতর বিশেষ নাই। ইহা আপামর-সেবা। ওঁ হরিকৃপাহি কেবলং।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ।

বৈশাখী সুধা

রবি-রসরসিতা মাধবী কবিতা।

আমার রজনী অমনি যায়
হাসিয়া প্রহর সুধীরে ধায়,
কত মালা গাথি গোঁয়াইনু রাতি,
এলোনা বঁধুয়া তবুতো হায়,
আমার রজনী বিফলে যায়।

টুটিয়া ফেলিব সাধের মালা,
তাহে কি নিবিবে মনের জ্বালা?
সে যে প্রাণ নিয়ে পীরিতি বাটিয়ে.
গিয়াছে দিয়াগো মোহের তালা
টুটিয়া ফেলিলে হবে কি মালা?

ছাঁকিয়া লইয়া ভাবের ভাষা,
রচিব যতনে কবিতা খাসা,
পাতে পাতে তার নীহারিকা ভার,
নীরবে দাঁড়ায়ে করিবে খেলা
ফুটিয়া উঠিবে টগর বেলা।

পবন পরশে তটিনী বুকে,
অযুত লহরী নাচিবে সুখে,
জল জল জল ছল ছল ছল,
ওগো-চাঁদ চুয়ে পড়া জোছন,
দেবে সুধা ঢেলে মোহন,

বিরহ-বিধুরা গোপবালা রাধা,
কেশব পীরিতে ছিল যথা বাঁধা,
তেমন করিয়ে, বঁধুরে বাঁধিয়ে
মন-যমুনায় যাইব ভাসি ;
আকাশে চাঁদিমা উঠিবে হাসি।

রামধনু-রথ আসিবে নামি,
হইব উভয়ে অলকাগামী,
মন্দার মোদিত, বিশ্ব বিমোহিত
আসিবে ছুটিয়া মন্দ পবন,
খুলিবে গোলাপ বক্ষ আপন।

স্বপন ছিঁড়িয়া মায়ার ডোর,
হৃদয়ে বসিবে হইয়ে ভোর,
সুধা-ঝরা-মুখ, কুসুম চুচুক,
অলিনী গুঞ্জনে উঠিবে কাঁপি,
আবেশে কাননে ডাকিবে পাখী।

হেন জাগরণে আলস নাই,
পীরিতি জীবনী সকল ঠাঁই,
পরশে পীরিতি. চুমনে মিরিতি
আঙুরের রসে পরাণ ভিজে,
ভাষা নাই এর বলিব কি যে !!

আঁধারে আলোকে হেঁয়ালি রচি,
(দিব) ভাব মুকুতায় বঁধুরে খচি,
অনুরাগ গান. নাচাবে পরাণ
আকাশে ছুটিবে নীলাভ রেণু,
পশিবে কাণেতে শ্যামের বেণু !

আকাশে বসিবে সুষমা মেলা,
চাঁদ চকোরে করিবে খেলা,
পারিজাত মধু আমি আর বঁধু,
পুরবী সায়রে মগন রব
(অমনি অমনি)
দুইটী হৃদয়ে একটী হব।

কেঁদে চলে যাবে 'দীঘল শ্বাস',
পীরিতি ফুলের ছুটিবে বাস,
বেদনে বিরহ রবে অহরহ,
উঠিবে পুলকে জগত ছাপি
উল্লাসে বসুধা উঠিবে কাঁপি।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

গ্রীক-দর্শন।

অ্যারিস্টটল্ (Aristotle)।

ম্যাসিডোনিয়ার দক্ষিণে চালসাইডিস, বর্ত্তমান চালকিস্ রাজ্য অবস্থিত ? উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত মাউণ্ট অ্যাথসের (Mt. Athos) নিকটবর্ত্তী প্রাচীন ষ্ট্যাজিরা (Stagira) নগরে, খ্রীঃ পূঃ ৩৮৫ অব্দে, প্রসিদ্ধ দার্শনিক অ্যারিষ্টটলের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা নাইকোমেকাস্ (Nicho- machus) ম্যাসিডনের রাজা অ্যামিণ্টাসের (King Amyntus) গৃহচিকিৎসক ছিলেন এবং চিকিৎসা ব্যবসায়ই তাঁহাদের পারিবারিক জীবিকা ছিল। অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রম-

কালে (খ্রীঃ পূঃ ৩৬৭) তিনি এথেন্স নগরে আগমন করতঃ প্রথমে প্লেটোর শিষ্যরূপে অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া, পরে প্লেটোর পরিণত বয়সে তাঁহার একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হন। খ্রীঃ পূঃ ৩৪৩ হইতে ৩৪০ অব্দ, অর্থাৎ চারি বৎসরকাল, তিনি ফিলিপতনয় মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডারের শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। আলেক্‌জাণ্ডারের সহিত বন্ধুত্ববশতঃ তাঁহার অগাধ-জ্ঞানসঞ্চয়ের পথ প্রশস্ত হয়। ৩৩৪ অব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথম ল্যুকেয়মের পথে পাদ-চারণাযোগে দর্শনশিক্ষার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া তৎপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় 'পেরিপ্যাটিটিক্' (Peripatetics) নামে অভিহিত হইত। আলেক্‌জাণ্ডারের মৃত্যুর পর, অ্যারিষ্টটলের প্রতি ষড়যন্ত্র এবং নাস্তিকতার অভিযোগ আনীত হইলে, তিনি ইউবিয়া দ্বীপের কলচিস্ (Chalchis) নগরে পলায়ন করিতে বাধ্য হন এবং তথায় খ্রীঃ পূঃ ৩২২ অব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

অ্যারিষ্টটলের দর্শনালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে, তৎপ্রণীত গ্রন্থসমূহের কিঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক। তাঁহার গ্রন্থাবলী সমুদ্র-বিশেষ। খ্রীঃ পূঃ ৫০ কিম্বা ৬০ অব্দে অ্যাণ্ড্-নিকাস কর্ত্তৃক এই সমুদ্র প্রথমে মথিত এবং প্রকাশিত হইয়াছিল। যে সকল গ্রন্থ অদ্যাপি বিদ্যমান, তাহাদের অধিকাংশ প্রয়োজনীয় গ্রন্থের মৌলিকতা-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। অপরাপর গ্রন্থের অনেকগুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্থির হইয়াছে এবং কয়েকখানি একেবারে লোপ পাইয়াছে। প্রচলিত এবং লুপ্ত অর্থাৎ সমগ্র গ্রন্থাবলীর যে দুইখানি তালিকা দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে যেখানি খ্রীঃ পূঃ ২০০ অব্দে আলেক্-জাণ্ড্রিয়ায় পাওয়া গিয়াছিল, তাহার পুস্তক সংখ্যা মোট চারিশত। এই তালিকাটী অসম্পূর্ণ বলিয়া স্থির হইয়াছে; কেননা অনেক প্রচলিত গ্রন্থের নাম উহাতে নাই। পণ্ডিতদিগের মতে, আলেক্‌জাণ্ড্রিয়ার লাই-ব্রেরিতে অ্যারিষ্টটলের যে সকল পুস্তক রক্ষিত হইয়াছিল, উহা তাহারই তালিকা। অপর তালিকাখানি আরবদেশীয় লেখকদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত এবং অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ বলিয়া গণ্য; উহার পুস্তকসংখ্যা একসহস্র।

সমগ্র গ্রন্থাবলী নিম্নলিখিত পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

১। 'অর্গানন' (Organon) বা তর্কশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী। 'ক্যাটিগরিস, (The Categories) বা ন্যায়শাস্ত্রোক্ত পদার্থ-বিভাগ; প্রতিজ্ঞা বা বিচার বাক্য বিষয়ক পুস্তকসমূহ (The Propositions); 'অ্যানা-লিটিক'দ্বয় (The two Analytics); তাঁহার 'লজিক' বা ন্যায়শাস্ত্র, এই নামে অভিহিত। 'টপিকা' (The Topica) বা যুক্তিকৌশল শিক্ষার পুস্তক। এই শ্রেণীর পুস্তক সমূহ 'অর্গাননের' অন্তর্ভুক্ত।

২। প্রাকৃতিক ইতিহাস (The Treatises on Natural History) জড়বিজ্ঞান (Physics) আটখণ্ড; ডি সিলো (De Cœlo) চারি খণ্ড; উৎপত্তি এবং ধ্বংস (Origin and Decay) সম্বন্ধীয় দুই খানি পুস্তক; জ্যোতিষ বিজ্ঞান (Meteorology) চারি খণ্ড; প্রাণিবিজ্ঞান (Zoology); এতদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি পুস্তক এই বিভাগের অন্তর্গত।

৩। অধ্যাত্ম-দর্শন (Metaphysics)। অধ্যাত্ম দর্শন সম্বন্ধীয় সমস্ত গ্রন্থই এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রাথমিক দর্শন (First Philosophy) নামে অভিহিত।

৪। নীতি-বিজ্ঞান (Ethics)। নাই-

কোমেকিয়ান নীতিবিজ্ঞান নামে দশখানি এবং রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে আটখানি গ্রন্থ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। রাষ্ট্রনীতি সম্পূর্ণ লিখিত হয় নাই। 'ইউডিমিয়ান' নীতি বিজ্ঞান ইউডিমাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইলেও, অ্যারিষ্টটলই ইহার প্রণেতা। এই গ্রন্থের চারি খণ্ড রক্ষিত হইয়াছে। 'ম্যাগনা মর‍্যালিয়া' (The Magna Moralia) বা প্রধান উপদেশাবলী ইউডিমিয়ান এবং অ্যারিষ্টটেলিয়ান নীতিশাস্ত্রের সংক্ষিপ্তসার। পাপপুণ্য সংক্রান্ত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক (The Treatise on Virtues and Vices) এবং 'ইকনমিকস্' (Economics) বা অর্থ নীতি গ্রন্থের প্রথম ভাগ এই বিভাগের অন্তর্নিবিষ্ট হইলেও, অ্যারিষ্টটল কর্ত্তৃক লিখিত হয় নাই বলিয়া বিশ্বাস।

৫। ভাষা বিজ্ঞান বা অলঙ্কার শাস্ত্র (Rhetoric) সম্বন্ধে তিন খানি পুস্তকের তৃতীয় খানি অ্যারিষ্টটল কৃত নয়। কাব্য (Poetry) সম্বন্ধে 'পোয়েটিকাস' বলিয়া যে দুই খানি গ্রন্থ আছে, তাহা অ্যারিষ্টটল প্রণীত; তবে উহা ঐ সম্বন্ধে সমগ্র গ্রন্থের একটী মাত্র।

অ্যারিষ্টটলের গ্রন্থাবলী দৃষ্টে মনে হয়, সে গুলি যেন নিজের ব্যবহারের জন্য এবং ছাত্রদিগের শিক্ষা দান মানসেই রচিত হইয়াছিল, সাধারণের নিকট প্রকাশের নিমিত্ত নহে। গ্রন্থকারের বয়সের তারতম্যানুসারে মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটা এবং সেই পরিবর্ত্তন বিভিন্ন বয়সের পুস্তকে লক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক। অ্যারিষ্টটলের পুস্তকে এরূপ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না; তাহার কারণ, তাঁহার প্রায় সমস্ত পুস্তকই পরিণত বয়সে অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব্বে দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। এস্থলে অগ্রপশ্চাৎ বিচারের প্রয়োজন না থাকিলেও বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, তাঁহার 'ক্যাটিগরিস' 'অ্যানালিটিকস্' এবং 'টপিকা'ই প্রথমে লিখিত হয়। তৎপরে, ক্রমান্বয় 'ফিজিকস' ও তৎসংক্রান্ত পুস্তকাবলী, প্রাণী বিজ্ঞান এবং আত্মাসম্বন্ধীয় গ্রন্থ, 'এথিকস্' বা নীতিবিজ্ঞান সমূহ, 'পলিটিকস্' এবং 'মেটাফিজিকস্'। মেটাফিজিকস্ সম্পূর্ণরূপে লিখিত হয় নাই। 'পোয়েটিকাস্' এবং 'রেটরিক' সর্ব্ব পশ্চাৎ আরব্ধ হইলেও, অ্যারিষ্টটল সে গুলি সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন। *

অ্যারিষ্টটল দর্শন শাস্ত্রকে মোটের উপর সাধারণ সংজ্ঞা বা নাম-মূলক বিজ্ঞান (Science of Universals) বলিয়াছেন। প্রত্যেক বিশেষ খণ্ড বিজ্ঞানের এক একটী স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য থাকে, যাহাকে লইয়া সেই বিজ্ঞানের সৃষ্টি। ইহাদের প্রত্যেকেই এক একটী খণ্ড দর্শন এবং সকলেই এক বা একাধিক সত্যে প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ যাবতীয় বিশেষ বিজ্ঞান বা খণ্ড দর্শনের আশ্রয়ভুক্ত সত্যসমূহ সম্বন্ধে যে সকল ধারণা এবং বিচার, তাহাদের সারভাগ বিধিনিবদ্ধ হইয়া একমাত্র সাধারণ বা সার্ব্বভৌমিক দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাই আরিষ্টটলের মুখ্য বা প্রাথমিক দর্শন (First Philosophy)। খণ্ড দর্শনগুলি গৌণস্থানীয় (Secondary Philosophy)। প্রথমোক্ত দর্শনও একটী পৃথক বিজ্ঞানশাস্ত্র। খণ্ড-দর্শনগুলি একত্র

* এই প্রবন্ধের গ্রন্থ-পরিচয় অংশ Zeller's Outlines of Greek Philosophy' হইতে গৃহীত।

মিলিত হইয়া একীভূত হইলেও, প্রাথমিক উদ্দেশ্যটী অক্ষুণ্ণ থাকে। সত্তা কি, নিরপেক্ষ অস্তিত্ব বা ঈশ্বরের স্বরূপ কি, ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসাই উহার উদ্দেশ্য। যাবতীয় বিশেষ-বিজ্ঞান বা খণ্ড-দর্শনের মিলিত উদ্দেশ্য এবং প্রাথমিক-দর্শনের উদ্দেশ্য, উভয়ে পার্থক্য নাই। বিশেষ-বিজ্ঞানগুলি একদেশদর্শী বলিয়া, তাহাদের সকলের প্রামাণ্য এবং প্রাথমিক-দর্শনের প্রামাণ্য একই। তাহার কারণ, উহারা প্রত্যেকেই সেই অনন্ত মহা-সত্তার এক একটী রূপের প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত।

তার্কিক সম্প্রদায় এবং সন্দেহবাদীগণ বিজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, কিন্তু অ্যারিষ্টটলের তাহাতে সন্দেহ ছিলনা। তাঁহার মতে বিজ্ঞানও অধ্যাত্মশাস্ত্রের ন্যায় একটী সম্ভবপর শাস্ত্র। জীবমধ্যে মানবই প্রজ্ঞার বা বিচারবুদ্ধির অধিকারী এবং এই প্রজ্ঞা ঈশ্বরেরই স্বরূপ। এইজন্য মানব ঈশ্বরের ধারণা হইতে চিন্তাপ্রভাবে ক্রমান্বয় নিরপেক্ষ-সত্তার জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। আবার, মানবই বাক্‌শক্তি সম্পন্ন। বাক্‌শক্তিপ্রভাবে মানব স্ব স্ব জ্ঞানানুসারে দ্রব্য-সমূহের নামকরণ করিয়াছে, এবং প্রজ্ঞার দ্বারাই দ্রব্যসমূহের স্বরূপ অবধারিত হয়; সুতরাং শব্দার্থসমন্বয়, বিষয়ানুভূতি এবং প্রজ্ঞার সাহায্যে যে কোন শাস্ত্র বা বিজ্ঞান সঙ্কলিত হইবে, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। দ্রব্যজ্ঞানলাভার্থ বিষয়ানুভূতির যে সকল শ্রেণী বিভাগ আছে, তাহারা যথাক্রমে (১) সত্তা (Substance) (২) পরিমাণ বা সংখ্যা (Quantity) (৩) গুণ (Quality) (৪) সম্বন্ধ (Relation) (৫) স্থান (Place) (৬) কাল (Time) (৭) অবস্থিতি (Position) (৮) পরিবর্ত্তন (Mode of being), (৯) ক্রিয়াশীলতা Activity) এবং (১০) নিশ্চেষ্টতা (Passivity)। দ্রব্যমাত্রই এই সকল বিভাগের অধীন।

১। অধ্যাত্মদর্শন (First Philosophy.)

গণিত ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে দ্রব্যসমূহের পরিমাণ, সংখ্যা, গুণ এবং সম্বন্ধ আলোকিত হইয়াছে। প্রাথমিক বা অধ্যাত্মকদর্শনের প্রামাণ্য বস্তুমাত্রেরই সার বা সত্তা, যাহার সহিত অপরাপর গুণাবলী সম্বন্ধবদ্ধ, বা যাহাকে আশ্রয় করিয়া গুণগুলি বিদ্যমান। স্থান কালাদির সম্বন্ধ উপেক্ষা করতঃ এই দর্শন সত্তার প্রকৃতি কি, অর্থাৎ নির্ব্বিকার অবশ্যম্ভাবী গূঢ় এবং চিরন্তন ভিত্তির সহিত অস্থায়ী, আপেক্ষিক এবং দেবাধীন গুণ সমূহের প্রভেদ বা পার্থক্য কি, তাহারই মীমাংসায় নিযুক্ত।

এই জন্য প্লেটো অধ্যাত্মদর্শনকে ইন্দ্রিয়-জগতের অতীত বাস্তব সত্তার বিজ্ঞান (Science of the Ideas) বলিয়া ঠিকই করিয়াছিলেন, কিন্তু ধারণাসমূহ (Ideas) যে দ্রব্য হইতে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, প্লেটোর গ্রন্থাদিতে তাহার প্রমাণাভাব। এবম্বিধ কল্পনা হইতে আধ্যাত্মিক বিচারের মীমাংসা না হইয়া, বরং বাস্তব জগতের সহিত একই অর্থ প্রকাশক একটী দ্বিতীয় জগতের যোজনা দ্বারা, প্রতিপাদ্য বিষয়টী আরও জটীলভাব ধারণ করিয়াছে! স্বতন্ত্রভাবে কল্পিত দ্রব্যের ধারণা দ্বারা দ্রব্যের উৎপত্তি, স্থিতি বা প্রকৃতি নির্ণয়ের কোন সাহায্যই হয় না, এবং প্লেটোর ধারণা বা আদর্শ ও ইন্দ্রিয়-জগতের মধ্যে যে কি সম্বন্ধ, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। ধারণা বা আদর্শগুলি *

দ্রব্য সকলের নমুনা (archetype) এবং দ্রব্যসমূহ আদর্শের প্রতিরূপ, এরূপ উক্তি নিরর্থক শব্দঘটা বই কিছুই নয়। অধিকন্তু, সাধারণ ধারণা বা মূলাদর্শ যদি ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যনিচয়ের ভিত্তি বা অবস্থিতির হেতু হয়, তবে উহা যে সকল দ্রব্যের অবলম্বনস্বরূপ, তাহাদিগকে ছাড়িয়া কিরূপে অবস্থান করিবে? সাধারণ কখনও বিশেষকে ছাড়িয়া, অথবা বিশেষের বহির্দ্দেশে, কিম্বা পৃথকভাবে পাশাপাশি থাকিতে পারে না। সুতরাং আদর্শরাজি অথবা অনিত্য দ্রব্যজাতের নিত্য আকার সমূহ, যাহারা দ্রব্যসমূহ হইতে পৃথক কল্পিত হইয়াছে, তাহারা বাস্তব এবং চিন্ময় সত্তা কিম্বা দ্রব্যজাতের অবলম্বন স্থানীয় নহে। প্লেটো চিন্ময় সত্তার 'আউসিয়া' (Ousia) নাম দিয়াছেন। অ্যারিষ্টটলের মতে, আউসিয়ার স্বতন্ত্র বা স্বাধীন অস্তিত্ব নাই ; তবে, তিনি জাতিসমূহের বাস্তব (Objective exis ence) বিশ্বাস করিতেন। উভয়ের মতেই সাধারণ ধারণা, বিশেষ জ্ঞানের সারভাগ (Essence) এবং কেবল সারভাগরূপেই উহার আউসিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ধারণাগুলি যে দ্রব্য হইতে পৃথক্ অবস্থিতি করে, প্লেটোর এই মতটী অ্যারিষ্টটল খণ্ডন করিতে চাহিয়াছেন ধারণা বস্তুরই অন্তর্নিহিত ভাব ; উহা বস্তুরই রূপ (Form) এবং একমাত্র চিন্তা সাহায্যেই পৃথক কল্পিত হয়। ধারণা বস্তুর সারাংশ এবং ধারণাযোগেই বস্তুর বস্তুত্বপ্রাপ্তি।

প্লেটোর স্বরূপবাদ বা আদর্শবাদ দোষাবহ ; তাই বলিয়া জড়বাদিগণ যে বস্তু বিচার সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাও নহে। রূপকে ছাড়িয়া জড়ের অস্তিত্ব নাই। এইরূপ শুধু দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ বা উচ্চতা লইয়া নহে, পরন্তু গুণ মাত্রই রূপের অন্তর্গত। জড়ের যে বিশেষ বিশেষ আকার বা অবস্থা দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল দৈর্ঘ্য প্রস্থাদি সহযোগে উৎপন্ন হয় না, যাবতীয় গুণের সমবায়ে হইয়া থাকে। আবার, ধারণাব্যতীতও জড়ের অস্তিত্ব অসম্ভব। দ্রব্যসমূহ আদর্শ হইতে পৃথক থাকিয়া, পরিশেষে আদর্শেই অভিব্যক্ত হয় এবং জড়ের মূলে ধারণা না থাকিলেও, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে উহা স্বয়ংই কার্য্য করিয়া আসিতেছে, এই উভয় কল্পনাই মানসিক সংস্কারমাত্র। গতিও স্বয়ং অসিদ্ধ ; কেননা গতিমাত্রেরই মূলে গতিসিদ্ধির হেতু প্রয়োজন। অতএব দৃষ্ট হইতেছে যে, আদর্শ বা ধারণা, জড় এবং গতি, এ তিনের কাহারই স্বকীয় স্বাধীন অস্তিত্ব নাই; পক্ষান্তরে সমস্তকে লইয়া বাস্তব সত্তা বা বস্তু বিশেষের উৎপত্তি। বাস্তবসত্তা (Reality) অর্থে, পূর্ণাবয়ব ও পরিণত বস্তুরই জ্ঞান জন্মে। উহা বিভিন্ন উপাদানে গঠিত। চিন্তাবলে উপাদানগুলির পৃথক কল্পনা সম্ভবপর হইলেও, উহারা কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। উপাদানসমূহের মধ্যে ধারণা বা রূপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অ্যারিষ্টটল উহাকে আত্মা বা সৎ (সত্তা) স্বরূপগণ্য করিয়াছেন। জড় উহার আশ্রয়, একান্ত অপরিহার্য্য অবলম্বন।

এইক্ষণ বস্তুর উৎপত্তিসাধক কারণগুলির বিচার করিতে হইবে। স্বভাবজাত বা শিল্পজাত যে কোন দ্রব্যই হউক, তাহার চারি প্রকার কারণ নির্দ্ধারিত হইতে পারে, যথা, (১) উপাদান কারণ (Material cause), (২) আকৃতিগত বা আবয়বিক কারণ (Formal cause), (৩) নিমিত্ত কারণ (Efficient cause) এবং (৪)

উদ্দেশ্যসাধক কারণ (Final cause)। প্রতিমূর্ত্তি একটী শিল্পজাত দ্রব্য। প্রতিমূর্ত্তির বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় (১) যে উপাদানে উহা গঠিত হয়, সেই উপাদান অর্থাৎ কাষ্ঠ স্ফটিক অথবা পিত্তলাদি ধাতুর প্রয়োজন; (২) যে ধারণা বা নক্সা অবলম্বনে মূর্ত্তিটী গঠিত হইবে, সেই ধারণা বা নক্সার প্রয়োজন (যদি প্রশ্ন হয়,এই ধারণা বা নক্সার অবস্থিতি কোথায়; তাহার উত্তর এই যে,উহা শিল্পীর মনেই বিদ্যমান থাকে।) (৩) হস্ত বাহু বা যন্ত্রপাতির প্রয়োজন, যদ্দ্বারা মূর্ত্তিটীর গঠনকার্য্য সম্পন্ন হয়; ইহারা নিমিত্ত কারণ; (৪) যে উদ্দেশ্য বা সঙ্কল্প দ্বারা বিভিন্ন শক্তিগুলি নির্দ্দিষ্টপথে চালিত হইয়া, কারণসমূহে লীন মূর্ত্তিটীকে কার্য্যে পরিণত করে, তাহার নাম উদ্দেশ্যসাধক কারণ। স্বভাবজাত দ্রব্যাদিরও এই নিয়ম। যথা, মানবের উৎপত্তি বিচার করিতে হইবে। প্রথমতঃ, একটী জীবকোষের উপাদান আবশ্যক, যাহা হইতে কোষটী গঠিত এবং বর্দ্ধিত হয়; দ্বিতীয়তঃ, যে ধারণা বা বিশিষ্ট আকারানুসারে জীবকোষ পুষ্টিলাভ করে; তৃতীয়তঃ, গর্ভাধান, চতুর্থতঃ যে নৈসর্গিক উদ্দেশ্যহেতু, বিভিন্ন কারণ হইতে মানবরূপ কার্য্য সম্পন্ন হয়। তাহা হইলে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, দ্রব্য মাত্রেরই, অর্থাৎ জগত সৃষ্টির মোটের উপর, উপাদান, ধারণা, নিমিত্ত এবং উদ্দেশ্য, এই চারি প্রকার কারণ থাকা দরকার। শিল্পজ কিম্বা স্বভাবজ যে দ্রব্যই হউক, সত্তা আখ্যা লাভ করিতে হইলে, এই কারণচতুষ্টয়ের সম্মিলন বা সহায়তা ভিন্ন তাহার উত্তবের কোন সম্ভাবনাই নাই। কিন্তু কারণগুলির প্রত্যেকের স্বাধীন বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। কারণ গুলি বস্তুগত অর্থাৎ বস্তুই তাহাদের আশ্রয়। কোন একটী স্বভাবজাত দ্রব্যের মূলে সেই শ্রেণীর বা সেই জাতীয় অপর দ্রব্যের কল্পনা অপরিহার্য্য অর্থাৎ বস্তু মাত্রই কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সেইরূপ, নীতি বিজ্ঞান কিম্বা কলাবিজ্ঞান বিহিত প্রত্যেক পরিবর্ত্তনের মূলেও, কারণস্বরূপ অপর কোন পরিবর্ত্তনের অবস্থিতি বিষয়ে সংশয় নাই। দৃষ্টান্ত এই যে, ব্যক্তিমাত্রেই অপর কোন ব্যক্তির নিকট শিক্ষালাভ করে। নিমিত্ত বা উৎপত্তি কারণ স্বয়ংই বস্তুরূপে গণ্য, এবং যাহা কিছু অসম্পূর্ণ, লীন বা লুপ্ত অবস্থায় থাকে, তাহা অপর কোন পূর্ণ বস্তুর সহ যোগেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

দর্শনশাস্ত্রে যদিও সৃষ্টির চারিটী কারণ নিরূপিত হইয়াছে, তথাপি তাহাদের তিনটী, যথা, (১) ধারণা বা রূপ (Formal cause), (২)। নিমিত্ত (Efficient cause) এবং (৩) উদ্দেশ্য (Final cause), কারণ পরস্পর মিলিত হইয়া একটী মাত্র কারণে পরিণত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শিল্পজগতে ভাস্করের কল্পনাজাত কোন দেবতার ধারণা হইতে, তদীয় হস্ত ও মাংসপেশি সমূহ সঞ্চালিত হয় বলিয়া উক্ত দেবতার মূর্ত্তি গঠনরূপ উদ্দেশ্যটী উপদান সহযোগে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। এস্থলে নিমিত্ত এবং উদ্দেশ্যসাধক কারণদ্বয়, ধারণা হইতে সঞ্জাত বলিয়া, ধারণা এবং উপাদান, মাত্র এই দুইটী কারণেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। স্বভাবজাত দ্রব্য, মানব সম্বন্ধেও এই নিয়ম। মানব-সৃষ্টি কল্পে প্রথমে মানবের ধারণা প্রয়োজন। মানব সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে, তাহার সৃষ্টি-অসম্ভব হইত। এই ধারণা

মানব মনেই সঞ্জাত হয় এবং মানবই উহা কার্য্যে পরিণত করে। উভয় ক্ষেত্রেই ধারণা, আকৃতি, নিমিত্ত এবং উদ্দেশ্যের পরিবর্ত্তে প্রযুক্ত হইতেছে।

সৃষ্টি-সাধনের নিমিত্ত তাহা হইলে চারিটী স্থলে মাত্র দুইটী কারণ দাঁড়াইল। একটী ধারণা বা রূপ, যদ্দ্বারা সৃষ্টি সাধিত হয়, এবং যাহা সৃষ্টির লক্ষ্য স্থানীয়; এবং অপরটী উপাদান, সৃষ্টি মাত্রই যাহার অবস্থা ভেদ। প্রথমটী মূল কারণ বা মুখ্য প্রয়োজন সাধক; দ্বিতীয়টী, গৌণ কারণ, অবস্থা মাত্র (mere condition)। ধারণা এবং উপাদান যখন যাবতীয় সৃষ্টি ব্যাপারের পূর্ব্বাবস্থা (antecedents), তখন এই দুই বস্তুর উৎপত্তি কল্পনা-বহির্ভূত. কেন না, তাহা হইলে সত্তার ধারণার পূর্ব্বেও উহাদের বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু এরূপ করা অসম্ভব। সৃষ্টি মাত্রেরই যখন পূর্ব্বাবস্থা ধারণা ও উপাদান, তখন ধারণা ও উপাদানের কারণ স্বরূপ অপর কোন বস্তুর কল্পনা দুঃসাধ্য। অ্যারিষ্টটল এবং প্লেটো দুজনেই ধারণা ও উপাদানকে অনন্ত বলিয়াছেন; পার্থক্য এই যে, অ্যারিষ্টটলের কল্পিত উপাদান দ্বৈতবাদের স্বপক্ষে গৃহীত হয় নাই। প্লেটোর মতে উপাদান (জড়) এবং ধারণা (আদর্শ) পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব। তাহাই যদি হয়, তবে উভয়ে মিলিত হয় কিরূপে? পরস্পরের সহায়তায় বস্তু জাতের উৎপত্তি সিদ্ধির উপায় কি? দুইটী বস্তু পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম হইলে, তাহারা কখনই মিলিত হইয়া বা এক যোগে কার্য্য করিতে পারে না।

প্লেটোর অসত্তা (Neon; 'non-being') এবং প্রকৃত জড়, সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ। তিনি জড়কে সত্তা ভাবাপন্ন অসৎ বলিয়াছেন এবং অসতের রূপ গুণাদি কিছুই কল্পনা করেন নাই; ধরিতে গেলে, তাঁহার মতে, অসৎ কিছুই নয় (absolute privation)। যাহা কিছুই নয়, তাহার আবার অস্তিত্ব কল্পনা কেন? জড়ের ধারণা সত্তার ধারণারই অনুরূপ, এমন কি, জড় কিয়দংশে স্বয়ংই সত্তা স্থানীয়। জড় অসত্তা নহে, সত্তার অব্যক্তাবস্থা। পূর্ণাবয়ব বস্তু মাত্রই জড়ের পরিণতি, অব্যক্ত হইতে ব্যক্তরূপে পরিবর্ত্তন, অপ্রকটাবস্থার প্রকটভাব। জড় রূপেরই আদি অবস্থা, জড় ও রূপ অঙ্গাঙ্গী ভাবে বিদ্যমান। জড়ই রূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, অথবা রূপ জড়ের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে। রূপ আছে বলিয়াই জড়ের মূর্ত্তি; রূপ, অথবা জড় ও রূপের সংযোগ ভিন্ন কিছুরই সম্ভব হয় না। কাষ্ঠনির্ম্মিত টেবিল একটী দৃষ্টান্ত। এখানে কাষ্ঠই টেবিল, অথবা টেবিলের অব্যক্তাবস্থা। টেবিল প্রস্তুত হইলে, তখনও তাহা কাষ্ঠই থাকে, প্রভেদের মধ্যে উহার রূপান্তর সাধিত হয়। পিত্তলকে প্রতিমূর্ত্তির অব্যক্তাবস্থা এবং প্রতিমূর্ত্তিকে পিত্তলের ব্যক্তাবস্থা বলা যায়। স্বভাব জগতে, পক্ষীর অণ্ড, সম্ভব-সাপেক্ষ পক্ষী এবং পক্ষী, অণ্ডেরই ব্যক্তাবস্থা। জড় দ্রব্য মাত্রেরই প্রারম্ভ (Beginning); রূপ (আদর্শ) সৃষ্টির চরমোদ্দেশ্য বা শেষ সীমা, দ্রব্যসমূহ যাহাকে পাইবার জন্য নিত্য সচেষ্ট। জড় রূপবর্জ্জিত হইলে, যে সকল বহিরাবয়বের দ্বারা দ্রব্য সকলের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা পায়, তাহাদের নক্সা জড়ে প্রতিফলিত হইত না; তাহার ফলে সৃষ্টি অসম্ভব হইত। জড় ও রূপে কোন বিরোধ নাই, বরং রূপের সহিত জড়ের মিলনাকাঙ্ক্ষাই দৃষ্ট হয়; জড় রূপকে পাইবার জন্য ব্যস্ত। এই মিলনাকাঙ্ক্ষা পুরুষের সহিত স্ত্রীর মিলনা-

কাজ্ঞার তুল্য। জড় ও রূপের (আদর্শের) মধ্যে এক অবিচ্ছিন্নভাব পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া বিদ্যমান। এককে ছাড়িয়া অপরের অবস্থিতি অসম্ভব,-একের কল্পনায় অপরের কল্পনা অনিবার্য্য, একের অভাব অপরে পূরণ করিতে বাধ্য। উভয়ের ক্রিয়ার ফল, বিকাশ বা বিবর্ত্তন, এবং এই বিকাশ বা বিবর্ত্তনই গতি। আ্যারিষ্টটল গতির ধারণাকে অত্যন্ত আবশ্যকীয় মনে করিয়াছেন, যেহেতু এই ধারণার সাহায্যেই তিনি কিয়ৎ পরিমাণে প্লেটোর দ্বৈতভাব পরিহার করিতে সমর্থ হইয়াছেন; কিন্তু *প্লেটো যে সংখ্যার ধারণা হইতে এইরূপ* চেষ্টা না করিয়াছেন, এমন নয়। সামর্থ্যের (Capacity) সহিত শক্তির (Energy) যে সম্বন্ধ, বীজের সহিত পরিণত জীবের যে সম্বন্ধ, জড়ের সহিত রূপের সেই সম্বন্ধ হইলে, উভয়ের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে কোন বৈরিভাব থাকিতে পারে না, এবং বস্তু মাত্রই একাধারে অব্যক্ত এবং ব্যক্ত, জড় এবং রূপ হিসাবে গণ্য হয়। সদ্যঃ খনিত ধাতুর তুলনায় পিত্তল যেমন রূপ, প্রতিমূর্ত্তির তুলনায় উহা তেমনি উপাদান বা সামর্থ্য? যে বৃক্ষ হইতে টেবিল প্রস্তুত হয়, তাহা বৃক্ষ বীজের তুলনায় রূপ, টেবিলের তুলনায় উপাদান। শিশুর কাছে যুবা রূপ, কিন্তু পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির কাছে উপাদান।

বস্তুমাত্রই যে একাধারে রূপ এবং রূপের আশ্রয়(Substratum),ধারণা এবং জড়,আত্মা এবং দেহ, এই নিয়মটী একমাত্র সেই মহা-সত্তা (ঈশ্বর) ভিন্ন আর সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। আ্যারিষ্টটলের মতে, উপাদান প্রত্যেক দৈহিক বিকাশের মূলেই বিদ্যমান, অর্থাৎ উপাদান ব্যতীত বিকাশ বা বৃদ্ধি নাই। ঈশ্বর স্বয়ং পূর্ণ, তিনি পূর্ণতাসাপেক্ষ নহেন, অতএব তাঁহাতে উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা না থাকায় উপাদানেরও প্রয়োজন হয় না। তিনি জড়াতীত বিশুদ্ধ (Immaterial) চৈতন্য? যে নামবাদের উপর নির্ভর করিয়া আ্যারিষ্টটল প্লেটোর আদর্শবাদের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, এখানে তিনি সেই নামবাদের বিরুদ্ধেই স্বীয় মত প্রকাশ করিতেছেন। এমন কি, বস্তুমাত্রেই উপাদান-মূলক, নিজের এই কথাটীরও বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বর্ণিত জড়ের সংজ্ঞা সম্বন্ধে চিন্তা করিলে, এই বৈসাদৃশ্য বড় *একটা লক্ষিত হয় না। জড় অর্থে তিনি* বলিতে চান যে, যাহা কিছু অসম্পূর্ণ, যাহা কিছু অস্থায়ী (provisional), যাহার চরমোদ্দেশ্য এখন কার্য্যে পরিণত হয় নাই, তাহাই জড়। জড় শব্দে অসম্পূর্ণতা, সামর্থ্য বা সম্ভাব্যতা (Potentiality), অব্যক্তাবস্থাই প্রকাশ পায়। ইহাই যদি উপাদানের অর্থ হয়, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে জাগতিক সৃষ্টিব্যাপারে প্রত্যেক বস্তু, তদপেক্ষা নিম্নস্তরের বস্তুর তুলনায়, ধারণা বা রূপ, এবং সেই জাতীয় উচ্চস্তরের বস্তুর তুলনায়, জড় বা উপাদান স্থানীয়। এই হিসাবে উহাকে পূর্ণ এবং অপূর্ণও বলা যাইতে পারে। কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠতম সত্তা বা ঈশ্বরই বিশুদ্ধ ধারণা, বিশুদ্ধ রূপ এবং নিরপেক্ষ সত্য। আ্যারিষ্টটল ইহাও বলিয়াছেন যে, সর্ব্বশেষ উপাদান, যাহা হ্রাস-বৃদ্ধিবিনাশের অতীত, তাহার সহিত রূপেরও কোন পার্থক্য নাই। এস্থলে ইহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, বোধ হয় তিনি সেই মহাসত্তা, পরব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে সৃষ্টির শেষ এবং চরম পরিণতি বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন

না। কিন্তু, তাই বলিয়া যে, এক অনন্ত মহাশক্তি বা সত্তা, ক্রমগতভাবে ক্রম বিকাশের পথে ধাবিত হইতেছে এবং তাহাই যে সর্ব্বপ্রথম রূপের পূর্ব্বাবস্থা, কেবলমাত্র উপাদানস্বরূপ বিরাজ করিত, তিনি এরূপ কল্পনার পক্ষপাতী নহেন। অনন্ত মহাসত্তা যদি সর্ব্বপ্রথম বীজ বা সামর্থরূপেই বিরাজ করিতেন, তাহা হইলে সেই বীজশক্তি বা কূটস্থগূঢ়চৈতন্যকে ঈশ্বর বলা চলিত না; তাঁহার ঈশ্বরোপাধিলাভের জন্য, অপর আর একটী পূর্ণব্রহ্মের আবশ্যক হইত। কেননা, পূর্ণতাই সৃষ্টির আদিম অবস্থা, পূর্ণবস্তুর সাহায্য ব্যতীত কিছু পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। অ্যারিষ্টটলের এই মতটী ইলিয়াটিক, 'অসৎ হইতে সতের উদ্ভব হয় না (Ex nihilo nihil)' মতের তুল্য। সৃষ্টির আদিতে যে শৃঙ্খলা ছিল না, অর্থাৎ জগতের যে সেই তমোময় সুপ্তাবস্থার ধারণা, অ্যারিষ্টটলের মতে তাহা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে। রূপ অথবা ধারণা, এবং উপাদান, উভয়ই অনন্ত বলিয়া উপাদানের সহিত রূপের কখন বিচ্ছেদ ঘটে নাই; সৃষ্টি পূর্ব্বেও কোন বিশৃঙ্খলার ভাব বিদ্যমান ছিলনা।

অনন্ত মহাসত্তা স্বয়ংই উৎপত্তি-কারণ, রূপ এবং সৃষ্টির চরমোদ্দেশ্য। এই সত্তাই স্বয়ং গতিবিহীন, অথচ গতির আদি কারণ (The first mover)। কার্য্য, কারণ সম্বন্ধ বিচার হইতে গতির প্রথম আধারস্বরূপ এই মহাসত্তার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। গতি বুঝিতে হইলে, গতি সম্পন্ন বস্তুর কল্পনা আবশ্যক এবং তাহা হইলে আরও একটী অধিকতর গতিবিশিষ্ট বস্তুর কল্পনা না করিলে চলে না। এইরূপে, আমরা গতি ও গতির আধার অথবা যে কার্য্য-কারণ শৃঙ্খল দেখিতে পাই তাহাকে অনন্ত বলা ভুল। কেন না; কারণ সূত্রাবলম্বনে অগ্রসর হইতে থাকিলে, এমন এক স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে যে, যাহার অধিক আর অগ্রসর হওয়া যায় না; সেইখানেই গতির প্রথম কারণ বা মূলাধারের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। যাহারা লিউসিপাস এবং ডিমক্রিটাস প্রভৃতির ন্যায় গতির আদি কারণ পরিত্যাগ করতঃ, গতির অস্তিত্ব এবং অনন্ত কার্য্য কারণ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে প্রস্তুত, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত। বিশেষতঃ আদিকরণ অনন্তকাল ক্রিয়ারত বলিয়াই তৎপ্রসূত গতিরও বিরাম নাই। *কাল হিসাবে বিশ্বের আদিও নাই,* অন্তও নাই, কিন্তু স্থানহিসাবে বিশ্ব সসীম। বিশ্ব স্থানে সীমাবদ্ধ থাকায়, ঈশ্বরের গতি শীলতার বাধা জন্মে।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, যাহা নিজে গতি বিহীন, তাহা আবার অপরকে চালায় কিরূপে? নিজে না চলিলে, নিজে গতিবিশিষ্ট না হইলে, কি অপরকে চালান যায়? অবশ্যই যায়। সুন্দর এবং মনোজ্ঞ বস্তু যে উপায়ে মানবকে চালিত করে, কারু-কার্য্য সম্পন্ন কোন মনোরম দ্রব্য অথবা চিত্ত-বিমোহন কোন নৈসর্গিক দৃশ্য, যেমন নিজে স্থির থাকিয়াও সৌন্দর্য্যবলে লোককে তৎপ্রতি আকর্ষণ করে, বস্তুমাত্রই সেইরূপ ঈশ্বরের প্রতি আপনা হইতে চালিত হইতেছে। যিনি আমার জীবনের আদর্শ, তিনি যদি আমার নিকট স্বয়ং আগমন না করেন, তবে আমাকেই তাঁহার নিকট যাইতে হইবে। সৃষ্টিব্যাপারেও অনন্ত আদর্শ বা রূপ নিজে নিশ্চল থাকিলেও উপাদান মাত্রই তৎকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতেছে। ঈশ্বরের সহিত মিলনের জন্য তাহার যে

আকাঙ্ক্ষা, ঈশ্বরই সেই আকাঙ্ক্ষার আদি কারণ।

অনন্ত মহাসত্তা জড়বিবর্জ্জিত বলিয়া উহাতে কোন প্রকারের সংস্কার, অনুভূতি, বাসনা অথবা সুখদুঃখাদি বোধ জন্মিতে পারে না। এইসকল আসক্তির ভাব জড়েই সম্ভব কেন না, জড় স্ত্রীভাবাপন্ন, উহাতে রূপের ক্রিয়া প্রতিফলিত হয়। ঈশ্বর শুদ্ধ চৈতন্য। মনুষ্য ইন্দ্রিয়জ্ঞান, বিষয়ানুভূতি বোধশক্তি এবং তুলনাদ্বারাই পরিণতিলাভ করে। ঈশ্বরের জ্ঞান (Divine nous) প্রত্যক্ষ সিদ্ধ যাবতীয় বস্তুর সত্তা দর্পণের ন্যায় তাহাতে প্রতিভাসিত। বিচার সাপেক্ষ মানববুদ্ধি প্রত্যক্ষভাবে ভিন্ন প্রকৃতি কোন বস্তুর জ্ঞান-লাভে সমর্থ নহে। উহার জন্য মানবকে চিন্তার অনেকগুলি বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিতে হয়। বস্তুমাত্রেরই সত্তা এবং ঈশ্বরের নিরপেক্ষ চিন্তাশক্তি, উভয়ের প্রকৃতি-গত পার্থক্য নাই; তিনি বস্তুর উৎপত্তিকারণ বলিয়া তাঁহার নিকট কিছুই ভিন্নপ্রকৃতি নহে। তাঁহাতে একাধারে সমস্ত বিদ্যমান বলিয়া, তিনি বস্তুজাতের নিগূঢ় রহস্য প্রত্যক্ষ ভাবে দর্শন করিতেছেন। তিনি নিত্যমুক্ত, অর্থাৎ তিনি অভাব, আকাঙ্ক্ষা বা দুঃখাদির অতীত। তিনি চিরানন্দময়। মানবজীবন ভক্তিরসে আর্দ্র হইলে, তখনই তাহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সামান্যরূপ প্রতিভাত হয়। যে সামান্য সুখের অনুসন্ধানে মানব জীবন-পাত করিতে প্রস্তুত, ঈশ্বর সেই সুখেরই একমাত্র অধিকারী। অনন্ত বিশ্বের সত্য চিন্তাই তাঁহার জীবন।

বিশ্বের উদ্দেশ্যসাধক কারণ এবং সর্ব্বোচ্চশ্রেয়ঃ বলিয়া ঈশ্বর বস্তুজাতের অন্তর্নিহিত অর্থাৎ লৌকিকভাবে এবং বহির্দেশে, অর্থাৎ অলৌকিক ভাবে বিদ্যমান। তাঁহার সহিত জগতের সম্বন্ধ, সেনাপতির সহিত সৈন্যদলের সম্বন্ধের ন্যায়! অর্থাৎ যে শাসনশক্তি সৈন্যসঙ্ঘের অন্তরে থাকিয়া সৈন্যদিগকে পরিচালিত করে, সেই শক্তি সেনাপতিরই মনঃসম্ভূত। ঈশ্বর স্বয়ং বিধি এবং বিধাতা, নীতি এবং নিয়ামক, ব্যবস্থা এবং ব্যবস্থাপক (Order and orderer)। সৃষ্টিমাত্র তাঁহারই উদ্দেশ্যে, তাঁহার দ্বারাই ঐক্য-সম্পন্ন এবং ব্যবস্থাপিত হইতেছে। এবং তিনি এক বলিয়া, একটীমাত্র বিশ্বই সৃষ্ট হইয়াছে; পক্ষান্তরে, বস্তুজাতের মধ্যে যে ঐক্য দৃষ্ট হয়, তাহাই একেশ্বরবাদের প্রমাণ। এই এক এবং মুখ্য উদ্দেশ্যের উপর স্বর্গ মর্ত্ত প্রভৃতি যাবতীয় সৃষ্টি নির্ভরশীল (ক্রমশঃ)।

শ্রীদিগ্বিজয় রায়চৌধুরী।

যশোহর সম্মিলন।

সকলেই জানেন, এবার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন যশোহরে হইয়াছিল। রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুরের যত্নে ও পরিশ্রমে এই মহৎকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। ন্যূনাধিক ৮০০ শত সাহিত্যিকের শুভাগমন হইয়াছিল। তাঁহাদিগের যত্ন ও সেবা যদু-বাবু, তাঁহার পুত্র ও জামাতা এবং সমস্ত স্বেচ্ছা সেবকদল যথাসাধ্য করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। এবার সভাপতি ছিলেন মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যা-

ভূষণ। কোন কোন বিষয়ে যেরূপ আগুন জ্বলিবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহাতে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ন্যায় নম্রতা ও বিনয়-ভূষিত সভাপতি না থাকিলে শান্তি রক্ষা করা বড়ই কঠিন হইয়া উঠিত। অপরাহ্ন দুইটার সময় সভার অধিবেশন হয়। সঙ্গীত মঙ্গলাচরনাদির পর সভাপতির বক্তৃতা পঠিত হইয়াছিল। অভিভাষণটী গভীর গবেষণার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই; উহা বাঙ্গালাভাষার ক্রমোন্নতি এবং বিভিন্ন স্বর-বিন্যাস যে ভাবে শিক্ষা দিয়াছে, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। বৌদ্ধ সাহিত্যের সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম উন্মেষ যেরূপভাবে জড়িত,তাহা বিদ্যাভূষণ মহাশয় সংক্ষেপে দেখাইয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। চারিটী শাখাতেই অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। যদুবাবুর বর্ষীয়সী মাতা এবং রামানন্দ বাবুর কন্যারা সম্মিলন স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যদুবাবুর মাতা সকলকে সম্বোধন করিয়া দুই চারিটী কথায় যেরূপ সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকের চক্ষে জল আনিয়াছিল। শ্রীমতী মানকুমারীর কবিতা বড়ই হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল। সান্ধ্য-সম্মিলনাদির অভাব ছিল না। নিম্ন শ্রেণীর লোকের জন্য নারি গানেরও ব্যবস্থা ছিল। বস্তুতঃ, এবার সম্মিলনের কার্য্য বড়ই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। আশা করি বর্ষে বর্ষে সম্মিলন ক্রমেই উচ্চপদবীতে আরোহণ করিবে।

শ্রীশশধর রায়।

সাহিত্য ও ভাষা-সমস্যা।

আমরা হিন্দু, বাণীর আরাধনা এবং সাধনা আমাদিগের কাছে ছেলেখেলা নহে, তাহা যে আমাদিগের জীবনে মহা খেলা। বড়ই দুঃখের বিষয়, আধুনিক বঙ্গভাষা ও সাহিত্য কতকগুলি বালখিল্য সাহিত্যিকের হস্তে পড়িয়া নিতান্ত বাল্যলীলায় পরিণত হইয়াছে। এমনভাবের দেশে জন্মাইয়াও আজকাল অধিকাংশ লেখকদের রচনা-নৈপুণ্যে সেরূপ চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় না। যদিও বা কোথাও তেমন চিন্তাশীলতা থাকে, তাহাও বৈদেশিক অনুবাদ বা ব্যর্থ অনুকরণ চেষ্টা; আমাদিগের জাতীয় বিশেষত্বের সহিত খাপ খায় না। বর্ত্তমান সময়ে যিনি বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বলিয়া পরিচিত, তাঁহার রচনায় যথেষ্ট ভাবুকতা আছে. কিন্তু দেশীয় অনুভূতির সঙ্গে অধিকাংশ স্থলে তাঁহার যোগ নাই বলিয়া তাহা আমাদিগের প্রাণে, মনে এবং কর্ণে কেমন কেমন ঠেকে? তিনি যতক্ষণ স্বরূপে অবস্থান করিয়া লিখেন, তখন আমাদিগের অভিযোগ করিবার কিছুই থাকে না। কিন্তু তিনি বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হইয়াও, আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ কি গদ্যে, কি পদ্যে, অধিকাংশ রচনাতেই বিরূপভাব ধারণ করেন। জানি না, কি তাঁহার অন্তর্নিহিত নিগূঢ় উদ্দেশ্য? জানি না,

সবুজপত্রের ছায়াতলে বসিয়া এ ছেলেখেলায় কি তাঁহার সার্থকতা ; পুরাতনের উপর কি তাঁহার আক্রোশ ? তাঁহার দেখাদেখি, তাঁহার অধিকাংশ উদীয়মান (উড্ডীয়মান ?) শিষ্য-সেবক আজ বাঙ্গালীর বিশেষত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিতে বদ্ধপরিকর ও উদ্দাম উশৃঙ্খলতার পক্ষপাতী। দেশের অধিকাংশ হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য, অপরিণামদর্শী, অপরিণত বয়স্ক পাঠক-পাঠিকা আজ তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, জানি না কোন্ উদ্দেশ্য-হীন পথে ছুটিয়াছে! জানি না, বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ রবীন্দ্রনাথের বহির্মুখীন চিন্তাশীলতা দ্বারা কতটা সমুজ্জ্বল হইবে ?

রমেশের ন্যায় অধিকাংশ বিকৃত শিক্ষিত যুবক অধ্যয়নকালে ছাদে বসিয়া হেমনলিনীর ন্যায় অনেক উচ্চশিক্ষিতা যুবতীকে দেখে ; রবীন্দ্রনাথের নভেল পাঠে অনেক সংসারে আজ বিধবা বিনোদিনীর ন্যায় অনেক চোখের বালীর সৃষ্টি হইয়াছে, কমলার ন্যায় এখন অনেক বঙ্গকুলবধূ রমেশের ন্যায় উদ্ধার কর্ত্তাকে স্বামী বলিবার সুবিধা খুঁজিতেছে। বাঙ্গালীর এতাদৃশ অধঃপতনের কারণ কি রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ ঔপন্যাসিকগণ নহেন ? এই জন্য সর্ব্বাগ্রে আমরা বঙ্গের সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রকেই অধিক দোষী এবং দায়ী মনে করি। বঙ্কিমচন্দ্র ভাষা এবং সাহিত্যের অনেক উপকার সাধন করিলেও, আমাদের কতটা উপকার করিয়াছেন, আজ তাহা বাস্তবিকই একটু ভাবিবার বিষয়। ব্যাল-জাক ফ্রান্সের উপন্যাস-জগতের গুরু হইলেও, তাঁহার দ্বারা ফরাসীজাতীর জীবন কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, বর্ত্তমান যুগের নব্য ফরাসী আজ তাহা বিশেষভাবে বুঝিতে পারিতেছে। আমাদিগের নবীনচন্দ্র, গুরু-দাস প্রভৃতি ভবিষ্যৎদর্শী শুভকামী মনীষিগণ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের দ্বারা সামাজিক ক্ষতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। এমন কি, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার উপন্যাসগুলি দ্বারা বাঙ্গালীর কি ক্ষতি করিয়াছেন, তাহা শেষ বয়সে বুঝিতে পারিয়া আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য আমাদিগের সমাজকে যত দিন না সুপথে চালিত করিবে, ততদিন আমরা সাহিত্যিক হইয়াও, অলক্ষ্যে দেশের শত্রুতা এবং সর্ব্বনাশ করিয়া যাইব।

ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে—Novelty brings calamity। বড় খাঁটী কথা। নানারূপ বহির্মুখীন অভিনবত্বই আমাদিগের ধর্ম্ম ও শান্তির সংসারে আগুন লাগাইয়াছে। আমাদিগের নির্ব্বিবাদ, সন্তোষপর জীবনে এই সব বিকৃত উপন্যাস সমূহই ঘরে বাহিরে সয়তানের আগুন জ্বালাইয়াছে। Sir Walter Scott ঔপ-ন্যাসিক জগতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলিয়া বিখ্যাত হইলেও, ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎবক্তা ঋষি Carlyleএর সূক্ষ্মদর্শিতার ভিতর তিনি কিরূপ স্থান পাইয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা তাঁহার Burns, Sir Walter Scottএর সমা-লোচনা পড়িয়াছেন, তাঁহারা বিশেষভাবে অবগত আছেন।

Carlyle তাঁহার Waverly নভেল সম্বন্ধে কি বলিয়া গিয়াছেন, শুনুন :—

"What, then is the result of these Waverly Romances? Are they to amuse one generation only? One or more! As many generations as they can; but not all generations."

কতকগুলি অকর্ম্মা আলস্যপ্রধান বিশ্বাসী-দিগের জন্যই Scott নভেল লিখিতে প্রবৃত্ত

হইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার অর্থের পথ সুগম হইয়াছিল এবং farm house বাড়িয়াছিল বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনের কোন কল্যাণই সাধিত হয় নাই।

কেবল কতিপয় আলস্য-প্রধান ব্যক্তির কামোদ্দীপনা ও বিলাস-বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য সাহিত্য সাধনা নহে; সাহিত্যের স্থান তাহার অনেক উচ্চে। যে সাহিত্যিকের দ্বারা জাতীয় কল্যাণ, ও ধর্ম্মজীবন সাধিত ও গঠিত না হয়, তাহার সাহিত্য-চর্চ্চা জীবনে বিড়ম্বনা মাত্র। সাহিত্যিকরাই দেশের এবং সমাজের প্রকৃত সারথি। সে দায়িত্বজ্ঞান যে লেখকের নাই, তাহার বাণীর চরণ পূজা হইতে বিরত থাকাই শ্রেয়। বঙ্কিমচন্দ্র এতগুলি উপন্যাস লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে তিনটীকে আমরা আদর্শ ও উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, যথা—আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, ও সীতারাম। এই তিন খানিই বাঙ্গালীর উত্থানের অনুকূল সামগ্রী, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য উপন্যাস গুলি বাঙ্গালীর অধঃপতনের মূল বলিলেও আমার আক্ষেপ যায় না।

ফরাসী সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, ব্যালজাকের 'Peau de Chagrin' নামক একখানি নভেলে বিগত শতাব্দীর ফরাসী জাতির কতই না সর্ব্বনাশ করিতেছে। ফরাসী সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট সমালোচক বলিতেছেন—"Balzac's rich imagination transported us into a magical world, but more than one generation of Frenchmen was afflicted with the possession of a "peau de chagrin" that prevented all action and destroyed all joy of life. ইহা বিংশ শতাব্দীর নব-প্রাণ-দীপ্ত ফরাসী জাতিই বলিতে পারে, অকর্ম্মণ্য বিলাসপ্রাণ ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরাসীরা বোধ হয় এ কথা বলিতে সাহস করিত না।

তেমনি, বাঙ্গালার বর্ত্তমান কমল-বিলাসী বাঙ্গালী আমরা বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের জাতীয় অধঃপতনমূলক নভেল সমূহের বিরুদ্ধে এইরূপ ভাবে বলিতে কি সাহসী হইব? পরমুখাপেক্ষী আমরা, আমাদের বলিবার সে সাহস এবং স্বাধীনতা কোথায়? আমি অন্যান্য ভুঁইফোড় গল্প-লেখকদের কথা আর উত্থাপন করিলাম না, কারন তাঁহাদের রুচি অতি জঘন্য এবং তাঁহারা নকলেরও নকল করিয়া থাকেন। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনাই বাঙ্গালীর প্রেয় হইতে পারে, কিন্তু শ্রেয় নহে। এই সব জঘন্য রুচির নাটক নভেল বাঙ্গালীকে জগতের উন্নতির পথে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিবে। এই সব নাটক নভেলের বাহুল্য বশতঃই বাঙ্গালী তাহার স্বভাবসিদ্ধ মোটা চাল ও সরল চিন্তা দূরে পরিহার করিয়াছে। Plain living and high thinking are no more—সকলেরই মুখে এখন এই আক্ষেপেই শুনিতে পাই।

কি সাহিত্যে, কি সমাজে অনুকরণপ্রবৃত্তা এবং পরমুখাপেক্ষিতাই আমাদিগের যথাসর্ব্বস্ব হইয়াছে। বাঙ্গালীর সর্ব্ব প্রধান দোষ এই যে, সে যাহা একবার অনুকরণ করে, তাহা মজ্জাগত করিয়া লয়—একবার গ্রহণ করিলে আর বর্জ্জন করিতে পারে না। এই বর্জ্জন করিবার শক্তি নাই বলিয়াই সমগ্র হিন্দু জাতিটাই আজ আবর্জ্জনা বহুল হইয়া পড়িয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাস-রচনা দ্বারা

বাঙ্গালীর অনুকরণ-প্রবৃত্ত প্রাণে যে সব বৈদেশিকতা ঢুকাইয়াছেন, তাহা এখন আমরা অন্তরঙ্গ করিয়া লইয়াছি ও জীবনটা ক্রমশঃই আমাদের Romance হইতে চলিয়াছে। তাহার পর অদ্ভুতকর্ম্মা রবীন্দ্রনাথ Tolstoy, Ibsen, Maeterlink প্রভৃতিকে অনুকরণ করিয়া, বঙ্গের সাহিত্য ক্ষেত্রে যে আঙুর ফলাইয়া যাইতেছেন, তাহা বাঙ্গালার নরনারীর প্রাণে কিরূপ বেদন বন্ধন জাগাইতেছে তাহা বিশেষজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন। তাহার পর তাঁহার শিষ্য-সেবকেরাও বাঙ্গালার খেনো মাটীতে আঙুর ফলাইতে কম চেষ্টা করিতেছেন না। পেয়ালা এবং সিরাজীতে বাঙ্গালী মস্‌গুল হইয়া উঠিতেছে। এত দিন বাঙ্গালীর বাহিরে এই সব সুধাপান চলিতেছিল এখন ক্রমশঃ দেখিতে পাইতেছি, বাঙ্গালার সতী সাবিত্রী অরুন্ধতী-পূর্ণ অন্তঃপুরও গুলজার হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালার নারী জাতিকে এখন উদ্ধত মার্গে কাহারা লইয়া যাইতেছে? ইহার উত্তরে আমরা কি সাহস করিয়া বলিতে পারি না—কতকগুলি ক্ষুদ্র কবি ও ঔপন্যাসিকের দল। যে কবিতায় এবং উপাখ্যানের ভিতর চুম্বন এবং আলিঙ্গন নাই, সে কবিতা কবিতা নহে, সে উপন্যাস উপন্যাস নহে ইহাই যাহাদের ধারণা, তাহাদের নিকট সে দেশের কোন সুফল আশা করা বৃথা। এই সব বিকৃত রুচির জন্য আমরা পাঠক সম্প্রদায়কে দোষ দিতে পারি না, সর্ব্বাগ্রে মাসিক পত্রের কতকগুলি অর্ব্বাচীন সম্পাদক ও লেখক মহাশয়েরাই দায়ী। লেখক মহাশয়দিগের যদি ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য থাকে, সম্পাদকদিগের যদি হিতাহিত বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে এমন ভাবে দেশময় বিষ ছড়াইতে পারে না। বড়ই দুঃখের বিষয়, আজকাল 'নারায়ণ' প্রভৃতি কতিপয় মাসিক পত্রিকা এইরূপ প্রকারের বিষ দেশময় ছড়াইতেছেন।

লেখকগণের এই সব কদর্য্য রচনা ও সর্ব্বাপেক্ষা বৈদেশিক অনুকরণপ্রিয়তাই আমাদিগকে ক্রমশই বাঙ্গালীর প্রেত করিয়া তুলিতেছে এবং সর্ব্ববিষয়েই অস্বাভাবিক বাবু করিয়া তুলিতেছে।

সাহিত্য সমাজকে গঠন করে—এই প্রধান কথাটাই যে আমরা লিখিবার কালে ভুলিয়া যাই। সাহিত্য বিকৃত ও আন্তরিকতা শূন্য হইয়াছে বলিয়াই, সমাজও উচ্ছৃঙ্খল ও প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে, ইহাতে কোন ভুল নাই।

হিন্দুর কাছে ভাষা বা শব্দ একটা নিরর্থকতা নহে, শব্দ একটা গুরুতর বিষয়। ভারতচন্দ্র হইতে নবীনচন্দ্র পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর কাব্যজগতে এই শব্দের ধারা একটা অসীম শক্তির সাধ্য করিয়া আসিতেছিল। 'The song that nerves a nation's heart is itself a deed'—ইহা আমরা পরতে পরতে অনুভব করিতেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ হইতে সে শব্দ-শক্তি-মত্তা ক্রমশঃই ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে—ভাষার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। ভাষা কেবল কতকগুলি অস্পষ্ট দুর্ব্বোধ্য ঝঙ্কারেই পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, ভাষায় সে প্রাণ নাই, সে ভাব নাই; কেবল ধ্বনি যাহা কাণ পর্য্যন্তই যায়, মরমকে স্পর্শ করে না। কিন্তু স্মরণ ব্যতীত শ্রবণ নিরর্থক। বৈষ্ণব কবিদিগের ভাষা কোমল হইলেও, কাণের ভিতর দিয়া মরমকে স্পর্শ করিত। কিন্তু আধুনিক মৌখিক কবি-

দিগের কেবলই গর্জ্জন আছে, প্রকৃত বর্ষণ নাই—সরসতা নাই।

কোমলতা বশতঃ বৈষ্ণব কবিগণ বাঙ্গালী জাতিকে দুর্ব্বল এবং বাঙ্গালার মাটীকে ভক্তিতে কোমল হইতে কোমলতর করিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত শক্তি দিতে পারেন নাই। রামপ্রসাদ এবং ভারতচন্দ্র হইতেই বঙ্গভাষার একটা ভৈরবী শক্তি আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। বঙ্গভাষার সেই শক্তি-মত্তা রঙ্গলাল হইতে গিরীশচন্দ্র, এমন কি, দ্বিজেন্দ্রলাল পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। রবীন্দ্রনাথ হইতে বঙ্গের সাহিত্য এবং ভাষার সেই শক্তির অধঃপতন ঘটিয়াছে। বাঙ্গালীর সাহিত্য এবং ভাষা আজ নির্জীব হইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালা-ভাষায় বহু প্রাদেশিকতা এবং বৈদেশিকতা ঢুকিয়া, বাঙ্গালীর বিশেষত্বের বিশেষ হানি করিয়াছে। লিখন প্রণালীতে বাঙ্গালীকে যে অনুপাতে কপট করিয়া তুলিয়াছে, আচার ব্যবহারেও বাঙ্গালী তেমনি মৌখিক ও কপট হইয়া পড়িতেছে। অশ্লীল বলিয়া আমরা বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যকে দোষা-রোপ করিয়া থাকি, কিন্তু সে অশ্লী-লতায় বাঙ্গালীর চরিত্র যত না দূষিত করি-য়াছে, বর্ত্তমান লেখক এবং লেখিকাগণের প্রেম-কবিতায় এবং উপন্যাসে তদপেক্ষা শতগুণ অশ্লীলতা ও কামভাব উদ্দীপিত হইতেছে! এমন চতুর পাঠক অনেক আছেন, যাহারা লেখক লেখিকার রচনায় তাঁহাদিগের জঘন্য অন্তর্প্রকৃতি অনায়াসে ধরিতে পারেন। এই ভাবে কত যে সাহিত্যিক ব্যভিচার চলিয়াছে এবং পাপের পথ প্রশস্ত হইতেছে, তার ইয়ত্তা নাই।

আমরা বর্ত্তমান সাহিত্য এবং ভাষার সম্বন্ধে অনেক কথা প্রয়োজনবোধে খুলিয়া বলিলাম। এখন এসব কথা তলাইয়া বুঝিবার সময় আসিয়াছে। নাটক নভেল পড়া আমরা ছাড়িতে পারিব না, তাহা জানি। কিন্তু বিষ দ্বারা যেমন বিষ ক্ষয় হয়, এক্ষণে আমাদিগকে তেমনিভাবে নাটক নভেল সম্পূর্ণ নূতন আদর্শে গঠিত করিতে হইবে। যাহাতে ইহাদের দ্বারা যথার্থ লোকশিক্ষা হয় এবং সমাজ রক্ষা পায়, আজ তাহারই দিকে বাঙ্গলার সুনিপুণ শুভাকাঙ্ক্ষী লেখক সম্প্রদায়কে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রব-ন্ধান্তে বলিব, বাঙ্গালার একমাত্র দীনেশবাবুই গল্পরচনায় সে আদর্শ রক্ষা করিয়া আমা-দিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন এবং নাট্যে গিরীশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ রায় সে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন।

শ্রীঅকিঞ্চন দাস।

ইসলাম প্রচারক বাগ্মীবর মুন্সী মোহম্মদ মেহেরুল্লা সাহেবের জীবনী।

এই ক্ষণজন্মা পুরুষ ১২৬৮ সালের ১০ই পৌষ, সোমবার রজনীতে, যশোহর জেলার অন্তর্গত 'ঘোপ' নামক গ্রামে তদীয় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুন্সী মোহাম্মদ ওয়ারেজুদ্দীন। যশো-হরের পাঁচ মাইল উত্তর পশ্চিমে 'ছাতিয়ান

তলা' নামক গ্রামে তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান। জন্মগ্রহণের ছয় মাস পরে তিনি পিত্রালয়ে আনীত হন। মুনশী সাহেবের পিতা একজন ধার্ম্মিক ও নিরীহ ভালমানুষ ছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়ক্রম কালে তিনি পুত্ররত্নকে গ্রাম্য পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিতে দেন। মুন্সী সাহেব যখন "বোধোদয়" পড়িতে-ছিলেন, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুতে তাঁহার মাতা, পুত্র এবং কয়েকটী কন্যা লইয়া বিষম কষ্টে পতিতা হন। বিধবা স্বীয় ভ্রাতাদিগের দ্বারা অনেকটা সাহায্য পাইয়াছিলেন। মুন্সী সাহেবের জননী বিদ্যানুরাগিনী মহিলা ছিলেন; তিনি পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। যশোহরের কচিয়া নিবাসী মৌলবী মহম্মদ ইস্মাইল সাহেবের নিকট তিনি কোরাণ শরীফ, গোলেস্তাবোস্তা এবং কিঞ্চিৎ উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করেন। পরে, সাংসারিক অভাবে পড়িয়া, মোহম্মদ যশোহরে যাইয়া সেলাই শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। সেলাই শিক্ষা করিয়া কিছু দিন পরে তিনি সাহেবদিগের নিকট সেলাই কার্য্যের চাকুরী গ্রহণ করেন। সাহেবদিগের সঙ্গে তিনি কয়েকবার দার্জ্জিলিংয়ে যাতায়াত করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি যশোহরে একখানি দর্জ্জির দোকান খুলেন। তৎকালে যশোহরে খ্রীষ্টীয়ান মিশনারীদিগের খুবই ধর্ম্মভাব ছিল। অনেকগুলি কারিগর এই সময় খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। পাদ্রী আনন্দ বাবুর প্রচার শ্রবণ এবং বাইবেল ও খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্ম-সংক্রান্ত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া, তাঁহার খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে অনেকটা আস্থা জন্মে। তিনি বাপ্তাইজ হয়েন নাই। তিনি যখন বাপ্তাইজ হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সময় কলিকাতাস্থ হাফেজ নেয়ামতুল্লা সাহেব কৃত "খ্রীষ্টান ধর্ম্মের ভ্রষ্টতা" ও বাবু ঈশানচন্দ্র মণ্ডল ও এহমাতুল্লা সাহেব কৃত "ইঞ্জিলিম হজরত মোহাম্মদ" নামক পুস্তিকাদ্বয়, এবং "মনসুরে মোহাম্মদী" নামক বাঙ্গালোর হইতে প্রকাশিত উর্দ্দু পত্রিকাখানি ও খ্রীষ্টীয়ান-দিগের বিরুদ্ধে লিখিত কতিপয় উর্দ্দু পুস্তক পাঠ করিয়া, তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয়; এবং সেই হইতে তিনি পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে দৃঢ়বিশ্বাসী হন। ১২৯৩ সালে তিনি "খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অসারতা" নামক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখেন; এবং যশোহরের হাটে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি হাটে প্রচার আরম্ভ করিলে, পাদরীদিগের নিকট একটীও লোক থাকিত না; সমগ্র জনমণ্ডলী তাঁহার বক্তৃতা-সুধা পান করিবার জন্য তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হইত। অতঃপর তিনি যশোহরে "ইস্লাম ধর্ম্মোত্তেজিকা" নামক একটী ক্ষুদ্র সভা স্থাপন করেন। এই সময় "সুধাকর" নামক স্বনাম-প্রসিদ্ধ মুসলমান সংবাদপত্র খানি বাহির হয়। উপরোক্ত সভার অধিবেশন ও "সুধাকরের" প্রতি মুসলমান জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ জন্য তিনি উক্ত সংবাদ-পত্রের সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গ-সাহিত্য-সেবী মুন্সী মোহাম্মদ রিয়াজুদ্দীন আহম্মদ সাহেব, মৌলবী মেয়রাজউদ্দীন আহম্মদ সাহেব ও মুন্সী শেখ আবদুর রহিম সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া যশোহরে লইয়া যান। যশোহর—"ঘোপে"—মৌলবী সৈয়দ

ওবায়দুল্ল্যা, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, সাহেবের বহিঃপ্রাঙ্গনে এতদুপলক্ষে বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার পর মুন্সী সাহেব নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করিতে থাকেন। তাঁহার বক্তৃতার মাধুর্য্যে শ্রোতাগণ বিমুগ্ধ হইত। ১২৯৮ সালের ২১শে, ২২শে ও ২৩শে আশ্বিন তারিখে বাখরগঞ্জ (বরিশাল) জেলার পিরোজপুর মহকুমার উপর খ্রীষ্টীয়ানদিগের সহিত মুসলমানদিগের এক বিরাট তর্ক-সভা হয়। মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ সাহেবের অনুরোধে তিনি ঐ সভায় গমন পূর্ব্বক, স্বীয় অসাধারণ বাগ্মীতা এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম সংক্রান্ত অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদানে জয়লাভ করেন। "খ্রীষ্টীয়ান মুসলমানে তর্ক-যুদ্ধ" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় ঐ সভার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই ঘটনার পর, তিনি আমাদের গৌরীপুর অঞ্চলে ধর্ম্ম-প্রচারার্থে গমন করিয়াছিলেন। ইং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে জমীরুদ্দিন সাহেব "খ্রীষ্টীয় বান্ধব" নামক পত্রিকায় "আসল কোরাণ কোথায়?" নামক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; মুন্সী সাহেব ১২৯৯ ও ১৩০০ সালের "সুধাকর" পত্রিকায় উহার ঘোর প্রতিবাদ করেন। সে প্রতিবাদেও তাঁহার শাস্ত্র-জ্ঞান ও যুক্তি-প্রয়োগের নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছিল। মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ সাহেবের চেষ্টা ও অনুরোধে, মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন সাহেব, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেবের সহিত প্রচার কার্য্যে যোগদান করেন। অতঃপর ইঁহারা উভয়ে, উত্তরবঙ্গ, মধ্যম বঙ্গ ও পূর্ব্ব বঙ্গে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারে বিশেষভাবে ব্রতী হন। ঐ সময় হইতে তথাকার খ্রীষ্টীয়ান মিশনারীদিগের প্রতিপত্তি ও প্রাধান্য নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেবের উদ্দীপনাপূর্ণ ও যুক্তিমূলক বক্তৃতায় শ্রোতামণ্ডলী বিমুগ্ধ হইয়া যাইতেন। বড় বড় উচ্চশিক্ষিত লোকেরাও তাঁহার বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। তিনি নির্জ্জীব বঙ্গীয় মুসলমান সমাজকে জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। এক-দিকে "সুধাকর" পরে "মিহির ও সুধাকর" "ইস্‌লাম প্রচারক" এবং "সোলতান" সংবাদ-পত্রে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের হৃদয়ে উৎসাহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতেছিলেন, অন্যদিকে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা ও তাঁহার সহযোগীদিগের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় মুসলমান-সমাজ নূতন জীবন লাভ করিয়া, শিক্ষা-ক্ষেত্রে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ১৩০৪ সালে রাণাঘাটের বিখ্যাত পাদরী মনরো সাহেবের সহিত একটা বিরাট তর্ক-সভার আয়োজন হইয়াছিল; কিন্তু পাদরী সাহেব কার্য্যকালে, মুন্সী সাহেবদিগের সহিত তর্ক-সভায় সম্মুখীন হইতে সাহস করিলেন না।

বাঙ্গালা সাহিত্যেও মুন্সী সাহেবের বেশ অধিকার ছিল। তাঁহার যাবতীয় পুস্তকাবলী সাহিত্যের পুষ্টি বর্দ্ধন করিতেছে। মহাকবি শেখ শাদীর পুস্তকখানির যে পদ্যানুবাদ তিনি করিয়াছেন, তাহা বড়ই উৎকৃষ্ট হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তাঁহার লিখিত পুস্তক গুলি গভীর শাস্ত্র-জ্ঞান ও অসাধারণ গবেষণার ফল। এইরূপে প্রায় ২০ বৎসর কাল সমাজ সেবা করিয়া, তিনি ১৩১৪ সালের ২৪শে জ্যেষ্ঠ শুক্রবার অপরাহ্ন ১টার সময় স্বীয় পরিবারবর্গ ও বন্ধু-বান্ধব এবং বঙ্গীয়

মুসলমানদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করেন। বঙ্গের মুসলমান সমাজ এক অমূল্য রত্ন হারাইল। তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরদত্ত এমন এক বিশেষ শক্তি ছিল, যে শক্তির প্রভাবে তিনি শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও নাস্তিক—সর্ব্বশ্রেণীর নরনারীর হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিতেন। তাঁহার তর্ক শক্তিও অসাধারণ ছিল। খ্রীষ্টীয়ান পাদরী, ব্রাহ্ম, হিন্দু পণ্ডিত, নেড়া ফকীর, নাস্তিক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই তাঁহার যুক্তি তর্কের নিকট মস্তক অবনত করিতেন। তিনি যে বিষয়ের বক্তৃতা করিতেন, সে বিষয়ের যেন অবিকল ফটো আঁকিতেন। তিনি বস্তুতঃ ধার্ম্মিক পুরুষ ও আদর্শ মুসলমান ছিলেন। তাঁহার চরিত্র অতীব পবিত্র ও মধুর ছিল। তিনি লোকের সঙ্গে এমনই বিনয়-নম্র ব্যবহার করিতেন যে, কেহই তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। তিনি অতি দয়ালু ও হৃদয়বান্ পুরুষ ছিলেন। দরিদ্র ও বিপন্নের অশ্রু মুছাইতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। উৎপীড়িতের আর্ত্তনাদে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইত। তিনি অতি সাদাসিদে ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। সামান্য খাদ্যে ক্ষুন্নিবারণ করিতেন। পোষাক পরিচ্ছদের কোনও আড়ম্বর ছিল না। স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতির জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। আলেম অর্থাৎ ধর্ম্মযাজকদিগের প্রতি তাঁহার অসাধারণ ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল। বন্ধুবর্গের মনরক্ষার্থ তিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। তাঁহার চেষ্টায় বহু বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও মক্তব স্থাপিত হইয়াছে। বহু মস্জেদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অনেক পাঠার্থীকে তিনি অর্থ-সাহায্য করিতেন। মুসলমান গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ প্রচারেও তিনি সাহায্য করিতেন। মুসলমানদিগকে শিল্প ও বাণিজ্য কার্য্যে লিপ্ত হইবার জন্য উৎসাহিত করিতেন। তাঁহার উপদেশ ও চেষ্টায় বহু মুসলমান পানের "বরোজ" করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহারই চেষ্টায় যশোহর অঞ্চলে মুসলমানদিগের মিঠাইএর দোকান খোলা হইয়াছিল। হিন্দুসমাজও তাঁহাকে ভালবাসিতেন। তাঁহার ন্যায় অদ্ভুত ক্ষমতাশালী ও বাগ্মীপুরুষ বঙ্গদেশে খুব কমই দৃষ্ট হয়।

মৌলবী জমিরুদ্দীন—বিদ্যাবিনোদ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যাঁহারা ঈশ্বরযোগী—যাঁহারা যোগ দ্বারা চিত্তকে নির্ম্মল করিয়া, সংপ্রজ্ঞাত সমাধি সিদ্ধিতে বা 'সংযম জয়ে' ঋতম্ভরা প্রজ্ঞালাভ করিয়া সেই প্রজ্ঞা-আলোকে এই পরমেশ্বরতত্ত্বে ধ্যানাভ্যাস রূপে (অর্থাৎ অনন্য একান্ত ভক্তিযোগে সাধনার দ্বারা বিনিয়োগ পূর্ব্বক তাহার জ্ঞেয়ধ্যেয় বা উপাস্য ঈশ্বর তত্ত্ব বিজ্ঞান সহিত লাভ করেন, কেবল তাঁহারই এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায়, তাঁহার সর্ব্বপাপ বা সর্ব্বরূপ চিত্তের বন্ধন বিনির্ম্মুক্তি লাভ হওয়ায় যোগ দৃষ্টিতে এই বিশ্বরূপ পরমেশ্বরের দর্শন

সম্ভব হয়। পরমেশ্বর তাঁহার আত্মস্থ হইয়া, তাঁহার অব্যয় আত্মায় পরমেশ্বর ভাব তাহাকেই অনুকম্পা পূর্ব্বক দর্শন করান। যাঁহারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় 'ঈশ্বর প্রণিধান' দ্বারা বা ধ্যানাভ্যাস রসে আপ্লুত হইয়া ঈশ্বরকে ভজনা করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে পরমাত্মা পরমেশ্বরের এ বিরাট ঐশ্বরীয় যোগ দর্শনের সামর্থ্য বা এ যোগ দৃষ্টি লাভ হয় না।

এই যোগদৃষ্টিলাভ দ্বারা ঈশ্বর দর্শন-সিদ্ধ না হইলে, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে এ ঈশ্বরভাবও লাভ হয় না; অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে কেবল আত্মস্বরূপে অবস্থান সিদ্ধ হইলেও সে যোগীর অক্ষর কূটস্থ অব্যয় ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বাত্মা সর্ব্বরূপ পরমেশ্বরভাবে অবস্থান সিদ্ধ হয় না। তিনি তাঁহার আত্মায় এই পরমাত্মা পরমেশ্বররূপ আপনাতে দেখিতে পান না। আমরা গীতা হইতে জানিতে পারি যে, যে কোন ভাবে—পরমেশ্বর হইতে অভিব্যক্ত যে কোন রূপ ভাবে সদা সর্ব্বদা ভাবিত হওয়া যায়, সেই ভাবই লাভ হয়। আমরা যদি সদা ঈশ্বরভাবে ভাবিত হইতে পারি, তবে আমরা এই ঈশ্বরভাব লাভ করিতে পারি, তবে আমরা মৃত্যুকালেও সেই ঈশ্বর ভাবে ভাবিত হইয়া দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক সেই পরমধ্যেয় ভাবই লাভ করিয়া মুক্ত হইতে পারি। তাই বলিতেছিলাম যে, কেবল ঈশ্বরযোগীই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি পরিপাকে, ঈশ্বরে 'সংযম জয়' পূর্ব্বক প্রজ্ঞালোক বিনিয়োগহেতু সেই যোগ দৃষ্টিতে বিশ্বরূপ পরমেশ্বরকে দর্শন করিতে পারেন, এবং সদা ঈশ্বর ভাবে ভাবিত হইয়া সেই ভাব লাভ পূর্ব্বক বা ধ্যানে আপনাকে এই ধ্যেয়রূপে স্থাপন পূর্ব্বক, সেই ধ্যেয় ঈশ্বর ভাব লাভ করিতে পারেন এবং সেই ভাব লাভ করিয়া অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় আপনাকে সেই ভাবে দর্শন করিতে পারেন। তখন তাঁহার আত্মাই যে পরমাত্মা, এই বিশ্বরূপ যে তাঁহার অব্যয় আত্মায় বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত ভাব, তাহা তিনি সেই যোগ দৃষ্টিতে দেখিতে পান। ইহাই 'আত্মযোগে' আত্মাতে আত্মার বিশ্বরূপ দর্শন; ইহাই দিব্য দৃষ্টি লাভ পূর্ব্বক আত্মার পরম দ্রষ্টা স্বরূপে অবস্থান।

আমরা দেখিয়াছি যে, আমাদের আত্মার এই পরম ভাব লাভ সম্বন্ধে কোন উপদেশ আমরা সাংখ্য বা পাতঞ্জল দর্শন হইতে পাই না। বেদান্ত দর্শন কেবল আত্মার অক্ষয় নির্গুণ কূটস্থ ব্রহ্মভাব লাভের উপদেশ পাই। উপনিষদ্ হইতে কেবল আত্মার-ব্রহ্ম ভাব, অক্ষয় ব্রহ্ম ভাব ও নিয়ন্তা ঈশ্বর ভাব লাভের আভাস পাই। কেবল গীতা হইতেই আমরা আমাদের আত্মার এই অক্ষয় কূটস্থ পরম ব্রহ্ম ভাব এবং বিরাট বিশ্বরূপ বিশ্বাত্মা বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর ভাব এবং সেই ভাব লাভের উপায় জানিতে পারি। যেরূপে যোগদৃষ্টি লাভ করিয়া এই পরমেশ্বর ভাব দর্শন হয় ও তাহাতে প্রবিষ্ট হওয়া যায়, তাহার উপায় গীতাতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্য কোথায় উপদিষ্ট হয় নাই।

এইরূপে গীতা হইতে আমরা আমাদের পরম স্বরূপ, আমাদের পরম লক্ষ্য, আমাদের সাধনার পরম প্রাপ্য, পরম গতি জানিতে পারি বটে, কিন্তু বলিতেছি ত, সেই বিরাট সাধনায় সিদ্ধ হইয়া আমরা যে ক্রমে আমাদের সেই পরম স্বরূপ—প্রকৃষ্ট আদর্শ লাভ

করিতে পারি, তাহা ধারণা করিতে পারি। বলিয়াছি ত, যিনি এই পরমাত্মা পরমেশ্বর স্বরূপে অবস্থান করেন, তাঁহাকে আমরা মানুষ বলিতে পারি না। সাংখ্য দর্শন যাঁহাকে সিদ্ধ ঈশ্বর বলিয়াছেন তাঁহাকে সেই সিদ্ধঈশ্বর রূপেও ধারণা করিতে পারি না। মানুষের যোগজ সিদ্ধি—তাহার যোগৈশ্বর্য্য, এই সমস্ত অচিন্ত্য, অপরিসীম আদর্শ পর্য্যন্ত যাইতে পারে তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। ক্ষুদ্র-সর্ব্বরূপে সীমাবদ্ধ আমরা যে সর্ব্বসীমা অতিক্রম করিয়া এই বিরাট পরিণতি লাভ করিতে পারি—বা আমাদের সেই পরম আদর্শ স্বরূপে অবস্থান করিতে পারি, সর্ব্ব জ্ঞান সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের সহিত সম্পূর্ণ একীভূত হইয়া ব্যক্তিত্ব ঘুচাইয়া অনারিচ্ছিন্ন সর্ব্বত্ব লাভ করিতে পারি, ইহা ধারণা করিতে যাইলেও আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি অভিভূত হইয়া পড়ে, আমাদের কল্পনা সেখানে স্তম্ভিত হয়। অদ্বৈতবাদী শঙ্কর জীব ব্রহ্মে সম্পূর্ণ ঐক্য সিদ্ধান্ত করিয়াও—জীবের পরমার্থতঃ নির্গুণ অক্ষয় ব্রহ্মভাব সিদ্ধান্ত করিয়াও, তাঁহার এই বিরাট পরমেশ্বর ভাব ধারণা করিতে পারেন নাই। বেদান্ত দর্শনও বুঝি এতদূর অগ্রসর হন নাই। জীব ব্রহ্মভাব লাভ করিলেও, জগৎ স্রষ্টৃত্বাদি শক্তি যে কখন ঈশ্বরভাবে ভাবিত হইয়া লাভ করিতে পারে, ইহা শঙ্কর স্বীকার করেন নাই। তিনি আত্মায়-ব্রহ্ম স্বরূপ—পরম জ্ঞান স্বরূপ লাভকেই মুক্তি বলিয়াছেন। তিনি এ জগৎকে ও ঈশ্বরকে মৌলিক বলিয়াছেন, তাহা দেখিয়াছি। তাই বলিতেছিলাম, মানুষ যে কখন তাহার আত্মার পরম ভাব এই পরমেশ্বর স্বরূপ লাভ করিতে পারে, তাহা আমাদের ধারণার অতীত। তাই বৈষ্ণবাচার্য্যগণ পরমেশ্বরতত্ত্ব পারমার্থিক সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া—জীব ঈশ্বরের অভেদ কল্পনা করিতে পারে নাই। কিন্তু ইহাই গীতার উপদেশ। গীতা অনুসারে, পরম মুক্তিতে ভগবানকে ভগবদ্ভাবে ভাবিত হইয়া মৃত্যু কালে স্মরণ করিলে, ভগবান যাহাকে সম্ভাব বলিয়াছেন, সেই ভাব লাভ হয়। (গীতা ৮।৫)সেই সম্ভাব লাভ হইলে ভগবান যাহাকে আমি''আমার'বলিতেছেন,তাহাকে আমরাও 'আমি' 'আমার' ভাবে গ্রহণ করিয়া, ভগবান যাঁহাকে তাহার বিভূতি বলিয়াছেন, সেই আত্মবিভূতি সকল যে আমার, তাহা অনুভব করি ও এই বিশ্বরূপ যে ভগবান তাঁহার অব্যয় আত্মার স্বরূপ বলিয়াছেন, তাহাও আমাদের অব্যয় আত্মার স্বরূপ ভাবে দেখিতে পাই বিষ্ণুপুরাণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, যখন ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ বিষ্ণুকে ধ্যান করিতে করিতে স্তুতি করিতেছিলেন, তখন সেই ভগবান ভাবে ভাবিত হইয়া আপনাকে বিশ্বস্রষ্টা বিষ্ণুরূপেই দেখিতেছিলেন। তখন তাঁহার সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের সহিত একাত্মতা লাভ হইয়াছিল। তথাপি আমরা, মানুষের পক্ষে, এই ভাবে সদা ভাবিত হওয়া সম্ভব মনে করিতে পারি না যদি কখন বা দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া এই ভাবে কখন ভাবিত হইতে পারি, তবে সদা সেই ভাবে অবস্থান করিতে পারি না। যিনি তাহা পারেন, তাঁহাকে আমরা ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করি।

সে কথা আর এস্থলে প্রয়োজন নাই। আমরা দিব্য দৃষ্টির তত্ত্ব বুঝিতেছিলাম। আমরা দেখিলাম যে, যে দিব্য দৃষ্টিতে

আপনার এই বিরাট বিশ্বরূপ ভাব—ও বিশ্বাতীত পরম ভাব নিত্য দর্শন হয়, সেই পরম দ্রষ্টা স্বরূপ ভাবে যিনি নিত্য অবস্থান করেন, তিনি পরমেশ্বর। মানুষ বিশেষ সাধনা রূপে, পরমেশ্বরের অনুকম্পায় সেই পরমাত্মার পরম ভাবের মধ্যে এই বিরাট বিশ্বরূপ ভাব কচিৎ দর্শন করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু আপনাতে তাহা নিত্য দর্শন করিতে সমর্থ হয় না।

ভগবান বলিয়াছেন, তিনি আত্মযোগ হেতুই পরম তেজোময়, অনন্ত আদ্য বিশ্বরূপ অর্জ্জুনকে দর্শন করাইয়াছেন :—

"রূপং পরং দর্শিতমাত্ম যোগাৎ।"

এইরূপ পরমেশ্বরের যোগৈশ্বর্য্য পরম ঐশ্বর রূপ—তাঁহার যোগ বিভূতি। পরমাত্মা আত্মযোগে এই পরম বিশ্বরূপ নিত্য আপনার আত্মাতে দর্শন করেন। ভগবানের অব্যয় আত্মার এই আদ্য পরম ভাব নিত্য। তিনি আমাদের অন্তরেও আমাদের আত্মায় পরম স্বরূপ ভাবে—পরম আদর্শ রূপে অবস্থান করেন। তাঁহাকে যাঁহারা ভক্তি যুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা করেন, ভগবান তাঁহাদের বুদ্ধিযোগ দান করেন ও সেই বুদ্ধিযোগে সেই সা[illegible]তে উপগত হন। ভগবান তাঁ[illegible] [illegible]ম্পা [illegible], তাঁহাদের 'আত্ম ভাবস্থ' হন। যখন ভগবান এইরূপ আমাদের আত্মভাবস্থ হন, তখন জ্ঞানদীপ প্রজ্বলিত হয়,—অজ্ঞান দূর হয় ও সেই জ্ঞানদীপ বা প্রজ্ঞালোক দ্বারা তখন আমরা পরমেশ্বরের এই বিশ্বরূপ দেখিতে পাই। ভগবান আত্মভাবস্থ হইয়া আমাদের দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া দিলে, তবে আমরা পরমাত্মা পরমেশ্বরের অব্যয় আত্মায় বিভূতি রূপে, তাঁহার এ বিরাট বিশ্বরূপ দেখিতে পাই। তাহা তখন যে আমার আত্মারই বিশ্বরূপ—তাহা দেখিতে পাই না। অর্জ্জুন এইরূপে দিব্যদৃষ্টি বা যোগদৃষ্টি লাভ করিয়া পরমেশ্বরের এই বিরাট বিশ্বরূপ দেখিতেছিলেন। আমরা দেখিয়াছি যে, অর্জ্জুন সে বিশ্বরূপ অধিকক্ষণ দেখিতে পারেন নাই। তিনি ভক্তিসাধনায় সিদ্ধ হন নাই, তাঁহার 'সংযম জয়' হয় নাই।

এস্থলে আমরা দেখিতে পাই যে, ভগবান আত্মযোগে, আপনার আত্মাতেই আপনার অব্যয় আত্মার পরমভাবরূপে এই বিরাট বিশ্বরূপ দেখিতেছিলেন, এবং সেই দৃষ্টি অর্জ্জুন সংক্রামিত করিয়া, তাঁহাকে সেই যোগদৃষ্টি দিয়া, তাঁহাকে আপনার এই বিশ্বরূপ দেখাইতেছিলেন। কিরূপে এই যোগদৃষ্টি সংক্রামণ করা যায়, তাহা পূর্ব্বে এই অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। এস্থলেও আমরা দেখিয়াছি যে, ভগবান অর্জ্জুনের আত্মভাবস্থ হইয়া তাঁহাকে এই দিব্যদৃষ্টি দিয়াছিলেন। যখন আত্মা পরমাত্মায় যোগযুক্ত হয়, তবে পরমাত্মা আত্মভাবস্থ হন, তখন আত্মায় পরমাত্মার স্বরূপ অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত হয়. পরমাত্মার ঐশ্বররূপ প্রদর্শন হয়। পরমাত্মা যাঁহার আত্মভাবস্থ হন, তাঁহার এই যোগদৃষ্টি লাভ হইতে পারে।

আমরা দেখিয়াছি যে যদিও কখন কেহ বিশেষ সাধনা বলে, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে পরমাত্মা পরমেশ্বর স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন, কিন্তু যে স্বরূপে জীবন্মুক্ত অবস্থায়ও সর্ব্বদা অবস্থান করিতে পারেন না। যিনি পারেন, তাঁহাকে আমরা মানুষ বলিতে পারি না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই অবস্থায় আত্মযোগস্থ হইয়া আপনার বিশ্বরূপ

র্জুনকে দেখাইতেছিলেন। তাহা যে কোন মানুষ যোগসিদ্ধ হইয়াও অন্য কাহাকে দেখাইতে পারে, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। তিনি সেই আত্ম-যোগস্থিত হইয়া তাহা দেখাইতে পারেন, তিনি ঈশ্বর; তিনি সিদ্ধ ঈশ্বর ও ঈশ্বরও নহেন, তিনি নিত্য ঈশ্বর। এজন্য শঙ্কর-প্রমুখ সকল ব্যাখ্যাকারগণই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণের অবতার অনন্ত-জ্ঞান-বল-ঐশ্বর্য্যাদি দ্বারা সদা সম্পন্ন নিত্য ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এস্থলে এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

সাহিত্য-সম্মিলনের স্বপ্নদর্শন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের বাজারে এক এক করিয়া অনেক গুলি সম্মিলন বা সম্মেলন হইল। সেই সকল সম্মিলনে বাঙ্গালার নানাস্থানের সাহিত্যিকগণের পদধূলিও পড়িয়াছে, কিন্তু এই সকল সভায় সাহিত্যিক মেষের পাল তাড়িত ও পরিচালিত করিবার জন্য প্রতি বৎসর এক এক জন মেষপালক বা রক্ষক নিযুক্ত হন। তাঁহারা মানুষের জাতি পদস্থ ব্যক্তি, সাহিত্যিকগুলিকে গড্ডলিকার ন্যায় তাঁহাদের তাড়না ও পীড়নের অধীন হইয়া চলিতে হয়। ঐ সুনির্ব্বাচিত বরেণ্য পুরুষমণ্ডলীর নামাবলী হইতে দুই একজন মহাত্মাকে বাদ দিলে, আর সকলেই কেবল অবসরমত রাত্রিকালে নিদ্রাবশে বাঙ্গালা সাহিত্যের স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। ফলও তদনুরূপ ফলিতেছে।

সে বিদ্যাসাগর, সে বঙ্কিমচন্দ্র নাই; সে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো-পাধ্যায় নাই; সে প্যারীচাঁদ মিত্র, সে রাজনারায়ণ বসুও নাই; সে মনোমোহন বসু ও দীনবন্ধু মিত্রও নাই। যাঁহারা চরিত্র ও শিক্ষাগুণে উচিত কথাটা স্পষ্ট ভাষায় বলিতে পারিতেন। তাঁহারা চাটুকার ছিলেন না, ঠিক কথা ঠিক ভাবে বলিবার শক্তি তাঁহাদের ছিল, আর হয়কে হয়, নয়কে নয় বলিতেও পারিতেন। গুণীজনের গুণ ব্যাখ্যায় মুক্তহৃদয়, অথচ হীন বস্তুর হীনতা প্রদর্শনপটু ছিলেন। তাঁহারা লোক বিশেষের, দল বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশে-ষের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। এখন সে সব চন্দ্র সূর্য্য অস্তগত, তাই আজকাল এই জোনাকীর আলোতে পথ দেখিয়া চলিতে হইতেছে।

বিগত নয় বৎসরের নয়জন সভাপতির অভিভাষণ পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহাদের কেহই বাঙ্গালা সাহিত্যের ধার ধারেন না। কেবল তাহাই নহে, যাঁহারা এই নয় বৎসর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আহূত সভা সকলের অভ্যর্থনা সমি-তির সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করিয়া স্ব স্ব স্থানের প্রতিষ্ঠা ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই সাহিত্যিক নহেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব স্থানের মর্য্যাদা-শালী পদস্থ ব্যক্তি মাত্র। ব্যাকরণে যেমন

ভাষার নিয়ম পদ্ধতির উল্লেখ আছে, তদ্রূপ কতকগুলি উপসর্গও আছে। তাহারা যেখানে যখন আহূত হয়, তখনই সেখানে এক একটা বিভ্রাট ঘটাইয়া থাকে। সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে দুই শ্রেণীর দুই-প্রকার উপসর্গ জুটিয়াছে। একটা হইল পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের নিয়োজিত সভাপতির বক্তৃতার এক একটা জের থাকে, সেটা একটা বৃহৎ বিড়ম্বনা। পূর্ব্ব বৎসরের সভাপতি মহাশয় পর বৎসরের মজলিসে তাঁহার পূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ করাইয়া দেন।

সুতরাং মোটের উপর প্রতি বৎসর সাহিত্যিক মেষদলকে তিনটী করিয়া বক্তৃতা শুনিতে হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই নানাস্থানের বহু বহু সম্ভ্রান্ত সাহিত্যবাসীগণ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বৎসরের পর বৎসর যে ঐ তিনটী বক্তৃতা শুনিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগত হন, তাঁহারা কি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন, তাঁহাদের খরচা পোষায়? তাহার পর ঐ সকলের মধ্য দিয়া এবং সাহিত্য-পরিষদের মধ্য দিয়া এমন একটা ঢং গড়িয়া উঠিয়াছে যে, সেটা আর কেহ পছন্দ করুন, আর নাই করুন, সে ঢংএর বিরুদ্ধে কোন কথা কহিতে গেলেই সর্ব্বনাশ। যে ব্যক্তি সেরূপ কাজে অগ্রণী হ'বে, তাহাকে কর্ত্তৃপক্ষদল ত্বরায় দিনহীন কাঙ্গালে পরিণত করিয়া ছাড়িয়া দিবেন। আর যদি তিনি নাছোড়-বান্দা ও সবল পুরুষ হন, তাহা হইলে, সকলে অন্ততঃ তখনকার জন্য মস্তক নত করিবেন। পরে আবার যে সেই। এরূপ ঘটনার উল্লেখ করিতে গেলে সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত বাহির হইয়া পড়িবে, ঔষধ দিবার স্থান থাকিবে না। সুতরাং সে চেষ্টা ত্যাগ করিলাম।

তাহার পর দ্বিতীয় উপসর্গ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদগোষ্ঠীর বহু যত্ন ও সাধনার ফলে শিশু সাহিত্য-সম্মিলনের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বিভাগ সৃষ্টি। এটা একটা অপূর্ব্ব সৃষ্টি। বাঙ্গালা-দেশ চিরদিনই স্বেচ্ছাচারিতা-পরায়ণ। যে কোন কাজের অনুষ্ঠান করি না কেন, তাহাতে স্বেচ্ছাচারিতার অপূর্ব্ব লীলানিকেতন রচিত হইতেই হইবে। বাঙ্গালা সাহিত্য এখনও গড়ে নাই। গড়িতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। সেই অগঠিত সাহিত্যের সম্মিলনক্ষেত্রে সাহিত্য গঠনের নিয়ম পদ্ধতির আলোচনা একবারও হইল না। আমার পাঠকমণ্ডলী কি দয়া করিয়া ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিবেন?

প্রতি বৎসরই সাহিত্য সম্মিলনের মজলিসে বিসর্জ্জনের দিন, পর বৎসরের জন্য এক একটা সুবৃহৎ কমিটী গঠিত হইয়া বাঙ্গালাদেশে জারি করা হয়। কিন্তু সেই সকল মফঃসলবাসী সাহিত্যিকজনবৃন্দের মিলিত বৈঠকে কোন দিন কোন একটা নির্দ্ধারণ এ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। সাহিত্য-পরিষদের জনকয়েক মাতব্বর ব্যক্তি সমগ্র দেশের অভিভাবক সাজিয়া সকল কর্ম্ম শেষ করিয়া থাকেন। তাহারই বিষময় ফলে উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম বাঙ্গালার নানা স্থানে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সম্মিলন প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। পোড়া দেশের এমনই ভাগ্য যে, কোন কাজে মানুষগুলি নিজ স্বার্থ দূরে রাখিয়া, দেশের স্বার্থ রক্ষা ও পরিবর্দ্ধন চেষ্টা করিতে যেন একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। আবার দেশের স্থানীয় পদস্থ ভদ্রলোকগুলিও ঐরূপ বিভিন্নতা সৃষ্টিকল্পে সহায়তা করিয়া, গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। এই অবস্থা যে দেশের, সে দেশের মঙ্গল

কোথায়? এই এক দোষেই বাঙ্গালী ছোট, বড়, পদস্থ ও গরীব সবই হীনাবস্থাপন্ন, আর এই দোষের অভাবজনিত প্রধান একগুণে ইংরেজ জাতি মানব-সংসারে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে। দিল্লীর সম্রাট দরবারে ডাঃ বৌটনের নিজ স্বার্থ বিসর্জ্জন স্মরণ কর, তাহা হইলেই এক কথায় ছোট বড়র বিচার হইয়া যাইবে।

বাঙ্গালাদেশে অতি অল্প কাল মধ্যে মা গঙ্গা 'বোসের গঙ্গা' 'ঘোষের গঙ্গা' ইত্যাদি খানা ডোবা সৃষ্টি হওয়ার ন্যায় সকল বিষয়েই,—ধর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া স্বদেশী আন্দোলন ও সাহিত্যের বাজারে অসংখ্য ডোবা-কর্ত্তার সৃষ্টি হইয়াছে। এই কর্ত্তাগুলি আবার "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল" সাজিয়া, সব মাটি করিতে বসিয়াছেন। তাহা না হইলে এক এক করিয়া শিশু-সাহিত্যের ক্রোড়ে কেমন করিয়া অতগুলি শাখা সভার সৃষ্টি হইল? পৌরাণিক ইতিবৃত্তে মহীরাবণপুত্র অহীরাবণের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, নাড়ীকাটার পূর্ব্বেই, হনূমান মহাশয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করার বিবরণ পাওয়া যায়, আর আজ আমাদের এই সাহিত্য-সম্মিলন শিশুর জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে শাখা প্রশাখা বিস্তারের ও সংগ্রামের বিবরণ জানা যাইতেছে। তাহা না হইলে, সেবার কলিকাতার মজলিসে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের ঐতিহাসিক মজলিসে সভাপতিত্ব ও বিচিত্র দ্বন্দ্বমীমাংসা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হইত না। সাহিত্য-সম্মিলন রক্ষা করিতে গেলে এখনও এই ম্যালেরিয়ার দেশে শাখা প্রশাখাগুলি কাটিয়া দিলে ভাল হয়। তাহা হইলে গাছটা বাড়িতে পাইত।

আমি নিজে "গোলে হরিবোল" দেওয়াটা একেবারেই পছন্দ করি না, তাই এই সম্মিলনগুলির নানা স্থানীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিবার স্পৃহাও তত প্রবল হয় নাই। কেবল চুঁচূড়ায় শেষ দিনে, আর কলিকাতায় পূর্ব্বাপর উপস্থিত ছিলাম। অন্য সর্ব্বত্র অনুপস্থিতের সংখ্যা বৃদ্ধি ক[illegible]ন্দ উপভোগ [illegible]ছি। [illegible] ঐ সকল বৈঠকের কার্য্যকলাপ ও [illegible]নার বিবরণ যথাসম্ভব অবগত হইতে চেষ্টা করিয়াছি। এ চেষ্টার উদ্দেশ্য এই যে, ঐ গুলির দ্বারা বাঙ্গালার সাহিত্যের কতটা শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা মাত্র। আজ আক্ষেপের সহিত বলিতে হইতেছে যে—"খাওন দাওন"এর বিরাট আয়োজন সত্বেও আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতার পরিচয় দান ভিন্ন, আর বিশেষ কিছু একটা বড় বস্তুর পরিচয় পাই নাই।

এই সকল সাহিত্য-সম্মিলনের দয়াতে আমরা আমাদের জাতির অতি প্রাচীন কালের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে আসামের পর্ব্বত মালা অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে ধারে ভারতে প্রবেশ করিয়া বঙ্গে বসতি করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের এই অতি-বৃদ্ধপ্রপিতামহ মহাশয়গণের সেই মেরু-প্রদেশের উত্তর পূর্ব্বাঞ্চল হইতে বঙ্গে পদার্পণের বিবরণ শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। সে গুলিও সবই সম্ভাবনার তালিকাভুক্ত। কারণ অকাট্য প্রমাণ প্রদানের শক্তি বাঙ্গালীর নাই। পল্লবগ্রাহী বাঙ্গালী অল্প একটু সত্যের আভাস ইঙ্গিত পাইলেই সেটা নিজ কল্পনা বলে ত্বরায় একটা বিরাট অজগরে পরিণত করিতে বেশ পটু। রায়বাহাদুরই বল, আর মহামহোপাধ্যায়ের দলই বল,

সকলেই উচ্চিংড়াকে ব্যাঘ্রে পরিণত করিতে ব্যস্ত। কাজে কাজে বাঙ্গালা সাহিত্যের সূচনায় পূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাস, বা তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী বাচনিক ভাষার কচকচি শুনিয়াই তোমরা আনন্দ অনুভব কর। কারণ এরূপ আলোচনায় আলোচনাকারীর বিপদ অল্প; কারণ তাঁহার আলোচ্য বিষয়ে সকলেই মূর্খ; সুতরাং গবেষণার আকারে ঐ সকল মহাশয়দের আলোচনার বিরাটত্ব অত্যন্ত অধিক। সুতরাং মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী ও মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় মূর্খদের মজলিসে অবশ্যই প্রণম্য ব্যক্তি।

আক্ষেপের বিষয় আজ এই আট নয় বৎসরে একটা মানুষ দেখা দিল না, যিনি নাকি বাঙ্গালা সাহিতের সূচনা, শ্রীবৃদ্ধি ও বর্ত্তমান পরিণতির আলোচনা করিতে সাহসী ও সক্ষম। এরূপ এক একটা সাহিত্য-সম্মিলনের বাৎসরিক সভায় সভাপতির পঠিত বা মৌখিক বক্তৃতা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাবী লেখকগণের একটা বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইত। সে কাজ কে করে? বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি যাঁহার সত্য মমতা আছে, যিনি বাঙ্গালা সাহিত্যকে ভাল বাসেন, সর্ব্বান্তঃকরণে যিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবক, তিনিই কেবল সে কাজে পটুতা প্রদর্শনে সক্ষম। আর বিগত নয় বৎসর বাঙ্গালা সাহিত্যের বাজারে যাঁহারা নায়ক সাজিয়া সভামঞ্চে নিজেরা নাচিয়াছেন ও বন্ধু নাচাইয়াছেন, তাঁহারা কেহই সত্য সাহিত্যিক নহেন। জাতীয় সাহিত্যের সেবক বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার তাঁহাদের হয় নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে তাঁহারা কেহই তন্ত্রধার বা পুরোহিত ত নহই, তাঁহারা ঢাক,ঢোল ও সানাই বাজাই-বারও যোগ্য নহেন। বাঙ্গালী জাতি এই অনধিকারচর্চ্চাপটু ও প্রিয় লোকগুলিকে আদর করিয়া মাথায় তুলিয়া জাতীয় সাহিত্যের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছেন। এখন আর ইহার প্রতিকার কোথায়?

আমার এই আলোচনার ফলে হয়ত সাহিত্যসেবী "খয়েরখাঁর" দল আমার উপর খুবই বিরক্ত হইবেন, কিন্তু সে বিরক্তিতে ভয় করিলে চলিবে না। এই দেখুন না, সম্মিলনের কলিকাতা অধিবেশনে ২৪পরগণা-বাসী বলিয়া মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার সেবারের অভিভাষণে আপনার জেলার বড় বড় সাহিত্যিক খ্যাতনামা স্বর্গীয় গ্রন্থকারগুলির অনেকের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। অসংখ্য অনুল্লেখের মধ্য হইতে এখানে প্রসঙ্গক্রমে তিনটী নাম আমি উল্লেখ করিতেছি। বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত স্বর্গীয় মনোমোহন বসু মহাশয় ছোটজাগুলীয়া নিবাসী, আর শাস্ত্রী মহাশয়ের বাস নৈহাটী। মধ্যস্থলে একটা বৃহৎ মাঠ আর কয়েক খানি ক্ষুদ্র গ্রাম। শাস্ত্রী মহাশয়—মেদিনীপুর-নিবাসী বিদ্যাসাগরের নাম করিতে ভুলেন নাই, কিন্তু নিজের জেলার মনোমোহনকে ও মজিলপুর-নিবাসী উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে ও বোড়াল-নিবাসী রাজনারায়ণ বসুকে স্মরণ করিতে রাজী হন নাই। রাজ-নারায়ণ, মনোমোহন ও উমেশচন্দ্র চিরজীবন বাঙ্গালা-সাহিত্যসেবী, আর পণ্ডিত হরপ্রসাদ সংস্কৃত কলেজের অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ। তফাৎ কত? তাই তিনি ঐ সকল সাহিত্যিককে স্পর্দ্ধার ভাষায় "যাদু মাদুর" দলে নিক্ষেপ করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছেন।

আর তোমরা বাঙ্গালা সাহিত্যসেবীর দল আত্মমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়া এই সকল মহামহোপাধ্যায়দের পদলেহনে ব্যস্ত।

আর একটা দৃষ্টান্ত আবশ্যক। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় বিদ্বান ও পাণ্ডিত্যগুণসম্পন্ন হইয়াও না হয় অত্যন্ত দাম্ভিক ব্যক্তি। তাঁহার অহঙ্কারের সীমা নাই, তিনি অন্ত পদস্থও মর্য্যাদাশালী ব্যক্তিবর্গকে, "যাদু মাদু" আখ্যা দিয়া নিজ অহঙ্কারের আবরণে লুকাইতে ও পদমর্য্যাদার বলে অন্তের পূজা অর্জ্জন করিতে পারেন। মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিনয়ী ও সজ্জন। তাঁহাকে নিরীহ ভাল মানুষ বলিলেও চলে, এমন শাদাসিধা ভালমানুষ লোক বিদ্যাভূষণ মহাশয় অভিভাষণের গোড়ায় গলদ করিয়া বসিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রবীণ ও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যসেবী। শরীর ভাল থাকিলে, তিনিই তাঁহার পুত্র স্থানীয় অনেক ব্যক্তির সভাপতিত্বের পর, এবার সম্মিলনের সভাপতি হইতেন, তিনি প্রত্যাখ্যান করায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় আসরে নামিলেন। ঐ বৃদ্ধ শাস্ত্রী মহাশয়কে কি তিনি চিনেন না? তবে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার অভিভাষণের সূচনায় সর্ব্বদেশীয় শীলতার খাতিরে তাঁহার নামোল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইলেন কেন? এ সকলের অন্য কোন কারণ নাই, একমাত্র এই যে, ইঁহারা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখেন না। রাখিলে কখনই এরূপ অমার্জ্জনীয় অপরাধে ইঁহারা লিপ্ত হইতে সাহসী হইতেন না। কয়েকটা বাঁধা গতের মত, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র—আওড়াইয়া ফুল ফেলে দিয়ে পূজা শেষ করেন আর তিব্বত, নেপাল, ভোটান ও মেরুর পূর্ব্বদিগের কোথায় কি পাঁজি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাতেই ডুবে আছেন। তা থাকুন, আমরা সেই হিসাবে তাঁহাদের পূজা করিতে, সম্মান করিতে প্রস্তুত, কিন্তু যে কাজে তাঁহারা অনধিকারী, সে বিষয়ে হাত দেন কেন? গত বৎসর বর্দ্ধমানে মিহিদানা, সীতাভোগ ও পুকুর পুকুর মাছের মাঝখানে মালা নিয়ে কি কাণ্ডটাই না তোমরা করিলে।

এখন সখের সাহিত্যিক ছাড়িয়া দিয়া বঙ্গের সাহিত্যসেবীদল ২।৪টা সত্য সাহিত্য সেবীকে অভিভাবক নির্ব্বাচন কর, নতুবা দিন দিন অবস্থা আরও অন্ধকারে আবৃত হইবে। বর্ত্তমান সাহিত্যের সম্বন্ধে ঐ সব সভাপতির দল একটা বাক্যও ব্যয় করিবেন না। কারণ তাঁহাদের ক্ষমতা নাই।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহরে সবুজ।

(চট্টগ্রাম-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত)

না জানি স্বরগ কোথা, কোথা বা নন্দন বন,
ফুলময় মধুময় শোভাময় অতুলন!
কল্পনার কল্পভূমি সে অমৃত-নিকেতন
না জানি জন্মান্তে কভু করিব কি নিরীক্ষণ!

জানি তবু প্রাণে আজ, মানি মনে গর্ব্বভরে,
স্বর্গাধিক স্বর্গ এক লভিনু এ চরাচরে!
হেরিনু সৌন্দর্য্য হেন নয়ন-আনন্দ কত,
সহস্র নন্দন বুঝি তার কাছে ম্লান নত!

অভ্রলেহী শৈলমালা, অন্তহীন পারাবার,
নির্ঝর তটিনী উৎস গহন অরণ্য আর,
সাজাইয়ে স্তরে স্তরে একাধারে অনিবার
প্রকৃতি বিলায় হেথা ষড়ৈশ্বর্য্য অমরার।

সুবিশাল জগতের মহাধর্ম্ম চতুষ্টয়
কি গভীর আলিঙ্গনে সদা হেথা বদ্ধ রয়!
হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান, ঈশা-ভক্ত খ্রীষ্টিয়ান,
করিতেছে যুগপৎ জগদীশ স্তুতি-গান।

উন্মুক্ত গগনতলে গগনে চুম্বিয়া যেন
"চন্দ্রনাথ" "বিরূপাক্ষ" যুগল সোদর হেন,
ধরিয়া কিরীট শিরে চন্দ্রচূড় বিশ্বেশ্বরে
আহ্বানিছে সবে ওই সুনীরবে সমাদরে।

ওই জলে কি অপূর্ব্ব! নীর-বক্ষে হুতাশন
ধরিত্রীর হৃদি-জ্বালা উথলে কি অনুক্ষণ!
ওই ঝরে শৈল-কুঞ্জে পবিত্র "সহস্রধারা"
বরষেন শান্তি-বারি অলক্ষ্যে কি দেবতারা।

ওই দূরে—বহু দূরে গরজিছে পারাবার
বিচিত্র তরঙ্গ-ভঙ্গে নৃত্য-সুখে অনিবার!
সবিতা ঘুমায় সেথা, জাগে সেথা "আদিনাথ"
লক্ষ নদী বয়ে আনে নিখিলের প্রণিপাত।

পুণ্যতোয়া "কাঞ্চী" ওই পূত সতী কর্ণফুলে
বহিছে "শ্রীমতী" সনে পুলক-কল্লোল তুলে!
"শঙ্খ" "ফেনী" "ইছামতি""মুরলা"তটিনী ধায়
কমলার রত্নাসন উভ তটে শোভা পায়।

নির্জ্জন প্রান্তর পরে পরশিয়া নীলাম্বর
রাজে ওই "মহামুনি" বৌদ্ধ-মূর্ত্তি মনোহর!
ধ্যান-নিমীলিত নেত্র, বরাভয় পদ্মপাণি,
এখনো একান্তে বুঝি হরিছেন বিশ্ব-গ্লানি।

মহাত্মা "বাজিদ" আর মুক্তাত্মা "বদর" পীর
সমাধি-নিমগ্ন ওই শান্তি-অঙ্কে ধরিত্রীর!
হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান সমভাবে সর্ব্বজন
করিছে সম্ভ্রমে নিত্য আশীর্ব্বাদ-আকিঞ্চন।

ঈশা-কোলে মেরী মাতা যশোদা মায়ের মত
পূজিতা মন্দিরে ওই তৃপ্ত করি ভক্তে কত।
নানকের প্রতিষ্ঠিত ওই "গুরু দরবার"
গুরুজীর জয়-গীতে মুখরিত অনিবার।

প্রকৃতির রঙ্গালয়, ধর্ম্মালয় মানবের,
সমন্বয় পীঠক্ষেত্র ভক্ত কবি সাধকের,
কোথা আছে হেন আর বরণীয়া রমণীয়া
দিগ্বিজয়ী সুত কার হাসে কালে পরাজিয়া।

দ্বাবিংশ কবিতে মিলি গায় হেথা সুধাধার
চাঁদের গৌরব ভরা অশ্রুগাথা বেহুলার।
হেথাকার "ক্ষেমঙ্কর" "মুকুন্দ" ও "পুণ্ডরীক"
পুণ্য সুরভিতে পূর্ণ রাখিলেন দশদিক।

হেথাকার "আলোয়েল" যুগল "নবীন" কবি
ভারত-সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল প্রদীপ্ত রবি!
হেথাকার "শরচ্চন্দ্র" তেয়াগিয়া মৃত্যু-ভয়
করিলেন অবহেলে দুর্লঙ্ঘ্য "তিব্বত" জয়।

ধর্ম্মে কর্ম্মে কি বিচিত্র! কি বিচিত্র সুষমায়!
বিধির অপূর্ব্ব সৃষ্টি "রম্যভূমি" * বসুধায়!
ধন্য যাঁরা যুগে যুগে জন্মিলেন এই দেশে,
করিলেন অভিনয় সন্ন্যাসী সংসারী বেশ!

মা আমার জন্মভূমি! কর্ম্মভূমি সাধনার!
ধন্য আমি লভি তোমা"মা"বলিতে অধিকার!
প্রথম নয়ন মেলি হেরিনু তোমার মুখ,
জুড়াব অন্তিম-শ্বাসে তোমাতে তাপিত বুক।

সাগর-কুন্তলা অয়ি বিশ্বেন্দ্রাণী মা আমার!
ষড়ঋতু নিয়ে আসে তব পূজা উপহার!
দয়েল পাপিয়া শ্যামা বসন্ত সুহৃদ্ সনে
চির-বসন্তের বার্ত্তা গায় তব শ্যামাঙ্গনে!

মা তোমার পল্লীবাটে, ছায়াঘেরা কুঞ্জবনে,
অনন্ত দিগন্তপটে প্রসারিত তৃণ সনে,
কি মধু ক্ষরিছে নিত্য জুড়ায়ে আঁখি-মন,
করিতেছি অনুভব কি অজ্ঞাত-আকর্ষণ।

* "সহরে সবজ" বা চট্টগ্রামের অপর নাম।

মুগ্ধ করে চিরদিন রাখিয়াছ মা, আমায়
কি অতুল স্নেহমাখা রাতুল অঞ্চল ছায়!
ভ্রমিয়াছি এ জীবনে কত দেশ দেশান্তর
দেখিনি দেখিনি হেন অপরূপ সুধাকর!

ক্ষুদ্র আমি দীন আমি কিবা আছে মা আমার,
রচিবারে পারি অর্ঘ্য তব যোগ্য-অর্চ্চনার!
তোমারি বাঁশরী করি দিনু তাই এ হৃদয়,
অমৃত-সঙ্গীতে তব জন্মে জন্মে রেখো লয়!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

দেশভক্ত দ্বিজে লাল।

বঙ্গের গৌরব, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল অকৃত্রিম স্বদেশভক্ত ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সামান্য ডিপুটিগিরি করিতেন সত্য; কিন্তু, খটিরাম-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া, আত্ম-সম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া, শ্বেত-পদে তৈল-মর্দ্দন করিতে না পারায় তাঁহার মত প্রকৃত যোগ্য বিচারককেও বহুবার নানাভাবেই বিড়ম্বিত ও নির্য্যাতিত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার মত ইংরেজ জাতির যথার্থ গুণরাশির অকপট সুখ্যাতি ও আন্তরিক সমাদর করিতে আমি অতি অল্প লোককেই দেখিয়াছি,—প্রকৃতপক্ষে তিনি স্বভাবতঃই অত্যন্ত রাজভক্ত (Loyal) ছিলেন। কিন্তু, তা' বলিয়া তন্ময় হইয়া তিনি মাতৃভূমির পূজা করিতে অথবা অতীতের চির-গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি সহায়ে এ অধঃপতিত দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে কোন দিনও স্বীয় সঙ্কীর্ণ স্বার্থের প্রলোভনে অণুমাত্রও শঙ্কিত বা সঙ্কুচিত হন নাই। গুপ্ত পুলিশের বিচিত্র ও অতি জঘন্য চক্রান্তে একবার যখন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সরকার বাহাদুরের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয়, আমার বেশ মনে আছে, তখন একদিন তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—"সম্পূর্ণ নির্দোষ ও গভর্ণমেণ্টের যথার্থ হিতার্থী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের প্রতি এই রকম অন্যায় সন্দেহের ফলে এদেশের মজ্জাগত স্বস্তি বা শান্তি অনতিদূর ভবিষ্যতে অবশ্যম্ভাবীরূপে তিরোহিত হইয়া যাইবে, এবং একদিন এইজন্যই এদেশের লোকের মনে ন্যায়বান ব্রিটিশ রাজের প্রতি ক্রমশঃই আন্তরিক অনাস্থা ও বিদ্বেষের ভাব সঞ্চারিত হইতে থাকিবে। দূরদর্শী দ্বিজেন্দ্রলালের সে ভবিষ্যদ্বাণী আজ যেন বর্ণে বর্ণেই সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে, যখন এ দেশের আপামর জনসাধারণে এক অভিনব ও অনাস্বাদিতপূর্ব্ব, দিব্য উন্মাদনায় আত্মহারা হইয়া উঠিল, তখন অবকাশ লইয়া তিনি কলিকাতা—৫নং সুকীয়া ষ্ট্রীটে অবস্থান করিতেছিলেন। যদিও তিনি নিজে বয়কটের বিশেষ বিরোধী ছিলেন এবং বহুবার বিতর্ক বিচারের কালে স্পষ্টই বলিতেন যে, 'এই 'বয়কটে'র ফলেই আমাদের এ আন্দোলনটী অচিরেই অস্বাস্থ্যকর বিদ্বেষ-বিষে অকাল-জীর্ণ ও মন্দীভূত হইয়া পড়িবে, তবু, আমার বেশ স্মরণ হয়,—সেদিন ১৬ই অক্টোবর, অপরাহ্ন কালে তিনি স্বয়ং একটী দলের

নায়ক হইয়া, বাগবাজারে পশুপতিবাবুর গৃহ-প্রাঙ্গণে গমন করিলেন ও সেই সম্মিলিত অগণ্য, উন্মত্ত জনমণ্ডলীর মধ্যে স্ব-রচিত সঙ্গীত-সুধার এক অতি উদ্দাম স্রোতোধারা প্রবাহিত করিয়া দিলেন। সেদিন তাঁহাকে তদবস্থায় যাহারা একবার দেখিয়াছিল, ইহজীবনে তাহারা কখনও সে অপূর্ব্ব, স্বর্গীয় দৃশ্য বিস্মৃত হইতে পারিবে না। 'আলুথালু' কেশ, নগ্ন-পদ, মল্লকচ্ছপরিহিত, মাতৃ-প্রেমে মাতোয়ারা, বাল-স্বভাব দ্বিজেন্দ্র লাল ঠিক শিশুরই মত উর্দ্ধে দুই হাত তুলিয়া, হেলিতে দুলিতে যখন গান গাহিতেছিলেন, মাঝে দলস্থ গায়কগণকে "বন্দেমাতরম্" মহামন্ত্রে যখন মাতাইয়া তুলিতেছিলেন, এবং নিজেও উৎসাহ দমন করিতে না পারিয়া "মাগো মা, ওমা"—বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছিলেন, তখন সেই দিব্য ভাবে উদ্দীপ্ত মুখমণ্ডলে কি যে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহা না দেখিলে বর্ণনা করিয়া বুঝানো বস্তুতই সম্পূর্ণ অসম্ভব।

সেদিন বেলা প্রায় ৯॥• কি ১০'টার সময়ে "কুন্তলীনের" এইচ্, বসু মহাশয় হঠাৎ দ্বিজেন্দ্রলালের বাসায় আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"আজ, গোলদিঘীতে একটা বিরাট সভা হ'বে। সেখানকার জন্য একটা গান লিখে' দিন—এখনি। ছাপিতে হইবে"। বসু মহাশয়কে বিদায় দিয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল অনধিক মিনিট দশেকের মধ্যেই একটা অগ্নি-গর্ভ সঙ্গীত রচনা করি লেন, এবং তখনি উহা বসু মহাশয়কে তাঁহার প্রেসে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। পশুপতি বাবুর প্রাঙ্গণ হইতে ভাবোন্মত্ত দ্বিজেন্দ্রলাল যেই আসিয়া শ্যামবাজারের ট্রামে চড়িলেন, অমনি তাঁহার পিছনে পিছনে শত শত লোক, কেহ পদব্রজে, কেহবা ট্রামে—গোলদীঘি অভিমুখে ছুটিয়া চলিল। গোলদীঘিতে যখন কবি গিয়া পৌঁছিলেন, পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থানুসারে তথায় তখন ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের গানটী শেষ করিয়া, একটা কাঠের বাক্সের উপরে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তথায় অল্পক্ষণ মাত্র অপেক্ষা করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন পথে যাইতে যাইতে গদ্ গদ্ কণ্ঠে তিনি তাঁহার জনৈক বন্ধুকে বলিলেন—"আজ এ কি দেখিলাম,—ঁ্যা! এতটা তো কোন দিন ভাবা যায়নি। তবে, তবে কি এখানো আশা আছে নাকি?" এই সময়ে তিনি যে অতি উৎকৃষ্ট কয়েকটী প্রাণোন্মাদী ও জলন্ত উদ্দীপনাপূর্ণ সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলি বন্ধুবর্গের পরামর্শে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও, তিনি ভস্মী-ভূত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যদি সেগুলি রক্ষিত হওয়ার কোন উপায় থাকিত, আমি অসঙ্কোচেই বলিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সাহিত্যে "আমার দেশ" ও "আমার জন্মভূমির" অন্ততঃ আরও দু' একটী জোড়া বা উপমা মিলিতে পারিত। সুহৃ-জ্জনের অনুরোধে যখন সেগুলি কবি একে একে, স্বহস্তে, অগ্নি-সংযোগে দগ্ধ করিতে-ছিলেন, তখন ম্লান হাস্য করিয়া ক্রন্দনোন্মুখ কম্পিত কণ্ঠে তিনি যে কয়টী কথা বলিয়া-ছিলেন, আজিও অনলাক্ষরে আমার অন্তরে তাহা খোদিত রহিয়াছে। মলিন হাস্য করিয়া, আহত অভিমানে কম্পিত কণ্ঠে দ্বিজেন্দ্রলাল বলিলেন—"দেখছ? কেমন জ্বলে যাচ্ছে, দেখছ? এ আগুন যতটা বাইরে জ্বলছে, তা'র কি অন্ততঃ দশগুণ

আগুনও (বুকে হাত দিয়া) এখানে জ্বলছে না”? দেখিতে দেখিতে কাগজের খণ্ডগুলি তখনি ভস্মে পরিণত হইয়া গেল।

* * *

দ্বিজেন্দ্রলাল যখন গয়াতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদিন সেখানে তাঁহার সহিত বিশ্বমান্য আচার্য্য জগদীশ-চন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। কথা-প্রসঙ্গে জগদীশ-চন্দ্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“আপনি, রাণা-প্রতাপ, দুর্গাদাস প্রভৃতির অনুপম চরিত গাথা বঙ্গবাসীকে শুনাইতেছেন; কিন্তু, তাঁহারা বাঙ্গালীর সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি বা একেবারেই ঘরের লোক নহেন এমন আদর্শ বাঙ্গালীকে দেখাইতে হইবে, যাহাতে এই মুমূর্ষু জাতটা আত্ম-শক্তিতে আস্থাবান হইয়া উন্নতির জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে। আমাদের এই বাঙ্গালা দেশেই জন্ম লইয়া, সমগ্র জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে, যদি সম্ভব হয়, যদি পারেন ত' একবার সেই আদর্শ-বাঙ্গালীকে দেখাইয়া, এই প্রাণহীন অসার দেশটাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করুন।” স্বদেশ-প্রেমিক জগদীশচন্দ্রের এই অমূল্য উপদেশটী দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে গিয়া এক অতি প্রচণ্ড আঘাত করিল; এবং তাহারি ফলে, এই ঘটনার বোধ হয় এক সপ্তাহের মধ্যেই কবি একদিন দ্বিপ্রহরে (অর্দ্ধঘণ্টা বা তিন কোয়াটারের ভিতরে) “আমার দেশ” সঙ্গীতটী রচনা করিয়া ফেলিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের পরলোক-প্রয়াণের অব্যবহিত পরে “সাহিত্য” পত্রে আমি এ গানটী রচিত হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ আদ্যন্তই প্রকাশিত করিয়াছিলাম; অতএব, আজ আর এস্থলে সে সব কথার পুনরুল্লেখ করিলাম না।

সেদিন সন্ধ্যার পর যখন ভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় জজ ৺লোকেন্দ্রনাথ পালিত ও ৺বরদাচরণ মিত্র মহাশয়েরা দ্বিজেন্দ্রলালের কক্ষে সাহিত্যিক বৈঠকে আসিয়া সম্মিলিত হইলেন, তখন দ্বিজেন্দ্রলাল দাঁড়াইয়া উঠিয়া, সেই জলদ-গম্ভীর স্বরে, ধীরে ধীরে “আমার দেশ” গানটী তাঁহাদিগকে গাইয়া শুনাইলেন। সে রাত্রে তাঁহার রক্তিম মুখমণ্ডলে দিব্য ভাব-সমারোহের যে জ্বলন্ত জ্যোতির্বিভা দেখিয়াছিলাম, এ দগ্ধ হৃদয়-পটে তাহা আমরণ স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। সে নিশায় স্বদেশপ্রেমিক শ্রোতৃদ্বয় সে অতুলনীয় সঙ্গীতটী শুনিয়া বিস্ময়ে, আনন্দে, অপূর্ব্ব গর্ব্বে ও অকৃত্রিম দেশ-ভক্তিতে যথার্থই একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। উৎসাহে উন্মত্ত পালিত মহাশয় সঙ্গীত শেষে লাফাইয়া উঠিয়া, কবির করদ্বয় উভয় হস্তে সবেগে মর্দ্দন করিতে করিতে বলিলেন—“Oh! how wonderful—how magnificent! Let me confess, dear, —dear Dwiju, it's undoubtedly the very–very—very best national song that I've ever heard or read in my life. It's indeed a divine inspiration!” সে কথার প্রত্যুত্তরচ্ছলে দ্বিজেন্দ্র-লাল হাসিতে গিয়া, সহসা মুখখানা দুই হাত দিয়া ঢাকিয়া ফেলিলেন। তখন কবি বরদাচরণ দ্বিজেন্দ্রলালকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া পার্শ্বস্থ চেয়ারে উপবেশন করাইলেন।

নেতৃগণের অদূরদর্শিতা ও বিশ্বাস-ঘাতকতার ফলে অমন স্বদেশী আন্দোলনটাও কালক্রমে যখন মন্দীভূত ও প্রাণহীন হইয়া পড়িল, দ্বিজেন্দ্রলাল তখন আর “আমার দেশ” গানটী মোটেই গাহিতেন না। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেণ্টও তখন এ গানের ‘রেকর্ড’

গ্রামোফোনে বাজানো বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। শুনিতে চাহিলেও দ্বিজেন্দ্রলাল এ গানটা কিছুতেই গাহিতে চাহিতেন না দেখিয়া এক দিন তাঁহার কোন বন্ধু ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "সম্ভবতঃ ভয়ে আর তিনি উহা পারতপক্ষে গাহিতে রাজী হন না। 'সাধে কি বাবা বলি'?—এখন যে 'গুঁতোর চোটে বাবা বলায়!" ইত্যাদি। বুঝিবা সেদিন এ বিদ্রূপটা কবির অন্তরে বড়ই বাজিয়াছিল। তিনি তাই, একটু বিশেষ বিরক্তির সঙ্গেই উত্তেজিতস্বরে বলিলেন—"বটে! আমি তোমাদের মত শশকের প্রাণ নিয়ে বাঁচতে চাই,—মনে কর? ভয়! না হে, না, তা' নয়!—ও গানটা গাইতে গেলে আমার কেন জানিনা ভয়ানক মাথা গরম হ'য়ে উঠে। ভয়ের কথা আমাকে বলো না;—ও কথা শুন্‌লে সত্যি আমার অত্যন্ত রাগ হয়। ভয়! মানুষ হ'য়ে জন্মেছি—ন্যায়-পথে চিরকাল চলে' যাব; এতে আবার ভয় কিসের হে? ভয়ের মস্তকে আমি এই পদাঘাত করি।" এই বলিয়া দর্পী দ্বিজেন্দ্রলাল বাস্তবিকই মৃত্তিকায় পদ-প্রহারের অভিনয় করিয়া, হাসিয়া ফেলিলেন।

হায়, কে তখন কল্পনা করিয়াছিল—এই 'আমার দেশ' সঙ্গীতই অবশেষে তাঁহার দেহে সন্ন্যাস রোগের সূত্রপাত করিবে! ফলে কিন্তু শেষে তাহাই হইল। একদিন (বর্ত্তমান 'সার') ডাক্তার কৈলাস বসু মহাশয়ের ভবনে "ইভ্‌নিং ক্লাবের" সভ্যগণের সঙ্গে তিনি 'আমার দেশ' গান করিতেছিলেন। গানটী শেষ হইতে না হইতে, তিনি এমনি অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িলেন যে, গৃহস্থ সকলেরই মনে হইল—বুঝিবা এখনি তাঁহার মূর্চ্ছা হয়! অনেকক্ষণ ধরিয়া সে রাত্রে মাথায় বরফ ও গোলাপজল দেওয়ার পর তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন বটে, কিন্তু, ইহাই তাঁহার সন্ন্যাস রোগের প্রথম ও স্পষ্ট সূত্রপাত হইল! যতদূর মনে হইতেছে, ইহার পর আর একদিন বোধ হয় "দীন-ধামে" (৺দীনবন্ধু মিত্রের ভবনে) তিনি এই গানটী গাহিতে গিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়েন। বলা বাহুল্য, অতঃপর আর তিনি 'আমার দেশ' কখনো গাহিতে পারেন নাই; এবং এই ঘটনার অনতিদীর্ঘকাল পরেই বঙ্গ-মাতার এই ক্ষণজন্মা সুসন্তান সমগ্র ভারতভূমিকে শোক-তিমিরে নিমজ্জিত করিয়া, অকালে এ মর-সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন!

তাঁহার মত সারাটী হৃদয় ঢালিয়া অকপটে জন্মভূমিকে যথার্থ জননীরই মত ভালবাসিতে ও পূজা করিতে আর কয়জন পারেন অথবা জানেন, তাহা একমাত্র সর্ব্বদর্শী অন্তর্য্যামীই জানেন। কিন্তু, তাঁহার ন্যায় পার্থিব প্রতিষ্ঠা ও সম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া, তুচ্ছ স্বার্থ-চিন্তা বিস্মৃত হইয়া, তন্ময় সাধনায় স্বদেশের অকৃত্রিম কল্যাণ-কামনা করিতে আমি অতি অল্প লোককেই দেখিয়াছি।

যে মহাপুরুষ স্বদেশের অতীত গুণ-গৌরবরাশির অনুধ্যানে আত্মহারা হইয়া, এ ভাবে, জননীর স্তুতি-গীতিতে তন্ময় হইয়া, দিব্য উন্মাদনার অদম্য উৎসাহ-প্রভাবে সাধন-যজ্ঞে স্বীয় দুর্ল্লভ জীবনকে আহুতি প্রদান করেন, জননী-জন্মভূমির জীবন্ত মূর্ত্তিখানি মাথায় তুলিয়া লইয়া, স্বদেশের পুরোহিতরূপে, তাঁহারই চরণ-প্রক্ষালনের জন্য হৃদয়ের উত্তপ্ত রক্তরাশি এভাবে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিয়া এভাবে মরণকে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হন, আজ আমি তাঁহারই পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে, সাশ্রুলোচনে, বারংবার নমস্কার করিয়া এই ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ প্রসঙ্গের এইখানেই উপসংহার করিলাম।

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি।*

ভাষার উৎপত্তি, বৃদ্ধি, পরিবর্ত্তন, ক্ষয় ও বিলোপ, কিছুই হঠাৎ হয় না। এ সকলই ধীরে ধীরে হইতে থাকে; সময়ে সময়ে এত ধীরে হয় যে, সমসাময়িক লোকেরা তাহা ভাল রূপে টেরও পায় না। বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে কেন? এ ভাষা যে হটাৎ একদিন স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে, অথবা সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে, একথা বোধ হয় কেহই বলিবেন না। অথচ আমরা অনেক সময় এই রকমেরই একটা ভুল করিয়া বসি। এ ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দের, এবং স্পষ্টতঃ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন শব্দের প্রচলন দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলি, সংস্কৃত হইতেই বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে; সংস্কৃত ও বাঙ্গালার মধ্যে যে ব্যবধান, তাহার ক্রম-নির্ণয় আর আবশ্যক মনে করি না; যেন সংস্কৃত বঙ্গদেশে আসিয়া দেখিতে দেখিতে বর্ত্তমান বাঙ্গালার রূপ ধারণ করিয়াছে। যাঁহারা প্রাচীন নাটকাদির প্রাকৃত ও বৌদ্ধ সাহিত্যের পালি ভাষার সহিত পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহারা ঐরূপ ভাষার মধ্য দিয়া বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি স্বীকার করেন। কিন্তু বিশেষ সূক্ষ্মভাবে আলোচনা খুব কম লোকেই করিয়া থাকেন। যাঁহারা সেরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের নিকট অনেক জটিল প্রশ্ন উঠে। সেইরূপ কয়েকটী প্রশ্নের আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথম সমস্যা একেবারে সংস্কৃত লইয়া। যে ভাষায় লোকে কথা কহে, তাহাই ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন ভাষার উৎপত্তি করে। যে ভাষা কেবল সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়, তাহার সেরূপ ক্রম-পরিবর্ত্তন অসম্ভব। দেশীয় কথ্য ভাষা ও বিদেশী ভাষা হইতে তাহাতে মধ্যে মধ্যে শব্দাদি গৃহীত হইতে পারে, এবং কথ্য ভাষার সহিত যখন তাহার অত্যন্ত পার্থক্য হইয়া উঠে, তখন লেখ্য ভাষার কোন কোন প্রয়োগ উঠিয়া গিয়া, তাহার স্থানে কথ্য ভাষার প্রয়োগ প্রচলিত হইতে পারে। কিন্তু এ সকল স্থলে পরিবর্ত্তিত প্রয়োগ গুলি বাহির হইতে গৃহীত হয়; উহা আভ্যন্তরীন পরিবর্ত্তনের ফল নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সাহিত্যের ভাষা, কথ্য ভাষার পরিবর্ত্তন সাধন করে না, বরং তাহার পরিবর্ত্তনে কিছু বাধাই দেয়; কথ্য ভাষার দ্বারাই সাহিত্যের ভাষা পরিবর্ত্তিত হয়। বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তিও প্রাচীন কথ্য ভাষা হইতেই হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এখন কেহ কেহ বলেন, সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যের ভাষা, উহা কখনও কথ্য ভাষা ছিল না সুতরাং বাঙ্গালা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, একথা বলা চলে না।

এই পূর্ব্বপক্ষের দুইটী উত্তর দেওয়া যায়। প্রথমতঃ, সংস্কৃত যে কখনও কথ্য ভাষা ছিল না, তাহার প্রমাণ কি? 'সংস্কৃত' এই নাম হইতেই কেহ কেহ অনুমান করেন যে, একটা অসংস্কৃত ভাষা ছিল, পণ্ডিতগণ তাহার সংস্কার করিয়া সাহিত্যে ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াই ইহার নাম 'সংস্কৃত' হইয়াছে; সেই অসংস্কৃত ভাষাই ছিল তৎকাল-প্রচলিত কথ্য ভাষা। কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যে সেই সংস্কৃত ভাষায়ই

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বরিশাল-শাখার পঞ্চমবর্ষের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত। সং

কথা কহিতেন না, তাহা ইহাতে বুঝা যায় কি? ইতর সাধারণের অসংস্কৃত ভাষার তুলনায় ইহার নাম সংস্কৃত হইয়াছে, এরূপ অনুমানে অসঙ্গতি কোথায়? প্রাচীন দৃশ্য-কাব্যগুলিতে শিক্ষিত পুরুষমাত্রেই সংস্কৃতে কথা কহেন, শিক্ষিত মহিলাগণ সাধারণতঃ সংস্কৃত না কহিলেও, সময় বিশেষে তাহা করেন, সন্ন্যাসিনী প্রভৃতি বিদুষী স্ত্রীগণ সর্ব্বদাই সংস্কৃত বলেন। ইহাতে বরং মনে হয়, সংস্কৃত এক সময়ে অন্ততঃ শিক্ষিত সমাজে কথ্য ভাষা রূপে ব্যবহৃত হইত। পাণিনি দ্বিবিধ ভাষার কথা বলিয়াছেন; তাহার একটীর জন্য ছন্দঃ, মন্ত্র বা নিগম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন (ইহা বৈদিক সংস্কৃত), আর অপরটীর নাম দিয়াছেন ভাষা (ইহাই সাধারণ সংস্কৃত)। তিনি কোথাও সংস্কৃত' এই শব্দটীর ব্যবহার করেন নাই। 'বিভাষা-ছন্দসি', 'ভাষায়াং সদ বস শ্রুবঃ' ইত্যাদি সূত্র তাহার প্রমাণ। যাস্কও ভাষা শব্দের এইরূপ অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, যথা 'ইব ইতি ভাষায়াঞ্চ অন্বধ্যায়ঞ্চ' ইত্যাদি। ভাষ্যতে কথ্যতে ইতি ভাষা, যাহা ভাষিত বা কথিত হয়, তাহাই ভাষা, 'ভাষা' শব্দের ইহাই ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ। পাণিনি ও যাস্ক লৌকিক সংস্কৃতকে বিশেষণহীন 'ভাষা' শব্দে অভিহিত করায়, এই অনুমানই দৃঢ়ীভূত হয় যে উহা তাঁহাদের সময়ে কথ্য ভাষা রূপে ব্যবহৃত হইত। রামায়ণে আছে, অসুর ইল্বল ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া সংস্কৃত কহিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিয়া বধ করিত। সে সময়ে তবে ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃত কহিত? আবার, হনুমান্ ভাবিতেছেন, "আমি যদি ব্রাহ্মণের-মত সংস্কৃত বাক্য বলি, তবে সীতা আমাকে রাবণ মনে করিয়া ভীতা হইবেন, অতএব আমি মনুষ্যের মত সংস্কৃত বাক্য প্রয়োগ করিব" এই দ্বিবিধ সংস্কৃত বাক্য কিরূপ, তাহা বুঝা কঠিন, কিন্তু উভয়ই সংস্কৃত। নিরুক্ত পরিশিষ্টধৃত ব্রাহ্মণ বিশেষে আছে, "ব্রাহ্মণা উভয়ীং বাচং বদন্তি, যাচ দেবানাং যাচ মনুষ্যাণাম্" অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ দেবতাদের বাক্য ও মনুষ্যদের বাক্য, এই উভয় বাক্যই বলেন। পূর্ব্বে যে সকল প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে, তারপর মনুষ্যদের বাক্য সংস্কৃত নহে, একথা বলিবার কোন হেতু দেখা যায় না। পরবর্ত্তী কালে সংস্কৃতকে 'দৈবী বাক্' বলা হইয়াছে, কিন্তু চিরকালই এরূপ ছিল, এমন মনে করিবার কারণ নাই। উক্ত ব্রাহ্মণের 'দেবানাং বাক্' সম্ভবতঃ বৈদিক সংস্কৃত। প্রাকৃত ভাষায় মধ্যে মধ্যে এমন প্রয়োগ দেখা যায়, যাহা লৌকিক সংস্কৃত অপেক্ষা বৈদিক ভাষার অধিক নিকট-বর্ত্তী। কিন্তু ইহাতেও প্রমাণ হয় না যে, প্রাকৃতভাষাগুলি লৌকিক সংস্কৃতের মধ্য দিয়া না আসিয়া বৈদিক সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অথবা লৌকিক সংস্কৃত কথ্য ভাষা ছিল না। যখন লৌকিক সংস্কৃতের যুগ ছিল, তখন যে আর্য্য-ভারতের ভাষার প্রাদেশিক ভেদ ছিল না, একথা কেহ বলে না। তাহার মধ্যে কোন কোন প্রদেশের ভাষার কোন কোন প্রয়োগ সাহিত্যে ব্যবহৃত লৌকিক সংস্কৃত অপেক্ষা বৈদিক সংস্কৃতের অধিক নিকটবর্ত্তী হওয়া বিচিত্র নহে; আর সেই প্রয়োগ প্রাকৃতভাষার প্রয়োগের উৎপত্তির কারণ হওয়াও অসম্ভব নহে। এরূপ প্রয়োগের সংখ্যা অধিক নহে হয়ত, বৈদিক সংস্কৃত যজ্ঞাদিতে ব্যবহৃত হইত বলিয়া, তাহা হইতেও প্রাকৃতের প্রয়োগ বিশেষ উৎপন্ন হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ—সংস্কৃত কেবল সাহিত্যের ভাষা ছিল, একথা স্বীকার করিলেও, তাহার তুলনায় অসংস্কৃত কথ্য ভাষা যে তাহা হইতে অল্পই পৃথক্ ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কারণ, সাহিত্যের জন্য প্রচলিত ভাষা হইতে অত্যন্ত পৃথক্ কোন কালে অপ্রচলিত একটা নূতন ভাষার গঠন অস্বাভাবিক, এবং তাহার কোন দৃষ্টান্তও নাই। সাহিত্যের বাঙ্গালা ও কথ্য বাঙ্গালায় যে প্রভেদ, সাহিত্যের সংস্কৃত ও তদনুরূপ কথ্য ভাষায় তাদৃশ প্রভেদ থাকাই সম্ভব। কথ্য ভাষায় প্রাদেশিক পার্থক্য অবশ্য ছিল *। কিন্তু তাই বলিয়া, কোথাও সাহিত্যের ভাষাকে এক নাম, আর কথ্য ভাষাকে আর এক নাম দেওয়া হয় না। সুতরাং, এস্থলেও সাহিত্যের সংস্কৃতের তুলনায় কিঞ্চিৎ অমার্জিত, অসংস্কৃত হইলেও, সেই কথ্য ভাষাকে সংস্কৃত নামেই অভিহিত করা সঙ্গত নহে কি? আর সেই কথ্য সংস্কৃত নিশ্চয়ই সাহিত্যের সংস্কৃতের এত নিকটবর্ত্তী ছিল যে, সাহিত্যের সংস্কৃতের সহিত তাহার সাধারণতঃ অভেদ অনুমান করিলে, অধিকাংশ স্থলেই ভুলের সম্ভাবনা নাই। সাহিত্য ছাড়িয়া দিলে, কোনও প্রাচীন ভাষারই বড় একটা নিদর্শন পাওয়া যায় না। তাই, সর্ব্বত্রই প্রাচীন সাহিত্যের ভাষা অবলম্বন করিয়াই ভাষা-তত্ত্বের আলোচনা করা হইয়া থাকে। এস্থলে তাহার ব্যতিক্রম করার কোন উপযুক্ত কারণ দেখি না।

* বৈয়াকরণ ও নিরুক্তকারগণ প্রাদেশিক পার্থক্যের কথাও স্থল-বিশেষে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—'দাতির্লবণার্থে প্রাচ্যেষু দাত্র মুদীচ্যেষু'। নিরুক্ত ২।২, ইত্যাদি

তাহার পর প্রাকৃতের কথা। প্রাকৃত ত অনেক প্রকার; কোন্ প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে? প্রাচীন সাহিত্যে যে মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী প্রভৃতি প্রাকৃতের উল্লেখ ও দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, সেগুলি কি বিভিন্ন দেশে প্রচলিত প্রাকৃত? অধিকাংশ প্রাকৃতের নাম দেশের নাম হইতে উৎপন্ন দেখিয়া তাহাই মনে হয়। কিন্তু, সেই সেই দেশের আধুনিক ভাষার সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় নাটকের মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি ভাষার যে সকল বিশেষত্ব, তাহা আধুনিক মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের ভাষায় নাই। দুই একটী দৃষ্টান্ত দেখুন। শৌরসেনী প্রাকৃতে অস্ ধাতু স্থানে অচ্ছ আদেশ হয়, কিন্তু হিন্দী ভাষায় ইহার প্রয়োগ দেখি না তবে শূরসেন হইতে বহুদূরে বঙ্গদেশে 'আছে।' এই ক্রিয়ার প্রয়োগ আছে। মহারাষ্ট্রী-শৌরসেনী 'হিঅঅ' প্রাচীন বাঙ্গালা 'হিয়া' শব্দে দেখা যায়,কিন্তু মাগধী হড়ক্কের প্রয়োগ কোথাও দেখিতে পাই না। মাগধী প্রাকৃতে 'অহম্' এই পদের স্থানে যে 'হকে' 'হগে' বা 'অহকে' হয়, তাহার মত কোন পদ মগধ বা তন্নিকটবর্ত্তী কোথাও এখন আছে বলিয়া জানা যায় না; মহারাষ্ট্রী-শৌরসেনীর বক্ররূপের সদৃশ হম্ বা আমি ও মৈঁ বা মুইই মগধেও প্রচলিত। এই সকল দেখিয়া, অনেকে সাহিত্যে ব্যবহৃত এই সকল প্রাকৃতকে দেশ-প্রচলিত প্রাকৃত হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করেন। যদি তাহাই হয়, তবে এই সকল সাহিত্যগত প্রাকৃতের কোনটীকেই বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তিস্থান বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। সাহিত্য-দর্পণে দেখিতে পাই—

পুরুষাণামনীচানাং সংস্কৃতং সংস্কৃতাত্মনাম্।
শৌরসেনী প্রয়োক্তব্যা তাদৃশীনাঞ্চ যোষিতাম্॥

আসামেবতু গাথাসু মহারাষ্ট্রীং প্রয়োজয়েৎ।
অত্রোক্তা মাগধীভাষা রাজান্তঃপুরচারিণাম।
চেটানাং রাজপুত্রাণাং শ্রেষ্ঠিনাঞ্চার্দ্ধমাগধী
প্রাচ্যা বিদুষকাদীনাং ধূর্ত্তানাং স্যাদবন্তিকা।
যোধনাগরিকাদীনাং দাক্ষিণাত্যা হি দীয়তাম্।
ইত্যাদি।

অর্থাৎ নাটকাদিতে উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত পুরুষের ভাষা সংস্কৃত, তাদৃশী স্ত্রীগণের ভাষা শৌরসেনী, আবার সেইরূপ স্ত্রীগণের গাথার ভাষা মহারাষ্ট্রী, রাজান্তঃপুরচারিগণের ভাষা মাগধী; চেট, রাজপুত্র ও শ্রেষ্ঠীদের ভাষা অর্দ্ধ মাগধী, বিদুষকাদির ভাষা প্রাচ্যা, ধূর্ত্তগণের ভাষা অবন্তিকা, যোদ্ধা ও নাগরিকাদির ভাষা দাক্ষিণাত্যা, ইত্যাদি।

অবশ্য শেষে একথাও আছে, "যদ্দেশং নীচপাত্রন্তু তদ্দেশং তস্য ভাষিতম্"; অর্থাৎ নীচপাত্র যে দেশের লোক, তাহার ভাষাও সেই দেশের হইবে। কিন্তু পূর্ব্বের কাহার ভাষা কি হইবে, তাহার বিধানের সহিত দেশের সম্বন্ধ কিছুই দেখা যায় না। এই ব্যবস্থা গুলি একেবারেই কৃত্রিম। ইহাতে বোধ হয়, ভাষাগুলি ও তাহাদের নাম গুলি একেবারেই কৃত্রিম। সুতরাং, যদিও ইহার মধ্যে যে 'প্রাচ্যা বিদুষকাদীনাম্' বলিয়া প্রাচ্যা ভাষার উল্লেখ আছে, তাহাকে কেহ কেহ গৌড়ী অর্থাৎ গৌড়ের ভাষা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তথাপি তাহার উপরে তত নির্ভর করা যায় না। আর, নাটকে বিদূষকগণকে যে ভাষা ব্যবহার করিতে দেখা যায়, তাহাতে বাঙ্গালা ভাষার বিশেষত্ব কিছুই নাই, অতএব বাঙ্গালাভাষা কোন্ প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন, তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য।

ইহার উত্তরে এই বলা যায়, প্রাকৃত ভাষাগুলি তাহাদের নামানুযায়ী বিভিন্ন দেশের ভাষা বলিয়াই বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ; তাহা না হইলে এইরূপ নামকরণের কারণ বুঝা যায় না; সুতরাং সেগুলি সেই সেই দেশের ভাষারূপে কোনকালে বর্ত্তমান ছিল না, একথা উপযুক্ত প্রমাণ না পাইলে বিশ্বাস করা যায় না। নাটকের প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয়, এখন যেমন সমস্ত বঙ্গদেশে কলিকাতার ভাষাকে কথ্য ভাষার আদর্শরূপে গ্রহণ করিবার একটা ঝোঁক দেখা যায়, এবং অনেক ভদ্রলোকে কলিকাতার ভাষায় কথা কহেন, আর নাটকে সকল উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীপুরুষেই, হয় সাহিত্যের সাধুভাষা,না হয় কলিকাতার চলিত ভাষা ব্যবহার করেন,সেইরূপ একসময়ে সমগ্র আর্য্যভারতে মহারাষ্ট্রী-শৌরসেনী শ্রেণীর প্রাকৃতই আদর্শ ও ভদ্রলোকের ব্যবহার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত, এবং নাটকে উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণ, হয় সংস্কৃতে, না হয় মহারাষ্ট্রী শৌরসেনী শ্রেণীর প্রাকৃতে কথা কহিতেন। অন্যান্য প্রাকৃতের মধ্যেও, যে শ্রেণীর লোক যে দেশ হইতে বেশী আমদানী হইত, সেই শ্রেণীর লোকে সেই দেশের প্রাকৃতে কথা কহিবে, এইরূপ নিয়ম নাটকে প্রচলিত হইল। এ অনুমান যে অসঙ্গত নহে, তাহা এদেশের প্রাচীন কবি কবিকঙ্কনাদির গ্রন্থে মাঝীদের পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা ব্যবহার এবং আধুনিক নাটকাদির প্রয়োগ দ্বারাও প্রমাণিত হয়। উত্তর ভারতে নৌবিদ্যায় বঙ্গদেশেরই প্রাধান্য ছিল। কালিদাসের রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বঙ্গদেশবাসীদিগকেই নৌ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখা যায়। বঙ্গে কৈবর্ত্ত জাতীয় লোকের সংখ্যাও খুব বেশী। এই কৈবর্ত্ত বা ধীবরগণ প্রাচীন নাটকে মাগধী শ্রেণীর প্রাকৃতে কথা কহে (অভিজ্ঞান শকুন্তলা দেখুন)। মগধ বাঙ্গালার সংলগ্ন দেশ;

সুতরাং বঙ্গদেশে মাগধী শ্রেণীর প্রাকৃতের প্রচলন খুব স্বাভাবিক। বাঙ্গালা ভাষার ভিতরেও এই অনুমানের পরিপোষক প্রমাণ পাওয়া যায়। দুই একটী দৃষ্টান্ত দেখুন—মাগধী প্রাকৃতে স ও ষ স্থানে শ হয়; বাঙ্গালায়ও তাই; তবে এই 'শ'কে অনেকে 'ষ'এর ন্যায়ও উচ্চারণ করে। মাগধী প্রাকৃতে অকারান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে একার হয়, বাঙ্গালায়ও অনেক সময় তাহা হয়; কোন কোন অঞ্চলে খুব বেশী হয়, তবে এরূপ প্রয়োগ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়াছে। মাগধী প্রাকৃত যে এককালের পূর্ব্বে ভারতেরই ভাষা, তাহা বিশ্বাস করিবার আরও একটা বিশেষ কারণ আছে। মহারাজ অশোকের স্তম্ভলিপি ও শিলালিপিগুলি ভারতের নানা স্থানে দৃষ্ট হয়; সে গুলির ভাষার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে; কিন্তু একটা দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, স্তম্ভলিপিগুলির ভাষা সর্ব্বত্রই উড়িষ্যার অন্তর্গত ধৌলীর শিলালিপির ভাষার বিশেষ অনুরূপ, এবং এই ভাষায় আবার মাগধী প্রাকৃতের অনেকগুলি বিশেষত্ব বর্ত্তমান। ইহাতে অনুমান হয়, মগধ হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত একপ্রকার ভাষা প্রচলিত ছিল এবং স্বদেশ মগধের ভাষা বলিয়া, অশোক স্তম্ভলিপিগুলিতে তাহাই ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং বঙ্গদেশেও তদনুরূপ ভাষাই প্রচলিত ছিল। কিন্তু, ভদ্রসমাজে মহারাষ্ট্রী-শৌরসেনীর আদর হওয়াতে অনেকস্থলে পরবর্ত্তী ভাষায় মাগধীর পরিবর্ত্তে মহারাষ্ট্রী-শৌরসেনীর অনুরূপ শব্দাদি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সাহিত্য-দর্পণের 'প্রাচ্যা বিদূষকাদীনাম্' এই পাঠের মধ্যেই যেন কোন গোল আছে বলিয়া আমার সন্দেহ হয়। যদি এ পাঠ ঠিক হয়, আর নাটকে বিদূষকগণকে যে ভাষায় কথা কহিতে দেখা যায়, তাহা বঙ্গদেশের ভাষা হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, এক সময় বঙ্গদেশে যে প্রাকৃত প্রচলিত ছিল, তাহা মাগধী অপেক্ষা মহারাষ্ট্রী শৌরসেনীর অধিক নিকটবর্ত্তী। তাহা হইলে বলিতে হয়, বঙ্গভাষায় মাগধী প্রাকৃতের যে সকল বিশিষত্ব প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী কালে মগধের সহিত বাঙ্গালার বিশেষ ঘনিষ্ঠতার ফল। রাষ্ট্রীয় ঘনিষ্ঠতা ও ধর্ম্মমূলক ঘনিষ্ঠতা যে হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু এ বিষয়ে ভালরূপে আলোচনা করিতে হইলে যে ঐতিহাসিক জ্ঞানের আবশ্যক, তাহা আমার নাই। আর,এদেশের সেই মধ্যযুগের প্রকৃত ইতিহাস এখনও নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে বলিয়াও আমার মনে হয় না। যে ভাবেই হউক,বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষায় মাগধী ও মহারাষ্ট্রী শৌরসেনী এই উভয় বিধ প্রাকৃতেরই প্রভাব আছে বলিতে হইবে। আরও এককারণে মহারাষ্ট্রী-শৌরসেনীর গ্রহণ আবশ্যক। প্রাকৃত ভাষাগুলির আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহারা অনেক বিষয়ে এক। প্রাকৃত-ব্যাকরণকারগণ মহারাষ্ট্রী-শৌরসেনীর বিস্তৃত আলোচনা করিয়া মাগধী পৈশাচী, প্রভৃতিকে অল্পকয়েকটী কথায়ই বিদায় দিয়াছেন; কারণ যে সকল বিষয়ে ইহারা মহারাষ্ট্রী শৌরসেনীর অনুরূপ, তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন কেহ কেহ অন্যান্য প্রাকৃতকে মহারাষ্ট্রী-শৌরসেনী হইতে উৎপন্ন বলিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। সুতরাং, ভারতীয় যে কোন আর্য্যভাষার উৎপত্তির সমালোচনায় মহারাষ্ট্রী-শৌরসেনীর সাহায্য লইতে হইবে। বিদূষকের ভাষা ত মহারাষ্ট্রী-শৌরসেনীর অতি নিকটবর্ত্তী ভাষা।

যদি সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মধ্যবর্ত্তী আর কোন ভাষা পাওয়া যায়, তবে প্রাকৃতরূপগুলির উৎপত্তিক্রম অনেকটা পরিষ্কার হয়। আর, প্রাকৃতের আদর্শ যে আমাদের নিকট যথেষ্ট আছে, এরূপ বলা যায় না; যেখানে প্রাকৃত হইতে সাহায্য না পাওয়া যায়, সেখানে হয় ত সেই মধ্যবর্ত্তী ভাষা হইতে সেই অভাবের পূরণ হইতে পারে। বৌদ্ধ-সাহিত্যের গাথা-ভাষা ও পালি ও অশোক লিপি সমূহের ভাষা সেই শ্রেণীর। অতএব বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তির আলোচনায় এ গুলিকে বাদ দিলে ঠিক হইবে না।

কেহ কেহ কিন্তু বঙ্গভাষাকে খাঁটী আর্য্য-ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতেই অসম্মত। তাঁহারা বলেন, ভাষার উৎপত্তি-বিচার করিতে হইলে, কেবল তাহার শব্দগুলির উৎপত্তির অনুসন্ধান যথেষ্ট নহে; কোন ভাষা নিজের বিশেষত্ব পরিত্যাগ না করিয়াও অনায়াসে নানা ভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ করিতে পারে এবং করিয়াও থাকে। এইরূপে, কোন ভাষা হইতে খুব বেশী পরিমাণে শব্দ গ্রহণ করিলেও, সে জন্য তাহার সহিত জন্য-জনকত্ব সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। ভাষার মূল জানিতে হইলে, তাহার বিভক্তি-প্রত্যয়ের উৎপত্তির অনুসন্ধান করিতে হয়। বাঙ্গালা ভাষার বিভক্তিগুলির মূল অনুসন্ধান করিলে, অনেক স্থলে সংস্কৃতে পৌঁছান যায় না। সুতরাং, প্রাচীন অনার্য্যভাষা হইতে তাহাদের উৎপত্তি অনুমান করাই সঙ্গত। প্রচলিত দ্রাবিড়ভাষা সমূহের কোন কোন বিভক্তির সহিত বাঙ্গালা কোন কোন বিভক্তির সাদৃশ্যও তাঁহারা দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু সে সাদৃশ্য বেশী নহে। সংস্কৃতের সহিত এত অধিক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিতে, তাহা ছাড়িয়া অনার্য্যভাষার সামান্য সাদৃশ্যকে ধরিয়া বসার কোনও উপযুক্ত কারণ নাই। এমন সামান্য সাদৃশ্য আকস্মিক হইতে পারে। আর, যেহেতু কোনও রূপের সংস্কৃত হইতে উৎপত্তি সহজে বুঝা গেল না, অতএব তাহা কোনও অজ্ঞাত অনার্য্যভাষা হইতে উৎপন্ন বলিয়া আর অনুসন্ধান হইতে বিরত থাকা প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের অতি সহজ প্রণালী হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে সত্য নির্ণয়ের প্রকৃষ্ট প্রণালী বলা যায় না।

আমি এ কথা বলিতেছি না যে, বাঙ্গালা ভাষার উপরে অনার্য্যভাষা কোনই কার্য্য করে নাই। সংস্কৃতভাষা যখন সংস্কৃত ছিল, তখনও তাহাতে অনার্য্যভাষার শব্দ প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে সংস্কৃতের সংস্কৃতত্ব যায় নাই। বাঙ্গালা ভাষায়ও নিশ্চয়ই অনেক অনার্য্য শব্দ আছে, দুই একটা বিভক্তি প্রত্যয়ও হয় ত অনার্য্যভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে; তথাপি যখন দেখিতে পাই যে অধিকাংশ বিভক্তি-প্রত্যয় নিশ্চিত আর্য্য-ভাষামূলক, তখন বাঙ্গালাকে আর্য্যভাষাই বলিতে হইবে।

বঙ্গদেশ আর্য্যভূমির প্রায় প্রান্তভাগে অবস্থিত। বাঙ্গালীজাতির মধ্যে অনার্য্য-ভাগ অনেক বেশী। সুতরাং, বাঙ্গালা ভাষার উপরে অনেক পরিমাণে অনার্য্যপ্রভাব বিস্তৃত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। দুইভাবে সে প্রভাব কার্য্য করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। প্রথমতঃ, অনেকগুলি অনার্য্য শব্দ ও (হয় ত) দুই একটী অনার্য্য বিভক্তি-প্রত্যয় বাঙ্গালাভাষায় স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, অনেক সংস্কৃত প্রাকৃত বিভক্তি প্রত্যয় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এবং নবোদ্ভাবিত বিভক্তি-প্রত্যয় ও

শব্দ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। যে সকল আর্য্যভাষার সহিত অনার্য্যভাষার সংস্পর্শ অপেক্ষাকৃত কম ঘটিয়াছে, তাহাদের মধ্যে বিভক্তিপ্রত্যয়ের লোপ না ঘটিয়াছে, এমন নহে, তবে এত নহে। বিভক্তি-প্রত্যয়ের বাহুল্য ও জটিলতা কমিয়া ব্যাকরণের সরলতা-সাধন,ভাষার অভিব্যক্তির সাধারণ নিয়ম। অপভ্রংশ ভাষাগুলিতে এই ব্যাপার চরমে উঠিয়াছিল; তাহার পরে আবার নূতন আকারে বিভক্তি প্রত্যয় দেখা দিয়াছে, অথবা নূতন উপায়ে তাহার কার্য্য সাধিত হইতেছে। বাঙ্গালাভাষায় বিভক্তি প্রত্যয়গুলি অনেক স্থলে লুপ্তই রহিয়াছে, তাহাদের কার্য্য পদবিন্যাস প্রণালী অথবা পৃথক্ শব্দদ্বারা সাধিত হইতেছে। যথা,— বিশেষণ ও ক্রিয়ার বচনভেদ একেবারে লুপ্ত; বিশেষণের লিঙ্গভেদও অনেকস্থলে করা হয় না; বহুবচনের শব্দবিভক্তিও প্রথমায় ছাড়া নাই বলিলেই হয়; 'দিগ'একটা পৃথক শব্দ; ষষ্ঠীর 'দের'ও পৃথক শব্দেরই সংক্ষিপ্ত আকার, বিভক্তি নামে অভিহিত হইবার পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। এইরূপ পৃথক্ শব্দদ্বারা বহুবচনের প্রকাশও অনেক স্থলে করা হয় না, ভাবে বুঝিয়া লইতে হয়, কোথায় বহুবচন আর কোথায় একবচন।

এই যে প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার বিষয় বলিলাম, এ সম্বন্ধে একটা কথা বলা আবশ্যক মনে হইতেছে। কেহ কেহ বলিতে চাহেন, সংস্কৃত প্রকৃতি অর্থাৎ মূল ভাষা; তাহা হইতে যে সকল ভাষা বিকৃত বা অপভ্রষ্ট হইয়াছে, সে সকলি প্রাকৃত বা অপভ্রংশ নামের বাচ্য। সুতরাং, আধুনিক আর্য্যভাষা সমূহও প্রাকৃত বা অপভ্রংশ; ইহাদের কোন অবস্থাকে প্রাকৃত এবং কোন অবস্থাকে অপভ্রংশ বলা সঙ্গত নহে। এই কথা বলিয়া,কেহ কেহ বর্ত্তমান বাঙ্গালাকেই প্রাকৃত নাম দিয়া, প্রাচীন প্রাকৃতকে বিবেচনার মধ্যেই আনেন নাই, এবং সংস্কৃত হইতে একেবারে বাঙ্গালার উৎপত্তির নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার ফলে তাঁহাদিগকে অনেক কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে, এবং তাঁহারা অনেকস্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

বাস্তবিক বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি যথা-সম্ভব নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করিতে হইলে, সংস্কৃত হইতে আরম্ভ করিয়া যতগুলি ধাপের মধ্য দিয়া উহা বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, সে সমুদয়ই, যতদূর পাওয়া যায়, বিচার করিতে হইবে। যদি তাহা না করা যায়, তবে অনেকস্থলে ভ্রম হইবেই; আর যেখানে ভ্রম না হয়, সেখানেও, যে পরিবর্ত্তন দ্বারা বঙ্গভাষা বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার ক্রম বুঝিবার কোন উপায় থাকে না। এই ধাপগুলির ভিন্ন ভিন্ন নাম না দিলে,তাহাদের আলোচনায় সুবিধা হয় না। কোন প্রাকৃত বা অপভ্রংশ ভাষাকে যদি আধুনিক ভাষার সহিত এক নামে অভিহিত করি, তাহা হইলে তাহাকে বুঝাইবার জন্য কোনও বিশেষত্ববোধক বিশেষণ যোগ করিতে হয়। এরূপ সুন্দর বিশেষণ অনেক স্থলে পাওয়া কঠিন হইবে। কিন্তু, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ, এই দুইটী শব্দ দ্বারাই ভাষার যে বিশেষত্ব প্রকাশ পায়, তাহার জন্য নূতন শব্দ গঠনের কোন প্রয়োজন দেখি না। বিজ্ঞানে ব্যবহারের জন্য প্রচলিত শব্দের পারিভাষিক অর্থে গ্রহণের নিয়ম চিরকাল হইতেই প্রচলিত আছে। সেইরূপ অর্থে, এই দুইটী শব্দ বহুদিন হইতে ব্যবহৃত

হইতেছে। সুতরাং ইহাদিগকে সেই অর্থেই ব্যবহার করিব। সংস্কৃতেতর যে সকল ভাষা প্রাচীন নাটকাদিতে ব্যবহৃত হইয়াছে, যে সকল ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের জটিলতা অনেক কমিয়াছে, অথচ শব্দবিভক্তি ও ক্রিয়াবিভক্তিগুলি অনেক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে, প্রাকৃত ব্যাকরণকারগণ যাহাদিগকে প্রাকৃত-ভাষা নাম দিয়াছেন, সেগুলিই প্রাকৃত-ভাষা। আর যে সকল ভাষায় বিভক্তিগুলি বহুল পরিমাণে লুপ্ত, কোথাও বা একই রূপ নানা বিভক্তির কার্য্য করে, কোথাও বা বিভক্তির পরিবর্ত্তে পৃথক্ শব্দ ব্যবহৃত হয়, অন্যান্য বিষয়ে যে সকল ভাষা প্রাকৃতেরই অনুরূপ, প্রাকৃতের পরবর্ত্তী সেই সকল ভাষার নাম অপভ্রংশ ভাষা। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, তাঁহার এক সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির অভিভাষণে, কয়েকখানা নবাবিষ্কৃত গ্রন্থের ভাষাকে প্রাচীন বাঙ্গালা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেইরূপ অনুমান করিবার কতক কারণও দেখাইয়াছেন। উক্ত গ্রন্থগুলির ভাষাকে বিশেষরূপে বিশ্লেষণ করিয়া না দেখিলে, ঐ ভাষা বর্ত্তমান বাঙ্গালারই প্রাচীন রূপ কিনা, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তিনি তাঁহার অভিভাষণে উহার যে নমুনা দিয়াছেন, তাহাতে উহা সম্পূর্ণ প্রাকৃত বা অপভ্রংশের লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া বোধ হয়। এ বিষয়ে একটু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি।

পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্ধৃত প্রথম শ্লোকটী এই—

"গুরু উবএসো অমিঅ রস হবহিং ন পিঅ উজেহি।
বহু সহ মরুত্থলিহিঁ তিসিএ মুরিথউ তেহি ॥"

এই শ্লোকের প্রত্যেক পদ পরিচিত প্রাকৃতের নিয়মানুসারে সিদ্ধ না হইলেও, ইহাতে প্রাকৃতের লক্ষণ সুস্পষ্ট। 'গুরূপদেশঃ', 'অমৃত' ও 'মরুস্থলী' স্থানে 'গুরু-উবএসো,' 'অমিঅ' ও 'মরুত্থলি' হওয়া প্রাকৃতেরই নিয়মানুযায়ী। 'হি'র বহুল প্রয়োগ প্রপভ্রংশের পরিচায়ক। এই শ্লোকটী বেণ্ডল সাহেবের প্রকাশিত সুভাষিত সংগ্রহের পরিশিষ্ট হইতে গৃহীত।

আর একটী শ্লোক—

"পরঅপ্পান ম ভন্তি করু সঅল নিরন্তর বুদ্ধ।
এহুসো নিম্মল পরম পাউ চিত্ত স্বভাবে শুদ্ধ ॥"

এই শ্লোকেও অপভ্রংশের লক্ষণ বিদ্যমান। তবে, ইহাতে বিভক্তির ব্যবহার এত অল্প যে, ইহাকে আধুনিক ভাষার প্রাচীনরূপও বলা যায়। এটী সরোরুহ বজ্র-কৃত দোঁহা-কোষ হইতে গৃহীত। কিন্তু, ইহাতে বাঙ্গালা ভাষার কোন বিশেষত্বেরই চিহ্ন দেখা যায় না।

সরহপাদের (যাঁহাকে পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় সরোরুহ বজ্রের সহিত অভিন্ন মনে করেন) আর দুইটী শ্লোক দিতেছি, তাহা অধুনিক ভাষার আরও নিকটবর্ত্তী—

"অপনে রচি রচি ভবনির্ব্বাণা
মিছে লোঅ বন্ধাবএ অপনা।
অম্ভে ন জানহুঁ অচিন্ত জোই
জাম মরণ ভব কৈসন হোই।

বাঙ্গালা অপেক্ষা মিথিলার ভাষার সহিত ইহার ঘনিষ্ঠতা অধিক বলিয়া বোধ হয়। কেহ কেহ মিথিলার ভাষাকে, বাঙ্গালার প্রাচীনরূপ বলিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু, সেরূপ মনে করিবার কোনও প্রকৃষ্ট হেতু দেখা যায় না। বৈষ্ণব পদাবলীতে মৈথিলী ভাষার রচনা দেখিয়া এই বিশ্বাসের উৎপত্তি

হয়। কিন্তু জানা গিয়াছে, সেই সকল রচনা হয় মিথিলাবাসীর কৃত, অথবা তাহার অনুকরণের ফল। মৈথিল পদাবলীর সম্ভবতঃ সর্ব্বপ্রাচীন পদকর্ত্তা বিদ্যাপতি, বাঙ্গালী পদকর্ত্তা চণ্ডীদাসের সমসাময়িক বলিয়া প্রসিদ্ধ। চণ্ডীদাসের রচনা কিন্তু খাঁটী বাঙ্গালা। যদি সে সময়ে মৈথিল ভাষা বাঙ্গালার ভাষা হইত, তবে এরূপ হইতে পারিত না। তবে, বাঙ্গালা ভাষার কোন কোন শব্দ বা প্রয়োগের প্রাচীনরূপ ওড়িয়া,অসমীয়া বা মিথিলার ভাষায় থাকিতে পারে ; এবং ঐ সকল ভাষার কোন কোন প্রাচীনরূপও হয় ত বাঙ্গালায় আছে। সে-জন্য এই সকল প্রতিবেশী ভাষার একটীকে আর একটীর প্রাচীন রূপ বলা যায় না। হইতে পারে, বাঙ্গালা ও মিথিলার ভাষা এক মূল হইতে উৎপন্ন, এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের উল্লিখিত ভাষাই সেই ভাষা ; কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান ভিন্ন ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তিনি প্রধানতঃ 'বঙ্গে জায়া নিলেসি,' 'আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী' ইত্যাকার কথা ঐ সকল রচনায় দেখিয়াই উহাদিগকে বাঙ্গালা বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিজেই বলিয়াছেন, এ সকল স্থলে বঙ্গ ও বঙ্গালী শব্দের অর্থ পৃথক্। সহজ মতে, তিনটী পথ আছে, তন্মধ্যে ডোম্বী বা বঙ্গালী একটী ; ঐ সকল কথায় সেই 'বঙ্গালী' পথের কথাই বলা হইয়াছে, জাতির কথা নহে। যদি বিশেষ প্রমাণ বলে এই সকল রচনা বাঙ্গালা বলিয়া স্থির হয়, তবে বঙ্গভাষার ভাষাতত্ত্বের পথ অনেকটা পরিষ্কার হইবে ; অনেক সন্দিগ্ধ বিষয়ের মীমাংসা হইবে।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। আর একটা কথা বলিয়া উপসংহার করিব। শিশু যেমন মাতৃস্তন্যের ন্যায়, পিতামহীর স্তন্য ও পান করে, বঙ্গভাষাও সেইরূপ, সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে, অনেক সংস্কৃত হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছে ; এখনও করে। প্রাকৃত ভাষাগুলির মধ্যে অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ অল্পই পাওয়া যায়। বৌদ্ধ যুগে লোকে প্রচলিত ভাষা গুলির আদর হওয়াতে, সংস্কৃত একটু ম্রিয়মান হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু মহাযান-সম্প্রদায় ও নবাভ্যুদিত হিন্দু-গণ আবার সংস্কৃতের দিকে ফিরিলেন। ইহার ফলেই বোধ হয় সাধারণের ভাষায় আবার সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। কালে সেই সকল সংস্কৃতশব্দও বিকৃত হইতে লাগিল ; কিন্তু পণ্ডিতগণের সাহায্যে আবার নূতন সংস্কৃতশব্দ ভাষায় প্রবিষ্ট হইল। এইরূপ কতবার হইয়াছে, তাহা বলা কঠিন। দুই একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা আমার এ বিশ্বাসের কারণ প্রদর্শন করিতেছি। তাম্র হইতে তামা, আম্র হইতে আম, এবং নম্র হইতে নরম শব্দের উৎপত্তি, এ বিষয়ে বোধহয় মতদ্বৈধ হইবে না। কিন্তু এক-বিধ সংস্কৃতশব্দের এইরূপ বিভিন্ন প্রকার পরিবর্ত্তনের কারণ কি ? চর্ম্ম ও ঘর্ম্ম হইতে চাম ও ঘাম হইল, কিন্তু ধর্ম্ম ও মর্ম্ম হইতে ধরম ও মরম হইল কেন ? এক চর্ম্ম হইতে চাম ও চামড়া, এক চক্র হইতে চক, চকা, চাক, চাকা, চক্কর ইত্যাদি বিচিত্র রূপ কিরূপে উদ্ভূত হইল ? যে সকল কারণে এইরূপ বিচিত্রতার উৎপত্তি হইয়াছে, আমার বিবেচনায় বিভিন্ন শব্দের উৎপত্তির কালভেদ তন্মধ্যে একটী। বিভিন্ন সময়ে সংস্কৃত শব্দের বিকৃতির ধারা বিভিন্ন প্রকার ছিল, অনেক স্থলে এই কারণেই বিকৃত শব্দের এইরূপ বিচিত্রতা দেখা যায়। কেবল

অনুমানের কথা নহে, আমাদের অভিজ্ঞতা হইতেও ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। দেখুন, প্রাচীন কালে সংস্কৃত কর্ম্ম শব্দ হইতে প্রাকৃত 'কম্ম' ও তাহা হইতে 'কাম' শব্দের উৎপত্তি হয়। কিন্তু, পরবর্ত্তী কালে 'মজুরি' অর্থে কর্ম্ম শব্দ ব্যবহৃত হইতে লাগিল; কাম শব্দ সে অর্থে প্রযুক্ত হইল না। এখন বর্ত্তমান সময়ের রীতি অনুসারে অদৃষ্টার্থক কর্ম্ম শব্দ স্থানে 'করম' হইতে পারে, কিন্তু 'কাম' হইবে না। অতএব যাঁহারা সংস্কৃতকে বাঙ্গালার অতি-অতি-অতি-অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহী বলিয়া দূরে সরাইয়া রাখিতে চাহেন, তাঁহারা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয় ভাষার উপরই অত্যন্ত অন্যায় করেন, বলিতে হইবে! প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষা'ত পরবর্ত্তী ভাষা গুলির জন্ম দিয়া মরিয়া গিয়াছে। পারসী, আরবী, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষা সময়ে সময়ে খাদ্য সংগ্রহ করিয়াছে, পরেও করিবে; কিন্তু সেই সকল বিদেশী খাদ্য বাঙ্গালার পুষ্টির পক্ষে সংস্কৃতের স্তন্যের ন্যায় তেমন উপযোগী নহে, অল্প পরিমাণেই তাহার গ্রহণ সম্ভব হইয়াছে ও হইবে, নতুবা সুপাচ্য হইবে না। তবে যদি কেহ বলেন, অতিরিক্ত মাতৃস্তন্যও অনিষ্টকর হইতে পারে তাহা হইলে তাঁহার সহিতও আমার বিবাদ নাই।

শ্রীপরেশনাথ সেন।

পৃথিবীর উৎপত্তি। (৫)

ভূপৃষ্ঠে জল ও স্থলের সমাবেশ

আমাদের এই ভূপৃষ্ঠে জল ও স্থলের সমাবেশ মোটেই চিরস্থায়ী নহে। আজ যাহা একটা বিরাট মহাদেশ, কোটী কোটী ভূচর ও খেচরের লীলাভূমি সুদূর অতীতে হয়ত তাহা একটা বিরাট জলাধার ছিল, আলোক বাতাসেরও তথায় প্রবেশাধিকার ছিল না। আবার যেখানে দিগন্তপ্রসারী নীলাম্বুরাশি নানারঙ্গে তরঙ্গ বিস্তার করিতেছে, দূর ভবিষ্যতে হয়ত তাহা পল্লবিত তরুরাজি সমাকীর্ণ গহন কান্তারে পরিণত হইয়া নানা জাতীয় বিহগকূজনে মুখরিত হইবে।

যুগেযুগে এই যে বিশ্বব্যাপী সংস্কার, এই যে নবনব ক্ষীরোদপ্লাবন, নবনব ধরণী সংগঠন, এসকল কি নিতান্তই কোন অজ্ঞাত ঐন্দ্রজালিকের অজ্ঞেয় কুহকদণ্ড পরিচালনার ফল? এই সকল পরিবর্ত্তন পরম্পরার মূলে কি কোন মনুষ্য-বুদ্ধি-গম্য কারণের অস্তিত্ব নাই?

কার্য্য হইতে কারণে, ঘটনা হইতে ঘটন পটীয়সী শক্তিতে উত্তরণই বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য। বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা দেখিব,—পৃথিবীর অতীত ও বর্ত্তমান জল-স্থল সমাবেশ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণ এই লক্ষ্য অভিমুখে কতটুকু অগ্রসর হইয়াছেন।

পৃথিবীর মানচিত্রে দৃষ্টিপাত করিলে সহসা মনে হয়, ভূপৃষ্ঠে জল ও স্থলের সমাবেশ নিতান্তই যেন একটা "খাম খেয়ালি" ব্যাপার। অসীম মহাসাগরের বুকের উপরে

কতকগুলি বিক্ষিপ্ত দ্বীপপুঞ্জের মতই যেন বিশৃঙ্খল ভাবে আমাদের এই মহাদেশগুলি স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের ভিতরে না আছে কোন সামঞ্জস্য না আছে, কোনও নিয়মানুবর্ত্তিতা। কিন্তু এই আপাত-প্রতীয়মান অনৈক্যের মধ্যেও অতি প্রাচীন কাল হইতেই বৈজ্ঞানিকগণ একটা ঐক্যের সাড়া পাইয়াছিলেন। এই সকল বিশৃঙ্খলতার মধ্যেও বৈজ্ঞানিকগণ একটা শৃঙ্খলা ধরিবার চেষ্টায় ছিলেন।

আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কারের পূর্ব্বে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করিতেন, এসিয়া মাইনর প্রদেশ পৃথিবীপৃষ্ঠের স্থলভাগের প্রায় মধ্য-স্থলে অবস্থিত, (এতদনুসারেই তাঁহারা তৎসন্নিহিত Mediterranian বা ভূমধ্যসাগর নাম দিয়াছিলেন।) আর বিশাল ভূখণ্ড সমূহ চক্রাকারে ইহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। এই ভূচক্রের পর অনন্ত প্রসারী সাগরমালা বিদ্যমান্।

আমেরিকা যতদিন বিজ্ঞান জগতের অন্তরালে নিঃশব্দে আত্ম গোপন করিয়া আসিতেছিল, ততদিন প্রাচীন পণ্ডিতগণের এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত অটুট এবং অচল অবস্থায় ভূতত্ত্বের এই অধ্যায়ের দ্বারে কড়া প্রহরায় নিযুক্ত ছিল। কিন্তু, আমেরিকা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভিত্তিহীন প্রমাণিত হইয়া গেল। সবিস্ময়ে পণ্ডিতগণ দেখিলেন, তাঁহাদের পরিকল্পিত চক্রনেমীই ভূপৃষ্ঠের স্থলভাগের শেষসীমা রেখা নহে। আর চক্র পরিবেষ্টনকারী মহাসাগরও অপার নয়; ইহার পরপারেও আবার ষড়-ঋতু-সেবিত নানা বিহগ কূজিত বিশাল ভূখণ্ড বিদ্যমান।

যাহা হউক, 'নবজগৎ' আবিষ্কারের ফলে, প্রাচীন চক্র সিদ্ধান্ত তিরোহিত হইয়া, তৎপরিবর্ত্তে একটী মহত্তর সত্যের আভাস পণ্ডিতগণের নিকট ধীরে ধীরে প্রতিভাসিত হইতে লাগিল।

আমেরিকা আবিষ্কারের পর হইতে, সমগ্রভাবে পৃথিবীর ভূগোল আলোচনার একটা বিপুল সাড়া পড়িয়া গেল। আর তাহার ফলে, পণ্ডিতগণ বিক্ষিপ্ত মহাদেশগুলির আকৃতি ও অবস্থিতির মধ্যে কতকগুলি অদৃষ্ট-পূর্ব্ব সামঞ্জস্য দেখিতে পাইলেন।

প্রথমতঃ পণ্ডিতগণ দেখিলেন, ভূগোলকের উত্তরার্দ্ধ স্থল-বহুল, আর দক্ষিণার্দ্ধ জল-সমাকুল। পৃথিবীর মানচিত্রে এ ব্যাপারটী এতই পরিস্ফুট যে, এখানে বর্ণনা দ্বারা ইহার ব্যাখ্যান চেষ্টা নিতান্তই বাহুল্য।

দ্বিতীয়তঃ আমেরিকা, আফ্রিকা প্রভৃতি মহাদেশের আকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ দেখিলেন যে, পৃথিবীর স্থলভাগ প্রায় সর্ব্বত্রই উত্তরের দিকে প্রশস্ত, এবং দক্ষিণের দিকে ক্রম-সূক্ষ্ম।

মহাদেশগুলি অনেকটা ত্রিভুজাকৃতি; পৃথিবীর উত্তরাংশে ভূমি স্থাপন করত ইহাদের ক্রমসূক্ষ্ম শীর্ষদেশ দক্ষিণে হেলিয়া ধীরে ধীরে সমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছে। স্থলভাগের উত্তরে বিস্তৃত আর দক্ষিণে সূক্ষ্মতা আমাদের ভারতবর্ষের আকৃতিতে ও স্পষ্টতঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

আবার পৃথিবী-পৃষ্ঠের স্থলভাগের এই আকৃতি-গত সামঞ্জস্যের ফলে, ইহার বিভিন্ন জলভাগের আকৃতিতেও একটা ঐক্য লক্ষিত হইতেছে। পৃথিবী-পৃষ্ঠ যখন জল আর স্থলের, মহাদেশ আর মহাসাগরের সমবায়েই গঠিত, তখন মহাদেশগুলি যদি ত্রিভুজাকৃতি হয়, তবে মহাসাগরগুলিও নিশ্চয়ই ত্রিভুজাকৃতি

হইবে। এবং স্থল-ত্রিভুজের শীর্ষদেশ যেমন দক্ষিণে বিপুল বারি রাশির মধ্যে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া, অবশেষে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে; জল ত্রিভুজের শীর্ষদেশও ঠিক সেইরূপ উত্তরের দিকে অনুপ্রবিষ্ট হইতে হইতে, ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া অবশেষে বিশালভূমি খণ্ডে স্বীয় অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে।

তৃতীয়তঃ; উপর্য্যুক্ত পর্য্যবেক্ষণ যুগলের সমন্বয়ে বৈজ্ঞানিক গণ দেখিলেন যে, পৃথিবীর উত্তর ভাগে বিভিন্ন মহাদেশের সুবিস্তৃত উত্তর ভূভাগ সমূহ পরস্পর সম্মিলিত হইয়া একটী বৃত্ত রচনা করিয়াছে। আর এই বৃত্ত হইতে তিনটী বিশাল ভূভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া দক্ষিণে নামিয়া আসিয়াছে। তাঁহারা দেখিলেন—উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকা এবং এসিয়াও অষ্ট্রেলেসিয়া মহাদেশ তিনটী বিচিত্র ঝালরের মত উত্তর গোলার্দ্ধকে বেষ্টন করিয়া দক্ষিণে প্রসারিত হইয়াছে।

আর পৃথিবীর মানচিত্রে প্রশান্ত, আটলান্টিক প্রভৃতি বিভিন্ন নামধারী অনন্তপ্রসারী মহাসাগর সমূহ পৃথিবীর দক্ষিণ ভাগে পরস্পর মিলিত হইয়া সুবিস্তৃত কটীবন্ধের ন্যায় যেন ইহাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে।

সমগ্র-ভাবে পৃথিবীর ভূগোল আলোচনায় পণ্ডিতগণ আর একটী অতীব কৌতুহলোদ্দীপক ব্যাপার লক্ষ্য করিলেন, তাঁহারা দেখিলেন—জল এবং স্থলভাগ ভূ-পৃষ্ঠে পরস্পর বিপর্য্যস্তভাবে সন্নিবিষ্ট।

ভূগোলকের কেন্দ্র ভেদ করিয়া 'এপাশ ও পাশ' শলাকা-চালনা করিলে, দেখা যায় যে এই শলাকার এক প্রান্তে স্থল থাকিলে, অপর প্রান্তে প্রায় সর্ব্বত্রই জল সন্নিবিষ্ট থাকে। একটু অভিনিবেশ সহকারে ভূলোক পর্য্যবেক্ষণ করিলে অতি সহজেই এই ব্যাপারটী পরিস্ফুট হইবে।

পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন আমাদের এই পৃথিবীর সমুদয় স্থলভাগের প্রায় ২৮ ভাগের ২৭ ভাগের বিপরীত দিকেই জল; শুদ্ধ অবশিষ্ট এক অংশের পর-পার্শ্বেই স্থল বিদ্যমান।

যাহা হউক, পৃথিবী পৃষ্ঠের জল ও স্থল রাশির সমাবেশ ব্যাপারে, এই যে কতকগুলি বিশেষত্ব লক্ষিত হইয়াছে, ইহারা সকলেই যেন কোন অজ্ঞাত কারণের দিকে সুস্পষ্ট অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে। মহাদেশ ও মহাসাগর সমূহের আকৃতি ও অবস্থান গত এই যে সামঞ্জস্য ইহা নিতান্ত নিরর্থক নহে। বস্তুতঃ ইহাই এতাবৎকাল ভূতত্বের এ অধ্যায়ের আলোচনায় নব্য বৈজ্ঞানিক গণের কল্পনা-যজ্ঞের ইন্ধন যোগাইয়া আসিতেছে।

পৃথিবীর জল ও স্থলভাগের বিন্যাস সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রবর লোথিয়ান গ্রীন্ (Lothian Green) মহোদয়ের সুপ্রসিদ্ধ মতবাদ এই ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

এক্ষণে আমরা তদালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

লোথিয়ান্ গ্রীণের পূর্ব্বে বিখ্যাত ফরাসী ভূতত্ববিদ্ এলি-ডে বোমণ্ট্ (Elie-De-Bomont), পর্ব্বত শ্রেণীর বিন্যাস অবলম্বনে, পৃথিবীর পৃষ্ঠের স্থলভাগের বিভিন্ন আকৃতির ব্যাখ্যানের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তিনি বলিয়াছিলেন, ভূধর শ্রেণী পৃথিবীর স্থলভাগের মেরুদণ্ড-স্বরূপ। ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই স্থূলতঃ মহাদেশগুলি আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

এতদনুসারে তিনি সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে পরস্পর সংলগ্ন দ্বাদশটী পঞ্চভূজ (Pentagon) ক্ষেত্রে ভাগ করিয়া ফেলিয়াছিলেন আর এই সকল পঞ্চভূজের বাহু সমূহ, তিনি বলিয়াছিলেন, পৃথিবীর বিভিন্নমুখীন পর্ব্বতমালা দ্বারাই গঠিত। কিন্তু তাঁহার এই সুনিপুণ সিদ্ধান্তে একটী প্রধান সমস্যাই অমীমাংসিত রহিয়া গেল। যদি সারা পৃথিবীটাই বারটী সমাকৃতি পঞ্চভূজ দ্বারা সমাচ্ছন্ন রহিল, তবে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণার্দ্ধে জল ও স্থলসমাবেশে এত বৈষম্য কেন?

বোমণ্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে পৃথিবীর উত্তরে ও দক্ষিণে জল-স্থলের সন্নিবেশে কোন তারতম্য হওয়া উচিত নহে। কিন্তু, বিজ্ঞান-জগতে ভূগোল পরিচয়ের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্দ্ধে জল ও স্থল-সমাবেশের বৈষম্য উত্তরোত্তর এতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, এক্ষণে আর ইহাকে উপেক্ষা করিয়া কোন মতবাদই দাঁড়াইতে পারে না।

লোথিয়ান্ গ্রীণ দেখাইয়াছেন—ভূপৃষ্ঠে জল ও স্থল-সমাবেশ বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে, পৃথিবীকে দ্বাদশটী পঞ্চভূজ ক্ষেত্রদ্বারা সমাবৃত না বলিয়া বরং অনেকটা ঘন-চতুষ্কোণাকৃতি (Tetrahedral) কল্পনা করাই সঙ্গত।

জ্যামিতিতে ঘন চতুষ্কোণ (Tetrahedron) বলিতে অনেক পিরামিডের মত আকৃতি-বিশিষ্ট পদার্থ বুঝায়। পিরামিডের ভূমি (Base) এবং পার্শ্ব দেশ (Face) যদি সমায়তন চারিটী সমবাহু ত্রিভুজের সমাহারে গঠিত হয়, তবেই ঐ পিরামিডকে ঘন চতুষ্কোণাকৃতি বলা যায়। একটী সমবাহু ত্রিভুজের তিনটী বাহুর উপরে যদি আবার তদনুরূপ তিনটী সমবাহু ত্রিভুজ পরস্পরের পার্শ্বরেখা (Edge) স্পর্শ করত দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের শীর্ষবিন্দু (Vertex) এর একই বিন্দুতে সম্মিলিত করে, তবেই একটী ঘন চতুষ্কোণ-উৎপন্ন হয়।

ঘন চতুষ্কোণের মোট চারিটী পার্শ্ব (Face) ইহারা প্রত্যেকেই এক একটী সমবাহু ত্রিভুজ। আর, ইহাদের যে কোনটীর উপর চতুষ্কোণটীকে স্থাপন করিলে প্রত্যেক বারেই তৎসম্মুখীন ফলকাকৃতি এক একটী কোণশীর্ষদেশে গিয়া উপস্থিত হয়—কাজেই ঘন চতুষ্কোণে মোট চারিটী ফলক কোণ (Solid angel) বিদ্যমান। ঘনক্ষেত্রের সন্নিহিত পার্শ্বযুগলের সঙ্গমে যে রেখা উৎপন্ন হয়, তাহাকে শিররেখা (edge) বলা যায়। ঘন-চতুষ্কোণে এইরূপ ছয়টী শিররেখা আছে।

যাহা হউক, আমাদের আলোচ্য ঘন চতুষ্কোণের সহিত তাহা হইলে আমরা এতক্ষণে একরূপ পরিচিত হইলাম। এখন আর লোথিয়ান্ গ্রীণের যুক্তি পরম্পরা এবং সিদ্ধান্ত বুঝিতে আমাদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না।

কাঠ অথবা পুরুকাগজ-নির্ম্মিত একটী আদর্শ ঘন চতুষ্কোণের একটী পার্শ্ব ত্রিভুজের ঠিক মধ্যস্থলদিয়া তৎসম্মুখীন ফলককোণ ভেদ করত একটী শলাকা চালাইয়া চতুষ্কোণটীকে অপর একখণ্ড কাঠ বা কর্কের উপর স্থাপন করা যাউক (Making of the Earthএর একবিংশতিতম চিত্র)। এই ঘন চতুষ্কোণটীকে সম্মুখে রাখিয়াই আমরা ভূপৃষ্ঠে জল ও স্থল সমাবেশ সম্বন্ধে লোথিয়ান্ গ্রীণের মতবাদ আলোচনা করিব।

মনে করা যাক,—আমাদের এই ঘন চতুষ্কোণটী কেন্দ্রাভিমুখীন আকর্ষণ বলে ঠিক পৃথিবীর মতই স্বীয় পৃষ্ঠে জলরাশি ধারণে সমর্থ।

চতুষ্কোণ পৃষ্ঠে, কল্পিত এই জলরাশির অবস্থান সম্বন্ধে একটু বিবেচনা করিলেই আমরা দেখিব যে, এই জল সমভাবে পার্শ্ব ত্রিভুজের মধ্যপ্রদেশগুলি আশ্রয় করিবে। যেস্থান ঘন চতুষ্কোণের কেন্দ্র বিন্দুর যত নিকটবর্ত্তী, সেইস্থানে আকর্ষণ তত বেশী; আর যে স্থান কেন্দ্র হইতে যত দূরে অপসৃত, তথায় আকর্ষণী শক্তি তত কম। এই কারণেই চতুষ্কোণের পার্শ্ব ত্রিভুজের মধ্য প্রদেশ সমূহ বারিপ্লাবিত থাকিবে, আর চারিটী ফলক কোণ ঊর্দ্ধে জাগ্রত থাকিবে।

পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন—পৃথিবী-পৃষ্ঠের ৭ ভাগের ৫ ভাগই জল। এখন, আমরা যদি আমাদের চতুষ্কোণ গাত্রেও ঠিক এই অনুপাতে জল স্থাপনা করি, তাহা হইলে দেখিব, বিভিন্ন জলরাশি প্রত্যেক পার্শ্ব ত্রিভুজের মধ্যদেশ প্লাবিত করিয়া বেষ্টন-কারী শিররেখা সমূহের ঠিক মধ্য বিন্দুতে সন্নিহিত অপরাপর পার্শ্ব ত্রিভুজের মধ্যস্থ জলরাশির সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। তাহা হইলে আমাদের ঘন চতুষ্কোণে জল ও স্থলের সমাবেশ এইরূপ হইল:-

ইহার উপরিভাগে শলাকার পাদদেশকে কেন্দ্র করিয়া একটী বৃত্তাকৃতি মহাসাগর অবস্থিত। শলাকার এই মূল বিন্দুকে উত্তর মেরু কল্পনা করিলে এই সাগর বৃত্তই আমাদের উত্তর মহাসাগর। তিনটী ফলক কোণের উন্নতভূভাগ এই সাগর-বৃত্তকে মণ্ডলাকারে প্রায় বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। ফলককোণের এই ভূভাগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহাদের নিম্নপ্রদেশের ক্রম-সূক্ষ্মতা সহজেই প্রতীয়মান হয়। কোণাবস্থিত এই ভূভাগত্রয়ই যেন আমাদের পৃথিবী গাত্রে ঝালর সদৃশ সেই তিনটী বিশাল ভূখণ্ড। আর শলাকার অগ্রভাগের ফলক-কোণস্থ ভূভাগ আমাদের পৃথিবীর আণ্টা-টিকা (Antartica) বা কুমেরুপ্রদেশের সহিত উপমিত হইতে পারে। আমাদের সমচতুষ্কোণ গাত্রের জল ভাগও ঠিক এইরূপ পৃথিবীর মহাসাগর সমূহের সহিত তুলিত হইতে পারে। ইহাদের আকৃতিও পৃথিবী-পৃষ্ঠস্থ সমুদ্রেরই অনুরূপ -উত্তরের দিকে ক্রম সূক্ষ্ম, আর দক্ষিণদিকে পরস্পর মিলিত। ঘন চতুষ্কোণের নিম্নভাগে যে সুবিস্তৃত এবং অখণ্ড সাগর মেখলা বিদ্যমান ইহা আণ্টা-টিকা পরিবেষ্টনকারী মহাসাগর বৃত্ত—প্রশান্ত মহাসাগর ও দক্ষিণ মহাসাগরের সমবায়ে গঠিত।

তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি, পণ্ডিত-গণ ভূগোল আলোচনায় পৃথিবীর জল-স্থল সমাবেশে যে কয়েকটী বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন, স্থূলত তাহার সবগুলিই আমাদের এই ঘন চতুষ্কোণে বর্ত্তমান।

পৃথিবীর উত্তরমেরু প্রদেশে যেমন উত্তর মহাসাগর চারিদিকে প্রায় স্থল-বেষ্টিত রহিয়াছে, আমাদের ঘনচতুষ্কোণের উপরি-ভাগের (উত্তরের) জলরাশিও সেইরূপ ফলক কোণত্রয়ে সন্নিবিষ্ট স্থল ভাগ দ্বারা বৃত্তাকারে পরিবেষ্টিত আছে।

আবার, উত্তর মেরু বেষ্টনকারী স্থলভাগ যেমন দক্ষিণে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে হইতে পৃথক পৃথক তিনটী ঝালরের ন্যায় ভূগোলক গাত্রে নামিয়া আসিয়াছে, আমাদের

ঘন চতুষ্কোণের ফলক-কোণাবস্থিত ভূভাগ ত্রয়ও ঠিক সেইরূপ উহার তিনটী শিররেখা অবলম্বন করত ক্রম সূক্ষ্মভাবে দক্ষিণে প্রসারিত হইয়াছে।

ভূগোলকের দক্ষিণে যেমন মহাসাগর গুলি পারস্পারিক স্বাতন্ত্র হারাইয়া মিলিত ভাবে সমস্ত পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, আমাদের চতুষ্কোণও তদ্রূপ উহার পার্শ্ব ত্রিভুজ-ত্রয়ের জলরাশি নিম্নপ্রদেশে মিলিত, হইয়া সর্ব্বতোভাবে ইহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া ফেলিয়াছে।

পণ্ডিতেরা যেমন দক্ষিণমেরু প্রদেশে আণ্টার্টিকার সন্ধান পাইয়াছেন, আমাদের চতুষ্কোণেও তেমনি নিম্নফলককোণ চারিদিকে জল-বেষ্টিত অবস্থায় আত্ম প্রকাশ করিতেছে।

আবার, পৃথিবী-পৃষ্ঠের জল ও স্থলের বিপর্য্যস্ত অবস্থান আমাদের ঘন চতুষ্কোণেও স্পষ্ট প্রতিভাসিত হইয়াছে। প্রত্যেক ফলক কোণের বিপরীত পার্শ্বেই জলরাশি অবস্থিত।

এইত গেল স্থূলতঃ আমাদের ঘন-চতুষ্কোণের সহিত পৃথিবীর জল-স্থল সমাবেশের সামঞ্জস্য। একটু সতর্কভাবে পর্য্যালোচনা করিলে স্থানে স্থানে ইহার ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হইবে।

উত্তর মেরু প্রদেশের মানচিত্র দেখিলে দেখা যাইবে, উত্তর মহাসাগর সর্ব্বতঃ স্থল-বেষ্টিত নহে। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, আটলাণ্টিক মহাসাগর উত্তর মহাসাগরের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। ইহার মীমাংসায় পণ্ডিতগণ বলেন—পৃথিবীর ইতিহাসে অতীতকালে, উত্তর আমেরিকা ও উত্তর ইউরোপ নাতি-প্রসর ভূমিখণ্ড দ্বারা সংলগ্ন ছিল। তাঁহারা দেখাইয়াছেন, তখন স্কটলণ্ড, ফারো দ্বীপ পুঞ্জ, আইসলণ্ড ও উত্তর আমেরিকার গ্রীণলণ্ড প্রদেশ পরস্পর সংলগ্ন ছিল। বস্তুতঃ, বর্ত্তমানেও ইহাদের মধ্যবর্ত্তী জলভাগ নিতান্তই অগভীর।

আবার পৃথিবীর মানচিত্রে ত ইউরোপ এবং এশিয়া ঠিক আমেরিকার ন্যায় বিভিন্ন-মুখীন ঝালরের মত বিস্তারিত হয় নাই। ইহারা পরস্পর-সংলগ্ন এক বিশাল ভূখণ্ড সৃষ্টি করিয়াছে। এতদুত্তরে পণ্ডিতগণ বলেন:—

ভূতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, অতীত যুগে ইউরোপ ও এসিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্নই ছিল। পরবর্ত্তী কালে, পৃথিবী-পৃষ্ঠের আলোড়নে তাহাদের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্র-বক্ষ উন্নত হইয়া স্থলে পরিণত হইয়াছে। ইহাদের মতে কাস্পিয়ান্ হ্রদ এবং পারশ্য-উপসাগর সেই লুপ্ত সমুদ্রের অবস্থান ও প্রসরণ নির্দ্দেশ করিতেছে। উত্তর মহাসাগরে শীল্ (Seal) নামক এক জাতীয় মৎস্য আছে, কাস্পিয়ান হ্রদেও এই সামুদ্রিক মৎস্য দৃষ্ট হয়। ইহা হইতেও পণ্ডিতগণ মনে করেন—অতীত যুগে কাস্পিয়ান্ হ্রদ রুশিয়া ভেদ করত বরাবর উত্তর মহাসাগরের সহিত সংযুক্ত ছিল। পরবর্ত্তী কালে পৃথিবীর আলোড়নে সেই সাগর অন্তর্হিত হইয়া ইউরোপ ও এসিয়াকে সম্মিলিত করিয়া দিয়াছে।

যাহা হউক, এই সকল যুক্তি পরম্পরা অবলম্বন করিয়াই লোথিয়ান গ্রীন্ বলেন জল ও স্থল সমাবেশ ব্যাপারে আমাদের এই পৃথিবী অনেকাংশে একটী ঘন-চতুষ্কোণের সহিত উপমেয় তিনি বলেন, পৃথিবী

যদি ঘন চতুষ্কোণাকৃতি হইত, তবে তৎপৃষ্ঠে জল ও স্থল সন্নিবেশ বর্ত্তমানের অনুরূপ হওয়া সম্ভব হইত। এই যুক্তির অনুসরণেই লোথিয়ান্ গ্রীণ বলেন যে, গোলকাকৃতিই পৃথিবীর স্থায়ী গঠন নহে। পৃথিবী-পৃষ্ঠে জল ও স্থল সমাবেশ পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যেন ঘন চতুষ্কোণাকৃতি পৃথিবীতে জল-স্থল-সন্নিবেশের পরে উহা পারিপার্শ্বিক শক্তির ফলে গোলকে পরিণত হইয়াছে। বস্তুতঃ স্বীয় মেরুদণ্ডের উপরে পৃথিবী যে বেগে তাহার দৈনন্দিন আবর্ত্তন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে, তাহাতে ইহার পক্ষে চতুষ্কোণ অবস্থা হইতে ক্রমশঃ গোলকে পরিণত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

আমরা সকলেই ফুটবলের ব্লাডার দেখিয়াছি। রবারের ব্লাডারের ভিতরে যখন নলমুখে প্রথমে বাতাস প্রবেশ করান যায়, তখন প্রথমতঃ উহার চারি পার্শ্বের চারিটী রবারের পুরু জোড়া শিরের মত খাড়া হইয়া উঠে। আর তাহাদের মধ্যবর্ত্তী স্থান সমূহ অপেক্ষাকৃত কম স্ফীত হয়। পরে ব্লাডারে যতই বাতাস প্রবিষ্ট হয়, ততই শির চারিটী বক্র হইয়া আসে, এবং পরিশেষে ব্লাডারটী প্রায় একটী গোলকে পরিণত হয় আমাদের চতুষ্কোণ পৃথিবীও এইরূপ, তাহার বিপুল আবর্ত্তন বেগের ফলে ক্রমশঃ গোলকে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

আবার পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন, পৃথিবীর অন্তর্মুখীন্ আকুঞ্চনের ফলে, ইহার গোলক হইতে চতুষ্কোণাকৃতিতে যাইবার একটা প্রয়াসের সৃষ্টি হয়।

পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ তরলই হউক, আর বায়বীয়ই হউক, উহা যে ক্রমেই নিবিড়ভাবে জমাট বাঁধিতেছে, তাহাতে আর পণ্ডিতগণের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। এদিকে পৃথিবী-পৃষ্ঠ কঠিন বলিয়া, এখন আর এই অন্তর্মুখীন্ আকুঞ্চনের সহিত তাল রাখিয়া তাহার পক্ষে সমভাবে আকুঞ্চিত হওয়া সম্ভবপর হয় না এই কারণেই পৃথিবী, পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল, যতদূর সম্ভব সমান রাখিয়াই ইহাকে আকুঞ্চিত হইতে হয়।

গণিত সাহায্যে পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন, পিণ্ড-পরিমাণ (Volume) তুলনায়, গোলকাকৃতি পদার্থের বহির্ভাগের ক্ষেত্রফল সর্ব্বাপেক্ষা কম; আর ঘন চতুষ্কোণের বহির্ভাগের ক্ষেত্রসকল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কাজেই অন্তর্মুখীন্ আকুঞ্চন বশতঃ গোলাকৃতি পৃথিবীর পিণ্ড-পরিমাণ যতই কমিতে থাকে, ততই তাহার উপরিস্থ কঠিন ভূভাগ ক্রমে চতুষ্কোণাকৃতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়।

অন্তর্মুখীন্ আকুঞ্চনে গোলকাকৃতি পদার্থের এই ঘন চতুষ্কোণাকৃতি অবলম্বন ব্যাপারটী, পণ্ডিতগণ পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নিঃসংশয়িত রূপে প্রমাণ করিয়াছেন। ইহার উপর নির্ভর করিয়া লোথিয়ান্ গ্রীণের সমর্থকগণ বলেন, নিশ্চল অবস্থায় থাকিলে পৃথিবী সর্ব্বতোভাবে একটী ঘন চতুষ্কোণে পরিণত হইত। কিন্তু আবর্ত্তনশীল বলিয়া পৃথিবী গোলক-অবস্থাতেই আছে। তবে, আকুঞ্চনের ফলে, ইহার পার্শ্ব চতুষ্টয় ঈষৎ চাপা রহিয়াছে। আর পৃথিবী-পৃষ্ঠের জলরাশি এই নিম্ন ভূমি সমূহ অধিকার করিয়াই মহাসমুদ্রের সৃজন করিয়াছে।

বস্তুতঃ, পৃথিবী যে ঠিক গোলকাকৃতি নহে, একথা অধুনা অধিকাংশ ভূতত্বানুসন্ধায়ী পাণ্ডিত সমাজই এক বাক্যে স্বীকার

করিতেছেন। বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে কেহ কেহ আবার উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর আকৃতির বিভিন্নতাও ঘোষণা করিতেছেন। ইঁহাদের মতে, উত্তর মেরু প্রদেশে পৃথিবী একটু চাপা, আর ইহার দক্ষিণ মেরু প্রদেশ অপেক্ষাকৃত বহিরাগত। পণ্ডিতগণের এই সিদ্ধান্তটী ঘন-চতুষ্কোণবাদের পরিপোষক বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

গণিত সাহায্যে বৈজ্ঞানিকগণ আরও দেখাইয়াছেন যে, গোলকাকৃতি বা চতুষ্কোণাকৃতি, ইহাদের কোনটীই পৃথিবীর পক্ষে স্থায়ী হইতে পারে না। আকুঞ্চন-প্রভাবে গোলক ধীরে ধীরে চতুষ্কোণত্ব প্রাপ্ত হইতে থাকে বটে, কিন্তু ইহারও একটা সীমা আছে; পৃথিবী চতুষ্কোণের সেই চরমে উপনীত হইলে, আবর্ত্তন বেগের ফলে আবার ক্রমশঃ গোলকে পরিণত হইতে থাকে। চরম গোলকে আবার চাতুষ্কৌণিক সঙ্কোচন ক্রিয়া সূচিত হয়। চতুষ্কোণ আবার গোলকে পরিণত হয় গোলক আবার চতুষ্কোণাকৃতি ধারণ করে। সৃষ্টির আদি হইতে পৃথিবী এইরূপ যুগব্যাপী শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত স্বীয় আকৃতি পরিবর্ত্তিত করিয়া আসিতেছে।

পৃথিবীর এই সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে ভূ-পৃষ্ঠে যুগে যুগে জল ও স্থল সমাবেশের বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অপরাপর নানা নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন পরম্পরাও অধুনা পণ্ডিতগণ ইহা দ্বারা মীমাংসা করিতেছেন।

পৃথিবীর ইতিহাসের অতি পুরাকাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত ভূপৃষ্ঠের আগ্নেয়-গিরি সমূহের অগ্ন্যুৎপাৎ আলোচনা করিয়াও বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণ-মূলক মতবাদের পরিপোষক প্রমাণ পাইয়াছেন

সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে, পৃথিবীতে গৈরিক নিঃস্রাব একেবারে ক্ষান্ত হইয়াছে, এরূপ কখনও দেখা যায় না বটে; তথাপি সাধারণ ভাবে ভূ-তত্ত্ব আলোচনা করিলে, সহজেই দেখা যাইবে যে, পৃথিবীতে অগ্ন্যুৎপাৎ কোন কোন যুগে বা মৃদু, আবার কোন কোন যুগে বা উগ্রভাব ধারণ করিয়াছে। ব্যাপারটী একটু অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিলে, আমরা পৃথিবীর আগ্নেয়-গিরি-সমূহের ইতিহাসে একটী বড়ই কৌতুহলোদ্দীপক পারম্পর্য্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইব।

অতি প্রাচীন যুগ হইতেই আমরা দেখিব, পৃথিবীর ইতিহাসের এক অধ্যায়ে গৈরিক উৎসারণ অতীব ভীষণ এবং ব্যাপক, আবার ঠিক তৎপরবর্ত্তী অধ্যায়েই উহা শান্ত এবং সংক্ষিপ্ত। তৎপরে আবার উগ্র, তারপর আবার মৃদু। ভূগর্ভে গৈরিক উৎসারণ লীলা এইরূপে যুগের পর যুগ ঢেউ খেলাইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে।

উৎসারণ-লীলার এই উত্থান পতনের ব্যাখ্যানে, পণ্ডিতগণ পৃথিবীর সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণমূলক সিদ্ধান্তের প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, চাতুষ্কৌণিক সঙ্কোচনের ফলে পৃথিবী যখন চারিদিক হইতে কেন্দ্রাভিমুখে আকুঞ্চিত হইতে থাকে, তখনই পৃথিবীব্যাপী গৈরিক উৎসারণ ঘটিয়া থাকে। আবার পরবর্ত্তী যুগে চতুষ্কোণ যখন আবর্ত্তন বেগের ফলে ক্রমশঃ গোলকে পরিণত হয়, তখন পৃথিবী শান্তভাব ধারণ করে

যাহা হউক, এইরূপে বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণ পরম্পরায় উপরে পৃথিবীর সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণমূলক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ;

এ অধ্যায়ের আলোচনায় তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি, পৃথিবীর আকৃতি সাধারণতঃ গোল বলিয়া বিবেচিত হইলেও, সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, উহা সর্ব্বতোভাবে গোল নহে। পৃথিবীর আকৃতি-পরিবর্ত্তনশীল, এবং বিভিন্ন যুগের জল ও স্থল-সমাবেশ বুঝিতে হইলে, পৃথিবীর আকৃতির অল্প-বিস্তর পরিবর্ত্তন কল্পনা একান্ত প্রয়োজনীয়

শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত

স্বর্গীয় জয়গোপাল গোস্বামী

সাহিত্যের কুঞ্জে বাণীর তপোবনে আর একটী উজ্জ্বল দীপ কিছুদিন হইল নিবিয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যিক পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় কিছুদিন হইল ইহধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। যখন মনে হয় যে তিনি আর নাই, আর আসিবেন না, তখন আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না। তিনি গিয়াছেন সত্য, তথাপি তাঁহার ওজস্বিতা, তাঁহার দয়া, তাঁহার অধ্যবসায় এবং তাঁহার মুগ্ধকর স্বভাব চিরকাল আমাদের মনে জাগরূক থাকিবে। তাঁহার মধুর স্মৃতিই আজ আমাদের শান্তি।

গোস্বামী মহাশয়ের জীবনী লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। কারণ আমার মনে হয়, যিনি নাকি সমস্ত জীবন, এমন কি, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জীবনী লেখার ভার নিশ্চয়ই কোন যোগ্যতর ব্যক্তি গ্রহণ করিবেন, আমি কেবল এই প্রবন্ধে তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিব মাত্র। মনে হইতেছে, ইহা না করিলে আমার একটী কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে।

১২৩৬ বঙ্গাব্দে শান্তিপুরে অদ্বৈত-বংশে প্রাচীন সাহিত্যিক পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺রমানাথ গোস্বামী একজন সচ্চরিত্র, সত্যপ্রিয়, সুকণ্ঠ, সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পুত্রের শিক্ষাকল্পে কোন দিনই বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। সাধারণতঃ দেখা যায়, যাঁহারা সঙ্গীতে আত্মসমর্পণ করেন, সাংসারিক বিষয়ে তাঁহাদের প্রায়ই ঔদাসীন্য পরিলক্ষিত হয়। ২ বৎসর বয়সের সময় পণ্ডিত জয়গোপাল মাতৃহীন হন। তখন তদীয় পিতৃব্য ব্রজনাথ গোস্বামী ও তাঁহার পত্নী তাঁহাকে পুত্র নির্ব্বিশেষে অত্যন্ত যত্ন সহকারে পালন করিতে থাকেন। মাতৃহীন জয়গোপাল পিতৃস্বসার অতি আদরের ছিলেন।

আমরা অধিকাংশস্থলেই দেখিতে পাই যে, পিতৃস্বসাদিগের অত্যধিক আদর পিতৃমাতৃহীন বালকের ভবিষ্যতটা অন্ধকারাবৃত করিয়া তোলে। কিন্তু জয়গোপালের পিতৃস্বসা ও পিতৃব্যপত্নী অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন ; এবং তাঁহাদের উপদেশ ও অনুপ্রেরণাতেই তিনি এই প্রশ্নসঙ্কুল জগতে উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

নয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত জয়গোপাল গোস্বামী তদীয় পিতৃব্য ব্রজনাথ গোস্বামীর নিকটেই তৎকালোপযোগী বাঙ্গালা ভাষা অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ব্যাকরণ অধ্যয়নার্থ তিনি চতুষ্পাঠীতে প্রেরিত হন। এখানে তিনি তদানীন্তন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন আরম্ভ করেন অসাধারণ মেধা ও অধ্যবসায় বলে তিনি তিন বৎসরের মধ্যে সমস্ত মুগ্ধবোধ ও অমরকোষ পরিসমাপ্ত করেন। ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভের নিমিত্ত তিনি সমগ্র ভট্টিকাব্য পাঠ করেন। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি রঘু, কুমার, মাঘ, ভারবী প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থ সকল বিশেষরূপে অধ্যয়ন করেন। তখন শান্তিপুরে প্রায় ৫০।৬০টী টোল ছিল। দেশ দেশান্তর হইতে ছাত্রবৃন্দ এইস্থানে অধ্যয়নার্থ আগমন করিত। গোস্বামী মহাশয় এক দিবস এইস্থানে "মাণবক" শব্দের ণ স্থানে ন ব্যবহার কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হন এবং সেইদিন হইতে সিদ্ধান্তকৌমুদী পড়িতে আরম্ভ করেন। তাঁহার অলৌকিক স্মরণশক্তি ছিল। অমরকোষে শব্দানাটন দেখিয়া তিনি কতিপয় দিবসের মধ্যে "মেদিনী" ও "ব্যাড়ী" কণ্ঠস্থ করেন। অতঃপর গোস্বামী মহাশয় বৈষ্ণব গ্রন্থালোচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁহার সতীর্থ মদনগোপাল গোস্বামী ও তিনি এক সময়েই বৈষ্ণব গ্রন্থ অধ্যয়নে ব্রতী হন। মদনগোপাল গোস্বামী ভাগবৎ ও পণ্ডিত জয়গোপাল কবিকর্ণপুরের "আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ" অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন; এবং উহা শেষ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় অলঙ্কার-সম্বন্ধে "সাহিত্য-মুক্তাবলী" নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তক রচনা-সূত্রে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত পরিচিত হন। ইহার পরেই তাঁহার লেখনীপ্রসূত "সীতা-হরণ" এবং "বাসবদত্তা" প্রকাশিত হইল। সীতাহরণ অনেক বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং ইহা কয়েকবার Indian Civil Service পরীক্ষার পাঠ্য-পুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এই সময় অর্থাভাবপ্রযুক্ত গোস্বামী মহাশয়কে শান্তি-পুর স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করিতে হইল। ২২ বৎসর বয়সে তিনি এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াই কয়েক বৎসর ইংরাজীভাষার অনুশীলন করেন। "Rasselers", "Citizen of the World", "Bee" প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিয়া ইংরাজী ভাষা মোটামুটি বুঝিবার মত ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। দীর্ঘকাল সুখ্যাতির সহিত কাজ করিয়া তিনি ৬৫ বৎসর বয়সের সময় বিদ্যালয়ের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কার্য্য-কালীন গণিতশাস্ত্র অধ্যয়নার্থ বিশেষরূপে মনোনিবেশ করেন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে উহাতে পারদর্শিতা লাভ করিয়া "গণিত বিজ্ঞান" নামক একখানা বৃহদাকার পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকখানি ১৫।১৬ বৎসরের মধ্যে প্রায় নব্বই হাজার বিক্রয় হয়। গোস্বামী মহাশয় এই সময় স্বর্গীয় কবি মধুসূদন দত্তের সহিত বিশিষ্টরূপে পরিচিত হন। মধুসূদন একদিন কোন কার্য্যোপলক্ষে শান্তিপুর আসিয়া গোস্বামী মহাশয়ের সহিত কাব্যসম্বন্ধে আলাপ করেন। তখন মধুসূদনকে অনেক সংস্কৃতনবীশ ঘৃণা

করিতেন। কিন্তু গোস্বামী মহাশয়কে অমিত্রাক্ষর ছন্দের গুণগ্রহণ করিতে দেখিয়া মধুসূদন বড়ই আহ্লাদিত হন। উত্তরকালে তিনি, কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় ও দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকদিগের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহার সরল মধুর আলাপে এবং বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অধ্যবসায় সহকারে বাগ্‌দেবীর আরাধনা করাই তাঁহার জীবনের মহাব্রত ছিল। শান্তিপুরে নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে, কিন্তু গোস্বামী মহাশয় কোন আমোদ প্রমোদেই যোগ দিতেন না। সর্ব্বদাই গ্রন্থাধ্যয়ন ও গ্রন্থপ্রণয়ন কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার অদম্য জ্ঞান-পিপাসা দর্শনে অনেকেই বিস্মিত হইতেন। বৃদ্ধ বয়সে শারীরিক দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও তিনি সর্ব্বদাই "পঞ্চদশী গীতা" ও "শ্রীমদ্ভাগবৎ" লইয়া আলোচনা করিতেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বিখ্যাত বৈষ্ণব কবিদিগের ভাল ভাল পদ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। বাল্যকালে জয়-গোপাল ও সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এক সঙ্গে পড়িতেন। তাঁহাদের বাল্যপ্রণয় আমরণ বিদ্যমান ছিল। বিজয় গোস্বামী যে সময় ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার বৈষ্ণবধর্ম্মে আসক্ত হন, সেই সময় তিনি ও জয়গোপাল উভয়ে বসিয়া ভাগবতের দশম অধ্যায়ের আলোচনা করিতেন। তিনি শিক্ষিত সমাজের একজন বরণীয় মহাপুরুষ, সাহিত্য-রূপ কর্ম্মক্ষেত্রে অসাধারণ কর্ম্মবীর ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ ও কথকতার পুঁথি রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে সাহিত্য-মুক্তাবলী, সীতাহরণ, বাসবদত্তা, (গদ্য), আটকাবী, (satire) শৈবলিনী, রত্নযুগল, (নভেল) অনুক্রমণিকা, চারুকথা গোবিন্দদাসের "করচা" প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার প্রকাশিত গোবিন্দ-দাসের "করচা" পূজনীয় সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থে বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছে। তাঁহার চারুকথা কবিত্ব ও লালিত্যের নিমিত্ত বিখ্যাত। তিনি চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস লইয়া এক নূতন ছাঁচে ঢালিয়া কথকতার পুঁথি রচনা করিয়াছেন। এডুকেশন গেজেটে ভূদেব বাবু ও ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্যের সময় তিনি সোয়ান (Swan) পক্ষী নাম দিয়া অনেক গ্রন্থের সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক লুপ্তপ্রায় পুঁথি সাহিত্য জগতের কল্যাণের জন্য নিজহস্তে নকল করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। নরহরি কবির "অদ্বৈত-মঙ্গল" পাণ্ডুলিপি আকারে পণ্ডিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কবি বেণোয়ারী-লালের হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান ও বিনয় তাঁহার হৃদয়ে যুগপৎ বিরাজিত ছিল। একজন সামান্য ব্যক্তি তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে তিনি স্বয়ং তাঁহাকে হাতে ধরিয়া বসাইতেন। 'অভ্যাগত গুরুতুল্য' তাঁহার এই নীতি অনু-ষ্ঠান আমাদের চক্ষে জীবন্ত হইয়া উঠিয়া-ছিল। তিনি বিনয়ী ছিলেন সত্য, কিন্তু আত্ম-মর্য্যাদার সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হইলেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইতেন। একসময়ে কলি-কাতার কোন স্থানে অধ্যাপকরূপে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয় স্বয়ং পণ্ডিতদিগকে পরীক্ষা করিয়া বিদায় দিতেছিলেন। গোস্বামী জয়গোপাল বিদায় লইতে যাইলে, বাচস্পতি মহাশয় তাঁহাকে

মাঘ হইতে একটী শ্লোক লইয়া ব্যাখ্যা করিতে দেন। তিনি ঐ শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিয়া ভাগবৎ হইতে একটী শ্লোক বাচস্পতি মহাশয়কে ব্যাখ্যা করিতে দিলেন। এই বিষয় লইয়া তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে তর্ক হয়। বাদানুবাদ কালে বাচস্পতি মহাশয় জয়গোপালের গভীর পাণ্ডিত্য দর্শনে মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে অধিক বিদায় প্রদান করেন। তিনি অহঙ্কারী ছিলেন না এবং স্বীয় চরিত্র ও বিবিধ সদ্‌গুণাবলীর কীর্ত্তন শুনিতে ভালবাসিতেন না। আত্মপ্রশংসাসূচক কোনও প্রসঙ্গ শুনিলে লজ্জিত ও ক্ষুণ্ণ হইতেন। ইচ্ছা করিলে তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আদৃত হইতে পারিতেন, কিন্তু পার্থিব ঐশ্বর্য্যের ও অাকিঞ্চিৎকর খ্যাতি প্রতিপত্তির দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। তিনি এই সকলের অতীত আত্মতৃপ্তিরূপ পবিত্র রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন। শিরোরত্ন উপাধিতে ভূষিত হইয়াও উক্ত উপাধি কখনও নিজে ব্যবহার করেন নাই। এক কথায় বলিতে গেলে তিনি নিজকে জাহির করিতে চাহিতেন না। নবদ্বীপের পণ্ডিত অজিত ন্যায়রত্ন ও স্বর্গীয় ব্রজনাথ ন্যায়রত্ন এসমস্ত গুণগ্রামের জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন।

দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিতে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া কেহ সাহায্য চাহিলে তিনি প্রাণপণে তাহার সাহায্য করিতেন। দুঃখীর দুঃখ দূর করা, আর্ত্তের সেবা করা এবং ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান করা তাঁহার জীবনের মহাব্রত ছিল। শান্তিপুরে রাসের সময় বহুদূরদেশ হইতে লোকসমাগম হইয়া থাকে। এই সকল যাত্রীগণ প্রায়ই কদর্য্য আহার, অপরিমিত পরিশ্রম এবং জনসমাগমজনিত গ্রীষ্মের দরুণ পীড়িত হইয়া পড়ে। গোস্বামীমহাশয় যথাসাধ্য এই সকল পীড়িত লোকদিগকে স্বীয় বাটীতে আনাইয়া স্বয়ং তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতেন।

কবি হেমচন্দ্র বৃত্র সংহার রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইবার জন্য কোনদিন নিমন্ত্রণ করেন। হাইকোর্টের উকিল উমাকালী মুখোপাধ্যায় পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামীকে কবি সকাশে লইয়া যান। হেমচন্দ্র যখন

বসিয়া পাতাল পুরে ক্ষুব্ধ দেবগণ
নিস্তব্ধ বিমর্ষভাব চিন্তিত আকুল
নিবিড় ধূম্রঢ় ঘোর পুরীকে পাতাল
নিবিড় মেঘাড়ম্বরে যথা অমানিশি ॥

এই শ্লোকটি পড়িয়া শুনাইতেছিলেন, সেই সময় জয়গোপাল বলিলেন, ধূম্রঢ় শব্দ ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ। হেমচন্দ্র উত্তর করিলেন, আমি যখন ব্যবহার করিয়াছি, তখন ঐ শব্দই ভবিষ্যৎ পুরুষ ধূমল শব্দের পরিবর্ত্তে গ্রহণ করিবেন। হেমচন্দ্র সেই সময়ে আরও বলিলেন, মাইকেলের শ্যামাঙ্গিনী প্রভৃতি শব্দ অশুদ্ধ হইলেও বাঙ্গালার অনেক গ্রন্থকার এখন সেইসকল আদরের সহিত ব্যবহার করিতেছেন। গোস্বামী কবির আত্মশ্লাঘার প্রতিবাদ না করিয়া সে সময় নীরব ছিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে কল্পনা নামক মাসিক পত্রে গোস্বামী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র বেণোয়ারীলাল হেমচন্দ্রের কবিতাবলীর ধারাবাহিক কঠোর সমালোচনা করিতে আরম্ভ করেন। বেণোয়ারীলাল যাহাতে হেমচন্দ্রের সমালোচনায় বিরত হন, সেবিষয়ে চেষ্টা করিবার জন্য উকিল উমাকালী জয়গোপাল গোস্বামীকে অনুরোধ করেন। জয়গোপাল ব্যাকরণ-

দুষ্ট লেখার প্রশ্রয় দিতেন না। যে সময় নিবাতকবচ-বধ নামক মহাকাব্য বাহির হয়, এডুকেশন গেজেটের সোয়ান পক্ষী ধারাবাহিকরূপে ঐ গ্রন্থের তীব্র সমালোচনা করেন।

বহুদিন যাবৎই জয়গোপাল হাঁপানী রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। তিনি ভাল বাঁশী বাজাইতে জানিতেন, অনেকে মনে করেন, ইহা হইতেই তাঁহার হাঁপানী রোগের সৃষ্টি হয়। যে কারণেই ইহার সৃষ্টি হইয়া থাকুক,তিনি শেষজীবনে এই রোগে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন। সময়ে সময়ে ইহার যন্ত্রণায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন। অবশেষে ইহাই তাঁহাকে পৃথিবীর সমস্ত কষ্ট ও যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্ত করিয়া দিল। অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল সাহিত্যের সেবা করিয়া পণ্ডিত জয়গোপাল গত বৎসর ২২শে জ্যৈষ্ঠ ৮৬ বৎসর বয়সে পুত্র পৌত্রাদির মুখে হরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তিনি পাঁচটী পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে সুযোগ্য কবি বেণোয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয় সাহিত্য-সংসারে কবি ও সমালোচক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। জয়-গোপালের তৃতীয়পুত্র মোহনলাল ও পঞ্চম পুত্র বীণাবল্লভ আজ কথক সমাজের অগ্রণী। মোহনলাল সংস্কৃত ভাষায় একখানি বৃহৎ কাব্য রচনা করিয়াছেন। বীণাবল্লভ সুকণ্ঠ। তাঁহার কথকতায় লোক বিমুগ্ধ হয়। পুত্রগণের কথকতার সমস্ত পালাই পণ্ডিত জয়গোপাল রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল পালা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে আকারে ৫০০০ পাঁচ হাজার পৃষ্ঠারও অধিক হইবে।

শ্রীচারুচন্দ্র সেন।

ক-দর্শন

ক্রিটো।

সক্রেটিস ও ক্রিটোর কথোপকথন।

স্থান—এথেন্সের কারাগৃহ।

[সক্রেটিস তাঁহার সময়ে এথেন্স নগরে নীতি জ্ঞানের প্রাধান্য রক্ষা হেতু এবং প্রচলিত সংস্কার-সমূহের বিরুদ্ধে স্বীয় স্বাধীন মত প্রচারের নিমিত্ত কতকগুলি শক্তিসম্পন্ন লোকের কোপানলে পতিত হইয়া বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইলে, তাঁহার প্রতি বিষ পানের আদেশ হইয়াছিল। আদেশের পর মাসাবধি তিনি শৃঙ্খলিত অবস্থায় কারাগারে রক্ষিত হন। তাঁহার বন্ধুগণ এ সময়ে প্রত্যহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন এবং সক্রেটিস চিরাভ্যাসানুসারে তাঁহাদের সহিত নীতি শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। তাঁহার শিষ্য ও পার্শ্বচর মতামতি প্লেটো সক্রেটিসের বিচার ও মৃত্যু উপলক্ষে যে কয়খানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ক্রিটো তন্মধ্যে অন্যতম। ক্রিটো সক্রেটিসের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

সক্রেটিস সম্বন্ধে প্লেটোর যতগুলি গ্রন্থ আছে, সকল গুলিই প্রশ্নোত্তর প্রণালীতে লিখিত, ইহাই সক্রেটিসের এক মাত্র উপদেশ প্রণালী। নিম্নে "সক্রেটিসের বিচার ও মৃত্যু"

নামক পুস্তক (The Trial and Death of Socrates) হইতে 'ক্রিটোর' অবিকল অনুবাদ প্রদত্ত হইল।]

সক্রেটিস। বন্ধু ক্রিটো, এখনি যে! এখন কি খুব সকাল না?

ক্রিটো। হাঁ, সকালই বটে।

সক্রে। কত বেলা হবে?

ক্রিটো। এই সবে ভোর হ'ল।

সক্রে। জেল-দারগা যে আস্‌তে দিলে!

ক্রিটো। হাঁ সক্রেটিস, সে এখন জান্‌তে পেরেছে যে আমি এখানে প্রায়ই আসি। তা ছাড়া, আমি তার কিছু কাজও করেছি।

সক্রে। অনেক্ষণ এসেছো কি?

ক্রিটো। হাঁ বন্ধু, কিছুক্ষণ হ'ল!

সক্রে। তবে চুপ করে' ছিলে কেন? এসেই কেন আমাকে জাগাওনি?

ক্রিটো। সত্য বলছি সক্রেটিস, আমার ইচ্ছে হয়, আমারও যদি তোমার মত ঘুম বেশী হ'ত, আর তোমার মত নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম। তুমি এমন সুখে নিদ্রা যাচ্ছিলে যে দেখে আশ্চর্য্য বোধ করছি। ইচ্ছা করেই জাগাইনি, তোমার শান্তি নষ্ট করা আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। জীবন-ভোরই তোমাকে প্রফুল্ল দেখলাম, আর আজ এই বিপদে তোমার চিত্ত যেন আরও প্রসন্ন বোধ হচ্ছে।

সক্রে। বন্ধু ক্রিটো, বুড়ো হয়ে মর্‌তে নারাজ হ'লে কি ভাল দেখায়?

ক্রিটো। বন্ধু সক্রেটিস, তোমার বয়সে আরও অনেকের ত এই দশা ঘটেছে, কিন্তু তারা ত তাতে একটুও খুসী হয়নি!

সক্রে সত্য; 'কিন্তু বল দেখি, আজ তুমি এত সকালে কি মনে ক'রে?

ক্রিটো। সক্রেটিস, বড় দুঃসংবাদ! ওঃ না, দুঃসংবাদ তোমার কাছে নয়; আমার কাছে! তোমার সব বন্ধুর কাছে সংবাদটী অশুভ হলেও আমার কাছে সব চেয়ে বেশী কষ্টকর।

সক্রে। কি দুঃসংবাদ ক্রিটো, জাহাজ *

---

* এথেনীয়দিগের মধ্যে প্রবাদ ছিল যে, বহু প্রাচীন কালে থিসিউস্ নামে এক পরাক্রমশালী নরপতি একবার এথেন্স হইতে সাতটী যুবক ও সাতটী কুমারীকে ক্রীটে লইয়া গিয়া তাহাদের এবং নিজের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ ঘটনা উপলক্ষে এথেনীয়েরা দেশের মঙ্গল কামনায়, প্রতি বৎসর ডেলসে এপলোদেবের পূজা পাঠাইতেন। যে কাহাকে পূজা পাঠান হইত, অভিষেকান্তে তাহা ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত এথেন্সবাসীগণ যথাসাধ্য সহরের পবিত্রতা রক্ষা করিতেন এবং ঐ সময়ে কোন অপরাধীর প্রাণ দণ্ড হইত না।

প্লেটোর 'ফিডো' (Phaedo) গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:—

Echecrates. And what is this ship?

Phaedo. It is the ship, as the Athenians say, in which Theseus took the seven youths and the seven maidens to Crete, and saved them from death, and himself was saved. The Athenians made a vow then to Apollo, the story goes, to send a sacred mission to Delos every year, if they should be saved, and from that time to this, they have always sent it to the God every year. They have a law to keep the city pure as soon as the mission begins, and no to execute any sentence of death until the ship has returned from Delos; and sometimes when it is detained by contrary winds, that is a long while. The sacred mission begins when the priest of Apollo crowns the stern of the ship; and as I said, this happened to have been done on the day before the trial; that was why Socrates lay so long in prison between his trial and his death.—Phaedo.

কি 'ডেলস্' থেকে ফিরেছে ? জাহাজ এলেই যে আমার মৃত্যু।

ক্রিটো। এখনো ফেরে নি, তবে আজই ফিরবে বোধ হচ্ছে। যে লোক গুলো সুনিয়ামে (Sunium) জাহাজ পৌঁছে দিতে গিয়েছিল, তারা এসেছে; তাদেরই কাছে এই খবর পেয়েছি। তারা পরিষ্কার বল্লে যে, জাহাজ আজই আস্‌বে। তারপর, সক্রেটিস, কালই ত তোমার শেষ!

সক্রে। ভাল, ক্রিটো প্রার্থনা কর যেন শান্তিতে মরতে পারি। দেবতাদের ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক! কিন্তু বন্ধু, আমার মনে হচ্ছে, জাহাজ আজ আসবে না, কাল আসবে।

ক্রিটো। কেন, কিসে বুঝ্‌লে ?

সক্রে। তাই বলছি। আমি মরবো পৌঁছুছিলে ত ?

ক্রিটো। সেই রকমই ত প্রকাশ ?

সক্রে। অল্পক্ষণ হ'ল স্বপ্ন দেখে' এই বিশ্বাস হয়েছে। ভাগ্য যে, তুমি আমাকে ডেকে' জাগাও নি।

ক্রিটো। কি স্বপ্ন, সক্রেটিস ?

সক্রে। শুভ্রাভরণা এক সুন্দরী যেন আমাকে ডেকে' বল্‌লেন, "আজ থেকে তৃতীয় দিনে তোমার স্বর্গলাভ হ'বে"

ক্রিটো। সক্রেটিস, কি আশ্চর্য্য স্বপ্ন!

সক্রে। কিন্তু ক্রিটো, স্বপ্নের মানে বেশ স্পষ্ট। অন্ততঃ, আমার কাছে।

ক্রিটো। খুব স্পষ্টই বটে; কিন্তু প্রিয় বন্ধু সক্রেটিস, আমার শেষ অনুরোধ রাখ'। প্রাণ বাঁচাও। তোমার মৃত্যু বড়ই অমঙ্গল-জনক, কেবল যে আমি তোমার মত একজন দুর্লভ বন্ধুকে হারাবো, তা নয়; অনেকে, যারা তোমাকে এখনও ভাল চিন্‌তে পারে নি, আমাকেও ভাল রকম জানে না, তারা মনে ক'রবে, আমি যদি টাকা খরচ ক'রতে চাইতাম, তা হ'লে হয় ত তোমাকে বাঁচা'তে পারতাম; আমি যেন ইচ্ছা করেই সে চেষ্টা করিনি। যে, বন্ধুর জীবনের চেয়ে টাকার বেশী মায়া করে, তার চেয়ে অধম আর কেহ নেই। জগতে কেহই বিশ্বাস ক'রবে না যে, আমরা তোমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তুমি আমাদের কথা শুনলে না।

সক্রে। বন্ধু ক্রিটো, জগতের কথায় আমরা এত ভয় করবো কেন? জ্ঞানী লোক, যাঁহাদের কথার মূল্য আছে, তাঁরা ত, আমার যে যা ক'রেছি, ঠিক ঠিক বিশ্বাস করবেন!

ক্রিটো। তা বটে, কিন্তু দেখ সক্রেটিস, জগতের কথাও দরকার। এই তোমার যে অবস্থা হ'ল, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণ লোকে, লোকের বড় কম অনিষ্ট করে না; বরং যখন কেহ মিথ্যা অভিযোগে দণ্ড পায়, তখন অনিষ্টের পরিমাণ সব চেয়ে বেশীই বল্‌তে হবে।

সক্রে। বন্ধু ক্রিটো, আমি বলি, সাধারণ লোকে যদি লোকের সব চেয়ে বেশী অনিষ্টই করতে পারতো, তা হলে তারা সব চেয়ে বেশী উপকারও করতে সক্ষম হ'ত। মোট কথা, তারা কারো ভাল ও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না। তাদের এমন কাজে লোকের জ্ঞান বা মূর্খতা, কিছুই বাড়ে না। তারা যার যা খুসী, তাই করে।

ক্রিটো। তাই যেন হ'ল, কিন্তু সক্রেটিস, তুমি আমার এবং অন্যান্য বন্ধুদের জন্য ভাবছো যে, যদি তুমি কারাগার থেকে পালাও, তা হ'লে গোয়েন্দারা বলবে, আমরাই তোমাকে চুরি করেছি। তারা আমাদের বিপদে ফেলবে; আমাদের অনেক অর্থদণ্ড হবে, এমন কি, আমাদের বিষয়-সম্পত্তি

বাজেয়াপ্ত হবে, হয়ত, আরও গুরুদণ্ড হ'তে পারে। এমন আশঙ্কা থাকে ত, সে আশঙ্কা দূর কর। আমরা তোমার রক্ষার জন্য এসব কেন, এর চেয়ে গুরুতর দণ্ড নিতে বাধ্য। তাই বলি, আমার অনুরোধ, কথা রাখ'।

সক্রে। সত্যই আমি এই সব কথা ভাবছি, তা ছাড়া অন্য কারণও আছে

ক্রিটো। ও সম্বন্ধে তা হ'লে কোন ভয় নেই। এমন অনেক লোক আছে, যারা সামান্য অর্থবলে তোমাকে কারামুক্ত করে' নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবে। আর, তুমি ত জান যে গোয়েন্দারা অল্প অর্থেই বশীভূত হয়, তাদের জন্য বেশী টাকা দরকার হবে না আমার যা কিছু আছে, সব খরচ করবো, তা হলেই যথেষ্ট। আর, যদি কেবল আমার অর্থব্যয়ে নারাজ হও, তবে এথেন্সে অনেক বিদেশীও আছেন, যাঁরা তোমার জন্য খরচ ক'রতে কুণ্ঠিত নন্। তাঁদের মধ্যে সিম্মিয়া নামে থিবিসের একজন তোমার উদ্ধারের জন্য যথার্থই প্রচুর অর্থ এনেছেন। সিবিস্ প্রভৃতি আরও অনেকে প্রস্তুত। তাই, আবারও বলি, সক্রেটিস, খরচের ভয়ে আত্মরক্ষায় অযত্ন করো না। বিচারালয়ে যেমন বলেছিলে, নির্ব্বাসিত হ'য়ে বেঁচে থাকায় ফল নেই, আর যেন সে কথা তুলো না। অনেক জায়গা আছে, যেখানে লোকে তোমায় পেলে খুসি হবে। থেসালীতে যাও ত সেখানে আমার বন্ধুগণ তোমাকে পেয়ে উপকৃত হবেন, সাধারণ লোকে তোমায় যাতে বিরক্ত না করে, তারা তার উপায় করবেন।

তা ছাড়া, বন্ধু সক্রেটিস, আমার মনে হয়, আত্মরক্ষার উপায় থেকেও যদি আত্মরক্ষা না করো, তা হ'লে সেটা অন্যায় হবে। তুমি একমাত্র তোমার শত্রুগণেরই লক্ষ্য হয়েছো; ঠিক তাদেরই লক্ষ্য, যারা তোমার প্রাণনাশের চেষ্টায় ছিল। তুমি তোমার সন্তানদিগকে ছেড়ে যাচ্ছ, অন্ততঃ তুমি যে তাদের অদৃষ্টের উপর ফেলে দিয়ে চলেছো, তাতে সন্দেহ নেই। ইচ্ছা থাকলে তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষও করতে পারতে। তোমার অভাবে তাদের দশা অনাথ বালকের মত হবে। যদি মানুষই না ক'রবে তবে তুমি তাদের জন্মদাতা হয়েছিলে কেন? আর দেখ, তুমি যে সারা জীবন ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে আসছো, তোমার সে ধর্ম্ম এখন কোথায়? বীর পুরুষের মত কর্ত্তব্যপালন না করে' আজ তুমি কি পাশ কাটিয়ে স'রে পড়তে চাচ্ছো না? লোকে ব'লবে, এ পর্য্যন্ত যা কিছু ঘটেছে, আপনা হ'তে বিচারালয়ে উপস্থিত হওয়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত, এ সমস্তই কাপুরুষের লক্ষণ; আর, আমরা জঘন্য কাপুরুষ বলেই তোমার উদ্ধারের জন্য বিপদে পা দিলাম না, অর্থাৎ ক্ষমতা থাকতেও আমরা তোমাকে বাঁচালাম না, আর সুযোগ পেয়েও তুমি আত্মরক্ষা ক'রলে না। এ সকল ঘটনা শুধু অনিষ্টজনক নয়, তোমার ও আমাদের পক্ষে অসম্মানজনক। অতএব, সক্রেটিস, সাবধান হও, বিবেচনা করে' দেখ। বিবেচনারই বা আর সময় কৈ এখনি মনঃস্থির করে' ফেল; যা কিছু করার আজ রাত্রেই ক'রতে হবে। পলায়নই একমাত্র ব্যবস্থা। দেরী করেছো কি মৃত্যু নিশ্চয়। বন্ধু সক্রেটিস, অনুরোধ রাখ'।

সক্রে। প্রিয় বন্ধু ক্রিটো, আমাকে

রক্ষার জন্য তোমার চেষ্টা যদি ন্যায়সঙ্গত হয়, তবেই আমি তোমার পরামর্শ মূল্যবান জ্ঞান করবো; আর যদি অন্যায় হয়, তবে তার চেয়ে বেশি বিপজ্জনক আর কি আছে? এখন স্থির করতে হবে, তোমার কথামত কাজ করা উচিত, কি উচিত নয়। আমার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে বটে, কিন্তু আমি আগেও যেমন ছিলাম, এখনও তেমনি আছি। আমি একমাত্র বিবেকের আদেশই জানি, সেই, বিবেকের পরামর্শ ছাড়া আর কোন পরামর্শ আমি শুনবো না। বিপন্ন বলে যে আমি পূর্ব্বেকার সংস্কারগুলি ত্যাগ করেছি তা নয়। কর্ত্তব্য-জ্ঞান এখনও ঠিক তেমনি আছে। তার চেয়ে যদি বেশি ভাল পরামর্শ না পাই, তা হলে আমি তোমার প্রস্তাবে রাজী হ'ব না। তুমি কেন, শিশুদের যেমন ভূতের ভয় দেখায়, সহস্রলোকে যদি আমাকে সেই রকম করে' ভয় দেয়, নূতন করে' অর্থদণ্ড করে, কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড দেয়, তা হ'লেও কর্ত্তব্য হারাবো না।

এখন, তুমি যে, সব লোকের কথা শুনতে ব'লছিলে, তাই কি আগে ভেবে দেখবো? না, একদলের কথা না শুনে অপর দলের কথা শোনা উচিত, তাই—ভাববো? দণ্ডের পূর্ব্বে আমি এই সব কথা চিন্তা করিতাম, তখন আমার মুখে এই সব কথা সাজতো, আর এখন কি আমি প্রলাপ বকছি! শুধু তর্কই করছি এখন কি, এ কথায় কোন লাভ নেই? বন্ধু ক্রিটো, আমার পূর্ব্বেকার সংস্কারগুলি কতদূর সত্য, তোমার সঙ্গে আজ তারই বিচার ক'রতে চাই, দেখতে চাই যে, আমার বর্ত্তমান অবস্থায় সেই সকল সংস্কার কোন অংশে বিকৃত হ'য়েছে কি না, তখনকার সিদ্ধান্ত এখন ত্যাগ করা উচিত, কি গ্রহণ করা উচিত। আমাদের মধ্যে যাঁরা বাস্তবিক তলিয়ে ভাবতেন, আমার মনে হয় এখন আমি যা ব'লুলাম, অর্থাৎ সকলের মত না নিয়ে, কেবল যাঁদের মতের মূল্য আছে তাঁদের মতই নেওয়া উচিত, তাঁরা সর্ব্বদা এই কথাই ব'লতেন। বল দেখি ক্রিটো, তাঁরা ঠিক ব'লতেন বলে মনে হয় কি না। তুমিই বল, কেন না, তুমি ত আর কাল ম'রতে যাচ্ছ না। মৃত্যুভয়ে তোমার বিচার-বুদ্ধি লোপ পায়নি, ভেবে দেখ, তুমি কি এমন বলা সঙ্গত মনে কর না যে, মানুষের সব মত না মেনে কোন কোন মত মানা, অথবা সব মানুষেরই মত না মেনে, কোন কোন মানুষের মানা উচিত?

ক্রিটো। ঠিক বটে।

সক্রে। আর, ভাল মতই মানা দরকার, অসার মত নয়?

ক্রিটো। সত্য।

সক্রে। কি জ্ঞানীলোকের মতই ভাল, মূর্খের মত অসার, কেমন কিনা?

ক্রিটো। নিশ্চয়ই।

সক্রে। এ সম্বন্ধে আমরা কি ব'লতাম? ছাত্র কি সকল লোকের প্রশংসা, আর নিন্দা শুনে বেড়ায় না, যে তার শিক্ষক, কেবল তারই কথা শোনে?

ক্রিটো। একজনের কথাই শুনে থাকে।

সক্রে। তা হ'লে, তার সেই এক-জনেরই নিন্দাকে ভয়, প্রশংসাকে আদর করা উচিত, অনেকের নয়?

ক্রিটো। নিশ্চয়ই।

সক্রে। তা হ'লে, যে তার গুরু বা চিকিৎসক, যে তার সম্বন্ধে সব বুঝে, সে কেবল তারই কথামত চলাফেরা, খাওয়াপরা করতে বাধ্য, অন্য লোকের কথা সে শুনবে না?

ক্রিটো। ঠিক।

সক্রে। ভাল, যদি সে এই একজনের অবাধ্য হয়, তার উপদেশ অগ্রাহ্য করে' যারা তার বিষয় কিছুই জানে না তাদের কথা শুনে, তা হলে, তার কি কষ্ট পেতে হয় না?

ক্রিটো। নিশ্চয়ই হয়।

সক্রে। আচ্ছা কষ্টটা কি রকম? কোথায়, তার কোন্ অংশে?

ক্রিটো। নিশ্চয় শরীরের কোন অংশে। শরীর অপটু হয়।

সক্রে। ঠিক বলেছো; আর ক্রিটো, এই নিয়ম কি সব বিষয়ে খাটে না? এই যে 'ন্যায় অন্যায়', 'ভদ্র অভদ্র', ভালমন্দ', আমরা এখন যে সকল কথা ভাবছি, সে সকলে কি আমরা অনেকের মত অনুসরণ করবো, অনেকের মতকে ভয় করবো? না, যে এসকল বিষয় ভাল বুঝে (এমন লোক যদি পাওয়া যায়) সেই একজনের মত শুনবো, ভয় বা লজ্জা ক'রবো? যদি সেই একজনের কথামত কাজ না করি, তা হ'লে দেহের যে অংশ সৎকাজে করে, অসৎকাজে অপটু হয়, সেই অংশটাই কি অকর্ম্মণ্য হবে না?

ক্রিটো। হাঁ সক্রেটিস, আমারও সেই মত।

সক্রে। তবে অজ্ঞলোকের কথা শুনে শরীরের যে অংশ স্বাস্থ্যদ্বারা সবল হয়, আর পীড়ায় অকর্ম্মণ্য হয়, আমরা যদি সেই অংশেরই ক্ষতি করি, তা হ'লে শরীরই নষ্ট হবে, কেমন কি না?

ক্রিটো। হাঁ।

সক্রে। খোঁড়া কি অসুস্থ হ'য়ে বেঁচে থাকায় সুখ আছে কি?

ক্রিটো। না, নিশ্চয়ই না।

সক্রে। তা হ'লে, শরীরের যে অংশ মন্দ কাজে নষ্ট হয়, আর ভাল কাজে ভাল হয়, সে অংশকে অপটু করে' বেঁচে থাকায় সুখ নেই, অর্থাৎ দেহের যে অংশের সঙ্গে ভাল মন্দের এত সম্বন্ধ, সে অংশকে দেহের চেয়ে কম দরকার মনে করা উচিত নয়?

ক্রিটো। না, নিশ্চয় না।

সক্রে। বেশি দরকার?

ক্রিটো। অবশ্য।

সক্রে। তা হলে, বন্ধু, লোকে কি ব'লবে, সে কথা আর আমার ভাবার দরকার নেই, কেবল যে ন্যায় অন্যায় বুঝতে পারে, স্বয়ং সত্য আমাদের সম্বন্ধে যা বলে, তারই কথা, এবং সেই কথাই ভাবা উচিত। তাহলে দেখ, তুমি ন্যায় অন্যায় বা ভালমন্দ সম্বন্ধে সবলোকের কথা শুনতে গোড়ায়ই ভুল করেছো। তবে তুমি হয়ত ব'লবে, অনেক লোকে মিলে আমাদের যে মেরে ফেলতে পারে, তার কি?

ক্রিটো। হাঁ, তাত দেখতেই পাচ্ছি, সক্রেটিস্

সক্রে। সত্য, কিন্তু প্রিয় বন্ধু, আমার মনে হচ্ছে এইমাত্র আমরা যে বিষয়ের মীমাংসা করলুম, পূর্ব্বেও অনেকবার তাই করেছি। ভেবে দেখি, এখনও আমাদের সেই বিশ্বাস আছে কিনা। আমরা বলতাম; শুধু বেঁচে থাকার চেয়ে ভালভাবে বেঁচে থাকা দরকার; কেমন?

ক্রিটো। হাঁ, ঠিক বটে।

সক্রে। আর ভাল ভাবে বেঁচে থাকা মানেই সম্মানিত ও সাধুজীবন লাভ করা। একথা কি আমরা মানি নে?

ক্রিটো। মানি বৈ কি?

সক্রে। তা হলে এইক'টী মন্তব্য হতে বিচার করা যাক, এথেনীয়দিগের বিনা-সুমতিতে আমার কারাগার হতে পলানো উচিত, কি অনুচিত? যদি উচিত হয়, তাহলেই পলাতে চেষ্টা করবো, যদি না হয়, তবে যেমন আছি, তেমনি থাক্‌বো। আমার মনে হচ্ছে, টাকাকড়ি, সম্মানলাভ, সন্তানপালন, এসকল বিষয়ে ক্রিটো, তুমি যা বল্‌লে, সবই সেই জনমণ্ডলীর কথার প্রতিধ্বনি। তাঁদের কথা, যাঁরা অক্লেশে লোকের প্রাণদণ্ড করিতে পারেন, আবার সম্ভব হলে প্রাণ দিতেও পারেন। কিন্তু,আমার কাছে বিবেকই পথপ্রদর্শক। বিবেকেই বলে দিচ্ছে, এইমাত্র আমি যে প্রশ্নটী করলাম, তাহাই একমাত্র চিন্তার বিষয়। প্রশ্নটী এই, আমার পলায়নের জন্য যেসকল লোক সাহায্য করবে, তাদের আদর্শ করা বা ধন্য-বাদ দেওয়া, আর নিজে এই কাজে যোগ দেওয়া কি আমাদের কাছে ন্যায়সঙ্গত, না ন্যায়বিরুদ্ধ? যদি দেখতে পাই, কাজগুলি গর্হিত, তাহলে মৃত্যুর কথা একেবারেই মনে আনবো না, এখানে বসে' থাকলে তার ফল কি, তাও ভাববো না; ভাববো কেবল, যেন অন্যায় কাজ না করি; কেমন কি না?

ক্রিটো। বোধ হয় তুমি ঠিক বলছো, সক্রেটিস। কিন্তু আমরা এখন কি করবো বল?

সক্রে। তবে এস বন্ধু, দুজনে তাই ভেবে দেখা যাক। আমি যদি কিছু ভুল বলি, তুমি ধরে' দিও। আর যদি ভুল ধরতে না পার, তাহলে বন্ধু, এথেনীয়দিগের বিনানু-মতিতে আমাকে বারে বারে পলাতে বলো না। তোমার কথামত কাজ করতে রাজী আছি, কিন্তু আমি ভুল বুঝেছি, যতক্ষণ না তুমি তা দেখাতে পারছো, ততক্ষণ কোন যুক্তি শুনবো না। এখন আমার প্রশ্নগুলির ঠিক ঠিক উত্তর দিতে চেষ্টা কর।

। বল।

সক্রে। ইচ্ছা করে, কোন অন্যায় কাজ করা কি একেবারেই উচিত নয়, না কোন কোন বিষয়ে আমরা অন্যায় করবো, কোন কোন বিষয়ে করবো না? আমরা আগে যেমন বল্‌তাম, অন্যায় কাজ করা ভালও না, সম্মানজনকও না, এ ধারণা কি আমরা এই কয় দিনে ভুলে গিয়েছি? আমরা বৃদ্ধ ছিলাম, ক্রিটো, আমরা গম্ভীরভাবে যখন পরস্পর কথোপকথন করতাম, তখন কি বুঝতে পারিনি যে, আমরা শিশুর চেয়ে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নই? লোকে বলুক আর না বলুক, আমরা কি দৃঢ়তার সহিত বলি নি যে ইহাই সত্য? সৎকাজ করে' মৃত্যু বা মৃত্যুর চেয়ে, লঘু কিম্বা গুরু দণ্ড পাই বা না পাই, যে অন্যায় কাজ করে, তার পক্ষে কাজটী অম-ঙ্গলকর ও লজ্জাজনক কি না?

ক্রিটো। অবশ্যই।

সক্রে। তবে কখনই অন্যায় করা উচিত নয়?

ক্রিটো। নিশ্চয়ই না।

সক্রে। অন্যায় কাজই যখন করা উচিত নয়, তখন অন্যায়কাজ করে' অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়াও সম্ভব নয়?

ক্রিটো। কিছুতে নয়।

সক্রে। আচ্ছা, তাহলে ক্রিটো, আমাদের কি কারও অনিষ্ট করা উচিত?

ক্রিটো। না সক্রেটিস, তা কখনই মনে করিনে।

সক্রে। আর সাধারণ লোকে যেমন বিশ্বাস করে, মন্দ করে' মন্দের প্রতিশোধ নেওয়া উচিত; কি ভাল কাজ করে?

ক্রিটো। নিশ্চয়ই মন্দকাজ করে নয়।

সক্রে। যেহেতু মন্দকরা, আর অন্যায় করার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই; আছে কি?

ক্রিটো। না।

সক্রে। তাহলে, লোকে আমাদের যতই ক্ষতি করুক, অন্যায় কি অনিষ্ট করে' তার কাজের প্রতিশোধ নেওয়া উচিত নয়। আর, বন্ধু ক্রিটো, তুমি যদি এ কথাটী বিশ্বাস কর, তা হলে তুমি নিজে যা বুঝিবে, তার বেশি আর আমাকে কিছু বলো না। সাবধান করার কারণ এই যে, জগতের অতি অল্পলোককেই এই মত গ্রহণ করতে দেখি। যারা একথা বিশ্বাস করে, আর যারা করে না, তাদের মধ্যে কোন যুক্তিও চলে না; তারা উভয়ে উভয়ের বিশ্বাসের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে। তুমি ভাল করে ভেবে দেখ, আমার সঙ্গে একমত হতে পার কিনা। অন্যায় করা, অন্যায় করে' অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়া, কেহ অনিষ্ট করলে তার বদলে অনিষ্ট করা, এগুলি যে খারাপ কাজ, আমরা কি এই সত্যটী স্বীকার করেই তর্কে প্রবৃত্ত হব, না তোমার সঙ্গে আমার মতের কোথায়ও অমিল হয়েছে? এই কথাগুলি আমি অনেক দিন ধরে বিশ্বাস করে এসেছি, এখনও সেই বিশ্বাস আছে। তুমি যদি অন্যরকম ভাব ত আমাকে বুঝিয়ে বল, আর যদি পূর্ব্ব বিশ্বাসই থাকে ত আমি যা বলবো মন দিয়ে শোনো।

ক্রিটো। পূর্ব্বের বিশ্বাসই আছে সক্রেটিস, আর তোমার সঙ্গে মতেরও মিল হচ্ছে; তুমি বলে যাও।

সক্রে। তাহলে আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, লোকে সত্য সত্যই যখন কোন সর্ত্তে আবদ্ধ হয়, তখন সে সর্ত্ত তার পালন করা উচিত, না সর্ত্ত হ'তে পলায়ন করা উচিত?

ক্রিটো। সর্ত্ত পালন করাই উচিত।

সক্রে। তবে দেখ, যদি আমি বিচারকের বিনা আদেশে পলাই, তা হলে যাদের কোন অনিষ্ট করা উচিত নয়, তাদেরই কি অনিষ্ট করা হবে না? যথার্থ সর্ত্ত মত কাজ করা উচিত কি না?

ক্রিটো। সক্রেটিস, তোমার প্রশ্নটী ভাল বুঝতে পারিনি বলে' উত্তর করতে পারছিনে।

সক্রে। আচ্ছা, কথাটা এইরকম ভাবে নেও। ধর, আমার পলায়নের জন্য যখন সব ঠিক হয়ে গেছে, আমি পলাতে যাচ্ছি, ঠিক এমনি সময় সমস্ত সাধারণ-তন্ত্র-রাজ্য, আর স্বয়ং ধর্ম্ম আমার সামনে এসে দাঁড়ায় ও বলে "সক্রেটিস, তোমার মতলব কি বলতো? পলাতে চেষ্টা করে' তুমি কি আইন ও সমস্ত নগরের যে অংশটুকু তোমাতে আছে, তুমি তাই নষ্ট করতে যাচ্ছ না? তুমি কি মনে কর, দেশে আইনের জোর না থাকলে আর লোকে আইনের বিচার অমান্য করলে দেশরক্ষা সম্ভব?" এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবো ক্রিটো? আইনের বিচার যে অকাট্য ও চূড়ান্ত, সে সম্বন্ধে যে তাঁদের বলবার অনেক আছে। কোন বক্তা যদি আইনের বা ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য বক্তৃতা দেন,

তা হলে ত কথাই নেই। তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে কি আমি বলবো "রাজ্য হতে আমার অনিষ্ট হয়েছে, রাজ্য আমার অবিচার করেছে, তাই আমি আইন লঙ্ঘন করতে যাচ্ছি?" এই কথাই বলবো কি?

ক্রিটো। না সক্রেটিস, নিশ্চয়ই না।

সক্রে। আর ধর, আইন যদি তার উত্তর দেয়,"তাই কি আমাদের করার ছিল? না, ধর্ম্মাধিকরণ যা ব্যবস্থা করেন, তুমি তাহাতে বশ্যতা স্বীকার করবে?" একথায় যদি আমি আশ্চর্য্য বোধ করি, তাহলে হয়ত আইন বল্‌বে, "সক্রেটিস, চুপ করে রইলে যে, উত্তর দেও, তুমি নিজেই যে প্রশ্ন করে, প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাক। তোমার নগর আর আমরা, তোমার কি করেছি যে, তুমি আমাদের ধ্বংস করতে চাও? আমরাই কি তোমার প্রথম পিতা মাতা ছিলাম না? আমাদের ভিতর থেকেই তোমার পিতা, তোমার মাতাকে গ্রহণ করেছিলেন, আর তাই তুমি জন্মলাভ করেছো। বিবাহের আইনই ত আমরা। তুমি আমাদের কি দোষ পেয়েছো? উত্তরে আমার বলতে হবে,"কোন দোষই পাইনি।" আর যদি বলে, "আমরাই শিশুদের লালন পালনের ব্যবস্থা করেছি। তুমি নিজে যে শিক্ষা পেয়েছো, তার বিরুদ্ধে তোমার কি কিছু বলবার আছে? তোমাকে সঙ্গীত কি ব্যায়াম শিক্ষা দিতে তোমার পিতাকে আদেশ করে,আমরা ভাল করি নি?" উত্তরে "আমাকে বলতেই হবে"হাঁ, ঠিকই করেছিলে আচ্ছা তাই যদি হয়, তাহলে তুমি যখন আমাদের কৃপায় জগতের মুখ দেখেছো, আমাদের কাছেই শিক্ষা পেয়েছো, তখন প্রথমতঃ তুমি কেমন করে অস্বীকার করবে, যে তুমি তোমার পিতৃপুরুষের মতই আমাদের সন্তান, অথবা আমাদেরই ক্রীতদাস? তাহলে তোমার দাবী কি আমাদের দাবীর সমান হতে পারে? আমরা যদি তোমার সম্বন্ধে কিছু করতে চাই, তাহলে তুমি কি তার প্রতিশোধ নেবে? তোমার উপর তোমার পিতার যে সকল দাবী দাওয়া ছিল, আর তুমি ভৃত্য হলে তোমার প্রভুর যে দাবী-দাওয়া থাকতো, তোমার ত সে দাবীদাওয়া নেই। তারা তোমার উপর কোন অন্যায় করলে তোমার প্রতিশোধ নেওয়া চলতো না, তারা নিন্দা করলে তোমার প্রতিবাদ করার যো ছিলনা, তোমাকে মারলেও তুমি তাদের মারতে পারতে না, কোন রকমে কোন অনিষ্ট করলে তুমি তাদের অনিষ্ট করতে পারতে না। এখন তুমি কি মনে কর যে, তুমি তোমার দেশ ও দেশের বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে সক্ষম? ভাল মনে করে' যদি আমরা তোমার প্রাণ বিনাশেরই ব্যবস্থা করি, তুমি কি পাল্‌টে আমাদিগকে, দেশের আইনকে,আর দেশকে ধ্বংস করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে? চেষ্টা করতে গিয়ে তুমিই কি বল্‌বে, যার ধর্ম্মে এত বিশ্বাস, সেই তুমি কি বলবে যে, তুমি ঠিকই করছো? তুমি কি এতই অন্ধ যে, দেখতে পাচ্ছ না, তোমার দেশ তোমার চেয়ে কত মূল্যবান, কত মহান্, কত পবিত্র; বিচক্ষণগণ, এমন কি দেবতারা, যাকে তোমার পিতা মাতা, পিতৃপুরুষ, সকলের চেয়ে বেশি সম্মান করে' এসেছেন? আর দেশকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখা, দেশের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করা, দেশ যখন তোমার প্রতি কুপিত হন, পিতা কুপিত হলে সন্তান যেমন নতভাবে তাঁর সম্মুখে অগ্রসর হয়, সেইরকম

ভাবে অগ্রসর হওয়া কি উচিত নয়? দেশ যা করতে বলবে, তুমি হয় তা পালন করবে, না হয়, দেশের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হবে। তোমার প্রতি যদি বেত্রাঘাত বা কারাদণ্ডের আদেশ হয়, তাও সইতে হবে; দেশের জন্য যুদ্ধে গিয়ে মরতে হয়, তাও হবে; কেননা, সেইই তোমার কর্ত্তব্য। তুমি হেরে, আসবে না, হঠে আসবে না, স্থান ভ্রষ্ট হবে না। যুদ্ধে, বিচারালয়ে যেখানেই হ'ক, তোমার দেশ আর তোমার নগর, তোমাকে যা করতে বলবে, তুমি তাই করবে। হয় তাই কর, না হয় দেশকে বুঝিয়ে দেও যে, দেশের লোকে অন্যায় আদেশ করেছে। দেশ বা নগর তোমার পিতামাতা, তাদের আদেশ অমান্য করলে পিতামাতার প্রতি বল প্রয়োগ করা হবে, তাহলে ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করা হবে।" এসকল কথার কি উত্তর দেবো, ক্রিটো? আমরা কি বলতে বাধ্য নই যে, আইনের কথাই সত্য?

ক্রিটো। আমার বোধ হচ্ছে, আইন সত্য কথাই বলে।

সক্রে। তারা হয়ত ব'লবে, "তা হ'লে ভেবে দেখ, সক্রেটিস, তুমি পলাতে গিয়ে আমাদের অনিষ্ট করেছো, একথা বলা যায় কি না? আমরাই তোমাকে সংসারের মুখ দেখিয়েছি, আমরাই পালন করেছি, আমরাই শিক্ষা দিয়েছি, আমরাই তোমাকে ও প্রত্যেক নগরবাসীকে সমস্ত ভাল জিনিষের অংশ দিয়েছি। তবু আমরা বলে' থাকি, এথেন্সের কোন লোক যদি এই সকল উপকার পেয়েও আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তা হলে ধন সম্পত্তি নিয়ে যেখানে খুসী চলে যেতে পারেন। আইন কানুন ও শাসন ব্যাপার বুঝতে শিখ্‌লেই তাকে আমরা এই অনুমতি দেই। সে যদি আমাদের বা নগরের উপর যথার্থই অসন্তুষ্ট হয়, তা হ'লে কেহই তাকে যেতে বাধা দেবে না; তার যেখানে খুসী, হয় এথেন্সের কোন উপনিবেশে, না হয়, অন্য কোন বিদেশে তার জিনিষ পত্র নিয়ে যেতে মানা করবে না। কিন্তু আমাদের কথা এই, তোমাদের মধ্যে যে কেহ আমাদের বিচার আচার ও দণ্ড বিধান দেখে শুনে, এখানে বাস্‌ করেছেন, তিনি নিশ্চয়ই এই সর্ত্তে আবদ্ধ হয়েছেন যে, আমরা যা বলবো, তাঁকে তাই করতে হবে। আমরা আরও বলি যে, যে কেহ আমাদের অমান্য করেন, তিনি তিন রকমে অন্যায় করেন; ১মতঃ, তাঁহার পিতৃ স্থানীয় আমাদের অমান্য করেন; ২য়তঃ, পালনকর্ত্তা আমাদের অমান্য করেন, ৩য়তঃ একবার বশ্যতা স্বীকার করে' আবার অবাধ্য হন। এতগুলি অন্যায় করলেও আদেশ পালন করতে হবে বলে' আমরা কোন কড়া কথা বলিনে। আমরা মাত্র দুটী প্রস্তাব করে' তার একটীই গ্রহণ করতে বলি। প্রস্তাব দুটী এই, হয় আমাদের অধীনতা স্বীকার কর, না হয় দেখিয়ে দেও যে অন্যায় করেছি: সক্রেটিস, তোমার প্রতিও এইরূপ ব্যবহার করা হয়েছে, আর তুমি জানতে যে, আমাদের প্রস্তাবে সম্মত না হ'লে তোমার প্রতি কি কি অভিযোগ আসতে পারে, আর অভিযোগ গুলি অপর কোন এথেনীয় অপেক্ষা তোমার প্রতি বেশী খাটে।" আমি যদি বলি 'কেন'? তারা অমনি বিদ্রূপ করে' বলবে যে, আমি অন্যান্য এথেনীয় অপেক্ষা বেশী করেই চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। তারা বলবে, "সক্রেটিস, আমাদের যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে, তুমি আমাদের উপর আর নগরের উপর খুসী ছিলে। অন্যান্য এথেনীয় অপেক্ষা

তুমি যদি বেশী সন্তুষ্টই না হবে, তা হলে সহরের ভিতর, বাড়ীতে বাস করতে তাদের চেয়ে বেশী আনন্দ বোধ করবে কেন? যুদ্ধ ব্যতীত একমাত্র 'ইস্‌মিয়ান্' পর্ব্বোপলক্ষেই তুমি এথেন্সের বাহিরে যেতে, তা ছাড়া নগরের বাইরে আর কোন উৎসবেই তুমি যোগ দেও নি, এথেন্সের বাইরে অন্য কোন দেশে ভ্রমণ করতে, বা ভিন্ন দেশের শাসন প্রণালী দেখবার জন্যও কখনও যাও নি, কেননা, তুমি আমাদের পেয়ে' ও আমাদের নগরে বাস করে, সর্ব্বদাই খুসী ছিলে; আমাদের এতই পছন্দ করতে, আমাদের শাসন তোমার এতই ভাল লাগ্‌তো, অধিক কি, এথেন্সকে এতই সুখের মনে করেছিলে যে, এইখানেই তুমি সন্তান উৎপাদন করেছো। তা ছাড়া, তুমি যদি নির্ব্বাসনই ইচ্ছা করেছিলে, তা হলে সে কথা ত বিচারের সময় আদালতেই বলতে পারতে। এখন তুমি সম্মতি না নিয়ে যা করতে যাচ্ছ, পূর্ব্বে সম্মতি নিয়েই ত তাই করতে পারতে। তখন বল্‌লে, নির্ব্বাসনের চেয়ে মৃত্যু ভাল। এখন কি সে কথা মনে করে' লজ্জা বোধ করছো না? আমরা ধর্ম্মের প্রতিনিধি জেনেও তুমি আমাদের নষ্ট করতে চেয়েছো। একটা সামান্য ক্রীতদাস পলাবার জন্য যে পথ গ্রহণ করে, তুমিও তাই করেছো, অর্থাৎ প্রথমে আমাদের শাসনাধীন থাকতে চেয়ে', পরে পলাতে চেষ্টা করে', নিজের চুক্তি ভঙ্গ করেছো। এখন বল দেখি, কেবল কথায় নয়, তুমি যে সত্যই আমাদের অধীনে বাস করতে চেয়েছিলে একথা বলা আমাদের সাজে কি না? বন্ধু ক্রিটো, এ প্রশ্নের আমরা কি উত্তর দেবো? একথা যে সত্য, তা কি স্বীকার করবো না?

ক্রিটো। হাঁ সক্রেটিস, অবশ্য।

সক্রে। তারপর তারা বলবে, "তুমি নিজের সর্ত্ত কি নিজেই ভাঙ্গছো না? কেউত জোর করে বা ফাঁকি দিয়ে তোমাকে সর্ত্তে আবদ্ধ করেনি, আর ব্যস্ত সমস্ত হয়েও তুমি রাজী হওনি। সর্ত্তগুলি যদি অন্যায় মনে হয়েছিল ও আমাদের উপর যদি রাগই ছিল, তাহলে দুই এক বৎসর নয়, সত্তর বৎসর সময় পেয়েছো, এর মধ্যে অনায়াসে তুমি চলে যেতে পারতে। তুমি ল্যাসিডিমন ও ক্রীটকে সুশাসিত রাজ্য বলে থাক, এই দুই যায়গার কোনটা, অথবা হেলেন, কিম্বা অসভ্যাদিগের কোন দেশকেই তুমি পছন্দ করনি। কাণাখোঁড়া লোকেও তোমার চেয়ে বেশি সহরের বাইরে যায়। এই সব কারণে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, অন্যান্য এথেনীয় অপেক্ষা তুমিই নগরের উপর সবচেয়ে বেশী খুসী ছিলে, শুধু নগর কেন, নগরের শাসনকর্ত্তা আমাদের উপরেও খুসী ছিলে; কেননা, যে নগরে বিচার নেই, সে নগরকে লোকে ভালবাসবে কেন? তুমি কি এখন তোমার সর্ত্তানুসারে কাজ করবে না? আমাদের পরামর্শ নেও ত, তোমাকে নিশ্চয়ই করতে হবে; তাই বলি, সক্রেটিস, এথেন্স হ'তে চলে' গিয়ে হাস্যাস্পদ হও না!

বিবেচনা করে, দেখ, তুমি সর্ত্তভঙ্গ করে' নিজের কিম্বা বন্ধুদের কি উপকার করবে? তাদের সম্বন্ধে নিশ্চয় জেনো যে, তারাও (তোমার পলায়নের সাহায্য করে;) অন্ততঃ নির্ব্বাসনদণ্ড পাবে, স্বাধীনতা হারাবে, কিম্বা সম্পত্তিচ্যুত হবে। তুমি নিজে হয়ত থিবিস্ অথবা মিগারা, কোন সুশাসিত নগরে যাবে, কিন্তু সেখানে গিয়েও তুমি এই সকল সাধারণ তন্ত্র রাজ্যের শত্রু বলে গণ্য হবে।

যারা তাদের নগরের মঙ্গল কামনা করে, তারা তোমার দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাইবে, আর মনে করবে' তুমি ন্যায়-বিরোধী। তারা যে তোমার সম্বন্ধে ঠিক ধারণা করেছে, সেখানকার বিচারকের মনেও সেই বিশ্বাস হবে; কেননা, যে যুবক কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন লোকদিগকে কুপথে নিয়ে যায়, সে আইনের অবমাননা করে বলেই লোকের ধারণা। তাহালে তুমি কি সুশাসিত দেশ ও সুসভ্যদিগের সংসর্গ ছেড়ে যেতে যাও? তাই যদি হয়, তবে বেঁচে থেকে ফল কি? তুমি এখানে যেসকল বিষয়ে আন্দোলন করে থাক, সে দেশের লোকদের সঙ্গে কি সে রকম করতে লজ্জা বোধ হবে না? তুমি কি তাদের বলবে না যে, ধর্ম্ম, ন্যায়, শিক্ষা ও আইন, মানুষের কাছে সব চেয়ে বেশি মূল্যবান? যদি তাই-ই বল,সক্রেটিস,তাহলে কি সেটা লজ্জার কথা নয়? তোমার এই রকমই মনে করা উচিত কিন্তু তুমি এসব দেশও ত্যাগ করে যাবে। থেসালীতে ক্রিটোর বন্ধু আছে, তার কাছে যাবে, কেননা সেইটী বিশৃঙ্খলা ও ব্যভিচারের দেশ; সেই দেশের লোকেই কৃষকবেশে বা অন্যকোন ছদ্মবেশ ধরে লোকে যেমন কারাগার থেকে পলায়, তুমিও সেই রকম করে' পলিয়েছো শুনে খুব আনন্দ বোধ করবে! কিন্তু তাদের মধ্যেও কেহই কি বলবে না যে, তুমি একজন বুড়োলোক, গোরে পা দিয়ে এখন তুমি জীবনটাকে আঁকড়ে ধরে রাখবার জন্য এমন যে মহার্ঘ বিচার-বিধি, তাই অমান্য করেছো? তবে তাদের যদি না চটাও ত তারা হয়ত একথা বলবে না। কিন্তু, সক্রেটিস, কেউ যদি একবার অসন্তুষ্ট হয় ও এমন অনেক কথা শুনতে হবে, যা হতে লজ্জায় তোমার মুখ লাল হয়ে উঠবে। মোট কথা, তুমি সেখানে সব লোকেরই তোষামদকারী ও ক্রীতদাস হয়ে থাকবে। থেসালীতে নিত্যকর্ম্মের মধ্যে তোমার একমাত্র খাওয়াদাওয়া ছাড়া আর কিছুই থাকবে না; ঠিক যেন সেখানে তুমি কোন আমোদ প্রমোদে যোগ দিতেই গিয়েছ! তখন ন্যায় ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে তোমার উপদেশ গুলি কোথায় থাকবে? কিন্তু এসব ছাড়া তোমার আর একটা প্রয়োজন আছে। সন্তানপালনের জন্য তোমার বাঁচা দরকার; তাদের তুমি মানুষ করতে চাও, কেমন কি না? আচ্ছা, তাই যদি হয়, তবে তুমি কি তাদের থেসালীতে নিয়ে যেতে চাও? শিক্ষার জন্য তাদের কি দেশছাড়া করবে? দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ তুলে দেবে না কি? আর যদি এখেনেই রাখ,তা হলে তুমি বেঁচে থেকেই বা তাদের কি উপকার করবে? তুমি ত আর তাদের কাছে থাকতে পারলে না! স্বীকার করি, তোমার বন্ধুগণ আছেন, তাঁরা দেখবেন। তাই যদি হয়, তবে তুমি পরলোকে না গিয়ে, থেসালীতে গেলেই কি তাঁরা বেশি যত্ন নেবেন? যাঁরা তোমার প্রকৃত হিতৈষী, অন্ততঃ তাঁদের সম্বন্ধে তোমার ওরূপ ভাবা উচিত নয়। না, সক্রেটিস, আমরা তোমাকে মানুষ করেছি, আমাদের কথা মত কাজ করতেই হবে। ন্যায়ের কাছে তোমার সন্তানসন্ততি, জীবন, কি অন্যকোন স্বার্থ চিন্তা করা অনুচিত। তা যদি কর,তবে পরলোকে ঈশ্বরের নিকট তুমি আত্মসমর্থন করতে পারবে না। আজ যদি তুমি পলাও, তাহলে এজীবনে তুমি কিম্বা তোমার বন্ধুবান্ধবেরা কেহই সুখী হতে পারবেন না। তোমার প্রতি অন্যায় অভিযোগ হইলেও তা আমাদের দ্বারা কিম্বা

আইনের দ্বারা হয় নাই; কয়েকজন লোকের দ্বারাই হয়েছে। কিন্তু তুমি যদি এখন অন্যায় করে অন্যায়ের কিম্বা অনিষ্ট করে অনিষ্টের প্রতিশোধ নেও আমাদের সঙ্গে সর্ত্তভঙ্গ কর, নিজের ও বন্ধুদের, দেশের ও আমাদের, যাদের একটুও ক্ষতি করা উচিত নয় তাদেরই ক্ষতি কর তাহলে যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে, ততদিন তোমার উপর আমাদের রাগত থাকবেই, তাছাড়া তুমি মরে গেলে পরলোকের অধিবাসীরা, অর্থাৎ আমাদেরই জাত ভাইয়েরা, তোমার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করেন; কেননা, তাঁরা জানেন, বেঁচে থাকতে তাঁদের বংশধরদের অনিষ্ট করার জন্য তুমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলে। তাহলে দেখ সক্রেটিস, আমাদের কথামতই তোমার কাজ করা উচিত, ক্রিটোর কথামত নয়।'

প্রাণের বন্ধু ক্রিটো, তা হলে জেনো, ভক্তিরসে, আপ্লুত হয়ে সীবিলের পুরোহিতগণ যেমন দেবতাদিগের মধুর বংশীধ্বনি শুনতে পায়, আমিও এখন সেই রকম দেবতাদের সঙ্গীত শুনতে পাচ্ছি। এতক্ষণ ধরে তোমাকে যে কথাগুলি বললাম, সেগুলি আমার কর্ণকুহরে এত জোরে জোরে প্রতিধ্বনি ক'রছে যে, তাহাতে আর কোন কথাই শুনতে পাচ্ছিনে। বেশ বুঝতে পারছি, ক্রিটো, আমাকে ফিরাবার জন্য এখন তুমি যতই চেষ্টা কর, তাহাতে কোন ফল হবে না। সব কথা শুনেও যদি মনে কর, তর্কে তোমার জয়লাভের আশা আছে, তাহ'লে তুমি যা'খুসী বলতে পা'র, আমি বাধা দেবো না।

ক্রিটো। না, সক্রেটিস, আর কিছু আমার ব'লবার নাই।

সক্রে। বন্ধু ক্রিটো, তবে এই পর্য্যন্ত। আমার কাজ আমার ক'রতে দেও; জেনো, ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়।

শ্রীদিগ্বিজয় রায়চৌধুরী।

রামানন্দস্বামীর খাতা—ভক্তি-সুধা। (৩)

ভক্তির সাধন।

হরিবিলাসে উদ্ধৃত

বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর বচনে আছে—"হে হরি, আমি এই নিবেদন করিতেছি যে, তুমি জান, যে কিছু উৎসবাদি কর্ম্ম, তাহা তোমার প্রেরণায় করিব। হে বিষ্ণো, হে হৃষীকেশ, তুমি প্রাতঃকালে আমায় জাগ্রৎ করিলে, হে ঈশ, তুমি যাহা করাও, তোমার আজ্ঞায় তাহা করি। হে ত্রৈলোক্যের চৈতন্যময় আদিদেব, হে শ্রীনাথ, হে বিষ্ণু, তোমার আজ্ঞায় প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া তোমার সন্তোষার্থ সংসার-যাত্রা অনুবর্ত্তন করি। হে শ্রীনৃহরে, হে অন্তরাত্মন্, যখন তোমার আজ্ঞায় সংসার-যাত্রা অনুবর্ত্তন করি, তখন যেন হে ভূমন্, স্পর্দ্ধা, তিরস্কার, কলহ, প্রমাদ ও ভয় আমায় অভিভূত না করে। আমি ধর্ম্ম কি জানি, অথচ আমার তাহাতে প্রবৃত্তি নাই, আমি অধর্ম্ম কি জানি, অথচ তাহা হইতে নিবৃত্তি নাই। হে হৃষীকেশ, তুমি আমার হৃদয়ে থাকিয়া যেরূপ নিযুক্ত কর, আমি তেমনি করি।"

এই আত্মনিবেদন অতি গভীর। এক দিকে সমুদয় কার্য্য, উৎসব হইতে আরম্ভ করিয়া নিত্য দৈনিক সাংসারিক কার্য্য পর্য্যন্ত, সমুদয় কার্য্য হরির আজ্ঞা অনুসারে, তাঁহার সন্তোষার্থ করিব, এই যত্ন, এই চেষ্টা, এই প্রতিজ্ঞা। আবার অন্যদিকে, সবইত জানি, তবুত বিষ্ণুর প্রিয় কার্য্য করিতে পারি না, এই আক্ষেপ, এই ক্রন্দন। "আমি ধর্ম্ম কি জানি, অথচ আমার তাহাতে প্রবৃত্তি নাই" তবে তোমার সন্তোষার্থ সংসার যাত্রা অনুবর্ত্তন করিব কেমন করিয়া? "আমি অধর্ম্ম কি জানি, কিন্তু তাহা হইতে আমার নিবৃত্তি নাই" পাপ মন অধর্ম্মের দিকে যে ধায়, তবে তোমার আজ্ঞায় কার্য্য করিব কেমন করিয়া? তাই বলি হে হৃষীকেশ, তুমি আমার মনে বল দেও, জ্ঞান দেও, যেন সদা সর্ব্বদা আমি অনুভব করিতে পারি যে, তুমি আমার হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছ, আর তুমি আমাকে যেরূপ নিযুক্ত করিবে, আমি যেন তেমনিই করি। ভক্ত এখানে ভবিষ্যৎ সামীপ্যে বর্ত্তমান কাল প্রয়োগ করিয়াছেন। হে ঈশ, তুমি আমার হৃদয়ে আছ। এই ভাবটী যেন সতত আমার মনে থাকে। শ্রুতি বলিতেছেন—আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরন্নাম মহৎ পদম্—"ব্রহ্ম প্রকাশমান, প্রাণীদিবের অন্তরস্থ, "গুহাচর" অর্থাৎ হৃদয়বাসী, এই নামধারী এবং মহৎ আশ্রয়।" (ক) গীতাতেও ঐ কথা—ঈশ্বরঃ সর্ব্ব ভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। "হে অর্জ্জুন, সকল ভূতের হৃদয়দেশে ঈশ্বর স্থিতি করিতেছেন।" একই শরীরে জীব ও ঈশ্বর রহিয়াছেন। তথাপি জীব অবসন্ন হয় কেন, মুহ্যমান থাকে কেন? শ্রুতি তাহার উত্তর দিতেছেন,—

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ।

"পুরুষ (অর্থাৎ জীব) একই বৃক্ষে নিমগ্ন হইয়া (অর্থাৎ দেহকে আত্মা মনে করিয়া) শক্তিহীনতা (বা দীনতা বশতঃ মুহ্যমান হইয়া শোকগ্রস্ত হয়)। কিন্তু সে যখন সাধকদিগের সেবিত অপর অর্থাৎ ঈশ্বরকে দেখিতে পায়, তখন সে বিগত-শোক হয়"—

এই দেহের মধ্যেই ঈশ্বর রহিয়াছেন, তবে তাঁহাকে দেখিতে পাই না কেন? মায়াতে, অবিশ্বাসে, অজ্ঞানে, পাপে চিত্ত আচ্ছন্ন, তাই সেই হৃদয়বাসীকে দেখিতে পাই না। পাপের ঠুলি চোখ হইতে খসিয়া পড়িলে, তাঁহাকে দেখিতে পাইব। অন্ধ সূর্য্যকে দেখিতে পায় না। যার চোখ আছে, সে দেখিতে পায়। অন্ধ যদি বলে সূর্য্য নাই, সূর্য্য উঠে না, সূর্য্য জগৎকে প্রকাশ করে না, তাহা যেমন বিশ্বাস করিবে না, মায়ামুগ্ধ মোহাচ্ছন্ন পাপান্ধ জীব যদি বলে, ঈশ্বর নাই, তাহাও তেমনই বিশ্বাস করিবে না। ঈশ্বরকে দর্শন করিবার, ঈশ্বরকে লাভ করিবার, ঈশ্বরকে জানিবার চেষ্টা কর, অধ্যবসায় সহ যত্ন কর। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবং বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥

"হে পরন্তপ, হে অর্জ্জুন, আমার প্রতি অবিচলিত ভক্তি দ্বারা এবংবিধ (বিশ্বরূপ) আমাকে প্রকৃত রূপে জানিতে ও শাস্ত্রতঃ

(ক) মুণ্ডকোপনিষৎ। ২য় মুণ্ডক, ২য় খণ্ড।

প্রত্যক্ষ করিতে এবং একাত্মরূপ আমাতে বিলীন হইতে পারা যায়।"

ঐ "অবিচলিত ভক্তি"। ভক্তির উপরই ঝোঁক। এখন ঐ ভক্তি পাই কিরূপে? —এই ত মুস্কিল।

ভক্ত প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

"অজ্ঞলোকদের ইন্দ্রিয় বিষয়ে যেরূপ মহান্ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়, তোমায় স্মরণ করিবার সময় তোমার প্রতি সেইরূপ তীব্র আসক্তি যেন আমার হৃদয় হইতে অপসারিত না হয়। (ঘ)

প্রহ্লাদ যাহা বলিয়াছেন, ভীষ্ম, উদ্ধব ও নারদও তাহাই বলিয়াছেন—

অনন্যামমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥

শরীরাদি অপরাপর বিষয়ে মমতা না হইয়া, একমাত্র বিষ্ণুতে প্রেমসঙ্গত মমতা হইলে তাহার নাম "ভক্তি"। ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদ এইরূপ বলিয়াছেন।

কিন্তু বিষ্ণুতে এই প্রেমসঙ্গত মমতা কেমন করিয়া হয়? কোন্ পথ দিয়া গেলে ভক্তির মন্দিরে উপস্থিত হইতে পারিব?

সৎ-চিন্তা, সৎ-গ্রন্থ, সৎ-সঙ্গ, সৎ-অনুষ্ঠান ও হরি-সঙ্কীর্ত্তন, এই গুলিই ভক্তি লাভ করিবার উপায়। এই গুলি ভক্তি পথের পাথেয়, এই সমুদয়ই সাধকের উপজীব্য। কিন্তু এই সব সাহায্যে ঈশ্বরকে সতত স্মরণ করিতে হইবে। আমি যা কিছু করিব, ভগবানের সন্তোষার্থই করিব, মনেতে এইরূপ প্রতিজ্ঞা চাই। আর ঈশ্বর আমার হৃদয়ে আছেন? সতত এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

১। সৎ-চিন্তা। মনেতে সকলেরই মঙ্গল কামনা করিবে। পরস্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে না। পরস্ত্রীর রূপ কখন চিন্তা করিবে না। পরনারী ভক্তি পথের কণ্টক। এ সম্বন্ধে মহাপ্রভুর নিয়ম এত কঠিন ছিল যে, হরিদাস মাধবীর নিকট ভিক্ষা লইয়াছিল বলিয়া মহাপ্রভু তাহার মুখ দর্শন করেন নাই। ভগবদ্গীতাতে আছে কাম, ক্রোধ, লোভ এই তিনটী নরকের তিনটী দুয়ার।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥

অর্থাৎ কাম ক্রোধ এবং লোভ নরকের এই তিনটী দ্বার, অতএব আত্মবিনাশের মূল, আত্মার অবনতি সাধনের কারণ; এজন্য এ তিনটী ত্যাগ করিবে। মনেতে এই তিনটীকে স্থান দিবে না। (ছ) ইহারা পবিত্র হৃদয়মন্দির, যেখানে ঈশ্বর স্বয়ং বাস করিতেছেন, সেখানে আসিলে মল মূত্রের ন্যায় সেই হরি-মন্দির অপবিত্র করে। যাহাতে ইহারা হৃদয়কে আক্রমণ করিয়া কলুষিত করিতে না পারে, তজ্জন্য সতত সতর্ক থাকিবে। মনে অন্যের মঙ্গল বা সুখ কামনা করিবে, অন্যের অনিষ্ট বা দুঃখ কখন ইচ্ছা করিবে না। সর্ব্বদা এই কথাটী মনে রাখিবে, আমার নিকট দুঃখ যেমন অপ্রিয়, অন্যের নিকটও তাহাই; আমার নিকট সুখ যেমন প্রিয় বা বাঞ্ছনীয়, অন্যের নিকটও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

গীতা ১১।৫৪

(ঘ) বিষ্ণুপুরাণ ১।২০।১৯

(ছ) গীতা ১৬।২১।

"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥"
"হে অর্জ্জুন, যিনি সর্ব্বজীবে, সুখ বা দুঃখ আপনার সঙ্গে তুলনায় সমান দেখেন, অর্থাৎ আমার যেমন সুখ প্রিয়, ও দুঃখ অপ্রিয়, অন্যেরও সেইরূপ; এই ভাবিয়া সকলের সুখ ইচ্ছা করেন, আমার মতে সেই যোগী শ্রেষ্ঠ।* নিজের মঙ্গলের জন্য যখন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যের মঙ্গলের জন্য, বিশেষতঃ তোমার শত্রুর মঙ্গলের জন্যও প্রার্থনা করিবে। (a)

এই সমুদয় বিষয়ে সচ্চিন্তা করিতে করিতে মন পবিত্র হইবে এবং মন হইতে সদ্বাক্য এবং সৎকার্য্য উৎসের ন্যায় স্বতঃ নির্গত হইবে।

২। সৎ-গ্রন্থ বা শাস্ত্র। সদ্‌গ্রন্থ বা শাস্ত্র মনে সচ্চিন্তা আনিয়া দেয়, অবসন্ন মনকে বল দেয়, পাঠককে শাস্ত্রকারের বিশুদ্ধাত্মার সংস্পর্শে আনয়ন করে। শাস্ত্রের বিদ্যুৎসূত্রযোগে পরপার হইতে ঋষিগণ আমাদিগের সহিত কথা কহেন। তাঁহারা সতত আমাদিগকে সৎপথে যাইবার জন্য আহ্বান করেন; সংসারের দৈনিক জ্বালা, মালিন্য, দুঃখ, অবসাদ সরাইয়া, মনে শান্তি, পবিত্রতা, প্রফুল্লতা আনিয়া দেয়। যে পথে সেই মহাজনগণ গিয়া শান্তি লাভ করিয়াছেন, সেই পথ দেখাইয়া দেন, সেই পথে যাইবার প্রবৃত্তি দেন। ভক্তির সহিত প্রতিদিন শাস্ত্র আলোচনা করিবে, শাস্ত্র বুঝিতে চেষ্টা করিবে, তাহাতে যে সদুপদেশের বীজ নিহিত আছে, তাহা যত্ন করিয়া হৃদয়ে বপন করিবে।

৩ সৎসঙ্গ। সাধুসঙ্গে ধর্ম্মের উপদেশ পাওয়া যায় এবং তৎসঙ্গে আমরা ধর্ম্মের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সাধুর জীবনে দেখিতে পাই। আর সাধু ব্যক্তি আমার মনের, আমার আধ্যাত্মিক অবস্থার উপযোগী উপদেশ দেন। যে সকল অত্যুচ্চ কথা আমি বুঝিবার জন্য এখনও প্রস্তুত হই নাই, এখনও আমার হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা হয় নাই, আমাকে তাহা না বলিয়া যাহা আমি বুঝিতে পারিব, যাহা আমি গ্রহণ করিতে পারিব, তিনি তাহাই দেন। এই জন্য সদ্‌গুরু পাইলে উন্নতির পক্ষে বড়ই সুবিধা হয়।

আমার গৃহে সাধু আসেন না কেন? আমি যে তাঁহার নিমিত্ত পথ চাহিয়া থাকি, কবে কোন্ সাধু, কোন মহদ্ব্যক্তি এই অধমের গৃহে পদার্পণ করিবেন, কখন সাধু আমাকে দর্শন দিয়া এই পাপতাপদগ্ধ জীবন শীতল করিবেন?

শাস্ত্র বলেন-

মহদ্বিলনং নৃণাং গৃহিণাং দীন চেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা কচিৎ॥

"হে ভগবন্ দীনচিত্ত গৃহীগণের, কল্যাণ সাধনার্থ তাঁহাদিগের গৃহে মহদ্ব্যক্তিদিগের

* গীতা ৬।৩২।

(a) "The patient man hath a great and wholesome purgatory who though he receive injures, yet griveth more for the malice of another, than for her own wrong; who prayeth willingly for his adverseries, and from his heart forgiveth their offences.

Im. of Chr :—সঃ শীঃ।

গমন হইয়া থাকে, অন্য কারণে কদাচ তাঁহাদিগের গমন হয় না।"

আমি দীনচিত্ত না হইলে, বিনীত নম্র কাতরভাবে আকাঙ্ক্ষা না করিলে, তিনি আমার ঘরে আসিবেন কেন ?

সৎসঙ্গ লাভ করিতে হইলেও ঈশ্বরের দয়ার আবশ্যক। ঈশ্বরের নিকট যেন ক্রমাগত প্রার্থনা করি—"হে ঈশ্বর, আমি যাহাতে সৎসঙ্গ লাভ করি, দয়া করিয়া তাহা করুন।" সকল বিষয়েই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। নিজের চেষ্টারও প্রয়োজন, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনারও প্রয়োজন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাও একপ্রকার চেষ্টা। সকল মঙ্গলের জন্যই ঈশ্বরের করুণার আবশ্যক। তাই "শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মুচুকুন্দ বলিয়াছিলেন—"হে অচ্যুত! তোমার করুণায় যখন সংসারী ব্যক্তির ভববন্ধন ছিন্ন হয়, তখনই সৎসঙ্গম লাভ হইয়া থাকে" (চ)—অতএব যখন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিব, তখন অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সৎসঙ্গম লাভের নিমিত্তও যেন প্রার্থনা করি।

হে ভগবন্, আমাকে সদ্গুরু দিন, এমন গুরু দিন, যিনি শাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ, যাঁহার চরিত্র পবিত্র, যিনি আমাকে ভালবাসিয়া, আমার প্রতি দয়া করিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি আমার ভিতর সঞ্চারিত করিবেন—এমন গুরু, যিনি এই অধমজনকে ধরিয়া তোমার পাদপদ্মে উৎসর্গ করিতে পারিবেন। আমি নিজের চেষ্টায় তোমাকে পাইবার জন্য এত চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু আমার ভয় হয়,যে সদ্গুরুর সাহায্য ব্যতীত তোমার দর্শন পাইব না। তাই প্রভো, কৃপা করিয়া আমাকে সদ্গুরু দিন।

(চ) শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৫১।৫৩।

৭। সৎ-অনুষ্ঠান। সদনুষ্ঠান না থাকিলে শাস্ত্রের ও আচার্য্যের উপদেশ, আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা, সব বৃথা হইয়া যায়। সৎকার্য্য, সচ্চিন্তার পরিণতি ও পূর্ণ-বিকাশ। সচ্চিন্তার অনুযায়ী সৎকার্য্য না করিলে, সচ্চিন্তা এক প্রকার আলস্যময় স্বপ্নবৎ কল্পনায় পর্য্যবসিত হয়। দীর্ঘকাল চিন্তার ও কার্য্যের সামঞ্জস্য না থাকিলে, নিজের নিকট একপ্রকার কপটতা অভ্যস্ত হইয়া যায়। আমি যদি বক্তৃতাতে পরোপকার-মহিমা বিবৃত করি, কিন্তু কার্য্যে কিছুই পরোপকার না করি, লোকে আমাকে কপট বা ভণ্ড বলিবে। তেমনি আমি যদি পরোপকার কর্ত্তব্য,ইহা দীর্ঘকাল চিন্তা করি, অথচ পরোপকার না করি, সেও একপ্রকার নিজের নিকট ভণ্ডামি। অনেক সদনুষ্ঠান চিন্তাতে যত সহজ, কার্য্যে তত সহজ নহে। চিন্তাতে সদনুষ্ঠানের নিমিত্ত ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় না, কিন্তু কার্য্যে অনেক সদনুষ্ঠানের নিমিত্ত ত্যাগ-স্বীকার, কায়িক কষ্ট সহ্য করিতে হয়। কিন্তু পুণ্যাত্মারা এই কষ্টকে কষ্টই মনে করেন না, তাঁহাদিগের আত্মার পরিতৃপ্তিতে কায়িকক্লেশ দূর হইয়া যায়। সদনুষ্ঠানে "ক্ষুদ্র আমি" "বৃহৎ আমিতে" বিস্তৃত হয়। পরোপকার করিতে করিতে সকল জীবেই যে পরমাত্মা আছেন, এই ব্যবহারিক জ্ঞান ক্রমে অভ্যাস হয়। পরোপকার করিতে করিতে, আমি আর তুমি, এই যে প্রভেদ, তাহা ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যায়। যখন জীব অন্য জীবের দুঃখে গলিয়া যায়, তখন দুইটী আত্মা, গঙ্গা-যমুনার ন্যায়, সম্মিলিত হইয়া যায়। অন্যের দুঃখে আমার দুঃখ হয় কেন? সে যে আমি। সমুদয় জীবই যে এক পরমাত্মার অংশ। সদনুষ্ঠানে

অন্যের মঙ্গল সাধন করিয়া নিজেরই মঙ্গল সাধন করা হয়। দান একটী প্রধান সদনুষ্ঠান—ধনদান, অন্নদান, জলদান, ভূমিদান, বিদ্যাদান প্রভৃতি। ন্যায়ার্জ্জিত ধনাদেঃ সৎপাত্রে অর্পণং দানং—সদুপায়ে অর্জ্জিত ধন সৎপাত্রে অর্পণ করিলে তাহাকে দান বলে। গরু মারিয়া ব্রাহ্মণকে জুতা দান, দান নহে—তাহা একটা মহাপাপ। অত্যাচার করিয়া বা প্রবঞ্চনা করতঃ ধন-সঞ্চয় পূর্ব্বক, তাহা দান করা প্রকৃত দান নহে, তাহা পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া গণ্য হইলে হইতে পারে। ধন ন্যায়ার্জ্জিত হইলেও তাহার দান উত্তম মধ্যম বা অধম বলিয়া পরিগণিত হয়।

ভগবান বলিয়াছেন—

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালেচ পাত্রেচ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥
অদেশকালে, যদ্দান মপাত্রেভ্যশ্চদীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ *

"দান করা উচিত, এই বোধে উপযুক্ত দেশে, উপযুক্তকালে উপযুক্ত পাত্রে যে দান করা যায়, তাহাকে সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে। প্রত্যুপকারের আশায়, বা স্বর্গাদি ফলের উদ্দেশে, চিত্ত-ক্লেশ সহকারে যাহা দেওয়া যায়, তাহাকে রাজসদান বলে। অসৎকার এবং অবজ্ঞা পূর্ব্বক, অদেশে, অকালে অপাত্রে যে দান করা যায়, তাহাকে তামস দান বলা যায়। †

* গীতা ১৭।২০-২২।

† এখানে রামানন্দ টীকাকারদিগের ব্যাখ্যা অনুসরণ না করিয়া সহজর জ্ঞানে অর্থ—করিয়াছেন সঃ শ্রীজ্ঞাঃ।

মহাভারতে আছে—দানের দ্বারা কদর্য্যকে জয় করিবে (এ) অর্থলোভাদিবশতঃ পরোপকারে বৈমুখ্য হয়, তাহাকে "কদর্য্য" বলে। সাচ্চিন্তা আলোচনা করিবার সময় বুঝিয়াছি যে, শত্রুর মঙ্গলকামনা করা উচিত। সদনুষ্ঠানের আলোচনায় বুঝিতেছি যে, কেবল শত্রুর মঙ্গল কামনা করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না। সমভাবে শত্রু ও মিত্রের নিত্য সেবা করিবে"—মহাভারতে আছে। এ স্থলে দানাদির দ্বারা শত্রুরও সেবা কর্ত্তব্য, ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ শত্রুকেও দান করিবে, শত্রুরও উপকার করিবে। এরূপ মহাত্মা আমার বংশেই জন্মিয়াছিলেন। এক দুরাত্মা তাঁহার নামে একটা ভয়ানক মিথ্যামোকদ্দমা করিল—অভিযোগ এই যে, অমুকবাবু হুকুম দিয়া আমার গৃহে ডাকায়তি করাইয়াছেন। অবশ্য মোকদ্দমা মিথ্যা প্রমাণ হইল। তাহার কিছুদিন পরে ঐ দুরাত্মা একটা ঘোর বিপদে পড়িয়া তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য উক্ত মহাত্মার নিকট প্রার্থনা করিল। গ্রামের সমুদয় লোক একবাক্যে বলিল—"মহাশয়, ঐ দুরাত্মা আপনার নামে ভয়ানক মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়াছিল, আপনি কখনই উহাকে উদ্ধার করিবেন না।"

তিনি হাসিয়া বলিলেন—"আমার যে শত্রু, সে বিপন্ন হইলে আমার তাহাকে উদ্ধার করা উচিত"। ঐ মহাত্মা দুরাত্মাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। আহা! আমি সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার অগাম দয়া দাক্ষিণ্য কিছুই লাভ করিতে পারিলাম না।

শ্রুতি বলিতেছেন, শ্রদ্ধয়া দেয়ম—(ট)।

(এ) উদ্যোগ পর্ব্ব ৩৯ অ।

(ট) তৈ ১১।

শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে। অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্—অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবে না। যখন দান করিবে, তখন মনে করিবে, তুমি যাহা দান করিতেছ, তাহা স্বয়ং ভগবান্ ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে, হস্ত প্রসারণ করিয়া গ্রহণ করিতেছেন। ইহা মনে থাকিলে কখন অশ্রদ্ধার সহিত, অবজ্ঞা পূর্ব্বক দান করিবেনা। শ্রিয়া দেয়ম্, বুদ্ধির সহিত দান করিবে। গীতার কথা যে, দেশ কালপাত্র বিবেচনা করিয়া দান করিবে। যেখানে জলকষ্ট নাই, সেখানে পুষ্করিণী খনন করিলে, অথচ সেখানে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, সেখানে অন্নদান করিলে না। এই জল দান বুদ্ধির সহিত হইল না। অনর্থক অর্থ ব্যয় হইল। হ্রিয়া দেয়ম্—লজ্জার অর্থাৎ বিনয়ের সহিত দান করিবে। অহঙ্কার বা দর্পের বা শ্লাঘার সহিত দান করিবেনা। এই জন্য সাধু দাতা গোপনে দান করিতে ভালবাসেন। প্রসিদ্ধ দাতা প্রাতঃস্মরণীয় তারক প্রামাণিক শীতকালে গঙ্গাস্নান করিয়া ছিন্ন কম্বল গায় দিয়া আসিতেন। যদি কেহ বলিতেন, "প্রামাণিক মহাশয়, একখানি নূতন কম্বল কিনিয়া আপনি ব্যবহার করিলে ভাল হয়"। তিনি বলিতেন, চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু সুবিধা করিতে পারিতেছি না। একদিন শীতকালে দরিদ্রদিগের মধ্যে এক হাজার কম্বল বিতরণ করিয়া, তৎপরে একখানি নূতন কম্বল গায় দিলেন। রাস্তার লোকে ভক্তিভরে যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রামাণিক মহাশয়! এখন সুবিধা হইয়াছে? তিনি অতি বিনীত ভাবে উত্তর দিলেন, আজ্ঞে হাঁ একটু সুবিধা হইয়াছে। বৎসর বৎসর এইরূপ দীন ভাবে যে তিনি কত দারিদ্রব্যক্তিকে কত দান করিয়াছিলেন, তাহার হিসাব কে দিতে পারে? দীনবন্ধুর খাতাতে তাহার হিসাব আছে। ভীয়া দেয়ম্—ধর্ম্মভয়ের সহিত দান করিবে। ঋষিগণ ভগবানের ধনের অছী। সৎপাত্রে সেই ধন অর্পণ করাতে ধর্ম্ম; অসৎ পাত্রে তাহা দান করাতে অধর্ম্ম। আর ধন থাকিতে দান না করায় অধর্ম্ম হয়—যে ধনীর এই ধর্ম্মভয় আছে, তিনি দান করিবেন, নিজের বিলাস ভোগে অর্থের অপব্যয় করিবেন না। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

"দেহিগণের যতটুকু হইলে উদরপূর্ত্তি হয়, ততটুকুতে তাহার অধিকার। ইহা অপেক্ষা অধিক যে ব্যক্তি আপনার বলিয়া মনে করে, সে চোর, দণ্ডার্হ!"

এই বিধি অনুসারে কি কখন চলিতে পারিয়াছি? আমি সে অর্থ অর্জ্জন করিয়াছিলাম,তাহার উচিত ব্যবহার কি করিতে পারিয়াছি? তথাপি একজন আত্মীয় ব্যক্তি, যাহার পুত্রের শিক্ষার জন্য আমি কয়েকবৎসর যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছিলাম, তিনিই আমার সম্পর্কে বলেন যে, "জীবনের শেষভাগে উহার এইরূপ অর্থাভাব হইবেই, যখন তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল, তখন হরির লুঠের ন্যায় টাকা দান করিতেন। প্রতি মাসে নানা দিকে তাঁহার মণি অর্ডার যাইত। এখন তাহার ফলভোগ করিতেছেন।" কেহ কেহ বলেন, "লোকটা পণ্ডিত, অন্যবিষয়ে বিবেচক ও বুদ্ধিমান্। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে কতই নির্ব্বোধের মত কাজ করিয়াছে। নিজের বার্দ্ধক্যের বা রোগের জন্য কিছুই সঞ্চয় করে নাই।" এইরূপে নানা জনে নানাবিধ আলোচনা করেন *। হে ভগবন্,

* জগতে এরূপ হইয়াই থাকে—সুতরাং শ্রীমদ্ভা-

এই সব কথা শুনিয়া আমি আমার ভাল সময় অর্থ দিয়া লোকের যে উপকার করিয়াছি, এখন নিঃসম্বল অবস্থায় যেন তাহার জন্য কখনও অনুতাপ হয় না। শাস্ত্র বলেন যে, দত্বা সন্তপ্যতে যস্তু তমাহু ব্রহ্মঘাতকম। আহা! শ্রীমদ্ভাগবতে কি সুন্দর উপদেশই আছে!—"এই সংসারে দেহধারী মাত্রেরই ইহা জন্মসাফল্য যে, প্রাণ, ধন, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা অন্যান্য দেহধারীর সতত মঙ্গলাচরণ।"

ফল কথা—অসক্তঃ সতত কার্য্যং কর্ম্ম সমাচার—"তুমি ফলাসক্তি শূন্য হইয়া সর্ব্বদা অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে বিহিত কর্ম্মঅনুষ্ঠান কর—স্বয়ং ভগবান্ এই কথা বলিয়াছেন।

প্রতিদিন হরিসঙ্কীর্ত্তন করিবে—আমার মন! হরিসঙ্কীর্ত্তন বড় মধুর,—ইহাতে তোর শুষ্ক প্রাণ রসযুক্ত হইবে।

হরিসঙ্কীর্ত্তন বড় মধুর, বড় মধুর। হে মন, প্রতিদিন প্রাতে, সন্ধ্যায়, নিশীথে হরির গুণগান করিবে। সেই গানের মধ্যে হরির বিশ্বপ্রাণ ক্রমে প্রবাহিত হইবে, ভক্তির উৎস খুলিয়া যাইবে। শুষ্ক নয়নে ভক্তির জল উথলিয়া পড়িবে; এই সেইজলে ইন্দ্রধনুর ন্যায় হরির ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রতিফলিত হইবে। হরির অসংখ্যরূপ অসংখ্যবর্ণ দেখিতে পাইবে। সেইদিন কবে আসিবে আমার, যখন হরিসঙ্কীর্ত্তনে মন মজিবে।

হে মন, সতত মনে রাখিবে যে (১) সৎচিন্তা (২) সৎ-গ্রন্থ, (৩) সৎসঙ্গ (৪) সৎ-অনুষ্ঠান, এবং (৫) হরিসঙ্কীর্ত্তন, এই পাঁচটী ভক্তিলাভের উপায়। সচ্চিন্তা করিবে, সদ্‌গ্রন্থ পড়িবে, সাধুসঙ্গ করিবে, সদনুষ্ঠান করিবে, আর প্রাণ খুলিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন করিবে।

রামানুজ তাহার বেদান্তভাষ্যে এতৎ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন (১) বিবেক (অর্থাৎ খাদ্যাখাদ্য বিচার) (২) বিমোক (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সংযম) (৩) অভ্যাস (অর্থাৎ আত্ম-সংযম ও আত্ম ত্যাগের অভ্যাস) (৪) ক্রিয়া (অর্থাৎ যজ্ঞ) (৫) কল্যাণ (অর্থাৎ পবিত্রতা; বাহ্যশৌচ ও অন্তঃশুদ্ধি) (৬) অনবসাদ (অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক বল প্রয়োগ) (৭) অনুদ্ধর্ষ অর্থাৎ অতিরিক্ত হর্ষ হাস্য, কৌতুক ত্যাগ) এই সাতটী উপায় দ্বারা ভক্তি লাভ হয়।

হে ভগবন্, আমি আবার বলিতেছি, আমি ধর্ম্ম কি জানি, তাহাতে যে আমার প্রবৃত্তি হয় না, অধর্ম্ম কি আমি জানি, তাহা হইতে যে আমার নিবৃত্তি হয় না। তুমি আমার হৃদয়ে, আমাকে ধর্ম্ম পথে চালনা কর। যেন প্রাতঃকালে জাগ্রৎ হইয়া রাত্রি পর্য্যন্ত তোমাকে স্মরণ করিয়া, তুমি সতত আমার হৃদয়ে বাস করিতেছ, ইহা গভীর ভাবে অনুভব করিয়া, তোমারই সন্তোষার্থ সমুদয় কার্য্য করি। বড় মোহে আচ্ছন্ন আমি, গভীর দুঃখে অবসন্ন, তুমি আমার হৃদয়ে বল দেও, তুমি আমাকে দেখা দেও, হৃদয়ের নিবিড় অন্ধকার দূর করিয়া আমার নিকট তুমি প্রকাশিত হও। আমি জীবনের প্রান্তরে,—সন্ধ্যা সমাগত, মেঘ ভাসিতেছে, ঝটিকা ও বৃষ্টি আমার অনাবৃত গাত্রে

মানন্দ বোধ করি তাহাতে দুঃখিত হন নাই। একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, কোন দুর্ঘটনা বশতঃ কোন সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি নিঃস্ব হইলে তাহার বন্ধুগণ বলে—"Poor devil, what imprudences he has committed, what chances that chap has thrown away" শ্রীজ্ঞাঃ সঃ।

আঘাত করিতেছে, আমার জরাজীর্ণ দেহ ঘুমিয়া পড়িতেছে, পা আর উঠিতেছে না, হে নাথ, তুমি কি এ হতভাগ্যকে আশ্রয় দিবে না? অন্ধকার, অন্ধকার চতুর্দ্দিকে অন্ধকার! প্রভো! এই বিজন প্রান্তরে আমার উপায় কি হইবে? আমাকে রক্ষা কর। হরিঃ॥ ওঁ॥

রামানন্দস্বামি-বিরচিত ভক্তি-সুধার সম্পাদক—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

বাঁশী।

(১)

ঠাকুর!

তুমি নাকি বড় ভালবাস বাঁশী?
নিশিদিন সন্ধ্যা সকাল,
বাজাও তুমি তাই সদাকাল
পথে ঘাটে বনে বনে
মধুর মধুর মধুর হাসি!

তোমার—

সপ্ত ছিদ্র বাঁশীর সুরে,
কুলনারীর দুকুল উড়ে
লজ্জা শরম যায় যে দূরে
অকূলে ভাসে গোকুলবাসী!

(২)

কত কষ্টে শোকে দুখে,
কত ছিদ্র আমার বুকে,
কত সুরে বাজবে হৃদয়
বাজায়ে দেখ একবার আসি
কাম-কদম্বের কাল ছায়া,
ময়ূর নাচে মোহমায়া,
কালিন্দী বয় কাল কায়া
আঁখি ভরা অশ্রুরাশি!
অসুর বুদ্ধি পশুর পাল,
রাখ এসে রাজ রাখাল,
গোপন বৃত্তি গোপিনীদের
কর এসে চরণদাসী!
আবার বাজাও এসে হৃদয়বাঁশী!

(৩)

নানান্ রন্ধ্রের নানান্ সুরে,
আবার বিশ্ব ভুবন যুড়ে,
নূতন ছন্দে উঠুক ঘুরে,'
গ্রহ তারা উল্কা রাশি,
শৈলে শৈলে লাগুক নাড়া,
গুহায় গুহায় পড়ুক সাড়া,
ভাঙ্গুক নরক অন্ধ কারা,
অষ্ট বজ্র অট্টহাসী!
ঠাকুর, বাজাও এসে হৃদয়বাঁশী।

(৪)

সুপ্ত বিশ্ব উঠুক জেগে,
প্রলয় কালের ধাক্কা লেগে,
আগুন জ্বলুক মেঘে মেঘে,
দিগ্দাহী সে দিগ্বিভাসী!
যুগ যুগান্তের অন্ধ পাপ,
যুগ যুগান্তের অভিশাপ,
যুগ যুগান্তের পরিতাপ
সকল করুক ভস্মরাশি!
ঠাকুর, বাজাও এসে হৃদয় বাঁশী!

(৫)

ব্যাথার মথিয়ে সপ্ত সাগর,
গর্জ্জিয়ে উঠুক শেষ অজগর,
বেড়িয়ে বেড়িয়ে মন্থন মন্দর
দ্যুলোক ভূলোক ত্রিলোক গ্রাসি,
উঠুক গরল উঠুক সুধা,

ঘুচুক প্রাণের ব্যাকুল ক্ষুধা,
জয়ে যশে ভরুক বসুধা
নূতন জীবন উঠুক হাসি !
ঠাকুর বাজাও এসে হৃদয়বাঁশী !

(৬)

নিদ্রালস তন্দ্রা মগ্ন,
জাঁজর লাগা পাঁজর ভগ্ন,
চরণ তুলসী কণ্ঠ লগ্ন
চির মরণ অভিলাষী,
নিরুৎসাহ নিরুদ্যম,
কর্ম্ম কেবল দেখে যম,
অধম যারা জাগুক তারা
আত্ম বলে অবিশ্বাসী।
ঠাকুর, বাজাও এসে হৃদয়বাঁশী।

(৭)

বাজাও সঞ্জীবনী তানে,
নূতন মন্ত্র নূতন গানে,
নূতন আশা জাগুক প্রাণে,
ভীরুতা জড়তা নাশি,
জাগুক যত কাণা খোঁড়া,
ভগ্ন সন্ধি লাগুক যোড়া,
আতুরা মথুরা জাগুক
পায়ের বাঁধন গলায় ফাঁসি !
ঠাকুর, বাজাও এসে হৃদয়বাঁশী !

(৮)

বাজাও ভ্রাতৃপ্রেমের সুরে,
সারা বিশ্ব ভুবন যুড়ে,
মিলুক আবার ব্রজের বালক
ভাই ভাইয়েরে ভালবাসি,
বিশ্ব-বালক আপন জানি,
জাগুক নারী নন্দরাণী,
মাতৃ-মন্ত্রে জগন্মাতা
কোলে করুক জগৎবাসী
ঠাকুর, বাজাও এসে হৃদয়-বাঁশী !

(৯)

বাজাও ঠাকুর দীপক রাগে,
গীতায় যেন জগৎ জাগে,
দাঁড়াও তুমি রথের আগে,
পথের বাধা বিঘ্ন নাশি,
যে ভীরু কাপুরুষ ক্লীব,
জগতের জঘন্য জীব,
ফিরে আবার ধরুক্ গাণ্ডীব
কর্ত্তব্য-বিমুখ উদাসী,
বুঝুক মূঢ় তত্ত্ব গূঢ় অমর আত্মা অবিনাশী
ঠাকুর, বাজাও এসে হৃদয়বাঁশী !

(১০)

ব্রহ্মচারী কুমার ব্রত,
নবীন ভীষ্ম শত শত,
হৌক সে শরশয্যাগত,
সর্ব্বত্যাগী বীর সন্ন্যাসী,
বাজাও মর্ম্মভেদী সুরে,
সপ্ত পাতাল উঠুক ফুড়ে,'
নবীন ভেগবতী গঙ্গা
নব্যভারত উচ্ছ্বাসি !

(১১)

জাগুক সে অজ্ঞাত বাসে,
আবার নবীন অভিলাষে
বৃকোদর বাবুর্চির বেশে—
দ্রৌপদী-সৌরিন্ধ্রী দাসী,
কঙ্ক সে নিঃশঙ্ক মনে,
লাগুক নব শুভক্ষণে,
জাগুক নকুল সহদেব সে
গরু রাখাল ঘোড়ার ঘাসী !
ঠাকুর, বাজাও এসে হৃদয়বাঁশী !

(১২)

বাজাও সে ভৈরব রন্ধ্রে,
জাগুক বিন্ধ্য মেঘ-মন্দ্রে,
জাগুক প্রতাপ বনে বনে

কন্যা পুত্রে উপবাসী,
অন্ধ যত গিরিগুহা,
হুঙ্কারিয়া উঠুক উহা,
জাগুক এ অকালে আবার
কাঁকাল সার সে ক্ষুৎপিপাসী !
ঠাকুর, বাজাও আমার হৃদয়বাঁশী !

(১৩)

বাজাও সে করুণার তান,
শাক্য খুঁজুক মহানির্ব্বাণ,
জীবের দুঃখে আকুল প্রাণ
রাজপুত্র ভোগবিলাসী,
উদ্ধারিতে অধঃপতিত,
অচৈতন্য মর্ম্ম মথিত,
জাগুক আবার শ্রীচৈতন্য
নব নবদ্বীপ-নিবাসী !
ঠাকুর, বাজাও আমার হৃদয়বাঁশী !

(১৪)

বাজাও সে পবিত্র সুরে,
জাগুক নারী অন্তঃপুরে,
আত্রেয়ী সাবিত্রী সীতা
পুণ্যকিরণ পরকাশি,
অহল্যা, পদ্মিনী, সতী,
কন্যা কৃষ্ণা, দুর্গাবতী,
কর্ম্মদেবার কর্ম্ম দেখি,
ধর্ম্ম আবার উঠুক হাসি !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

সঙ্কলিকা।

(১)

সাহিত্য-পরিষদের উৎসাহী সভ্য এবং সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তোফী মহাশয়, ১৩২২ সালের ১৯শে চৈত্র, শনিবার দেহরক্ষা করিয়াছেন। ঘোর দারিদ্র্য-সংগ্রামে প্রপীড়িত হইয়াও তিনি পরিষদের উন্নতির জন্য কায়মনোবাক্যে খাটিতেন। তিনি স্বাধীনচেতা, মিষ্টভাষী, প্রিয়দর্শন এবং সর্ব্বজনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার তিরোধানে বঙ্গভূমির যে অভাব হইয়াছে, তাহার যে শীঘ্র পূরণ হইবে, তাহা মনে হয় না। যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা সাহিত্য-পরিষদের গৌরব অক্ষুণ্ণ, তাহার মধ্যে ব্যোমকেশ অন্যতর। এস্থলে আমরা তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনের কথা লিপিবদ্ধ করিলাম।

১২৭৫ সালে ব্যোমকেশ জন্ম গ্রহণ করেন। ১৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি ছিল। বাল্যকালেই ব্যোমকেশ, নন্দলাল সারখেল ও তাঁহাদের এক বন্ধু, তিন জনে মিলিয়া, ১২৮৯ সালে 'তপস্বিনী' ও ১২৯১ সালে ভারত'নামক দুইখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। যখন 'বসুমতী' পত্র প্রথম বাহির হইল, তখন"সাহিত্য-কল্পদ্রুম"নামে একখানি মাসিক পত্রও প্রকাশিত হয়; উহার সম্পাদক ছিলেন ব্যোমকেশ। ১২৯৩ সালে যখন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু প্রথম "বিশ্বকোষ" লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন ব্যোমকেশ তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। ব্যোমকেশের সাহায্য ভিন্ন "বিশ্বকোষ" সম্পূর্ণ হইত কি না সন্দেহ। ব্যোমকেশের জীবনের প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য ছিল—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও বঙ্গীয় সাহিত্যের পুষ্টি। পরিষদের পুস্তকালয়, পুঁথিশালা, চিত্র-শালা,

গৃহ-নির্ম্মাণ—সমস্তই ব্যোমকেশের পরিশ্রমের ফল। পরিষদ-পত্রিকায় এ পর্য্যন্ত ব্যোমকেশের নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছে,—

(১) কবি কৃষ্ণরামের রায়-মঙ্গল।

(২) শীতলা-মঙ্গল (দেবকীনন্দন ও নিত্যানন্দ কৃত)

(৩) রাজকবি জয়নারায়ণ।

(৪) কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্র পুরাণ।

(৫) বাণীকণ্ঠের মোহ-মোচন।

(৬) সত্যনারায়ণের কথা।

(৭) রামভদ্রের সত্যদেবসংহিতা।

(৮) বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত।

(৯) বাঙ্গালা নাম রহস্য (১ম প্রবন্ধ)।

(১০) ঐ (২য় „)

(১১) বাঙ্গালার উপসর্গ।

(১২) বাঙ্গালা বিশেষণ-রহস্য।

(১৩) বিবিধ-প্রসঙ্গ।

(১৪) পাঁচালিকার ঠাকুরদাস।

১৩০৭ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক হইয়া, জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাহার কার্য্য করেন।

বাঁরাট হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত পরিষদের শাখা স্থাপন একমাত্র ব্যোমকেশের চেষ্টাতেই হইয়াছে। তিনিই প্রথম বাঙ্গালা প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ করেন এবং সকলকে এই শ্রেণীর কাজ করিতে অনুরোধ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনেও ব্যোমকেশ রামেন্দ্র বাবুর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া কার্য্য করিয়াছেন।

(২)

এবার যশোহর সহরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মিলন সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা বলিতেছেন। সাহিত্য-সম্মিলন দলাদলির আড্ডায় পরিণত হইতেছে, ইহা যারপর নাই দুঃখের বিষয়। আমরা সকল সভাপতির অভিভাষণ পড়িয়া বুঝিয়াছি,কোন সভাপতিই বাঙ্গালা সাহিত্যের বড় একটা সংবাদ রাখেন না। ইহা যারপর নাই দুঃখের কথা। চন্দ্রনাথ বসু, ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রভৃতি সাহিত্য-সেবিগণ যে সম্মিলনে উপেক্ষিত হন,সে সম্মিলনের পরিণাম এইরূপ হওয়াই সম্ভব। ইহা যেন কর্ত্তাভজাদের সম্মিলন বিধাতা দলাদলীর হাত হইতে এই সম্মিলনকে রক্ষা করুন।

(৩)

এবার লক্ষ্ণৌ সহরে জাতীয় মহাসমিতির যে অধিবেশন হইবে,তাহাতে মহামতি শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের নাম সভাপতিরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, এরূপ একনিষ্ঠ দেশসেবককে কখনও জাতীয় মহাসমিতি সম্মানিত করিবেন না, কেন না, ইহাও যে কর্ত্তাভজাদের সমিতি। বহুদিন পর উক্ত মহাত্মা এবার লাট-সভায় স্থান পাইয়াছেন। এরূপ খাঁটী দেশহিতৈষী এ দেশে বড় বিরল। তাঁহাকে সম্যকরূপে বুঝিতে পারে, এরূপ লোক এদেশে অধিক আছে বলিয়া মনে হয় না। দেখা যাক্, এবার কি হয়? কলিকাতা কংগ্রেস কমিটীও যখন শুধু তাঁহাকে মনোনীত করিলেন না, তখন আর আশা কোথায়? তিনি যে সর্ব্বসম্মতিতে সভাপতি মনোনীত হইতে পারিতেন না, এই ঘটনাতেই তাহা মনে হয়।

(৪)

কীর্ত্তিবাস-স্মৃতি-সংরক্ষণ-সম্মিলনে এবার

নানা অপকীর্ত্তি হইয়াছে বলিয়া শুনা গিয়াছে। সাধুসজ্জনদিগের প্রতি এরূপ অবহেলার কথা শীঘ্র শুনি নাই। কর্ত্তাদিগের অহঙ্কার সংহত এবং খর্ব্ব না হইলে প্রকৃত সাহিত্য-সেবীদের আদর এদেশে কখনও হইবে না। দরিদ্রগণ চির-আঁধারে নিমগ্ন থাকেন, তাহাই যেন ভাল বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে আর নানা কলঙ্কের কথা আমাদিগকে শুনিতে হইত না। প্রকৃত সাহিত্যিকগণ সাধনার আঁধারে লুক্কায়িত হইয়া যাউন। তাহাই ভাল, হতাদর হওয়ার অপেক্ষা বুঝিবা তাহাই ভাল।

(৫)

মদ্যপান এবং ব্যাভিচার নানা মূর্ত্তিতে চতুর্দ্দিকে মাথা তুলিতেছে দেখিয়া আমরা বড়ই ম্রিয়মাণ হইতেছি। ভক্ত বিশ্বাসীদিগের সমবেত চেষ্টার একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। যে সব কলঙ্কের কথা শুনিতেছি, তাহা শুনিবার পূর্ব্বে মৃত্যু হইলেই রক্ষা পাইতাম। শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল নিয়োগী মহাশয় উহা দমনের চেষ্টা করিতেছেন শুনিয়া সুখী হইলাম। ধর্ম্মের নামে সর্ব্বত্রই অধর্ম্মের লীলা বিস্তৃত হইতেছে। বিধাতা দেশকে রক্ষা করুন।

(৬)

ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত লর্ড কিচনার (জন্ম ২৪শে জুন, ১৮৫০, মৃত্যু—৬ই জুন (১৯১৬) এবং চীনের প্রেসিডেণ্ট ইয়ুং-সি-কিয়ুংয়ের মৃত্যু সংবাদে পৃথিবী সচকিত হইয়া উঠিয়াছেন। এই দুই মহাত্মা আপন আপন কার্য্য-বিভাগে নানা সৎকাজের দ্বারা সম্পূজিত হইয়াছিলেন। বোধ হয়, দুই বলিরই অপমৃত্যু হইয়াছে। অপমৃত্যুর সংবাদে আমরা যারপর নাই দুঃখে অভিভূত হইয়াছি। বিধাতা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এ কি চিত্র অঙ্কিত করিলেন ?

(৭)

বিগত ৩০শে আষাঢ়, শুক্রবার, পূর্ব্বাহ্ন ৬ ঘটিকার সময়ে মানবপ্রকৃতি, বনফুল প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা সুবিখ্যাত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়-চৌধুরী, এম-এ, মহাশয় কটকে দেহ-রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার জীবন নানা ঘটনার সমাবেশে পূর্ণ। পুত্রকন্যার প্রতি স্নেহ, পত্নীদের প্রতি ভালবাসা, বন্ধুদের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ তদীয় জীবনের বিশেষত্ব ছিল। সুদীর্ঘকাল গবর্ণমেণ্টের চাকুরী করার পর পেন্সন পাইয়া Star of Utkal ও মৃণ্ময়ী সম্পাদন করিয়াছিলেন। ঘটনা-বৈচিত্র্যে মৃণ্ময়ী উঠিয়া যায়, এবং গবর্ণমেণ্টের কোপে উৎকলের ষ্টারও নির্ব্বাপিত হয়। তিনি গবর্ণমেণ্টের চাকরী করার সময়ে "বঙ্গবাসী" প্রকাশে বিশেষ সাহায্য করেন। জীবনের শেষাংশে কটকে একটী উচ্চ বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া তাহার উন্নতির জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেছিলেন। এই স্কুলের জন্য অত্যধিক পরিশ্রম এবং ষ্টারের মৃত্যুই তাঁহার জীবন-নাশের কারণ। গত বৎসর যে সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহারই পুনরাবির্ভাবে তাঁহার জীবনের অবসান হইল। তাঁহার জীবনের মহত্ত্ব ঘোষণা করিবার জন্য তাঁহার পুত্র-কন্যাগণ ও শেষ-পত্নী জীবিত রহিয়াছেন। বিধাতা সকলের হৃদয়ে শান্তি-ধারা বর্ষণ করুন। নব্যভারতের জন্য তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। আমরা গভীর শোকে অস্থির হইয়াছি, ভবিষ্যতে তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

(৮)

এবার ইষ্টারের ছুটির সময় খানাকুল-কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী রাধানগর গ্রামে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের নেতৃত্বে, রাজার পৌত্রীর পৌত্রী শ্রীমতী হেমলতা দেবী কর্ত্তৃক রামমোহন রায়ের স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। ১৪৩ বৎসর ১১ মাস পূর্ব্বে, শকাব্দা ১৯৯৩, ১১৭৯ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার কৃষ্ণতৃতীয়া তিথিতে, খ্রীষ্টাব্দ ১৭৭২, ২২শে মে ঐ গ্রামে তিনি আবির্ভূত হন। ঐ স্থানে স্মৃতি-স্থাপনের জন্য ৺ঈশানচন্দ্র বসু, 'দুর্গামোহন দাস', মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি প্রভৃতি ব্যক্তিগণ পূর্ব্বে চেষ্টা করিয়াছেন। তৎপরে আমরা যখন (১৩১৫ সালের ৫ই বৈশাখ) খানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজের অধিবেশন উপলক্ষে সেখানে যাই, তখন এ সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করি। ২১শে বৈশাখের (১৩২৩) সঞ্জীবনীতে এবং আষাঢ় মাসের তত্ত্ববোধিনীতে, হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন —"আজ হইতে ৮ বৎসর পূর্ব্বে, ৫ই বৈশাখ ১৩১৫, ১৮ই এপ্রেল ১৮০৯, কৃষ্ণনগর গ্রামে কৃষ্ণনগর সমাজের যে অধিবেশন হয়, এবং যে সভায় নব্যভারতের সম্পাদক শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সভাপতি ছিলেন, তাহাতে ৺মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী উপস্থিত করা হইলে ইহা সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হয়—"জগদ্বিখ্যাত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের জন্মস্থান রাধানগর গ্রামে তাঁহার স্মৃতি-চিহ্ন রাখা নিতান্ত আবশ্যক; অতএব কি উপায় অবলম্বন করিলে উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবে, তাহা অবধারণার্থ নিম্নলিখিত মহোদয়কে লইয়া একটী কমিটী গঠিত হউক।"

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে এত দিন পর এই পুণ্যময় কার্য্যটী সুসম্পন্ন হইতে চলিয়াছে, ইহা যারপর নাই আনন্দের বিষয়। এই কাজে সর্ব্বসাধারণের সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন। রামমোহন সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, সর্ব্বশ্রেণীর লোকের এই মহৎকার্য্যে সাহায্য করা উচিত। আশা করি, মুক্ত হস্তে সকলে সাহায্য করিয়া অক্ষয় পুণ্যসঞ্চয় করিবেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, ঈশান চন্দ্র বা মহেন্দ্রনাথ দেহত্যাগ করিয়াছেন। সকল সাধুভক্তের এবং ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ এই মহৎ কার্য্যে বর্ষিত হউক।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন

পৃথ্বীরাজ। ঐতিহাসিক মহাকাব্য। মূল্য ২৲। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত লেখক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, বি-এ বিরচিত।

এই পুস্তক সম্বন্ধে নবম সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অভিভাষণে লিখিত হইয়াছে— 'শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বাবুর পরিশুদ্ধ লেখনী হইতে সম্প্রতি পৃথ্বীরাজ নামক যে ঐতিহাসিক কাব্য প্রসূত হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য সমূহের মধ্যে মহনীয় আসন

প্রাপ্ত হইবে।" এইরূপ ঘোষণার পর এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু লিখিতে ইচ্ছা হয় না। বিশেষতঃ এই পুস্তকের দুই অধ্যায় নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতেই পাঠকগণ এই গ্রন্থের কতকটা পরিচয় পাইয়াছেন। যোগীন্দ্রনাথকে বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষী সুধীবৃন্দ সকলেই জানেন। অধিক বক্তব্যের আবশ্যকতা কি?

কোন দেশেই মহাকাব্য অধিক প্রকাশিত হয় নাই। হোমরের ইলিয়াড, মিল্টনের প্যারাডাইস্ট লষ্ট, বেদব্যাসের মহাভারত, বাল্মীকির রামায়ণ, কালিদাসের রঘুবংশ কুমারসম্ভব প্রভৃতির ন্যায় গ্রন্থ পৃথিবীতে অল্পই হইয়াছে। মেঘনাথ বধ, বৃত্রসংহার এবং পলাশীর যুদ্ধের ন্যায় কাব্যও বাঙ্গালা ভাষায় অধিক নাই। যোগীন্দ্রনাথ মহাকাব্য লিখিতে প্রয়াসী হইয়া যে বাঙ্গালা ভাষার একনিষ্ঠ-সাধনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার লেখা অক্ষয় হউক।

মহাকাব্যের লক্ষণ এই—"সর্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রৈকো নায়কো সুরঃ। সদ্বংশঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি ধীরোদাত্তগুণান্বিতঃ॥ এক বংশভবা ভূপাঃ কুলজা বহবোঽপিবা। শৃঙ্গার বীরশান্তানামেসোঽঙ্গীরস ঈষ্যতে॥ অঙ্গানি সর্ব্বেঽপি রসাঃ সর্ব্বে নাটক সন্ধয়ঃ। ইতিহাসোদ্ভবং বৃত্তমন্যদ্বা সজ্জনা-শ্রয়ম॥ চত্বারস্তস্য বর্গাঃস্যুস্তেষ্বেকঞ্চ ফলং ভবেৎ। আদৌ নমস্ক্রিয়াশীর্ব্বা বস্তুনির্দ্দেশ এব বা॥ ক্বাচিন্নিন্দা খলাদীনাং সতাঞ্চ গুণ কীর্ত্তনম্। একবৃত্তময়ৈঃ পদ্যৈরবসানেঽন্যবৃত্তকৈঃ। নাতি স্বল্পা নাতিদীর্ঘাঃ সর্গা অষ্টধিকা ইহ। নানা বৃত্তময়ঃ ক্বাপি সর্গ কশ্চন দৃশ্যতে॥"

যোগীন্দ্রনাথ একজন সংস্কৃত পণ্ডিত, সংস্কৃত কলেজের একজন বিশিষ্ট ছাত্র। তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে অলঙ্কার শাস্ত্র অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মনে হয়, সকল রস এই গ্রন্থে পরিস্ফুট হয় নাই। বিশেষতঃ সংযুক্তা এবং পৃথ্বীরাজের চরিত্র যে সম্যকরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাও মনে হয় না। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, আরো কেন বিবৃত হইল না, মনে হয়, অবসর পাইয়াও গ্রন্থকার কেন স্থায়ীভাব পাঠকের হৃদয়ে চিত্রমুদ্রিত করিতে সমর্থ হইলেন না? কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, বিষয়-নির্ব্বাচনে গ্রন্থকার সৌভাগ্যশালী। তিনি "হিন্দুর দুর্গতি-মূলে দুর্ম্মতি হিন্দুর"—একথা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার লেখনী এত নির্ভীক ও সুন্দর ভাবে চলিয়াছে যে, পড়িতে পড়িতে লেখকের দেশানুরাগের পরিচয়ে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারা যায় না—

"দেখ, বৎস! কি পার্থক্য হিন্দু, মুসলমানে।
পরাজিত জয়পাল, অভিমান ভরে,
পশিলা অনলে. আর পরাজিত ঘোরী
করিয়াছে প্রাণপণ জিনিতে হিন্দুরে।
না পারি বুঝিতে, বৎস! শিরোদেশে যার
দাঁড়াইয়া হিমাচল মহারুদ্র রূপী,
পদপ্রান্তে গর্জ্জে সিন্ধু তাণ্ডব লীলায়,
যে দেশে জনমে সিংহ, শার্দ্দূল, গণ্ডার,
যে দেশে জনমে শাল, তাল বজ্রবপু,
সে দেশে জনম লভি কেন আর্য্যসুত
হেন লঘুচেতা, স্থৈর্য্য দৃঢ়তা-বিহীন!
পুরুষ ত তিনি, চিনি সঙ্কটে বিপদে
অটল, অচল, ধীর, পরাজয়ে জয়ী,
আত্মহত্যা আচরিয়া নিষ্কৃতি-প্রয়াস
নহে রাজধর্ম্ম।"

শিষ্য কহিলেন—

"শুনিলাম, বহুরাজা হিন্দুস্থানবাসী,
চৌহানের জয়লাভে হয়ে ঈর্ষান্বিত,

করিয়াছে বাক্যদান সাহায্যের তরে।
বলেছেন জয়চন্দ্র, পৃথ্বীরাজ যবে
দেখিবেন রণক্ষেত্র, রাঠোর সৈনিক,
হয়ে সম্মিলিত জম্মু সেনাদল সনে,
আক্রমিবে ভীমবলে দিল্লীর বাহিনী।"
দেখিয়াছি ছদ্মবেশে তুরুকের সেনা
শার্দ্দুল সদৃশ মূর্ত্তি; ভক্ষ্য তাহাদের
অর্দ্ধপক্ক শূল্যমাংস, কলির রাক্ষস।
ডামাস্কাস, ইস্পাহান, খোরাসান হ'তে
আনিয়াছে ঘোরীরাজ শূল, বাণ, অসি।
রুমবাসী কর্ম্মীদল করিছে গঠন
লৌহবর্ম্ম, শিরস্ত্রাণ অভেদ্য শায়কে।
তাতার, তুরষ্ক, বক্ষ, আরব হইতে,
আনিয়াছে বহু অশ্ব, অচিরাৎ তারা
পঙ্গপাল সম আসি গ্রাসিবে ভারতে
না জানি, এবার দেব, কি হইবে গতি।"

অন্যত্র—

"পিতৃ-পিতামহ হ'তে শুনিতেছি মোরা,
যে হ'ক যে হ'ক রাজা, আমরা কৃষক
সকলের ভক্ষ্য মোরা কি জানি যুদ্ধের?"
"সন্ন্যাসী ঠাকুর।
কি বলিছ? কেন হেন দেখাইছ ভয়
আসিবে তুরুকসেনা, কি ক্ষতি মোদের?
জম্মে ছাগ মাংস দিতে, নর দেয় বলি
ব্যাঘ্র করে বিদারিত, গ্রাসে অজগর
এই মাত্র ভেদ' কি মৃত্যু প্রতিস্থলে।

অন্যত্র—

" * * বুঝেছি ব্রাহ্মণ॥
চৌহানের চর তুমি; এসেছ কৌশলে
সেনা, অর্থবল মোর করিতে নিয়োগ
চৌহানের শত্রু জয়ে; বরিতে আমারে
দিল্লীর সামন্ত পদ; বৃথা এ প্রয়াস
নহি অর্ব্বাচীন আমি, নহি অবিবেকী;
না আছে বিবাদ মোর তুরুষ্কের সাথে;
চৌহানের পক্ষলয়ে তবে অকারণে
কেন ঘাঁটাইব তায়? ভুলি নাই মোরা,
অহিংসক বৌদ্ধ প্রতি যত অত্যাচার
করিয়াছে হিন্দুগণে।" * *

অন্যত্র—

" * * মোরা সংসার-বিরাগী
সন্ন্যাসী সম্বন্ধহীন পৃথিবীর সনে।
কি ক্ষতি মোদের যদি আসে তুর্ক-সেনা!
নাহি আমাদের গৃহ, নাহি ধন, ভূমি,
কি লইবে তারা? মোরা রয়েছি যেমন
তেমনি রহিব।"

অন্যত্র—

" * * জাতিবর্গে আর্য্যাবর্ত্তবাসী
অবজ্ঞা, উপেক্ষা করে দাক্ষিণাত্য জনে
কিষ্কিন্ধ্যা নিবাসী বলি করে উপহাস।
হয় যদি নিগৃহীত তুরুকের হাতে
কি ক্ষতি মোদের তাতে! ভাঙ্গুক গরব।"

গুরু কহিলেন—

বুঝিলাম, বৎস, দৈব বটে প্রতিকূল।
যবনের আয়োজনে নাহি ছিল ভয়;
ভয় এই দেশব্যাপী ঔদাস্থ্যে হিন্দুর।"

বুঝিয়া এই সব স্মরণে কবি বলিতেছেন

"চলিয়া গিয়াছে দিন,
স্মৃতিমাত্র আছে তার,
তা'ও, বুঝি, ক্রমে, লুপ্ত হয়;
ভারতের কবিগণ
গাইছেন অন্য গান,
বীরকীর্ত্তি গেয় কারও নয়।
শয্যা এবে রণক্ষেত্র
নূপুরে দুন্দুভি-ধ্বনি,
অবিরাম ছুটে ফুলবাস;
ভার(ই) অনুকূল কথা,
শুনি প্রীত সর্ব্বজন,
কে শুনিবে আমার এ গান?
নিঃসঙ্গ বিহগ সম,

গাইব আপন মনে,
ডাকিয়া শুনাব আপনারে ;
সার্থক হইবে শ্রম,
একজন (ও) শ্রোতা যদি
পাই এই ভারত মাঝারে॥"

কি তীব্র মর্ম্মোক্তি ; বোধ হয় যেন যোগীন্দ্রনাথের শিরা ছিঁড়িয়া উষ্ণ রক্ত বিনির্গত হইতেছে। ধন্য কবির স্বদেশানুরাগ।

আমরা ভাবিতেছিলাম, এ কবি, এদেশে জন্মিলেন কেন ? যে দেশে বঙ্কিমচন্দ্র এবং মাইকেলের হৃদয় লোকেরা বুঝিয়াও বুঝে নাই, যে দেশে বিদ্যাসাগর অনুসৃত নয়, রামমোহন অনুকৃত নয়, সে দেশে এহেন কবির স্বদেশ-প্রেম কে বুঝিবে ? পৃথ্বীরাজ কাব্য শোণিতাক্ষরে লেখা, কিন্তু এ দেশে তাহার আদর হইবে কি না, কে জানে ?

আমাদের সন্দেহ হইতেছিল, পৃথ্বীরাজ কাব্য, বা ইতিহাস ? যাহা ছিল স্বপ্নের কথা, তাহা সত্যে ফলিয়াছে ; যাহা ছিল সত্যগাথা, তাহা কাব্যে শোভিত হইয়াছে কাব্য ও ইতিহাসের এরূপ সংমিশ্রণ "পলাশীর যুদ্ধ" ভিন্ন আর কোন বাঙ্গালা কাব্যে দেখা যায় নাই।

নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধের অক্ষয় বাণী —
"কোথা যাও ফিরে চাও সহস্রকিরণ,
বারেক ফিরিয়া চাও ওহে দিনমণি,
তুমি অস্তাচলে দেব করিলে গমন
আসিবে ভারতে চির বিষাদ রজনী !
প্রভৃতি কথার প্রতিধ্বনি এই বাক্যে পাওয়া যায়—

"বদ্ধাঞ্জলি তুঙ্গাচার্য্য, নতজানু হয়ে,
চাহিয়া আকাশ-পানে কহিলেন পুনঃ
"হে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডপতি ! অন্তর্যামী তুমি ;
জানিছ অন্তর-কথা। ছিল অভিমান,
পৃথ্বীরাজ সংযুক্তারে লয়ে, পুনর্ব্বার
রাম-সীতা বশিষ্ঠের দেখাব মিলন ;
ভাঙ্গিলে সে দর্প দেব, দর্পহারী তুমি।
কিন্তু যদি কর্ম্মার্জ্জিত থাকে পুণ্য কোন(ও)
তবে, এ বাসনা মোর পূর্ণ করো, দেব !
পতিতপাবন তুমি, করেছ উদ্ধার
কতই পতিত জাতি, পতিত ভারতে
উদ্ধার করিও তবে। হিন্দু নর, নারী
দ্বিধাহীন হয়ে যেন পারে বুঝিবারে,
হিন্দুর দুর্গতি-মূলে দুর্ম্মতি হিন্দুর।"

এই মহাকাব্যখানি বর্ত্তমান-সময়োপযোগী এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহাতে সকল মহাকাব্যের উত্থান-পতনের সত্য-কাহিনী কীর্ত্তিত। মার্জ্জিত রুচি, বিশুদ্ধ ভাষা এবং কাব্যোচিত সহৃদয়তায় গ্রন্থকার ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিবার এক অপূর্ব্ব সম্মোহন চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ভাষায় বুঝাইবার শক্তি নাই, ইহা বর্ত্তমান কালোপযোগী এক মহা সম্মোহন-মন্ত্র। পলাশীর যুদ্ধ কাব্য লিখিয়া নবীনচন্দ্র যদি এদেশে অমর হইতে পারেন, তবে যোগীন্দ্রনাথও পৃথ্বীরাজ মহাকাব্যের দ্বারা অমর হইবেন। কিন্তু এই দুই গ্রন্থেও আকাশ পাতাল প্রভেদ। যোগীন্দ্রনাথ সাত্ত্বিক কবি। রজোগুণের স্থলে সাত্ত্বিকতা এই গ্রন্থের প্রতি ছত্রে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। স্বদেশপ্রেমময় সাত্ত্বিকতাপূর্ণ এরূপ মহাকাব্য এদেশে আর প্রকাশিত হয় নাই। বলিতে পারি কি যে, এ গ্রন্থখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকা-ভুক্ত হওয়ার একান্ত যোগ্য পুস্তক ?

যোগীন্দ্রনাথ আমাদের বাল্যবন্ধু, অথবা চিরবন্ধু। প্রতিভায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, একথা আমরা বলিতে চাহি না, বলিতে পারিও

না। কিন্তু নীরব স্বদেশপ্রেমে তিনি যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাঁহার এই গ্রন্থ ঘরে ঘরে, স্কুলে স্কুলে, কলেজে কলেজে প্রচারিত এবং প্রতিষ্ঠিত হউক। নানা কারণে বিস্তৃত সমালোচনা করিলাম না। বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক

২। মহিম্নঃ স্তোত্রম। চতুর্ধুরীণোপ-নামক শ্রীমদনমোহন শর্ম্মণা সম্পাদিতম্, টীকা ও অনুবাদ সহ। কি ব্রাহ্মণ. কি শূদ্র, সকলেরই ইহা অবশ্য-পাঠ্য পুস্তক।

৩। A Brief History of the Rudrakar Zeminder Family. Published by Srimanta Kumar Chakravarty. উপন্যাসের ন্যায় সুমিষ্ট করিয়া এই পুস্তকখানি লিখিত।

৪। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন। নবম অধিবেশন—যশোহর ১৩২৩ সাল। সভাপতির অভিভাষণ গবেষণাপূর্ণ উপাদেয় বিবরণ।

৫। Heavings of Heart. R. M Bose. God and Man, Society, Love, Science and Philosophy, My God, My Keshub and Myself—এই সকল বিষয়ে ছোট ছোট উপদেশ। বিশ্বাসীর বিশ্বাসের কথা, পড়িয়া উপকৃত হইলাম।

৬। Employment for the Middle classes in India and the Problems of popular education and industrial development. Price one anna. নামেই বিবৃত। সুন্দর পুস্তক।

৭। বিফল উদ্যম। মূল্য ৵০ আনা। জ্ঞানানন্দজীর উদ্যমের বিফলতা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৮। দই-খই। শ্রীরাধাবিনোদ সাহা। মূল্য ৷৷০ আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তকের মূল্য বড় বেশী হইয়াছে। লেখা মন্দ নহে।

৯। মাধবী শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত প্রণীত। মূল্য ১৲। সাত্বিকতা-পূর্ণ পুস্তক হৃদয়ের গভীর ভক্তি এবং সদ্ভাব এই পুস্তকের ছত্রে ছত্রে অভিব্যক্ত হইয়াছে। পড়িয়া বিমল আনন্দ পাইলাম। একটী কবিতা উদ্ধৃত করিলাম—

হৃদয়-বীণার তারে
দিয়েছিলে যেই তান,
তোমারি মহিমা তাহে
করিনু নিয়ত গান।
সুযশ-অযশ-হেলা
স্নেহ-দয়া-অনাদর,
পুলকে অরপি সবি
তোমারি চরণ' পর।
আমার কিছুই নাই
তুমি বিনে প্রেমময়!
তোমারি গৌরবে শুধু
ভরে গেছে এ হৃদয়।
তোমারি ইচ্ছায় প্রাণ
পেয়েছে তোমারি জয়,
এ তুচ্ছ জীবন হোক্
তোমারি ইচ্ছায় লয়।

১০। মন্দির। কিরণচাঁদ দরবেশ। মূল্য ১৷৷০। দরবেশের লেখা নব্যভারতের পাঠকগণ পড়িয়াছেন দরবেশ একজন ভক্তিপিপাসু ব্যক্তি, তাঁহার লেখার উদ্দেশ্য —ধর্ম্মপ্রচার। এ প্রকার উদ্দেশ্য লইয়া অতি অল্প লোকেই আজকাল কবিতা লিখিয়া থাকেন। দরবেশের কাব্য-সাধনার অর্থ ধর্ম্ম-সাধনা।

"তুমি চিন্ময় চিন্ময় চিন্ময় হে
মম তনু-মন-প্রাণ-জ্ঞান তন্ময় হে
তুমি আনন্দ-ঘন নন্দিত হে
মম অন্ধ-জীবনে চির বন্দিত হে।"

অন্যত্র—

"তুমি হে আমার আলো আঁধেয়ার
তনুর তনিমা নাশিতে;
তুমি হে আমার সুশীতল ছায়া,
ভানুর কিরণ শাসিতে;
তুমি যে আমার সুবিমল বারি
প্রাণের পিপাসা মিটাতে;
তুমি হে আমার অন্ধের নড়ি,
সান্ধ্য-প্রদীপ ভিটাতে।"

অন্যত্র—

"যতই জাগিবে 'আমি আমি' সাড়া,
ততই যে তুমি পড়িবে গো ধরা,
বিয়োগ আনিবে যোগের পশরা,
ছায়া পানে কায়া ধরিতে;
অকালের যেথা নাহিক বোধন
মহাকাল সেথা হয় না চেতন,
রসের লাগিয়া রূপের জনম,
তাই সাধ নাই মরিতে।

গভীর যোগের অবস্থায় দরবেশ এইরূপে কত সুন্দর কথাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পড়িতে বসিলে তন্ময় হইয়া যাইতে হয়। গ্রন্থকারের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।

পাঠক দেখুন শেষ কবিতাটী কত সুন্দর—

ভাবাতীত তুমি বঁধু, ভাবাতীত তুমি,
তরঙ্গের পরপারে চির স্থির তুমি।
অনন্ত ভাবের স্রোতে দিগন্ত প্লাবিয়া,
বহিলে অনন্ত কাল আমারি লাগিয়া।
অনন্ত হিল্লোলে খেলে কত মধু ভাব,
সে মধুর মধু নহে তোমার স্বভাব।
আমারে হারায়ে তব ভাবের মহরা,
আজি তুমি ভাবাতীত, আমি দিছি ধরা।
কমনীয় তনু মম তোমার মন্দির,
চরণ-চুম্বিত-ধারা লীলা-কালিন্দীর।
থির এ মন্দির মাঝে নিথরে বসিয়া,
অথির-তরঙ্গ-রঙ্গে খেলিছ হাসিয়া।
ধন্য মম অনুপম মন্দির অন্দর,
ধন্য তুমি ভাবাতীত সহজ সুন্দর।"

১১। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন। অষ্টম অধিবেশনের বিবরণ। রাজসাহী-সাহিত্য-সম্মিলনের বিবরণ পড়িয়াছিলাম, তৎপর এই সুবিস্তৃত বিবরণ পাইলাম, আর বিবরণ পাই নাই। এই বিবরণ খানি বড়ই সুন্দর হইয়াছে। চিত্র-সমাবেশে গ্রন্থখানির মূল্য বড়ই বাড়িয়াছে। প্রতি বৎসর এইরূপ বিবরণ বাহির হইলে সাহিত্যের যে কত উপকার হয়, তাহা সংক্ষেপে লেখা যায় না। সকল প্রবন্ধ ভাল না হইলেও, ইহা পাঠে যে অভিজ্ঞতা জন্মে, তাহা উপেক্ষার জিনিস নয়। যাঁহাদের চেষ্টায় এবং অদম্য পরিশ্রমে এই কার্য্য-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে প্রাণের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।

১২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা: শ্রীদেবেন্দ্র-বিজয় বসু প্রণীত, পদ্যানুবাদ ও ব্যাখ্যা সমেত, মূল্য ১॥০। ৪র্থ ভাগ।

এই একখানি গ্রন্থ লিখিতে দেবেন্দ্র-বিজয় চক্ষু রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে, পেন্সন নিতে বাধ্য হইয়াছেন; তবু এখনও গীতা শেষ হয় নাই। এরূপ পাণ্ডিত্য এবং গবেষণা পূর্ণ পুস্তক এদেশে আর প্রকাশিত হয় নাই। গীতা এখন সকলের নিকট আদৃত হইয়াছে—উপনিষদ ও বাইবেলের ন্যায় নিত্য-পাঠ্য হইয়াছে। দেবেন্দ্র-বিজয়ের গীতা-ব্যাখ্যা যে সর্ব্বত্র আদৃত হইবে, আমরা সে আশা রাখি। ধার্ম্মিক-দিগের নিকট এ গ্রন্থের যে কত মূল্য, তাহা ভাষায় ব্যাখ্যাত হইবার নহে। সংক্ষেপে সব কথা লেখার শক্তি নাই। এই গ্রন্থের যোগ্য তুলনা এই গ্রন্থই—ইহা অন্য তুলনা-রহিত, অন্য উপমা-রহিত। বিধাতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।

নিবেদন।

বিশ্বের বিধাতা যিনি করুণা তাঁহার
তুমি যদি চাহ অনুক্ষণ,
চেয়ে দেখ উপস্থিত দুয়ারে তোমার
কৃপার ভিখারী কতজন।

ওই যে পথের ধারে আছে দাঁড়াইয়া
দীনহীন বিষণ্ণ বদন,
জীর্ণশীর্ণ রুগ্নদেহ, উহাকে হেরিয়া
থেমেছিল তোমার চরণ?

চেয়ে আছে মুখপানে বড় আশা করে
কৃপার কটাক্ষ তব মাগি,
আর কিছু নাহি হ'ক বারেকের তরে
একটী স্নেহের ডাক লাগি।

ঘৃণায় ফেলে কি তারে চ'লে গেছ তুমি
বন্ধুসনে হাসিয়া হাসিয়া?
ভেবেছ কি অপবিত্র তার স্পৃষ্ট ভূমি,
তাই সেথা চাহনি ফিরিয়া?

অই যে আশ্রম কত করিছে নির্ভর
তোমাদের কৃপার উপরে,
আর্ত্তের সেবক যারা যুড়ি দুই কর
কিছু দান মাগিছে কাতরে,

হে ধনিন! পশেছে তা শ্রবণ-বিবরে?
হ'য়েছে তা নয়নগোচর?
বিলাসের চিন্তা ছেড়ে দিনেকের তরে
সে দিকে কি ফিরেছে অন্তর?

অই যে বিপদে পড়ি করিছে চীৎকার
অসহায় মানব-সন্তান,
হে স্বাধীন! তারে কিহে করিতে উদ্ধার
কাঁদিয়া উঠিছে তব প্রাণ?

জনক জননী বৃদ্ধ, সোদর তোমার
দেশে তার রয়েছে পড়িয়া,
ছিন্নবাসে, অর্দ্ধ অন্নে, নিত্য অশ্রুধার
ঝরিতেছে নয়ন বাহিয়া

প্রবাসে করিয়া তুমি অর্থ উপার্জ্জন
ভাসিতেছ বিলাস-সাগরে,
কিছু কি আপন ব্যয় করিয়া কর্ত্তন
রাখিবে না তাহাদের তরে?

দেশের দুর্গতিরাশি করিবারে দূর
উৎসাহ জাগিছে আজি চিতে।
বিধির প্রদত্ত তব সামর্থ্য প্রচুর
তার তরে পার ঢেলে দিতে?

শত অসুবিধা মাঝে গ্রামবাসী তব
করিতেছে জীবন যাপন,
তোমারি আপন জন তাহারা যে সব
সেদিকে কি ফিরেছে নয়ন?

জলাভাবে শুষ্ক কণ্ঠ, সহিতে না পারি
নিদাঘের দারুণ পীড়ন,
পান করি কর্দ্দমাক্ত পূতিগন্ধি বারি
করিতেছে তৃষ্ণা নিবারণ।

ওলাদেবী জ্বরাসুর সময় বুঝিয়া
ছাড়িতেছে বিকট হুঙ্কার,
গৃহে গৃহে অই শোন গিয়াছে পড়িয়া
মর্ম্মভেদী কিবা হাহাকার।

কাষ্ঠ-পুত্তলিকা সম কুলাঙ্গনাগণ
পাংশুবর্ণ মলিন বদন,
দিবানিশি যেন এক চিন্তায় মগন
মূর্ত্তিমতী অশান্তি যেমন;

ক্ষীণ-উদর শুষ্কদেহ কিম্ভুত মুরতি
তাহাদের অঙ্কে শিশুগণ,
মুহূর্ত্তের তরে, হেরি, তব এক বার
কাঁপিয়া কি উঠে নাই মন?

অই চেয়ে দেখ হায় দুর্ভিক্ষ শাসনে
লক্ষ জন দেশের তোমার,
কি যাতনা ভুগি বস্ত্রাভাবে, অনশনে
দিবানিশি করিছে চীৎকার।

জনক জননী আর না হেরি উপায়
উদ্বন্ধনে ত্যজিতেছে প্রাণ,
শূন্যপানে চেয়ে চেয়ে বিনারোগে হায়
অনাহারে মরিছে সন্তান।

লজ্জায় দারিদ্র ওহ উলঙ্গ রমণী
ভিক্ষায় পারে না বাহিরতে,
স্বপ্নে ছিল একদিন, যাহার ধরণী
সে বুঝি গো নাই পৃথিবীতে!

তুমি পুত্র তার, অই কঙ্কালরূপিণী
মাতা তব, তোমার উপর
চেয়ে দেখ আজি তব জননী দুঃখিনী
করিতেছে একান্ত নির্ভর।

সে আশা বিফল হবে? ক্রন্দন তাহার
করিবে না স্পর্শ তব প্রাণ?
লভিবে না আত্মতৃপ্তি চরণে মাতার
করি আজ উপযুক্ত দান?

ধন্য হবে পুণ্যে তব আজি মাতৃভূমি,
এ সুযোগ ছেড় না কখন,
স্বার্থ সুখ বিনিময়ে ধন্য হও তুমি
ধন্য হ'ক তোমার জীবন।

অতএব হে মানব অপরের তরে
আপনারে কর নিয়োজিত,
আপনি রহিবে তবে বিধাতার বরে
আজীবন সৌভাগ্যমণ্ডিত।

শ্রীনলিনীনাথ দাসগুপ্ত।

যশোহর সাহিত্য-সম্মিলন।*

এবার নানাকারণে যশোহর-সাহিত্য-সম্মিলনে যাইতে পারি নাই। তথাপি সম্মিলনের অহ্বান হইতে যে সকল বিষয় লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, তাই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

এক অশুভক্ষণেই যেন কলিকাতার সম্মিলন-সময়ে যশোহরের পক্ষ হইতে সম্মিলন আমন্ত্রিত করা হইয়াছিল। বর্দ্ধমান তাহা যেন ছিনাইয়া লইয়া গেল। তারপরে বর্দ্ধমান সম্মিলনান্তে যশোহরের ডাক টিকিল বটে, কিন্তু সেই সময়াবধি নানারূপ বিভ্রাট ঘটিতে লাগিল।

সভাপতি নিয়োগ সম্বন্ধে এত ঢলাঢলি বোধ হয় আর কোন সম্মিলনে কুত্রাপি হয় নাই। শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়াছিলেন—তিনি বর্দ্ধমানাধিপতিকেই সভাপতিত্বে মনোনীত করিয়া আসিলেন। এমন কোন কার্য্য হইতে পারে না, যাহা সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ সভাপতি হইলেন, একথা প্রচারিত হইলে কোন কোন স্থলে একটু টীকা টিপ্পনী হইয়াছিল; কিন্তু এটা যে পরমার্থতঃ হইয়াছিল, এমন বোধ হয় না। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্বয়ং একজন কবি; বর্দ্ধমানের সাহিত্য-সম্মিলনেও তিনি সাহিত্য-সেবকদের সঙ্গে অমায়িক ব্যবহার করিয়া নিজের মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সাহিত্যের পুষ্টিকল্পে তিনি সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত—সেদিনও সাহিত্য-পরিষদের হস্তে দর্শন বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখার জন্য বার্ষিক ২৫০৲ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এমন অবস্থায় সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করা খুব শোভনই হইয়াছিল। জানিনা কি জন্য, টীকা টিপ্পনীতে অভিমান বশতঃ কিম্বা অপর কোন কারণে তিনি ঐ পদ গ্রহণে অস্বীকার করিলেন।† এই ব্যবহারে আমরা প্রকৃতই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম। তার পর যখন শুনিলাম, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয় সভাপতি পদে মনোনীত হইয়াছেন, তখনও উপযুক্ত ব্যক্তিকেই নিযুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী একজন ঘোরতর সমাজ-সংস্কারক এবং হয়ত তদীয় অভিভাষণে (শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ন্যায়) তিনি আমাদের আপত্তিকর দু একটা কথার অবতারণা করিতেন। কিন্তু একজন তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার ফলে যে সকল সংস্কার হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া লইয়াছেন, তিনি যদি স্বীয় বক্তৃতায় তদ্বিষয়ক দুই একটা কথা বলিয়াই ফেলেন, ইহাতে ভিন্নমতাবলম্বী কাহারও আপত্তি থাকিলেও, ইহা স্বাভাবিক বলিয়া অশোভন বলা যায় না। আমরা নিত্যই ইহা সহিয়া আসিতেছি—তাই পণ্ডিত

* এই প্রবন্ধটী যথা সময়ে প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে আমাদের হস্তগত হইতে বিলম্ব হওয়ায় গত সংখ্যায় প্রকাশিত হয় নাই। না. সা।

† তাঁহাকে বাঁকীপুরে সভাপতি করিবার প্রস্তাব কেহ কেহ করিতেছেন; কিন্তু পদত্যাগ পত্রে তিনি যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, তিনি কুত্রাপি সম্মিলন-সভাপতির পদ গ্রহণে স্বীকৃত হইতে পারেন না। তবে ভিতরে কোনও রহস্য আছে কিনা, জানি না।

শিবনাথ সভাপতি হইবেন, ইহাতে সুখীই হইয়াছিলাম। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহিত্য-সাধনা সর্ব্বতোমুখী—বক্তারূপে, সম্পাদকরূপে, কবিরূপে, উপান্যাসকাররূপে তিনি বঙ্গবাসীর প্রভূত সেবা করিয়াছেন; তাহার গ্রন্থ স্কুলপাঠ্য হইয়াছে; বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে বহুশঃ বাঙ্গালা পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। তবে তিনি সাহিত্য বিষয়ক সভা-সমিতিতে বড় একটা যোগ দেন নাই—তাহাও সম্ভবতঃ বার্দ্ধক্য হেতু, অথবা স্বীয় অশেষ কর্ত্তব্যের গুরুত্বে অবসরাভাব নিবন্ধন। তাই তাঁহার ন্যায় বর্ষীয়ান বহুদর্শী সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী সভাপতি হইবেন, ইহাতে সম্মিলন জাকিয়া উঠিবে বলিয়াই মনে আনন্দ হইয়াছিল। কিন্তু হায়, তিনিও ঐ পদ পরিত্যাগ করিয়াই ফেলিলেন!

তখন শারদীয়া পূজার ছুটিতে কলিকাতায় ছিলাম—সভাপতি কে হইবেন, ইহা লইয়া সাহিত্যিক মহলে জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল। মহামহোপাধ্যায় আচার্য্য সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিয়োগ সম্বন্ধেও কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। এতদ্বিষয়ে কলিকাতায় দুই চারি জন সাহিত্য-বান্ধবের প্ররোচনায়—রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার মহাশয়ের নিকট সভাপতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলাম। তাহাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম প্রস্তাবিত হইয়াছিল:—*

১। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়। (এযাবৎ কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্মিলনে সভাপতি হন নাই—অথচ পণ্ডিতরাজের ন্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপযুক্ত আর বড় দেখা যায় না।

২। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর। (পদে, বিদ্যায়, সাহিত্য বিষয়ে ও প্রবীণতায় বঙ্গে ঈদৃশ ব্যক্তি অতি বিরল।)

৩। লালগোলার রাজাবাহাদুর। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তথা বঙ্গসাহিত্য এই মহাত্মার নিকটে ঋণী; তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এই এক প্রকৃষ্ট উপায়। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহোদয়ও আমার এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছিলেন।

৪। শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। (কেবল ভাইস চ্যানসেলার বলিয়া নয়—চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মিলনে তদীয় সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা শ্রবণে এবং "ভারতবর্ষে" তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, বিশেষতঃ কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলনে অন্যতর সম্পাদক ভাবে তাঁহার কার্য্য অবলোকনে সম্মিলনের সভাপতিত্বে তদীয় যোগ্যতার পরিচয় পাইয়াছিলাম। তাঁহার নিযুক্তিতে স্কুল কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রবর্গের মধ্যে সম্মিলনে যোগদান বিষয়ে একটা প্রবল উৎসাহ-স্রোত প্রবাহিত হইবারও সম্ভাবনা ছিল।)

শ্রীযুক্ত যদুনাথ বাবু ইহার উত্তরে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার অংশ বিশেষ এস্থলে উদ্ধৃত করা হইতেছে:—*

"All that you say is true, but the reception committee here was

* কোন কারণে তাঁহাদের মধ্য হইতে একজনের নাম এস্থলে উল্লিখিত হইল না।

* আমি যথাসাধ্য চিঠিখানি বঙ্গ ভাষায় লিখিয়াছিলাম; কিন্তু যদুনাথবাবু ইংরাজী ভাষায় উত্তর লিখিয়াছিলেন। যদুনাথ বাবু একজন দেশহিতৈষী বঙ্গসাহিত্যসেবী শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় যে কেন উত্তর দিলেন না, ইহা সম্যক্ বুঝিতে পারি নাই। এখনও কি আমরা মাতার আসনে বিমাতাকে বসাইতে কুণ্ঠিত হইব না?

put to much trouble in the matter of selecting a President and ultimately they thought any body was as good as the rest. I proposed the name of Jadavesw-r but was out-voted here. Satyendranath was once elected. Nobody knows Lalgola Raja here. A member proposed Devaprasad and he was out-voted. * * * Though I have been cultivating Bengali and Sanskrit literature for the last 40 years, I did not know that there was so much party-feeling among literary men. You can't propose a single name without meeting opposition. Every one at Calcutta is against the rest. * * *

এই চিঠিখানির উদ্ধৃতাংশ হইতে যশোহরের অধিবাসিগণের সাহিত্য বিষয়ক অভিজ্ঞতার অবস্থা বুঝা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কখন সভাপতি হইয়াছিলেন, আমরা অবগত নই। বিগত আটটী সম্মিলনে সভাপতি কে কে ছিলেন, ঐ খবরও যশোহরের মহাত্মাগণ রাখেন নাই। লালগোলার বদান্য রাজবাহাদুরের অবদান-কাহিনী তাঁহাদের কর্ণগোচরই হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর ও মাননীয় দেবপ্রসাদ ত উড়িয়াই গেলেন !!

যাহা হউক, বড় দুঃখে এতদুত্তরে লিখিয়াছিলাম, যেখানে চুতচন্দন ছিন্ন হইয়া শাখোটবৃক্ষের সংবর্দ্ধনা হয়--সেই দেশকে নমস্কার !! যদুনাথবাবুকে যাঁহারা যশোহরের সর্ব্বেসর্ব্বা ভাবেন, তাঁহারা বুঝিবেন যে, তাঁহারও প্রস্তাব ঐ স্থানে টিকে নাই।

উদ্ধৃতাংশের শেষার্দ্ধ সম্ভবত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ঐতিহাসিক শাখার সভাপতিত্ব সম্বন্ধে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে। এ আর এক বিষম ব্যাপার। নগেন্দ্রবাবুর কোন কোন সিদ্ধান্তের সঙ্গে কোন কোন ব্যক্তির মতভেদ থাকিতে পারে। তাই বলিয়া তাঁহাকে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহোদয়দ্বয়ের পরেও কি ইতিহাস-শাখার সভাপতি করিতে আপত্তি হওয়া উচিত? আমি এই অবস্থায় নগেন্দ্রবাবুকে পদত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম—তিনিও নাকি তাই করিয়াছিলেন। কিন্তু যদুনাথবাবুর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে এবং অপর কোন সাহিত্য-মহারথের বিশেষ আগ্রহে তিনি তাহা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এইত গেল সভাপতি-বিভ্রাট। তারপর ছোটখাট আরো দুই একটী কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যশোহরবাসিগণ সম্মিলন আহ্বান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। একবার সম্মিলন করিতে কত কায়ক্লেশ, কত ভাবনা চিন্তা, কত অর্থব্যয়। এই সব যাঁহারা মাথা পাতিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহারা বঙ্গ-সাহিত্যসেবীর কৃতজ্ঞতার পাত্র। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের ধীরতার অভাবে বা বিবেচনার ত্রুটিতে, নির্ব্বিরোধে এই বৃহৎ ব্যাপারটী সম্পন্ন হইতে পারিলনা, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

জানিনা, কে বা কাহারা "কলিকাতা হইতে ২৫ জন মহিলা-প্রতিনিধি যশোহর সম্মিলনে যোগদান করিবেন" এই সংবাদ প্রচারের জন্য দায়ী। ইউরোপীয় অথবা এতদ্দেশীয় যে সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে, তাঁহাদের কোন কোন গৃহলক্ষ্মী যদি সভাস্থলে গিয়া উপস্থিত হন, তবে আমাদের কাহারও

কিছু বলিবার অধিকার নাই। কিন্তু কোন মহিলা সাহিত্য-সম্মিলনের আসরে যান, ইহা আমি সবিনয়ে বলিতেছি, প্রার্থনীয় মনে করিনা। তাঁহারা সভায় থাকিলে যে বিভ্রাট ঘটে, তাহা ময়মনসিংহ-সম্মিলনে শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠ উপলক্ষে দেখা গিয়াছে। একটী সরল রচনা পাঠ করিতে গিয়া ললিতবাবুকে বিড়ম্বিত হইতে হইল। এই অবস্থায় তাঁহারা দূরে থাকেন, এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

অপিচ ৫ জন মহিলা প্রতিনিধি যে সভাস্থ হইবেন, ঢাকঢোল বাজাইয়া এ সংবাদ জারি করা কীদৃশ রুচিসঙ্গত, তাহাও বিবেচ্য; প্রকারান্তরে সম্মিলনে যাইবার এটাও একটা প্রলোভনরূপে ঘোষণা করা হয় নাই কি?

আমরা হিন্দুগণ মহিলাদিগকে মাতৃভাবে নিরীক্ষণ করিতে উপদিষ্ট। স্ত্রীলোকের মুখের দিকে তাকাইয়া কথাবলা পর্য্যন্ত আমাদের নিষিদ্ধ। আমরা সকলেই শুকদেব বা রামকৃষ্ণ পরমহংস নহি, তাই যদি কোন স্থানে স্ত্রীলোকের দর্শন ঘটিবার সম্ভাবনা দেখি, তাহা হইলে বাস্তবিক ভীত হই। ইহাতে যদি আমাদিগকে দুর্ব্বল বা আর কিছু বলিয়া গালিদিতে চাও, দিতে পার, মাথা পাতিয়া লইব। কিন্তু দোহাই ধর্ম্মের, সাহিত্যের আসরে স্ত্রীলোক আনিও না। আমরা নারী জাতির পবিত্রতা এত যত্ন-সংরক্ষণীয় মনে করি যে, তাঁহাদিগকে পুরুষের সভায় সর্ব্ব সাধারণের দৃষ্টিগোচরে আনিতে কখনই প্রস্তুত নহি।

আমরা শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মোটা রসিকতা'র সমর্থন করিতে পারি না। তথাপি একটী কথা সবিনয়ে বলিব। পাঁচকড়িবাবুর কথা গুলি পরমার্থতঃ লইয়া একটা গোল বাঁধান বুদ্ধিমানের কার্য্য হয় নাই। যাঁহাদের নিকটে পাঁচকড়িবাবুর রসিকতা আপত্তিজনক বোধ হইয়াছিল, তাঁহারা সম্মিলনের কর্তৃপক্ষীয়দিগকে না জড়াইয়া, প্রতীকারের ব্যবস্থা করিলেই ত বেশ হইত—সম্মিলন-ক্ষেত্রে এত অশান্তির কারণ ঘটিত না।

তারপর সম্মিলনের প্রারম্ভেই আর এক ব্যাপার ঘটিল। রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার মহাশয় নানা কারণে আমাদের বহুমানভাজন। তিনি বয়োবৃদ্ধ, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত, তিনি সনাতন ধর্ম্মের পক্ষপাতী 'হিন্দু পত্রিকা'র সম্পাদক; তিনি সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, লোকহিতকর বহু সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা। এছাড়া তিনি পদ গৌরবেও গরীয়ান্—গবর্ণমেণ্টেরও সম্মান-চিহ্ন ভূষিত। কিন্তু তিনি কিরূপে যে তদীয় বৃদ্ধাজননীকে সভাস্থলে প্রকাশ্যস্থলে দণ্ডায়মানা করাইয়া কথা বলাইতে পারিলেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

যদুনাথবাবুর অভিভাষণের যতটা আমি দেখিতে পাইয়াছি, তাহাতে, "না জাগিলে সব ভারত-ললনা এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা" ইত্যাদি সংস্কারকদের মামুলী পদ দেখিয়া বুঝিয়াছি, তিনি অধুনা সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। তা হউন। কিন্তু ভারতী-জননীকে সভাস্থ করা কোন মতেই বিবেচিত কাজ হইয়াছে মনে করিতে পারি না। তাঁহার প্রতি আমাদের যে গভীর শ্রদ্ধা ছিল, এই ব্যাপারে তাহার যে কিঞ্চিৎ হ্রাস ঘটিয়াছে, ইহা আমরা দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি।*

* এতদুপলক্ষে একটী সদৃশ ব্যাপারের উল্লেখ করিতে হইল, কিন্তু সদৃশ হইলেও উভয়ের কত প্রভেদ। উত্তরবঙ্গ সাহিত্যসম্মিলনের পঞ্চম

মূল ও শাখা-সভাপতিগণের অভিভাষণ সমস্ত এ যাবৎ পাঠ করিতে পারি নাই — কেবল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয় তদীয় অভিভাষণখানি অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু হিতবাদী পত্রে সতীশ বাবুর অভিভাষণের সংক্ষেপ দেখিয়া বোধ হইল, তিনি বঙ্গসাহিত্যের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস দিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং প্রবন্ধ শেষে যাঁহাদের দ্বারা ভাষার পুষ্টি সাধন হইয়াছে, তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। দেখিয়াছি, সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি হইলেই অনেকে মনে করেন যে, অভিভাষণে বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের উৎপত্তির কাল হইতে একটা বিবরণ দেওয়া নিতান্তই আবশ্যক। সাহিত্য-সম্মিলন হইতেছে বহু, সমগ্র বঙ্গের সম্মিলন ত আছেই, তা ছাড়া উত্তর বঙ্গের ও শ্রীহট্টের সাহিত্য-সম্মিলন নিয়ম মত হইতেছে। আরো দুই একটা ক্ষুদ্র সম্মিলন আছে এবং এতদ্ব্যতীত অনেক সাহিত্য-সমিতির বার্ষিক অধিবেশনেও অভিভাষণ পঠিত হইয়া থাকে। সর্ব্বত্রই যদি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ধারাবাহিক বিবরণ শুনিতে হয়, তবে বিষয়টা একঘেয়ে ও বিরক্তিকর হইয়া উঠে না কি? তবে যদি নূতন কিছু বক্তব্য থাকে, অবশ্যই তাহা সাদরে গ্রহণীয়। অথবা তেমন বলিবার কায়দা যদি থাকে, যাহাতে পুরাতন বিষয়ও অভিনবের ন্যায় চিত্তাকর্ষক হয়, তাহা হইলেও উহা সমাদর-যোগ্য; সতীশ বাবুর অভিভাষণে এতাদৃশ কিছু ছিল বলিয়া বোধ হইল না। যাহা হউক, তিনি পালি সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ বলিয়া খ্যাতিমান্; বঙ্গসাহিত্যে বৌদ্ধ-প্রতাপ কি এতাদৃশ অপর একটা বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই তাঁহার পক্ষে শোভন হইত—সাধারণের সমালোচনাও তাঁহাকে স্পর্শ করিত না।

বঙ্গসাহিত্যের লেখকদের নামও একটা বিপৎসঙ্কুল ব্যাপার; বুদ্ধিমান ব্যক্তি দুই চারিজন অতি বড় ব্যক্তির নাম লিখিয়া তৎপশ্চাৎ প্রভৃতি, ইত্যাদি বসাইয়া কাজ সারেন। সতীশ বাবু এবিষয়েও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারেন নাই বলিয়াই বোধ হইল। সকলের নাম লেখা অসাধ্য, অথচ রামের নাম হইল, শ্যামের হইল না, এই সূত্রে শ্যামের গোঁড়ারা লেখককে যে আক্রমণ করিবে, ইহা স্বাভাবিক। আবার জীবিত লোকদের কাহারও নাম যদি বাদ গিয়া থাকে, তবে তাহাদের মনে যে ক্ষোভের উদয় হইবে, তাহাও স্বাভাবিক। তাই এই পথে যাওয়াই অনুচিত, গেলেও খুব সাবধানতা সহকারে চলিতে হয়;—সতীশ বাবু তাহা পারেন নাই বলিয়াই বোধ হইল।

যশোহরে সম্মিলন উপলক্ষে যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করা হইয়াছে। কার্য্য প্রণালীতে নানারূপ ত্রুটি ও গোলযোগ থাকিলেও অভ্যাগতগণের পরিচর্য্যায় সকলেই

অধিবেশন কামাখ্যাধামে হইয়াছিল; সভাপতি বরণের পরক্ষণেই ৺কামাখ্যার আশীর্ব্বাদ লইয়া একজন শুভদর্শনা কুমারী সভামণ্ডপে সমাগত হইয়াছিলেন এবং সভাপতির মস্তকে নির্ম্মাল্য প্রদান পূর্ব্বক "তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হউক" এই আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিয়াই সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। হিন্দু মাত্রেই জানেন যে, মহাপীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবতা কুমারী রূপেই পূজাগ্রহণ ও বর প্রদান করিয়া থাকেন। যশোহরে যদি এইরূপ হইতে পারিত, তবে কত শোভন হইত।

সন্তোষলাভ করিয়াছেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ, অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য মাহাদয়গণ, বিশেষতঃ রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এ বিষয়ে প্রভূত প্রশংসা লাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। আগামী সম্মিলনে সাহিত্য অথবা দর্শন শাখায় * যদুনাথ বাবুকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহার,তথা যশোহরবাসিগণের ঐকান্তিক আতিথেয়তার যৎকিঞ্চিৎ প্রতিদান করা যাইতে পারে কিনা, বিবেচনা করিবার নিমিত্তে উপসংহার আমি বাঁকীপুরের সম্মিলন-কর্ত্তৃপক্ষীয় মহোদয়গণের সমীপে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

পুণ্যশীলা কবি হেমন্তবালা দত্ত।

হেমন্তের জীবন-কথা যে কখনও আমাকে লিখিতে হইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। মনে করিতাম, যাহারা এদেশে আগে আসে, স্বাভাবিক নিয়মে তাহারই বুঝি আগে সেই অজ্ঞাত দেশে চলিয়া যায় এবং এদেশের ন্যায় সেখানেও কনিষ্ঠের জন্য স্নেহের আশ্রম রচনা করে। তাই আমি কতদিন হেমন্তকে তামাসা করিয়া বলিয়াছি,খুকী আমি মরিলে তুমি আমার বিষয়ে"বামাবোধিনী"তে একটী কবিতা লিখিও"। সে তখনই গম্ভীর ভাবে বলিত, "দাদা, কে কার বিষয়ে কবিতা লেখে, বলা যায় না।" তাহার এই উত্তরের মধ্যে যে কঠোর সত্য লুকান ছিল, তখন তা হায় বুঝিতে আরি নাই! আজ আমাকেই "বামাবোধিনী'তে" তাহার বিষয়ে কবিতা লিখিতে হইয়াছে! নিয়তির কি নিষ্ঠুর অভিশাপ!!

হেমন্ত আমার একমাত্র কনিষ্ঠা সহোদরা। আমরা দুইটী ভাইবোন নিসর্গলক্ষ্মীর প্রিয়লীলাভূমি চট্টলা জননীর শান্তি-শীতল বুকে একবৃন্তে বিকাশোন্মুখ যুগল ফুলকলিটীর মতই ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিলাম। ফুলের সেই নির্ম্মল সৌন্দর্য্যলাভের সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই; কিন্তু সত্যসত্যই হেমন্ত অন্তরে বাহিরে ফুলের অপেক্ষাও বেশী সুন্দর ও নির্ম্মল ছিল। তথাপি আমাদের দুইজনের জীবন মিলিয়া একখানি জীবনই ছিল; আজ অকস্মাৎ তাহাকে হারাইয়া বেশ বুঝিতে পারিতেছি, আমার ক্ষুদ্র জীবনের কতখানি শূন্য হইয়া গিয়াছে!

হেমন্ত আমাদের পিতামহ স্বর্গীয় রামকিশু ডাক্তারের শৈলশিখরস্থিত প্রাসাদ-ভবনে ১২৯৬সালের ৫ই কার্ত্তিক তারিখে, সোমবার, অপরাহ্ন ৩-৩৫ মিনিটের সময় জন্মগ্রহণ করে। সে সময়ে আমাদের পর-

* আমি শাখা-বিভাগের পক্ষপাতী নই—একথা দুই বৎসরের সম্মিলন সমালোচনা প্রবন্ধে বলিয়াছি। তাই এই শাখা বিভাগ সম্বন্ধে এবার বাহুল্য বিবেচনায় আলোচনা করি নাই। সম্মিলন সম্বন্ধে যাঁহারা নানা সংবাদ পত্র ও পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিতেছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই শাখা বিভাগের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতেছেন। বাঁকীপুরে শাখা বিভাগ উঠিতে না দেখিলে আমি সুখীই হইব।

মারাধ্য পিতৃদের পুণ্যাত্মা অনঙ্গচন্দ্র * চট্ট গ্রামে উপস্থিত না থাকিলেও, ঠিক তাহার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমার খুল্লতাত মহাশয়ের শুভপরিণয়োৎসব সংঘটিত হওয়ায় তখন আমাদের গৃহ কুটুম্বাদিতে পরিপূর্ণ ছিল। তখন আমার সাত বৎসর বয়স। আমার বেশ মনে পড়ে, হেমন্ত জন্মগ্রহণ করিলে আত্মীয়গণের উচ্ছ্বসিত হুলুধ্বনির মধ্যে কন্যা জন্মিয়াছে জানিয়া আমাদের পিতামহ অশ্রু-সংবরণ করিতে পারেন নাই। শৈশবে নিদারুণ পক্ষাঘাত-রোগাক্রান্ত হইয়া আমি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাই আমার স্নেহপরায়ণ পিতামহ বড় ভরসা করিয়াছিলেন, এবার আমি যদি একটী কনিষ্ঠ সহোদর পাই, তাহা হইলে আমার দুর্ব্বহ জীবনের একটা অবলম্বন হইবে। তিনি সে আশায় বড় নিরাশ হইয়াই আমার জন্য কাঁদিয়াছিলেন।

কিন্তু আমাদের এই স্নেহপরায়ণ স্বদেশ-গৌরব পিতামহ যদি আরও কিছু দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতেন, তবে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইতেন, তাঁহার সেই করুণা-বিগলিত অশ্রুপাত নিষ্ফল হয় নাই, আমি সুখ-দুঃখ হর্ষ বিষাদে কিরূপ সোদরাধিক হৃদয়সম্পন্না সাহায্যকারিণী ভগ্নী লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। সে কথা পরে লিখিব।

এদিকে আমাদের অসীম স্নেহশীল পিতৃদেবতা হেমন্তের জন্মে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন।' তিনি তাহার স্বহস্ত লিখিত "আত্ম-জীবন-কথা" নামক পুস্তকে প্রসঙ্গ ক্রমে হেমন্তের জীবনী বিবৃত করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

"কন্যা আমার অতি প্রিয়বস্তু, আমি তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার ৮বৎসর পূর্ব্বে মাতৃহীন হইয়া তাহাকে শৈশবাবধি "মা খুকী" ডাকিয়া সুখী হইয়াছিলাম। * * * প্রায়শঃ পুত্র সন্তানগুলি তাহাদের জননীর উপাদানে বা প্রকৃতি লইয়া এবং কন্যাগুলি তাহাদের পিতার প্রকৃতি লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। শ্রীমতী শিশুকাল হইতে (তাহার) বাবার বড় অনুরাগী—সদা বাবার পক্ষপাতী। বাবাকে পাইলে তাহার বড় আনন্দ হইত, বাবাকে দেখিতে পাইলে, তাহার মুখে হাসি ধরিত না। আমি তাহাকে এক সময়ে "ভূতি" বলিয়া ডাকিতাম। আমার তৎকালীন ডায়রী বহিতে 'আমার ভূতির কথা" বলিয়া একটা অসম্পূর্ণ কবিতা লিখিত হইয়াছিল; খুকীর জন্য ইহা নিম্নে লিখিয়া রাখিলাম:—

(১) ভূতি নাম তার, খুকীটী আমার
হাসে, কাঁদে' নাচিয়া বেড়ায়,
সুন্দর নয়ন বরণ তাহার
আদরে সকলে ধরে কি পাড়ায়।
(২) তবু ভূতি কাঁদে কেন গো আমার
(তার) মার মুখে শুনি নিয়ত এ কথা,
ছুটে যাই দেখি মুখ পানে তার
পুনঃ হাসি ভরা, ভুলে সব ব্যথা॥

হেমন্ত পিতৃদেবের কতখানি স্নেহের অধিকারিণী ছিল, তাঁহার উপরোক্ত লেখাতে যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি তাঁহার অসম্পূর্ণ কবিতাটীর মধ্যে তাহার শৈশব-জীবনের একখানি অস্পষ্ট ছবি দেখিতে পাই।

যাহা হউক, যথাসময়ে এই নবজাত

---

* যাঁহারা ইঁহার সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বিগত ১৩২১ সালের মাঘ সংখ্যা "নব্যভারতে" প্রকাশিত "পুণ্যাত্মা অনঙ্গচন্দ্র দত্ত" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

কুমারীকে আমাদের পিতামহ “গিরিজায়া” এবং সে হেমন্তকালে জন্মিয়াছে বলিয়া পিতৃদেব “হেমন্তকুমারী” নামকরণ করেন। কিন্তু উত্তরকালে হেমন্ত তাহার নামের “কুমারী” স্থানে “বালা” ব্যবহার করিত এবং এই নামেই সে সর্ব্বত্র সুপরিচিতা হয়। পিতামহের প্রদত্ত নামে আমরা কখনও তাহাকে সম্বোধন করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। হেমন্ত চিরকালই আমাদের কাছে “খুকী” ভিন্ন আর কিছু ছিলনা।

শৈশবাবধি আমাদের বাড়ীতে আমি একা বালক. “খুকীকে” পাইয়া আমার সেই খেলার সাথীর অভাব দূর হইল। কিছুকাল পরে পিতামহও তাহাকে আপনার খেলার সাথী করিয়া লইলেন। প্রতিদিন মধ্যাহ্ন আহারের পর তিনি যখন তাঁহার বিরাট খাটে শুইয়া বিশ্রাম করিতেন, খুকী তখন তাঁহার নিকটে বসিয়া খাটের ছাপ্পরে আবদ্ধ ক্ষুদ্র পাখাটী তাহার কচি হাতে টানিয়া তাঁহাকে বাতাস করিত ও ঘুম পাড়াইত। ইহা হেমন্তের শৈশবে তাহার দৈনন্দিন কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল।

আমাদের পিতামহ স্বচেষ্টায় উর্দ্দু, পার্শি, হিন্দি, ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ পারিদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, তিনি সেই সেই ভাষায় সঙ্গীত ও কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তিনি এক এক সময়ে খুকীকে কোলে লইয়া বিচিত্র সুরতানলয়ে তাঁহার সেই সকল কবিতাদি গান করিয়া শুনাইতেন। তিনি যে তখন হেমন্তের শিশু-হৃদয়ে কবি-প্রতিভার বীজ অলক্ষ্যে বপন করেন নাই, আজ তাহা কেমন করিয়া বলিব?

আমাদের পিতামহ যে শুধু বিভিন্ন ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন, তাহা নহে, তিনি অতি নিষ্ঠাবান হিন্দুও ছিলেন। আমাদের গৃহে দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি সকল পূজানুষ্ঠানই অতিশয় সমারোহে সুসম্পন্ন হইত। আমরা ভাইবোন তখন নববস্ত্র উপহার পাইতাম। পরিধেয় বস্ত্রাদি যত সুন্দর ও মূল্যবান হউক, আমার কখনও পছন্দ হইত না। কিন্তু হেমন্ত অতি অল্পেতেই সন্তুষ্ট হইত। তাহার তখনকার সেই আনন্দ, সেই হাসি, সেই সরলতা, সেই স্বল্পে সন্তুষ্টিভাব আজীবন সমভাবে অক্ষুণ্ণ ছিল। সে জন্য সে পরে বাহিরে সকলকারই সমান আদরের পাত্রী হইতে পারিয়াছিল।

আশৈশব হেমন্তের প্রকৃতি অত্যন্ত কোমল, মধুর ও নম্র ছিল। বাল্যে আমার চরিত্রে এ সকল গুণের বিপরীত ভাবই বেশী দেখা যাইত। ফলে, পিতামাতার কোল লইয়া–খেলানার জিনিস লইয়া আমি হেমন্তের সহিত খুব মারামারি করিতাম। তখন আমাদের ভাইবোনের ভালবাসার যেমন সীমা ছিল না, মারামারিরও তেমন শেষ ছিল না। নিরীহ হেমন্ত আমার সকল উৎপাত-অত্যাচার অধিকাংশ সময়েই নীরবে সহ্য করিত।

হেমন্তের যখন সাত বৎসর বয়স, তখন আমাদের অতুল যশস্বী পিতামহ লোকান্তরিত হয়েন। তাহার ছয়মাস পরে পিতৃদেব আমাদিগকে তাঁহার কর্ম্মস্থল ঢাকা নগরীতে লইয়া যান। তিনি সেখানে Inspector of Works-আপিসে Head Assistant ছিলেন। আমরা সেবার ঠাঠারীবাজারের বাসায় থাকি। আমাদের বাসার নিকটে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণমহিলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক-বালিকাদের জন্য নিজের গৃহেই একটী

পাঠশালা করিয়াছিল। তাঁহাকে সকলে "ঠান্‌দিদি" এবং তাঁহার পাঠশালাকে "ঠান্‌দির স্কুল" বলিত। আমাদের পাড়ার অনেক ভদ্র পরিবারের মেয়ে সেখানে পড়িত। আমার পিতৃদেব হেমন্তকেও এই "ঠান্‌দির স্কুলে" ভর্ত্তি করিয়া দেন। "ঠান্‌দির" নিকটে হেমন্তের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ "বর্ণ-পরিচয়" সমাপ্ত হয়।

"ঠান্‌দির স্কুলের" মত প্রাচীন আদর্শের মমতাভরা পাঠশালা আজকাল আমাদের দেশে ক্রমে দুর্লভ হইয়া দাঁড়াইতেছে। সুতরাং এ পাঠশালা সম্বন্ধে এখানে কিছু লেখা প্রয়োজন, বিশেষতঃ হেমন্তের অক্ষর পরিচয় যখন এ পাঠশালাতেই হইয়াছিল। "ঠান্‌দির" পাঠশালার সময় প্রভাতেই নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রতিদিন প্রাতে দেখিতাম, দলে দলে ছেলে মেয়ে বিদ্যালয়ে বসিবার জন্য বগলে ছালা বা বোরা লইয়া এবং হাতে পুঁথিপত্র, তালপাতা ও গলায় সূতা বাঁধা মাটির দোয়াত ঝুলাইয়া গল্প করিতে করিতে "ঠান্‌দির" পাঠশালায় চলিয়াছে। হেমন্তও প্রতিবেশী ভদ্র পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে এই দলে যোগ দিত। তবে পিতৃদেব তাহাকে পাঠশালায় বসিবার ও লিখিবার জন্য সুন্দর আসন ও কাগজের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার দোয়াতটীও মাটির ছিল না। এজন্য তাহাকে কখনও ঠান্‌দির পাঠশালায় ছালায় বসিয়া পড়িতে বা তালপাতায় লিখিতে হয় নাই। হেমন্তের কাছে শুনিয়াছি, উচ্চশ্রেণীর ছাত্র ও ছাত্রীরা "ঠান্‌দির স্কুলে" কেরোসিন তেলের কাঠের বাক্সে বসিয়া লেখাপড়া করিবার অধিকার পাইত। হেমন্তও দ্বিতীয় ভাগ "বর্ণ পরিচয় পড়িবার সময় এ গৌরবের অধিকারিণী হইয়াছিল। কিন্তু "ঠান্‌দির স্কুলে" আড়ম্বরপূর্ণ বাহ্যিক উপকরণাদির অভাব থাকিলে কি হইবে? 'ঠান্‌দিদি" যে স্নেহ-সুকোমল প্রাণ লইয়া জননীর মত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতেন এবং যেভাবে তাহাদের সকলকে একান্ত আপনার করিয়া লইতেন তাহার তুলনা বর্ত্তমানের কোন উচ্চাঙ্গের বিদ্যালয়ে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কি না, সন্দেহ। এজন্যই আমার মনে হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক-বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার ভার মাতৃজাতির উপরেই ন্যস্ত থাকা সমধিক সুযুক্তিসঙ্গত।

যাহা হউক, কয়েকমাস পরে আমাদের পিতৃদেবের আপিস চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হইয়া আসে, তখন আমরা পুনরায় বাড়ী ফিরিয়া আসি। ইহা ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের কথা। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে চট্টগ্রামে প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হওয়ায় স্থানীয় স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। আমরাও সকলে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতে থাকি। হেমন্তের লেখাপড়াও কিছুকালের জন্য একরূপ বন্ধ হয়। সে যখন একটু ভাল থাকিত, স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়ে পড়িতে যাইত।

তার পর হেমন্তের যখন নয় বৎসর বয়স, তখন আমাদের পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠতাত সিবিল সার্জ্জন রায় শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দত্ত বাহাদুর তাহাকে ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখাইবার জন্য তাঁহার তাৎকালীন কর্ম্মস্থান দ্বারভাঙ্গায় লইয়া যান। সে সেখানে প্রায় একবৎসর ছিল এবং সেখানকার লেডি ডাক্তার মিস্ রেমাস্‌বটনের নিকটে ইংরাজি ও সেলাইর কাজ শিখিয়াছিল। মিস্

মেমসবটন তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনি সে সময়ে তাহার যে ছায়াচিত্র বা ফটো গ্রহণ করেন, তাহা আমাদের পিতৃদেবের অপ্রকাশিত "আত্ম-জীবন-কথা" পুস্তকে সন্নিবেশিত আছে।

পিতৃদেবের আপিস পুনরায় ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সে জন্য আমরাও আবার ঢাকায় যাই এবং সে বার বাঙ্গালাবাজারের বাসায় থাকি। হেমন্ত তখন আমাদের নিকটেই ছিল আমাদের বাসার প্রায় সম্মুখবর্ত্তী বেপ্‌টিষ্ট মিসনের স্থাপিত Zanana Mission স্কুলে হেমন্তকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। সেখানে সে চারিমাস মাত্র অধ্যয়ন করিয়া ৪র্থ ষ্ট্যাণ্ডার্ড পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণা হয়। এত অল্প সময়ে তাহার এইরূপ কৃতকার্য্যতা দেখিয়া স্কুলের শিক্ষয়িত্রীগণ অতিশয় আনন্দিতা হয়েন। স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও প্রধান শিক্ষয়িত্রী জনৈক মেম হেমন্তের ছাপান সুন্দর পাশ সার্টিফিকেটখানি স্বহস্তে লইয়া আমাদের বাসায় আসেন এবং অত্যন্ত আনন্দপ্রকাশ করিয়া তাহা হেমন্তকে প্রদান করেন। আমরা সেই উদারপ্রকৃতি স্নেহ-পরায়ণা ইংরেজ মহিলাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া "মিষ্টিমুখ" করাইতে ভুলি নাই। হেমন্তের পাশ-সার্টিফিকেটখানির যথাযথ প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

Standard IV.—

Certified that Hemanta Dutta, daughter of Babu A. M. Dutta of the B. Z. M. Dacca School, appeared at the above mentioned Examination held in December 1901 and passed in the 2nd Division.

(Sd.) Mary A. C. Morrat
Inspectress of Girls' School, Bengal.

ইহার পর হেমন্তকে ঢাকার সরকারী ইডেনফিমেল স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দেওয়া হয়। এই স্কুলে পড়িবার সময়ও স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী (শ্রীমতী সরলাবালা রক্ষিত বি-এ) ও অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীরা তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন। বাস্তবিক ছেলেবেলা হইতে হেমন্তকে লেখাপড়ার জন্য কখনও কিছু অনুযোগ করিতে হয় নাই, সে স্বভাবতঃই তাহাতে অতিশয় অনুরক্তা ছিল। ইডেন ফিমেল স্কুলেও হেমন্তের অধিক দিন পড়া হয় নাই। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের পরম আরাধ্যা শ্রীশ্রীযুক্তা মাতৃদেবী গুরুতররূপে পীড়িতা হইলে আমরা সকলে বাড়ী ফিরিয়া আসি। এখানেই হেমন্তের স্কুলে পড়া বিদ্যা সমাপ্ত হয়।

পরবর্ত্তী বৎসর ১৩১১ সালের ১৯শে বৈশাখ তারিখে, হেমন্তের প্রায় পনের বৎসর বয়সে, চট্টগ্রামের অন্তর্গত চনহরা গ্রামের সনামধন্য সাধুপ্রকৃতি জমিদার স্বর্গীয় জগচ্চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের দ্বিতীয় সন্তান শ্রীমান কালীমোহনের সহিত তাহার শুভবিবাহ মহা সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছিল। পিতৃদেব সরকারী কার্য্য উপলক্ষে তখন ঢাকায় ছিলেন, ছুটি লইয়া বাড়ী আসিবার সুযোগ পান নাই। আমিই কন্যাকর্ত্তারূপে হেমন্তকে সম্প্রদান করিয়াছিলাম। অভিভাবকরূপে কোন বৃহৎ অনুষ্ঠান সম্পাদন করা সেই আমার জীবনে প্রথম। সেদিনকার হেমন্তের সেই ব্রীড়ানম্রমুখখানি, চারিদিকের সেই বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাসের চিত্রখানি এখনও আমার চক্ষে অতি উজ্জ্বল প্রত্যক্ষবৎ ভাসিতেছে, —এত অশ্রুর প্লাবনও আজ তাহা মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই।

যাহা হউক, আশৈশব সহরে পিতা-

মাতার অশেষ স্নেহে লালিতাপালিতা হেমন্ত অকস্মাৎ পল্লীগ্রামের একান্নবর্ত্তী বিস্তৃত জমিদার-পরিবারে পুত্রবধূ হইয়া নিশ্চয়ই প্রথমে আপনাকে কতকটা বিপন্না ও অসহায়া ভাবিয়াছিল। সেখানকার রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারে হেমন্ত সম্পূর্ণ অনভ্যস্তা ছিল। এমন কি, সেখানকার গ্রাম্য-ভাষাও হেমন্ত ভাল করিয়া বুঝিতে ও বলিতে পারিত না।

কিন্তু দেবতুল্য শ্বশুর-শ্বাশুড়ির অনাবিল স্নেহে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মধুরপ্রকৃতি পতির অকৃত্রিম ভালবাসায় এবং সর্ব্বোপরি আপনার চরিত্র-গুণে হেমন্ত শীঘ্র সেই পরিবারেরই "একজন" ও সকলের আদরের ও সম্মানের পাত্রী হইয়া দাঁড়াইল। পুকুর হইতে জল আনা, ঘর নিকান প্রভৃতি পল্লীসুলভ গৃহকার্য্যেও আশৈশব অনভ্যস্তা হেমন্ত পশ্চাৎপদ রহিল না। শুধু ইহাই নহে। সেই পরিবারের নববধূগণ হেমন্তকে শিক্ষায় দীক্ষায় আপনাদের আদর্শস্থানীয়া করিয়া লইলেন। তৎপূর্ব্বে সেখানে সাধারণ হিন্দু পরিবারের মত মেয়েদের, বিশেষতঃ বধূদের উচ্চাসনে বসা, লেখা-পড়া করা, সেমিজ জ্যাকেট গায়ে দেওয়া, কিম্বা উল্ কার্পেটাদি বোনা বিশেষ নিন্দার বিষয় ছিল, হেমন্ত নিজে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াও স্বীয় পরিবারের বালিকা-বধূগণের মধ্যে এগুলির প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। হেমন্তের প্রতি বিশেষ স্নেহপরায়ণ ও গুণমুগ্ধ শ্বশুর মহাশয় তাঁহাদের পরিবারের দৈনিক জমা-খরচের হিসাব পত্রও তাহার হাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, হেমন্ত লোকান্তরিতা হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত সে গুরুভার সসম্ভ্রমে ও সুচারুরূপে রক্ষা করিয়া গিয়াছে।

তথাপি হেমন্তবালা আশৈশবের স্নেহ-নীড় ও প্রিয় পিতামাতা পরিজনবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া অকস্মাৎ সম্পূর্ণ অপরিচিত ও বিভিন্ন প্রকৃতির শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইয়া স্বীয় সঙ্কোচজড়িত কোমল হৃদয়ে যে তীব্র বেদনা অনুভব করিয়াছিল, তাহাতেই তাহার অন্তরে সুপ্তা কবি-প্রতিভার উন্মেষ হয়। সে এ সময় হইতেই অর্থাৎ পরিণয়ের পরবর্ত্তী সময় হইতেই তাহার সুকুমার প্রাণের সকরুণ ভাবগুলি কবিতাকারে লিখিতে আরম্ভ করে। এসময়ে তাহার কবিতায় স্নেহময়ী জননী বিচ্ছেদ-ব্যথা এবং ভগবচ্চরণে শক্তি-প্রার্থনার বেশী ফুটিয়া উঠিত। ইহাই চট্টগ্রামের একমাত্র মহিলা-কবি স্বনামখ্যাতা হেমন্তবালার কবি জীবনের নিগূঢ় প্রারম্ভ-কাহিনী।

আমার মনে হয়, বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাস অপেক্ষা গভীর দুঃখ-বেদনার মধ্যেই প্রকৃত কবিত্বের জন্ম হইয়া থাকে। কবি-প্রতিভা চিরকাল নিবিড়তাপ্রিয়। হর্ষের আতিশয্য মানুষের মনকে স্বভাবতঃই বিক্ষিপ্ত ও বহির্মুখী করিয়া দেয়, এরূপ অবস্থায় কখনও নিবিড়তা আসিতে পারে না। কিন্তু দুঃখ-বেদনা শুধু মন নহে, মানুষের জীবনকেও বাহিরের হট্টকোলাহল হইতে আকর্ষণ করিয়া অন্তর্মুখী ও আত্মনিষ্ঠ করিয়া থাকে। এই অন্তর্মুখিতা ও আত্মনিষ্ঠতার ভিতরেই যথার্থ নিবিড়তা বর্ত্তমান আছে এবং এই ধ্যান গরিষ্ঠা কবি-প্রতিভার প্রসূতি। এ জন্যই আমরা দেখিতে পাই, প্রকৃত কবি-জীবন এত দুঃখ-দৈন্য-বিষাদ-বেদনা-পূর্ণ।

পক্ষান্তরে এই দুঃখ-বেদনার অপূর্ব্ব চেতনাতেই জগতের আদি-কবি মহর্ষি বাল্মীকির পীযুষবর্ষী মর্ম্ম-বীণা সর্ব্ব প্রথম ঝঙ্কৃত হইয়াছিল। আমি এ পথেই হেমন্তকে আমার কাব্যসঙ্গিনী রূপে পাইয়াছিলাম

এবং মনে পড়ে, এ পথেই আমি সর্ব্ব প্রথম কাব্যলক্ষ্মীর চরণে চিরকালের জন্য আত্ম-বিক্রয় করিয়াছিলাম।

ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি, হেমন্তের বিবাহের পর প্রায় পনের বৎসর বয়স হইতে সে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করে। আমার যখন নয় বৎসর বয়স, তখন হইতেই আমি কবিতা লিখিয়া আসিতেছি এবং আমার ১৩। ১৪ বৎসর বয়স হইতে তাহা বঙ্গের বিভিন্ন মাসিক সাহিত্যে প্রকাশিত হইতেছে। আমাদের পিতামহ ও পিতৃদেব উভয়েই কবিতা লিখিতে পারিতেন, এতকাল আমি একেলাই আমার ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া তাহা-দের সে গৌরব রক্ষার— বঙ্গ-বাণীর সেবায় পৈত্রিক অধিকার বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, এক্ষণে হেমন্তকে আমার সহকারিণীরূপে পাইয়া আমার কি যে আনন্দ হইয়াছিল, আজ তাহা কেমন করিয়া প্রকাশ করিব ?

হেমন্তের এই কবি-জীবন আলোচনা করিবার পূর্ব্বে তাহার আর কয়েকটী বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। হেমন্ত যে শুধু লেখা পড়া লইয়া ব্যস্ত থাকিত, তাহা নহে,সে যাবতীয় গৃহকার্য্যেও সুনিপুণা ছিল। আমাদের পূজনীয়া মাতৃদেবীর পদপ্রান্তে বসিয়া সে রান্না শিক্ষা করিয়াছিল এবং তাহাতে সে প্রায় তাঁহারই মত দক্ষতা লাভ করিয়াছিল। তাহার পতি বৃহৎ একান্ন-বর্ত্তী পরিবার। হেমন্তের উপর পালাক্রমে যেদিন এ ভার পড়িত, তাহার স্বভাব-দুর্ব্বল শরীর রান্না বিষয়ে অপটু হইলেও সে হাস্য মুখেই সে ভার গ্রহণ করিত এবং সেদিন সকলের মুখেই তাহার রান্নার সুখ্যাতি ধরিত না। কখনও কখনও হেমন্তকে উপর্য্যুপরি এতগুলি লোকের রান্না ও পরিবেশন করিতে হইত। এতদ্ভিন্ন জমিদার-গৃহের উৎসব অনুষ্ঠানে ও সম্ভ্রান্ত নিমন্ত্রিত অভ্যাগতের আগমনে শ্রেষ্ঠ তরকারিগুলি রান্না করিবার ভার তাহার উপরে দিয়াই সকলে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতেন। ইহা তাহার রান্না বিষয়ে সামান্য যোগ্যতা ও প্রশংসার কথা নহে।

আমি যখনই তাহার বাড়ী গিয়াছি, দেখিয়াছি, তাহার গৃহখানিই বাড়ীর সকল গৃহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সাজান গুছান। এ সম্বন্ধে সে আমাদের পূজ্যপাদ পিতৃদেবের স্বভাবসুলভ সুরুচির উত্তরাধিকারিণী, তাহার গৃহের অনেক চিত্র তিনি স্বহস্তে আঁটিয়া দিয়াছিলেন। তিনি যে তাহাকে বড় ভালবাসিতেন।

হেমন্ত পিতৃদেবের ন্যায় ফুল ও ফুলের মতই সুন্দর শিশুদের বড় ভালবাসিত। বিধাতা তাহাকে নিজের শিশুতে বঞ্চিতা করিলেও তাহার শিশুর অভাব ছিল না। তাহাদের বাড়ীতে দেখিতাম, সেখানকার বালকবালিকারা তাহার কাছে আসিতে, তাহার কোলে উঠিতে ও রাত্রিতে তাহারা নিকটে শুইতে কত লালায়িত! সে যখন আমাদের বাড়ী আসিত, তখনও এ দৃশ্যের অভাব ঘটিত না। ছোট ভাই বোনদের কথা দূরে থাকুক, পাড়ার ছেলেমেয়েরাও তাহাকে পাইলে সহজে ছাড়িতে চাহিত না। শিশু-হৃদয় যেমন প্রকৃত স্নেহপ্রবণ হৃদয় চিনে ও তাহার প্রত্যেক স্তরের সন্ধান রাখে, আমরাও ঠিক তেমনটী চিনি না—জানি না। পরন্তু, হেমন্তের পুষ্প-প্রিয়তার কথা বেশী আর কি লিখিব? সে শেষ রোগশয্যায় থাকিবার সময়ও যখনই একটু ভাল বোধ করিত, তখনই আমাদের বাগান হইতে নানা

রকম ফুল তুলিয়া আনিয়া ও প্রায়ই মালা গাঁথিয়া তাহার প্রিয় পরমহংসদেবের ছবি, বিজয়কৃষ্ণের ছবি, কেশবচন্দ্রের ছবি, প্রভৃতি নানা ভাবে সাজাইয়া গভীর আত্মতৃপ্তি লাভ করিত। কখনও কখনও বা আমার মেজের উপরে নানা রকম ফুলের মেলা বসাইয়া আনন্দ-গদ্‌-গদ্‌-কণ্ঠে আমাকে ডাকিয়া দেখাইত। সে এমনি ফুল ভালবাসিত বলিয়া তাহার অসুখের সময় স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীরা তাহাকে কত রকমের কত ফুল উপহার পাঠাইয়া দিতেন, সে কতই আনন্দে সে গুলি গ্রহণ করিত। বুঝি 'সাত রাজার ধন মাণিক' পাইলেও লোক এত আনন্দিত হয় না!

স্বদেশী-আন্দোলনের বহু পূর্ব্ব হইতেই আমি স্বদেশী বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। তারপর স্বদেশী আন্দোলনের পীযূষ-স্পর্শে যখন আমাদের জাতীয় জীবনে নব জাগরণের মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, তখন হেমন্তও সমগ্র মন-প্রাণের সহিত দেশমাতার সে আহ্বানে সাড়া দিল—আমি তাহাকে দেশ-সেবায় প্রধান সহায় ও সাহায্য কারিণীরূপে প্রাপ্ত হইলাম। আমাদের ভাইবোনের অন্তরে তখন মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার সেবা ব্যতীত আর কোন কথা জাগিত না। সেই অপূর্ব্ব ভাবের বন্যায় ডুবিয়া আমরা ভাইবোন রাশি রাশি কবিতা, প্রবন্ধ ও সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলাম। সে সময়কার ভারতী, নব্যভারত, প্রবাসী, সুপ্রভাত, স্বদেশী, অঙ্কুর, ভাণ্ডার, বামাবোধিনী, সঞ্জীবনী প্রভৃতির পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিলে তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

তবে কোন বিশেষ কারণে হেমন্তের অধিক স্বদেশী কবিতা মাসিক সাহিত্যে প্রকাশিত হয় নাই এবং তাহার পুস্তকাদিতেও মুদ্রিত হয় নাই। কিন্তু তৎসমুদয় যে স্থানীয় মহিলা-সমিতি ভগিনী-সমাজ-প্রমুখ নারী-প্রতিষ্ঠানে গঠিত হইয়া সে সময়ে শিক্ষিতা মহিলা সমাজে নবীন উন্মাদনার সঞ্চার করিয়াছিল, একথা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

তারপর স্বদেশীর এ দুর্দ্দিনে আমরা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও যখন আমাদের উভয় পরিবারে নিখুঁত স্বদেশী রক্ষা করিতে পারিলাম না, তখন একান্ত ভগ্ন হৃদয়ে শুধু আমরা দুইটী ভাইবোন স্বদেশী বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া নীরবে জাতীয় ব্রত প্রতিপালন করিতেছিলাম। শুধু এবিষয়ে নহে, আমরা যে কোন প্রিয় ঈপ্সিত কার্য্যে আমি যখন সকলের নিকটে নিরুৎসাহ, নিরাশা, বিদ্রূপ-বিদ্বেষের আঘাত সহ্য করিয়া ব্যথিত-প্রাণে ফিরিয়াছি, হেমন্ত তখনই তাহার এমনি ধারা প্রগাঢ় সহানুভূতি ও স্নেহপূর্ণ হৃদয়খানি লইয়া তাহার হতভাগ্য নিঃসঙ্গ দাদার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—অজ্ঞাতে কত সান্ত্বনা, কত সহায়তা করিয়াছে। "দাদার" মর্ম্মবেদনা এমন করিয়া আজ আর কে বুঝিবে? কে ঘুচাইবে?—

ক্রমশঃ।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

পত্রাবলী।*

(যোগী অধিকাংশ পত্রেই তারিখ দেন নাই, এজন্য চিঠি সাজাইতে ভুল হইতে পারে। একটীর পর একটা না হইতেও পারে। পাঠকগণ মিলাইয়া পড়িয়া লইবেন)।

পত্র নং ১০।

মঙ্গলবার

ক্ষীরোদবাবু,

ইতিপূর্ব্বে একখানি পত্র লিখিয়াছি, বোধ হয় পাইয়া থাকিবেন। জ্ঞানেন্দ্রবাবুর সহিত কথাবার্ত্তা চলিতেছে; একদিন ফাউল কারী দিয়া ভোজ হইয়াছিল। তিন রকম condition প্রথমে দেন,—

(১) লাভের অংশ (সিকি)

(২) মাহিনা ৭৫৲

(৩) ৪৲ হিঃ কলম

তার পর দিন দেখা করিয়া গেলে বলেন, হঠাৎ ছাড়াইয়া দিবার ভয় আমার আছে; একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত চাহি। প্রস্তাব করেন, ৫০৲ টাকা মাহিনা এবং যখন ছাড়াইয়া দিবেন ১০০০৲ টাকা ক্ষতিপূরণ। আমি বলিলাম—অসম্ভব। তিনি শেষে বলিলেন,৫০০৲ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। এইত ব্যাপার; কিন্তু তাঁহার টাকার ভয়ানক অভাব,—পরিবার বোধ হয় শীঘ্রই আনিবেন। আপনার কি মত লিখিবেন। কিন্তু আমি দেখিতেছি অসম্ভব। কেহ কেহ বলেন, তিনি বঙ্গবাসীর dangerous enemy হইবেন। এমন সকল প্রবন্ধ লিখিতে পারেন, যাহাতে বঙ্গবাসীর ক্ষতি হইতে পারে—তখন ছাড়াইতে গেলে ৫০০৲ টাকা compensation দিতে হইবে। বেশ বুঝিয়া মত দিবেন।

Supplement ডবল হইয়াছে—কেমন হইয়াছে? লক্ষ্মীরায়ের ছবি কেমন উঠিয়াছিল? Supplement কি ভাবে চলিবে, কি matter থাকিবে, বঙ্গবাসীর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবে কিম্বা একটা বিভিন্ন জিনিষ হইবে, তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিবেন।

আপনার লর্ড রীপন ও ফৌজদারী কার্য্যবিধি পাইয়াছি। বর্ষ সমালোচনা যাইতেছে,—বড় ব্যস্ত। ইতি—

শ্রীযোগেন্দ্র।

পত্র নং ১১

কলিকাতা।

ক্ষীরোদ বাবু,

বাঙ্গালা কাগজের উন্নতি হইতে এখনও অনেকদিন বাকী আছে। এবারে মহাবিপদে পড়িয়াছি। উপীনবাবু শুক্রবার হুগলী গিয়াছেন; আজও দেখা নাই। পূর্ণবাবুর জ্বর হইয়াছে; উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছিল। কাল হইতে উঠিয়াছেন—এখনও পথ্য পান নাই। আমার বিপদের কথা কি বলিব? পিতা ঠাকুর মহাশয় আজ ১০।১২ দিন হইল কলিকাতা বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। গত রবিবার হইতে জ্বর হইয়াছে, শ্লেষ্মা বিকার হইয়াছে; আমি কিরূপ আছি তাহা বেশ বুঝিতে

---

* ক্ষীরোদবাবু মৃত্যুর অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে এই কাপি পাঠাইয়াছিলেন। ন, স।

পারিতেছেন, অধিক আর কি লিখিব। এলোপ্যাথি মতে চিকিৎসা হইতেছে। সুবিধা মধ্যে আজকে ভাল আছেন,— ডাক্তার এক্ষণে বলিতেছেন, আর চিন্তার বিষয় কিছু নাই আমিও আজ চেহারা ভাল দেখিতেছি। কাগজের বিষয়। কৃষ্ণ নগর হইতে যে article আসিয়াছিল এবং গোপালকৃষ্ণের আর্টিকেল ২টীতেই কাগজ শেষ হইয়াছে, আমি এক কলমও লিখিতে পাই নাই; আজ আপনাকে পত্র লিখিলাম মাত্র অপরের দ্বারা প্রুফ দেখাইয়াছি। আপনার মিশর প্রভৃতি এবার যাইবে না।

News, Paragraph এ পর্য্যন্ত আমি কিছুই লিখিতে পারি নাই। সংবাদ পত্র একখানিও পড়া হয় নাই. আজ কিছু লিখিব, ইচ্ছা আছে।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু সম্বন্ধে পত্র একখানি পূর্ব্বে লিখিয়াছি. পাইয়া থাকিবেন বোধ হয়। কি স্থির করিলেন?

News লিখিতে যদি না পারি, তবে সংবাদাতার পত্রের কিছু কাপি করিয়া দিব।

ইতি শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র।

(ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত পত্র নং ৭ ইহার পরে লিখিত; সুতরাং এই পত্রটী আগে যাওয়া উচিত ছিল। তারিখ না থাকার দরুণ ইহা হইয়াছে। ইহা পড়িবার পরে সেটী পড়িয়া লইবেন। ক্ষীঃ।

পত্র নং ১২।

বঙ্গবাসী আফিস।

ক্ষীরোদ বাবু, কলিকাতা।

অদ্য আপনার পত্র পাইয়া সন্তুষ্ট হইলাম,—আপনি শুক্রবার দিন আসিবেন লিখিয়াছেন, বড়ই সন্তোষের কথা, আমি কত বল পাইলাম। সাক্ষাতে সকল কথা কহিব, কোন বিশেষ কথা আছে। অক্ষয় বাবু আসিয়াছিলেন, এখানে একদিন ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে রাখা স্থির করিয়াছি—আমি দিনকতক management দেখিব। কাজ বড় জমিয়া পড়িতেছে।

তাড়াতাড়িতে প্রুফ দিতে উল্টা পাল্টা হইয়াছে, বড় ব্যস্ত। সাক্ষাতে সকল কথা কহিব। আপনি আসিবার অন্য মত করিবেন না। শ্রীযোগেন্দ্র।

অত্র পত্রে শ্রীমতী অলকাদেবী আমার সভক্তি অভিবাদন জানিবেন।

আপনার যথা সময়ে পত্র পাইয়াছি। সখা পাঠাই। বঙ্গবাসীর ফাইল, আমি আলমারীর ভিতর রাখিয়া দিলাম। গ্রীষ্মাবকাশে কলিকাতা আসিলেই দিব। যদি বিশেষ আবশ্যক হয়, লিখিবেন। তৎক্ষণাৎ ডাকে পাঠাইয়া দিব।

আপনার প্রবন্ধ রাখিয়া দিলাম। আপনি যদি মধ্যে মধ্যে বহরমপুরের সংবাদ লেখেন, তাহা হইলে আপনার লেখা অভ্যাস হইয়া যায়।

বোধ হয় জানিয়াছেন, বঙ্গবাসীর অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে। বড় সঙ্কটকাল উপস্থিত। দেখিবেন, এ সময়ে যেন ক্ষীরোদবাবুর কলম বন্ধ না হয়।

আশা করি, আপনি ভাল আছেন। আপনার সন্তানেরা কেমন আছেন, লিখিবেন; ভরসা করি, ক্ষীরোদবাবুর ব্যথা সারিয়া গিয়াছে। ইতি—শ্রীযোগেন্দ্র।

পত্র নং ১৩।

বঙ্গবাসী কার্য্যালয়।

ক্ষীরোদ বাবু,

আজ পর্য্যন্ত কোন পত্র পাইলাম না

কেন? আমি বড় ব্যস্ত আছি, বিব্রত ততোধিক। মেশিন শীঘ্র হইবে, টাকার যোগাড় প্রায় হইয়াছে; কিছু বাকী আছে। এ বাসা ত্যাগ করিতে হইবে, কারণ মেশিন রাখিবার এখানে স্থান নাই।

আপনার প্রবন্ধটীর এবার বেশ প্রশংসা হইয়াছে। বঙ্গবাসী কেমন হইতেছে, জানিতে ইচ্ছা করি। আপনার কেমন লাগিতেছে? কি অভাব আছে, জানাইবেন।

সম্ভবতঃ ২২শে বৈশাখ আমার বিবাহ হইবে। অন্ততঃ এক সপ্তাহ আমি অনুপস্থিত থাকিব। কিন্তু সেই সময় বিষম বিভ্রাট হইবার সম্ভাবনা। এখন হইতে প্রবন্ধের যোগাড় করিতে হইবে। আপনি আগামী বারের জন্য ২টী প্রবন্ধ (একটী রাজনৈতিক অপরটী সামাজিক বা ঐতিহাসিক) পাঠাইয়া দিবেন, না দিলে চলিবে না। বড় সঙ্কটকাল। এবার একটা ছবি বঙ্গবাসীতে যাইবে। ইতি—শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র।

পত্র নং ১৪।

ক্ষীরোদ বাবু, কলিকাতা।

আপনি যাওয়ার পর জ্ঞানেন্দ্র বাবুর সহিত আমার আর কোন কথা হয় নাই; তিনিও কোন কথা উত্থাপন করেন নাই। জ্ঞানেন্দ্র বাবু অবশ্যই মনে মনে বুঝিয়াছেন যে, আমরা অংশ দিব না; কিন্তু বাহিরে আমাদের সহিত আমোদ আহ্লাদে কাটাইতেছেন। আপনি যে সন্দেহ করিয়াছিলেন

*।

বঙ্গবাসীর এক্ষণে গ্রাহক ৫৬০০। শীঘ্র ৬০০০ হইবে। ম্যাপ করিতে ৭৯৲ খরচ। ঐ টাকা ঘর থেকে লাগে নাই। ফণীর (Phanibushan) সহিত বন্দোবস্ত হইয়াছে। সপ্তাহে ১২ছত্র বিজ্ঞাপন একবৎসর কাল দিতে হইবে। ইহাতে আমাদের লাভ আছে।

জ্ঞানেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন যে, দুধ জলখাবার প্রভৃতি আমি নিজে আনিব। তাহার দরুণ আমাদিগকে তাঁহাকে মাসে ১২৲ টাকা দিতে হইবে। আমি এ প্রস্তাবের কোন উত্তর দিই নাই। তিনি আজ ৫।৬ দিন হইল নিজে ঐ সব আনাইয়াছেন। বঙ্গবাসীর গ্রাহক ৮০০০ নাম ডাক বটে কিন্তু তহবিলে টাকা মজুদ থাকে না—যত্র আয় তত্র ব্যয়—আমরা দুজনে মাসে ৩॥৵৲ টাকার বেশী খরচ করি না। যা বেশী খরচ জামা, জুতা, কাপড়; আর আমাদের কোন খরচ নাই। এক্ষণে সপ্তাহে ১২ রীম কাগজ লাগে। সুতরাং জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে মাসে ৪২৲ টাকা দেওয়া অসম্ভব। বহু কষ্টে ৩০৲ টাকা দিতেছি। আর বেশী দিতে কোথা পাইব? টাকা থাকিলে দিবার অনিচ্ছা কিছুই ছিল না। আর এক কথা, জ্ঞানেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন, ৬০০০ পুরা গ্রাহক হইলে আমাকে আর ১০৲ টাকা বেশী অর্থাৎ ৫২ টাকা দিতে হইবে।" এখন বিষম ব্যাপার উপস্থিত। আপনি সদুপদেশ দিবেন। আমার মতে জ্ঞানেন্দ্র বাবু এখন যেমন আছেন, সেই রকমই থাকুন, কিন্তু ইহার উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলে আমরা নাচার। ওখানে বঙ্গবাসীর কেমন নাম?

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র।

পুনশ্চ—আশা করি, আপনার স্ত্রী এবং পুত্র সকলে ভাল আছেন। কোন খানে বাসা করিয়াছেন?

পত্র নং ১৫।

বঙ্গবাসী কার্য্যালয়।

ক্ষীরোদ বাবু, রবিবার (রাত্রি)।

আপনার পত্র পাইয়াই উত্তর লিখি। কিন্তু

আপনি তদুত্তরে কিছুই লেখেন নাই। আমি উত্তর আশা করিয়াছিলাম। আমার উপর কি আপনি রাগ করিয়াছেন? আমি যেরূপ বুঝিয়াছিলাম, সেরূপ লিখিয়াছিলাম, মনে কিছু খল কপট রাখি নাই। আর পত্রের জবাবটী বড় তাড়াতাড়ি লিখিয়াছিলাম। ভাষা কিরূপ হইয়াছিল, মনে নাই। তাই ভাবিতেছি, ভাষা বা ভাব আপনার বুঝি রাগের কারণ হইয়া থাকিবে? ক্ষীরোদ বাবু, আপনি আমার উপর রাগ করিবেন না, আমার যাহা বিশ্বাস, তাহাই লিখিয়াছিলাম, স্বার্থের দিকে প্রবৃত্তি নাই। বঙ্গবাসীর উন্নতির জন্য যেরূপ স্বার্থ ত্যাগ করিতে বলিবেন, তাহাই স্বীকার করিব। বঙ্গবাসীর উন্নতি একান্তই প্রার্থনীয়, তবে আপাততঃ কোনরূপে সৌন্দর্য্য বা সুবিধায় মুগ্ধ হইয়া কোন কার্য্য করিয়া ফেলিলে, ভবিষ্যতে যদি কিছু গোলমাল হয়, ইহাই আমার ভাবনা। যদি ভবিষ্যতে কোনরূপ গোলযোগ ঘটে, তাহা হইলে বঙ্গবাসী সুচারুরূপে চলিবে কি? যদি পরে কোন গুরুতর কারণ বশতঃ আমাকে বঙ্গবাসী ছাড়িতে হয়, তবে কি বঙ্গবাসী ভাল ভাবে চলিবে? যদি আমি না থাকিলেও বঙ্গবাসী চলে বিবেচনা করেন, এবং আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে এই দণ্ডে আপনার অনুমতি মত কার্য্য করিব। কিন্তু আমার বিশ্বাস অন্যরূপ। আমাকে অহঙ্কারী ভাবিবেন না, আত্মগরিমা করিয়া একথা বলিতেছি না। আমি একদিনও মনে ভাবিনা যে, আমি একজন দিগ্‌গজ লেখক এবং আমার জোরেই বঙ্গবাসী চলিতেছে বা এরূপ নাম হইয়াছে। কিন্তু কাগজ চালান সম্বন্ধে এমন একটী সূক্ষ্ম হিসাব আছে, তাহা আমি কিছু কিছু বুঝি, বিশ্বাস করি। কাগজ চালান সহজ কথা নহে, ইচ্ছা করিলে যে সে পারে না। অনেক ভাবনা, অনেক চিন্তা আছে, অনেক চাল র্যাঁচ করিয়া কাগজ চালাইতে হয়। এখানেও আমাকে অহঙ্কারী ভাবিবেন না; আমার যেরূপ বিশ্বাস, সেরূপ লিখিলাম।

ক্ষীরোদ বাবু, আপনাকে বঙ্গবাসীর বিশেষ হিতৈষী বলিয়া জানি, বঙ্গবাসীর হিতৈষী আপনার মত কাহাকেও পাই নাই। সুতরাং আপনার অবাধ্য আমি কখন হইতে পারিব না। আমার কর্ত্তৃত্বে কাগজ থাকিলে কাগজের উপর আপনার যেরূপ ক্ষমতা থাকিবে (সুতরাং কাগজের প্রতি আপনার যেরূপ টান থাকিবে) অপর কাহারও কর্ত্তৃত্বে থাকিলে নিশ্চয়ই সে ক্ষমতা আপনার থাকিবে না; আপনার প্রভুত্ব বা ক্ষমতা না থাকিলে কাগজের ক্ষতি হইতে পারে।

আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, দেখিয়া শুনিয়া আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি নাই। আর অনেক কথা আছে, কিন্তু তাহা পত্রে লিখিবার নহে। আপনি বিশেষ বিবেচনা করিবেন; অনুগ্রহ করিয়া, দয়া করিয়া, শীঘ্র উত্তর দিবেন।

বঙ্গবাসীর ছাপাখানা হইয়াছে। "৭ই শ্রাবণ বঙ্গবাসীর নিজের প্রেসে বঙ্গবাসী বাহির হইবে—" লিখিয়াছি, সে কথার খেলাপ হয় নাই। তবে এবার কিছু বিলম্বে কাগজ বাহির হইয়াছে। আপনার ভয়েই এত শীঘ্র প্রেস হইয়াছে।

প্রেসটী নূতন,—Super Royal। প্রেসটী অতি সুন্দর উৎরাইয়া গিয়াছে, প্রেসে প্রায় ১৫০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে,

সমস্ত আসবাবই নুতন এবং বিলাতী কিনিয়াছি, Inking Table 60 টাকা, mould ৬৫৲ টাকা ইত্যাদি রূপে অনেক খরচ হইয়াছে। দেশী Inking Tabl এর মূল্য ১০৲ টাকা, দিশি mouldএর দাম ৮৲ টাকা, কিন্তু খারাপ জিনিষ খরিদ করি নাই।

ভরসা করি, আপনি সপুত্র, সস্ত্রীক ভাল আছেন

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র

হাস্মিটেজ }
কটক। } শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায়চৌধুরী
এম্-এ

ভারতের জাতীয় কবি হেমচন্দ্র

হেমচন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাবান্ মহাকবির বঙ্গে জন্মাইবার আবশ্যকতা ছিল। হেমচন্দ্রকে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন গঠনের অগ্রদূত বলিতেও আমি পরাঙ্মুখ নহি। বাঙ্গালার উত্তর-সাধকগণ কি ভাবে গঠিত হইবে, হেমচন্দ্রের মহতী সাধনায় তাহারই একটা দূরাগত শিঙ্গাধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। ঈশ্বরগুপ্তের ন্যায় হেমচন্দ্র বাঙ্গালার খাঁটী কবি না হইলেও, বাঙ্গালীর যে প্রাণের কবি, একথায় কোন ভুল নাই। বাঙ্গালায় হেমচন্দ্রের আদর সর্ব্বত্র সকলের মুখে এবং সর্ব্বকালে থাকিবে। কোন দল বিশেষ, স্থান বিশেষ বা ভক্ত বিশেষের ভিতর হেমচন্দ্রের সুখ্যাতি আবদ্ধ নাই; কি নূতন কি পুরাতন, কি হিন্দু কি মুসলমান, কি পূরবী কি পঞ্জাবী, মহাপ্রাণ হেমচন্দ্রকে চিরদিন হৃদয়ে রাখিবেই; তাহার কারণ, একমাত্র হেমচন্দ্রের আন্তরিকতা। হেমচন্দ্রের মুখে মধু, হৃদয়ে বিষ ছিল না। অসাধারণ স্বদেশানুরাগ বুঝি হেমচন্দ্রের ন্যায় আর কোন হৃদয়কেই ব্যথিত করে নাই—করিবেও কিনা সন্দেহ! হেমচন্দ্রের একটা সামান্য কবিতার ভিতরেও দেশের দিকে একটা অসামান্য টান দেখিতে পাই। আমার মনে হয়, হেমচন্দ্রের লেখনী-মুখে যখনি বাণী জাগ্রত হইতেন, সঙ্গে সঙ্গে দেশজননী কবির কল্পনা-নয়নে মূর্ত্তিমতী না হইয়াও থাকিতে পারিতেন না। ভারত এবং ভারতী যে অভেদ সামগ্রী। মৃত্তিকা ব্যতীত মাতৃকার মূর্ত্তি গঠিত হয় না। মৃত্তিকাকে বাদ দিয়া, দেশ-জননীকে উপেক্ষা করিয়া যাহারা শূন্যে প্রতিষ্ঠা চায়, তাহারা কি ভ্রান্ত!

প্রথম জাতীয়তার স্বপ্ন হেমচন্দ্রই দেখিয়াছিলেন, অভেদ ভারতের ছবি হেমচন্দ্রই প্রথমে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, ভারতে জাতীয়তার বীজ তিনি সর্ব্ব প্রথম বপন করিয়া যান, তিনি আমাদিগের পথপ্রদর্শক অগ্রদূত! আজ যে জাতীয়ভাব ভারতবাসীর মনে বদ্ধমূল হইতে চলিয়াছে, হেমচন্দ্রের তেজস্বিনী বাণীই তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ। জাতীয়তাকে বদ্ধমূল করিতে হেমচন্দ্র জাতিভেদকে শিথিল করিতে চাহিয়াছিলেন।

"হবে কি সেদিন হবে কিরে ফিরে
বিশ কোটী প্রাণী জাগি ধীরে ধীরে

হয়ে একপ্রাণ ধ'রে একতান
ভারতে আপনা চিনিবে ;
বুঝিবে সবাই হৃদয়-বেদনা
ভারত সন্তান জানিবে আপনা
চিনিতে স্বজাতি—স্বজাতি-কামনা
আপনার পর জানিবে !"

একদেশদর্শিতা হেমচন্দ্রে ছিল না—তাই হেমচন্দ্র শুধু বাঙ্গালার নহে, সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাগুলিকে একত্রিত করিতে চাহিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের স্বজাতি-বোধসমগ্র ভারতবাসীকে লইয়া।

শত হৃদি বাঁধা একই লহরে
পূরব পশ্চিম দক্ষিণ সাগরে
হিমগিরি আজ মিলিল ;—
ভারত-জননী জাগিল।
পূরবী পঞ্জাবী আজি ভাই ভাই—
সম ভূষানলে আশা পথে চাই—
একতার হার পরিল ॥"

হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর যেস্থানেই অন্বেষণ করি না কেন, সর্ব্বত্রই একটা শক্তির পরিচয় পাই। হেমচন্দ্রের শব্দ-শক্তির তুলনা নাই। ভারতচন্দ্রে যে শক্তি নির্ঝরিণীর ন্যায় জাগ্রতা হইতেছিল, রঙ্গলালে যে শক্তি কেবল নদীর ন্যায় উভয় কূল তরঙ্গায়িত করিয়াছিল, হেমচন্দ্রে সে শক্তি সিন্ধুর ন্যায় সহস্র তট প্লাবিত করিয়া সিংহরোষ প্রকাশ করিয়াছিল। সে শক্তি কেবল অসাধারণ স্বদেশানুরাগ হইতেই জন্মায় নাই, অসাধারণ সত্যানুরাগও হেমচন্দ্রের লেখনী-মুখে শক্তির অসামান্য পরিচয় দিয়াছিল। তাই তিনি হিন্দুসমাজের বুকের উপর বসিয়া "ভারত-কামিনী" "কামিনী-কুসুম", "কুলীন মহিলা বিলাপ" "বিধবা রমণী" প্রভৃতি কবিতাবলীতে নারীজাতির পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। আবার 'বাঙ্গালীর মেয়ে' নামক ব্যঙ্গ কবিতায় বাঙ্গালীর মেয়েকে বিদ্রূপ করিতেও ছাড়েন নাই।

দেশপ্রথা চালিত হিন্দুসমাজকে তিনি নূতন সাজে নব কলেবরে গঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে জাতিভেদের পরিবর্ত্তে জাতীয়তাকে মূলাধার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

"একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র মিলে
কর দৃঢ়পণ এ মহীমণ্ডলে
তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা।"

ইহাতেই বুঝা যায়, তিনি ভেদবুদ্ধির কত দূর বিরোধী! একমাত্র জাতীয়তাই তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল। জগতের চারিদিকে উন্নতি ও একমাত্র ভারতের অবনতি দেখিয়া তিনি বড়ই ব্যথা পাইতেন। তাই তাঁহার হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়াছিল—

"এহেন প্রকাণ্ড মহীখণ্ড মাঝে
নাহি কিরে কোন বীরাত্মা বিরাজে,
এখনি উঠিয়া করে খণ্ড খণ্ড
সমাজের জাল করাল প্রচণ্ড
স্বজাতি উজ্জ্বল করিয়া ভবে ?
চৈতন্য গৌতম নাহি কিরে আর
ভারত-সৌভাগ্য করিতে উদ্ধার ?
ঋষি বিশ্বামিত্র, রাঘব, পাণ্ডব,
কেন জন্মেছিলা মহাত্মা সে সব,
ভারত যদি না উন্নত হবে ?"

হেমচন্দ্র জড়ভরত সমাজের মুখ চাহিয়া লেখনী ধারণ করেন নাই, তিনি হৃদয়ে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, এমন কোন তোষামোদ ছিল না, যাহা তাঁহার হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ

করিতে পারিত। এক কথায় তিনি বাঙ্গালী জাতিকে—সমগ্র হিন্দু সমাজকে কষাঘাতে প্রবুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন।

"অরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার,
এই কি তোদের দয়া, সদাচার?
হয়ে আর্য্যবংশ—অবনীর সার
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে!
এখনও ফিরিয়া দেখ না চাহিয়া
জগতের গতি—ভ্রমেতে ডুবিয়া
চরণে দলিয়া মাতা, সুতা, জায়া,
এখনো রয়েছ উন্মত্ত হয়ে?"

হেমচন্দ্র হিন্দু জাতিটাকে বীরের জাতিতে, এবং হিন্দু মাতাকে বীর-জননী রূপে গঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন—

"আর কি ভারতে ওরূপে আবার
হবে রে অঙ্গনা-মহিমা প্রচার?
পেয়ে নিজ মান, পরে নিজ বেশ
জ্ঞান, দম্ভ, তেজে পূরে নিজ দেশ
বীর বংশাবলী প্রসূত হবে?"

তাই বলিয়া মনে করিবেন না যেন হেমচন্দ্র আধুনিক উন্মত্ততা ও উচ্ছৃঙ্খলতার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি স্বয়ং বীর পুরুষ ছিলেন, তিনি রমণী-জনসুলভ কেবল কবি ছিলেন না—তিনি মাতৃস্বরূপিণী রমণীকে বীরাঙ্গনারূপেই দেখিতে ভালবাসিতেন। তিনি একদিকে যেমন নবীন পন্থীদিগের উচ্ছৃঙ্খলতার ঘোর বিরোধী ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি পুরাতন-পন্থীদিগের সঙ্কীর্ণতা ও আলস্যেরও পোষকতা করিতে পারিতেন না। তিনি "বাঙ্গালীর মেয়ে" নামক ব্যঙ্গ-কবিতায় বাঙ্গালীর মেয়ের যে চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য—তাহার বিরুদ্ধে সমালোচনা চলে না। কবিতাটীর এক স্বাভাবিকতা অনুভব করুন। এমন নিখুঁত চিত্র বঙ্গ-সাহিত্যে নাই বলিলেও হয়।

"শাঁখেতে পাড়িতে ফুঁক চূড়ান্ত নিপুণ
হুলুধ্বনি কোলাহলে চতুর্ম্মুখ খুন!
রান্নাঘরে হাওয়া খাওয়া গাড়ী যুঁদে যাওয়া,
দেশশুদ্ধ লোকের মাঝে গঙ্গাঘাটে নাওয়া!
বাসর ঘরে ঝুমুর কবি চোখের মাথা খেয়ে,
প্রভাত হ'লে পিস্‌শাশুড়ী ঘোমটা মুখে চেয়ে"

আবার যে সমস্ত বঙ্গরমণীদিগের ভিতর নব্য তন্ত্র প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদিগের প্রতি কবি ইঙ্গিত করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই।

"কার্পেটে কারচুপি কাজ কারু নব্য চাল,
ঘরকন্নায় জলাঞ্জলি ভাত রাধ্‌তে ডাল!"

হেমচন্দ্র যে কিরূপ সুরসিক কবি ছিলেন, তাহা তাঁহার ব্যঙ্গ কবিতাগুলিই ব্যক্ত করিয়া দেয়—এই সব কবিতাগুলি পাঠ করিলে গুপ্ত কবিকে মনে পড়ে। হেমচন্দ্রের রসিকতার দুই একটী নমুনা আস্বাদন করুন, কখনই ধরিতে পারিবেন না যে, হেমচন্দ্রের লেখনী না ঈশ্বর গুপ্তের লেখনী? বাবুর জাতিকে হেমচন্দ্র কি চক্ষে দেখিতেন, তাহারই নিদর্শন কবির এই দুইটী পংক্তিতে সপ্রমাণ হয়।

"বাঙ্গালী বাবুর সাজ্ আমার চখে বালি।
নকলে মজবুৎ বঙ্গ আসলে কাঙ্গালী॥"

আর এক স্থলে দেখুন,—

"পরের অধীন দাসের জাতি "নেসন্" আবার তারা
তাদের আবার "এজিটেসন"—নরুণ উচু করা!"

যাঁহারা সফেদ কালা বা পূর্ব্ব পশ্চিম

এক করিতে প্রয়াসী. তাহাদের সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের ব্যঙ্গোক্তি অবধারণ করুন।

"সফেদ কালা মিশ খাবে না—
সমান হওয়া পরে!
নাচের পুতুল হয় কি মানুষ তুল্লে উঁচু ক'রে।"

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন. হেমচন্দ্রের "বৃত্রসংহারের" মোহে পড়িয়া ঈশ্বর গুপ্তের "পৌষ-পার্ব্বণকে" ভুলিলে চলিবে না। কারণ ঈশ্বর গুপ্ত বিদেশের ঠাকুরকে ত্যাগ করিয়া স্বদেশের কুকুরকেও আলিঙ্গন দিয়া সুখানুভব করিতেন। বলা বাহুল্য, হেমচন্দ্রের বিবিধ ব্যঙ্গ কবিতা গুলিতেও আমরা গুপ্ত কবির পৌষপার্ব্বণের স্বাদ অনুভব করি। হেমচন্দ্র নব্য শিক্ষা দীক্ষার ক্রোড়ে লালিত হইয়া ঈশ্বর গুপ্তকে ভুলিতে পারেন নাই। তাহা না হইলে কথনই প্রাণ খুলিয়া লিখিতে পারিতেন না।

"কোথায় ঈশ্বর গুপ্ত তুমি এ সময়।
চতুর রসিক রাজ চির রসময়॥
দেখিলে না চর্ম্ম চক্ষে হেন চমৎকার।
বঙ্গের গোগ্রহরঙ্গ ব্যঙ্গের বাজার॥

কিছুকাল যদি আর থাকিতে হে বেঁচে।
লিবার্টির জন্ম দেখে কলম নিতে কেঁচে॥"

দুঃখের কথা এই যে, তখনকার হেমচন্দ্রপ্রমুখ নব্যপন্থীরা বাঙ্গালীর খাঁটী সামগ্রীটাকে অস্বীকার করিয়া যাইতে পারেন নাই. কিন্তু এখনকার কলাবিদ্ বাবু কবিরা ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতিকে অশ্লীল বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দেন।

*কবিবর হেমচন্দ্র নূতন ও পুরাতনের সঙ্গম-স্থল। তাঁহার ভিতর গুপ্ত কবির ব্যঙ্গ রসিকতারও অসদ্ভাব নাই, আবার নব্য কবিদিগের আশা আকাঙ্ক্ষারও অপ্রতুল ছিল না। তিনি যেমন লিখিয়া গিয়াছেন—

"নরজাতি যত হের ধরা মাঝে
সকলেরি চিহ্ন কাল বক্ষে সাজে;
নিরখিলে তায় হৃদি-তন্ত্রী বাজে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা যায় পাশরি!
এছার জাতির কি আছে তেমন,
কালের কপালে সঙ্কেত লিখন?
অপূর্ব্ব কিবা সে নূতন কেতন
উড়িছে ভবিষ্য-উপরি?"

ইহাও যেমন নব্যভারতের আশার কথা, তেমনি আবার নব্যভারতের অনুকরণপ্রিয়তার প্রতি তাঁহার বিদ্রূপবাণ বর্ষণও কম নহে। নমুনা দেখুন.—

"দুর্গা কালী শিবনাম শিকেয় তুলে রাখি।
সিদ্ধ হন ফুলকুমারী, কিরণময়ী ডাকি।
বিল্ব পত্র বিনিময়ে 'বটন হোলে' আঁটা।
শ্রীমতীর কুন্তলের বাসি ফুলের বোঁটা,
ছাঁদন দড়ি বাহুলতা. ছেদন কঠিন
বাবুজী ভয়েতে ভেবে, বদন মলিন।"

এখানে হেমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তকেও পরাস্ত করিয়াছেন।

হেমচন্দ্র বিলাতের ঠাকুরকে পূজা করিয়াছেন, কিন্তু নিজের বাঙ্গালীত্বের মাপ কাঠিতে মাপিয়া,তাঁহার গ্রন্থরাজিতে এমন কোন্ ভাষা ও ভাবের প্রয়োগ চাই,যাহা কেবল হেঁয়ালীর আকার ধারণ করিয়াছে? ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল. তিনি বিদেশীয় সামগ্রী পুরাদস্তুর জীর্ণ না করিয়া নিজের লেখনী-মুখে প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু এখন অধিকাংশ লেখকেরই লেখার অজীর্ণ দোষ। নিজেই যখন পরিপাক করিতে পারেন না, তখন কেমন করিয়া অপরকে পরিপাক করাইবেন? হেমচন্দ্রের জীবন সঙ্গীত সং

ফেলোর রচিত "সাম অব লাইফের" অনুকরণ, কিন্তু কবি স্বীকার না করিলে হঠাৎ অনুকরণ বলিয়া ধরা যায় কি? আর এখনকার কবিরা নকল স্বীকার করিতে চাহেন না, অথচ দুর্ব্বোধ্যতার জন্য বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীর হস্তে তাঁহাদের নকল দিকটা কেমন সহজেই ধরা পড়িয়া যায়।

হেমচন্দ্রের "আশাকানন" ও "ছায়া-ময়ীতে" বিদেশীয় কবির অনুকরণ-চেষ্টা আছে, কিন্তু উক্ত কাব্যদ্বয়েও কবির নিজস্বের দিকটা এতই প্রবল ও পরিস্ফুট যে, সে অনুকরণে রচনার প্রাণের বিন্দু মাত্রও হানি হয় নাই। ছায়াময়ীর প্রস্তাবনাটী যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, তাহাতে কবির নিজস্ব কতটা? এবং ভাবের ঘরে চুরিই বা কতটা? কবিবর হেমচন্দ্র নিজের মাপ কাঠিতে না মাপিয়া ঝড়ের অগ্রে পরের সামগ্রী লইয়া বসিতেন না।

কবির নিজস্ব কিরূপ, দেখুন —

"সন্ধ্যা-গগনে নিবিড় কালিমা
অরণ্যে খেলিছে নিশি;
ভীত-বদনা পৃথিবী দেখিছে
ঘোর অন্ধকারে মিশি!
হী-হী শবদে অটবী পূরিছে
জাগিছে প্রমথগণ,
অট্টহাসেতে বিকট ভাষেতে
পূরিছে বিটপী বন।
কূট করতালি কবন্ধ তালিছে,
ডাকিনী দুলিছে ডালে,
বিল্ব-বিটপে ব্রহ্ম পিশাচ
হাসিছে বাজায়ে গালে।"

হেমচন্দ্র বঙ্গের অসাধারণ মৌলিক কবি ছিলেন—তাঁহার রচনার কোন স্থলেই কষ্ট-কল্পনা নাই, তাঁহার এক একটী কবিতা যেন একটী প্রবাহ! তাঁহার স্বদেশ-গাঁথা গুলির বেগ ধরিয়া রাখা যায় না। বাঙ্গালীর সব যদি যায়, আর অন্ধ হেমচন্দ্রের যদি এই অশ্রু গাঁথাগুলি বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে বাঙ্গালী আবার সব ফিরিয়া পাইবে। এমন প্রবল উচ্ছ্বাসে আর কোন কবিই দেশের দুঃখে কাঁদে নাই। আজ যে বাঙ্গালীর বুকে একটা উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার আদি কারণ হেমচন্দ্র।

"কুহুস্বর" নামক কবিতায় হেমচন্দ্র বাঙ্গালী জাতিকে যে কত দূর ভালবাসিতেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। হেমচন্দ্রের স্বজাতি-প্রীতি যাঁহারা দেখিতে পান না তাঁহারা 'কুহুস্বর' পাঠ করুন, দেখিবেন, হতভাগ্য বাঙ্গালীর দুঃখে তিনি কি উচ্ছ্বাস ঢালিয়া গিয়াছেন! ওই 'কুহুস্বরে' তিনি বাঙ্গালীর আবাল বৃদ্ধ বনিতার প্রাণে নব আশার স্রোত বহাইয়া গিয়াছেন।

"বঙ্গবালা, বৃদ্ধ, যুবা শিশুক কাঁদিতে,
হৃদি ভ'রে জীবনের উচ্ছ্বাস তুলিতে।"

যাঁহারা "ওই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে" শীর্ষক কবিতাটিকে হেমচন্দ্রের কলঙ্ক বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহারা কুহুস্বরের নিম্নলিখিত স্থানটী লক্ষ্য করুন।

"হে কামিনীকুল মৃত বঙ্গের পীযুষ।
কর পণ শিখাবারে, পতি, পুত্র, তনয়ারে
সফল করিতে এই কবির স্বপন।
রেখো মনে দ্রৌপদীর বেণী বাঁধা পণ!"

আর এক স্থলে বলিতেছেন,—

"জগৎ ভাসানো বেগ বঙ্গেতে কোথায়,
বহে যদি সে তরঙ্গ কাহারও হৃদয়?
গাওহে তবে সে গীত, শুনায়ে কর জীবিত,

নিঃস্রোত বঙ্গের হৃদি স্রোতেতে ডুবাও ঃ—
রহস্য, রোদন কিম্বা উৎসাহে ভাসাও ”

“কুহুস্বর” হেমচন্দ্রের বাঙ্গালী-প্রীতির জ্বলন্ত পরিচয়।

হেমচন্দ্র বাঙ্গালী জাতিকে ধিক্কার দিয়া জাগাইতে আসিয়াছিলেন। যাহারা দেশপ্রথার মোহে অন্ধ, তাহাদের চেতন উৎপাদন করাই হেমচন্দ্রের জীবনব্যাপী সাধনা ছিল। হেমচন্দ্রের রচনার অনেক স্থলে প্রসাদ গুণের অভাব হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার কর্কশ প্রকৃতি যে ওই ‘কুহুস্বরে’র মত আমাদিগের জীবনকে একদিন সরস করিয়া তুলিবে না, তাহা কে বলিতে পারে ? হেমচন্দ্র আমাদিগকে আঘাত দিতে আসিয়াছিলেন—সে আঘাতে আক্ষেপ করিবার কিছুই নাই, সে আঘাত আজ আমরা জীবনের আশীর্ব্বাদ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। অক্ষয়চন্দ্র সে আঘাতের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই, তাই বাঙ্গালীর জাতীয় কবি হেমচন্দ্রকে নানাদিক হইতে আক্রমণ করিয়াছেন—এবং প্রশংসা স্থলেও প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিতে পারেন নাই।

স্বদেশ এবং স্বজাতির জন্য হেমচন্দ্রের ক্রন্দন সর্ব্বত্র—তাহাতে নকল কিছুই ছিল না—নাম কিনিবার চেষ্টা ছিল না, তাহাতে ছিল কেবল আত্ম বিসর্জ্জন ও জাতীয় কল্যাণ। বৃত্রসংহারেও কবির ক্রন্দন—ওই বেদনা—ওই দুঃখ—ওই সাধনা।

“সসর্প গৃহেতে বাস পরবশ আর,
দুই তুল্য জীবিতের দুই তিরস্কার।
ব্রহ্মলোক বৈকুণ্ঠ কৈলাসে নাহি ভেদ
যেইখানে পরবশ, সেইখানে খেদ।”

বীরবাহু কাব্যের রচনা কাল হইতে কবিবর হেমচন্দ্র মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত স্বদেশের ভাবনা ভুলিতে পারেন নাই। অক্ষয়চন্দ্র তাঁহার প্রতি জাতিবৈরদোষ আরোপ করিয়া অবিচার করিয়াছেন এবং জাতি-বৈর না দেখাইয়া তিনি স্বদেশের জন্য ইংরাজের সহানুভূতি প্রার্থনা করিয়াগিয়াছেন। তাঁহার রেলগাড়ী শীর্ষক কবিতায় তিনি ইংরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

“জড়ে প্রাণ দিতে পার দেবের দর্পেতে
পার না কি বাঁচাইতে নির্জ্জীব ভারতে ?”

তাঁহার বিন্ধ্যগিরি কবিতাতেও তিনি তাঁহার দেশবাসীকে ইংরাজ-প্রদর্শিত পথে চলিতে বলিয়াছেন।

“না থাকিলে এ ইংরাজ
ভারত অরণ্য আজ,
কে দেখাত কে শিখাত,
কেবা পথে লয়ে যে’ত—
যে পথ অনেক দিন করেছ বর্জ্জন!
ছিঁড়ে ফেল পূর্ব্ববেদ,
ভোল সে প্রাচীন ভেদ—
অই—ভারতের গতি রেখোরে স্মরণ
হে ভারতব্যাপী গিরি, রেখোরে স্মরণ,
ভবিষ্যৎ পারাবার
পার হইতে অন্য আর
ভারতের নাহি ভেলা,
ভারত জীবন খেলা
একত্র ওদেরি সঙ্গে—উত্থান পতন!”

এই সব উচ্ছ্বাসগুলিতে জাতিবৈর কোথায়, তাহাত আমি বুঝিতে পারিলাম না, বরং এই গুলিতে ইংরাজের প্রতি হেমচন্দ্রের অসামান্য কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পায়! প্রবীণ অক্ষয়চন্দ্রের বিগত হেমচন্দ্রের প্রতি এই দোষারোপ কতদূর সঙ্গত, তাহা সকলে বিবেচনা করুন। তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন না বটে, জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিভেদ মানিতেন

না বটে, কিন্তু তিনি যে স্বদেশপ্রাণ ছিলেন, ভারত প্রাণ ছিলেন, তাহাতে আর ভুল নাই। তাঁহার স্বদেশপ্রেমিকতা কেবল ক্ষুদ্র বঙ্গ-ভূমির ভিতরেই আবদ্ধ ছিল না, তাঁহার স্বজাতিপ্রিয়তা কেবল বাঙ্গালীকে লইয়াই সন্তুষ্ট হইত না, তিনি কি হিন্দু কি মুসলমান, সকলকেই একতার হারে বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন। তাই রাখীবন্ধন-উৎসব, ভারতের নিদ্রা-ভঙ্গ নামক কবিতায় ভারতের আর একটী সহোদর ভাই মুসলমানকে তিনি বাদ দেন নাই। আমি পূর্ব্বে একবার বলিয়াছিলাম, বঙ্কিমে একদেশদর্শিতা ছিল, মুসলমান-বিদ্বেষ ছিল, কিন্তু দূরদর্শী হেমচন্দ্র মুসলমানকে ভারতের আর এক সন্তান বলিয়া জানিতেন এবং ভাই বলিতে লজ্জাবোধ করিতেন না। কবিবর উক্ত কবিতায় লিখিয়া গিয়াছেন—

"তোমার নন্দন মহাত্মাগণ—
বাহুবলে যার ধরণী টলে,
ডাকিছে তোমায় সবে একস্বর
জাগো মা ভারত জাগো মা বলে।
একা বঙ্গ নয় হিমালয় হতে
কুমারীর প্রান্ত যেখানে শেষ,
আজি একপ্রাণ হিন্দু মুসলমান
জাগাতে তোমায় জেগেছে দেশ॥"

বঙ্কিমচন্দ্র ও হেমচন্দ্রে প্রভেদ এই যে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গ ও বাঙ্গালীকেই তুলিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু অভেদ ভারতই হেমচন্দ্রের একমাত্র আদর্শ ছিল। তাঁহাতে জাতিভেদ ছিলনা—জাতীয়তা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সপ্তকোটী পর্য্যন্ত লক্ষ্য ছিল, তাহাতেও আবার মুসলমান বাদ পড়িয়াছে, হেমচন্দ্রের লক্ষ্য ত্রিশকোটী ভারতবাসীকে লইয়া, তাহাতে কেহই বাদ পড়ে নাই! এই সর্ব্বদর্শিতার জন্যই হেমচন্দ্রের স্থান সকলের উচ্চে! বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যে চণ্ডীদাসের যে স্থান, বঙ্গের নবীন সাহিত্যে হেমচন্দ্রের সেই স্থান, সেই অধিকার। বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য ও সভ্যতার চণ্ডীদাস অগ্রদূত ছিলেন, বঙ্গের নবীন সাহিত্য ও সভ্যতার হেমচন্দ্র অগ্রদূত! হেমচন্দ্র শুধু বঙ্গ ও বাঙ্গালীর নন হেমচন্দ্র ভারত ও ভারতবাসীর কবিগুরু!! হেমচন্দ্র নব্যভারতের জীবনদাতা এবং নব্যভারতে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠাতা। হেমচন্দ্র নব্যভারতের ভবিষ্যৎগঠন করিয়া গিয়াছেন। হেমচন্দ্রের বীণা নব্যভারতের ভবিষ্যৎকে প্রতিধ্বনিত করিতেছে, হেমচন্দ্রের স্থান ভবিষ্যতের আশা ও ভরসার উপর স্থাপিত হইয়াছে। হেমচন্দ্র মরেন নাই, মরিতে পারেন না—হেমচন্দ্র ভবিষ্যতের গর্ভে আবার জন্মাইতেছেন। ভবিষ্যতের গর্ভে বসিয়া হেমচন্দ্র আজিও গাহিতেছেন—

"হবে অগ্রসর সেই আশা-পথে
তিলেক তাহাতে নাহি সংশয়,
দিয়াছে দেখায়ে যে পথ উহারা
হবে পরিসর ক্রমে নিশ্চয়॥
দিয়াছে যখন দেখায়ে সে আলো
দিয়াছে যখন দেখায়ে পথ,
আজি আর কালি, তাহাতে পশিব
সাধনে পূরাবো স্ব-মনোরথ॥"

প্রবন্ধের উপসংহারে আমি দুই একটী অপ্রিয়কর কথার উত্থাপন করিব। প্রবীণ সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র বলিয়াছেন, "হেমচন্দ্রের কাব্যের কৃতিত্ব স্বধর্ম্মানুরাগ পর্য্যন্ত পৌঁছে নাই। তিনি শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি, শিক্ষিত বাঙ্গালীর সাধারণত ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই। হেমবাবুর কাব্যেও সাধারণত নাই। তিনি কোথাও স্মরণ শক্তিগুণে স্বদেশানুরাগী কোথাও জাতি-বৈর-বলে স্বজাতি-বৎসল। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত।"

এমন খেলোভাবে আর কোন সমালোচকই কবির প্রতিভাকে উড়াইয়া দেন নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হেমচন্দ্রের স্বদেশ সমগ্র ভারতবর্ষকে লইয়া, হেমচন্দ্রের স্বজাতি সমস্ত ভারতবাসীকে লইয়া। হেমচন্দ্রের এই সমগ্রভাবকে তলাইয়া বুঝিলে জীবিত অক্ষয়চন্দ্র মৃত হেমচন্দ্রকে এতটা লঘু করিতে কখনই সাহসী হইতেন না। অক্ষয়চন্দ্রের এমনভাবে আক্রমণ হেমচন্দ্রের জীবদ্দশাতে করাই উচিত ছিল, তাহা হইলে অক্ষয়চন্দ্রের আপত্তির একটা মীমাংসা হইয়া যাইত। হেমচন্দ্রের স্বধর্ম্ম কি? ইহার উত্তরে আমি বলিব, সমগ্র ভারতবাসীর যাহা স্বধর্ম্ম, হেমচন্দ্রের তাহাই স্বধর্ম্ম! ভারতবাসী ও ভারতবর্ষের স্বধর্ম্ম কি? ভারত কর্ম্মভূমিশ্চ অন্যেতু ভোগ ভূময়! শুধু ভারতবর্ষের নহে, সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডের মনস্তত্ব ধর্ম্মপ্রাণতা—ত্যাগ এবং পরলোকে বিশ্বাস। ভাগ্যদোষে অন্ধ হইলেও হেমচন্দ্রের দর্শন শক্তি বহুদূর বিস্তৃত ছিল, বহুপ্রাণ ব্যাপিয়া ছিল, ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা এবং স্বার্থরক্ষাই হেমচন্দ্রের যথাসর্ব্বস্ব ছিল না, তাই দশমহাবিদ্যায় ক্ষণজন্মা হেমচন্দ্রের প্রতিভা অনন্ত ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। হেমচন্দ্রের হৃদয়ের মহানুভবতার যদি পরিচয় চাও, দশমহাবিদ্যা বুঝিতে চেষ্টা কর। বুঝিবে, কবির লক্ষ্য কোথায়, প্রতিভার উচ্চ চূড়া কোন্ শিরদেশে? ভিকতর হুগো বলিয়াছেন, "A genius is a promontory into the infinite." আমি বলি, কেবল অনন্তের উদ্দেশ্যেই প্রতিভার অভিযান নহে, ভবিষ্যতের গর্ভেও প্রতিভার ধ্রুব লক্ষ্য—তাই জর্ম্মানির শেষ দার্শনিক কবি নিট্সে বলিয়াছিলেন, I am future! আমাদিগের মহাকবি হেমচন্দ্রেরও অনন্ত এবং ভবিষ্যতের পথেই মহাযাত্রা! হেমচন্দ্রকে বুঝিবার এখনও সময় আসে নাই। হেমচন্দ্র যে কতবড় প্রতিভাশালী, তাহা আমাদিগের তলাইয়া বুঝিবার সামর্থ্য কোথায়, শিক্ষা কোথায়? সে সুযোগ এবং সংযোগ কোথায়? জড় কি কখনও জীবনের গতি বুঝিতে পারে? আর আমরা যে জড়েরও অধম! দশমহাবিদ্যায় শিব-নারদ সংবাদে হেমচন্দ্র সে সন্দেহ ভঞ্জন করিতে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছেন।

"কেবা হেন মতিমান, কে ধরে সেইজ্ঞান,
জানিবে সুগভীর জগদীশ মরমে,
অনন্ত পরমাণু, বিরাট বিদ্যুদ্ ভানু,
উদ্ভব কোথা হ'তে, কি হইবে চরমে?
হর হরি ব্রহ্মাণ, অচেতন জীবগণ
আদিতে দিল কিবা জনমিল কারণে?
মানস কিরূপ ধন, জড়েই কি বিশেষণ,
জড়সনে সঞ্চারে কিবা বিধিমননে?
সুখ কি জীবিত মানে? কিবা অর্থ নির্ব্বাণে?
কা হ'তে জনমিল জগতের যাতনা?
অশুভ সৃজন কার? নিরমল বিধাতার
মানস হইতে কি এ মলিনতা রচনা?"

দশমহাবিদ্যায় নারদের এই সন্দেহবাদ কবি মীমাংসা করিয়াছেন, কবি দেখাইয়াছেন—

"জগৎ অশুভ নয়, কালেতে হইবে লয়
জীব দুঃখ সমুদয় ত্রিগুণার ভজনে।"

আর প্রবীণ সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র অনন্তদর্শী হেমচন্দ্রকে সবলে নাস্তিক, বিশ্বাসহীন করিয়া তুলিয়াছেন! হেমচন্দ্রের হৃদয়ের গভীরতার এবং বিশালতার সঠিক মীমাংসা করিতে হইলে অগ্রে পাঠক মাত্রকেই দশমহাবিদ্যা বুঝিতে হইবে। হেমচন্দ্রকে ক্ষুদ্র করা যত সহজ, হেমচন্দ্রকে উচ্চে তোলা তত সহজ নহে। তাহাতে সমালোচকের গভীর অভিনিবেশ ও সুমহান্ হৃদয়ের প্রয়োজন।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—

"যতদিন দেশী-বিদেশীতে বিজিত-জেতৃ-সম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন আমরা নিকৃষ্ট হইলেও, পূর্ব্ব গৌরব মনে রাখিব, ততদিন জাতি-বৈর সমতার সম্ভাবনা নাই। আমাদিগের সৌভাগ্য-ক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদিগের জাতি-বৈর ঘটিয়াছে।" ইহা যদি সত্য হয়, তবে আর স্বর্গগত অন্ধ কবি বেচারা হেম-চন্দ্রকে লইয়া অক্ষয়চন্দ্রের এত দাহ-নিবারণ কেন? এবং তাঁহার ভারত-জাগান ভাবকে "ভারতের বানর-জাগান উৎসাহ" বলিয়া উপহাস করাই বা কেন? তাহার কারণ কি সেই রসের তুক্ক—ভতোম প্যাঁচার গান যাহা 'নবজীবনে'শ্রীরসিক মোল্লা গাহিয়াছিলেন?

"আসর জাঁকায়ে বসো তুমি অতঃপর
গাল জোড়া ফ্যাঁসা গোপ বুড়ো দিগম্বর,
চুঁচুড়ার কিনারায় যাঁর পীঠ স্থান,
হৃদয় ক্ষীরের খনি, আকারে পাঠান,"

ইহাই কি হেমচন্দ্রের অপরাধ?

আর প্রবীন সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় নিজেই যখন বুঝিতে পারিতেছেন যে—"এই স্বধর্ম্মা-নুরাগ দেশে যখন প্রবল ছিল, তখন স্বদেশ-ভক্তি, স্বজাতি-বৎসলতা বলিয়া হাঁকাহাঁকি. ডাকাডাকি করিবার প্রয়োজন হয় নাই। এখন বোধ করি হইয়াছে,—কেননা—"সীতা-হারা হয়ে রামের বাঁদরে আদর," আর এই বানরের সাহায্যেই হয় ত আবার সীতার উদ্ধার হইবে।

"দেশ-ভক্তির,জাতি-ভক্তির দোহাই দিতে হয় ত, আমরা ক্রমে স্বধর্ম্মানুরাগী হইব।" আরও যখন বুঝিতেছেন—"এই বানর আনিয়াছেন, বা ঝোপে ঝোপে ছিল—তাহাদের বাহির করিয়াছেন, লাফাইতে দিয়াছেন—হেমবাবু!" তবে কেন "হেমচন্দ্রের কাব্যের কৃতিত্ব স্বধর্ম্মানুরাগ পর্য্যন্ত পৌছে নাই" বলিয়া অক্ষয়চন্দ্র বৃথা আক্ষেপ করেন? অগ্রে স্বদেশভক্তি এবং স্বজাতিবৎসলতা জাগিয়া উঠুক, স্বধর্ম্মানুরাগ আপনাপনি ফিরিয়া আসিবে। এখন ত আমাদিগের ভিতর ঘোর সন্দেহ ও প্রলয়ের অবস্থা—জাতি ভেদ এবং স্বধর্ম্ম-রক্ষা এখন যে প্রলয়ের অতল জলে হাবুডুবু খাইতেছে। তাই হেম-চন্দ্র ভারতের ছত্রিশ-জাতিকে এক করিতে, বিশ কোটী কণ্ঠ এক সুরে বাঁধিতে বিরাট জাতীয়তার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। "ভারত-বাসীর ত অক্ষয়চন্দ্রের ন্যায় জাতীয় জীবনই নাই" বলিয়া হতাশ হইলে চলিবে না, জাতীয়-তার পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। স্বধর্ম্মপালন মুখের কথা নহে, তাহার অগ্রে স্বদেশ এবং স্বজাতির—ভারত এবং ভারত-বাসীর প্রতিষ্ঠা চাই। সে প্রতিষ্ঠা আনিতে হইলে অক্ষয়চন্দ্রের কেবল "আভিজাত্যের গৌরবেই" কুলাইবে না, হেমচন্দ্রের নিম্ন-লিখিত বাণীগুলিকেও সম্যকরূপে চরিতার্থ করিতে হইবে।

"জন্ম বৃথা, কর্ম্ম বৃথা, বৃথা বংশ জাতি,
কীর্ত্তিমান্ জনকের পুত্র হওয়া বৃথা।
স্বনামে যদি না ধন্য হয় সর্ব্বলোকে
জীবনে জীবনঅন্তে চিরস্মরণীয়।"

রুদ্রপীড়ের মুখে বৃত্র-সংহার কথার ইহাই প্রধান উপদেশ।

হেমচন্দ্র স্বনামধন্য মহাপুরুষ ছিলেন বলিয়াই এই সারসত্য পূর্ব্বাপুরুষাভিমানী অতীত মোহভারাক্রান্ত হিন্দু জাতিকে শুনাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমি খিদির-পুরবাসীর হইয়া অনেক অপ্রিয় কথা বলিলাম, কারণ হেমচন্দ্রের অযথা নিন্দায় আমরা বড় ব্যথা পাই—তজ্জন্য উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী এবং মাননীয় সভাপতি মহাশয় আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীঅকিঞ্চন দাস।

আত্মার অমরত্ব।

আমরা পৃথিবীতে যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই, তৎসমস্তই ধ্বংসশীল ও মরণশীল। এই সমস্ত দেখিয়া উৎপত্তি ও বিনাশই জগতের নিয়ম বলিয়া বোধ হয়। তাহাতেই শাস্ত্রকার লিখিয়া গিয়াছেন "সর্ব্বমুৎপত্তি ভঙ্গুরম্"---উৎপন্ন বস্তু মাত্রেই ভঙ্গপ্রবণ (ক্ষণস্থায়ী)। পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা এই প্রকারে জগতের সমস্ত বস্তুর নশ্বরত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াই আর্য্য ঋষিগণ ইহাকে 'মর্ত্ত্যলোক' নাম প্রদান করিয়াছেন। 'মর্ত্ত্য' শব্দ দ্বারাই জগতের সমস্তই যে মৃত্যুর অধীন, অর্থাৎ মরণশীল, তাহা নিঃসংশয়রূপেই প্রকাশিত হয়। এবংবিধ 'মরজগতে' অমরত্বের সন্ধান যে আর্য্যদিগের সাধারণ চিন্তাশীলতার কার্য্য নহে, তাহা সহজেই অনুধাবন করা যাইতে পারে। এই অমরত্ব সন্ধানের ইতিহাস অনুসরণ করিলে আমরা ইহার সহিত আর্য্য চিন্তার ইতিহাস-সূত্রও আশ্চর্য্যরূপে সংগ্রথিত দেখিতে পাইব।

আর্য্য ঋষিগণের প্রথম অমরত্ব সন্ধানের নিদর্শন আমরা বেদেই দেখিতে পাই। মৃত্যু অবস্থার পর্য্যবেক্ষণ হইতেই ঋষিগণ প্রথম অমরত্বের ধারণায় উপনীত হন বলিয়া মনে হয়। মৃত্যুতে আমাদের সমস্ত দেহই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, দেখিতে পাইলেও, একটী বস্তুকে তাঁহারা অবিনশ্বর বলিয়া অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। নিম্নোদ্ধৃত বৈদিক ঋকে পূর্ব্বোক্ত ধারণার বিশদ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় :—

সূর্য্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মাত্মাং চ গচ্ছ
পৃথিবীং ধর্ম্মণা।
অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তেহিতমোষধীষু
প্রতিতিষ্ঠা শরীরৈঃ ॥৩
অজো ভাগস্তপসা তংতপস্ব তংতে শোচি-
স্তপতু তংতে অর্চ্চিঃ ॥
যাস্তে শিবাস্তন্বো জাতবেদস্তাভি র্বহৈনং
সুকৃতামু লোকম্ ॥৪

ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ১৬ সূক্ত।

"হে মৃত! তোমার চক্ষু সূর্য্যে গমন করুক, তোমার শ্বাস বায়ুতে যাউক। তুমি তোমার পুণ্যফলে আকাশে ও পৃথিবীতে যাও। অথবা যদি জলে যাইলে তোমার হিত হয়, তবে জলে যাও। তোমার শরীরের অবয়ব গুলি উদ্ভিজ্জবর্গের মধ্যে যাইয়া অবস্থিতি করুক। এই মৃত ব্যক্তির যে অংশ অজ অর্থাৎ জন্ম-রহিত, চিরকালই আছে, হে অগ্নি! তুমি সেই অংশকে তোমার তাপ দ্বারা উত্তপ্ত কর, তোমার ঔজ্জ্বল্য, তোমার শিখা, সেই অংশকে উত্তপ্ত করুক। হে জাতবেদা বহ্নি! তোমার যে সকল মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি আছে, তাহাদিগের দ্বারা এই মৃত ব্যক্তিকে পুণ্যবান্ লোকদিগের ভুবনে বহন করিয়া লইয়া যাও।"

উৎপন্ন মাত্রই বিনাশশীল—সুতরাং অবিনাশী অংশ 'অজ' অর্থাৎ জন্মহীন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় ইহা যে অমর, তাহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে।

উল্লিখিত অবিনশ্বর বস্তু যেমন উদ্ধৃত ঋকে'অজ' অর্থাৎ জন্ম-রহিত বলিয়া বিশেষিত হইয়াছে—তেমনই অন্যত্র স্পষ্ট 'অমর্ত্ত্য' অর্থাৎ 'অমর' বলিয়াও বিশেষিত হইয়াছে যথা—"জীবো মৃতস্য চরতি স্বধাভি রমর্ত্ত্যো মর্ত্ত্যেনা সযোগিঃ।" ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল, ১৬৪ সূক্ত।

"মর্ত্ত্যের সঙ্গে একত্র উৎপন্ন মর্ত্ত্যের অমর জীব স্বধা ভক্ষণ করতঃ (চিরকাল) বিচরণ করে।" রমেশ বাবুর অনুবাদ।

উদ্ধৃত ঋকে 'অমর্ত্ত', বা 'অমর' বস্তুটী 'জীব' নামে আখ্যাত হওয়ায় ইহাকে জীবনের সত্তাভূত মূল তত্ত্ব বা 'জীবাত্মা' তাহার পরিষ্কার আভাসই পাওয়া যাইতেছে।

প্রথমোদ্ধৃত ঋক্ হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, মৃত্যুর পর অপর শরীরোপাদানের ন্যায় আত্মা নাশ বা লয় প্রাপ্ত হইয়া আকাশ ও পৃথিবীতে নানা পদার্থের মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে।

উপরিউদ্ধৃত ঋক্‌গুলির মর্ম্ম বিশেষরূপে অনুধাবন করিলে কিরূপ যুক্তিমার্গের দ্বারা আর্য্যঋষিগণ আত্মার নিত্যত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। আত্মার নিত্যত্বপক্ষে তাঁহাদের প্রথম যুক্তি ইহার জন্ম নাই অর্থাৎ ইহা 'অজ', দ্বিতীয় যুক্তি ইহার ধ্বংস নাই, অর্থাৎ ইহা 'অমর্ত্ত্য'; তৃতীয় যুক্তি ইহার কর্ম্ম সমাপ্তির আবশ্যকতা।

প্রথমোদ্ধৃত ঋকে যে 'দ্যাং চ গচ্ছ পৃথিবীং কর্ম্মণা' বলিয়া পাওয়া গিয়াছে—তাহাতেই নিজের ধর্ম্মের দ্বারা মৃত্যুর পরও ক্রিয়াশীল থাকে, তাহার আভাস পাওয়া যায়। এই ধর্ম্ম সুতরাং কর্ম্মেরই নামান্তর বলিয়া বুঝিতে হইবে।

জর্ম্মান দার্শনিকপ্রবর কেন্ট আত্মার ধর্ম্মের পূর্ণপরিণতিকেই আত্মার অমরত্বের ও তৎসঙ্গে সঙ্গে জন্মান্তরবাদের মূলযুক্তিরূপে প্রখ্যাপিত করিয়াছেন :—

"The well-known argument of Kant also, which bases immortality on the realisation of the moral law implanted in us, a result only attainable by an infinite process of approximation, tells not for immortality in the usual sense, but for transmigration." The Philo- of the Unpanisheds by Paul Deussen P. 315.

"কেন্টের সুবিদিত যুক্তিতে অমরত্ব আমাদের অন্তর্নিহিত নৈতিক নিয়মের উৎকর্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—যে উৎকর্ষরূপ ফল কেবল উন্নতির অনন্ত প্রক্রিয়া-দ্বারাই লব্ধ হইতে পারে এবং যাহা প্রচলিত অর্থে অমরত্বের নির্দ্দেশক নহে, জন্মান্তর-বাদেরই নির্দ্দেশক।"

কেন্টের উপরিউদ্ধৃত যুক্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারি, কি প্রকারে আমাদের কর্ম্মবাদ আমাদের পুনর্জ্জন্মবাদের প্রতিপাদক হইয়া ইহার অমরত্বেরও প্রতিপাদক হইয়াছে।

ধর্ম্মকর্ম্মের প্রভাবে আত্মা কিরূপে অমরত্ব প্রাপ্ত হয়—বেদে তাহার যেরূপ উজ্জ্বলচিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত বৈদিক বর্ণনা হইতে তাহা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে :—

"যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিঁল্লোকে স্বর্হিতম্।
তস্মিন্ মাং ধেহি পবনামৃতেলোকে অক্ষিত
ইন্দ্রায়েন্দোপরিস্রব ॥৭
যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্রাবরোধনং দিবঃ।
যত্রামূর্যহ্বতীরাপস্তত্র মামৃতং কৃধীন্দ্রা-
য়েন্দো পরিস্রব ॥৮
যত্রানুকামং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ।
লোকাযত্র জ্যোতিষ্মন্তস্তত্র মামমৃতং
কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব ॥৯
যত্রকামা নিকামাশ্চ যত্র ব্রধ্নস্য বিষ্টপম্।
স্বধাচ যত্র তৃপ্তিশ্চ তত্রমামমৃতং কৃধীন্দ্রা-
য়েন্দোপরিস্রব ॥১০
যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতং
কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব ॥"

ঋগ্বেদ ৯ম মণ্ডল ১১৩ সূক্ত।

"যে ভুবনে সর্ব্বদা আলোক, সেস্থানে স্বর্গলোক সংস্থাপিত আছে; হে ক্ষরণশীল! সেই অমৃত ও অক্ষয়ধামে আমাকে লইয়া চল। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।"

"যেস্থানে বৈবস্বত রাজা আছেন, যেস্থানে স্বর্গের দ্বার আছে, যেস্থানে এই সমস্ত প্রকাণ্ড নদী আছে, তথায় আমাকে লইয়া গিয়া অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।"

"সেই যে তৃতীয় নাগলোক, তৃতীয় দিব্যলোক, যাহা নভোমণ্ডলের উর্দ্ধে আছে, যথায় ইচ্ছানুসারে বিচরণ করা যায়, যেস্থান সর্ব্বদা আলোকময়, তথায় আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।"

"যথন সকল কামনা নিঃশেষে পূর্ণ হয়, যথায় প্রধ্নানামক দেবতার ধাম আছে, যথায় যথেষ্ট আহার ও তৃপ্তিলাভ হয়, তথায় আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।"

"যথায় বিবিধপ্রকার আমোদ, আহ্লাদ, আনন্দ বিরাজ করিতেছে, যথায় অভিলাষী ব্যক্তির তাবৎ কামনা পূর্ণ হয়, তথায় আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।"

এইপ্রকারে স্বর্গলোকে অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া আত্মা যে সম্পূর্ণ দেবরূপে পরিণত হয়—তাহারও স্পষ্ট বর্ণনাই বেদে দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

"মহিম্ন এষাং পিতরশ্চনেশিরে দেবা দেবেষ্বদধুরপি ক্রতুম্।
সমবিব্যচুরুত যান্যত্বিষুরৈষাং তনূষু নিবিশুঃ পুনঃ॥" ৪

ঋগ্বেদ ১০ম খণ্ড ৫৮ সূক্ত।

"আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ দেবতার মত মহিমার অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেবতাদিগের সহিত ক্রিয়াকলাপ করিয়াছেন। যে সকল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ দীপ্তি পাইয়া থাকে; তাঁহারা উহাদিগের সহিত একীভূত হইয়াছেন, তাঁহারা দেবতাদিগের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।"

দেবের এক নাম 'অমর', দেবত্ব প্রাপ্ত হওয়াতে আত্মাও সুতরাং অমররূপেই পরিণত হয়।

অমরত্ব লাভ সম্বন্ধে আমরা উপরে যে সমস্ত ঋক্ উদ্ধৃত করিয়াছি, কামনার নিবৃত্তিই যে অমরত্বের প্রধান রহস্য, তাহাই তৎসমস্তের মূল তাৎপর্য্য বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। কামনার দ্বারাই কার্য্য প্রবর্ত্তিত হয়, সুতরাং কামনার নিবৃত্তিতে কার্য্যের নিবৃত্তিও অবশ্যম্ভাবী। এই প্রকারে কামনার নিবৃত্তি সাধিত হইয়াই আত্মার পরম চরিতার্থতা লাভ হইয়া থাকে। ইহাই কেণ্টের উদ্দিষ্ট নৈতিক আদর্শের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি। এই অবস্থাই গীতার কথায় এইরূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

"তদ্বৎ কামাযং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
সশান্তি মাপ্নোতি ন কামকামী॥"

আমরা যে আত্মার স্বর্গ গমনের বৃত্তান্ত উপরে পাইয়াছি, তাহা যে সর্ব্বস্থলে একেবারেই সম্ভবপর হইতে পারে, তাহা নহে, আত্মার বহু জন্ম গ্রহণের পরই সাধারণতঃ তাহা ঘটিয়া থাকে। বেদের অপর একস্থল পাঠ করিলে আত্মা কিপ্রকারে বহু জন্মের মধ্যে দিয়া আপনার কার্য্যকারিতা চরিতার্থ করে, তাহার স্পষ্ট আভাসই পাওয়া যায়।

"অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমাচ পরাচ পথিভিশ্চরন্তম্।
স সধ্রীচীঃ স বিষুচীর্বসান আ বরীবর্ত্তি ভুবনেষন্তঃ॥৩

ঋগ্বেদ ১০ম খণ্ড ১৭৭ সূক্ত।

"দেখিলাম, এক গোপাল তাহার কখন পতন নাই, কখন নিকটে, কখন দূরে, নানা-পথে ভ্রমণ করিতেছে। সে কখন অনেক বস্ত্র একত্রে পরিধান করিতেছে, কখন কখন পৃথক্ পৃথক্ পরিধান করিতেছে। এইরূপে সে বিশ্ব সংসার মধ্যে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতেছে।"

এস্থলে আত্মাকে 'অনিপদ্যমান' (অপতন-শীল) বলিয়া নির্দ্দেশ করায় ইহার অমরত্ব স্পষ্টরূপেই স্বীকৃত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত বর্ণনার তাৎপর্য্য ইহাই উপলব্ধ হয় যে, আত্মা যত দিন কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ থাকে, ততদিনই সংসার-চক্রে ইহার পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন হইতে থাকে। সুতরাং আত্মার সংসার অবস্থাই কর্ম্মাবস্থা বলিতে হয়। এই কর্ম্ম নিবৃত্ত হইয়া বিশ্রামাবস্থা উপস্থিত হইলেই স্বর্গাবস্থা। সংসার আত্মার বাসনা-জনিত অশান্তির অবস্থা। স্বর্গ আত্মার বাসনা তৃপ্তির নিরবচ্ছিন্ন সুখের অবস্থা। স্বর্গ নামের মধ্যে এই সুখের অর্থ পাওয়া যায়। স্বর শব্দের অর্থ পরম সুখ, স্বর্ বা পরম সুখের অবস্থায় গমন অর্থেই গম্ ধাতুর সহিত যোগে "স্বর্গ" শব্দ গঠিত হয়।

'আত্মা' ও ইহার বাচক 'সত্ত্ব' এই উভয় শব্দ হইতেই আমরা ইহার অমরত্ব ধর্ম্মের প্রমাণ পাইতে পারি। 'আত্মা'—অত্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অত্ ধাতু গমনার্থক—সুতরাং গতিশীল বলিয়াই যে আত্মা নাম হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। দেহের নাশ হইলেও যে আত্মা অবিনশ্বর থাকিয়া সংসার মার্গে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করে, এই গতি-শীলতা হইতেই ইহার এই নাম হইয়াছে। 'সত্ত্ব' সৎ শব্দ হইতে উৎপন্ন সুতরাং ইহা যে সত্বস্তু, ইহার মূলার্থ তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকে। অনিত্য সংসারে যতদিন বিচরণশীল থাকে, ততদিনই ইহা যথার্থ আত্মরূপী—তৎপর সংসার নিবৃত্ত হইয়া ইহা যখন নিত্য সত্য বস্তুরূপে বিরাজিত থাকে, তখনই ইহা সত্ত্বরূপী। এই প্রকারেই আমরা অমরত্বের ক্রিয়ার দিক্ ও সত্তার দিক্, এই দুইটী দিক্ প্রাপ্ত হইতেছি।

আমরা 'বিশ্বসংসার মধ্যে' আত্মার পুনঃ পুনঃ গতায়াতের যে বর্ণনা বেদে পাইয়াছি—তাহাতে কর্ম্মসূত্রের দ্বারা আত্মা যে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে অনুস্যূত হইয়া থাকে—তাহাই বুঝিতে পারা যায়। এই প্রকারে অমরত্বের সঙ্গে অনন্তত্বেও আত্মার প্রসার হইয়াছে। আত্মা এইরূপে অনন্তে পরিণত হইয়াই বিশ্বাত্মার প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। এই বিশ্বাত্মা, আত্মার নামানুসারেই 'পরমাত্মা' নামে অভি-হিত হইয়া থাকে।

পরমাত্মার ধারণা যে আত্মার ধারণা হইতেই হইয়াছে, 'আত্মা' শব্দের সহিত 'পরম' শব্দের যোগের দ্বারা—'পরমাত্মা' শব্দের গঠন হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। ক্রিয়াশীল আত্মা ও বিশ্রামশীল আত্মার যে ভেদ আমরা দেখিতে পাইয়াছি—আত্মা ও পরমাত্মাতে আমরা সেই ভেদই দেখিতে পাই। ক্রিয়া-শীল আত্মা হইতেই জীবাত্মা ও পরমাত্মাভাবের উৎপত্তি হইয়াছে। বৈদিক ঋষিগণ যে আত্মার এই দ্বিবিধভাব বিশেষরূপেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বৈদিক ঋকের দ্বারাই প্রতিপাদিত হয়:—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষ-স্বজাতে।
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাক-শীতি॥ ২০—ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৬৪ সূক্ত।

"দুইটী পক্ষী বন্ধুভাবে এক বৃক্ষে বাস করে। তাহাদিগের মধ্যে একটী স্বাদু পিপ্পল ভক্ষণ করে; অন্য ভক্ষণ করে না, কেবল মাত্র অবলোকন করে॥"

সায়ণ দুই পক্ষীর অর্থ জীবাত্মা ও পরমাত্মা করিয়াছেন। *

এস্থলে বৃক্ষ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝাইতেছে বলিয়াই আমাদের মনে হয়। ইহাতে জীবাত্মা প্রবৃত্তিমার্গে কর্ম্মের অনুসরণ করিতেছেন; আর পরমাত্মা নিবৃত্তিমার্গে সাক্ষীরূপে তাহা দর্শন করিতেছেন, ইহাই বৈদিক উক্তির প্রকৃত মর্ম্ম।

আত্মার কার্য্য দ্বারাই সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হয় এবং আত্মার বিশ্রাম দ্বারাই ইহা উপসংহৃত হয়। সুতরাং আত্মার সহিতই যে সৃষ্টি লয়ের সম্বন্ধ, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। অতএব সমস্ত বিশ্বরহস্যেরই সাক্ষীভূত হইয়াই যে আত্মা অমর হইয়াছে, তাহা আমরা এখানে দেখিতে পাইয়াছি।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

নববর্ষায়।

১

কেশবের কান্তিহরা
মুদিরে আকাশ-ভরা
চাহিলে পুলকে আঁখি হয় বিস্ফারিত;
নয়নে অমৃত পান
কর্ণে বসে সামগান
প্রাণ আজি লেলিহান সৌন্দর্য্য-মোহিত।

২

শ্যাম অঙ্গ রাধা আসি
পরশিয়া যায় হাসি
বেণুতে ধৈবত নাই অবাধ উচ্ছ্বাস;
মৃদঙ্গ মল্লার রাগে
উল্লাসে বৈকুণ্ঠ জাগে
শ্যামরূপ ধরণীতে পায় পরকাশ।

৩

তৃণে শ্যাম পত্রে শ্যাম
বাতাসে শ্যামের নাম
নব নদী ধরিয়াছে যমুনার সাজ;
ব্যাকুল প্রকৃতি মন
পুরুষে কেশব ধন
আদরে বঁধুরে ডাক আর কেন লাজ।

৪

বরষা যশোদারাণি
গোপালেরে কোলে টানি
শ্যামরূপে ছেয়ে ফেল নিখিল সংসার;
মধুর গম্ভীর সুরে
অনাহত ধ্বনি ঘুরে
জানাইছে কোথা জাগে মাধুরী সম্ভার।

৫

রাধা হ'য়ে আকুলিয়া
ডাক শ্যামে ফুকারিয়া
শ্যামল হইয়ে মন উঠিবি এখনি;
তোর ভক্তি যমুনায়
সাঁতারিবে শ্যামরায়
ভোরে যাবে চরাচর ছুটিবে লাবণি।

৬

কিছু নাই অনুষ্ঠেয়
নাহি প্রিয়া নাহি প্রেয়
বার্দ্ধক্য জীবন হেয় নবীনতাহীন;
সুধাস্রবা নীল-কান্তি
শূন্যমনে আনে শান্তি
যৌবন উৎসব ভ্রান্তি হইয়াছে লীন।

* রমেশবাবুর ঋগ্বেদানুবাদ ৩৬৪ : দ্রষ্টব্য।

৭

নভো অঙ্গে নীলাঞ্জন
পুলকের প্রস্রবণ
দ্যুতিমান কেশবের মাধুরী অপার;
কৌমার যৌবন ফিরে
যদি আসে এ শরীরে
সব দিয়ে ওই রত্নে করি উপচার।

৮

স্নেহসিক্ত সুনিবিড়
অন্তিমের সুষ্ঠু নীড়
ওই কাল রূপ মাঝে হবে নাকি স্থান;
অহো কৃষ্ণ হে মাধব
হে দয়িত, অকৈতব
প্রতি অঙ্গে ওইরূপ করি নাথ পান।

৯

কেন আছ অত দূরে
এস এ হৃদয়ে পুরে
প্রতি অঙ্গ চক্ষু হ'য়ে দেখুক তোমায়;
মুগ্ধশত নেত্র দিয়া
প্রাণ যাবে বাহিরিয়া
কালরূপ হয়ে, স্নিগ্ধ করিব ধরায়।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

যতিপঞ্চক।

(১)

বেদবেদান্তের বাক্য সুধায় সদাই যাহার তোষ,
ভিক্ষামুটী মিল্লেই বাবু মনের পরিতোষ,
শোকের আবেগ যাহার কভু পায়না মনে স্থান,
কৌপীনধারী সেইত বটে বড়ই ভাগ্যবান্।

(২)

তরুর মূলে মনের সাধে কচ্ছে দিনপপাত,
ভোগবাসনায় যাতে তাতে বাড়ায় নাকো হাত
ভোগের লক্ষ্মী ঠেলে ফেলে—আত্মপ্রাধার যান,
কৌপীনধারী সেইত বটে বড়ই ভাগ্যবান্।

(৩)

দেহের দফা রফা করে কচ্ছে পরিপাটী,
আত্মার মধ্যে আত্মদর্শন মনটী রেখে খাঁটি,
নাইবা অন্ত নাইবা মধ্য নাইবা বাইরের ধ্যান,
কৌপীনধারী সেইত বটে বড়ই ভাগ্যবান্।

(৪)

আত্মানন্দে সদাই তুষ্ট সদাই আত্মারাম,
শান্তভাবে কচ্ছে সাধন ইন্দ্রিয়াদির গ্রাম,
ব্রহ্মসুখে মনের মত সদাই অবস্থান,
কৌপীনধারী সেইত বটে বড়ই ভাগ্যবান্।

(৫)

পাপবিনাশন সদাই মুখে ওঙ্কার উচ্চারণ,
সাধনের ধন শিব শরণ্য মনে ধ্যান ধারণ,
ভিক্ষার আশে ভিক্ষার বশে দেশবিদেশে যান্,
কৌপীনধারী সেইত বটে বড়ই ভাগ্যবান্।

কবিরত্ন শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

চাটুকার।

জগতে অদ্ভুত সৃষ্টি জীব চাটুকার,
কোন্ কার্য্য আছে বল অসাধ্য তাহার?
যোগাতে ধনীর মন পটু বড় সেই;
চতুর তাহার সম কেহ আর নেই;
সাধিতে আপন ইষ্ট ভাল সেই জানে,
মায়ারূপী কত রূপে ধনীকে বাখানে;
নির্গুণকে গুণী করে মূর্খকে পণ্ডিত,
শুনিয়া তাহার বাক্যে হয় রে মোহিত;
খঞ্জকে লঙ্ঘায় গিরি বধিরে শুনায়,
বোবারে কহায় কথা অন্ধকে দেখায়;
কুরূপে ডাকেরে সেই সুরূপ বলিয়া,
ভুলায় তাহার মন কাড়িয়া লইয়া;
পাপীকে ধার্ম্মিক করে কুজনে সুজন,
এমনি তাহার কার্য্য অদ্ভুত যাতন।

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

প্রসাদী ফুল। (৮৮)

(মানব জীবনের লক্ষ্য)।

শ্রীশ্রীগুরুদেব (প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী) বলিয়াছেন; "এই যে মানবের প্রাণ, বৃহৎ সুন্দর মঙ্গলকর বস্তুর দিকে শিশু-কাল হইতে আকৃষ্ট হইতেছে, ইহার চরিতার্থতা কোথায়? এমন বড় কি, এমন সুন্দর কি, এমন মঙ্গল কি এবং এমন পুরাতন কি যাহার মত আর কিছু নাই?......এ সংসারে বৃহৎ পদার্থের অনুসন্ধান করিয়া দেখে এখানে সকলই পরিমিত, তখন মানবের হৃদয় খুঁজিতে খুঁজিতে এ সংসারের অতীত ভূমাব্রহ্মের নিকট উপস্থিত হয়। এইরূপেই ঋষিরা বলিয়াছেন, "ভূমৈবসুখং নাল্পে সুখমস্তি।" (বক্তৃতা ও উপদেশ—ত্রয়োদশ উপদেশ)।

"অনন্তের দিকে প্রাণ ছুটিতে থাকে।... ...ব্রহ্মাণ্ডের সব সুন্দর পদার্থ দেখিলাম, তাহাতেও তৃপ্ত হইতে পারিলাম না, অনন্ত সৌন্দর্য্যের দিকে ধাবিত হইলাম। সেইরূপ পৃথিবীর সীমাবদ্ধ ভালবাসায়ও প্রাণ তৃপ্ত হইল না, অনন্ত প্রেমের দিকে ছুটিল। সেই চিরমঙ্গলের দিকে প্রাণ যাইতে চাহিল। সেই বৃহৎ অনন্ত সুন্দর প্রেমময় মঙ্গলময় নির্ভরের স্থল কে? না, আমার ব্রহ্ম। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।"

(চতুর্বিংশ উপদেশ)

অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় একটী পরমাণুর অপেক্ষাও ক্ষুদ্র এই পৃথিবী, সেই পৃথিবীর কোনও এক কোণের বাহ্য বস্তু সম্বন্ধীয় যৎকিঞ্চিৎ তত্ত্ব অবগত হইয়া যে মানবের মনে বিজ্ঞতার অভিমান উৎপন্ন হয়, তাঁহারাই তর্কপথে "অতর্ক প্রতিষ্ঠ" পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁহার উপাসনার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রমাণ প্রদর্শনে সাহস করে।

ব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ও পরলোকতত্ত্ব বুঝিবার জন্য যত সকল অন্তরায় আছে, সে সকলের মধ্যে বিদ্যাভিমানই শ্রেষ্ঠতম অন্তরায়। এই অভিমান আমাদের অত্যন্ত দুষ্কৃতি হইতে উৎপন্ন হয়।

একজন মহাপুরুষ বলিয়াছেন, "সকল নারীর সন্তান হয় না, সকল বৃক্ষলতায় ফল ফলে না, সেইরূপ সকল মানুষেরই ধর্ম্মপিপাসা জন্মে না, যাঁহাদের জন্মে তাঁহারাই ধর্ম্মজিজ্ঞাসু হন।" ভক্তদিগের নিকট যে হরিনাম "শ্রবণ-মন-রসায়ন" অভক্তের নিকট উহা একটা বৃথা কোলাহল মাত্র।

জ্যামিতি শাস্ত্র যেমন কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত, তর্ক শাস্ত্রকেও সেইরূপ কতকগুলি মূলতত্ত্ব মানিয়া লইতে হয়। নতুবা উহার দাঁড়াইবার স্থান থাকে না। এই তত্ত্বগুলি সকলের নিকট সমানভাবে প্রকাশিত হয় না, সাধনা, শিক্ষা, সংসর্গ ও কর্ম্মফল হইতে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্নভাবে উহা প্রকাশিত হয়। এইজন্য সকলের ধর্ম্ম-বিশ্বাস এক নহে, সকলের বিবেক বৈরাগ্য একরূপ নহে। জগতের সমস্ত বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্ ব্যক্তিরা যদি এক মতাবলম্বী হইতেন এবং নির্ব্বোধ ও মূর্খদিগের একটা আলাহিদা মত থাকিত, তবে যুক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত। যুক্তিবলে তুমি যাহাকে প্রতিষ্ঠিত কর, তোমার অপেক্ষা বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উহাকে অগ্রাহ্য করেন, আবার তাঁহার

অপেক্ষা অধিকতর বিজ্ঞ ব্যক্তি উঁহাকেও অগ্রাহ্য করেন, আবার প্রবীণ বয়সে অনেক সুবিজ্ঞ ব্যক্তির মতের পরিবর্ত্তন ঘটে, সুতরাং যুক্তির প্রতিষ্ঠা কোথায়? কিন্তু যে বিষয়টী সকলের প্রাণকেই সর্ব্বদা আকৃষ্ট করে, তাহাকে অগ্রাহ্য করার উপায় নাই।

শান্তি পিপাসা।

একটী মানুষের মুখশ্রীর সঙ্গে অন্য একটীর সম্পূর্ণ ঐক্য নাই। এক জনার চরিত্র ও কার্য্যপ্রণালীর সহিত অপরের মিল নাই। মানুষ দিবারাত্রি নানাকার্য্যে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে, একের নিকট যাহা ভাল, অন্যের নিকট তাহা মন্দ, একের যাহাতে রুচি, অন্যের তাহাতে অরুচি, একের যাহাতে প্রবৃত্তি, অন্যের তাহাতে বিরক্তি। কিন্তু এইরূপ অশেষ বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার মধ্যেও এমন একটী বিষয় আছে, যাহা লাভ করিবার জন্য সকলেই ব্যতিব্যস্ত, সকলেই সেই একই বিষয় লাভ করার জন্য বিভিন্ন পথে ছুটাছুটি করিতেছে, সেই বিষয়টী অথবা বস্তুটীর নাম "সুখ" বা "শান্তি"।

এক রাজপুত্র পিতাকে সত্যপাশ হইতে মুক্ত করার জন্য সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলেন। অন্য এক রাজকুমার সিংহাসন লাভের জন্য পিতাকে কারারুদ্ধ করিলেন, উভয়ের এই পরস্পর বিসদৃশ কার্য্যের একমাত্র নিয়ন্তা "সুখ লিপ্সা" বা "শান্তি পিপাসা"।

দাতা দান করেন, দস্যু অপহরণ করে, দয়ালু পরের জন্য প্রাণপাৎ করেন, নিষ্ঠুর নরহত্যা করে, সকলেরই উদ্দেশ্য "সুখ" লাভ, "শান্তি" লাভ।

বিশ্বাসঘাতক ম্যাকবেথ রাজ্যলোভে পিতার ন্যায় প্রতিপালক প্রভুকে হত্যা করিল, রাজ-পরিচারিকা পান্না প্রভুপুত্রের জীবনরক্ষার জন্য আপন পুত্রকে বিসর্জ্জন দিল। মনুষ্যজাতির ইতিহাসে এরূপ ঘটনা-বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের পন্থা স্বতন্ত্র হইলেও মূল উদ্দেশ্যে পার্থক্য নাই, সকলেই সুখ চায়, শান্তি চায়। দুঃখের লালসায় কেহই ভোগী কিম্বা ত্যাগী হয় না।

সকলেই এক বস্তু খুঁজিতেছে এবং সেই বস্তুর জন্য কেহ জলে নামিতেছে, কেহ আকাশে উড়িতেছে, কেহ ভূগর্ভে প্রবেশ করিতেছে, কেহ পর্ব্বতে আরোহণ করিতেছে, কেহ গভীর গুহায় অবতরণ করিতেছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একই বস্তুর অন্বেষণে বাহির হইয়া একজন খুঁজিয়া পাতিয়া নিরাশ হইয়া যে স্থান পরিত্যাগ করিতেছে, অপর জন সেই পরিত্যক্ত স্থানেই সেই বস্তু খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

দিবারাত্রি আজীবন সমস্ত মানব যে বস্তুর জন্য প্রাণের পিপাসায় ছুটাছুটি করিতেছে, তাহা কি একটা অসত্য বস্তু? বুদ্ধি কি তাহার যুক্তিবলে এই প্রাণের পিপাসা নিবারণ করিতে পারে? এই সুকঠিন সমস্যার মীমাংসা করিতে পারে? অনন্তকাল হইতে কোটী কোটী মানব-হৃদয় হাহাকার করিয়া যে বস্তু চাহিতেছে, সেটা কি একটা অবাস্তব পদার্থ? মানব প্রাণ কি একথা বিশ্বাস করিবে?

সকলেই যে সুখ চায়, শান্তি চায়, একথায় ভুল নাই, কিন্তু তাহারা সুখ শান্তি পাইতেছে কি? সংসারে সুখ আছে, কিন্তু সে সুখ বড়ই ক্ষণিক। ভাল সন্দেশ, ল্যাংড়া আম ও গঙ্গার ইলিশ খাইলে অনেকের সুখ হয়; মোকদ্দমা জিতিলে মক্কেলের এবং জিতাইলে উকীলের সুখ হয়, প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিতে পারিলে, পররাজ্য হরণ করিতে

পারিলে রাজাদের সুখ হয়, কবিতা লিখিয়া ও পড়িয়া,সঙ্গীত গাহিয়া ও শুনিয়া, ছবি আঁকিয়া ও দেখিয়া সুখ হয়; আবার অর্থহীন উপাধি ও ব্যর্থ প্রসারণ লইয়াও অনেকের সুখ হয়। অধিক বর্ণনা করা নিরর্থক, এই পৃথিবীতে মানুষ নিরন্তর সুখভোগ করিতেছে, নতুবা মানুষ বাঁচিত না। এত বড় সান্নিপাতিক জ্বরের প্রবল-পিপাসায় মাঝে মাঝে ছিটা ফোঁটা জল না পাইলে রোগী বাঁচিবে কেন? কিন্তু এই সমস্ত সুখ লইয়া মানুষ শান্তিলাভ করে না। গলিত কুষ্ঠ রোগীর মুখে সন্দেশ দিলে, তাহাকে ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় জল দিলে তাহার সুখ হয়, কিন্তু সেই সুখ লাভ করে বলিয়া কুষ্ঠীকে সুখী বলা যায় কি? এই সংসারের ধন-মান, ভোগ্য ভোজ্য, জয় প্রণয় সমস্তই কুষ্ঠ-রোগীর নিকট সন্দেশের মতন, উহাতে প্রাণের জ্বালা দূরীভূত হয় না।

একদিন ঢাকা সহরে সন্ধ্যার পর একটা গলি দিয়া বাঙ্গলা বাজার হইতে পাটুয়াটুলি যাইতেছিলাম। একটী দ্বিতলবাটী হইতে বামাকণ্ঠ-নিঃসৃত একটী সঙ্গীত আমার কর্ণে প্রবেশ লাভ করিল। সঙ্গীতটীর প্রথম দুই চরণ আমার মনে আছে, তাহা এইরূপ,—

"যারে বিদেশী বঁধু আমি তোরে চাই না
যখন তোরে মনে করি তখন তোরে পাই না"

গায়িকা তাহার নিজের ভাবে গাহিতেছিল, কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়া মানব হৃদয়ের একটী করুণ ক্রন্দন, একটা তীব্র বাসনা, চির অভিলাষ, যেন মূর্ত্তি ধরিয়া আমার নিকট প্রকাশিত হইল। বিদেশী বঁধুকে লইয়া কাহারও প্রাণ তৃপ্ত হয় না, কেন না যখন তাকে মনে করে,তখন তাকে পাওয়া যায় না। ক্ষণিককে লইয়া কাহারও তৃপ্তি নাই, প্রাণের বস্তুকে দূরে রাখিয়া বাসনা পূর্ণ হয় না। মানব-প্রাণ এমন বঁধুকে চায়, যিনি অন্তরের ধন হইয়া সর্ব্বদা পরিপূর্ণরূপে প্রাণে বিরাজিত থাকিবেন। তাঁহার সহিত দেশ ও কালের ব্যবধান থাকিবে না, ইহকালে পরকালে যিনি অণুক্ষণ প্রাণ ভরিয়া থাকিবেন, তিনিই স্বদেশী বঁধু, মানুষ সেই বঁধুকেই চায়।

অসীম ও সসীম।

মানুষের সুখ-পিপাসা অনন্ত,সুতরাং সসীম কোনও বস্তু দ্বারাই সে পিপাসা মিটিতে পারে না। দরিদ্র মনে করে সহস্র মুদ্রা পাইলে সে সুখী হইবে, কিন্তু সেই বাসনা পূর্ণ হইতে না হইতে লক্ষের জন্য বাসনা জন্মে, ক্রমে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেও বাসনা মিটে না, পরন্তু ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠে। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন;—

"কোবা দরিদ্রহি বিশাল তৃষ্ণঃ"

প্রকৃত দরিদ্র কে? যাহার বিশাল তৃষ্ণা,সেই প্রকৃত কাঙ্গাল, কেন না তাহার অভাব বোধ অসীম। জগতের সমস্ত [illegible] সসীম, সসীমের দ্বারা কখনই অসীমকে পরিতৃপ্ত করা যায় না। শুধু সসীম নহে, এখানকার সমস্তই ক্ষণভঙ্গুর, ধন মান পরিজন এই আছে এই নাই; শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন "এ সমস্তই ধোকার টাটী"।

সত্য সত্য সমস্তই নলিনী-দল-গত জল-বিন্দুর ন্যায় সর্ব্বদা টলমল করিতেছে, কোন্ মুহূর্ত্তে গড়াইয়া পড়িবে, তাহার স্থিরতা নাই। মৃত্যু অতিশয় নিশ্চিত ব্যাপার। এই ভবযুদ্ধ-ক্ষেত্রে সর্ব্বদা যমের গোলা চলিতেছে, কখন কাহার বুকে লাগিবে, কে জানে? যে ব্যক্তি সর্ব্বদা টাকার ঝন্‌ঝনিতে, রমণীর মোহে, গৌরবের গর্ব্বে মোহিত থাকে, তাহার প্রাণও সময় সময় চমকিত হইয়া উঠে। এত সরঞ্জামের মধ্যেও প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, কি যেন

নাই, কি যেন চাই, তাহা সে ধরিতে বুঝিতে পারে না, কিন্তু এই ক্ষণিক সুখ লইয়া যে প্রাণ জুড়ায় না, তাহা বুঝিতে পারে, তাই ঋষি বলিয়াছেন "যো ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।"

মায়ের দয়া।

যিনি মানবপ্রাণে সুখের জন্য, শান্তির জন্য, এত বড় প্রবল আকাঙ্ক্ষা দিয়াছেন, তিনি যদি মানুষের এই আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করার কোনও উপায় না করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর নিষ্ঠুর আর কে আছে? এই ভাবিয়া অনেক লোক সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্বে এবং তাঁহার দয়া ও সর্ব্বশক্তিমত্তাগুণে সন্দেহ করিয়া নাস্তিক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই ঘটনার মধ্যেই যে জগজ্জননীর অপার দয়া প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহা তাহারা দেখিতে পায় না।

তিন প্রকারে।

আমাদের সংসারের জননী তিন প্রকারে আমাদের দেহকে রক্ষা করিয়া থাকেন। বালক খেলায় মত্ত, স্নেহময়ী জননী তাহাকে খাওয়াইতে চাহিতেছেন, কিন্তু বালক কিছুতেই খেলা ছাড়িয়া আসিবে না। এইরূপ অবস্থায় জননী তিন প্রকারের উপায় অবলম্বন করেন।

প্রথম উপায়—উপদেশ দান।

মা উপদেশ দিয়া বলেন "আয় বাছা, শীঘ্র আয়। এখন না খে'লে পিত্ত পড়ে অসুখ করবে, শরীরে বল হবে না, নানা রকমের পীড়া হবে" ইত্যাদি। যারা সুবোধ ও সুশীল বালক, তারা মায়ের এই ডাক শুনিয়া খেলা ফেলিয়া মায়ের কোলে ছুটিয়া আসে, কিন্তু যারা অবাধ্য, তাহারা সে কথা, সে উপদেশ গ্রাহ্য করে না, পরন্তু আরও অধিক করিয়া খেলায় মত্ত হয়। ইহাদের জন্য জননী তখন দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করেন।

দ্বিতীয় উপায়—প্রলোভন।

যে বালক উপদেশ গ্রাহ্য করিল না, তাহাকে প্রলোভন দিয়া ডাকেন। বলেন "যাদু আমার, মাণিক আমার, এস বাছা, সন্দেশ রেখেছি, ক্ষীর ননী সর রেখেছি, আম দিব, লিচু দিব, খাও এসে।" লোভী বালকগণ এইবারে খেলা ছাড়িয়া মায়ের কোলে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু যাহারা অত্যন্ত দুরন্ত, তাহারা তাহাতেও ভুলিল না, আরও দূরে দূরে গিয়া রৌদ্রে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। এই অবাধ্য সন্তানের কল্যাণের জন্য মা তখন তৃতীয় উপায় অবলম্বন করিলেন।

তৃতীয় উপায়—প্রহার।

যে বালক উপদেশে ফিরিল না, মিষ্টবাক্য ও সুখাদ্যের প্রলোভনে ভুলিল না, মা দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিলেন, কিন্তু দুষ্ট বালক কিছুতেই খাইবে না, সে দাঁতে দাঁত লাগাইয়া মুখ বুজিয়া রহিল। তখন দয়াময়ী জননী সন্তানের কল্যাণের জন্য তাহার পিঠে কিল মারিয়া তাহাকে কাঁদাইয়া হাঁ করাইয়া মুখে অন্নের গ্রাস পূরিয়া দিলেন। অনন্যোপায় হইয়া বালক যাই গিলিল, অমনি তাহার অন্নে রুচি জন্মিল ও শরীর সুস্থ হইল। মা যদি এরূপ ভাবে যত্ন না করিতেন, তবে কি সকল সন্তান বাঁচিতে পারিত?

শরীর রক্ষা।

অবোধ বালকের কথা ছাড়িয়া দিয়া বয়স্ক লোকের কথাই বলি। আমাদের শরীর রক্ষার জন্য যদি শুধু কর্ত্তব্যজ্ঞানই থাকিত, তবে সে কর্ত্তব্যের তাড়নায় অতি অল্প লোকই গলদ্‌ঘর্ম্ম পরিশ্রম করিয়া উদরান্নের সংগ্রহ করিত। এইজন্য সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদের খাদ্য

বস্তুর সহিত রসনার একটু সুমধুর সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিয়া দিয়াছেন, যদি কর্ত্তব্যজ্ঞানে আহার না কর, তবে লোভের বশীভূত হইয়াও করিতে হইবে। কিন্তু এমন অলস লোক অনেক আছে যে, লোভও তাহাদিগের তম-ভাব দূরিত করিতে পারে না। এমন সকল তমভাবাপন্ন লোকের জন্য পেটে ক্ষুধা দিয়াছেন। কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিতে পার, লোভকেও উপেক্ষা করিতে পার, কিন্তু ক্ষুধাকে উপেক্ষা করার যো নাই। চুরী ডাকাতি করিয়াও ক্ষুধাকে আহুতি দিতেই হইবে।

অনেকে ক্ষুধাটাকেই সকল ক্লেশের কারণ বলিয়া মনে করে, বলে "পোড়া পেটের দায়ে সকলই করিতে হয়"। কিন্তু তাহারা বুঝে না যে "পেটের দায়" না থাকিলে মানুষের, শুধু মানুষের কেন, জীবমাত্রেরই জীবনধারণ করা অসম্ভব হইত। এই ক্ষুধাই মায়ের কিল, ইহার চোটে খাটিতেই হইবে।

বেদনা বোধ।

লোকেরা অনেক সময় অত্যাবশ্যক ব্যাপারকে অনাবশ্যক ভাবিয়া ঈশ্বরকে নির্দ্দয় অথবা বোকা মনে করিয়া থাকে, তদপেক্ষাও দুর্গতিজনক ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে।

আমাদের শরীরের বেদনা-বোধ শক্তিটা সাধারণ চক্ষে দেখিতে গেলে একটা দুঃখজনক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ ছাত্রগণ যখন ষণ্ডামার্ক গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হয়, তখন বেদনা বোধের সৃষ্টি-কর্ত্তাকে কোন রূপেই প্রশংসা করিতে পারে না। একটা ফোড়া কিম্বা পৃষ্ঠঘাত যখন অত্যন্ত যাতনাপ্রদ হয়, অথবা অস্ত্রচিকিৎসক যখন শরীরে অস্ত্র প্রয়োগ করেন, তখন আমরা কেহই এই বেদনা-বোধকে আত্মীয় বলিয়া মনে করি না। কিন্তু এই "বেদনা-বোধ" না থাকিলে কিছুতেই আমাদের শরীর রক্ষা পাইত না, অধিকাংশ পীড়া আমাদের নিকট ধরাই পড়িত না এবং নিদ্রিতাবস্থায় কোন জন্তু যদি একখানা হাত কি পা খাইয়া ফেলিত, তবু আমরা টের পাইতাম না। নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া দেখিতাম, খোঁড়া অথবা নুলো হইয়া রহিয়াছি।

ক্ষুধা-বোধ ও বেদনা-বোধ যেমন আমাদের দেহরক্ষার ও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান সহায়, ক্ষুধা অপেক্ষাও তীব্র এবং বেদনা অপেক্ষাও তীক্ষ্ণ "অতৃপ্ত-সুখ-পিপাসা" মানবাত্মার পক্ষে সেইরূপ কি ততোধিক কল্যাণকর?

মায়ের ডাক।

কিরূপে তিন প্রকারের উপায় অবলম্বন করিয়া জননী সন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষা করেন, তাহা সংক্ষেপে বলিয়াছি, কিরূপে বিশ্বজননী তিন প্রকারের উপায় দ্বারা মানব সন্তানের আত্মার স্বাস্থ্যরক্ষা করেন, তাহা বলিতেছি।

"ধর্ম্মান্ন" কথাটার অর্থ এই যে, ধর্ম্মই মানবাত্মার অন্নস্বরূপ। মানব যে অনন্ত সুখের প্রয়াসী, ঈশ্বরই সেই সুখস্বরূপ, তাঁহাকে লাভ করাই ধর্ম্মলাভ, এই লাভের অন্ত নাই। পিপাসা অনন্ত, পানীয়ও অনন্ত, অতএব পিপাসুর কখনও গলা শুকাইয়া মরিবার আশঙ্কা নাই। এই অনন্ত সুখ স্বরূপের দিকে, সচ্চিদানন্দ-ঘনের দিকে, আকর্ষণ করিবার জন্য, সংসার-খেলায়-মত্ত বালককে দয়াময়ী বিশ্বজননী তিন প্রকারে আকর্ষণ করিতেছেন।

১ম প্রকার। প্রথমে মা উপদেশ দিয়া ডাকিতেছেন "হে জীব, তুমি আর খেলায় মত্ত থাকিয়া পরম বস্তুকে বিস্মৃত হইও না, চঞ্চলে বুক বাঁধিয়া কেহ কখনও জুড়াইতে পারে নাই, অনিত্য হইতে কখনও নিত্য

শান্তি জন্মে না। তোমার প্রাণ যে বস্তু লইয়া জুড়াইতে চায়, সংসারের হাটে মাঠে ঘাটে তাহা মিলিবে না, আমার কোলে এসো, আমি তোমাকে ধর্ম্মান্ন দানে তৃপ্ত করিব।” মায়ের এই আহ্বান, এই আদেশ লোকমুখে, শাস্ত্রমুখে, সাধুমুখে অনেকে শুনিল, কিন্তু অতি অল্প সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিই সে কথা মানিয়া চলিল। তখন জননী দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করিলেন।

২য় উপায়। অবাধ্য বালককে যেমন সুখাদ্যের প্রলোভন দিয়াছিলেন, এক্ষেত্রেও সেইরূপ বলিলেন “ধর্ম্মেই সুখ, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ, ইহার মধ্যে কত মিষ্টতা রহিয়াছে”।

“ধর্ম্মে সুখ” একথা শুনিলে অনেকে হয়ত হাসিবে। যাহারা ধর্ম্ম করে, পৃথিবীতে তাহাদের সুখ কোথায়? এই সংসারে ধনেরই জয় জয়কার। ধন এবং ধর্ম্ম এক সঙ্গে থাকিতে পারে না। ধর্ম্ম লইয়া রাজ্য চলে না, বাণিজ্য চলে না, জমিদারী চলে না, ওকালতী চলে না, বিলাসিতা, বিজিগীষা, সমস্তই ধর্ম্মের বিরোধী, এরূপ ধর্ম্ম লইয়া কিরূপে সুখী হইব? “ধার্ম্মিক” বলিতে লক্ষ্মীছাড়া লেংটীপরা দলকেই বুঝা যায়, এরূপ দলে ঢুকিয়া সুখ কি? এইরূপই অনেকের মনের ভাব কিন্তু ইহারা ভাবিয়া দেখে না যে, কি লোভে লোকেরা রাজ্য ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া লেংটী পরে ও ভিক্ষা করে।

কোন এক রাজা এক সন্ন্যাসীকে বলিলেন “প্রভো, আপনিই প্রকৃত স্বার্থত্যাগী।” রাজার কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, “মহারাজ, আপনি বুঝিতে ভুল করিয়াছেন, আমি মোটেই স্বার্থত্যাগী নহি, একান্তই স্বার্থপর, আপনারাই প্রকৃত স্বার্থত্যাগী।” রাজা বিস্মিত হইয়া তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য জানিতে চাহিলেন, সন্ন্যাসী বলিলেন, “মহারাজ, আমরা সামান্য অর্থের বিনিময়ে পরমার্থলাভের চেষ্টা করিতেছি, একটা যৎসামান্য স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া পরম স্বার্থ লাভের চেষ্টা করিতেছি, সুতরাং আমরা মহা স্বার্থপর, আর আপনারা সামান্য ধনের, সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে পরমধন পরমার্থকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আপনারাই বেশী ত্যাগ করিলেন, সুতরাং আপনারাই প্রকৃত স্বার্থত্যাগী।”

রাজপুত্র ধ্রুব, বিমাতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া রাজ্য লাভের জন্য তপস্যা করিতে গেলেন, বালকের কঠোর সাধনায়, ঐকান্তিক ব্যাকুলতায়, মহর্ষি নারদের কৃপায় ভগবান্ * তাঁহাকে দর্শন দিয়া অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন, ধ্রুব কিন্তু কোনও বরই প্রার্থনা করিলেন না, বলিলেন,—

> “স্থানাভিলাষী তপসিস্থিতোঽহং।
> ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব মুনীন্দ্র গুহ্যং॥
> কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং।
> স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥”
>
> হরিভক্তিসুধোদয়।

হে প্রভো, কোন ব্যক্তি কাচের অন্বেষণ করিতে গিয়া যেমন দিব্য রত্ন লাভ করে, আমিও সেইরূপ রাজ্যলাভের জন্য তপস্যা করিয়া দেবতা ও মুনীন্দ্রের অগোচর রত্ন তোমাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, আর কোনও বরই চাহি না।

“রসবৈসঃ” যিনি রস স্বরূপ, যাহা হইতে রসের সঞ্চার হইয়া জগৎ মধুময় হয়, সেই রসের উৎসের সাক্ষাৎ পাইলে মন ইন্দ্রিয়গণ অন্য সুখে আসক্ত হয় না। ইক্ষুদণ্ডের সন্ধান

পাইলে কোন্ মূঢ় অত্যল্প মিষ্ট আস্বাদনের জন্য ইক্ষুপত্র চর্ব্বণ করিয়া জিহ্বাকে ক্ষত বিক্ষত করে?

যাঁহার নাম স্মরণ মনন করিলে সর্ব্ব-সন্তাপ বিদূরিত হইয়া তপ্তধরা শীতল হয়;

"যং লব্ধা চাপরং লাভ মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুনাপি বিচল্যতে॥"

যে অবস্থা লাভ করিয়া অন্য লাভকে লাভ বলিয়াই মনে হয় না, যাহাতে অবস্থিতি করিলে মহা দুঃখও বিচলিত করিতে পারে না, উহা ভগবদ্ধ্যান ভিন্ন অন্য কিছুতেই লাভ করা যায় না।

প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দাও, বর্ত্তমান সময়ও এই ভারতবর্ষে সহস্র সহস্র সাধু সন্ন্যাসী সর্ব্বপ্রকারের বৈষয়িক সুখকে পায়ে ঠেলিয়া যে বস্তু লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করিতেছেন, সে বস্তু কি সুখময় নহে? ইঁহারা কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া একটা অপ্রাপ্ত বস্তু লাভের জন্য বৃথা আশায় দিন কাটাইতে-ছেন না। অনেকেই ভগবানের ধ্যানে ও নাম গানে আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। ইহা স্বর্গলাভের প্ররোচনার ন্যায় অপ্রত্যক্ষ বস্তুর জন্য প্রয়াস নহে, এক্ষেত্রে নগদ বিদায়। সাধনভজন নাম কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া যায়, পরকালের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না।

এই নাম রসে সেদিনও নবদ্বীপে শ্রীবাস ঠাকুরের পুত্র শোকানল নির্ব্বাপিত হইয়া-ছিল, আজিও শত শত লোকের হইতেছে। এগুলি যদি পাগলামীর ফল হয়, তবে সে পাগলামী অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় বস্তু মানুষের আর কিছুই নাই। ঠাকুর নরোত্তম দাস বলিয়াছেন,—

"হরি নাম কৃষ্ণ নাম বড়ই মধুর।
যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর॥"

যুগে যুগে সাধু সজ্জন ও ভক্তদিগের মধ্যে বিশ্বজননী চিরকাল সন্তানকে প্রলোভন দিয়া ডাকিতেছেন "আয় বাছা ঘরে আয়, তোর জন্য থরে থরে অমৃতভাণ্ড সাজানো রহিয়াছে, একবার চাহিয়া দেখ্, অন্য বস্তুতে আর রুচি রহিবে না।"

মায়ের কতক সন্তান এই ডাক শুনিয়া ফিরিল, কিন্তু এমন দুর্বৃত্ত ও অলস অনেক আছে যে, উপদেশ কিম্বা প্রলোভন তাহা-দিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। এমন কুঁড়ে লোক ঢের আছে, যাহারা "গোঁপ খেজুরে", গোঁপের উপর হইতে তুলিয়া খেজুরটী মুখে দিতে চাহে না, বিশ্বজননী তাহাদিগকে কি পরিত্যাগ করিতে পারেন? তাহাদিগের জন্য তিনি তৃতীয় উপায় অব-লম্বন করেন, কেশে ধরিয়া টানিয়া আনিয়া পিঠে কিল মারিয়া মুখে গ্রাস পূরিয়া দেন।

পূর্ব্বে পার্থিব ভাবে ক্ষুধাকেই মায়ের প্রহার বলিয়াছি, এক্ষেত্রে দুর্ব্বার সুখ-লিপ্সাই প্রহারের কার্য্য করে। প্রত্যেক মানব সুখ-লিপ্সারূপ দারুণ ক্ষুধায় ছট্‌ফট্ করিয়া মরি-তেছে, কিন্তু ক্ষুধার অন্ন মা জননী নিজের হাতে রাখিয়াছেন, আজ হউক কাল হউক, ইহ জন্মে হউক পর জন্মে হউক, ইহলোকে হউক পরলোকে হউক, একদিন ঠেকিয়া শিখিয়া তোমাকে মায়ের কোলে যাইতেই হইবে। কেন না ক্ষুধার অন্ন পিপাসার বারি অন্যত্র কোথাও নাই।

কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মান মৈক্ষ-
দাবৃত্ত চক্ষুরমৃতত্ব মিচ্ছন্।
পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু
স্তস্মাৎ পরাঙ পশ্যতি নান্তরাত্মন॥ (কঠ)

অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বার সমূহকে বহির্মুখ করিয়া বিধান করিয়াছেন। সেই জন্যই মনুষ্য বিপরীত দিকে অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, অন্তরাত্মাকে দেখে না। এই জন্য বাহিরেই আমরা শান্তি খুঁজি, কিন্তু যে বস্তু যেখানে থাকে না, সেখানে হাজার অন্বেষণ করিলেও তাহাকে পাওয়া যায় না। শ্রীকবির সাহেব বলিয়াছেন, "বস্তু কাঁহা ঢুরে কাঁহা কেহিবিধি আওয়ে হাত" অর্থাৎ বস্তু কোথায়, খোঁজে বা কোথায়, কেমন করিয়া হাতে আসিবে? কচিৎ কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয় হইতে চক্ষু ফিরাইয়া এবং অমৃতত্ব বাঞ্ছা করিয়া স্বতঃ প্রত্যক্ষ আত্মাকে দেখিয়া থাকেন।

কোনও বস্তু থাকিলেই তাহাকে দেখা যায় না, নিকটে থাকা চাই; নিকটে থাকিলেও দেখা যায় না, সম্মুখে থাকা চাই; সামনে থাকিলেও দেখা যায় না, মধ্যে কোন আবরণ না থাকা চাই; আবরণ না থাকিলেও দেখা যায় না, বস্তুটীকে চিনিতে পারা চাই। এতগুলি প্রতিবন্ধকতা ঘুচিয়া গেলে লৌহ যেমন চুম্বকে টুক্ করিয়া লাগিয়া যায়, মানুষের প্রাণও সেইরূপ প্রাণেশ্বরের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়।

অকূলে পড়িয়া মানুষ যেমন তৃণগুচ্ছ ধরিয়া বাঁচিতে চেষ্টা করে, আমরাও সেইরূপ এই ভবসাগরে পড়িয়া ধনের গুচ্ছ, মানের গুচ্ছ, জনের গুচ্ছ, যশের গুচ্ছ ধরিয়া শান্তি লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু একটী একটী করিয়া সকল ডুবিয়া যায়, কেহই আমাকে রক্ষা করিতে পারে না। যাহা আজ আছে, তাহা কাল নাই, যাহা আজি সুখের, কালি তাহা দুঃখের আকর। যাহা নাই, তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা, যাহা আছে তাহার জন্য আশঙ্কা, যাহা গিয়াছে তাহার জন্য শোক, এই ভাবেই আমরা সংসারে জীবন কাটাইতেছি। কিন্তু আমাদের আত্মা কোন একটা স্থায়ী, সত্য, অচঞ্চল নিত্য বস্তুতে বুক বাঁধিতে চাহিতেছে—সংসারে তাহা মিলিতেছে না। আমরা পথভ্রষ্ট হইয়া খুব জোরে ছুটিতেছি, যতই জোরে দৌড়াইতেছি, ততই দূরে যাইয়া পড়িতেছি, ততই লক্ষ্য হইতে সরিয়া যাইতেছি।

যে ব্যক্তি আম পাড়িতে তালগাছে উঠে, তাহার শক্তি যতই অদ্ভুত হউক না কেন, সে ব্যক্তি যতই লম্ফে লম্ফে ঊর্দ্ধে উঠুক না কেন এবং নীচে থাকিয়া দর্শকগণ তাহাকে যতই বাহবা দিক না কেন, সে কিছুতেই তালগাছে অমৃত-ফল পাইবে না। তাহার সমস্ত শক্তি ও চেষ্টাই পণ্ড হইবে। যাহারা সংসারের ধন, জন, যশ, মান দ্বারা শান্তি লাভের চেষ্টা করে, তাহাদের কার্য্যও আমের জন্য তালগাছে উঠার ন্যায় একান্তই পণ্ড হয়। যাহাতে যে বস্তু নাই, তাহা হইতে কেহই সেই বস্তু লাভ করিতে পারে না। শশকের শৃঙ্গ কেহই পাইতে পারে না।

একটী ক্ষুধিত বালককে উত্তম পোষাকে সাজাইয়া গাড়ীতে করিয়া গড়ের মাঠে বেড়াইলে, যেমন তাহার ক্ষুধা নিবারণ করা যায় না, সেইরূপ সংসারের কোনও বস্তু দ্বারাই মানুষের প্রাণের ক্ষুধা নিবারণ করা যায় না। ক্ষুধিত বালককে খাদ্য না দিলে যেমন কিছুতেই তাহার শান্তি লাভ হয় না, সেইরূপ সচ্চিদানন্দঘন ভগবান ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারাই মানব-প্রাণে শান্তি দানের সম্ভাবনা নাই। দরকার ভাতের, তুমি সাটিনের জামা পরাইলে কি হইবে?

মানুষ সুখ ভালবাসে, এই জন্য অনেকে

অন্যের নিকট আপনাকে সুখী বলিয়া পরিচিত করিতে চায়। এই শ্রেণীর লোকেরা দেখিতে চিতার উপরের মঠের ন্যায়। বাহিরে ধ'বধ'বে অমলধবল কান্তি, দেখিলে চক্ষু জুড়ায়, ভিতরে অস্থি কঙ্কাল ছাই ভস্ম বুকে চাপিয়া থাকে। ইহারা অভিমানে আপনার প্রাণের অভাব অন্যকে জানিতে দেয় না, কিন্তু যখন জল কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠে—তখন অভিমানের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া হিমালয়ের ঘনা হ্রদের মতন একেবারে কূল ছাপিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই শ্রেণীর বৈষয়িক লোকেরা কখন কখন একদিনের মধ্যে সুদৃঢ় বিষয়-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া ভক্তিস্রোতে ভাসিয়া যায়। ঘোর বিষয়াসক্ত নাস্তিক যে পলকের মধ্যে ভক্ত হয়, ইহা ভগবানের নামের মহিমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

শ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন,—"যতক্ষণ তাঁহাকে নিকটে না দেখিব, যতক্ষণ তাঁহাকে না পাইব, ততক্ষণ সংসারের হাজার হাজার জিনিষেও আমাদিগকে তৃপ্ত করিতে পারিবে না। তৃষ্ণার্ত্তের নিকট মণিমুক্তা আনিলে সে তাহার দিকে দৃষ্টি করিবে না; ক্ষুধার্ত্তকে মহামূল্য রত্ন দিলে সে সেদিকে একবার ফিরিয়াও চাহিবে না। আমরাও যদি বাস্তবিক আমাদের প্রাণের বস্তুর জন্য ব্যাকুল হই, তাহা হইলে আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ কত জিনিষ—কত শত বৃক্ষ, নদী, সমুদ্র, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য ইহারা কি আমাদিগকে তৃপ্ত করিতে পারে? আমার প্রাণের বস্তু কোথায়? ইহারা কিছুই নয়। এইরূপ যখন আমার প্রাণ কাঁদিবে, তখন আর থাকিতে পারিব না।" (৩৯ উপদেশ)

অন্যত্র বলিয়াছেন, "মানবের লক্ষ্য কি? না, সেই অনন্ত, সুন্দর, মঙ্গলময়, চিরনির্ভরের স্থল, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর। যিনি এইরূপ নিজের লক্ষ্য স্থির করিতে পারিয়াছেন, তিনি সেই লক্ষ্য যতদিন না প্রাপ্ত হন, ততদিন নিজের জীবন বৃথা মনে করেন।"

(চতুর্ব্বিংশ উপদেশ)।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা।

জড়ের মূল উপাদান।

জড়ের প্রকৃত মূর্ত্তি কি? অনন্ত জড়ের অনন্ত রূপ, না একই রূপের অনন্ত বিকাশ? জড় প্রকৃতই বহু, না মূলতঃ এক? সোণা সোণাই বটে, লৌহ লৌহাই বটে, না সোণাই লৌহ, লৌহাই সোণা? রসাল ও স্বর্ণলতিকার বিবাদ শুধু কবির কল্পনা না বিধাতারই বিধান? বিভিন্ন জড়ের বিভিন্ন উপাদান, না সকল জড়েরই মূল উপাদান এক? জড় মাত্রই একই পদার্থে গঠিত কি না? জড়ের স্থূল আবরণ ভেদ করিতে পারিলে সকল জড়ে একই মূর্ত্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইবে কি না? ইহা একটী মস্ত প্রশ্ন। বিজ্ঞানের শৈশবকাল হইতে মানবজাতি এই প্রশ্নের উত্তর দানের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে এবং আজ পর্য্যন্ত ইহার একটা সুনিশ্চিত উত্তর পাওয়া যায় নাই।

প্রশ্নটার মীমাংসা হয় নাই, কিন্তু বহুদিন হইতে মানব মনে মনে একটা ধারণা পোষণ

করিয়া আসিতেছে যে, স্থূল আবরণটা ভেদ করিতে পারিলে হয়ত সকল জড়ে একই মূর্ত্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইবে। সকল জড়েরই মূল উপাদান এক। একই মাত্র মূল পদার্থ হইতে এই বিচিত্র জগতের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। জড় বাহ্যদৃষ্টিতে বহু হইলেও মূলতঃ এক।

এই ধারণার মূল কোথায়, বলা কঠিন, কিন্তু এই ধারণাকে অবলম্বন করিয়াই জড়-বিজ্ঞান উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছে এবং বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণা ক্রমে বিশ্বাসে পরিণত হইতেছে। বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণ বলেন এবং কতকটা দৃঢ়স্বরেই বলেন যে, জড়মাত্রই একই পদার্থে নির্ম্মিত, এবং সে একমাত্র পদার্থটা কি, অঙ্গুলি নির্দ্দেশে তাহা দেখাইয়াও দিয়া থাকেন।

তাঁহাদের এই উক্তির মূলে যে সকল পরীক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ, যুক্তি, তর্ক ও গবেষণা নিহিত রহিয়াছে, তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ বলিবার ও শুনিবার ঠিক সময় ইহা নহে। কোন কোন পথে অগ্রসর হইয়া তাঁহারা কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, তাহার একটা মোটামুটি আভাষ দেওয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে জড়ের লক্ষণগুলি ঠিক করিয়া লওয়া ভাল।

ইট, কাঠ, পাথর, সোণা, রূপা, ফল, ফুল, জল, বায়ু, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থগুলি লইয়া আমাদের কারবার। এইগুলির সাধারণ নাম জড় পদার্থ। ইহাদের লইয়াই জড়জগৎ। এই জড়পদার্থগুলি ছাড়া আরও কতগুলি পদার্থ লইয়া আমাদের কারবার করিতে হয়। উহারা আমাদিগের স্থূলেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে—যে অর্থে ইট, কাঠ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ঠিক সেই অর্থে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। ইহারা জড়জগতের অন্তর্ভূত নহে।

ফুল জড় পদার্থ, কিন্তু ফুলের ছায়া জড় পদার্থ নহে। ফুলকে ছোঁয়া চলে, সোঁকা চলে, দেখা চলে; ফুলের ছায়াকে ছোঁয়াও চলে না, সোঁকাও চলে না এবং ফুলের দেখার মত দেখাও চলে না।

পণ্ডিতগণ আরও দেখিলেন, জড়পদার্থ সমূহের কতকগুলি বিশিষ্ট ধর্ম্ম বা লক্ষণ রহিয়াছে। এই লক্ষণগুলিকে জড়ের সংজ্ঞা-রূপে ব্যবহার করা চলে এবং উহাদের সাহায্যে কোন্‌টী জড়, কোন্‌টী অজড়, মোটামুটী নিরূপণ করা চলে, যথা ঃ—

ইট, কাঠ জায়গা জুড়িয়া থাকে, উহাদের ছায়া জায়গা জোড়ে না। পণ্ডিতগণ বলিলেন, যাহার দেশব্যাপ্তি আছে, তাহাই জড়।

আবার ইট, কাঠের ভার আছে, উহাদের ছায়ার ভার নাই। বৈজ্ঞানিকগণ বলিলেন, যাহার ভার আছে, তাহাই জড়।

আবার ইটকে চালাইতে হইলে একটা ধাক্কা বা ঠেলা চাই—একটা বল প্রয়োগ চাই, কিন্তু ইটের ছায়া ধাক্কার অপেক্ষা না রাখিয়াই চলিতে আরম্ভ করে। বৈজ্ঞানিকগণ বলিলেন, যাহার বেগ জন্মাইতে বল প্রয়োগের আবশ্যক, —যাহার বেগ জন্মাইতে গেলেই একটা বাধা পাইতে হয়, তাহাই জড়।

আবার ইটকে চালাইতে হইলে খানিকটা শক্তিও ব্যয় করিতে হয় এবং ইট সচল হইলেই শক্তিবিশিষ্ট হয়; কিন্তু ইটের ছায়া অচল অবস্থাতেও শক্তিহীন, সচল হইলেও শক্তি-হীনই রহিয়া যায়। বৈজ্ঞানিকগণ বলিলেন, যাহার বেগ উৎপন্ন করিতে শক্তি প্রয়োগের

আবশ্যক হয় এবং যাহা বেগবিশিষ্ট হইলেই শক্তিবিশিষ্ট হয়,তাহাই জড়। আরও সংক্ষেপে বলিলেন, যাহা শক্তির আধার হইতে পারে, তাহাই জড়।

এইগুলি জড়ের বিশিষ্ট লক্ষণ; ইহাদের সাহায্যেই কোন্‌টী জড়, কোন্‌টী জড় নহে, চিনিয়া লইতে হইবে।

তারপর, উপাদান কথাটার অর্থও একটু পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক। উপাদানের অনুসন্ধান অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু উপাদান অর্থে সেকালের পণ্ডিতেরা যে সকল পদার্থ বুঝিতেন, বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণ ঠিক তাহা বুঝেন না। ফলে সে কালের অনুসন্ধান-প্রণালীর সহিত একালের তত মিল নাই।

উপাদান বলিতে প্রাচীনেরা বুঝিতেন,সেই সকল পদার্থ,যাহা হইতে যাবতীয় জড়ের উদ্ভব ঘটিয়াছে। নব্যেরাও উপাদান বলিতে ঠিক তাহাই বুঝিয়া থাকেন; তথাপি প্রাচীনের উপাদান ও নব্যের উপাদান সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ।

একটা উদাহরণ লইলে কথাটা স্পষ্ট হইবে। জড়ের কথা ছাড়িয়া চেতনের কথা ধরা যাক্। প্রশ্ন হইল, পৃথিবীতে যে সকল জন্তু দেখা যায়—এই যে মানুষ, গরু, ভেড়া, কুকুর, বানর—ইহাদের উপাদান কি? এইরূপ প্রশ্ন কাহারও মনে কখনও উঠিয়াছে কি না,বলা যায় না; কিন্তু যদি কাহারও মনে এ প্রশ্ন উঠে, তবে তিনি তাহার সমাধানে কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন? ইহা নির্ভর করে,তিনি কি উপাদানে গঠিত, তাহার উপর, —তাঁহার মানসিক বৃত্তিগুলি কিরূপ অবস্থার ভিতর দিয়া বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার উপর।

যদি তিনি প্রাণীর দেহটাকেই সার পদার্থ বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, তবে হয়ত তিনি ছুরী বা কাঁচির সাহায্যে মানুষ ও গরু, কুকুর ও ভেড়ার বিশ্লেষণ কার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন, এবং পরীক্ষার ফলে হয়ত সাব্যস্ত করিবেন, আমরা ইতস্ততঃ যে সকল জন্তু দেখিতে পাই, তাহাদের উপাদান হইতেছে চর্ম্ম, মাংস, অস্থি, মজ্জা ও শোণিত। আর যদি তিনি দেহটাকে শুধু বাজে জিনিস বলিয়া মনে করেন এবং প্রাণী সমূহের গুণ বা ধর্ম্ম গুলিকেই খাঁটি পদার্থ বলিয়া বুঝেন, তাহা হইলে তাঁহার বিশ্লেষণ-প্রণালী ভিন্ন রকমের হইবে। তিনি হয়ত ছুরী, কাঁচির সাহায্য গ্রহণ করিবেন না, একটা কসাইখানা নির্ম্মাণেরও আবশ্যক বোধ করিবেন না। হয়ত তিনি কোন জন্তুর দেহ স্পর্শই করিবেন না;—হয়ত একটু দূরে দূরে থাকিয়া শুধু প্রাণী সমূহের গতিবিধি ও উহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া চলিবেন এবং পর্য্যবেক্ষণ ফলে হয়ত সাব্যস্ত করিবেন, স্নেহ ও বিদ্বেষ, ক্রোধ ও ক্ষমা, দয়া ও হিংসা, বুদ্ধি, প্রবঞ্চনা ও তোষামোদ, এই গুলি হইতেছে যাবতীয় প্রাণীর উপাদান।

ফলকথা, যাহারা দেহ-সর্ব্বস্ব, তাহারা শুধু দেহটাকে লইয়াই নাড়াচাড়া করিবেন এবং দেহের যে অংশগুলি দেহীমাত্রেই বিদ্যমান, ঐ অংশগুলিকেই তাহারা মূল পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করিবেন। ইহাদের এই উপাদানগুলি হইবে শুধু দেহময়। আর যাহারা গুণসর্ব্বস্ব, তাহাদের কার্য্য হইবে শুধু গুণগুলির বিশ্লেষণ করা এবং যে গুণগুলি সকলের পক্ষে সাধারণ, সেই গুলি খুঁজিয়া বাহির করা। এই গুণ গুলিই হইবে, ইহাদের মতে, মূল পদার্থ।

উভয় দলেরই লক্ষ্য উপাদান খোঁজা—

একজাতীয় জিনিসেরই উপাদান খোঁজা; কিন্তু একই জিনিসকে দুই জনে দেখিতেছেন দুই দিক হইতে। তাই উঁহাদের বিশ্লেষণ প্রণালীতেও মিল নাই এবং উঁহাদের নির্দ্ধারিত উপাদানগুলিতেও মিল নাই। বিবাদ, উপাদানের অর্থ লইয়া নহে, জন্তুর জন্তুত্ব লইয়া। একদল দেখেন শুধু দেহটা, অন্য দল দেখেন শুধু গুণগুলি; যা কিছু গোল গোড়াতে।

গুণ সর্ব্বস্বের দল হয়ত তাঁহাদের গুণময়, এই উপাদানগুলি লইয়া আরও খানিকটা নাড়াচাড়া করিবেন। তাঁহারা দেখিবেন, তাঁহাদের আবিষ্কৃত এই মূল ধর্ম্মগুলির মধ্যে কোন কোন ধর্ম্মের বিকাশ হয়ত বিশেষ ভাবে মানুষে, আবার কোন কোনটার বিকাশ হয়ত সিংহে বা শৃগালে। তাঁহারা তখন এক একটা বিশিষ্ট ধর্ম্মের সহিত এক একটা বিশিষ্ট জন্তুর নাম যোগ করিয়া দিবেন—হয়ত বুদ্ধির সঙ্গে মানুষ, শঠতার সঙ্গে শৃগাল, এইরূপ। এই রূপে যে জন্তুতে যে ধর্ম্ম বা যে উপাদানটা বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট, ঐ জন্তুটাকেই ঐ ধর্ম্মের বা উপাদানের প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ করিবেন। ফলে, গুণ বুঝাইলেও উপাদান গুলি এক একটা জন্তুর নামেই পরিচিত হইতে থাকিবে।

এইরূপে যাহারা গুণ-সর্ব্বস্ব, তাঁহাদের আবিষ্কৃত উপাদান সমূহের নাম হইবে মনুষ্য, সিংহ, শৃগাল ইত্যাদি। হঠাৎ মনে হইবে যেন এই উপাদানগুলিও অস্থি, চর্ম্ম, শোণিত-ময়—যেন উভয় পক্ষের উপাদানে জাতিগত একটা মিল আছে। কিন্তু নাম দেখিয়া ভুলিলে অনেক সময়েই ঠকিতে হয়।

এই দুই শ্রেণীর লোকের চিন্তাপ্রণালী দুইটা ভিন্ন ভিন্ন পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে। গুণসর্ব্বস্বগণ দেখিতে পাইবেন, মানুষ অবস্থা বিশেষে ভেড়া হয়, আবার গাধা পিটাইয়া ঘোড়া তৈয়ার করা যায়। মানুষেও পশু ভাবের প্রাবল্য দেখা যায়, আবার পশুতেও মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখা যায়। তাঁহারা বুঝিবেন, মানুষ ও পশু একই উপাদানে গঠিত। মানুষে ও পশুতে ভেদ শুধু উপাদান গুলির বিকাশের মাত্রা লইয়া। তাঁহারা ভাবিবেন, পশুকেও মানুষ করিয়া তোলা সম্ভব। তাঁহারা আরও দেখিবেন, যেখানে প্রকৃষ্ট উপাদানগুলির পূর্ণ প্রভাব, সেখানে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য বিরাজমান, সেখানে মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট, পশুত্ব হীনপ্রভ; আর যেখানে নিকৃষ্ট উপাদানগুলি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা বিবিধ রোগের আকর, সেখানে মনুষ্যত্ব পশুত্ব দ্বারা আবৃত। তাঁহারা মনুষ্যত্ব অর্থে বুঝিবেন, যাহা সুস্থ ও সুন্দর, পশুত্ব অর্থে বুঝিবেন, যাহা রুগ্ন ও কুৎসিত। তাঁহারা ভাবিবেন, চিকিৎসা করিলে রোগী সুস্থ হয়, চিকিৎসা করিলে পশুও মানুষ হইবে। ফলে তাঁহারা চিকিৎসক সাজিবেন এবং একটা খুব আশু ফলপ্রদ ঔষধের আবিষ্কারে মনোনিবেশ করিবেন—হয়ত একখণ্ড জমাট বাঁধা প্রেম, যাহা স্পর্শ মাত্রে ব্যাঘ্র মানুষ হয়, মানুষ দেবতা হয়, মর অমর হয়—এইরূপ একখানা প্রেমময় পরশ পাথর খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রান হইবেন।

যাঁহারা দেহসর্ব্বস্ব, তাঁহাদের চিন্তা-প্রণালী ভিন্ন পথে ধাবিত হইবে। তাঁহাদের কারবার শুধু দেহ লইয়া। তাঁহাদের আবিষ্কৃত উপাদানগুলি দেহেরই এক একটা অংশ মাত্র। তাঁহারা দেখিবেন, তাঁহাদের এই উপাদানগুলির—এই অস্থি, চর্ম্মগুলির—বিন্যাস বা পরিমাণে মানুষে ও পশুতে প্রভেদ রহিয়াছে। নিক্তির সাহায্যে ইঁহারা উপাদান মাপিবেন এবং মাপিয়া দেখিবেন, এই উপাদান-

গুলির ওজন মানুষে ও পশুতে ভিন্ন ভিন্ন। তাঁহারা বুঝিবেন, এইরূপ গড়মিল আছে বলিয়াই মানুষ মানুষ ও পশু পশু। তাঁহারা পশুত্ব একটা রোগ বলিয়া বুঝিবেন না, ঔষধ প্রয়োগে পশুকে মানুষ করিয়া তুলিবারও কল্পনা করিবেন না; পরন্তু যাঁহারা এইরূপ চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিবেন, ইহাঁদের নিকট তাঁহারা অজ্ঞ বা ভ্রান্ত বা বাতুল বলিয়াই বিবেচিত হইবেন।

কিছু দিন উভয় দলে বিবাদ চলিবে; কিন্তু কালক্রমে এই দেহসর্ব্বস্বগণ অপর দলকে ঠিক বুঝিতে পারিবেন—অপর দল যে দেহসর্ব্বস্ব নন, গুণসর্ব্বস্ব, এইটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তখন হয়ত দেহবাদী-গণের নিকট অপর দলের চেষ্টা আর বাতুলতা বলিয়া বিবেচিত হইবে না। তখন তাঁহারা শৃগাল বা কুকুরের মনুষ্যত্ব প্রাপ্তি ততটা অসম্ভব বলিয়া বোধ করিবেন না। হয়ত তাঁহারা দেহ সর্ব্বস্বই রহিয়া যাইবেন এবং তাঁহাদের আবিষ্কৃত দেহময় উপাদানগুলিরই—ঐ অস্থি, মজ্জা, শোণিতেরই—একটার অন্যটায় পরিণতি দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া থাকিবেন।

এখন জড়ের কথায় ফিরিয়া আসা যাক্। প্রাণী সম্বন্ধে যে কথা, জড় সম্বন্ধেও সেই কথা। জড়কেও দুইটা ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে দেখা চলে। প্রাচীনেরা ছিলেন গুণসর্ব্বস্ব; তাঁহারা জড়কে উহার গুণ বা ধর্ম্মের দিক দিয়াই দেখিতেন। আর আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিকেরা হইলেন দেহসর্ব্বস্ব; ইহাঁরা জড়কে উহার দেহের দিক দিয়াই দেখিয়া থাকেন। গুণসর্ব্বস্ব প্রাচীনেরা কতকগুলি মূল ধর্ম্মের বা মূল তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া-ছিলেন। তাঁহারা জড়ের এই মূল ধর্ম্মগুলিকেই উহার উপাদান বলিয়া গ্রহণ করিতেন এবং যে ধর্ম্মটা যে জড়ে বিশেষ ভাবে পরি-স্ফুট, ঐ ধর্ম্মটার পরিচয় স্বরূপ ঐ জড়ের নামই ব্যবহার করিতেন। এইরূপে প্রাচীন হিন্দুর মতে জড়ের উপাদান ছিল পাঁচটী—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ। ইহাদের প্রতিনিধি হইল যথাক্রমে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। প্রাচীন গ্রীকেরা একটা উপাদান ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে জড়ের উপাদান হইল চারিটী—ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ। গ্রীকদের এই উপাদান গুলিও বিশেষ বিশেষ গুণ বুঝাইত। ক্ষিতি বলিতে তাঁহারা বুঝিতেন, যাহা শুষ্ক ও শীতল, অপ্ বলিতে বুঝিতেন, যাহা শীতল ও আর্দ্র, তেজ বলিতে বুঝিতেন, যাহা শুষ্ক ও গরম এবং মরুৎ (বা বাষ্প) বলিতে বুঝিতেন, যাহা আর্দ্র ও গরম। জড় মাত্রেই তাঁহাদের মতে ক্ষিত্যপ্ তেজ মরুৎময়; কিন্তু কোন জড়ে বা ক্ষিতির ভাগ বেশী, কোনটায় বা মরুতের ভাগ বেশী; অথবা কোনটায় বা ক্ষিতিগুণ বেশী পরিস্ফুট, কোনটায় বা মরুৎ গুণ বেশী পরিস্ফুট। ইহারই ফলে জড়ে জড়ে ভেদ, ভিন্ন ভিন্ন জড়ের ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

এইরূপ চিন্তার ফলে এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব ঘটিল; তাঁহাদের নাম হইল অ্যাল্-কেমিষ্ট। ইহাঁদের এক মাত্র লক্ষ্য হইল, জড়ের নিকৃষ্ট গুণগুলি দমন করিয়া উহার সদ্‌গুণ রাশি ফুটাইয়া তোলা—ব্যথিত, পীড়িত জড়কে সুস্থ করা—হীন ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করা। বহুকাল ধরিয়া এই অ্যাল্‌কেমিষ্টগণ একটা আশু ফলপ্রদ ঔষধের আবিষ্কারে—এক খানা পরশ পাথর, যাহার স্পর্শ মাত্রে কুৎসিত সুন্দর হয়, জরাগ্রস্ত যৌবন ফিরিয়া পায়, লৌহ সোণা হয়, এইরূপ একটা পদার্থের

আবিষ্কারে—তাঁহাদের সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু অর্দ্ধ সহস্র বৎসরের চেষ্টাতেও পরশ পাথরের সন্ধান পাওয়া গেল না।

পরশ পাথর পাওয়া গেলনা সত্য, কিন্তু এই কিমিয় বিদ্যা অনুশীলনকারীগণ প্রাচীন মত ত্যাগ করিলেন না। ইহাঁরা গুণসর্ব্বস্বই রহিয়া গেলেন এবং কালক্রমে জড়ের আরও নূতন নূতন ধর্ম্মের সহিত পরিচিত হইবার ফলে উপাদানের সংখ্যা আরও বাড়াইয়া তুলিলেন। ইহাঁরা দেখিলেন, সোণা, রূপা, তামা, লৌহা, পারদ প্রভৃতি ধাতু সমূহের কতকগুলি বিশিষ্ট ধর্ম্ম রহিয়াছে এবং ইহাদিগকে একটা বিশিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্গত করা চলে। ফলে, উহাঁরা একটা নূতন উপাদান বা গুণ স্বীকার করিলেন—ধাতবগুণ। এই নূতন উপাদানটার প্রতিনিধি হইল পারদ।

ইহাঁরা আরও দেখিলেন, অগ্নি সংযোগে কোন কোন ধাতু অবিকৃত রহিয়া যায়, আবার কোন কোন ধাতু বিকার প্রাপ্ত হয়, উহাদের ধাতব প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে। দেখিলেন, কোন কোন ধাতু দাহ্য, কোন কোনটা অদাহ্য। ফলে, উহাঁরা দাহ্য গুণও স্বীকার করিলেন। এই দাহ্য গুণের প্রতিনিধি হইল গন্ধক। এই রূপে আর একটা উপাদানের আবিষ্কার হইল।

ইহাঁরা বলিলেন, ধাতু মাত্রই এই দুইটা উপাদানে নির্ম্মিত—সকল ধাতুতেই পারদ ও গন্ধক রহিয়াছে; তবে ভিন্ন ভিন্ন ধাতুতে ইহাদের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। সোণা, রূপা খুব খাঁটি ধাতু; ইহাদের মধ্যে গন্ধকের পরিমাণ খুব অল্প এবং ইহাদের মধ্যে যে পারদ রহিয়াছে, তাহা খুব খাঁটি পারদ। লোহা বা তামা অপকৃষ্ট ধাতু; ইহাদের গন্ধকের পরিমাণ খুব বেশী, উহার পারদটাও অপকৃষ্ট পারদ। স্পর্শমণি প্রভাবে লোহার পারদ খাঁটি হয়, ফলে লোহা সোণা হয়।

ক্রমে দেখা গেল, শুধু দহন নহে, দ্রবণও জড়ের একটা বিশিষ্ট গুণ বটে। কাজেই, এই গুণটাও একটা উপাদান বলিয়া স্বীকৃত হইল; ইহার প্রতিনিধি হইল লবণ। এই রূপে আর একটা উপাদান বাড়িয়া গেল।

মধ্যযুগে আরও একটা উপাদান আবিষ্কৃত হইল—ফ্লজিষ্টন। ইহার আবিষ্কর্ত্তা হইলেন, বেচার ও ষ্টল্। ইহাঁরা দেখিলেন, দহন ক্রিয়াটা জড় জগতের একটা প্রধান ব্যাপার বটে। ধাতু বা অধাতু সকলকেই পুড়িতে হয়। কেহ ধীরে পোড়ে, কেহ বা দ্রুত পোড়ে; না পোড়ে এমন জড় নাই। অতএব দাহ্যগুণই হইতেছে জড় মাত্রেরই একটা প্রধান উপাদান। ফলে একটা অশ্রুত-পূর্ব্ব নামের আবির্ভাব ঘটিল—দাহ্য গুণের প্রতিনিধি হইল ফ্লজিষ্টন্। ইহাদের মতটা এই রকম;—জড়পদার্থ গুলি ফ্লজিষ্টনময়; তাই উহারা পোড়ে। যাহাতে ফ্লজিষ্টন যত বেশী রহিয়াছে, তাহা তত ভাল পোড়ে। কয়লা ফ্লজিষ্টনে ভরা, তাই উহা এত ভাল জ্বলে। যখন কোন একটা পদার্থ পুড়িতে থাকে, তখন উহার ফ্লজিষ্টনটা বাহির হইয়া আসে। ইহারই নাম দহন। ফ্লজিষ্টন নির্গত হয়, কিন্তু ভস্ম পড়িয়া থাকে; অতএব জড়ের প্রধান উপাদান দুইটা—ফ্লজিষ্টন ও ভস্ম।

অনেক বড় বড় পণ্ডিত ফ্লজিষ্টনবাদী হইলেন, কিন্তু সকলে ফ্লজিষ্টন মানিতে চাহিলেন না। বিরুদ্ধবাদীরা বলিলেন, একটা নূতন নাম সৃষ্টি করিলেই একটা আবিষ্কার হয় না। ফ্লজিষ্টন পদার্থটা গুণময় না দেহময়?

ছাই বা ভস্মের ভার আছে, ফ্লজিষ্টনের ভার নাই কি? যখন একটা জিনিষ পুড়িতে থাকে—যখন উহার ফ্লজিষ্টন বহির্গত হইতে থাকে, তখন উহার ওজনটা কমিয়া যাওয়া উচিত নয় কি? কিন্তু ধাতু পুড়িলে উহার ওজনটা বৃদ্ধি হইতেই দেখা যায়, হ্রাস হইতে ত দেখা যায় না।

এই সকল কথায় ফ্লজিষ্টনবাদীরা চটিয়া যান এবং বিপক্ষ দলকে পাষণ্ড, অর্ব্বাচীন বলিয়া গাল দেন। অপর পক্ষ নূতন একটা ফ্লজিষ্টনের আবির্ভাব আশঙ্কায় তর্কে বিরত হন এবং অবহেলা রূপ শীতল বারি সিঞ্চনে ফ্লজিষ্টনের বিলোপ সাধনে যত্নপরায়ণ হন।

এইরূপে দেহসর্ব্বস্ব দলের আবির্ভাব ঘটিল। ইহাঁদের অগ্রণী হইলেন, রবার্ট বয়েল। বয়েল বলিলেন, আর গুণের আলোচনায় ফল নাই, এখন দেহের চর্চ্চা আবশ্যক। দেহটাই খাঁটি জিনিস, দেহটাই সত্য আর সব মিথ্যা। জড়ের উপাদানগুলি দেহময়, উহাদিগকে জড় দেহের মধ্য হইতেই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ইহাই হইবে বৈজ্ঞানিকের প্রধান কার্য্য, ইহাই খাঁটি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। বিশ্লেষণের ফলে যে জড়ের মধ্য হইতে বিভিন্ন ধর্ম্মের বিভিন্ন পদার্থ পাওয়া যাইবে না, উহা হইবে, একটা মূল পদার্থ বা মূল উপাদান; আর যাহার মধ্য হইতে পাঁচ রকমের পাঁচটা পদার্থ পাওয়া যাইবে, উহা হইবে একটা যৌগিক পদার্থ, উহা পাঁচটা উপাদানে নির্ম্মিত। জড়ের উপাদানগুলি জড় পদার্থই বটে; শুধু পাঁচের সংযোগে উৎপন্ন নহে, ইহাই উহাদের বিশিষ্ট লক্ষণ।

রবার্ট বয়েল উপাদানের একটা নূতন সংজ্ঞা দিলেন। কিন্তু প্রথমে অনেকেই বয়েল সাহেবের কথা কাণে তুলিলেন না; বৈজ্ঞানিকগণ ফ্লজিষ্টনবাদীই রহিয়া গেলেন।

তারপর অক্সিজেন গ্যাস আবিষ্কৃত হইল। দেখা গেল, আমরা যে বায়ুরাশি মধ্যে বাস করিতেছি, উহাতে অক্সিজেন রহিয়াছে। অক্সিজেন আবিষ্কার করিলেন প্রিষ্টলি। ল্যাবোয়াশিয়ে দেখাইলেন, যখন কোন জিনিস পুড়িতে থাকে, তখন ঐ পদার্থটার সহিত বায়ু মধ্যস্থ এই অক্সিজেন গ্যাসের সংযোগ ঘটে। ইহারই নাম পদার্থটার দহন, এবং ইহারই ফলে দহন কার্য্যে পদার্থের গুরুত্ব বৃদ্ধি। বৈজ্ঞানিকগণ বুঝিলেন, দহন ক্রিয়ায় ফ্লজিষ্টনের আবশ্যক নাই—আবশ্যক অক্সিজেন গ্যাসের।

অক্সিজেনের আবির্ভাব ঘটিল, ফলে ফ্লজিষ্টন ভূতকে চিরদিনের জন্য বৈজ্ঞানিকের স্কন্ধ ত্যাগ করিতে হইল। ক্রমে অন্যান্য পুরাতন ভূতগণও চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন—সকল ভূতকেই ল্যাবোয়াশিয়ের মন্ত্র প্রভাবে দেশ ছাড়িয়া পলাইতে হইল। ল্যাবোয়াশিয়ের দীক্ষাগুরু হইলেন, নিউটন ও বয়েল। নিউটন মহাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিয়া জড়ের মধ্যে 'বস্তু' দেখিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া গেলেন; বৈজ্ঞানিকগণ ওজন করিয়া বস্তু মাপিতে শিখিলেন। ল্যাবোয়াশিয়ে নিউটন-প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিলেন, বয়েল-প্রবর্ত্তিত উপাদানের সংজ্ঞাটাও গ্রহণ করিলেন। ওজনের দ্বারাই যে জড় দ্রব্যের বস্তু নির্দ্দেশ করিতে হইবে এবং জড়ের উপাদানে যে বস্তুত্ব আরোপ করিতে হইবে, ল্যাবোয়াশিয়ের ইহা দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল। ল্যাবোয়াশিয়ে পরীক্ষা করিলেন—নিক্তির সাহায্যে জড়ের বস্তু মাপিলেন এবং জড় দেহের বিশ্লেষণ ঘটাইয়া যে পাঁচ রকমের পাঁচটা পদার্থ

পাওয়া যায়, উহাদেরও বস্তু মাপিলেন। দেখা গেল, গোটা জড়ের ওজন যাহা, উহার মধ্যস্থ ঐ পাঁচটা পদার্থেরও মোট ওজন তাহা। ল্যাবোয়াশিয়ে বলিলেন, ঐ পাঁচ রকমের পাঁচটা পদার্থই ঐ গোটা জড়টার উপাদান—জড়ের উপাদানগুলি বস্তুময়। বস্তুটাই জড়ের খাঁটি পদার্থ এবং ভারেই বস্তুর পরিচয়। জড়ের সব বদলাইতে পারে, কিন্তু উহার ভার বা বস্তু বদলায় না। জড়ের সঙ্গে জড় মিশিয়া নূতন জড়ের উদ্ভব ঘটে, কিন্তু নূতন বস্তুর আবির্ভাব ঘটে না। বস্তু অবিনশ্বর। যার যার বস্তু ঠিক রাখিয়াই জড় জড়ের সঙ্গে মিলিত হয়, আবার পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেও যার যার বস্তু ঠিকই থাকিয়া যায়:—সংশ্লেষণে বা বিশ্লেষণে জড় আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলে না।

বৈজ্ঞানিকগণ বুঝিলেন, বস্তু লইয়াই আসল কারবার এবং জড়ের উপাদানগুলি বস্তুময়। তাঁহারা আরও বুঝিলেন, একটা উপাদানকে অন্যটায় পরিণত করা দুরাশার কথা; অ্যাল্‌কেমিষ্টগণ ভ্রান্ত, তাঁহারা মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছিলেন মাত্র।

এই রূপে বিজ্ঞান জগতে দেহবাদের প্রতিষ্ঠা হইল। তখন হইতে বৈজ্ঞানিকগণ উপাদান অর্থে শুধু দেহময় উপাদান বুঝিয়া আসিতেছেন এবং নিক্তির সাহায্যে উহার পরিমাণ নির্ণয় করিয়া আসিতেছেন। অতঃপর উপাদান বলিতে আমাদিগকে এই দেহময় বা বস্তুময় উপাদানগুলিকেই বুঝিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রীক-দর্শন।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

অ্যারিষ্টটল।

২। গৌণ বা প্রাকৃতিক দর্শন।

অ্যারিষ্টটলের মতে আকাশ নিটোল বর্ত্তুল বিশেষ; পৃথিবী তাহার কেন্দ্র। এই গোলকের অন্তর্গত যাবতীয় পদার্থকে লইয়া প্রকৃতি (Nature) বা জড় জগৎ কল্পিত হইয়াছে। প্রকৃতি গতি বা বিরামসাপেক্ষ। সূক্ষ্মভাবে দেখিলে উহাকে গতিই বলা যায়, অন্ততঃ সেই পরিমাণে, যে পরিমাণে উহা প্রথম সঞ্চালক অথবা গতির মূলকারণ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া প্রাকৃতিক কারণগুলি (Physical Causes) কর্ত্তৃক স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়।

জড়বিজ্ঞান গতির ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। উহা সেই স্থির, নিশ্চল পরিবর্ত্তনবর্জিত পরব্রহ্ম (ঈশ্বর), সঞ্চালিনী শক্তির আধার (স্বর্গ) এবং নিত্যপরিবর্ত্তনশীল পরিদৃশ্যমান জগৎ (প্রকৃতি), সকলেরই অস্তিত্ব, গুণ ও ক্রিয়ানিরূপণে নিযুক্ত। মোটের উপর, গতির চারিপ্রকার শ্রেণী বিভাগ সম্ভব; যথা, (১) যে গতি দ্বারা উৎপত্তি ও লয় ঘটে; (২) যে গতি দ্বারা গুণের তারতম্য হয়; (৩) যাহা পরিমাণ-বিভেদের কারণ; এবং (৪)

যদ্দ্বারা স্থান-বিচ্যুতি হয়। চারিশ্রেণীর মধ্যে প্রথমোক্ত, অর্থাৎ উৎপত্তি ও লয়ের কারণকে গতি না বলিলেও চলে; পক্ষান্তরে শেষোক্ত অর্থাৎ স্থান-বিচ্যুতির কারণই প্রকৃত পক্ষে গতিস্থানীয়। বৈজ্ঞানিক মাত্রেই, বিশেষতঃ আনাক্সাগোরাস এই শ্রেণীর গতিকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, সর্ব্বব্যাপী এবং মূল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। গতি বা যে কোন পরিবর্ত্তন, যে কোন বল অথবা জীবাত্মা, সকলই লীন শক্তির ব্যক্তাবস্থা; ইহাদের কেহই সত্তা বা সত্তাস্থানীয় নহে।

স্থানের (space) প্রকৃতি অনেকাংশে সত্তারই অনুরূপ। প্লেটো 'টিমীয়াস' গ্রন্থে স্থানকে ভ্রমবশতঃ উপাদানরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। উহা কিন্তু বাস্তবিক উপাদান নহে, বস্তুসমূহের রূপ কিম্বা ব্যবধানও নয়। স্থান দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং পরিবেষ্টকের সীমা নিরূপিত হয় মাত্র। অর্থাৎ, উহা আধার এবং আধেয় রূপেই সর্ব্বত্র বিদ্যমান। দ্রব্য সমূহের অভ্যন্তরে অথবা পরস্পরের মধ্যে অন্তর বা অবকাশ নাই; ইহাই সপ্রমাণ করিবার জন্য অ্যারিষ্টটল স্থানের এই অদ্ভুত সংজ্ঞা দিয়াছেন। তাঁহার মতে, শূন্যগর্ভ আকাশের ধারণা ভ্রমমূলক। আবার গতির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইলেই যে অবকাশ স্বীকার করিতে হইবে, এমন নয়। উহাদ্বারা দ্রব্য সমূহের স্থান-বিচ্যুতিই সূচিত হয়। কোন এক বস্তুর আত্মসঙ্কর্ষণ বা ঘনীভবন হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তৎপার্শ্ব-বর্ত্তী অপর কোন বস্তুর বিপ্রকর্ষণ বা সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে। সেইরূপ, কোন বস্তুর সম্প্রসারণ ক্রিয়া হইতে বস্তুবিশেষের ঘনীভবনই সম্ভব। অতএব, দ্রব্য সমূহের অভ্যন্তরে বা বহির্ভাগে অবকাশ থাকিতে পারে না। গতিব্যতীত যখন স্থানের ধারণা হয় না, তখন যিনি নিশ্চল, অর্থাৎ পরব্রহ্ম বা ঈশ্বর, স্থান জুড়িয়া অবস্থিত করিতেছেন, এরূপ বলা ভুল। অধিকন্তু, স্থান আধার ও আধেয়ের সীমামাত্র এবং বস্তুমাত্রেই সার্ব্বজনীন সত্তার অন্তর্ভূত; এজন্য ব্রহ্মাণ্ড স্থানবিশেষকে অধিকার করিয়া অবস্থিতি করে না। অতএব বস্তু-জাতের সমষ্টি স্বরূপ সমগ্র বিশ্ব গতিশীল নহে; কেবল উহার অংশ সমূহের স্থান বিচ্যুতি ঘটে বলিয়া অংশ গুলিকেই সচল বলা যায়। জগৎ কেবল মাত্র স্বীয় কক্ষে আবর্ত্তন করিতে সমর্থ। স্বর্গ লোকের কতক গুলি অংশ সঞ্চালিত হয় বটে, কিন্তু তাহাদের সে গতি বৃত্তাকারেই সম্পন্ন হয় এবং অপেক্ষা-কৃত গুরুভার ও লঘুভার দ্রব্য সমূহ যথাক্রমে নিম্নদেশে ও ঊর্দ্ধাভিমুখে প্রেরিত হইয়া থাকে।

স্থানের ন্যায় কালও গতির ধর্ম্মরূপে গণ্য। কালের দ্বারা গতির সংখ্যা বা পরিমাণ নিরূপিত হয়। প্লেটো যাহাই বলুন, কাল অসীম হইলেও, উহার অসীমত্ব পরিস্ফুট অবস্থায় বা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না। এই খানেই স্থানের সহিত কালের প্রভেদ; কেন না, স্থান সীমা-বিশিষ্ট। অসীম মাত্রই অব্যক্ত; ব্যক্ত সরূপ, সগুণ ও সান্ত। কাল অব্যক্ত বলিয়া অসীম। বিপরীত দিক দিয়া দেখিলেও উপলব্ধি হয় যে, অসীমত্ব বা অনন্তত্ব গুণ সংখ্যার অনন্ত গুণ বৃদ্ধি এবং পরিমাণ বা আয়তনের অনন্ত বিভাজ্যতার উপরই নির্ভর করে। পক্ষান্তরে, কাল গতির পরিমাণ নির্দ্দেশ করে বলিয়া স্বয়ংই সংখ্যারূপে গণ্য। এই কাল ও সংখ্যার সম্বন্ধ হইতে আত্মার অস্তিত্ব বিষয়েও ধারণা জন্মে; যেহেতু, সংখ্যার জ্ঞান লাভ করিতে

হইলে সংখ্যাগণনাকারী ব্যক্তির আবশ্যক হয়। কাল হইতে আত্মার জ্ঞান আসিতেছে এবং সংখ্যা-নির্ণয়কারী আত্মা আছে বলিয়াই কালের জ্ঞান জন্মে।

পূর্ব্বে গতির কয়েক প্রকার শ্রেণী এবং তন্মধ্যে স্থান-বিচ্যুতির কারণ রূপ গতিকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। স্থান বিচ্যুতি আবার অনেক প্রকারের। উহাদের মধ্যে বৃত্তাকার ভ্রমণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পূর্ণ এবং পরিণত গতি। এই গতির শেষ নাই, উহা মৌলিক এবং সর্ব্বত্র একরূপ। সরল রৈখিক গতি সর্ব্বত্র এক প্রকার নহে এবং বৃত্তাকার গতি অপেক্ষা অসম্পূর্ণ। সরল রেখা ক্রমে কোন বস্তু অনন্তকাল চলিতে পারে না। তাহার কারণ অ্যারিষ্টটলের মতে জগৎ সীমাবিশিষ্ট। সরল রেখাকে যথেচ্ছ বর্দ্ধিত করিলে তাহার প্রত্যাবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, অথবা কোন বেগসম্পন্ন বস্তু যদি একাদিক্রমে নিয়ত একই দিকে চলিতে থাকে, তবে তাহা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া অবশেষে দুলিতে বা স্পন্দিত হইতে থাকিবে এবং তদবস্থা হইতে ক্রমান্বয় তাহার দিক পরিবর্ত্তন করা স্বাভাবিক। জড় জগতে সর্ব্বপ্রকার গতির মধ্যে বৃত্তাকার গতি এবং উর্দ্ধাধঃ ভাবে সরল রৈখিক গতিই উল্লেখযোগ্য। বৃত্তাকার গতি অখণ্ড এবং জটীলতাশূন্য বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা পরিণত ও নিখুঁত, এবং সর্ব্বোপরি অবস্থিত স্বর্গমণ্ডলেই উহার প্রভাব। সর্ব্বোচ্চ স্বর্গমণ্ডল রূপ গুরটী সুকঠিন এবং দৃঢ়নিবদ্ধ নক্ষত্রাবলীর অবলম্বন। সরল রৈখিক গতি অখণ্ড নহে বলিয়া অপেক্ষাকৃত অসম্পূর্ণ, এবং তজ্জন্য জগতের নিম্নস্তরবর্ত্তী অথবা কেন্দ্রস্থানীয় অংশগুলি সরল রেখাক্রমে চালিত হয়। জগৎ-পরিধির সর্ব্ববহিঃস্থ দ্রব্যসমূহ অনন্তকাল যাবত স্ব স্ব অক্ষপথে পরিভ্রমণ করিতেছে। এবম্বিধ অক্ষভ্রমণ রূপ গতির কারণ শক্তির সেই প্রথম আধার বই আর কেহ নয়, যিনি স্বয়ং না চলিয়াও জগতের অংশ সমূহকে পরোক্ষভাবে, অর্থাৎ প্রথম স্বর্গের ভিতর দিয়া, গতিসম্পন্ন করিতেছেন। অতএব ইহাই অনুমান হয় যে, অচল নক্ষত্রমণ্ডল প্রথম সঞ্চালিত স্বর্গরাজ্যে অবস্থিত এবং তথা হইতে নিম্নস্থ সৌররাজ্য সমূহে গতি সঞ্চালিত করে। সৌররাজ্য গুলি দৃঢ় ও স্বচ্ছ এবং তাহাদের সংখ্যা পঞ্চাশৎ হইবে। তাহারা একটী সাধারণ কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। এই কেন্দ্রই জগতের কেন্দ্র এবং পৃথিবীর কেন্দ্রের সহিত এক। তাহাদের গতি জটীল। সর্ব্ববহিঃস্থ স্বর্গের ন্যায় তাহারা দক্ষিণ হইতে বাম দিকে আবর্ত্তন করে, তবে কখনও কখনও বিপরীত দিকেও ভ্রমণ করিয়া থাকে। গতি-বিধির জটীলতার কারণ এই যে, প্রথম সঞ্চালিত-সঞ্চালক (The First moved mover) ছাড়াও প্রত্যেকেরই আপেক্ষিক ভাবে স্বাধীন এক একটী সঞ্চালক বস্তু আছে। সর্ব্বশেষ, কেন্দ্রস্বরূপ বর্ত্তুলটী, অর্থাৎ জলস্থলময়ী পৃথ্বী, জীবজন্তু ও চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুস্তর সহ, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গ্রহাদির দ্বারা এবং পরোক্ষভাবে স্থির নক্ষত্রগণ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। পৃথিবী স্বয়ং কক্ষাবর্ত্তন করে না, তদ্দ্বারা কেবল মাত্র কতকগুলি জটীল গতিবিধিই সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সকল গতির মধ্যে উর্দ্ধাধঃ গমনই মৌলিক এবং সর্ব্বপ্রধান।

যে সকল দ্রব্য বিশ্বের সর্ব্ববহিঃ প্রান্ত হইতে সর্ব্বাস্তরস্থ কেন্দ্রাভিমুখে প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে গুরুভার দ্রব্য বলে; আর, যে সকল দ্রব্য কেন্দ্র-প্রদেশ হইতে আকাশ

মার্গে প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে লঘু ভার দ্রব্য বলা যায়। শীতোষ্ণাদির ন্যায় লঘু ও গুরু দ্রব্যের মধ্যে বিপরীত সম্বন্ধ বিদ্যমান। অভিজ্ঞতাদ্বারা ইহাই স্থির হইয়াছে যে, সরস এবং শীতল বায়ু নিম্নগামী; শুষ্ক, নীরস এবং উষ্ণ বায়ু উর্দ্ধগামী। উপাদান সমূহের পার্থক্য শীতোষ্ণাদির বৈপরীত্যভাব হইতে সঞ্জাত। ভারী এবং শীতল বস্তুর সংযোগে কঠিন দ্রব্য, অর্থাৎ মৃত্তিকা ভাগের উৎপত্তি, এবং আলোক ও উত্তাপ হইতে অগ্নির সৃষ্টি হইয়াছে। সলিল ও বায়ু, অর্থাৎ শৈত্য, এবং শুষ্কতা, অপর দুইটী উপাদান, অর্থাৎ মৃত্তিকা ও অগ্নির মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া উভয়ের সমতা রক্ষা করিতেছে। অ্যারিষ্টটল উপাদানের চারিটী বিভাগ কল্পনা করিলেও, তাঁহার মতে, ডিমক্রিটাস ও হিরাক্লাইটাসের ন্যায়, উপাদানগুলি সমধর্ম্মী এবং মূলে একটী মাত্র উপাদানের বিভিন্নাবস্থা। অভিজ্ঞতা সহযোগে তিনি ইহাও স্থির করিয়াছিলেন যে, কঠিন দ্রব্য সমূহ তরল দ্রব্যে, তরলদ্রব্য বায়বীয়ে এবং বায়বীয় দ্রব্য অগ্নিতে পরিণত হয়। আবার, বিপরীত ভাবে, অগ্নি হইতে বায়বীয়, বায়বীয় হইতে তরল এবং তরল হইতে কঠিন দ্রব্যের ও উৎপত্তি সম্ভব। এখানে এইরূপই অনুমান হয় যে, অ্যারিষ্টটল গতি সম্বন্ধীয় রাসায়নিক জ্ঞান এবং স্থিতি সম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক জ্ঞানের ঐক্য স্থাপনে চেষ্টা করিয়াছিলেন। উপাদান সকলের পার্থক্য পৃথিবীর গতির উপরও নির্ভর করে। যেখানে গতির জটীলতা নাই, সেখানে উপাদানের পার্থক্যও নাই; একারণ জগতের বহির্ভাগে কোথায়ও পার্থক্য থাকা অসম্ভব। স্বর্গমণ্ডল সমূহের একমাত্র উপাদান ঈথার। ঈথারকে পঞ্চম উপাদান বলা ভুল। কেন না, উহা একটী মূল পদার্থ এবং পার্থিব উপাদান সমূহের অপরিণীত স্বাভাবিক অবস্থা (Neutral state)। স্বর্গমণ্ডল সমূহে গাঢ়, তরল, বায়বীয় এবং উষ্ণ, ইত্যাদি সংজ্ঞক কোন দ্রব্য থাকিতে পারে না; তাহার কারণ, তথায় গুরু ও লঘু এবং শীত ও উষ্ণ বলিয়া কোন প্রভেদ নাই। সরলরৈখিক এবং উর্দ্ধাধঃ গতির অভাবে উক্ত রাজ্য সমূহে বিপরীত জ্ঞানেরও অভাব।

নর জগতের পার্থক্য সমূহ হইতে বহুদূরে অবস্থিত বলিয়া এবং সর্ব্বাধিষ্ঠিত স্বর্গাধিপতি প্রথম সঞ্চালকের সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত থাকায়, গগনমার্গের জ্যোতিষ্ময় অধিবাসিগণ অমরত্ব এবং অবিমিশ্র সুখের অধিকারী। সৃষ্ট জীবের তুলনায় তাহাদের সহিত প্রথম সঞ্চালকের সাদৃশ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গতিবিধি সম্বন্ধে তাহারা স্বেচ্ছাচারী নহে, তাহাদের মধ্যে দৃশ্যতঃ কোন বিষয়ে অসম্পূর্ণতা থাকিলে, তাহা ঐশ্বরিক বিধান এবং ক্ষমতার নিদর্শন। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, স্বাধীন ব্যক্তি ক্রীতদাস ও পশুর অপেক্ষা স্বীয় কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অধিক নিয়মাবদ্ধ। সমাজে তাহাকে প্রচলিত নিয়মগুলি মানিয়া চলিতে হয়। বর্ব্বর এবং পশুগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সামাজিক উন্নতির কোন সহায়তা করে না, তাহাদের কার্য্যের মূলে কোন শৃঙ্খলা নাই এবং স্বভাবতঃ তাহারা আপনাপন খামখেয়ালীর উপর নির্ভর করে। যাহার বিচারবুদ্ধি যত তীক্ষ্ণ, তাঁহার কার্য্যকলাপও তত সুনিয়ন্ত্রিত, এবং তিনি ততই স্বল্প-স্বেচ্ছাচারী। পক্ষান্তরে, সুষ্টদেবগণ স্থানুভাবাপন্ন বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে গতি বা পরিবর্ত্তনও কম; তাহার ফলে, একটী মাত্র মণ্ডল বা স্তরে অসংখ্য দেবতার বাস ঘটিতে পারে। নক্ষত্রাপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর সৃষ্ট, অর্থাৎ

গ্রহ সমূহ, অমর এবং সৃষ্টিপূর্ব্ব জীব (Uncreated beings)। যাহাদের দ্বারা গ্রহসমূহ সঞ্চালিত হইতেছে, তাহারা স্ব স্ব গণ্ডীর ভিতরে যে শক্তির সঞ্চার করে, সেই শক্তি সর্ব্বোচ্চ স্বর্গের (Protos ouramos) পূর্ণ ও পবিত্র গতিবিধির বিপক্ষে সঞ্চারিত হয় এবং তদ্দ্বারা তাহারা যে দেবতার আজ্ঞাধীন নহে ও জগৎ-শৃঙ্খলার বিরুদ্ধাচারী, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এই স্থান হইতেই যাবতীয় পার্থিব অমঙ্গলের সূত্রপাত। তবে, অমঙ্গল এই স্তরে এত সামান্য যে, পৃথিবীর সহিত তুলনায় বুধ গ্রহ (Merc iry), শুক্রগ্রহ (Venus), মঙ্গল গ্রহ (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter), শনি (Saturn), সূর্য্য (The Sun), এবং চন্দ্র (The Mo n), ইহাদের জীবন পূর্ণ, পবিত্র এবং সুখশান্তিময়। *

উপাদান চতুষ্টয়ের সংঘর্ষ এবং তাহার ফলে দ্রব্য সমূহের যে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহা ভূলোকেই বিদ্যমান। জন্মজরামৃত্যু-সমন্বিতা প্রকৃতি, যাহা অলৌকিক, অপরিবর্ত্তনীয় এবং অবিনশ্বর সৃষ্টি অর্থাৎ স্বর্গ-মণ্ডলীর আধার স্বরূপ আকাশ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহার সহিত এই মর্ত্ত্যভূমিরই সম্বন্ধ। ভূলোক এবং দ্যুলোক, "এখানে এবং সেখানে", স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক, লৌকিক এবং পারলৌকিক, ইহাদের পার্থক্য সম্বন্ধে অ্যারিষ্টটল যাহা বুঝিয়াছিলেন, খ্রীষ্টধর্ম্মের ক্যাথলিক সম্প্রদায় ঠিক সেই অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না, বুঝা যায় না, তবে ইহা নিশ্চিত যে, এই প্রকার দ্বৈতবাদে প্লেটোর রহস্যবাদের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় এবং তাহা অ্যারিষ্টটলের মূল অধ্যাত্মতত্ত্বেরই বিরোধী। পৃথিবী জগতের কেন্দ্র এবং ঈশ্বর

* অ্যারিষ্টটলের জগৎ বা সৃষ্টি-কল্পনা কিছু জটিল ও দুর্ব্বোধ। তিনি যাহাকে প্রথম সঞ্চালক বলিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গ, শক্তির অধিকারী। প্রথম সঞ্চালকই ঈশ্বর। সৃষ্টিমাত্রই ইঁহার অন্তর্ভুক্ত। ইনি নিজে না চলিয়া অপর সকলকে চালাইতেছেন। এই স্বর্গের পরেই আর একটী স্বর্গ কল্পিত হইয়াছে, যাহাকে প্রথম সঞ্চালিত সঞ্চালক (The First Moved Mover) বলা যায়। প্রথম সঞ্চালিত সঞ্চালকের অর্থ এই যে, এই স্বর্গ স্বয়ং প্রথম সঞ্চালক (The First Mover or Prime Mover) কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া অপরাপর সৃষ্ট বস্তু সমূহের উপর স্বীয় শক্তি সঞ্চারিত করিতেছেন। নক্ষত্রগণ এই স্বর্গের অধিবাসী। ইহার পরে গ্রহোপগ্রহ-সমন্বিত সৌর জগৎ। উহা দুইটী বিরুদ্ধ শক্তির অধীন; একটী স্বাভাবিক শক্তি, যাহা প্রথম সঞ্চালিত সঞ্চালক হইতে আসিতেছে, অপরটী দেবতা (Spirits) প্রদত্ত। স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা গ্রহগুলি যেদিকে যাইতে চাহে, দেবতাগণ তাহাদিগকে তাহার বিপরীত দিকে লইতে চেষ্টা করে। সর্ব্বনিম্নস্থ স্তরটী আমাদের পৃথিবী এবং জগতের কেন্দ্র। পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া উপরি উপরি তিনটী স্তর বিদ্যমান। ইহারা যথাক্রমে জল, বায়ু এবং অগ্নি। নিম্ন চিত্র হইতে অ্যারিষ্টটল-কল্পিত জগতের একটী মোটামুটি ধারণা জন্মিতে পারে।

উল্লিখিত দেবতা বা স্পিরিট সম্বন্ধে Zeller's History of Greek Philosophy হইতে একাংশ উদ্ধৃত করা গেল।

"To each of these (spheres) as to 'the first-heaven', its motion must be imparted by an eternal and unlimited, and therefore incorporeal substance, by a spirit belonging to it: and thus there must be as many sphere-spirits as spheres."

জগতের বহির্দ্দেশে, বহুদূরে অবস্থিতি করেন, মোটের উপর এই বিশ্বাসটী খ্রীষ্টধর্ম্মের মূল ভিত্তি এবং খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণ এই বাক্যটীকে স্বয়ং ঈশ্বরোক্তিরূপে মানব মনে অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন।

অ্যারিষ্টটলের বায়ুবিজ্ঞান (Meteorology) তাৎকালিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত তদীয় জ্যোতিঃ শাস্ত্রের ধারণাপেক্ষা অধিক যুক্তিসঙ্গত। তাঁহার মতে যে বায়ুরাশি পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহার দুইটী স্তর (Toroi); উহার একটী শৈত্যপ্রধান, যদ্দ্বারা সসাগরা পৃথিবী আবৃতা, অপরটী অপেক্ষাকৃত উষ্ণতর, হিরাক্লাইটাস যাহাকে 'পুর'(Pur) বলিয়াছেন এবং যাহা স্বর্গমণ্ডলীর শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সর্ব্বোচ্চ বায়ুমণ্ডলে উল্কারাজি এবং ছায়াপথ অবস্থিত। নিম্নবর্ত্তী বায়ুমণ্ডলী হইতে ঝটিকা, ঝঞ্ঝাবাত, রামধনু এবং অন্যান্য বায়বীয় পরিবর্ত্তন সমূহ, ভূমিকম্প এবং সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় পৃথিবীস্থ জলরাশি এবং বায়ুর ঘাতপ্রতিঘাতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বায়বিক এবং সামুদ্রিক আন্দোলন সম্বন্ধে অ্যারিষ্টটলের ব্যাখ্যায় যতটুকু সত্য নিহিত থাকুক বা না থাকুক, প্রাকৃতিক (Natural Science) তাঁহার গবেষণা অমিত প্রতিভার পরিচয় দিতেছে।

জীব জগতেই প্রকৃতির উদ্দেশ্যসাধক কারণ সমূহের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এইখানেই প্রকৃতি দেবী অসাধারণ ক্ষমতাশালী শিল্পীর ন্যায় সতত আত্মপ্রকাশ করিতেছেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, স্বাভাবিক ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়ে যাহাতে স্বীয় উদ্দেশ্য সফল হয়, তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। কলাবিদ্যা (Art) এবং প্রকৃতি (Nature),* উভয়ের পার্থক্য এই যে, শিল্পী যে কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, পূর্ব্ব হইতে তাহার রচনা-কৌশল তাঁহাকে শিক্ষা করিতে হয়; প্রকৃতির বেলায়, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ভাবনা চিন্তার আবশ্যক করে না। পূর্ব্বকথিত পক্ষী এবং শয্যার বিষয় ভাবিলে দেখা যায় যে, পক্ষীরূপ উদ্দেশ্যটী স্বয়ংই কার্য্যে, অর্থাৎ পক্ষীতে, প্রকটিত হইতেছে, কিন্তু শয্যা প্রস্তুতের সময় কারিকরের সাহায্য প্রয়োজন। বাস্তবে পরিণতির জন্য শয্যারূপ উদ্দেশ্যটী কারিকরের সাহায্য লইতেছে, পক্ষীর উদ্দেশ্য স্বয়ংই পক্ষীরূপে প্রকাশ পাইতেছে, উভয়েরই কিন্তু চরমোদ্দেশ্যের ক্রিয়া বিদ্যমান। তবে আপত্তি হইতে পারে, শ্রেষ্ঠ আদর্শলাভই যদি প্রকৃতির উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হয়, তবে স্বভাবে, বিকলাঙ্গজীবের (monster) সৃষ্টি কেন? ইহার উত্তর এই যে, মানুষের ন্যায় প্রকৃতিরও ভুল ভ্রান্তি আছে। বৈয়াকরণিকও শব্দান্বয়ে ভুল করিতে পারেন, চিকিৎসক চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াও, রোগ নির্ণয়ে ভুল করেন। প্রকৃতির কার্য্যকলাপেও সেই ভুল হওয়া এবং তাহার ফলে, বিকৃত বা অসম্পূর্ণ জীবের উৎপত্তি হওয়া আশ্চর্য্য নহে। এমন ভুল কেন হয়? জড়ের সহিত সংমিশ্রণই উহার একমাত্র কারণ। প্রকৃতি সোজাপথে চলিতে চাহিলেও জড় তাহাকে সময়ে সময়ে বাঁকা পথে লইয়া যায়। সুতরাং সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্তির জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও প্রকৃতির সে উদ্দেশ্য সর্ব্বত্র সফল হয় না। প্রত্যেক কাজেই প্রকৃতির একটী বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, একটী নির্দ্দিষ্ট আদর্শের প্রতি যে সৃষ্টি মাত্রই চাহিয়া

* 'Nature', Aristotle explains, 'does nothing without an aim', 'she is always striving after the best', 'she always makes the most beautiful that is possible'.—Zellers' Outlines of Greek Philosophy.

আছে ও তৎপ্রতি অগ্রসর হইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। আমরা সৃষ্টি-রহস্যের প্রতি উদাসীন থাকি বলিয়া প্রকৃতির এই ক্রিয়া দেখিতে পাই না। প্রকৃতির ভিতরেও বিচার-বুদ্ধি কার্য্যকরী রহিয়াছে, তবে এই বিচার-বুদ্ধির কাজ এতই স্বাভাবিক যে, সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। শিল্প সম্বন্ধেও এই নিয়ম। কলাবিদ্যা অধিকাংশ স্থলেই সুফলদায়িনী, তবে তাহাতে মাঝে মাঝে ভুল চুকও ঘটে। একটু পার্থক্য এই যে, কলাবিদ্যা অন্তর্মুখী, প্রকৃতি বহির্মুখী (Art moves from without, nature from within)। কাষ্ঠের যদি নৌকা গঠনের ক্ষমতা থাকিত, তবে তাহাকে চেতনাময়ী প্রকৃতি বলা যাইত। উদ্দেশ্য বা সংকল্পই শক্তি, যাহা হইতে প্রকৃতি কর্ম্মে প্রণোদিত হইতেছে। উদ্দেশ্য বা সংকল্প জীবদেহ সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল।

অচেতন জড় এবং জীবের প্রভেদ এই যে, জীবদেহ আভ্যন্তরিক শক্তি বলে কয়েকটী অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাহায্য লইয়া, আপনাপন উদ্দেশ্য সাধন করিয়া লয়। উদ্ভিদের উদ্দেশ্য উদ্ভিদত্ব লাভ নহে, উদ্ভিদ্‌ভোজী জীব সমূহে পরিণতি লাভই উহার উদ্দেশ্য। উদ্ভিদাত্মার (Soul of the plant) কার্য্য কেবল মাত্র সমীকরণ (Assimilation) এবং পুনরুৎপাদন (Reproduction)। জীবাত্মার পক্ষে, এই দুইটী ক্রিয়া ছাড়াও সুখ দুঃখাদির অনুভব শক্তি আছে। উচ্চ শ্রেণীর জীবের মধ্যে আবার বিষয়াবধারণ ক্ষমতা (Power to retain sense impressions)ও দেখা যায়। দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শন, পঞ্চেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া পরস্পর মিলিত হইয়া একটী মাত্র সাধারণ জ্ঞান (Common sense) উৎপাদন করে। সাধারণ জ্ঞানই বিষয়ানুভূতির ভিত্তি। পশুর আত্মা সামান্য সুখ দুঃখেই বিচলিত হয়। সুখ লাভের জন্য পশু মাত্রই ব্যাকুল এবং দুঃখ ভোগে সতত বিমুখ। কর্ত্তব্য বোধের অভাবে, পশু দুঃখ ভোগের জন্য আদৌ প্রস্তুত নয়। তাহাদের গতি বিধি ক্রিয়াকলাপ আপনা হইতে সাধিত হয়, অর্থাৎ গতি বিধির উপর তাহাদের কোন আধিপত্য নাই। মানবের পক্ষে, সুখাসক্তি এবং দুঃখবিমুখতা স্বাভাবিক হইলেও, জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির সাহায্যে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হয়। এই বিশেষত্ব আছে বলিয়াই মানব দেহধারী জীবের মধ্যে পূর্ণতম জীব এবং প্রকৃতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি বলিয়া পরিগণিত। বিভিন্ন জীবস্তরের ভিতর দিয়া প্রকৃতি মানব রূপ আদর্শে পরিণত হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন। এই চরমোদ্দেশ্য সিদ্ধি কাল সাপেক্ষ এবং জড়ের সহিত সংঘর্ষই বিলম্বের কারণ। উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অসংখ্য বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও প্রকৃতির চেষ্টার বিরাম নাই। চেষ্টার ফলে প্রকৃতি প্রতিবারেই আদর্শের দিকে কিছু না কিছু অগ্রসর হইতেছেন। শিক্ষানবীশ শিল্পীও যে পর্য্যন্ত না তাহার কল্পিত মানস প্রতিমা পূর্ণমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়, সে পর্য্যন্ত চেষ্টা হইতে বিরত থাকে না।

উপরোক্ত অধ্যবসায়ের ফলে জীব জগতে একটী ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগ সাধিত হইয়াছে। জীব সৃষ্টির চরমোদ্দেশ্য অচেতন জড়ে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া জড় প্রদত্ত বাধাকে যে পরিমাণে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, জীব দেহ সমূহ এবং তাহাদের আত্মাও সেই পরিমাণে পরিণতি লাভ করে। উদ্ভিদাত্মার উপযোগী উদ্ভিদ্-দেহ কেবল মাত্র ঊর্দ্ধাধঃ ভাবে বিভক্ত; উহাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ, দক্ষিণ

ও বাম বলিয়া কোন পার্থক্য নাই। উদ্ভিদের মুখ (মূল) নিম্নগামী, জননেন্দ্রিয় (পুষ্প) ঊর্দ্ধগামী। উহার পৃষ্ঠ বা বক্ষঃস্থল বলিয়া কিছু দেখা যায় না। জীবাত্মার উপযোগী দেহ মাত্রেরই ঊর্দ্ধ ও অধঃ, বাম ও দক্ষিণ ইত্যাদি দুই দুইটী বিপরীত সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। অবশেষে, মানব দেহে এই ঊর্দ্ধাধঃ বৈষম্য ভাব জাগতিক নিরপেক্ষ ঊর্দ্ধাধঃ বৈষম্যের সহিত একার্থবোধক।

সমস্ত জীবরাজ্য সশোণিত এবং অশোণিত, এই দুইটী প্রধান ভাগে বিভক্ত। স্তন্যপায়ী জীব মাত্র, পক্ষী, মৎস্য এবং উভচর জীব, শোণিত-বিশিষ্ট। কীট পতঙ্গ, কঠিনাবরণ (Crustaceous) এবং মেরুদণ্ড-বিহীন জীব অশোণিত শ্রেণীর অন্তর্গত। উত্তাপ প্রাণ মাত্রেরই ধর্ম্ম। যে জীব দেহের উত্তাপ যত অধিক, সে সেই পরিমাণে পূর্ণতা লাভের অধিকারী। অ্যারিষ্টটলের মতে, জীব সৃষ্টি অবাধ গতি এবং বহু বিস্তৃতি সাপেক্ষ, তবে এমতটী তিনি উচ্চাঙ্গের জীব সম্বন্ধে গ্রহণ করেন নাই। প্রমাণসিদ্ধ আধুনিক ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকায়, তিনি জীবন এবং জীব শ্রেণীর (Species) অনন্ত বিদ্যমানতার সমর্থন করিয়াছেন।

সেন্দ্রিয় জীবদেহ এবং আত্মা বা জীবনী শক্তি, (Vital principle) উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ জড় ও রূপ, অব্যক্ত ও ব্যক্ত, সামর্থ্য ও কার্য্যের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ। উভয়ের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই জীব দেহের অস্তিত্ব এবং চরমোদ্দেশ্য রূপ আত্মার অবস্থিতি সম্ভব। জীবাত্মার যে নিরপেক্ষ স্বাধীনতা নাই, তাহার কারণ, আত্মা দেহকে যে পরিমাণেই সঞ্জীবিত রাখে, দেহের শক্তি ও ক্রিয়ারূপে প্রকাশ পায়, সেই পরিমাণেই আত্মার অস্তিত্ব। দেহকে ছাড়িয়া আত্মার অবস্থিতি সম্ভব হইলেও সে অস্তিত্ব না থাকারই মত, উহা আত্মার বিকাশাবস্থা নহে। দেহ ব্যতীত আত্মার ক্রিয়া প্রকাশ পায় না। অ্যারিষ্টটলের মতে, উপকরণ ব্যতীত যেমন মূর্ত্তি গঠিত হয় না, চরণ ব্যতীত যেমন গমন সম্ভব নয়, ইন্দ্রিয়গণ ব্যতীত সেইরূপ অনুভূতি, ইচ্ছা ও সংকল্প প্রভৃতি আত্মার কোন ক্রিয়াই সম্পন্ন হইতে পারে না। আত্মার সহিত দেহের যে সম্বন্ধ, কুঠারের ধারের সহিত কুঠারের সেই সম্বন্ধ। কুঠার সজীব হইলে কর্ত্তন ক্রিয়াকে উহার আত্মা বলা যাইত। কুঠার না থাকিলে যেমন কুঠারের ধারও থাকেনা এবং বৃক্ষাদির কর্ত্তন অসম্ভব হয়, দেহ না থাকিলেও সেইরূপ যে সকল ক্রিয়ার সমবায়ে আত্মার উদ্ভব, সেই সকল ক্রিয়ার অভাব ঘটে।

জীবনী শক্তি বা আত্মা সম্বন্ধে অ্যারিষ্টটল যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অনুমান হয় যে, আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি, অর্থাৎ মৃত্যুর পর আত্মার যে কোন জীবদেহ গ্রহণ (Metempsychosis) সম্ভব নহে। আত্মা দেহেরই ক্রিয়া সমষ্টি, অথবা বিভিন্ন শক্তি সমূহের সম্মিলিত বল (Resultant of different forces) ; এ জন্য আত্মার ক্রিয়া কলাপ অথবা স্বয়ং আত্মা, দেহের বিশেষ বিশেষ গঠন প্রণালী এবং প্রকৃতি কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, নেহাইয়ের আঘাতে বংশিধ্বনি অথবা বংশীদ্বারা নেহাইয়ের শব্দ উৎপন্ন হয় না। অশ্বদেহে মানবাত্মা অথবা মানব দেহে অশ্বাত্মা সংযুক্ত করিয়া দিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই।

দেহ আত্মার অনুদ্ভূত বা অব্যক্তাবস্থা, আত্মা দেহের শক্তি, বা ব্যক্তভাব। আত্মার

অথবা অব্যক্ত ভাব (সামর্থ্য অথবা সামর্থ্য সমষ্টি) ইচ্ছা, বিষয়ানুভূতি এবং সুখ দুঃখ বোধ রূপ মানসিক ক্রিয়া সমূহের আশ্রয়স্থল সাধারণ জ্ঞান (Common sense), যাহা হইতে সংকল্প, বিষয় জ্ঞান এবং ইন্দ্রিয় বৃত্তিরূপ অনুষ্ঠান সমূহ সাধিত হয়। আত্মার প্রথমাবস্থায় উহাকে কেবল মাত্র শক্তি কেন্দ্র (Entelechy), বা দৈহিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের আদি কারণ এবং উহার ব্যক্তাবস্থা সমূহকে (Manifestations) দৈহিক অনুষ্ঠানরূপেই গণ্য করিতে হইবে।

বিষয়ানুভূতি, কল্পনা, স্মৃতি এবং সংকল্প হিসাবে আত্মাকে পার্থিব সুখ দুঃখাদির অংশ গ্রহণ করিতে হয়। এই হিসাবে আত্মা নশ্বর, এমন কি, বুদ্ধিরও নশ্বরত্ব গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধির নশ্বরত্ব বা অসারতা, আমাদের ধারণা সমষ্টির উপরে দৈহিক এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনা সমূহের উত্তেজনার ফল। বুদ্ধি বহির্জগৎ হইতে যাহা কিছু গ্রহণ করে, তাহাই উহার নশ্বর অংশ। এই অসার অংশ দেহের সহিত সমদুঃখ ভাগী এবং দেহ ব্যতীত উহার অবস্থিতি অসম্ভব। কেবল মাত্র সারভাগ, যাহা বিশুদ্ধ চৈতন্য, যদ্দারা সার্ব্বজনীন সত্তার ধারণা হয় এবং পরমার্থ লাভ ঘটে, সেই অংশেরই বিনাশ নাই। এই অংশ শারীরিক পরিবর্ত্তন এবং সুখ দুঃখাদির অতীত, পরিবর্ত্তনাদির দ্বারা ইহার অস্তিত্বের কোন মীমাংসা করা যায় না। দেহ হইতে উহা মূলতঃ পৃথক ও ভিন্ন প্রকৃতি; কিন্তু অন্যান্য মানসিক ক্রিয়াগুলি দেহের সহিত সম্বন্ধবদ্ধ। ক্রিয়ান্বিতা বুদ্ধিকে (Active intellect) কেবলমাত্র সামর্থ্য বলা যায় না; উহা বাস্তব সত্তা। উহা স্বভাবজাত নহে; বিষয়ানুভূতি, কল্পনা ও স্মৃতি প্রভৃতির ন্যায় আত্মার পরিণতি ফলও নয়। এক কথায়, এই বুদ্ধি সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কেহ নয়, পরন্তু উহা নিরপেক্ষ শক্তি, যাহা জীবাত্মা এবং দেহ সৃষ্টির পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল এবং দৈবক্রমে, অর্থাৎ আপনা হইতে দেহের সহিত সংযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। দৈহিক পরিবর্ত্তনাদি হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকায়, এই বুদ্ধি জড়তা বর্জ্জিত, বিশুদ্ধ শক্তি, অজরামর এবং অনন্ত; ইহার সহায়তা ভিন্ন অসার বা সগুণ বুদ্ধি কোন বিষয়ের ধারণা করিতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদিগ্বিজয় রায়চৌধুরী।

উপন্যাসে ধর্ম্মপ্রচার—বঙ্কিম বাবু।

আয়েষা, লবঙ্গলতা, কপালকুণ্ডলা।

পবন গুণ্ গুণ্ গান—রবি শশী তারা, কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্রের হরি-সঙ্কীর্ত্তনে ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া রহিয়াছে। পাপ পুণ্যের করুণ প্রফুল্ল সঙ্গীতে—ধর্ম্মের বংশীধ্বনিতে ধরাতল নিনাদিত হইতেছে। পবিত্র দাম্পত্য-প্রণয়ের কুহু কুহু রবে সংসারকুঞ্জ কূজিত হইতেছে। ভাগ্যবান্ তাঁহারা, যাঁহারা এই হরি সঙ্কীর্ত্তন, এই সঙ্গীত, এই বংশীধ্বনি শুনিতে পান। অধিকতর ভাগ্যবান্ সেই সকল ব্যক্তি, যাঁহারা এই বিশ্ব-সঙ্গীতের দুই চারিটী পদও গাহিতে পারেন। আর সর্ব্বাপেক্ষা ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা এই সঙ্গীত গাহিয়া ধর্ম্ম

প্রচার করিতে সমর্থ। বঙ্কিম বাবু এই সর্ব্বোচ্চ-শ্রেণীর লোক। তিনি তাঁহার প্রতিভার মোহন বাঁশীতে গান গাহিতে গাহিতে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। তিনি দেবী চৌধুরাণীতে, আনন্দমঠে ও সীতারামে প্রত্যক্ষ ও প্রোজ্জ্বল ভাবে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। অন্যান্য প্রধান উপন্যাসে প্রত্যক্ষ ভাবেই হউক আর পরোক্ষ ভাবেই হউক, তিনি ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

যদি কেহ বঙ্কিমের সমুদয় রচনা একত্র করিয়া, তাহার নাম বঙ্কিম-সংহিতা দিয়া তাহার ভাষ্য বা টীকা লিখিতে পারেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। অথবা জার্ভাইনস (Gervinus), ডাউডেন (Dowden) বা ভিক্টর হিউগো (Victor Hugo) যেমন সেক্ষপিয়ার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যদি কেহ বঙ্কিমের তেমনই ব্যাখ্যা করেন, তবে সাহিত্য-জগতে একটী মঙ্গল সাধন করা হয়। (Prescott) স্যার ওয়াল্টার স্কটকে (Sir Walter Scott) Shakspeare in prose বলিয়াছিলেন। এই অর্থে আমরাও বঙ্কিম বাবুকে গদ্যে সেক্ষপিয়ার বলিতে পারি। আমি ভরসা করি, কোন পাঠক আমাকে বঙ্কিমের অন্ধ পূজক মনে করিবেন না। আমি যৌবন-চাপল্য বশে, বা অজ্ঞতা হেতু, বঙ্গবাসীতে, নব্যভারতে এবং নবপ্রভাতে প্রকাশিত মল্লিখিত "উত্তমানন্দের বক্তৃতাতে" বঙ্কিম বাবুর কোন কোন লেখার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন বার্দ্ধক্যে, বহুদর্শিতায়, ভরসা করি, একটু বিনয় শিক্ষা করিয়াছি। এখন মনে হয়—

অলোকসামান্যমচিন্ত্য হেতুকম্
দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম্।

মূঢ় পুরুষগণ, কারণ বুঝিতে না পারিয়া, মহাত্মাদের অলোকসামান্য চরিত্রে দোষ দিয়া থাকে। স্থূলদর্শী পাঠকগণও তেমনই অসাধারণ প্রতিভাশালী গ্রন্থকারদিগের রচনাতে সহসা দোষারোপ করেন।

সংযম ধর্ম্মের ভিত্তি। সাগরে ঝটিকা যেমন কর্ণধারহীন নৌকাকে নিমজ্জিত করে, তেমনই সংযমহীন হৃদয় মনুষ্যকে পাপ-সাগরে ডুবাইয়া দেয়। বঙ্কিম বাবু তাঁহার উপন্যাসাবলীতে পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিয়াছেন যে, সংযম শান্তি, ধর্ম্ম ও স্বর্গ; অসংযম অশান্তি, অধর্ম্ম ও নরক।

আমরা প্রথমতঃ দুর্গেশনন্দিনী আলোচনা করিব। ইহাতে আয়েষা সর্ব্বাপেক্ষা মনোহারিণী সৃষ্টি। এত মনোহারিণী কেন? তাহার সংযমের জন্যই। একদিকে তাহার প্রণয় যেমন জলধিবৎ গভীর, অন্যদিকে তাহার ইন্দ্রিয়-সংযম গিরিশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত—যেন সূর্য্যের কনক কিরণ-বিভাসিত শুভ্র-তুষারে নিত্য মণ্ডিত। কিন্তু আয়েষার মনে একটু অভিমান, একটু অহঙ্কার ছিল। অহঙ্কার প্রতিহত হইলেই ক্রোধ হয়, আর ক্রোধ হইলেই সম্মোহ উপস্থিত হয়। সম্মোহ হইলেই অবিবেচনার কার্য্য হয়। তাই যখন ওসমান নিশীথে জগৎসিংহের শয়ন-কক্ষে আয়েষাকে একাকিনী দেখিয়া বলিলেন যে "নবাব-পুত্রি, এ উত্তম," আয়েষা জিজ্ঞাসা করিলেন "কি উত্তম, ওসমান?" ওসমান কহিলেন, "নিশীথে একাকিনী বন্দি-সহবাস নবাব-পুত্রীর পক্ষে উত্তম। বন্দীর জন্য নিশীথে কারাগারে অনিয়ম প্রবেশও উত্তম"।

সমাজের দিক্ হইতে দেখিলে, ওসমানের এই কথা কিছুই অসঙ্গত হয় নাই। কিন্তু অভিমানিনী আয়েষার পবিত্র চিত্তে এ তিরস্কার সহনাতীত হইল। তিনি ওসমানের

মুখপানে চাহিয়া অতি গর্ব্বিত স্বরে কহিলেন—"এ নিশীথে কারাগার মধ্যে আসিয়া এই বন্দীর সহিত আলাপ করা আমার ইচ্ছা। আমার কর্ম্ম উত্তম কি অধম, সে কথায় তোমার প্রয়োজন নাই"। ইহার পরও যখন ওসমান সমাজ নিয়ম লঙ্ঘনের গূঢ় কারণ জানিবার চেষ্টা করিলেন, তখন আয়েষা দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তাঁহার বিশাল লোচন আরও যেন বর্দ্ধিতায়তন হইল। মুখপদ্ম যেন অধিকতর প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল; হৃদয় তরঙ্গান্দোলিত নিবিড় শৈবাল জালবৎ উৎকম্পিত হইতে লাগিল; অতি পরিষ্কার স্বরে আয়েষা কহিলেন, "ওসমান, যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমার উত্তর এই যে, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর!"

যদি তন্মুহূর্ত্তে কক্ষ মধ্যে বজ্র পতন হইত, তবে জগৎসিংহ কি ওসমান অধিকতর চমকিত হইতে পারিতেন না? ওসমান অবাক্! আয়েষা পুনরপি বলিলেন, "শুন, ওসমান, আবার বলি, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর—যাবজ্জীবন অন্য কেহ আমার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। ** আমি (চিরকাল) ইহাঁর প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী দাসী রহিব" ইত্যাদি। এই আত্মগরিমাতে আয়েষার চিত্তে সংযমের কথঞ্চিৎ অভাব দেখা যায়। যেখানে চিত্ত-সংযমের অভাব, সেখানেই অনর্থ ঘটে। তাই নিভৃত অট্টালিকা-প্রাঙ্গণে ওসমান ক্রোধে আয়েষার 'প্রাণেশ্বর' জগৎসিংহকে পদাঘাত করিল। দুই জনের মধ্যে যুদ্ধ হইল। একজনের মরিবারই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ কাহারও প্রাণত্যাগ হইল না। জগৎসিংহ যদি সংযমী না হইতেন, তবে একটা অনর্থ ঘটিতে পারিত। শুশ্রূষাকারিণী প্রণয়শালিনী নিরুপমা সুন্দরী আয়েষার রূপ মাধুরীতে, সন্ধ্যা-সমীরণ-কম্পিত নীলোৎপল তুল্য ধীর মধুর কটাক্ষে, জগৎসিংহের হৃদয় এক মুহূর্ত্তের তরেও টলে নাই। কেন না, তাঁহার হৃদয় সংযত; তাহার উপর তিনি তিলোত্তমা-প্রেমে মগ্ন। কিন্তু তাহা যদি না হইত, আয়েষার উন্মাদয়িতৃ রূপে, উত্তপ্ত প্রণয় বিজ্ঞাপনে, "প্রাণেশ্বর, প্রাণেশ্বর" ইত্যাদি মোহোদ্দীপক সম্ভাষণে, উষ্ণ-শোণিত নবীন যুবক জগৎসিংহ অপবিত্র পিপাসায় উদ্ভ্রান্ত হইতে পারিতেন, এবং একটা ঘোর অশান্তিকর পাপচেষ্টা সমুদ্ভাবিত হইত। সুতরাং ওসমান কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলেও গর্ব্বিত আয়েষার প্রণয় জ্ঞাপন ও আত্মশ্লাঘা নিন্দনীয়। তিনি পরে জগৎসিংহকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, "আমি তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী নহি। আমি যাহা দিবার, তাহা দিয়াছি"। পত্র লিখিবার সময় আয়েষা কি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি কারাগারে জগৎসিংহের ও ওসমানের সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন যে, তিনি জগৎসিংহের "প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী দাসী"; না, তিনি ভুলেন নাই। পূর্ব্বে তাঁহার মনের ভাব এক রকম ছিল। এখন তিনি সংযম অভ্যাসে তাঁহার প্রেমকে নিষ্কাম প্রেম করিয়া তুলিয়াছেন, অথবা নিষ্কাম প্রেমে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

এখন নবাব-পুত্রী যবনী আয়েষার চরিত্রের সহিত হিন্দু গৃহস্থের কায়স্থ-কন্যা লবঙ্গলতার চরিত্র তুলনা করুন। রামসদয়ের সহিত বিবাহ হওয়ার পূর্ব্বে সুন্দর সুশিক্ষিত যুবা অমরনাথের সহিত তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। তিনি অমরনাথকে ভালবাসিয়াছিলেন। সেই ভালবাসা অতিশয় গভীর। লবঙ্গ অমরনাথকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা মনে করুন—

লবঙ্গ। * * এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও, কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—

অমর। লবঙ্গ আর কিছুই বলিল না। আমি ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া বলিলাম, "যদি লোকান্তর থাকে তবে ?"

লবঙ্গ। "আমি স্ত্রীলোক, সহজে দুর্ব্বলা। আমার কত বল—দেখিয়া তোমার কি হইবে ? আমি ইহাই বলিতে পারি, আমি তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—" ইত্যাদি।

দেখুন এখানে কেমন বিনয় ও বল।

যবনী আয়েষা পরপুরুষের প্রতি প্রেম দর্পসহকারে প্রকাশ করিলেন। হিন্দুরমণী লবঙ্গলতা তাহা অতি যত্নে সংগোপন করিয়াছিলেন এবং সেই প্রেমকে যথাসম্ভব কঠোরভাবে দমন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমরা কল্পনা করিতে পারি যে,লবঙ্গলতা যদি আয়েষা-চরিত্র সমালোচনা করিতেন, তাহা হইলে তিনি সম্ভবতঃ বলিতেন—"পরপুরুষকে আয়েষা 'প্রাণেশ্বর, প্রাণেশ্বর' বলিয়া ডাকাইল কেন ? তাহাকে প্রণয়লিপি লিখিল কেন ? যদি কোন দুর্ভাগ্যবশতঃ পরপুরুষপ্রেমে চিত্ত পতিত হয়, সেই নিষিদ্ধ প্রেম সাধ্যমত দমন করা এবং তাহা গোপন করা উচিত ; তাহা ঘোষণা করাতে বাহাদুরী নাই—নিন্দা ও নির্লজ্জতা আছে।"

আয়েষা পবিত্রতাভিমানিনী। তাই তিনি অভিমানে ওসমানকে বলিয়াছিলেন—"তুমি আজ আয়েষাকে অবিশ্বাসিনী ভাবিয়াছ। আয়েষা অন্য যে অপরাধ করুক, আয়েষা অবিশ্বাসিনী নহে"। কপালকুণ্ডলাও এইরূপ গর্ব্বিত বচনে নবকুমারকে বলিয়াছিলেন, "আইস, অবিশ্বাসিনী কি না, স্বচক্ষে দেখিয়া যাও"। যুবতী কপালকুণ্ডলা রজনীতে একাকিনী বনে যাইতেছিলেন। নবকুমারের অপরাধ, কপালকুণ্ডলাকে বলিয়াছিলেন, "চল আমি তোমার সঙ্গে যাইব"। তাই কপালকুণ্ডলার অভিমান। এই অভিমানে কপালকুণ্ডলার আর নবকুমারের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল।

উদ্দেশ্য ভাল হইলেও সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করা উচিত নহে। তাহা লঙ্ঘন করিলে তাহার ফল মন্দ হইবে, তাহার জন্য কোন না কোন সময়ে শাস্তি পাইতে হইবে। আমরা দেখি, আয়েষা, কপালকুণ্ডলা ও রমা সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছিল—তিন জনেরই উদ্দেশ্য উত্তম, পরোপকার। আয়েষা জগৎসিংহকে কারাগার হইতে মুক্ত করিবার জন্য নিশীথে কারাগারে একাকিনী জগৎসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ; কপালকুণ্ডলা শ্যামাসুন্দরীর জন্য ঔষধ আনয়ন করিতে রজনীতে একাকিনী বনে গমন করিয়াছিলেন ; ছোটরাণী রমা নিজের পুত্রের জীবনরক্ষা-প্রয়াসে গঙ্গারামকে তৃতীয় প্রহর রাত্রিতে অন্তঃপুরে নিজের কক্ষে আনিয়াছিলেন। তিন স্থলেই পরিণাম মন্দ হইয়াছিল। কপালকুণ্ডলা ও রমার পক্ষে তাহাদিগের এই ভ্রম প্রমাদের পরিণাম অতি শোচনীয় হইয়াছিল। পাঠক সম্ভবতঃ কপালকুণ্ডলার ভ্রম মৃদুভাবে আলোচনা করিবেন।

গম্ভীরনাদী সাগরের মধুর কল্লোলের সহিত,স্বেচ্ছাবিহারী বনসঞ্চারী বায়ুর স্বাধীনতার সহিত, রজনীর নক্ষত্রখচিত নীলাম্বরের প্রহেলিকার সহিত কপালকুণ্ডলার হৃদয়তন্ত্রী একসুরে বাঁধা হইয়াছিল। সমাজে আসিয়া সমাজের নিয়ম সকল তাহার বেসুরা বোধ হইয়াছিল। সে সাগরতটে বনে ফুলের ন্যায় ফুটিয়া রহিয়াছিল ; তাহাকে বৃন্তচ্যুত করিয়া

সংসারে আনা হইয়াছিল—যেন বনদেবীকে জনপদে আনিয়া সংসারের কারাগারে কয়েদ করা হইয়াছিল। তাই, পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ যেমন মুক্ত আকাশের স্বাধীনতার জন্ম ছট্‌ফট্ করে,কপালকুণ্ডলা তেমনই বনের স্বাধীনতার জন্ম অস্থির হইত। সমাজকে সে আপন করিতে পারে নাই, সামাজিক নিয়ম সকল আয়ত্ত করিতে পারে নাই। ইহাতে তাহার জন্ম দুঃখ হয়। কিন্তু ঐশিক নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। যিনি যে অবস্থায় পড়েন, তাঁহার কার্য্য সেই অবস্থার উপযোগী করা উচিত। নতুবা বিপদ্ বা মৃত্যু। কপালকুণ্ডলা সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে,কোন কার্য্যের উদ্দেশ্য ভাল হইলে তাহার উপায় দূষ্য হইতে পারে না। বঙ্কিমবাবু দেখাইয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত বিপত্তি-জনক। কপালকুণ্ডলা সমালোচনাকালে এই সকল কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। ঐরূপ রমার ভ্রম সম্বন্ধেও, সীতা-রামে প্রদত্ত ধর্ম্মশিক্ষা ব্যাখ্যা করিবার সময়, আরও কিছু বলিব।

আমরা আয়েষার ও কপালকুণ্ডলার অভিমানের পরিণাম উল্লেখ করিয়াছি। অভি-মান যে কি ভয়ানক দোষ, তাহা বঙ্কিমবাবু আরও স্পষ্টভাবে ভ্রমর ও গোবিন্দলালের চরিত্রে দেখাইয়াছেন। কালামুখী রোহিণী ভ্রমরকে জব্দ করিবার জন্য প্রতিবাসিনীর নিকট হইতে একখানি বাণারসী সাড়ী ও এক সুট গহনা চাহিয়া আনিয়া ভ্রমরকে তাহা দেখাইল এবং বলিল, "গোবিন্দলাল তাহাকে তিন হাজার টাকার গহনা আর এই সাড়ী খানি দিয়াছে"। ভ্রমর পূর্ব্বেই রোহিণী-ঘটিত মিথ্যা কলঙ্ককথা শুনিয়াছিল। সে অভিমানে আর কিছু বিচার থাকিল না। গোবিন্দ-লালকে পত্র লিখিল, "এখন তোমার উপর আমার ভক্তি ও বিশ্বাস নাই" ইত্যাদি, এবং গোবিন্দলাল জমিদারী হইতে বাটী প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বে পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। ছিঃ ভ্রমর কি করিলে! তুমি সতী সাধ্বী, তোমার এই কাজ! স্বামী যদি প্রকৃতপক্ষেই পর-নারীতে আসক্ত হন, সতীর কর্ত্তব্য কি? সতী অপ্রতিহত প্রণয়ে, অক্লান্ত অধ্যবসায়ে, সেই ধর্ম্মমার্গভ্রষ্ট পতিকে বক্ষে টানিয়া লইয়া, নিজের অশ্রুগঙ্গোদকে তাহাকে স্নান করাইয়া তাহার পাপমালিন্য প্রক্ষালন পূর্ব্বক, তাহার চিত্তকে ক্রমশঃ বিশুদ্ধ করিবেন। তুমি হয়ত দগ্ধ অভিমানে মজিয়া তাহার ঠিক বিপরীত কার্য্য করিলে, ভালবাসার পরিবর্ত্তে পতির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিলে; বস্তুগত্যা স্বামীর তখন যে পাপ হয় নাই, সেই পাপ টানিয়া আনিলে। গোবিন্দলাল বাটী পৌছিয়া শুনিলেন, ভ্রমর পিত্রালয়ে গিয়াছে। গোবিন্দ-লাল বুঝিলেন, ভ্রমর তাহাকে বিনা অপরাধে ত্যাগ করিয়াছে। "মনে বড় অভিমান হইল"। মনে মনে ভাবিলেন, "এত অবিশ্বাস! না বুঝিয়া, না জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল। আমি আর সে ভ্রমরের মুখ দেখিব না"। উভয়েরই অভিমান, উভয়েরই সংযমের অভাব, সহিষ্ণুতার অভাব; উভয়েরই পরিণামে শোচনীয় মরণ।

এখন আমরা আবার আয়েষা সন্নিধানে ফিরিয়া যাই। আয়েষার প্রেম নিঃস্বার্থ। তাই জগৎসিংহকে উন্মুক্ত করিতে চাহিয়া-ছিলেন; কতলুখাঁর দণ্ডাজ্ঞার আশঙ্কা তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন। জয়ন্তীও শ্রীকে কারা-গার হইতে মুক্ত করিবার জন্য সীতারামের দুর্জ্জয় ক্রোধ-বজ্র বুক পাতিয়া লইয়াছিলেন। এখানে প্রণয়িনী আয়েষা ও সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীর কার্য্য—উভয়ই নিঃস্বার্থ প্রেমের পরিচয়।

নিঃস্বার্থ প্রেমে প্রণয়িনী সন্ন্যাসিনীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছেন। মনোরমা ও পশুপতির পৈশুন্য ভয় না করিয়া, বন্দী হেমচন্দ্রকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এও নিঃস্বার্থ ভালবাসা।

আমরা দুর্গেশনন্দিনীর জন্য আর অধিক সময় দিতে পারি না। যেরূপ সমালোচনার তীর্থযাত্রা পথে বাহির হইয়াছি, তাহা অতি দীর্ঘ। আমার বাসনা যে, বঙ্কিমবাবুকে বঙ্কিমবাবুর সহিত তুলনা করিয়া বুঝিব; বঙ্কিমবাবুর এক একটী গ্রন্থ তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিব। আমার জীবনের সন্ধ্যাকাল ঘনাইতেছে। অতি শীঘ্রই রজনী সমাগত হইবে। রাত্রি আসিলে পথ হাঁটা হইবে না; এই তীর্থযাত্রা অসমাপ্ত থাকিবে। তাই এই সমালোচনার পথে যথাশক্তি দ্রুতবেগে হাঁটিতে হইবে। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, "আকাশে যেমন নক্ষত্র ছড়ান, ভবভূতির রচনা মধ্যে সেইরূপ কবিত্বরত্ন ছড়ান আছে"। বঙ্কিমবাবু সম্বন্ধেও তেমনই বলা যাইতে পারে, "আকাশে যেমন নক্ষত্র-রাজি বিক্ষিপ্ত আছে, বঙ্কিমবাবুর রচনাতে তদ্রূপ সুনীতিরত্ন তারকার ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতেছে।" কিন্তু সেগুলি সমুদয় দেখাইতে হইলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ লিখিতে হয়। তাহা লিখিবার আমার আর সময় নাই। তাই এই তীর্থযাত্রাপথে যেখানে যে দেবালয়, বা পুণ্য-প্রতিষ্ঠা দেখিব, তাহা সমুদয় বা সবিস্তারে বর্ণনা করিতে পারিব না।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

সঙ্গণিকা।

(৯)

এবার সাহিত্য-পরিষদ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে সভাপতি রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এদেশের পক্ষে ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। জগদীশচন্দ্র সাহিত্য-সেবী না হইলেও মাতৃভক্ত অমর সন্তান। তাঁহার আবির্ভাবে বাঙ্গালা ধন্য হইয়াছে। তাঁহার গৌরবে দেশ পূর্ণ হউক।

(১০)

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আগামী বাঁকীপুরের সাহিত্য-সম্মিলনীতে প্রধান সভাপতি এবং নব্যভারতের দুইজন বিশিষ্ট লেখককে সহ-সভাপতি মনোনীত করা হইয়াছে। সাহিত্যসেবী না হইলেও তিনি বাঙ্গালা ভাষার পরিপোষক, তাঁহার দ্বারাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা চলিতেছে। এহেন গুণধর ব্যক্তিকে সভাপতি মনোনীত করিয়া বাঙ্গালীকে গৌরবান্বিত করা হইয়াছে। এদেশে প্রকৃত সাহিত্য-সেবীদের যখন আদর হইবে না এবং চাটুকারে যখন দেশ পূর্ণ হইয়া যাইতেছে, তখন এরূপ গুণী ব্যক্তি সম্মানিত হন, প্রার্থনীয়।

(১১)

আর পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে, বুঝি বা বাঙ্গালী ভারতের আর কুত্রাপি স্থান পাইবে না। দিনে দিনে ব্যবসা বাণিজ্য ভারতের অন্যান্য সকলে গ্রহণ করিতেছেন, বাঙ্গালী দিন দিন চাকরীতে আত্মসমর্পণ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে, কলিকাতার পুরাতন লৌহের কারবার হিন্দুস্থানীগণ গ্রহণ করিয়া

ফেলিতেছেন, মাড়োয়ারাগণ, পার্শীগণ, পাঞ্জাবীগণ দেশের সর্ব্বত্র এবং বিদেশেও নানা ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া ধনী হইতেছেন, আর বাঙ্গালীরা নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছেন। রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রকারে অবনতি দেখা যাইতেছে। বিধাতা এই জাতিকে রক্ষা করুন।

(১২)

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবার বড়লাট সভায় প্রবেশ করিতে পারেন নাই বলিয়া বড়ই বিস্ময়ের কারণ হইয়াছে। কিন্তু এদেশের লোকের নিকট আর কি আশা করা যাইবে? যে দেশে কৃতিত্বের পূজা হয় না, সে দেশের লোকের নিকট অধিক আশা করা ভুল। সুরেন্দ্রনাথ ঐ সকল স্বপ্নের মায়া ভুলিয়া দেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হইয়া দেশের মঙ্গল কার্য্যে রত থাকুন।

(১৩)

মানুষ এক রূপ ভাবে, বিধাতা অন্য রূপ করেন। আমরা আশা করিয়াছিলাম,আমাদের বার্দ্ধক্যের সম্বল রসিকলাল রায় আমাদের তিরোধানের পর "নব্যভারত"কে রক্ষা করিবেন। কিন্তু তিনিও অল্প বয়সে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে জন্মগ্রহণ করেন; ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই, ১৫ই শ্রাবণ, সোমবার, আনন্দ-আশ্রমে দেহরক্ষা করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। রসিকলালের জীবন-কথা সংযমপূত মাধুর্য্যপূর্ণ। বহু দিন বিপত্নীক অবস্থায় সংযম সাধন করিয়া তিনি অমর হইয়াছেন। কিন্তু আমরা শোকে অবসন্ন,—এখন পারিলাম না, পরে তাঁহার কথা বিশেষ করিয়া লিখিব। অদ্য শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয়ের সহৃদয়তাপূর্ণ পত্রখানি এস্থলে তুলিয়া দিলাম।

"গিরিডি, ২১শে শ্রাবণ, ১৩২৩।

শ্রদ্ধাভাজনেষু—

বুধবারের প্রভাতে "বাঙ্গালী" খুলিয়া দেখিলাম যে, রসিকবাবু দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার কথাই কি ঠিক হইল? আপনি বলিয়াছিলেন যে, আপনার সহোদরার আদ্য শ্রাদ্ধকার্য্যে যোগদান করিতে গিরিডি আসিবার জন্য আপনি যখন রসিকলালের নিকট বিদায় চাহিলেন, আপনি আশা করিয়াছিলেন যে,তিনি এ কার্য্যের জন্য মুক্তকণ্ঠে আপনাকে বিদায় দিবেন, কিন্তু তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, "আর দেখা হবে না।" সত্যই কি সেই কথা ফলিল? আপনি কি কলিকাতায় পৌঁছিয়া তাঁহাকে দেখিতে পান নাই? তিনি সোমবারে দেহত্যাগ করিয়াছেন, হিসাব করিয়া দেখিলাম, আপনি বৈদ্যনাথ হইয়া সোমবারে কলিকাতায় পৌঁছাইতে পারেন নাই, সেই আজন্ম সাধুর কথা বোধ হয় সত্যই হইয়াছে। নব্য-ভারত অবলম্বন করিয়াই তাঁহার প্রতিভা প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। জ্ঞানপথে আপনি যাঁহাকে কতমত উৎসাহ দিয়াছেন, পীড়িত অবস্থায় যাঁহাকে নিজের বাড়ীতে রাখিয়া চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিলেন, এক দিনের ফাঁকে মৃত্যুকালে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না, এইরূপই নিয়তির খেলা!

রবিবারের সকাল বেলা আপনাতে আমাতে যতক্ষণ কথাবার্ত্তা হয়, তাহার অধিকক্ষণ সময়ই তাঁহার সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে সাক্ষাৎ আলাপ কখনও হয় নাই, কিন্তু আমার প্রাণে তাঁহার জন্য যথেষ্ট ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল। যে কোনও মাসিকে তাঁহার লেখা দেখিতাম, আমি সর্ব্বাগ্রে তাহা পাঠ

করিতাম। সকল বিষয়েই যে এক-মত হইতে পারিতাম, তাহা নহে, কিন্তু রসিকবাবুর রচনার মধ্যে যে শিষ্টতা, সত্যানুরাগ, চিন্তা-শীলতা এবং চাতুরী-রাহিত্য ও বিনয়নম্রতা ছিল, তাঁহার সরল, প্রাঞ্জল, অকৃত্রিম, বিশুদ্ধ ভাষার স্রোতের মধ্য দিয়া সেই ভাবগুলি আমাকে বড়ই আনন্দ দান করিত।

সেদিন তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্রের কথা আপনি যেমনই প্রাণের সহিত বলিতেছিলেন, আমিও তেমনি বুভুক্ষুর মতন সেগুলিকে গিলিতেছিলাম। শেষে যখন আপনাকে বলিলাম যে, তাঁহাকে (রসিকবাবুকে) আমার প্রাণগত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাইবেন, তখন তাঁহাকে দেখিতে আমার খুব ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু সে আশা আর ইহলোকে পূর্ণ হইল না!

কিঞ্চিদধিক ৪০ বৎসর মাত্র বয়সে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। রুগ্ন দেহ বহন করা তাঁহার পক্ষে ক্লেশকর হইয়াছিল। বাঙ্গালীর অকালমৃত্যুর জন্য যমরাজ যতগুলি অনুচর পাঠাইয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে "কালাজ্বর" নূতন নিযুক্ত হইল।

যাঁহারা রসিকলালের রচনা পড়িয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই অনুভব করিবেন যে, বাংলা সাহিত্য তাঁহার নিকট কতটা আশা করিয়াছিল। বাংলার অধিকাংশ মাসিকই তাঁহার কাছে বিশেষ ঋণী, এ সম্পর্কে আমিও বিশেষ ঋণী, তিনি তাঁহার রচনা দ্বারা অধিকাংশ সংখ্যা "বিজয়া"কে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। হিন্দী ভাষার মাসিকাদি হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া বাংলা ভাষায় প্রচারিত করার পন্থা রসিকলালই দেখাইলেন, এবিষয়ক প্রবন্ধ ও সমালোচনা তিনি অনুগ্রহ করিয়া বিজয়া'কে সর্ব্বাগ্রে প্রদান করেন। তাঁহার অনূদিত হিন্দী সাহিত্য-সম্মিলনীর সভাপতির বক্তৃতা বাংলা সাহিত্যে একটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। এ বিষয় রসিকবাবু যাহা করিতেছিলেন, কাহাকে সে কাজের ভার অর্পণ করিয়া গেলেন? হিন্দী সাহিত্যের বঙ্গানুবাদ বাংলা সাহিত্য-সংসারের একটা অতিশয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী, রসিকবাবু এই সামগ্রী প্রস্তুত করিবেন, এই আশা ছিল, সে আশা কুসুমিত হইতে না হইতে বিলুপ্ত হইল, সফলা হওয়ার সময় পাইল না।

রসিকলালের অভাবে বঙ্গবাসী একটী প্রকৃষ্ট ভক্ত ও একনিষ্ঠ সাধক হারাইলেন, বঙ্গবাসী একটী প্রকৃত মানুষ হারাইল। তাঁহার একমাত্র পুত্র জ্ঞানে, ধর্ম্মে, শক্তিতে, ভক্তিতে পিতার যোগ্যপুত্র হউন, ইহাই কামনা করি।

ভবদীয়—শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা।"

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১৩। হীরা। মিস মার্ষ্টন রচিত 'হীরাজ কোয়েষ্ট' নামক ইংরাজি পুস্তক অবলম্বনে শ্রীলক্ষ্মীপ্রসাদ চৌধুরী কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। মূল্য ॥০। ভাষা প্রাঞ্জল এবং মাধুর্য্যপূর্ণ।

১৪। আশিস্। শ্রীলক্ষ্মীপ্রসাদ চৌধুরী কর্ত্তৃক লিখিত। কুমারী মারস্টনের Nirmol's Choice নামক পুস্তকের ছায়াবলম্বনে লিখিত। মৌলিক গ্রন্থের ন্যায় সুমিষ্ট গল্পাবলম্বনে লিখিত। ভাষা বিশুদ্ধ।

১৫। প্রভু যীশুর শিক্ষামালা। ডাক্তার জেমস্ রবার্টসনের Our Lord's Teaching নামক পুস্তকের অনুবাদ। অনুবাদ ভাল।

১৬। চৈনিক ঋষি সি। ঐ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক লিখিত। উপদেশপূর্ণ কাহিনী মধুর ভাষায় লিখিত।

১৭। মণিমুক্তা। শ্রীরসময় লাহা প্রণীত। বিশুদ্ধ কবিত্বপূর্ণ পুস্তক। রসময় লাহার ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল। আমরা তাঁহার লেখার একান্ত পক্ষপাতী। নীরব সাধনার অক্ষয় ফল ফলুক। একটী কবিতা তুলিয়া দিলাম—

জন্মভূমির আদরের বীণা,
রয়েছ আঁধারে পেয়েছি আজ ;
কত যুগ হ'তে নীরব যে তুমি,
ধূলি ধূসরিত মলিন সাজ।

জন্মভূমির বীণা তুমি মোর,
গৌরবে বাঁধন খুলিনু তব ;
তন্ত্রীতে তুলি' ঝঙ্কারভাতি
গাহিনু মুক্তি-রাগিণী নব।

প্রেমের দীপ্ত দীপক বিভাস
চটুল স্বরেব বিলাস কত,
সতেজ পুলক রত নর্ত্তনে,
তোমার যা' প্রিয় মনের মত।

এত আনন্দ মাঝে তবু আজি
তোমার গভীর বিষাদ শ্বাস ;
ঘুরিয়া ফিরিয়া অজ্ঞাতে আসি'
পশিছে তোমাতে করিতে বাস।

জন্মভূমির প্রিয় বীণা তুমি,
ফেলে দাও দূরে বিষাদ জ্বালা ;
অমর গীতের—গাঁথিব যা' দোঁহে—
মালা হোক্ তব বিজয়-মালা।

লভগে বিরাম যশের কিরণে
আমার জন্মভূমির বীণ,
যতদিন নাহি পরশে তোমায়
আমা হ'তে যিনি নহেক হীন।

কি স্বদেশ-প্রেমী, কবি-শূর-বীর,
শুনি' আমাদের এ গীতরব,
ধমনী কাহারো নেচে উঠে যদি,
জেন সে গৌরব—তোমারি সব।

বহে যায় যথা মত্ত সমীর,
তেমতি তোমার মধুর তান
যেতেছিল ভেসে—স্বরে বেঁধে আমি
দিছি শুধু—এ যে তোমারি গান।

১৮। শতদল। শ্রীশচীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার প্রণীত, মূল্য ৸০। সাধনা করিলে ভবিষ্যতে ভাল লেখা বাহির হইবে। ইহা আশাপ্রদ গ্রন্থ।

১৯। The greater scourge or the struggle for existence and Keshub's call to Modern India. Prof. S. N. Roy M.Sc. B.A. Published by 'The Brotherhood.' চিন্তাপূর্ণ পুস্তক।

২০। রাক্ষস-রহস্য। আত্মবোধ-প্রণেতা শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্র প্রণীত, মূল্য ।৶০। বর্ণিত বিষয়ের সহিত আমাদের মতের মিল নাই, কিন্তু রচনা মাধুর্য্যপূর্ণ।

২১। জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, বি-এল প্রণীত, মূল্য ॥০। হীরেন্দ্রনাথ সাধক ব্যক্তি, তিনি যাহা লেখেন, তাহাই পড়িতে ইচ্ছা হয়, এবং অনেকেই পড়িয়া থাকেন। পুস্তকখানি তাঁহার লেখনীর অযোগ্য নয়, সুচিন্তা ও গবেষণা বিমিশ্রিত হইয়া এই গ্রন্থখানিকে সৃজন করিয়াছে। কিন্তু হইলে কি হয়, মতের সহিত ঐক্য হইতে না পারিয়া আমরা দুঃখিত—খুব দুঃখিত।

২২। প্রাণের গান। শ্রীমতী নলিনীবালা ঘোষ প্রণীত। সুন্দর কয়েকটী কবিতা এই পুস্তকে আছে। বিধাতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।

ভাব ও ভাষা। *

ভাব চৈতন্য, ভাষা আলম্বন। ভাব দেবতা, ভাষা মূর্ত্তি। ভাব কায়া, ভাষা ছায়া। ভাব দর্পণবিম্বিত মুখাদি, ভাষা দর্পণ। ভাব আন্তর ধর্ম্ম, ভাষা বাহ্যরূপ। ভাব অপার্থিব, ভাষা বাস্তব পদার্থ। ভাব ফল্গু, ভাষা বালুকাচর। ভাব ভক্তি, ভাষা কর্ম্ম।

ভাষা ভাবের বহির্বিকাশ কিম্বা ভাষার অভ্যন্তরে ভাব ওতঃপ্রোতোভাবে বিদ্যমান। ভাষাই ভাবের দ্বার। ভাষাই ভাবপুর প্রবেশের দুর্গ। ভাষাকে আশ্রয় করিয়াই ভাবের স্থিতি, স্ফূর্ত্তি। সাধারণ কথায় বলে, মনোভাব ব্যক্ত করিবার নিমিত্তই ভাষা। ভাষা-পাষাণ ভেদ করিয়াই ভাবের উৎস ছুটে, ভাষা-সলিলেই ভাববুদ্বুদ ফুটে। ভাবরূপ ধান্য ঘরে তুলিতে হইলে ভাষারূপ ধানের চারা রোপণ আবশ্যক। ভাব প্রকাশ্য, ভাষা তাহার প্রকাশক।

জড় পদার্থই আলম্বন আর সেই আলম্বনে প্রকাশমান চৈতন্যই দেবতা। ভাষা-প্রতিমায় ভাব-দেবতার আবির্ভাব। চৈতন্য-রহিত দেবমূর্ত্তি পুত্তলিকা মাত্র, তাহাই জড়। ভাবহীন ভাষা প্রাণহীন শব্দসমষ্টি, তাহা মৃত। ভাবময়ী ভাষাই হৃদয় স্পর্শ করে, দেশের দশের হিত করে। ভাবশূন্য ভাষা চির দিনের মত আদৃত হয় না; ধধূপের মত দুইদিন মাত্র আলোক দিয়া বিলীন হইয়া যায়। দেবতা প্রতিষ্ঠিত থাকে বলিয়া আলম্বনের আদর; আলম্বন না থাকিলে সার্ব্বভৌম অপরিচ্ছিন্ন অসীম চৈতন্য ধারণায় আইসে না। ভাব প্রকাশক বলিয়াই ভাষা সজীব প্রাণসমন্বিত; ইহাই আমাদের অবলম্বনীয়া, আরাধ্যা। ভাব চৈতন্যময়ী বলিয়া ভাষা তর তর বেগে নদী স্রোতের মত চলে, সূর্য্য চন্দ্রের মত আলোক দেয়, বিহঙ্গের মত আকাশে উড়ে, বাতাসের মত সর্ব্বত্র গমন করে। ভাবহীনা ভাষা অচল।

দেবতা ও আলম্বন উপাস্যের কাছে অভিন্ন বলিয়াই প্রতীত। ভেদজ্ঞান-প্রাবল্যে উপাসনা সার্থক নহে। সেবকের ভাষা ও ভাবকে অভিন্ন বলিয়াই ভাবনা কর্ত্তব্য। ভাষা যখনই ভাবময়ী—তখন তাহা চিন্ময়ী। দেবমূর্ত্তি জড় ভাবিতে নাই, যেহেতু জড়ের অভ্যন্তরে দেবতা জাগ্রত। দেহী ও দেহের মত কায়া ও ছায়ার মত ভাব ও ভাষা নিত্য সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। ভাবহীনা ভাষা নামে মাত্র ভাষা। প্রকৃত ভাষা বলিতে ভাব সমন্বিতা ভাষাই বুঝিতে হয়। এই জন্যই ভাব ও ভাষা কায়া ও ছায়া। ভাব দেবতা বলিয়া অন্তঃস্থ, সকলের নিকট সকল সময়ে প্রকাশিত হন না। ভাষা জড়মূর্ত্তি বলিয়া সকলেরই দৃশ্য। ভাবকে ছাড়িয়া যখন ভাষা, তখনই পুত্তলিকা। আমরা প্রতিমা-পূজক—আমাদের কাছে ভাষা চিন্ময়ী মাতৃসম পূজ্যা, নারায়ণী বলিয়া উপাস্যা।

দর্পণ পরিষ্কৃত বিশুদ্ধ না থাকিলে মুখাদি সুষ্ঠু প্রতিবিম্বিত হয় না। মুখাদির স্পষ্ট প্রতিবিম্ব-পাত মলিন দর্পণে কখনই পড়ে না। ভাবের স্ফূর্ত্তি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে হইলে ভাষার শুদ্ধি ও নৈর্ম্মল্য সাধন আবশ্যক। ভাষা যেরূপ অবিশুদ্ধ থাকুক না

* যশোহর সাহিত্য-সম্মিলনের নবম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

কেন, ভাবের অভিব্যক্তি হইবেই; আর মোটের উপর সেই ভাবের সংস্পর্শে ভাষাও বেশ মানাইয়া যাইবে—এ আশা বৃথা।

ভাব অন্তরের ধর্ম্ম। ভাবই যখন রস-রূপে পরিণত হইয়া থাকে, তখন তাহা কঠিন বাস্তব পদার্থ হইতে পারে না। ভাষা বাস্তব পদার্থ, শব্দই ভাষার প্রধান উপাদান। এই শব্দ শরীরের সংযোজন, অর্থের মাধুর্য্য, সুন্দর মার্জ্জনা ও অলঙ্কার সন্নিবেশের প্রতি যত্ন রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। ভাষা বাস্তব পদার্থ বলিয়া বাহ্য রূপ।

ভাষারূপ বালুকাচরের অভ্যন্তরে ভাব-ফল্গু অবস্থিতি করে। বালুকা খুঁড়িলেই ভাবের নির্ম্মল সলিল ফুটিয়া বাহির হয়। কোথাও সামান্য কোথাও বা অধিক খনন করার আবশ্যক পড়ে। ভাষা লঘু ও গুরু, উভয় প্রকারই হইয়া থাকে। আদি করুণ রসে লঘু, বীর, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়ানক রসে গুরু হওয়া প্রয়োজন। ভাষা কোথাও নারিকেল ফলসন্নিভ, বাহিরে কঠিন। ভেদ করিলে ভাবের শীতল জল দেখা দিবে। আবার ভাষা কোথাও মাখনের মত কোমল; মুখে দিতে দিতেই আস্বাদ পাওয়া যায়। ভাষা কখন কোমলা স্নেহময়ী অন্নপূর্ণা, কখন বা ভীষণা পদদলিতা শিবদেহা কালিকা। ভাষার মধ্যে কখন নন্দনের অম্লান সৌরভ, কখন বা মরুভূর রুক্ষতা বিরাজ করে। ভাষা যাহাই হউক, ভাব কিন্তু আনন্দময়। করুণের শোকের মধ্যেও আনন্দলহরী খেলিয়া থাকে, নচেৎ সহৃদয় সাধ করিয়া কেন করুণ রসাশ্রিত নাটক অভিনয় দেখিবার জন্য ব্যগ্র হন? শোক দুঃখ কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রিয় হইতে পারে না।

চৈতন্যই জড়াকারে কিম্বা জড়াভ্যন্তরে চৈতন্য—ইহা চিন্তার দুইটী দিক্ মাত্র। ভাষাকে ভাবের বহির্বিকাশ, ভাবকে ভাষার আন্তর বিকাশ বলাও যা, ভাষার ভিতরে ভাবের স্থিতি স্ফূর্ত্তি বলাও তা। অন্তর্জ্জগতেই বহির্জ্জগতের আকারে, কিম্বা বহির্জ্জগতের বিশ্বস্থানীয়ই অন্তর্জ্জগত—উভয়ই সত্যের দুইটী পার্শ্ব মাত্র। ভাবই ভাষার অন্তর্বিকাশ, ভাষাই ভাবের বহির্বিকাশ, ইহা অনুধাবন করিতে হইলে সূক্ষ্ম চিন্তার সাহায্য আবশ্যক। ভাষার অভ্যন্তরে ভাব—ইহা সরল চিন্তার আয়ত্তের মধ্যে, আর ইহাই সাধারণ মতসিদ্ধ কথা।

ভাব অপার্থিব। যাহা আন্তর ধর্ম্ম, যাহার আনন্দময় রস আকারে পরিণতি, তাহাকে পার্থিব বস্তু বলা যায় না। যে রসে ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি, সেই রস অপার্থিব; ভাবও যখন সেই রসেরই পূর্ব্বাবস্থা, তাহাও অবশ্য অপার্থিব। আর ভাব বলিতে রসও যে তাহারই মধ্যে, ইহা পরে বুঝাইব। অতএব রস-রূপে ভাবকে অলৌকিক আনন্দময় দ্রবীভাবকে পার্থিব বলা চলেই না।

ভাব ভক্তি। ভক্তি যে ভাব পদার্থ, ইহা সকলেই জানেন। পরমেশ্বরে যে গাঢ় অনুরাগ, তাহাই ভক্তি। প্রণয় স্নেহ দয়া প্রভৃতিও হৃদয়ের ভাব। ভক্তিভাব প্রেমভাব প্রভৃতি পদেই তাহা বুঝা যায়। ভক্তি স্নেহ দয়া মৈত্রী প্রণয় প্রভৃতি অন্তরের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। ভাষা কর্ম্ম। কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তমলা পাপদোষ নাশ করিলে পর তবেই ভাব ভক্তির আবির্ভাব। কুকর্ম্মে আসক্ত সৎকর্ম্মে বিতৃষ্ণ ব্যক্তি পাপপরায়ণ, তাহারা কখনই ভাবভক্তির অধিকারী হয় না। অবশ্য ভাব ভক্তির উদয় হইলে তখন আর মলাদি থাকে না, ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার হইয়া যায়। ভাব-

ভক্তি হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে কর্ম্মানুষ্ঠানে আর ব্যাপৃত থাকার প্রয়োজন থাকে না। ভাবের সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইয়া গেলে তখন আর ভাষার দিকে কাহারও লক্ষ্য থাকে না।

মন্দির প্রবেশের জন্যই দ্বার আবশ্যক, আর এই দ্বারই মন্দিরের রক্ষক। দ্বার যদি অবারিত থাকিত, তাহা হইলে যে কোন দস্যু চোর বদমাইস আসিয়া মন্দিরটীকে ছারে-খারে দিত, দেবমূর্ত্তি লইয়া পলাইত, কিম্বা মূর্ত্তির অঙ্গে নানা আবর্জ্জনা দিয়া ভরিয়া দিত, সন্দেহ নাই। ভাবুক, সেবক, সাধক ও মহাপ্রাণ ব্যক্তিই ভাব-মন্দিরে প্রবেশের অধিকারী।

ভাব-রাজপুরের উপর সকলের লোলুপ দৃষ্টি নিপতিত। আর এই ভাষা-দুর্গ সেই সকলের লোলুপ দৃষ্টির প্রতিরোধক। এই ভাষা-দুর্গ অতিক্রম না করিলে যখন ভাব-পুরী দুষ্প্রবেশ্য, তখন যে কেহ যে কোন মুহূর্ত্তে কিঞ্চিন্মাত্র সাধনা ব্যতিরেকে যে ভাব-পুরী প্রবেশে সমর্থ হইবেন, ইহা সঙ্গত নহে। ভাষা কোথাও দ্বার, কোথাও দুর্গ, ভাবও কোথাও মন্দির, কোথাও রাজপুরী, ইহার তাৎপর্য্য বোধ করি বুঝানের প্রয়োজন নাই।

ভাষাই ভাবের আশ্রয়। ভাষাকে আশ্রয় না করিলে ভাব শূন্যে বিচরণ করিত, বৃক্ষ-শাখায় বাঁধা থাকিত, কিম্বা রসাতলে পলাইয়া যাইত, তাহা বুঝিতে পারি না। আর স্বয়ং-সিদ্ধ ভাবগ্রাহী ভাবুকের হৃদয়গুহার নিভৃত-কক্ষে আশ্রয় পাইলেও তাহাতে আমাদের কোন লাভই হইত না। প্রকাশক আলো-কাদি না থাকিলে বস্তু প্রত্যক্ষীকৃত হয় না, চক্ষুরাদি তাহার কার্য্য করিবার সুযোগ পাইত না। অবশ্য যোগশক্তি সাহায্যে কোন সাধক যদি আলোকাদি ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ-বিরহিত অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারাই বস্তু দর্শনের অধিকারী হন, তাহাতে আলোকাদির উপ-যোগিতা কমে কি? তদ্রূপ কোন অসামান্য ভাবুক রসজ্ঞ সহৃদয় ব্যক্তি ভাষা আলম্বন ব্যতীত যদি ভাবের উপলব্ধি করিতে সমর্থই হন, তাহাতে ভাষার গৌরবের ত্রুটি হইবে কেন?

শব্দ ব্যবহারাদিনা প্রযুজ্যতে যা সা ভাষা। শব্দ ব্যবহারাদি দ্বারা যাহা প্রযুক্ত হয়, তাহা ভাষা। এই ভাষাকে আর্য্য ঋষিগণ আরাধ্যা দেবীজ্ঞানে পূজা করিয়া গিয়াছেন, ব্রহ্মশক্তি সায়ং সন্ধ্যারূপিণী, বৈষ্ণবী মূর্ত্তি রূপে যাঁহার উপাসনা ব্যবহিত, বীণাপাণি বাগ্দেবী নারায়ণী সরস্বতী রূপে পূজা যাঁহার বিহিত, সেই চৈতন্যময়ী ভাষা আমাদের জননী। আমরা তাঁহার সন্তান। শ্রদ্ধা ভক্তির চন্দন মাখাইয়া জ্ঞানকুসুমে সেই জগজ্জননী মায়ের পূজা করা সন্তানের ধর্ম্ম। ক্ষুদ্রজ্ঞান, মলিন রুচি, কদর্য্য মনোবৃত্তি, উৎকট অর্থলালসা লইয়া মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করা সন্তানের পক্ষে উচিৎ হয় না। মায়ের পূজা করিতে গিয়া ভোগের সেবা করা কি সন্তানের সাজে? যে কুসন্তান বাগ্দেবীরূপিণী ভাষা-দেবীকে ভোগের বস্তু বলিয়া মনে করে, বারবিলাসিনী বোধে কুৎসিত দৃষ্টি-নিক্ষেপ করে, সে কি অভিশপ্ত মহাপাতকী নহে? এই পবিত্র দেবমন্দিরে যে পাষণ্ড কামের পঙ্কিল স্রোত বহায়, কুরুচির বিষাক্ত বাতাস সঞ্চালিত করে, অনাচারের আবর্জ্জনা ছড়াইয়া দেয়, এমন কি, জঘন্য স্বার্থ, উৎকট অর্থলালসা ও ঘৃণ্য ব্যবসাদারীর মদিরা-বৃষ্টি করে, সে ব্যক্তির উপযুক্ত দণ্ড কি, তাহা আমরা জানিনা।

ভাবের অনুরূপই ভাষা। বিম্বপ্রতিবিম্ব

একই প্রকারের হইয়া থাকে। অনভিজ্ঞের হাতে পড়িয়া ভাষা যদি ভাবানুরূপা না হয়, তবে বুঝিতে হইবে তাহা জড়পুত্তলিকার মত প্রাণহীন। বুঝিতে হইবে, সেই ভাষা ভাবময়ী--চিন্ময়ী হয় নাই। ভাবের অনুরূপে অভিব্যক্ত না হইলে তাহার দ্বারা কোন উপকার প্রত্যাশা করা যায় না। ভাব ওজস্বী হইলে ভাষা ওজস্বিনী, ভাব মাধুর্য্যময় হইলে ভাষা মাধুর্য্যময়ী হওয়াই চাই। ভাব গগনপথে উধাও হইয়া বেড়াইবে, ভাষা রসাতলের দিকে নামিয়া যাইবে, ইহা সঙ্গত নহে। ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্য রাখাতেই প্রকৃত কবিত্বের বিকাশ। ভাষা শ্রুতিকটু দুরন্বয়াদি দোষদুষ্ট হইলে অর্থবোধ সহজে বোধ জন্মে না। ভাবাভিব্যক্তি ব্যাঘাতক যাহা, তাহাই দোষ। ভাষার সারল্যই ভাবসারল্যের কতকটা কারণ। ভাষা সরল হউক বা না হউক, ভাব সরল হইলেই হইল—ইহা অজ্ঞের কথা। আলম্বন নিকৃষ্ট হইলে অধিষ্ঠান চৈতন্যের উৎকৃষ্টতার আশা করা যায় না। ভাবানুরূপ ভাষার ব্যবহার করাই কবির শক্তিমত্তার পরিচায়ক। ভাষা ও ভাবের অননুরূপতা কাব্যসৌন্দর্য্যনাশক। ভাষার কাঠিন্যও সময় বিশেষে আবশ্যক আছে।

মাখমের মত কখন মুখে দিতে না দিতেই ভাবের আস্বাদ পাওয়া যায়, কখন বা নারিকেলের মত কঠিন ত্বক ভেদ করিয়া তবে শাঁস খাইতে হয়। ভাব কখন ভাষার উপর বুদ্বুদের মত ভাসিয়া থাকে, কখন বা ভাষার অতল সাগরগর্ভে মুক্তার মত অবস্থিতি করে। কোথায় মাধুর্য্য, কোথাও কাঠিন্য, কোথায় প্রসাদ, কোথায় ওজস্বিতা, তাহা অলঙ্কার শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ আছে। রৌদ্র বীভৎস রসের কঠোর বর্ণ বিন্যাস আবশ্যক এবং তাহা রসের উৎকর্ষ সম্পাদক—তাহা উত্তরচরিত নাটকে দেদীপ্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়, আদি করুণরসে কোমল পদাবলী সন্নিবেশ যে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধিকর, তাহা জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির কবিতা দেখিলেই সহজে বোঝা যায়। ভাষার দুর্ব্বোধ্যতা কদাচিৎ গুণ, অধিকাংশ স্থলে দোষ। ভাষার সারল্য অনেক ক্ষেত্রেই গুণ, ক্বচিৎ দোষ। কিন্তু ভাবের কাঠিন্য দুর্ব্বোধ্যতা সর্ব্বত্রই দোষ। এই ভাবের সারল্য ও মাধুর্য্যের সঙ্গে বিশুদ্ধি সর্ব্বাংশে আবশ্যক। ভাবের বিশুদ্ধি আবার ভাষার বিশুদ্ধির উপর নির্ভর করে। অতএব সর্ব্বাগ্রে ভাষার বিশুদ্ধি সম্পাদনে যত্ন কর্ত্তব্য, পশ্চাৎ ভাবের বিশুদ্ধি। ভাষা মলিন থাকিলে ভাব-প্রতিবিম্ব সুস্পষ্ট পড়িবে কেন?

ভাবের বিশুদ্ধি করিতে হইলে ভাষার বিশুদ্ধির মত কবির ভাবশুদ্ধিও প্রয়োজন। এই আত্মভাব শুদ্ধি না হইলে প্রকৃত ভাবশুদ্ধির আশা করা যায় না।

ভাষার বিশুদ্ধি অধ্যয়ন-সাপেক্ষ, অনুশীলনাধীন, কাজেই সহজ। এই ভাষা-বিশুদ্ধি যাহাতে মাধুর্য্যময়ী হয়, তাহার জন্য চেষ্টা আবশ্যক। মিষ্টতা না থাকিলে লোকে আদর করিবে না। মধুরাস্বাদ ফেলিয়া বিস্বাদে রুচি লোকের জন্মিবে না। প্রথমতঃ ভাষার বিশুদ্ধির নিয়মগুলি জানিয়া রাখিতে হইবে, উৎকৃষ্ট লেখকগণের সৃষ্ট সৎসাহিত্য আলোচনা করিয়া যাইতে হইবে, ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলে চলিবে না। তাহার পর মিষ্টতার অনুরোধে কোন্‌টী গ্রহণীয়, কোন্‌টী পরিত্যাজ্য, তাহা ক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আইসে আসুক, তাহা বলিয়া অবিশুদ্ধি আনয়ন করা প্রথমে সমীচীন নহে। খেয়ালবশে, অজ্ঞতা

হেতু, মালিন্য সঞ্চার করা মহাপাপ। ভাষা-দর্পণে মালিন্য জন্মিয়া থাকিলে ভাবাভিব্যক্তি যখন হইবে না, তখন ঐ মালিন্য সঞ্চার কর্ত্তব্য, না মালিন্য দূরীকরণ কর্ত্তব্য?

হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক হইলে ভাষার দোষে যে তাহা প্রকাশ পায় না, তাহা সকলেই বোঝেন। ভাষার উপর যাঁহার ক্ষমতা আছে, তাঁহার ভাব অপ্রকাশমান বা অস্পষ্ট থাকে না। গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটী ভাব স্থায়ী হইলে অলঙ্কার শাস্ত্রে তাহার স্থায়ী ভাব আখ্যা।* এতদ্ভিন্ন হৃদয়ে সাময়িক ক্ষণিক এমন কতকগুলি ভাবও বুদ্বুদের মত উত্থিত হয়, বুদ্বুদের মত বিলীন হইয়া যায়, তাহার নাম ব্যভিচারী ভাব। রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাবের উৎকর্ষ সম্পাদক হয় বলিয়া এই ব্যভিচারী ভাবগুলির উপযোগিতা অল্প নহে। এই ব্যভিচারী ভাবগুলির উত্থান ও লয় না হইলে বৈচিত্র্যের অভাব ঘটে, কাব্য-সৌন্দর্য্যের ব্যাঘাত জন্মে, অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ হয় না। একই ভাব এক ও স্থায়ী, আবার অসংখ্য ও অস্থায়ী। এই ভাবকে কখন কখন আকারেঙ্গিতাদিরূপে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়, তখন ইহার নাম অনুভাব। স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চ প্রভৃতি আটটী সাত্ত্বিক ভাব অনুভাব মধ্যে পরিগণিত। এই সাত্ত্বিক ভাব অনুভাব মধ্যে অন্তর্গত। একই নিমিত্তভেদে নানা আকারে বিবর্ত্তিত হইয়া অপূর্ব্ব চমৎকারিতাময়, নূতন নূতন বৈচিত্র্যময় অলৌকিক আনন্দের সৃষ্টি করে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, কবি-হৃদয়ের শুদ্ধি না হইলে ভাবশুদ্ধির সম্পূর্ণতা আশা করা যায় না। কবির হৃদয়ের শুদ্ধিভাব শুদ্ধির দ্বারাই অনুমিত হয়। তাই কথাই আছে যে, কাব্য দ্বারা কবিকে চেনা যায়। কারণ, আমরা অনেক সময়ে কারণটীকে দেখিতে পাই না, কার্য্য দ্বারা তাহার অনুমান করিয়া থাকি। যে কাব্যের ভাবশুদ্ধি নাই, বুঝিতে হইবে, কবির হৃদয়ের অবিশুদ্ধিই তার কারণ। কবি-হৃদয়ের যাবতীয় ভাবই ভাষার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠে। এ ভাবের অনুরূপ ভাবেও ভাষার বিকাশ লাভ ঘটে। কবি-হৃদয়ের প্রতিবিম্ব যে ভাষা-দর্পণে প্রতিফলিত থাকে, তাহা চিন্তাশীলগণ অনেকেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, মানব বহুরূপী কপট বলিয়া সকল সময়ে এই হৃদয় ভাব ও কাব্য ভাবের ঐক্য ও সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় না। সাধারণ পাঠক মরুভূমে জল ভ্রম করিয়া, ভ্রান্ত ধারণা লইয়া বসিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত ভাবুকের কাছে, সূক্ষ্মদর্শীর কাছে সে কাপট্য ধরা পড়ে, সে ভ্রান্তি অপসারিত হয়। মিথ্যার সাজে সত্য কতদিন টিকিয়া থাকে?

আলঙ্কারিকেরা ভাব ও ভাষা সম্বন্ধে বহু মূল্যবান উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। বহু কঠোর নিয়ম প্রণীত করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে সংস্কৃত সাহিত্যে যথেচ্ছাচারিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা বড় দেখা যায় না, আবর্জনাও বড় জমিতে পায় নাই। কঠোর নিয়ম ফলে সাহিত্যে একটী পবিত্র সংযম বন্ধন দৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু দুই একটী ক্ষতিও সাধিত হইয়াছে। এই ক্ষতি, স্বাধীন কল্পনার, স্বাধীন ভাবের ও বিচিত্র ভাষাগতির সঙ্কোচ। শাসন ব্যতীত শিশু-চরিত্র গঠিত হয় না, আবার অতিরিক্ত শাসনে শিশুদের মনোবৃত্তি সঙ্কুচিত, সহজ প্রফুল্লতা মন্দীভূত

* আদিরসে রতি, বীররসে উৎসাহ, করুণরসে শোক, রৌদ্ররসে ক্রোধ ইত্যাদি স্থায়ী ভাব। নির্ব্বেদ, আবেগ, দৈন্য, শ্রম, মত্ততা, জড়তা প্রভৃতি সাময়িক ভাবগুলি ব্যভিচারী ভাব।

হইবার আশঙ্কাও থাকে না। আলঙ্কারিক শাসন যদি কিয়ৎ পরিমাণে আজ বাঙ্গালা সাহিত্যে অনুসৃত হইত, তাহা হইলে আজ ভাষার এত মালিন্য, এত জড়তা, এত উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যাইত না, ভাবের এমত অস্পষ্টতা, এমত দুর্ব্বোধ্যতা, এমত অস্পষ্টতা তাণ্ডব নৃত্যে বিরাজ করিত না। সংযম ও স্বাধীন গতির সেবা করাই সমীচীন। প্রথম সংযমাভ্যাস, পশ্চাৎ স্বাধীন গতি অনুসরণই কর্ত্তব্য।

ভাষার শোভাবৰ্দ্ধক বলিয়া অলঙ্কার কবিগণের বড় প্রিয়। স্বর্ণ অলঙ্কারে দেহের শ্রী খুলে, কাব্যালঙ্কারে ভাষার শোভা বাড়ে। অলঙ্কার অবশ্য ভাষা শোভাবৰ্দ্ধক বলিয়া বাহিরের জিনিষ। ভাব ভিতরের জিনিষ হইলেও অলঙ্কার দ্বারা যেন ভাবও সমৃদ্ধ হইয়া উঠে বলিয়া মনে হয়। ভাষার অঙ্গে অতিরিক্ত অলঙ্কার দিয়া তাহাকে জড়ীভূত আড়ষ্ট করিয়া রাখা সৌন্দর্য্যাভিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে। ভাষা ভাবহীন হইলে সহস্র অলঙ্কার দিয়া সাজান বৃথা। প্রাণ চলিয়া যাইলে মৃত দেহকে সাজাইয়া গৃহে রাখার ফল কি? অলঙ্কার ভাবের প্রকাশক নহে, ভাবের প্রকৃত শোভাকর তাহাও নহে। তবে ভাষার শ্রী খুলে বলিয়া ভাবও শোভিত বলিয়া মনে হয় মাত্র। বাঙ্গালার গুণ অলঙ্কার ধ্বনিকে পর্য্যন্ত ভাবের মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট করান হয়, ইহা দোষের কথা। ভাষা সাজসজ্জাময়ী, অলঙ্কৃতা হওয়া চাই, ভাবকে কিন্তু অনাড়ম্বর অকৃত্রিম হইতে হইবে।

অগ্রে বিম্ব, পশ্চাৎ প্রতিবিম্ব, অগ্রে ভাব, পরে ভাষা। অগ্রে জীব-চৈতন্য, শেষে দেহ। ভাবই যখন ভাষারূপে বিবর্ত্তিত, অথবা ভাবই ভাষার আত্মা, তখন ভাব ও ভাষা ইহাই সঙ্গত। হৃদয়ে অগ্রে ভাবের উদ্রেক না হইলে ভাষার বিকাশ হয় না, অতএব ভাবও ভাষা।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ।

পুণ্যাহ।

পুণ্যাহ অর্থে পুণ্য দিন। পুণ্য শব্দের অর্থ কি? পুণ্য বলিতে গেলে পাপ ও পুণ্য, এই দুইটী কথা সহজেই মনে আসে। আলোকের সঙ্গে অন্ধকারের যে সম্বন্ধ, পুণ্যের সঙ্গে পাপেরও সেই সম্বন্ধ। পাপ ও পুণ্য জিনিষটা কি, তাহা আমাদের ভাল করিয়া বুঝা উচিৎ। মনে করুন, এক ব্যক্তি একজনের খাদ্য চুরি করিল, তাহাই হইল পাপ; আর এক ব্যক্তি নিরন্নকে অন্ন বিতরণ করিল, তাহাই পুণ্য কর্ম্ম হইল। ইহার কারণ কি? চোর চুরি করিয়াছে, ইহার অর্থ এই যে, সেই চোর অন্যের করায়ত্ত জড়বস্তু বিশেষের মায়াত্যাগে অসমর্থ হইয়া, তাহাতে বিশেষরূপ আকৃষ্ট হইয়া, তাহা গ্রহণ করিয়াছে, এইজন্যই না সে পাপী? জড়ের আকর্ষণই পাপের মূল। এই কারণে পাপের আর একটা নাম পাতক, অর্থাৎ যাহা জড়তার দিকে আমাদিগকে পাতন করে। ইহার বিপরীত পুণ্য। এক ব্যক্তির গৃহ ধনধান্যে পূর্ণ, গৃহী সেই জড়বস্তুরূপ ধনধান্যে আকৃষ্ট না হইয়া, স্বেচ্ছায় অনাহারীদিগকে সেই সকল ধনধান্য বিতরণ করেন, সেইটাই তাঁহার

পুণ্যকার্য্য—জড়বস্তুর ত্যাগের কারণেই তাহা পুণ্য। পাপের পথ যেমন জড়ের আকর্ষণে অজ্ঞানের পথে নামিবার সোপান; পুণ্যের পথ সেইরূপ জড়ের ত্যাগে জ্ঞানের পথে উঠিবার সোপান। আমাদের এই যে জীবন, ইহা জ্ঞানেরই অনুচর; জ্ঞান প্রসারতা লাভ করিলে জীবন প্রসারতা লাভ করে। যাহাতে জ্ঞানের প্রসার হয়, জড়তার তাহাতেই সঙ্কোচ হয়। জড়ের ত্যাগ সাধন করিতে না পারিলে জ্ঞানের প্রসারতা কিছুতেই লাভ করা যায় না। জড়ের ত্যাগ সাধনই পুণ্য। যে সকল মহাপুরুষেরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা পুণ্যাত্মা বা পুণ্যবান বলি কেন? তাহা আর কিছুর জন্যই নয়, কেবল তাঁহারা বিশেষ ভাবে জড়বস্তুর আকর্ষণ বা বিষয়ের মায়াত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া। পাপ পুণ্যের লক্ষণ আমরা এইরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারি যে, যাহা আমাদিগকে জড়ের আকর্ষণ হইতে দূরে জ্ঞানের পথে লইয়া যায়, তাহাই পুণ্য, আর যাহা আমাদিগকে জড়তার দিকে আকৃষ্ট করে, তাহাই পাপ। এক কথায় জড়ের ত্যাগই পুণ্য এবং জড়ে আসক্ত হওয়াই পাপ। ঈশ্বর, যিনি পূর্ণজ্ঞান, জড়ের আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া তাঁহার দিকে যাওয়াই প্রকৃষ্ট পুণ্যের পথ, আর পার্থিব বস্তুর আকর্ষণে আকৃষ্ট হওয়াই পাপের পথ। এতক্ষণে বোধ হয়, পাপ পুণ্যের প্রকৃত মর্ম্ম আপনাদের হৃদয়ঙ্গম হইল।

আজ আমরা যে এই দিনে শত সহস্র লোকে একত্র সমবেত হইয়াছি, তাহা কার নামে? সেই পুণ্যের নামে। এখন দেখা যাউক, এই দিনকে পুণ্যাহ বা পুণ্য দিন বলে কেন? প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রধানভাবে হলচালনা ও বীজ বপনের দিন। পুরাকালে হলচালনা ও বীজবপনাদি কার্য্যকে ঋষিরা হেয় চক্ষে দেখিতেন না। এই সমস্ত কর্ম্ম তাঁহাদের পুণ্য কর্ম্ম যজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই বৈদিক গ্রন্থাদিতে পুণ্যদিনে ঐ সকল করিবার কথা লিখিত আছে। বৈদিক পারস্কর গৃহ্য সূত্রে স্পষ্ট আছে "পুণ্যাহে লাঙ্গল যোজনং" অর্থাৎ পুণ্যাহে লাঙ্গল যোজনা করিবে। এই সঙ্গে হলচালনার বৃষকে, পুষ্পমাল্যের দ্বারা ভূষিত করিয়া, মধুপর্ক প্রাশনের ব্যবস্থা আছে। পরে, গৃহ্যসূত্রকার স্থালী পাক চরু দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে যাগ করিবারও বিধান দিয়াছেন। এই যজ্ঞকার্য্য সূত্রে ইহা ঋষিদের একটী মিলনের দিন ছিল। তাই পারস্কর ঋষি "ততো ব্রাহ্মণ ভোজনং" বলিয়া সমাগত ঋষিদের ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আরও এক কথা, গৃহ্যসূত্রকার লাঙ্গল যোজনা ব্যতীত অন্য কোন যজ্ঞাদি কর্ম্মে পুণ্যাহের উল্লেখ করেন নাই। তাহাতেই স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পুণ্যাহ হলচালনাদি কৃষি কর্ম্মের সঙ্গে যেন একযোগে আবদ্ধ। খুব সম্ভব, তাই এই দিন ক্রমে "পুণ্যাহ" নামে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। অনেকের ধারণা, মুসলমানদিগের আমলে পুণ্যাহের প্রথম প্রবর্ত্তন। তাহা ভ্রম। মুসলমানেরা এই প্রাচীন হিন্দু সুপ্রথাকে রাজকার্য্যের অনুকূল বুঝিয়া লোপ হইতে দেয় নাই, বজায় রাখিয়াছেন মাত্র। পুরাকালের ঋষিদিগের কথা ছাড়িয়া দিয়া, একালের কথা যখন ভাবিয়া দেখি, তখনও হলচালনাদিকে পুণ্যকার্য্য এবং হলচালনার দিনকে পুণ্যদিন না বলিয়া থাকা যায় না। কৃষকেরা যে হলচালনা ও বীজবপনাদি কার্য্য করে, সে কি তাহাদের কম পুণ্যের কথা! তাহাতে তাহাদের ত্যাগ-

স্বীকারের অনন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না কি? কৃষক যে ভূমিতে এই চাষটুকু দেয়, ইহা কি বৃহৎ যজ্ঞের আয়োজনের জন্যে নয়? সমস্ত সংসারের প্রতিপালনের জন্য নয়? সে নিজে অনন্যচিত্তে নিতান্ত শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিয়া রৌদ্রদগ্ধদেহে যে হলচালনা করে, তাহার ফল সে নিজে কতটুকু ভোগ করে? অতি সামান্য মাত্র কৃষকের ভোগে আসে। বস্তুতঃ পরের জন্যই সে এই কৃষিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। ইহাতে তাহাকে কি কম জড়তার মায়া বা আকর্ষণ ত্যাগ করিতে হয়? এই ত্যাগের কারণেই এই দিন পুণ্যাহ বা পুণ্যদিন। বস্তুতই আজ আমাদের এক মহা পুণ্য দিন। নিরক্ষর কৃষক প্রজারা আজ যে ত্যাগের আদর্শ সকলের সম্মুখে প্রতিভাষিত করিয়াছে, তাহাতেই এই দিন পুণ্য দিন। আজ তাহাদের লইয়াই আনন্দ উৎসব পুণ্যোৎসব। রাজা প্রজা সকলেই সেই পুণ্যোৎসবে যোগদান করিতে আসিয়াছেন। আজ হইতে আমাদের সকলকেই সেই পুণ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পুণ্যের পথে, ত্যাগের পথে চলিলে তবেই দেশের মঙ্গল। আজ এক মহা যজ্ঞানুষ্ঠান উন্মুক্ত করিবার দিন। আজ হইতে প্রজারা যেমন রাজ্যের সুখ সৌভাগ্যের জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়, রাজারও তেমনি রথ্যানির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খননাদি নানা ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মের দ্বারা প্রজার কল্যাণে ব্রতী হইয়া পুণ্য অর্জ্জনে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। রাজা প্রজার সম্বন্ধ পিতা পুত্রের সম্বন্ধের তুল্য। পুত্র যেমন পিতার অভিপ্রায়ানুযায়ী কর্ম্ম করে, তাঁহার শাসন মানিয়া চলে, তেমনি প্রজাদিগেরও রাজার অনুকূলে রাজার শাসন মানিয়া চলা কর্ত্তব্য। কিন্তু পুত্র পিতার বাধ্য বলিয়া পিতা যেমন যথেচ্ছাচারী হইতে পারেন না, পুত্রের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাকে যেমন স্বার্থত্যাগী হইতে হয়, রাজাকেও সেইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া প্রজার মঙ্গলের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। রাজা ও প্রজা উভয়ের ত্যাগ-যজ্ঞেই পুণ্যাহের সার্থকতা।

এই পুণ্য মিলনে রাজা ও প্রজা উভয়কেই ত্যাগের আদর্শ লইয়া উপস্থিত হইতে হইবে। রাজা যেমন প্রজাদের প্রতি স্নেহ বর্ষণ করিয়া তাহাদের অন্তঃকরণ সিক্ত করিবেন, প্রজাবর্গও তেমনি সুশাসনে অনুপ্রাণিত হইয়া শস্যশ্যামলা ডালি রাজার চরণে ভক্তি পূর্ব্বক অর্পণ করিবে। রাজা ও প্রজার এই মিলনের ফলে যে সুফল প্রসব হইবে, তাহাতে সমস্ত সংসারের কল্যাণ হইবে। প্রত্যেক মনুষ্য যেমন নিজের চরিত্র ও কর্ম্মবলে, এক কথায় পুণ্যবলে, জগতের অশেষ কল্যাণ সাধনে সমর্থ, সেইরূপ প্রত্যেক ক্ষুদ্র রাজ্যও যে মহত্বের পুণ্য আদর্শ দেখাইতে পারে, তাহাতে সমস্ত জগৎ তাহার অনুকরণে অগ্রসর হইবে। ইহা মনে করা ঠিক নয় যে, ইহা একটী সামান্য ক্ষুদ্র রাজ্য বলিয়া নিতান্ত অবহেলার বস্তু। ত্যাগে, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে, রাজা ও প্রজার পরস্পরের সদ্ভাবে ইহাকে এমন এক পুণ্য রাজ্যে পরিণত করা যাইতে পারে যে, স্বার্থপ্রণোদিত, হিংসারত, বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্যও এই আদর্শের নিকট নতমস্তক হইবে।

ন্যায়পরায়ণ হইয়া প্রজারঞ্জনই রাজার প্রধান ধর্ম্ম। রাজা ন্যায় পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অন্যায় পথে গমন করিলে অশেষ অমঙ্গল হয়। রাজাকে যেমন ন্যায়পরায়ণ হইয়া প্রজাপালনে রত হইতে হইবে, তেমনি প্রজাদেরও রাজার কুশলের জন্য মন প্রাণ নিয়োগ করিতে হইবে। রাজা ও প্রজার মধ্যে

মনোমালিন্যই সর্ব্বনাশের মূল। এই শুভ পুণ্যাহ রাজা ও প্রজাবর্গের মিলনের দিন। এই দিন পরস্পরের মনোমালিন্য বিদূরিত করিয়া সকলের হৃদয়কে মিলনে প্রতিষ্ঠা করিবার দিন। এই দিন রাজা, প্রজাবর্গের মধ্যে অবস্থান করিয়া বুঝিতে থাকুন যে, ঋষিরা যেমন ইন্দ্রাদিদেবতার উদ্দেশে তাঁহাদের প্রিয় বস্তু চরু উৎসর্গ করিতেন, প্রজারাও সেইরূপ রাজার জন্য ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত, রাজার কোষ ধনধান্যে পরিপূর্ণ করিবার জন্য তাহাদের চিত্ত ব্যাকুল। আবার প্রজাবর্গও রাজা বা রাজপ্রতিনিধিকে সাক্ষাৎলাভ করিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করুক যে, রাজা তাহাদের সুখ সৌভাগ্যের জন্য যেরূপ অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বার্থত্যাগে বদ্ধপরিকর, এমন আর কেহই নয়। এইরূপে রাজা ও প্রজা পরস্পরে প্রীতি বন্ধনে আবদ্ধ হইলে যে শান্তিময় পুণ্য-পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবে, তাহার সৌরভ দিগ্দিগন্ত আমোদিত করিয়া তুলিবে।

আমাদের আদর্শ ভোগের দিকে নয়, ত্যাগের দিকে। ভোগের বিষে জর্জ্জরিত হইলেই হিংসাদ্বেষ প্রভৃতি পাপ-রিপু সকল আমাদিগকে সহজেই আক্রমণ করিয়া প্রাণ হরণ করিবে। ত্যাগের দিকে লক্ষ্য করিয়া চলিলে রিপুগণ পরাভূত হইয়া অমৃতে প্রাণ সিক্ত হইয়া উঠিবে। উহাই আমাদের লক্ষ্য।

ঈশ্বর আমাদের মধ্যে রাজা প্রজা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া এক গুরুতর ভার অর্পণ করিয়াছেন, ইহা বহন করিবার সামর্থ্য তিনি আমাদিগকে প্রদান করুন। আমরা তাঁহার নামে জড়তার আকর্ষণ ত্যাগ করিয়া তাঁহার জ্ঞানের পথে যেন ধাবিত হইতে পারি। আমাদের যে ধনধান্য, ইহা সঙ্কীর্ণ ভোগের জন্য নয়, আমাদের সুখ সৌভাগ্য জড়তার মধ্যে নিমগ্ন হইবার জন্য নয়। আমাদের ধনধান্য মহৎ যজ্ঞে দেশের কল্যাণে নিয়োজিত হউক, পুণ্যার্থে বিতরিত হউক। পুণ্য অর্জ্জনে আমাদের নির্জ্জীবতা দূর হইবে, আমাদের প্রাণ সজীব হইয়া পুণ্যকীর্ত্তি লাভ করিবে, পুণ্যলোকে গমন করিবে।

পুণ্যং কুর্ব্বন্ পুণ্যকীর্ত্তি পুণ্যস্থানং স্ম গচ্ছতি।
পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে॥

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পৃথিবীর উৎপত্তি। (শেষ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জীবোৎপত্তি।

পৃথিবীর বিকাশ-পথে আমরা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছি। এপর্য্যন্ত আমরা ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর উৎপত্তি, ভূপৃষ্ঠের গঠন, এবং ভূপৃষ্ঠে জল ও স্থলের বিন্যাস, মহাসাগর ও মহাদেশের সমাবেশ পর্য্যালোচনা করিয়া আসিয়াছিলাম, এত দূরে প্রকৃতির এই বিশাল রঙ্গমঞ্চনির্ম্মাণ কার্য্যের আলোচনার একরূপ শেষ হইল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দেখিব, স্রষ্টার অঙ্গুলি-স্পর্শে, কিরূপে এই রঙ্গমঞ্চের যবনিকা অপসারিত হইয়া ধীরে ধীরে সৃষ্টি-লীলা প্রকটিত হইয়াছে।

কিরূপে যে পৃথিবীতে প্রথম জীব অভ্যু-

দিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ আজও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তবে, এক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিকগণের সাধনার ক্রটী হইতেছে না। ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণ স্তরের পর স্তর উদ্‌ঘাটন করিয়া পৃথিবীর আদিম জীবের অনুসন্ধান করিতেছেন। প্রাণি-তত্ত্ব-বিদ্‌গণ অদম্য উৎসাহে জীব অভিব্যক্তি-ধারার উজান বহিয়া চলিয়াছেন। রসায়ন-বিদ্‌গণও ঐ একই উদ্দেশ্য বিপুল অধ্যবসায় সহকারে পরীক্ষা-পর্য্যবেক্ষণ-প্রণালীর বিনি-য়োগ করিতেছেন। বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা সংক্ষেপে তাঁহাদের কার্য্যাবলির অনুসরণ করিব।

অতি পুরাকাল হইতে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-গণের মধ্যে জীবোৎপত্তি সম্বন্ধে "স্বতঃজনন" (Spontaneous generation) নামক একটী মতবাদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক পাষ্টুর (Pasteur) মহোদয় সমূলে ইহার উচ্ছেদ-সাধন করিয়াছেন। এ প্রস-ঙ্গের সূচনায় আমরা সংক্ষেপে, অতি প্রাচীন, এই 'স্বতঃ-জনন' মতবাদের ইতিহাস আলো-চনা করিব। (Thales, Aristotle) আরি-ষ্টটল্, থেলস্ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতগণ এই মতবাদের প্রচার করিয়াছিলেন। (Van Helmont) ফান্ হেলমণ্ট নামক খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ রাসায়নিক অতীব দৃঢ়তার সহিত এই মতবাদের পোষকতা করিয়াছেন। পনির পচিয়া স্বতঃজনন-প্রভাবে ইঁদুরের উৎপত্তি পর্য্যন্তও উল্লেখ করিতে তিনি ছাড়েন নাই। এই খানেই শেষ নহে। (Buonanni) বোনানী নামক একজন ইটালীয় বৈজ্ঞানিক, আবার সমুদ্র জলসিক্ত কাষ্ঠখণ্ড হইতে প্রজাপতি এবং ক্রমশঃ পক্ষী পর্য্যন্ত উৎপত্তির কথাও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক, (Redi) রেডি ও (Valis-neri) ভালিস্‌নেরী নামক দুইজন ইটালীয় বৈজ্ঞানিক পূর্ব্বোক্ত মতের প্রতিবাদও করি-য়াছিলেন। তাঁহারা দেখাইয়াছিলেন, মাংস, পনির, ফল প্রভৃতি হইতে জীব স্বতঃই উৎ-পন্ন হয় না। পোকা, মাছি প্রভৃতি হইতে আহারান্বেষণে আসিয়া, ইহাদের উপরে বসিয়া ডিম্ব ত্যাগ করিয়া যায়, আর ঐ ডিম্ব হইতেই পরে বীজ উৎপন্ন হয়।

অণুবীক্ষণ আবিষ্কারের পরে এবি স্পালান্‌জানী (Abbe Spallanzani) অতীব দক্ষতার সহিত স্বতঃজনন মতের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। অণুবীক্ষণ সাহায্যে তিনি পচনশীল পদার্থের জীবাণুর প্রকৃতি সম্যক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, এ জীবাণুর বীজ, হয় পচনশীল পদার্থে পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান ছিল, আর নতুবা বাতাসের সহিত উড়িয়া আসিয়া ইহাতে আশ্রয় লইয়া থাকিবে। এখন অনুকূল অব-স্থায় পড়িয়া ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতেছে। এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া, স্পালান-জানী, পরীক্ষার পূর্ব্বে, পরীক্ষার ব্যবহার্য্য পদার্থকে উত্তপ্ত করিয়া, তন্মধ্যস্থ জীবাণুর সম্পূর্ণ ধ্বংস-সাধন করত, পরে উহা বায়ু সংস্পর্শ শূন্য-ভাবে রাখিয়া দেখাইয়াছেন, আর উহাতে জীবাণুর সঞ্চার হয় না।

কিন্তু স্বতঃজনন মতবাদের এই খানেই শেষ হয় নাই। ইহার পরে ইংলণ্ডে নীড-হাম্ (Needham) এবং ফ্রান্সে পোসে (Pouchet)-প্রমুখ সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ আবার ঐ মতবাদের পোষকতা করিয়া-ছিলেন।

পরিশেষে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে পাষ্টুর নানা দিক দিয়া, নানা ভাবে পরীক্ষা-দ্বারা প্রাচীন এই মতবাদটীর ভিত্তি-হীনতা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণ যে সকল অবস্থায় জীবাণুর স্বতঃজনন সম্ভব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বস্তুতঃ সাবধানতা সহকারে পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, ঐ সকল অবস্থায় জীবাণুর উদ্ভব হয় না।

জীব অভ্যুদয় আলোচনায়, সুবিখ্যাত লর্ড কেলভিন্ মহোদয় বলিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ অপর কোনও গ্রহাদি হইতে, উল্কা-যোগে জীবাণু প্রথম আমাদের এই পৃথিবীতে নীত হইয়াছিল। এখানে প্রশ্ন উঠিবে, উল্কার পতনকালে পৃথিবীর বাতাসের সহিত তাহার ঘর্ষণে যে তাপ উৎপন্ন হয়, জীবাণু কিরূপে সে তাপে জীবিত থাকিতে পারে? এ প্রশ্নের মীমাংসা একেবারে অসম্ভব নহে। ঘর্ষণজাত তাপ উল্কার উপরিভাগকে অতিশয় উত্তপ্ত করে, সন্দেহ নাই, কিন্তু বৃহদাকৃতি উল্কার অভ্যন্তরে উহার ক্রিয়া নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কাজেই, উল্কা-শরীরে গভীর ফাটল থাকিলে, জীবাণু নিরাপদে তথায় আশ্রয় লইতে পারে। উল্কার অভ্যন্তর ভাগ অতিশয় শীতল। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, জীবাণু সমূহের শীত সহন ক্ষমতা অসাধারণ।

যাহাহউক, জীবোৎপত্তি সম্বন্ধে লর্ড কেলভিনের ধারণায় যদি কোন অসঙ্গতি নাও থাকে, তথাপি ইহাতে ত' সৃষ্টি-রহস্যের কোন মীমাংসাই হইল না। কেবল, প্রতিপাদ্য বিষয়টীকে আমাদের পৃথিবী হইতে সরাইয়া, আর একটী গ্রহে পাঠান হইল এই মাত্র।

সুইডেনের বৈজ্ঞানিক-প্রবর অধ্যাপক আর্হেনীয়াস্ও (Professor S. Arrhenius) গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে জীবাণুর গমনাগমন সমর্থন করিয়াছেন। তবে তিনি বলেন, উল্কার উপর নির্ভর না করিয়াও জীবাণুর এই লোকান্তর প্রাপ্তির ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। তিনি দেখাইয়াছেন, আলোক-চাপ দ্বারাও (Light pressure) এরূপ স্থান-চ্যুতি সম্ভব।

অধ্যাপক প্রেষ্টন (S.T. Preston)-প্রমুখ নব্য বৈজ্ঞানিকগণ আলোকের চাপের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, পরীক্ষা যোগে তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, আলোক-প্রদ পদার্থ হইতে আলোক-রশ্মির সঙ্গে সঙ্গে শক্তিও আলোকিত পদার্থে উপনীত হয়। আর ইহারই ফলে, আলোক-প্রদ এবং আলোক প্রাপ্ত পদার্থের মধ্যে বিপ্রকর্ষণ ক্রিয়া সূচিত হয়। অধ্যাপক লারমর, লর্ড র‍্যালে, ডাক্তার বার্লো প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ এই আলোক-চাপ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন, আলোকপ্রাপ্ত পদার্থ যতই ক্ষুদ্র হয়, আলোকচাপের ক্রিয়া, অর্থাৎ আলোকিত পদার্থের দূরাপসরণ প্রচেষ্টা ততই অধিক কার্য্যকরী হয়। পক্ষান্তরে, বৃহৎ পদার্থ সমূহ মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে এতই অভিভূত যে, আলোকচাপের ক্রিয়া তাহার উপরে নিতান্ত সামান্য এবং অনুমেয়। ক্ষুদ্রতন জীবাণু তাহার উপর পতিত আলোকের চাপ সহিতে পারে না; মাধ্যাকর্ষণ-জনিত তাহার যে স্থাবর ভাব, তাহা আলোকচাপে সহজেই বিচলিত হইয়া যায়। কাজেই জীবাণু আলোকপ্রদ পদার্থ হইতে ক্রমেই অপসৃত হইতে থাকে। অধ্যাপক আরহেনীয়াস্ গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এইরূপে আলোকপ্রাপ্ত জীবাণুর সশরীরে লোকান্তর প্রাপ্তিও সম্ভব।

তাহা হইলে, আমরা দেখিলাম—জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে লর্ড কেলভিন্ এবং অধ্যাপক আরহেনীয়াস্ বিশেষ কিছুই বলেন নাই। তাঁহাদের উভয়ের মতেই জীব, এ পৃথিবীতে 'উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে'।

কিন্তু অপরাপর বৈজ্ঞানিকগণ এবিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। ষ্টোক্স্ (Sir George Stokes) সাফার্ (Professor Schafer)-প্রমুখ মনীষিগণ বলেন, যতদূর অনুমান করা যাইতে পারে, তাহাতে সমুদয় গ্রহ উপগ্রহাদিরই আদিম অবস্থা এবং পরিণতির ধারা একইরূপ হওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে, আদিম জীবাণু যদি অন্য জগতে উৎপন্ন হইতে পারে, তবে আমাদের পৃথিবীতেই বা পারিবে না কেন? এইরূপ যুক্তিপরম্পরার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা বলেন—'পৃথিবীর জীব এই পৃথিবী হইতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে'—এইরূপ সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক এবং সহজ।

জীব-অধ্যুষিত আমাদের এই পৃথিবী যতই পুরাতন হইয়াছে, ততই ইহার জীব-দেহের গঠন-প্রণালীর জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রাণি-তত্ত্ব-বিদ্ বলেন, স্তন্যপায়ী জীবদেহই নাকি এই বর্দ্ধিষ্ণু জটিলতার বর্ত্তমান সীমা।

পৃথিবীর ইতিহাসের বর্ত্তমান যুগে স্তন্যপায়ী জীবেরই প্রাধান্য। কিন্তু ভূতত্ত্ব আলোচনায় দেখা যায় যে, মধ্যযুগে পৃথিবীতে উহাদের একান্তই অভাব ছিল; তখন সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীই এখানে রাজত্ব করিত। তৎপূর্ব্বে প্রাচীন যুগে আবার সরীসৃপও দুষ্প্রাপ্য ছিল। তখন স্পঞ্জ্, কোরাল প্রভৃতি জলজ প্রাণীরই আধিপত্য। প্রাচীন যুগের সর্ব্ব প্রাচীন স্তর-রাজি আলোড়ন করিয়া পণ্ডিতগণ মাত্র দুইটী কি তিনটী শ্রেণীর (Species) জলচর প্রাণীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছেন।

যাহা হউক, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ভূতত্ত্বের আলোচনায়, বর্ত্তমান হইতে যতই আমরা অতীতের দিকে অগ্রসর হই, ততই পৃথিবীর জীব সমারোহ ক্রমশঃ কমিতে থাকে। অবশেষে প্রাচীন যুগের সর্ব্ব নিম্নস্তরে—অর্থাৎ সর্ব্ব প্রথমে যেখানে আমরা জীবাশ্ম দেখিতে পাইতেছি, তথায়, এই কর্ম্মবহুল, কোলাহলময়, অশান্ত জগতের পরিবর্ত্তে—গভীর কুহেলিকাচ্ছন্ন, জীব-বিরল পৃথিবীর ছবি আমাদের মনোবৃত্তির সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। কিছুদিন পূর্ব্বে, কোন কোন ভূ-তত্ত্ববিদ্ এই প্রাচীনতম জীবাশ্ম সমূহকেই, পৃথিবী পৃষ্ঠের আদিম জীবের দেহাবশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই ধারণা নিতান্ত অমূলক প্রমাণিত হইয়াছে। প্রাচীন যুগের এই সকল জীবাশ্মের শরীর গঠনের জটিলতা দেখিয়া প্রাণিতত্ত্ব-বিদ্গণ একবাক্যে বলেন, ইহারা কখনও আদিম জীব হইতে পারে না। ইহাদের দেহের গঠন নিশ্চয়ই বহু যুগব্যাপী অভিব্যক্তির ফল। প্রাচীন যুগের সর্ব্বনিম্নস্থ ক্যাম্ব্রিয়ান (Cambrian) স্তর পর্য্যায়ের নিম্নস্থ ভূ স্তরেও স্থানে স্থানে বৈজ্ঞানিকগণ জীব-চিহ্ন সমূহ দেখিতে পাইয়াছেন। তবে এই সকল চিহ্ন এতই অস্পষ্ট যে, ইহাদের উপর নির্ভর করিয়া সেই সময়কার জীব সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা কেহই সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই। যাহা হউক, মোটের উপরে, আমাদের অধীত সর্ব্বপ্রাচীন জীবাশ্ম যে আদিম জীবের দেহাবশেষ নহে, সে বিষয়ে বর্ত্তমানে আর পণ্ডিতগণের মধ্যে কোন মতদ্বৈধ নাই। পণ্ডিতগণ একবাক্যে

বলিতেছেন যে, লক্ষ লক্ষ বৎসরের অভিব্যক্তির ফলেই কাম্ব্রিয়ান্ যুগের জীবদেহ গঠিত হইয়াছিল।

কাম্ব্রিয়ান্ যুগের পূর্ব্বেও পৃথিবীতে যে সকল প্রাণী বসবাস করিত, ভূ-স্তরে তাহাদের বিশেষ কোনই চিহ্ন কেন পাওয়া যাইতেছে না? এ প্রশ্নের উত্তরে, বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, ঐ সকল প্রাণি-শরীরে তখনও অস্থি-পঞ্জর গঠিত হয় নাই। জীবাশ্ম ত' আর কিছুই নহে, প্রায় সর্ব্বত্রই উহা অতীত যুগের প্রাণিদেহের কঙ্কালাবশেষ মাত্র। কাজেই, কঙ্কালবিহীন জীবের আর কি অবশেষ থাকিবে? মৃত্যুর পরে, এই সকল জীবের মাংসল দেহ, ধীরে ধীরে মৃত্তিকায় বিলীন হইয়া গিয়াছে; সেই সুদূর অতীতের সাক্ষ্য দিবার জন্য আর তাহার কণামাত্রও অবশিষ্ট নাই।

পৃথিবীর আদিম প্রাণিদেহের এই কঙ্কাল অথবা কঠিন বহিরাবরণের (Shell) অভাবের ব্যাখ্যান পণ্ডিতগণ দুই দিক দিয়া, দুই ভাবে করিয়াছেন। এক, রসায়ন-শাস্ত্রের দিক দিয়া, অপর, প্রাণিতত্ত্বের পক্ষ হইতে।

রসায়ন শাস্ত্রমূলক ব্যাখ্যাটী আমরা প্রথমে আলোচনা করিব। প্রাচীন যুগের যে সকল জীবাশ্ম বৈজ্ঞানিকগণ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহারা অধিকাংশই জলচর প্রাণীর দেহাবশেষ। আর এই অবশিষ্টাংশ অনেক স্থলেই তাহাদের শরীরের কঠিন বহিরাবরণ। জলচর প্রাণি-দেহের এই কঠিন বহিরাবরণ ভাগ যাহা দ্বারা গঠিত, রসায়ন শাস্ত্রে তাহাকে কার্বনেট্ অব্ লাইম (Carbonate of Lime $CaCO_3$) বলা হইয়া থাকে। কাম্ব্রিয়ান্ যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী স্তরসমূহ অনেক স্থলেই কার্বনেট অব্ লাইম দ্বারা গঠিত। আমাদের ভারতবর্ষে দাক্ষিণাত্যের কাডাপ্পা (Cudappa) এবং বিন্ধ্য (Vindian system) পর্য্যায়ের স্তররাজিকে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ কাম্ব্রিয়ান্ যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াছেন। এখানেও আমরা কোন কোন স্তরে কার্বনেট্ অব্ লাইমের বাহুল্য দেখি। এই সকল স্তরের বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের কার্বনেট্ অব্ লাইম জীব-কঙ্কাল হইতে উৎপন্ন নহে। রাসায়নিক ক্রিয়া সঞ্জাত। (আমরা জানি, কোরাল প্রভৃতি জলচর জীবের দেহাবশেষ দ্বারা, পৃথিবীর অনেক স্থলে, কার্বনেট্ অব্ লাইমের গভীর স্তর গঠিত হইয়াছে।)

এখন আমরা দেখিব, প্রকৃতির ভাণ্ডারে তৎকালে এত কার্বনেট্ অব লাইমের সঞ্চিত হইতে থাকিলেও, সাগর-গর্ভে সেই অতীত যুগে এত কার্বনেট্ অব লাইমের স্তর গঠিত হওয়া সত্ত্বেও, কিরূপে তখনকার সাগরচারী জীবগণ, তাহাদের স্থিতির রক্ষা-কবচ স্বরূপ সামান্য একটু কার্বনেট্ অব্ লাইম্ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল! সমুদ্র জলে কার্বনেট্ অব্ লাইম, দ্রব অবস্থায় (in solution) অতি সামান্য পরিমাণেই থাকে; তদ্দ্বারা অসংখ্য জলচর প্রাণীর দেহের কঠিন বহিরাবরণ নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া একান্ত অসম্ভব। সামুদ্রিক জীবগণ প্রত্যক্ষ ভাবে জলে কার্বনেট্ অব্ লাইম্ না পাইলেও, পরোক্ষ ভাবে ইহা সংগ্রহ করিয়া থাকে। পণ্ডিতগণ বলেন, সমুদ্র জলে সাল্‌ফেট্ অব্ লাইম্ (Sulphate of Lime) নামক রাসায়নিক পদার্থটী বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান; আর প্রাণিগণ ইহা হইতেই কার্বনেট্ অব্ লাইম্ উৎপাদন করিয়া, তদ্দ্বারা দেহাবরণ প্রস্তুত করে। এই ব্যাপারটী অতি সহজ একটী রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। প্রাণী-শরীর হইতে মলমূত্রাদি

সহ কার্বনেট্-অব্ এমোনিয়ম্ (Carbonate of Ammonium) নির্গত হয়। এই কার্বনেট অব্ এমোনিয়ম্ এবং জল মধ্যস্থ সাল্ফেট্ অব্ লাইমের রাসায়নিক যোগাযোগে কার্বনেট্ অব্ লাইম্ এবং সালফেট্ অব এমোনিয়াম্ উৎপন্ন হয়। প্রক্রিয়াটী গাণিতিক ভাবে উল্লেখ করিতেছি।

কার্ব অব এমন্ + সাল ফ্-অব্-লাইম্ = সালফ্-অব্ এমন্ + কার্ব-অব্-লাইম।

কাজেই আমরা দেখিতেছি, জীবদেহ নিঃসারিত কার্বনেট্ অব্ এমোনিয়ম্ দ্বারা সমুদ্র জলস্থ সাল্ফেট্ অব্ লাইম্ নামক পদার্থটী, রাসায়নিক ক্রিয়াযোগে কার্বনেট্ অব্ লাইমে পরিণত হইয়া, জীবদেহের কঠিন বহিরাবরণ নির্ম্মাণ করে। এখন, সমুদ্রে যদি অন্য কোন কারণ বশতঃ সর্ব্বদাই প্রচুর পরিমাণে কার্বনেট্ অব্ এমন্ সঞ্চিত থাকে, তবে ত' জীবদেহ বিনির্গত কার্ব অব্ এমন্ এর অপেক্ষা না করিয়াই, জলমধ্যস্থ সমুদয় সালফ্ অব্ লাইম্ই কার্ব অব্ লাইমে পরিণত হইয়া জলাশয় গর্ভে স্তর গঠন করিবে। প্রাণিদেহের বর্ম্ম-নির্ম্মাণ জন্য ত' একটুও অবশিষ্ট থাকিবে না। পণ্ডিতগণ বলেন, সেকালে জল মধ্যে মাংসাশী জীব তখনও অভ্যুদিত হয় নাই বলিয়া জলচর প্রাণিগণের মৃতদেহ পচিয়া বহুল কার্ব অব্ এমন্ উৎপন্ন হইত। এবং এই কার্ব অব্ এমন্ হইতেই, কাম্ব্রিয়ান্ যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী চূর্ণ প্রস্তর সমূহের (Lime-stone = Carb of Lime) উৎপত্তি হইয়াছে। যাহা হউক, তাহা হইলে আমরা বুঝিলাম, পূর্ব্বকালে (কাম্ব্রিয়ান্ যুগের পূর্ব্বে) সমুদ্র জলে প্রচুর পরিমাণে কার্ব অব্ এমন্ থাকাতে জলচর প্রাণিগণ দেহাবরণ গঠনের জন্য কার্ব অব্ লাইম্ পায় নাই। এবং সেই জন্যই ঐ সময়কার জীবদেহের আর কিছুই এখন স্তর মধ্যে পাওয়া যায় না।

এইবার আমরা প্রাণিতত্ত্বের পক্ষ হইতে কিরূপে এই প্রাচীন জীবদেহের কঙ্কাল-বিহীনতার মীমাংসা হইয়াছে, তাহারই আলোচনা করিব।

প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ ডাক্তার ইভান্স (Dr. J. W. Evans) বলেন; আদিম জলচরগণের দেহে কঙ্কাল বা কঠিন বহিরাবরণ ছিল না, তাহার কারণ, তখনও জলে হিংস্র বা মাংসাশী জীবের আবির্ভাব হয় নাই। মাংসাশীর আক্রমণ হইতে দেহ রক্ষাই বহিরাবরণের কার্য্য, আর, আততায়ীর আক্রমণ হইতে দ্রুত পলায়ন প্রভৃতি গতিবিধির সৌকর্য্যের জন্যই দেহমধ্যস্থ অস্থি কঙ্কালের অভিব্যক্তি। পুরাকালীন্ জীবগণ নিতান্ত নিরীহ এবং নিরামিষাশী ছিল; সমুদ্র-বক্ষে ভাসমান আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদকোষ সমূহই তাহাদের ভক্ষ্য ছিল। কাজেই তাহাদের দেহে বর্ম্ম (Shell) বা শল্কের (Spines) কোনই প্রয়োজন হয় নাই। তারপর, ডাক্তার ইভান্স বলেন, কাম্ব্রিয়ান্ যুগের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে এক দল সমুদ্রচারী জীব হঠাৎ মাংসাশী হইয়া অপরাপর সম্প্রদায়ের শত্রু হইয়া উঠে; তাহারই ফলে, কাম্ব্রিয়ান্ যুগের নানা শ্রেণী প্রাণীর দেহেই কঙ্কালাদির অভিব্যক্তি হইয়াছে।

ডাক্তার ইভান্সের এই মতবাদের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, অনেক স্থলে নিতান্ত শরীর ধারণের জন্যও জীবশরীরে কঙ্কাল দৃষ্ট হয়। আবার অনেক সময়ে, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে আত্মরক্ষার জন্যও কঙ্কাল গঠন প্রয়োজন হয়। কাম্ব্রিয়ান্ যুগের কোরাল (Corals) নামক জলচর জীবগণের

দেহ শাখা প্রশাখা-সমন্বিত কঙ্কালের উপর গঠিত। এই শাখা প্রশাখা দ্বারা তাহারা পরস্পর পরস্পরকে নিবিড় ভাবে আঁকড়িয়া ধরে। সাগরের তরঙ্গমালা হইতে আত্মরক্ষাই তাহাদের এই নিবিড় আলিঙ্গনের উদ্দেশ্য। আর সেই জন্যই তাহাদের দেহে শাখা প্রশাখাবৎ অস্থি সমাবেশ। কাজেই, কাম্ব্রিয়ানের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে কেন যে ইহারা উদ্ভূত হইবে না, আর কেনই যে তৎসাময়িক ভূস্তরে ইহাদের চিহ্ন থাকিবে না—তাহা প্রাণিতত্ত্বমূলক যুক্তি দ্বারা মীমাংসিত হয় না।

যাহা হউক, আমরা দেখিতেছি, আদিম জীব-জনন কাল হইতে কাম্ব্রিয়ান্ যুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীবদেহ অস্থিহীন, কঠিন বহিরাবরণ শূন্য অবস্থায় ছিল; এবং পরে, যে কারণেই হউক না কেন, কাম্ব্রিয়ান যুগ হইতেই জীবদেহে কঙ্কাল এবং বর্ম্মাদি গঠনের সূত্রপাত হয়। কাম্ব্রিয়ান্ যুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আদিম জীবগণের দেহাবশেষ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। ভূতত্ত্বে জীব অভিব্যক্তির ধারা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে হইতে অবশেষে কাম্ব্রিয়ান্ যুগের পর, বিস্তীর্ণ বালুকাগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কাজেই এ পথে আদিম জীবের সাক্ষাৎপ্রাপ্তির আশা সুদূরপরাহত। পৃথিবীতে জীবোৎপত্তি অনুধাবনে আমাদিগকে অন্য পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

এ পথ পরীক্ষা-পর্য্যবেক্ষণ-মূলক। জৈব রসায়নবিদ্‌গণ ইহার প্রদর্শক এবং নেতা। জৈব-রসায়ন (Organic Chemistry) শাস্ত্র একটা অত্যন্ত আধুনিক ব্যাপার। প্রাচীন পণ্ডিতগণ এ শাস্ত্রের চর্চ্চায় নিতান্ত পরাঙ্মুখ ছিলেন। জীব জগৎ তাঁহাদের চক্ষে অভেদ্য রহস্য-কুহেলিকাচ্ছন্ন ছিল। এ রহস্যভেদের চেষ্টা তাঁহারা বাতুলতা মনে করিতেন। তখনকার রসায়নবিদ্‌গণের মতে, জীবদেহ বা জীবদেহ হইতে উৎপন্ন পদার্থ সমূহের মূলে এক অজ্ঞেয় "জীবনী শক্তির" (Vital Force) ক্রিয়া বর্ত্তমান। তাঁহারা বলিতেন—এ সমস্ত জৈবসামগ্রী মানবের রসায়নাগারে প্রস্তুত হইবার নয়। মানুষ এই সমস্ত পদার্থের বিশ্লেষণ করিয়া, ইহাদের উপাদান-স্থানীয় মৌলিক পদার্থগুলি যথাযথ ভাবে একত্র করিতে পারে বটে, কিন্তু সেই অজ্ঞেয় "জীবনী-শক্তির" স্ফুলিঙ্গটুকু ত' সে কোন মতেই উহাতে সংযোগ করিতে পারিবে না। কাজেই জৈব পদার্থের উৎপাদন চেষ্টা সার্থক হইবার নহে।

নব্য বৈজ্ঞানিকগণ প্রাচীনগণের এ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন, বিজ্ঞানের নিকট কোন প্রাকৃতিক তত্ত্বই অজ্ঞেয় হইতে পারে না। আজ যাহা ঘন-তিমিরে আবৃত—শীঘ্রই তাহা জ্ঞানালোকমালায় উদ্ভাসিত হইতে পারে। আজ যাহা জানিবার চেষ্টা বাতুলতা—শীঘ্রই এমন দিন আসিতে পারে, যখন তাহা না জানাই ঘোরতর মূর্খতা বলিয়া গণ্য হইবে।

যাহা হউক, নব্য রাসায়নিকগণ এইরূপে জীব-জগতে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া, বিপুল উৎসাহে জৈব পদার্থ সমূহ পর্য্যালোচনা করত, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এবং পর্য্যবেক্ষণের উপর এক নবতর রসায়ন শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—ইহাই জৈব রসায়ন। অত্যল্পকালের মধ্যে জৈব রসায়ন শাস্ত্র অসাধারণ প্রসার এবং প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। জীব জগতের সৃষ্টি-রহস্যে বিজ্ঞানের আলোকপাতই ইহার চরম উদ্দেশ্য। এই সুমহৎ লক্ষ্যের দিকে জৈব-বিজ্ঞান কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে—সে সম্বন্ধে নানা মত থাকিতে পারে,

কিন্তু সে যে প্রকৃত পন্থাই বাছিয়া লইয়াছে, সে বিষয়ে আর বর্ত্তমান যুগের মনীষিগণের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জৈব রসায়ন অতি আধুনিক শাস্ত্র। এখনও ইহার বাল্যাবস্থাই উত্তীর্ণ হয় নাই। কিন্তু এই অল্পসময়ের মধ্যেই ইহার এত অভাবনীয় বিকাশ হইয়াছে যে, এক্ষণে সমস্ত সভ্য জগৎ, ঐকান্তিক আগ্রহ এবং আস্থার সহিত, ইহার পূর্ণ পরিণতির জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

জৈব-রসায়নের কল্যাণে এখন বহুবিধ জৈব পদার্থ মানবের রসায়নাগারে প্রস্তুত হইতেছে, বলা বাহুল্য, পূর্বে এ সমস্ত পদার্থের জন্য আমাদিগকে নিতান্ত নিরুপায় ভাবে প্রকৃতির দ্বারস্থ থাকিতে হইত। পূর্ব্বে রবারের জন্য রবার বৃক্ষের চাষ একান্ত করণীয় ছিল—এখন জর্ম্মানীতে রসায়নাগারে কৃত্রিম রবার প্রস্তুত হইতেছে। পূর্ব্বে বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিতে নানা উদ্ভিদের রস ব্যবহৃত হইত—এখন জর্ম্মানীর কৃত্রিম রং সমূহ সে সব নির্ব্বাসিত করিয়াছে। পূর্ব্বে গন্ধোপকরণের জন্য সুগন্ধ পুষ্প রাজি সংগ্রহ করিতে হইত, এখন নানা-বিধ সুগন্ধ পুষ্পরেণু বিশ্লেষণ করিয়া জৈব রাসায়নিকগণ কৃত্রিম উপায়ে ঠিক তদনুরূপ গন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছেন। জীব শরীরান্ত-র্গত অনেক জটিল পদার্থও জৈব রাসায়নিকগণ রসায়নাগারে প্রস্তুত করিয়াছেন। ইউরিয়া (Urea) নামক পদার্থটা মূত্রাদির সহিত জীব-শরীর হইতে নির্গত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ ইহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং পরীক্ষাগারে ইহার পুনরুৎপাদনও করিয়াছেন। ফরমিক্ এসিড্ (Formic Acid) পূর্ব্বে পিপীলিকা শরীর হইতে সংগৃহীত হইত। এক্ষণে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হইতেছে। আরও রাশি রাশি এইরূপ উদাহরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

জৈব-রসায়নের এই সকল অবদানপরম্পরা জ্ঞান-জগতে যুগান্তর আনিয়াছে। এখন আর অজ্ঞেয় "জীবনীশক্তির" উপর জীব জগতের সৃষ্টিস্থিতির ভার দিয়া বৈজ্ঞানিকগণ নিশ্চিন্ত নহেন। তাঁহারা এখন বলিতেছেন; যাহাকে এতদিন "জীবনীশক্তি" বলা হইত, এখন আর তাহার অস্তিত্বের পরিকল্পনার কোনই প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের মতে প্রাকৃতিক জগতের এরূপ ব্যাখ্যা নিতান্ত আত্ম-প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নহে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সৃষ্টি-রহস্য নিতান্ত একটা 'সৃষ্টিছাড়া' জ্ঞানাতীত ব্যাপার নহে। বৈজ্ঞা-নিকগণ বলিতেছেন, একই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া জড় ও জীবজগৎ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। উন্নততর জীবের সঙ্গে জড়ের যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, আদিম জীব এবং জড়ের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। বস্তুতঃ জীব ও জড়ের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ বড়ই শক্ত ব্যাপার। হৃষ্ট পুষ্ট, সদাচঞ্চল একটা ছাগশিশুরসঙ্গে তুলনায়, একখণ্ড শিলাকে প্রাণহীন, নির্জ্জীব বলা খুবই সহজ, সন্দেহ নাই; কিন্তু, এই প্রাণিকুলের আদি পুরুষ, পণ্ডিতগণ যাহাকে আমিবা (Amœba) বলেন, তাহার সহিত তুলনায় খনিজ স্ফটিককে একেবারে অত সংক্ষেপে জীব-জগৎ হইতে বিদায় দেওয়া চলে না। আমাদের দেহের রক্ত মাংস, পেশী চর্ম্ম, এ সমস্তই অসংখ্য জীবকোষ (Cells) দ্বারা গঠিত। বস্তুতঃ প্রাণিমাত্রেরই দেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জীবকোষের সমষ্টি মাত্র। আমাদের জীবন শরীরের কোনও বিশেষ স্থানে রক্ষিত নাই, ইহা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। যাহা হউক, আমিবার (Amœba) দেহ এইরূপ একটী মাত্র

কোষে গঠিত। আমিবার মধ্যে স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই। ইহারা সামুদ্রিক শৈবালাদির গাত্রে লাগিয়া থাকে; আর খাদ্যদ্রব্য গায়ে ঠেকিলে তাহার পুষ্টিকর অংশ শোষণ করিয়া লয়। বংশ-বৃদ্ধির জন্যও ইহাদের কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। শরীরের পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের গাত্র হইতে শাখা প্রশাখা নির্গত হয়; এবং ইহারাই মূল শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবশেষে আমিবায় পরিণত হয়, এই ত' গেল আমিবার জীবনের ইতিহাস। স্ফটিকের জীবনেও আমরা কতকটা এইরূপই দেখিতে পাই। স্ফটিকও খনিজ-মিশ্রিত জল হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া পরিপুষ্ট হয়। স্ফটিকেরও ঠিক আমিবার মতই বংশ বৃদ্ধি হয়। একটী স্ফটিক পরিণতি লাভ করিলে, তৎপার্শ্বে আবার নবতর স্ফটিকের সঞ্চার হইতে আরম্ভ হয়।

তাহা হইলে, আমরা দেখিতেছি, স্থূলতঃ জীব এবং জড়ের পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট হইলেও, সূক্ষ্ম এবং সতর্ক ভাবে বিচার করিলে এই পার্থক্যটুকুকে আকার দান বড়ই কঠিন হইয়া উঠে।

সুপ্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক জাড্ (Judd) ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে Geological Societyর সাম্বৎসরিক অধিবেশনের সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষে তাঁহার পঠিত তথ্যপূর্ণ অভিভাষণে তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত, "প্রাণী" এবং "প্রাণের" যে সকল সংজ্ঞা প্রচলিত আছে, তৎ সমুদয়ের সমালোচনা করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, সতর্ক ভাবে বিচার করিলে খনিজ স্ফটিক সমূহকেও এই সকল সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছিলেন—বৈজ্ঞানিক হিসাবে প্রাণীর এমন কোনই বিশেষত্ব নাই, যদ্দারা তাহাকে এককালে জড় জগৎ হইতে অবচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

এই সমস্ত বিষয় বিষদ্ রূপে আলোচনা করিয়া অধুনা বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন—জীব ও জড়ে যে পার্থক্য, তাহা কেবল অভিব্যক্তিরই ফল। ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এখন জীব ও জড়ে বিস্তর পার্থক্য দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু জীবোৎপত্তির প্রারম্ভে এতটা পার্থক্য ছিল না। তাঁহারা বলেন, ক্রমোন্নতির ফলে জড়ই আদিম জীবে পরিণত হইয়াছে। যে নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আর্দ্রজান্ এবং অম্লজান্ বাষ্প মিলিয়া প্রকৃতিতে জলের সৃষ্টি করিয়াছিল, ঠিক সেই নিয়মের অনুসরণেই কালে প্রকৃতিতে জীবের প্রথম অভ্যুদয় হইয়াছিল। ইহার মধ্যে আর কোনও "দৈব" নাই। অথবা আর্দ্রজান এবং অম্লজানের মিলন-সম্পাদনে দেবতার যতটুকু হাত ছিল, জীবের বেলায়ও ঠিক ততটুকুই তিনি করিয়াছেন। জীব-সৃষ্টিতে তিনি কিছুমাত্র পক্ষপাত করেন নাই। সৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁহার যে মহানিয়ম, তাহাই সর্ব্বত্র সমভাবে কার্য্যকরী হইতেছে। এই মহা নিয়মের সন্ধানে, বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া নব্য রসায়ন এবং পদার্থ বিজ্ঞান তাহাদের সম্মিলিত শক্তির বিনিয়োগ করিয়া আসিতেছে। এক্ষণে আমরা সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব।

কিছুদিন পূর্ব্বেও বৈজ্ঞানিকগণ সৃষ্টি-তত্ত্বের ব্যাখ্যানে দুইটী সত্যের স্বীকার করিয়া লইতেন; একটী শক্তি (Energy), অপরটী বস্তু (Matter)। তাঁহাদের মতে ইহারা পরস্পর অপরিবর্ত্তনীয় এবং প্রত্যেকে অব্যয়, অক্ষর এবং চিরন্তন। বস্তু বা শক্তি নানা ভাবে জগতে কার্য্য করিতে পারে বটে; কিন্তু

ইহাদের তিলমাত্রও অন্তর্হিত হইতে পারে না। শক্তি, বিদ্যুৎ আকারে, আলোক আকারে, তাপ আকারে অবস্থান করিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া কখনও বস্তুতে পর্য্যবসিত হইতে পারে না, বা অন্য কোন প্রকারে অন্তর্ধান করিতেও পারে না। বস্তু সম্বন্ধেও তাঁহাদের ঠিক এইরূপ ধারণাই ছিল। তাঁহাদের মতে বস্তু এবং শক্তির পরিমাণ সুনির্দ্দিষ্ট। কোন উপায়েই আমরা এককণা শক্তি বা একতিল বস্তু সৃষ্টিও করিতে পারি না—বিনাশ করিতেও পারি না।

বৈজ্ঞানিকগণ প্রায় আশিটী মৌলিক বস্তুর (Elements) অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন, ইহাদের বিশ্লেষণ বা অন্যান্য পরিবর্ত্তন অসম্ভব। আর ইহাদের রাসায়নিক যোগাযোগই যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তির কারণ।

বর্ত্তমানে নব্য বৈজ্ঞানিকগণের পর্য্যবেক্ষণ পরম্পরার ফলে এই প্রাচীন সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ এক্ষণে দেখিতেছেন, কতকগুলি মৌলিক পদার্থ ধীরে ধীরে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে শক্তি সেই পরিবর্ত্তনশীল পদার্থ হইতে ইতস্ততঃ বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ এখন বলিতেছেন, বস্তু শক্তির আধার; শক্তির ধারণাতেই বস্তুর বস্তুত্ব। আর আধেয় এই শক্তির হ্রাস বৃদ্ধিতেই বস্তুর প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যতক্ষণ বস্তুর মধ্যে শক্তি ধৃত এবং নিহিত না হইবে, ততক্ষণ বস্তু—বস্তু নহে, উহা অ-বস্তু —এই অ-বস্তুই বৈজ্ঞানিকগণের ইথর (Aether or Ether) ইথর জগৎময়, সর্ব্বব্যাপী। ইথর যখন শক্তি ধারণ করে, তখনই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতম ইলেক্ট্রণ বা প্রাণুকণিকার জন্ম হয়। সহস্র সহস্র প্রাণুকণিকা (Electrons) মিলিয়া ক্রমশঃ মৌলিক পদার্থের পরমাণু সৃষ্টি করিয়া থাকে।

এইখানে প্রশ্ন উঠিবে,—ইথরের মধ্যে শক্তি পরিচালিত এবং নিহিত হইয়াই যদি প্রাণুকণিক উৎপন্ন হয়, আর প্রাণুকণিকার সমবায়েই যদি মৌলিক পদার্থের পরমাণুর উদ্ভব হইয়া থাকে, তবে জগতে একটী মাত্র মৌলিক পদার্থ না হইয়া প্রায় ৮০টী মৌলিক পদার্থ আমরা কেন দেখিতে পাইতেছি? ইহার ব্যাখ্যানে নব্য বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন যে, অন্তর্নিহিত শক্তির পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত পরমাণুর প্রকৃতির তারতম্য হইয়া থাকে। আর তাহারই ফলে আমরা যাহাকে মৌলিক পদার্থ বলি, তাহার প্রকারভেদ হইতেছে। ইথারের উপর শক্তির ক্রিয়া দ্বারা আমরা যে বস্তুর অভিব্যক্তি দেখিয়াছি, ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক পরমাণুগুলি যেন সেই অভিব্যক্তিরই এক একটী ধাপ। শক্তি ইথারের মধ্যে আশ্রয় লইয়া প্রাণুকণিকা সৃষ্টি করিতে থাকে; ক্রমশঃ এই প্রাণুকণিকার সংখ্যা বাড়িয়া যাইতে যাইতে এমন এক সময় আসে, যখন ইহাদের পক্ষে সমবেত ভাবে একটী স্থায়িভাব (Stability) অবলম্বন সম্ভব হয়—ফলে একটী মৌলিক পরমাণুর প্রতিষ্ঠা হয়। যত অধিক সংখ্যক প্রাণুকণিকা সমবেত হইয়া এই স্থায়ি ভাবে উপস্থিত হয়, পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তি ততই বেশী হয়—ফলে, ততই গুরুতর মৌলিক পরমাণুর উৎপত্তি হয়। আমরা জানি, আর্দ্রজানের পরমাণুর গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা কম (১) পণ্ডিতগণ বলেন, ইহা অন্যুন সহস্রটী প্রাণুকণিকার

সমবায়ে গঠিত। পারদের পারমাণবিক গুরুত্ব (Atomic weight) অনেক বেশী (২০০)। পণ্ডিতেরা মনে করেন, ইহার প্রত্যেক পরমাণুতে লক্ষাধিক প্রাণুকণিকা বিদ্যমান। এইরূপ রেডিয়ম্, থোরিয়ম্ প্রভৃতি মৌলিক পদার্থের পরমাণু আরও ভারী, ইহাতে আরও অধিক সংখ্যক প্রাণুকণিকা নিহিত রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আধেয় শক্তি এতই বেশী যে, ইহা হইতে শক্তিকণা স্বতঃই বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে।

শক্তির সাহায্যে ইথারের এই যে অবস্থা বিপর্য্যয়, এই যে জটিল হইতে হইতে ক্রমশঃ জটিলতর রাসায়নিক জগতের বিকাশ, ইহার একটা ধারা বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার এবং অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে তাঁহারা উত্তপ্ত নক্ষত্র সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, সর্ব্বাপেক্ষা উত্তপ্ত নক্ষত্র কেবল মাত্র আর্দ্রজান বাষ্প—তাহার উৎপত্তির প্রাথমিক অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। আর উষ্ণতা হিসাবে ঠিক তন্নিম্নবর্ত্তী নক্ষত্রে আর্দ্রজান্, হিলিয়াম্ প্রভৃতি লঘুতম বাষ্পরাজি গঠিত হইয়াছে। তদপেক্ষা শীতল নক্ষত্রে আর্দ্রজান্ প্রভৃতি ছাড়া আবার লঘুতম ধাতু সমূহও প্রাথমিক অবস্থায় বিদ্যমান। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, জগৎ যতই শীতল হইয়া আসে, ততই ধীরে ধীরে রাসায়নিক মৌলিক পরমাণু গুলি অভিব্যক্ত হইতে থাকে। তার পরে ক্রমে জগৎ আরও শীতল হইতে থাকিলে, বিভিন্ন মৌলিক উপাদান গুলির পারস্পরিক যোগাযোগ আরম্ভ হয়—ফলে, ক্রমেই জটিল যৌগিক পদার্থ সমূহ উৎপন্ন হইতে থাকে। এই সকল সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এবং পর্য্যবেক্ষণের ফল, ইহাদের মধ্যে এতটুকুও কল্পনার স্থান নাই।

এই সকল আলোচনায়, আমরা জগতের বিকাশের বেশ একটা ক্রম দেখিতে পাইতেছি। আমরা দেখিতেছি, জগতের উগ্রতম অবস্থায়, অর্থাৎ যখন তাহাতে শক্তির খেলা তীব্রতম, তখন হয় ত এখানে বস্তু ছিলই না; কেবলই, অ-বস্তু, ইথর ছিল। তারপর শক্তির তীব্রতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণুকণিকার বিকাশ হইল। দশ, বিশ, শত, হাজার করিয়া, ক্রমে তীব্রতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে, প্রাণুকণিকা গঠিত এবং সমবেত হইয়া, লঘুতম মৌলিক বস্তুর পরমাণু (atom) সমূহ সৃষ্টি করিতে লাগিল। তারপর জগৎ যখন আরও শীতল হইয়া আসিল, তখন ধীরে ধীরে গুরুতর মৌলিক পরমাণু সমূহের উৎপত্তিও সম্ভব হইল। এই খানেই শেষ নহে। আবার উষ্ণতা হ্রাসের তালে তালে জগতে যখন দুইটী বা তিনটী মৌলিক পরমাণুর যোগও সম্ভব হইল, তখন ক্রমশঃ অক্সাইড্ (Oxides) কার্বনেট্ (Carbonates) প্রভৃতি সহজসাধ্য যৌগিক পদার্থ সমূহ (Compounds) উৎপন্ন হইতে লাগিল। তারপরে জগতের অবস্থা অনুকূল হইলে, অর্থাৎ উষ্ণতা আরও কমিলে, জগতে ক্ষার-লবণাদি (Alkali salts) যৌগিকেরও সমাবেশ আরম্ভ হইল। উষ্ণতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে, রাসায়নিক জগতের এই যে বর্দ্ধিষ্ণু জটিলতা, ইহা এক অখণ্ড ধারায় জগতের আদি হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। পণ্ডিতগণ ইহার অনুসরণ করিয়া একবাক্যে বলিতেছেন—এ ধারার মধ্যে কোথাও বিচ্ছেদ নাই, বিরাম নাই। বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছার মত ইহা সর্ব্বব্যাপী। জগতের যত কিছু বিকাশ, সবই এই মহা বিকাশসূত্রে পরম্পরাক্রমে গ্রথিত। জড় ও জীব কেহই ইহা হইতে পৃথক নহে—সকলেই

এই মহা নিয়মের আহ্বানে একে একে সাড়া দিয়া নিজ নিজ স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে।

সহজ কথায় পণ্ডিতেরা বলেন :—পৃথিবী শীতল হইতে হইতে যখনই ইহাতে আদিম জীবরূপ এক বিশেষ রাসায়নিক যৌগিকের গঠন সম্ভবপর হইয়া, তখনই উহা গঠিত হইয়াছে। অবশ্য পরীক্ষা দ্বারা বৈজ্ঞানিকগণ অবিসম্বাদিত রূপে এখনও জড় হইতে জীব গঠন করিতে সমর্থ হন নাই, তথাপি তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক এবং সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়।

আদিম জীব গঠন সম্বন্ধে বর্ত্তমান্ বৈজ্ঞানিক জগতে অনেক পরীক্ষা হইয়াছে এবং হইতেছে, তবে জৈব-দেহের রাসায়নিক জটিলতা এবং আদিম জীব-অভ্যুদয়ের সমসাময়িক প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা বশতঃ এ কার্য্যে নানা জনে নানা পন্থা অবলম্বন করিতেছেন। তাঁহাদের কার্য্যাবলির বিবৃতি এখানে অসম্ভব। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, বৈজ্ঞানিকের বিপুল উৎসাহ এবং অদম্য অধ্যবসায়ের নিকট একদিন না এক দিন জীবনরহস্য মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইবেই। এক ভাবে স্বতঃজননবাদের উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু কালে দৃঢ়তর ভিত্তির উপরে উহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবেই। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার চার্লটন্ বষ্টিয়ান্ (Dr. Charlton Bastion) তাঁহার বিংশবর্ষ-ব্যাপী পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছেন—সে দিন আগতপ্রায়।

শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত।

গ্রীক-দর্শন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অ্যারিষ্টটল।

অ্যারিষ্টটল আত্মাকে অমর বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নিজের মতানুসারেই আত্মার অমরত্ব লোপ পাইতে বাধ্য; কেন না, যাহাকে তিনি অমর বলিতেছেন, সেই বিশুদ্ধ আত্মা বা ক্রিয়াত্মিকা বুদ্ধি (Active intellect) হইতে কোন ব্যক্তিবিশেষের (Thinking individual) উদ্ভব হয় না, অথবা উহা ব্যক্তির অংশরূপেও প্রকাশ পায় না। উহা যেন বাহিরের কোন বস্তু, আমার 'আমিত্বে'র সহিত কোন দুশ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ নহে। ধরিতে গেলে, ক্রিয়াত্মিকা বুদ্ধি বা বিশুদ্ধ আত্মার অস্তিত্বই নাই। অ্যারিষ্টটল বিশুদ্ধ আত্মার অর্থে যে ঠিক কি বুঝিয়াছিলেন, তাহা বলা কঠিন। তাঁহার দর্শনশাস্ত্রের বহু টীকাকার এ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মাথা ঘামাইয়াছেন। সোজা কথায় অনুমান হয় যে, তিনি এই বুদ্ধি বা বিশুদ্ধ আত্মাকে প্রকারান্তরে ঈশ্বরই বলিয়াছেন। যে দিক দিয়াই হউক, ক্রিয়াত্মিকা বুদ্ধি আর নিরপেক্ষ চৈতন্য অথবা ঈশ্বরে কোন প্রভেদ নাই। ইহার একটী প্রমাণ এই যে, অ্যারিষ্টটল বুদ্ধির বহুত্ব স্বীকার করেন নাই। বুদ্ধি যদি এক না হইয়া অনেক হয়, তাহা হইলে বুদ্ধির নিরপেক্ষত্ব থাকে না; তখন উহা জড়স্থানীয়, কেন না, যাহা কিছু বহুত্ববোধক, অ্যারিষ্ট-

টলের মতে তাহাই জড়। ক্রিয়াত্মিকা বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে জড়বর্জ্জিত, এজন্য একক ভাবেই উহার অবস্থিতি। উহা অদ্বিতীয় এবং কূটস্থ চৈতন্য (Immanent Reason), জগতাত্মা, ষ্টৌয়িকগণ যাহাকে বিশ্বজনীন মহাশক্তি (Universal Spirit) বলিতেন, যাহা হইতে নশ্বরজীব সমূহের উদ্ভব। অ্যারিষ্টটল ঈশ্বরকে বিশ্বাতীত বলিলেও, তাহাতে ঈশ্বরের সার্ব্বভৌমিকত্ব লোপ পায় নাই। কেন না, অধ্যাত্মদর্শনে তিনি দেবতার (The Deity) বিশ্বাতীতভাব (Transcendency) এবং প্রাকৃতিক ও নৈতিক শৃঙ্খলার কারণস্বরূপ অন্তর্লীনত্ব (Immanency), উভয়ই রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু, যখনই তিনি ক্রিয়াত্মিকা বুদ্ধিকে বস্তুগতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তখনই আর এই সামঞ্জস্য রক্ষা পায় নাই। তখনই ঈশ্বরের লোকাতীতভাবের স্বপক্ষে বলিবার কিছু থাকে না।

ক্রিয়াত্মিকা বুদ্ধি ও মানব বুদ্ধি, দুটী এক বস্তু নহে এবং ক্রিয়াত্মিকা বুদ্ধির অমরত্ব হইতে কোন উপকারও দর্শে না। জ্ঞান সম্বন্ধে অ্যারিষ্টটলের যে ধারণা ছিল এবং যাহার সহিত ডিমক্রিটাস ও প্রত্যক্ষবাদীগণের ঐক্য দৃষ্ট হয়, তদনুসারে মানববুদ্ধি (Human understanding) সৃষ্টির কারণস্বরূপ বা পিতৃস্থানীয় নহে, উহার কিছু দান করিবার ক্ষমতা নাই; পক্ষান্তরে, গ্রহণশক্তি যথেষ্ট আছে বলিয়া উহা মাতৃস্থানীয়া। মানব-মন স্বভাবতঃ একখানি শ্বেতপ্রস্তরফলক বা কাগজ খণ্ড সদৃশ। প্রথমে উহাতে কোন ধারণাই থাকে না। পেরিপ্যাটেটিক প্রত্যক্ষবাদের মতে ধারণাগুলি যে একেবারে থাকে না, এমন নয়, তবে লুপ্তভাবে থাকে। ইহার অর্থ এই যে, ধারণাগুলি সদ্যঃপ্রস্তুত থাকে না, পরন্তু ধারণাগ্রহণের ক্ষমতা মনেরই ধর্ম্মরূপে বিদ্যমান থাকে। এই ক্ষমতা বা যোগ্যতা মনের সহজাত, নতুবা উহা কোথা হইতে আসিবে? অসৎ হইতে ত সতের উদয় হয় না (Ex nihilo nihil)। অ্যারিষ্টটল যদিও বলেন, শিশুর মন নিষ্কলঙ্ক স্ফটিক সদৃশ অভিজ্ঞতাই জ্ঞানলাভের উপায় এবং ইন্দ্রিয়-জ্ঞান হইতে বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, তথাপি তিনি এ বিষয়ে যুক্তিবিরুদ্ধ কোন দ্বৈতবাদের অবতারণা করেন নাই, অথবা সাধারণ বিশ্বাসানুরূপ ঈশ্বরই যে সর্ব্বকর্ম্মের মূল, এরূপ শিক্ষার প্রশ্রয় দেন নাই। দ্বৈতবাদের লক্ষণ এই যে, উহাতে জ্ঞানলাভের উপায়স্বরূপ বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা, উভয়ই অক্ষুণ্ণ থাকে এবং একের দ্বারা অপরের বাধা জন্মে। আর, এই মতে, চিন্তাশক্তিকে জড়প্রকৃতি হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করে; কেন না, ইন্দ্রিয়ানুভূতির শক্তি অধিক হইলে, তদ্দ্বারা চিন্তাশক্তির হ্রাস হয়। প্লেটোর দ্বৈতবাদ এইরূপ। অ্যারিষ্টটলের মতকে দ্বৈতবাদ বলিতে হইলে এই অভিযোগ কেবল তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্র (Theology) এবং ক্রিয়াত্মিকা বুদ্ধি (active intellect) সম্বন্ধেই প্রযুজ্য।

মানবাত্মা পশুর আত্মা এবং ঈশ্বরের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা। চেতনাশক্তি, বিষয়জ্ঞান এবং স্মৃতি সম্বন্ধে মানব ও পশুর মধ্যে প্রভেদ নাই, অথবা থাকিলেও তাহা সামান্য। এই তিন শক্তি ব্যতীত মানবের আর একটী শক্তি আছে, যাহা পশুতে নাই; সেটি বিচারবুদ্ধি (Reason)। বিচার-বুদ্ধির গুণে মানব পশুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ত বটেই, অধিকন্তু তাহার সহিত ঈশ্বরেরও সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ঈশ্বরত্ব এবং পশুত্ব, এই দ্বৈতভাব আছে বলিয়াই মানব নীতিজ্ঞানের অধিকারী, ও এইজন্যই

জীব-রাজ্যে মানবের বিশেষত্ব। বুদ্ধিবৃত্তি এবং পশুত্ব, উভয়ের একত্র সমাবেশ ভিন্ন নৈতিকজ্ঞানের উদয় হয় না। পশুর নীতি-জ্ঞান নাই, তাহার কারণ, পশুতে বিচার-বুদ্ধির অভাব। আবার, নিত্যচৈতন্যস্বরূপ বলিয়া ঈশ্বরেও নীতি-জ্ঞানের অভাব। ভাল এবং মন্দ এই দুয়ের পার্থক্য হইতেই নীতি-জ্ঞান; যেখানে কেবল ভাল অথবা কেবল মন্দ, সেখানে নীতিজ্ঞান আসিবে কিরূপে? নীতিজ্ঞানই মানব-প্রকৃতির বিশেষত্ব এবং বস্তুমাত্রের চরমোদ্দেশ্য যদি স্ব স্ব প্রকৃতির পূর্ণাভিব্যক্তি হয়, তবে মানবজীবনের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র পশুবৃত্তির স্ফূর্ত্তি কিম্বা কেবলমাত্র দেবত্ব লাভ নহে, পরন্তু উভয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা, অর্থাৎ পশুত্ব এবং ঈশ্বরত্ব, এই দ্বিবিধ ভাবের পূর্ণতা ও সামঞ্জস্য সাধনই এ জীবনের উদ্দেশ্য। বুদ্ধিবৃত্তি এবং পাশবিক বৃত্তির সামঞ্জস্য হইতে যে সুখের উদয় হয়, তাহাই মানবের চরম লক্ষ্য এবং ইহাদের সমতারক্ষাই মানব-সাধারণের ধর্ম্ম। এই সমতার ফলে, কল্পনা-রাজ্যে জ্ঞান এবং কর্ম্মজগতে বিজ্ঞতা জন্মে। বুদ্ধি এবং ইচ্ছা শক্তির সামঞ্জস্য হইতে নীতিধর্ম্মের উৎপত্তি। সৎ-সাহস, মিতাচার, দানশীলতা, মহানুভবতা, মহত্ব, শিষ্টতা, আন্তরিকতা এবং সামাজিকতা ইত্যাদি গুণ নীতিধর্ম্মের অন্তর্গত। ভীরুতা এবং অসম সাহসিকতার মধ্যবর্ত্তী অবস্থাই সাহস; অর্থগৃধ্নুতা এবং অমিতব্যয়িতার মধ্যবর্ত্তী অবস্থার নাম বদান্যতা।

সমাজ-সংগঠন অথবা সামাজিক সংস্কার ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, পক্ষান্তরে সমাজই মানবচরিত্র গঠনের সহায়তা করে। পরিবারপালন, দাসত্ব এবং সম্পত্তি রক্ষণ লইয়াই মানবের কর্ম্মক্ষেত্র; মানবগণ সাধারণতঃ এই তিন বিষয় হইতে অভিজ্ঞতা লাভ করে। এক ব্যক্তির পরিচ্ছদ যেমন অপরের গায়ে মানায় না, সেইরূপ একজাতীয় রাজশাসন অপর জাতীয় লোকের পক্ষে খাটে না। রাজা সজ্জন অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ হইলে রাজতন্ত্র বা একাধিপত্য শাসনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কারণ যে সকল ঐশিক নিয়মে জগৎ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, এখানেও সেই নিয়মগুলির প্রভাব অধিক থাকে। সম্রাট যে পরিমাণে পূর্ণতা ও পবিত্রতা লাভ করিবেন, তাঁহার সাম্রাজ্যেও সেই পরিমাণে পূর্ণতা ও পবিত্রতা বিরাজ করিবে। সম্রাট স্বেচ্ছাচারী হইলে একাধিপত্য শাসন বিষময় ফল প্রসব করে। রাজপুরুষগণের মধ্যে যথারীতি শাসনবিভাগ এবং মধ্যবিত্ত প্রজাপুঞ্জের সমবেত শক্তির উপরই রাজ্যের শান্তি প্রতিষ্ঠিত।

অধ্যাত্মশাস্ত্রের ন্যায়, অ্যারিষ্টটলের নীতি এবং রাজনীতিও প্লেটোর লোকাতীত দুর্লভ স্বপ্নরাজ্যের কল্পনা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অ্যারিষ্টটল প্রত্যক্ষবাদী, এজন্য সহজবোধ্য বিষয় সমূহের আলোচনাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল এবং অভিজ্ঞতা সাহায্যে যে সকল বিষয়ের মীমাংসা হয়, সেই সকল বিষয়েই তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন। তাঁহার সমগ্র দর্শনশাস্ত্র মধ্যপন্থী; স্থূল প্রত্যক্ষবাদ এবং সূক্ষ্ম আদর্শবাদ যাহার সহিত বাস্তবজীবনের সম্পর্ক নাই, এ দুয়ের কোনটীর সহিতই তাঁহার সহানুভূতি ছিল না। বিজ্ঞানের জন্যই বিজ্ঞানচর্চ্চা, প্রতিভার সর্ব্বগ্রাহিতা ও কোমলতা, আদর্শ ও প্রত্যক্ষের সাম্যরক্ষা, এ সকল গুণে অ্যারিষ্টটল চিন্তাশীল গ্রীকদিগের শীর্ষস্থানীয়। কিন্তু তাঁহা হইতে যে পরোক্ষভাবে গ্রীকচিন্তাশক্তির অবনতিও না ঘটিয়াছিল, এমন নয়। মানবজাতির স্বাভা-

বিক বিবর্ত্তন সম্বন্ধেও তিনি এক নূতন যুগের সুত্রপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যক্ষবাদের গাম্ভীর্য্য এবং অবিশ্রান্ত সদালোচনা দেখিয়া তাঁহাকে একজন রোমক কিম্বা সেমাইট বলিয়া মনে হয়। তাঁহার রচনা গুরুর রচনার ন্যায় কবিত্বময়ী ছিল না সত্য, কিন্তু তাঁহার দর্শনমতে রূপ অপেক্ষা জড়েই অধিক সত্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার মূল আধ্যাত্মিক মত, যাহাতে উপাদান সসীম বস্তু মাত্রেরই অবস্থিতিহেতু, মানব-জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা (নিষ্কলঙ্ক স্ফাটিকের সহিত মনের সাদৃশ্য) তাঁহার একেশ্বরবাদিত্ব যাহা প্লেটোর অপেক্ষা অনেকাংশে নির্ব্বিরোধ, সর্ব্ববিষয়ে মিতাচারপদ্ধতি, সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতার ভাব, (Monarchical tendencies), তাঁহার চিন্তাপ্রণালীর এই সকল বিশেষত্ব হইতে যে নূতন যুগের সৃষ্টি হয়, পেলা (Pella), রোম, আলেক্‌জান্দ্রিয়া এবং জেরুজালেমের অধিবাসীগণ পূর্ব্ব হইতেই তজ্জন্য প্রস্তুত ছিল।

অ্যারিষ্টটলের মৃত্যুর পর ল্যুকেয়মে যে কয়েকজন দার্শনিক প্রতিষ্ঠালাভ করেন, তন্মধ্যে থিওফ্রেষ্টাস (Theophrastus), ডিসিয়ার্কাস (Dicœarchus), অ্যারিষ্টজিনাস (Aristoxenus) এবং সর্ব্বোপরি, টলেমি ফিলাডেল্‌ফাসের শিক্ষক ল্যাম্পসেকাসের ষ্ট্র্যাটো (Strato) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অ্যারিষ্টজিনাস আত্মার (বুদ্ধির) অমরত্ব এবং ষ্ট্র্যাটো ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন নাই। উভয়েই এক গুরুর শিষ্য; অথচ গুরুর দুটি মূল তথ্যের সহিত ইঁহাদের মতভেদ হওয়ার কারণ কি? প্রথমতঃ, হয়ত অ্যারিষ্টটল প্রথম সঞ্চালক এবং বুদ্ধির অমরত্ব বিষয়ে নিজের মতটী নিজের দর্শনালোচনার সুবিধার জন্যই কল্পনা করিয়াছিলেন; অথবা হয়ত, মধ্যযুগের অ্যারিষ্টটেলিয়ান সম্প্রদায় অপেক্ষা প্রাচীন যুগের দার্শনিকগণ অধিকতর স্বাধীন মতাবলম্বী ছিলেন। সে যাহা হউক, অ্যারিষ্টটলের পরবর্ত্তী দর্শন মত সমূহে এবং তাঁহার সহিত তাঁহার শিষ্যগণের যে অনৈক্য দৃষ্ট হয়, বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতিই তাহার প্রধান কারণ। ভূমধ্যসাগরের দ্বীপপুঞ্জ, মিসরদেশ এবং সিসিলি দ্বীপেই অ্যারিষ্টটল-প্রবর্ত্তিত বৈজ্ঞানিক মতাবলীর প্রথম চর্চ্চা আরম্ভ হয়। কিন্তু তৎপ্রণীত দর্শন বা অধ্যাত্ম শাস্ত্রের মূলভিত্তি এথেন্সে এবং এথেন্সের অন্তর্গত ল্যুকেয়মেই প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাহার ফলে, উক্ত রাজ্যের অধিবাসীগণ জড় জগতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ থাকিয়া আত্মার উন্নতিকল্পে অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

(খ) জড়ের প্রাধান্য-চিন্ময় সত্তার প্রতি অবিশ্বাস।

এপিকিউরাস্ (Epicurus)

গর্জ্জিটস (Gargettos) নগরে খ্রীঃ পূঃ ৩৪০ অব্দে নিওক্লিসের (Neocles) পুত্র এপিকিউরাসের জন্ম হয়। তাঁহার জনক ও জননী উভয়েই এথেনীয় ছিলেন। নসিফেনিসের (Nansiphanes) নিকট তিনি ডিমক্রিটাসের দর্শনমত অবগত হন; পরে, প্লেটোর অনুচর প্যাম্ফিলাসের (Pamphilus) নিকট শিক্ষা সমাপন করতঃ তিনি যথাক্রমে কোলোফন (Colophon) মিটিলিন (Metylene) ও ল্যাম্পসেকাস নগরে, এবং খ্রীঃ পূঃ ৩০৬ অব্দে এথেন্স নগরে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। এথেন্স নগরস্থ তাঁহার উদ্যানে বহুলোকের সমাগম হইত এবং সকলের নিকটই তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। এই শিক্ষা সমিতিতে স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত

যোগ দিতেন। তাঁহার মতাবলী বহুসংখ্যক পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল বটে, তবে ঐ সকল পুস্তকের রচনা-প্রণালীর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। খ্রীঃ পূঃ ২৭০ অব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর, হরমার্কাস (Hermarchus) তদীয় সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এপিকিউরাসের প্রিয় শিষ্যদ্বয় মিট্রোডোরাস (Metrodorus) এবং পলিনাসের (Polyænnus) মৃত্যুর পর তাঁহার পার্শ্বচরগণের মধ্যে কলোটিস (Colotes) এবং আইডোমিনিয়াসের (Idomeneus) নাম উল্লেখযোগ্য।

এই সম্প্রদায়ের আর এক ব্যক্তি, এপোলোডোরাস (Apollodorus) খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। তাঁহারই ছাত্র জেনো (Zeno) খ্রীঃ পূঃ ৭৮ অব্দ পর্য্যন্ত এথেন্সে এপিকিউরাসের ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া কৃতী হইয়াছিলেন। ডাইওজিনিসের মতে এপিকিউরাসের ধর্ম্ম ২৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল, কিন্তু ল্যাক্টান্টিস (Lactantes) ৩২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহার অস্তিত্ব নিরূপণ করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুমান এই যে, উক্ত ধর্ম্মমত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে একেবারে লোপ পায়।

কথিত আছে, মাতার কুসংস্কারাপন্ন আচার ব্যবহার দর্শনে এপিকিউরাস দেবদেবীর অস্তিত্বে সন্দিহান হন এবং তাহাতে তাঁহার এইরূপ ধারণা হয় যে, দেবতা ও পরলোকের ভয়ই সংসারে সুখভোগের প্রধান অন্তরায়। সুতরাং অবধারণ এবং বিচার সাহায্যে অলৌকিক ব্যাপারসমূহের বিশ্বাস হইতে মুক্তি প্রদানই দর্শনের উদ্দেশ্য।

অ্যারিষ্টটল যেমন বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পেই বিজ্ঞানচর্চ্চা করিতেন এবং তাঁহার প্রাথমিক দর্শনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান বলিতেন, এপিকিউরাস কিন্তু তদ্রূপ মনে করেন নাই। তাঁহার মতে বিজ্ঞানশাস্ত্র জীবন-সাফল্যের উপায়মাত্র এবং বিজ্ঞানের যতটুকুর সহিত দৈনিক জীবনের সম্পর্ক, ততটুকুর আলোচনায়ই তিনি আনন্দবোধ করিতেন। তিনি দর্শনকে ন্যায় (logic), জড়বিজ্ঞান এবং নীতিবিজ্ঞান, এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। মানব কি উপায়ে নিরাপদ সুখ-শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে সক্ষম, দর্শন হইতে তাহারই শিক্ষা পাওয়া যায়। ডিমক্রিটাসের দর্শনে তিনি এই শিক্ষার পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং ডিমক্রিটাসের সহিত তাঁহার প্রায় সর্ব্ববিষয়েই ঐক্য দৃষ্ট হয়।

প্লেটো জড়কে অসত্তা (non-being) আখ্যা দিয়াছিলেন, কিন্তু জড় অসত্তা নহে, উহাই দ্রব্য-জগতের একমাত্র অবস্থিতিহেতু, জগতের মূলভিত্তি (Universal substratum)। আত্মা, মন এবং ধারণা বা চিন্তা, দৈবক্রমে জড়ের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। জড়ের বহির্দ্দেশে শূন্যব্যতীত আর কিছুই নাই এবং শূন্য হইতেই গতির উৎপত্তি। জড়ের উপাদান অসংখ্য পরমাণুকোষ, যাহাদের সৃষ্টিও নাই, বিনাশও নাই এবং যাহারা নিত্য-স্পন্দনশীল। ডিমক্রিটাসের মতে পরমাণু-কোষসমূহ স্বভাবতঃ নিম্নাভিমুখ। কোন দুর্জ্ঞেয় শাসনাধীনে কোষগুলি সর্ব্বদা সরল-রেখাক্রমে, অধোদেশে গমন করিতেছে। এপিকিউরাসের মত এই যে, কোষগুলি স্বভাবতঃ নিম্নগামী সত্য, তবে তাহারা যখন পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া দ্রব্যসমূহের সৃষ্টি করে, তখন তাহাদের গতিবিধি যে কেবল লম্বভাবেই নিষ্পন্ন হয়, তাহা নহে। তাহারা স্ব স্ব রেখাপথ পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়; তাহা না হইলে তাহা-

দের মিলন-সম্ভাবনা থাকিত না এবং সৃষ্টিও সম্ভব হইত না। দৈবই পরমাণুগুলির স্থানবিচ্যুতির কারণ। এখানে দৈবের অবতারণা হইতে এইরূপ অনুমান হয় যে, এপিকিউরাস ইচ্ছা-শক্তির নিত্যবিদ্যমানতায় বিশ্বাস করিতেন না, অর্থাৎ ইচ্ছা-শক্তি যে সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে ঐশ্বরিক বিধানরূপে বিদ্যমান ছিল, তিনি এরূপ মতের পক্ষপাতী ছিলেন না।

কার্য্য কারণবিধি সম্বন্ধে ডিমক্রিটাসের সহিত এপিকিউরাসের বিরোধ থাকিলেও, বিশ্বের অনন্ত বিদ্যমানতায় উভয়েই বিশ্বাসপরায়ণ ছিলেন। জগতের এককালে সৃষ্টি বা এককালে ধ্বংস নাই। সত্যসত্যই কোন কিছুর সৃষ্টি হইতে পারে না, অর্থাৎ প্রথমে কিছুই ছিল না, পরে সেই 'কিছু না' হইতে অকারণে কিছুর সৃষ্টি হইল, কেবলমাত্র শূন্য হইতে জগতের উদ্ভব হইল, এরূপ মত যুক্তিবিরুদ্ধ। আবার, জগৎ যে দেবতাদিগেরও সৃষ্ট নয়, সহজেই তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে। দেবতাদিগের প্রকৃতি এবং সৃষ্টির অসম্পূর্ণতা হইতে ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। স্রষ্টৃগণ দেবতা, অতএব তাঁহারা পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপ এবং অনন্ত সুখের অধিকারী। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের কোন বিষয়ের অভাব বা আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে না। তাহাই যদি হয়, তবে তাঁহারা জগৎ-সৃষ্টিরূপ দুর্ব্বহ ভার বহন করেন কেন? কেনই বা তাঁহারা বিশ্বশাসনরূপ গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন? তর্কানুরোধে যদি ধরা যায়, জগৎ দেবগণ কর্ত্তৃকই সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলে এই সৃষ্টি দুই প্রকারে সম্ভব হইতে পারে। প্রথমতঃ, অনাদি এবং অনন্ত ভাবে; দ্বিতীয়তঃ, আদি ও অন্ত-বিশিষ্ট ভাবে। জগৎ যদি অনাদি-অনন্ত হয়, তবে তাহার সৃষ্টিই হয় নাই; সৃষ্ট বস্তুমাত্রেরই আদি এবং অন্ত অবশ্য স্বীকার্য্য। আর যদি আদ্যন্তবিশিষ্ট হয়, তবে কালেরই কোন না কোন সময়ে জগতের সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ সৃষ্টির হেতু কি? যদি বলি দেবগণের ধর্ম্মই সৃষ্টি করা, অর্থাৎ সৃষ্টি করিয়াই তাঁহাদের সুখ, তাহা হইলে ইহাও নিশ্চিত যে, যতদিন না সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল, ততদিন দেবগণ অসুখী ছিলেন এবং দীর্ঘকাল নিষ্কর্ম্মা ও অসুখী থাকার পর, বিশ্বরচনা আরম্ভ করেন। আর যদি বলি সৃষ্টি করা তাঁহাদের ধর্ম্ম নয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, সৃষ্টি করিয়া দেবতারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচরণ করিয়াছেন। সৃষ্টি না করিয়াই যদি দেবতাদের সুখ, তবে তাঁহারা সৃষ্টি করেন কেন? সৃষ্টি ব্যাপারে তাঁহাদের কি অভিপ্রায়ই বা সিদ্ধ হইবে? বসবাসের জন্যই কি জগৎসৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছিল? তাহাই যদি হয়, তবে অনাদিকাল যাবত দেবতাদিগের বাসস্থান ছিল না, অথবা থাকিলেও তাহা তাঁহাদের মনঃপূত হয় নাই; তাই তাঁহারা মনের মত করিয়া এই দুনিয়াটা গড়িয়াছেন। কিন্তু দেবতারা পূর্ণব্রহ্ম, তাঁহাদের কোন বিষয়ের অভাব বা আকাঙ্ক্ষা না থাকায় বাসস্থানের অভাববোধ হওয়াও প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তবে কি মানুষের জন্যই জগতের সৃষ্টি? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা দুই চারিজন পুণ্যাত্মা লোকের জন্য আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ কল্পনাও সঙ্গত নয়; কেন না, দেবগণ তাহা হইলে অকারণ এত বড় একটা বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের এত পরিশ্রম তাহা হইলে বৃথা হইয়াছে, বলিতে হইবে। তবে

কি দুষ্ট লোকের জন্যও জগৎ-সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছে? কখনই নহে; কেন না, দেবতারা পূর্ণব্রহ্ম এবং শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ বলিয়া তাঁহাদের দুষ্টতার জ্ঞানই জন্মিতে পারে না; তদ্ভিন্ন দুষ্টতার প্রশ্রয় দিলে তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই ক্রূরমতি বলিতে হইবে।

দেবতার দিক দিয়া সৃষ্টির যতগুলি সম্ভাবনা ছিল, একে একে সবই দেখা গেল; এখন জগতের দিক দিয়া দেখা যাউক, দেবতাদিগের দ্বারা সৃষ্ট ব্যাপার কতদুর সম্ভবপর। আমরা দেখিতে পাইতেছি, (অন্ততঃ পক্ষে পৃথিবী সম্বন্ধে) যে, জগৎ বিপদাপদে পরিপূর্ণ। জগতে অনিষ্টকর বস্তু কি না আছে? অনুর্ব্বরা মরুভূমি, দুর্গম পর্ব্বতমালা, মার্ত্তণ্ডতাপদগ্ধ দক্ষিণ প্রদেশ, বিষাক্ত ওষধি পূর্ণ জলাশয়, মনুষ্যের অগম্য মেরুপ্রদেশ, কণ্টকাকীর্ণ বিশাল অরণ্য, ঝটিকাবর্ত্ত, বন্যাপ্লাবন, শিলাবৃষ্টি, সিংহ-ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু, বিষধর সর্প, লোকক্ষয়কারী ব্যাধি, অকালমৃত্যু প্রভৃতি কিছুরই অভাব নাই। যে জগৎ এত বিপদ-সঙ্কুল, তাহার সৃষ্টি ও শাসন বিষয়ে দেবতাদিগের সংশ্রব থাকাই আশ্চর্য্য। সৃষ্টির সহিত দেবতাদের কোন সম্পর্কই নাই; কেবলমাত্র শূন্য বা আকাশ, পরমাণু এবং গুরুত্ব (weight), সংক্ষেপে কলকারখানায় যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন, সৃষ্টি সম্বন্ধেও সেই সকল দ্রব্য থাকিলে যথেষ্ট। উদ্দেশ্য-সাধক কারণের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের শরণাপন্ন হওয়ার আবশ্যক করে না। তবে, দেবগণের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করারও কারণ নাই। দেবতারা থাকিলেও থাকিতে পারেন; থাকিতে পারেন কেন, আছেন। পৃথিবীর সকল জাতিই দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাসপরায়ণ। কথা এই যে, এই সকল নিত্যমুক্ত পুরুষ, যাঁহাদের রাগদ্বেষাদি আসক্তির ভাব কিছুই নাই এবং মানুষের কোন দুর্ব্বলতাই যেখানে স্থান পায় না, তাঁহাদের পক্ষে জাগতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা অসম্ভব; তাঁহারা চিরশান্তিতে নিমগ্ন। সংসার হইতে বহুদূরে থাকায় মানবের দুঃখ দৈন্য বা কাতরতায় তাঁহারা বিচলিত হন না। মানব জীবনের উপরে তাঁহাদের কোন আধিপত্যও নাই। জগতে ভৌতিক, অলৌকিক এবং দেবদর্শন বলিয়া যে সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহাদের কোনটীই সত্য নহে। এবং দেবতার সহিত মানবের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না।

মৃত্যুর পর নরক যন্ত্রণা ভোগের আশঙ্কা নাই। আত্মা জড় সম্ভূত; দেহের যে দশা, আত্মারও সেই দশা ঘটে। আত্মা জড়সম্ভূত তাহার প্রমাণ এই যে, কঠিন পীড়া হইলে কিম্বা আঘাত পাইলে, মূর্চ্ছা অথবা প্রলাপের সময়, অস্ত্রচিকিৎসাকালে অজ্ঞান করিয়া রাখিলে, আমাদের সংজ্ঞা বা অনুভবশক্তি থাকে না। দেহের বিকৃতাবস্থাই এই সংজ্ঞালোপের কারণ। তদ্ব্যতীত আত্মার উন্নতি ও অবনতি দৈহিক অবস্থাভেদেরই অনুরূপ। শৈশবাবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তিগুলি কোমল এবং অপটু থাকে, যৌবনে সেগুলি পুষ্ট ও সবল হয় এবং বৃদ্ধ বয়সে তাহাদের শক্তি ক্রমশঃ লোপ পায়। শুধু তাহাই নহে, মুমূর্ষু ব্যক্তি বুঝিতে পারে না যে, তাহার আত্মা ধীরে ধীরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইতেছে এবং অবশেষে স্বীয় শক্তিগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া একেবারেই তাহাকে ছাড়িয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে, সে ইহাই বুঝিতে পারে যে, তাহার মানসিক ক্ষমতাগুলি ক্রমান্বয় হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। মৃত্যুতে যদি সংজ্ঞাই লোপ না পাইত, এবং

কোন কোন প্লেটোনিকের মতে, মৃত্যুতে যদি আত্মার মহত্তর জীবন লাভেরই সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে মানুষ মৃত্যুকে ভয় করিত না। বরং মৃত্যু সম্ভাবনায় মানুষ আনন্দবোধই করিত। বিশেষতঃ, মৃত্যুর পর আমাদের অস্তিত্ব লোপ পাইবে, এরূপ চিন্তা করিয়াই যে আমরা মৃত্যুভয়ে ভীত হই, তাহা নহে। মৃত্যুর নামে আতঙ্ক উপস্থিত হয়, তাহার কারণ, জীবন এবং মরণের ধারণায় আমরা এতই অভ্যস্ত যে, জীবনের কথা ভাবিবামাত্র মৃত্যুর কথা আপনিই আসিয়া পড়ে; তখন আমরা একপ্রকার শূন্যতা অনুভব করি; আমাদের মনে হয়, যেন মৃত ব্যক্তি বুঝিতে পারে, তাহার দেহ অগ্নিতে ভস্মীভূত হইতেছে, কীটে ভক্ষণ করিতেছে, অথবা ধীরে ধীরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে; আর, আত্মারই যেন ধ্বংস নাই, দেহ নষ্ট হইলেও আত্মা নষ্ট হয় না এবং আত্মা দেহের ধ্বংস প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু এ সকল যে সংস্কার মাত্র, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না। যদি কোন উপায়ে এই সংস্কারগুলি ত্যাগ করা যাইত, যদি জীবনের ধারণা হইতে জীবনের অভাব-জ্ঞানকে পৃথক করা যাইত, এবং নির্ভয়ে আত্মার অমরত্ব বিষয়ক সমস্ত ধারণা যদি এককালে বিসর্জ্জন দেওয়া যাইত, তাহা হইলে মৃত্যুরও কোন বিভীষিকা থাকিত না। তাহা হইলে সদর্পে আমরা বিপদের সম্মুখীন হইতে পারিতাম; বলিতে পারিতাম যে, মৃত্যু আমাদের অহিতকর নহে,—মৃত ও জীবিত কাহারও পক্ষেই নহে; কেন না, যে মৃত, দেহের সহিত তাহার সমস্ত সম্পর্কই লোপ পাইয়াছে, বোধশক্তির অভাবে মৃত্যুর ইষ্টানিষ্ট সে কিছুই বুঝিতে পারে না; আর যে জীবিত, সে ত মৃত্যুর পরের কোন খবরই রাখে না। যতক্ষণ আমরা আছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের মৃত্যু নাই; আর মরিয়া গেলে ত সবই ফুরাইবে। অতএব দেখা যাইতেছে, যে মৃত্যুর জন্য আমরা এত ভয় পাই, যে মৃত্যুর শীতল স্পর্শ, কল্পনায় অনুভব করিয়া শিহরিয়া উঠি, বাস্তবিক সে মৃত্যুতে ভয়ের কারণ নাই।

তাহাই যদি হয়, তবে মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া আমরা জীবনের চরমোদ্দেশ্যরূপ সুখ-সম্ভোগে বঞ্চিত হই কেন? সুখই পরমমঙ্গল, জীবনব্রতসাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে একটী কথা আছে। এই যে সুখ, যাহা জীবনের চরমোদ্দেশ্য, ইহা আপাতমধুর ইন্দ্রিয়বৃত্তি-জনিত সুখ নহে; এই সুখ স্থায়ী, মনের সুখ এবং সন্তোষ, যাহাতে উচ্ছৃঙ্খল জীবনের আবেগ স্পন্দন নাই। মনের সুখ কামজ সুখ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ; কেন না, মনের সুখ স্থায়ী, কামজ সুখ মুহূর্ত্তে উৎপন্ন হইয়া মুহূর্ত্তেই লয় পায়। যে কোন বিষয়েই হউক, আতিশয্য ভাল নয়; আতিশয্যের ফলে অবসাদজনিত চিরদুঃখের উদয় হয়। কতক-গুলি অনুষ্ঠান আপাততঃ কষ্টদায়ক হইলেও পরিণামে সুখকর; যেমন, অস্ত্রচিকিৎসায় বেদনা অনুভূত হইলেও, উহাতে পরিণামে স্বাস্থ্যসুখের উদয় হয় বলিয়া এরূপ কার্য্য হিতকর। জ্ঞানীগণ যে গুণ বশতঃ অনিষ্ট-কর আচরণের পরিহার দ্বারা ইষ্টসাধনে সমর্থ হন, তাহাকে ধর্ম্ম কহে। ধর্ম্ম স্বয়ং মঙ্গল স্বরূপ নহে, উহা মঙ্গল বা ইষ্টলাভের উপায় মাত্র।

এপিকিউরাসের মত জটিলতাশূন্য, রহস্য-বর্জ্জিত এবং সহজবোধ্য বলিয়া প্লেটোনিক আদর্শবাদ, অ্যারিষ্টটল-প্রবর্ত্তিত সত্তামূলক নামবাদ এবং জেনোর বৈরাগ্যদর্শন, এই তিন

মতের শত্রুস্থানীয় হইয়াছিল। ইতালীয়েরা এই মত সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ রোমান দার্শনিক সিসিরো (Cicero) খ্রীঃ পূঃ ৯০ অব্দে জেনোর সধর্ম্মী ফীড্রাসের নিকট অবগত হইয়া এই মতের সমর্থন করেন। তদ্ব্যতীত, লুক্রেশিয়াস (Lucretius Carus), টি, কেসিয়াস্ (T. Cassius), এল, টরকোয়েটস্ (L. Torquatus) টি, পম্পোনিয়াস অ্যাটিকাস (T. Pomponius Atticus), সম্রাট সিজার (Caesar), হোরেস (Horace) এবং প্লিনী (Pliny the younger) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সিজার বংশের রাজত্বকালে এপিকিউরিয়ান মত এবং বৈরাগ্যদর্শন (Stoicism) লইয়া ইতালীতে একটী দলাদলি ঘটে। রাজশাসনের বিপক্ষ, সাধারণ তন্ত্রের দল বৈরাগ্যমতাবলম্বী এবং সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষগণ ও ধনীগণ, যাঁহারা রাজছত্রের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া গুরুর উপদেশগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারাই এপিকিউরিয়ান মতের পক্ষপাতী ছিলেন। সম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় * এপিকিউরিয়ান সম্প্রদায় কর্ত্তৃক যত দেবত্ববাদের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও লয় পাইয়া যায়, এবং নবজাত বৈরাগ্যধর্ম্ম ও প্রথম যুগের রহস্যমূলক খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে।

(গ) ইচ্ছাশক্তির প্রাধান্য।

বৈরাগ্য-দর্শন (Stoicism)

জেনো (Zeno)

গ্রীক বৈরাগ্য-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা জেনো খ্রীঃ পূঃ ৩৪২ অব্দে কোন এক ফিনিসীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সাইপ্রাস দ্বীপস্থ সিটিয়াম নগর তাঁহার জন্মভূমি এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য তাঁহার জীবিকা ছিল। কথিত আছে, জাহাজডুবি হইয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং সেই হইতে তিনি দর্শনাধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন; উদাসীন সম্প্রদায়ের ক্রেটিস (Crates) মিগারাবাসী ষ্টিল্পো (Stilpo) এবং অধ্যাপক জিনো ক্রেটিস ও পোলিমো তাঁহার শিক্ষাগুরু ছিলেন। অধ্যয়ন সমাপনান্তে জেনো খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অব্দে এথেন্স নগরে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। জেনোর অসাধারণ চরিত্রবল ছিল। খ্রীঃ পূঃ আনুমানিক ২৭০ অব্দে আত্মহত্যায় তাঁহার জীবনলীলা সাঙ্গ হয়।

জেনোর পর তদীয় শিষ্য ক্লিয়াস্থিস (Cleanthes) বহুদিন যাবত বৈরাগ্য ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। গুরুর ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন না হইলেও চরিত্রবান এবং দৃঢ়চিত্ত বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। খ্রীঃ পূঃ ৩৩১ অব্দে তাঁহার জন্ম হয় এবং খ্রীঃ পূঃ ২৫১ অব্দে আশী বৎসর বয়সে, তিনি অনশনব্রত উদ্যাপন করতঃ প্রাণত্যাগ করেন।

ক্লিয়াস্থিসের মৃত্যুর পর টরসাসের ক্রিসিপাস (Chrysiphus) (খ্রীঃ পূঃ ২৮০-২১০) যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে বৈরাগ্য দর্শনের পুষ্টিসাধন ও প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি

---

* এপিকিউরাসের ধর্ম্মমত এবং তদীয় সম্প্রদায় যে সম্রাটদিগের নিকট প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছুদিন হইল এথেন্সের পূর্ত্তবিভাগ কর্ত্তৃক লাটীন ও গ্রীক ভাষায় লিখিত একখানি প্রস্তরফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রস্তরফলকখানি রোমসম্রাট হাড্রিয়ানের সময়ে (১১৭-১৩৮ খ্রীঃ অঃ) খোদিত হয়। উহা হইতে জানা যায় যে, এপিকিউরিয়ান সম্প্রদায় সম্রাটদিগের নিকট যথেষ্ট উৎসাহ পাইত এবং তাহার ফলে, খ্রীষ্টীয় কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত উক্ত সম্প্রদায়ের ক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় প্লেটোনিক, পেরিপ্যাটেটিক এবং ষ্টোয়িক সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভের বিশেষ কারণ ঘটিয়াছিল।

অসংখ্য পুস্তকের রচয়িতা। পুস্তকগুলির রচনাপদ্ধতি প্রশংসাজনক না হইলেও, উহাদের সাহায্যে জেনোর দর্শন ও ধর্ম্মমত সমূহ বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

ক্রিসিপাসের পর, তাঁহার দুই শিষ্য, টরসাসের জেনো এবং সিলিউসিয়ার ডাইওজিনিস যথাক্রমে ক্রিসিপাসের আসন গ্রহণ করেন। খ্রীঃ পূঃ ১৫৬ অব্দে এথেন্স হইতে রোমে একদল দার্শনিক, প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরিত হয়। ডাইওজিনিস ঐ দলে ছিলেন, কিন্তু ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই। এই ডাইওজিনিসের অনেক শিষ্য ছিলেন, তন্মধ্যে টরসাসের অ্যান্টিপেটার (Antipater) এথেন্স নগরে তদীয় গুরুর পদে অভিষিক্ত হন। আর্কিডিমাস (Archedemus) নামে আর এক শিষ্য ব্যাবিলনে গিয়া স্বয়ং একটী শাখা সম্প্রদায় গঠিত করিয়াছিলেন।

গ্রীক বৈরাগ্য দর্শন সম্বন্ধে খাঁটি ধারণা করিতে হইলে তিনটী বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক। ১মতঃ, এই মত কেবলমাত্র দর্শন বা নীতিশাস্ত্র নহে, পরন্তু উহাতে দর্শনাপেক্ষা ধর্ম্মতত্ত্বই অধিক পাওয়া যায়, এবং উহা লৌকিক বহু দেবত্ববাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। ২য়তঃ, এই মতের প্রতিষ্ঠাতা এবং গোঁড়াগণের সহিত, এশিয়ার প্রাচীন সিমাইট জাতি, অথবা রোমীয়দিগের আধিপত্য কালে ইতালীয়দিগের বংশগত সম্বন্ধ ছিল। ৩য়তঃ, এই ধর্ম্ম বা ধর্ম্মমূলক দর্শন, কেবলমাত্র একজন লোকের দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই, পরন্তু উহার তত্ত্বগুলি বিভিন্ন দেশ হইতে নদী স্রোতের ন্যায়, একত্র মিলিত হইয়াছিল। এই জন্যই আধ্যাত্মিকতায় উহার প্রবল গোঁড়ামি এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রচুর আধিপত্য দৃষ্ট হয়। উহার আর একটী বিশেষত্ব এই যে, উহাতে কল্পনা অপেক্ষা সাধনা অধিক স্থান পাইয়াছে এবং সর্ব্বধর্ম্মের সার সংগ্রহ দ্বারা পুষ্টিলাভ করাই যেন উহার উদ্দেশ্য ছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীদিগ্বিজয় রায়চৌধুরী।

ইতিহাসে অসত্যের প্রচার।

"যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যতৃণ বদগ্রাহ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা।"

যশোহর-সাহিত্য-সম্মিলনে ইতিহাস বিভাগে যশোহরের ইতিহাস বিষয়ে একটী বিষয়ের মীমাংসা হওয়া অতীব আবশ্যক। যশোহর জেলার ইতিহাস সম্পর্কে সমগ্র মাহিষ্য সমাজে বিষম ক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে। তথা-কথিত ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, তাঁহারা কোন জড়তত্ত্ব লিখিতেছেন। জড়পদার্থের প্রতি গালিবর্ষণ কর, নিন্দা কর, অবিচার কর, জড় জড়ই থাকিবে। কিন্তু মনে রাখা উচিত, ২৯ লক্ষ মাহিষ্যের সমাজ জড় পদার্থ নহে। এই সমাজেও ঘৃণা, দ্বেষ, মান, অভিমান, প্রতিহিংসা, আত্মসম্মান প্রভৃতি মানবোচিত সমস্ত গুণই আছে। যদি ইতিহাসের নাম দিয়া এই জাতির সম্মান হানি ও কুৎসা প্রচার করা বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের অনুমোদিত হয়, তবে অবিলম্বে সাহিত্যের আখড়ায় কবির খেউড় অভিনীত হইবে। আঘাতপ্রাপ্ত কালকেউরেরও ফণা

উত্তোলন পূর্ব্বক প্রহারককে দংশন করা অন্যায় হইবে না। তখন সেই বিষ জ্বালায় অনেককেই কষ্ট অনুভব করিতে হইবে। তাই ভবিষ্যৎ অশান্তি নিবারণ জন্য আমরা সাহিত্যিকগণের নিকট বিচারপ্রার্থী হইতেছি। সর্ব্বাগ্রে যশোহর ও খুলনার ইতিহাসের প্রতিই আমাদের অভিযোগ। কারণ সেইখানি ইতিহাস বলিয়া প্রচারিত; উপন্যাস বা খোষগল্প নহে। মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত-জাতি সম্বন্ধে যশোহর ও খুলনার ইতিহাসে যে সকল অনৈতিহাসিক অসত্য প্রচার করা হইয়াছে, আমরা ক্রমে তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

আমরা কোন ইংরাজ-সম্পাদকের লেখায় পাঠ করিয়াছিলাম "মিথ্যা উক্তিকে এক ঘণ্টা অবাধে প্রচারিত হইতে দেও, উহার লাগ পাইতে একমাস লাগিবে।" এই উক্তিটী অভ্রান্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বঙ্গীয় চির-বিশুদ্ধ কৈবর্ত্ত জাতির বিরুদ্ধে এতাবৎ বল্লাল-চরিত নামক কল্পিত উপন্যাসের গল্প শাখা পল্লবে বিস্তার লাভ করিয়া গল্পে গল্পে একের মুখ হইতে অন্যের মুখে নীত হইয়া "কৈবর্ত্তের অনাচরণীয়তা" রূপ প্রবাদের সৃষ্টি করিয়াছে। এই জনশ্রুতি কল্পিত উপন্যাসমূলক। জনশ্রুতি-গুলির মধ্যে কোনটী বা কল্পিত উপন্যাসের সূতিকাগৃহ হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ক্রমে বিপুলকায় হইয়া পড়ে। কোনটী বা উদ্দাম গল্পপ্রিয় লোকের মুখগহ্বর হইতে জন্মিয়া দিগন্তব্যাপী হইয়া পড়ে। কোনটী বা ইতিহাসের ছায়া পল্লবিত করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়। বর্দ্ধমান রাজবাটীর বিদ্যাসুন্দরের ঘটনার জনশ্রুতি, অন্নদামঙ্গলের অন্তর্গত বিদ্যাসুন্দর পুস্তকের কাল্পনিক গল্প হইতে জন্মিয়া সমগ্র বঙ্গবাসীর হৃদয় অধিকার করিয়াছে। এই রূপ হ্যালির ধূমকেতুর ফকির হইবার প্রবাদ, প্লেগের টীকা দিবার সময়ের প্রবাদ, ব্রহ্মপুত্র নদের ঔরসে বল্লাল সেনের জন্ম-প্রবাদ, রাম রাবণের যুদ্ধের অবসানে ইংরাজের উৎপত্তি প্রবাদ প্রভৃতি শত শত প্রাচীন ও আধুনিক প্রবাদের মূল অনুসন্ধান করিলে ঐ সকল প্রবাদের অসত্যতা প্রমাণিত হইবে। এতদিন শুনিয়া আসিতেছিলাম—বগুড়া জেলার ভীমের জাঙ্গাল মধ্যম পাণ্ডবের ব্রহ্মপুত্র স্নানের পথ। ভাগ্যে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি জন্ম লাভ করিয়াছিল, ভাগ্যে শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে "রামচরিত" আবিষ্কার করিলেন, অমনি প্রকৃত সত্য বাহির হইয়া পড়িল; উহা মধ্যম পাণ্ডবের জাঙ্গাল নহে, উহা কৈবর্ত্ত-রাজ ভীমের মৃত্ প্রাচীর। সুতরাং প্রবাদ পাইলেই তাহার মূলে ঐতিহাসিক সত্য আছে, ধারণা করা ঐতিহাসিকের পক্ষে শোভনীয় নয়।

আমরা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বিপুলকায় যশোহর ও খুলনার ইতিহাসে "বল্লাল কর্ত্তৃক কৈবর্ত্ত জাতির উন্নয়ন" প্রবাদ উদ্ধৃত ও সমর্থিত হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। প্রকৃত ঐতিহাসিক নিরপেক্ষ বিচারকের ন্যায় কোন কথার স্বপক্ষে বিপক্ষে বাদানুবাদ, জেরা প্রভৃতি শুনিয়া পরে নিজের বিচারফল লিখিয়া সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তাহার কিছুই হয় নাই। পূজনীয় ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় গৌড় রাজমালার ভূমিকায় যথার্থই লিখিয়াছেন যে, "জাতি বিশেষের প্রতি আমাদের বদ্ধমূল অনুরাগ বা বিরাগ প্রকৃত ইতিহাস হইতে আমাদিগকে দূরে রাখিয়াছে।" কৈবর্ত্ত জাতির প্রতি একটী বদ্ধমূল ধারণা লইয়া ইতিহাস লিখিতে যাওয়ার

মিত্র মহাশয়কেও ইতিহাস হইতে দূরবর্ত্তী হইতে হইয়াছে।

যদিও উপন্যাস-জাত মিথ্যা জনশ্রুতি সমাজে প্রসার লাভ করিয়াছে এবং অবাধে মিথ্যা প্রচার হইতে দেওয়ায় তাহার লাগ পাইতে কিছু বিলম্ব হইবে, তথাপি আশা করি, তাহাকে নিশ্চয়ই ধরিতে পারিব।

যদি সতীশ বাবু ১৩১৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসের "নব্যভারতে" মল্লিখিত "সূর্য্যদ্বীপ ও সূর্য্যমাঝি" প্রবন্ধ পাঠ করিতেন, তাহা হইলে কখন তিনি ঐ ভাবে প্রবাদ সমর্থন করিয়া বঙ্গের একটী গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনঃক্ষোভের কারণ হইতেন না। সতীশ বাবু নিজের উদ্ধৃত প্রবাদের সমর্থনের জন্য ১৩১৯ সালের 'আর্য্যাবর্ত্ত' পত্রিকায় "মহেশপুরের সূর্য্যরাজা" প্রবন্ধ প্রমাণ ক্ষেত্রে উপস্থিত করিয়াছেন। যথা সময়ে 'আর্য্যাবর্ত্ত' পত্রিকায় উক্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদ প্রেরিত হইয়াছিল। 'আর্য্যাবর্ত্ত' সম্পাদক মহাশয় কি জানি কি কারণে ঐ প্রতিবাদ নিজ কাগজে প্রকাশ করেন নাই। 'আর্য্যাবর্ত্ত' সম্পাদক মহাশয় যদি ঐ প্রতিবাদ প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে সতীশ বাবু কখন 'আর্য্যাবর্ত্তে' লিখিত প্রবন্ধ প্রমাণস্বরূপে ব্যবহার করিতে পারিতেন না।

সতীশবাবু যশোহর ও খুলনার ইতিহাসের ১৩৬ পৃষ্ঠায় সূর্য্যদ্বীপের বিবৃতিস্থলে লিখিয়াছেন, —"মহারাজ বল্লাল সেন একটী অদ্ভুত কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ নামক একজন কৈবর্ত্ত ধীবরকে যোগীন্দ্রদ্বীপের যে অংশ দান করিয়াছিলেন, তাহাই সূর্য্যদ্বীপ হয়; এখন কিন্তু বিপরীত হইয়াছে। সমগ্র দ্বীপটীকে সূর্য্যদ্বীপ বলা হয় এবং উহা তিন অংশে বিভক্ত। যথা—যোগীন্দ্রদ্বীপ, লাটদ্বীপ ও কঙ্কদ্বীপ।" সমগ্র দ্বীপের নামই পুরাকালে সূর্য্যদ্বীপ ছিল। যেমন নবদ্বীপ, চক্রদ্বীপ, চন্দ্রদ্বীপ, তেমনি সূর্য্যদ্বীপ। পরবর্ত্তীকালেই যোগীন্দ্রদ্বীপ সূর্য্যদ্বীপ আখ্যা লাভ করে।

প্রমাণ—এড়ুমিশ্র মহাশয় লিখিয়াছেন—

> সূর্য্যদ্বীপস্ত্রিভির্ভাগৈঃ সরিদ্ভ্যো বিভজ্যতে।
> তে লাটকঙ্কযোগীন্দ্রা ভৈরবেচ্ছাদি যোগতঃ॥
> যোগীন্দ্রো ধীবরপ্রাপ্তো লাটো দাসস্য রাজ্যকম্
> কঙ্কস্থ পূর্ব্বসীমায়াং চিত্রা যত্র বিরাজতে॥

এড়ুমিশ্র সম্বন্ধনির্ণয় ৪র্থ সংস্করণ ১১৭ পৃষ্ঠা।

এড়ুমিশ্র মহাশয় বলিতেছেন, সূর্য্যদ্বীপ ভৈরব, ইছামতী প্রভৃতি নদীর দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত,—লাটদ্বীপ, কঙ্কদ্বীপ, যোগীন্দ্রদ্বীপ। তন্মধ্যে যোগীন্দ্রদ্বীপ ধীবর পুরস্কার পাইয়াছিল। লাটদ্বীপ দাসের একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। আর পূর্ব্বসীমাতে দাসের আর একটী রাজ্য ছিল, তাহার নাম কঙ্কদ্বীপ। এই স্বনামখ্যাত দাস জাতিকে সকলেই জানেন। ইঁহারাই মাহিষ্য কৈবর্ত্ত। ফুলো পঞ্চাননও লিখিয়াছেন—

> সূর্য্যদ্বীপ জালিক সূর্য্যের পুরস্কার।
> যারা লক্ষ্মণে আনে অনুদিত ভাস্কর॥
> সূর্য্যদ্বীপের কিছু অংশ হালিক রাজ্যে খ্যাত।
> অন্য অংশ লাট আর কঙ্কদ্বীপে বিধৃত॥

এখানে ফুলো যোগীন্দ্র-দ্বীপকেই সূর্য্যদ্বীপ নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৃহৎ সূর্য্যদ্বীপ এক সময়ে ক্ষুদ্রতম গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এই যোগীন্দ্রদ্বীপ জালিকের পুরস্কার। আর প্রাচীন সূর্য্যদ্বীপের অংশ লাটদ্বীপ ও কঙ্কদ্বীপ হালিকের রাজ্য বলিয়া ফুলো বর্ণন করিয়াছেন। সূর্য্যদ্বীপ ওরফে যোগীন্দ্রদ্বীপেরও কিয়দংশ হালিকের রাজ্য ছিল। ইহাতে বোধ হয় সূর্য্যমাঝি সমগ্র যোগীন্দ্রদ্বীপও জায়গির বা পুরস্কার পায় নাই। যোগীন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত যোগিনীদহ বা মহেশপুরই প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এই লাটরাজ্য ও কঙ্করাজ্যের ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই দুই রাজার ক্ষমতা, বল্লালসহ প্রতিযোগিতা প্রভৃতি কথা ময়মনসিংহের ভূতপূর্ব্ব উকীল স্বর্গীয় যাদবচন্দ্র লাহিড়ী B.L. মহাশয় তদীয় কুলকালিমা গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। এবং বল্লালের কূট-নীতিতেই বিক্রমপুরে হালিকদাসগণ অপদস্থ হইয়াছেন। * বিক্রমপুর রাজা বল্লাল সেনের রাজধানীর পরিচোবর্ত্তী স্থান। এই স্থানেই তাঁহার কুটনীতি কার্য্যকরী হইয়াছিল। দূরবর্ত্তী স্থানে তিনি কৈবর্ত্তের কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারেন নাই। এইজন্যই মেদিনীপুর, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, বগুড়া, পূর্ণিয়া, নদীয়া, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, পাবনা, রাজসাহী, রংপুর প্রভৃতি স্থানে কৈবর্ত্তগণ আচরণীয়ই আছেন। ঢাকা বিক্রমপুরে হালিকদাসের অনাচরণীয়তা যেন রাজভয়-সঞ্জাত। কারণ সকলেই ঐ অঞ্চলের হালিকদাসের জলপান করে, অথচ প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে চায় না। আবার ঢাকা বিক্রমপুর পার হইয়া শিলেটে গেলেই দাসগণ নির্ব্বিবাদে কায়স্থ তুল্য আচরণীয় জাতি। মাঝখানে বিক্রমপুরের দাসের অর্দ্ধ অচলতা কেবল রাজ-অত্যাচারের ফলমাত্র।

মালোজাতীয় সূর্য্যমাঝি বল্লালের নৌকা ঠেলিয়া রাজ্যের মুখ দেখিয়াছিল, কিন্তু মাহিষ্য জাতি তরবারির জোরে বল্লালের বহু পূর্ব্বে, আদিশূরের ও পূর্ব্বে বঙ্গে ও মগধে বহু রাজ্য স্থাপন করিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবে রাজ্যশাসন করিয়া আসিয়াছেন।

এক মেদিনীপুর জেলাতেই তমলুক, সুজা-মুঠা, কুতুবপুর, তুর্কা, এই পাঁচটী স্বাধীন রাজ্য ছিল। ইহাঁদের রাজ্যকাল আদিশূরের বহু পূর্ব্ব হইতেই মীমাংসিত হইয়াছে। (মাহিষ্য-বিবৃতি ৪র্থ, ৩য়, ২য় সংস্করণ দ্রষ্টব্য) তৎপরে ঢাকা জেলার সাভারের পালরাজগণও মাহিষ্য। তাঁহাদের বংশধরগণ এখন ঐ জেলার কোণ্ডা, গাব্দিরা, ভাকুর্ত্তা প্রভৃতি গ্রামে সসম্মানে বাস করিতেছেন। সাভারের সেই বিশাল রাজপুরীর ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তদ্ব্যতীত ময়মনসিংহের রাজা নবরঙ্গ-প্রতিষ্ঠিত ভোগবেতাল রাজ্য, শ্রীহট্টের কতিপয় রাজ্য এই জাতির প্রাচীন আধিপত্যের সাক্ষী স্বরূপ বিরাজমান আছে। অদ্যাপি মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমলুকের রাজবংশ, ময়নাগড়ের রাজবংশ, তুর্কার গজপতিবংশ, স্বীয় স্বীয় গড়ে সামান্য সামান্য জমীদারী শাসন করিতেছেন। তমলুক রাজের সেই বহু দেবসেবা, সেই দিগ্‌দাহকারী অনলবর্ষী ভীষণ কামানসমূহ আজিও তাঁহাদের পূর্ব্বস্বাধীনতার অক্ষয় প্রমাণরূপে দণ্ডায়মান আছে। পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অধ্যবসায়ে নেপাল হইতে যে রামচরিত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও লিখিত আছে, কৈবর্ত্তরাজ দিব্যক স্বীয় ভুজবলে মাৎস্য ন্যায় দূরীভূত করিবার জন্য ভীষণ যুদ্ধে অত্যাচারী রাজা দ্বিতীয় মহীপালের শিরশ্ছেদন করিয়া সমগ্র বরেন্দ্র ভূমি করতলগত করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা রুদ্রক ও রুদ্রকপুত্র মহারাজ ভীম অতীব মহত্বের সহিত বরেন্দ্রভূমি শাসন করিয়াছিলেন। পরে ভারতীয় চতুর্দ্দশ রাজার সমবেত চেষ্টায় ভীম ২য় অভিমন্যুর ন্যায় রাজ্য ও প্রাণ হারাণ। অদ্যাপি মহারাজ ভীমের জাঙ্গাল, তাঁহার রাজধানীর ভগ্নাবশেষ বগুড়া ও দিনাজপুর জেলায় বিদ্যমান আছে। বঙ্গের ক্রমওয়েল দিব্যক ২য় মহীপালকে পরা-

* কুলকালিমা ২য় সংস্করণ ৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জিত করিয়া দিনাজপুর জেলাতে একটী দীঘীতে যে মনুমেণ্ট বা কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করেন, এখনও তাহা বিরাজমান। গৌড়রাজ মালা-গ্রন্থে উহার চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। দিব্যের ঐ দীঘিকে স্থানীয় লোকে "দিবার" বা দিব্যোর দীঘী বলে। ২য় মহীপালের ধ্বংস-কারক জননায়ক কৈবর্ত্তরাজকে গৌড়রাজ-মালা গ্রন্থে দিব্যক বলা হইয়াছে। কিন্তু "কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও ভোজের নবাবিস্কৃত তাম্রশাসন" প্রবন্ধে প্রথম সংখ্যা "ভারতবর্ষে" প্রাচ্যবিদ্যার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ৭০০ বৎসরের প্রাচীন কুলজী হইতে কতিপয় শ্লোকের অনুবাদ দিয়াছেন—

"শান্তনু হইতে গাঙ্গেয় (ভীষ্মের) ন্যায় জাতবর্ম্মা জাত হন। দয়াই যাঁহার ব্রত, রাই যাঁহার ক্রীড়া, ত্যাগই যাঁহার মহোৎসব, বেণ নন্দন পৃথুর শ্রীকে গ্রহণ করিয়া, কামরূপ শ্রীকে পরাভব করিয়া দিব্যের ভুজশ্রীকে নিন্দা করিয়া, গোবর্দ্ধনের শ্রীকে বিফল করিয়া শ্রীকে আত্মসাৎ করিয়া যিনি সার্ব্বভৌম রাজা হইয়াছিলেন।"

এই কুলজী বচনে "দিব্য" যে অসাধারণ ভুজবলসম্পন্ন বীরপুরুষ ছিলেন, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

পুনশ্চ মদন পালের তাম্রশাসনে আছে—

"এতত্রাপি সহোদরো নরপতিদিব্য প্রজা-নির্ভর ক্ষোভ ক্ষুভ বিধুত বাসবধৃতিঃ শ্রীরাম-পালোঽভবৎ।"

অর্থাৎ (দিব্য প্রজার) দেবলোকবাসি-গণের (অসুরাক্রমণ-সঞ্জাত) চিত্তচাঞ্চল্যে আহত হইয়া আন্দোলিতচিত্ত দেবরাজ (বাসব) যেমন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন, এই নর-পতির সহোদর শ্রীরামপাল নামক নরপতিও সেইরূপ (দিব্যপ্রজার) দিব্য নামক কৈবর্ত্ত-পতির পক্ষভুক্ত প্রজাবৃন্দের অতিশয় আক্রমণে আহত ও আন্দোলিত-চিত্ত হইয়াও ধৈর্য্যা-বলম্বন করিয়াছিলেন।

উদ্ধৃত তাম্রশাসন দৃষ্টে জানা যাইতেছে, কৈবর্ত্ত নরপতির নাম "দিব্য" চলিত ভাষায় দিব্বো। এই দিব্যের নামানুসারে তাঁহার খনিত দীঘির নাম দিব্য'র বা দিব্বোর দীঘী হইয়াছে। কয়েকজন তথাকথিত ঐতিহাসিক ঐ দীঘীকে ধীবর দীঘী লিখিয়া ঐতিহাসিক ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া উদোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে চাপাইয়াছেন।

যাহা হউক, এই বরেন্দ্র রাষ্ট্রবিপ্লব বল্লালের বহু পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল। এ অবস্থায় বিরূপে স্বীকার করি যে, বল্লালের অনুগ্রহেই মাহিষ্য কৈবর্ত্ত রাজ্যের মুখ দেখিয়াছে। বল্লালের বহু পূর্ব্বে ইহাঁরা বাঙ্গলার বহুস্থানের রাজা। তাই পূজনীয় পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিয়াছেন ;—"ইহাঁদের (মাহিষ্য কৈবর্ত্তগণের) মধ্যে অনেকেই আদিশূরের রাজত্বের পূর্ব্বেও ভূম্যধিকারী বলিয়া বিশেষ পরিচিত। হালিক কৈবর্ত্ত-গণের মধ্যে সামন্ত, ভূঁয়ে (ভূমিপ), মাইতি (মহান্ত) প্রভৃতি সম্মানাস্পদীভূত উপাধি আছে।" সম্বন্ধনির্ণয়ের পরিশিষ্ট ৬৯৫ পৃষ্ঠা।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন "আদিশূরের বহুপূর্ব্ব হইতেই তাহারা (কৈবর্ত্তেরা) মেদিনীপুর অঞ্চলে রাজ্য করিতেছেন।" ইহা ছাড়া মহাত্মা বেইলী, হাণ্টার, উড়িষ্যার কমিশনারের রিপোর্ট প্রভৃতিতেও এই জাতির প্রাচীন আধিপত্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

এক্ষণে আমরা সতীশবাবুর অন্য উক্তি, বল্লালের অনুগ্রহেই ধীবরগণ হালিক ও জলা-চরণীয় হইয়াছেন, এই কথার বিচার করিব।

বল্লালের কোন অনাচরণীয় জাতির – আচরণীয় করা অসম্ভব। বঙ্গের নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণগণ রাজার এত ধামাধরা ছিলেন না যে, তাঁহার কথামত জাতিধর্ম্ম খোয়াইয়া অন্ত্যজ জাতির জলপান করিবেন। হিন্দুরাজা হিন্দু সমাজের রাজা নহেন। হিন্দু সমাজের প্রকৃত রাজা ব্রাহ্মণ। রাজার কথায় ব্রাহ্মণগণ অধর্ম্মজনক, জাতিধ্বংসকর কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইতে পারেন না। ব্রাহ্মণের নিকট হিন্দু রাজা চিরকালই অবনত-মস্তক। তাঁহার জাতিধর্ম্মের উপর রাজার কোন হাত নাই। রাজা ব্রাহ্মণের অপ্রিয় কার্য্য করিলে ব্রাহ্মণগণ সেই রাজার বাড়ীতে আহারাদি করিতেন না। বরং অভিশাপ দিয়া অমঙ্গলাদি করিতেন। এই প্রকার ব্রাহ্মণের শক্তি এখনও যেমন আছে, পূর্ব্বেও সেইরূপ ছিল। এ অবস্থায় রাজাজ্ঞায় ব্রাহ্মণ-সমাজে অনাচরণীয় জাতির জলাচরণ উদ্দাম কল্পনামাত্র। যদি বল্লালের এইরূপ ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে সং ব্রাহ্মণগণ তাঁহার চণ্ডালী উপপত্নী গ্রহণে তাঁহার পৌরোহিত্য পরিত্যাগ করিতেন না। যিনি অন্ত্যজ সংস্রবে নিজের জাতি রাখিতে পারিলেন না, তিনি অন্ত্যজের জল ব্রাহ্মণ সমাজে চালাইলেন! ইহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য।

চণ্ডালী উপপত্নী গ্রহণে লক্ষ্মণ সেন যেমন তাঁহার পিতাকে "পতিতং পিতরং ত্যজেৎ" যুক্তি দেখাইয়া তাঁহার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ব্রাহ্মণগণও তাঁহার পৌরোহিত্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। বল্লাল-পৌত্র মাধব সেনের সভায় বসিয়া এ বিষয়ে নির্ভীক ব্রাহ্মণগণ যে অপ্রিয় সত্য বলিয়াছিলেন, তাহাতেই আমাদের উক্তি সমর্থিত হইবে। মাধব সেন সভাস্থ ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যথা—

একদিন রাজা জিজ্ঞাসিলেন পঞ্চগোত্রিয়ে।
মহাবংশ কুলীন আদি সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ে॥
কহ সভাসদ আছ যতেক পণ্ডিত।
কি হেতু ত্যজিলে বৈদ্যে ছিলে পুরোহিত॥

তখন—

উত্তরিল মহেশ আদি যতেক সুকৃতি।

উত্তর—

বল্লাল লয় যদা পদ্মিনী জাতিহীনা।
লক্ষ্মণ কহে দ্বিজে এ প্রথা ত দেখি না॥
তাই বল্লাল ত্যজে কুপুত্র বলি সুতে।
লক্ষ্মণ ত্যজে পৈতা বৈদ্যকুল রক্ষিতে॥
এতে উভয় পক্ষের বৈদ্য পতিত ব্রাত্য।
ক্রমশঃ বৃষলেগণ্য অত্রত্য তত্রত্য॥
তাই কানকুব্জী বৈদ্যে যাজন না করে।

* * * *

সবন্ধু বল্লাল পতিত বৃষলেগণ্য।
বৈদ্যকুল পৈতা ত্যজি শূদ্রবৎ অধন্য॥

অতএব—

সংশ্রোত্রিয়ে আর যে কুলীন তনয়ে।
যাজন ত্যজে রাজার শূদ্র বলে ভয়ে॥

সম্বন্ধনির্ণয় ৩য় সংস্করণ।
৭৩৪।৩৫ ৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অন্য কথা সতীশবাবু নিজে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার কথার তাঁহার অজ্ঞাতসারেই প্রতিবাদ হইয়া গিয়াছে। খুলনা ও যশোহরের ইতিহাসের ২৫২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে ;—

'কৈবর্ত্তদিগের মধ্যে যাহারা মৎস্য-ব্যবসায়ী থাকিল, তাহাদিগের জল অস্পৃশ্য। উহারা আবার চণ্ডাল জাতীয় মৎস্য-ব্যবসায়ী হইতে পৃথক হইয়া আপনাদিগকে মালো বলিয়া পরিচয় দেয়।"

পাঠকগণ ধীরভাবে এই কয়টী কথার বিচার করুন। যাহারা আপনাদিগকে মালো

বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা যে কৈবর্ত্ত জাতি ছিল, তাহার প্রমাণ কি? বঙ্গদেশে কৈবর্ত্ত যেমন একটী গরিষ্ঠ সম্প্রদায়, মালো জাতিও সেইরূপ সংখ্যা-বহুল। মালো ও রাজবংশী, দুইটীই বঙ্গের প্রসিদ্ধ মৎস্যব্যবসায়ী। পাবনা, ফরিদপুর, ঢাকা, নদীয়া, যশোহর, খুলনা প্রভৃতি বহুস্থানে বহু মালোর বাস। যদি তাহারা আদিতে কৈবর্ত্ত জাতি হইত, তবে তাহাদের সেই গৌরবান্বিত নাম ত্যাগ করিবার কারণ কি? মালো ও কৈবর্ত্ত যে সম্পূর্ণ পৃথক জাতি, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত ও সর্ব্বজনবিদিত।

আমরা মহেশপুরে স্বয়ং যাইয়া অনুসন্ধান করিয়াছি। মহেশপুরের সংলগ্ন পাড়া জলীলপুর গ্রামে এখনও বহু মালোর বাস আছে। তন্মধ্যে সূর্য্যমাঝির অধস্তন পঞ্চমপুরুষ সুলতান মাঝির শালিপতির বংশধরগণ এখনও ঐ গ্রামে বাস করিতেছে। এখনও ঐ বংশের পঞ্চ পাড়ুই জীবিত আছে। তাহারা মালো জাতীয়। উক্ত স্থানের মালোগণ তাহাদের জাতীয় রাজা মহেশপুরে রাজত্ব করিতেন, এই কথাই বলিয়া থাকে। কেবল মহেশপুরে নহে, নদীয়ার অন্তর্গত আন্দুলবেড়িয়া অঞ্চলে বহু মালোর বাস আছে। সকলেই মহেশপুরে তাহাদের স্বজাতি রাজা ছিল, এই কথা বলে। তাহারা কৈবর্ত্তের স্বজাতি একথা বলে না। কৈবর্ত্তগণও মহেশপুরের রাজাকে স্বজাতি বলিয়া জানেন না। এ অবস্থায় সতীশবাবু কিরূপে স্থির করিলেন যে, মালোগণ কৈবর্ত্তের স্বজাতি ছিল?

পক্ষান্তরে ঐ মহেশপুরে সম্ভ্রান্ত মাহিষ্য কৈবর্ত্তেরও বাস আছে। হরিনাথ মজুমদার মহেশপুরের একজন শিক্ষিত মাহিষ্য। তিনি স্থানীয় উচ্চ শ্রেণীর স্কুলের শিক্ষক। আমরা তাঁহার সহিত বহু অনুসন্ধানেও কোথাও শুনিলাম না যে, মালোগণ কৈবর্ত্তের স্বজাতি। এরূপ প্রবাদও কেহ কোন দিন শুনে নাই।

মালো সূর্য্য মাঝির যদি হালিক কৈবর্ত্ত হওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণই সর্ব্বাগ্রে জলাচরণীয় কৈবর্ত্ত জাতি হইত। সূর্য্য মাঝির আত্মীয়গণ অনাচরণীয় মালো জাতিই থাকিয়া গেল, আর দূরবর্ত্তী স্থানের মালোগণ আচরণীয় কৈবর্ত্ত জাতি হইয়া গেল, এ মীমাংসা মন্দ নয়!

যদি মালোগণকে কখন বল্লাল জলচলের অভয় দিয়া থাকেন, তবে তাহা বাক্য মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কার্য্যে কখন পরিণত হয় নাই। তিনি যেমন পদ্মিনী স্ত্রী গ্রহণ সময়ে "স্ত্রীরত্ন দুস্কুলাদপি" শাস্ত্রবাক্য দেখাইয়া চণ্ডালী পত্নী গ্রহণ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, সমাজে কখন তাহা চলে নাই, তদ্রূপ মালোর জলচলের কথা প্রকাশ করিলেও সমাজে তাহা কখন চলে নাই। মালোগণ পূর্ব্বেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। ইহাকেই বলে "উদোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে"।

ভাগ্যে মহেশপুরে অদ্যাপি মালো জাতীয় জেলে রাজার স্বজাতি ও আত্মীয়গণ বিদ্যমান আছে, তাহাতেই কৈবর্ত্তের জলাচরণীয়তা প্রবাদের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। এবং চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতেছে। ঐ মালো জাতীয়গণ ঐ গ্রামে না থাকিলে বিরুদ্ধবাদীগণকে আমরা কিছুতেই নিরস্ত করিতে পারিতাম না। প্রবাদের বিষয়ীভূত মালোজাতির অস্তিত্ব সপ্রমাণ হওয়ায় হালিক ও জালিক কৈবর্ত্ত উভয়ই প্রবাদ হইতে মুক্ত হইলেন।

সামাজিক ইতিহাস লিখিতে হইলে পুরাণ, স্মৃতি, প্রভৃতির জাতিতত্ত্বের অনু

থাকাও আবশ্যক। নতুবা পদে পদে ভ্রান্তি ঘটাও সম্ভব। মালো ও কৈবর্ত্ত দুইটী পৃথক জাতি। তাহা শাস্ত্র ও ব্যবহারে প্রত্যক্ষ রহিয়াছে। সতীশ বাবু এই মীমাংসিত বিষয়ের বিপরীত অর্থ করিতেছেন, বড়ই দুঃখের বিষয়।

পূর্ব্ববঙ্গে বিস্তর মালোর বাস আছে। ইহারা আপনাদিগকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে প্রয়াসী। মনুর লিখিত—

ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবীরেবচ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এবচ॥

শ্লোকমতে ইহারা আপনাদিগকে সংস্কারচ্যুত ক্ষত্রিয় বলে। ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত "ঝালো মালো বান্ধব" পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

মালো জাতির চিরন্তন উপাধি ও মাহিষ্য জাতির আবহমান-কাল-প্রচলিত উপাধিতেও উভয়ে যে পৃথক জাতি, তাহা প্রতিপন্ন হয়। মালোর উপাধি মাঝি, হলদার, পাড়ুই প্রভৃতি। আর মাহিষ্য কৈবর্ত্তের এতদ্দেশের উপাধি রায়, চৌধুরী, মজুমদার, ভুঁঞা (ভৌমিক) নস্কর, দাস, মণ্ডল, প্রামাণিক, জোয়ার্দ্দার, সরকার, বিশ্বাস, সিংহ, সিকদার ইত্যাদি। হাওড়া মেদিনীপুর অঞ্চলের মাহিষ্যের উপাধি মাইতি (মহান্ত), জানা, হাজরা, সাঁতরা, দেশমুখ, সেনাপতি, হাতী, বাঘ, সিংহ, পট্ট নায়ক, পুরকাইত (পুরকায়স্থ), আদক (আর্দ্ধক), রণঝম্প, (সুজামুঠার রাজার উপাধি), বাহু বলীন্দ্র (ময়নাগড় রাজার উপাধি), গজপতি বা গজেন্দ্র (তুকা রাজের উপাধি), পাত্র, মহাপাত্র প্রভৃতি। এই সকল উপাধি-পার্থক্যই এই উভয় জাতির পার্থক্য সূচিত হইতেছে।

রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্নেলের ৯ম খণ্ডে (১৮৭৭—১৮৮৫) যবদ্বীপের বিবরণ দৃষ্টে জানা যায়, মাহিষ্য জাতিই কৈবর্ত্ত নামে পরিচিত। ঐ স্থানে লিখিত আছে, যাবাদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান হিন্দু রাজ্যে ক্ষত্রিয়ের সংখ্যা অধিক ছিল না। কৈ'বো (কৈবর্ত্ত) অর্থাৎ শক্তিতে মহিষ সদৃশ ছিল। * প্রাচ্যবিদ্যার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "মহিষ" কে মাহিষ্য লিখিয়াছেন। কিন্তু ঐ স্থানেই মহিষের নামান্তর কৈবো বা কৈবর্ত্ত নাম লিখিত আছে। সুদূর যবদ্বীপে যখন পুরাকাল হইতে মাহিষ্যের "কৈবো" বা কৈবর্ত্ত নাম প্রচলিত আছে, তখন কৈবর্ত্তের মাহিষ্যত্বে আর কোন সন্দেহ নাই। ভারত সাগরময় যে জাতির আধিপত্য ছিল, বঙ্গদেশে যাহাদের বহুরাজ্য ছিল, যাহাদের পূর্ব্ব ক্ষমতার পরিচয় স্বরূপ এখনও বহু রাজবংশ বিদ্যমান আছে। এক সময়ে যাহাদের শাসন-পতাকা তলে সর্ব্ব জাতি শাসিত হইত, সেই জাতি বল্লালের অনুগ্রহে উন্নীত হয় নাই, বরং অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

যশোহর খুলনার ইতিহাসের ২১৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—

১। "পতত্যবিরত বারি নৃত্যন্তি শিখিনোমুদা।
অদ্য কান্তঃ কৃতান্তো বা দুঃখস্যান্তং করিষ্যতি॥

এই বিরহ শ্লোক লক্ষ্মণ পত্নীর রচিত নহে। ইহা সুকবির উদ্ভট আদিরস-ঘটিত বিরহ শ্লোক। বারি বর্ষণ, ময়ূর নৃত্য, আদিরসের আবলম্বন ও উদ্দীপন বিভাব। ইহা কাব্য শাস্ত্রের সুনিয়মে রচিত। তৎপরে—

২। সপ্তম্ দশমম্ ধ্বজা গতিনা সন্তাপিতা নির্জ্জনে।
তুর্য্যং দ্বাদশবৎ দ্বিতীয় মতিমন্নেকাদশাভ স্তনী॥

* The largest kingdom in Jaba did not contain many Xatrayes; they are called "*Mohisya or K'bo*" (*Buffalo to indicate their strength.*)

সাষষ্ঠী নৃপপঞ্চমস্য নবমীচ্চ সপ্তমী বর্জ্জিতা
প্রাপ্নোত্যষ্টম বেদনাঃ প্রথম হে তুর্গং
তৃতীয়োভব।

এই সাঙ্কেতিক পত্রও বল্লালের রচিত নহে। ইহাও বহুকালের প্রাচীন উদ্‌ভট শ্লোক মাত্র। উক্ত শ্লোকদ্বয় আমরা বল্লাল চরিত নামক উপন্যাসে এবং অতি প্রাচীন গদাধর ভট্টের কুলজ্ঞীতেও প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ কুলজ্ঞী আমাদের দেশে এবং মান্দ্রাজে পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে। উপন্যাসকারগণ ঐ শ্লোক দুইটী স্বীয় স্বীয় উপন্যাসে ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র। বল্লাল চরিতকার উক্ত ১ নং শ্লোক লক্ষ্মণ পত্নীর মুখ দিয়া বাহির করিয়াছেন। ২নং শ্লোক বল্লালের মুখ দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল শ্লোক লক্ষ্মণ পত্নী বা বল্লালের রচিত নয়।

৺গদাধর ভট্টের কুলজ্ঞীতে লিখিত আছে, ভবানন্দ দেশাধ্যক্ষ, তিনি রাজকার্য্যের জন্য দূরতর স্থানে ছিলেন। তাঁহার বিচ্ছেদে তদীয় পত্নী দেবমন্দিরের প্রাচীরে—

"পতত্যবিরত বারি নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা" ইত্যাদি শ্লোক লিখিয়াছিলেন। ভবানন্দের পিতা তদ্দর্শনে স্নেহার্দ্র হৃদয় হইয়া অহোরাত্র মধ্যে ভবানন্দকে আনিবার জন্য দ্বিসপ্ততি ক্ষেপণীযুক্ত নৌকা সজ্জিত করিলেন, ভবানন্দের পিতা নাবিকগণের হস্তে পূর্ব্বোল্লিখিত ২নং "সন্তপ্ত দশম ধ্বস্তা গতিনা সম্থাপিতা নির্জ্জনে" ইত্যাদি সাঙ্কেতিক শ্লোক সম্বলিত পত্র দিলেন। ভবানন্দ এই পত্র পাইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দিনানি গণয়েৎ কান্তা দিনানি গণয়েৎ যমঃ।
চিন্তায়ৎ শ্রীভগবানন্দঃ প্রাকৃযামি কস্য মন্দিরম্॥
৺গদাধর ভট্টের কুলজ্ঞী।

তৎপরে নানা চিন্তার পর দেশাধ্যক্ষ ভবানন্দ নিজের বাসভূমি গঙ্গা তীরস্থ "মেটারী" নামক গ্রামে আসিয়া স্ত্রীর সহিত মিলিত হইলেন। প্রাতে নাবিকগণ পুরস্কার জন্য ভবানন্দের নিকট উপস্থিত হইল। এবং তাঁহার নিকট জলাচরণ পুরস্কার প্রার্থনা করিল। ভবানন্দ বলিলেন,"রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য কঠোর বনবাস স্বীকার করিয়াছিলেন, ভার্গব পিতৃ আজ্ঞায় গুরুতর কুকার্য্য মাতৃ-মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, আমিও পিতৃসত্য পালনের জন্য ধীবরের প্রার্থনা নিতান্ত অবৈধ হইলেও পূর্ণ করিব।" এই বলিয়া তিনি দেশের অধিবাসীগণ লইয়া ধীবরের হস্তে জলপান করিলেন। এই উপন্যাস একবার গদাধর ভট্টের কুলজ্ঞীতে গীত হইয়াছে, আবার বল্লালচরিতে ধৃত হইয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এক ধীবরকে কয়বার আচরণীয় করা হইল?

৺গদাধর ভট্টের কুলজ্ঞীতে দেখা যায়, ভবানন্দ দেশবর্গের সহিত জলপানার্থ ধীবরের বাড়ীতে উপস্থিত হইবার জন্য কৈবর্ত্তদিগকে আহ্বান করিলে কৈবর্ত্তগণ তাঁহার রাজ্য ত্যাগ করিয়া উত্তর ও দক্ষিণ দিকে পলায়ন করিল। তদবধি উত্তর রাঢ়ী ও দক্ষিণ রাঢ়ী কৈবর্ত্তের শ্রেণী-বিভাগ হইয়াছে। তাহারা নিয়োদ্ধৃত শ্লোকে মনোভাব প্রকাশ করিয়া ভবানন্দের এলাকা পরিত্যাগ করিল।—

বরং দেশং পরিত্যজ্য যামো দেশান্তরং বরম্।
তথাপি জালিক-গৃহে করিষ্যামো নভোজনম্॥

* * *
* * *

বিচার-রহিতে দেশে বাসে ধর্ম্মক্ষয়ো ভবেৎ।
ইতি নিশ্চিত্য তদ্রাত্রৌ হালিকা সপুরোহিতাঃ॥
গৃহং গ্রাম্যং পরিত্যজ্য দক্ষিণাশাং সমাযযুঃ॥

ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা জানা যায়, ভবানন্দ ও

তাহার ধামাধরা ব্রাহ্মণগণ মেটারী গ্রামে উক্ত ধীবরের জলপান করিলেও হালিকগণ দেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় স্বীয় পুরোহিত সহ স্থানান্তরে গেল, তথাপি জালিক গৃহে জলপান করিয়া জাতিনষ্ট করিল না। ইহাতেও হালিকগণের স্বতন্ত্রতা ও তেজস্বিতা প্রকাশ পাইতেছে।

প্রকৃত কথা, জলচলের কথাটাই উপন্যাসের কল্পনা মাত্র। পিতৃসত্য পালনের জন্ত বা প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য যে কেমন অবৈধ কার্য্যকেও বৈধকার্য্যরূপে গণনা করিতে হয়, তাহারই প্রদর্শনের চেষ্টা মাত্র। নতুবা একই কথা, একই শ্লোক বিভিন্ন আখ্যায়িকায় প্রযুক্ত হয় কেন?

তৎপরে বল্লাল পৌত্র মাধব সেনের নিকট ব্রাহ্মণগণ ভূমি প্রার্থনা কালে মেদিনীপুরের ভূমি অসুবিধাজনক বলিয়া মাধব সেনকে বলিতেছেন—

কহে মেদিনীপুর কিঙ্কিন্দার নিকট।
উঠে যে সমুদ্র হতে জল লোণা বিকট॥
সাগর হইতে উত্থিত মেদিনীপুর নাম।
কৃষিকার্য্যে সুপ্রশস্ত কৈবর্ত্তের ধাম॥
বিদ্যা ব্রাহ্মণ্য বিনা আছি ম্রিয়মাণ।
পিতার কর্ত্তব্য সুতে জ্ঞান ধনদান॥
নবদ্বীপ শ্রীনিবাস জ্ঞানের আলয়।
দেও গঙ্গাবাস চতুর্ব্বর্গের আশ্রয়॥

সম্বন্ধনির্ণয় ৩য় সংস্করণ, নুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠী কথা। ৭১৩ ও ৭১৬ পৃষ্ঠা।

নুলো পঞ্চাননের উক্তিতেও দেখা যাইতেছে, মেদিনীপুর চিরকালই কৃষিকারক কৈবর্ত্তের আধিপত্য স্থান, তাহারা চিরকালই কৃষিব্যবসায়ী ও ভূম্যধিকারী। এ অবস্থায় বল্লালের অনুগ্রহে কৈবর্ত্তগণের কৃষি ব্যবসায়ী হওয়া কতদূর সঙ্গত?

পক্ষান্তরে আমরা দ্বিজ বংশীদাসকৃত "পদ্মপুরাণ" হইতে জানিতে পারি, মাহেশ ও চাষী কৈবর্ত্ত সম্পূর্ণ পৃথক জাতি। ঐ গ্রন্থে আছে—মনসা দেবী প্রথমতঃ হালুয়া দাস জাতীয় বছাই (বৎসতর) রাজার পূজা গ্রহণ করেন। তাহাতে হালুয়া দাসদিগের মধ্যে মনসার পূজা প্রচলন হয়। তৎপরে মনসা "জালুমালু" জাতির পূজা পান। ইহাতেও বুঝা গেল, বহুপূর্ব্ব হইতেই মাহেশ ও চাষী কৈবর্ত্ত পৃথক জাতি। যাঁহারা প্রমাণ প্রয়োগ না দেখিয়া ঐতিহাসিকতত্ত্ব প্রচার করিতে যান, আমরা তাঁহাদিগের নিকট নিতান্ত নাচার।

সতীশবাবু নিজের গ্রন্থের ভ্রান্তি প্রদর্শনের জন্য জন সাধারণকে আহ্বান করিয়াছেন। আমরাও যথাজ্ঞান উপস্থিত বিষয়ের আলোচনা করিলাম। আশা করি, সতীশবাবু আমাদের উক্তি বিচার পূর্ব্বক সারসংগ্রহ করতঃ নিজ গ্রন্থ সংশোধন করিবেন।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য, বঙ্গের এই প্রকার মিথ্যা জাতি-কুৎসা ইতিহাস-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করায় কি লাভ হইতেছে? প্রকারান্তরে জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষের সৃষ্টি করা হইতেছে মাত্র। এইরূপ বিস্মৃতপ্রায় জাতি-বিদ্বেষ পুনঃ প্রজ্বালনে বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজ কি লাভবান হইতেছেন, তাহা তথাকথিত শিক্ষিতগণই বলিতে পারেন। আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতেছি—সাহিত্যের এই সুপ্রসন্ন ক্ষেত্র দিয়া এই স্রোত প্রবাহিত হইতে দিলে অচিরে বঙ্গের শান্তি বিদূরিত হইবে। আমরা এ বিষয়ে সমবেত সাহিত্যিকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। অলমিতি।

শ্রীসুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস।

নির্জ্জনতা ও সাধনশীলতা।*

অনেক দিন হইল, আমি একবার ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত গয়াধামে গমন করিয়াছিলাম। তথায় আমরা কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া, মধ্যে মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও হিন্দু সাধুদিগের আশ্রম দর্শন করিবার জন্য বহির্গত হইতাম। মধ্যে আমরা একদিন ভারতের এক সুপ্রসিদ্ধ পুরুষের সাধন-স্থান দর্শন করিবার জন্য অতি প্রত্যূষে একখানি গাড়ী করিয়া বাহির হইলাম। গন্তব্য স্থানে যখন পৌঁছিলাম, তখন সূর্য্যের তরুণ কিরণে চারিদিক আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই সিদ্ধপুরুষের সাধনভূমিতে যখন গিয়া দাঁড়াইলাম, তখন এক অপূর্ব্ব ভাবরসে, বিস্ময়ে ও আনন্দে আমাদের প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিল। গোস্বামী মহাশয় সেই স্থানে পদার্পণ মাত্র, চক্ষু মুদিয়া করযোড়ে, প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন, তৎপর ভক্তি ও বিস্ময়ে, সেই মহাপুরুষের উদ্দেশে নতজানু হইয়া, ভূমিতে প্রণাম করিলেন; এবং অল্পকাল মধ্যেই নিকটস্থ নিভৃত বৃক্ষলতাদিপূর্ণ নিরঞ্জন নদীর তীরে যাইয়া, সায়ংকাল অবধি ধ্যানস্তিমিত লোচনে তথায় উপবেশন করিয়া রহিলেন।

এ কোন্ স্থান? গৌতমবুদ্ধের সাধনভূমি; সিদ্ধার্থের সাধন সিদ্ধির স্থান—নির্ব্বাণ তত্ত্বের সূতিকাগৃহ। এইরূপ লোকের সাধনার স্থান দেখিবার জন্য জাতিনির্ব্বিশেষে গ্রাম গ্রামান্তর হইতে, নরনারী ধাবিত হয়, এবং তাঁহার উদ্দেশে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির কুসুম অর্পণ করিয়া থাকে।

কপিলাবস্তু নগর পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে গৌতমের মনে নির্ব্বাণতত্ত্বের একটা সুস্নিগ্ধ মনোহর ভাব উদিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি দেখিলেন, যে আভায় তাঁহার মনে উদিত হইয়াছে, উহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, সমাজ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, নির্জ্জন সাধনার আবশ্যক। তিনি সেই জন্যই ছয় বৎসরকাল নির্জ্জন স্থানে উপবেশন করিয়া, কঠোর সাধনায় রত হইয়াছিলেন, এবং সাধনায় সিদ্ধ হইয়া, দুর্জ্জয় শক্তি লাভ করতঃ, অসংখ্য নরনারীকে বিশুদ্ধ নীতি ও বিশ্বজনীন প্রেমের পথে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কেবল বুদ্ধ কেন? যে সকল ধর্ম্মাত্মা, নরনারীকে মুক্তির পথ প্রদর্শনের জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই অগ্রে আত্মাতে শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, ভগবৎবাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন—সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন।

আত্মাতে এই অধ্যাত্ম-শক্তি লাভের উপায় কি? ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা ও ধর্ম্মপ্রচারকেরাই বা কিরূপে সেই শক্তি লাভ করিয়াছিলেন? আত্মানুসন্ধানের দ্বারা। নির্জ্জনতাই এই আত্মদর্শনের প্রকৃষ্ট উপায়—আত্মার শক্তি লাভের প্রকৃত পথ।

খ্রীষ্টীয় সাধু বার্ণার্ড বলিয়াছিলেন, জগতে নিরানব্বইজন ব্যক্তি আত্মচিন্তা বিহীন হইয়া বাস করে। কি করিতে সংসারে আসিলাম, কি করিতেছি, আমার কি করা কর্ত্তব্য, এ সকল বিষয় তাহাদের প্রাণে স্থান পায় না। সংসার কোলাহলে ও আমোদে জীবন অতি-

* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু কর্ত্তৃক বিবৃত।

বাহিত করিয়া, তাহারা ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া, পরলোকে গমন করে। আত্মচিন্তা না থাকিলে, আত্মদর্শন হয় না। আত্মদর্শন না হইলে, আত্মশক্তিও অন্তরে জাগরিত হয় না—ব্রহ্মপ্রীতিরও সঞ্চার হয় না। ধর্ম্মের ইতিহাসে, ও সাধুদিগের অমিয়মাখা জীবন-চরিতের মধ্যে আমরা সততই এই সাক্ষ্য পাইয়া থাকি। নিস্তব্ধতা ও নির্জ্জনতাই উচ্চতর অধ্যাত্ম-জীবন লাভের একটা প্রধান উপায়,—সকল মহৎ অনুষ্ঠানের নিয়ামক।

সুপবিত্র যীশুর চরিত্র পাঠ করিলে, আমরা কি দেখিতে পাই? তিনি জর্ডান নদীর তটে যোহনের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, জীবনের মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্রি নির্জ্জনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, চৌদ্দ বৎসরের পর হইতে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি যে কোথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন, খ্রীষ্টীয় বাইবেল গ্রন্থে তাহার কোন উল্লেখ নাই। যিনি নরনারীকে অধ্যাত্ম শক্তির গুণে মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তিনি যে সে সময়, আত্মায় শক্তি লাভ করিবার জন্য, সাধুদিগের সহবাসে বা কোন নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া, পরমাত্মার চিন্তনে ও ধ্যানে সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। কোন কোন লোকের মতে তিনি বৌদ্ধ মঠে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

আর এক কথা। বুদ্ধ ও যীশুর চরিতাখ্যায়কেরা দেখাইয়াছেন যে, ইঁহারা যখন নির্জ্জনে সাধনায় রত হইয়াছিলেন, তখন সংসারের প্রলোভন আপনার মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ইঁহাদিগকে সংকল্পের পথ হইতে, ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু উভয়েই ব্রহ্মশক্তির প্রভাবে তাহাদিগের চেষ্টা বিফল করিয়াছিলেন। উভয়েই যেন এক বাক্যে এই কথা বলিয়াছিলেন,—"শয়তান! সম্মুখ হইতে চলিয়া যা।" এই সকল ঘটনা কল্পনার রংএ চিত্রিত হইলেও, উহার গভীর তাৎপর্য্য এই, মানুষ অধ্যাত্ম শক্তিতে আত্মাকে বলীয়ান করিলে, নীচ প্রবৃত্তির উপর অবাধে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়।

যিনি দুর্দ্ধর্ষ আরব জাতির কল্যাণ সাধনের জন্য তৎপর হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি কি করিয়াছিলেন? মহাত্মা মহম্মদ হীরা পর্ব্বতের নিস্তব্ধ গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া চক্ষু নিমীলিত করিয়া, তথায় উপবেশন করিলেন। চারিদিক নিস্তব্ধ; জন মানবের কোলাহল নাই, মহম্মদ হৃদয়দ্বার খুলিয়া সেই বিশ্বপতি পরমেশ্বরের নিকট হৃদয়ের কথা নিবেদন করিলেন, নিজ আত্মাতে সেই অনন্ত শক্তিশালী পরমেশ্বরের নিকট হইতে, শক্তি লাভের জন্য, ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ভগবান কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তিনি মহম্মদের অন্তরে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিলেন, শক্তি সঞ্চার করিয়া দিলেন। সেই বিশ্বপতি পরমেশ্বরের উজ্জ্বল জ্যোতিতে তাঁহার হৃদয় আলোকিত হইয়া উঠিল; এক অভিনব অধ্যাত্ম শক্তিতে তাঁহার হৃদয় বলীয়ান হইয়া উঠিল। তিনি নিজ আত্মার মধ্যে এক স্বর্গীয় বাণী শ্রবণ করিলেন, "মহম্মদ! মহম্মদ! যাও, সমগ্র আরব দেশে 'একমেবাদ্বিতীয়ম' এই অমোঘ সত্য ঘোষণা কর।" মহম্মদ হীরা পর্ব্বতের মধ্যে দুর্জ্জয় বলে বলীয়ান হইয়া উঠিলেন,—তাঁহার হৃদয় প্রশান্ত হইল, তিনি ঐ মহাবাণী শ্রবণ করিয়া, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দুর্জ্জয় সমর ঘোষণা করিলেন। তাঁহার প্রভাবে লক্ষ লক্ষ মুসলমান নমাজের সময় "ঈশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয় এবং মহম্মদ তাঁহার

প্রেরিত” বলিয়া নমাজের অঙ্গ শেষ করিয়া থাকে। এ সকলের মূলে আমরা কি দেখিতে পাই? নির্জ্জনতা ও সাধনশীলতা।

এ সংসার বড় কোলাহলময়। আমরা এই কোলাহলের মধ্যে সতত বাস করিয়া, বিবেক-কর্ণকে বধির করিয়া রাখি; সংসারের ধূলাতে অধ্যাত্ম চক্ষুকে অন্ধ করিয়া ফেলি। এজন্য সময়ে সময়ে তরুলতাবেষ্টিত বনে বা উপবনে, দ্রুতগামী স্রোতস্বিনী বা তরঙ্গমালা, পূর্ণ সাগর-তটে, নিস্তব্ধ গিরিগুহা, বা গিরি-শৃঙ্গে না বসিলে কি সেই পরমসুন্দর দেবতার সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার লাভ হয়? তাঁহার দিব্য জ্যোতিতে আমাদের জীবনমন প্রাণ আলোকিত হয়? আমরা কি তাঁহার পবিত্র সহবাস লাভ করিতে পারি, বা তাঁহার অমৃতময় বাণী শ্রবণ করিয়া, আত্মাতে শক্তি লাভ করিতে সমর্থ হই? কখনই না। তিনি যে সর্ব্বদাই আমাদিগকে এই কথা বলিতেছেন, “যাও, যদি আমাকে ভাল করিয়া দেখিতে চাও, জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য ভাল করিয়া নিরূপণ করিতে চাও, তবে একবার দূরে চল—নিভৃত স্থানে উপবেশন কর, আমি তোমার প্রাণে বল দান করিব—তোমার তৃষিত তাপিত প্রাণে শান্তি বর্ষণ করিব।”

গৌতম বুদ্ধের নির্জ্জন সাধনার ফলে, নির্ব্বাণ তত্ত্ব চারিদিকে ঘোষিত হইয়াছিল,—বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় তাঁহার প্রভাব ভারতে, কেবল ভারতে কেন, সমস্ত মানবজাতির মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এখনও সে শক্তি সমস্ত মানবের মধ্যে কার্য্য করিতেছে। যীশুর জীবনের অতুলনীয় প্রভাব যুদ্ধপ্রিয় ইয়ুরোপীয় জাতির মধ্যেও সহস্র সহস্র পুরুষ ও নারীকে প্রেমের পথে, ক্ষমার পথে পরিচালিত করিয়াছে, এখনও তাহার দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। মহম্মদের জীবন্ত বিশ্বাসের প্রভাবে কত মানবকে একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের সিংহাসন পাশে নীত করিয়াছে, কত মুসলমান তাপস সেই একমাত্র পরমেশ্বরকে অন্তরে ধারণ করিয়া, জীবনের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন।

এই সকল ক্ষনজন্মা পুরুষেরা কি তড়িৎ শক্তির ন্যায় যুগযুগান্তর ধরিয়া নরনারীর হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিতে পারিতেন, যদি ইঁহারা অধ্যাত্ম বলে বলীয়ান না হইতেন? ইঁহারা অতিরিক্ত বাক্যব্যয় অপেক্ষা সর্ব্বাগ্রে নিজেরাই ঈশ্বরানুগত প্রাণ হইবার জন্য প্রাণপণে যত্নবান হইয়াছিলেন,—সেজন্য সাধন করিয়াছিলেন। কোথায়?—নির্জ্জন স্থলে। ইঁহারা বুঝিয়াছিলেন, নির্জ্জনতাই অধ্যাত্ম জীবন লাভের ও ঈশ্বর সহবাসের বিশিষ্ট উপায়—আত্মার কল্যাণ সাধনের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি।

প্রেমিক চূড়ামণি শ্রীচৈতন্য নীলাচলে বাস করিয়া ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়াছিলেন। তিনি যে প্রেমের উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, নির্জ্জন সাধনাই তাহার মূল। তিনি জীবনে অধিকাংশ সময় বনে, উপবনে, পর্ব্বত-শিখরে, নদী ও সাগরতটে বিচরণ করিয়া, তাঁহার ইষ্টদেবতাকে প্রাণে লাভ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে, আমরা দেখিতে পাই, ঋষিপ্রতিম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি ভারতের পূজ্যপাদ ঋষিদিগের ন্যায় ভগবানকে প্রাণে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি সেজন্য জনকোলাহলপূর্ণ কলিকাতা নগরী পরিত্যাগ করিয়া নদীবক্ষে

তরী আরোহণে বিচরণ করিতেন ও চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেন। কখন নির্জ্জন নিবিড় অরণ্য-মাঝারে গমন করিয়া, গাম্ভীর্য্যরসে মনপ্রাণ পূর্ণ করিতেন। কিন্তু তিনি অধিকাংশ সময় হিমালয়-শিখরে বাস করিয়া ব্রহ্ম-ধ্যানে ও ব্রহ্ম-প্রীতিরসে নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন। একদিন তিনি হিমালয় শিখরে, এক নিঝরিণী পার্শ্বে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এক ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করিলেন, সে বাণীর মর্ম্ম এই, "যাও, ব্রাহ্ম সমাজের সেবা কর।" সে বাণী শ্রবণে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। গিরিশিখরের সুখ-নিবাস পরিত্যাগ করিয়া, কলিকাতায় আগমন করিলেন; এবং প্রাণ মন দিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবায় আপনাকে নিয়োগ করিলেন। তিনি যখন ব্রাহ্মসমাজের বেদী গ্রহণ করিয়া, উপদেশ দান করিতেন, তখন উপাসকবৃন্দের প্রাণে যেন এক নূতন শক্তির সঞ্চার হইত। "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" নামক পুস্তক তাহার জাজ্বল্য প্রমাণস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। শুনা গিয়াছে, তিনি যে দিন সমাজে আচার্য্যের কার্য্য করিতেন, সেদিন প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল অবধি সেই পরমাত্মার চিন্তনে রত থাকিতেন, এবং ব্রহ্মবলে বলীয়ান হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। আমার কোন এক ধর্ম্মনিষ্ঠ পরলোকগত প্রাচীন বন্ধু আমার নিকট মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, সেই সময়ে মহর্ষির জীবন্ত উপদেশ বাক্যগুলি যেন আগুণের গোলার ন্যায় আমাদের অন্তরে আসিয়া পড়িত। আমরা তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিতাম, যেন এক অপূর্ব্ব আভা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইতেছে। এ শক্তি তিনি কোথা হইতে লাভ করিয়াছিলেন? প্রকৃতির সঙ্গ লাভে—ও নির্জ্জন সাধনা হইতে।

কলের চাকাগুলি ঘর ঘর করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে উহা যেমন উত্তপ্ত হইয়া উঠে, বায়ুবিতাড়িত নদীবক্ষ যেমন বিক্ষিপ্ত তরঙ্গমালায় পূর্ণ হইয়া উঠে, মানবের মনও সেইরূপ সংসারের চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে উত্তপ্ত হইয়া উঠে, ও নানা প্রকার ঘটনাতে তাহার চিত্তসরোবরও চঞ্চল হইয়া পড়ে। আমরা অধিকাংশ সময় বিবিধ বাহ্যিক কার্য্যে এতই লিপ্ত হইয়া থাকি যে, আমাদের আত্মা সেই চিন্ময় পুরুষের চিত্তবিমোহন রূপ দর্শন লাভ করিবার অবসর পায় না। সেই জন্য আমরা অধ্যাত্মজীবনের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হই না। ধর্ম্ম সমাজের লোকেরা অনেক সময়ে মনে করেন যে, খুব তর্ক, যুক্তি প্রয়োগে ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা বা উপদেশাদি দ্বারা লোককে আপনাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসের পথে আনিতে সক্ষম হইব। এ সকলের একটা বিশেষ দিক আছে, সংশয় নাই, কিন্তু সাধন-লব্ধ জীবন ভিন্ন মানুষ কোন কালেই নরনারীকে অধ্যাত্মজীবনের পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হয় নাই। নিজে সাঁতার না জানিয়া, জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে যাওয়া যে প্রকার, অনেক সময় নিজে প্রস্তুত না হইয়া অপরের উদ্ধার সাধন করিতে যাওয়াও সেই প্রকার।

ষোড়শ শতাব্দীতে মহাত্মা মার্টিন লুথর পোপের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি যৌবন কালে রোমান ক্যাথলিক আশ্রমে বাস করিতেন। ধর্ম্মবল সঞ্চয়ের জন্য তিনি অনেক সময় নির্জ্জন প্রার্থনাদিতে সময় কাটাইতেন। একদিন তিনি আশ্রমের একটী গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। লুথর আর গৃহ হইতে বহির্গত হন না। কি হইল, তাহা দেখিবার জন্য, আশ্রমবাসীরা রুদ্ধদ্বারে সজোরে আঘাত করিতে

লাগিলেন। কিন্তু দ্বার উদ্ঘাটিত হইল না দেখিয়া, তাঁহারা দ্বার ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন, লুথর অচেতন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। লুথর বড় সঙ্গীত ভালবাসিতেন; এজন্য তাঁহারা সঙ্গীত ধরিলেন, সঙ্গীতের ধ্বনি তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিলে, তাঁহার চেতনার উদয় হইল। এইরূপ নির্জ্জন সাধনশীল না হইলে কি তিনি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত পোপের সিংহাসন নাড়া দিতে পারিতেন? ইয়ুরোপের মধ্যে প্রবল ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত করিতে সমর্থ হইতেন?

নির্জ্জনতা জীবনের পক্ষে কি মঙ্গলকর, কি কল্যাণপ্রদ! এই ব্রহ্মাণ্ডের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, আমরা দেখিতে পাই, শত শত কার্য্য নিঃশব্দে সম্পন্ন হইতেছে। সৌর জগতের অসংখ্য গ্রহ উপগ্রহ সকল নীরবে আপনাপন কক্ষে ভ্রমণ করিতেছে। অসংখ্য তরুরাজি নিঃশব্দে ফল ফুল প্রদান করিয়া বিবিধ প্রকারে নরনারীর সুখ বিধান করিতেছে। আমাদের শরীরে ধমনীর মধ্যে জীবন শোণিত নিঃশব্দে বহিয়া যাইয়া আমাদের জীবন রক্ষা করিতেছে। জগতের জীবনদাতা যিনি, আদি কবি যিনি, তিনি নীরব। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ও মানব অন্তরে বাস করিয়া তিনি নীরবেই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। জগতের এই 'প্রাণস্য প্রাণমে'র সহিত হৃদয়ের যোগ স্থাপন করিতে হইলে, সময়ে সময়ে কোলাহলপূর্ণ স্থান পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে গমন করিতে হয়,—সেই নীরব কবির নিকট হইতে হৃদয়ে প্রেমরস সঞ্চার করিতে হয়।

যে সকল ধর্ম্ম-গ্রন্থের বচনে মানবের কল্যাণ সাধিত হইয়াছে,—সে সকল গ্রন্থ নির্জ্জন বৃক্ষলতাদি পূর্ণ মনোরম শান্তিপূর্ণ আশ্রমে বা অন্য কোন নিভৃত প্রদেশেই রচিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ ভারতের ঋষিরা নির্জ্জন তপোবনের মধ্যে বসিয়া উপনিষদাদি অমূল্য গ্রন্থ সকল রচনা করিয়া, সমগ্র মানব জাতির সম্মুখে সত্যম্, শিবম ও সুন্দরমের এক উচ্চতর আদর্শই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন—নরনারীকে অমূল্য আধ্যাত্মিক রত্ন দানে সমর্থ হইয়াছেন।

সুবিখ্যাত ঋষি-সদৃশ এমারসন্ অনেক সময় নির্জ্জনেই সময় অতিবাহিত করিতেন। পল্লীতে তাঁহার একটী কুটীর ছিল। স্থানটী জনকোলাহলশূন্য ও রমণীয়। তিনি তথায় সময়ে সময়ে গমন করিয়া অধ্যাত্ম চিন্তাতে রত হইতেন। সেই লোভনীয় পল্লিকুটীরে তিনি যখন গমন করিতেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে যে ভাবের সঞ্চার হইত, তাহা তিনি এক কবিতায় এই মর্ম্মে প্রকাশ করিয়াছেন, "কোলাহলপূর্ণ সংসার, স্বার্থপর গর্ব্বিত সংসার তোমার নিকট বিদায়! এখন আমি আমার প্রকৃত গৃহেই গমন করিতেছি। তুমিও আমার বন্ধু নও, আমিও তোমার বন্ধু নই"; তৎপর আবার বলিতেছেন, "আমি যখন আমার পল্লি কুটীরে গমন করি, তখন আমি গর্ব্বিত গ্রীস্ ও রোমের মস্তকে পদাঘাত করি।" এমারসনের এই সকল কথায় এই প্রকাশ পায়, যে মানব যখন নিস্তব্ধ কোলাহলশূন্য স্থানে গমন করিয়া, সেই অনন্ত শক্তিশালী পরম পুরুষের নিকট হইতে নিজ আত্মার মধ্যে শক্তি লাভ করে, তখন তাহার আত্মা বলশালী হইয়া উঠে। আত্মার সহিত আত্মার যোগে, আনন্দ ও শান্তির উৎস উৎসারিত হইয়া উঠে। তখন ব্রহ্মসাধক হৃদয়ে যে শান্তি ও আনন্দ উপভোগ করেন, তাহার তুলনায় পৃথিবীর সকল শক্তি ও সকল আনন্দ তাঁহার নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই বোধ হয়। অধ্যাত্মবলেই

সংসার পরিচালিত হইতেছে; অধ্যাত্ম-আনন্দ ও শান্তিই আমাদের চরম লক্ষ্য। ইহাই মানব-ইতিবৃত্তের অমোঘ বাণী।

আমরা যখন কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্জ্জনে বাস করি, তখন কি আমরা সত্যই একাকী নির্জ্জনেই বাস করি? আমাদের জীবনদাতা, ইহ পরলোকের দেবতা যিনি, তিনি সর্ব্বদাই আমাদের সঙ্গে বাস করিতেছেন। তবে যখন আমরা কোন নিভৃত স্থানে তাঁহাকেই লাভ করিবার জন্য গমন করি, তখন আমরা আরও উজ্জ্বলরূপে পরমেশ্বরের সত্তা অনুভব করিতে সমর্থ হই। তাঁহার উজ্জ্বল ও মধুর জ্যোতিতে আমাদের হৃদয় আলোকিত হইয়া উঠে। আমাদের হৃদয় প্রশান্ত হইলে ভগবানের বাণী আমাদের বিবেক কর্ণে প্রবেশ করে, এবং তাঁহার অমৃতময় বাণী শ্রবণে আমরা মহত্তর জীবনের পথে অগ্রসর হইতে পারি।

জীবনের কি কোন সময়েই আমাদের একটু নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নহে? আমাদের পূর্ব্বতন ধর্ম্মাচার্য্যেরা জীবন পরিচালনের জন্য আশ্রম চতুষ্টয়ের কি সুব্যবস্থাই করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য। প্রথমে গুরুগৃহে বাস করিয়া ধর্ম্ম ও জ্ঞান ও আত্মসংযম শিক্ষা করিবে; তৎপর সুদৃঢ় হইয়া সংসারে প্রবেশ করিবে। সংসারের কার্য্য কতক শেষ করিয়া পরিণত বয়সে ভগবৎ আরাধনার জন্য কোন নির্জ্জন প্রদেশে যাইয়া অবশিষ্ট জীবন ক্ষেপণ করিবে। চতুর্থ ব্যবস্থা কতকটা বানপ্রস্থের ন্যায়। তাঁহাদের সকল ব্যবস্থা আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে না পারিলেও এবং বর্ত্তমান সময়ে উহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন অসম্ভব হইলেও, কার্য্যক্ষেত্রে ও গার্হস্থ্য আশ্রমে বাস করিয়াও বানপ্রস্থ আশ্রমের সুমহৎ ভাবটী স্মরণে রাখিয়া, সময়ে সময়ে ভগবৎ-কৃপা লাভের জন্য আমাদের সকলেরই নির্জ্জন হওয়া আবশ্যক।

আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই কাহারও কোন কারণে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইলে, চিকিৎসকেরা তাহাকে বায়ু পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিয়া থাকেন। লোকে সেই জন্য অনেক সময় স্বাস্থ্যকর স্থানে গমন করিয়া শরীরে শক্তি সঞ্চয় করে, পীড়ার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করে, এবং দীর্ঘ জীবন লাভের উপযোগী হয়। আত্মার স্বাস্থ্য লাভের কি কোন প্রয়োজন নাই? ধর্ম্মানুগত ব্যক্তিরা সেজন্য মানবকে পরমাত্মার সহবাস লাভ করিবার জন্য উপদেশ দান করিয়া গিয়াছেন।

সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও অধিকাংশ ধর্ম্মপ্রচারকদিগের দৃষ্টান্ত এ বিষয়ে সংসারী ব্যক্তিদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে অনুকরণীয় না হইলেও, কথঞ্চিৎ পরিমাণে আমাদের সকলেরই পক্ষে প্রযোজ্য। আত্মার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য লাভের জন্য সময়ে সময়ে জনকোলাহলের দূরে পল্লবাবৃত বৃক্ষতলে, গিরিশিখরে, সাগর বা নদীতটে গমন করিয়া, সেই পরমাত্মার সহবাস লাভের জন্য আমাদের সকলেরই জীবনের বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করা বিধেয়।

ইয়ুরোপের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা যাক। ইয়ুরোপ শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যে ভারত অপেক্ষা বহুলরূপে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে, তাহাতে আর সংশয় নাই। তবে এ নিদারুণ সমরানলে কেন সুসভ্য ইয়ুরোপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল? সহস্র কণ্ঠ হইতে আজ এই ধ্বনিই উত্থিত হইতেছে যে, শিক্ষা, ধনৈশ্বর্য্য, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের মূলে ভগবৎ শক্তি দর্শন না করাই ইহার

প্রধান কারণ। স্থূল কথায়, সকল বিষয়ে বহির্ম্মুখীন দৃষ্টিই উচ্চতর মনুষ্যত্ব লাভের—অন্তরে প্রকৃত শান্তি ও ঐশীশক্তি লাভের প্রধান অন্তরায়।

শ্রীশশিভূষণ বসু।

উপন্যাসে ধর্ম্মপ্রচার—বঙ্কিমচন্দ্র।

লবঙ্গলতা—(নন্দা, প্রফুল্ল ও সূর্য্যমুখী)।

"রজনী" বঙ্কিম বাবুর অপূর্ব্ব গ্রন্থ,—ইহা রত্ননিচয়-খচিত। ইহা উচ্চ আদর্শে সুশোভিত। বঙ্কিম বাবু নিজে লিখিয়াছেন যে, প্রথম লর্ড লিটন প্রণীত "Last Days of Pompeii" নামক উৎকৃষ্ট উপন্যাসে নিদিয়া নামে একটী কাণা ফুলওয়ালী আছে, রজনী তৎস্মরণে সূচিত হয়। এই অন্ধ যুবতী ব্যতীত আর কিছুই Last Days of Pompeii হইতে বঙ্কিম বাবু গ্রহণ করেন নাই। মিশর দেশের নানা বিদ্যাবিশারদ বৃদ্ধ, গুপ্ত বিদ্যাবিৎ, কামুক Arbaces এর ঐন্দ্রজালিক লীলা,—Glaucus এর Greek উৎকর্ষ, নূতন খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায় প্রধূমিত ক্ষীণ দীপশিখাবৎ—উত্থান,—কুপিত আগ্নেয়গিরি Vesubius-এর রোষকষায়িত নেত্রের লোহিতাভা এবং সর্ব্বশেষে তাহার জনপদ ধ্বংসকারী দ্রব ধাতু শিলা, অঙ্গার বমন ইত্যাদি বিষয়ের তিনি কিছুই গ্রহণ করেন নাই। এই সকল প্রলোভনকে দূরে রাখিয়া, তিনি বাঙ্গালা দেশের পল্লীগ্রামের একটী গৃহস্থের উপাখ্যান লিখিয়া বিচিত্র ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। কোথায় আগ্নেয়গিরি বিসুভিয়সের দ্রব ধাতু নিঃস্রাব,—আর কোথায় "লবঙ্গ-লতাপরিশীলন কোমল মলয় সমীর" কুঞ্জ কুটীর—রামসদয় মিত্রের ভবন—শান্তি, সংযম ও ধর্ম্মের আলয়।

রামসদয় বাবু প্রাচীন, বয়ঃক্রম ৬৩ বৎসর। ললিত লবঙ্গলতা,—নবীনা, বয়স ১৯ বৎসর—দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, আদরের আদরিণী, গৌরবের গৌরবিনী, মানের মানিনী, নয়নের মণি। তিনি রূপসী,—বাস্তবিক গুণবতী, গৃহকার্য্যে নিপুণা, দানে মুক্তহস্তা,—হৃদয়ে সরলা। আবার তাঁহার অশেষ গুণের মধ্যে এইটী অসাধারণ গুণ যে, তিনি বাস্তবিক পিতামহের তুল্য সেই স্বামীকে ভালবাসিতেন। কোন নবীনা, নবীন স্বামীকে সেরূপ ভালবাসেন কি না সন্দেহ।

রামসদয় একদিন তাঁহাকে বলিলেন,—"আমি যদি মরি?" লবঙ্গ উত্তর করিলেন—"আমি তোমার বিষয় খাইব।" কিন্তু মনে মনে বলিতেন,—"আমি বিষ খাইব।" কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, এই নবীনা যুবতী কিরূপে পিতামহ তুল্য স্বামীকে এরূপ ভালবাসিতে পারিতেন। ইহার উত্তর—"True love idealises its object. It transcends the limitations of the body." আর একটী উত্তর রজনীর ধর্ম্মজ্ঞান। যে সুন্দর

যুবক অমরনাথকে তিনি বিবাহের পূর্ব্বে ভালবাসিতেন এবং যাহার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল, যখন সেই অমরনাথ লবঙ্গকে বিবাহের পরে কোন এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি আমার প্রতি একটু স্নেহ করিবে?" লবঙ্গ উত্তর করিল,—"আমি তোমাকে স্নেহ করিলে ধর্ম্মে পতিত হইব।" লবঙ্গের পাতিব্রত্যের সহিত শৈবলিনীর ও চন্দ্রশেখরের বিষয় স্মরণ করুন। চন্দ্রশেখরের বয়ঃক্রম প্রায় চত্বারিংশৎ বৎসর। তাহার আকার দীর্ঘ; তদুপযোগী বলিষ্ঠ গঠন। তাহার স্ত্রী শৈবলিনী বিংশতি বর্ষীয়া যুবতী। ১৯ বৎসরের লবঙ্গ ৬৩ বৎসরের স্বামী রামসদয়কে ভালবাসিতে পারিল। ২০ বৎসরের শৈবলিনী, ৪০ বৎসরের স্বামী চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিতে পারিল না। লবঙ্গের বিবাহের পূর্ব্বে অমরনাথের প্রতি লবঙ্গের যে ভালবাসা হইয়াছিল, তাহা লবঙ্গ বিবাহের পর সম্পূর্ণ দমন করিতে পারিল। আর শৈবলিনী, বিবাহের পূর্ব্বে প্রতাপের প্রতি তাহার যে অনুরাগ হইয়াছিল, তাহা কোন মতেই উপশমিত করিতে পারিল না; বিবাহের পরেও দিন দিন সেই অনুরাগ তাহার হৃদয়ে অধিকতর প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। তাই সে কালামুখী প্রতাপকে পাইবার আশায় ফরষ্টারের সহিত গঙ্গাবক্ষে ভাসিল,—এই জীবনেই নরকের ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিল এবং নানা রূপে লাঞ্ছিত হইয়া, ছিন্ন ভিন্ন কণ্টকবিদ্ধ হৃদয়ে দারুণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া, অবশেষে ধর্ম্মের সুশীতল-শান্তি-সমীরণ সেবিত পথে আসিল। লবঙ্গ যদিও পূর্ণ যুবতী—তাহার স্বামী যদিও স্থবির, তথাপি সে নিজের সংযম গুণে, ধর্ম্মবলে, কোন লাঞ্ছনাই ভোগ করে নাই; বরঞ্চ নিঃস্বার্থ ভাবে একটা পরিবারকে সুধীর প্রশান্ত ভাবে পরিচালনা করিয়াছিল। সুভদ্রা অশ্ব রশ্মি হস্তে লইয়া অতি নিপুণ ও প্রশান্ত ভাবে রথ চালনা করিতেছেন, সুভদ্রা আপন সারথ্যনৈপুণ্যে প্রীত হইয়া মুখ ফিরাইয়া স্মিত বদনে অর্জ্জুনের দিকে দৃষ্টি করিতেছেন। লবঙ্গলতাও যেন নিপুণ ও প্রশান্ত ভাবে মিত্র পরিবারের রথটী,—আপনার রিপু ও স্বার্থ স্বরূপ অশ্বগণকে সংযত করিয়া, প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া আত্মতৃপ্তির সহিত চালনা করিতেছেন।

নানা প্রতিকূল অবস্থার তরঙ্গ লবঙ্গকে আঘাত করিতেছে; তিনি অটল ভূধরের ন্যায় অবিচলিত। কেবল তাহার স্বামী বৃদ্ধ নহে; তাঁহার সপত্নী আছে কিন্তু সেই সপত্নীর সহিত ব্যবহারে কোথায়ও তাঁহার ঈর্ষা লক্ষিত হয় নাই। সেই সপত্নীর পুত্র শচীন্দ্র, তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ। শচীন্দ্রের প্রতি লবঙ্গলতার স্নেহ কেমন পবিত্র। আমরা অধিকাংশ পুস্তকে দেখিতে পাই যে, যুবা সপত্নী পুত্রের প্রতি বিমাতার না হয় দ্বেষ আছে, না হয় তাহার প্রতি অপবিত্র প্রেম সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু এখানে তাহা নহে। শচীন্দ্র বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও বিমাতাকে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। এমন কি, যেমন লক্ষ্মণ সীতার মুখমণ্ডলের প্রতি কদাপি দৃষ্টি না করিয়া তাঁহার পাদপদ্ম দর্শন করিতেন, তেমনি যেন শচীন্দ্র তাহার বিমাতার মুখের প্রতি না চাহিয়া তাঁহার চরণাম্বুজে দৃষ্টি রাখিতেন। এমন পবিত্র ভাবের চিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল।

আর লবঙ্গের সপত্নীর প্রতি ব্যবহার, সীতারামের ছোট রাণীর রমার প্রতি বড়রাণী নন্দার ব্যবহার, তুলনা করিয়া দেখা যাউক। রমা পুত্রস্নেহে নগররক্ষক ও গঙ্গারামকে

নিশীথে অন্তঃপুরে আনিয়াছিল। তাহাতে কলঙ্ক রটিল। তাহার সপত্নী বড় রাণী নন্দা রমাকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন; তাহাকে বালাই কণ্টক ভাবিয়া, সেই কণ্টক উন্মূলিত হইলেই নিজের পক্ষে যে মঙ্গল, তাহা ভাবিলেন না।

নন্দা রমার চক্ষের জল মুছাইয়া সস্নেহ বচনে বলিল, "কাঁদিলে কলঙ্ক যাইবে না দিদি! না কাঁদিয়া যাতে এ কলঙ্ক মুছিয়া তুলিতে পারি, তাই করিতে হইবে।"

নন্দা রমার নিকট সকল কথা শুনিয়া আবার বলিল,—"যদি ঘুণাক্ষরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া এ কাজ করিতে দিদি, তবে কি এত কাণ্ড হইতে পায়? তবে যা হয়ে গিয়েছে, তার জন্য ভিরস্কার করিয়া এখন আর কি হইবে? এখন যাহাতে আবার মান সম্ভ্রম বজায় হয়, তাই করিতে হইবে।"

পরে, সীতারাম যখন বলিলেন—"সীতার ন্যায় রমাকে আমার ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। তাহা হইলে আর কোন কথা থাকে না।" নন্দা তাহার সপত্নীর পক্ষে হৃদয়ের সহিত ওকালতি করিয়া বলিল,—"মহারাজ! নিরপরাধিনীকে ত্যাগ করিবে, তবু তার বিচার করিবে না। এই তোমার রাজধর্ম্ম? রামচন্দ্র করিয়াছিলেন বলিয়া কি তুমিও করিবে? যিনি পূর্ণ ব্রহ্ম, তাঁহার আর ত্যাগই কি, গ্রহণই বা কি? তোমার কি তা' সাজে মহারাজ!"

এইরূপ তর্ক বিতর্ক হইলে সীতারাম ক্রুদ্ধ হইলেন, তখন নন্দা যোড় হাতে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। যোড় হাত করিয়া নন্দা জিতিয়া গেল, সীতারাম শেষে রমার বিচার করিতে সম্মত হইলেন।

কি অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত! সপত্নীর মঙ্গলের জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে কেমন আন্তরিক চেষ্টা! সচরাচর লোকে জানে যে, স্ত্রীলোক সপত্নী হইলেই তাহার অনিষ্ট চেষ্টা করে। কিন্তু বঙ্কিম বাবু লোকের ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য অন্যরূপ সপত্নী-চরিত্র চিত্রিত করিলেন।

দেবীচৌধুরাণীতে দেখা যায়, প্রফুল্ল যখন স্বামী-গৃহে আসিল, সুশিক্ষিত হইয়া যখন স্বামীর ঘর কন্না করিতে লাগিল—তখন তাহার সপত্নীদ্বয় নয়নতারা এবং সাগরকে স্নেহে সম্পূর্ণ বশীভূত করিল। "নয়নতারার ছেলে গুলিকে প্রফুল্ল যেমন যত্ন করে,—নয়নতারা তেমন পারে না; নয়নতারা প্রফুল্লের হাতে ছেলে গুলি সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। সাগর বাপের বাড়ী অধিক দিন থাকিতে পারিল না—আবার আসিল। প্রফুল্লের কাছে থাকিলে সে যেমন সুখী হইত, এত আর কোথাও হইত না।" ধন্য বঙ্কিম! ক্ষুদ্র গ্রন্থকার যাহা কুৎসিত নীচ তাহাই প্রধানতঃ দেখাইয়া থাকেন। বঙ্কিমবাবু—যাহা সুন্দর, মহৎ, দেব ভাবাপন্ন,—তাহাই দেখাইলেন। যে দৃষ্টান্তে পাঠক পাঠিকার মনের ভাব উন্নত হইবে, হৃদয় পবিত্র হইবে, সেই দৃষ্টান্ত অঙ্কিত করিলেন। নন্দা পূর্ণিমার চাঁদ। প্রফুল্ল উষার করুণ হাসি। লবঙ্গলতা রজনীর নির্ম্মেঘ আকাশের তারকাস্তবকের শুভ্র জ্যোতি। তবে কি বঙ্কিম বাবু অধিকাংশ স্ত্রীলোকের পক্ষে সপত্নী জ্বালা কিরূপ ভয়ানক, তাহা বুঝেন নাই? খুব বুঝিয়াছিলেন। এই তত্ত্ব তিনি তাঁহার 'বিষবৃক্ষে' সূর্য্যমুখী চরিত্রে আলোচনা করিয়াছেন। যখন নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিল, তখন সূর্য্যমুখী সপত্নী সংঘটন জ্বালায় ছটফট করিয়া প্রায় উন্মাদিনীবৎ হইলেন, এবং রজনী যোগে গোপনে গৃহত্যাগ করিলেন। কমলমণিকে

পত্রে লিখিয়া গেলেন যে—"কুন্দনন্দিনী থাকিতে আমি আর এ দেশে আসিব না, এবং আমার সন্ধানও পাইবে না। আমি এখন পথের পাগলিনী হইলাম—ভিখারিণী বেশে দেশে দেশে ফিরিব—ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিব। আমাকে কে চিনিবে? আমি টাকা কড়ি সঙ্গে লইলে লইতে পারিতাম, কিন্তু প্রবৃত্তি হইল না। আমার স্বামী ত্যাগ করিয়া চলিলাম—সোণা রূপা সঙ্গে লইয়া যাইব!" উঃ, হৃদয়ের কি জ্বালা! সূর্য্যমুখী আবার গৃহে ফিরিল; কিন্তু কুন্দ বিষ খাইয়া মরিল। সূর্য্যমুখীর যদি লবঙ্গের অথবা নন্দার অথবা প্রফুল্লের মতন সংযম থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ বিভ্রাট ঘটিত না। সূর্য্যমুখী যখন দেখিল যে, কুন্দ বিষপান করিয়াছে, তখন রোদন করিয়া তাহার স্বামীকে কহিল, "কুন্দকে আমি বালিকা বয়স হইতেই মানুষ করিয়াছি। এখন সে আমার ছোট ভগ্নী,—বহিনের ন্যায় তাহাকে আদর করিব সাধ করিয়া আনিয়াছিলাম, আমার সে সাধে ছাই পড়িল। কুন্দ বিষপান করিয়াছে।" পরে সময় আসন্ন বুঝিয়া, সূর্য্যমুখী ও কমলমণিকে কুন্দ দেখিতে চাহিল। তাহারা উভয়ে আসিল। কুন্দ তাহাদের পদধূলি লইল। তখন সূর্য্যমুখী ও কমলমণি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিল। এদিকে কুন্দনন্দিনী স্বামীর পদযুগল মধ্যে মুখ লুকাইল আর কথা কহিল না। শনৈঃ শনৈঃ চৈতন্যশূন্যা হইয়া চরণ মধ্যে মুখ রাখিয়া, নবীন যৌবনে কুন্দনন্দিনী ইহলোক হইতে চলিয়া গেল। তখন সূর্য্যমুখীর ও নগেন্দ্রের ক্রন্দন নিষ্ফল। আগে সূর্য্যমুখী বুঝিয়া সুঝিয়া কাজ করিলে এই ভীষণ বিভ্রাট ঘটিত না। সূর্য্যমুখী নানা গুণালঙ্কৃত হইয়াও লবঙ্গ, নন্দা ও প্রফুল্লের সহিত তুলনায় অতি ক্ষীণ জ্যোতি প্রভাতী শশিকলা।

লবঙ্গকে আমরা সম্পদে যেরূপ ধীরা দেখিতে পাই, সদা সমাগত দারিদ্র্যেও সেইরূপ অটল দেখিতে পাই। সহসা প্রমাণ হইল, রামসদয় যে অতুল বৈভব ভোগ করিতেছেন, তাহা আইনমত রামসদয়ের নহে—তাহা কাণা ফুলওয়ালী রজনীর। তখন লবঙ্গ কেমন প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রকাশ করিল। তখনও মিত্র পরিবার রথের সারথি লবঙ্গ অতি নিপুণ ভাবে রথ চালনা করিতেছে। তখন লবঙ্গ একজন রাজনৈতিক ambassadorএর ন্যায় সুযোগ্য diplomacy প্রয়োগ করিয়া অমরনাথকে পরাস্ত করিলেন। কিন্তু এই ডিপ্লোমাসিতে কোনরূপ অধর্ম্ম নাই। ইহাতে ধৈর্য্য এবং ধর্ম্ম-ভিত্তি সংযম আছে। এই প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল, রজনী, শচীন্দ্র ইত্যাদি বিষয় পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

'ভারতী'র গাত্রদাহ।

দেখিলাম ভাদ্রের 'ভারতী' আমার 'নব্যভারতে' প্রকাশিত 'সাহিত্য ও ভাষা-সমস্যা'র ছিদ্রান্বেষণ করিয়াছে। আমার উক্ত প্রবন্ধে যে শ্রেণী-বিশেষের গাত্রদাহ উপস্থিত করিবে, তাহা আমি জানিয়া শুনিয়াই লিখিয়াছিলাম। তবে উদ্ধত-স্বভাবা ভারতীর গাত্রদাহে আমি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হই নাই। যে দিন হইতে 'ভারতী' প্রবীণার হস্ত ছাড়াইয়া

কতকগুলা বালখিল্যের হস্তে গিয়া পড়িয়াছে এবং আত্ম-প্রশংসার ধ্বজা উড়াইয়া চলিয়াছে, সে দিন হইতে বুঝিয়াছি, ভারতীর আর সে গৌরব বা মূল্য নাই। ভারতী এক্ষণে নাতি নাতিনীর আবদারের বা মন রক্ষার ক্ষেত্র হইয়া পড়িয়াছে, তাই ভারতী এক্ষণে স্বেচ্ছাচারিণী এবং তাহার Art এক্ষণে artificeএ পরিণত হইয়াছে।

মহামতি টলষ্টয় বর্ত্তমান যুগের Artকে prostituteএর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। বাস্তবিক আর্ট যে ব্যভিচারে পরিণত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পশ্চাৎ সাহিত্যের হনুকরণে (aping!) অকালপক্ক বঙ্গসাহিত্যেও সেই নগ্ন-মূর্ত্তি ব্যভিচারিণী দুর্নীতিময়ী কলা (art?) আসিয়া প্রশ্রয় পাইয়াছে। এই অপূর্ব্ব ছলাময়ী কলার অছিলায় কত যে হেয় মনস্তত্ত্বের বাহ্য বিকার (morbidity) বঙ্গবাণীর পূত প্রাঙ্গণকে কলুষিত করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যে দেশ জয়দেবের গীতগোবিন্দ বা চণ্ডীদাসের পিরীতির বিপক্ষে আপত্তি তুলে নাই, আর এখনই বা সেই দেশ এই সব বিজাতীয় জঘন্য অনুকরণমূলক বিকৃতির বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিতেছে কেন, ইহার কি কোন হেতু নাই? একটা দানের মত দান হয় ত দেশ গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু অনুকরণকে দান বলিয়া চালাইতে গেলে দেশের প্রাণ সে দানে পরিতৃপ্ত হইবে কেন? চুরি কর, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু বোকার মত কর কেন? যে চুরি নিজেও হজম করিতে পার না, দেশের লোককেও হজম করাইতে পার না, তাহা কর কেন? বঙ্কিমচন্দ্র ভাবের ঘরে এক জন পাকা চোর ছিলেন, তাই তাঁহার চুরি (plagiarism) বাহাদুরীতে পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু তোমরা হইতেছ বোকা এবং কাঁচা চোর, তাই সাহিত্যের মাগ-কাটিতে তোমরা বমাল শুদ্ধ ধরা পড়িয়া যাও, তাই তোমাদের ভাবে বিভীষিকা, ভাষায় বিভীষিকা! দেশ তোমাদিগের মাথামুণ্ড ছাই পিণ্ড কিছুই বুঝিতে পারে না। কেবল "আপিং ফুলের রঙিন স্বপনে" দেশ জাগিবে না। অপর দেশের চাঁদপারা ছেলেটীর মুখ দেখিয়া ভুলিয়া আছ, নিজের খাঁদা ছেলেটীর দিকে তোমাদের লক্ষ্য নাই, তোমরাই আবার দেশকে জাগাইবে? তোমাদের Art এবং Psychologyর fallacy দেশকে সম্মোহিত করিতে পারে, দেশকে সঞ্জীবিত করিবে না।

সাহিত্যে স্বেচ্ছাচারী কালাপাহাড় তোমরা, একমাত্র স্বেচ্ছাচারই তোমাদের ব্রত। তোমরা বঙ্গ সাহিত্যকে নিরঙ্কুশ করিবার চেষ্টা পাইতেছ, কিন্তু মনে রাখিও, বাণীর ব্রত তোমাদের ছেলেখেলা নহে, সে যে এক মহা মেলা! জীবনস্মৃতির আড়ম্বরে, কপটতায় এবং কুরুচিপূর্ণ অনুকরণ-বাহুল্যে দেশকে অত শীঘ্র মুগ্ধ করিতে পারিবে না, বিদেশকেও পারিবে না, কালে সব ধরা পড়িয়া যাইবে।

হে ভক্ত ভগীরথগণ, যে গঙ্গা আনয়ন করিবার জন্য এত কাঁসর ঘণ্টা বাজাইতেছ, হুজুগে পড়িয়া বিশ্বের গড্ডলিকা প্রবাহ তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিলেও, যাঁহারা সাহিত্যের জহুরী তাঁহারা তোমাদের 'রত্ন'কে ঘসিয়া মাজিয়া লইতে ছাড়িতেছেন না। 'জীবনস্মৃতি' ইংরাজীতে অনুবাদই কর কিম্বা Rhysকে দিয়াই লিখাও, এই অদ্ভুত বিজ্ঞপ্তির যুগে যত drumই বাজাও না কেন, রবিকবির যত ছবিই বিতরণ কর না কেন, বিদেশেও কি তোমাদের so-called ভগবানের নিস্তার আছে, অবশেষে দশচক্রে ভগবান

ভূত না হইলে বাঁচি। তোমরাই না রাহু হইয়া দাঁড়াও! সর্ব্বং অত্যন্ত গর্হিতম। সব বিষয়েরই ত একটা সীমা আছে, কিন্তু তোমরা যে সীমার বাহিরে! Ernest Rhys ত রবীন্দ্রনাথের জীবনী খাড়া করিয়া তুলিলেন, কিন্তু তাহার সমালোচনা বাহির হইল এইরূপ:—

"In regard to the Rhys's book it is difficult to make any comment. It is one long hymn of praise. Such enthusiasm is refreshing but uncritical. The whole book is written upon a note of laudation; but it is written obviously, in the most perfect sincerity and with the only purpose of presenting a new genius, one might almost say a new saint (ঋষি!) to the world. Fortunately, the collective mind is more cautious than the individual. It takes a terrific blow to convert the world."

The Bookman, July, 1915.

ভক্ত ভগীরথগণ গঙ্গার এই সব ভিতরের ব্যাপার চাপা দিয়া রাখেন এবং জাপানের কোথায় কে প্রশংসা করিল, অমনি মুদ্রাযন্ত্রের মাহাত্ম্যে বঙ্গের অভিনয়-ক্ষেত্রে তাহারই বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া গাত্র কণ্ডূতি নিবারণ করিয়া থাকেন। হায়, বঙ্গের জয়দেব, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ যদি এমনি করিয়া বিজ্ঞাপন দিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা আজ রবি-কবির নিকট জোনাকীর আলোর মত টিপ্ টিপ্ করিতেন না।

কি কালই পড়িয়াছে! অথচ সেই কালই আবার সকল বিষ দাঁত, সকল বুজরুকি ভাঙ্গিয়াও দিতেছে। ওই Bookmanই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

"The fact is that Tagore was overestimated in the first flush of enthusiasm. His reputation is finding a saner lavel. He is not (as we know his work) a creative artist or original artist of the highest rank and, therefore outside his own country, he can never expect the widest recognition." (তাহাই বা কোথায়? চণ্ডীদাস বা রামপ্রসাদের ন্যায় দেশের অন্তরাত্মার ভিতর রবীন্দ্রনাথের স্থান বড়ই অল্প! তিনি কবি-সম্রাট, তাঁহার নিকট অগ্রসর হইবে কে? তিনি দিগ্বিজয়ী বিশ্ব-কবি, দেশের মাটী তাঁহার নিকট কত অকিঞ্চিৎকর! তিনি নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন, তাঁহাকে পায় কে? তাঁহার ভক্তগণও এখন সুদুর্লভ!) "This reaction comes when we find that only for the chosen few is there this "open sesame" to existence. Tagore's philosophy is all right for a Tagore." অনুবাদ আর করিলাম না। আমাদের সামান্য দংশনেই অস্থির হও, আর বিখ্যাত পত্রিকা Bookmanএর ভয়ে নিশাচর পেচকের ন্যায় দিবাভাগে প্রচ্ছন্ন হও কেন? শুধু কি Bookman, বিলাতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমালোচনা পত্র Athenæumও রবীন্দ্রনাথের বুজরুকি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। আবশ্যক হইলে অনেক রহস্য আমরা উদ্‌ঘাটন করিব।

আর্ট আর্ট কর, আর্ট তোমাদের বিজ্ঞাপনের নামান্তর মাত্র! আর্ট, সাইকলজি কি তোমাদের মত উড্ডীয়মান ভুঁইফোড় স্বেচ্ছাচারীগণের মুখে শোভা পায়? অগ্রে আর্ট কি তাহারই একটা স্থিরতা কর। জগতের বড় বড় দার্শনিক এবং সাহিত্যিকগণ

আর্ট সম্বন্ধে কি মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার অন্বেষণ কর, এবং সর্ব্বাগ্রে আমাদের দেশ সাহিত্য এবং কলাকে কি চক্ষে দেখিয়াছে এবং তদ্‌সম্বন্ধীয় ভাষাভূষণ, সাহিত্য-দর্পণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ সমূহ পাঠ কর, দেখিবে, যে আর্ট তোমরা চাহিতেছ, তাহা যথার্থ আর্ট নহে, তাহা আত্ম-প্রতারণাময় প্রাণহীন বিকৃতি! তোমাদের ভাষায় আর্ট নাই, তোমাদের ভাবে আর্ট নাই। তোমরা অনুকরণ দ্বারা আর্টের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে? তাহা মনেও স্থান দিও না। নিজের মাপকাটিতে না মাপিয়া অনুকরণ দ্বারা লোক হাসাইয়া আর আর্টের দোহাই দিও না। যাহা পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে গ্রহণ করিব, তাহা দেশের মাপকাটিতে মাপিয়া লইব। সাহিত্যে বল, সমাজে বল, এই নিয়মটী আমাদিগকে রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। নচেৎ পাশ্চাত্য অনুকরণের অসংশোধিত পারদ আমাদের ধাতুতে জীর্ণ ত হইবেই না, উপরন্তু সমাজ-শরীর দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে এবং সাত পুরুষ ধরিয়া সেই পারদ বাহির হইতে থাকিবে। অন্ধ অনুকরণ-চিকীর্ষাকে আমি উপদংশ অপেক্ষাও ভয়াবহ মনে করি। উপদংশ একটী পরিবারকে ধ্বংস করে, কিন্তু অনুকরণ একটী জাতির ধ্বংস আনয়ন করে।

অজ্ঞতায় দেশের যে অনিষ্ট হইয়াছে, অল্পজ্ঞতায় দেশের আরও সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তাই আমাদের পেটে ভাত নাই, অথচ মনস্তত্ত্বের ও বাগাড়ম্বরের বড়ই বাড়াবাড়ি, আর্টের অত্যধিক প্রাবল্যে প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হইতেছে। হায়রে অল্প বিদ্যা, তুমি সত্য সত্যই ভয়ঙ্করী! তোমরা একদিকে যেমন রোঁদ্যার শিল্পচাতুর্য্যের ফাঁকা অনভিজ্ঞতা দেশে প্রচার কর, আবার অন্যদিকে তেমনি জাপানী সীতা অঙ্কিত করিয়া নিজের জাতির চক্ষে ধাঁধাঁ লাগাইয়া বিদেশীর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ কর। ধিক্ তোমাদিগের নূতনত্বে—ধিক্ তোমাদের বিকৃত রুচিকে!

হেমচন্দ্র বড় দুঃখেই গাহিয়াছিলেন "নকলে মজবুৎ বঙ্গ, আসলে কাঙ্গালী!"

তোমাদের দোষ দিয়াই বা লাভ কি? তোমরা যতই সবুজপত্রের নবীনতা ও যৌবনের জয়ধ্বজা উড়াও না কেন, ভাবের ঘরে ফাঁকি দেওয়াই তোমাদের ব্যবসা এবং মজ্জাগত অভ্যাস! অনুকরণ পর্য্যন্ত তোমাদের দৌড়! তাহার অধিক আর তোমাদের কিছুই দিবার নাই। Walt Whitman, Ibsen, Materlink, Tolstoyকে লইয়াই ত তোমাদের বিদ্যাবুদ্ধি, তোমাদের অদ্ভুত Realism এবং Idealism! তাই ছোট গল্প এবং গীতি-কবিতা ছাড়া তোমাদের পত্রিকাগুলিতে প্রকৃত দান কিছুই দেখিতে পাই না। অমন নিরঙ্কুশ পথ আর নাই! তাই আজকাল ঘরে ঘরে mushroomএর ন্যায় কবি গজাইয়া উঠিতেছে, অন্তঃপুরের অবগুণ্ঠনবতীও কবিতা দ্বারা নিজের স্বভাব-চরিত্র প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিতেছেন। এমন 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'র পথ—এমন নিরঙ্কুশ কুসুমময় পথ আর নাই। যে দেশের কালিদাসেরও জীবন বৃত্তান্ত জানিবার উপায় নাই, সে দেশের আজ সামান্য পতঙ্গও আপন স্মৃতি জাহির করিতেছে! কি দুরাশা! ইহাই কি এদেশের আর্ট? যে দেশের আর্টের মর্ম্ম সত্যং শিবং সুন্দরম্, সে দেশ আজ জাহির করাটাকেই আর্ট বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। যাহারা জাপানে গিয়া অনুকরণকে দুর্ব্বলতা বলে এবং দেশে আসিয়া অনুকরণকে অঙ্গের

ভূষণ করিয়া লয়, যাহারা দেশে থাকিয়া দেশকে গালি দেয় এবং প্রশংসার লোভে দেশের বাহিরে গিয়া দেশের প্রশংসা করে, তাহাদের আর্ট বল, সাইকলজি বল, সকলই ফকিকারী। তাহারা বসন্তের কোকিলের মত কেবলই Time-server নহে, place-serverও বটে। এই জন্যই আমরা বলিয়া থাকি, এসব ভেল্কীবাজী চিরকাল টিকিবে না। শরতের লঘু মেঘের ন্যায়, বর্ষার প্রতিভাহীন শৈবালদলের ন্যায় এই সব অনুকরণকারীগণের বৃথা আস্ফালন কোথায় ভাসিয়া যাইবে ?

কেন বঙ্গসাহিত্যে এই সব আবর্জ্জনা আসিয়া পড়িতেছে, ইহার প্রকৃত কারণ আমাদিগকে নির্ণয় করিতে হইলে কেবল এই সব কলের পুতুলদিগকে দোষ দিলেই চলিবে না, কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সব বালখিল্যদের মতামতের কোন মূল্যই নাই। অগ্রে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং কলার গতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দী একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ! য়ুরোপের উনবিংশ শতাব্দী যে গ্লানি অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছে, বিংশ শতাব্দীতে তাহার প্রায়শ্চিত্ত এবং প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগটা এমনি দ্বন্দ্বময় যে, পাশ্চাত্য সভ্যতাটাই যেন উদ্ভ্রান্তের ন্যায় এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়াছে, এমন অশান্তির যুগ জগতে আর আসে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় নাই। আজ যে বিপর্য্যয় আমরা দেখিতে পাইতেছি, ইহা উনবিংশ শতাব্দীর ভাব জগতের যুদ্ধেরই ফলাফল। বিজ্ঞানের উপরেও প্রজ্ঞান বলিয়া যে আর একটা সভ্যতার দিক আছে, উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য জগৎ তাহা ধরিয়াও ধরিতে পারে নাই। ইবসেন, নীট্সে, টলষ্টয় প্রভৃতি ভাবুকগণ এই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাসন্দেহের মধ্যে জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমানেও পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সাহিত্য হইতে সে সন্দেহের ঘোর কাটে নাই। সেদিন একজন চিন্তাশীল লেখক বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জীবন আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

"The smoke of the prosperous factory chimneys hangs like a pall between earth and heaven, shutting out all conception of the spiritual capacities of the human soul."

এই বৈজ্ঞানিক সভ্যতা সাধারণ মানব চরিত্রকে যেমন কলুষিত করিয়াছে, মানবের ভাব-জগৎকেও তেমনি কৃত্রিমতায় গঠিত করিয়াছে। ভাব-জগতেও যেন প্রাণ নাই, শৃঙ্খলা নাই, সুরুচি নাই, সুনীতি নাই, মানবের অন্তর ও বাহির আজ অভাবনীয় পাপে এবং যথেচ্ছাচারিতায় যৎপরোনাস্তি দুর্নীতিপরায়ণ ও অপবিত্রতার আধার হইয়া পড়িয়াছে। মানব আজ রাজা উত্তানপাদের ন্যায় উপরের দিকে পা করিয়া শ্রেয়কে ভুলিয়া প্রেয়কে চাহিতেছে, উপাদেয়কে বিসর্জ্জন দিয়া কেবল বাছিয়া বাছিয়া হেয়কে অন্বেষণ করিতেছে। সাহিত্য জগতেও এইরূপ দুর্নীতিপরায়ণ লেখক সম্প্রদায় দেখা দিয়াছে,—যাহাদের কার্য্যই হইতেছে, লেখনী সঞ্চালন ও ইচ্ছা পরিচালন দ্বারা লোকের মনোভাব বিকৃত করা। য়ুরোপে এই শ্রেণীর লেখকগণকে Dr. Max Nordau প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ, আজকাল চোর, ডাকাত, লম্পট প্রভৃতি জঘন্য প্রবৃত্তির লোকদিগের সহিত সমকক্ষ করিতেছেন। আবশ্যকবোধে আমরা

বিচক্ষণ Dr. Nordauর 'Degenaration' গ্রন্থ হইতে তাঁহার যুক্তির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"The artist who complacently represents what is reprehensible, vicious, criminal, approves of it perhaps glorifies it, differs not in kind, but only in degree, from the criminal who actually commits it. If the actual law does not treat the criminal by intention so rigourously as the criminal in act, it is because criminal law pursues the deed and not the purpose; the objective phenomenon, not its subjective roots. Ought art to be at present the last asylum to which criminals may fly to escape punishment? Are they to be able to satisfy, in the so-called "temple" of art, instincts which the police man prevents them from appeasing in the street? I do not see how a privilege so inimical to society can be willingly defended." ভবিষ্যতে আবশ্যক বোধ হইলে, ইহা ছাড়া আমরা Menzel, Lombroso, Turck Valdes প্রভৃতির এই সব জঘন্য রুচির কলাবিদ-সম্বন্ধে মতামত উদ্ধৃত করিয়া দিব।

'নব্যভারতে'র পাঠক সম্প্রদায়, এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন "সাহিত্য ও ভাষা সমস্যা" আমি এই কারণেই লিখিয়াছিলাম। দেশে অসৎ-সাহিত্যের বহুল প্রচার দ্বারা কম অনিষ্ট ঘটিতেছে না। বিশেষতঃ অপরিণত বয়স্ক যুবক-যুবতীর জীবন 'ঘরে-বাহিরে,' 'চোখের বালি'র ন্যায় জঘন্য রুচির উৎকট উপন্যাসগুলি একেবারে বিগ্‌ড়াইয়া দিতে কম সহায়তা করিতেছে না। 'ঘরে বাহিরে'র সন্দীপের বিষময় উক্তিগুলি কেমন করিয়া স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা বঙ্গললনাগণ গলাধঃকরণ করিতেছেন, ইহাই আশ্চর্য্য! ইহাঁদের অভিভাবকগণই বা কিরূপ! এইরূপ উৎকট আর্টই হইয়াছে ভারতীর আদর্শ! যে দেশে সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী, বেহুলা, সতী আজিও পাতিব্রত্যের সাক্ষ্য দিতেছেন, সে দেশে ঘরে বাহিরের চরিত্রভ্রষ্টা, সন্দীপস্বদিপ্সা বিমলা আদর্শ হইবে! হায় দুর্ভাগ্য! বিমলাকে ঘরের বাহির করিয়া রবীন্দ্রনাথ রক্ষা করিতে পারেন নাই, বিমলা যখন সন্দীপের লালসার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে ডুবিয়া গেল, তখন রবীন্দ্রনাথ বিমলার কলঙ্কিত মৃতদেহকে মাত্র টানিয়া তুলিয়াছেন। যে নারী পরপুরুষকে বহুবার মনে স্থান দিয়াছে, এমন কি, সন্দীপের বাহুর মধ্যেও ধরা দিয়াছে, তখন তাহার সতীত্ব কোথায় রহিল? তাই বলিতেছিলাম, রবীন্দ্রনাথ বিমলার শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। বিমলার পুতিগন্ধময় শবদেহকে তুলিয়াছেন মাত্র। বিমলাকে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুনারী বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। হায় দুরাশা! এইরূপ নারীই কি বঙ্গনারীর অভিপ্রেত বা আদর্শ! ইহাই কি Art! ললনা কি তবে ছলনা মাত্র!

Dr. Max Nordau বলিতেছেন, "The work of art is not its own aim, but it has a specially organic and social task. It is subject to the moral law; it must obey this; it has claim to esteem only if it is morally beautiful and ideal. আত্মাকে বাদ দিলে দেহের যেমন কোন মূল্য নাই, সুনীতিকে বাদ দিয়া সৌন্দর্য্যেরও তেমনি মূল্য নাই। রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাহিরে কেবল কদর্য্য লালসাই চারিদিক হইতে ফুটিয়া

উঠিয়াছে—প্রকৃত Art হিসাবে ইহাতে সত্যং শিবং সুন্দরম্ কিছুই নাই। ইহাই আবার নাকি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস! ইহাকেই আবার ভারতবর্ষ, বর্ত্তমান ভারত ও য়ুরোপের রূপকে ঢাকা হইয়াছে। যে উপন্যাসে একজন ন পুংসক প্রকৃতির স্বামী নিজ অসচ্চরিত্রা পত্নীকে একজন লম্পটের হস্তে তুলিয়া দিয়া নিজের দুর্ব্বলতা নীরবে সহ্য করিতেছে, সে উপন্যাসের নিখিলেশ হইয়াছে ভারতবর্ষ, একজন অবিশ্বাসিনী দ্বিচারিণী হইয়াছে বর্ত্তমান ভারত ও য়ুরোপ হইয়াছে জঘন্য প্রকৃতির সন্দীপ! এমন রূপকের বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা করে। এরূপ অভাবনীয় অসম্ভব উদ্ভট কল্পনা সাহিত্য জগতের কলঙ্ক ব্যতীত আর কিছুই নহে। অথচ 'ঘরে-বাহিরে' পড়িলেই একটা অনুকরণের অদ্ভুত খিচুড়ীই আমরা আস্বাদন করি। কোথায় বা Tolstoyএর Anna Karenina, কোথায় বা Ibsenএর Nora বা Youngmen's Leagueএর কত রহস্যই চক্ষের সমক্ষে ভাসিয়া উঠে।

'ঘরে-বাহিরে'র মর্ম্মকথা ত এই "আমার পথের সঙ্গিনীকে এবার কোনো আইডিয়ার শিকল দিয়ে বাঁধিতে চাইব না, কেবল আমার ভালবাসার বাঁশি বাজিয়ে বল্‌ব, তুমি আমাকে ভালোবাস, সেই ভালোবাসার আলোতে তুমি যা তারই পূর্ণ বিকাশ হোক্, আমার ফরমাস একেবারে চাপা পড়ুক।" ইহা ইব্‌সেনের সম্পূর্ণ অনুকরণ নহে ত কি? নোরার স্বামী হেলমার এই বলিয়াই আক্ষেপ করিয়াছিল। এইরূপ যথায় তথায় রবীন্দ্রনাথ যে কত অনুকরণ করিয়াছেন, তাহার সীমা নাই, অথচ জাপানে গিয়া রবীন্দ্রনাথ উপদেশ দিতেছেন,—অনুকরণ দুর্ব্বলতা!

চতুর ঠাকুরের অনুকরণভঙ্গিও নানারূপ অদ্ভুত লুকাচুরিতে পূর্ণ। ইব্‌সেনের সেই নেতা-বিদ্বেষ, নোরার সেই স্বামীকে গোপন করিয়া Dr. Rankএর সঙ্গে কীর্ত্তি সবই 'ঘরে-বাহিরে' খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় 'সবুজ পত্রে'র অন্তরালে বসিয়া তথা-কথিত কবি-সম্রাট (?) Ibsen-এর যথায় তথায় সপিণ্ডকরণ করিলেও উক্ত পত্রের ২য় বর্ষের পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যার টীকা টিপ্পনীতে অস্বীকার করা হইয়াছে যে "Ibsen-এর সঙ্গে আমাদের কস্মিনকালেও পরিচয় ছিল না এবং বহুকাল যাবৎও ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সভ্যতার ভগ্ন স্তূপের ভিতর তাঁর সমাধি হয়ে গেছে।" ওকালতি বটে! ইহারা হয়কে নয়, নয়কে হয় করিতে পারে।

কিন্তু আমরা দেখিতে পাইতেছি, ইব্‌সেন সমাধিস্থ হন নাই, রবীন্দ্রনাথের ভাবের ফাঁকির মধ্য দিয়া ইব্‌সেনের Ghost উঁকি মারিতেছে! আবশ্যক হইলে আমরা বারান্তরে সব একে একে ধরাইয়া দিব।

ধিক্, অনুকরণ যে দুর্ব্বলতা, তাহাতে আর সন্দেহ আছে কি? জাপানকে অনুকরণ হইতে বীতরাগ হইবার উপদেশ দেওয়াটা বড়ই সহজ, কিন্তু স্বয়ং কবি-সম্রাট্ কতটা অনুকরণের মোহ হইতে মুক্ত, তাহাই বিবেচ্য। কবি-সম্রাট জাপানে গিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার জয়ধ্বজা তুলেন, তাহা না করিলে যে উপঢৌকন তেমন মিলে না, কিন্তু দেশে থাকিয়া ভাবে, ভাষায় পাশ্চাত্য আদর্শের ক্রীতদাস হইয়া পড়েন, এইখানেই ত এই বহুরূপী ঋষির মত রহস্য! দেশে থাকিয়া ইব্‌সেনের Brandএর ন্যায় 'পাকা'র মস্তকে পদাঘাত করেন এবং 'কাঁচা'র কপালে রাজটীকা পরাইয়া দেন।

"আয়রে নবীন, আয়রে আমার কাঁচা
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।"

ইহাতে ম্যালেরিয়া ভারাক্রান্ত বাঙ্গালা দেশের প্লীহা চম্‌কাইয়া গিয়াছিল, পিলার ফাটিবার উপক্রম হইয়াছিল। আমরা কিন্তু দূরে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছিলাম ও Brand নাটকের Brand এবং Linarএর কথোপকথন স্মরণ করিতেছিলাম, আর মনে মনে হাসিতেছিলাম। শুধু কি আমি "নির্ব্বোধ"? সমগ্র দেশটাই যে নির্ব্বোধ! তাই রবীন্দ্রনাথের যত রাবিশ পেটেণ্ট ঔষধের মত বিজ্ঞাপনের জোরে চলিয়া যাইতেছে, এই অদ্ভুত Picture-postcardএর যুগে রাংতাও সোণার দরে বিকাইতেছে। রবীন্দ্রনাথের যে সব কবিতা waste-paper basketএ যাওয়া উচিত, সে সব জঞ্জালও আজ 'আহা মরি' হইয়া পড়িয়াছে। হায়রে আর্ট (artifice), হায়রে বিজ্ঞাপন, হায়রে "নূতন কিছু করো"—যাহাকে ফরাসীরা বলে Fin-de-siecle! তোমাদের চরণে কোটি কোটি নমস্কার, তোমরা সবই করিতে পার। Brand নাটকের শিল্পী Linar তাঁহার ভগবানকে টাকপড়া Hoary বুড়া শিবরূপেই গঠিত করিয়াছিলেন, কিন্তু নবযুগের কাঁচার প্রচারক Brand তাঁহার ভগবানকে Young Hercules রূপে দেখিতে চাহিয়াছিল, বাহুল্য ভয়ে আমি আর Brandএর উক্তি উদ্ধৃত করিতে সাহসী হইলাম না, সুধী পাঠকবর্গ, তাহা দেখিয়া লইবেন। ইহাই হইতেছে, কাঁচা ও পাকার নিগূঢ় সূত্রপাৎ। অথচ অদ্বিতীয় দিগ্বিজয়ী বহুরূপী কবি-সম্রাট, বৈদিক যুগের ঋষির ন্যায়, 'সৃষ্টির আনন্দে' বিভোর হইলেন এবং তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণও ঢাক বাজাইয়া 'আহা মরি' করিতে লাগিলেন। মজা এই যে, য়ুরোপে যাহা পুরাতন, second hand হইয়া যায়, তাহা আমাদের দেশে hawkerএর দোকানে নূতন হইয়া দ্বিগুণ দরে বিকায়। য়ুরোপে Ibsen, Materlink প্রভৃতি এখন পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মতবাদ এখন নিলাম হইতে বসিয়াছে, আর উচ্ছিষ্টভোজী আমরা তাহাদের পরিত্যক্ত dishএ বসিয়া খাইতেছি। তাহা না হইলে কি এই শ্যাম-শ্যামার দেশে, এই চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের দেশে অবান্তর 'সবুজের' চাষ শোভা পায়!

'সবুজ পত্র' নামকরণও যে একটা অনুকরণ (aping), ইহাও আমাদের কাছে অবিদিত নাই। হুইটম্যানের Flag of disposition হইয়াছিল তৃণ পত্র (out of green staff woven) বহুরূপী রবীন্দ্রনাথ সেইটাকে একটু পরিবর্ত্তন করিয়া করিলেন তালপত্র, অথচ সবুজটাকেও বজায় রাখিলেন। ইনিই আবার অন্যত্র অনুকরণকে দুর্ব্বলতা বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন।

ইহাতেও যদি ভারতীর গাত্রদাহ নিবারিত না হয়, আমরা এইবার অন্যরূপ প্রলেপ দিবার বন্দোবস্ত করিব। মাটীর ঠাকুর ভাঙ্গিয়া মানুষ ঠাকুরের পূজায় বিড়ম্বনাই অধিক। মাটীর ঠাকুরের নিকট ষোল আনা নৈবেদ্য পাওয়া যায়, কিন্তু মানুষ ঠাকুরের মানসিক পূজা করিয়াও তোমাদের ভাগ্যে কেবল মৌখিক অটরম্ভাই মিলিয়া থাকে।

প্রবন্ধান্তে অকপটে বলিব, শ্রীযুক্ত দীনেশ সেনের নিকট যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছি, সে কেবল তাঁহার আদর্শ-নির্দ্দেশের জন্য। তিনি মস্ত একজন গল্প-লেখক বলিয়া নহে। তিনি তাঁহার প্রবন্ধে ও গল্পে একটা শ্রেয়ের অন্বেষণ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার নাম

উল্লেখ করিয়াছি। তিনি দেশের লোকের চক্ষে সতী বেহুলার ও রামায়ণ-মহাভারতের দেবভাবপূর্ণ সুপবিত্র আদর্শ ধরিয়াছেন। সে আদর্শ তোমরা না গ্রহণ করিতে পার, কিন্তু আমরা চিরদিনই মাথায় করিয়া রাখিব। আমাদের চক্ষে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর চরিত্র-চিত্রই কলা, 'ঘরে-বাহিরে'র হাব-ভাব-শালিনী বিমলা কলার ছলা মাত্র, আমাদের চক্ষে বাল্মীকি, বেদব্যাসই উপাস্য, ঋষিপদ-বাচ্য। পাশ্চাত্য মোহভ্রান্ত বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ঋষি নহেন। তাঁহাদিগকে আমরা ঔপন্যাসিক বা কবি বলিব, কিন্তু ঋষি বলিব না। ঋষি হইবার তোমাদের প্রধান ও প্রথম উপকরণ চরিত্রবল বা personality কোথায়? বিশ্বামিত্রের উৎকট সাধনাই বা কোথায়?

শ্রীঅকিঞ্চন দাস।

বিক্রমপুর।

নদীয়া জেলায় দেবগ্রামের নিকট আর এক বিক্রমপুর আবিষ্কৃত হওয়ায়, ঐতিহাসিক মহলে প্রশ্ন উঠিয়াছে, বর্ম্ম ও সেন রাজগণের রাজধানী কোন্ বিক্রমপুরে ছিল? এত দিন ঢাকা জেলার বিক্রমপুরই এই গৌরব পাইয়া আসিয়াছে। আজ হঠাৎ আর এক বিক্রমপুর আবিষ্কৃত হইয়া তাহার গৌরব নষ্ট করিলে পূর্ব্ববঙ্গবাসীগণের পক্ষে বড়ই দুঃখের বিষয় হইবে। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য নির্ণীত হওয়াই অত্যাবশ্যক, তাই কোন্ বিক্রমপুর বর্ম্ম ও সেন বংশের রাজধানী ছিল, তাহা জানিবার জন্য সকলেই উৎসুক হইয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী*, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, † ঢাকার ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়, † বাঙ্গালার ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, * শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন গুপ্ত ‡ এবং শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী § মহাশয় এ বিষয়ের মীমাংসা সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতেছেন।

* ভারতবর্ষ ১৩২২ ফাল্গুন ৪৯৫ পৃষ্ঠা।
† সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ২২ ভাগ প্রথম সংখ্যা।
‡ প্রতিভা ১৩২২। ৩২৮ পৃষ্ঠা।
§ প্রবাসী ১৩২২ সাল, আষাঢ়।

বর্ম্ম, চন্দ্র ও সেনবংশীয় রাজগণের রাজধানী বিক্রমপুরে ছিল। তাঁহাদের নিম্নলিখিত তাম্রশাসন সমূহে তাহা জানা যায়।—

(১) জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত সামন্তসার গ্রামে প্রাপ্ত হরি বর্ম্ম দেবের তাম্রশাসনে লিখিত আছে—"বিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ * * * পৌণ্ড্রভুক্ত্যন্তঃ পাতি" ইত্যাদি।

(২) রামপালে প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্র দেবের তাম্রশাসনে—"শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয় স্কন্ধাবারাৎ * * * পৌণ্ড্রভুক্তন্তঃ পাতি নান্যমণ্ডলে নেতকাষ্ঠি গ্রামে" ইত্যাদি।

(৩) সামন্তসারে প্রাপ্ত শ্যামল বর্ম্মার তাম্রশাসনে—"বিক্রমপুর নিবাসী—কটক পত্তেঃ শ্রীশ্রীমতঃ জয়স্কন্ধাবারাৎ * * * বঙ্গ বিষয় পাঠে বিক্রমপুর ভুক্ত্যন্তে"। ইত্যাদি *

* এই তাম্রশাসনখানি এখন পাওয়া যায় না। বৈদিক কুলপঞ্জিকায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ইহার অনুলিপি পাইয়াছেন। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২য় ভাগ ২২ পৃষ্ঠা)। রাখালবাবু এই তাম্রশাসন খানিকে জাল বলেন (প্রবাসী ১৩২০।১। ৪৫৪ পৃষ্ঠা) আমি তাহার প্রতিবাদ করিয়া সত্যতা প্রমাণ করিয়াছি, (প্রবাসী ১৩২০।২। ১৫৫ পৃষ্ঠা) এ পর্য্যন্ত তাহার প্রতিবাদ পাই নাই, বাস্তবিক ইহা জাল নহে।

(৪) ঢাকা জেলার বেলাব গ্রামে প্রাপ্ত ভোজ বর্ম্মার তাম্রশাসনে—"শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ * * * শ্রীপৌণ্ড্রভুক্ত্যন্তঃপাতি অধঃপত্তন মণ্ডলে" ইত্যাদি।

(৫) বারাকপুরে প্রাপ্ত বিজয় সেনের তাম্রশাসনে—"বিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবারাৎ * * * পৌণ্ড্রবর্দ্ধন" ইত্যাদি।

(৬) সীতাহাটী নামক স্থানে প্রাপ্ত বল্লাল সেনের তাম্রশাসনে—"বিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ * * * শ্রীবর্দ্ধমান ভুক্ত্যন্তঃ পাতিপ্যুত্তর রাঢ়া মণ্ডলে" ইত্যাদি

(৭) তপন দীঘির নিকট (দিনাজপুরে) প্রাপ্ত লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনে—"শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ * * * পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃ পাতি * * * বরেন্দ্রী গ্রামীয় ভূভাগ" ইত্যাদি।

(৮) সুন্দর বনের নিকট প্রাপ্ত লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনে—"শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ * * পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃ পাতিনি * * * মণ্ডল গ্রামীয় কিয়ানদি ভূভাগ" ইত্যাদি।

(৯) আনুলিয়ায় প্রাপ্ত লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনে—"বিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ * * * পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃ পাতি ব্যাঘ্রতট্যাং" ইত্যাদি।

(১০) মাধাই নগরে প্রাপ্ত লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনে—"ধার্য্যগ্রাম পরিসর সমাবাসিত * * * শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃ পাতি বরেন্দ্র্যাং" ইত্যাদি।

(১১) বাখরগঞ্জ জেলার ইদিলপুরে প্রাপ্ত কেশব সেনের তাম্রশাসনে—"জম্বুগ্রাম পরিসর—শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ * * * পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃ পাতি বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে প্রদেশে" ইত্যাদি।

(১২) ফরিদপুর জেলায় মদনপাড় গ্রামে প্রাপ্ত বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনে—"ফল্গুগ্রাম পরিসর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ * * * পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃ পাতি বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে" ইত্যাদি।

বর্ম্ম, চন্দ্র ও সেনবংশীয় রাজাদিগের এই ১২ খানি তাম্রশাসন দ্বারা তাঁহাদের রাজধানী বিক্রমপুরের অবস্থান নির্ণয় করিতে হইবে। তন্মধ্যে মাধাই নগরের তাম্রশাসনে বিক্রমপুর নাম নাই।

এই তাম্রশাসনগুলি ও পাল রাজবংশের তাম্রশাসন সমূহ আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, এক সময়ে সমস্ত গৌড় বঙ্গ ছয়টী ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল—

(১) শ্রীনগর ভুক্তি—দেব পালের তাম্রশাসনে মুঙ্গের প্রভৃতি ভুক্তির অন্তর্গত ছিল বলিয়া জানা যায়।

(২) তীর ভুক্তি—নারায়ণ পালের তাম্রশাসনে মিথিলা প্রভৃতি এই ভুক্তির অন্তর্গত বলিয়া জানা যায়।

(৩) পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি—ধর্ম্মপাল, মহীপাল, মদন পাল, লক্ষ্মণ সেন, কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেন প্রভৃতির তাম্রশাসনে এই ভুক্তির উল্লেখ আছে।

(৪) পৌণ্ড্র ভুক্তি—হরিবর্ম্মা, শ্রীচন্দ্রদেব ও ভোজ বর্ম্মার তাম্রশাসনে এই ভুক্তির উল্লেখ আছে।

(৫) বিক্রমপুর ভুক্তি—শ্যামল বর্ম্মার তাম্রশাসনে এই ভুক্তির উল্লেখ আছে। কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনে "বিক্রমপুর ভাগ প্রদেশের" উল্লেখ আছে, তাহা বিক্রমপুর ভুক্তি শব্দেরই রূপান্তর বলিয়া বোধ হয়।

(৬) বৰ্দ্ধমান ভুক্তি—বিজয় সেন ও বল্লাল সেনের তাম্রশাসনে বৰ্দ্ধমান ভুক্তির উল্লেখ আছে।

নগেন্দ্র বাবুর মতে পৌণ্ড্রবৰ্দ্ধন ভুক্তি ও পৌণ্ড্রভুক্তি এক। * কিন্তু প্রমাণিত হইয়াছে, হরিবৰ্ম্মা, শ্রীচন্দ্রদেব, শ্যামল বৰ্ম্মা, তৃতীয় বিগ্রহ পাল, রাম পাল, বিজয় সেন সমসাময়িক ব্যক্তি। † অতএব যখন পাল রাজগণ পৌণ্ড্রবৰ্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত ভূমি, তাম্রশাসন দ্বারা দান করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই বৰ্ম্ম রাজগণ পৌণ্ড্রভুক্তির অন্তর্গত ভূমি দান করিতেছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, পৌণ্ড্রভুক্তি ও পৌণ্ড্রবৰ্দ্ধন ভুক্তি এক নহে। বিক্রমপুরের ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং ঢাকার ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় প্রভৃতি অনেকেই বিশ্বাস করেন, ঢাকা জেলার অন্তর্গত পদ্মার উত্তর পারে অবস্থিত বিক্রমপুরের পূর্ব্বোত্তর প্রান্তস্থিত রামপাল নামক স্থান পাল বংশীয় রাজা রামপালের স্থাপিত। যদি এ কথা ঠিক হয়, তাহা হইলে অনুমান করা উচিত যে, ঐ সময় পদ্মার উত্তর পারে অবস্থিত এই প্রদেশ রাজা রামপালের পৌণ্ড্রবৰ্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত ছিল। সুতরাং ঢাকা জেলার বিক্রমপুর রামপালের সমসাময়িক হরিবৰ্ম্মা শ্রীচন্দ্রদেব, শ্যামল বৰ্ম্মা, বিজয় সেন প্রভৃতির রাজধানী হওয়া অসম্ভব। ইহাতেও অনুমান করা যাইতে পারে যে,পদ্মার উত্তরে বৰ্ম্মরাজগণের অধিকার ছিল না। বরং লক্ষ্মণ সেনের মাধাই নগরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে এবং কেশব ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনে বিক্রমপুরের পরিবর্ত্তে ধার্য্যগ্রাম, জম্বুগ্রাম ও স্কন্দগ্রাম প্রভৃতি রাজধানীর নাম দেখিয়া অনুমান হয়, তখন পর্য্যন্ত ঐ বিক্রমপুর স্থাপিত হয় নাই। অবশ্যই বক্তিয়ার খিলিজি ঐ বিক্রমপুর অধিকার করেন নাই, সুতরাং ইহাঁদের রাজধানীর অন্য নাম লিখিবার আর কি কারণ হইতে পারে? অতএব ঐ সময় পদ্মার উত্তর পার পৌণ্ড্রবৰ্দ্ধন ভুক্তির এবং দক্ষিণ পার পৌণ্ড্রভুক্তির অন্তর্গত ছিল, এরূপ অনুমান করিতে কোন বাধা দেখা যায় না।

এক্ষণে শ্যামল বৰ্ম্মার তাম্রশাসনোক্ত বঙ্গ বিষয় পাঠে বিক্রমপুর ভুক্তির অন্তে এবং কেশব ও বিশ্বরূপের তাম্রশাসনে লিখিত "বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগ প্রদেশ" এক কি না, ইহাই বিবেচ্য বিষয়।

প্রথমে দেখা যাউক "বঙ্গ" কোন্ প্রদেশের নাম? হরিবৰ্ম্মার তাম্রশাসনে লিখিত আছে, "বঙ্গে বেজনিসার ভূমি"। এই বেজনিসার গ্রাম ফরিদপুর জেলায় সামন্তসারের নিকট। মেঘনার পশ্চিম ধারে 'ব' দ্বীপের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত। এই প্রদেশ বঙ্গরাজ হরিবৰ্ম্মার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তাই তিনি এই স্থানে ভূমি দান করিয়াছেন। অতএব এই স্থান পৌণ্ড্রভুক্তির অধীন বঙ্গের অন্তর্গত, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। শ্যামল বৰ্ম্মার তাম্রশাসন মতে এই স্থান "বঙ্গবিষয় পাঠে বিক্রমপুর ভুক্তি"র অন্তর্গত এবং তাহার এক অন্তে অবস্থিত। সুতরাং "বঙ্গ বিষয় পাঠে বিক্রমপুর ভুক্তি"র অন্তে অর্থ বঙ্গ বিষয় মধ্যে বা বঙ্গে বিক্রমপুর ভুক্তির এক অন্তে বা প্রান্তে। চন্দ্রদ্বীপ শ্রীচন্দ্রদেবের রাজধানী ছিল। তিনি শ্যামল বৰ্ম্মার নিকট পরাজিত হওয়ায় তাঁহার রাজ্য "বিক্রমপুর ভুক্তি" নামে বৰ্ম্মরাজ্য ভুক্ত হইয়াছে। হরি-

* সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ২২।৬ পৃষ্ঠা।

† প্রবাসী ১৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা।

বর্ম্মার রাজ্যান্তর্গত 'ব' দ্বীপের নাম তখন "বঙ্গ" ছিল। সুতরাং সামন্তসার, বেজনিসার প্রভৃতি বঙ্গে বিক্রমপুর ভুক্তি বা ভাগের পূর্ব্ব প্রান্তে ছিল স্বীকার করিতে হয়। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর তখন পর্য্যন্ত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এখন দেখা যাউক, এই বিক্রমপুর ভুক্তি বা ভাগের বিক্রমপুর কোথায়? উপরে দেখা গেল "পৌণ্ড্রভুক্তি," "বঙ্গ বিষয়" এবং "বিক্রমপুর ভুক্তি," পদ্মার দক্ষিণ পারে 'ব' দ্বীপে অবস্থিত। কেশব সেন, জম্বুগ্রাম রাজধানী হইতে এবং বিশ্বরূপ স্কন্দগ্রাম রাজধানী হইতে তাম্রশাসন দিয়াছেন। ইহাঁরা যে এই সময় পদ্মার উত্তর পারে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি মধ্যে ছিলেন, তাহা ঐতিহাসিকগণের স্বীকৃত বিষয়। বিক্রমপুর রাজধানী থাকিলে তাম্রশাসনে না লেখাও অসম্ভব। সুতরাং ধরিতে হইবে, বিক্রমপুরে তখন তাঁহাদের রাজধানী ছিল না। কিন্তু বিক্রমপুর ভাগ বা ভুক্তির সহিত তাঁহাদের যে সম্বন্ধ ছিল, তাহা তাঁহাদের তাম্রশাসনোক্ত "বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগ প্রদেশ" উক্তিতে বুঝা যায়। ভুক্তি ও ভাগ একই কথা। বিভাগ বা ডিভিসান বলিলে আমরা যাহা বুঝি, তাহাই।

এই দুই তাম্রশাসনের ভূমি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতী বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে অবস্থিত বলিলে কি বুঝায়? বক্তিয়ার নদীয়া জয় করিলে সেন বংশ পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই স্থান পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত ছিল। তথা হইতে "বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে" ভূমি দান করিয়াছিলেন। এই দুইখানি তাম্রশাসনই পদ্মার দক্ষিণ পারে ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলায় পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ তাম্রশাসনের লিখিত দুই স্থান বঙ্গ বিষয় পাঠে বিক্রমপুর ভুক্তির মধ্যে ছিল। মুসলমানগণ এই সময় এই প্রদেশ অধিকার করিবার কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং "ব" দ্বীপের এই ভাগ তখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির সামিল করিয়া সেন রাজগণ নিজ অধিকারেই রাখিয়াছিলেন। এবং তাহার পরিচয় "বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগ প্রদেশ" বলিয়া দিতেন। অতএব পদ্মার যে পারে বিক্রমপুর অবস্থিত, সেই পারেই ঐ তাম্রশাসনের ভূমি ছিল। ইহাতে অনুমান হইতেছে বর্ম্ম, চন্দ্র ও সেন রাজের রাজধানী বিক্রমপুর পদ্মার দক্ষিণ পারেই ছিল। বিক্রমপুর ভাগ প্রদেশের অর্থাৎ বাকলা চন্দ্রদ্বীপের কোন স্থানে ছিল না। মুসলমানগণের অধিকৃত প্রদেশ মধ্যেই ছিল।

পরগণাতি সন এ বিষয়ের আর একটী প্রমাণ। ১২০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই সন প্রচলিত হইয়াছিল। ইহার প্রকৃত নাম "বল্লালি সন"।* এই সনটী ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ (বাকলা, চন্দ্রদ্বীপ) প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত ছিল। † নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রচলিত থাকিবার কোন প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সুতরাং অনুমান হয় ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলিজি নদীয়া অধিকার করিলে লক্ষ্মণ সেন পূর্ব্ব বঙ্গে ধার্য্য গ্রামে রাজধানী স্থাপন করতঃ এই সন প্রচলিত করিয়াছিলেন। এই সময় ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ এবং খুলনা জেলা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির সামিল তাঁহার অধিকারেই ছিল। তাই এই প্রদেশে ঐ সন প্রচলিত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই সমস্ত কারণে অনুমান করা যাইতে

* গৃহস্থ ১৩২০ ফাল্গুন ৪২৫ পৃষ্ঠা।

† ঐ ঐ ঐ ৪২৭ পৃষ্ঠা।

পারে যে, পদ্মার দক্ষিণ পারে বক্তিয়ার খিলিজির অধিকৃত নদীয়া মধ্যে বিক্রমপুর নামে রাজধানী ছিল। হরি বর্ম্মা, শ্রীচন্দ্রদেব, শ্যামল বর্ম্মা, বিজয় সেন, বল্লাল সেন এই বিক্রমপুরেই রাজত্ব করিতেন। লক্ষ্মণ সেনও তাঁহার জীবনের অধিকাংশ ভাগ এই স্থানেই রাজত্ব করিয়াছেন। অবশেষে বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক ঐ রাজধানী অধিকৃত হইলে, তিনি পদ্মার উত্তর পারে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি মধ্যে ধার্য্য গ্রামে রাজধানী স্থাপন করতঃ জীবনের শেষ কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বাক্‌লা, চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি মুসলমানগণ অধিকার না করায় ঐ ভাগ তিনি নিজ অধিকারে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির সামিল রাখিয়া "পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতী বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগ প্রদেশ" নাম দিয়াছিলেন। তাই কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেন স্ব স্ব তাম্রশাসনে পদ্মার দক্ষিণ পারে যে স্থান দান করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় স্বরূপ "বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগ প্রদেশ" উল্লেখ করিয়াছেন। এবং তাহা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতী বলিয়া লিখিয়াছেন।

'দিগ্বিজয় প্রকাশ' নামক প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে—"দিলপুরোত্তরে ভাগে ব্রহ্মপুত্রস্য পশ্চিমে। বৃদ্ধ গঙ্গা দক্ষিণে চ পূর্ব্বে পদ্মানদী বরাৎ॥" অর্থাৎ ইদিলপুরের উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিমে বুড়িগঙ্গার দক্ষিণে পদ্মানদীর পূর্ব্ব তীরে বিক্রমপুর অবস্থিত। * ইহাই ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের প্রমাণ। সম্ভবতঃ বিশ্বরূপ সেনের স্কন্দগ্রাম রাজধানীই ক্রমে বিক্রমপুর নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। এই প্রদেশের নাম ঐ সময়ে "সমতট" ছিল।

দ্বিতীয় বল্লাল সেন এই বিক্রমপুরে রাজত্ব করিয়াছেন। † "বল্লাল" নামে যে কীর্ত্তি ঐ প্রদেশে আছে, তাহা ঐ বল্লাল সেন কৃত। ইনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় লিখিয়াছেন—"বর্ম্মচন্দ্র সেন বংশের রাজধানী (বিক্রমপুর) একই স্থানে ছিল বলিয়া মনে হয় না। এই বিপুল ধ্বংসাবশেষের বিভিন্ন বংশের রাজধানী ছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস। * * * "সুখবাসপুর গ্রামের পশ্চিম প্রান্তস্থিত হরিশ্চন্দ্রের দীঘি। আমার মনে হয়, এই হরিশ্চন্দ্র হরিবর্ম্ম ব্যতীত আর কেহই নহেন। এই সুখবাসপুরেই বর্ম্ম বংশের রাজধানী ছিল। *** চন্দ্রবংশের রাজধানী বর্ত্তমান বজ্রযোগিনী গ্রামের পুকুর পাড় অংশে ছিল বলিয়া মনে হয়। সেখানে পরম্পরা সংলগ্ন তিনটী প্রকাণ্ড দীঘির পাড়ে অনেক ভগ্নাবশেষের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এখানেও রাজার আবাস-বাটী ছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে। চন্দ্ররাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন। বজ্রযোগিনী বিখ্যাত বৌদ্ধ নাম। ধামর অর্থাৎ ধর্ম্ম ক্ষেত্র, ধানারণ অর্থাৎ ধর্ম্মারণ্য, [illegible] ইত্যাদি। * * * সেনবংশের রাজধানীর অবস্থান লইয়া কোন গোলমালই নাই। প্রকাণ্ড পরিখা বেষ্টিত বল্লাল বাড়ী নামে পরিচিত সুরক্ষিত স্থান এখনও সর্ব্বজন বিদিত। টঙ্গিবাড়ী দীঘির মধ্যে লক্ষ্মণ সেনের জলটঙ্গ ছিল। বল্লাল সেনের নামই জনসাধারণ জানে, এ অবস্থায় বৃদ্ধের মুখে লক্ষ্মণ সেনের নাম শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইয়াছিলাম। পরম নারসিংহ লক্ষ্মণ সেনের হয় ত এক গ্রীষ্মাবাস এই দীঘির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল।" (প্রবাসী ১৩২২।৩৮৭ পৃষ্ঠা)।

পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুরে বহু রাজধানীর চিহ্ন থাকিবারই কথা। হরিশ্চন্দ্র পাল নামে এক রাজা এ প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছেন। তাহা উত্তমরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং হরিশ্চন্দ্র হরিবর্ম্ম নহেন। লক্ষ্মণ সেন নদীয়া হইতে পূর্ব্বদিকে গিয়া ধার্য্যগ্রামে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহা তাঁহার তাম্রশাসনে জানা যায়। কেশব সেন ঐ পূর্ব্ববঙ্গেই জম্বুগ্রামে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন; বিশ্বরূপ সেনও ঐ প্রদেশেই স্কন্দগ্রামে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাও তাঁহাদের তাম্রশাসনে প্রকাশ। বল্লাল দীঘি থাকাও আশ্চর্য্য নহে, কারণ বৈদ্যবংশীয় দ্বিতীয় বল্লাল সেন এই বিক্রমপুরেই রাজত্ব করিয়াছেন। লক্ষ্মণ সেনের জলটঙ্গ থাকাও আশ্চর্য্য নহে। কেন না শেষ বয়সে লক্ষ্মণ সেন ধার্য্য গ্রামেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ

* বিক্রমপুরের ইতিহাস ৪ পৃষ্ঠা।

† ঐ ঐ ৪১ পৃষ্ঠা।

সময়ে গ্রীষ্মাবাস প্রস্তুত করিয়া থাকিবেন। বৌদ্ধ কীর্ত্তি থাকাও আশ্চর্য্য নহে। কারণ হরিশ্চন্দ্র পাল, শিশু পাল প্রভৃতি বৌদ্ধ পাল রাজগণ সেন বংশের পূর্ব্বে এ প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছেন *। সুতরাং এই সমস্ত প্রমাণের [illegible] বর্ত্তমান বিক্রমপুর প্রদে- [illegible] বলা যায় [illegible] অন্ততঃ প্রথম [illegible]।

[illegible] বিক্রমপুর গ্রাম নূতন নহে। রেনেলের মানচিত্রে এই স্থানের উল্লেখ আছে। দেব গ্রামের প্রায় ৫ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে এই বিক্রমপুর অবস্থিত। দেবগ্রাম ও বিক্রমপুরের মধ্যে দেবগ্রামের ২॥ মাইল দক্ষিণে "বেথে" নামক গ্রাম অবস্থিত। সাঁওতা ও দমদমা দেবগ্রামেরই অংশ বিশেষ। অনুমান হয়, এই দেবগ্রাম, সাঁওতা, দমদমা, বেথে এবং বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থান অতি প্রাচীন কালে বিক্রমপুর নামেই অভিহিত হইত। পরে দেবন রাজা তাহারই উত্তরাংশের "দেবগ্রাম" নাম দিয়াছেন। ফল কথা, বক্তিয়ার খিলিজি যে সেন রাজধানী বিক্রমপুর অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্মণ সেনের মাধাই নগরের তাম্রশাসন এবং কেশব ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন দেখিয়া অনুমান করিতে কোন বাধা আছে বলিয়া বোধ হয় না।

বর্ত্তমান সময়ে ঐতিহাসিকগণের ইহা একটী বিবেচ্য বিষয়। আশা করি, সকলেই সরল চিত্তে কোন ধারণার বশবর্ত্তী না হইয়া এই বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

* পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজ।

সাধ্বী বিরজাসুন্দরী।

জন্ম—উলপুর, ১২৬৫ সাল। মৃত্যু—গিরিধি, ১লা ভাদ্র, ১৩২৩।

লোকচক্ষুর অন্তরালে যে সকল সাধু ও সাধ্বী কর্ম্মময় আদর্শ জীবন যাপন করিয়া অন্তিমে এই মরজগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, আমাদের পরলোকগতা জননী সাধ্বী বিরজাসুন্দরী তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। [illegible]ের অন্তর্গত উলপুরস্থ জমীদা[illegible] রামচন্দ্র রায় চৌধুরীর গৃ[illegible] জন্মগ্রহণ করেন। অতি বাল্যকালেই তাঁহার পিতৃ-মাতৃ বিয়োগ হয়। যৌবনের প্রারম্ভে উৎকট রোগাক্রান্ত হইলে তাঁহার অগ্রজ পূজনীয় দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে চিকিৎ[illegible]- কাতায় আনয়ন করেন। তাঁহা[illegible] সকলেই তখন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী [illegible] কিন্তু কলিকাতায় বাস কালে তাঁহার অগ্রজ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সে যুগে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করা আর জীবনে মহা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া সমান ছিল; প্রত্যেককেই অনেক প্রলোভন ও অত্যাচার জয় করিতে হইয়াছে মাতুল মহাশয়ের মতিগতি তখন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের দিকে, কাজেই তিনি অনুজাকে নিজ বাসাবাটীতে চিকিৎসার জন্য লইয়া আসিলে চতুর্দ্দিক হইতে অত্যাচার বর্ষিত হইতে লাগিল, আত্মীয়েরা ধনের প্রলোভন দেখাইলেন, কিন্তু ভ্রাতা ভগ্নী টলিলেন না, ব্রহ্মের মধুর নামে তাঁহাদের জীবন মন ভরিয়া গিয়াছে;—বাহ্য প্রলোভন, দারিদ্র্য গ্রাহ্য করিলেন না। ভ্রাতা ভগিনীকে বলিলেন 'বোন্! এখনও ভাবিয়া দেখ, এক দিকে অতুল সম্পত্তি ও আত্মীয়বর্গ, অন্য দিকে এই কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন-সংগ্রাম ও একমাত্র দরিদ্র ভ্রাতা সহায়; এখনও ইচ্ছা করিলে ফিরিয়া যাইতে পার'; কিন্তু ভগিনীর সংকল্প অটুট রহিয়া গেল। পঁয়ত্রিশ বর্ষ ব্যাপী বিবাহিত জীবনে তিনি যে ব্রহ্মের নাম মাত্র সম্বল করিয়া সকল সংগ্রাম ও রিপু জয় করিয়া সম্মানে, গৌরবে দেহ ত্যাগ করিতে

পারিবেন, তখন যেন তাঁহারই পরীক্ষা দিলেন। ভগিনীর থাকার ব্যবস্থা করিয়া পরে এক বর্ষ বয়স্ক পুত্রসহ পত্নীকে নিজের কাছে আনেন। তাৎকালীন প্রথানুসারে মাতুল মহাশয় অল্প বয়সেই পরিণীত হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই এই দুইটা সমবয়স্কা 'ননদ-ভাজে' বিশেষ সম্প্রীতি হয়। কলিকাতায় আসার পরে দুজনে এক ব্রত গ্রহণ, একত্রে উপবেশন, একত্রে আহার ও শয়ন করিয়া সেই স্নেহ-বন্ধন অধিকতর দৃঢ় সুদৃঢ় করেন; জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। সহোদরাকে নিজের কাছে আনিয়া ভ্রাতা তাঁহার সুশিক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়েন এবং সর্ব্ব বিষয়ে সুশিক্ষিতা করিয়া-শ্রেষ্ঠ কুলীন বংশোদ্ভব আদর্শ চরিত্র সাধু ভগবানচন্দ্রের সহিত বিবাহ দেন। তাঁহার অগ্রজ তাঁহাকে সৎপাত্র দেখিয়াই দান করিয়াছিলেন। এখনকার মত ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম যুগে ধনের প্রতি কাহারও বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। মা আমার রূপের সঙ্গে অতুল গুণরাশি মাত্র যৌতুক লইয়া গরীবের ঘরে অন্নপূর্ণা রূপে আসিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত অতিথি অভ্যাগত আত্মীয় স্বজন সকলের মধ্যে অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতেই বিরাজিত ছিলেন। যদি বিধাতা এই দরিদ্র দম্পতির ঘরে বিত্ত দিয়া মণি কাঞ্চন সংযোগ করিতেন, তবে আজ তাঁহাদের নামের জয় জয়কারে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত হইত। তাহা না হউক, পরীক্ষা ও বিপদের মধ্য দিয়া তিনি যে ভাবে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিবার ও শিখিবার বিষয়। পিতার স্বল্প আয়, পরিবারের লোক সংখ্যাও কম নহে, কিন্তু লক্ষ্মী স্বরূপিনী মা আমার যে ভাবে চিরকাল পাঁচ জনকে খাওয়াইয়া, অতিথি সেবা করিয়া গিয়াছেন, লোকে কখনই ভাবিতে পারে নাই যে, তাঁহারা নির্ধন। তাঁহার অভাবের কথা সহোদরগণের নিকটও কখন প্রকাশ করেন নাই। অনন্যসাধারণ কর্ম্মশীলতার গুণে তিনি একাকিনী সুশৃঙ্খলার সহিত সন্তান পালন ও রন্ধনাদি সংসারের যাবতীয় কার্য্য সমাধা করিয়া বালিকা স্কুলে শিক্ষকতার কার্য্য পর্য্যন্ত করিয়াছেন। আমাদের হাতে খড়ি ও শিক্ষা তাঁহারই কাছে। অধিক বয়সে তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হইলেও অধ্যবসায় গুণে ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা প্রযুক্ত শীঘ্রই তিনি ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্যে জ্ঞান ও শিল্পকর্ম্মে দক্ষতা লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী না হইলেও তিনি সুশিক্ষিতাগণের অগ্রগামিনী ছিলেন, শিক্ষায় উৎসাহ শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ছিল। ছোট বড় কাহারও কাছে শিখিতে একটুও লজ্জা বোধ করিতেন না। আমার মার মধ্যে রূপ গুণ ও সর্ব্ববিধ বিদ্যার একত্র সমাবেশ ছিল বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। সরলতা, পবিত্রতা ও ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি তাঁর সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখ যিনি দেখিয়াছেন, যিনি একবারও তাঁর সংস্রবে আসিয়াছেন, তিনি চিরদিন তাঁহার মধুর সরল ব্যবহার ও আদর যত্ন সর্ব্বোপরি সেই মাতৃমূর্ত্তিকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবেন। তাঁহার ভক্তি গদগদ কণ্ঠে মধুর দয়াল নাম গান শুনিয়া মনে হইত, এমন সুকণ্ঠ বুঝিবা আর নাই। পলান্ন ফেলিয়া তাঁহার হাতের শাকান্ন খাইতে ইচ্ছা করিত, রন্ধনে তিনি এমনই পারদর্শিনী ছিলেন। শেষ বয়সে দৃষ্টির অল্পতা সত্ত্বেও নানাবিধ সুন্দর সুন্দর সেলাই করিতেন। তিনি অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়াই গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন এবং অতিথি অভ্যাগত পতিপুত্র কন্যাগণের পরিচর্য্যা করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করিতেন। দিনে যেটুকু অবসর পাইতেন, সেলাই, পাঠ বা অন্য কার্য্যে ব্যয়িত হইত। একটুকু সময় আলস্যে যাপন করিতেন না। সকলের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যস্ত হইতেন, কিন্তু নিজের শরীরের প্রতি একেবারেই উদাসীন ছিলেন, সেই জন্য অসময়ে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। রোগে ভগ্নদেহ হইলেও তাঁহার পতি বা পুত্র কন্যাগণ কেহই তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর লওয়াইতে পারেন নাই। শেষ দিন পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহার কর্ম্মের অবসরের সঙ্গে সঙ্গে জীবনেরও শেষ হয়। এমন সুখের মৃত্যু সকলেরই বাঞ্ছনীয়। আজ আমরাই শুধু মাতৃহীন হইয়া হাহাকার করিতেছি না, তাঁহার পিতৃমাতৃ শ্বশুর ও বন্ধুকুলের সকল আত্মীয়েরাই তাঁহার বিচ্ছেদে অশ্রুপাত করিতেছেন। তাঁহার কর্ম্মজীবন মফঃস্বলেই

স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার সেবা ও ভালবাসায় মুগ্ধ হিন্দু ব্রাহ্ম, এমন কি, মুসলমান পর্য্যন্তও আজ আমাদের সঙ্গে সমব্যথিত। তিনি নীরবে ধৈর্য্যের সহিত জীবনে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া তাঁহারি ইচ্ছায় অকস্মাৎ অমৃতধামে চলিয়া গেলেন। তাঁহার সাধনার সিদ্ধি হইয়াছে—তিনি চলিয়া গেলেন। পশ্চাতে রাখিয়া গেলেন, তাঁহার আদর্শ চরিত্র, আত্মহারা প্রেম ও ভগবদ্ভক্তি। তাহাই আমাদের অনুকরণীয় হউক, আর অনুকরণীয় হউক তাঁহার অনন্যসাধারণ কর্ম্মপরায়ণতা ও সকল কর্ম্মে দক্ষতা, জীবে সেবা, শিক্ষায় উৎসাহ, চরিত্রে বল ও সংযম, ধনে নিস্পৃহতা এবং সকলের জন্য আত্মবিসর্জ্জন। আজ কন্যার আসনে বসিয়া মাতৃচরিত্র অঙ্কিত করিতে আসি নাই, সাধারণ ভাবে সেই ত্যাগশীলা, পূতচরিত্রা, নীরব উপাসিকা অন্নপূর্ণারূপিনী যোগিনার কর্ম্মময় জীবনের এক পৃষ্ঠা অঙ্কিত করিলাম। বিধাতা সেই সতী সাধ্বীর মহৎ গুণাবলী আমাদের মধ্যে সংক্রামিত করিয়া তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করুন, এই প্রার্থনা।

শ্রীপুণ্যপ্রভা ঘোষ।

সাহিত্যিক সারমেয়।

ওরে রে সরমা-সুত
তুঁহু বড় গুণ যুত
আদর পাইলে কর লাঙ্গুল স্পন্দন।
ঢ'লে পড় পরশনে
লুটাও হরষ মনে
'ঘেউ' রবে বিকশিত করহ দশন॥

২

আকারে প্রকৃতি লেখা
সর্ব্বাঙ্গে কালির রেখা
চাটুবাদে সমতুল্য কে আছে তোমার।
তুমি ভোগী তুমি ন্যাসী
দো আধার ভস্মরাশি
আভাসে প্রকাশ কর তুমি নির্ব্বিকার॥

৩

মিহিদানা মতিচুর
পানিতুয়া সুমধুর
হে জিহ্বালম্পট চূড়া তব ধ্যান ধেয়।
সাজি' বৃন্দা দূতীরাণী
ছড়াও মধুর বাণী
পদলেহ করিয়াছ জীবনের প্রেয়॥

৪

[illegible] দল
[illegible]
[illegible] কত বনায় কবলে।
সাহিত্যের নাম দিয়া
জাহান্নবে উত'রিয়া
মাপিলে গাম্ভীর্য্য তার আপনার বলে॥

৫

ওরে দুট্য বলি শোন
আকাশে বসিয়া কোন
দেব দূত করিতেছে তোমায় তর্জ্জন।
কলঙ্কে সুনাম তার
কেন রে ভরিস আর
স্নেহ চোরা সে যে ছিল নয়ন মোহন॥

৬

At night bay the moon
ছড়াও আপন গুণ
প্রতিভার করিওনা মর্য্যাদা হরণ।
ক্ষুদ্ধ বক্ষে জোরে টানি
কেন ঘোষ তার গ্লানি
যাও whelp মিষ্ট পদ করগে লেহন॥

৭

এ সাহিত্য চিরদিন
রবে না এমন দীন
চাটুবাদী অর্দ্ধচন্দ্রে যাবে কোন দূর।
বেণুর মধুর স্বানে
বেণুর মধুর তানে
হবে মুগ্ধ মাতোয়ারা রসজ্ঞ চতুর॥

৮
নিজের নিজত্ব স্মরি'
মেরুদণ্ডে ভর করি'
প্রতিভা প্রতীক্ষা করে ভবিষ্যৎ লাগি।
এ নহে বুদ্বুদ খেলা।
এ নহে স্তবের মেলা
সত্য তার প্রাণে বাঁধা সত্য অনুরাগী,
থাকে সে প্রীতির তরে জাগি॥

৯
পায়ে পড়া হাতে ধরা
পকেট বোঝাই করা
যশের bolus কর ধনীরে বিক্রয়।
অমূল্য মহিমা তব
কূটবুদ্ধি অভিনব
জানি, কবি বসে আছে মনে পেয়ে ভয়॥

১০
Hudiblastic কবিতায়
বঙ্গদেশ ভেসে যায়
কে তাদের রসলীলা উল্লাসে বাখানে।
Mercenary land shark
উচ্চ রবে করি bark
চেষ্টা করে repparee কে মুকুট প্রদানে॥

১১
পবিত্রতা, প্রীতি পলে
সাহিত্য নির্ম্মল জলে
স্বপ্রকাশ শত দলে রাখে ফুটাইয়া।
হেথা যে কলঙ্ক আনে
মনুষ্যত্ব তার প্রাণে
কে বলিবে এক তিল আছে লুকাইয়া॥

১২
হেথা প্রেম, হেথা প্রীতি
হেথা বেদান্তের গীতি
হেথা সত্য বলে দেয় কোথায় সুন্দর।
হেথা মূর্ত্তিমতী ভক্তি
আনে প্রাণে ব্রহ্মশক্তি
সাধকে হেথায় করে অজর অমর॥

১৩
ওরে চাটু চিকণিয়া
লাঙ্গুল স্পন্দন নিয়া
সাহিত্যের তপোবন কর পরিহার
অর্থীর হৃদয় হরি
যত্নে তৈল ব্রক্ষ করি
প্রচার করহ গিয়া নিজ ব্যভিচার॥

১৪
সৌকুমার্য্য নিকেতন
সাহিত্যের তপোবন
ধূপ গন্ধে এই স্থান সদা বিলসিত।
হেথা খেলে কবিবাস
জয় দেব কালিদাস
নিত্য হেথা চণ্ডীদাস গায় নবগীত॥

১৫
হেথায় বঙ্কিম রবি
শ্রীমধুসূদন কবি
ফুটায়ে রেখেছে যত্নে কল্পনা মন্দার।
যাও colly দূরে যাও
যদি ভদ্রতায় চাও
খনিপদে নিজ মত করহ প্রচার॥

১৬
এ সাহিত্য চিরদিন
রবেনা এমন দীন
জেনে রেখ প্রতিভার হইবে আদর।
ঘেউ ঘেউ, ঘেউ ঘেউ
শুনিবেনা আর কেউ
মনে রেখে এই বেলা লও অবসর॥

১৭
লতিকা বিতান মাঝে
হেথা পিক কুহু গাজে
লীলাময় পুলকের এ যে তীর্থস্থান।
হেথা কবি পুষ্পলাব
নবরসে নবভাব
সংযোজিয়া ভাবুকের মুগ্ধ করে প্রাণ॥

১৮
কবিতা আসব পিয়া
মাতাল ভাবুক হিয়া
ইহারা চাহেনা স্তব স্তাবক তোমার।
El Dorado অন্বেষিয়া
আপনারে বিকাইয়া
প্রাণ ভরে কর গিয়া ভৈরব চীৎকার॥

১৯
এসো শান্তি ক্লান্তিহরা
এসো প্রেম প্রীতিভরা
এসো ভাব—প্রতিভার কুসুম বিকাশ।
পতিত জাতির বল
এস ধর্ম্ম নিরমল
কলুষ কুকুরে কর সর্ব্বাগ্রে বিনাশ॥

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

মাদাম ব্লাভাস্কির জীবন-কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অগ্নি পরীক্ষা।

মান্দ্রাজের খ্রীষ্টান-পাদ্রীগণ কোন দিনই পরাবিদ্যা-সমিতির প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন না। সুযোগ মত সমিতির এবং উহার প্রতিষ্ঠাতাগণের প্রতিকূল সমালোচনা করা ইঁহারা একটী কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিতেন। বস্তুতঃ খ্রীষ্টীয় সমাজের নিকট পরাবিদ্যা সমিতির অপ্রীতিকর হইবার অনেক কারণ ছিল। তন্মধ্যে এই গুলি প্রধান—

(১) পরাবিদ্যা সমিতি সকল ধর্ম্মকেই মুক্তির উপায় বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্ম ব্যতিরেকে মুক্তি ত নাইই, অধিকন্তু অখ্রীষ্টান মাত্রকেই অনন্ত নরক ভোগ করিতে হইবে।

(২) খ্রীষ্টান পাদ্রীরা আপন বিশ্বাসানুযায়ী ভারতে আলোক বিস্তার করিতে আসিয়াছেন। পরাবিদ্যা সমিতি বলেন, প্রাচী গগনেই প্রথম আলোকের সৃষ্টি। প্রাচ্যদেশজাত আধ্যাত্মিক জ্ঞানালোকেই অপরাপর দেশের অন্ধকার দূর করিতেছে!

(৩) খ্রীষ্টান-পাদ্রীগণ হিন্দুর শাস্ত্র, সামাজিক আচার ব্যবহার, দেবতা উপাসনা, প্রভৃতি বিকট চিত্রে অঙ্কিত করিয়া থাকেন। ঐ সকল অতীব হেয়,ঘৃণ্য, অসভ্যোচিত বলিয়া বর্ণনা করিয়া পুস্তক প্রকাশপূর্ব্বক নানা কৌশলে হিন্দুস্থানকে খ্রীষ্টধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। পরাবিদ্যা-সমিতি বেদাদি শাস্ত্রের অমূল্য সত্য সকল নিষ্কাশিত করিয়া, আর্য জ্ঞানের মহিমা শিক্ষিত সমাজে প্রচার পূর্ব্বক পাদ্রীগণের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া থাকেন।

"সত্যমেব জয়তে"—সত্যের জয় নিশ্চিত। কিন্তু স্বার্থে আঘাত পড়িলে অধিকাংশ লোকই বিচারশূন্য হয়। ক্রমশঃ সত্যের প্রচারে যতই খ্রীষ্টধর্ম্মের সাম্প্রদায়িক শিক্ষা দীক্ষায়, প্রসার প্রতিপত্তিতে বাধা জন্মিতে লাগিল, ততই পাদ্রীগণ বিচলিত হইতে লাগিলেন। সিংহলে ব্লাভাস্কি ও অলকটের বৌদ্ধধর্ম্মোন্নতির চেষ্টায় পাদ্রীরা কিরূপ অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, পাঠক তাহা বিদিত আছেন। তদবধি তাঁহাদের ক্রোধ ও ঈর্ষা প্রবলতর হইয়া ব্লাভাস্কি ও তাঁহার সমিতির উচ্ছেদ সাধনে সতত সুযোগ খুঁজিতেছিল। পাদ্রী-সমাজে অনেক উন্নত চরিত্র ব্যক্তি থাকিলেও তাঁহাদের কর্ত্তব্যের আদর্শ হইতে পরাবিদ্যা সমিতির কর্ত্তব্যের আদর্শ ভিন্ন। উপরে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, উভয়ের কর্ত্তব্য-পথ কতদূর বিভিন্নমুখী। পাদ্রীরা হিন্দুকে খ্রীষ্টান করিতে পারিলেই জীবন সার্থক মনে করেন। পরাবিদ্যা-সমিতি যেমন হিন্দুকে স্বীয় ধর্ম্মে আস্থাবান হইতে উপদেশ দিয়া থাকেন, তেমনি সকল ধর্ম্মের কুসংস্কার-বর্জ্জিত সত্য সকল উদ্ঘাটিত করিয়া প্রত্যেককে স্বীয় ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। মান্দ্রাজের পাদ্রীগণের নেতা প্রধানাচার্য্য লর্ড বিসপ মহোদয় স্বয়ং কোন সময়ে পরাবিদ্যা-সমিতির প্রতিকূল সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কর্ণেল অলকটের সহিত বাক্ বিতণ্ডার সৃষ্টি

করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে এই বিরোধী সমাজদ্বয়ের পরস্পর সংঘর্ষে যে হলাহল উত্থিত হইল, তাহাই আমাদের বক্তব্য।

১৮৭১ খ্রীঃ ব্লাভাস্কি সমুদ্র-মগ্ন হইয়া আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পাইয়া মিশরে উপস্থিত হন। সেই সময়ে মাদাম কুলম (Madame Coulomb) নাম্নী জনৈকা রমণীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয় কুলম ও তাহার স্বামী কেইরো (Cairo) নগরে একটা হোটেল চালাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ব্লাভাস্কি এই হোটেলে কিছু দিন আশ্রয় লইয়াছিলেন। কুলম্ আপনাকে একজন মিডিয়ম বলিয়া গর্ব্ব করিত। ব্লাভাস্কির প্রেততত্ত্বানুসন্ধান সভায় কুলমও যোগ দিয়াছিল। কয়েক বৎসর পরে, এই কুলম-দম্পতি অন্নবস্ত্রাভাবে নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া ব্লাভাস্কির শরণাপন্ন হয়। পূর্ব্ব পরিচয়ের অনুরোধে ব্লাভাস্কি তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার উদার মুক্ত হৃদয় শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে বিপন্নকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হইত না। স্ত্রী গৃহকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল, স্বামী চাকরির চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইত। ব্লাভাস্কি ও অলকটের প্রথম সিংহল যাত্রার অনতিপূর্ব্বে কুলমেরা বোম্বাই আইসে। উহাদিগকে উক্তরূপে গৃহে স্থান দিয়া তাঁহারা সিংহল চলিয়া যান। কুলম পত্নীকে এইরূপে এক প্রকার গৃহকর্ত্রীর পদে নিযুক্ত করাতে অনেকে অলকটের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু উহাদের কার্য্যপটুতা এবং ব্লাভাস্কির প্রতি একান্ত আজ্ঞানুবর্ত্তিতা দেখিয়া অলকট প্রীত হইয়াছিলেন। সেই জন্য উহাকে গৃহের তত্ত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে অলকট দ্বিধা করিলেন না।

কিন্তু কুলম দম্পতির নীচতা ক্রমেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। উহারা অনেক সময় সমিতির সভ্যগণের নিকট পীড়াপীড়ি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিত। ভবনগরের মহারাজার ভ্রাতা রাজকুমার হরসিংহজীর নিকট হইতে দুই সহস্র মুদ্রা সংগ্রহের জন্য কুলম-পত্নী নানা চেষ্টা করে। ব্লাভাস্কি ভবনগরে গিয়া ইহা জানিতে পারিয়া কুলমকে কঠোর শাসন করেন। তদবধি সে ব্লাভাস্কির শত্রুতাচরণে দৃঢ়সংকল্প হইল। এই ঘটনা ব্লাভাস্কির ইউরোপ যাত্রার প্রাক্কালে ঘটে। তাই তিনি উহাদিগকে কার্য্য হইতে অপসারিত করিবার এবং উপস্থিত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিবার অবসর পান নাই। কিন্তু তিনি ডাঃ হার্টমানকে বলিয়া গেলেন, সমিতির সহিত সংসৃষ্ট হইয়া কুলম যেরূপ নীচতার পরিচয় দিতেছে, তাহাতে তিনি ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আর উহাদিগকে আদিয়ারে দেখিতে ইচ্ছা করেন না। ব্লাভাস্কি ভবনগর হইতে একেবারে বোম্বাই গিয়া জাহাজে চড়িলেন। কুলম কপট দুঃখ জানাইয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। কিন্তু আসিবার সময় ব্লাভাস্কির সঙ্গীয় ভৃত্য বাবুলার নিকট অন্তরের গরল ঢালিয়া বলিয়া গেল,—"তোমার কর্ত্রী আমাকে যেমন দুই হাজার টাকা হইতে বঞ্চিত করিলেন, আমিও তেমনি ইহার প্রতিশোধ লইয়া তবে ছাড়িব।"

ব্লাভাস্কি চলিয়া গেলেন। কুলম প্রকাশ্যরূপে নিজ মূর্ত্তি ধরিবার অবসর প্রাপ্ত হইল। উহাদের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উহাদিগকে তিরস্কৃত ও চরিত্র সংশোধন করিতে সতর্ক করিয়া দিলেন। সমিতির প্রতি পাদ্রীদিগের মনোভাব ইহারা বিলক্ষণ অবগত ছিল। এক্ষণ মান্দ্রাজে যাতায়াত করিয়া সমিতিরদ

বিরুদ্ধে তাঁহাদের নিকট নানা কথা প্রচার করিতে লাগিল। কুলম-পত্নীকে ব্লাভাস্কির ও সমিতির বিরুদ্ধে ইতস্ততঃ নানা অপবাদ রটনা করিতে দেখিয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ উহার ঈদৃশ কৃতঘ্নতায় স্তম্ভিত হইলেন। সতর্ক করা সত্ত্বেও যখন উহারা এই নীচ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইল না, তখন সভ্যগণ ঐ দুষ্ট দম্পতীকে অপসৃত করিতে মনস্থ করিলেন। অন্যতম সভ্য ডাঃ হার্টমান দয়া করিয়া আমেরিকার কলোরেডো (Colorado) নামক স্থানে একটা স্বর্ণ খনিতে তাঁহার নিজের যে সত্ব ছিল, তাহা দিয়া উহাদের জীবিকার্জ্জনের সুবিধা করিয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন। উহারাও তথায় যাইবার আয়োজন করিতেছিল। ইতিমধ্যে একদিন বোধ হয় উহাদের পরামর্শদাতাদের উত্তেজনায়, উহারা সহসা সভ্যদের নিকট তিন সহস্র টাকা দাবি করিয়া বসিল। উহারা বলিল, উহাদের নিকট ব্লাভাস্কির নিজ হস্তে-লিখিত তাঁহারই অপবাদজনক অনেক পত্র আছে, টাকা না পাইলে ঐ সকল পত্র প্রকাশ করিয়া দিবে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উহাদের এই আস্ফালনে ভীত হইলেন না, উহাদিগকে উৎকোচ দিয়া কৃতার্থ করিতেও সম্মত হইলেন না। পরন্তু উহাদিগকে ডাকাইয়া উহাদের সম্মুখেই উহাদের কার্য্যকলাপ আলোচনা পূর্ব্বক উহাদিগকে পদচ্যুত করিলেন, এবং সমিতির বাটী ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ব্লাভাস্কি উহাদিগকে নিজ গৃহগুলির রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার আদেশ ব্যতীত উহারা বাটী ত্যাগ করিবে না বলিয়া গোলযোগ উপস্থিত করিল। অর্থাৎ, উহারা ব্লাভাস্কির গৃহে থাকিয়াই তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনে রত থাকিবে। যাহা হউক, তার যোগে জর্ম্মানি হইতে ব্লাভাস্কির অনুমতি গ্রহণান্তর কার্য্য নির্ব্বাহক সভা উহাদিগকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। মান্দ্রাজের পাদ্রী বন্ধুগণ অবিলম্বে উহাদিগকে আশ্রয় দান পূর্ব্বক স্বকার্য্য সাধনে উদ্যত হইলেন। তৎপরেই "Christian College Magazine" নামক পত্রে ব্লাভাস্কির ঘোরতর গ্লানিকর প্রবন্ধ প্রকাশ! শ্রীদামোদর ব্যথিত হৃদয়ে এই সকল কাহিনী বিবৃত করিয়া ব্লাভাস্কিকে পত্র লিখিলেন। তাহা তিনি জর্ম্মানিতে ১০ই সেপ্টেম্বর (১৮৮৪ খ্রীঃ) প্রাপ্ত হইয়া বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহার স্বভাবতঃ উত্তেজনাশীল চিত্ত এই ঘোর কৃতঘ্নতার কার্য্যে এবং উহাতে কতিপয় পাদরী পুঙ্গবের যোগদানের বৃত্তান্তে বিক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় মূর্ত্তি ধারণ করিল। ব্লাভাস্কির নিন্দা অপযশ চারিদিকে রটিত হইল। ইংরাজ-পরিচালিত সংবাদপত্র সমূহে ইহার স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। প্রবন্ধের সারাংশ তারযোগে লণ্ডনের টাইম্‌স্ (The Times) পত্রে প্রেরিত ও প্রকাশিত হইল, এবং বিলাতে ইহা লইয়া তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হইল। কাহারও কাহারও ধারণা ছিল, ব্লাভাস্কি শঠ,—ধারণা বদ্ধমূল হইল। কাহারও কাহারও সন্দেহ ছিল, ব্লাভাস্কির ক্রিয়াকাণ্ড বুঝি বা মিথ্যা, এইবার সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। অনেকের ব্লাভাস্কির প্রতি বেশ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু এইবার তাহাদের বিশ্বাস টলটলায়মান হইল। কেননা, ধর্ম্মযাজকগণ প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশ্যভাবে বলিতেছেন, ব্লাভাস্কির ক্রিয়াকলাপ অলৌকিক উপায়ে মহাত্মাদের সহিত পত্র-বিনিময় সূক্ষ্ম শরীরে মহাত্মাদের আগমন ও কাহারও ২ সহিত কথোপকথন, এ সকলই ব্লাভাস্কির প্রতারণা নানা কলকৌশলের

সাহায্যে এবং কুলমদিগের সাহচর্য্যে সম্পাদিত হইত।

অলকট নভেম্বর মাসে ভারতে প্রত্যাগমন করিলেন। ব্লাভাস্কি কুলম-চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষরূপে অনুসন্ধানের জন্য মিশর যাইবেন এবং তথা হইতে ভারতে আসিবেন, এইরূপ স্থির হইল। মান্দ্রাজের হিন্দুসাধারণ এবং কলেজের ছাত্রগণ অলকটকে সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়া জানাইলেন যে, পরাবিদ্যা সমিতি ও মাদাম ব্লাভাস্কির প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস পূর্ব্ববৎ অচল অটল, এবং কুৎসাকারীগণ তাঁহার চরিত্রের উপর যে দোষারোপ করিয়াছে, তাহা প্রকৃত পক্ষে ভিত্তিহীন ও ধিক্কারযোগ্য।

ব্লাভাস্কি লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া টাইম্‌স পত্রে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, কুলম-পত্রগুলি সমস্তই কৃত্রিম, উহার একখানাও তাঁহার লিখিত নহে। আরও দুই এক জন অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রতিবাদ করিলেন। তিনি প্রতিবাদ করিলেন সত্য, কিন্তু উহা তখন কে শুনে? তাঁহার ক্ষীণ স্বর নিন্দার চক্কারবে নিমজ্জিত হইয়া গেল। কুৎসার শত জিহ্বা তখন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহাতে লণ্ডন সমিতির এবং পাশ্চাত্য অন্যান্য শাখা সভার সভ্যবর্গের শ্রদ্ধার কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। তাঁহারা এই সকল নিন্দাবাদের মূলীভূত কারণ অবগত হইয়া ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং ব্লাভাস্কির প্রতি অটল বিশ্বাসের পরিচয় দিলেন। ব্লাভাস্কি লণ্ডন হইতে মিশরে গিয়া অলকটকে জানাইলেন যে, কুলমদিগের দুশ্চরিত্রতার যথেষ্ট প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। মিঃ লেডবেটার, (Mr. Leadbeater),—যিনি স্বয়ং একজন খ্রীষ্ট ধর্ম্মযাজক ছিলেন,—ব্লাভাস্কির সঙ্গে ছিলেন। তিনিও মিশর হইতে ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রে কুলমদের সেস্থলের কীর্ত্তি কথা কিছু কিছু প্রকাশ করিলেন।

ডিসেম্বর মাসে ব্লাভাস্কি ভারতে আগমন করিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আয়োজন হইল। সর্ব্ব সাধারণ হিন্দুগণ তাঁহার সম্মান প্রত্যুদগমন করিলেন। তাঁহার এই অভ্যর্থনায় সাধারণের মধ্যে যেরূপ উৎসাহ, উদ্যম, সরল সহৃদয়তা দৃষ্ট হইল, তাহাতে খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের অযথা নিন্দাবাদে যে তাঁহাদের চিত্ত কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। ক্রিশ্চিয়ান কলেজের (Christian Callege of Madras) শত শত ছাত্র এবং অন্যান্য কলেজের ছাত্রবৃন্দ দলবদ্ধ হইয়া ব্লাভাস্কির জন্য ঘোষণা পূর্ব্বক এক বিরাট সভায় তাঁহার অভিনন্দন করিল। অভিনন্দন পত্রে পঞ্চশতাধিক ছাত্রের স্বাক্ষর ছিল। ব্লাভাস্কি উপস্থিত হইবা মাত্র সমাজের মুকুট-স্বরূপ ব্যক্তিবর্গ-মণ্ডিত সমগ্র সভা দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করিল এবং সমস্বরে তাঁহার শুভ কামনা করিল। এই সভায় উক্ত কলেজের পাদ্রী অধ্যাপকগণও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা চক্ষুর সম্মুখে এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। ব্লাভাস্কিকে যে অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার মর্ম্ম এই—

"ইউরোপে জ্ঞানালোক বিতরণ করিয়া আপনি এখানে পুনরাগমন করিয়াছেন,—এতদুপলক্ষে আমরা আপনাকে অন্তরের সহিত অভ্যর্থনা করিতেছি। ভারতবর্ষ আপনার নিকট যে অসীম কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ, তাহার উপযুক্ত প্রকাশ অভ্যর্থনায় অসম্ভব। আপনি আধ্যাত্মিক সত্যের

প্রচারোদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। আপনার বিস্ময়কর গ্রন্থ 'আইসিস্ অনভিল্ড'-এর আলোকে আমাদের প্রাচীন ধর্ম্ম ও দর্শনাদির গূঢ় তত্ত্ব সকল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের বেদীর উপর স্থাপিত ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ-শিখাকে প্রোজ্জ্বল করিতে আমাদের প্রিয় কর্ণেল (অলকট) মহাশয় যে সুমহৎ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহার মূল আপনি।

'পৃথিবীর একাংশে যখন আপনি জ্ঞান বিস্তারে প্রবৃত্ত, তখন অপরদিকে শত্রুগণ আপনার গ্লানিকর কার্য্যে ব্যাপৃত। একটা তাড়িত ভৃত্যাকে অবলম্বন করিয়া ইহারা মান্দ্রাজনগরে আপনার নানা অপযশ রটনা করিয়াছে। ইহাদের এই সকল ব্যর্থ চেষ্টা অতীব ঘৃণাস্পদ। আপনি নিশ্চিত জানিবেন, আপনার প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, আপনার মনের উচ্চতা, উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব এবং নিষ্কাম আত্মত্যাগের উপরে এত দৃঢ়রূপে স্থাপিত যে, উহা কাহারও বিদ্বেষ বিজৃম্ভিত অপযশ রটনায় বিচলিত হইবার নহে। আর এরূপ হিংসা দ্বেষ ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারের ইতিহাসে নিতান্ত বিরল নহে। ইত্যাদি।"

ব্লাভাস্কি এই অভিনন্দনের মুক্ত সহৃদয়তার মর্ম্মস্পৃষ্ট হইলেন। তাঁহার চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইল। তিনি যে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, তাহার মর্ম্ম এই—

"আমার লিখিত বলিয়া যে সকল পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার এক খানাও আমার লিখিত নহে। পত্রগুলি একেবারে কৃত্রিম। এই অপবাদকারীদের প্রতি আমি নিয়ত সদয় ব্যবহার করিয়াছি। আজ কিনা তাহারাই বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগদান করিয়া আক্রমণ করিল! আমি ভারতের সেবা সম্পর্কে এমন কিছুই করি নাই, যেজন্য আমাকে লজ্জিত হইতে হইবে। যাহাই হউক না কেন, এই দেহ দ্বারা যতদিন পারিব, ভারতের সেবায় রত থাকিব। ইত্যাদি।"

ব্লাভাস্কি কখনও সাধারণ সভা সমিতিতে বক্তৃতা করিতেন না। অলকট বলেন, বোধ হয় ইহাই তাঁহার প্রথম ও শেষ বক্তৃতা।

এদিকে ভারতীয় সংবাদ পত্র সমূহও ব্লাভাস্কির প্রতি হিন্দু জাতির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন পূর্ব্বক সমস্বরে তাঁহার চরিত্রের গুণগান করিলেন। তন্মধ্যে কয়েকখানি প্রধান ২ পত্রের মত নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্র লিখিলেন, "হিন্দু সমাজ মাদাম ব্লাভাস্কির প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইয়াছে। কারণ হিন্দুর বিশ্বাস, এই মহিলার প্রতারণা বাহির করা মিশনরিদের একটা ছলনা মাত্র। তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শনকে আক্রমণ করা।"

ইণ্ডিয়ান ক্রোনিকল (Indian Chronicle) লিখিলেন "আমরা নিজে থিয়সফিষ্ট নহি। কিন্তু থিয়সফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতাদিগকে আমরা অতীব শ্রদ্ধা করি। বস্তুতঃ এই একটী সমিতি ভিন্ন বিদেশীয়দিগের অন্য কোন অনুষ্ঠানই ভারতের জাতীয় চিত্তকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। খ্রীষ্টীয় বিদ্রূপকারীরা বোধ হয় জানেন না যে, মহাত্মাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস ভারতবাসীর অন্তরে চির প্রোথিত। এবং মান্দ্রাজের পাদ্রীরা যে এই বিশ্বাসের কোন হানি করিতে পারিবেন, ইহা অসম্ভব। থিয়সফি শীঘ্রই এই সাময়িক অগ্নি পরীক্ষা হইতে মুক্ত হইয়া উজ্জ্বলাকার ধারণ করিবে।"

'অমৃতবাজারপত্রিকার' মন্তব্য—"থিয়সফি ব্রহ্ম বিদ্যার যে সকল বিষয় লইয়া আলোচনা

করে, খ্রীষ্টীয় অভিযোক্তারা তাহার ধারণা করিতে অক্ষম। যোগসিদ্ধিতে বিশ্বাসবান হিন্দু কখনও মহাপুরুষের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারে না। ভারতীয় সম্বাদপত্র সমূহের মতামত অনুধাবন করিয়া আমরা বুঝিতেছি যে, মিশনরিরা মহাপুরুষে অবিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা করিয়া সমস্ত ভারতবাসীর অবমাননা করিতেছেন।"

ব্লাভাস্কি ভারতে আসিয়া দুশ্চরিত্র কুলম-দিগকে শাস্তি দিবার জন্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। বৈষয়িক ব্যাপারে তিনি নিতান্ত অজ্ঞ ছিলেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি। অলৌকিক ক্রিয়ার যাহারা প্রমাণ পায় নাই, তাহারা উহা বিশ্বাস করিবে কেন? আর আদালতে এ সকল কথা প্রমাণযোগ্য কিনা, আহত হৃদয়ের আবেগ বশতঃ তখন ইহা তিনি বিচার করিতে পারেন নাই। তবে ব্লাভাস্কি একবার আদালতে আইসেন, তাঁহার শত্রুগণের তাহাই ইচ্ছা। কারণ 'হার—জিত' যাহাই হউক, অবমাননা-সূচক জেরামুখে তাঁহাকে একবার অপদস্ত করিয়া আমোদ উপভোগ করিবার সুযোগ তাহারা ত পাইবে! অলকট বহুদিন ব্যবহার-জীবীর কার্য্য করিয়া আইন আদালতের অভিজ্ঞতা যথেষ্টই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবেচনায় আদালতে এ বিষয় লইয়া যাওয়া সমীচীন বোধ হইল না। ব্লাভাস্কি প্রমাণ প্রয়োগের কূটতর্ক অত বুঝিতে চাহেন না। তিনি মনে করিলেন, তাহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার পক্ষে বিচারকের ন্যায়পরতাই যথেষ্ট এবং সকল বিচারককেই ন্যায়ের অবতার বলিয়া বুঝিতেন। অতএব তিনি অলকটের অসম্মতিতে ভারি অসন্তুষ্ট হইলেন। অবশেষে, অব্যবহিত পরেই বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সমিতির যে সাধারণ অধিবেশন হইল, তাহাতে শেষ নিষ্পত্তির জন্য এ বিষয় উপস্থিত করা হইল। এ বিষয়ে ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিবার জন্য সাধারণ সভাকর্ত্তৃক একটী কমিটী নিযুক্ত হইল। নানাদেশাগত প্রতি-নিধিগণের মধ্য হইতে কয়েকজন প্রধান ২ ব্যক্তিকে লইয়া এই কমিটি গঠিত হইল। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ আইন-ব্যবসায়ী ও বিচারক পদাভিষিক্ত ব্যক্তিরও অভাব ছিল না, যথা, ইণ্ডিয়ান মিরর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন, এটর্নি, সভাপতি; রাম স্বামীয়ার মাদুরার ডিষ্ট্রীকট রেজিষ্ট্রার; নৌরজি দোরাবজি খাণ্ডাল ভালা, জজ; নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট; টি সুব্বারাও, মান্দ্রাজ হাই-কোর্টের উকিল; শ্রীনিবাস রাও, জজ; পি, ইয়ালু নাইড়ু, ডিঃ কালেক্টর; রঘুনাথ রাও, ডিঃ কালেক্টর ইন্দোর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী; (স্যর) সুব্রহ্মণ্য আয়ার; মান্দ্রাজ হাইকোর্টের উকিল, পরে হাই-কোর্টের বিচারপতি, প্রভৃতি।

নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় তাঁহার ভ্রাতা নববিধানাচার্য্য স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় কোন অপযশকারীর বিরুদ্ধে যে মানহানির মোকদ্দমা আনিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, এজাতীয় মোকদ্দমায় বিবা-দীর অপেক্ষা বাদীর অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া থাকে, বহুবৎসর এটর্ণির ব্যবসায় করিয়া ইহাই তাঁহার ধারণা। জজ খাণ্ডালভালা বলিলেন, যে পত্রখানায় তাঁহার নাম আছে, উহা সম্পূর্ণ জাল। জেনারল মরগান বলি-লেন, কুলম প্রকাশিত সমগ্র পত্রই সম্পূর্ণ জাল। কিন্তু কেহই আদালতে যাইবার পরামর্শ দিলেন না। সর্ব্বজনমান্য সুব্রহ্মণ্য আয়ার প্রভৃতি খ্যাতনামা আইনজ্ঞগণ মোকদ্দমার

বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, আদালতে যাহা ধার্য্য হয়, অনেক সময়ে তাহা সত্যের বিপরীত; তদ্ভিন্ন আর এক কথা এই যে, এই সমিতি ইহার একটী প্রধান লক্ষ্য সকলের মধ্যে শান্তি ও সদ্ভাব স্থাপনরূপ কর্ত্তব্যপালনে রত থাকুন; কেহ নিন্দা করিলে তজ্জন্য আদালতে যাইয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করা ইহার পক্ষে অসঙ্গত। সমিতির পক্ষে যাহা বক্তব্য, তাহা পুস্তকাকারে সর্ব্ব সাধারণের অবগতির জন্য প্রচারিত হউক। ভ্রান্ত লোকেরা ইহাতে সত্যকথা জানিতে পারিবে।

প্রকৃতপক্ষে আদালতে সুফলের আশা অল্পই ছিল। তাহার একটী কারণ এই যে, মান্দ্রাজের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় সমিতির প্রতি অত্যন্ত বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিল। তাঁহাদের স্বজাতীয় বিচারক নিজ সম্প্রদায়ের প্রভাব প্রতিপত্তি ছাড়াইয়া উঠিতে পারিবেন কিনা, সেটী সন্দেহের কারণ হইয়াছিল। অলকট কোন সম্রান্ত সূত্রে অবগত হইয়া তাঁহার গ্রন্থে দুইজন হাকিমের মধ্যে গুপ্ত কথোপকথনের যে সারমর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায়, উক্ত সন্দেহ অমূলক ছিল না।*

* One fact reported confidentially by a very respected colleague of ours, made a deep impression on the mind of the Committee. He had overheard a conversation between two influential Madras civilians about Madame Blavatsky and the charges against her. In reply to a question by one of them as to what would be likely to happen, the other said, "I hope she will bring an action, for......who must try it, is determined to give the greatest latitude for cross examination, so that this d—d fraud may be shown up, and it is not at all impossible that she may be sent to the Andaman Islands—O. D. L., vol. III, P. 195.

ব্লাভাস্কি অগত্যা এই কমিটির সিদ্ধান্তে সম্মত হইলেন। পরদিবস সমিতির নবম বার্ষিক অধিবেশন সভায় ব্লাভাস্কি উপস্থিত হইলে, পৃথিবীর নানাদেশ হইতে সমাগত সার্দ্ধ সহস্র প্রতিনিধি সেই সুবৃহৎ সভামণ্ডপ প্রতিধ্বনিত করিয়া তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও স্নেহব্যঞ্জক উচ্চরোল তুলিলেন এবং বক্তাগণের মুখে তাঁহার নাম উচ্চারিত হইবা মাত্র তাঁহার জয়ধ্বনিতে দিগন্ত কম্পিত করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর সর্ব্বজাতীয় সভ্যবর্গের এই অবিচলিত বিশ্বাসের প্রমাণ পাইয়া ব্লাভাস্কির ক্ষতচিত্ত কতকটা সুস্থ হইল।

যাহা হউক, 'এস্-পি-আর'। (Society for Psychical Research) নামক বিলাতের পূর্ব্বোক্ত বিখ্যাত বিবুধজন-গঠিত 'মনস্তত্ত্বান্বেষী সমিতি' কিছুতেই সন্তুষ্ট না হইয়া ব্লাভাস্কির বিরুদ্ধে উক্ত অভিযোগের, তথা উহারই কমিটি সম্মুখে অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে অলকট প্রদত্ত সেই সাক্ষ্যের সত্যাসত্য নির্ণয়ার্থ জনৈক সভ্যকে ভারতে প্রেরণ করিলেন। মিঃ হজসন (Mr Richard Hodgson) নামক এই তরুণবয়স্ক সভ্য মহাশয় যথাকালে মান্দ্রাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি প্রথমতঃ পরাবিদ্যা-সমিতির সভ্যগণের নিকট উপস্থিত হওয়াতে তাঁহারা ইহাঁকে অতিথি জ্ঞানে সৎকারপূর্ব্বক যথোচিত ভদ্রতা ও যত্ন সহকারে ইহাঁর উদ্দিষ্ট অনুসন্ধান কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিলেন, এবং গৃহের তাবৎ স্থান ইহাঁর পরিদর্শনার্থ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

এস্থলে ব্লাভাস্কির ব্যবহৃত প্রকোষ্ঠগুলির একটু বর্ণনা আবশ্যক। বাটীর উপরের গৃহগুলি মাদামের নিজের থাকিবার জন্য

নির্দ্দিষ্ট ছিল। একটী প্রকোষ্ঠ 'তত্ত্ব-নিকেতন' (Occult room) নামে পরিচিত। এই স্থানটী সাধারণের সংস্পর্শ-শূন্য, এবং অত্যন্ত পবিত্রভাবে রক্ষিত হইত। ইহা একমাত্র তাঁহার ব্যবহারের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই গৃহে তাঁহার একান্ত অন্তরঙ্গ লোক ভিন্ন অপরের প্রবেশাধিকার ছিল না। ইহার সংলগ্ন অন্য একটী গৃহের প্রাচীরে একটী ছোট আলমারি ঝুলান ছিল। এই আলমারির মধ্যে মহাত্মাদের দুইখানি চিত্র, এবং তাঁহার তিব্বত বাসের চিহ্নস্বরূপ মহাত্মাদের স্মৃতিজড়িত দুই চারিটী সামগ্রী সযত্নে ভক্তির সহিত রক্ষিত ছিল। ব্লাভাস্কি চিত্রদ্বয় ও উক্ত দ্রব্যগুলির আধার স্বরূপ আলমারিটীর নাম দিয়াছিলেন,—'ঠাকুর ঘর' (The Shrine)। এই ঠাকুর ঘরের ভিতর দিয়া তিনি সময় সময় মহাত্মাদের প্রেরিত লিখিত আদেশ প্রাপ্ত হইতেন, এবং নিজের লিখিত প্রশ্নাদি নিবেদন করিয়া উহাতে স্থাপন করিলে তাঁহারা গ্রহণ করিতেন। বলাবাহুল্য, এই সকল ক্রিয়া যোগবলেই সম্পন্ন হইত। পাঠক ব্লাভাস্কির গৃহগুলির এই ব্যবস্থা-প্রণালী দেখিলেন।

ব্লাভাস্কির অনুপস্থিতিকালে সমিতির বিরুদ্ধাচারীরা প্রচার করিল, এই গৃহগুলির মধ্যেই গুপ্ত প্রবঞ্চনার কল কৌশল নিহিত ছিল। তবে আর একটী কথা এখানে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ব্লাভাস্কির শয়ন কক্ষটী অত্যন্ত বৃহৎ ছিল। এই কক্ষটী পর্দ্দাদ্বারা ভাগ করিয়া একাংশ তাঁহার শয়নের জন্য, এবং অপর অংশ অভ্যর্থনা গৃহরূপে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু ইহা সুবিধাজনক বোধ না হওয়াতে, সম্মুখস্থ বিস্তৃত উন্মুক্ত ছাদের এক পার্শ্বে তাঁহার জন্য একটী পৃথক শয়নকক্ষ নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব হয়। ইহা যখন স্থিরীকৃত হইল, তখন তিনি পীড়িত হইয়া ইউরোপ যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন। কুলমের স্বামী সূত্রধরের কার্য্যে ও শিল্প-কৌশলে অভিজ্ঞ ছিল। ব্লাভাস্কি আদিয়ার ত্যাগের কিছু পূর্ব্বে তাহাকে ঐ গৃহ নির্ম্মাণের ভার দিলেন। এই কার্য্য যখন চলিতেছে, তখন তিনি আদিয়ার ত্যাগ করিলেন। কুলম আপন মনে ঐ কার্য্য করিতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার পত্নী গৃহ রক্ষণা-বেক্ষণের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণ এই দুই ব্যক্তি নিরঙ্কুশভাবে ব্লাভাস্কি-গৃহের যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার যথেষ্ট অবসর প্রাপ্ত হইল। সুতরাং প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য, সমিতি ও ব্লাভাস্কির উচ্ছেদ মানসে, কুলম-দম্পতি দ্বারা কোনপ্রকার কল কৌশলের সৃষ্টি সম্ভাবনা বেশই ছিল। প্রকৃত পক্ষে হইয়াছিলও তাই। Philosophic Inquirer নামক পত্রের সম্পাদক পি, রঙ্গবেলু মহাশয়ের লিখিত উক্তিতে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি কুৎসা রটিবার পূর্ব্বেও ব্লাভাস্কির গৃহগুলি ভালরূপ দেখিয়াছিলেন, এবং পরেও পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, পাদ্রীগণ কর্ত্তৃক কুৎসা প্রচারের অব্যবহিত পরেই (ব্লাভাস্কি তখন ইউরোপে) ব্লাভাস্কির গৃহগুলি পরিদর্শন করিতে গিয়া দেখিলেন, পূর্ব্বোক্ত ঠাকুরঘর-সংলগ্ন প্রাচীরের বাহিরের দিকে, যেখানে পূর্ব্বে কোন ছিদ্রাদি ছিল না, সেখানে একটী গর্ত্ত খনিত হইয়াছে, এবং সেই গর্ত্তমুখে একটী স্প্রিংএর দরজা সংলগ্ন হইয়াছে। উহা খুলিলে, একটী ছোট বালক দাঁড়াইতে পারে, এরূপ একটী সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হইয়াছে, দেখা গেল। কিন্তু তথাপি সেই

বা সুড়ঙ্গের সহিত ঠাকুরঘররূপ আলমারিটার যোগ করা হয় নাই। অর্থাৎ তখনও কার্য্যটী সম্পূর্ণ হয় নাই। এই সকল নূতন পরিবর্ত্তন যে অল্পদিন মাত্র করা হইয়াছে, রত্নভেলু মহাশয় তাহার যথেষ্ট চিহ্ন দেখিতে পাইলেন।

ইহা দেখিয়া হজসন সাহেব ভাবিলেন, আর কি? ইহাই ব্লাভাস্কির প্রতারণার যথেষ্ট প্রমাণ! ইহা কে করিল, কখন হইল, এ সকল অনুসন্ধান করা তাঁহার বিচার-বুদ্ধিতে যুক্তিযুক্ত বোধ হইল না। কিন্তু কি ভারতবাসী কি ইউরোপীয়,সকলের সম্মানিত, স্যর সুব্রহ্মণ্য আয়ার মহোদয় বলিতেছেন, ব্লাভাস্কির ইউরোপ যাত্রার সময় প্রাচীর গাত্রে এসকল কাণ্ড কারকারখানার চিহ্ন মাত্রও ছিল না। * মিঃ সিনেট বলেন, তরুণ যুবক হজসন মান্দ্রাজের সাহেব সম্প্রদায়ের সঘন ভোজ নিমন্ত্রণে যোগদান করিতে লাগিলেন, এবং স্থানীয় পাদ্রীগণের কথা বাইবেলের ন্যায় সত্য বলিয়া মানিতে আরম্ভ করিলেন। ফলে এক অতীব অহেতুবাদ দুষ্ট ভ্রান্তময় রিপোর্টের উৎপত্তি হইল। হজসন সাহেব লিখিলেন, কুলম-প্রকাশিত পত্রগুলি বিশেষজ্ঞ লিপি-পরীক্ষকের মতে অকৃত্রিম বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এই লিপি-পরীক্ষকের কথার মূল্য কত, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। এই লিপি-পরীক্ষকের যোগ্যতাও যে উচ্চশ্রেণীর নহে, অলকট কতকগুলি উদাহরণ দিয়া তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন।

মিঃ হজসনের রিপোর্ট কিরূপ দুর্ব্বল ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাহা তাঁহার প্রধান সাক্ষী কুলমের চরিত্র হইতেই বুঝা উচিত। কুলম বলিতেছে, সে ব্লাভাস্কির প্রতারণার প্রধান সহকারী। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে এই স্বয়ং স্বীকৃত প্রতারকের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। যে পত্রগুলি তাঁহার প্রধান অবলম্বন, সেগুলি তিনি অলকট ও ব্লাভাস্কিকে দেখাইয়া তাঁহাদের মতামত জানিতে পারিতেন। কিন্তু এতটুকু ন্যায়পরতা প্রদর্শন করিতেও তিনি কেন কুণ্ঠিত হইলেন, তাহা বুঝা যায় না। যাহা লইয়া এত গোলযোগ, তাহা সত্য কিনা, ভদ্রতার অনুরোধেও ইহা মাদাম ব্লাভাস্কিকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন। কিন্তু ইহা তিনি একটীবারও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন না। ব্লাভাস্কি একখানা পত্রে দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"আজ পর্য্যন্ত আমাকে ঐ সকল পত্রের একটী পংক্তিও দেখান হয় নাই। কেন, মিঃ হজসন কি একখানা পত্রও দেখাইতে পারিতেন না? ইংলণ্ডের আইনানুসারে কি একজন রাস্তার ঝাড়ুদারকেও তাহার অজ্ঞাতে, তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার স্বপক্ষে একটীমাত্র কথাও বলিবার অবসর না দিয়া,—কখন সর্ব্ব সমক্ষে অভিযুক্ত করা হয়?"

হজসন সাহেব যে সকল অলৌকিক ব্যাপারের অনুসন্ধানার্থ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার কিছুমাত্র শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা ছিল না। সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ব্যাপারের অনুসন্ধানের পক্ষে আবশ্যকীয় আধ্যাত্মিক ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। অতএব তাঁহার অনুসন্ধানের ফলে সত্য নির্ণয় হওয়া দূরে

* "I saw no room for deception; no wire, no springs inside or outside the shrine, I requested permission to examine the shrine and was allowed to do so etc., etc," *Ibid.*

থাকুক, ভ্রম প্রমাদ ও জল্পনা কল্পনার অন্ধকার ঘণীভূত হওয়াই সম্ভব এবং তাহাই হইয়াছে। তাঁহার জানা উচিত ছিল, কেবল মান্দ্রাজে নহে, ব্লাভাস্কি যেখানে যাইতেন, সেইখানেই অলৌকিক ক্রিয়া কাণ্ড ঘটিত। এই জীবনী পাঠক জানেন, অলৌকিক ক্রিয়া ব্লাভাস্কির জন্মাবধি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘটিয়া আসিতেছে। তাঁহার জীবনের এই বিশেষত্ব দেখাইবার জন্য তাঁহার শৈশব ও বাল্যের অনেক প্রামাণ্য ঘটনা ইতঃপূর্ব্বে আমরা বিবৃত করিয়াছি।

হজসন সাহেবের ইহাও বিচার করিয়া দেখা উচিত ছিল যে, ব্লাভাস্কি প্রকৃতপক্ষে কুলম সাহায্যে প্রতারণা করিলে তাঁহার প্রতারণার প্রমাণগুলি উহাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া কখনই তিনি নিশ্চিন্ত মনে ইউরোপ যাত্রা করিতে পারিতেন না, এবং জর্ম্মানি হইতে ভারতে ফিরিবার পূর্ব্বেই ঐ প্রমাণ গুলির যথেষ্ট ব্যবহার করিবার অবসর দিয়া তাহাদিগকে কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিবার আদেশে সম্মত হইতেন না। ব্লাভাস্কিকে এরূপ নির্ব্বোধ মনে করিয়া তিনি অদ্ভুত বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। সূক্ষ্মদর্শী হিউম মহোদয় ষ্টেটস্‌ম্যান (The Calcutta Statesman) পত্রে ঠিক এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই এই সিদ্ধান্ত করিবেন। কিন্তু তরুণ বয়স্ক হজসন সাহেব সকল সহজ সিদ্ধান্তের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আত্মবুদ্ধির গরিমা অসীম।

যিনি পিতৃ-প্রাসাদের অনায়াস-লভ্য সুখবিলাস, লোকবাঞ্ছিত ধনজন, সম্পদ ও কুলগৌরব চির তরে বিসর্জ্জন দিয়া দারিদ্র্য আশ্রয় করিলেন, যিনি আমেরিকার সংযুক্ত রাজ্যের পৌরজনরূপে পরিগৃহীত হইয়া রুসিয়ার এক উচ্চরাজ-পুরুষের বিধবার ন্যায্য প্রাপ্য বার্ষিক পঞ্চসহস্র মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট আয় অবলীলা ক্রমে উপেক্ষা করিয়া এক মহৎ লক্ষ্য সাধনাদ্দেশ্যে পৃথিবীর কঠোর পথে বাহির হইয়া পড়িলেন, সেই ব্লাভাস্কি কোন্ লাভের প্রত্যাশায় এই প্রতারণার কার্য্য করিবেন? এ প্রশ্ন স্বতঃই উত্থিত হইতে পারে। মিঃ হজসন পশ্চাৎপদ হইবার লোক নহেন। তিনি ব্লাভাস্কির প্রতারণার যে উদ্দেশ্য বাহির করিয়াছেন, তাহা শুনুন। তিনি লিখিয়াছেন, ব্লাভাস্কি প্রকৃত পক্ষে ছদ্মবেশী রুসিয়ার গুপ্তচর—ভারতের নির্ব্বোধ লোক গুলাকে ফাঁকা ধর্ম্মের কথায় ভুলাইয়া এবং গবর্ণমেণ্টের চক্ষে ধূলি দিয়া এদেশে বাস করাই তাঁহার উদ্দেশ্য! পাঠক জানেন, স্বয়ং ভারত-গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ের অনুসন্ধান পূর্ব্বক ব্লাভাস্কিকে সকল প্রকার রাজনৈতিক সংস্রবের সন্দেহ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। হজসন সাহেব ইহার কোন সংবাদ রাখিতেন কিনা, জানি না। কিন্তু তাঁহার উর্ব্বর কল্পনা যে গবর্ণমেণ্টের সাবধান অনুসন্ধান ফলকেও অতিক্রম করিয়া সেই মৃত গুপ্তচর তত্ত্বটীকে কবর হইতে টানিয়া তুলিয়া পুনর্জ্জীবিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অলকট সিলেট প্রভৃতি S. P. R. কমিটির নিকট যে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্ব-প্রস্তুত বা লিখিত সাক্ষ্য নহে। বর্ণিত ঘটনা সম্বন্ধে স্মৃতিই তখন তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন ছিল, এবং বন্ধুভাবেই তাঁহাদের সাক্ষ্য প্রদত্ত হয়। ইহার দুই একস্থানে ভ্রম থাকা, অবশ্যই ঘটনা-বিবৃতিতে তত্ত্ব সম্বন্ধে নহে, অসম্ভব নহে। হজসন সাহেব এইরূপ দুই একটী ছিদ্র বাহির করিয়া সমস্ত অলৌকিক ঘটনাই মিথ্যা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অলকট অবশ্যই জানিতেন না যে, তাঁহাকে এইরূপে বিড়ম্বিত হইতে

হইবে। ইহা তিনি পরে বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছেন—

"কমিটি জীবিত মহাত্মা সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধাপূর্ণভাব, উদ্দেশ্য ও মতামত একেবারে পদদলিত করিয়া আমাদের সাক্ষ্যের যথেষ্ট অপব্যবহার করিয়াছেন। আমাদের সমিতিকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া উহাকে ভূমিসাৎ করা এবং তৎস্থানে আপনাদের সভার একাধিপত্য স্থাপন করাই উহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রিপোর্টটী আগাগোড়া এই উদ্দেশ্যের পরিচায়ক।*

আমাদের বোধ হয় S.P.R. সভা পরাবিদ্যা সমিতিকে কেবল যে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিত, তাহা নহে, কিন্তু কোন ২ অংশে ঘোর পরিপন্থীও মনে করিত। ইহার এক কারণ এই যে, প্রেততত্ত্ব লইয়া S. P. R. অনুসন্ধান করিতেন, সেই প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে ব্লাভাস্কির মতের সহিত উহাঁদের বিষম বিরোধ ছিল। আমেরিকার প্রেতাহ্বান-চক্র-গুলির উপর ব্লাভাস্কির সুতীক্ষ্ণ মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, প্রেতদৃশ্য সম্বন্ধে প্রেততাত্ত্বিকেরা যাহা মনে করেন,তাঁহার মতে উহা ভ্রমজালে জড়িত। এই মত-বিরোধের জন্য ব্লাভাস্কিকে প্রেততাত্ত্বিকদের নিকট অনেক আক্রমণ সহ্য করিতে হইয়াছে, ইহাও আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এই বিরোধের তরঙ্গ পাশ্চাত্য দেশের যাবতীয় প্রেততাত্ত্বিককে আঘাত করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? S. P. R.এর সভ্যরা মহা বৈজ্ঞানিক হইলেও যোগতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন, এবিষয়ে তাঁহাদের ধারণা, মিডিয়ম-ঘটিত ক্রিয়া পর্য্যন্ত। তাঁহারা ব্লাভাস্কির যোগবল-সম্পন্ন-ক্রিয়া, যোগসিদ্ধ মহাত্মাদের স্থূল দেহ হইতে সূক্ষ্মদেহে অনায়াসে নিষ্ক্রমণ ও স্থূল মূর্ত্তি প্রকটন প্রভৃতি সন্দেহের চক্ষে দেখিবেন, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আজকাল সেই মিডিয়মৈক গতি S.P.R.এর যে দুই একজন সভ্য 'ক্রমশঃ বিজ্ঞতম' হইয়াছেন, তাঁহারাও উক্ত সভার গণ্ডির বহির্ভূত বিষয়ে আপনাদের উচ্চস্তরের অভিজ্ঞতা সাধারণ সভ্যগণ সমক্ষে ভয়ে ভয়েই প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু সেই সময়ে অহমিকাপূর্ণ বৈজ্ঞানিক অবিশ্বাস খ্রীষ্টীয় পাদ্রী সম্প্রদায় দুর্লভ আধ্যাত্মিক অন্ধ-বিশ্বাসের সহিত সন্ধিসূত্রে মিলিত হইয়া উভয়ের তুল্য শত্রু পরাবিদ্যা সমিতি এবং উহার প্রতিষ্ঠাত্রীকে কুলম ছিদ্র অবলম্বনে সমূলে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল। এই অভিসন্ধি ফলে সমিতির অস্তিত্ব যায় যায় হইয়াছিল।

যাহা হউক, ঝড় কাটিয়া গিয়াছে। মুহুর্মুহু ভীষণ বজ্রপাতে সমিতির ও ব্লাভাস্কির যশোভিত্তি কিছু সময়ের জন্য কম্পিত হইলেও উহা অধিকতর দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইতেছে। এই মারাত্মক অগ্নি-পরীক্ষা হইতে তিনি অক্ষত দেহে নির্গত হইয়াছিলেন, এবং এক্ষণ তাঁহার স্মৃতি ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর রূপে জগৎ সমক্ষে প্রকাশিত হইতেছে। আর আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই মিঃ হজসন অতঃপর আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাঁহার বৈজ্ঞানিক কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া বিশ্বাসের পথে আসিয়াছিলেন। এই

* "So we simply made ourselves the easy game of a Committee who cared not a whit about our feelings, motives, or opinions, but concerned themselves chiefly in trying to break down the standing of the great rival society, and sweeping our rubbish off the ground, which they aimed at occuping alone. This is the tone that seems to run through the whole Report." O. D. L. Vol. III. P. 104.

সময়ে তাঁহার রিপোর্ট লিখিত হইলে নিশ্চিতই উহা পূর্ব্বোক্ত ভ্রমপ্রমাদ ও হঠকারিতা হইতে অনেকাংশে মুক্ত হইতে পারিত। কিন্তু যিনি জীবনে কখনও কাহারও অনিষ্ট করেন নাই, সেই ব্লাভাস্কির ন্যায় সদা মানবকল্যাণ-রতা একজন মহানুভবা মহিলাকে তিনি যেরূপ নৃশংসভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে কি? সত্য বটে মিথ্যা হইতে সত্যের দিকে তাঁহার এই বিশ্বাস পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকেও নিন্দিত ও উপহসিত হইতে হইয়াছে।* কিন্তু একজন নিরপরাধা রমণীকে জগৎসমক্ষে লাঞ্ছিত করিবার ইহাই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত কি?

এই রিপোর্ট যখন ব্লাভাস্কির হস্তগত হয়, তখন তিনি পুনরায় কঠিন পীড়ায় এক প্রকার মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তদবস্থায় ব্যথিত হৃদয়ে তিনি ঐ রিপোর্টের উপর স্বহস্তে যে মন্তব্য লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা এই—

"মাদাম ব্লাভাস্কি শীঘ্রই মরিয়া যাইবে। মৃত্যুছায়ায় শায়িত ব্লাভাস্কি তাহার S. P. R. এর বন্ধুদিগকে এই কথা বলিয়া গেলেন, আমার অকাল মৃত্যুর সাক্ষাৎ কারণ এই সকল ক্রিয়া (জনিত জীবনী শক্তি ক্ষয়)। কিন্তু আমি মরিয়া গেলেও এইরূপ ক্রিয়া জীবন্তভাবে ঘটিতে থাকিবে। তবে বাঁচি বা মরি,আমার বন্ধু ও ভ্রাতাবর্গকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা কখনও এসকল প্রকাশ না করেন, কখনও যেন তাঁহারা সাধারণের কৌতূহল বা বিজ্ঞানের শূন্য গর্ব্ব চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহাদের শান্তি ও সম্মানকে বিসর্জ্জন না দেন। পুস্তকখানা পড়িয়া দেখ! আমার তথাকথিত বন্ধুগণ প্রচারিত এই ক্ষুদ্র পুস্তকের কয়েকখানা পাতার মধ্যে আমার উপর যেরূপ ভিত্তিহীন নিন্দা, ঘৃণ্য সন্দেহ ও অপযশবাণী বর্ষিত হইয়াছে, আমার বিষাদপূর্ণ দীর্ঘজীবনে কোন নিরপরাধা স্ত্রীলোকের উপর এরূপ কখনও দেখি নাই। মৃত্যুশয্যা শায়িতা এইচ পি ব্লাভাস্কি। আদিয়ারণ ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৫ সাল।"

ব্লাভাস্কি একখানা পত্রে লিখিয়াছেন,—"আমি বহু শতাব্দী পূর্ব্বের কোন অপরাধের জন্য আজ এই ফল ভোগ করিতেছি। কিসের জন্য আমার এই শাস্তি, তাহা আমি জানি। আমি অবনত মস্তকে কর্ম্মফল স্বীকার করিয়া লইতেছি এবং আমার গুরুদেবের চরণে আত্ম সমর্পণ করিতেছি। কিন্তু আমি কর্ম্ম এবং গুরুর নিকটই অবনত। কখনও পাদ্রীদের নিকট অথবা তাঁহাদের ভীতি প্রদর্শনে মস্তক অবনত করিব না। তুমি তাঁহাদের অবগতির জন্য এ কথা প্রকাশ করিতে পার।

ইহা যে তাঁহার জন্মান্তরীন কর্ম্মফল, তাহাতে হিন্দুর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু হায়! বিধি-বিড়ম্বনায় অনেক জগৎপূজ্য ব্যক্তিকে এই কর্ম্মফলের তিক্তস্বাদ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। গেলিলিও সক্রেতিশকে প্রচলিত মতবিরোধী সত্য প্রচারের জন্য ধর্ম্মদ্বেষী বলিয়া নিহত করা হইয়াছে। আরিষ্টটলের (Aristole) প্রতিভা তাঁহার অনেক শত্রুর সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার প্রতি

* Dr. Hodgson, the writer of the S. P. R. report became a believer in phenomena for more wonderful than those which he denied in his youthful self-confidence, and also became himself the victim of misrepresentation and ridicule.—"H. P. B. and the Masters of wisdom." by Mrs. Besant.

আক্রমণের উদ্যোগ হইলে তিনি দেশ ত্যাগ, আত্ম ত্যাগ করিয়া আত্ম রক্ষা করিলেন. বলিয়া গেলেন,—"আমাকে শাস্তি দিয়া আথেন্স নগরী দ্বিতীয়বার দর্শন জ্ঞানের বিরুদ্ধে অপরাধী হয়, ইহা আমি ইচ্ছা করি না, সেই জন্য পলাইলাম।

আশ্চর্য্যের বিষয়, একদিকে যেমন জগৎ এই সকল দেবচরিত্র মানবদিগের অভিনব শিক্ষায় উপকৃত হইতে থাকে, অপরদিকে তেমন ইঁহাদের উপর অজস্র গ্লানির কুলিশাঘাত হইতে থাকে, একদিকে তাঁহাদের প্রচারিত সত্য পৃথিবীময় ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতে থাকে, অপরদিকে কতকগুলি লোক সেই সত্যের দুর্ব্বার স্রোতে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর হয়। পরিণামে কাহার জয় হয়, ইতিহাস বহুবার তাহার সাক্ষ্য দিয়াছে। * ধর্ম্মজগতের যাঁহারা আলোক-স্তম্ভস্বরূপ, সেই মহাপুরুষদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথিবীতে এমন কোন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন নাই, যিনি নিন্দা ও নির্য্যাতনের হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পাইয়াছেন। নিন্দার বিষাক্ত সুদীর্ঘ জিহ্বা সমুদ্রের ন্যায় গভীর-চরিত্র মহাত্মাগণের অঙ্গকেও স্পর্শ করিয়াছে, আকাশের ন্যায় উচ্চ উদারহৃদয় মহাপুরুষগণের উপরেও হলাহল উদ্গীর্ণ করিয়াছে। হে নিন্দা-বিষধর! তোমার বক্র ও কুটিল গতি বোধ হয় সর্ব্বত্রই অপ্রতিহত। তুমি নিরন্ধ্র লৌহ গৃহেও প্রবেশ করিয়া যশোলক্ষ্মীর অঙ্কশায়িত কত কত লক্ষীন্দরকে দংশন করিয়াছ, তাহার ইয়ত্তা নাই। সৌভাগ্যের বিষয়, তোমার চেষ্টা আশু ফলবতী হইলেও মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অচিরকাল মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের তপস্যা ও কীর্ত্তিরূপিণী বেহুলা সময়ে তাঁহাদিগকে বিষনির্মুক্ত করিয়া জীবনদান করিয়াছে। ইহা সত্য, কিন্তু তুমি নিয়তই পূতচরিত্র মহাত্মাগণের জীবনে ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বেড়াও, এবং যেখানে কোন ছিদ্র নাই, সেখানেও ছিদ্র খুঁজিয়া লইতে তোমার বিলম্ব হয় না। কঠোর তপস্বী মহাযোগী খ্রীষ্ট, বিশুদ্ধাত্মা বুদ্ধ, প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ কি তোমার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছে? তুমি ইঁহাদের স্বর্ণ মূর্ত্তির উপরেও কলঙ্ককালিমা লেপন করিয়াছ। আর মাদাম ব্লাভাস্কি? তাঁহাকেই বা তুমি ছাড়িবে কেন? তিনি ত মহাপুরুষগণেরই পথাবলম্বী। তিনি ত তাঁহাদেরই জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোক জগৎ ধারণ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনিত তাঁহাদেরই পদাঙ্ক-চিহ্নিত মার্গকে প্রশস্ত করিতে, নিষ্কণ্টক করিতে, যুগোপযোগী করিতে এবং অধুনাকার জড়বিজ্ঞানের কঠোর আগ্নেয় শকটের ঘর্ঘরধ্বনিসংযুক্ত গুরু নিষ্পেষণে ভারসহ করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে প্রভুকে ছাড়ে নাই, সে প্রভুর অনুচর সেবককে ছাড়িবে, ইহা কখনই আশা করা যায় না।

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ।

---

* অলকট বলেন, বিরুদ্ধাচারীদের অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও ব্লাভাস্কির নিন্দা রটনার সময়ে সমস্ত পৃথিবীতে সমিতির শাখা সংখ্যা ছিল ৯৭টী মাত্র, আর ১৮৯৭ সালে হইল ৪৯২।" বর্ত্তমান সময়ে সমিতির বহুবিস্তৃতি হইতেও বুঝা যায়, ইহা দ্বারা মানব সমাজ কতদূর উপকৃত হইয়াছে।

পুণ্যশীলা কবি হেমন্তবালা দত্তা।(২)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমাদের পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেব আমাদিগকে শৈশবাবধি সুন্দর সুন্দর ব্রহ্মসঙ্গীত শিখাইতেন এবং আমরা তাঁহার সহিত ভগবদারাধনাদিতে যোগ দিলে অতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন। তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মজীবনের প্রভাব হেমন্ত-জীবনে বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল। ইদানীং আমার কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠতাত-ভ্রাতা ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেকটর শ্রীমান মণীন্দ্রভূষণ দত্ত, M.A. B. L. এর পুণ্যচরিত্রজ্যোতি হেমন্ত-হৃদয়ে উজ্জ্বলতররূপে প্রতিভাত হইতেছিল। সে তাহারই উপদেশক্রমে বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থ ও সাধুজীবনী পাঠে একান্ত অনুরাগিনী হইয়াছিল। অধুনা "ম্যাডাম গেয়োঁ" পুস্তকখানি সে অতিশয় ভালবাসিত এবং গত কয়েক-বৎসর পর্য্যন্ত সে পিতৃদেবের ও শ্রীমান মণীন্দ্রভূষণের আদর্শানুসারে প্রতি দিবসের কিছুকাল সময় নির্জ্জন চিন্তা ও ধ্যানধারণায় যাপন করিত। বিগত ১৩১৫ সালে হেমন্তের অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাহার জীবনে এক অত্যাশ্চর্য্য ভৌতিক ঘটনা ঘটে; ইহার পর হইতেই পূজনীয় জ্যেষ্ঠতাত প্রভৃতি গুরুজনের উপদেশানুসারে তাহার নির্জ্জন ধ্যানধারণাদির গভীরতা আরও বৃদ্ধি পায় এবং সে আরও দৃঢ়ভাবে দেবানুরক্তা হয়।

বাস্তবিক হেমন্তের অন্তর বাহির কি অপার্থিব উপাদানে ঘটিত ছিল, তাহা এক কথায় বুঝিতে গেলে পিতৃদেবের প্রিয় একটী ব্রহ্মসঙ্গীতের কতকাংশ মনে পড়ে। তিনি এ গানটী আমাদিগকে ছেলেবেলায় শিখাইয়াছিলেন। আমার ভাল মনে না থাকিলেও হেমন্তকে মধ্যে মধ্যে অস্পষ্টকণ্ঠে মধুর সুরে গাইতে শুনিতাম—

সুকৃতি প্রেম-প্রকৃতি স্বর্গেতে বসতি গো।
হাসি হাসি ভালবাসি মিষ্টভাষী আমি গো॥
জানিলে কটু কর্কশ, ঝরিতেছে সুধা-রস,
মধুর স্বভাব আমার ফুলের মতন;
পরসেবা-ব্রত আমার অনন্ত জীবন গো।
স্বর্গে ভক্ত পরিবারে, পৃথিবীতে ঘরে ঘরে,
বেড়াই আমি সেবা করে সবে অনুক্ষণ;
করি আমি সুখ শান্তি মিলন বিধান গো॥"

হেমন্তের আদর্শ-হেমন্তের জীবন সত্য সত্যই এ গানটীর মধ্যে জীবন্ত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে! যদি এ গানটীর প্রত্যেকটী ভাব আমরা গভীরতররূপে অন্তরে বুঝিতে ও ধরিতে পারি, তবে আর পুণ্যশীলা হেমন্তকে বাহিরে অন্বেষণ করিতে হইবে না।

এক্ষণে হেমন্তের কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। আমার যতদূর স্মরণ হয়, হেমন্তের প্রথম কবিতাটী "বামাবোধিনী পত্রিকা, "কিম্বা অধুনা-লুপ্তা "পরিচারিকা"পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

তারপর তাহার বহু কবিতা "সুপ্রভাত, "ব্রহ্মবিদ্যা", "মালঞ্চ", 'বাঁশরী", "প্রভাত" "বামাবোধিনী পত্রিকা"প্রভৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছে। "মালঞ্চ" "বাঁশরী ইত্যাদির কৃতবিদ্য সম্পাদকগণ হেমন্তের কবিতা প্রবন্ধ

বহুবার আপনাপন পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান দান করিয়া তাঁহাদের যথার্থ গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। বিগত ১৩২০ সালে চট্টগ্রামে যখন "বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হয়, তখন হেমন্তের "মাঙ্গলিক" নামক একটী সুদীর্ঘ কবিতা "সম্মিলনে" পঠিত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে "বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে" আর কোন মহিলার কোন রচনা পড়া হইয়াছে কিনা, আমি জানি না।

হেমন্ত অতি দ্রুত কবিতা লিখিতে পারিত। সে লোকান্তরিতা হইবার কিছুকাল পূর্ব্বেও দৈনিক পাঁচ ছয়টী করিয়া কবিতা লিখিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার প্রত্যেকটী কবিতা আমাকে দিয়া সংশোধন করাইয়া না লইলে, সে কিছুতেই তৃপ্তা হইত না এবং তাহার অধিকাংশ কবিতার নামকরণ করিবার ভার আমাকে দিত। আমি নিজে প্রথম নাম ঠিক করিয়া তারপর কবিতা বা প্রবন্ধ লিখিয়া থাকি, হেমন্তের স্বাধীন হৃদয়খানি বুঝি এ সামান্য বন্ধনটুকুও মানিতে চাহিত না! অধুনা হেমন্তের কবিতাগুলি আমি শুধু একবার দেখিয়া দিতাম, কোথায়ও একটী অক্ষরও পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যক হইত না, বরং অনেক সময় আমার মনে হইত, বুঝিবা এমন সুন্দর কবিতা আমি নিজেও লিখিতে পারি না, তাহা আমি আর সংশোধন করিব কি?

হেমন্তের কবিতাগুলি সাধারণতঃ বড় সরল ও সুমিষ্ট ছিল, ভাব যেন ভাষা ও ছন্দের নিগড় ছিন্ন করিয়া, কোন্ এক অজ্ঞাত অতীন্দ্রিয় রাজ্যে প্রিয়তম প্রাণেশ্বরের সন্ধানে একান্ত ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া যাইত। মুমুক্ষু মানবাত্মার এমনি মধুর বোধন-সঙ্গীতে পূর্ণ হইয়া হেমন্তের প্রথম কবিতা পুস্তক ক্ষুদ্র "শিশির" তাহার বিশবৎসর বয়সে ১৩১৭ সালে প্রকাশিত হয়। "শিশিরের" নামকরণ ও প্রকাশের একটুখানি ইতিহাস আছে।

১৩১৭ সালের বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাস হইবে, হেমন্ত তাহার নিজের বাড়ী যাইবার জন্য সজলনয়নে জিনিসপত্র গুছাইতেছে, আমি হঠাৎ বলিলাম, আমিও শীঘ্র কাশী বেড়াইতে যাইব; কিন্তু সেখানে যাইবার আগে আমি তোমার একখানা বই প্রকাশ করিয়া যাইতে চাই। তুমি বাড়ী পৌঁছিয়া তোমার কবিতার খাতাগুলি আমাকে পাঠাইও, আমি কবিতা নির্ব্বাচন করিয়া দিব। হেমন্ত তাহার বাষ্পাকুল আঁখি দুইটী তুলিয়া বলিল, দাদা, আমার তো বেশী কবিতা নাই। আমি বলিলাম "যাহা আছে, তাহাতেই হইবে।" তখন হেমন্ত জিজ্ঞাসা করিল "কিন্তু দাদা! বইর নাম কি হইবে?" সত্যই তো! এ কথা যে আমি কখনও ভাবি নাই! ছোট বোনটীর একখানি ছোট বই ছাপাইয়া জন্মভূমির নিকট বিদায় লইব, এই শুধু আমার ইচ্ছা ছিল। বাণী পূজায় দাদার উপরে একান্ত নির্ভরশীলা বোনটী যে সেই বইখানির নামটীর জন্যও দাদার উপরে নিভর করিবে, তাহা কখনও আমার কল্পনাতেও আসে নাই। তথাপি এক-মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা না করিয়া আমি উত্তর দিলাম, "তোমার বইর নাম শিশির দিব। হেমন্তের শিশির এ কথাদুইটীর মধ্যে যে কতখানি কবিত্ব লুকান আছে, তখন তাহা বুঝিবার মত সময় আমাদের ছিল না। বঙ্গের সূক্ষ্মদর্শী মনীষী সমালোচকগণের দৃষ্টিতে পরে সেই কবিত্ব সৌন্দর্য্যটুকু ধরা পড়িয়াছিল।

যথাসময়ে হেমন্তের কবিতার খাতা পাইলে আমি বিশটী মাত্র শ্রেষ্ঠ কবিতা

নির্ব্বাচন করিলাম—ক্ষুদ্র শিশির রচিত হইল। কয়েকদিন পরে হেমন্ত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলে দেখিলাম, সে শিশির আমাকেই উৎসর্গ করিয়াছে এবং আমাকে একটী ভূমিকা লিখিয়া দিবার জন্য লিখিয়াছে।

আমার প্রথম পুস্তক অঞ্জলি পিতামাতার শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, হেমন্তও তাহার শিশির খানি পিতামাতা কিম্বা তাহার পতিদেবতাকে উৎসর্গ করিবে। কিন্তু সে তাহার ক্ষুদ্র বহিখানি অযোগ্য দাদার হাতেই তুলিয়া দিল। সে যে দাদাকে বড়ই স্নেহ করিত!

যাহা হউক, আমি শিশিরের ভূমিকা নহে, উচ্ছ্বাসিত প্রাণে দাদার আশীর্ব্বাদ তাহাতে সন্নিবেশিত করিয়া পুস্তকখানি মুদ্রনার্থ আমার আবাল্য সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ ঘোষাল, এম. এ. বি. এল, মহাশয়ের নিকটে কলিকাতায় পাঠাইলাম। এই সূত্রে মিত্রোত্তম রামপ্রসাদ আমাদিগকে একটী অমূল্য বন্ধুরত্ন দান করিলেন—শিশিরের প্রুফাদি সংশোধনের ব্যপদেশে আমি বর্ত্তমানে আমার সোদরাধিক সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র, বি. এল মহোদয়ের সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিলাম। শিশিরের নির্ম্মল স্নিগ্ধতায় তিনি যেন বিধাতার আশীর্ব্বাদরূপে ধরা দিলেন; হেমন্তের পরবর্ত্তী কাব্য "মাধবীতে" এ বন্ধন আরও দৃঢ়তর ও ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে, সে কথা পরে লিখিতেছি।

বন্ধুযুগলের ঐকান্তিক চেষ্টায় ক্ষুদ্র "শিশির" দুইটী মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হইল। এ পর্য্যন্ত চট্টগ্রামের আর কোন মহিলার রচিত কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই, হেমন্তই এ গৌরবের সর্ব্বপ্রথম অধিকারিণী। আমাদের আনন্দ ও উৎসাহের সীমা রহিল না। আমি নানা স্থানে শিশির পাঠাইতে লাগিলাম। অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিলাম, "শিশির" শিশির বিন্দুর মত আকারে ক্ষুদ্র হইলে কি হয়, উহার নির্ম্মল সৌন্দর্য্যটুকু বঙ্গের মনীষিসমাজের সস্নেহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। "পড়িয়া স্যার গুরুদাস লিখিলেন—"কবিতাগুলি গভীর ভাবপূর্ণ ও মধুর ভাষায় লিখিত।" সারদাবাবু লিখিলেন "শিশির কোমলত্ব ও কবিত্বপূর্ণ। বাঙ্গালাসাহিত্য-ভাণ্ডারে উচ্চাসন পাইবে।" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখিলেন—"শিশির পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। কবিতাগুলি সুন্দর হইয়াছে। প্রতিছত্রে ভগবৎ ভক্তি উচ্ছ্বাসিত হইতেছে।" কবি মানকুমারী লিখিলেন"শিশির সুন্দর হইয়াছে। মা বীণাপানি হেমন্তকে তাহার দাদার সুযোগ্য সহোদরা করুন, এই আশীর্ব্বাদ করি।" নব্যভারত সমালোচনা করিলেন, "কবিতাগুলি বড়ই সুন্দর হইয়াছে।" সুপ্রভাত সমালোচনা করিলেন "এই ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। কবিতা কয়েকটী শিশিরের মতই নির্ম্মল উজ্জ্বল এবং মহদ্ভাবে পূর্ণ, ইহাতে ধরার মলিনতা নাই।" বামাবোধনী সমালোচনা করিলেন "এই গ্রন্থের আন্তর সৌন্দর্য্য বড় মধুর। প্রতি পদ্যেই গ্রন্থকর্ত্রীর পবিত্র প্রেমমাখা হৃদয়খানি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। পূতনির্ম্মল ভগবৎপ্রেমের দিব্য প্রভায় হেমন্তের শিশিরবিন্দুগুলি ঝরিতেছে।" এরূপ আর কত সঙ্কলন করিব? দেশপূজ্য সহৃদয় মহোদয়গণের ও সমালোচকবৃন্দের সাদর সম্ভাষণে আমাদের হেমন্ত ক্ষুদ্র শিশির প্রকাশ করিয়াই বঙ্গবাণীর পূজা-মন্দিরে সসম্ভ্রমে অভিনন্দিতা হইল।

তারপর ধীরে ধীরে কয়েক বৎসর

কাটিয়া গেল। এক্ষণে হেমন্ত বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ মাসিক সাহিত্যের যশস্বিনী লেখিকা। আমরা ভাইবোন অনেক পত্রিকাতে একত্রেই লেখা পাঠাইতাম। অনেক সময়ে হেমন্ত আমার কবিতাদির প্রতিলিপি করিয়া দিত, আমি শুধু স্বাক্ষর করিতাম। প্রতিলিপি করা কি বিরক্তিকর কাজ, ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। হেমন্ত তাহার অক্ষম "দাদার" সাহায্যের জন্য এই বিষম বিরক্তিকর কাজও নীরবে ধৈর্য্যের সহিত প্রতিপালনে কখনও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে নাই।

বিগত দুইতিন বৎসর হইতে হেমন্তের কবিতার ভাবরাজ্যে এক অভিনব বিশিষ্টতা দেখা যাইতে থাকে। সে এ সময় বৈষ্ণবীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা বিষয়ক কবিতা লিখিতে আরম্ভ করে। তাহার এ কবিতাগুলি পদলালিত্যে ও ভাবমাধুর্য্যে সর্ব্বাংশে অতুলনীয়। কিন্তু অকস্মাৎ হেমন্তের নির্ম্মল হৃদয়ে এ অনুপ্রেরণা কোথা হইতে জাগিল? শুনিতে পাই, হেমন্তের পতিকুল শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীমৎ মুকুন্দদত্তের বংশধর, তাঁহাদের বাড়ীতে মুকুন্দদত্তের বলিয়া কথিত কতকগুলি শালগ্রাম শিলা এখনও দেখা যায়। সম্ভবতঃ হেমন্তের এই নবভাবের উৎসের মূল এখানেই উপ্ত রহিয়াছে।

যাহা হউক, হেমন্তের লিখিত এই নবীন ভাবের কয়েকটী কবিতা পড়িয়া আমাদের প্রতি অগ্রজপ্রতিম স্নেহশীল ভক্তিভাজন সুরসিক সমালোচক কবি শ্রীযুক্ত বেণোয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্য পাঠ করিতে দিবার জন্য আমাকে লেখেন এবং হেমন্তকেও এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দিয়া পত্র দেন। হেমন্ত তখন নিজের বাড়ীতে, ছলহরা গ্রামে। আমি তাহাকে প্রাচীন বৈষ্ণবকবিগণের সমগ্র গ্রন্থাবলী পাঠাইলাম। কিন্তু অল্পকয়েক দিন পরেই হেমন্ত তৎসমুদয় আমাকে ফেরৎ পাঠাইয়া লিখিল, নানা গৃহকার্য্যের ভিতরে ব্রজবুলীর রস-মাধুর্য্য অনুধাবন করিবার মত অবসর তাহার নাই।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটী বিষয় উল্লেখ করিলে অযৌক্তিক হইবে না। আধুনিক যশস্বী কবিগণের মত হেমন্তের বিভিন্ন ভাষায় কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না; তাহার ভাবসম্পদ বৃদ্ধি ও পুষ্টিকল্পে সে একমাত্র মাতৃভাষা ব্যতীত অপর কোন ভাষার নিকটে সামান্যমাত্রও সাহায্য পায় নাই। সে সম্পূর্ণরূপে আপনার ভাবে আপনি ডুবিয়া শুধু আপনার উন্মুক্ত হৃদয়খানিকেই সম্বল করিয়া বঙ্গবাণীর পূজা-পীঠে অর্ঘ্য রচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। ক্ষুদ্র শিশুটীর মত সরল প্রাণ যাহার, শ্রীভগবান যে তাহার সকল কার্য্যে এমনি সহায় থাকেন, তাহার যে আর কাহারও মুখাপেক্ষা করিতে হয় না। হেমন্ত-জীবনে আমরা এ শিক্ষা পাইতেছি।

শুধু ইহাই নহে। আমরা আরও বুঝিতে পারি, সকল জ্ঞানের উৎস যিনি, সকল রসের মূলাধার যিনি, মুমুক্ষু মানবাত্মা তাঁহাকে যথার্থ আপনার বলিয়া ভাবিতে পারিলে, তাঁহার রাতুল চরণে সত্যরূপে নিজকে উৎসর্গ করিতে শিখিলে, তাহার আর কোন প্রকার পার্থিব সহায়তার আবশ্যক করে না। প্রাণেরপ্রাণ যিনি, তিনিই গোপনে প্রাণের মূলে থাকিয়া তাহার সকল অভাব পূর্ণ করেন; তাহাকে আর ভিক্ষার ঝুলি লইয়া বহির্জ্জগতের দ্বারে হাত পাতিতে

হয় না। পুণ্যশীলা হেমন্তও এ পথের পথিক ছিল। এজন্যই তাহার নবপ্রকাশিত "মাধবী" কাব্যের একস্থানে দেখিতে পাই, সে সুমধুর সুরে প্রিয়তম উপাস্য দেবতার উদ্দেশে গাইতেছে—

"আমার কিছুই নাই
তুমি বিনে প্রেমময়!
তোমারি গৌরবে শুধু
ভরে গেছে এ হৃদয়!"

এমনি স্বর্গীয় সঙ্গীতের অমৃত পশরা লইয়া হেমন্তের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ মাধবী বিগত ১৩২২ সালের বসন্তকালে প্রকাশিত হয়। দপ্তরীর গোলযোগে হেমন্ত লোকান্তরিতা হইবার কিছুকাল পূর্ব্বেই আমরা পুস্তকখানি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ফলে হেমন্ত ভাল করিয়া একবার তাহার মুদ্রিত পুস্তকখানি দেখিয়া যাইতে পারে নাই। নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

উল্লেখ বাহুল্য, হেমন্তের এ পুস্তকখানির "মাধবী" নামাকরণও আমি করিয়াছিলাম। শিশিরের পর মাধবী, হিমঋতুর পর বসন্ত, ইহাই প্রকৃতিরাজ্যের স্বাভাবিক নিয়ম। আমি দেখিলাম, হেমন্তের কাব্যজীবনেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এ পুস্তকের কোন কবিতায় শিশিরের সেই সঙ্কোচজড়িত অবসন্নভাব কোথায়ও নাই—প্রত্যেকটী কবিতাই প্রীতি-প্রেম প্রফুল্ল প্রসূনস্তবকে শোভিত মধু-মাধবীর কথাই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এজন্য হেমন্তের এ গ্রন্থের নাম দিয়াছিলাম "মাধবী। কিন্তু হায়, তখন কে জানিত, নিদারুণ কাল নিদাঘের খরতাপে সুকুমার প্রাণ, মধুটুকু এমনিভাবে অকালে শুষ্ক হইয়া যাইবে?

যাহা হউক, এখানে লেখা উচিত, মাধবীর কবিতাগুচ্ছ সাজান বিষেয় আমার ভগ্নিপতি মধুর-হৃদয় শ্রীমান্ কালীমোহন আশাতীত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। মাধবীর খণ্ড কবিতাগুলি যে অখণ্ড কাব্যাকারে পরিণত হইয়াছে, ইহা তাঁহারই বিষয় নির্ব্বাচনের গুণে; এ সম্বন্ধে তাঁহার কোথাও কোন ত্রুটি হইতেছে কিনা, আমি শুধু এটুকই লক্ষ্য করিতাম। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীমৎ মুকুন্দদত্তের জন্মতিথিতে মাধবীর লভ্যাংশ দিয়া চট্টগ্রামে একটী নূতন উৎসব অনুষ্ঠানের সূচনা হইবে, ইহাই আমাদের ইচ্ছা ছিল। মাধবীর প্রচ্ছদ পটে এ কথার উল্লেখও করিয়াছিলাম।

মাধবী মাধবের নামে উৎসর্গিত হইয়াছে। এ 'মাধব কে? হেমন্তকে আমি একথা কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই, সেও নিজ হইতে আমাকে কিছু বলে নাই। তথাপি তাহার লিখিত মাধবীর ক্ষুদ্র উৎসর্গ কবিতাটী পড়িয়া আমার মনে হইয়াছে, যদি পতিব্রতা হিন্দুরমণীর চক্ষে পরমারাধ্য পতি-দেবতাই বিরাট বিশ্বদেবতার প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ হয়েন, তবে হেমন্ত তাহার "মাধবী কাব্যখানি শ্রীমান কালীমোহনের নামেই উৎসর্গ করিয়া গিয়াছে; সে তাঁহাকেই স্মরণ করিয়া লিখিয়াছে—

'হরষে বিষাদে বিভব অভাবে
কল্পনা-কাননে ভ্রমিনু যবে,
ছিলগো উজলি নিয়ত গোপনে
তোমারি মুরতি হৃদয়-নভে,
সাধের "মাধবী দিতে অর্ঘ্য তাই
তোমারি চরণে পড়িল ভুলে,
এযেগো দীনের "বিদুরের ক্ষুদ"
লও হে মাধব আদরে তুলে!"

আমার পূর্ব্বোক্ত অনুমান যদি যথার্থ না

হয়, তথাপি ভক্তহৃদয়-নিষিক্ত এই অমূল্য "বিদুরের ক্ষুদ" টুকু যে হেমন্তের উদ্দিষ্ট মাধব সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আমার সন্দেহ মাত্র নাই।

'মাধবী' মুদ্রণে আমরা 'নব্যভারত'-সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়-চৌধুরী মহাশয়ের যথেষ্ট সহায়তা পাইয়াছিলাম এবং আমার চির সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র, বি-এল. মহাশয় ইহার প্রুফাদি সংশোধনের ভার লইয়া আমাকে নিশ্চিন্ত করিয়াছিলেন। শুধু ইহাই নহে। ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি, হেমন্তের "শিশির" মিত্রোত্তম বিভূতিবাবুকে আমাদের নিকটে পরিচিত করিয়াছিল, এবার তিনি "মাধবীর" "পরিচয়" লেখাতে সে পরিচয় আরও নিবিড়তর ও মধুরতর হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার লিখিত "পরিচয়" পত্রের একস্থান পড়িলে "মাধবীর" অন্তর-সৌন্দর্য্যের কিছু আভাস পাওয়া যায়, আমি সে অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"কিরূপে একটা মুমুক্ষু জীবাত্মা আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ, হর্ষব্যথা, বিরহমিলন প্রভৃতি মানবজীবনের চিরন্তন আলো অন্ধকারের ভিতর দিয়া পরমারাধ্য বাঞ্ছিত দেবতার অন্বেষণ করিয়া লয়, "মাধবীর" বিভিন্ন স্তবক পরম্পরায় তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একমাত্র সনাতন সত্যের মহান্ লক্ষ্যানুসরণে ভাবের এবম্বিধ বহুধা রসস্ফূর্ত্তিপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ আমাদের বঙ্গসাহিত্যে সম্ভব নহে।"

দুর্ভাগ্যবশতঃ হেমন্তের অন্তিম রোগশয্যার সময় "মাধবী" আমাদের হস্তগত হওয়ায় পুস্তকখানি বঙ্গের যাবতীয় সুধীমণ্ডলীকে পাঠাইবার অবসর পাই নাই। তথাপি হেমন্তের রোগ-কাতর প্রাণে একটুখানি আনন্দ দিবার জন্য "মাধবী" যাঁহাদিগকে পাঠাইয়াছিলাম, তন্মধ্যে স্যার গুরুদাস বাবু তাহাকে লিখিয়াছিলেন—"কবিতাগুলির ভাষা যেমন সরল অথচ সুমধুর, ভাবও তেমনি প্রগাঢ় অথচ প্রাঞ্জল। এই "মাধবীস্তবক"গুলি পবিত্র ভাবপূর্ণ হৃদয়কুঞ্জে আপনি বিনায়াসে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাই তাহারা এত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।" ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সারদাবাবুও তাহাকে লিখিয়াছিলেন—"তোমাকে সান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। "মাধবী"তে খুব কবিত্বের পরিচয় আছে। ভাষাও বেশ সরল; আজকালের কবিতায় বাক্যাড়ম্বর, শব্দাড়ম্বরই বেশী; তোমার কবিত্ব আছে অথচ সে কবিতা দুরূহ শব্দে ও দুর্জ্ঞেয় ভাবে কলুষিত নহে।" স্বনামখ্যাত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আমাকে লিখিয়াছিলেন—"মাধবী পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। সুন্দর রচনা। তাহার মধ্যে একটা আন্তরিকতা আছে। কবিতাগুলি অধিকাংশই বিষাদ মাখান। একজন ইংরেজ কবি বলিয়াছেন, "গভীরতম বিষাদের ভাব হইতেই আমাদের মধুরতম গান নিঃসৃত হয়।" বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র লিখিয়াছিলেন,—"কবিতাগুলি আপনার বোনেরই উপযুক্ত। ভাইবোন দুইজনেই কাব্যচর্চ্চারদ্বারা মাতৃ-ভাষার উন্নতি করিতেছেন জানিয়া সুখী হইলাম। আশা করি, আপনার ভগিনী সত্বর আরোগ্য লাভ করিয়া কাব্যচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিবেন।" হায়, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্রের এ আশা পূর্ণ হয় নাই—বিধাতা আমাদের সকল সুখ-স্বপ্নই অকালে ভঙ্গ করিয়া দিয়াছেন!

আজ সবে মাত্র দুইদিন হইতেছে, আমি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, কবিসম্রাট মহোদয়ের একখানা

স্নেহাশীর্ব্বাদপূর্ণ বিস্তৃত পত্র পাইয়াছি। তাঁহাকে হেমন্তের "মাধবীর" সহিত আমার "তপোবন" ও 'ধ্যানলোক' নামক কাব্যগ্রন্থদ্বয় ও পাঠাইয়াছিলাম। তিনি লিখিতেছেন—

'আপনার" তপোবন ও "ধ্যানলোক" পাইয়াছি, সেই সঙ্গে মাতৃদেবী শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত মহোদয়ার "মাধবী"ও পাইয়াছি। * * "তপোবন" হইতে অনাবিল হবির্গন্ধি যজ্ঞীয়ধূম অনবরত উঠিতেছে, দেখিলেই ভিতরে প্রবেশ করিয়া কুটীরে বসিয়া তপঃসাধনা করিতে ইচ্ছা হয়। "ধ্যানলোক" ধ্যানের কপাট খুলিয়া দেয়, "মাধবী" মাধবের মন্দিরের দরজায় লইয়া উপস্থাপিত করে। আমি চিরদিন আপনার কবিতার পক্ষপাতী। কবিতাগুলি কাচের ন্যায় স্বচ্ছ, ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। আপনার ও দেবীর হৃদয় হইতে ফোয়ারা ছুটিয়া পাঠকপাঠিকার ক্ষুদ্র হৃদয় সবলে ভাসাইয়া আনন্দে মাতোয়ারা করিয়া কোন এক অজানা দেশে লইয়া যায়। কবিতাগুলি অক্ষরে অক্ষরে অমৃতবর্ষণ করে। ফলে আমি একান্ত মুগ্ধ হইয়াছি।"

"মাধবী" এখনও কোন সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রে সমালোচিত হয় নাই। যদি সম্পাদক মহাশয়েরা "মাধবীর" নিরপেক্ষ সমালোচনা করেন, (সে বিশ্বাস আমার বড় নাই) তবে পাঠকপাঠিকা দেখিতে পাইবেন, যথার্থ গুণগ্রাহী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয় প্রমুখ-দেশপূজ্য সহৃদয় সুধী মহাত্মাগণের কথা কতদূর সত্য। হেমন্ত আমাদিগের বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে কি অমূল্য সম্পদ দান করিয়া গিয়াছে।

যথাস্থানে লিখিতে ভুলিয়াছি, হেমন্তের "শিশির" প্রকাশিত হইলে তাহাকে মহিলা-কবি শ্রীযুক্তা হেমলতাদেবী, শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী দেবী, শ্রীযুক্তা অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা প্রভৃতি তাঁহাদের স্ব স্ব রচিত গ্রন্থাবলী সাদরে উপহার দিয়াছিলেন। এবার "মাধবী" প্রকাশের পর লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ,মহাশয় তাঁহার 'সপ্তস্বরা' কাব্যখানি তাহাকে উপহার পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয়, হেমন্ত তখন রোগে অজ্ঞান; তাঁহার সুন্দর বহিখানি একটীবার দেখিতেও পায় নাই।

এক্ষণে হেমন্ত জীবনের যে অংশের কথা লিখিতে যাইতেছি, তাহা চিন্তা করিতেও আমার অসহ্য কষ্ট হয়। তাই আমি অতি সংক্ষেপে সে কথা সমাপ্ত করিতে চেষ্টা করিব।

বিগত অগ্রহায়ণ মাসে হেমন্ত তাহাদের পল্লীভবনে পীড়িতা হইয়া সহরে আমাদের বাসায় আসে। তাহার প্রতিদিন অল্প অল্প জ্বর হইত। চট্টগ্রামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ একাদিক্রমে তাহার চিকিৎসা করিয়াও একটীদিনের জন্য তাহার জ্বর বন্ধ করিতে পারিলেন না। অবসরপ্রাপ্ত সিবিলসার্জ্জন আমার পূজ্যপাদ জ্যেঠতাত মহাশয় প্রভৃতি সন্দেহ করিতে লাগিলেন, হেমন্ত নিদারুণ যক্ষ্মারোগে আক্রান্তা হইয়াছে। আমরা তাহার জীবনের আশা একরূপ পরিত্যাগ করিলাম। কিন্তু তখনও তাহার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

হেমন্ত একেবারে শয্যাশায়িনী না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার দৈনিক পুষ্পচয়ন, নিভৃত পূজার্চ্চনা,সাহিত্যচর্চ্চা প্রভৃতি প্রিয় কার্য্যগুলি হইতে বিরতা হয় নাই। এ সময়েও সে "বামাবোধিনী" "মালঞ্চ" "বাঁশরী" প্রভৃতি

পত্রিকায় কবিতা পাঠাইত, তাহার সে কবিতা এখনও প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে। হেমন্তের লিখিত শেষ কবিতাটী নিম্নে যথাযথ সঙ্কলন করিতেছি। ইহা সে বিগত ১৭ই বৈশাখ তারিখে (১৩২৩ সাল) লিখিয়াছিল। ইহার পর তাহার আর লেখাপড়া করিবার মত শক্তি ছিল না। এ কবিতাটীও সে অতি কষ্টে বিছানায় শুইয়া শুইয়াই পেন্‌সিল দিয়া লিখিয়াছে। তাহার এই শেষ কবিতাটীর নাম--"আকিঞ্চন"। পৃথিবীর নিন্দা-প্রশংসার অতীত লোকযাত্রিনী হেমন্তের শেষ "আকিঞ্চন" এই:—

"আমার যা' ছিল ধন
সকলি তোমারি করে,
কে রহে বিশ্বাসী আর
তব সম বিশ্বভরে?
স্বর্গ মোক্ষ শান্তি প্রীতি
সবি হে লুকান তায়,
তাই তো নির্ভীক হয়ে
সঁপেছি তোমারি পায়।
দীননাথ! কবে তব
হইবে সময় আর?
ফিরায়ে আনিতে পার
আমার জীবন সার?
শুনেছি ভকত মুখে
তুমি দয়া-প্রস্রবণ,
সে আশায় বুক বেঁধে
করি আজ আকিঞ্চন।"

এই ১৭ই বৈশাখ তারিখে হেমন্ত আর একটা কবিতা লিখিয়াছিল; এ কবিতাটী পড়িলে তাহার "আকিঞ্চন" কবিতার নিগূঢ় অর্থ স্পষ্টতর হয়। সে এ কবিতাটীর কোন নামাকরণ করে নাই; হয়ত তাহার পূর্ব্ব অভ্যাসমত সে ভার তাহার দুর্ভাগ্য "দাদার" জন্য রাখিয়াছিল। কিন্তু তাহার কবিতার নামাকরণ করিবার ইচ্ছা ও শক্তি আজ আমার নাই। ভাবগ্রাহী ভগবান সে সুরভিত দেব নির্ম্মাল্য স্বয়ং গ্রহণ করিবেন। আমি শুধু সেই নামহীনদেশের অধিবাসিনী হেমন্তের নামহীন কবিতাটী এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম:—

"বুকভরা ভালবাসা তব,
প্রাণভোলা মধুর বচন,
ওই মোর স্বরগের সুখ,
ওই মোর চির আকিঞ্চন।
ভব-তাপে পলে পলে দহি
হৃদয় তো ব্যাকুল আমার,
তবু নাথ! তব নাম লয়ে
প্রাণে লভি সান্ত্বনা অপার।
তুমি আমি ঘুচি ব্যবধান
শুধু সাধ এক হয়ে যাই,
ধরণীর হারাবার ভয়
তবে আর কোন কালে নাই।"

ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু প্রেমময় দেবতা পুণ্যশীলা হেমন্তের এ "সাধ", এ "আকিঞ্চন" বুঝি আর বেশীদিন অপূর্ণ রাখিতে পারেলেন না। সে যে "স্বর্গ মোক্ষ শান্তি প্রীতি" সমস্তই সেই 'দীননাথ' হৃদয়েশ্বরকে সমর্পণ করিয়াছে—সে যে "ভব-তাপে"—রোগ যাতনায়" পলে পলে দগ্ধ হইয়াও তাঁহার মধুমাখা "নাম" স্মরণ করিয়া 'প্রাণে অপার সান্ত্বনা' লাভ করিতেছে। তাই সে আজ জীবনস্বামীর সহিত 'তুমি আমি'র সকল 'ব্যবধান' ঘুচাইয়া তাঁহাতে একাকার হইয়া যাইতে চায়! তাহা হইলে যে, "ধরণীর হারাবার ভয়' আর কোনকালে থাকে না!

বিগত ২৯শে বৈশাখ শুক্রবার বিকালে কলিকাতা হইতে হেমন্তের বাঁধান "মাধবীর" পার্শ্বেল পাইলাম। সে আমার দ্বারা

লিখাইয়া একখানি পুস্তক কনিষ্ঠ শ্রীমান্ প্রভাতকুসুমকে উপহার দিল এবং বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল, প্রভাতকুসুম যেন 'মাধবী' খানা সযত্নে রক্ষা করে। শ্রীমান 'মাণিক' ভায়া (প্রভাতকুসুমের ডাক নাম) 'মাধবী' পাইয়া আনন্দবেগে মাতৃদেবীর কাছে ছুটিয়া যাইতেছে দেখিয়া হেমন্ত হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিল—"দাদা! দাদা! দেখেছেন. "মাধবী" পাইয়া মাণিকের কি আনন্দ! শিশুদের এ রকম আনন্দের মধ্যেই ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়।" হায়, তখন বুঝিতে পারি নাই, তাহার এ উপহার, এ উপদেশ, এ হাসি, এ জগতের শেষ উপহার, শেষ উপদেশ, শেষ হাসি !!

তৎপরদিন অপরাহ্ণে হেমন্ত অকস্মাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িল, এবং ঔষধ পথ্য সকলি পরিত্যাগ করিল। এ অবস্থায় আট নয়দিন কাটিয়া গেলে তাহার সামান্য জ্ঞান সঞ্চার হইল বটে, কিন্তু এত দুর্ব্বল যে, কথা বলিবার শক্তি নাই। মহাপ্রয়াণোন্মুখ প্রিয়জনের শেষ কথাগুলি আমাদিগের নিকটে এমনি অস্পষ্ট হইয়া যায় কেন ? আমাদিগের চক্ষের সম্মুখে আমাদের অনন্ত পথযাত্রী প্রাণাধিক প্রিয়জনেরা অসহ্য কষ্ট পাইতেছে, আমরা সে সময়ে আমাদের সমস্ত বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান ধনসম্পদ মান লইয়া শুধু মূঢ়ের মতন চাহিয়া থাকি,তাহার সে যাতনার বিন্দুমাত্র প্রতিকার, বিন্দুমাত্র উপশম করিতে পারিনা কেন ? তাহার শেষ বাসনাটুকু শুনিবার, বুঝিবার, পালিবার আমাদের অধিকার থাকে না কেন ? এ নির্ম্মম পরিহাস কোন্ নিষ্ঠুর দেবতার ?—

বিগত ১১ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার (২৪শে মে, ১৯১৬ খ্রীঃ) রাত্রি সাড়ে আটটার সময় হেমন্ত এ জন্মের মত পূজনীয়া মাতৃদেবীর হস্তে কিঞ্চিৎ গোদুগ্ধ পান করিয়া এবং তাঁহাকে অকূল শোকসাগরে ভাসাইয়া, মাত্র সাতাস বৎসর বয়ঃক্রমকালে, অক্ষয় অমৃতলোকে মহাপ্রস্থান করিল। তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে সে শ্রীমান কালীমোহনকে বলিয়াছিল, (ইহাই শ্রীমানের সহিত তাহার শেষ কথা)। "এস, এখন আমরা ঈশ্বরকে ডাকি।" কিন্তু হায়, দুর্ব্বলচিত্ত আমরা, তাহার মত ঈশ্বরকে ডাকিবার ক্ষমতা তখন আমাদের কাহারও ছিল না !

আমি বজ্রাহতের ন্যায় হেমন্তের রোগশীর্ণ মুখখানির প্রতি নির্ব্বাক স্তম্ভিত হৃদয়ে চাহিয়া রহিলাম। একটী বিন্দু অশ্রুও আমার আঁখি কোণে দেখা দিল না ! এতকালের এত রোগ যাতনা একটী মুহূর্ত্তে অবসান হইয়া গিয়াছে। বিশ্ববিধ্বংসী মৃত্যুর কঠোর স্পর্শ কি এত কোমল, এত অমৃতমাখা ! !

মৃত্যু কি ? সে কি সত্যই বড় বিভীষিকাময় ? হেমন্ত তাহার "মাধবী কাব্যে লিখিয়াছে :—

"মরণের নামে সখা ! কেন এত ভয় ?
বেচে শুধু মরে আছি, সে মরণ হলে বাঁচি,
নবীন জীবন সে যে কিবা সুখময় !
লয়ে নববল আশা, বুক-ভরা ভালবাসা,
সমাধি' সাধনা ধন্য হইবে নিশ্চয় !
মরণেরে আমি সখা ! নাহি করি ভয় !!'

বাস্তবিক হেমন্ত যে আজ এমনি নির্ভয়ে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছে ! পৃথিবীর সকল স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া যাইতে তাহার কণ্ঠে যে একটী কাতর ভাষা জাগে নাই ! অসহ্য রোগ-যাতনার মধ্যেও সে যে একান্ত ধৈর্য্যের সহিত নিশিদিন নীরবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়াছে। সে কি আজ মৃত্যুর

মধ্য দিয়া 'সুখময় নবীন জীবন' লাভ করিয়া এবং নূতন "বল-আশা" ও 'বুকভরা ভালবাসা' লইয়া তাহার আরব্ধ "সাধনা" সমাধা করিয়া 'ধন্য' হইতেছে ? কে বলিবে ?

সে দিন কৃষ্ণাষ্টমীর নক্ষত্রভূষিতা নিশীথিনী, অকস্মাৎ নির্ম্মল আকাশ মেঘাবৃত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে বারিবর্ষিত হইতে লাগিল। প্রকৃতি-রাণী কি তাঁহার প্রিয় সঙ্গিনীকে হারাইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন ? না, আমার সমস্ত অশ্রু ওই নিবিড় মেঘমালায় পুঞ্জিকৃত হইয়াছে ? এ রহস্য কে উদ্ঘাটন করিবে ?

তৎপরদিন অর্থাৎ ১২ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে স্থানীয় "জ্যোতিঃ" পত্রিকায় হেমন্তের পরলোক যাত্রার সংবাদ প্রকাশিত হইল। বহুস্থান হইতে আমাদের শোকে সমবেদনা জানাইয়া পত্রাদি আসিতে লাগিল। আমি সর্ব্বপ্রথম বঙ্গবিশ্রুত দার্শনিক শ্রেষ্ঠ হীরেন্দ্র-নাথের পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন :—

"আপনার সহোদরার বিয়োগ সংবাদ পাইয়া বিশেষ দুঃখানুভব করিলাম। বিধাতা এই কবিতার উৎসটী অকালে শুকাইয়া দিলেন! আপনি এ শোকবজ্র মাথায় পাতিয়া লউন—এ ভিন্ন লীলাময়ের লীলার আমরা কি প্রত্যুত্তর দিতে পারি। তিনি আপনাদের শোকে শান্তি দিন—এই প্রার্থনা। জ্যৈষ্ঠের "ব্রহ্মবিদ্যায়" এই শোক-সংবাদের সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম।"

তিনি "ব্রহ্মবিদ্যায়" হেমন্ত সম্বন্ধে এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন :—

"চট্টগ্রামের সুকবি শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্তের অকাল-মৃত্যুর সংবাদে আমরা সবিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। তাঁহার ধর্ম্মভাবপূর্ণ কয়েকটী কবিতা সময় সময় 'ব্রহ্মবিদ্যায়' প্রকাশিত হইয়াছিল। পাঠকগণ তাহা হইতে তাঁহার কবিতাশক্তির কতক পরিচয় পাইয়াছিলেন। সম্প্রতি "মাধবী" নাম দিয়া তাঁহার অনেকগুলি খণ্ড কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। এই কবিতা-বীণা অকালে ছিন্ন-তার হইল, ইহা বিশেষ আক্ষেপের বিষয়। বিধাতা শোকসন্তপ্ত পরিবারকে বিশেষতঃ আমাদের স্নেহভাজন সুকবি শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্তকে শোকে শান্তিদান করুন, ইহাই প্রার্থনা করি।"

আমার অভিশপ্ত অদৃষ্টে কখনও শান্তি আছে কি না, আমি জানি না। তথাপি স্নেহপরায়ণ শুভানুধ্যায়ীগণের আন্তরিক শুভ-কামনা মুহ্যমান হৃদয়ে অভিনব শক্তি-চেতনার দেব-প্রেরণা আনিয়া দেয়। এজন্য আমি আরও কয়েকখানি সহানুভূতিপূর্ণ পত্র এখানে সন্নিবেশিত করিব। হেমন্ত যে আমাদের দেশের বিশিষ্ট সমাজের সস্নেহ-দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, এ পত্রগুলিতে সে পরিচয়ও পাওয়া যাইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহৃদয় Vice Chancellor মাননীয় ডাঃ সর্ব্বাধিকারী মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"I am grieved to hear of the death of your good sister. It must be a tremendous shock to you, but from the letter I gather that you have borne it well. May God give you strength in your tremendous calamity!

Pray, accept my hearty condolences.

I trust your own health will not suffer and the good work, in which you are engaged, will go on unimpeded."

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সারদাবাবু লিখিয়াছেন—

"হেমন্তবালার মৃত্যু সংবাদে বড়ই ব্যথিত হইলাম। অদৃষ্ট ভারতবর্ষের প্রতিকূল; এরূপ ভাল দ্রব্য অপহরণ করিয়া আমাদের বিশেষ ক্ষতি করিলেন। তবে মরণ নিশ্চিত; অকাল মৃত্যুই শোকের কারণ। যাহা হউক. ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া কর্ম্মপথে বিচরণই পুরুষত্ব।"

ভক্তিভাজন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"তোমার কনিষ্ঠা সহোদরা হেমন্তবালার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া যারপর নাই ব্যথিত হইলাম। এই সেদিন তাহার 'মাধবী' পাঠ করিয়া কত আনন্দ লাভ করিলাম। এই সংসারে কাহাকেই ধরিয়া রাখা যায় না। মঙ্গলময়ের বিধানই এই। এই বিধান নতমস্তকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার মঙ্গলস্বরূপে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিবে, তাই আমরা বলি—

"তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ
মঙ্গলময় স্বামী"

ভগবান তোমার শোকতপ্ত হৃদয়ের উপর শান্তিবারি বর্ষণ করুন।

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক সহৃদয় ভদ্র লোক এবং সম্ভ্রান্তা ভদ্রমহিলা হেমন্তের জন্য শোক প্রকাশ করিয়া আমাকে পত্র দিয়াছেন। সে সকল পত্র আর উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই। হেমন্তের জন্ত স্থানীয় সাহিত্য-পরিষৎ এবং হেমন্তের একান্ত প্রিয় "ভগিনীসমাজ" শোকসভা আহ্বান করিতেছেন। "ভগিনী-সমাজ" হইতে হেমন্তের নামে দুর্ভিক্ষের চাঁদা সংগ্রহের প্রস্তাবও হইয়াছে। ইহাদের সকলের অযাচিত স্নেহে আমি মুগ্ধ, ইহারা সকলেই আমার কৃতজ্ঞতার পাত্র। এ সকল-কিছুর ভিতরে আজ আমার প্রাণে শুধু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মহাবাণী প্রতিধ্বনিত হইতেছে—

"তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ
মঙ্গলময় স্বামী!"

* * * *

আজ পুণ্যশীলা কবি হেমন্তবালার পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে তাহার নির্ম্মল জীবন-কথা সমাপ্ত করিয়া ভাবিতেছি, আমার অক্ষম লেখনী তাহার নানা সদ্‌গুণবিভূষিত সুন্দর জীবনের কতখানিইবা অঙ্কিত করিতে পারিয়াছে। সে যে কখনও এ ধরণীর ছিল না—আমি কেমন করিয়া এ ধরণীর মনোপ্রাণ লইয়া তাহাকে স্পর্শ করিব?

হয়ত আজ হেমন্তের পল্লী-ভবনে মহা-সমারোহের সহিত তাহার আদ্য-শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইতেছে—বার বৎসর পূর্ব্বে সে গৃহ একদিন হেমন্তকে নববধূরূপে বরণ করিয়া আনন্দ-গৌরবে উদ্ভাসিত হইয়াছিল. হয়ত সে গৃহই আজ তাহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে সমবেত জনসঙ্ঘের বিচিত্র কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে! কালের কি অচিন্তনীয় ক্রুর আবর্ত্তন!!

দুরদৃষ্ট অগ্রজ আমি, অনন্ত-যাত্রায় অনুজার পশ্চাতে পড়িয়া, যে গৃহ হইতে সে চির-বিদায় লইয়াছে, তাহারই পার্শ্বে এ বর্ষণ-কাতর মলিন-মধ্যাহ্নে একাকী অনশন-ক্লিষ্ট-শরীরে বসিয়া তাহাকে আজ শ্রদ্ধা-বিনম্র-হৃদয়ে স্মরণ করিতেছি। জানি না, আমার এই স্মৃতির অঞ্জলি তাহার নিকটে পৌঁছিবে কিনা। জানি না, জন্ম-জন্মান্তরের অনন্ত যাত্রা-পথে তাহার সহিত আমার আর দেখা হইবে কি না! শুধু একমাত্র প্রার্থনা, সে আজ যেখানেই থাকুক, আনন্দ-সুখ-শান্তি

যেন সর্ব্বদা তাহাকে ঘেরিয়া থাকে! শুধু একমাত্র সান্ত্বনা, উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং
কুতশ্চিন্ন বভুব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ম্পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

বড় পণ্ডিতের ভাষাজ্ঞান।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বড় পণ্ডিত। বঙ্গভাষায় তাঁহার বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বহু পাঠক যত্ন ও আগ্রহ সহকারে তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন। অনেক পুস্তকালয়ে ও পাঠাগারে তাঁহার পুস্তক শোভমান। সকল গ্রন্থ পাঠ করা আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। "পুরোহিত দর্পণ" একখণ্ড কিনিয়াছিলাম। পুরোহিত মহাশয় তাহা লইয়া গিয়াছেন। পরের নিকট হইতে চাহিয়া আনিয়া "জন্মান্তর রহস্য" একবার পড়িয়া বুঝিয়াছি, পুস্তক খানি বান্ধব-সম্পাদক স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ রায় বাহাদুরের "ছায়া দর্শন" নামক গ্রন্থের অনুকরণে লিখিত। সম্প্রতি কোন নব পরিণীতা বালিকার নিকট "মিলন-মন্দির" নামক উপন্যাসখানি পাইয়া পাঠ করিয়াছি। ঐ উপন্যাসে যে সকল চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে বঙ্গভাষার অনেক পুস্তকে পূর্ব্ব হইতেই তাহার আভাস দেখিতে পাই। "সেজ বৌ" ও ক্ষিতীশ" চরিত্রে "জামাই বারিকে"র "কামিনী" ও "অভয় কুমারের" ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'মেজ বৌ', 'যতীশ' ও 'রাম সেবক' 'স্বর্ণলতার' 'প্রমদা', 'শশিভূষণ' ও 'গদাধরের' নূতন সংস্করণ . 'যুথিকা' 'মডেল-ভগিনী'র 'কমলিনী'র ছাঁচে ঢালা। সন্ন্যাসী ঠাকুর দামোদর বাবুর ঘনানন্দ স্বামীর ন্যায় প্রভাবশালী না হইলেও মরা বাঁচাইতে ও নিজে মরিতে সমতুল্য। এ পুস্তকে সাহিত্যিক বিশুদ্ধতা সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় নাই। কিন্তু আখ্যায়িকা ভাগে ও পারিবারিক শিক্ষাদানে পুস্তকখানি মন্দ হয় নাই।

আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের বহু উপন্যাস ও শাস্ত্রগ্রন্থের স্বাদগ্রহণ করিতে পারি নাই। সম্প্রতি তাঁহার "ব্রহ্মচর্য্যশিক্ষা (৪র্থ সংস্করণ) পুস্তকের একখণ্ড ক্রয় করিয়া পাঠ করিতেছি। পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের 'ভক্তিযোগ" এবং স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের 'সংযম শিক্ষা' নামক পুস্তকদ্বয়ের বহু কথা এ পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গবেষণা পূর্ণ নূতন কথাও বিস্তর আছে। পুস্তকের উদ্দেশ্য অতি উচ্চ। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, পুস্তকখানির ভাষার দিকে পণ্ডিতপ্রবর আদৌ লক্ষ্য রাখেন নাই। মনে হয়, বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর ছাত্র দ্বারা তিনি পুস্তকখানি লিখাইয়া লইয়াছেন। যিনি সমাজের শিক্ষক, উচ্চ সাহিত্যের সেবক, ও সমাদৃত গ্রন্থকার, তিনিও যদি এরূপ অসাবধান হইয়া সাহিত্য-উদ্যানে কণ্টক-গুল্মের রোপণ করেন, তাহা হইলে অচিরে ঐ উদ্যান মহারণ্যে পরিণত হইবে। সুতরাং

সময় থাকিতে উপবনের আবর্জ্জনা তুলিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। উক্ত 'ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষা' গ্রন্থ হইতে কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিয়া দিলেই পাঠকগণ আমাদের দুঃখের গুরুত্ব বুঝিতে পারিবেন। ৪র্থ পৃ—"তাহা কি প্রকারে সংঘটন হয়?" এরূপ বাক্য হয় না। সংঘটিত লিখিলে শুদ্ধ হইত। ৬ পৃ—যাহাতে প্রত্যেক মানুষে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা হয়।" ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা বা ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত—এইরূপ বাক্য হইবে। ৬ পৃ—"অতি ক্ষুদ্র দুই একখানি পুস্তক, যাহা প্রকাশ হইয়াছে।" ৮পৃ—যোগিরা। ৮পৃ—"সক্ষম"। ১৩ পৃ—"তথাপিও"। ৩২ পৃ—"ধর্ম্ম বুদ্ধি, বীরত্ব, দয়া, দাক্ষিণ্য ও পরোপকার প্রবৃত্তির' সমপর্য্যায়ে "উদাসীনতা' কেন প্রবিষ্ট হইল, বুঝা গেল না। ৪৮ পৃ—'সঞ্চয় করতঃ'। 'করত' অসমাপিকা ক্রিয়া পদ। ফলতঃ, বস্তুতঃ, বশতঃ প্রভৃতি শব্দের ন্যায় তস্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ নহে। তবে উহার অন্তে বিসর্গের চাপ কেন? শুধু এ গ্রন্থে নহে, বহু পুস্তক ও পত্র-পত্রিকায় এ ভ্রমটা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ইহা মুদ্রণ-দোষ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। ঐ পৃ—'ঋষি শক্তির নিকট সে শক্তি পরিশোধ করিতে হয়।" শক্তি পরিশোধ' কিরূপে হয়,বুঝিলাম না। ঐ পৃ—'বৈজ্ঞানিক বৈদ্যুতিক ও তড়িৎশক্তি।" বিদ্যুতে ও তড়িতে প্রভেদ কি? "বৈজ্ঞানিক বৈদ্যুতিকশক্তি" কেমন পদার্থ? অবৈজ্ঞানিক বৈদ্যুতিক শক্তিও আছে না কি? ঐ পৃ—আবার 'পুত্রোৎপাদন করতঃ।' ৪৯ পৃ—"বিশেষ-বিধি—শূদ্রেরও আত্মসংযম বা ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করিতে হইবে।' এ কিরূপ বাক্য? ৫০ পৃ "উৎকর্ষতা লাভ করিবে।" 'উৎকর্ষতা' ব্যাকরণ' বিরুদ্ধ। প্রথমে এই শব্দটীর প্রতিই আমাদের দৃষ্টি নিপতিত হয়? পুস্তকের বহুস্থানে এই অশুদ্ধ শব্দটীর প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হয়। যথা—১৫৮ পৃ ২ বার। ১৬১ পৃ ইত্যাদি।—৫০ পৃ—"অজ্ঞানীর"। ৫১ পৃ "মহান্ কার্য্যভার।" ৫২ পৃ—'সম্প্রদায়-গণের।" ঐ পৃ—"দুই একটী শিক্ষা ও সতর্কের (?) কথা বলা বোধ হয় অপ্রাকৃত হইবে না।" ঐ পৃ—"অত্যাবশ্যকীয়।" ঐ পৃ—"সহবাস কার্য্যে অতিশয় দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও আমাদের গোচরে প্রকৃত ও প্রাচুর্য্য ভাবে কদাচিৎ আনয়ন করা হয়।" "আনয়ন করা" ক্রিয়ার কর্ম্মপদ কোথায়? কি আনয়ন করা হয়? প্রাচুর্য্যভাবে।" কিরূপ পদ? ঐ—পৃ "সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত না হইয়া এবং সম্পূর্ণ অশিক্ষিত রাখিয়া এই বিষয়, যেরূপে সংঘটিত হয়।" "অশিক্ষিত" কোন্ পদের বিশেষণ? "রাখিয়া" ক্রিয়ার কর্ম্ম কোথায়? ৫৩ পৃ—"তাচ্ছিল্যতা"। ৫৪ পৃ "সবিস্তারিত রূপে।" ঐ পৃ—"গ্রন্থকলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া যাইবে।" ৫৫ পৃ"দামরাখাসী ইত্যাদি জন্তু।" ঐ পৃ—"বলশক্তির নিয়মের সহিত সহবাস শক্তির নিয়ম, প্রত্যক্ষ ও বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্রব আছে।" কোনও বালক পরীক্ষার কাগজে এরূপ লিখিলে তাহার উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে কি? ৫৬ পৃ "অন্ততঃ ইহার আরব্ধ (?) একই প্রকারের হয়।" ঐ পৃ—"এই কার্য্যের একবার পূর্ণ ও পরস্পরের বীর্য্যক্ষয় সন্তান উৎপাদনের জন্যও যথেষ্ট।" "কার্য্যের" সম্বন্ধপদ। কিন্তু ইহার সহিত কোন্ পদের কোথায় কিরূপ অন্বয় হইয়াছে, গ্রন্থকার তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া দিতে পারিলে কৃতার্থ হইব। ঐ পৃ "প্রসূত হইয়া সন্তানকে দুগ্ধ দেওয়ার সময়ের পর।" "প্রসূত" কাহার বিশেষণ? প্রসূতির

না কি? ঐ পৃ—"যখন ক্রিয়াকর্ত্তাগণ (বায়ু, পক্ষযুক্ত কীটগণ, অলি, প্রভৃতি) পুং শুক্র অর্থাৎ পুষ্পরেণু, স্ত্রীক্ষেত্র অর্থাৎ জরায়ুতে নিক্ষেপক কার্য্য সম্পন্ন করিবার পরে এবং যখন জরায়ু প্রকৃতভাবে উর্ব্বরিত (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) হয়, তখন পুরুষের সংশ্রবে থাকিলেও আর ধারণ করিবার ক্ষমতা থাকে না।" (ক) ক্রিয়াকর্ত্তাগণ, (খ) নিক্ষেপক কার্য্য, (গ) উর্ব্বরিত এরূপ পদ হয় কি? উর্ব্বরিত অর্থ "বৃদ্ধিপ্রাপ্ত" কোন্ অভিধানে পাওয়া যাইবে? (ঘ) "ধারণ করিবার" ক্রিয়ার কর্ম্ম কোথায়? (ঙ) "পরে" বেচারী মধ্য পথে পড়িয়া মারা যাইতেছে কেন? উহার কি আত্মীয় বন্ধু কেহ নাই? (চ) বাক্যটীর অর্থ সঙ্গতিও চমৎকারিণী। ৫৭—পৃ "রসায়ন বা খনিজ জগতের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান রাসয়নিক সংযোগের প্রথম নিয়ম এই যে,—তৃতীয় একটী বস্তু উৎপন্ন করিতে বস্তু সকলকে রাসায়নিক কার্য্যক্ষম করিতে পারে না। আমাদিগকে আরও জ্ঞাত করায় যে, এইরূপ সংযোগ কোনও জানিত সুবিধাজনক অবস্থাতে অসম্ভব। পুনরায় আমাদিগকে শিক্ষা দেয় যে, উপযুক্ত (মিলযুক্ত) সংযোগ জন্য বস্তুদিগকে ভাল করিয়া মিশ্রিত করা আবশ্যক, অর্থাৎ যে বস্তু যে বস্তুর জন্য অতিশয় আকর্ষণ প্রকাশ করে, সেই সেই বস্তুর সংমিশ্রণে অতিশয় স্থায়ী মিশ্র পদার্থ উৎপন্ন হয়।

এইরূপে দেখা যায় যে,—জগতের নিম্নস্তর হইতে ফলদায়ক প্রমাণগুলি কেবল একই পথ প্রদর্শন করে। অর্থাৎ কেবল সন্তান বিস্তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সহবাস সম্বন্ধবিধি পূর্ব্বক উপভোগ্য হইতে পারে। এবং ঐ বিষয়ে অন্য কোনও প্রকার প্রশ্রয় বা আতিশয্য নীতি-ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্য-বিগর্হিত এবং অস্বাভাবিক।" (ক) পাঠকগণ উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন, গ্রন্থকর্ত্তার ভাষা কেমন মধুর ও প্রাঞ্জল। (খ) আরও বুঝিবেন উদ্ধৃতাংশের পদগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ কি অদ্ভুত ও অপূর্ব্ব। (গ) "শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান" কোন্ পদ? বিশেষ্য না বিশেষণ? বিশেষণ হইলে কাহার বিশেষণ? বিশেষ্য হইলে কোন্ কারক? (ঘ) "করিতে পারে না" ক্রিয়ার কর্ত্তা কে? (ঙ) প্রথম বাক্যটীর অর্থ প্রতীতি হয় না। (চ) "জানিত" শব্দটী কোন্ সূত্রে সিদ্ধ? উহা বাঙ্গলা না সংস্কৃত? (ছ) "জ্ঞাত করায়" ক্রিয়ার কর্ত্তা কোথায়? (জ) "জানিত সুবিধাজনক অবস্থা" কিরূপ? (ঝ) যাহা "জানিত সুবিধাজনক অবস্থায় অসম্ভব" তাহা কোন্ অবস্থায় সম্ভব? (ঞ) "শিক্ষাদেয়" ক্রিয়ার কর্ত্তাই বা কোথায়? (ট) "উপযুক্ত (মিলযুক্ত) সংযোগ" কিরূপ? (ঠ) "মিলযুক্ত" শব্দ ব্যাকরণ বিরুদ্ধ নহে কি? (ড) "কেবল সন্তান বিস্তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সহবাস সম্বন্ধ বিধি পূর্ব্বক উপভোগ্য হইতে পারে।" 'রাজার হস্তী ফুল ফুটিয়া কাক ডাকিতেছে" লিখিলে দোষ হয় কি? ৫৮—পৃ—"আপনি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিলে এবং সেই ব্রতোৎপন্ন সন্তানে সর্ব্বগুণ, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্ব সামর্থ্য ও সর্ব্বাবয়ব সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। এরূপ একখানি উপাদেয় গ্রন্থে এত অন্বয়-বর্জ্জিত পদ কিরূপে সন্নিবিষ্ট হইল, বুঝিতে পারা যায় না। ৬১ পৃ—"সক্ষম।" ও "অপরিমিত সুখী হইতেন।" ৬২ পৃ "তখন তাহার জীবন নানাকারণে দুঃখের ঘোর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন করিয়া তুলে।" ঐ পৃ —"ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া কতকগুলি রুগ্ন, হীন-বুদ্ধি, কদাকার সন্তান উৎপাদন করিয়া নিজের অবস্থার অতীত ব্যয়ভার বহন করিতে

গিয়া দারিদ্র্য জ্বালা ডাকিয়া আনিয়া আপন জীবন অশান্তির দাবদাহের বিষম দহন হইতে রক্ষা করুন।" "অশান্তির দাবদাহের বিষম দহন" কিরূপ ভীষণ, তাহা কেহ বুঝিয়া থাকিলেও, "ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া" "কতকগুলি রুগ্ন হীনবুদ্ধি কদাকার সন্তান উৎপাদন করিয়া" "নিজের অবস্থার অতীত ব্যয়ভার বহন করিতে গিয়া" এবং "দারিদ্র্য (?) জ্বালা ডাকিয়া আনিয়া" "আপন জীবন" কিরূপে "অশান্তির দাবদাহের বিষম দহন হইতে রক্ষা" করা যায়, তাহা কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন কি?—"রক্ষা করুন" ও উক্ত অসমাপিকা ক্রিয়াগুলির কর্তা কে? ঐ পৃ 'ধাঁ ধাঁ গ্রস্ত' বারদ্বয় লিখিত আছে ধাঁ ধাঁ যদি ধন্ধ শব্দের অপভ্রংশে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে উহাতে ডবল চন্দ্রবিন্দু কোথা হইতে আসিল? বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শব্দ সংযোগে সমাস হওয়া এই প্রথম দেখিলাম। ৬৩—পৃ "সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়া, হাসপাতাল কারাগার, পাগলা গারদ এবং সংশোধন কারাগার ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া এবং সাধারণের সম্পত্তি রক্ষার জন্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত, পুলিশ সৈন্য এবং অন্যান্য আদালত স্থাপন করিতে বাধ্য করিয়া সমাজের বলক্ষয় করা হয় মাত্র।" মরি, মরি, ক্রিয়াপদ, কর্তৃকারক ও কর্ম্মকারকে কেমন ঐক্য! সস্তাকিস্তি পাইলেই যদি মুরসিদাবাদ না যাইয়া মেদিনীপুর যাওয়া যায়, তবে ভাষাবোধ না থাকিলেও পুস্তকরচনা করিয়া রাশি রাশি টাকা উপার্জ্জন করা যায়। (ক) "পুলিশসৈন্য" কিরূপ আদালত? ৬৫পৃ—'তাহা অত্যন্ত নিয়মিত অর্থাৎ বিবাহের উদ্দেশ্য যাহা, তাহাই সাধন করিবার জন্য নিষ্পন্ন হওয়া উচিত!" ৭০—পৃ "অসংযমতা"। ৭১পৃ—পৃ—"রোগ চিনিতে পারিলেই তাহা আরোগ্য করিবার ক্ষমতা জন্মে না।" ঐ—পৃ 'নৈতিক শিক্ষার আবশ্যক।' ৭২—পৃ 'ভাসমান হইতেছেন।" ঐ—পৃ 'অর্থকরী জ্ঞান বিষয়ক।' কেমন লিঙ্গবোধ! ঐ—পৃ শিক্ষিত যুবককে সহবাস জ্ঞান অপরিপক্ক অবস্থায় অনিয়ন্ত্রিত হওয়া' অর্থ কি?—ঐ পৃ 'তাঁহার স্বভাবের সকল দিক প্রত্যেকে প্রত্যেককে সমেত-(?) ও শাসন করিয়া সমপরিমিত বিবর্ত্তন (?) হইতে থাকে?" ৭৩—পৃ—'মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের কঠোরতম ধর্ম্মের সুন্দর অংশে ভূষিত হইয়াছেন।" (ক) 'মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের কঠোরতম ধর্ম্ম' (খ) 'কঠোরতম ধর্ম্মের সুন্দর অংশ' (গ) 'সুন্দর অংশে ভূষিত হওয়া' ব্যাপারগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না।—ঐ—পৃ—'যুবকের স্বভাবে দুর্ব্বিনীততা, অশান্ততা, ও কর্কশতা বিদ্যমান আছে। সেগুলিকে কোনও শিষ্ট সূত্রধরের বাটালীর কাটিয়া ছাটিয়া সুশোভিত করিয়া লইতে হইবে।' 'দুর্ব্বিনীততা, অশান্ততা ও কর্কশতা' কে 'কাটিবে ছাটিলে' ও 'সে গুলি' যদি ফুলে ফলে 'সুশোভিত' হইয়া উঠে, তবেই ত সর্ব্বনাশ! ৭৭—পৃ 'ইন্দ্রিয় সুখকর বিষয়ক পরিত্যক্ত প্রেম।"—ইহার শব্দার্থ ও তাৎপর্য্য উভয়ই উদ্ভট!

৩২৯ পৃষ্ঠায় পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হইয়াছে। আমরা তাহার ৭৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঠক মহাশয়দিগকে দেখাইলাম। এই ৭৭ পৃষ্ঠা মধ্যেও আরও অসংখ্য ভ্রম পড়িয়া আছে। প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে আমরা সে গুলি বাদ দিয়া গিয়াছি। পুস্তকের অবশিষ্ট অংশেও অগণ্য অশুদ্ধি সগর্ব্বে বক্ষ স্ফীত করিয়া বিরাজ করিতেছে। এবং পাঠকগণের মূর্খতার সাক্ষ্য দিতেছে।

পাঠক মূর্খ এই জন্য, যে, তাঁহাদের শ্রমার্জ্জিত অর্থের অপব্যয় করিয়া এইরূপ

ভ্রম-সঙ্কুল পুস্তক ক্রয় করেন, এবং সময় নষ্ট করিয়া এরূপ অপাঠ্য পুস্তক পাঠ করেন। গ্রন্থখানির চতুর্থ সংস্করণ—আমরা পাইয়াছি। প্রতি সংস্করণে যদি পাঁচ শত খণ্ড মুদ্রিত হইয়া থাকে, তবে দুই হাজার খণ্ডের মূল্য তিন হাজার টাকা, পাঠক মহাশয়েরা দিয়াছেন উহার প্রতিদানে পাইয়াছেন,—স্বর্ণ-কান্তি মাখাল।

এইরূপ সাহিত্যে দেশ ছাইয়া গেলে, মূর্খতার সীমাও বাড়িয়া যাইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—এইরূপ পুস্তক প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে সাহিত্যিকেরা মানিয়া লইতেছেন। কোনও প্রতিবাদ বা সংশোধন করিতেছেন না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় শিক্ষায় গুরু, দীক্ষায় গুরু, গুরুগিরিতে গুরু। তাঁহার যদি এত ভ্রম, তবে তাঁহার শিষ্যগণের যে অনন্ত ভ্রম উপস্থিত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

আজকাল একশ্রেণীর লেখকেরা "চ্যাং ব্যাং" লিখিয়া বাহাদুরী লইতেছেন। এবং বঙ্গভাষার অঙ্গ হইতে সংস্কৃত-কণ্টক তুলিয়া ফেলিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আর এক শ্রেণী—ইংরেজীর অনুকরণে, আইনের ও মিশনরী ধর্ম্মপুস্তকের ভাষার ন্যায় দুর্ব্বোধ্য ও জটিল ভাষার সৃষ্টি করিতেছেন। তৃতীয় শ্রেণী এখনও সংস্কৃতমূলক সাধু বাংলা ভাষার পক্ষপাতী। এবং তাঁহারাই আমাদের ভরসা-স্থল। আমাদের মতে সংস্কৃত শব্দ বাদ দিলে বাঙ্গলা ভাষাই থাকে না। মধুর সংস্কৃত শব্দাবলী বাঙ্গলা ভাষার সর্ব্বাঙ্গে এমনই ভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে যে, সেগুলিকে এখন উৎপাটিত করিতে হইলে মাতৃভাষার শিরা, ধমনী এমন কি হৃদ্‌পিণ্ড পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া যাইবে।

পণ্ডিত মহাশয় আমাদের বাঞ্ছিত শেষোক্ত প্রকারের লেখক! তাঁহার রচনার বহিস্তর যেরূপ মনোমদ অন্তস্তর সেরূপ নির্ম্মল নহে তাঁহার গ্রন্থ সকলে দেশের লোকের যথেষ্ট অনুরাগ দেখিতে পাই; কিন্তু তিনি সাবধান না হইলে এ অনুরাগ স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। ভিতরে যাহার গলিত কুষ্ঠ, তাহাকে বারাণসী সাটী পরাইয়া, কিছুকালের জন্ত দর্শকগণকে মুগ্ধ করা গেলেও, দর্শকগণ তাহাতে চির মুগ্ধ রহেন না। একবার ক্ষত বাহির হইয়া পড়িলে, ঘৃণার বিকারে তাঁহারা মুখ ফিরাইয়া বসেন। তাঁহার ন্যায় যশস্বী গ্রন্থকারের এত ভ্রম আমাদের দুরদৃষ্টের পরিচায়ক।

হিতবাদী বহুবার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থ প্রণেতাদের চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছেন। এখন সে সকল গ্রন্থ পরিশোধিত হইয়াছে কি না, জানিতে পারি নাই। কিন্তু উক্ত পত্র, সাধারণের পাঠ্য পুস্তকের সাধারণ সমালোচনা ভিন্ন,তাহাতে কখনও বিশেষভাবে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ভরসা করি, উক্ত পত্রের পরিচালক বৃন্দ, সাধারণ পাঠ্য এবং নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকেও মনোনিবেশ করিয়া, মাতৃভাষার পূজককুলে অগ্রগণ্য হইবেন।

তৎপর সাহিত্য পরিষদের নায়ক মহাশয়দের প্রতিও আমাদের নিবেদন—তাঁহারা যদি প্রতি বৎসর নব প্রকাশিত সাহিত্য পুস্তক গুলির দোষগুণের বিচার করিয়া তন্মধ্য হইতে বিশুদ্ধ, সুপাঠ্য ও সর্ব্বানুমোদিত গ্রন্থ নিচয়ের একটী তালিকা কোনও সংবাদ পত্রে মুদ্রিত করিতে দেন, তাহা হইলে সমাজের প্রভূত উপকার সাধিত হয়। উৎকৃষ্ট পুস্তকের সংখ্যা বাড়িতে থাকে! আবর্জ্জনা দূরীভূত হয়। এবং দরিদ্র পাঠকের অনেক অর্থ ও সময় বাঁচিয়া যায়।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু।

গো-জাতির অবনতি ও ভারতের কৃষিশিক্ষা

(১)

গো-জাতির উন্নতি করিতে হইলে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক নীতি আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ—সমজাতীয় ষাঁড় ও গাভী সংযোগ করিবে। নচেৎ যদি বৃষ বড় হয়, বড় জ্রণ উৎপন্ন হইয়া গাভীকে প্রসবকালীন কষ্ট দিতে পারে এবং সময়ে সময়ে নবগাভীর জীবন-সংশয়ও করিতে পারে। আমাদের দেশে আজকাল ভাল বৃষ পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে, সেই জন্য বৃষের সাহায্য, বড়ই বুঝিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, পাশ্চাত্য দেশের মত আমাদের দেশেও গাভী হইতে তেজস্কর বৃষ জননকার্য্যে ব্যবহার করা উচিত। বৃষ এবং গাভী এক সঙ্গে কদাচ চরিতে দিবে না। তাহার ফল বিষময়। এইরূপ পৃথক্করণ আমাদের দেশে নাই বলিয়া গোকুলের ক্রমিক অবনতি ঘটিয়াছে। চারণ প্রস্তুত করিতে হইলে সে বিষয়ে শিক্ষার জন্য আমাদের দেশের লোকগণকে বিলাত বা আমেরিকায় যাওয়া কর্ত্তব্য। ওকালতী, ডাক্তারি, ব্যারিষ্টারি, ইঞ্জিনীয়ারী লাইন আমরা ছাইয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু গো-ব্যবসা, দুগ্ধব্যবসা, মাখনব্যবসাদি শিক্ষা করিতে আমাদের দেশের লোক পাশ্চাত্যদেশে কদাচ যায় না। আমাদের দেশের বড় লোকের ছেলেদের ঐ সকল শিক্ষা করিতে যাওয়া উচিত। আমাদের বঙ্গদেশের বড় বড় নগরের মধ্যে যাহাতে চারণ ভূমি প্রস্তুত হয়, তাহার জন্য দেশের লোকের সবিশেষ চেষ্টা এবং সংবাদপত্রে সম্পাদকগণের তীব্র আন্দোলন করা কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে বিলাতে থাকিয়া মিঃ কাশর বানাজি সাপুরজি জাসাওয়ালা অদম্য সাহস ও অধ্যবসায়ে ভারতীয় গোরক্ষার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। উত্তর পশ্চিম দেশের মধ্যে গোরক্ষার জন্য লক্ষ্ণৌনিবাসী বাবু আনন্দবিহারীলাল ও কলিকাতার পণ্ডিত হাসানন্দ বর্ম্মা ঐ জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও কিছু কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। বঙ্গীয় সাহিত্য-সমিতির পক্ষ হইতে বিগত ১৯১২।১৩ সালে গোরক্ষার জন্য আইন লিপিবদ্ধ করার অগ্রে এক আবেদনপত্র বড়লাট-সদনে পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট তাহা তথায় পাঠান নাই। আমাদের দেশের সকল লোকের এ বিষয়ে তীব্র আন্দোলন করা কর্ত্তব্য।

গোরক্ষায় মনঃ সন্নিবিষ্ট করিতে হইলে দেশের লোকের পশুচিকিৎসা জানা চাই, কৃষিশিক্ষারও বিশেষ অনুশীলন চাই। কৃষি আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হয় না বলিয়াই আমাদের সাধের কৃষিপ্রধান ভারত এত পশ্চাৎপদ হইয়াছে এবং কৃষির অবনতি এত হইয়াছে। কৃষি-গোরক্ষা শিক্ষার জন্য আমাদের দেশের বড় বড় লোকগণ বা রায় যোগীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর তাঁহার বৈজ্ঞানিক সমিতি হইতে বা কলিকাতার কর্পোরেশন দুগ্ধব্যবসাদি শিক্ষার জন্য ২।৩টি করিয়া দেশীয় যুবককে খরচ দিয়া বিলাত, জার্ম্মানী বা আমেরিকায় পাঠান, তাহা হইলে, দেশের মহৎ হিত সাধিত হইতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের লোক এদিকে বীতশ্রদ্ধ! কাজেই দেশে মহামারি, দুর্ভিক্ষ বৎসর বৎসর হইবেনা ত কি হইবে? খাদ্যাভাবেই সকল রোগ ও বিপদ লোককে আসিয়া অভিভূত করে। সেই জন্য বলি যে,

আমাদের দেশের কৃষি বিভাগটিকে নূতন করিয়া, বিলাতি অনুকরণে পুনর্গঠিত করিয়া, দেশের হিতকর করিয়া লইতে হইলে, প্রজাবৃন্দের তজ্জন্য রাজার কাছে অগ্রসর হওয়া আশু কর্ত্তব্য।

বিলাত প্রভৃতি পাশ্চাত্য-দেশের মত কৃষিশিক্ষাপদ্ধতি আমাদের দেশে নাই। বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর ও শ্রীহট্টের মত বিশাল প্রদেশে কত কৃষি-বিদ্যালয় ও কালেজ থাকা উচিত, তাহা এক বিলাত, জার্ম্মানী ও আমেরিকার কৃষিপদ্ধতির সহিত তুলনা করিলেই পাঠক জানিতে পারিবেন। আমরা কৃষিপ্রধান দেশের অধিবাসী হইয়াও কৃষির কি পর্য্যন্ত উন্নতি করিয়াছি এবং বিজ্ঞানবলে কৃষির উন্নতি করিয়া উপরি উক্ত পাশ্চাত্য দেশসমূহ আমাদের অপেক্ষা কিরূপ ধনের অধিপতি হইয়াছেন! এতেও কি দেশের লোকের চক্ষুর উন্মীলন হইবে না?

আমাদের কৃষির প্রধান সহায় গো-শক্তি। গো-শক্তির রক্ষা ও উন্নতির জন্য ভারতবাসী সমবেত চেষ্টা কর, নচেৎ ভবিষ্যৎ কৃষির বড়ই তমসাচ্ছন্ন পরিণাম হইবে, তাহা এই সময় হইতেই বুঝা কর্ত্তব্য।

এখন পাশ্চাত্য দেশসমূহে এবং আমাদের দীন ভারতে কৃষি-বিদ্যায় কিরূপ অনুশীলন হইয়া থাকে, তাহা এই প্রবন্ধে পাঠকবর্গকে দেখাইয়া প্রদর্শন করিব যে, আমাদের কৃষি কেন এত পশ্চাতে অবস্থিত, ইহা আমাদের দেশের লোকের দোষ!!

ইংলণ্ড, ওয়েল্‌স্ ও স্কটলণ্ড দেশে বহু ক্ষুদ্র কৃষি-বিদ্যালয় ও কলেজ আছে। জার্ম্মানীতেও ঐরূপ ব্যবস্থা আছে। ঐ সকল দেশে উচ্চ এবং নিম্ন কৃষি-শিক্ষার বিধি আছে। মার্কিণ দেশেও কৃষিশিক্ষার জন্য রাজকোষ হইতে প্রতি বৎসর প্রভূত অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে। বিলাতের যুক্তরাজ্যেও ঐ জন্য প্রতি বৎসর সাড়ে আঠার হাজার পাউণ্ড কেবলমাত্র ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স্ দেশে ব্যয়িত হয়। দেশে ঐ টাকা হইতে স্কুল কলেজ, কাউণ্টি কাউন্‌সিলের কৃষিপাঠাগার, মুর্গীক্ষেত্র, বীজনির্ণায়ক ক্ষেত্র, দুগ্ধব্যবসা, ফলের চাষের বিদ্যালয়, সাইডার ব্যবসায়ের বিদ্যালয়, অবৈতনিক বৃষের সাহায্যদান, পরীক্ষাক্ষেত্র, প্রবন্ধ লিখন, পারিতোষিক দান, রিসার্চ ওয়ার্ক ইত্যাদির জন্য ব্যয় হয়, তাহা ধারাবাহিকরূপে পর পর আমরা পাঠকগণকে অবগত করাইব। কৃষিবিদ্যা ও গোব্যবসায় শিক্ষা করিবার যেমন সু ও সস্তা ব্যবস্থা আমেরিকায় আছে, এরূপ সভ্য জগতের আর কোন দেশেও নাই। আমেরিকার মত জার্ম্মাণীতেও ঐরূপ ব্যবস্থার অভাব যদিও নাই, কিন্তু ঐ দেশে হয় বা শালিহোত্র-বিদ্যার অনুশীলনটাই কিছু বেশী। জার্ম্মানগণ যোদ্ধাজাতি বলিয়া তাহাদের অশ্বচালনাটা জগৎবিখ্যাত। কাজেই ঐ দেশের লোকগণ হয়-চিকিৎসাদির প্রতি বেশী মনোযোগ দিয়া থাকেন। যৌথমতে ডেন্‌মার্ক ও স্কান্দিনেভিয়া দেশে কৃষি ও গোজাত খাদ্য বহুল উৎপন্ন হয় বলিয়া ঐ দেশদ্বয়মধ্যে কৃষিশিক্ষার বিশেষ সুব্যবস্থা আছে। অষ্ট্রীয়া প্রদেশের মধ্যে "মোডলিঙ্গে"র কৃষিবিদ্যালয়টি ১৮৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হইলেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মার্কিণ দেশেও কৃষিবিভাগ কুড়ি বৎসরের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত না হইলেও বিগত ১৬ বৎসরের মধ্যে এই বিভাগ প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়া দেশের কৃষির অশেষবিধ সহায়তাদান

করিতেছে। ১৮৯১ সালে ঐ বিভাগে ৬৮২০০০০ পাউণ্ড খরচ হয়, কিন্তু ১৯১৩ সালে উহা ১৫৫০০০ পাউণ্ডে বর্দ্ধিত হইয়া দাঁড়ায়। তাহাতে দেশের কৃষককুলের অশেষবিধ সুবিধা হয়। চারাগাছের বিভাগ বা প্লাণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রী বুরো মোটে ১২ বৎসর পূর্ব্বে ঐ বিভাগে সংযোজিত হয়। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে ৩৪০০০ বিভিন্ন প্রকারের শস্য ও গাছের চাষ, দেশে নব-প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে এবং অবৈতনিক চাষীদের চাষবৃদ্ধির জন্য বীজ দেওয়া হইয়াছে। এই বিভাগ হইতে "চারণ" প্রস্তত-বিভাগের উৎপত্তি। তাহাতে দেশে গোব্যবসায়ীদের জন্য চারণ প্রস্তত-পদ্ধতিগুলি বিধিবদ্ধ হইয়া পুস্তকাকারে কৃষককুলের মধ্যে বহুল বিতরিত হওয়ায় দেশে বহু চারণ উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার ফলে উত্তম ও বলিষ্ঠ গোবৃন্দ জন্মিয়াছে। কীটতত্ত্ব আবিষ্কার ও পরীক্ষার জন্য ৩৫টা পরীক্ষাক্ষেত্র সমগ্র দেশে আছে। তাহাতে শস্যের পোকারোগ দূর করিবার ব্যবস্থা নিত্য হইয়া থাকে। তুলায় ফুল কাটা পোকা, স্যানজোস স্কেল ইত্যাদি বহুপ্রকার শস্যের শত্রু পোকা-কুলের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া মৃত্তিকা-পরীক্ষাক্ষেত্রও আছে। ইহার দ্বারা মৃত্তিকায় কত পরিমাণ সার হ্রাস হইল এবং ফসল-উৎপাদনের নিমিত্ত কি উপায়েই বা তাহা পূরণ করা যাইতে পারে, তাহার শিক্ষা কৃষককুলকে দিবার জন্য ব্যবস্থা আছে।

মার্কিণের কৃষি-বিভাগে প্রত্যেক বৎসর ৫৫০০০০০০ পাউণ্ড ব্যয়িত হইয়া থাকে। যাহাতে জমীর উৎপাদিকাশক্তি একে বারে নিঃশেষিত না হয়, তাহার জন্য এই বিভাগ সদাই ব্যস্ত। পশু চিকিৎসার জন্য "প্রাণী বা Animal Industry বুরোর সৃষ্টি। ইহার অধীনে সমগ্র দেশের জনন, উৎপাদন, রক্ষণ, গোশালাগুলি পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার জন্য সন্নিবিষ্ট বা স্থাপিত আছে। গোব্যবসা, দুগ্ধ-ব্যবসা, গবাখাদ্য সামগ্রীর উৎপাদন, বাজারে প্রেরণ, বিশুদ্ধ দুগ্ধ উৎপাদন, মাখন ও পনীরের ব্যবসা প্রভৃতি সবই এই বিভাগের অধীনে স্থাপিত। ঝড়, জল, শীলাপাত প্রভৃতির বিষয় সপ্তাহে এই বিভাগ দেশের কৃষকদের অবগতি করাইয়া ভাবী বিপৎপাত হইতে সাবধান করান। ১৮৯১ অব্দে কেবলমাত্র ৬১টি কৃষি-বিদ্যালয়ে ৬০০০ ছাত্র পড়িত, ১৯১৩ অব্দে ৭০টি কলেজে ২১০০০ কৃষক-ছাত্র ভর্ত্তি আছে দেখা যায়। ইহার মধ্যে অনেক ভারতবাসীও আছেন। তাহা ছাড়া দেশে ৪২টি স্বতন্ত্র সাধারণ-পরিচালিত কৃষিকলেজ আছে। কৃষির জন্য কেবল এক মিনিসোটা ষ্টেট ২৬০০০ পাউণ্ড সাহায্যদান করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া ৮০টা কৃষিবিদ্যালয় agricultural high school আছে। এখন সমগ্র দেশের মধ্যে ৬০টি কলেজ কৃষিবিষয়ে উচ্চ শ্রেণীর উপাধি বিতরণ করেন। ১৮৯১ অব্দের পূর্ব্বে মার্কিণ দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কৃষিকথা কেহ কখন শুনে নাই, কিন্তু চেষ্টা প্রতিভা ও বিজ্ঞানবলে আমেরিকা সভ্যজগতের শীর্ষস্থানীয়। আজকাল আমেরিকার ইউনিয়ানের অন্তর্গত প্রত্যেক ষ্টেটে কৃষিবিদ্যা অনুশীলনের নিমিত্ত বিশেষ ব্যবস্থা আছে এবং তন্মধ্যে ১৯টি ষ্টেটে তাহা আইনমতে compulsory. এক মাত্র কৃষির অনুশীলন জন্য ১৯১২ অব্দে মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট ১০৭০০০ পাউণ্ড সাহায্যদান করিয়াছেন।

প্রুসীয়ার যুক্তরাজ্যে ১৮৬১ অব্দের পূর্ব্বে কৃষি-অনুশীলনের কোনরূপই ব্যবস্থা ছিল না। এখন কাইশারের কৃপায় বিজ্ঞান-আলোচনা প্রসারের সহিত প্রুসীয়-রাজ্য কৃষি-অনুশীলনে ইউরোপখণ্ডের শীর্ষস্থানীয়। এই দেশের উচ্চ এবং নিম্ন বা প্রাথমিক কৃষি-অনুশীলনের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যালয় আছে। তাহা ছাড়া কৃষকপুত্রগণ ও কৃষক-কন্যা ও পত্নীগণের মুর্গীচাষ, বীজ পরীক্ষা, মাখন প্রস্তুত করণ, দুগ্ধ-দোহন প্রভৃতি অতি আবশ্যকীয়, কৃষকগণের গৃহস্থালীর কলাবিদ্যা শিক্ষা করিবার সুবন্দোবস্ত আছে। কিন্তু বীরপ্রসবিনী প্রুসীয় দেশে যুদ্ধবিদ্যার বিশেষ অনুশীলন থাকায় এই রাজ্যে শালিহোত্রের উৎকর্ষ খুবই হইয়াছে। গোচিকিৎসাদির অনুশীলন এই রাজ্যে তত বেশী না হইলেও তাহা উপেক্ষণীয় নহে। অধ্যাপক পলস্তু-পলী, ব্যাঙ্গ প্রভৃতি মনীষিগণ বর্ত্তমান সভ্য-জগতের মধ্যে প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। বার্লিন, গাটীঙ্গেন, ফ্রাঙ্ক-ফোর্ট, লিপজীগ, প্রভৃতি নগরের কৃষি-কলেজ ও কৃষি বিদ্যালয় জগদ্বিখ্যাত। ইউরোপখণ্ডের মধ্যে ডেন্‌মার্কের গো-দুগ্ধ ব্যবসায় জগৎপ্রসিদ্ধ। ডেন্‌মার্ক ও আয়র্লণ্ড দেশদ্বয় না থাকিলে আমার বিবেচনা হয়, ইংলণ্ডের যুক্তরাজ্যের লোক মাংস, ডিম্ব, মাখন, পনীর ও মুর্গীর অভাবে মরিয়া যাইত। ঐ দেশদ্বয়ের নিম্ন-স্থানবাসীরা অধিকাংশই কৃষিজীবী, তাহাদের পুত্রকন্যা-স্ত্রীগণ অল্পপুঁজীর ব্যবসা-অনুসরণ করিয়া বিশেষ লাভবান্ হইয়া থাকে। আজকাল আমাদের দেশের লোক কিছু বেশী মাত্রায় মাংসাশী হওয়ায় দেশমধ্যে পুলট্রি ফার্ম্মিং ব্যবসাটা ভাল করিয়া পাশ্চাত্য ধরণে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলে বিশেষ লাভজনক হইতে পারে, আশা করা যায় এবং দেশের নিঃস্ব মুসলমান প্রভৃতির পক্ষে জীবনোপায়ের পথ উন্মুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দতা আনিতে পারে।

কৃষি-শিক্ষায় সুইডেন এবং নরওয়ে যুক্ত-দেশদ্বয় (স্কান্দিনেভিয়া) জার্ম্মেনী অপেক্ষাও অগ্রণী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ডেয়ারি বা গো-পালন, উৎপাদন ও দুগ্ধব্যবসাই এ দেশে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ১৮১১ অব্দে এ দেশে প্রথম রয়েল একেডেমী অব এগ্রিকাল্‌চার স্থাপিত হয়।

সুইডেন দেশে দুইটীমাত্র উল্লেখযোগ্য কৃষিকলেজ আছে। প্রথমটি আপ্‌সালার সন্নিকট উল্‌টুনা নগরে ১৮৩৭ অব্দে এবং দ্বিতীয়টি দক্ষিণ সুইডেনের অন্তর্গত আসার্প নগরে ১৮৬২ অব্দে স্থাপিত আছে। এই দুই কলেজেই দুই বৎসরের কোর্স পাঠ করিয়া পরীক্ষা দিতে হয়। উভয় কলেজেই সরকার হইতে বৃত্তি প্রদত্ত হইয়া থাকে। দেশমধ্যে ২৮টি নিম্নশ্রেণীর কৃষি-পাঠশালা আছে। তন্মধ্যে স্কোনিয়া প্রদেশের অন্তঃপাতী ভেলের (svalof) কৃষিস্কুল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান কালে কি ভহেমের কৃষি-বিদ্যালয়টী ক্রমশঃ খ্যাতিলাভ করিতেছে নরওয়ে দেশের কৃষিবিভাগের কর্ত্তা "ডাই-রেক্টার অব এগ্রিকালচার" হইতেছেন। উচ্চ কৃষিশিক্ষার জন্য এ দেশে কৃষ্টিয়ানার সন্নিকট আস্‌গ্রামস্থিত কৃষি কলেজ আছে। তাহা ছাড়া, সমগ্র দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিম্ন-শ্রেণীর বা প্রাথমিক কৃষি-পাঠশালা আছে। ছাত্রগণ ছুটীর সময় আস কলেজে পরিদর্শন জন্য গিয়া থাকে।

দিনামার দেশ কৃষি এবং ডেয়ারি ব্যব-

সায়ে ইউরোপখণ্ডমধ্যে অগ্রণী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ দেশের "রেড ড্যানিশ" গাভী দ্রোণদুগ্ধা এবং জগদ্বিখ্যাত। পূর্ব্বে যে সুইডেনের কৃষি বিদ্যালয় এবং কৃষকদের পাঠশালার কথা বলিয়াছি, তাহা দিনামার-দের অনুকরণে গঠিত। এ দেশের মধ্যে "Royal Veterinary and Agricultural College in Copenhagen" এবং 'লিঙ্গবী'র (Lingby) কৃষি স্কুল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলেজটী ১৮৫৮ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষি বিদ্যালয়টি সরকার হইতে প্রতি বৎসর ১৬৭ পাউণ্ড সাহায্য পাইয়া থাকে। দিনামার দেশমধ্যে কোপনহেগেনের সন্নিকট ত্যাস্‌গার্ডের কৃষিবিদ্যালয়টীতে বহু কৃষক-বালকগণ বিনা বেতনে কৃষি-পদ্ধতি শিক্ষা করিয়া থাকে। এইখানকার শিক্ষার ব্যবস্থা দেখিলে আমার বঙ্গের "টুলো পণ্ডিতদের" কথা মনে পড়ে। এখানকার কৃষিশিক্ষা পাকা (deep and substantial) এবং স্থায়ী ও তদনুরূপ।

এইবার প্রুসীয় দেশের কৃষি-শিক্ষার বিষয় সংক্ষেপে বলিব। এ সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে যৎসামান্য বলিয়াছি। প্রুসীয় বা জার্ম্মেনীদেশীয় কৃষিশিক্ষার জন্য নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীর বিদ্যালয় আছে। এই গুলিতে উচ্চ এবং নিম্ন কৃষিশিক্ষা প্রদত্ত হয়।

১। Secondary Schools with an Agricultural Bias. ২। Lover Agricultural Schools. ৩। Winter Schools. ৪। Itine ant centes. ৫। Special schools. ৬। Schools for women and girls. Miscellaneous Course এই বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষি-বিদ্যালয়ে দেশের কৃষক পুত্রকন্যা ও পত্নীগণ কৃষি অনুশীলন করিয়া এবং শিক্ষিত হইয়া দেশের মধ্যে প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিতে-ছেন। এ সম্বন্ধে এক বিস্তারিত প্রবন্ধ পরে লিখিব। কৃষি-শিক্ষার কোনরূপ সুযোগ আমাদের এ দীন দেশে আছে কি?

প্রুশীয় দেশে মাধ্যমিক কৃষি স্কুল (Agr. second school.) প্রায় ১৮টি আছে। এই স্কুল বা বিদ্যালয় গুলিতে "থিয়োরেটি-ক্যাল" কৃষি-শিক্ষা প্রদত্ত হয়। কিন্তু ভাবী কৃষকদের থিয়োরেটিক্যাল শিক্ষায় কাজ হয় না বলিয়া দেশের মধ্যে আন্দোলন হইতে লাগিল। ফলে নিম্ন বা প্রাথমিক কৃষি (Lower agricultural School) স্কুল এবং (Winter Schools) পাঠশালা দেশে বহুল প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্র্যাক্‌টিকাল শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইল। অনেক ছাত্র-গণ এই পাঠশালা বা স্কুলে পড়িয়া নিজে-দের পিতার ফারাম বা ক্ষেত্রে সাহচর্য্য করিয়া Practical শিক্ষা পাইতে লাগিলেন। পশ্চিমপ্রুসীয় দেশের মেরিনবর্গের কৃষি-বিদ্যালয়টী এই শ্রেণীর অন্তর্গত। সমগ্র প্রুশীয় দেশের যাবতীয় কৃষি স্কুল ও কলেজের ব্যয়সঙ্কুলান জন্য রাজকোষ হইতে প্রতি বৎসর ৮৮০০০ পাউণ্ড অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে। কখন কখন কোন প্রদেশ (state) মধ্যে নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিবার জন্য স্বতন্ত্র (special) স্কুল-পরিচালনের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই সকল পাঠ-শালায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে;—শস্য উৎপাদন, জমীর উৎ-পাদিকা শক্তির বৃদ্ধিকরণ, সার প্রয়োগ, সার নির্ব্বাচন, পশু উৎপাদন, শূকর উৎপাদন ডেয়ারি, অশ্ব-জনন, পুল্‌ট্রী জনন বা চাষ, ইনকুবেটার পরিচালন, গোশালা, অশ্বশালা,

মেষ শালা বা অপর পশুশালা নির্ম্মাণ, কামারের কাজ, হিসাবপত্র রাখা, ফল চাষ, ফল সংরক্ষণ.সুবিধা ও সস্তায় ক্ষেত্রজাত শস্য, গব্য খাদ্যসামগ্রী, ফল, ডিম্ব বা মাংস বাজারে প্রেরণ, আঙ্গুর ও সাইডার চাষ, বীজপরীক্ষা. মাখান প্রস্তুতকরণ, মধুমক্ষিকার চাষ, ফরেষ্ট্রী বা কাননরচন, চারণ প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি। ছাত্রগণ এই প্রাথমিক বা মাধ্যমিক পরীক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা পাইলে higher agricultural শিক্ষার জন্য কোন কলেজ বা বিদ্যালয়ের Instituteএ প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন। প্রুশীয়ার কৃষি ইনস্টিটিউটগুলি ইউনিভার্সিটির অন্তর্গত। এইগুলি উচ্চ কৃষিশিক্ষার প্রধান সোপানাবলী বলিয়া অত্রদেশে প্রসিদ্ধ। বার্লিন, গটিংজেন্, হল্, লিপজিগ্ ফ্রাঙ্কফর্ট অন্ মেন্,হোয়েনজর্ণ প্রভৃতি স্থানের কৃষিবিদ্যালয়গুলি ইউরোপ মহাদেশের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সকল স্থানে পশু-চিকিৎসা (Veterinary science), উদ্ভিদ্-বিদ্যা বা বাগান-রচনা (Horticulture), আবিষ্কার-কার্য্য (Research Work) এবং উচ্চ অঙ্গের কৃষির অনুশীলন হইয়া থাকে। বিশেষ পারদর্শী ছাত্রগণ পারিতোষিক পাইয়া থাকে। ইহা ছাড়া দেশমধ্যে অনেক স্বতন্ত্র লোক পরিচালিত কৃষিশিক্ষার (Private Agricultural Institutions, আছে।

এইবার আমাদের আদর্শ ভূমি ইংলণ্ড দ্বীপপুঞ্জে কিরূপ কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাহা পাঠকগণকে উপহার দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। বিলাতের সমগ্র যুক্তরাজ্য-মধ্যে উচ্চ কৃষি বিদ্যা অনুশীলন জন্য পার্লিয়ামেণ্ট হইতে উচ্চ বাৎসরিক ১৮৫০০ পাউণ্ড যাবতীয় কৃষিকালেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া "এগ্রিকি বোর্ড" কৃষি-অনুশীলন জন্য ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে বাৎসরিক ৭০০০৲ পাউণ্ড দান করিয়া থাকেন। বিলাতে কৃষিবিদ্যা-শিক্ষা-প্রণালীমতে প্রত্যেক ছাত্রকে কলেজে ৩।৪ বৎসর থাকিয়া থিওরেটিক এবং প্র্যাক্‌টি-ক্যাল অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হয় এবং শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কৃষি ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট প্রদত্ত হয়। তাহা ছাড়া সমগ্র দেশ মধ্যে প্রাদেশিক বা কাউন্টি কাউন্সিল-পরিচালিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি-বিদ্যালয় আছে। এইগুলির মধ্যে কতকগুলি ভ্রমণশীল বিদ্যালয়। বৎসরের মধ্যে সময়ে সময়ে বা নির্দ্দিষ্ট সময়ে কৃষককেন্দ্রমধ্যে গিয়া কৃষি-সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া,নবাবিষ্কৃত কৃষিতথ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ কৃষকগণকে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে এবং কোন কোন স্কুল-কলেজে স্বল্পকালব্যাপী "কোর্স" নির্দ্দিষ্ট আছে কোন কোনটি পুনশ্চ কৃষককন্যা বা স্ত্রীগণের জন্যই নির্দ্দিষ্ট আছে। কোন কোন স্থলে পক্ষ, সপ্তাহ, ত্রৈমাসিক, বা ষাণ্মাষিক "কোর্স" বিশেষ সুবিধার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। কোন কোন স্থানে দিবা এবং সান্ধ্য (day and evening) লেক্‌চারের ব্যবস্থা আছে। এইগুলি কৃষি, মুর্গি-চাষ, মক্ষিকা-চাষ (Bee-Keeping), নাল বান্ধাই, উদ্যানবিদ্যানুশীলন, চারণ ও সার প্রভৃতি প্রস্তুত করণ. দুগ্ধ ও গোব্যবসা সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রদান করিয়া থাকেন। ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স্ প্রদেশে নিম্নলিখিত কৃষি-স্কুল-কলেজ আছে :—

১। এবারস্টিথ্ উইথ নগরস্থিত ইউনিভার্সিটি কলেজ অব্ ওয়েল্‌স্। প্রবেশিকা-

পরীক্ষার পর এইখানে তিন বৎসর পাঠ করিলে কৃষি উপাধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন কোর্সের পৃথক্ ফি বা বেতনের ব্যবস্থা আছে। ডিপ্লোমা কোর্স ছাড়া কৃষকদের সুবিধার জন্য ডেয়ারি শিক্ষার জন্য ২ বৎসর পাঠ ও প্র্যাক্টিক্যাল্ শিক্ষা করিতে হয়। এই দুই বৎসরের মধ্যে ছয়টী টার্ম (term) আছে এবং প্রত্যেক শেসানে আড়াই পাউণ্ড বেতন প্রত্যেক ছাত্রকে দিতে হয়। সার্টিফিকেট গৃহীতাকে এক শেসানে আড়াই পাউণ্ড দিলেই হয়। প্রত্যেক বৎসর মে এবং জুন মাসে প্র্যাকটিক্যাল্ ডেয়ারি সম্বন্ধে লেক্‌চার হয়। তিন পাউণ্ড ফি দিলেই তাহাতে ছাত্রগণ প্রবেশ লাভ করিতে পারে।

২। ব্যাঙ্গর নগরের সন্নিকট উত্তর-ওয়েল্‌সের ইউনিভার্সিটী কলেজ। এই কলেজের ছাত্রগণ কৃষিতে বি, এস্, সি উপাধি পান। প্রবেশিকার পর ২ বৎসর পাঠ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পাঠ করিতে পারেন। ব্যঙ্গর হইতে ৫ মাইল দূরে এবার নগরে কলেজ ফারম অবস্থিত। এইখানে ছাত্রগণ হাতে-কলমে (Practical) শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন. বন্য বিভাগের (forestry) শিক্ষার জন্য চায়ক্ নামক স্থানে বিশেষ সুবন্দোবস্তও আছে।

৩। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। এখানেও ফরেষ্ট্রী এবং কৃষি উপাধি লাভের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ছাত্রগণকে তিন বৎসর কলেজে থাকিয়া উপাধি লাভ করিতে হয়।

৪। লিডস্ বিশ্ববিদ্যালয়েও ছোট এবং বড় কোর্সের ব্যবস্থা আছে। কৃষি উপাধির জন্য ছাত্রগণকে তিন শীতের শেসান গ্রহণ করিতে হয়। তাহা ছাড়া চামড়া টানা শিক্ষার (Chrome leather tanning ব্যবস্থাও বেশ সুচারুরূপে অত্র স্থানে আছে। ইহার শিক্ষা আমেরিকা এবং জার্ম্মেণীতে খুব ভালরূপ হইয়া থাকে। লণ্ডনের ক্রমওসি অঞ্চলে চামড়ার কাজ হাতে কলমে শিক্ষার বিশেষ সুবিধা আছে। শীত কোর্সের ফি ১০ পাউণ্ড এবং গ্রীষ্ম কোর্সের যাহা সচরাচর এপ্রেল হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত স্থায়ী, তাহার ফি ৫ পাউণ্ড হইতেছে। ডিপ্লোমা কোর্স দুই বৎসরব্যাপী এবং ফি ২১ পাউণ্ড। হাতেকলমে কাজ শিক্ষার জন্য ছাত্রগণকে অন্ততঃ কলেজের অন্তর্গত গার্ ফোর্থের সন্নিকট ম্যানর ফারমে ৬ মাস কাল কাজ শিক্ষা করিতে হয়। এইখানে কৃষি, উদ্যানবিদ্যা এবং ডেয়ারি বিদ্যায় প্র্যাক্টিক্যাল কাজ শিখিতে হয়।

৫। টাইন নদে উপরিস্থ নিউক্যাসেলের আর্মষ্ট্রং কলেজ। ইহা ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত। কৃষক এবং ফরেষ্টারগণকে মাইকেলমাস্ টার্মে ৬ সপ্তাহব্যাপী কোর্স পাঠ করাইয়া উত্তীর্ণ করা হয়, কিন্তু যাহারা উপাধিগ্রহণেচ্ছুক, তাঁহাদের তিন বৎসর পাঠ করিতে হয় এবং ডিপ্লোমা প্রার্থিগণকে দুই শীতের ২ শেসানে পাঠ শেষ করিতে হয়। এক শীতব্যাপী স্বল্প কোর্সও আছে। বেতন ৬ পাউণ্ড। শীত কোর্সের ফি ১০ পাউণ্ড এবং ডিগ্রী বা উপাধি কোর্সের ফি ২০ পাউণ্ড হইতেছে। হাতে-কলমে ডেয়ারি-ব্যবসা শিক্ষার জন্য নর্থাম্বারল্যাণ্ড কাউণ্টি কাউন্সিল্ এবং ডারহাম্ কাউণ্টি কাউন্সিল্ ককল্ (Crecle park) পার্কের মধ্যে কৃষি শিক্ষা দিয়া থাকেন। এইখানে ৬০টি দ্রোণদুঘা রক্ষিত

হইয়া থাকে। বন্য-বিভাগের সহায়তার জন্যও চপ্‌ওয়েল উড্‌সে ২০০ একার ব্যাপী সংরক্ষিত বন আছে।

৬। অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়; এখানেও দুই বৎসর ব্যাপী কৃষি কোর্স আছে। এই স্থান হইতে কৃষি ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৭। রেডিংএর ইউনিভার্সিটী কালেজ সমগ্র ইংলণ্ড প্রদেশমধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গো ও দুগ্ধ ব্যবসায়ের পাঠাগার। এইখানে উচ্চ এবং নিম্ন অঙ্গের কৃষি, ডেয়ারি এবং উদ্যান-বিদ্যার শিক্ষা নিয়মিত প্রদত্ত হইয়া থাকে। উপাধি-পরীক্ষার জন্য তিন বৎসর এবং ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য ২ বৎসর পাঠ করিতে হয়। ছয় মাস পড়িলে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিন টার্ম-ব্যাপী সমগ্র সেশানের জন্য ২৪ পাউণ্ড এবং সার্টিফিকেট কোর্সের জন্য দুই টার্মে ১ পাউণ্ড ফি দিতে হয়। অক্টোবর হইতে জুলাই মাস পর্য্যন্ত পাঠে ডেয়ারিংএ সার্টিফিকেট এবং দুই বৎসর কাল অধ্যয়নে দুগ্ধ ব্যবসায়ে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ছয় মাসব্যাপী ডেয়ারিংএ স্বল্প কাল-ব্যাপী টার্মের ব্যবস্থা আছে। ব্যবহারিক (Practical) জ্ঞান-লাভের জন্য ছাত্রকে বৃটিশ ডেয়ারি ইন্‌ষ্টিটিউটে শিক্ষা লাভ করিতে হয়। উদ্যান-বিদ্যাশিক্ষায়ও কালেজ ফারমে (সিন্‌ফিল্ডে) বিশেষ সুব্যবস্থা আছে। তাহা ছাড়া পুলট্রি ফার্মিং সম্বন্ধেও এখানে শিক্ষার বেশ ব্যবস্থা আছে। আইলস্‌বেরীতে মুর্গীচাষের কেন্দ্রস্থল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অভ্যাসিক শিক্ষাশুদ্ধ ডেয়ারিংএর সম্পূর্ণ কোর্সে ৩০ পাউণ্ড সমগ্র শেসানে খরচ লাগে। ছয় ও তিন মাসের ডেয়ারিং কোর্সে ১৬ এবং ১০ পাউণ্ড ফি লাগে।

৮। "সিরেন্‌সিষ্টার" (সিষ্টার) স্থিত রয়েল এগ্রিকালচুরাল কলেজ দেশের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ কৃষি-কলেজ হইতেছে। এখানে বৈজ্ঞানিক উচ্চ কৃষি-শিক্ষার (ব্যবহারিক এবং কাল্পনিক) সুব্যবস্থা আছে। কলেজ ডিপ্লোমার জন্য তিন বৎসর, উপনিবেশিকদের জন্য বৎসরব্যাপী কোর্স, পরিণত-বয়স্কের জন্যও বৎসরব্যাপী কোর্সের, শীতে ৮ সপ্তাহব্যাপী কোর্সের, এবং বি, এস, সির জন্য পৃথক্‌ কোর্সের ব্যবস্থা আছে। মেধাবী ছাত্রগণ কলেজ হইতে বৃত্তি পাইয়া থাকেন। এখানে লর্ড ব্যাথার্ষ্টের ৩০ বিঘা জমিদারীতে উদ্যান ও বনবিদ্যায় ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই কলেজ ব্রিষ্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযোজিত।

এইখানে পক্ষী চাষের অনুশীলনেরও বিশেষরূপ সুচারু ব্যবস্থা আছে। সেক্রেটারিকে পত্র লিখিলে সমগ্র নিয়মাবলী পাওয়া যায়। আমাদের দেশের সুসন্তান মিঃ বি, কে, চক্রবর্ত্তী বার এ্যাট ল, মিঃ জি, সি, বোস, মিঃ ডি, এল্‌, রায় প্রভৃতি মনীষিগণ এই কলেজের কৃতি ছাত্র হইতেছেন।

৯ চেশায়ার কাউন্টির অন্তর্গত হম্‌স্‌ চ্যাপেলস্থিত কৃষি ও উদ্যান বিদ্যানুশীলনের কালেজ। ইহা ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযোজিত। ডিপ্লোমা কোর্স তিন বৎসরব্যাপী। কাউন্টির অধিবাসিগণকে ৬০ এবং তদ্‌বহিস্থ অধিবাসিগণকে ৭৫ পাউণ্ড ফি সমগ্র টার্মের সেশানের জন্য দিতে হয়। এইখানে শর্টহর্ণ গাভী, শূকর এবং পুল্‌ট্রী বিদ্যাও শিক্ষালাভ করা যায়। কলেজস্থ ফারমের ১০০ একার ভূমিতে বহুবিধ বিষয় —কৃষি, গোরক্ষা মক্ষিকাচাষ, পুল্‌ট্রী, উদ্যান-বিদ্যা, মেষচাষ—শিক্ষার সুবন্দোবস্ত আছে।

কৃষির বি এস্ সি উপাধি-লাভেচ্ছুগণকে এখানে এবং ম্যান্‌চেষ্টারে ব্যবহারিক এবং কাল্পনিক শিক্ষা লাভ করিতে এবং মৌলিক অনুসন্ধানে (original research) পারদর্শিতার পরিচয় দিতে হয়।

১০। জীবশায়ারের অন্তর্গত কিংসটন্ নগরস্থিত এগ্রিকাল্‌চুরাল্ এবং ডেয়ারি কলেজ। কৃষি-সার্টিফিকেট কোর্স অক্টোবর মাসে আরম্ভ হয় এবং দশ সপ্তাহের এক এক টার্মে বিভক্ত হইয়া তিন টার্মে শেষ হয়। শিক্ষার ব্যয় কাউন্টির বা সাহায্যকারী অধিবাসিগণের পক্ষে প্রত্যেক টার্মে ৫ পাউণ্ড এবং বহিঃসীমার জন্য সাড়ে ৭ পাউণ্ড পুল্‌ট্রী ফার্ম্মিং শিক্ষার জন্য ১২সপ্তাহের কোর্সের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। কলেজ নিজ ফারমের মধ্যস্থানে ১৭৭ একার ভূমি লইয়া প্রতিষ্ঠিত আছে। অক্টোবর হইতে ৯ মাস শিক্ষা করিয়া ডেয়ারি বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করা যায়। তিন কাউন্টির অধিবাসীর জন্য মাসের ফি ৬ পাউণ্ড, ৬ মাসের সাড়ে দশ পাউণ্ড এবং ৯ মাসের সাড়ে তের পাউণ্ড তদ্বহিস্থের জন্য ইহার দ্বিগুণ ফি ব্যবস্থিত আছে। তাহা ছাড়া ৬ সপ্তাহের স্বল্প কোর্সও ডেয়ারির জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। সপ্তাহে ১ পাউণ্ড বা তাহার অর্দ্ধেক ফি লাগিয়া থাকে। কাউন্টিস্থ অধিবাসিগণের বিশেষ সুবিধার জন্য দুইটি ভ্রমণশীল ডেয়ারিং স্কুল কৃষক-বালক ও বালিকাগণকে সরল ভাষায় লেকচার দিয়া শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা জন্য প্রতিষ্ঠিত আছে

১১। নিউপোর্ট স্থাপস্থিত হার্পার এডাম্সের কৃষিকলেজ। ২৩৬ একার-ব্যাপী কলেজের ফারমের মধ্যস্থানে এই কলেজ অবস্থিত। ইহার মধ্যে ১৫৪ একার চারণে এবং ৮২ একার কৃষি এবং উদ্ভিদ ও শাক শব্‌জি চাষে ব্যবস্থিত আছে। ডিপ্লোমা কোর্স ২ বা ৩ন বৎসরব্যাপী। সার্টিফিকেট কোর্সও ২ বৎসরকাল-ব্যাপী, কিন্তু প্রথমটী অপেক্ষা কম পরি-বর্দ্ধিত অর্থাৎ "pure science" কম শিখিতে হয়। পাঠ্য ফি ৮ পাউণ্ড এবং খোরাক আদি ৩৫ পাউণ্ড প্রত্যেক (সপ্তাহের) সেখানে দিতে হয়। ষ্ট্যাফোর্ড এবং শ্রপ্‌শিয়ারের অধিবাসিগণকে এবং বহিঃস্থ ছাত্রগণকে ১৮ এবং ৪২ পাউণ্ড দিতে হয়। দুগ্ধবতী গাভী ও মেষপাল কলেজ-খামারে রক্ষিত আছে এবং ৩ একার ভূমি ফল এবং শাকশব্‌জির জন্য প্রদত্ত আছে।

১২। কেণ্টের অন্তর্গত সোয়ান্‌লীস্থিত উদ্যান-কলেজ (Horticultural College)। ইহা বালিকা এবং স্ত্রীলোক যাহারা ফল, শাক ও শবজী-ব্যবসায়ী হইতে চাহে, তাহাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ২ বা ৩ বৎসর পড়িলে ডিপ্লোমা পাওয়া যায়। বাৎসরিক ফি ৮০ পাউণ্ড। এবং এইখানে পুল্‌ট্রী এবং ডেয়ারি ফার্ম্মিং শিক্ষারও সুব্যবস্থা আছে।

১৩। সাসেক্সের অন্তর্গত অক্‌ফিল্ড (Uckfield) স্থিত কৃষি এবং উদ্যান বিদ্যানুশীলন কলেজ (Agricultural and Horticultural College) তাহার পর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কলেজে ভিন্ন-প্রকার পাঠের ব্যবস্থা আছে। (১) সার্টিফিকেট জন্য কলেজে দুই বৎসর কাল পড়িতে হয়। (২) শীতকালে কৃষকবালকদের জন্য ১২ সপ্তাহের কোর্স ব্যবস্থিত আছে। (৩) ল্যাণ্ড এজেন্সি ও ষ্টেট ম্যানেজমেণ্টও পরিচালন শিক্ষার জন্য অক্টোবর হইতে মার্চ্চ

পর্য্যন্ত পাঠের নিয়মও আছে এই ত্রিবিধ-কোর্সের পৃথক্ পৃথক্ ফি'র ব্যবস্থা আছে। মুর্গী, শূকর, মেষ এবং দুগ্ধবতী গাভী কালেজের অন্তর্গত ১০১ একারের ফারমে শিক্ষার জন্য রক্ষিত হইতেছে। উদ্যান ও উদ্ভিদ-বিদ্যা এবং মুর্গীচাষের জন্য বিশেষ যত্ন করা হয়।

১৪। কেণ্টের অন্তর্গত ওয়াই-স্থিত কৃষিকলেজ (South Eastern Agricultural College)। এই কৃষি-কলেজে তিন পৃথক্ কোর্স গঠিত হইয়া থাকে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষির বি এস্ সি উপাধি-গ্রহীতাগণকে ম্যাট্রিকুলেশানের পর চারি বৎসর পাঠ করিতে হয়। ডিপ্লোমা-প্রার্থিগণকে তিন বৎসর এবং সার্টিফিকেট-ইচ্ছুকগণকে (কৃষি এবং ফল উৎপাদন বিষয়ে) দুই বৎসরের কোর্স পাঠ করিতে হয়। সকাল এবং সন্ধ্যায় লেক্‌চার এবং বৈকালে ক্ষেতে ও মাঠে ব্যবহারিক শিক্ষা,—ডেয়ারি, ফল চাষ, হপ উৎপাদন, পুল্‌ট্রীচাষ ইত্যাদির জন্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। খোরাক ও বাস শুদ্ধ পাঠ্য ফি বাৎসরিক ১২০ পাউণ্ড দিতে হয়, কেণ্ট এবং সারে কাউণ্টির অধিবাসিগণকে বাৎসরিক ৬০ পাউণ্ড খাওয়া, বাস এবং খরচার জন্য ফি দিতে হয়। দক্ষিণ-ইংলণ্ড মধ্যে এই কলেজটি বেশ প্রসিদ্ধ। এইখানে শিক্ষার জন্য রম্‌নি মার্শ, এবং সাউথ ডাউন্স জাতীয় মেষ এবং শর্টহর্ণস্, এবার্ডিন এঙ্গাস, গ্যালোয়ে, রেড পোল্‌স, হেরিফোর্ড, সাসেক্স্ এবং অন্যান্য জাতীয় গাভী রক্ষিত আছে।

১৫। রিডিংস্থিত বৃটিশ ডেয়ারি ইন্সটিটিউট্:—ইহা ইংলণ্ডমধ্যে দুগ্ধ-ব্যবসা শিক্ষার কেন্দ্রস্থল এবং ইউনিভার্সিটি কলেজ রেডিং এবং বৃটিশ ডেয়ারি ফার্ম্মার্স এসোসিয়েশানের দ্বারা পরিচালিত এবং পর্য্যবেক্ষিত। ব্যবহারিক এবং কাল্পনিক শিক্ষা এইখানে পুলট্রি, ডেয়ারিং বিদ্যায় প্রদত্ত হইয়া থাকে। সকলের পক্ষে ফি সপ্তাহে ১ পাউণ্ড। মার্চ্চ হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত যে ৬ মাসের কোর্স আছে, তাহার ফি ১৬ পাউণ্ড, নচেৎ অপর ত্রৈমাসিক কোর্সের বেতন ১০ পাউণ্ড এবং ষাণ্মাসিক কোর্সের ফিজ ১৮ পাউণ্ড। মাখম তোলা শিক্ষার জন্য সপ্তাহে অর্দ্ধ পাউণ্ড ফি ব্যবস্থিত আছে।

১৬। পেষ্টনের হ্যারিস ইনষ্টিটিউট্:—স্ত্রী-পুরুষদিগের জন্য এই স্থানের বিদ্যালয়টী একটি প্রসিদ্ধ কৃষি-শিক্ষার স্থান। ডিপ্লোমা-প্রার্থিগণকে ৪ বৎসর অর্থাৎ ২০ সপ্তাহের বাৎসরিক সেশানের ৪ শীতের সেশান পাঠ করিতে হয়। স্বল্প কোর্সের ছাত্রগণ ডিপ্লোমা কোর্সের দুই সেশান মাত্র পাঠ করে।

ইহা ছাড়া বৃটিশ ডেয়ারি ফার্ম্মার্স এসোসিয়েশন এবং লণ্ডন নগরস্থিত রয়াল এগ্রিকালচুরাল সোসাইটি কৃষি,গোরক্ষা, মক্ষিকা, পায়রা, পক্ষিচাষ, মেষ এবং ছাগল চাষ সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা প্রদান করিয়া থাকে। আমাদের দেশে দুগ্ধবতী ছাগল চাষ সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা নাই। পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসীগণ যাহাই করেন তাহা সুচারু এবং সুন্দর। ছাগল আমাদের দেশে দেশী এবং রামছাগল ভিন্ন বর্ব্বাই এবং পাহাড়ে দৃষ্ট হয় বটে কিন্তু ইহাদের উৎকর্ষতা-সাধনের জন্য আমাদের দেশে কোনরূপ সভা সমিতি নাই। বিলাতে "বৃটিশ গোট্ সোসাইটি" এজন্য প্রতিষ্ঠিত আছে। নর্থ-এলার্টনের হোমস্ পেগ্‌লার সাহেব ইহার

সম্পাদক এবং সমিতির মুখপত্র পত্রিকায় তিনি সম্পাদক ও এডিটার। আমাদের দীন দেশে প্রতিবৎসর কোটী কোটী গো নানা কারণে অকালে কাল সদনে নীত হইতেছে কিন্তু তাহা প্রতিকারের অথবা গো-জাতির রক্ষা বা উৎকর্ষসাধনের জন্য আমাদের কোন চেষ্টাই লক্ষিত হয় না। জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশেও এইরূপ "রাজকীয় কৃষি সমিতি" (রয়াল এগ্রিকাল্‌চুরাল সোসাইটী) আছে। আমাদের কৃষি প্রধান দেশ বলিয়া এইরূপ সভা সমিতি আদৌ নাই !!!

বিলাতের "রাজকীয় কৃষি সমিতি" দেশের কৃষকগণের কৃষি বিদ্যানুশীলন, পশু-পক্ষি উৎপাদন সম্বন্ধে নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও সত্য সমূহ নিনাদায়ে সমিতির পত্রিকার সাহায্যে ও অবৈতনিক লেক্‌চার দ্বারা এবং সংবাদ পত্রের সাহায্যে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। এইরূপে দেশের কৃষকগণ কত যে উপকৃত হন তাহা বলা যায় না। অধিকন্তু এই সমিতি কৃষক এবং পালকগণের উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য মেলা, ও এক্‌জিবিশন, প্রদর্শনী বৎসর বৎসর দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে খুলিয়া থাকেন এবং কৃষকগণ ও গো, মেষ, ছাগল, মক্ষিকা, মুর্গী, ঘোড়া এবং পায়রা উৎপাদকগণকে বিশেষরূপ পারিতোষিক দিয়া থাকেন। আমাদের দেশে কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা নাই। সেদিন আমাদিগের চিরপরিচিত বাবু সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষি সভায় প্রস্তাবনা পেশ করেন যে প্রতিবৎসর গ্রাম্য কেন্দ্রে কেন্দ্রে কৃষি-প্রদর্শনী খোলার পক্ষে গভর্ণমেণ্ট বিশেষ মনোযোগ দান করুন। তাহার জন্য জেলা সমূহ হইতে মতামত আনাইয়া সভাপতি মহাশয় প্রকাশ করিলেন, যে, তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না, যেহেতু সকল জেলার কৃষি বিভাগের কর্ত্তাদের একমত নহে। কাজেই তাহা কার্য্যে পরিণত হইল না। কিন্তু বিলাতে এইরূপ প্রদর্শনী, বা কৃষিমেলা জেলায় মহকুমায় প্রতিবৎসর হইয়া থাকে। আমাদের পোড়া এইরূপ !!! বিলাতি যুক্তরাজ্য মধ্যে প্রতি বৎসর কত স্থানে কত প্রদর্শনী ও কৃষি মেলা পশু পক্ষির মেলা মেলা হইয়া থাকে তাহার সংখ্যা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। ইউরোপ খণ্ডের মধ্যে নিজলীনভগরডের পশু ও পক্ষি প্রদর্শনী জগৎ বিখ্যাত। পশ্চিম ইউরোপ মধ্যে শ্রুজবেরি, লিভার পুল, লণ্ডন, বৃষ্টল, ইয়র্ক প্রভৃতি স্থানের শো বা প্রদর্শনী বিশেষ বিখ্যাত দেশের মধ্যে সময়ে সময়ে কৃষি পশু ও পক্ষি প্রদর্শনীর একটি হিতকর তাৎপর্য্য আছে। আমাদের দেশে হরিহর ছত্রের পশু মেলা ভারত বিখ্যাত হইলেও এ বিশাল দেশে আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেলা বা শো বা প্রদর্শনী হইয়া থাকে তাহার উল্লেখ আমি মল্লিখিত গোপাল বান্ধব প্রথম ভাগের ২৯৮ পৃষ্ঠায় করিয়াছি। বৃটিশ ডেয়ারি ফার্ম্মার এসোসিয়েশান, ডেয়ারি ষ্টুডেন্টস্ ইউনিয়ান, মেট্রপলিটান ডেয়ারি কোম্পানি, এবং ভিন্ন২ কাউণ্টির অন্তর্গত কাউণ্টি কাউন্সিল সমূহ সুচারুরূপ কৃষি, মক্ষিকা, পক্ষি ও পশু উৎপাদন রক্ষণ ও পালন প্রভৃতি বিদ্যানুশীলনের সুব্যবস্থা করিয়া থাকেন। প্রায় সকল স্কুল কলেজ বা নৈশ বিদ্যালয়ে পক্ষিচাষ শিক্ষার সুবন্দোবস্ত আছে। বিলাতে প্রতিবৎসর ২৩ লক্ষ টাকার ডিম অপর দেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে।

কৃষি বিদ্যানুশীলন জন্য বৃটিশ এগ্রিকি বোর্ড বাৎসরিক ৪০ হাজার পাউণ্ড দান করিয়া থাকেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কিন্তু আমাদের দেশে সরকার হইতে এ সম্বন্ধে কি ব্যয় হয়, তাহা কাহারও অপরিজ্ঞাত নহে।

স্কটলণ্ড দেশে কলা বিদ্যা শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। তাহা ক্রমশঃ পরে বিবৃত হইতেছে।

স্কটলণ্ড দেশের মধ্যে এবার্ডীন গ্লাসগো এবং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি, গোরক্ষা এবং পক্ষি-চাষের খুব ভাল রূপ ব্যবস্থা আছে। সেখানে বহু ছাত্র কৃষি বিদ্যানুশীলন করিয়া থাকেন এবং এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহ অক্সফোর্ড এবং কেম্‌ব্রীজ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের মত কৃষি-ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট পারদর্শিতানুসারে দান করিয়া থাকেন। উচ্চ কৃষি ও পক্ষি পালন বা পুল্ট্রী শিক্ষার জন্য ইষ্ট অব্ স্কটলণ্ড কৃষিকলেজ এডিনবরা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া ব্লাইদ-উড্ স্কোয়ারে অবস্থিত আছে। এইরূপ পশ্চিম হাইলণ্ড কৃষি-কলেজে নিম্ন ও উচ্চ কৃষি, পশু পালন ও পক্ষী শিক্ষার জন্য ব্যবস্থিত আছে। ইহা ছাড়া দেশের মধ্যে বহু কাউন্টি কাউন্সিলের দ্বারা পরিচালিত কৃষি ও পক্ষী বিদ্যা শিক্ষাগার আছে। তন্মধ্যে আর গ্লাসগো এবার্ডীন, পিবল্‌স্, সেণ্ট আণ্ড্রুস্, বিউট্, কিল্‌মারনক্ এডিনবরো, প্রভৃতি নগরের কাউন্টি কাউন্সিলের দ্বারা পরিচালিত কৃষি-স্কুল সকল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমেরিকা প্রদেশের মধ্যে কৃষি ও পক্ষী পালন কলাবিদ্যাদ্বয়ের অনুশীলন খুব উৎকর্ষতা সাধিত হইয়া থাকে। আমার মনে হয় যে, কৃষি শিক্ষার যেমন সংবিধান ইউরোপ খণ্ড মধ্যে, বর্ত্তমান যুগে, জার্ম্মানি ও দিনামার দেশে আছে, এইরূপ ব্যবস্থা প্রাচীন ভূলোকে কোথাও দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আরও সুব্যবস্থা মার্কীনদেশে দৃষ্ট হয়। কৃষি-বিদ্যা গো-পালন পক্ষী-চাষাদি কলা বিদ্যানুশীলনে পাশ্চাত্য বা নব ভূলোকের মধ্যে ফলতঃ বর্ত্তমান যুগের সভ্যজাতির মধ্যে আমেরিকা শীর্ষ স্থানীয়। বৈজ্ঞানিক সরল কৃষি-শিক্ষার সুব্যবস্থা সভ্য জগতের আর কোনখানেই নাই।

বৈজ্ঞানিক সরল কৃষি-শিক্ষার সুব্যবস্থা সভ্যজগতের আর কোনখানেই নাই। আমেরিকার প্রত্যেক ষ্টেটে এক একটী ষ্টেট-কলেজের সহিত কৃষি-বিভাগ সংযোজিত আছে। তাহারা কৃষকগণের যাবতীয় আবশ্যকীয় কৃষি-সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের সংবাদ দেয়, পুস্তিকা বিতরণ করে, শস্যের রোগের আলোচনা করে এবং ফলকথা, যাবতীয় কলা-বিদ্যার শিক্ষা দিয়া থাকে। মেষপালক, গোপালক, পক্ষিপালক, মক্ষিকাপালক, বন-রক্ষক, মৎস্যপালক, মাখম উৎপাদককুল, অশ্ব, খচ্চর এবং কুক্কুরপালক এবং কৃষকগণের যাবতীয় আবশ্যকীয় বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করে, জল বায়ুর, বৃষ্টিপাতের গতি-বিধির খবরাদি দিয়া থাকে, তাহাতে দেশের যে কি মহান হিত সাধিত হয়, তাহা বলা যায় না। আমাদের দেশের লোক খাটিতে চায় না, মাথা ঘামাইতে চাহেনা, তাহারা সম্পূর্ণ ঈশ্বরোপজীবী, কাজেই আমাদের এত দুর্দ্দশা। আমার ভারতবাসী যিনি এই সকল সামান্য সামান্য বিষয় একটু চিন্তা করিবেন, তিনি সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, এইরূপ শিক্ষার দ্বারা দেশের কৃষক-কুলের প্রকৃত শিক্ষা হইয়া থাকে, অন্যথা

নহে। আমাদের দেশে এইরূপ শিক্ষার কি কোন ব্যবস্থা আছে? যদি থাকিত এবং দেশের লোক তাহার উপযোগিতা বুঝিত, তাহা হইলে দেশের কাঙ্গাল, ধনী, দরিদ্র, অধিবাসীগণ অন্নাভাবে অকালে প্রাণ হারাইত না। প্রকৃত স্বদেশ মাতৃকার সেবা কেবল নৈতিক আন্দোলনে সমাহিত হয়না। দেশের আর্থিক দুর্ভিক্ষ যিনি চিন্তা করিয়া নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করেন এবং দেশের লোকের পথপ্রদর্শক হয়েন, তিনিই প্রকৃত-স্বদেশ-সেবক। ভারত বিশাল কৃষি-দেশ হইলেও এখানকার দীন অধিবাসীদের গড়ে এক সন্ধ্যা আহারও জুটেনা। ইহা নিবারণের উপায় কি কেহ চিন্তা করেন?

আমরা এখন বেশ বুঝিয়াছি যে, আমাদের দেশে ভীষণ জীবন-সংগ্রামের দিন উপস্থিত হইয়াছে। অধ্যাপক ডারুইন আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, জীব ক্রমোন্নত হইয়াছে। উপযুক্ততমের স্থিতিশীলত্ব নীতি ডারুইনই সর্ব্বপ্রথমে সভ্যজগতের নিকট প্রচার করেন। যোগ্যতমের স্থিতিশীলত্ব বিধির উল্লেখ ভারতীয় দর্শনে আছে,তাহা আমরা জানি না বা দেখি না, কাজেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে আমরা সর্ব্বোচ্চ পদবী দিয়া থাকি। কলাবিদ্যানুশীলনে আমাদের দেশে বিজ্ঞান চর্চ্চার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। গোপালন হিন্দুর নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম্ম। ইহা একটী কলাবিদ্যার অন্তর্গত,তাহা আমরা দশম ভাগ ভারতীর ৪৭ পৃষ্ঠায় বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষালের প্রবন্ধ পাঠে জানিতে পারি। আমাদের দীন দেশে বর্ত্তমান কালে যেরূপ তীব্র জীবন-সংগ্রাম উপস্থিত, তাহাতে কৃষি, গোরক্ষা, গোপালন এবং পক্ষীরক্ষা ও মক্ষিকাপালনাদি কলাবিদ্যার অনুশীলনে সর্ব্বতোভাবে মনোযোগ প্রদান করা কর্ত্তব্য। এখন "জীবন সংগ্রাম" শব্দটীর অর্থ বুঝা দরকার। বসুমতী পত্রিকায় বিগত বৎসর এ সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। দেশের মধ্যে অন্নকষ্ট যতই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিতেছে, জীবন-সংগ্রামের অর্থ ততই লোকের মর্ম্মে মর্ম্মে স্পর্শ করিতেছে। অন্নকষ্ট ছাড়া আরও বহু কারণে জীবন-সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া থাকে। অধ্যাপক ডারুইন ও ওয়ালেশের বৈজ্ঞানিক আলোচনার সময় ও সাবকাশ আমার নাই। যিনি এ বিষয় সম্যক জানিতে চাহেন, তিনি দিগ্বিজয় ও শশধর বাবুর প্রবন্ধ পাঠ করুন। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, যোগ্যতমের স্থিতি এবং দৈহিক যোগ্যতা প্রভৃতির বিষয় আমি বিশদভাবে উল্লিখিত গোপালবান্ধব প্রথম ভাগ পুস্তকে আলোচনা করিয়াছি। অন্নকষ্টের দায় হইতে বাঁচিতে হইলে আমাদের কলাবিদ্যানুশীলনে সম্যক মনোযোগী হওয়া উচিত; কিন্তু তজ্জন্য আমরা কিছুই করিনা।

মার্কিণ যুক্তসাম্রাজ্যের মধ্যে কৃষি বিদ্যানুশীলনের জন্য প্রত্যেক ষ্টেটে সরকারী কৃষি কলেজ ও তৎসংলগ্ন কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্র (Experimental stations) প্রতিষ্ঠিত আছে। আলাবামা ইডাহো, হাওয়াই জিময়জীয়া, ডেলাওয়ার, আর্কান্জাস্, আরিজোনা, ক্যালিফর্ণিয়া, কোলোরেডো, ইলিওনী, কানজাস, ইণ্ডিয়ানা, আয়োয়া, ম্যাসাচুসেট্, মিচিগাণ, মেন্ মেণ্টুকী, লুসিয়ানা, মিসৌরী, মিসিসিপী, মেরীল্যাণ্ড, নিউইয়ৰ্ক, নিউ জার্সি, ওহিও, পেন্সিলভেনীয়া, শিকাগো, রোড আইল্যাণ্ড নেব্রাস্কা, উটা, ভারমণ্ট্, ওয়াসিংটন, ওইস্

কন্‌সিন্‌ প্রভৃতি ষ্টেট মধ্যে ২১৩টী করিয়া কৃষি কলেজ আছে এবং ইহা ছাড়া দেশ মধ্যে বহু কৃষি-স্কুলও আছে। ভ্রমণশীল কৃষি ট্রেণের কথা আমরা আমেরিকা মহাপ্রদেশেই দেখিতে পাই। কৃষক-বালক বালিকা ও বনিতাদিগের কৃষি-বিদ্যায় পারদর্শী ও শিক্ষা দিবার জন্য কতকগুলি কৃতবিদ্য পারদর্শী ছাত্র অধ্যাপক সহ একটী রেলগাড়ী প্রত্যেক ষ্টেটের কৃষি কলেজ হইতে বহির্গত হইয়া ষ্টেটমধ্যে বড় বড় কৃষি কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া কৃষি গোপালন মেষ, অশ্ব, অশ্বতর. পক্ষী ও মক্ষিকা পালন, রক্ষণ ও উৎপাদন সম্বন্ধে, বীজ সংরক্ষণ, নির্ব্বাচন, সঞ্চাচয়, বীজ উৎপাদন ব্যবসা, দুগ্ধ মাখম পনীর উৎপাদন, রক্ষণ ও পরীক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষা, বক্তৃতা এবং ব্যবহারিক উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহাতে দেশের কত যে হিত সাধিত হয়, তাহা বলা যায় না। আমাদের দেশের লোক এত বিলাসী এবং পরমুখাপেক্ষী যে, এসব দিকে আদৌ তাঁহাদের দৃষ্টি নাই।

পাশ্চাত্য মহাসমরের কুফলে ভারতবাসীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রপীড়িত এবং ভুক্তভোগী। আমাদের দেশে বৎসর বৎসর দুর্ভিক্ষ ও অন্নকষ্ট এক না এক দেশে হইয়া থাকে; বিগত তিন বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা ও বিহার প্রদেশে ধান্য ফসলের নাশ হওয়ায় ঐ সকল দেশবাসীরা যে কি কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, তাহা যিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন। এই অন্ন কষ্টের লাঘবের এক মাত্র অন্যান্য উপায়ের মধ্যে গো-বল দৃঢ় করা। তাহা আমরা আদৌ করিনা; বরং গোশক্তির হ্রাসের পথ প্রদর্শক হই। ইকনমিক দিক হইতে দেখিলে বেশ বুঝা যাইবে যে,আমরা দিন দিন নিঃস্ব হইয়া অসহায় হইয়া পড়িতেছি !! দিন দিন আমাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। পাতাল মহাদেশের বন্য রেড্‌ ইণ্ডিয়ান বা ফিজী বা পেপুয়াবাসীদের মত আমরা ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া মরণোন্মুখ জাতিতে পরিণত হইতেছি। ইহার প্রতিকারের কোন চেষ্টাই আমরা করিনা,রাজার কর্ণে এসব অভাব অভিযোগের কথা ভুলিয়াও তুলিনা, আমরা কেবল আমিত্বে ডুবিয়া আছি এবং নিজের স্বার্থের জন্য সকলই হারাইতেছি ও হারাইয়াছি। এত কষ্টে, দুঃখে ও অবসাদে পড়িয়াও আমাদের চৈতন্য হয় না। জগদীশ্বর, এজাতির প্রতি কৃপা কর, ইহাদের রক্ষা কর, এই তব পদে প্রার্থনা !!! কেন আমরা মরণোন্মুখ জাতি, তাহা যদি কেহ সবিশেষ জানিতে বাসনা করেন, তবে তিনি ডাঃ উপেন্দ্রনাথ মুখোপধ্যায় মহাশয়ের পুস্তক যত্ন সহকারে পাঠ করুন। বঙ্গের কৃষি বিভাগের ডাইরেক্টার বাহাদুর মিঃ জে আর ব্লাকউড মহোদয় গোজাতি সম্বন্ধে এক বৃহৎ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তিনি কি উপায়ে দেশী গো-কুলের উন্নতি সাধিত হইয়া কৃষকগণের সাহায্য হইবে, কিসে দেশে সস্তা দরে গব্যজাত খাদ্য সামগ্রী সকল বিক্রীত হইবে, তাহার কোন আলোচনা এই পুস্তকে করেন নাই। গোরক্ষার জন্য কি কি বিধি প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে বা রাজার তজ্জন্য করা কর্ত্তব্য বা প্রজার সেজন্য রাজার মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন, তাহা ডাইরেক্টার মহোদয় তাঁহার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন নাই বা আমরাও করি না। গোরক্ষার জন্য আমাদের দেশে বহুল গোবীমা

কোম্পানি, গো ও পশু-প্রদর্শনী, রেল ও জাহাজে অল্প শুল্কে এক দেশ হইতে অন্য দেশে গো মেষ মহিষ ছাগল মুর্গী অশ্বাদি গৃহপালিত পশুর গমনবিধি প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। এবিষয়ে বঙ্গীয় কৃষি-সমিতিতে এবং শিমলা শৈলের রেলওয়ে বোর্ডে আবেদন করা হইয়াছিল, কিন্তু কাজে কিছুই হয় নাই। বঙ্গের গভর্ণর লাট উলিঙ্গডন নিজে বিলাতী কৃষক এবং তাঁহার শাসিত রাজ্যে কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যোগ করিতেছেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ছোট-লাট সার মেষ্টন বাহাদুরও এবিষয়ে কম মনোযোগী নহেন। আমাদের গভর্ণর লাট কারমাইকেল কৃষকদের এবং দেশের ভাবী হিতের জন্য যদি গো রক্ষার জন্য কোন নববিধি প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা হইলে তিনি দেশের প্রকৃতই স্থায়ী হিত সাধিত করিয়া দেশের সমগ্র দীন প্রপীড়িত অধিবাসীগণের ধন্যবাদার্হ হইবেন, সন্দেহ নাই। বিশুদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহের জন্য কলিকাতা নগরের মিউনি-সিপাল কর্পোরেশান বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন এবং তজ্জন্য কতকগুলি সভা সমিতি ও মাড়োয়ারী সম্প্রদায় প্রকৃতির নিকট হইতে মতামত চাহিয়াছেন, কিন্তু কাজে কিছুই করেন নাই। দেশের এবং দেশের লোকের চিরস্থায়ী হিত করিতে হইলে গভর্ণমেণ্টকে নিজের কতকটা স্বার্থ পরিহার করিতে হইবে। সমকালীন গভর্ণমেণ্টের স্বার্থের রক্ষা এবং প্রজার হিত সাধন হয় না!!! বকনা বা নব্য গাভীর (prime cows) অবাধ-হনন বিধিদ্বারা নিয়-ন্ত্রিত করিতে হইবে, দেশে চারণ রক্ষার জন্য বিধি প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে, যদি দশশালা বন্দোবস্তের দোহাই দিয়া অর্থ-লোলুপ বা জমীদারবর্গের কবল হইতে চারণ রক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত হয়, তাহাও করিতে হইবে। এসব বিষয়ের আলোচনা আমি ইতঃপূর্ব্বে বিশদ আলোচনা "আলোচনা", "ব্যবসা বাণিজ্য" এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যা "নব্যভারত" পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি। তাহা অনুসন্ধিৎসু পাঠক পাঠ করিতে পারেন। আজকাল যদিও আমাদের দেশের ২।১ জন বালক আমেরিকা বিলাত প্রভৃতি দেশে গো-রক্ষা গো-পালন, ডেয়ারিং প্রভৃতি কলা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা আমাদের দেশের পরিবর্ত্তিত দেশ কালপাত্র ভেদে তাহা কার্য্যকরী এবং লাভবান করিতে পারিতেছেন না। অধিকন্তু দেশের লোক তাঁহাদের সমর্থনও করেন না। গভর্ণমেণ্টের বহু অর্থব্যয়ে লব্ধ মনোমুগ্ধকর রিপোর্টের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া আমরা কোন দায়িত্বযুক্ত কৃষি সম্বন্ধীয় কাজে হস্ত প্রদান করিতে পারি না; কারণ আমাদের দেশের কৃষি-বিভাগ সেই স্থানীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, যেমন আমরা ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ডেনমার্ক, জার্ম্মেণী বা আমেরিকা মহাদ্বীপে দেখিতে পাই। সেইজন্য আমাদের সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাগ্রে কৃষির উন্নতি বিধান করা কর্ত্তব্য, গো জাতির উন্নতি বিনা কৃষির উন্নতি আমাদের দেশে সুদূরপরাহত বলিয়া মনে হয়। গো জাতির সম্বন্ধে অনেক কথা আমি মল্লিখিত গোপাল-বান্ধব পুস্তকে এবং ব্যবসায়ী, নব্যভারত, আলোচনা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি, তাহার পুনরুক্তি এবং উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করি।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পরম ঐশ্বর রূপ—ভগবান আত্মযোগে (আত্মযোগাৎ) আপনার অব্যয় আত্মার যে তেজোময় অনন্ত আদ্য বিশ্বরূপ,—যে ঐশ্বররূপ দেখাইয়াছিলেন এবং অর্জ্জুন ভগবানের কৃপায় বা প্রসাদে যোগদৃষ্টি লাভ করিয়া যে বিরাটরূপ দেখিতেছিলেন, সেই দিব্য ঐশ্বররূপ কি, তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে। অর্জ্জুন, পুরুষোত্তম পরমেশ্বরের যে অব্যয় আত্মার রূপ বা যে ঐশ্বররূপ দেখিতে চাহিলেন, ভগবৎ প্রসাদে তিনি তাহা যে ভাবে দেখিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে আমাদের বুঝিতে হইবে।

ভগবান পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন যে,—"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্ন মেকাংশেন স্থিতো জগৎ।" তিনি একাংশে এ বিশ্বজগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া স্থিত। আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, পরম ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ নিরুপাধিক অনির্ব্বাচ্য প্রপঞ্চাতীত (Transcendent)। আর তিনিই সবিশেষ সোপাধিক, সগুণ সপ্রপঞ্চ (Immanent) আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই পরম ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ, নিরুপাধিক, প্রপঞ্চাতীত ভাব আমাদের জ্ঞানের অতীত, ধারণার অতীত, যোগ দৃষ্টিতেও দর্শনের অতীত। অর্জ্জুন তাহা দেখিতে চান নাই। সেই নির্ব্বিশেষ, নিরুপাধিক ব্রহ্ম কিরূপে, কি হেতু সগুণ, সবিশেষ হন ও প্রপঞ্চরূপ হন, তাঁহার সে 'প্রভব' তত্ত্বও দেব বা মানুষের জ্ঞানের অতীত—তাহাও অর্জ্জুন দেখিতে চান নাই। পরমব্রহ্মের যাহা পরম, ঐশ্বররূপ যে অংশে অর্থাৎ যে বিশেষ ভাবে তিনি এ সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত, তাহাই অর্জ্জুন দেখিতে চাহিয়াছিলেন, এবং ভগবান অর্জ্জুনকে তাহাই দেখাইয়াছিলেন।

ভগবানের এই যে ঐশ্বর (Immanent) রূপ, তাহা ভগবান পূর্ব্বে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। ভগবান সেস্থলে বলিয়াছেন—

মযা তত মিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিত॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্যমে যোগ মৈশ্বরং
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবন

(গীতা ৯।৪-৫)।

ইহাই পরমেশ্বরের ঐশ্বর যোগ—ইহাই তাঁহার এ বিরাট বিশ্বরূপ। এই যোগ হেতু তিনি সর্ব্বভূতস্থ হইয়াও ভূতস্থ নহেন, আর ভূতস্থ না হইয়াও তাঁহারই আত্মা ভূতভৃৎ ও ভূতভাবন। তিনি সর্ব্বাতীত হইয়াও সর্ব্বরূপ, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বেশ্বর।

আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সৎ হইতেই সমুদয় 'ভাবের' অভিব্যক্তি হয়, অসতের কোন 'ভাব' হয় না বা নাই। সতেরও ভাব অভিব্যক্ত না হইলে, তাহাকেও একার্থে অসৎ বলা যায়। এই ভাব দুইরূপ-এক ক্ষর ভাব—ষড়ভাব বিকারযুক্ত, আর এক নিত্য অক্ষর ভাব। যাহা সতের এই ক্ষর ভাব তাহা সর্ব্বভূত। ভগবান বলিয়াছেন—

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ। (গীতা, ৮।৪)।

ভগবান অন্যত্র বলিয়াছেন,—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে
(গীতা, ১৫।১৬)।

এই দুই ভাবেরও অতীত আর এক পরম ভাব আছে, তাহা পুরুষোত্তম ভাব। গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

"উত্তমঃ পুরুষস্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয়মীশ্বরঃ॥
(গীতা, ১৫।১৭)।

এই তত্ত্ব শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে।—

"সংযুক্ত মেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।"
(শ্বেতাশ্বতর উপঃ, ১।৮)।

"ক্ষরং প্রধানং অমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মানাবীশতে দেবঃ একঃ।
(শ্বেতাশ্বতর উপঃ, ১।১০)।

ভগবান পূর্ব্বে বলিয়াছেন,-

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে॥
(গীতা, ৮।১৮)

ইহাই ক্ষর ভাব। ইহার অতীত যে পরম ভাব, তাহা পরম অক্ষর ভাব ও পরম পুরুষ ভাব।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ-
সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥
পুরুষ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যাস্তনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্ব মিদং ততম্॥
(গীতা, ৮।২০-২২)

আরও এই ক্ষর ভাব ও পরম অক্ষর ভাব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাং
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহং॥

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥
(গীতা, ৯।৭-১০)।

এই যে পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন ভাব—ইহাই ক্ষর ভাব। ইহা ভগবানের অপর ভাব—ইহাই তাঁহার এ সমুদয় জগৎরূপ (পুনঃ পুনঃ গতিশীল বা পরিবর্ত্তনশীল ভাব। ভগবানের ইহার অতীত যে নিত্য ভাব—তাহা পরম ভাব—অব্যয় ভূতাদি ভূত মহেশ্বর ভাব—

পরং ভাবং মম ভূতমহেশ্বরং।
(গীতা, ৯।১১)।

অতএব এই যে ক্ষর ভাবের মধ্যে অব্যয় পর অক্ষর পুরুষোত্তম ভাব অনুস্যূত, এই যে অব্যয় আত্মা পুরুষোত্তম পরম ঐশ্বর যোগহেতু যে সমুদায় জগৎরূপ হইয়া তাহার অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া তাহাকে নিয়মিত করেন, তাহাই তাহার এই বিরাট বিশ্বরূপ। ইহা পরম ব্রহ্মের এই পুরুষোত্তম-রূপ, নিত্যভাবে ঐশ্বর যোগে অভিব্যক্ত ও বিবৃত হয়। অতএব এই বিশ্বরূপ অনন্ত ত্রিবিজ্ঞানলব্ধ স্বরূপেই ঈশ্বর যোগে অভিব্যক্ত রূপ—তাঁহার অক্ষর ও ক্ষর রূপ ভাব। যাহা ক্ষর রূপ, তাহা কাল দ্বারা নিয়মিত দেশ কাল নিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন, যাহা নিত্য অব্যয় অক্ষয় ভাব রূপ—তাহা কালাতীত সর্ব্ব পরিচ্ছেদ সর্ব্ব উপাধির অতীত। শ্বেতাশ্বতর উপানিষদে আছে,—

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥
(শ্বেতাশ্বতর উপঃ ১।৩।)

অর্থাৎ ধ্যানযোগপরায়ণ ঋষিরা স্বগুণ দ্বারা নিগূঢ় দেবাত্মশক্তি (স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়াত্মিকা মায়াশক্তি) দর্শন করেন। ও যিনি এক (অদ্বিতীয়), তিনি যে কাল আত্মযুক্ত যে. নিখিল কারণ সমূহ তাঁহাতে অধিষ্ঠান (বা নিয়মন) কারণ, তাহাও দর্শন করেন।

ইহাই পরমেশ্বরের বিশ্বরূপ দর্শন। বলিয়াছি ত, ভক্তিযোগে বা ভক্তি পূর্ব্বক ধ্যান যোগে ইহার দর্শন অনুভব হয়। ভগবান অর্জ্জুনকে তাঁহার এই বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার যে ভাব—এই ভক্তিযোগে দর্শনযোগ্য, ভগবান তাহাই অর্জ্জুনকে দেখাইয়াছিলেন। যে পরম পুরুষোত্তম ভাবের অন্তর্ভূত—এই সমুদয় ক্ষর ভাব সর্ব্বভূত ভাব যে পরম ভাবের দ্বারা এই সমুদয় ব্যাপ্ত, নিয়মিত,সেই ঐশ্বর ভাব ঐশ্বর যোগ, তাহাই ভগবান অর্জ্জুনকে দেখাইয়াছিলেন। বলিয়াছি ত তাহাই 'অব্যয় আত্মার' নিত্য ঐশ্বর ভাব †। ভগবান বলিয়াছেন যে তাঁহার এই ব্যক্ত (ক্ষর) ভাব মাত্র জানে,তাহার পরম ভাব জানে না, সে মূঢ় অজ্ঞান।

† এ স্থলে প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যাইতে পারে যে, আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে এই ক্ষর ভাব তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা হইতেছে। ফরাশী দার্শনিক পণ্ডিত বার্গসোঁ ইহা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার অনুবর্ত্তী। কিন্তু এই ক্ষর ভাবের অন্তরালে তাহার নিয়ন্তারূপে বা নিত্য অক্ষর পুরুষোত্তম ভাব প্রতিষ্ঠিত এবং এই ক্ষর ভাব অতিক্রম করিয়া এই অক্ষর পুরুষোত্তম ভাবই যে পরম পুরুষ, তাহা ইঁহারা লক্ষ্য করেন নাই।

তাঁহাদের মতে জগৎ কালের ক্রোড়ে নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। সকল বস্তুর স্বভাব নিত্য পরিবর্ত্তন। সে পরিবর্ত্তনের মূল প্রাণ শক্তি। এ পরিবর্ত্তন এই change এই flux এই নিত্য নূতনের অভিব্যক্তি ও পুরাতনের পরিবর্ত্তন নিয়ত চলিতেছে। তাহার বিরাম নাই, তাহার অন্ত নাই, তাহার লক্ষ্য নাই, উদ্দেশ্য নাই, তাহার গম্য কিছুই নাই। এই সকল আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতগণ যদি এই নিয়ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে এই পুনঃ পুনঃ গতিশীল জগতের অন্তরালে এই নিত্য পরম ভাব অনুসন্ধান করিতেন, এই পরিদৃশ্যমান ক্ষর ভাবের মধ্যে সেই পরম অক্ষর ভাবের সংবাদ পাইতেন, তবে তাঁহারা এই ক্ষর ভাবের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিতেন। এ সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি যে, বর্ত্তমান জার্ম্মান দার্শনিক পণ্ডিত আয়কেন এই ক্ষর ভাবের অন্তরালে আধ্যাত্মিক Spiritual ভাব কতকটা দেখিয়াছেন। তিনি সেই ভাব,সেই Spiritual ভাব যে এই ক্ষর ভাবের অতীত, তাহা তিনি তাহার Truths of Religion গ্রন্থে দেখাইয়াছেন। এস্থলে তাহা উল্লেখের প্রয়োজন নাই। সেই নিত্য রূপ, অক্ষর ভাব বিকাশ করা চাই। সে ভাবকে যে কখনও লাভ করা যায়, তাহা তিনি বলেন নাই, সে ভাব পরম লক্ষ্য বটে, কিন্তু তাহা লাভ করিতে পারা যায় না। সে ভাব ক্রমে বিকাশিত হয়।

গীতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অক্ষর অব্যক্ত পরমব্রহ্ম (গীতা. ৮।৩) অব্যয় পরমাত্মা স্বরূপে ঐশ্বর যোগযুক্ত বা তাঁহার দৈবী যোগমায়া সমাবৃত (গীতা, ৭।২৫) এই ঐশ্বর যোগে পরমাত্মা বিশ্বরূপ বিশ্বাত্মা বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বর। এই বিশ্ব এই ঐশ্বর যোগে তাঁহার বিরাট দেহ।তিনি তাহার দেহী, তাহার অন্তর্য্যামী নিয়ন্তা পরমাত্মা। এই ব্যক্ত অখণ্ড জীব জড়ময় জগৎ তাঁহারই এ বিরাট দেহের অন্তর্ভূত। সমষ্টি ভাবে এই বিরাট দেহ

ভগবানের ক্ষেত্র ভগবান্ তাঁহার ক্ষেত্রজ্ঞ (গীতা, ১৩।২)। এইরূপে পরমেশ্বর এই সচরাচর সমুদায় জগৎরূপ দেহে বা ক্ষেত্রে পুরুষোত্তম পরমেশ্বররূপে পরম ক্ষেত্রজ্ঞ হন। তিনি পরমজ্ঞাতা রূপে সর্ব্বজ্ঞেয় ক্ষেত্রের জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞ। আর তিনি পরম শক্তিমানরূপে এই বিশ্ব বিরাট ক্ষেত্রের প্রকাশক বিষয়ক—তাহার অন্তর্য্যামী নিয়ন্তা।

পরম জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম যে তাঁহার অচিন্ত্য স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াত্মিকা 'মায়া' শক্তি যোগে পরমজ্ঞাতা পরমাত্মা (পুরুষোত্তম) পরম জ্ঞেয় তাঁহারই পরমা প্রকৃতি ভাবে নিত্য অভিব্যক্ত। তাই এই পুরুষ প্রকৃতি ভাব অনাদি।

প্রকৃতি পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
গীতা, ১৩।১৯

ইহাদের মধ্যে 'পুরুষ বিধ' আত্মার ভাবই পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভাব—পরম ক্ষেত্রজ্ঞভাব। আর এই প্রকৃতি ও প্রকৃতির বিকার সমষ্টি ভাব ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রই জ্ঞেয় রূপে দেহ, আর ক্ষেত্রজ্ঞই তাহার জ্ঞাতা। এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ যোগে সমুদায় জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি (গীতা, ১৩।১৬)। এইরূপে যাহা জ্ঞেয়, তাহাই ক্ষেত্র, তাহাই শরীর। এ বিষয়ে বিশ্ব পরম জ্ঞাতা ভগবানের জ্ঞেয় বলিয়াই ভগবান তাহাকে তাঁহার শরীর বলিয়াছেন। এই পরম জ্ঞাতা ব্যষ্টিভাবে প্রতি ক্ষেত্রে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক ব্যষ্টিভাবে ক্ষেত্রজ্ঞ হন, অথবা তাঁহার প্রতিবিম্ব গ্রহণ হেতু তাঁহার সান্নিধ্যে অধিষ্ঠাতৃত্বে, নিয়ন্তৃতে প্রতিক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রজ্ঞ ভাবের অভিব্যক্ত হয়, যাহাকে ভগবান, তাঁহার অংশ বা বিভূতি বলিয়াছেন। তাহাও পরম জ্ঞাতা ভগবানের জ্ঞেয় রূপে তাঁহার দেহ—তাঁহার বিরাট শরীরের অন্তর্ভূত। এইরূপে ভগবানের দেহ, অসংখ্যরূপ নানাবিধ দিব্য বর্ণ ও আকৃতি যেমন তাঁহার জ্ঞেয় রূপে অবস্থিত, সেই প্রকার বসু রুদ্র অশ্বিদ্বয়প্রভৃতি দেবগণও অবস্থিত। দেবগণ আত্মারই বিভূতি।

এই যে পরমেশ্বরের বিরাট দেহ, যাহার মধ্যে চরাচর সহিত সমুদায় জগৎ 'একস্থ' যাহা তাঁহার ঐশ্বররূপ, তাহা ভগবানের অব্যয় আত্মার রূপ (গীতার ১১।৪)। অব্যয় জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাবের অভিব্যক্তি নিত্যসিদ্ধ এবং তাঁহাতে এই উভয় ভাব একীভূত। তাহা না হইলে ভগবান অর্জ্জুনকে অব্যয় আত্মার স্বরূপ দেখাইবার জন্য তাঁহার জ্ঞেয় এই বিরাট দেহ দেখাইতেন না। তাঁহার এ বিরাট বিশ্বদেহ, তাঁহার আত্মা হইতে পৃথক হইলে ভগবানের তাহা অব্যয় আত্মার স্বরূপ হইত না। ভগবানের ঐশ্বর যোগ হেতু তাঁহার অনাদি অনন্ত পরাশক্তি যোগ হেতু পরমাত্মা এই পরমজ্ঞাতা ও পরমজ্ঞেয় ভাবের—এই দেহ দেহী ভাবের অভিব্যক্তি হয়। এবং এই উভয় ভাবই সেই পরমাত্মাতে বিধৃত হয়। তাহার পরম ঐশ্বর যোগে এই উভয় ভাবের সমাবেশ হয়। ভগবান এ বিরাট বিশ্বকে তাঁহার দেহ রূপে কল্পনা করিয়া স্বশক্তিরূপে প্রকাশ করিয়া তাহার অন্তর্য্যামী পরমাত্মা রূপে বিধৃত করেন।

ভগবান অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ বিরাট দেহ দেখাইবার পূর্ব্বে সেই বিশ্বরূপ দেহ কি প্রকার, তাহা সংক্ষেপে বলিয়া দিয়া অর্জ্জুনের দিব্য দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ভগবান বলিয়াছিলেন,—

"পশ্যমে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনিচ॥
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্ট পূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত॥
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মমদেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি।"
(গীতা, ১১।৫—৭)

ভগবান এ বিশ্বরূপ তাঁহার দেহেই দেখাইয়াছিলেন। তাঁহারই দেহে সচরাচর সমুদায় জগৎ একস্থ বা একত্র সংস্থিত। সচরাচর সমুদয় জগতে যে ভেদ আছে, সে ভেদ দূর হইয়া গিয়া সকল বিশেষত্ব ঘুচিয়া গিয়া নির্ব্বিশেষ ভাবে অভেদ-ভাবে তাহা যে ভগবানের এই বিরাট দেহে একস্থ, তাহা এস্থলে বুঝিতে হইবে না। আমাদের শরীরে যেমন বিভিন্ন ভূতগ্রাম (শরীরস্থং ভূতগ্রামং ইতি গীতার ১৭।৬) একস্থ হয় (Organised হয়), সেই ভাবে ভগবৎ শরীরে সচরাচর সমুদয় এ জগৎ একস্থ। শুধু তাহাই নহে। ভগবান বলিয়াছেন, সচরাচর জগতের অন্তরালে যাহা 'অদৃষ্ট', তাহাও একস্থ আর সে অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার মধ্যে যাহা কিছু দিব্য দৃষ্টিতে দেখা যায়, তাহা অর্জ্জুন ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাইবেন। অর্জ্জুন দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া যাহা দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাই দেখিতে পাইয়াছিলেন। এবিরাট বিশ্বরূপ অনন্ত অসীম। অর্জ্জুন যে সমগ্র বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। অর্জ্জুনের দৃষ্ট ও বর্ণিত বিশ্বরূপ ভগবানের সমগ্র বিশ্বরূপ নহে।

ভগবান আপনার দেহে আপনার বিশ্বরূপ—আপনারই অসংখ্য অনন্ত নানাবিধ নানা বর্ণাকৃতি যুক্তরূপ অর্জ্জুনকে দেখাইয়াছিলেন। অর্জ্জুনও পরে বলিয়াছেন যে, ভগবানের দেহেই তিনি এ বিশ্বরূপ দেখিতেছেন,—

"পশ্যামি দেবাং স্তবদেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূত বিশেষ সংঘান্।"

বলিয়াছি ত, পরমেশ্বরের যে ঐশ্বর রূপ তাঁহার অব্যয় আত্মার যে অভিব্যক্তরূপ, তাহা তাঁহার 'দেহ'। আপাতঃ মনে হয় যে, বিশ্বরূপ দেখাইবার পূর্ব্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথিরূপে তাঁহার সম্মুখে ছিলেন, সেইরূপেই তিনি অর্জ্জুনের প্রকৃত চক্ষুর সম্মুখে প্রত্যক্ষ ছিলেন—সুতরাং ভগবান তাঁহার সেই দেহকে লক্ষ্য করিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন, তুমি দিব্য চক্ষুর দ্বারা আমার এই মানুষী তনুতেই বিশ্বরূপ দর্শন কর। কিন্তু এ অর্থ সঙ্গত হয় না। অর্জ্জুন যখন দিব্য দৃষ্টি পাইলেন, তাঁহার অন্তর দৃষ্টি যোগস্থ হওয়ায় প্রকাশিত হইল, তখন তিনি বাহিরের কিছু আর চর্ম্মচক্ষে দেখিতেছিলেন না। তখন অন্তরে আত্মস্থ ভগবানকেই বিশ্বরূপে দেখিতেছিলেন। তখনও অর্জ্জুন বলিয়াছেন, ভগবান্ তোমারই দেহে তোমার এ বিশ্বরূপ দেখিতেছি। সুতরাং এ দেহ পরামাত্মারই ব্যক্তরূপ।

স্বপ্রকাশ পরমাত্মার আত্মপ্রকাশ রূপ, তাহাই তাহার দেহ। ব্রহ্ম কল্পনা বা ঈক্ষণ করিলেন 'আমি বহু হইব'—এবং সেই 'বহু' নামরূপ দ্বারা আপনাতেই প্রকাশ করিলেন ও তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। এই যে নামরূপ দ্বারা আত্মাতেই বহুর অভিব্যক্তি, ইহাই পরমাত্মার দেহ। কারণ এই বিশ্বরূপে ব্যাপৃত হইবার পূর্ব্বে পরম ব্রহ্মে যে "অহং" ভাব প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার সহিতই এই ব্যাকৃত নামরূপ দ্বারা বিধৃত বিশ্ব

—'ইদং রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল, এবং সেই 'ইদং" সম্বন্ধে মমত্ব ভাবও প্রকাশ হইয়াছিল। ইহাই যোগমায়া। এই মমত্বভাব হেতুই ভগবান প্রকৃতিকে আমার প্রকৃতি, মহৎ ব্রহ্মকে আমার 'যোনি' বলিয়াছেন। এই সমষ্টিভূত বিশ্বকে এই জন্য তিনি 'আমার' বা সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞ আমার ক্ষেত্র বলিয়াছেন,কখনও বা তাহা হইতে যে বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে,তাহাদের 'আমি' বলিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন বিভূতিকেও 'আমি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্যষ্টি-ভাবে অভ্যাসবশে আমাদের অহন্তা 'মমতা' হয়, আমাদের দেহে কখন 'আমি কখন আমার জ্ঞান হয়,' যেমন, তাহাতে আমাদের আত্মাধ্যাস হয়, সেইরূপ আমরা বলিতে পারি যে, সমষ্টিভাবে ও বিশ্ব-সম্বন্ধেও পরমেশ্বরের যোগমায়া হেতু এই অহন্তা ও মমতা ভাব হয়। বিশ্বকে তাহার দেহ এইভাবে ভগবান উল্লেখ করিয়াছেন,বলা যায়। কিন্তু ইহা হইতে এরূপ বলা যায় না। পরিচ্ছিন্ন জীব আমরা যেরূপ অভ্যাসবশে 'আমার দেহ' বলি, সেইরূপ ভগবানও মায়াবলে এ বিশ্বকে আমার দেহ বলিতেছেন, ইহা বলা যায় না। আমাদের শরীর আমাদের শুচি দ্বারা অভিব্যক্ত নহে। ইহা আমাদের 'আত্মার' রূপও নহে। কিন্তু এই বিশ্ব পরমাত্মারই অভিব্যক্ত ঐশ্বররূপ। বলিয়াছিত প্রকাশ স্বভাব আত্মার যাহা প্রকাশরূপ, তাহাকে আত্মার দেহ বলা যায়। আত্মার যাহা 'ভাব', যাহা বিভূতি, তাহাই আত্মার দেহ। এই প্রকাশ, এই ভাব, এই বিশ্বরূপে অভিব্যক্তি পরমার্থ সত্য হইলে ইহাকে অধ্যাস বা মায়া-কল্পনা, মায়া-বিলাস, বলা যায় না। অনন্ত জ্ঞান রসাত্মিকা শক্তিমান ব্রহ্মের এই শক্তিই এক অর্থে শরীর এবং সেই শক্তির কারণরূপ হইতে যাহা কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত, তাহাও এই অর্থে পরমেশ্বরের শরীর। যাহা এই কারণরূপ—তাহা কারণ শরীর বা সূক্ষ্ম শরীর, আর যাহা কার্য্যরূপ, তাহা স্থূল শরীর।

এই শরীরকে বেদান্ত শাস্ত্রে কোষ বলে। ব্যষ্টি ভাবে জীবাত্মা ও সমষ্টিভাবে পরমাত্মা —সর্ব্বভূতাত্মা সর্ব্বাত্মা ঈশ্বর এই কোষমধ্যে-স্থিত। এই কোষই শরীর। বেদান্ত অনুসারে এই কোষ পাঁচ রূপ—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। বেদান্ত-দর্শনের আনন্দময় কোষ সাংখ্যদর্শনের কারণ শরীর, বেদান্তের প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ—সাংখ্যের সূক্ষ্ম শরীর, আর বেদান্তের অন্নময় কোষ সাংখ্যের স্থূল মাতৃ-পিতৃজ শরীর। পরম ব্রহ্মের যাহা স্থূল অন্নরসময় শরীর বা স্থূল শরীর অভিমানী পরমাত্মা—তিনিই বিরাট সূক্ষ্ম শরীর অভিমানী পরমাত্মাই হিরণ্য গর্ভ, আর কারণ শরীর অভিমানী পরমাত্মাই পরমেশ্বর পরম পুরুষ। প্রকৃতভাবে এই স্থূল,সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর সমষ্টিভাবে পুরুষোত্তম পরমেশ্বরের শরীর বলা হয়। কিন্তু তিনি প্রধানতঃ তমোময় কারণ শরীরেই অবস্থিত, শ্রুতিতে আছে—

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজে ব্রহ্ম নিষ্কলং।

(মুণ্ডক, ২।২।৯)

হিরণ্ময়েণ পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখং।

ঈশ-উপঃ ১৫ ; বৃহদারণ্যক. ৫।১৫।১)

এই হিরণ্ময় কোষই কারণ শরীর। ইহাই জ্যোতির্ম্ময় শরীর, প্রথম কোষ। ইহা এই বিশ্বরূপ বর্ণনার পরে বিবৃত হইয়াছে। আমরা এই তত্ত্ব বুঝিলে এই

বিশ্বরূপতত্ত্ব বুঝিতে পারিব ও এই দিব্য বিশ্ব ঐশ্বর রূপকে ভগবান যে আপনার দেহ বলিয়াছেন, তাহার তত্ত্ব বুঝিতে পারিব। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, ইহারই উপর রামানুজের বিশিষ্ঠাদ্বৈত্যবাদ প্রতিষ্ঠিত। বিশিষ্ঠাদ্বৈত্যবাদ অনুসারে ঈশ্বর জীব ও জড় বা 'চিৎ' 'চিদচিৎ' ও 'অচিৎ—' এই তিন ভাব ব্রহ্মে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বরই পরম ব্রহ্ম, তিনি এই চিদচিৎ অচিৎ বা জীব জড়রূপ শরীর বিশিষ্ট। এই সচরাচর সমুদয় জগৎ পরমেশ্বরেরই শরীর। উপনিষদেও এ তত্ত্বের আভাষ পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে তৃতীয় ব্রাহ্মণে সপ্তম অধ্যায়ে আছে—

"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তারা যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীং অন্তরো যময়তি—এষত আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ।

এইরূপ অপ্, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, দিক্ (স্বঃ) আদিত্য, দিক্, চন্দ্র, আকাশ, তমঃ. তেজঃ, সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। এ সকলই সেই অন্তর্য্যামী সর্ব্বাত্মার শরীর। এইরূপ সর্ব্বভূত সম্বন্ধেও উক্ত হইয়াছে—

যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঃ অন্তরো যং সর্ব্বাণিভূতানি অন্তরো যময়তি—এষ ত আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ।

এইরূপ অধ্যাত্ম প্রাণাদি সম্বন্ধে অর্থাৎ প্রাণ, বাক্ বায়ু, শ্রোত, মন, ত্বক্, বিজ্ঞান, রেতঃ প্রভৃতি সম্বন্ধেও উক্ত হইয়াছে। অতএব এই শ্রুতি অনুসারে এ সমুদয়কে অন্তর্য্যামী অমৃত পরমাত্মা পরমেশ্বরের শরীর বলা যায়। ভগবানও এস্থলে তাঁহাই বলিয়াছেন। নামরূপ দ্বারা যাহা কিছু পরমাত্মাতে অভিব্যক্ত, যাহা কিছুর মধ্যে পরমাত্মা অন্তর্য্যামী· রূপে অবস্থিত, সেই বরাবর সমুদয় জগৎকে এই জন্য ভগবান তাঁহার দেহেই একস্থ বলিয়াছেন। ইহাই তাহার অব্যয় আত্মার ঐশ্বররূপ, এবং এইরূপ দেহবান বলিয়াই তিনি বিশ্বরূপ।

ভগবানের এই যে বিরাট বিশ্বদেহ—ইহার মধ্যে এই ব্যক্ত চরাচরের কৃৎস্ন জগৎ একস্থ। তাহার অব্যক্ত দিব্য বা দোত্মাত্মক দেহেই তাহা একত্র সংস্থিত। তাঁহার অসংখ্যরূপ বর্ণ ও আকৃতি (forms) এই দিব্য দেহেই অভিব্যক্ত। তাহা দিব্য দৃষ্টি ব্যতীত কেহ দেখিতে পায় না—তাহা অদৃষ্টপূর্ব্ব আশ্চর্য্য। ইহাতে অসংখ্য সৌর ও নক্ষত্র জগৎ—বিধৃত। যাহা কিছু দেশ-কাল ও নিমিত্ত দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া বিশ্ব-জগতে কার্য্য বা অব্যক্ত কারণরূপে অভিব্যক্ত, সে সমুদয়ই সেই দেশ, কাল নিমিত্ত দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মতত্ত্বে—তাঁহার পরম ঈশ্বরভাবে, তাহারই বিরাট শরীররূপে বিধৃত। অর্জ্জুন এই ভাবেই এ বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।

মহাত্মা রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানপ্রদানার্থ আজ আমরা এইস্থানে সমবেত হইয়াছি; এবং তাঁহার পবিত্র নাম আজ ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত ভক্তিনতশিরে আলোচিত হইতেছে। ভারতের প্রতি সন্তানই তাঁহার নাম শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করিয়া থাকে। তিনি আপনগুণে জগতে সুপরিচিত। আমার ন্যায় হীনজন তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে লজ্জিত ও কুণ্ঠিত। আমি আজ শুধু এইমাত্র বলিতে চাই, ভারতনারীর ক্ষুদ্র হৃদয়ে এই মহাত্মার প্রতি কতখানি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা লুক্কায়িত রহিয়াছে। আমরা কুসংস্কাররূপ অন্ধকার হইতে নূতন আলোকে দাঁড়াইবার যে অধিকারটুকু প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা ত মহাত্মা রামমোহনের দান। এখানে আজ যাঁহারা সমবেত হইয়াছেন, সকলেই আমা অপেক্ষা জ্ঞানবৃদ্ধ এবং বয়োবৃদ্ধ। তাঁহারা আমার নিকট রামমোহনের জীবনের কোন নূতন কথা শুনিবার আশা করেন নাই, তবে তাঁহারা যে রামমোহনের প্রদর্শিত পথে গমন করিয়া নিপীড়িতা ভারত রমণীকে আজ সুশিক্ষা লাভের কতখানি অধিকার প্রদান করিয়াছেন, সেইটুকু বিশেষভাবে স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি অসীম ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রত্যক্ষ ভাবে প্রদর্শন করিবার জন্যই বোধ হয় আমাকে সাদরে আহ্বান করিয়াছেন। আমি আপনাদের এই সম্মান লাভের সম্পূর্ণ অনুপযুক্তা। তথাপি অবনত মস্তকে আমি ইহা গ্রহণ করিতেছি, আপনারা নিজগুণে আমার ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইবেন।

যে হিন্দুগণ এক সময়ে জ্ঞান ও ধর্ম্মে বিভূষিত হইয়া সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, কালক্রমে অশেষ প্রকার কুসংস্কার ও ব্রাহ্মণগণের অক্ষুণ্ন প্রভাব তাঁহাদিগকে পতনের পথে টানিয়া আনিতে লাগিল। তখন প্রাচীন আর্য্যগণের বীণার ঝঙ্কার নীরব হইয়া গিয়াছিল, সেই প্রশান্ত মূর্ত্তি মুনিগণের বেদগান ভারত ভূমির নিকট হইতে চিরবিদায় লইয়াছিল। আর সেই দেবলোক হইতে এই সকল ভারত-গৌরব আর্য্য মুনিগণ তাঁহাদের প্রিয় ভূমির এই মহাদুর্দ্দশা দেখিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিলেন, তাঁহাদের সেই পবিত্র ওঁকার ধ্বনির পরিবর্ত্তে ঘোর পৌত্তলিকতা ও মহাকুসংস্কার সমগ্র হিন্দুসন্তানকে বিপথে চালিত করিতেছিল; প্রাচীন বৃদ্ধগণের বহু পারদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা যুবকের অদম্য উৎসাহ ও মহতী শক্তি এবং বালকের বিকাশোন্মুখ জীবন কুপথে পরিচালিত হইয়া সমগ্র ভারতাকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। এই গভীর রজনীর সময় প্রভাতী পাখীর গানের মত কে যেন গাহিয়া উঠিল 'আর রাত্রি নাই।' অমনি নব সূর্য্যরূপে রামমোহন ভারতাকাশে উদিত হইলেন।

এই ক্ষণজন্মাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই, বুঝি বা অভাগা দেশের অভাব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই তিনি শৈশব হইতেই অতি একাগ্রতার সহিত যাবতীয় ভাষা শিক্ষা করতঃ শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নানা মতাবলম্বীর শাস্ত্র হইতে সার অংশটুকু গ্রহণ করিয়া এক মহান তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। রামমোহনের পিতা পুত্রের এই স্বতন্ত্র ভাব

লক্ষ্য করিয়া বিশেষ রাগান্বিত হইলেন এবং তাঁহাকে সংশোধনের নিমিত্ত গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ষোড়শ বর্ষীয় যুবক ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না, শৈশব হইতেই আত্মনির্ভরতা তাঁহার একটী বিশেষ গুণ ছিল, যাহার জন্য তিনি এই সকল প্রতিকূল অবস্থাকে সানন্দে অগ্রাহ্য করিয়া আপনার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইয়াছেন। যখন বেগবতী স্রোতস্বিনী পর্ব্বত গাত্র হইতে বহির্গত হইয়া অনন্ত সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, তখন শতবাধাও তাহার গতিরোধ করিতে পারে না, সেইরূপ রামমোহনের অসাধারণ প্রতিভা, অদম্য উৎসাহ, অমানুষিকী শক্তি, আত্মীয় স্বজনের নির্য্যাতন ও সকল প্রতিকূল বাধাকে অতিক্রম করিয়া আপনার গন্তব্য স্থানে উপনীত হইয়াছিল।

ষোড়শবর্ষীয় যুবক গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াও বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না; নবীন তেজে নূতন উৎসাহে বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য তিব্বতে গমন করিলেন। তথায় স্নেহময়ী রমণীর অসীম করুণাবলেই তিনি তিব্বতবাসীদের নির্য্যাতন হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময় হইতেই তিনি এই স্নেহশীলা জননী, সাধ্বী পত্নী ও ভক্তিমতী তনয়ারূপী নারী জাতিকে সমাজের অশেষ নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত ভারত-ললনাকে উচ্চশিক্ষার আলোক দ্বারা জ্ঞান,ধর্ম্মে বিভূষিত করা না যাইবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতের উন্নতি সুদূরপরাহত।

তাই তিনি সমাজ সংস্কার করিতে অগ্রসর হইয়া সর্ব্বাগ্রে নারীজাতির উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বহুদিন হইতে হিন্দুগণ মাতা ও ভগ্নীকে জ্বলন্ত চিতায় হত্যা করাকে পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া মনে করিত। এই অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা যেরূপ নৃশংস ও লোমহর্ষণ ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিত, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। রামমোহনের পরদুঃখকাতর হৃদয় এই হতভাগিনী সতীদের জন্য কাঁদিয়া উঠিল। তিনি যাবতীয় হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করিয়া ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ এই অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। একে একে ইহার স্বপক্ষ প্রস্তাব সমূহ খণ্ডন করিতে লাগিলেন। বৈধব্য অবস্থায় রমণী চরিত্র রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে কি না, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, তিনি হুতাশনসম তেজে হুঙ্কার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, যে রমণীতে মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ধন্য হই, তাঁহার চরিত্রে এত ঘোরতর অপবাদ প্রদান করিলে সমগ্র ভারত সন্তানকে সেই পাপে জর্জ্জরিত হইতে হইবে, এবং তিনি ইহাও স্পষ্টভাবে বুঝাইয়াছিলেন যে, জঘন্য বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত অনুসারে কতশত নারী সধবা অবস্থাতেই কুমারীর ন্যায় পিতৃ গৃহে নির্ম্মল জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইতেছেন, আর সেই নারী বৈধব্য অবস্থায় ব্রহ্মচারিণীরূপে পতির আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া জগতের সেবায় অগ্রসর হইতে কেন সমর্থ হইবেন না? তাঁহার সেই সুনিপুণ তর্ক শক্তির নিকট কেহই দণ্ডায়মান হইতে পারেন নাই। অবশেষে আরও কতিপয় সদাশয় ব্যক্তির সহিত একযোগে এই লোমহর্ষণ সহমরণ-প্রথা রহিত করিতে সমর্থ হইলেন।

নারীর প্রতি সম্মান তাঁহার এত অত্যধিক

ছিল যে, যখনই কোনও রমণী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন, তখনই তিনি দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন।

রমণীকে পুরুষের ন্যায় সমান অধিকার প্রদান করিবার জন্য তিনি বহুতর চেষ্টা করিয়াছেন। যাহাতে কন্যা পিতার সম্পত্তিতে পুত্রের ন্যায় সমান অংশ প্রাপ্ত হন, সেইজন্য তিনি ঘোরতর আন্দোলন করিয়াছেন। যে রমণী এককালে গৃহের কর্ত্রীরূপী, পতির অবর্ত্তমানে সম্পত্তির উপর তাঁহার কোনই অধিকার থাকে না, অধিকন্তু পুত্র পুত্রবধূর অধীন হইয়া জীবন যাপন করিতে হয়। আবার কত রমণী নিঃসন্তান হইয়া কত দুঃখে কাল যাপন করিয়া থাকেন। পিতার সম্পত্তিতে ত বঞ্চিত হনই, অধিকন্তু পতির সম্পত্তিতেও কোন অধিকার থাকে না; এবং এইরূপে অপরের গলগ্রহ হইয়া জীবন্মৃত অবস্থায় কালযাপন করিতে হয়। রমণীর এই দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া সেই কুসুম-কোমল হৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, তাই তিনি এই আইন সংস্কার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁহার এই যত্ন ফলপ্রদ হয় নাই।

বিপথগামী যুবক ও বালককে উচ্চশিক্ষার আলোক দ্বারা ন্যায়ের পথে পরিচালিত করিবার জন্য বহুতর আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। এই আন্দোলনের ফলে রাজপুরুষগণ স্থানে স্থানে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সাধন করিতে লাগিলেন; এবং পুরুষের পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের উপযুক্ত সাহায্যকারিণী হইবার জন্য রমণী জাতিকেও শিক্ষিত করা বিশেষ আবশ্যক বোধ করিলেন। তিনি এই নিপীড়িতা ভারত-রমণীর অভ্যন্তরে, অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় এক অমৃত প্রস্রবণ দর্শন করিয়াছিলেন; এবং ইহাও স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন যে, উপযুক্ত পথপ্রাপ্ত হইলে এই অমৃত উৎস বিস্তৃত হইয়া সমগ্র ভারত-ভূমিকে স্নিগ্ধ ও শীতল করিতে পারে। তাই যাহাতে তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিকশিত করিয়া তুলিতে পারেন, তজ্জন্য তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। তাঁহার এই অদম্য যত্নকে কেহ কেহ বাতুলতা মনে করিয়া উপহাস করিতে লাগিলেন। এমন কি, ভারত-নারী শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবারও অনুপযুক্ত, ইহা বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি তখন এই সকল উপেক্ষা ও ভ্রুকুটিতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, বরং তেজের সহিত বলিলেন যে, "As to their inferiority in point of understanding, when did you ever afford them a fair opportunity of exhibiting their natural capacity. How then can you accuse them of want of understanding ?...you keep women generally void of education of acquirements, you cannot, therefore, in justice pronounce on their inferiority."

তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিলেন, যে নারী সন্তানের মাতা, তাঁহাকে সুশিক্ষিতা না করিলে সন্তানকে সুশিক্ষিত করিবার আশা বাতুলতা মাত্র, তাই তিনি পিঞ্জরাবদ্ধ বিহগীর ন্যায় ভারতরমণীকে অনন্ত গগনের মুক্ত বাতায়নতলে আনয়ন করিয়া জ্ঞানালোকে আলোকিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই আন্তরিক কামনা ও চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। তিনি ভারত ভূমিতে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর, মহর্ষি ও ব্রহ্মানন্দের

জল-সিঞ্চনে তাহা আজ বৃক্ষে পরিণত হইয়া ফল ফুলে সুশোভিত হইয়াছে।

মহাত্মা রামমোহন শুধু সমাজ সংস্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি দেখিলেন যে, সমস্ত নৈতিক রীতি নীতির মূলেই অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তি থাকা বিশেষ প্রয়োজন। এই কারণেই ভারত বক্ষ হইতে যাবতীয় কুপ্রথারূপ আবর্জ্জনা দূরীভূত করিয়া সেই পবিত্র ভূমিতে নিরাকার অনন্ত ব্রহ্মের আসন রচনা করিতে অগ্রসর হইলেন। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম শাস্ত্র অতি গবেষণার সহিত পাঠ করিয়া তিনি ভারতের লুপ্তধন প্রাচীন ঋষিগণের গগনভেদী ওঁকার ধ্বনির দ্বারা সমগ্র দেশ পুনরায় মুখরিত করিয়া তুলিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে ঘোরতর প্রতিবাদ আরম্ভ হইল, কিন্তু সেই নির্ভীক পুরুষ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই বিজয় নিশান হস্তে লইয়া একে একে সকল বাধা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন। এবং অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। জাতি ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে নর নারী সকলকেই এই বিশ্ব-মন্দিরে আহ্বান করিলেন।

'নর নারী সকলের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাত বিচার।"

এইরূপে ভারতের নবযুগের সূচনা হইল। অবশেষে ভারতের মহা দুর্দ্দশার কথা রাজপুরুষদের নিকট গোচর করিবার জন্য ১৮৩০খ্রীঃ ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। হায়! তখন কে জানিত, এই বিদায়ই চির বিদায়? ইংলণ্ডে পদার্পণ করিবা মাত্রই তাঁহার নাম চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। একাধারে তাঁহার পরদুঃখকাতরতা,উদারতা, অমায়িকতা, স্বাধীনচিত্ততা, সুনিপুণ বিচার শক্তি এবং গভীর পাণ্ডিত্য প্রভৃতি যাবতীয় গুণের সমাবেশ দেখিয়া ইংলণ্ডবাসীগণ বিমোহিত হইয়া গেলেন। একজন বিদেশী বঙ্গসন্তানকে তাঁহারা অতি আপনার জন বলিয়া অনুভব করিলেন। এই সকল আড়ম্বর ও সম্মানের মধ্যে বাস করিয়াও মহাত্মা রামমোহন তাঁহার প্রিয়তম মাতৃভূমির কথা একদিনের জন্যও বিস্মৃত হন নাই, অধিকন্তু সর্ব্বদা সকল প্রকারে ভারতের হিত সাধনে প্রয়াসী ছিলেন। এই সকল কঠিন পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়িল। অবশেষে ১৮৩৩খ্রীঃ অব্দের এই দিবসে শান্ত,স্নিগ্ধ নীরব জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে রাজা রামমোহনের অমর আত্মা নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত লোকে চলিয়া গেল! তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকা শোকে আচ্ছন্ন হইল।

যদিও তাঁহার সেই প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি আমাদের চক্ষুর অগোচর হইয়াছে, তথাপি তিনি যে উজ্জ্বল আদর্শ জগতের চিত্রপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরস্থায়ী, এবং চির আদরণীয়।

আজ ভাবিয়াও কূল পাই না যে, মহাত্মা রামমোহন রায় অবলা ভারত-নারীর কত আপনার জন ছিলেন। সেই কোমল-হৃদয় পুরুষ, নারীর দুর্দ্দশা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই, অসহ্য যন্ত্রণা লাঞ্ছনাকেও সানন্দে বরণ করিয়াছেন। নারীর উন্নতি-কল্পে তিনি না করিয়াছেন কি? আজ যে অনুকূল সমাজ ও আত্মীয় স্বজনের চেষ্টায় আমরা সুশিক্ষার আলোক পথে অগ্রসর হইয়াছি, তাহার মূলেই ত রাজা রামমোহন রায়। আজ আমরা না জানি কোন্ অন্ধ-

কারে পড়িয়া থাকিতাম, সমাজের কুসংস্কার নির্য্যাতনে নিষ্পেষিত হইতাম, তাই বুঝি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মহাত্মা আমাদের উদ্ধারার্থ জন্মগ্রহণ করিলেন। হায়! তবু ত আজ কত গ্রামে কত দুঃখিনী নারী কুসংস্কার-পূর্ণ নির্য্যাতনে নিষ্পেষিত হইয়া অকালে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেনা। যখন এই অভাগিনীদের বিবরণ অবগত হই,তখন ভাবি,রামমোহনের বংশধর-গণের ধমনীতে কি সেই শোণিত এখনও প্রবাহিত হইতেছে না? তথাপি কি সবাই আজ নীরব?আজিকার পবিত্র দিনে শুধু কি আবেগময়ী ভাষা ও ভাবেতেই আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিব! আমাদের করিবার কি কিছুই নাই? বৎসরান্তে তাঁহার স্মৃতিসভায় একবার আগমন করিলেই কি তাঁহার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইল? প্রতিদিন তাঁহার কথা কতবার স্মরণ করিয়া থাকি? কতবার তাঁহার উদার ভাব ও মহান গুণ সমূহ আলোচনা করিয়া থাকি? এমন কি, আমরা অনেকেই হয়ত তাঁহার গভীর চিন্তাশীল রচনাবলীর বিষয় অজ্ঞাত।

আজ কি আমি বিনীত ভাবে আপনা-দিগকে অনুরোধ করিতে পারি, যাহাতে মহাত্মার লিখিত পুস্তক সমূহ জন-সাধারণের মধ্যে অনায়াসে প্রচারিত হইয়া সমগ্র দেশকে এক মহান্ ভাব ও উচ্চ আদর্শেই প্রণোদিত করিয়া তুলিতে পারে, তাহার জন্য সকলেই কৃতসঙ্কল্প হউন। যদি তাঁহার পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অমরাত্মার তৃপ্তি সাধন করিতে হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে আমাদের তাহাই করিতে হইবে যে, ভারতের একজনও যেন তাঁহার লিখিত অমূল্য গ্রন্থ পাঠে বঞ্চিত না হন। এই রূপেই আমরা তাঁহাকে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিব।

শ্রীশোভা মুখোপাধ্যায়।

আর্য্যদিগের দিগ্ নামের আদিরহস্য।*

(ভারতীয় আর্য্যদিগের উত্তরকুল হইতে আগমনের প্রমাণ।)

সংস্কৃতে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, এই কয়েকটী দিগ্নাম সাধারণ প্রচলিত। ইহা-দের প্রাচী,প্রতীচী, উদীচী ও অবাচী প্রভৃতি নামও পাওয়া যায়। অমরকোষ অভিধানে এই সমস্ত নাম এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে:—

"প্রাচ্যপ্রাচী প্রতীচ্যস্তা পূর্ব্বদক্ষিণপশ্চিমাঃ।
উত্তরাদিগুদীচীস্যাৎ॥"

১। পূর্ব্বাদিনামের প্রাচীনত্ব।

পূর্ব্বোক্ত দিক্ পরিভাষার সম্বন্ধে বিশেষ-রূপ অনুধাবন করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, পূর্ব্বাদিনামই প্রথম গঠিত এবং প্রাচী প্রভৃতি নাম পরে গঠিত। কারণ পূর্ব্বাদি নাম রূঢ় কিন্তু প্রাচী প্রভৃতি নাম যোগে রূঢ়। বিশেষতঃ পূর্ব্বাদি নামের দ্বারাই যে প্রাচী প্রভৃতি নামের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে,তাহাতেও পূর্ব্বাদি দিগ্নামেরই প্রাচীনত্ব প্রতিপাদিত হয়।

পূর্ব্বাদি দিগ্নামের মধ্যে আবার 'পূর্ব্ব' ও 'পশ্চিম' নামই কল্পিত হইয়াছে, আমাদের

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ত্রিপুরা শাখায় গত বাৎসরিক অধিবেশনে পঠিত।

অনুমান হয়। পশ্চিমদিকের অন্য নাম "অপর"। পূর্ব্ব দিক্‌টীকে প্রথম দিক্‌রূপে পরিগণিত করিয়া পশ্চিম দিক্‌কে তদনন্তর দিক্‌রূপে পরিগণিত করা হইত, তাহাতেই ইহার নাম পূর্ব্বের বিপরীতরূপে "অপর" হইয়াছে। শব্দকল্পদ্রুমে দিক্ শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রতিপাদক যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের কথারই সমর্থন পাওয়া যায়, যথা :—

"কৃত্বৈবমবধিং তস্মাদিদং পূর্ব্বঞ্চ পশ্চিমম্।
ইতি দেশো নির্দ্দিশ্যেত যয়াসা দিগিতিস্মৃতা॥"

"একটী স্থানকে নির্দ্দিষ্ট ধরিয়া তাহা হইতে ইহা পূর্ব্ব ও ইহা পশ্চিম, এইরূপে যদ্দ্বারা নির্দ্দেশিত করা যায়, তাহাই দিক্।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিগ্ নামই প্রথম কল্পিত বলিয়া আমরা মনে করি। পূর্ব্ব শব্দের যে "প্রথম" ও "আদি" অর্থ পাওয়া যায়, তাহাতেই ইহা প্রমাণিত হয়।

২। অগ্রার্থবাচক "পূর্ব্ব" হইতে তদ্দিক্ নামের প্রবর্ত্তন।

পূর্ব্বদিক প্রথমে সম্মুখের দিক্‌কে বুঝাইত বলিয়াই বোধ হয়। কারণ পূর্ব্ব শব্দের যে কেবল "অগ্র" অর্থই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে, কিন্তু পূর্ব্ব শব্দের যোগে অগ্রার্থক "পুরঃ' ও "পুরতঃ" উভয় "শব্দই" নিষ্পাদিত হয়।

ইহা হইতে 'পূর্ব্ব' ও 'পশ্চিম' যে আদিতে অগ্র ও পশ্চাদর্থে ব্যবহৃত হইত, তাহাই মনে করা যাইতে পারে। এই প্রকারে সম্মুখের দিক্‌টী পূর্ব্ব হইলে পশ্চাতের দিক্‌টী সুতরাং 'পশ্চিম' হয়। 'পশ্চিম শব্দটী ব্যাকরণেও পশ্চাৎ শব্দ হইতে সাধিত হইয়াছে। পূর্ব্ব-দিকে সম্মুখ দিয়া দাঁড়াইলে আমাদের দক্ষিণ হস্ত যেদিকে থাকে, তাহাও আমাদের হস্তের 'দক্ষিণ' নামানুসারে 'দক্ষিণ' নামেই নির্দ্দেশিত হইতে পারে। এইরূপে আমরা 'দক্ষিণ' নামেরও স্পষ্ট ইতিহাসই প্রাপ্ত হই। উত্তর শব্দের একটী শেষার্থ আছে।‡ এই অর্থে অবশিষ্ট দিকের নাম "উত্তর" হইয়া থাকিতে পারে।

দিগ্ নামের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত রূপ ইতিহাস ব্যতীত আরও গভীর ইতিহাস নিহিত আছে বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আমরা এখানে সেই লুপ্ত ইতিহাস উদ্‌ঘাটনেরই চেষ্টা পাইব। আর্য্যগণ আপনাদিগের উত্তর কুরুবাস ছাড়িয়া যখন প্রথম নূতন বাসস্থানের সন্ধানে বহির্গত হন, দিগ্ নাম সেই স্মরণাতীত কালের লুপ্ত স্মৃতিই বহন করিতেছে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

৩। অগ্রার্থ বাচক পূর্ব্ব শব্দ গ্রহণের আনুমানিক ইতিহাস।

আর্য্যগণ প্রথম যেদিকে অগ্রসর হইতে থাকেন, তাহা তাঁহাদের সম্মুখের দিক্ বলিয়া 'পূর্ব্ব' নাম প্রাপ্ত হয়। তাঁহাদের পশ্চাদ্ভাগে যেদিক্ থাকে, তাহা 'পশ্চিম' আখ্যা প্রাপ্ত হয়; দক্ষিণ হস্তের দিক্ তদনুসারে "দক্ষিণ" নামে অভিহিত হয়, আর অবশিষ্ট দিক্ 'উত্তর' বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়। এই প্রকারে দিক্ সকলের নামকরণে আমরা আর্য্যদিগের আদি নিবাস পরিত্যাগের অতীত ইতিহাসের সূত্র ধরিতে পারি।

দিগ্ নাম সকলে এই প্রকারে কেবল যে সাধারণ ভাবেই আমরা ইতিহাসের সূত্র দেখিতে পাই, তাহা নহে, কিন্তু বিশেষ ভাবে এই নাম সকলের আলোচনা দ্বারা আরও বিশেষ ইতিহাসের সেই সূত্রই দেখিতে পাই।

‡ যথা রামায়ণের "উত্তর কাণ্ড"।

পূর্ব্বদিগের একনাম আমরা 'পুরা' প্রাপ্ত হই। এই 'পুরা' শব্দ সুদূর অতীত কালেরও বাচক। ইহাতে পূর্ব্বাদিকই যে আর্য্যদিগের পরিজ্ঞাত প্রাচীনতম দিক্, তাহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে। আর্য্যগণ পূর্ব্বদিকে আসিয়া তথায় প্রথম ইন্দ্র পূজা প্রবর্ত্তন করেন। তাহাতেই পূর্ব্ব দিকের 'ঐন্দ্রী' 'মঘোনী' 'মঘবতী' প্রভৃতি নাম অভিধানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যজুর্ব্বেদের নিম্নোক্ত স্থলটীর আলোচনা করিলে ইন্দ্রোপাসক আর্য্যদিগের পূর্ব্বদিকের বিজয়াভিযানেরই প্রথম ইসিহাস যেন আমরা প্রাপ্ত হই ;—

"জুষাণো বর্হিহরিবান্ন ইন্দ্রঃ প্রাচীনং সীদৎ প্রদিশা পৃথিব্যাঃ। ৩৯ শুক্ল যজুর্ব্বেদ ২০শ অধ্যায়।

মহীধর ভাষ্যে ইহা এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে—"ইন্দ্রোনোঽস্মা কং প্রাচীনং প্রাগ্‌ভবৎ প্রদেশং সীদৎ সীদতু আস্তাম্। কীদৃশ ইন্দ্রঃ। হরী অশ্বৌ তদ্বাক্তঃ। পৃথিব্যাঃ প্রদিশা। দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠী। পৃথিবীং দেবযজন ভূমিং প্রদিশং উপদিশন্।"

ইহার মর্ম্ম এই—"ইন্দ্র আমাদের পূর্ব্বদিকে অধিষ্ঠান করুন। তিনি অশ্বযুক্ত হইয়া যাবতীয় ভূমি নির্দ্দেশ করিতে করিতে অধিষ্ঠান করুন।

পূর্ব্বদিকের সংস্রবেই যে ইন্দ্রের 'প্রাচীন বর্হি নাম হইয়াছে, তাহার মূল রহস্যও আমরা এখানেই প্রাপ্ত হইতেছি। পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, আর্য্যগণ ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেই তাঁহারা ইন্দ্রদেবের কল্পনা করেন। তাহাতেই অন্য কোন আর্য্য শাখায়ই ইন্দ্রনাম দেখিতে পাওয়া যায় না। রমেশ বাবু এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—

আর্য্যজাতির যে শাখা ভারতবর্ষে আসিলেন, তাঁহারই বৃষ্টিদাতা আকাশের 'ইন্দ্র' বলিয়া একটী নূতন নাম দিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন।

আর্য্যদিগের আদিস্থান ভারতবর্ষ হইতে উত্তর দিকে অবস্থিত বলিয়া তাঁহারা ইহাকে এক্ষণে 'উত্তর কুরু' বলিয়া বলিতে লাগিলেন এবং তাহাদের পূর্ব্বদিকে অগ্র গতি হেতু দক্ষিণ হস্তের দিক্ দক্ষিণ নামেই অভিহিত হইল। কিন্তু এক্ষণে 'উত্তর' ও 'দক্ষিণ' নামের সহিত নূতন অর্থের সংযোগ হইল। উত্তরদিক উচ্চ প্রদেশ বলিয়া 'উত্তর' নাম এক্ষণে উচ্চার্থেরও বাচক হইল এবং দক্ষিণ হস্তের প্রদেশ অধোভূভাগ বলিয়া দক্ষিণ দিকের বাচক অবাচি এক্ষণে অধঃ বা নিম্নার্থেরও বাচক হইল।

৪। প্রাচী প্রভৃতি নামও ঐতিহাসিক অনুমানেরই সমর্থক।

আদি বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন বাসস্থানের সন্ধানে যাত্রা ও ভ্রমণ হইতেই যে পূর্ব্বাদি দিগ্‌নামের উৎপত্তি হইয়াছে, দিক্‌সকলের 'প্রাচী' প্রভৃতি যোগরূঢ় অপর নাম সকল হইতেও তাহার বিশেষ আভাস পাওয়া যায়। প্রাচী, অবাচী, প্রতীচী ও উদীচী প্রভৃতি নাম একই অঞ্চ ধাতুর সহিত যথাক্রমে প্র, অব, প্রতি ও উৎ উপসর্গ সকলের যোগে নিষ্পাদিত হইয়াছে। অঞ্চধাতুর অর্থ গতি। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সমস্ত নামের সহিতই গমনার্থের যোগ আছে, বুঝিতে হইবে। প্র উপসর্গের অর্থ প্রথম, সুতরাং, প্রাচী, নামের অর্থ প্রথম যেদিকে গমন করে, তাহাই হয়। অব উপসর্গের অর্থ 'অধঃ' সুতরাং অবাচী নামের অর্থ যেদিকে অধোদেশে গমন করিতে হয়, ইহাই হয়। প্রতি উপসর্গের অর্থ বিপরীত, সুতরাং প্রতীচী নামের অর্থ যেদিকে

পশ্চাৎদিকে গমন করিতে হয়, এইরূপই হয়। 'উৎ'উপসর্গের অর্থ ঊর্দ্ধ সুতরাং উদীচী নামের অর্থ যেদিকে ঊর্দ্ধ ভূভাগে গমন করিতে হয়, এই প্রকারই হয়। উত্তর কুরু হইতে আর্য্যদিগের ভারতবর্ষে আসিয়া অধিষ্ঠিত হওয়ার বৃত্তান্তের সহিত উপরি-উল্লিখিত অর্থ সকলের সহজেই সামঞ্জস্য হয়। আর্য্যগণ প্রথম পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই ভারতবর্ষে হইতে তাঁহাদেব আদিস্থান ঊর্দ্ধদেশ বলিয়াই তাহার দিক 'উদীচী' বা উত্তর নামে অভিহিত হইয়াছিল। কারণ ভারতবর্ষ হইতে তথায় যাইতে ঊর্দ্ধ ভূভাগ আরোহণ করারই প্রয়োজন হইত। উত্তর শব্দের যে ব্যুৎপত্তি ভানুজি দীক্ষিত অমরকোষের টীকায় দিয়াছেন, তাহাতেও ঊর্দ্ধদেশ অতিক্রমণেরই অর্থ পাওয়া যায়,যথা উৎঊর্দ্ধ তরস্যত্র। ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণদিকে যাইতে হইলে নিম্নদিকেই যাইতে হয়, তাহাতেই দক্ষিণদিকের নাম অবাচী অর্থাৎ নিম্নের দিক্ হইয়াছে। আর্য্যগণ ভারতবর্ষে পূর্ব্বাভিমুখেই ক্রমে অগ্রসর হইয়াছিলেন, পশ্চিমদিকে যাইতে হইলে তাঁহাদিগকে বিপরীত মুখে যাইতে হইত বলিয়াই ইহার নাম প্রতীচী হইয়াছিল।

৫। শাস্ত্রানুষ্ঠানের মধ্যে আর্য্যদিগের আদিনিবাস হইতে পূর্ব্বদিকে অগ্রগতির স্পষ্ট নির্দ্দেশ।

পূর্ব্বদিককে সম্মুখ করিয়াই আর্য্যগণ স্বদেশ হইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়াই 'প্রাচী' শব্দ যেমন পূর্ব্বদিকের বাচক হইয়াছে, তেমনই সাধারণ ভাবে অগ্রার্থেরও বাচক হইয়াছে, যথা :—

"দেবাগ্রে স্বস্তচাপ্যগ্রে প্রাচী প্রোক্তা গুরুক্রমৈঃ। ইতি
যত্রৈব ভানুস্ত বিয়ত্যুদেতি প্রাচীতিতাং বেদাবিদোবদন্তি।
তথাপুরঃ পূজক পূজ্যয়োশ্চ সদাগমজ্ঞাঃ প্রবদন্তি তন্ত্রে॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃততিথ্যাদিতত্ত্বম্।

উত্তর কুরুবাসী আর্য্যগণ শাস্ত্রাদিতে 'দেব' নামেই নির্দ্দেশিত হইয়াছেন। সুতরাং দেবতাদিগের সম্মুখভাগ 'প্রাচী' বলিয়া বিশেষিত হওয়ায় পূর্ব্বদিকের দেশই যে আর্য্যদিগের অধিষ্ঠান দ্বারা পবিত্রীকৃত হইয়াছিল, তাহারই স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

যজুর্ব্বেদের নিম্নোদ্ধৃত স্থলটীর অর্থ বিশেষভাবে অনুধাবন করিলে আমরা যেন আর্য্যদিগের যজ্ঞীয়াগ্নিকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পূর্ব্বদিগে অগ্রগতির উজ্জ্বল চিত্রই অঙ্কিত দেখিতে পাই।

"প্রাচী মনুপ্রদিশং প্রেহি বিদ্বানগ্নের-
গ্নেপুরো অগ্নির্ভবেহ।
বিশ্বা আকাশ দীদ্যানো বিভাহ্যূর্জ্জং নো ধেহি
দ্বিপদে চতুষ্পদে॥ ৬৬॥

শুক্ল যজুর্ব্বেদ ১৭ অধ্যায়।

ইহার মহীধর ভাষ্য এইরূপ—'হে অগ্নে প্রাচীং প্রদিশং প্রাগাখ্যাং প্রকৃষ্টাং দিশমনুলক্ষী কৃত্য ত্বংপ্রেহি প্রকর্ষেণ গচ্ছ। গত্বাচ হে অগ্নে ইহাস্মিন্ প্রদেশে পুরঃ অগ্রে অঙ্গতি গচ্ছতীতি পুরোঽগ্নি পুরোগন্তা মুখ্যোভব। কিঞ্চ বিশ্বাঃ সর্ব্বাঃ আশাদিশো দীদ্যানঃ দীপয়ন্ প্রকাশয়ন্ সন্ ত্বং বিশেষেণ দীপ্যস্বা ততোনোঽস্মাকং দ্বিপদে পুত্রাদিকায় চতুষ্পদে গবাদিকায় ঊর্জ্জমন্নং ধেহি সম্পাদয়।"

ইহার স্থুল মর্ম্ম এই"হে অগ্নি,পূর্ব্বদিক লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হও। যাইতে যাইতে পুরোবর্ত্তী হও ; বিশেষতঃ সর্ব্বদিক্ প্রকাশিত করিয়া বিশেষরূপে দীপ্তিমান্ হও। তৎপর আমাদের

পুত্রাদি ও পশ্বাদিকে অন্নপ্রদান কর।"

'উত্তর' শব্দের এক অর্থ অভিধানে 'উত্তম' দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্যদিগের আদি নিবাস উত্তর কুরুতে অবস্থিত থাকায় উহা উৎকৃষ্ট স্থান বলিয়াই—উহা হইতে উত্তর সাধারণ ভাবেই উত্তমার্থের প্রকাশক হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, উত্তরদিকে আর্য্যদিগের আদি নিবাস ছিল এবং পূর্ব্বদিকে তাঁহাদিগের প্রথম অধিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল। এই পবিত্র সাহচর্য্য হইতেই পূজার্চ্চনা সন্ধ্যা বন্দনাদি কার্য্য পূর্ব্ব ও উত্তরাভিমুখ হইয়া করিবার শাস্ত্রবিধান প্রচলিত হইয়াছে।

৬। প্রাচী প্রভৃতি নামের সূর্য্যসম্পর্কের দ্বারা ব্যাখ্যা।

'প্রাচী' প্রভৃতি নামের সূর্য্যগতির দ্বারা ব্যাখ্যাই অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা "প্রাথম্যে প্রশাদ্দাঽত্র। প্রাঞ্চতি প্রাপ্নোতি সূর্য্যং। অপাঞ্চতি সূর্য্যং। প্রতিপশ্চাৎ দিনান্তে ইঞ্চতি সূর্য্যং ইত্যাদি অমরকোষ টীকায়াং ভানুজি দীক্ষিতঃ।"

এই ব্যুৎপত্তিতে সূর্য্যকে যেদিক্ প্রথম প্রাপ্ত হয়। সূর্য্যকে যেদিক্ নীচে প্রাপ্ত হয়। সূর্য্যকে যেদিক্ শেষে প্রাপ্ত হয় এবং সূর্য্যকে যেদিক্ উর্দ্ধে প্রাপ্ত হয়।" এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দিক্ নামের অর্থ দাঁড়ায়।

কেহ কেহ পূর্ব্বদিকেরও সূর্য্য সম্বন্ধ দ্বারাই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। প্রথমোদিত সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলে সম্মুখের দিকই পূর্ব্ব হয়। দক্ষিণ হস্তের দিক্ দক্ষিণ হয়, পশ্চাতের দিক্ পশ্চিম হয়, আর অবশিষ্ট দিক্ উত্তর হয়।

৭। পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যার সহিত শাস্ত্রাদি-বিধানের অসঙ্গতি।

এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, মূলে সূর্য্যসম্পর্ক দ্বারাই যদি দিক সকলের নামকরণ হইয়া থাকিবে, তবে ইন্দ্র সম্পর্কের দ্বারা ইহার যেমন আমরা 'ঐন্দ্রী' প্রভৃতি নাম পাইয়াছি, তদ্রূপ সূর্য্য সম্পর্ক হেতুও পূর্ব্বদিকের সৌরী বা এতদনুরূপ সূর্য্য সম্বন্ধীয় অন্য কোন নামও থাকিত। কিন্তু এরূপ কোন নামই অভিধানে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ ধর্ম্মাদি কার্য্যে পূর্ব্ব ও উত্তরদিকের যে পবিত্রতা ও প্রশস্ততার বিধান শাস্ত্রাদিতে দেখা যায়, উপরিউক্ত কোন ব্যাখ্যায়ই এ সম্বন্ধে কোন রহস্যোদ্ভেদ হয় না। কিন্তু দিগ্‌নাম সকলের যে ব্যাখ্যা আমরা প্রদান করিয়াছি, তাহার সহিত যেমন অভিধানের সুসঙ্গতি হয়, তেমনই ঐতিহাসিক তত্ত্বেরও সুসামঞ্জস্য হয়। ইহা বলা অত্যুক্তি হইবে না যে, দিক্ সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ের সুসমাধানই তাহাতে পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য আমরা সুধীবর্গকে অনুরোধ করিলে, বোধ হয়, নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা

স্বর্গ।

কোন্ উর্দ্ধলোকে স্বর্গ দেবের বসতি,
জন্মিলে যেখানে মৃত্যু ঘটে না কখন,
ব্যাধির প্রভাব যেথা নাহি এক রতি,
ভুঞ্জে অধিবাসী যার অনন্ত যৌবন।

মন্দাকিনী তীরে যথা স্বর্ণ বালুকায়
হীরক প্রস্তর ল'য়ে দেয় শিশুগণ,
ক্রীড়ামত্ত রহে চির বসন্ত সন্ধ্যায়
হাস্য-মুখরিত করি সে দেব ভুবন।
কোথায় সে কল্পতরু যার যে বাসনা
লভিছে সতত, কোথা নন্দন কানন—

অমৃত কলসী কক্ষে ল'য়ে দেবাঙ্গনা
পারিজাত বৃক্ষমূলে করিছে সিঞ্চন।
কোথা বা সে কুবেরের অক্ষয় ভাণ্ডার,
সাধে নিত্য দেবতার প্রতি প্রয়োজন,
বিলাস বাসনা তার করিতে পূরণ।
সারাটী বরষ স্নিগ্ধ রবির কিরণ,
শ্যামল প্রান্তরে যার পুষ্প আস্তরণ,
পুষ্পরথে শূন্য পথে অধিবাসিগণ
পলকে গমন করে সহস্র যোজন।
জানিতে বাসনা নাই কোথায় সে ধাম,
কোন্ পুণ্যবলে সেথা যাবে কোন্ জন,
কোন্ লোকে দেবাসনে বসি অবিরাম
অনেন্দে অমৃত কেবা করিবে ভোজন।
কোথা সপ্ত স্বর্গ আর কোথা রসাতল,
কোন্ লোকে করেছিল ত্রিশঙ্কু গমন।
কোন্ দেশে ধর্ম্মরাজ একটী কেবল
মিথ্যায় নরকদৃশ্য করিল দর্শন।

আমি চাই—

তব পুণ্যালোকে উঠুক হাসি মোদের ধরাখানি,
ভ্রাতৃভাবে জেগে উঠি আমরা যত প্রাণী,
কুলীন, বাঙ্গাল, দুঃখী, কাঙ্গাল, রুগ্ন, আতুর যত,
সবকে দেখে সবাই যেন ভাই ভগিনীর মত,
পরের চখে অশ্রু দেখে ভাঙ্গবে সরম বাঁধ,
দুঃখের বোঝা নামিয়ে দিতে পাতবে আপন কাঁধ।
একের ব্যথা পরাণ পণে অন্যে করুক দূর,
জগৎ জুড়ে উঠুক বেজে একতার সুর,
পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ তারাও থাকুক সুখে,
তাদের জন্যও জেগে উঠুক কোমল ব্যথা বুকে,
বিনয়-মাখা, শান্তি-মাখা, শক্তি-ভরা মুখ
বিশ্বভরা দেখি যেন হৃদয়ে পাই সুখ,
দৃষ্টিরোধক ভেদজ্ঞানের আবরণ যাক খুলে,
প্রেমের অস্ত্রে হিংসা দ্বেষের শল্য ফেলি তুলে,
প্রীতির চক্ষে জগৎ হেরি স্বার্থ থাকি ভুলি,
হৃদ্-বাগানে ফুটে উঠুক সুপ্ত কুসুম গুলি,
বিশাল বিশ্বে তোমার ইচ্ছায় যখন যেথা যাই
সরলতার মধুর ছবি দেখতে যেন পাই ;
শস্যে পূর্ণ বসুন্ধরা চা'লে ভরা ডোল,
হৃষ্ট পুষ্ট ছেলে ভরা লক্ষ্মী মাদের কোল,
দেখবে যখন মায়ের মতন পুরুষ পরের নারী,
পিতৃ ভাবে পরপুরুষে দেখবে আবার নারী।
পরশ্রীতে কাতরতা, সিংহা বিষের জ্বালা,
ভুলবে তোমার আশীর্ব্বাদে দেশের যত বালা,
জাগবে ক্ষমা, হাসবে রমা প্রতি ঘরে ঘরে,
ভালবাসা, ভক্তি দয়ায় ভুবন যাবে ভরে,
দূরে যাবে অকালমৃত্যু অপমৃত্যুর ব্যথা,
মলয় বাতাস আনবে বয়ে তোমার দেশের কথা,
নদীর নীরে, কানন শিরে হাসবে তোমার হাসি,
গাছের পাতায় শিশির কণায় উঠবে তুমি ভাসি,
রবির কিরণ, মেঘের বরণ তোমায় দিবে খুলি,
বিশ্বভরা তোমায় দেখে কষ্ট যাব ভুলি,
চূর্ণ হবে দম্ভ মোদের, নম্র হবে শির,
শান্তি মাখা মূর্ত্তি হবে নূতন পৃথিবীর।
ভক্তি পুষ্প নিংড়াইয়া রস ঢেলে দেও প্রাণে,
নিখিল জগৎ জেগে উঠুক তোমার নামের গানে।
অশান্তি, বিষাদ, বিপদের রাশি ধরা হ'তে দেও নাশি
অথবা তোমার বিধান মানিয়া দুঃখ বরি লই হাসি,
বিশ্বমাঝে স্বর্গ ছবি উঠুক তোমার ফুটি,
দৈন্য দুঃখ দেশের যাবে এক নিমিষে টুটি।
এইটী যদি এইখানে পাই ভাবনা কি আর তবে,
চুপটি করে থাকব সেথা যা হবার তাই হবে।
এই করে দেও দয়াল প্রভো আর কিছুই না চাই,
প্রেমের হ্রদে ভাসিয়ে ডিঙ্গি বাহার মেরে যাই।

শ্রীনলিনীনাথ দাসগুপ্ত।

আয় মা।

(১)

আয়গো দুর্গে ! মা জননী !
এবার রুগ্ন জীর্ণ দেহ, দেমা, ঢালি শত স্নেহ,
তোর ও স্নেহে রুগ্ন দেহে বহুক পুণ্য মন্দাকিনী,
নে মা ! ধুয়ে শত পাপ, শত দুঃখ মনস্তাপ,
রোগের জ্বালা সইতে নারি তরা মাগো ! নিস্তারিণী !
আয়গো দুর্গে মা জননী !

(২)

আয়গো দুর্গে ! মা জননী !
ম্যালেরিয়া দারুণ জ্বরে, রক্ত নিছে শূন্য করে,
কঙ্কাল রয়েছে পড়ে আর কিছুই নাই আগমণি !
খাইলে কিছু উদর কাঁপে, হাট্‌লে পরে বুকটা কাঁপে,
কত জন্মের শত পাপে রক্তশূন্য আজ ধমনী !
তরা মাগো নিস্তারিণী !

(৩)

আজ দাও মা দেখা নিস্তারিণী !
শরতে আজ বিমল জলে, ফুটেছে ওই দলে দলে,
হাসি মুখে কতুহলে শতশত কমলিনী।

ভক্তি ভরে সেই কমলে, দিব তোমার চরণ তলে
পুষ্পাঞ্জলি দুর্গা বলে, লইও পূজা মা জননী!
আজ দাও মা দেখা নিস্তারিণী!

(৪)

আয়গো দুর্গা! মা জননী!
স্ত্রী পুত্র নাইক কাছে, তারা যেন কোথায় আছে?
সবাই তোমার স্নেহে বাঁচে তুমি মা! বিশ্বব্যাপিনী!
চাই না তাদের মায়া স্নেহ, তুমি মা! অভয় দেহ,
তুমি বিনে আপন কেবা এ ব্রহ্মাণ্ডে নিস্তারিণী!
দাও গো! অভয় মা জননী।

(৫)

আয়গো মা দুর্গে! মা জননী!
শক্তি শূন্য আজি দেহ, দাও মা "বল" করি স্নেহ,
ধমনীতে রক্ত বহুক রক্তশূন্য যে ধমনী।
ওগো দুর্গে! দশভুজা! লইও এবার দাসের পূজা,
তোমার পদে"জীবন"দিব আর কিছু নাই মা তারিণী!
আয়গো দুর্গে! মা জননী!

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত।

আনন্দ।

মায়ের বুকে ছিল আগে
স্তন্য-সুধা রূপে,
ক'দিন পরে খেলার ঘরে
খেল্‌তে এ'ল চুপে।
শেষে যখন অবগুণ্ঠন
মোচন করলো প্রিয়া,
দেখি আনন্দ চে'য়ে আছে
সলাজ আঁখি নিয়া।
যৌবনের সেই প্রথম স্বপ্ন
ভগ্ন হ'লে পর,
পুত্র কন্যার মুখে হ'ল
আনন্দ গোচর।
বুড়ো কালে এ সকলে
আসক্তি আর নাই,
সব চে'য়ে বেশী আনন্দ
নামেই এখন পাই।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ।

পরিতৃপ্ত।

১

হৃদয়-বীণার তারে
দিয়াছিলে যেই তান,
তোমারি রাগিণী তাহে
নিয়ত করিনু গান।

২

সুযশঃ অযশঃ হেলা
স্নেহ যত্ন অনাদর,
হরষে সঁপিনু সবি
তোমারি চরণ পর।

৩

আমার কিছুই নাই
তুমি ছাড়া ভগবান,
তোমারি গৌরবে শুধু
রব চির গর্বীয়ান।

৪

সৌভাগ্য গৌরব এই
জানি মোর নাহি লয়,
এ তুচ্ছ জীবনে হোক
তব বাসনার জয়।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

কৃতজ্ঞ।

দান পেয়ে দীন কহে জুড়ি দুই কর,
"হে দাতা, তোমার দানে কৃতজ্ঞ এ নর।"
দাতা কহে 'কৃতজ্ঞ" তোমা হ'তে আমি,
আমারে করিতে দান শিখায়েছ তুমি।

শ্রীহিরণবালা সেনগুপ্তা।

সহজ ভাব।

তোমারি রাজত্বে মোর কিসের সংযম?
তোমারি জগতে মোর কিসের নিয়ম?
সব যদি নিতে পারি তোমার বলিয়া,
সব যদি করি নাথ, তোমারে ভাবিয়া।

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন।

শ্রীমান্ সু-প্রসন্ন রায়ের পুত্রের অন্নপ্রাশন
উপলক্ষে শুভ কামনা।

অষ্টাদশ পদী।

শিশু খাবে আজি প্রথম অন্ন,
সকলের প্রাণ সু-প্রসন্ন।

এই অন্নে হোক দেহের পুষ্টি,
প্রাণমন মাঝে আসুক তুষ্টি।
যাঁরা এ দেহের জনম-দাতা,
স্নেহের সাগর পিতা ও মাতা।
তাঁদের চরণে শিশুর হৃদয়,
অন্ন সনে যেন চির বাঁধা রয়।
এই অন্নে হোক পরমে প্রীতি,
বিদ্যা বিনয় ভকতি ধৃতি।
ফুটুক হৃদয় রাজীব-রাজে,
লাগুক দেশের দশের কাজে।
চিরতরে সব ঘুচুক দৈন্য,
অন্নদানে শিশু হউক ধন্য।
সবে মিলে করি শুভ আশীর্ব্বাদ,
এই অন্ন হোক দেহের প্রসাদ।
বাজাও শঙ্খ কর উলু ধ্বনি,
শুভ দিনে অন্ন খায় খোকামণি।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা।

সুন্দর ও প্রিয়।

সব চেয়ে প্রিয়তম আমার এ আমি,
সব চেয়ে অনুপম তুমি মোর স্বামী।
পত্নী বিত্ত বান্ধবাদি যাহা কিছু আছে,
তুচ্ছ তারা আমার এ আমিটীর কাছে।
নয়নাভিরাম বিশ্বে যা কিছু সুরূপ,
সকলের প্রাণ তুমি—সকলের ভূপ।
তোমার অমল রূপ-জ্যোতির নিঝরে,
সূর্য্য তারা কত আলো ব্রহ্মাণ্ডে বিতরে
সিগ্ধ শান্ত মনোরম যা কিছু মহান্,
তোমার রূপের কণা সে সবার প্রাণ।
সুন্দরে ভেটিতে হয় প্রিয় বস্তু দিয়া,
কবে এ সহজ জ্ঞান উঠিবে ফুটিয়া?
সুন্দর চরণ তলে প্রিয় মোর আমি,
লুটায়ে পড়িবে কবে হে সুন্দর স্বামি!

দরবেশ

শ্রাবণে।

এস' চির বাঞ্ছিত হে মানসচারী;
এ মঞ্জু হৃদয়কুঞ্জে, প্রেমের উল্লাসে,
বেলার নূপুর পায়ে, ইন্দ্রধনু বাসে,
সেফালীর মাল্য কণ্ঠে, অধরে বাঁশরী।
দীপ্ত দামিনীর রূপে, বারিদ বরণ,
এস' মধুছন্দে ভরি যূথিকার গন্ধে,
চঞ্চল-চরণে চারু সমীরণে মন্দে,
নবীন নীরদ কান্তি নয়নরঞ্জন।
এস চিত্ত-চোর মম মানস-মিলনে,
শ্রাবণের ধারা ঢালি বাহুর বন্ধনে।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়।

প্রার্থনা।

যেন মোর হৃদিখাতে প্রেম-স্রোত বহে,
মিথ্যা মায়া-বাঁধে তার গতি নাহি টুটে।
করুক সে স্রোত মোর হৃদি নিরমল,
উচ্ছ্বাসে তাহার হ'ক হৃদয় পাগল।

শ্রীনলিনীকান্ত বসু।

সঙ্কলিকা।

(১৪)

কিছুদিন এদেশে নূতনের খেলা চলিতেছে। এদেশের বক্তাগণ বক্তৃতা করেন, তোমরা ভাল হও, কিন্তু নিজেরা ভাল হইতে চান না। নেতারা অন্যকে চালাইতে চাহেন, কিন্তু নিজেরা চালিত হইতে অনিচ্ছুক। দাতারা অন্যকে দান করিতে বলেন, নিজেরা কিন্তু ব্যয়কুণ্ঠ হইয়া থাকেন। অনুসন্ধান কর,জানিতে পারিবে, অপকর্ম্ম করিয়া দিন কাটাইতেছেন, কত কত নেতা, কত শত বক্তা। তাঁহারা স্বদেশীর আন্দোলনের দিনে নিজেরা বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতেন। কত শত দাতা জীবনে একটী পয়সাও দান করেন নাই! আজ কাল অন্যকে সৈন্যশ্রেণী ভুক্ত হইতে কত জন অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু নিজেদের আত্মীয় স্বজনকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিতেছেন। আমরা দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছি। হায়রে স্বদেশানুরাগ।

(১৫)

যাহা দেখি নাই, তাহা ভাল; যাহার আস্বাদনই লই নাই, তাহা বুঝিবা বড় মিষ্ট। নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে এই কথাই যেন প্রতিপন্ন হইতেছে। কেন একথা লিখিতেছি, পাঠকগণ বুঝিয়া লইবেন।

(১৬)

এটা নীরবতার যুগ। নীরব না থাকিলে অনেক ভয়। ভয় না থাকিলে এত ঝড় নীরবে কিরূপে দেশের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। কেহ কোন কথা বলিতেছেন না। কাহারও কোন কথা বলিবার শক্তি নাই। এহেন দিনে নেতাদের কূর্দ্দন থামিয়া গেলেই দেশ এখন নীরবতার সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। বিধাতা তাহাই করুন। সকল আনন্দ-কোলাহল নির্ব্বাণ হইয়া যা'ক। এদেশে জাগিয়া থাকুক, শুধু বিষাদ!

(১৭)

অন্ধভক্তি এদেশে দিন দিন গজাইয়া উঠিতেছে। 'ভারতী' আমাদিগকে "বেওকুব" বলিয়াছেন, তাহা মাথায় পাতিয়া লইলাম। অন্ধভক্তি,সাহিত্য সভায় পঠিত, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধ সম্বন্ধে কি বলেন, জানিতে চাই।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

২৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অনাথ ভাণ্ডার—চার্ণক। ভাণ্ডারের তৃতীয় বর্ষের এই কার্য্যবিবরণ পাঠ করিয়া আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইলাম। অকৃত্রিম সেবক শ্রীমান্ নারায়ণপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়ের তিরোধানের সংবাদে বড়ই বেদনা পাইলাম। নারায়ণপ্রকাশের পুণ্যপূত আদর্শ চরিত্র-স্মৃতি দ্বারা সেবকমণ্ডলী অনুপ্রাণিত হউন।

২৪। Observations on the Brahma Samaj by Rev. Beharilal Sen. সুচিন্তিত বিবৃতি।

২৫। সদানন্দ। শ্রীহেমচন্দ্র চৌধুরী। মূল্য ।০। মিলটনের ললেগ্রোর বঙ্গানুবাদ। সুন্দর অনুবাদ।

২৬। The Twentieth and Twenty-first Annual Report of the Raj-Kumari Leper Asylum at Baidanath Deoghur. আশ্রমের কার্য্য সুপ্রণালীতে চলিতেছে জানিয়া সুখী হইলাম।

২৭। ফরিদপুর সেবাসমিতির পঞ্চম বার্ষিক কার্য্যবিবরণী। ১৯১৫-১৬। আয় ৮৭৲,ব্যয় ৮৬৶০। বিধাতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।

২৮। An Essay on the Origin of Animals by Rajani Kanta Dass, Tezpur. ক্ষুদ্র পুস্তক, মোটে ১০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲। বিশদৃশ চিত্র।

২৯। সেবা ও সেবক। শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক প্রণীত,মূল্য ৵০। "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" ইহা অতি সুন্দর কথা। সহৃদয়তার অপূর্ব্ব চিত্র।

৩০। বরিয়ানা। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়। মূল্য ৸০। রবীন্দ্রনাথের লেখার তীব্র সমালোচনা। পুস্তকখানি সুলিখিত। কেবল, সুলিখিত নয়, অনেকের বিরক্তিকর হইলেও, ইহা সত্য কথার বিবৃতি। অমরেন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ অতি সুন্দর, সকলের প্রণিধানের যোগ্য। এ গ্রন্থের আগাগোড়ায় সৎসাহসের পরিচয় রহিয়াছে। অমরেন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল। এমন দিন শীঘ্র আসিবে, যে দিন দর্পীর অতি-দর্প খর্ব্ব হইবে।

শ্রীমধুসূদন।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন, "যদি কোন আধুনিক ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত ইউরোপীয় আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের আবার ভরসা কি?—বাঙ্গালীর মধ্যে মনুষ্য জন্মিয়াছে কে?" আমরা বলিব, "ধর্ম্মোপদেশকের মধ্যে শ্রীচৈতন্য দেব, দার্শনিকের মধ্যে রঘুনাথ, কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব ও শ্রীমধুসূদন।" বঙ্কিমচন্দ্র কেবল ইহাতেই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি আরও বলিয়াছেন,—"বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল, সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে। কাল প্রসন্ন—ইউরোপ সহায়—সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও,—তাহাতে নাম লেখ "শ্রীমধুসূদন।"

আমরা মধুসূদনকে কোন আখ্যায় ভূষিত, কোন বিশেষণে বিশেষিত করিতে চাহি না, আমরা বাঙ্গালীর কবি মধুসূদনকে বাঙ্গালার মিল্টন বলিতেও এক্ষণে নারাজ। আর সে দিন নাই, বাঙ্গালী ক্রমশঃই বুঝিতেছে যে মধুসূদন কেবল মাত্র বাঙ্গালীরই মধুসূদন। আমরা তাঁহাকে শ্রীহীন করিতেও নারাজ। এখন হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সুর মিলাইয়া আমরা বলিব "জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও, তাহাতে নাম লেখ "শ্রীমধুসূদন!" তিনি সমুদ্র-পারবর্ত্তী জলের ন্যায় বহু দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িলেও, তাঁহার অস্থি-কবরে শান্তিলাভ করিলেও তাঁহার স্মৃতির চিতা বাঙ্গালীর হৃদয়-শ্মশান হইতে কখনই নিবিয়া যাইবে না। হতভাগ্য মধুসূদনের জন্য হতভাগ্য বাঙ্গালী চিরদিনই কাঁদিবে, তাঁহার জীবদ্দশার বিয়োগান্ত নাটক স্মরণ করিয়া কাঁদিবে। তাঁহার দেহটা সাহেবী পোষাকে সাজিয়াছে, বিদেশীয় আচার ব্যবহারে মজিয়াছে, অবশেষে সাহেবী কবরে ওমিশিয়াছে, কিন্তু তাঁহার অন্তরাত্মা আমাদের কাছেই ছিল। তিনি উপরে যাহাই সাজুন, ভিতরে তিনি বাঙ্গালী ছিলেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার ভিতরটাকেই খুঁজিব, তাঁহার বাহিরের খোসা-ভুষির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, তিনি আমাদিগকে কি মধু দিয়া গিয়াছেন, তাহাই আহরণ করিব, তাহাই পান করিয়া সাধ মিটাইব।

"গাঁথিব নূতন মালা—
রচিব মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

মধুসূদনের এই সদর্প উক্তি ব্যর্থ হয় নাই। তাঁহার "নূতন মালা" আজিও ম্লান হয় নাই, হইবারও নহে, কারণ তাহা যে নূতন। কালিদাসের শকুন্তলা কি ম্লান হইয়াছে? কবি নাই, কিন্তু কবির দান ম্লান হয় নাই, কারণ তাহা যে প্রকৃত দান—প্রকৃত দান কখনও পুরাতন হয় না। তেমনি মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' যখনই পড়ি না কেন, যতবারই পড়ি না কেন, পুরাতন হইতে চাহে না, অবসাদগ্রস্ত করে না, কারণ তাহা যে কবির নিজস্ব দান, সজীবতার শ্যামলতায়, নবীনতার সরলতায় তাহা যে চির ভরপুর। হেমচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন "একত্র এত রসের সমাবেশ অন্য কোন বাঙ্গালা পুস্তকে নাই।...যিনি মেঘনাদবধের শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন যে, বাঙ্গালা ভাষার কতদূর শক্তি এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত কি অদ্ভুত ক্ষমতাপন্ন কবি।" যিনি এই কথা লিখিয়া

গিয়াছেন, তিনিও কম শক্তিধর নহেন। বাঙ্গালা ভাষার যে কতদূর শক্তি, তাহা এই দুইজন শক্তিধরই ধরিতে পারিয়াছিলেন। মধুসূদন এবং হেমচন্দ্রের ন্যায় ক্ষণজন্মা কবি জগতের কাব্যের ইতিহাসে অতি বিরল। এমন তরঙ্গ-তর্জ্জন, এমন মেঘ গর্জ্জনের সৃষ্টি বুঝি লেখনী-মুখে জগতের আর কোন কবিই প্রকাশ করিতে পারেন নাই। ইঁহা-দিগকে বক্ষে ধরিয়া বঙ্গভূমি এবং বঙ্গভাষা প্রকৃতই ধন্য হইয়াছেন।

হার্ডার তাঁহার শিষ্যপ্রবর গেটেকে শিখা-ইয়াছিলেন যে, "really great poetry is always the result of a national spirit" অর্থাৎ মহীয়সী কবিতা মাত্রেই জাতীয় চেতনার ফল স্বরূপ, তেমনি, মধুসূদন এবং হেমচন্দ্রের শব্দ শক্তিমত্তাতেও বাঙ্গালী যে আর ঘুমাইয়া নাই, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন যে জাগরূক, তাহারই সুস্পষ্ট পরিচয় প্রতি-ধ্বনিত হয়।

(জাতিচ্যুত হইলেও হেমচন্দ্রের ন্যায় মধুসূদনও বাঙ্গালীর জাতীয় কবি। সেই অনিবার্য্য দুঃসময়ের স্রোতে পড়িয়া তিনি চঞ্চল বালকের ন্যায় একটা অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া বাঙ্গালা কি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে? তাহা হইলে আজ আমরা এই গোরস্থানে তাঁহার পূজার জন্য প্রীতির অর্ঘ্য দিতে আসিতাম না। কবরে গমন করিবার সময় বিজাতীয়েরা তাঁহার শব-দেহের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়াছিল, আর আমরা তাঁহার আত্মীয় হইয়া সজল নয়নে দূর হইতেই নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সে ব্যবধান এখন আর নাই, কারণ বাঙ্গালী এখন তাঁহাকে হৃদয় দিয়া বুঝিতে পারিয়াছে, মধু-সূদনের মধুচক্র যে গৌড়জনেরই সম্ভোগের জন্য বিশেষ করিয়া রচিত, তাহা বাঙ্গালী মাত্রেই বুঝিয়াছে।)

বঙ্গের ঘরে ঘরে তাঁহার গ্রন্থাবলীর যথেষ্ট প্রচার হইয়া গিয়াছে, মধুসূদনের নাম আজ বাঙ্গালীর আবাল বৃদ্ধ বনিতার ঘরের কথা হইয়াছে, মেঘনাদ বধের অনেক কথা এখনও বাঙ্গালীর কণ্ঠে কণ্ঠে গাঁথা রহিয়াছে। অবশ্য অনুকরণের মোহে পড়িয়া, এই অসরল বিজ্ঞপ্তির যুগে আমরা কাচ মূল্যে কাঞ্চন বিকাইতেছি বটে, প্রকৃত কবিকে বাছাই করিবার আমাদের বিচারশক্তি লোপ পাই-য়াছে বটে, কিন্তু অবলম্বনহীন মেঘ কি চির-দিন সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে? প্রতিষ্ঠা-হীন শৈবাল কি সাগরের তরঙ্গ-বেগ রোধ করিতে পারে? একবার ভীম ভৈরব রবে প্লাবন আসলেই শরৎ কালের গঙ্গার ন্যায় আবার সকলই সুনির্ম্মল হইয়া উঠিবে। তখন মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রঙ্গলাল আবার বঙ্গের মেঘমুক্ত গগনে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবেন।

নবীনচন্দ্রের পর হইতেই বাঙ্গালীর কবিতা-নদীতে যেন ভাটা পড়িয়া গিয়াছে, কবিতায় সে প্রাণ নাই, ভাষায় সে শক্তি নাই, ছন্দের সে টান নাই, যেন নিস্তরঙ্গ নদীবক্ষে কতকগুলি কবিতারূপ বুদ্বুদের ক্ষণভঙ্গুর লীলাই সন্দর্শন করিতেছি। এখন আমরা মুখেই "নূতন নূতন" করিতেছি বটে, কিন্তু তখন নূতন আপনা হইতেই সৃষ্টি হইতে-ছিল। নূতন ঐশ্বরিক নিয়মেই আসে, নূতন মানুষের বাঁধাধরার ভিতরে জন্মায় না। মধুসূদনের সময় হইতে যে নূতন ঐশ্বরিক নিয়মেই প্রবাহিত হইতেছিল, সেই নূতন যেন নবীনচন্দ্রের পর হইতেই নিঃশেষিত হইয়া গেল। যে নূতনকে আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালীর

জীবন গঠিত হইতেছিল, এখন সেই আসল নূতনের সিংহাসনে নকল অনুকরণের আধিপত্য! বাস্তবিক মধুসূদনের পর হইতেই নবীনচন্দ্র পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে যেন একটা নূতনের স্রোত বহিয়া গিয়াছিল, তাহাতে দলাদলি ভাঙ্গাভাঙ্গি ছিল না। সে নূতন মালায় কেবলই ছিল মধুচক্রের ন্যায় হেম, মধু, নবীন, বঙ্কিম, দীনবন্ধু প্রভৃতি অলিকুলের গঠিবার প্রয়াস। সে নূতনের বিশেষত্ব ছিল, মিলনে এবং গঠনে। এখন আমরা তথা-কথিত নূতনের দল মিলিতে এবং গঠিতে পারি না, কিন্তু ভাঙ্গিতে ওস্তাদ। হেম, মধু, নবীন, বঙ্কিম, দীনবন্ধু প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ যেন একই সময়ের মালার আকারে বঙ্গবাসীর গলদেশ বিভূষিত করিয়া বঙ্গভূমির গৌরব বর্দ্ধিত করিয়া আবার নির্দ্দিষ্ট কালেই মালার ন্যায় মিলিত হইয়াই বিদায় লইয়াছিলেন। তাঁহারা যেন একটা আদেশ লইয়া আসিয়াছিলেন, এবং আদেশ পূরণ করিয়াও বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সমসাময়িক আগমন এবং প্রস্থানে ভগবানের একটা সুদূর-নিহিত উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল। আজ যাহার বলে আমরা বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব অনুভব করিতেছি, তাহার মূলে মধুসূদন একটা কত বড় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, তাহা আমরা ভাবিবার অবসর পাই কি? মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী পড়িয়া দেখিও, তাহাতে বাঙ্গালী জাতির এবং বঙ্গভূমির সকল ইতিহাসই চুম্বকে খুঁজিয়া পাইবে। মধুসূদনের অন্তঃপ্রকৃতি বুঝিতে হইলে তাঁহার এই প্রবাসে অবস্থানকালের কবিতাগুলিই একমাত্র সহায়। মধুসূদনকে বুঝিতে পারিলে আজ আমরা পরের দ্বারে পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্টের জন্য প্রত্যাশী হইতে যাইতাম না—নিজের মাতৃভাষাকে এমন করিয়া পাশ্চাত্য-দূষিত বিকৃত করিয়া তুলিতাম না। তখনকার পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাবল্যে মধু হইতে সকলেই একরূপ মাতিয়া উঠিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, অপরের সভ্যতার ক্রীতদাস হইয়া সুখ নাই। মধুসূদনের আক্ষেপময় জীবনই তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। তিনি প্রথম জীবনে মাতৃভাষার অঙ্গে পদাঘাত করিয়া ইংরাজী ভাষানুশীলনে মত্ত হইয়াছিলেন, ইংরাজের কবি হইবেন বলিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য স্বজাতি এবং স্বধর্ম্মকেও তিনি ত্যাগ করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই, কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিলেন কি? আবার ফিরিতে হইল। বঙ্গভূমি এবং বঙ্গভাষার ক্রোড়ে ফিরিতে হইল। পরধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াও তিনি স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। এই কবরেও কি তিনি স্থির হইতে পারিয়াছেন? তাহা হইলে আমরা আসিব কেন? আমাদের প্রাণ হেথায় টানিবে কেন? এমন করিয়া কাঁদিবই বা কেন? স্মৃতির জগতে যে আরও অস্থিরতা, আরও আত্মীয় স্বজনকে দেখিবার জন্য মমতা। অতি দুঃখেই হেমচন্দ্র বিলাপ করিয়াছিলেন ;—

"গেল চলি মধু কাঁদায়ে অকালে,
পাইয়া বহুল ক্লেশ,
ক্ষিপ্ত-গ্রহ-প্রায় ধরাতে আসিয়া,
জ্বলিয়া হইলা শেষ।"

কিন্তু স্মৃতির জগতে আরও জ্বালা! অমর মধুসূদন এখনও জ্বলিতেছেন—তাঁহার অমানুষী প্রতিভা এত শীঘ্র নিবিবার নয়। তিনি জ্বলিতে থাকুন—তাঁহার জ্বলনে আমাদের জাতীয় জাগরণ নির্ভর করিতেছে।

তিনি জ্বলিয়া পুড়িয়া আমাদিগের গন্তব্য পথের চির জাগরিত প্রহরীর ন্যায় সাবধান করিয়া দিন যে, মাতৃভাষাকে অবহেলা করিয়া পরপদলেহনে সুখ নাই। আশার ছলনে ভুলিয়া তিনি কি ফললাভ করিয়াছিলেন, তাহা যেন আমাদিগের ন্যায় পরমুখাপেক্ষী বাঙ্গালীর সদাসর্ব্বদা স্মরণ থাকে। বাঙ্গালী হইয়া তাঁহার মত সর্ব্বরকমে ধনে প্রাণে সাহেব কেহই সাজেন নাই। কিন্তু সেই পাশ্চাত্য মোহ-প্লাবিত মধুসূদনই চক্ষুষ্মান্ হইয়া জীবনের শেষ দশায় কি বলিতেছেন দেখুন ;—

"হে বঙ্গ ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পরধন-লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
মজিনু বিফল-তপে অবরেণ্যে বরি ;
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে,
"ওরে বাছা ! মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে।"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে,
মাতৃভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।"

আমাদিগের দেশের উদীয়মানদিগের বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি মধুসূদনের এই মর্ম্মবাণী-গুলি মনে লাগিবে কি ? ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা মাতৃভাষাকে ভরাইবার দুরাশা যেন আমরা মধুসূদনের ন্যায় পরিত্যাগ করি। কিন্তু আমরা পারিব কি ? মধুসূদনের ন্যায় আমাদের সে শক্তি কোথায় ?

শ্রীঅকিঞ্চন দাস।

আসামের জাতি বিভাগ।

জাতি বা বর্ণ চারিটী,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ইহাই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূল। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" গুণ এবং কর্ম্ম বা ব্যবসায়ানুসারে চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। এই চারিবর্ণ হইতে ক্রমে নানাবিধ সঙ্করবর্ণের সৃষ্টি। আসামে (Assam valley or Assam proper) সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কলিতা, কেওট, কোচ, ছুটিয়া, আহম ও রাজবংশী, এই কয় জাতিই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত অসভ্য জাতি আছে। আসাম যে অতি পূর্ব্বে কিরাতাধ্যুষিত স্থান ছিল, সে বিষয় ঐতিহাসিক মাত্রেই অবগত আছেন। তৎপর এখানে প্রথমে কাচারি জাতির আদি পুরুষগণ, তৎপর ক্রমে ছুটীয়া ও আহমগণ এদেশে প্রবেশ করে। সুতরাং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি আর্য্যজাতীয় লোকগণ যে বিভিন্ন স্থান হইতে এ স্থানে আসিয়া বসতি করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণদের অনেকেই, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ কোথা হইতে আসিয়াছিলেন, বলিতে পারেন না। কেহ কেহ বা কণৌজ হইতে আসিয়াছেন বলিয়া থাকেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে যে অনেকে আসিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তবে আবার অনেকে বঙ্গদেশ হইতেও আসিয়াছেন, তাহারও প্রমাণ রহিয়াছে। শিবসাগর জিলার গোলাঘাটের শ্রীযুক্ত সোমেশ্বর বড়ুয়া মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষই বঙ্গদেশাগত। ইহা আমি তাঁহার নিজমুখেই শুনিয়াছি। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদের আচার

ব্যবহারে প্রাদেশিক সামান্য ভিন্নতা থাকিলেও মোটামোটী ভাবে বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রহিয়াছে। ব্রাহ্মণের নীচে কায়স্থকেই স্থান দিতে হয়। ইহাদের অধিকাংশই বঙ্গদেশাগত বলিয়া বোধ হয়। আহোম রাজার সময়ে বিভিন্ন রাজকার্য্য গ্রহণ করিয়া এদেশবাসী হইয়াছিলেন। ইহাদের প্রায় সমস্তই কাকতি বা লিখক শ্রেণীভুক্ত। কায়স্থের ব্যবসাও তাই। ইহাদের কেহ কাকতি, কেহ বা দোয়ারা কাকতি, কেহ চলিহা কাকতিরূপে পরিচিত। কাহাকেও বা বড়ুয়া রূপেও দেখা যায়। বলিতে গেলে ইহারাই আসামের বিশিষ্ট ভদ্র সন্তান। কলিতা কাকতি (কাকত্ = কাগজ paper) গণের সমকক্ষ না হইলেও জাতি হিসাবে তাহাদের অপেক্ষা নিতান্ত হেয় নহে। কলিতারা শ্রীহট্ট বা বঙ্গের অন্যান্য স্থানবাসী কৃষিজীবী "দেব" আখ্যাধারী শূদ্র জাতির সমকক্ষ। কায়স্থেরা চাষ কার্য্য করেন না। কলিতার (সাধারণ শ্রেণী) নিজহস্তে ভূমি কর্ষণ করিয়া থাকে। কলিতাদিগকে "কুললুপ্ত" শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া পরশুরাম ভয়ে বিতাড়িত ক্ষত্রিয় সন্তানরূপে অনেকে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি দীর্ঘকাল আসাম প্রবাসে যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে ইহা স্বীকার করিতে পারি না। আমার বোধ হয়, ইহারাই প্রথম আসামে যে সমস্ত কায়স্থ আসিয়াছিলেন, তাহাদের অধিকাংশের সন্তান। অবস্থা বিপর্য্যয়ে কৃষিপ্রধান আসামে (কোচরাজ্যে) আসিয়া কৃষি ব্যবসায়াবলম্বনে এইরূপে অধঃপতিত হইয়া কায়স্থ শব্দের বিকৃতিতে(কায়স্থ—কায়থ্—কায়থা—কায়্তা—কয়্তা—কর্তা—কল্তা—কলিতা) কলিতারূপে পরিচিত হইয়াছে। ইহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। নতুবা পরশুরাম-ভয়-বিতাড়িত ক্ষত্রিয়গণ যে কেবল আসামের জঙ্গলে স্থান পাইলেন, আর কোথাও পাইলেন না, তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমানে এই শ্রেণীর মধ্য হইতে যাঁহারা বিদ্যা ও ধন-গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছেন, তাঁহারা সামাজিক হিসাবে কায়স্থদের সমকক্ষ হইয়া পড়িয়াছেন। এবং কোন কোন স্থলে কায়স্থদের সহিত বিবাহ সম্বন্ধাদিও হইতেছে। বর্ত্তমানে আসামে (আপার আসামে) বিদ্যা ও ধনগৌরবের সঙ্গে সঙ্গে জাতিগত উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। এবম্প্রকার ব্যক্তিগণ অপেক্ষাকৃত হীন জাতীয় হইলেও ক্রমে ক্রমে কায়স্থজাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িতেছেন। অথবা বলিতে গেলে, আধুনিক হিসাবে পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় এক ভদ্রশ্রেণীর সৃষ্টি হইতেছে। বিদ্যা ও ধনগৌরবে উন্নত হইলে জাতি সম্বন্ধে কেহ বড় অনুসন্ধান করিতে চায় না। অপ্রিয়তার ভয়ে ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে বিরত থাকিলাম। কলিতার নিম্নে কেওট বা কৈবর্ত্ত জাতির স্থান। আজ কাল আসামে ডোম (বা নদীয়াল) জাতীয় লোকেরাও কৈবর্ত্ত বলিয়া পরিচয় দিতেছে। কৈবর্ত্ত শব্দে আমি বঙ্গীয় কৈবর্ত্ত দাস বা মাহিষ্য জাতিকে লক্ষ্য করিয়াছি। মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী প্রভৃতি স্থানে এই জাতীয় বহুলোক দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীহট্টের দাস জাতীয় লোকও এই শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয়। কৈবর্ত্ত হইতে কৈবত্—কৈব্ত্—কৈয়ত্—কেয়ত্ = কেয়ট = কেওট হইয়াছে। এই কৈবর্ত্ত জাতিকে কেওটরূপে পরিচয় দিতে রাজসাহী বিভাগের কোন এক স্থানে শুনিয়াছি। সুতরাং কৈবর্ত্ত হইতে যে কেওট হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা ছাড়া

দৈবজ্ঞ বা গণক, জুগী বা কাঠনী (আপার আসামে কাঠনী বলে) ও কামরূপের স্থানে স্থানে সাহা জাতীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়। কামার (আসামে কমার রূপে পরিচিত) কুমার, হাড়ি (বা বুাওয়াল) জাতীয় লোকও দৃষ্ট হয়। দেশীয় ধোপা কোথায়ও দেখি নাই। নাপিত জাতীয় লোক কামরূপের স্থানে স্থানে দেখা যায়। নাপিত ও ধোপার অভাব হেতু আসামে সর্ব্বত্র বেহারী নাপিত ও ধোপা দেখিতে পাওয়া যায়। এবং দেশীয় গ্রামবাসী লোকেরা নিজেরাই নাপিত ও ধোপার কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। গণক ও সাহা জাতীয় লোক বঙ্গদেশের ন্যায় আসামে হেয় বলিয়া গণ্য নহে। দৈবজ্ঞ জাতীয় ভাল বংশীয় লোকেরা বড়দলৈ বলিয়া পরিচিত। আজকাল অবশ্য সাধারণ গণকরাও বড়দলৈ লিখিতেছে। এই জাতীয় লোকদের মধ্যে চাঙ্গকাকাত (Chankagati) বলিয়া একশ্রেণী পরিচিত।

উপরে যে সমস্ত জাতির কথা বর্ণনা করা গেল, কলিতা ব্যতীত সে সমস্তই বঙ্গদেশীয় লোকদের নিকট পরিচিত।

আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, কাছাড় জাতির পূর্ব্ব পুরুষগণ প্রথমতঃ ভারতের উত্তর পূর্ব্বকোণে ব্রহ্মদেশের দিক হইতে প্রবেশ করিয়া আসামের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। সেই একজাতীয় লোক হইতেই কোচ, কাছাড়ী, ত্রিপুরা, মিকির ও গারো জাতীয় লোকের (বিভিন্ন স্থানে বাস ইত্যাদি কারণবশতঃ) উৎপত্তি হইয়াছে। যোগিনীতন্ত্রে কোচদিগকে "কুবাচ"রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। অনার্য্য বা ম্লেচ্ছ জাতির ভাষা বলিয়া কুৎসিত বাচ বা বাক্য হইতে কুবাচ শব্দের সৃষ্ট হইয়াছে। "ম্লেচ্ছ" শব্দ হইতে গোয়ালপাড়ার অধিবাসী "মেছু" জাতীয় লোক মেচরূপে পরিচিত হইয়াছে। এই মেচ ও কাচারি যে এক, তাহা বর্ত্তমানেও জানা যায়। রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুরের কোচ রাজবংশের উৎপত্তিতে হরিয়া মেচকেই শিববংশের আদিপুরুষরূপে দেখান হইয়াছে। সুতরাং কাছাড় জাতই যে কোচ জাতির আদি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কোচরাজার হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বা তাহার অব্যবহিত পরে যে সমস্ত লোক (সে জাতীয়) হিন্দুধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিল, তাহারাই কোচরূপে পরিচিত হইয়াছে, ইহাই বুঝা যায়। একই বংশ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া উপর ও নিম্ন আসামে রাজ্য স্থাপন করে। উপর আসামে কাছাড়ি, নিম্ন আসামে (কোচবেহারাদি স্থান সহ) কোচরা রাজত্ব করিতে থাকেন। আহোমগণ আসামে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে লক্ষীমপুর ও শিবসাগরের অংশব্যাপী ছুটীয়া রাজ্য ধ্বংস করিয়া অপেক্ষাকৃত বলশালী হইলে ক্রমশঃ কাছাড়ী রাজাকে স্থানভ্রষ্ট করিতে করিতে বর্ত্তমান কাছাড় [illegible] নিকটস্থ স্থানে বাস করিতে [illegible] কোচরাজা প্রবল [illegible] শতাব্দীর পূর্ব্বে আহোমরা তাহা হস্তগত করিতে পারেন নাই। যেমন "কুবাচ" হইতে কোচ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, সেরূপ কাচার (কু আচারী) হইতে কাচারী বা কাছাড়ী শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। জয়ন্তিয়ার রাজার ন্যায় কাছাড়ের রাজাও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহা একটু অনুসন্ধান করিলেই বুঝা যায়। তাৎকালিক উদার হিন্দুধর্ম্মের নীতিবলে ইহাদের সকলেই কেহ শিববংশ, কেহ ভীম, কেহ বা অর্জ্জুনের বংশ-

রূপে পরিচিত হইয়া উচ্চাসন লাভ করিয়া স্বীয় কার্য্যগুণে ধন্য হইয়া গিয়াছেন।

এই কোচ জাতির স্থান আসামে কেওট জাতির নিম্নে। কিন্তু ইহাদের জল আচরণীয়। গোয়ালপাড়া জেলার রাজবংশীয় লোকদের জলও সে জেলায় আচরণীয়। রাজা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের বংশধর বলিয়া রাজবংশীয় নাম হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা করিয়া যাহারা উপবীতধারী ক্ষত্রিয়রূপে পরিচিত হইতেছেন, ব্রাহ্মণগণ আচারভ্রষ্ট বলিয়া তাহাদের জল গ্রহণ করেন [illegible] পাইয়াছি। গোয়ালপাড়া [illegible] লোকদের অন্ততঃ কেহ কেহ [illegible] জাতি হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। এবং কোচরাজবংশীয় বিজনীর রাজার বংশীয় লোকের সঙ্গে বিবাহাদি সম্পর্ক আধুনিক বলিয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহাতে শ্রেষ্ঠত্ব ও অশ্রেষ্ঠত্ব উভয়ই প্রতিপাদিত হয়। যতদূর অনুমান হয়, পরবর্ত্তীকালে যাহারা হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে, তাহারা ও তাহাদের বংশধরগণ রাজবংশী (রাজার অর্থাৎ কোচ রাজার বংশী) বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। যুক্তিবলে অন্য কথা প্রমাণ করিবার শক্তি থাকিলেও, যাঁহাদের আসামের সমস্ত জাতির সম্বন্ধে জ্ঞান আছে ও আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সাধারণ রাজবংশী লোকদের মুখাবয়ব ও পোষাক পরিচ্ছদাদি (বিশেষতঃ মেয়েদের) দেখিলেই ইহা প্রমাণিত হইবে। গোয়ালপাড়া জিলায় "মদাহী" বলিয়া এক শ্রেণীর লোক আছে। ইহারা প্রায় মেচ জাতীয় লোকের ন্যায়। মেচেরা যেমন মুরগী, মদ্, শূকরাদি ভক্ষণ করে, ইহারাও সেরূপ এই সমস্ত দ্রব্য পানাহার করিয়া থাকে। তবে পার্থক্য এই যে, ইহারা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার ও দেশীয় ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। মেচরা নিজ ভাষাতেই নিজেদের মধ্যে ও অন্যদের সঙ্গেও অনেকস্থানে কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। অনুমান হয় ও অনেকে বলে, এই মেচ হইতে "মদাহী" জাতির উৎপত্তি। মদাহী জাতীয় লোকরা অর্থব্যয়ে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুচী হইয়া গোঁসাই ও ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিলেই রাজবংশী হইতে পারে। তাহা বর্ত্তমানেও বিরল নহে। কামরূপে কাচারী জাতি হইতে অনেকে হিন্দুধর্ম্মে গোসাইর শরণ লইয়া শরণীয়া হইয়া থাকে। ইহা সকলেই জানেন। শরণীয়াদের বংশধরগণই ক্রমোন্নতির ফলে পরে কোচরূপে পরিণত হইয়া যায়। হিন্দুধর্ম্মের প্রাচীন উদার ভাবের দৃষ্টান্ত এখনও আসামে দৃষ্টি-গোচর হয়। এই নীতির বলেই বহু অনার্য্য-জাতি হিন্দুজাতির অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া শূদ্রজাতি-ভুক্ত হইয়াছে। তাহা সর্ব্বজন-বিদিত। বর্ত্তমানে হিন্দুধর্ম্মের সেই উদার ভাবের অভাব হওয়াতে ও তাৎকালিক মহাত্মাদের ন্যায় কোন শক্তিশালী পুরুষের আবির্ভাব না হওয়ায়, সমাজের সঙ্কীর্ণতা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সমাজ ক্রমে বিশৃঙ্খল ভাব ধারণ করিয়া নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। চুটীয়া ও আহোম জাতীয় লোকেরা বহুপূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মা-বলম্বী হইয়াছিল। তাহারাও বিশিষ্ট হিন্দু আচরণাবলম্বী। কিন্তু তাহাদের জল ব্রাহ্মণাদি বর্ণের আচরণীয় নহে। বড়ুয়া প্রভৃতি উপাধী দেখিয়া বঙ্গদেশীয় অনেক বড়ুয়া প্রভৃতি আখ্যাধারী মাত্রকেই জলাচর-ণীয় জাতি মনে করেন। কিন্তু তাহা নহে। বড়ুয়া বঙ্গদেশীয় চৌধুরী ইত্যাদি আখ্যার ন্যায় একটী আখ্যা মাত্র, জাতি নহে। জল

আচরণীয় আসামী জাতি সমূহের নাম পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। তাহারা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কলিতা, কেওট ও কোচ এবং স্থান বিশেষে রাজবংশী। একটী কথা এখানে উল্লেখ-যোগ্য। আজকাল আসামে অনেকেই "দত্ত" ইত্যাদি বঙ্গদেশীয় উত্তম জাতিবাচক উপাধি নিজ নামে যোগ করিতেছেন। ইহার সঙ্গে অনেক সময়েই জাতির সম্পর্ক নাই। জল অনাচরণীয় অনেককেও "দত্ত" আখ্যায় ভূষিত দেখিয়াছি।

উল্লিখিত জাতি ব্যতীত পাৰ্ব্বত্য ও অসভ্য জাতি আসামে বহু আছে। প্রসঙ্গ ক্রমে মেচ ও কাছাড়ি জাতির বিষয়ে কতক আলোচনা করিয়া থাকিলেও সে সমস্তের বিষয়ে এখানে আলোচনার স্থান নাই।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী রায়চৌধুরী।

একটী দলাদলির কথা।

দলাদলি যেন বাঙ্গালী জাতির নৈসর্গিক ধর্ম্ম, অতএব দুষ্পরিহার্য্য। সহর অপেক্ষা পল্লীগ্রামে ইহার পূর্ণ বিকাশ। সম্প্রতি বরিশালের লাখুটিয়া গ্রামোৎপন্ন দলাদলির প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে, পূর্ব্ব বঙ্গের বিশেষতঃ বরিশাল ও ফরিদপুর জেলার অধিকাংশ ব্রাহ্মণ-সমাজ বিলোড়িত। এই তরঙ্গের চোট যেন কোটালীপাড়া ব্রাহ্মণ সমাজের বক্ষে প্রবলতর বেগে আঘাত করিতেছে। এই ভীষণ আঘাতে ব্রাহ্মণগণ ধৈর্য্যচ্যুত ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন, ন্যায় অন্যায় ও গুরু লঘু বিষয়ে বিবেচনা-শক্তি যেন ব্রাহ্মণগণ একেবারে বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছেন। পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমানের বুদ্ধিমত্তা, প্রবীণের গাম্ভীর্য্য, এই তরঙ্গের প্রবল আঘাতে বালুকাময় সেতুর ন্যায় একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে।

লাখুটিয়ার সুরেন্দ্র বাবু প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রাহ্মণ সমাজে পুনঃ প্রবিষ্ট হইয়া যথা-শাস্ত্র মাতৃশ্রাদ্ধাদি নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রায়শ্চিত্ত ও ব্রাহ্মণ সমাজে পুনঃ প্রবেশ যাঁহাদের অনুমোদিত হয় নাই, তাঁহারাই, দলাদলির উদ্ভাবন করিয়া, হিন্দুত্বের পরাকাষ্ঠা দর্শাইয়া, সুরেন বাবুর মাতৃ-শ্রাদ্ধোপলক্ষে যাঁহারা যাইয়া—সিধা ও বিদায় আদি গ্রহণ করিয়াছেন, সামাজিক বা অমানুষিক শাসন দ্বারা তাঁহাদিগকে নির্যাতন করিতে প্রবৃত্ত।

সমাজের নিয়ন্ত্রীবর্গের কোপ-কলুষিত কুটিল ভ্রূভঙ্গী দর্শনে কতিপয় আদর্শ হিন্দু মস্তক মুণ্ডন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করতঃ বিধর্ম্মি-সংশ্রব-জনিত পাপস্খালন করিয়া সামাজিক দণ্ড হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু গৃহীত অর্থ সুরেন বাবুকে প্রত্যর্পণ করা যুক্তিযুক্ত বোধ করেন নাই। কারণ, ইহা যে অর্থ! কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মস্তক মুণ্ডন ও প্রায়শ্চিত্ত করাটা নিতান্ত কাপুরুষতার কার্য্য মনে করিয়া সমাজের কয়েকজন প্রধান লোকের পাদপদ্মে অর্ঘ্যাঞ্জলি প্রদান করিয়া "মাভৈঃ" বর লাভ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে জলপান করাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। এই ঘটনায় দলাদলির বিধাতাপুরুষগণের ধমনীতে উষ্ণ-শোণিত প্রবাহিত হইল। বিদ্বেষের মর্ম্মুর দহনে তাহাদের হৃদয় দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। বিদ্বেষের হেতু, হিন্দু ধর্ম্মের লোপ নহে, গূঢ়তম স্বার্থের মূলে ভীষণ কুঠারাঘাতই উহার

কারণ। এই দলাদলি এক্ষণে গৃহবিচ্ছেদ ও আত্মীয়তা নাশের অনিবার্য্য কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, স্নেহ, মমতা ও সৌজন্য-কুসুমের শোষণকারী নিদাঘের প্রতপ্ত সমীরণের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, মদ্য না হইলেও উহার মাদক-শক্তি প্রত্যেকের প্রতি আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, গুরুগণের শিষ্যবাড়ী যাইবার পন্থা পিচ্ছিল হইল। পুরোহিত ও যজমানের প্রণয়-বন্ধন ছিন্ন হইল। অবগুণ্ঠনবতী পিত্রালয় গমনাভিলাষিণী বালিকা বধূর গণ্ডস্থলপ্লাবী অশ্রু-প্রবাহ অবিরল ধারে বহিতে লাগিল। তথাপি দলাদলি জয়াভিলাষী বৃদ্ধ শ্বশুরবর্গের হৃদয় বিচলিত হইল না—তাঁহারা বজ্রাদপি কঠোর হইলেন। মাতামহ-বৎসল বালকেরা ভিন্ন দলভুক্ত পিতার অন্ন গ্রহণেও নিষিদ্ধ হইল। বৈশাখের মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড তাপদগ্ধ, ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর, নিরীহ দরিদ্র ভাগিনেয়ও পণ্ডিতাগ্রগণ্য ধনবান মাতুল গৃহে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইল না, অবশেষে অগত্যা মস্তক মুণ্ডন করতঃ প্রায়শ্চিত্ত বিধানে মাতুলের অনুগ্রহ লাভ করিল। ভাগিনেয়ের অপরাধ, সে নাকি সুরেন বাবুর বাড়ী বিদায়-প্রাপ্ত কোনও পণ্ডিতের বাড়ী জলপানকারীর পুরোহিতের বাড়ীতে পৌরোহিত্য করিয়াছিল। দম্ভের কথা পড়িয়াছিলাম "প্রবোধচন্দ্রোদয়"নাটকে—প্রত্যক্ষ করিলাম,কোটালীপাড়ার কোন পল্লীগ্রামে।

যখন কোন লোক ধর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন করিয়া পাপের চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া সমাজের উপর পৈশাচিক লীলার অবতারণা করে, এবং স্বকর্ম্ম দ্বারা সমাজকে মনুষ্য-বাসের অযোগ্য পশু-নিষেবিত অরণ্যের ন্যায় করিয়া তুলে এবং নানাবিধ কুকার্য্যের অনুষ্ঠানে সমাজে কলঙ্ক-কালিমা প্রলিপ্ত করে, রাজশাসন যেখানে অনধিকারী, তথায় তাহার শাসনের জন্য সামাজিক দণ্ডের আবশ্যক, নতুবা মনুষ্য-সমাজ আর পশু-সমাজে কোন প্রভেদ থাকে না। সমাজের সংশোধন করিয়া তাহার অভ্যুদয় সাধন করাই যাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাঁহারাই সমাজের প্রকৃত বন্ধু ও নিয়ন্ত্রীপদের উপযুক্ত। তাঁহাদের সমাজহিতৈষণার আবরণ ভেদ করিয়া স্বার্থপরতার পূতিগন্ধ বহির্গত হয় না, কিম্বা তাঁহাদের কার্য্যকলাপেও সঙ্কীর্ণভাব কোন সংশ্রব থাকে না। যাঁহারা ক্ষুদ্রতম স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সমাজের গ্লানি ও অকল্যাণকর নানাবিধ কুকার্য্যে প্রশ্রয় দিয়া সমাজের অধঃপতন ঘটাইয়া থাকেন, এবং অণুমাত্র স্বার্থহানি হইলেও যাঁহারা পদ-দলিত ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া নানা প্রকার অসদুপায়ে স্বার্থনাশকের প্রতি হিংসাপরায়ণ হইয়া উঠেন, তাঁহারা সমাজের বন্ধু না শত্রু? তাঁহাদের চরিত্রহীনতায় সমাজ দিন দিন নারকীয় আকার ধারণ করিতে চলিল, পরস্পর দ্বেষাদ্বেষি, মামলা মোকদ্দমা, প্রবঞ্চনা, সত্যের অপলাপ, ও চরিত্রের অপবিত্রতা প্রভৃতি দ্বারা সমাজ যে পাপের প্রবল প্রবাহে ভাসিয়া চলিল! এই সকল অপকার্য্যের প্রতিকারের জন্য দলাদলির বিধাতাপুরুষগণ যদি মনোনিবেশ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মস্তিষ্কের অপব্যবহার হইত না। সমাজের কত নিরাশ্রয় লোক নিরশনে বা অদ্ধাশনে দিনপাত করে, কত নিঃসহায় লোক চিকিৎসার অভাবে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, অভিভাবকের অর্থাভাব বশতঃ কত বালক শিক্ষালাভে বঞ্চিত হইতেছে, এবং সৎশিক্ষার অভাবে কত নরনারী অধঃপতিত হইতেছে, সমাজের নায়কগণের এই সব বিষয়ে দৃষ্টিহীনতা কি প্রকৃত অমঙ্গলকর নয়?

ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইলেই সমাজের অধঃপতন ঘটে। অধঃপতিত সমাজের অস্তিত্ব অপরের উপহাসাস্পদ ও ঘৃণাস্পদ হইবার জন্য। অধঃপতিত সমাজ সর্ব্বদাই লোকের ন্যায় ঢলিয়া পড়ে, আর উঠিতে পারে না, এবং উহার সঞ্জীবনীশক্তি ক্রমশঃ কাল-নিদ্রায় নিদ্রিত হয়, আর জাগিতে পারে না। জীবন্মৃত সমাজে সঞ্জীবনীশক্তির পুনঃ সঞ্চার করাই প্রকৃত সমাজহিতৈষিতার কার্য্য, দলাদলি সমাজ সংস্কারের উপায় নহে, বরং উহাতে সমাজের প্রভূত অকল্যাণ ঘটিয়া থাকে।

জীবন্মৃত সমাজে সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার করিতে হইলে প্রথমে ধর্ম্মের বন্ধন দৃঢ় করা আবশ্যক। ধর্ম্মের ক্ষয় হইলে, সমাজ, দিন দিন স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার কেলি-নিকেতন হইয়া উঠে। ঈদৃশ পতিত সমাজের তর্জ্জন গর্জ্জন কাটামুণ্ডের ভ্রূকুটীর মত নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হয়। ধর্ম্মক্ষয়ে সমাজের পরম অকল্যাণের আশঙ্কা করিয়াই মহাত্মা অর্জ্জুন ভগবান বাসুদেবকে কম্পিত হৃদয়ে ও শুষ্কমুখে বলিয়াছিলেন—

"ধর্ম্মেনষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত।
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ॥

(গীতা ১ম অঃ, ৩৯-৪০)

ধর্ম্মের ভিত্তি আচারের উপর অবস্থিত, শাস্ত্রোক্ত কর্ত্তব্যই আচারের নামান্তর, সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়া পরম জ্ঞানলাভ করিলেও আচারহীন ব্যক্তির উহা পরকালে কোন শুভাবহ হয় না। জাতপক্ষ বিহঙ্গ যেমন কুলায় পরিত্যাগ করিয়া যায়, সেইরূপ শ্রুতিজ্ঞানও মৃত্যু কালে ছাড়িয়া পলায়, অর্থাৎ সঙ্গের সঙ্গী হইয়া পরকালের শুভ বিধান করে না।

"আচারহীনং ন পনন্তি বেদাঃ।
যদ্যপ্যধীতাঃ সহ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ।
ছন্দাংস্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি,
নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ॥

আচারহীন হইলে ধর্ম্মানুরক্তি দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া শেষে বিলোপ প্রাপ্ত হয়, ধর্ম্মানুরাগ না থাকিলে, প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশের অবসর থাকে না। আচার কেবল জাতিভেদমূলক সংস্কারের মধ্যে আবদ্ধ নহে, উহাতে চাই অনেক, প্রকৃত বীরত্ব বা মনুষ্যত্ব না থাকিলে আচার রক্ষা করা যায় না, আচার রক্ষাই কর্ম্মীর কর্ম্ম, যোগীর যোগ, ও ত্যাগীর ত্যাগ, উহা হইতে বৈরাগীর বৈরাগ্য ও ভক্তের ভক্তি এবং ভাবুকের ভাবপরতার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে।

"শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জমমেবচ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজং॥

(গীতা ১৮ অঃ ৪২)

"অধ্যাপন মধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ং॥

(মনু ১ম অঃ, ৮৮)

ধর্ম্মহীন সমাজের অস্তিত্ব কেবল পাপ-বিস্তৃতির জন্য, ও পরস্পর দ্বেষ হিংসা প্রভৃতির প্রবল তাপে পুড়িয়া মরিবার জন্য, এবং পরের উপহাস ও অবজ্ঞা সে সমাজের কণ্ঠাভরণ হইয়া দাঁড়ায়।

শ্রীঅনঙ্গমোহন কাব্যতীর্থ।

স্বর্গীয় রসিকলাল রায়।

জীবনের প্রভাতে আমরা এক নন্দন কানন রচনা করিয়াছিলাম। সৎসঙ্গে যদি স্বর্গবাসের ফললাভ হয়, তবে সে ফল আমরা লাভ করিয়াছিলাম। দীন হই, হীন হই, লোক-লোচনের অন্তরালে পল্লী-কুটীরেই বাস করি, বান্ধব-সম্পদে আমরা মহা সৌভাগ্যশালী হইয়াছিলাম। কানাইপুরের মধ্য-বঙ্গ-বিদ্যালয় আশ্রয় করিয়া এই জীবন-উদ্যানে প্রস্ফুটিত হইয়াছিলেন—প্যারী, শুকদেব, যতীন্দ্র, ক্ষীরোদ, শরৎ, কুমুদ, অন্নদা, অশ্বিনী, রসিকলাল প্রভৃতি মহাত্মাগণ! আর অন্য দিক হইতে যুটিয়াছিলেন, যদু, বিধু, পুলিন, যোগেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ, প্রভৃতি যৌগিকস্থ সুহৃৎচয়। এমন দিন গিয়াছে, যেদিন প্রণয়-লীলার প্রতিযোগী-রূপে যদু ও রসিক এবং স্নেহাকর্ষণের প্রতি-দ্বন্দ্বী স্বরূপে শরৎ ও কুমুদ এ ক্ষুদ্র হৃদয় তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

তেরশত তিন সালের চৈত্র মাসে প্রথম কপাল ভাঙ্গিল। সর্ব্বলোক লোচনানন্দ বিধু সুধাকর অস্তগত হইলেন। তাঁহার চিন্তা-বহ্নি নির্ব্বাণ হইতে না হইতে, গৃহলক্ষ্মী তের শত চারি সালের ১লা বৈশাখ তারিখে, অভাগারে ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন করিয়া, চলিয়া গেলেন। আমি ও রসিক এক সরসীর পদ্মিনী যুগল তুলিয়া আনিয়া সযত্নে হৃদয়ে পরিয়াছিলাম। মহা মিলনের পবিত্র ত্রিদিবে আমরা—দম্পতি-যুগল কি সুন্দর প্রেমাভিনয় করিতেছিলাম। ঐ দিন তাহার শেষ হইল। বিধু ও কাদম্বিনীর জন্য অবিরল যে অশ্রু ঝরিতেছিল, তাহা শুকাইতে না শুকাইতে ঐ সনের ভাদ্র মাসে কুমুদানুজ অন্নদাকুমার, পুণ্যলোকে প্রস্থান করিলেন। কুমুদের সৌন্দর্য্যময় জীবনে বিষাদের স্থির ছায়া পতিত হইল। তার পর ক্রমে ক্রমে প্যারী, যতীন্দ্র, ক্ষীরোদ আমাদিগকে পরি-ত্যাগ করিলেন। পুলিন পঙ্গু এবং যদুনাথ উন্মত্ত হইলেন। তখন অবশিষ্ট শুকদেব, শরৎ, কুমুদ, অশ্বিনী, রসিকলাল, যোগেন্দ্র-নাথ, উপেন্দ্রনাথ এবং পঙ্গু পুলিনকে লইয়া জীবন-সংগ্রামে আমরা এক ক্ষুদ্র ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বর্ষ মধ্যে কালের করালাস্ত্রে সে ব্যূহও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল! গত অগ্রহায়ণ মাসে শরৎকুমার, এবং শ্রাবণ মাসে রসিকলাল ব্যূহ-মুখ হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। এই দুই প্রধান বন্ধুর তিরোধানে আমরা এখন হতাশ, ভীত, ম্রিয়মাণ! আর এ সংসারে কাহার মুখ চাহিয়া থাকিব? কাহার বলে বুক বাঁধিয়া অগ্রসর হইব? এখন এপার অপেক্ষা ও পারের আকর্ষণ যে প্রবল হইয়াছে। ও পারে যাঁহারা গিয়াছেন, তাঁহারা আনন্দময়! প্রেম-ঢল-ঢল-নেত্রে সর্ব্বদা আমাদের মুখপানে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছেন। আমরা একবার তাঁহাদের দিকে, আবার এ পারের দিকে চাহিয়া চাহিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছি।

মহাপুরুষেরা এ সংসারে লীলা করিতে আইসেন। লীলা সাঙ্গ হইলে চলিয়া যান। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের পঞ্চ কাণ্ড উজ্জ্বল! শৈশবে, বাল্যে ও কৈশোরে তাঁহার বৃন্দাবন-লীলা! যৌবনের প্রারম্ভে মথুরাকাণ্ড! পূর্ণ যৌবনে

দ্বারকা বিহার! প্রৌঢ়ে ভারতের রাজনৈতিক গগনে পূর্ণ প্রভা বিস্তার ও কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের সারথিরূপে রণাভিনয় এবং বার্দ্ধক্যে প্রবাসে লীলা-সমাপ্তি! আমাদের রসিক লালের জীবনও পঞ্চ অধ্যায়ে বিভক্ত! প্রবেশিকা পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের বালকাণ্ড; বি-এ ক্লাস পর্য্যন্ত দ্বিতীয় কাণ্ড; স্কুল সবইন্স্পেক্টরী ও ওয়ার্ডষ্টেটের বালকদের অভিভাবকতায় তৃতীয় কাণ্ড, গয়া ও ছাপরার স্কুল মাষ্টারীতে চতুর্থ কাণ্ড এবং কলিকাতার শিক্ষকতায় ও সাহিত্য-প্রবন্ধে তাঁহার জীবনের শেষ কাণ্ড পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

আমরা রসিকলালের রাখাল সখা, বাল্য ক্রীড়ার সঙ্গী। তাঁহার বাল্যলীলার সাক্ষ্য দিতেই বাঁচিয়া রহিয়াছি। পরবর্ত্তী মহা-জীবনের মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য যোগ্যতর লেখনী সমূহ প্রস্তুত হইয়া আছে।

শ্রীকৃষ্ণ রাখাল হইয়াও রাখাল-রাজ! আমাদের রসিকলাল ছাত্র হইয়াও ছাত্রদলের পরিচালক ছিলেন।

আমরা যখন কানাইপুর মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করি, তখন গোপাল ও রসিক ভ্রাতৃযুগল কিছুদিন উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। আমাদের বাড়ী কানাই-পুরের দেড় মাইল পশ্চিমে, রসিকের বাড়ী এক মাইল দক্ষিণে। বেশীদিন কানাইপুরে রসিকের পড়া হয় নাই। গোপালদাদা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে, রসিক ফরিদপুর মাইনর স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন। ফরিদপুর সহর কানাইপুর হইতে ছয় মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

আমরা কানাইপুর বিদ্যালয়ে পাঠ সাঙ্গ করিয়া কুচবিহার জেঙ্কিন্স স্কুলে কিছু দিন পড়িয়াছিলাম। অর্থাভাবে উচ্চ শিক্ষা ভাগ্যে ঘটিল না। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া ১২৯৩ সালে কানাইপুর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকতা গ্রহণ করিলাম। রসিক এ সময়ে মাইনর পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়া ফরিদপুর জেলা স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। তিনি প্রতি শনিবারে বাড়ী আসিতেন। এবং মাঝে মাঝে আমাদের সহিত দেখা করিতেন। এক দিন স্কুলে কাজ করিতেছি, এমন সময়ে এক প্রকাণ্ড ডাকের চিঠি আসিয়া উপস্থিত! খুলিয়া দেখি, রসিকের স্বাক্ষরিত পত্র। স্থায়ি-রূপে বন্ধুত্ব স্থাপনের অভিলাষে পত্র রচনা। সে রচনা-ঝঙ্কার বীণা ঝঙ্কারের ন্যায় অদ্যাপি আমাদের শ্রবণ মনঃ পুলকিত করিতেছে। যদিও আমরা এ সময়ে যদুনাথের ভালবাসায় আকণ্ঠ নিমগ্ন, তথাপি রসিকের স্নেহের প্রতি-দান করিতে প্রস্তুত হইলাম। যথাশক্তি অনু-রূপ প্রত্যুত্তর লিখিলাম। পরবর্ত্তী শনিবারে রসিক আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। সেই দিনই আমাদের গৃহে সমাগত হইয়া দীনালয় ও দীন হৃদয় পবিত্র করিলেন। পর শনিবারে আমিও তাঁহাদের বাড়ীতে গেলাম। প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে বন্ধুত্ব বন্ধনে আমরা আবদ্ধ হইলাম। তখন হইতে তাঁহার মা, আমার মাতা; এবং আমার মা তাঁহার মাতা হই-লেন। এক পাত্রে আহার, এক শয্যায় শয়ন, এক উদ্দেশ্যে ও এক মনে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম। কখনও যদুনাথের গৃহে, কখনও রসিকের গৃহে, কখনও আমাদের গৃহে, তিন জনে মিলিত হইতাম। অন্যান্য আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়াও কখন কখন যোগ দিতেন। এই সময়ে শরৎ ও কুমুদ আমাদের ছাত্ররূপে স্নেহের সাগর উদ্বেল করিয়া তুলিতে-ছিলেন। সে সময়টা আমাদের পরম আনন্দে কাটিয়াছিল। এখন তাহা ভাবিলে পুলকে

...বিষাদে আত্মহারা হইয়া যাই! ঠিক যেন বৃন্দাবনে গোষ্ঠ-লীলা করিতেছিলাম। রসিক ছিলেন, আমাদের কৃষ্ণ-সখা। আমরা যতই অযোগ্য হই, আমাদের চিত্তের সুর, বাল্যকাল হইতে উচ্চ তানে বাঁধা ছিল। আমরা কেহই ধূমপান করিতাম না। আমি ও রসিক "ব্যাণ্ড অব হোপে"র সভ্য হইয়াছিলাম। অসৎ সঙ্গে ও অসৎ প্রসঙ্গে আমাদের কাহারও মতি গতি ছিল না। পরোপকারে সকলের আকাঙ্ক্ষা ছিল। সনাতন ধর্ম্মে আমাদের প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। এই সময়ে শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় ও স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ মহাশয় কয়েক বার ফরিদপুর আসিয়া হিন্দু ধর্ম্মের বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রসিক, বিহারী চক্রবর্ত্তী, বরদা বসু প্রভৃতি এক ছাত্র-সভা করিয়াছিলেন। যদুনাথ, চূড়ামণি মহাশয়ের ও শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন।

এই সময়ে আমাদের উদ্যোগে কানাইপুর স্কুলে "ব্যাণ্ড অব হোপে"র এক সভা হয়। রসিকলাল জলদগম্ভীর স্বরে বক্তৃতা করেন। তাহাতে কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তি আঘাতপ্রাপ্ত ভুজঙ্গবৎ ক্রোধান্ধ হইয়া রসিকের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। বহু কষ্টে তিনি ঐ বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।

অঙ্গীকার পালনে রসিকলাল দৃঢ়ব্রত ছিলেন। একবার কোনও নির্দ্দিষ্ট দিনে টাকা পরিশোধের অঙ্গীকারে এক ব্যক্তির নিকট হইতে আমরা রসিকের জন্য শত মুদ্রা ধার করিয়াছিলাম। বিনা দলিলে টাকা লইয়াছিলাম। সাহস ছিল, স্যাভিংস্ ব্যাঙ্কে তাঁহার যে টাকা গচ্ছিত আছে, তাহা তুলিয়া লইয়া ঐ টাকা পরিশোধ করিবেন। কিন্তু ঐ টাকা একজন মোক্তারের মারফতে গচ্ছিত ছিল। মোক্তার মহাশয় উক্ত নির্দ্দিষ্ট দিন মধ্যে কার্য্যস্থলে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। ঐ দিনে অপরাহ্নে রসিকের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখি, তিনি ও তাঁহার পুণ্যময়ী জননী বন্ধক দিবার উদ্দেশ্যে স্বর্ণ অলঙ্কার গুলি বাহির করিয়াছেন। টাকা সংগ্রহ করিতে রাত্রি হইয়া গেল। ঋণদাতা নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া ঋণ পরিশোধ করা হইল।

পূজার বন্ধে ও গ্রীষ্মাবকাশে আমরা এরূপ ভাবে মিলিয়া থাকিতাম যে, হয় আমাদের বাড়ীতে, না হয় রসিকের বাড়ীতে উভয়ে অবস্থান করিতাম। আত্মীয় বাড়ীতে বেড়াইতে আমাদের বড়ই আগ্রহ ছিল। একবার জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্নে আমরা এক বৃহৎ প্রান্তর মধ্যে ভীষণ ঝটিকাবর্ত্তে পড়িয়াছিলাম। তখন উভয়ে গলা ধরাধরি করিয়া চলিলাম। এবং মিলিতস্বরে কণ্ঠে গীতার একাদশ অধ্যায় পাঠ করিতে লাগিলাম। প্রথমে আমরা জীবন ভয়ে অভিভূত হইয়াছিলাম। কিন্তু পরক্ষণে বিশ্বরূপের মহিমায় তন্ময় হইয়া হৃদয়ে অতুলানন্দ লাভ করিতে লাগিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে নিকটবর্ত্তী গ্রামে উপস্থিত হইয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হইলাম।

স্মৃতির মন্দিরে কত কথা জাগিতেছে। কোন্‌টী বলিব? প্রেমময় জীবনের সকলই সুন্দর! সকলই মধুর!

কানাইপুরের জমিদার বাবুদের বাড়ীতে দুর্গা পূজা হয়। একবার অষ্টমী পূজার রাত্রিতে আমরা কতিপয় বন্ধু যতীন্দ্রমোহনের আহ্বানে তথায় সমবেত হইলাম। অপূর্ব্ব বৃহৎ বাটী! পূর্ব্ববঙ্গে এই ইষ্টকালয় অতি বিখ্যাত! কত কালের পুরাতন ভবন; তথাপি নূতনের মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে,

চণ্ডীমণ্ডপ অতি মনোহর! তাহার গঠন দেবালয়ের গৌরবপূর্ণ ও তাহার শিল্পনৈপুণ্য দর্শকের চিত্তহর! পূজার দিনে, মায়ের শোভায়, আলোকমালায় ও অন্যান্য সজ্জায় মণ্ডপখানি নিরুপম শ্রী ধারণ করিয়াছে! আরতি সমাপ্ত হইলে, আমি, পুলিন, রসিক প্রভৃতি যতীন্দ্রমোহনের দ্বিতল বৈঠকখানায় গিয়া উপবিষ্ট হইলাম। খোস গল্পের ও রঙ্গ-কৌতুকের সভা বসিল। সভাপতি হইলেন, বয়োজ্যেষ্ঠ পুলিনচন্দ্র! ক্ষণেক পরে রসিক কোনও প্রয়োজনে নীচে নামিয়া আসিলেন। আমরাও তাহার কিঞ্চিৎ পরে নীচে আসিয়া মণ্ডপের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, মণ্ডপের মধ্য বারান্দার বাম ভাগে পুরোহিত-দ্বয় শয়ন করিয়া আছেন। দক্ষিণ দিকে একটী ভৃত্য বসিয়া প্রহরীর কাজ করিতেছে। মায়ের ঠিক সম্মুখে বালক কুমুদ যোড়াসনে বসিয়া মায়ের প্রতি এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। রসিক তাহার ঠিক পশ্চাতে নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ দৃশ্য দেখিতেছেন। আমরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মণ্ডপ মধ্যে প্রবেশ করিতেই, রসিক আমাদের নিকটে আসিয়া বলিলেন—"চুপ চুপ! শান্তি ভঙ্গ করিও না। এই বালক···কুলের প্রহ্লাদ হইবে। তুমি এই পিতৃহীন বালকের শিক্ষাদানে ও চরিত্র গঠনে বিশেষ মনোযোগ করিবে।" আমরা যথাসাধ্য বন্ধুবাক্য পালনে যত্ন করিয়াছি। কুমুদ সংসারাবর্ত্তে পড়িয়া যন্ত্রণা পাইতেছেন। প্রহ্লাদের ন্যায় যোগসিদ্ধি লাভ করিতে পারুন আর নাই পারুন, শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নিত্য শিব শক্তির আরাধনা দ্বারা চিত্তবল রক্ষা ও শান্তি ভোগ করিতেছেন। বন্ধুর ভবিষ্য বাণী সফল হইয়াছে।

আমরা উভয়ে চন্দনীর মিত্র বংশে বিবাহ করিয়াছিলাম। এবং একযোগে তিনবার শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলাম। তন্মধ্যে আমাদের একবার অভিলাষ হইল যে, আমরা বঙ্গীয় রাজ-কুলতিলক সীতারাম রায়ের পুণ্যকীর্ত্তি সকল দর্শন করিব। তদনুসারে চন্দনীর কয়েকটী বন্ধুসহ, আমরা মহম্মদপুরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেখানে যাইয়াই রসিকের জ্বর হইয়া পড়িল। তাঁহাকে পাল্কীতে পাঠাইয়া দিয়া, আমরা পশ্চাৎ পদব্রজে চন্দনী ফিরিয়া আসিলাম। আমাদের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া রসিক বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন। এবং নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর! বলিয়া বারম্বার আমাদিগকে তিরস্কার করিয়াছিলেন।

রসিকের প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই তাঁহার সহিত আমাদের মতের ঐক্য ছিল। কেবল একটী বিষয়ে মত মিলিত না। মন্দ চরিত্রের বালক ও যুবকগণের সহিত মিশিয়া আমরা তাহাদের চরিত্র সংশোধনে চেষ্টা করিতাম। অনেক স্থলে কৃতকার্য্য হইতাম। কিন্তু রসিক দুষ্ট-সংস্পর্শ একবারেই পছন্দ করিতেন না।

রসিক আদর্শ জনক জননীর সন্তান। তদীয় পিতৃ দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। তাঁহার জননী যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনই স্নেহবতী ছিলেন। একবার জ্যৈষ্ঠ মাসে রসিকের শ্যালকেরা আসিলে একটী ইলিশ মৎস্য আনীত হইয়াছিল। আমাদের নিমন্ত্রণ চিঠি "মাঠে মারা" গিয়াছিল। দুই দিন পরে আমরা তাঁহাদের বাড়ীতে গেলাম। ভোজন কালে অন্যান্য উপকরণের সহিত দুই খণ্ড ভর্জ্জিত ইলিশ মৎস্য দেখিয়া সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হইলাম। রসিক জিজ্ঞাসিলেন "মা! আজ এ মাছ কোথায় পাওয়া গেল?"

মা বলিলেন "কৈলাসের জন্য রাখিয়া দিয়াছিলাম।" বিষয় ক্ষুদ্র! কিন্তু ইহাতেই মায়ের অন্তঃকরণের বিশালতা ও স্নেহের গভীরতা অনুভব করিয়া আমরা কিয়ৎকাল বাক্‌শক্তিরহিত হইয়াছিলাম। আমরা যতবার রসিকের বাড়ীতে গিয়াছি, এইরূপ ব্যবহার পাইয়াছি। রসিক আমাদের বন্ধু ছিলেন, কি সহোদর ছিলেন, কিম্বা তদপেক্ষাও অন্তরঙ্গ অন্য কেহ ছিলেন, অনেক সময়ে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আমাদের ভাগ্য বৈগুণ্যে বহুদিন পূর্ব্বে স্নেহ-মন্দাকিনী শুকাইয়া গিয়াছে। প্রেমের ক্ষীর-সিন্ধুও আজ শুষ্ক হইল।

১২৯৭ সালে আমরা কানাইপুর পরিত্যাগ করিয়া প্রবাসী হইলাম। রসিক ইহার পর বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করিয়া কলিকাতা রিপণ কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। তদবধি বাল্যখেলা ফুরাইল! শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলা সমাপ্ত করিয়া মহাজীবনের প্রথম সোপানে পদক্ষেপণ করিলেন। রসিক কলিকাতা যাইয়া নব্যভারত-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ও রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম এ, এই দুই মহাপুরুষের স্নেহভাজন হইলেন। ঈশান বাবু রসিকের আত্মীয়। দেবী বাবু "বসুধৈব কুটুম্বকম্।" এই সময় হইতে ধর্ম্মে কর্ম্মে, শিক্ষায় সামাজিকতায়, সকল বিষয়েই রসিকের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল! আর আমরা তাঁহাকে ধরিতে পারিলাম না। ক্ষমতায় কুলাইল না। আমরা শ্রীদাম সুদাম সুবলাদি পরিত্যক্ত হইলাম। ভীমার্জ্জুন অক্রূর উদ্ধব তাঁহার বন্ধু যুটিলেন; ব্যাস ভীষ্ম বিদুরাদি প্রাজ্ঞগণ তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইলেন। শুধু আমরা বর্জ্জিত হইলাম না। ক্রমশঃ সাধের জন্মভূমি—বৃন্দাবন পর্য্যন্ত তিনি বিস্মৃত হইতে লাগিলেন। স্বদেশের ম্যালেরিয়ায় তাঁহার একটা আতঙ্ক ও পল্লীগ্রামের প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিয়া উঠিল। আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার মনের গতি ফিরাইতে পারিলাম না।

আমরা রসিক-জীবনের আদিকাণ্ডের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম। কলিকাতায় তাঁহার প্রকৃত জীবনারম্ভ। কালেজ-জীবনের প্রথম বৎসরেই, স্বদেশের ও মাতৃভাষার সেবার জন্য দেবীবাবুর নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সুহৃদ্ সভার বহু কার্য্যে—দুর্ভিক্ষে, কলেরায় দেবীবাবুর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার পড়ার ক্ষতি হইতে লাগিল। এফ-এ পরীক্ষায় বৃত্তি পাইলেন না। বি-এ পাস করিতেই পারিলেন না।

রসিকের পরবর্ত্তী জীবন উত্তম তুলিতে চিত্রিত হইবে বলিয়া আমরা সেদিকে অধিক অগ্রসর হইব না। আমাদের সহিত সংস্রব সংক্রান্ত দুই একটী কথা বলিব মাত্র।

তেরশত সালের বৈশাখ মাসে আমাদের গৃহদাহ হয়। রসিক জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতা হইতে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া আমাদের কষ্টের ও পরিশ্রমের সঙ্গী হয়েন। তাঁহার শরীর সুস্থ ছিল না। তিনি পাঁচড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। পড়ার ক্ষতি স্বীকার করিয়া এবং সামান্য আহার্য্যে তৃপ্ত হইয়া জ্যৈষ্ঠ মাসটী আমাদের নব নির্ম্মিত ক্ষুদ্র কুটীরে কাটাইয়া ছিলেন। তেরশত চারি সালে আমরা গৃহশূন্য হইলে এক বৎসর পরে রসিক বাড়ী আসিয়া স্বয়ং পাত্রী দেখিয়া আমাদিগকে পুনর্ব্বার গৃহস্থ করেন। তখন বুঝিতে পারি নাই, যিনি আমাদিগকে সংসারী করিলেন, তিনি গৃহশূন্য হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন।

রসিকের বন্ধুতার বলে আমরাও দেবী বাবু ও ঈশান বাবুর কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।

রসিক একে একে প্রেমময়ী পত্নী, স্নেহময়ী জননী, ও হিতৈষিণী ভ্রাতৃবধূকে পশ্চিমাঞ্চলে বিসর্জ্জন দিয়া একমাত্র বংশদুলাল সুধীন্দ্রকে লইয়া পুনর্ব্বার কলিকাতায় আগমন করেন। এবং সংস্কৃত কলেজাধীন স্কুলে শিক্ষকতায় প্রবৃত্ত হয়েন। এই সময় হইতে সাহিত্য সেবায় ও পুত্রের শিক্ষা বিধানে বিশেষ রূপে মনঃসংযোগ করেন। শ্রীমান্ এবার সুখ্যাতির সহিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে এম-এ ক্লাসে অধ্যয়ন করিতেছেন।

রসিক ৬০নং অখিলমিস্ত্রীর লেনে পুত্রসহ অবস্থান করিতেন। আমরা কয়েক বার তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিয়াছি, চারিদিকে পুস্তক ও কাগজের রাশি, তিনি মাঝখানে বসিয়া প্রবন্ধ লিখিতেছেন। আমাদিগকে পাইলে তাঁহার সকল কাজ বন্ধ হইয়া যাইত। তিনি অত্যন্ত চা-প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রতিদিন অন্ততঃ দুইবার চা-পান না করিলে অসুস্থতা অনুভব করিতেন। আমরা বলিতাম, "এই চায়ে তোমার সর্ব্বনাশ করিবে।" তিনি সে কথা উড়াইয়া দিতেন। আতিথেয়তা রসিকের বংশগত গুণ। তাঁহার আয় অল্প ছিল। অথচ স্বদেশের বা বিদেশের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধব তাঁহার আবাসে উপস্থিত হইলে, তিনি যত্ন করিয়া খাওয়াইতেন। যাঁহারা দেখা করিয়াই চলিয়া আসিতেন, তাঁহাদিগকেও মিষ্টমুখ না করাইয়া ছাড়িয়া দিতেন না।

তাঁহার সহিত বেড়াইতে বাহির হইলে আমরা প্রমাদে পড়িয়া যাইতাম। তাঁহার অনেক বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তি আসিয়া সম্মুখে পড়িতেন। তাঁহাদের সহিত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আলাপ না করিয়া তিনি যাইবেন কিরূপে? বোধ হইত যেন, কলিকাতা সহর তাঁহার বন্ধুময়।

শিষ্টাচারে ও আলাপ ব্যবহারে রসিক বড়ই সাবধান হইয়াছিলেন। তিনি চিরবিনয়ী। কিন্তু তোষামোদে অভ্যস্ত ছিলেন না। দরিদ্র হইলেও আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্ন করিতেন।

বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি জন্মভূমি দর্শন করিবেন বলিয়া আমাদিগকে আশ্বাস দিয়াছিলেন। কিন্তু জানি না কি জন্য হঠাৎ পাটনা অঞ্চলে চলিয়া গেলেন। তথা হইতে জ্বর লইয়া কলিকাতা ফিরিলেন। ঐ জ্বরেই তাঁহার জীবন হরণ করিল। সুধীন্দ্র চন্দননগরে মামার বাড়ীতে ছিলেন। হঠাৎ তার পাইয়া কলিকাতা উপস্থিত হইলেন। আমরা এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া, কলিকাতা যাইয়া দেখিলাম—রসিক দেবী বাবুর আনন্দ-আশ্রমের দ্বিতলে সাদরে রক্ষিত হইয়াছেন। রসিককে দেবী বাবু কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন। দেবী বাবুর পুত্র কন্যা তাঁহাকে 'কাকা' বলিয়া ডাকিতেন। আমরা যখন রসিককে দেখিতে গেলাম, তখন দেবী বাবুর বিপদের উপর বিপদ! তাঁহার এক মাত্র পৌত্র টাইফয়েড্ জ্বরে আক্রান্ত! সহোদরা বিদেশে মরণাপন্না! চির-স্নেহের বন্ধু রসিকলাল কাল-শয্যায়। আমরা যাইয়া দেখিলাম, রসিকের চিরফুল্ল মুখজ্যোতিঃ ম্লান! চক্ষুঃ নীলপ্রভ! শরীর রক্তহীন! দেবী বাবুর বন্দোবস্তে চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কিছু মাত্র ত্রুটী নাই। সুধীন্দ্র আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পিতৃসেবা করিতেছেন। আমাদিগকে

দেখিয়া মুমূর্ষুর বাক্‌শক্তি সবল হইল। কত কথাই বলিলেন। অধিক কথা বলা চিকিৎসকের নিষেধ ছিল। কিন্তু প্রাণের আবেগ সে নিষেধ মানিল না। পথ্য প্রস্তুত হইলে, দেবী বাবু স্বয়ং আসিয়া স্বহস্তে তাহা খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। মধুর বাক্যে কত আশ্বাস দিতে লাগিলেন। বিপত্নীক-দ্বয়ের প্রাণে প্রাণে মহাযোগ ঘটিয়াছিল। কার্য্যকলাপ দেখিয়া নয়ন চরিতার্থ হইল!

ঈশান বাবুও বিপত্নীক! তিনিও নিত্য আসিয়া তত্ত্বাবধান করিতেন। তিন বিপত্নীকে মহা মিলন সংঘটিত হইত!

রসিকের স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রবর্গকে ধন্যবাদ। তাঁহারা সেবা করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। সেবা করিতে না পাইলে ক্ষুণ্ণ হইতেন। মহাত্মা চিকিৎসকগণকে ধন্যবাদ। তাঁহারা বিনা দর্শনীতে যত্ন ও আগ্রহের সহিত রসিকের চিকিৎসা করিয়াছেন।

দেবী বাবুর সহোদরার মৃত্যু সংবাদ আসিল। পৌত্রটী তখনও সুস্থ হয় নাই। এরূপ সংকট কালেও দেবী বাবু রসিকের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়াছেন। রসিকের জীবন সম্বন্ধে তিনি আশান্বিত ছিলেন। রসিক ও খোকা একটু সুস্থ হইলেই বৈদ্যনাথ লইয়া যাইবেন, আমাদিগকে এইরূপ আশ্বাস দিতে লাগিলেন। আমরা চারিদিন থাকিয়া বাড়ী ফিরিতে বাধ্য হইলাম। চতুর্থ দিনের সন্ধ্যাকালে রসিকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম! তখনও বুঝিতে পারি নাই, সেই সাক্ষাৎ আমাদের ইহ জগতের শেষ সাক্ষাৎ!

আমরা বাড়ী আসার কয়েক দিন পরেই পুণ্যাত্মা পুণ্যধামে চলিয়া গেলেন! দেবী বাবুর আশার প্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। সুধীন্দ্রের একমাত্র আশ্রয়-মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমাদের জীবনের অন্ধকার-নাশক দীপ্ত সূর্য্য অস্তমিত হইলেন।

যাও ভাই! যেখানে পুণ্যশীলা সুশীলা মন্দার-মালা হস্তে করিয়া তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, সেখানে যাও। যাও, আর ভয় নাই! সুধীন্দ্রের জন্য আর তোমার ভাবনা নাই! যে কর্ত্তব্য পালনের জন্য সুশীলা তোমাকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তুমি তাহা সম্পাদন করিয়াছ। তাঁহার পার্শ্বে সগৌরবে উপবেশন করিবার তোমার অধিকার জন্মিয়াছে। আর তোমায় কে বাঁধিয়া রাখিবে? কল্য দুই জনে এক স্থানে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ ছিলাম। অদ্য উভয়ের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান। আমরা পূর্ব্ব স্থানে রহিয়া ধূলি কাদায় গড়াগড়ি যাইতেছি, সংসারের জ্বালা তাপে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছি। অতীন্দ্রিয় দেবতা তুমি, ঊর্দ্ধলোকে বসিয়া আমাদের দুর্গতি দর্শন করিতেছ! ক্ষুদ্র আমরা, বিশ্ববিধাতার বিধানচক্রের কি বুঝিব? বহু শোকে তুমি সান্ত্বনা দিয়াছ! তোমার বিয়োগ ক্লেশ কে নিবারণ করিবে ভাই? এখনও অনুভব করিতে পারিতেছি না যে, তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছ, বা ছাড়িয়া থাকিতে পার! যেখানেই থাক ভাই, এই অরণ্যবাসী ক্ষুদ্রাত্মার প্রতি পূর্ব্ববৎ স্নেহদৃষ্টি রাখিও! বৃদ্ধা মাতা, কুমুদ, শতদল, এখনও আমাদিগকে ধরিয়া রাখিতে চাহেন! কিন্তু তোমাদের আহ্বানে প্রাণ যে আকুল হইয়া উঠিতেছে। আর যে থাকিতে চায় না! হরি! হরি! ইচ্ছাময়! মঙ্গলময়! তোমার ইচ্ছাই মঙ্গল। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক!

শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু।

স্বপ্ন ও সুষুপ্তি।

স্বপ্ন ব্যাপারটী বড়ই জটিল। ইহা সত্য কি মিথ্যা, বাস্তব কি কাল্পনিক, প্রত্যক্ষজ খেয়াল, কিম্বা মানস ধারণা মাত্র—ইহার নির্দ্ধারণ কঠিন। স্বপ্ন ব্যাপারটী আগাগোড়াই রহস্যময়। বেশ স্পষ্ট নহে, আবার অস্পষ্টও নহে। অনুভব করা যায়, অথচ স্বরূপটী ঠিক বোঝাও যায় না। স্বপ্নের দেখা শোনা ভাবা সবই যেন ধোঁয়াটে রকমের। স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ মিথ্যা কল্পনা হউক, তাহার জ্ঞান (স্বপ্নাবগতি) যে সত্য, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কাল আমি অমুক স্থানে গিয়াছিলাম, অমুককে দেখিয়াছিলাম, এই অবগতির প্রত্যক্ষাবগতি তুলনায় কিছুমাত্র পার্থক্য নাই।

স্বপ্ন সত্য ও মিথ্যা, দুইটী উপাদানে গঠিত। স্বপ্ন ব্যাপারটীকে কখন সত্য কখন মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। কখন বা আংশিক সত্য ও মিথ্যা বলিয়াও বোঝা যায়। পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর দর্শনই সাধারণতঃ স্বপ্নে ঘটিতে দেখা যায়। কদাচিৎ অদৃষ্ট বস্তুর দর্শন লাভ ঘটে। সচরাচর জাগরিত অবস্থার চিন্তা স্বপ্নে মূর্ত্তিমতী হইয়া দেখা দেয়। ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষাকারেও অবভাসিত হইয়া থাকে। অপূর্ব্ব কল্পনার খেলা দেখিতে পাওয়া যায়। জাগ্রদবস্থার স্মরণই স্বপ্ন দর্শন। স্মৃতির্হি স্বপ্ন দর্শনং। জাগরণাবস্থায় বিষয়েন্দ্রিয় সম্পর্কিত চিত্ত স্বপ্নে একাই বিষয় দর্শনাদি করিয়া থাকে। স্বপ্ন জাগরণেরই প্রতিচ্ছবি। স্বপ্নাবস্থা জাগরণাবস্থার পৃথক্ সংস্থান মাত্র। জন্মান্তরদৃষ্ট বা জন্মান্তর-পরিচিত বস্তুর দর্শন স্মরণাদি যখন স্বপ্নে হইতে দেখা যায়, তখনই স্বপ্নটী আবছায়ার মত ঠেকে। ভালরূপ নিদ্রা না হওয়ার জন্য কখন কখন নানা প্রকার খামখেয়ালী স্বপ্ন দেখা যায়, তাহা একেবারেই অমূলক। গাঢ় নিদ্রার সময়ে অর্থাৎ সুষুপ্তি কালে স্বপ্রসন্ন চিত্ত কখন কখন অজ্ঞাত অতীত প্রত্যক্ষ করে, অজ্ঞেয় ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারে।

যাঁহারা সত্যসংকল্প সত্যসেবী, যাঁহাদের সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কুচিন্তা অন্তরে স্থান পায় না—তাঁহাদের সুষুপ্তি কালীন স্বপ্ন কখন কখন সত্য হইতে দেখা যায়। আমার পূজনীয় পিতৃদেব যখন পূর্ব্বাঞ্চলে শিয়ালয়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন আমার পিতামহ কাশীধামে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। পিতামহের যে সময়ে মৃত্যু হয়, ঠিক সেই সময়েই পিতৃদেব স্বপ্নে তাহা জানিতে পারিয়া বাটী চলিয়া আসেন। বাটী আসিয়াই টেলিগ্রাম পাইলেন। তাঁহার স্বপ্ন অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গেল। সাধারণ ব্যক্তি দিবসে অতিরিক্ত দৈহিক মানসিক শ্রম করিয়া যখন নিদ্রিত হন, তখন সেই শ্রান্ত উত্তপ্ত মস্তিষ্কে যে নানারূপ স্বপ্ন দেখেন, তাহা প্রায়শই মিথ্যা নিরর্থক। কুচিন্তা দ্বারা যাহাদের মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন, কুকার্য্য দ্বারা যাহাদের চিত্ত কলুষিত, আলস্যাদি তমোভাব দ্বারা সত্ত্বগুণ যাহাদের দূরীভূত, তাহাদের স্বপ্ন প্রায়ই মিথ্যাই হইয়া থাকে। ভালরূপ নিদ্রা না হইলে ইন্দ্রিয় চিত্তে লীন থাকে না, চিত্ত কালুষ্যরহিত হইয়া আত্মায় সংপরিষক্ত থাকে না, কাজেই অর্দ্ধ জাগরণ ও অর্দ্ধ নিদ্রারূপ স্বপ্ন খেয়াল মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। সুষুপ্তিকালে চিত্ত যে অনেকটা বাহ্য সম্পর্ক বিরহিত, কালুষশূন্য সত্ত্বগুণযুক্ত, সম্যক্ সংপ্রসন্ন স্বস্বরূপ প্রত্যগাত্মায় লীন থাকে, তাহা বুঝা যায়। সত্ত্ব

গুণ বৃদ্ধি হইলেই আধ্যাত্মিক শক্তি জন্মে, তখন স্বপ্ন দর্শনের সাধারণতঃ সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু যদি হয়, তবে তাহা সত্যই হইবে।

অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি যদা ন কাস্যবন বেদ, হিতা নাম দ্বাদপ্ততি সহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততমভি প্রতিষ্ঠন্তে তাভিঃ প্রত্যবস্থপ্য পুরীতাত্রী শেতে স যথা * * *

যখন জীব সুষুপ্ত হয়, তখন সে কিছুই জানিতে পারে না। বিশেষ বিজ্ঞানের অভাব বশতঃ স্বাভাবিক জ্ঞান বিলুপ্ত না হইলেও জীবের দর্শন স্মরণাদি শক্তি দেখা যায় না। বাহাত্তর হাজার নাড়ী দেহে বিদ্যমান। হৃদয়-পরিবেষ্টনী সূক্ষ্ম শরীর রূপ পুরীতৎ নাড়ীতে চিত্ত শায়িতবৎ অবস্থিতি করে, এই পুরীতৎ অর্থে হার্দ্দাকাশ বা হার্দ্দব্রহ্ম বুঝিতে হইবে। চিত্ত সুষুপ্তিকালে পর আত্মায় বর্ত্তমান থাকে, নিস্পন্দ ভাবে বিশেষ বিজ্ঞান বিরহিত হইয়া শায়িত থাকে। কখন কখন কর্ম্মানুগ বুদ্ধ্যানুবৃত্তি হেতু সুষুপ্তিকালেও স্বপ্ন দর্শন ঘটে। সম্যক্ সুপ্তিই সুষুপ্তি। প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থার নামই সুষুপ্তি। জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই ত্রিবিধ অবস্থা। সুষুপ্তিকালে স্বপ্ন দর্শন—স্বপ্ন ও সুষুপ্তির মধ্যস্থলেই ঘটে। সুষুপ্তির নাম সংপ্রসাদ ও স্বপিতি। চিত্ত বাহ্য ভাবশূন্য নিষ্কলুষ হার্দ্দব্রহ্ম বা স্বস্বরূপ আত্মায় সংপরিষক্ত, কাজেই সম্যক্ প্রসন্ন। "সম্যক প্রসীদতি যস্মিন স সংপ্রসাদঃ" যে সময়ে চিত্ত সম্যক্ প্রসন্ন থাকে—তাহাই সংপ্রসাদ।

"স্বমাত্মানমপিতো ভবতি সতা সোম্য তদা সংপন্নো ভবতি প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষক্ত পর আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে"। সুষুপ্তি কালে চিত্ত নিজ স্বরূপ আত্মাকে প্রাপ্ত হয়। সেই আত্মার দ্বারা সংপন্ন থাকে। আত্মাদ্বারা সংপরিষক্ত চিত্ত পরমাত্মায় সংপ্রতিষ্ঠিত জানিবে। এই সময়ে বাহ্য জগতের আধিপত্য পার্থিব ভাবের প্রাবল্য সেরূপ থাকে না। এই সময়ে কিছুক্ষণের জন্য হার্দ্দব্রহ্মে অবস্থিতি করিয়াও চিত্ত জানিতে পারে না যে, সে হার্দ্দব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। আবার সুষুপ্তির ভঙ্গে পুনরায় বাহ্য ভাবে আচ্ছন্ন সংস্কার জালে বদ্ধ ইন্দ্রিয়গণ সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। অজানিত ভাবে হার্দ্দব্রহ্মে মেলে বলিয়া প্রকৃত ব্রহ্মানন্দ সুখ জন্মে না, তবে সেই অননুভূত আনন্দ যে ব্রহ্মানন্দেরই অংশ, তাহা নিঃসন্দেহ। এই সুষুপ্তি কালেই চিত্ত যদি একটু কম আত্মলীন থাকে, সত্ত্বগুণময়ী বুদ্ধি যদি সম্পূর্ণ সংপ্রসন্ন না হইয়া থাকে, তবে সুষুপ্তি কালে স্বপ্নদর্শন হইতে দেখা যায়। এই সুষুপ্তি কালীন স্বপ্নেই (সুষুপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বেই কিম্বা সুষুপ্তি ভঙ্গ হইবার উপক্রম সময়ে) দেবতাদের প্রত্যাদেশ হইয়া থাকে, ইষ্ট দর্শন ঘটে, ঔষধাদি লাভও ঘটিয়া থাকে। উপবাসী সংযমী হইয়া একমনে ডাকিলে যে দেবতার প্রত্যাদেশ ও ঔষধাদি লাভ হয়, তাহা তারকেশ্বর ও বৈদ্যনাথ ধামে বহুবার পরীক্ষিত হইয়া গিয়াছে। নিয়ম পালন পূর্ব্বক ঐকান্তিকী নিষ্ঠা ও আকুল প্রার্থনার ফলে উপাসকের দেহে কোমল কান্ত তড়িতের সঞ্চার হয়। রজস্তমোভাব বিদূরিত হইয়া সত্ত্ব গুণ বিবৃদ্ধি ঘটে, কাজেই স্বপ্ন দর্শন হইয়া থাকে, আর তাহা সত্যই হইতে দেখা যায়।

স্বপ্ন ইহ পরকালের সন্ধিস্থল বলিয়া উক্ত। অর্দ্ধেক ইহলোক, অর্দ্ধেক পরলোক, এই উভয় লোকের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া উভয়ের গুণই কতক পরিমাণে স্বপ্নে বিদ্যমান। যাহা পার্থিব ও বাস্তব, তাহাই ইহলোকের, যাহা অপার্থিব ও অবাস্তব, তাহা পরলোকের। স্বপ্নের একদিকটা যেমন বেশ সুস্পষ্ট, অপর দিকটা

যেমনই অস্পষ্ট, রহস্যময়, দুর্জ্ঞেয়। স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় মিথ্যা কিন্তু তাহার অবগতি বা জ্ঞান সত্য! জাগরণ ও স্বপ্নের সুখ দুঃখ অনুভবাংশে একরূপই বোধ্য। স্বপ্নকালীন ভয় কম্প স্বেদ নির্গমাদি ফলে সত্য। আর স্বপ্নজ্ঞান যে মিথ্যা নহে, তাহা অসন্দিগ্ধ। নতুবা আমরা স্বপ্নের পর স্বপ্নের কথা বলিতে পারিতাম না। এই স্বপ্নতত্ত্বের ভিত্তির উপর পারলৌকিকতত্ত্ব দণ্ডায়মান। স্বপ্নকালীন সুখ দুঃখই অতীন্দ্রিয় সংস্কারজ সুখ দুঃখের নিয়ামক, স্বপ্নের ক্ষুধা তৃষ্ণা যেমন স্বপ্নকালে সত্যরূপে প্রতীত, লিঙ্গদেহে ঐ ক্ষুধা তৃষ্ণা ঐরূপই সত্য রূপে প্রতীত। এই ক্ষুধা তৃষ্ণার উদয়ও সংস্কারজ, পরিশান্তিও সংস্কারজ—এই যুক্তির উপরই শ্রাদ্ধ তর্পণাদি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত।

স্বপ্নসৃষ্ট জগত বাস্তব জগতেরই অনুরূপ চিত্র। বাস্তব জগতের মধ্যে যেমন সত্য সত্তা বিদ্যমান, স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের (অন্তর্জ্জগতের) মধ্যেও তদ্রূপই সত্য সত্তা বর্ত্তমান। চক্ষু কর্ণ মন যেমন দর্শন শ্রবণ মননে অভ্যস্ত, স্বপ্নও তাহাই মাত্র করিয়া থাকে। কখনও কখন নূতন স্থান দৃষ্ট হয়, নূতন লোক নয়নগোচর হয়, নূতন ভাব সমুদিত হয়, তাহারও মূলে জন্মান্তর পরিচয় বর্ত্তমান। জাগ্রদবস্থার সংস্কার স্বপ্নে দেখা যায়, জন্মান্তর সংস্কারও জীবদ্দশায় অনুবর্ত্তিত হয়। কদাচিৎ অস্ফুট ভাবে কদাচিৎ স্ফুটভাবে আসিয়া থাকে।

স্বপ্ন সত্য দেখিতে হইলে, অতীত ও ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি জন্মাইতে হইলে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক। আহারে বিহারে, চরিত্রে ব্যবহারে সংযম প্রয়োজন। কুচিন্তা কুভাব কুকার্য্য দমন করিতে না পারিলে, সুমনোবৃত্তি বিকশিত না করিতে পারিলে স্বপ্ন সত্য হয় না, স্বপ্নে পিতৃগণের দর্শন, দেবতার অনুগ্রহ প্রভৃতি লাভ করা যায় না।

সুষুপ্তি সময়ে জ্ঞান বা অনুভূতি সূক্ষ্মাকারে বিদ্যমান থাকে। আমি গাঢ় নিদ্রাচ্ছন্ন ছিলাম, কি সুখেই রাত্রি কাটিয়া গেল—ইত্যাকার বোধ হইতেই বুঝা যায় যে, তখন জ্ঞান ও অনুভূতি বিদ্যমান ছিল, অনুভূত সুখের স্মরণ যখন করিতে পারিতেছি, তখন বুঝিতে হইবে আমিত্বের ধারা ঠিকই আছে, কিছুই পরিবর্ত্তিত হয় নাই। কল্য নিদ্রার পূর্ব্বে যে আমি ছিলাম, নিদ্রা সময়ে নিদ্রা ভঙ্গের পর এক্ষণে সেই আমিই আছি; সেই আমি সৌষুপ্ত সুখসংবলিত স্মরণও করিতে পারিতেছি। সুষুপ্তিকালে অনুভূতি ছিল না, জ্ঞান ছিল না—ইত্যাকার অনুভূতি বা জ্ঞান তখন কাহারও হইয়াছে কি? আর যদি হইয়াই থাকে, তবে সেই দ্বিতীয় অনুভূতি বা জ্ঞানই ত রহিয়াছে, তবে আর অনুভূতি বা জ্ঞান রহিল না কৈ? এই বিষয়ে আমার অনুভূতি নাই, এই বিষয়ে আমার জ্ঞান নাই—এইটী বুঝিতে হইলে অনুভূতি বা জ্ঞানেরই আশ্রয় লইতে হইবে। এতদ্বিষয়াবচ্ছিন্ন অনুভূতি বা জ্ঞান থাকিলেও কোন বিষয়াবচ্ছিন্ন বা অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান বা অনুভূতি ছিল। ইহা বলিতেই হইবে। সুষুপ্তিকালে বিষয়ের সহিত চিত্তের সংযোগ ছিল না, কাজেই বিষয় সম্পর্কাধীন জ্ঞানের বিকাশ ছিল না। অন্ধকারে স্থিত ঘট দেখিতে না পাওয়া যাইলেও তাহা নাই বলা যায় না। কেন না, আলোক আনিলেই ঘট দেখিতে পাওয়া যায়। সুষুপ্তি সময়ে অনুভূতি বোঝা না যাইলেও সুষুপ্তির পর "সুখ মহমস্বাপ্সং" ইত্যাকার বোধ দ্বারা অস্তিত্বের উপলব্ধি হয়।

স্বপ্নে ইহলোকের চিত্র ত দৃষ্ট হয়ই, পরলোকেরও ছবি পর্য্যন্ত অনেক সময়ে দৃষ্ট হইয়া থাকে। পার্থিব লোক, এমন কি, দেবলোকের পর্য্যন্ত সংবাদ জানিতে পারা যায়। মৃত জীবগণ (লিঙ্গদেহী) স্বপ্নে কখন কখন দেখা দিয়া থাকে। ইহা নিঃসন্দেহ সত্য, চিন্তাশীল সত্যসংকল্প সত্বগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বল অধিক হইয়া থাকে। ইহারা পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ অধ্যয়ন, অনেক চিন্তাও করিয়া থাকেন। জিজ্ঞাসা রূপ আকুলতা লইয়া কত রাত্রে নীরব সাধনায় যে কাটাইয়া দেন, তাহা অপরে কেহ বুঝিতে পারেন না। ইহারা কখন কখন মৃত ব্যক্তিকে দেখিবার মত শক্তি লাভ করেন। লিঙ্গদেহ দেখিতে হইলে যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি প্রয়োজন, তাহা তাঁহাদের হইয়া যায়। যে প্রত্যক্ষযোগ্য মহত্বের অভাবে লিঙ্গদেহী সাধারণ স্থূল চক্ষুর গোচরে আইসে না, ঐ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের নিকট সেই প্রত্যক্ষগ্রাহ্য মহত্ব শূন্য লিঙ্গদেহও চর্ম্মচক্ষু গোচর হইয়া থাকে। চর্ম্ম চক্ষুর গোচরে আনিতে হইলে খুব শক্তির আবশ্যক। মৃত জীবের উৎকট লালসা থাকিলে কম শক্তিতে কাজ চলিতে পারে। স্বপ্নে সহজে দেখা মিলিতে পারে, মৃত জীব সহজে দেখা দিতেও পারে। মৃত জীবগণ যখন লিঙ্গদেহে যন্ত্রণায় অতীব কাতর হয়, আর সে কাতরতা দূর হইবার সুসময়ও উপস্থিত হয়, তখন যাহাকে তাহাকে দেখা দিতে পারে, স্বপ্নে ত অতি সহজেই পারে। কিন্তু শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি আপনার বলেই মৃত জীবের ইচ্ছা থাক্ বা না থাক্, তাহাদের সহিত দেখা করিতে পারেন, তাহাদিগকে স্বপ্নে উপস্থিত করিয়া মনোভাব জানিয়া লইতে পারেন। মৃত পিতৃগণ জীবদ্দশোচিত অভ্যস্ত সংস্কার গুণে যখন ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ করিতে বাধ্য হন, তখন প্রিয় কোন জীবিত ব্যক্তিকে সেই দুঃখ জানাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হন। জীবিত ব্যক্তিও সাধারণতঃ সম্মুখে পার্শ্বে অবস্থিত লিঙ্গদেহী দেখিতে পায় না, কাজেই এই জীবিত ও লিঙ্গদেহীর সমাগম স্থান স্বপ্ন ব্যতীত আর নাই।

দেহান্তর ধারণের সময় যখন নিকট হইয়া আইসে, অপ্রতিকার্য্য বিঘ্নের জন্য যখন সেই দেহ লাভ ঘটিয়া উঠে না, তখন মৃত জীব কষ্টকর দশা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আকুল হইয়া পড়ে। সে সময়ে বিলম্ব আর সহে না। প্রত্যক্ষ হউক, স্বপ্নে হউক, তাহারা দেখা দিয়া থাকে। দেখা দেওয়ার সুবিধা করিয়া উঠিতে না পারিলে উপদ্রব করিতেও ছাড়ে না। মোট কথা, যাঁহারা জীবনে দুই চারি মৃত পিতৃগণের সম্পর্কে আসিয়াছেন, স্বপ্নে মধ্যে মধ্যে সমাগম লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সত্বগুণের যে কিছু আধিক্য হইয়াছে, আধ্যাত্মিক বল একটু জন্মিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বপ্নে একবার সফল দর্শন কাহারও কাহারও হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ।

জড়ের মূল উপাদান। (২)

যখন বিজ্ঞানের শৈশব কাল, যখন আধুনিক রসায়ন-বিজ্ঞান জন্মগ্রহণ করে নাই, যখন আলোক ও তাপ, তাড়িত ও চৌম্বকশক্তি নিত্য নূতন মূর্ত্তি বিকাশ করিয়া মানবের হৃদয় মন মোহিত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই, তখন নিতান্ত সাধারণ রকমের পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করিয়াই তত্ত্বান্বেষীগণ জড়ের মূল উপাদানের অন্বেষণে রত হইতেন। ছুরী বা কাঁচির সাহায্যে তাঁহারা জড়কে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিতেন, ঢেঁকি বা খলের সাহায্যে তাঁহারা জড়কে চূর্ণ করিয়া ফেলিতেন। তাঁহারা দেখিলেন, জড়মাত্রই অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভাজ্য এবং এই সূক্ষ্ম অংশগুলির ধর্ম্ম গোটা জড়েরই অনুরূপ। লোহার গুঁড়া লোহাই বটে, সোণা নহে। তাঁহারা জড়ের এই সূক্ষ্ম অংশগুলির নাম দিলেন অণু। তাঁহারা বলিলেন, জড় অণুময়—নীরেট নহে।

বহুকোটি অণু লইয়া এক একটা জড়দেহ গঠিত হইয়াছে, এই অণুগুলি সর্ব্বাংশে পরস্পরের সমান। অণুগুলি গোটা জড়েরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মাত্র; গোটা জড়ে ও উহার অণুতে মূলগত কোন পার্থক্য নাই। সোণার অণুগুলি সোণা ভিন্ন আর কিছু নহে, লোহার অণুগুলি লোহা ভিন্ন অন্য কিছু নহে; কিন্তু সোণার অণুতে ও লোহার অণুতে মূলগত ভেদ—সোণাতে ও লোহাতে যে প্রভেদ, সোণার অণুতে ও লোহার অণুতে সেই প্রভেদ। অণুতে অণুতে ভেদ উপাদানগত ভেদ, এবং অণুতে অণুতে ভেদ বলিয়াই সোণাতে লোহাতে ভেদ—জাতিগত, ধর্ম্মগত ভেদ। জগতে কোটী প্রকারের জড় রহিয়াছে; জড়জগৎ চূর্ণ কর, ঠিক কোটী প্রকারের অণু পাইবে, জাতিভেদ একটুও কমাইতে পারিবে না। যত রকমের জড়, তত জাতীয় অণু, জড় জগতের মূল উপাদানও ততগুলি। কোটী মসলায় এই বিশাল জড়জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে। জগতের বাহ্যমূর্ত্তি যাহা, উহার প্রকৃত মূর্ত্তিও তাহাই। জড়জগৎ মূলতঃ এক নহে, প্রকৃতই বহু।

কালক্রমে জড়কে চূর্ণ করিবার পক্ষে কয়েকটা খুব সূক্ষ্ম অস্ত্র আবিষ্কৃত হইল। দেখা গেল, প্রাচীনদের ঢেঁকি বা যাঁতা, ছুরি বা কাঁচি জড়কে বিভক্ত করিবার পক্ষে নিতান্তই স্থূল অস্ত্র। জড়পদার্থ নির্ম্মিত এই অস্ত্রগুলির সাহায্যে জড়কে খুবই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা চলে না। খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে ভাগ করিতে হইলে আরও সূক্ষ্ম অস্ত্র চাই—চাই তাপ ও তাড়িত। তাপ ও তাড়িত পূর্ব্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু জড়কে বিভক্ত করিবার পক্ষে যে ইহারা এক একখানি শাণিত অস্ত্র, ইহা আবিষ্কৃত হইল বহুদিন পরে। এই আবিষ্কার লইয়া আধুনিক রসায়নশাস্ত্র জন্মগ্রহণ করিল এবং তখন হইতেই পূর্ণবেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকিল। এই অশরীরি অস্ত্রপ্রয়োগে ল্যাবোয়াশিয়ে ও ক্যাবেণ্ডিস্, ডেভি ও ফ্যারাডে জড়দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। কঠিন, তরল ও অনিল সকলেই তাপ ও তাড়িতের প্রভাবে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিল। জল ভাঙ্গিয়া গেল, জলের অণু ভাঙ্গিয়া গেল; জলের অণুর মধ্য হইতে

বাহির হইল বিভিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট, বিভিন্ন উপাদানে নির্ম্মিত দুইটা নূতন পদার্থ—হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। এই হাইড্রোজেন বা এই অক্সিজেন তাপ ও তাড়িত প্রভাবে আর বিভক্ত হইল না। বুঝা গেল, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এক একটী মূল পদার্থ, জল একটা মূল পদার্থ নহে, উহা যৌগিক পদার্থ। স্থূল অস্ত্রে যাহা পারে নাই, রাসায়নিকের সূক্ষ্ম অস্ত্র তাহা অক্লেশে সম্পন্ন করিতে থাকিল। সাব্যস্ত হইল, প্রাচীনদের অণু ভাঙ্গা চলে এবং অণু ভাঙ্গিয়া ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বাহির করা চলে। বুঝা গেল, অণু জড়ের ক্ষুদ্রতম অংশ নহে, এবং একই অণু একই মাত্র উপাদানে গঠিত নহে। জড় যত রকমের, অণু তত রকমের বটে, কিন্তু অণু যত রকমের, জড়ের মূল উপাদান তত রকমের নহে।

তখন মূল উপাদানের রকম ভেদ দেখিবার জন্য রসায়নবিদ্ পণ্ডিতগণ মধ্যে একটা জিদ্ পড়িয়া গেল ; ফলে, যাবতীয় জড় রাসায়নিকের ব্যবচ্ছেদাগারে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক বাহ্যরূপের নশ্বরতা প্রতিপাদন করিতে থাকিল।

পরীক্ষার ফলে বহু জড়ের অণু হইতে শুধু দুই রকমের মূল পদার্থ বাহির হইল, কোন কোনটার ভিতর হইতে তিন রকমের, গোটা কয়েকের মধ্য হইতে ৪।৫ রকমের বা বড় জোর ৮।১০ রকমের মূল পদার্থও বাহির হইল।

প্রায় সকল অণুকেই আত্মসমর্পণ করিতে হইল—প্রায় সকল জড়ই যৌগিক পদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল ; কেবল গোটাকয়েক জড়ের বেলায় দেখা গেল, উহাদের অণুগুলি ভাঙ্গিয়া আর নূতন কিছু পাওয়া যায় না। ইহাদের নাম হইল মূলপদার্থ ; ইহাদের সংখ্যা হইল ৭০এর কাছাকাছি। আরও দেখা গেল যে, যে কয়েকটা উপাদানে একটা বিশিষ্ট রকমের অণু গঠিত হইয়াছে, ঠিক সেই কয়েকটা উপাদান লইয়াই আরও বহু অণু গঠিত। দেখা গেল, কতকগুলি অণু শুধু হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন লইয়া, কতকগুলি শুধু নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন লইয়া, অনেকগুলি অণু কেবল অঙ্গার ও হাইড্রোজেন লইয়া। মোটের উপর দেখা গেল, সহস্র জড়ের সহস্র রকমের অণুর মধ্য হইতে ৭০।৮০ রকমের বা বড় জোর শত রকমের মূল পদার্থ পাওয়া যাইতে পারে।

বুঝা গেল, অণুর মূর্ত্তি জড়ের প্রকৃত মূর্ত্তি নহে, কোটি জড়ের কোটি মূর্ত্তি নহে,—শত-মূর্ত্তি মাত্র। জড়ের মূল উপাদান একটী মাত্র না হইলেও একশতের অধিক নহে, এবং এই শতমাত্র মূল উপাদানের বিভিন্ন প্রকারের সংযোগের ফলেই জড় জগতের এই বিচিত্র মূর্ত্তি।

এখানে একটা সমস্যা উপস্থিত হইল। শতমাত্র মূল উপাদান লইয়া জড়ের এই অনন্ত মূর্ত্তি, কাজেই জড়ের রূপভেদ শুধু উহার উপাদান ভেদ লইয়াই নহে। রূপ ও ধর্ম্ম যদি শুধু উপাদানের উপর নির্ভর করিত, তাহা হইলে রূপের সংখ্যাও শুধু উপাদানের সংখ্যা দ্বারাই নিয়মিত হইত ; মূল উপাদান যত রকমের এবং উহাদিগকে মিশাইতে পারা যায় যত রকমে, জড়পদার্থের সংখ্যা বড় জোর ততগুলি হইত। অর্থাৎ একটা উপাদান হইতে শুধু একটা জড় নির্ম্মাণ করা চলিত, দুইটা উপাদান হইতে নির্ম্মাণ করা চলিত বড়জোর দুইটা মৌলিক ও একটা যৌগিক, তিনটা উপাদান হইতে

৬টা মৌলিক ও ৪টা যৌগিক, চারটা উপাদান হইতে ৬টা মৌলিক ও ১১টা যৌগিক এইরূপ। তাহা হইলে শতমাত্র উপাদান হইতে পাওয়া যাইত, একশত মৌলিক ও বহুশত যৌগিক পদার্থ। তাহা হইলে বহুশত জড়পদার্থ পাওয়া যাইত, কিন্তু এই অনন্তশ্রেণী মিলিত না—শতমাত্র উপাদান হইতে অনন্ত ধর্ম্মবিশিষ্ট অনন্ত জড়ের উদ্ভব ঘটিত না। শুধু উপাদানের বৈষম্যই জড়জগতের এই অনন্ত বৈচিত্র্যের কারণ নহে; এই বিচিত্রতার মূলে জড়ের উপাদান ছাড়া আরও কিছু নিহিত রহিয়াছে। সেই আর কিছু কি, ইহাই সমস্যা দাঁড়াইল।

এই সমস্যার পূরণ করিলেন ড্যাল্টন। ড্যাল্টন বলিলেন, শুধু উপাদানের মূর্ত্তিভেদ দেখিলে চলিবে না। উহাদের পরিমাণের দিকে লক্ষ্য কর। দেখ শুধু দুইটা মাত্র উপাদান হইতেই ১০।২০টা যৌগিক পদার্থ পাওয়া যাইতেছে,—১০।২০টা খিচুড়ী তৈয়ার হইয়াছে শুধু চাউলে আর দাইলে। সর্ব্বত্র একই চাউল, একই দাইল, কিন্তু দেখ এই খিচুড়ীগুলির স্বাদে কত তফাৎ। খিচুড়ী একটা না হইয়া ১০টা কেন? ওজন কর। দেখ চাউলের সেরপ্রতি, দাইলের পরিমাণ এক এক খিচুড়ীতে এক এক রকমের। প্রতিসের চাউলের সহিত দাইল মিশান হইয়াছে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের, তাই খিচুড়ী একটা না হইয়া ১০টা, খিচুড়ীর অণুগুলি একরকমের না হইয়া ১০ রকমের।

আরও দেখ, চাউল দাইলেরই আবার কতকগুলি খিচুড়ী এমন রহিয়াছে, যাহাদের অণুগুলির মধ্য হইতে সমান সমান পরিমাণেরই চাউল পাওয়া যায়; কিন্তু উহাদেরই দাইলের বেলায় দেখ, দাইলের পরিমাণ এক এক অণুতে এক এক রকমের—কোনটায় বেশী কোনটায় কম। সবচেয়ে কম পরিমাণের দাইল কোন অণুটায় দেখ। অতটুক দাইলের ওজন যাহা, তাহাকে বল ১; দেখিতে পাইবে অপর অণুগুলির দাইলের ওজন দাঁড়ায় ২, ৩, ৪ ইত্যাদি। কোন অণুরই দাইলের ওজন আর সিকি বা দেড় বা পৌণে তিন, এইরূপ সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে পারিবে না। কাজেই দেখ, ঐ দাইলটুকু যাহার ওজন এক, উহা আর ভাঙ্গিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে। অতএব, উহাকে সম্মান কর; উহাকে বল দাইলের পরমাণু। এই যে পরমাণু, ইহাই দাইলের ক্ষুদ্রতম অংশ; উহা একটা গোটা দাইল; উহা অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অমর।

১ নং খিচুড়ীর অণুতে দাইলের ওজন ১, ইহার অর্থ ঐ অণুটায় দাইলের ১টা মাত্র পরমাণু রহিয়াছে; ২ বা ৩ নং খিচুড়ীর অণুতে দাইলের ওজন ২ বা ৩, ইহার অর্থ, দাইলের পরমাণুর সংখ্যা ২ নং খিচুড়ীর ২, ৩নং খিচুড়ীতে ৩, এইরূপ বুঝিতে হইবে। দাইলের এই পরমাণুগুলি সর্ব্বাংশে পরস্পরে সমান। এই পরমাণুগুলির উপাদানই দাইলের উপাদান, ইহাদের লইয়াই দাইল দাইল।

দাইলের বেলায় যে কথা, চাউলের বেলাও সেই কথা। চাউলও কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি —প্রত্যেক মূল পদার্থই কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। একই মূল পদার্থের দুইটা পরমাণুতে কোন বিভিন্নতা নাই—উহারা সমধর্ম্মী; কিন্তু বিভিন্ন মূল পদার্থের পরমাণুগুলি বিভিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট; উহাদের ওজনও ভিন্ন ভিন্ন, আকার প্রকারও ভিন্ন ভিন্ন। মূল পদার্থ যতগুলি, পরমাণুও তত প্রকারের; মূল পদার্থ শত, পরমাণুও শত রকমের। শত

রকমের পরমাণু লইয়াই এই বিচিত্র জড়জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে।

দেখ তাপ ও তাড়িত খুব তীক্ষ্ণ অস্ত্র বটে, কিন্তু উহাদের তীক্ষ্ণতারও একটা সীমা আছে। উহাদের সাহায্যে অণু ভাঙ্গিয়াছ, অণু ভাঙ্গিয়া পরমাণু পাইয়াছ, কিন্তু পরমাণু ভাঙ্গিতে পার নাই। ইহা অস্ত্রের দোষ নহে, ইহা প্রকৃতিরই বিধান। অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা আরও বাড়াইতে পার, কালক্রমে আরও সূক্ষ্ম অস্ত্রের আবিষ্কার করিতে পার, কিন্তু সাবধান! পরমাণুর অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপ করিতে সাহস করিও না; অস্ত্রপ্রয়োগ বৃথা হইবে, পরমাণু অবিকৃত রহিয়া যাইবে, তোমাকে শুধু উপহাসের ভাগী হইতে হইবে।

দেখ, কি আশ্চর্য্য কৌশলে এই জগৎ-যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাকে খুবই সূক্ষ্ম অংশে চূর্ণ করা চলে এবং চাঁকনির সাহায্যে এই চূর্ণগুলিকে পৃথক্ করা চলে। পৃথক্ করিলে পাওয়া যায় মোট শত রকমের চূর্ণ। এই শত রকমের চূর্ণ হইতে শতটী কণা সংগ্রহ করিয়া বাক্সে বন্ধ কর, সমগ্র জড়জগৎ তোমার করায়ত্ত হইবে। এই কণাগুলিই জড়জগতের মূল পদার্থ; ইহাদের উপাদানই জগতের মূল উপাদান।

দেখ, এক একটা কণা এক একখানা ইট—এক এক রঙ্গের এক একখানা ইট। ইট শত রঙ্গের কিন্তু শতখানা মাত্র নহে। এক এক রংএর ইটের সংখ্যা অনন্ত, তাই জগতে এত বিভিন্ন রঙ্গের অট্টালিকা—তাই জড়-জগতের অনন্তরূপ। দেখ, কেবল মাত্র দুই রঙ্গের ইট লইয়াই, শুধু উহাদের সংখ্যাভেদে, কত না বিচিত্র রঙ্গের অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়া থাকে; একশত রঙ্গের কোটী কোটী ইট লইয়া এই জড়জগৎরূপ কোটী অট্টালিকা নির্ম্মিত হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। জড়ের মূর্ত্তিভেদ শুধু উপাদানভেদ লইয়া নহে—মূল উপাদানের উপর সংখ্যা ফলাইয়া এই জগৎ-যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। জগতের এই বিচিত্রতার মূলে নাম ও রূপ, দুই রহিয়াছে; নাম ও রূপ লইয়াই জড়জগৎ।

ড্যাল্টনের এই পরমাণুবাদ জড়জগতের আপাতবৈষম্যে একটা শৃঙ্খলা আনয়ন করিল। এই পরমাণুবাদ অবলম্বন করিয়াই রসায়নশাস্ত্র অতি দ্রুতবেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইল। কিন্তু কোন কোন বৈজ্ঞানিকের অন্তঃকরণ ড্যাল্টনের সিদ্ধান্তেও সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। মূল উপাদানের সংখ্যা কমিলই যদি, তবে শতে দাঁড়াইলে কেন?—একে দাঁড়াইতে দোষ ছিল কি? অনন্তরূপে যদি সান্ত্বনা না দিলে, তবে শতরূপেই বা সম্পূর্ণ দিলে কোথায়? শতরূপ কোন কথাই নহে। হয় অনন্তরূপ অথবা একরূপ, এ দুয়ের মাঝামাঝি কোন কথা অগ্রাহ্য। উহা নিতান্তই জড়বুদ্ধির কথা; কবি বা দার্শনিক উহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না।

প্রাউট্ বলিলেন, ঠিক কথা; শতরূপ নহে একরূপ, শত পরমাণু নহে এক পরমাণু, ইহাই ঠিক কথা। জড়ের আসলরূপ একটী মাত্র, উহা হাইড্রোজেনের রূপ; আসল পরমাণু একটী মাত্র, উহা হাইড্রোজেন পরমাণু। হাইড্রোজেন পরমাণুই পরমাণু, আর বাকী ৯৯টা নকল পরমাণু, উহারা হাইড্রোজেন পরমাণুরই গোটাকত গোটাকত লইয়া গঠিত হইয়াছে।

দেখ হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনই সব চেয়ে কম। হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন যাহা অঙ্গার পরমাণুর ওজন ঠিক তাহার ১২ গুণ, নাইট্রোজেন পরমাণুর ওজন ঠিক তাহার

১৪ গুণ, অক্সিজেন পরমাণুর ওজন ঠিক তাহার ১৬ গুণ। তবেইত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ১২টা বা ১৪টা বা ১৬টা হাইড্রোজেন পরমাণু লইয়াই অঙ্গার বা নাইট্রোজেন বা অক্সিজেন পরমাণু নির্ম্মিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুতে হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন, তাই শত রকমের পরমাণ, তাই ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন ওজন। পরমাণু গুলির এই গুরুত্বের বিভিন্নতা উহাদের উপাদানের পার্থক্য নির্দ্দেশ করে না—নির্দ্দেশ করে শুধু উহাদের অন্তর্গত হাইড্রোজেন পরমাণুরই সংখ্যার বিভিন্নতা। হাইড্রোজেন পরমাণুর তুলনায় যে পরমাণুর গুরুত্ব যতগুণ ঐ পরমাণুতে ঠিক, ততটী হাইড্রোজেন পরমাণু রহিয়াছে। আসল পরমাণু একটী মাত্র—উহা হাইড্রোজেন পরমাণু।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ প্রাউটের এই উক্তি মনোযোগ সহকারে শুনিলেন, কিন্তু অত সহজ যুক্তিতে উহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহারা বলিলেন, যে পরমাণুর গুরুত্ব হাইড্রোজেন পরমাণুর তুলনায় ১০ কি ১২, বুঝিলাম, তাহার ভিতর হাইড্রোজেনেরই ১০টা বা ১২টা পরমাণু রহিয়াছে, কিন্তু যাহার গুরুত্ব ৩২।০ বা ৩৫।০, তাহাদের বেলায় ঐরূপ বুঝিতে গেলেই যে গোল উপস্থিত হয়। প্রাউট বলিলেন, পরমাণুর ওজন ৩২।০ হইতেই পারে না, উহা হয় ৩২ কি ৩৩; তোমাদের ওজনে ভুল রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলিলেন, খুব ভালরূপে ওজন করিয়াও দেখিতে পাওয়া গেল, ৩২।০কে ৩২ কি ৩৩সে দাঁড় করান যায় না, কিছু ভগ্নাংশ রহিয়াই যায়। অধিকন্তু যে পরমাণুগুলির ওজন এত দিন ভগ্নাংশ বিবর্জ্জিত ছিল, ভাল করিয়া মাপিলে তাহাদের ওজনেও ভগ্নাংশ আসিয়া পড়ে। পণ্ডিতগণ বলিলেন, যদি একই পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা লইয়া শত পরমাণু গঠিত হইয়া থাকে, তবে সেই একমাত্র পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণু নহে, উহা আর কিছু। উহা হাইড্রোজেন পরমাণুর ভগ্নাংশ হইতে পারে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ঐরূপ ভগ্নাংশের সাক্ষাৎ মিলে নাই। যতদিন না মিলে, ততদিন ড্যাল্টনের সিদ্ধান্তকেই আঁকড়াইয়া ধরা ছাড়া উপায় নাই। জড়ের মূল উপাদান এক নহে, শতই বটে।

মেণ্ডেলিফ্ বলিলেন, আচ্ছা আর একদিক দিয়া দেখ। এক কাজ কর: পরমাণুগুলিকে একটীর পর একটী করিয়া উহাদের গুরুত্ব অনুসারে সাজাও। হাইড্রোজেন পরমাণু সবচেয়ে হাল্‌কা, উহাকে রাখ সকলের নীচে, তারপর গুরুত্ব অনুসারে একটীর উপর একটী করিয়া শতটী পরমাণু সাজাইয়া যাও। এখন একটী একটী করিয়া সবগুলি পরমাণুর সহিত বিশেষভাবে আলাপ পরিচয় কর। উহাদের কোনটীর কিরূপ ধর্ম্ম ভাল করিয়া জান। উহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা, স্বভাব ও অভিযোগের কথা মন দিয়া শুন। দেখিতে পাইবে, বিভিন্নধর্ম্মী হইলেও, উহাদের ধর্ম্মগুলি একেবারেই পরস্পর বিরোধী নহে; উহাদের প্রত্যেকের কথাতেই নূতন সুর বাজিয়া ওঠে না। দেখিবে, পরমাণুগুলির ধর্ম্মভেদেও একটা শৃঙ্খলা রহিয়াছে, শত ধর্ম্মের মধ্যেও একটা শ্রেণীবিভাগ চলে। দেখ, ১নং পরমাণু যে কথা বলে ৮নং পরমাণুও ঠিক তাহা না হউক, প্রায় সেইরূপ কথাই বলিয়া থাকে, আবার ১৫নং বা ২২নং পরমাণুর কথাতেও প্রায় সেই সুরই বাজিয়া ওঠে। ১ নং পরমাণুর যে ধর্ম্ম, ৮ নং বা ১৫ নং বা ২২ নং পরমাণুর ধর্ম্মও প্রায় তদ্রূপই

বটে। ১ নং হইতে ২ নংএ যাও, একটু নূতন ধর্ম্মের সাক্ষাৎ পাইবে ; কিন্তু ঐখানেই থামিও না, একটী একটী করিয়া পরমাণু-গুলিকে পর পর অতিক্রম করিয়া চলিতে থাক। দেখিবে, নূতন নূতন ধর্ম্মের ভিতর দিয়া যাইয়াই পুনঃ পুনঃ পূর্ব্ব ধর্ম্মেরই সাক্ষাৎলাভ ঘটিতেছে—একই ধর্ম্ম একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যবধানের অন্তর বার বার ফিরিয়া আসিতেছে।

দেখ, গুরুত্বভেদে পরমাণুর ধর্ম্মভেদ ঘটে কিন্তু এই ধর্ম্মভেদ নিতান্ত খাপছাড়া গোছের নহে। ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনের ভিতরেও একটা প্রত্যাবর্ত্তনের ভাব নিহিত রহিয়াছে, আর এই প্রত্যাবর্ত্তনকেও নিয়মিত করে গুরুত্বেরই ব্যবধান। ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনই বল বা প্রত্যা-বর্ত্তনই বল, অথবা প্রত্যাবর্ত্তনশীল পরিবর্ত্তনই বল, সকলই নির্ভর করিতেছে পরমাণুর গুরুত্বের উপর। যেন গুরুত্ব লইয়াই আসল কারবার, উহাই পরমাণুর খাঁটি ধর্ম্ম, আর পাঁচটা ধর্ম্ম শুধু গুরুত্বের মুখ চাহিয়া চলে। মোটের উপর দেখা যাইতেছে, গুরুত্বই পরমাণুর অপরাপর ধর্ম্মগুলিকে নিয়মিত করে এবং যে প্রণালীতে নিয়মিত করে, উহা একটু বিচিত্র ধরণের—উহা আবর্ত্তনের প্রণালী।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক মেণ্ডেলিফের এই আবর্ত্তন প্রণালীটা একটু অতিরিক্ত মাত্রায় চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহারা বলিলেন, দেখ, গুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন ঘটে, কিন্তু এই পরিবর্ত্তন পরিবর্ত্তন মাত্র, সম্পূর্ণ নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ নহে। এইরূপ পরিবর্ত্তন তোমায় আমায়ও ঘটে, কিন্তু উহা বিকাশেরই নাম মাত্র, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ নহে। গুরুত্বের ক্রম-পরিবর্ত্তনে গুণ ও ধর্ম্মের ক্রম-বিকাশ, তাই গুরুত্ব একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় বাড়িয়া গেলে পুনরায় পূর্ব্ব ধর্ম্মের সাক্ষাৎ ঘটে। দেখ, আবর্ত্তন যাওয়া আসা লইয়া—একেবারে চলিয়া যাওয়া নহে। যেখানে আবর্ত্তন, সেইখানেই একটা লক্ষ্যস্থল রহিয়াছে। আবর্ত্তন অর্থ লক্ষ্যস্থলেরই একটু এপাশে ওপাশে আন্দোলন মাত্র, লক্ষ্য ছাড়িয়া যাওয়া নহে। দেখ, একটা আবর্ত্তনের ভাব লইয়া—একটা প্রত্যা-বর্ত্তনের ভাব লইয়াই পরমাণুগুলির ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে; বুঝিতে হইবে একটা মূলধর্ম্ম রহিয়াছে যাহাকে কেন্দ্র করিয়াই ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের বিকাশ ঘটিয়াছে। বুঝিতে হইবে, শত ধর্ম্মের মূলে একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম রহিয়াছে, শত উপাদানের মূলে একটা বিশিষ্ট উপাদান রহিয়াছে—বিশিষ্ট ধর্ম্মের একটা বিশিষ্ট উপাদান লইয়াই শত পরমাণু নির্ম্মিত হইয়াছে। পরমাণুগুলি প্রকৃতই ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের হইলে ধর্ম্মে ধর্ম্মে এই সামঞ্জস্য—এই ফিরিয়া আসার ভাব লক্ষিত হইত না। বুঝিতে হইবে, ড্যাল্টনের পরমাণুগুলি প্রকৃতপক্ষে পরমাণু পদবাচ্য নহে, প্রাউটের হাইড্রোজেন পরমাণুও আসল পরমাণু নহে। আসল পরমাণু হয়ত ইহাদের সকলেরই তুলনায় খুব সূক্ষ্ম। এই সূক্ষ্ম কণাগুলিরই ২।৪ শত বা ২।৩ হাজার করিয়া লইয়া ড্যাল্টনের এক একটী পরমাণু গঠিত হইয়াছে।

বুঝিতে হইবে, জড়ের মূল উপাদান একটী মাত্র। এই মূল উপাদানের গঠন আণবিক গঠন, উহা কণাময়। এক একটী কণা এক একটী পরমাণু। এই কণাগুলি সর্ব্বাংশে পরস্পরে সমান। এই একই জাতীয় কণা লইয়াই উহাদের সংখ্যাভেদে এই অনন্ত জড়-শ্রেণী নির্ম্মিত হইয়াছে। জড়জগতের এই

বৈচিত্র্যের মূলে শুধু সংখ্যাভেদ, উপাদানভেদ নহে—ভেদ যাহা তাহা শুধু নাম লইয়া, রূপ লইয়া নহে।

আর একদল বৈজ্ঞানিক বলেন, এ যুক্তি কোন কাজেরই নহে, উহা আত্মকল্পনা মাত্র। ধরিয়া লইলাম, জড়ের মূল উপাদান একটী মাত্র; ধরিয়া লইলাম উহা কণাময়, এবং এই মূল কণার কতকগুলি কতকগুলি করিয়া লইয়া আমাদের পরিচিত পরমাণুগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, পরমাণর যাহা কিছু ধর্ম্ম আমরা দেখিতে পাই, সবই উহার ভিতরকার মূল কণার সংখ্যা লইয়া, অর্থাৎ পরমাণুটার গুরুত্ব লইয়া। বুঝিতে হইবে, পরমাণুতে পরমাণুতে ভেদ কেবল গুরুত্ব ভেদ লইয়া। কিন্তু এইরূপ বুঝিবার পক্ষে প্রমাণ কোথায়? মেণ্ডেলিফের আবর্ত্তন প্রণালী হইতে শুধু ইহাই প্রমাণিত হয় যে, গুরুত্বভেদের সঙ্গে সঙ্গে পরমাণুগুলির ধর্ম্মভেদ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু গুরুত্বভেদের জন্যই যে ধর্ম্মভেদ ঘটে, ইহাত প্রমাণিত হয় না। গুরুত্বের ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে ধর্ম্মের আবর্ত্তন ঘটে, কিন্তু শুধু গুরুত্ব-বৃদ্ধির ফলেই যে এই পরিবর্ত্তন, ইহাও প্রমাণিত হয় না। গুরুত্বই পরমাণুর মূল ধর্ম্ম, আর পাঁচটা ধর্ম্ম যে শুধু আগন্তুক ধর্ম্ম, ইহাত প্রমাণিত হয় না।

একমাত্র গুরুত্বের উপরই যে আর পাঁচটা ধর্ম্ম নির্ভর করিতেছে, ইহা জোর করিয়া বলিবার অধিকার কোথায়? সমান সমান ওজনের পরমাণুগুলি একই জাতির অন্তর্গত বটে, উহাদের আর পাঁচটা ধর্ম্মেও মিল দেখা যায় বটে, কিন্তু এইরূপ মিল যে থাকিতেই হইবে, কোন স্থলেই যে গরমিল হইবার আশঙ্কা নাই, তাহার প্রমাণ কোথায়? হয়ত গুরুত্বও একটা আগন্তুক ধর্ম্ম মাত্র। হইতে পারে এক একটী পরমাণু কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি, কিন্তু এই কণাগুলি সকলেই যে একই উপাদানে নির্ম্মিত, তাহার নিশ্চয়তা কি? হয়ত এই কণাগুলি বিভিন্ন উপাদানেরই বটে। হয়ত বিভিন্ন উপাদানের বিভিন্ন সংখ্যার কণা লইয়া এক একটী পরমাণু গঠিত। হয়ত পরমাণুর গঠনে উপাদান ভেদও, সংখ্যাভেদও রহিয়াছে, আবার উপাদান-সাদৃশ্য ও সংখ্যা-সাদৃশ্যও রহিয়াছে; এই উভয় জাতীয় ভেদ ও উভয় জাতীয় সাদৃশ্য লইয়া এক একটী পরমাণু গঠিত হইয়াছে—তাই পরমাণুতে পরমাণুতে ভেদ এবং পরমাণুতে পরমাণুতে মিল, তাই পরমাণুগুলির ভিন্ন ভিন্ন গুরুত্ব এবং গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের এই আবর্ত্তন। ব্যাঘ্র, কুকুর ও বিড়ালে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুই রহিয়াছে; হয়ত গুরুত্ব অনুসারে পর পর চলিয়া গেলে ইহাদের ভিতরেও একটা ক্রম বিকাশের ভাব, একটা আবর্ত্তনের ভাব লক্ষিত হইতে পারে। শুধু এইটা দেখিয়া উহারা যে একই উপাদানে গঠিত, ইহা জোর করিয়া বলা চলে না। হইতে পারে, উহাদের কোন কোন উপাদানে মিল আছে, অথবা হইতে পারে, উহাদের সকলেরই ধমনীতে একই শোণিত বহিয়া থাকে; কিন্তু ঠিকই যে বহিতেছে, ইহা বলিবার পূর্ব্বে উহাদের শোণিত বিশ্লেষণ করিয়া দেখা চাই। সকল পরমাণু একই ধাতুতে গঠিত কি না, ইহা বিনা বিশ্লেষণে বলা চলে না। কিন্তু হায়! পরমাণু অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অজয়, অমর, পরমাণুর বিশ্লেষণ ঘটাইবে কে?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ভগবান বলিয়াছেন—

'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্ জ্ঞানং মতং মম।' (১৩।২)

এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানই প্রধানতঃ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এই অধ্যায় গীতার তৃতীয় ষট্‌কের প্রথম অধ্যায়। গীতার প্রথম ষট্‌কে বা প্রথম ছয় অধ্যায়ে আত্মতত্ত্ব ও কর্ম্মযোগ প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে। এই প্রথম ষট্‌ককে সেজন্য গীতার Psychology ও Ethics বিভাগ বলা যায়। গীতার দ্বিতীয় ষট্‌কে ঈশ্বরতত্ত্ব ও ভক্তিযোগ বিবৃত হইয়াছে। ইহাকে গীতার Theology ও Religion অংশ বলা যায়। সেইরূপ এই তৃতীয় ষট্‌কে তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন বিবৃত হইয়াছে। ইহাই গীতার প্রকৃত দর্শন অংশ। ইহাকে Philosophy ও Metaphysics বিভাগ বলা যায়। এ অধ্যায়ের আরম্ভে একথা বিবৃত হইয়াছে।

তত্ত্বজ্ঞানের যাহা প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহাই তত্ত্বজ্ঞানার্থ। যাহা দ্বারা এই তত্ত্বজ্ঞানের অপরোক্ষ দর্শন সিদ্ধ হয়, তাহাই তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন। এই তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন সিদ্ধ হইলে যে ফল হয়, তাহাকেও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন বলে। এইজন্য গীতায় এই তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনকে জ্ঞানের স্বরূপ বলা হইয়াছে। শুধু, ইহা জ্ঞানের এই অধ্যায়োক্ত বিংশতিরূপ জ্ঞানের একটী স্বরূপ মাত্র নহে। ইহাই ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞানার্থ বা তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানই প্রধান। তাহা ভগবান উক্ত শ্লোকে বলিয়াছেন। পরে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে পুনর্ব্বার এই ক্ষেত্র সম্বন্ধীয় ত্রিগুণ তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে ও ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ যোগে জীবের উৎপত্তি ও ক্ষেত্রের ত্রিগুণজ ভাবের দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের বন্ধন উক্ত হইয়াছে। সেই জ্ঞানকে ভগবান "জ্ঞানানাং জ্ঞান মুত্তমম্" (১৪।১) বলিয়াছেন। পঞ্চদশ অধ্যায়েও এই তত্ত্বজ্ঞান জীবের সংসার বন্ধন, মুক্তি ও পুরুষোত্তমতত্ত্ব উপদেশ করিয়া ভগবান বলিয়াছেন, ইহাই গুহ্যতম শাস্ত্র (১৫।২০)। এইরূপে ভগবান এই তত্ত্বজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব বার বার উপদেশ দিয়াছেন।

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব।—এই তৃতীয় ষট্‌কের প্রথম তিন অধ্যায়ে, অর্থাৎ এই ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞান প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে। পরের তিন অধ্যায়ে ইহার মধ্যে ক্ষেত্র সম্বন্ধীয় ত্রিগুণ তত্ত্বের বিস্তার করা হইয়াছে। এইরূপে এই তৃতীয় ষট্‌কে যে তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন বিবৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রথম ও প্রধান এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান। এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান ও সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতি পুরুষজ্ঞান এক অর্থে একই। সাংখ্যদর্শন অনুসারে প্রকৃতি পুরুষ বিবেক জ্ঞান হইতেই পরম পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়, সর্ব্ব দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি হয়, কৈবল্য মুক্তি হয়। প্রকৃতি হইতে ক্ষেত্রের উৎপত্তি হয়, ক্ষেত্র প্রকৃতিরই পরিণাম। আর যিনি পুরুষ, তিনি এই ক্ষেত্রের জ্ঞাতা হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ হন। এইজন্য প্রকৃতি পুরুষ জ্ঞানই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান।

ভগবান অতি সংক্ষেপে প্রথমেই এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ কাহাকে বলে, তাহা বলিয়া

দিয়াছেন। এই শরীরই ক্ষেত্র। আর ক্ষেত্রকে যে জানে, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞাতা, আর ক্ষেত্র জ্ঞেয়। ক্ষেত্রজ্ঞ মধ্যেও বিশেষ আছে, যিনি বা যে পুরুষ—ব্যষ্টি ক্ষেত্রের জ্ঞাতা তিনি সেই বিশেষ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ,আর যিনি সর্ব্বক্ষেত্রের জ্ঞাতা,নিয়ন্তা, তিনি পরমেশ্বর। পরে পঞ্চদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, যিনি ব্যষ্টি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনি ক্ষর পুরুষ, আর যিনি সমষ্টিভাবে সর্ব্ব ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনি পুরুষোত্তম পরমেশ্বর। অতএব ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব জানিতে হইলে ব্যষ্টি ক্ষেত্রবদ্ধ ক্ষরপুরুষ তত্ত্ব, ব্যষ্টিক্ষেত্র-মুক্তিজাতীয় পুরুষ তত্ত্ব, আর সর্ব্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ উত্তম পুরুষ তত্ত্ব বুঝিতে হয়। সেইরূপ ক্ষেত্র তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, সেই ক্ষেত্রের যাহা উপাদান ও যাহা কারণ, সেই প্রকৃতি তত্ত্বও বুঝিতে হয়, অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব বুঝিতে হইলে সর্ব্ব ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর তত্ত্ব, ব্যষ্টিক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, এবং সর্ব্বক্ষেত্র রূপ জগৎ তত্ত্ব ও ব্যষ্টিক্ষেত্র রূপ জীব শরীর তত্ত্ব সমুদায় বুঝিতে হয়। ইহাই দর্শনশাস্ত্রের মূল প্রতি-পাদ্য বিষয়—

"জীবতত্ত্বং জগত্তত্ত্বং ঈশতত্ত্বং তৃতীয়কং।
স্থিত্বৈকাদশ তন্ত্রেষু তত্ত্বত্ৰ্যাক্যা নিরূপিতং॥"

ইহাই দর্শনশাস্ত্রের সাধারণ প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু ইহাই শেষ নহে। এই তিন তত্ত্বকে এক অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব মধ্যে দর্শনই, জ্ঞানের শেষ—ইহাই বেদান্ত। এজন্য উক্ত অদ্বৈত-ব্রহ্ম সিদ্ধিতে উক্ত হইয়াছে—

"পশ্চাৎ বেদান্ত সদ্বাক্যা অদ্বৈত শ্রুতিমানতঃ।
অদ্বয়ং ব্রহ্ম সংসিদ্ধিং দ্বৈতস্যাবসরঃ কুতঃ॥"

যাহা হউক, এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানই যে জ্ঞান, ইহাই যে সর্ব্বজ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, তাহা আমরা ইহা হইতে বুঝিতে পারি।

আমরা বলিয়াছি যে, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানই সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতি পুরুষ বিবেক জ্ঞান। কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ আছে। সাংখ্য দর্শন অনুসারে পুরুষ বহু—কতক পুরুষ বদ্ধ ও কতক পুরুষ মুক্ত। বদ্ধ পুরুষই প্রকৃতি বদ্ধ থাকে, পরে পুরুষ প্রকৃতি বিবেক জ্ঞান লাভ করিয়া, প্রকৃতি বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হয় নাই, পাতঞ্জল দর্শনে পুরুষ বিশেষ ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে এই পুরুষ বিশেষ ঈশ্বর বদ্ধ ও মুক্ত পুরুষ হইতে ভিন্ন। কিন্তু গীতার উত্তম পুরুষ যে সর্ব্ব ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ পরমেশ্বর, তিনি স্বরূপতঃ বদ্ধ বা মুক্ত পুরুষ হইতে ভিন্ন নহেন, এ তত্ত্ব যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

এ ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে আর এক কথা বুঝিতে হইবে। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারগণের মতে যিনি প্রতি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনি ক্ষর পুরুষ হইলেও তিনি পরাপ্রকৃতি। ভগবান পূর্ব্বে যে বলিয়াছেন, তাহার দুই প্রকৃতি, এক অষ্টধা অপরা প্রকৃতি, আর এক পরাপ্রকৃতি, সেই পরাপ্রকৃতিই এই ক্ষেত্রজ্ঞ জীব। আর অপরা প্রকৃতি ক্ষেত্র, পরাপ্রকৃতিই জীবভূত হইয়া জগৎ ধারণ করে। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, এই অর্থ সঙ্গত নহে। পরা প্রকৃতি এই ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে পারে না। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ পরাপ্রকৃতি হইলে সাংখ্য দর্শনোক্ত পুরুষ প্রকৃতি বিবেক জ্ঞান নিরর্থক হয়। আর গীতা অনুসারেও পরা এবং অপরা প্রকৃতি উভয়েই ভূতযোনি মাত্র। পরমেশ্বরই ভূতগণের বীজপ্রদ পিতা। সুতরাং পরাপ্রকৃতি জীব ভাবের কারণ হইলেও তাহা ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মা নহে। আর ব্যষ্টি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞকে অপরা প্রকৃতি

বলিলে তাহার সহিত সর্ব্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরের যে ভেদ স্থাপিত হয়, সে ভেদের মীমাংসা হয় না। কোনরূপ অদ্বৈতবাদের স্থান থাকে না।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, গীতোক্ত পরাপ্রকৃতি বেদান্ত-উক্ত প্রাণ। ইহাই জীবভূত হয়। এই প্রাণই মুখ্য-তত্ত্ব। এই মূল প্রাণেরই বৃত্তি প্রাণ, অপান প্রভৃতি পাঁচ প্রকার। কিন্তু সাংখ্য দর্শনে মূল প্রাণতত্ত্ব স্বীকৃত হয় নাই। প্রাণাদি পঞ্চবায়ুকে সামান্য কারণ বৃত্তি বলা হইয়াছে মাত্র। অতএব সাংখ্যদর্শন অনুসারে অর্থ করিতে হইলে, এই পরাপ্রকৃতিকে প্রাণ না বলিয়া চেতনা (consciousness) বলিতে হয়। পুরুষ সন্নিধানে লিঙ্গ শরীরে চেতনার অভিব্যক্তি হয়। এই চেতনাই (consciousness) পরাপ্রকৃতির স্বরূপ। চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে—"চিতিরূপেন যা কৃৎস্নং এতদ্ ব্যাপ্যস্থিতা জগৎ।" এই চেতনার দ্বারাই জগৎ বিধৃত, তাই গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, পরাপ্রকৃতির জীবভূত হইয়া জগৎ ধারণ করে (গীতা ৭।৫)। যাহা হউক, বেদান্ত অনুসারে এ স্থলে পরাপ্রকৃতিকে প্রাণ বলা অধিক সঙ্গত। চেতনার ন্যায় প্রাণও ক্ষেত্রের উপাদান।

যাহা হউক, এইরূপে ভগবান ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব সংক্ষেপে, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে বুঝাইয়া, পরে সংক্ষেপে এই ক্ষেত্র কি, তাহা তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ শ্লোক পর্য্যন্ত বিবৃত করিয়াছেন। ভগবান বলিয়াছেন যে, এই ক্ষেত্রই শরীর। ইহার প্রধান উপকরণ পঞ্চ মহাভূত অহঙ্কার বুদ্ধি প্রভৃতি। ইহাই গীতোক্ত অষ্টধা অপরা প্রকৃতি ও সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি বিকৃতি। আর ইহার অপর উপকরণ সম দয়া ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ-মূলভূত, ইহাই সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির বিকৃতি। উক্ত অষ্টধা প্রকৃতি, বিকৃতি ও ইন্দ্রিয়গণ লিঙ্গ শরীরের উপকরণ আর পঞ্চস্থূলভূত স্থূল শরীরের উপকরণ। প্রকৃতি হইতে পরিণত প্রকৃতি বিকৃতি যে বুদ্ধি সম ও পঞ্চ মহাভূত বা তন্মাত্রা এবং এই প্রকৃতি-বিকৃতি হইতে পরিণত কেবল বিকৃতি যে সমদর্শ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত—এই ষোড়শ বিকৃতি সর্ব্বশুদ্ধ প্রকৃতির পরিমাণ এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব ও প্রকৃতি তাহাই এই ক্ষেত্রের উপকরণ। এই পর্য্যন্ত সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত। কিন্তু গীতায় ইহা ব্যতীত ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ, সংঘাত চেতনা ধৃতি,—ইহাদিগকে এই ক্ষেত্রের উপকরণ বলা হইয়াছে। সাংখ্য-দর্শন অনুসারে চেতনা সূক্ষ্ম শরীরে পুরুষের চৈতন্যের প্রতিবিম্ব মাত্র। তাহা স্বতন্ত্রভাবে গৃহীত হয় নাই। ধৃতি যে প্রাণশক্তি, তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সাংখ্যদর্শন অনুসারে, তাহা করণের অর্থাৎ অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গণের সামান্য বৃত্তি। সংঘাত স্থূল শরীর সমবায় শক্তি। ইচ্ছা দ্বেষ, সুখ দুঃখ, ইহারা অন্তঃকরণের ত্রিগুণজ ভাব হইতে উৎপন্ন। ইহারাই ক্ষেত্রের বিকারের কারণ। ভগবান সবিকার ক্ষেত্রতত্ত্ব বিবৃত করিবার প্রসঙ্গে এই ইচ্ছা দ্বেষাদির উল্লেখ করিয়াছেন—এবং ইহাদিগকে সবিকার ক্ষেত্রের উপকরণ বলিয়াছেন।

এই ক্ষেত্র ও তাহার বিকার বুঝিতে হইলে, এবং এই ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ কিরূপে বদ্ধ হন, তাহা বুঝিতে হইলে, সাংখ্যোক্ত ত্রিগুণ-তত্ত্ব বুঝিতে হয়। ভগবান তাহা চতুর্দ্দশ অধ্যায় হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ে কতক দূর পর্য্যন্ত বুঝাইয়াছেন। সে স্থলে এই ত্রিগুণের ভাব দ্বারা ক্ষেত্র কিরূপে রঞ্জিত

হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকেও রঞ্জিত করে, তাহা বিবৃত হইয়াছে। সবিকার ক্ষেত্র এ স্থলে 'সমাসে' বা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে মাত্র। পরে এই তত্ত্ব বিস্তারিত হইয়াছে। আমরা এই কয় শ্লোকে উক্ত ক্ষেত্রের উপকরণের অর্থ যথাস্থানে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ গীতার এক বিশেষত্ব। পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে দেহ দেহী বা শরীর শরীরী বিভাগ উক্ত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,

দেহিনোঽস্মিন যথা দেহে কৌমারং
যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥
২।১৩

আরও উক্ত হইয়াছে যে—

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তঃ শরীরিণঃ।

এই দেহী ক্ষেত্রজ্ঞ। কিন্তু 'ইমে দেহা' আমাদের স্থূল শরীর। ইহাই বিনাশী। মৃত্যুতে ইহার বিনাশ হয় ও পরে আবার এই স্থূল দেহ গ্রহণ হয়। কিন্তু ক্ষেত্র এই রূপ বিনাশী নহে। ক্ষেত্রের যে উপাদান এই অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, মৃত্যুতে তাহার বিনাশ হয় না। মৃত্যুতে সূক্ষ্ম বা কারণ শরীরের বিনাশ হয় না, কেবল স্থূল পঞ্চ ভৌতিক শরীরেরই ধ্বংস হয়। পরে ১৫শ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥
১৫।৭,৮

ইহা হইতে জানা যায় যে মৃত্যুতে স্থূল শরীরেরই ধ্বংস হয়, কিন্তু শরীরের যে উপাদানের কথা এস্থলে উক্ত হইয়াছে, তাহা ধ্বংস হয় না। তাহা আমোক্ষ স্থায়ী। যত দিন ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ থাকে বা পুরুষ প্রকৃতিবদ্ধ থাকে, ততদিন তাহার ধ্বংস হয় না। আর মৃত্যুতে স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহ ধ্বংস হইলেও যাহা সূক্ষ্ম পাঞ্চভৌতিক দেহ, তাহার বিনাশ হয় না। এই সূক্ষ্ম পাঞ্চভৌতিক দেহের নাম আতিবাহিক দেহ। বেদান্ত দর্শনে 'আতিবাহিকস্তল্লিঙ্গাৎ' এই সূত্রে ইহা বিবৃত হইয়াছে। মৃত্যুর পর এই আতিবাহিক বা সূক্ষ্ম ভৌতিক দেহ অবলম্বনে প্রেতাত্মার গতি হয়। সে তত্ত্ব এ স্থলে বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই।

আমরা বলিয়াছি যে, এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ গীতার এক বিশেষত্ব। এই বিভাগ পূর্ব্বে কোথাও বিশেষ ভাবে বিবৃত হয় নাই। কিন্তু ভগবান বলিয়াছেন যে, ক্ষেত্র যাহা, যে প্রকার, যে বিকারী এবং ক্ষেত্রজ্ঞ যে [illegible] ইত্যাদি তত্ত্ব পূর্ব্বে ঋষিগণ দ্বারা [illegible] হইয়াছে—

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥১৩।৪

অথচ আমরা বেদ সংহিতায় বা প্রচলিত ব্রহ্মসূত্র পদে কোথাও এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগের উল্লেখ দেখিতে পাই না। প্রামাণ্য উপনিষদ গুলির মধ্যে কেবল শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দুইটী মন্ত্রে এ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ নাম পাওয়া যায়। সে দুইটী মন্ত্র এই—

একৈকং জালং বহুধা বিকুর্ব্ব-
ন্নস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ। ৫।৩
প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ পতির্গুণেশঃ
সংসার মোক্ষস্থিতি বন্ধ হেতুঃ ॥৬।১৬

ইহা ব্যতীত আর কোথাও ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ

বিভাগের উল্লেখ নাই। তবে ভগবান কেন বলিয়াছেন যে পূর্ব্বে ঋষিগণ দ্বারা বিবিধ ছন্দে এবং ব্রহ্মসূত্র পদে ইহার বিস্তারিত বিবরণ আছে, ইহার কারণ এই বোধ হয় যে, ক্ষেত্রজ্ঞ যিনি এবং ক্ষেত্র যাহা, সেই তত্ত্ব অন্য নামে শ্রুতিতে বিবৃত হইয়াছে। যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ তিনি আত্মা, তিনিই পুরুষ, তিনিই ব্রহ্ম। শ্রুতিতে নানাস্থলে নানা ভাবে এই আত্মতত্ত্ব, পুরুষতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

'অয়ং আত্মা ব্রহ্ম' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'সোঽহং' 'আত্মৈব ইদং অগ্রমাসীৎ পুরুষবিধ' ইত্যাদি মহাবাক্যে শ্রুতিতে এই ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। সেই রূপ ক্ষেত্র বা দেহের বিবরণও শ্রুতিতে পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে যে, আমাদের দেহে পাঁচটী কোষ আছে, যথা অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ,মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ। এই অন্নময় কোষই আমাদের পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষই আমাদের সূক্ষ্ম শরীর এবং আনন্দময় কোষই আমাদের কারণ শরীর। কারণ-শরীরের উপাদান অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতি ইহাই মায়া। সূক্ষ্ম শরীরের উপাদান বেদান্ত মতে প্রাণ, মন ও বিজ্ঞান, আর সাংখ্য মতে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, এই তিন অন্তঃকরণ এবং দশ ইন্দ্রিয় বা বহিঃ করণ এই ত্রয়োদশ করণ, এবং এই ত্রয়োদশ করণের সামান্য বৃত্তি পঞ্চ প্রাণ এবং পঞ্চ তন্মাত্রা বা বেদান্ত অনুসারে পঞ্চ মহাভূত। এইরূপে আমরা বেদান্ত ও সাংখ্য শাস্ত্র হইতে এই দেহের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারি। যাহা হউক, গীতায় এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব এ স্থলে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইলেও, এই তৃতীয় ষট্‌কে তাহার যে বিবরণ আছে,সেরূপ বিস্তৃত বিবরণ আর কোথাও পাওয়া যায় না বলিয়া মনে হয়।

এক্ষণে এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগের মূল তত্ত্ব আমাদের বুঝিতে হইবে। যখন আমাদের বুদ্ধিতে বৃত্তি জ্ঞানের বিকাশ হয়, তখন 'আমি ইহা জানিতেছি' জ্ঞান এইরূপ আকার ধারণ করে, অর্থাৎ জ্ঞান 'জ্ঞাতা অহং' এবং 'জ্ঞেয় ইদং' এই দুই ভাবে বিভক্ত হইয়া যায়। আমাদের বৃত্তিজ্ঞান এই 'জ্ঞাতা অহং' এবং 'জ্ঞেয় ইদং' সর্ব্ব অবস্থায় এই দুইয়ের সমষ্টি মাত্র। এক ভাবে দেখিলে এই অহং ইদং জ্ঞান 'জ্ঞাতা অহং' 'জ্ঞেয় ইদং' 'কর্ত্তা অহং' 'কার্য্য ইদং' এবং 'ভোক্তা অহং' 'ভোগ্য ইদং' এই তিন ভাগে বিভাগ করা যায়। কিন্তু 'ভোক্তা অহং' ও 'কর্ত্তা অহং' ইহা এক অর্থে 'জ্ঞাতা অহং' এর অন্তর্ভূত। এবং 'ভোক্তা ইদং' ও 'কার্য্য ইদং' 'জ্ঞেয় ইদং' এর অন্তর্গত। এজন্য 'জ্ঞাতা অহং' ও 'জ্ঞাতা ইদং' সামান্যত জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুই বিভাগই যথেষ্ট। সঙ্কর জ্ঞানের এই দুই বিভাগই গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কোথাও তিনি অহং বা ইদং বা ত্বং কোথাও বা আত্মা ও অনাত্মা এই বিভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। 'বেদান্ত পরিভাষায়' প্রমাতৃ চৈতন্য ও প্রমেয় চৈতন্য এই বিভাগ গৃহীত হইয়াছে। সাংখ্য দর্শনে জ্ঞানের এইরূপ বিভাগ উক্ত হয় নাই বটে, কিন্তু পুরুষ প্রকৃতি এই বিভাগই গৃহীত হইয়াছে এবং পুরুষকে চেতনজ্ঞ স্বরূপ এবং প্রকৃতিকে অচেতন জড়রূপে গৃহীত হইয়াছে।

যাহা হউক, জ্ঞানের জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুই বিভাগ সম্বন্ধে সঙ্কর বলিয়াছেন যে, যাহা জ্ঞেয়, তাহা জ্ঞাতা হইতে পারে না এবং যাহা জ্ঞাতা, তাহা জ্ঞেয় হইতে পারে না। এই

অধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন "জ্ঞেয় ধর্ম্ম জ্ঞাতায় ও জ্ঞাতার ধর্ম্ম জ্ঞেয় আরোপিত করা অবিদ্যার কার্য্য।" * * "যাহা জ্ঞেয়, তাহা কখন আপনার দ্বারা জ্ঞেয় হইতে পারে না, তাহার নিজের প্রকাশের জন্য আত্মব্যতিরিক্ত প্রকাশের অপেক্ষা করিয়া থাকে। আর জ্ঞাতা স্বপ্রকাশ, নিজের প্রকাশের জন্য অন্য কাহারও বা কিছুরই অপেক্ষা রাখে না।" * * যদি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর সহিত সম্বন্ধ জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া, আর একজন জ্ঞাতা কল্পনা করিতে হয়। জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ—জ্ঞানের বিষয় হইলে, তাহার আশ্রয় বলিয়া আর একটী জ্ঞাতা কল্পনা করিতে হয়। এইরূপ ভাবে জ্ঞাতৃত্ব কল্পনার শেষ পাওয়া যায় না; সুতরাং অনবস্থা দোষ হয়। যদি অবিদ্যা কেবল জ্ঞেয়ই হয়, জ্ঞাতার সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকে, তবে জ্ঞাতা কেবল জ্ঞাতাই হইবে, জ্ঞেয় হইতে পারিবে না। সুতরাং অবিদ্যা ও তৎকার্য্য দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা কোন প্রকারে দূষিত হইতে পারে না।" বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যের উপক্রমণিকায় সঙ্কর যে অধ্যানবাদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ 'অহং' ও 'ত্বং' বা 'ইদং' এই বিভাগ সম্বন্ধেও এইরূপ কথা বলিয়াছেন। যুষ্মদ্ অর্থাৎ ইদং। অস্মদ্ অর্থাৎ অহং। 'ইদং' বা 'এই' এতদ্রূপ জ্ঞানের আস্পদ্ বা আলম্বন অনেক; কিন্তু 'অহং'—'আমি' এতদ্রূপ জ্ঞানের আস্পদ বা গোচর এক। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও প্রত্যেক বাহ্য বস্তু,—সমস্তই ইদং প্রত্যয় গোচর—'এই' বা 'ইহা' বলিবার যোগ্য অথবা 'এই' এতদ্রূপ জ্ঞানের বিষয়। কিন্তু আত্মা অস্মদ্ শব্দের গোচর ও 'অহং' 'আমি' এতদ্রূপ জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ অহং জ্ঞানের আলম্বন বা আমি বলিবার যোগ্য। যাহা ইদং জ্ঞানের জ্ঞেয় তাহা বিষয় এবং যাহা অহং জ্ঞানের জ্ঞেয় তাহা বিষয়ী। চিৎ স্বভাব আত্মা বিষয়ী, তাঁহার দেহাদি বিষয় আছে বলিয়া তিনি বিষয়ী—তদ্ভিন্ন অন্য সমস্ত তাঁহার বিষয় অর্থাৎ জড় বা চিৎ প্রকাশ্য। অন্ধকার এবং আলোক যেমন পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব অহং প্রত্যয়গম্য চিৎস্বভাব আত্মা ও ইদং প্রত্যয়গম্য জড় স্বভাব অনাত্মা, ইহারাও তেমনি পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব। যাহা আলোক তাহা অন্ধকার নহে, আর যাহা অন্ধকার তাহা আলোক নহে। এইরূপ যাহা আত্মা তাহা অনাত্মা নহে এবং যাহা অনাত্মা তাহা আত্মা নহে। সুতরাং অহং জ্ঞান জ্ঞেয় আত্মার সহিত ইদং জ্ঞান জ্ঞেয় অনাত্মার ইতরেতরত্ব অর্থাৎ পরস্পরাধ্যাস বা তাদাত্ম্য বিভ্রম থাকা যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ বা উপপন্ন হয় না।" (পণ্ডিতবর কালীবর বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক অনূদিত 'বেদান্ত দর্শনম্') সঙ্করাচার্য্য এইরূপে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের প্রভেদ স্থাপন করিয়াছেন। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় যেন জ্ঞানের দুইটী পক্ষ। ইহাদের সহায়ে জ্ঞান বিষয় মধ্যে বিচরণ করে, বিষয় আহরণ করে এবং তাহার দ্বারা আপনাকে পরিপুষ্ট করে। সঙ্কর বলেন যে, গীতায় এই যে ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্র বিভাগ উক্ত হইয়াছে, তাহাই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিভাগ মাত্র। ক্ষেত্রজ্ঞই জ্ঞাতা আর জ্ঞেয় তাহার ক্ষেত্র। অবিদ্যা বা অজ্ঞান বশে এই জ্ঞেয় ক্ষেত্রে জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞের অধ্যাস হয় ও সে জন্য ক্ষেত্রজ্ঞ আপনাকে ক্ষেত্র হইতে পৃথক ভাবে ভাবনা করিতে পারে না। অবিদ্যা বা অজ্ঞান দূর হইয়া যদি জ্ঞানের বিশেষ প্রকাশ হয়, তবেই এই প্রভেদের ধারণা হয়। ক্ষেত্রজ্ঞ আপনাকে ক্ষেত্র হইতে পৃথক রূপে জানিতে পারে। তাই ভগবান বলিয়াছেন

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং
মতং মম ॥ ১৩।২

ক্ষেত্রজ্ঞকে ক্ষেত্র হইতে পৃথক করিয়া জানিবার একমাত্র উপায় এই যে, যাহা জ্ঞেয়, তাহা জ্ঞাতা হইতে পারে না ও যিনি জ্ঞাতা, তিনি জ্ঞেয় হইতে পারেন না। এই ক্ষেত্র বা শরীর মধ্যে যে মহাভূত হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত ৩১টী উপাদান ভগবান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেগুলি সকলেই জ্ঞেয়। এজন্য তাহার কোনটীই জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞ নহে। ক্ষেত্রজ্ঞ ইহা হইতে পৃথক। যতদিন এই জ্ঞান লাভ না হয়, ততদিন আমাদের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞের অধ্যাস থাকে। প্রথমে আমাদের স্থূল দেহাধ্যাস বড় প্রবল থাকে। এই স্থূল দেহই যে আমি, তখন এই ধারণা থাকে। তখন 'অয়ং আত্মা অন্নরসময়'। এই অধ্যাস দূর হইলে তখন আমি প্রাণ এইরূপ অধ্যাস থাকে 'তখন অয়ম আত্মা প্রাণময়'! সে অধ্যাস দূর হইলে তখন আমি মন, এই অধ্যাস থাকিয়া যায়। তখন 'অয়ম আত্মা মনোময়'। এ অধ্যাস দূর হইলে আমি বুদ্ধি, এই অধ্যাস থাকে, তখন 'অয়ম আত্মা বিজ্ঞানময়'। এ অধ্যাসও যদি দূর হয়, তখন 'অয়ম আত্মা আনন্দময়' এই অধ্যাস থাকিয়া যায়। তখনও অব্যক্তে বা মূল প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বা আনন্দময় কোষে অবস্থান করিয়া আত্মা আপনাকে আনন্দময় মনে করে। এ অধ্যাসও দূর না হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞাতা আপনার স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে না। এই যে অধ্যাস, ইহার মূল অজ্ঞান বা অবিদ্যা। পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে অস্মিতা পঞ্চ পর্ব্ব অবিদ্যার এক পর্ব্ব মাত্র। এই অস্মিতা দূর না হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্র হইতে আপনাকে পৃথক জানিয়া স্বস্বরূপে অবস্থান করিতে পারে না। সাংখ্যকারিকায় আছে—

এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষং।
অবিপর্য্যায়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানং ॥
৬৪।

সাংখ্য দর্শন অনুসারে পুরুষের অধিষ্ঠান হেতু প্রকৃতি হইতে প্রথম যে বুদ্ধি তত্ত্বের অভিব্যক্তি হয়, তাহা হইতেই অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়, এই অহঙ্কারই 'অহং' 'মম' ও 'ইদম' এই বিভাগের মূল। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন। রাজসিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণ ও তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্রা ও স্থূল বিষয়ের অভিব্যক্তি হয়, অতএব এই অহং ও ইদং বিভাগ বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিভাগ প্রকৃতিজ অহঙ্কার হইতেই অভিব্যক্ত। পুরুষ অজ্ঞান বশে প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রকৃতিজ গুণ ভোগ করে বলিয়া এই অহন্তা ও মমতা বুদ্ধিতে বা অহং ইদং জ্ঞানে বদ্ধ হয়। বাস্তবিক জ্ঞ স্বরূপ পুরুষের জ্ঞান নির্ব্বিশেষ, নিরুপাধিক, অখণ্ড ও ভূমা। তাহাতে এই জ্ঞাতা জ্ঞেয় বিভাগ নাই, অথবা তাহা একীভূত। এ তত্ত্ব এস্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই।

যাহা হউক, আমরা ইহা হইতে বুঝিতে পারি যে, সাংখ্য দর্শন অনুসারে যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ অহং তিনি স্বরূপতঃ আত্মা নহেন, তিনি প্রকৃতিজ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত আত্মার রূপ (Phenomenal self) মাত্র। কিন্তু সঙ্কর এ কথা স্বীকার করেন না। এইরূপে সাংখ্য দর্শন অনুসারে সঙ্করের জ্ঞাতা জ্ঞেয় বিভাগে যে আপত্তি হইতে পারে, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। ইহা ব্যতীত এই জ্ঞাতা জ্ঞেয় বিভাগ সম্বন্ধে আরও এক আপত্তি হইতে পারে। সঙ্কর জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় মধ্যে যে ভেদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা দূর করিয়া অভেদ বা অদ্বৈত জ্ঞান সহজে সম্ভব হয় না। আমরা

জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে একীভূত করিবার কোন মূল সূত্র পাই না। সঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ স্থাপনের জন্য এই জ্ঞেয়কে মায়িক কাল্পনিক বা অবাস্তব বলিয়াছেন। কিন্তু উপনিষদে বা বেদান্ত দর্শনে এবং গীতায় কোথাও জ্ঞেয় জগৎকে মায়িক বা মিথ্যা বলা হয় নাই। শ্রুতির মহাবাক্য যেমন 'অহং ব্রহ্মাস্মি' সেই রূপ 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। শ্রুতিতে এই অহং ও ইদং বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই উভয়কে এক ব্রহ্ম তত্বের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয় তত্ব একীভূত। অহং ও ইদং উভয়েই সমন্বিত হইয়াছে। সুতরাং সঙ্করের জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভেদবাদ কেবল আমাদের বৃত্তি জ্ঞান সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে।

জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই বিভাগ আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শনের subject ও object বিভাগ এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিভাগের অনুরূপ। এস্থলে তাহা বুঝিবার প্রয়োজন নাই। গীতায় কিন্তু এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিভাগ বা 'অহং' 'ইদং' বিভাগ গৃহীত হয় নাই। তাহার পরিবর্ত্তে ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র বিভাগ গৃহীত হইয়াছে। কেন গৃহীত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বুঝিতে হইবে। গীতায় উক্ত হইয়াছে—

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্বং স্থাবর জঙ্গমম্।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥
১৩।২৬

এ জগতে যাহা কিছু বস্তু বা সত্বা আমাদের জ্ঞানগোচর হয়, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। স্থাবর ও জঙ্গম বা অচর ও চর। জঙ্গম সত্বা বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীবর্গ। আর স্থাবর কেবল উদ্ভিদ্ নহে। যাহাকে আমরা জড় বলি, তাহাও স্থাবরের অন্তভূত। ভগবান পূর্ব্বে বলিয়াছেন 'অহং স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ।' অতএব অতি ক্ষুদ্র জড় অণু বা জীবাণু হইতে অতি বৃহৎকায় জড় বা জীব সমুদায় এই স্থাবর বা জঙ্গমের অন্তর্ভূত। এ তত্ব পরে ১৪শ অধ্যায়ে ২।৩য় শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত হইবে। গীতা অনুসারে ক্ষুদ্রতম জড় বা জীবাণু হইতে অতি বৃহৎ জড় বা জীব পর্য্যন্ত সমুদায় স্থাবর জঙ্গমাত্মক সত্ব ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগে উদ্ভূত হয়। অতি ক্ষুদ্র জড়াণু বা জীবাণু মধ্যে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়ই সংযুক্ত থাকে। এবং প্রত্যেকের মধ্যে ক্ষেত্রের যে ৩১টী উপাদানের কথা এ স্থলে উক্ত হইয়াছে, তাহাও নিহিত থাকে। আমরা ক্ষুদ্র জড়াণুর মধ্যে অবশ্য এই ক্ষেত্রজ্ঞের ও ক্ষেত্রর অন্তর্গত বুদ্ধি-মন অহঙ্কার ইন্দ্রিয় প্রভৃতির প্রকাশ দেখিতে পাই না। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে এগুলি বীজ ভাবে থাকে, তাহা গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। জড় ও উদ্ভিদ্ সমুদায় স্থাবর ও নিম্ন শ্রেণীস্থ প্রাণীবর্গ অন্তঃ 'সংজ্ঞ'। কেবল উচ্চ শ্রেণীর জীব ও মনুষ্য বহিঃ সংজ্ঞ। * মনুসংহিতায় ইহা উক্ত হইয়াছে। এবং বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি পুরাণেও ইহা বিবৃত হইয়াছে। অতি ক্ষুদ্র জড় বা জীবাণু হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্ন জাতীয় জীব পর্য্যন্ত যাহা কিছু সত্ব আছে, তাহারা সন্তঃসংজ্ঞ বলিয়া তাহাদের বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয়গণ অপ্রকাশিত ও বীজ ভাবে নিহিত থাকে। এজন্য তাহাদের বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাকে না। কেবল উচ্চ জাতীয় জীবে ও মনুষ্য মধ্যে বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয়গণের বিকাশ হয় বলিয়া তাহারা বহিঃসংজ্ঞ হয় ও বাহ্য বিষয় গ্রহণ করিতে পারে। মনুষ্যাদি

* জর্ম্মান পণ্ডিত সপেনহর বলিয়াছেন, "consciousness sleeps in stones, dreams in animals and awakes in man."

উচ্চজাতীয় জীব জ্ঞানেই কেবল বাহ্য জ্ঞেয় বিষয় বা ইদং জ্ঞান অভিব্যক্ত হয়। নিম্ন জাতীয় জীবে তাহা হয় না। সুতরাং সমুদায় স্থাবর জঙ্গমাত্মক সত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিভাগ সঙ্গত হয় না, কেবল ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগই সঙ্গত হয়। নিম্নজাতীয় জীবে ক্ষেত্র-জ্ঞের কেবল ক্ষেত্র সম্বন্ধীয় অনুভূতি থাকে। অন্য কোনরূপ অনুভূতি থাকে না। তাই ভগবান বলিয়াছেন—

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্‌যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি
তদ্বিদঃ॥ ১৩।১

এস্থলে 'বেত্তি' শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে। জ্ঞানার্থক বিদ্‌ ধাতু হইতে বেত্তি। বিদ্‌ ধাতু হইতে বেদনা। বেদনার অর্থ অনুভব করা, অতএব যাহা অপরোক্ষ ভাবে অনুভব করা যায়, তাহাই বেদনা। যে এইরূপ অনুভব করে, সেই বেত্তা। অতএব এই শ্লোকের অর্থ এই যে,যে ক্ষেত্র বা দেহ মধ্যে আপনাকে সেই দেহরূপে অনুভব করে, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ। স্থাবর জঙ্গমাত্মক সকল সত্ত্বাতে যে সেই সেই ক্ষেত্ররূপে আপনাকে বিশেষ ভাবে অনুভব করে, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ। তাহার বাহ্য বিষয়ের অনুভূতি থাকুক বা না থাকুক, সর্ব্ব অবস্থায় তাহার এই অন্তরানুভূতি থাকে, ইহাই সর্ব্ব জীব সম্বন্ধে বা সর্ব্ব সত্ত্বা সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম। জ্ঞাতা জ্ঞেয় বিভাগ কেবল উচ্চ শ্রেণী জীবে বিশেষতঃ মনুষ্য সম্বন্ধেই সম্ভব। নিম্ন শ্রেণীর সত্ত্বাতে তাহা সম্ভব নহে। এজন্য গীতোক্ত ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগই বিশেষ সঙ্গত। সে যাহা হউক, মানুষের জ্ঞান যখন বিকাশিত হয়, শুদ্ধ সাত্ত্বিক হয়, তখন মানুষ আপনাকে জ্ঞাতারূপে এবং তাহার শরীরকে ও বাহ্য জগৎকে জ্ঞেয় রূপে জানিতে পারে। তখন সে জ্ঞাতা রূপে আপনাকে আপনার জ্ঞেয় ক্ষেত্র হইতে ও জ্ঞেয় বাহ্য জগৎ হইতে পৃথক করিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ আপনার স্বরূপ জানিতে পারে। এবং সেই জ্ঞান প্রকৃতরূপে লাভ করিয়া পরম অক্ষর রূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। তখন ক্ষেত্রের সহিত তাহার আর কোন সম্বন্ধ থাকে না, তাহার কৈবল্য মুক্তি হয়। কিন্তু এই জ্ঞানও জ্ঞানের শেষ সীমা নহে। এই মুক্তিও চরম মুক্তি নহে। যখন ক্ষেত্রজ্ঞ সর্ব্বান্তর্ভূত আত্ম হইয়া সমুদায়কে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া সর্ব্ব ক্ষেত্রে আপনাকে এক মাত্র ক্ষেত্রজ্ঞরূপে জানিতে পারে, যখন সে আপনার সর্ব্বাত্মা সর্ব্বেশ্বর স্বরূপ জানিতে পারে, সেই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়,তখনই তাহার ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান পূর্ণরূপে লাভ হয়। তখন সে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে পারে। সে ঈশ্বর ভাবে ভাবিত হয়। তাই ভগবান বলিয়াছেন—

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম॥
১৩।২

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

সাহিত্য সাধনা।

সুদূর ভবিষ্যৎদর্শী সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কিছুকাল পূর্ব্বে রংপুরে সভাপতির আসন হইতে যে মর্ম্মস্পর্শী গভীর তত্ত্ব আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, তাহাই আমাদিগের মূলমন্ত্র স্বরূপ গ্রহণ করিয়া সাহিত্যালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। যদি সফলতার আশা করি, তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা ভিন্ন অন্য পন্থা নাই। তাঁহার প্রচারিত মন্ত্রের ভাষ্য হইতে পারে, কিন্তু ইহার সহিত কিছুই যুক্ত হইতে পারে না। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা আত্মসাৎ করিতে হইবে; তৎপর সৎ-সাহসের সহিত কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে; নচেৎ আমাদিগের সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা রহিয়াছে। তিনি বলিতেছেন, "সকল জাতিরই এক একটা লক্ষ্য থাকা আবশ্যক আছে, আছেও। লক্ষ্যহীন জাতি কদাচ অভ্যুদয়শালী ও কালজয়ী হইতে পারে না। * * * লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিলে কিছুই অসম্ভব নহে। অতি দুষ্কর এবং দুঃসাধ্য কার্য্যও সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে * * * আমাদিগের এই জাতীয় সাহিত্যের মন্দির নির্ম্মাণেও একটা স্থির লক্ষ্য আবশ্যক, অন্যথা আমরা সফলকাম হইতে পারিব না। আমাদিগের সেই লক্ষ্য কি হওয়া উচিত? কোন লক্ষ্যে স্থির চিত্ত থাকিয়া, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি হইতে পারিয়াছিলেন? কোন্ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হওয়া নিবন্ধনই আমরা ক্রমে অধঃপতিত হইতেছি? ইহাই আমাদের সর্ব্বাগ্রে দ্রষ্টব্য ও বিবেচ্য।" এই কথা বলিয়া সার আশুতোষ বলিতেছেন, "ভারতবর্ষ যে এত উন্নত হইয়াছিল, সে একমাত্র ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া। * * ধর্ম্মভাব হিন্দুজাতির প্রধান লক্ষ্য ছিল, ধর্ম্মভাবকেই তোমার বর্ত্তমান জাতীয়তারও প্রধান লক্ষ্য কর। তোমার সাহিত্য, সমাজনীতি, আচার-ব্যবহার সর্ব্বত্রই সেই ভারত স্পৃহণীয় ধর্ম্মভাবের স্ফুরণ কর। * * * অন্তরের সমস্ত আবেগ, উৎসাহ, ও নির্ভর একত্র করিয়া যদি জাতীয় সাহিত্য গঠন করিতে পার, দেশের ও জাতির মঙ্গল হইবে।"

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, আমাদিগের সাহিত্য সেবার কোন লক্ষ্য আছে কি না? নিশ্চয়ই সাহিত্য সেবামাত্রই লক্ষ্য নহে; উহা উপলক্ষ্য মাত্র। মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির পন্থা মাত্র। লক্ষ্যভেদ করিবার বাণ মাত্র। আমাদিগের লক্ষ্য কি? শুধু সাহিত্য সেবা, না সৌন্দর্য্য সম্ভোগ; না পুরস্কার লাভ! না আর কোন গুরুতর লক্ষ্য আছে? মনীষী সার আশুতোষ বলিতেছেন, একবার নহে, বহুবার বলিয়াছেন, "জাতীয়তার গঠন করিতে হইলে জাতীয় সাহিত্য গঠন সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।" আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি, একথা চরম সত্য। জাতীয়তা গঠন করাই লক্ষ্য; সাহিত্যসেবা তাহার উপায়। ধর্ম্মপ্রাণ সৎসাহসী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জাতীয়-মঙ্গলকামী ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের জাতীয়তা গঠন করিবার, সুতরাং জাতীয় সাহিত্যে হস্তক্ষেপ করিবার কোনও অধিকার নাই। আপনারা কি "অন্তরের সমস্ত আবেগ, উৎসাহ ও নির্ভর একত্র করিয়া," ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া, সাহিত্য সাধনায় ব্রতী

হইয়াছেন? রং তামাসা, করতালি, বাচালতা, চটুলতা, ধর্ম্মবিরুদ্ধ, সমাজবিরুদ্ধ, বিপ্লবকারী উশৃঙ্খলভাব, স্বেচ্ছাচারিণী ভাষা, সকল সাহিত্য সাধনার পরিপন্থী। সাহিত্য-সাধনা প্রকৃত পক্ষেই ধর্ম্ম সাধনা। আমরা সাহিত্যের যোগে সমাজকে উন্নত করিতে চাই। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, স্বদেশবাসীগণকে ঈপ্সিতভাবে অনুপ্রাণিত করিতে চাই। এক কথায়, লক্ষ্যের উপযোগী করিতে চাই। এ দেশকে ধনে, জনে জ্ঞানে, ধর্ম্মে প্রাচীন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই। ডারউইন্ বলিতেছেন:—"An increase in the number of well endowed men and an advancement in the standard of morality will certainly give an immense advantage to one race over another "Well endowed." শব্দ তিনি বিশদ করিয়া বুঝাইয়া বলিতেছেন:—Our moral sense or conscience becomes a highly complex sentiment—originating in the social instincts, largely guided by the approbation of our fellow-men, ruled by reason, self-interest and in later times by deep religious feelings and confirmed by instruction and habit [Descent of man, 1916 p 203]. সার আশুতোষ যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়াছেন, ডারুইন্ এস্থলে তাহারই একাংশ ব্যাখ্যা করিতেছেন। সমাজপ্রীতি, প্রজ্ঞা এবং ধর্ম্মভাব মিশিয়া আমাদিগের সাহিত্য-সাধনার সহায় হউক। কিন্তু তাহা কি হইতেছে? আমি ত সাহস করিয়া তাহা বলিতে পারি না। ডারুইন্ যে শিক্ষার ও যে অভ্যাসের উল্লেখ করিয়াছেন, সে শিক্ষা সুকুমার সাহিত্যে, ইতিহাসে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, সর্ব্বত্র হইতে সমভাবে আত্মপ্রকাশ করুক। আর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কথা, সে শিক্ষা গ্রহণ করিবার, সে সমাজপ্রীতি অনুভব করিবার, সে প্রজ্ঞার দ্বারা পরিচালিত হইবার এবং সে গভীর ধর্ম্মভাবে উত্তেজিত হইবার যোগ্য লোক জাত হউক। শিক্ষা দিলেই হয় না; ভাব বিস্তার করিলেই হয় না; তাহা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি চাই। গুরু সকলকেই শিক্ষা দেন, কিন্তু সকলে তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। শিক্ষা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি চাই। ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইবার যোগ্য ব্যক্তি চাই। কিন্তু ব্যক্তি পিতৃকুলের ও মাতৃকুলের দোষ গুণের অধিকারী হয়।

যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী সুতং সূতে তথা
বিধং। মনু।৯।৯

এ নিমিত্ত সমাজপ্রীতি, প্রজ্ঞা, নীতি ও ধর্ম্মভাব, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও সৎসাহস পরিপূর্ণ স্বামী স্ত্রীর সন্তান সন্ততিজাত হওয়া চাই; তাহারাই সর্ব্ববিধ সাধনার সুতরাং সাহিত্য সাধনার অধিকারী, অন্যে নহে। যেন-কেন দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া আমরা আজি এক শতাব্দী হইল ধর্ম্মপ্রচারে, সমাজ-সংস্কারে, ধনার্জ্জনে, রাজনীতি ক্ষেত্রে, শিল্প-বাণিজ্যে, সকল বিষয়েই অকৃতকার্য্য হইতেছি। ইহা সর্ব্বজন-বিদিত কথা। যথাযোগ্য নরনারী দ্বারা, "Well endowed" জনগণ দ্বারা ভবিষ্যৎ বংশ গঠিত না হইলে এ সাধনায় ফললাভের আশা নাই। সকল কর্ম্মেই অধিকারী অনধিকারী ভেদ আছে। স্বদেশে বিদেশে করতালী লাভ করিলেই চলিবে না। গভীর পরিতাপের সহিত অনুভব করিতে হইবে,— "আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়িয়া রহিয়াছি।" সার আশুতোষের ভাষায় বলি, "কেবল পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করিয়া, পূর্ব্বের

অতীত সম্পদের আলোচনা করিয়া, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলে কোনই ফলোদয় হয় না। নিজের জাতীয় জীবনের শক্তি যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, তাহার প্রয়াস স্বতঃপরতঃ করিতে হইবে। শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে।" এবং বংশানুক্রমে এ শক্তিকে উন্নত রাখিতেও হইবে। যাহারা দেহে এবং মনে অধঃপতিত, তাহাদিগের দ্বারা পর-পর-বংশ গঠিত হইলে আমরা অধঃপতিত হইবই। "শক্তি সঞ্চয়" করিব কিরূপে? যে সকল শাস্ত্র আলোচনায় বংশানুক্রমে এতদ্দেশীয় জনগণের দেহে ও মনে শক্তি "সঞ্চিত" হইতে পারে; ধনবল, জনবল, নীতি ও ধর্ম্মবল স্ফূরণ হইতে পারে, তাহা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত আয়ত্ত করুন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন ও ভূতত্ত্ব; জীব বিজ্ঞান লোকতত্ত্ব ও অর্থশাস্ত্র, সমাজতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম্মতত্ত্ব, বিশেষ ভাবে আত্মসাৎ করুন। এ সকল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় উপন্যাসে, কবিতায় ও নাটকে, ইতিহাসে ও পুরাতত্ত্বে, ন্যায় ও দর্শনে সমস্বরে চারিদিক হইতে উদ্গীত হউক। বংশপরম্পরায় বঙ্গ সাহিত্যের মধ্য দিয়া এতদ্দেশীয় জনগণের হৃদয়ে এ তত্ত্ব সকল অমর অক্ষরে ক্ষোদিত হউক; তবেই সফলতার আশা করা যায়। কিন্তু গভীর পরিতাপের সহিত স্বীকার করিতে হইবে, বঙ্গ সাহিত্য এ সকল পথ এখনও খুঁজিয়াই পাইতেছে না। এ সকল শাস্ত্র যে বঙ্গ সাহিত্যের অঙ্গীভূত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, তাহা আমরা প্রায় অনুধাবনই করি না। তাহা হইলেও, এ পন্থা ভিন্ন বংশপরম্পরায় উন্নতির এবং সদ্ভাব-বিস্তৃতির অন্য পন্থা নাই। এ কথা মুখে বলা যত সহজ, কার্য্যে পরিণত করা তদ্রূপ নহে। "Well-endowed" অর্থাৎ যথাযোগ্য বংশপরম্পরা গঠন করিব কিরূপে? যথাযোগ্য নরনারীর পবিত্র বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া। দেহে ও মনে অধঃপতিত জনগণের সংখ্যা সমাজ মধ্যে যতই কম হইবে, সমাজপ্রীতি, প্রজ্ঞা, নীতি ও ধর্ম্মবলে বলীয়ান জনগণের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইবে, ততই সৎশিক্ষা ও সৎভাব গ্রহণের যোগ্য ব্যক্তি বংশপরম্পরায় জাত হইবার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং এতদ্দেশীয় সমাজও উন্নত হইবে। অযোগ্যের বর্জ্জন ও যোগ্যের বর্দ্ধন সমাজকে উন্নত করিবার একমাত্র উপায়। বর্ত্তমান লোকতত্ত্বের আলোচনা হইতে পরিষ্কার বুঝাই যাইতেছে যে, দেহে ও মনে উন্নত ব্যক্তি গঠন করিতে হইলে, তদ্রূপ নরনারী পরিণীত হওয়া আবশ্যক।* কিন্তু এতদ্দেশে বিবাহ ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ; আমরা কেমন করিয়া এ সাধনায় সিদ্ধ হইব? বড়ই কঠিন কথা। তথাপি সার আশুতোষের সাহস বাক্য স্মরণ করুন— "লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিলে কিছুই অসম্ভব নহে।" সুতরাং দেশমধ্যে এ ভাবের বিস্তৃতি হইলে, অগ্রণীগণের হৃদয়ে এ ভাব বদ্ধমূল হইলে, কিছুই অসাধ্য নহে; কারণ অপরে তাঁহাদিগের পথানুসরণ করিবেই। একাগ্র সাধনায় সকলই সিদ্ধ হয়। বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক ডন্‌ক্যাষ্টার সাবধানতার সহিত বলিতেছেন:—The whole tread of the results obtained is that inorder to produce exceptionally gifted men in both body and mind, those with high development of the characters desired should be encouraged to marry and that to prevent the production of the weakly and feeble-minded, the

* মেণ্ডেলের বিধান এই সিদ্ধান্তকে অধিক পরিবর্ত্তিত করে না।

only method is to prevent such from having off spring. It is admitted that at present these things hardly come within "practical politics." But there is little doubt that the nation which first finds a way to make them practical, will in a very short time be the leader of the world.

—*Heredity p. 51.*

তাহা হইলেও দেহে ও মনে অধঃপতিতদিগকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিতে পারি না। তাহারা মোটের উপর সমাজস্থিতির এবং সামাজিক উন্নতির পরিপন্থী হইলেও, কখন কখন সমাজের বিবিধ উপকার সাধন করিয়া থাকে, ইহা সত্য। তাহাদিগকে বর্জ্জন করিলে ফলতঃ সমাজ লাভবান হইবে; কিন্তু কদাচ ক্ষতিগ্রস্তও হইতে পারে। সমাজে সকল কার্য্যই ভালমন্দের তারতম্যের উপর নির্ভর করে। সুতরাং ইহাদিগকে বর্জ্জন করা যেমন দুঃসাধ্য, তেমনি ক্লেশকর। তথাপি সমাজদ্রোহী, চরিত্রহীন, ধর্ম্মহীন, সৎসাহস-শূন্য জনগণের আবির্ভাব যত অসম্ভব করা যায়, ততই সমাজের মঙ্গল; এ বিষয়ে কোনই সন্দেহের কারণ নাই। যে জাতি ইহারই পন্থা সর্ব্বাগ্রে আবিষ্কার করিবে, ও সৎ সাহসের সহিত কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইবে, সেই জাতিই ধরাতলে অগ্রণী হইবে। সকল সাধনার ন্যায় এ সাধনাও ভাবের ও জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। সে ভাব, সে জ্ঞান আপনারা শ্রদ্ধার সহিত মুক্তহস্তে বিতরণ করুন। সাহিত্য-সেবা, সাহিত্য সাধনাকে জয়যুক্ত করিতে হইলে, সমাজকে পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, এই পন্থা অবলম্বন করিতেই হইবে। এক্ষেত্রে অন্য পন্থা নাই। কিন্তু এ পন্থা আবিষ্কার করিব কেমন করিয়া? এতদ্দেশীয় একটী পূর্ব্ব প্রথার সংস্কার করিয়া। সকলেই জানেন, এতদ্দেশে পূর্ব্বে ঘটকগণ কোথায় কোন্ বিবাহ হইল, কাহার ক'টি সন্তান সন্ততি হইল, তাহা গ্রন্থাকারে লিখিয়া রাখিতেন। তখন সকলেই এ সকল গ্রন্থকে শ্রদ্ধা করিতেন। আমরা কি জাতীয় উৎকর্ষকে লক্ষ্য করিয়া তদ্রূপ গ্রন্থ রক্ষা করিতে পারি না? এ কালের এক সম্প্রদায় বৈজ্ঞানিক ঘটকগণ উপরের বর্ণিত সদ্‌গুণাবলী-মণ্ডিত নরনারীগণের, নাম নিবাস, গোত্রাদি জ্ঞাতব্য বিষয় গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে ও সেই সকল দেশ মধ্যে প্রচার করিতে পারেন না কি? এতদ্দেশীয়গণ বিবাহ ক্ষেত্রে সেই সমস্ত গ্রন্থের নির্দ্দেশানুসারে কার্য্য করিলেই ত উল্লিখিত পন্থা আবিষ্কারের প্রধান ও প্রথম কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। দেহে ঈপ্সিত ভাবের প্রচার ও কল্যাণময় বৈজ্ঞানিক ঘটকগণের আবির্ভাব, এই দুইটী গুরুতর কর্ম্ম সাহিত্যের দ্বারা সুসম্পন্ন হইলেই সাহিত্য সাধনা কৃতার্থ হইবে; কালের বক্ষে পদাঙ্ক স্থাপন করিয়া আপনারাও ধন্য হইবেন।

শ্রীশশধর রায়।

শিবসূত্র।

সংস্কৃত সাহিত্যে শিবসূত্র নামে অন্ততঃ চারিখানি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে। প্রথমতঃ পাণিনীয় ব্যাকরণের প্রত্যাহার সূত্র কয়টী মাহেশ্বরসূত্র বা শিবসূত্র নামে প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, পাশুপতমতবোধক পাশুপতসূত্রও শিবসূত্র নামে প্রসিদ্ধ। তৃতীয়তঃ, উৎপল দেবকৃত ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাকারিকা বা প্রত্যভিজ্ঞাসূত্রও শিবসূত্র নামে খ্যাত। চতুর্থতঃ, বসুগুপ্তের আবিষ্কৃত সূত্রগ্রন্থ শিবসূত্র নামে পরিচিত।

ইহার মধ্যে প্রথমখানি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পাণিনি খৃঃপূঃ পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্ত্তী হইতে পারেন না। ইহাই অধুনাস্বীকৃত পাণিনির কালনির্ণয়। পাণিনি তাঁহার সূত্রে যে সকল প্রত্যাহার ব্যবহার করিয়াছেন, সেগুলি প্রথমোক্ত শিবসূত্রের উপর নির্ভর করিতেছে। পতঞ্জলি পাণিনির সূত্রের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এই চতুর্দ্দশটী শিবসূত্রের মধ্যে কতিপয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কারণ এই চৌদ্দটী সূত্রের আদ্যন্ত গ্রহণ করিয়াই পাণিনি-ব্যবহৃত প্রত্যাহারগুলি বিরচিত হইয়াছে। অতএব এই শিবসূত্রের উৎপত্তিকাল বর্ত্তমান সময় হইতে সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসরের ন্যূন নহে। এই সূত্রগুলি যে কেবল ব্যাকরণশাস্ত্রের উপযোগী, তাহা নহে। ইহাতে দর্শনশাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্বও নিহিত আছে। ইহার ব্যাকরণশাস্ত্রোপযোগী ব্যাখ্যান পতঞ্জলি প্রভৃতি অনেকেই করিয়াছেন, কিন্তু ইহার দার্শনিক ব্যাখ্যা কেবল নন্দিকেশ্বর ও উপমন্যু করিয়াছেন।

দার্শনিক ব্যাখ্যাকারদ্বয় এই গ্রন্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিতেছি। কোন সময়ে সনকাদিসিদ্ধগণ ও পাণিনিপ্রভৃতি বৈয়াকরণ স্ব স্ব ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত আদিদেব মহেশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। তৎকালে মহাদেব তাণ্ডবে মত্ত ছিলেন। পরে নৃত্তাবসানে ইঁহাদের উপর তুষ্ট হইয়া তিনি চতুর্দ্দশ বার স্বীয় ঢক্কার নিনাদ করেন। তাহাতে চতুর্দ্দশটী সূত্র উৎপন্ন হয়। যথা—অ ই উ ণ্। ঋ ৯ ক্। এ ও ঙ্। ঐ ঔ চ্। হ য বর ট্। লণ্। ঞ ম ঙ ণ ন ম্। ঝ ভ ঞ্। ঘ ঢ ধ ষ্। জ ব গ ড দ শ্। খ ফ ছ ঠ থ চ ট ত ব্। ক প য়্। শ ষ স র্। হল্। নন্দিকেশের প্রথম কারিকায় এই বিবরণ আছে, যথা

> নৃত্তাবসানে নটরাজরাজো
> ননাদ ঢক্কাং নবপঞ্চবারান্।
> উদ্ধর্ত্তুকামঃ সনকাদিসিদ্ধান্
> এতদ্বিমর্শে শিবসূত্রজালম্॥

এই চতুর্দ্দশ সূত্রের সাহায্যে পাণিনি প্রত্যাহার রচনা পূর্ব্বক সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ সূত্র সকল নির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছিলেন। সনকাদি সিদ্ধগণ এই চতুর্দ্দশ সূত্রের মোক্ষোপযোগী অর্থগ্রহণে অসমর্থ হইয়া মহেশ্বরের অন্যতম গণাধিপ নন্দিকেশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তদনুসারে নন্দিকেশ কারুণ্যবশতঃ ষড়্‌বিংশতি কারিকাদ্বারা এই চতুর্দ্দশ সূত্রের ব্যাখ্যা করেন। সেই ব্যাখ্যাবলম্বনে সনকাদি সিদ্ধগণ পূর্ণকাম হন। এই নন্দিকেশ্বর কারিকা বা কাশিকাতে সর্ব্বসমেত ২৭টী কারিকা আছে। এই গ্রন্থ বাস্তবিক পক্ষে সূত্রের সমকাল হইতে প্রচলিত কি না, তাহা

নির্ণয় করা দুরূহ। এই গ্রন্থকে নন্দিকেশ্বরকাশিকা বলে, এজন্য কেহ বলিতে পারেন যে, অষ্টাধ্যায়ীর সুপ্রসিদ্ধ টীকা কাশিকা রচিত হইবার পরে এই গ্রন্থের প্রচার হয় এবং বামন জয়াদিত্যের কাশিকার অনুকরণে ইহাকে নন্দিকেশ্বরকাশিকা বলা হয়। কিন্তু মূল গ্রন্থে ইহার নন্দিকেশ্বরকাশিকা এই নাম নাই। নাগেশভট্ট প্রভৃতি বৈয়াকরণ ইহাকে নন্দিকেশ্বরকাশিকা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নন্দিকেশ্বরকারিকার টীকাকার উপমন্যুও ইহাকে কাশিকা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে উপমন্যুর টীকার বামন জয়াদিত্যের পরবর্ত্তিত্ব সূচিত হইতে পারে, কিন্তু ইহা দ্বারা কারিকার নবীনত্ব সূচিত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন কোন গ্রন্থে নন্দিকেশ্বরকারিকার উল্লেখ পাওয়া যায় না। বোধ হয় নাগেশভট্টই ইহার প্রথম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখের অভাব দ্বারা কোন গ্রন্থের নবীনতা অনুমান করা অসঙ্গত। কিন্তু এই গ্রন্থের সঙ্গত ভাবে কাল নির্ণয় করা দুরূহ। কোনরূপ বাহ্য প্রমাণ দ্বারা ইহাকে প্রাচীন বা নবীন কিছুই বলা যায় না। আভ্যন্তরিক প্রমাণও দুর্লভ। এই গ্রন্থ যে নন্দিকেশ্বরকৃত, তাহাও মূলে উল্লিখিত হয় নাই, কেবল উপমন্যুর টীকা হইতে এই কথা জানা যায়। উপমন্যু কত কালের লোক, তাহাও ঠিক করা যায় না। পিটারসন্ সাহেব (Dr. Peterson) ভ্রমক্রমে ইহাঁকে অভিমন্যু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ গ্রন্থে উপমন্যু নামই আছে, তথাপি তিনি টীকাকারকে কেন অভিমন্যু নামে উল্লেখ করিলেন, তাহা বুঝা যায় না। যদি ইহাকে ভ্রম বলা হয়, তবে এরূপ ভ্রম কিছু আশ্চর্য্যজনক। এই গ্রন্থের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে দু একটী মাত্র আভ্যন্তরিক যুক্তি পাওয়া যায়। গ্রন্থকার কয়েকটী পদ প্রয়োগ করিয়াছেন, যাহা পাণিনীয় বা অন্য প্রচলিত ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ। টীকাকারগণ ইহাকে আর্ষপ্রয়োগ বলিয়াছেন। যথা উল্লিখিত কারিকার "বিমর্শে" পদটী। টীকাকারগণ ইহাকে ক্রিয়াপদ বলিয়াছেন। কিন্তু পাণিনীয় ব্যাকরণের নিয়মে এরূপ ক্রিয়া পদ নিষ্পন্ন হয় না। লঘুশব্দেন্দুশেখরের চন্দ্রকলাভিধটীকাকার ভৈরব মিশ্র ইহাকে আর্ষপদ বলিয়াছেন। ঐ শ্লোকেই 'ননাদ' পদের অর্থ 'নাদয়ামাস' অর্থাৎ ঐ পদটী অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ। ইহাও কিঞ্চিৎ রীতি বিরুদ্ধ। এতদ্দ্বারা গ্রন্থকারকে প্রাচীন বলিতে হয়। (অবশ্য 'বিমর্শে' পদকে সপ্তম্যন্ত বলা যাইতে পারে, তাহাতে ক্রিয়াপদ উহ্য করিতে হয়, কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যায় কষ্ট কল্পনা করিতে হয়) দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থের রচনা রামায়ণাদির ন্যায় অত্যন্ত সরল। তৃতীয়তঃ বীজমন্ত্রের যে রীতিতে ব্যাখ্যা করা হয়, এই গ্রন্থে সেই রীতির প্রথম প্রয়োগ দেখা যায়। ইহাতেও ইহাকে প্রাচীন বলিতে হয়। যাহাই হউক, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, এরূপ যুক্তিজাল বিশেষ নির্ভরযোগ্য বা সর্ব্ব সংশয়চ্ছেদী নহে।

এইবার গ্রন্থের বিষয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। এই গ্রন্থের মতে পূর্ব্বোল্লিখিত চতুর্দ্দশটী শিবসূত্রে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জীবব্রহ্মের ঐক্য, সৃষ্টিতত্ত্ব এবং শিব ব্রহ্মবাদ এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে। হরিহরাদ্বৈতবাদও এই গ্রন্থের অভিপ্রেত। গ্রন্থকার বিষ্ণুশব্দের দ্বারা শিব অর্থ করিয়াছেন। বিষ্ণুশব্দের অর্থ সর্ব্বব্যাপী, শিব পরমেশ্বর ও সর্ব্বব্যাপী, অতএব বিষ্ণু শব্দও শিবকে বুঝায়, অতএব হরিহর অভিন্ন, ইহা প্রতিপাদিত হইল। উল্লিখিত চতুর্দ্দশটী শিবসূত্রের তাৎপর্য্য এইরূপ—(১)

নির্গুণ পরব্রহ্ম মায়াকে আশ্রয় করিয়া সগুণ ঈশ্বর হন। (২) মনোবৃত্তিরূপ মায়া দ্বারা জীব প্রভৃতি প্রকাশিত করেন। (৩) শিবই ঐশ্বরিক শক্তিবলে জীব ও জগৎ রূপে বর্ত্তমান থাকেন, এজন্য শিবই একমাত্র অদ্বিতীয় পরমার্থ, সগুণ ঈশ্বর ও পরমাত্মা একই বস্তু এবং তিনিই সর্ব্ববস্তুতে বর্ত্তমান। (৪) ব্রহ্মস্বরূপ শিব স্বান্তর্গত জগৎ বিস্তার করিতে ইচ্ছা করিয়া সগুণ হন। অতঃপর স্থূলতমক্রমে সৃষ্টির বিস্তার বর্ণিত হইতেছে। (৫) মহেশ্বর হইতে আকাশ, বায়ু, জল ও অগ্নির উৎপত্তি হয়। (৬) সর্ব্বাধারভূত ও অন্নাদির কারণ পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। (৭) শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ব্যোমাদির গুণ এই পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হয়। (৮) বাক্ ও পাণির উৎপত্তি হয়। (৯) পাদ, পায়ু, ও উপস্থ—এই কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল শিব হইতে উৎপন্ন হয়। (১০) শ্রোত্র, ত্বক্, নয়ন ঘ্রাণ ও জিহ্বা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। (১১) পঞ্চ প্রাণ ও মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই সকলের উৎপত্তি হয়। (১২) প্রকৃতি ও পুরুষের প্রকাশ হয়। (১৩) সত্ব, রজঃ ও তম, এই গুণত্রয়কে আশ্রয় করিয়া মহাদেব ক্রীড়া করেন। (১৪) তত্ত্বাতীত, পরাৎপর, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বানুগ্রহবিগ্রহ আমি সর্ব্বাত্মা—এই কথা বলিয়া শম্ভু তিরোহিত হন। প্রথমোক্ত শিবসূত্রের দার্শনিক তাৎপর্য্য এইরূপ। অন্যান্য শিবসূত্রেও এই মতই বিস্তারিত ভাবে বর্ণন করা হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে দ্বিতীয় পাশুপত শাস্ত্রাভিধ শিবসূত্রের মত বিভিন্ন। ইঁহারা পশু, পতি ও পাশ নামক তিনটী বিভিন্ন বস্তু স্বীকার করেন। কিন্তু এই পঞ্চাধ্যায়ী পাশুপত শাস্ত্র এখন পাওয়া যায় না। মাধবাচার্য্যের উল্লেখ হইতে এই গ্রন্থের অনুমান করা হয়। মাধবাচার্য্য ইহার প্রথম সূত্র উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা এই—অথাতঃ পশুপতেঃ পাশুপতযোগবিধিং ব্যাখ্যাস্যামঃ। এই মত সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, উৎপলদেব কৃত কারিকাগ্রন্থের নামও শিবসূত্র। কিন্তু ইহার যথার্থ নাম ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞাকারিকা বা প্রত্যভিজ্ঞাকারিকা। এই গ্রন্থকার উৎপলদেবের পিতার নাম উদয়াকর। অভিনব গুপ্ত এই গ্রন্থের টীকা লিখিয়াছেন। ইহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি গ্রন্থকার উৎপলদেবের প্রশিষ্য। উৎপলদেবের শিষ্য লক্ষ্মণ গুপ্ত, তাঁহার শিষ্য অভিনব গুপ্ত। অভিনব গুপ্ত একাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। অতএব এই গ্রন্থ অনতিপ্রাচীন; ইহার প্রথম কারিকা এই—

কথঞ্চিদাসাদ্য মহেশ্বরস্য
দাস্যংজনস্যাপ্যুপকারমিচ্ছন্।
সমস্তসম্পৎসমবাপ্তিহেতুং
তৎপ্রত্যভিজ্ঞামুপপাদয়ামি ॥

এই কারিকার ব্যাখ্যারূপে মাধবাচার্য্য অভিনব গুপ্তের টীকার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। এইমতে কেবল মাত্র ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা মোক্ষ পর্য্যন্ত সমস্তই লাভ করা যাইতে পারে। এই মতের একটী বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে সকলেই অধিকারী। ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই এই মতে মোক্ষ লাভ করিতে পারে। কারণ কারিকায় কোন শ্রেণী বিশেষের বা লোকবিশেষের উল্লেখ করা হয় নাই। লোক মাত্রেই ইহাতে অধিকারী।

চতুর্থ শিবসূত্র বসু গুপ্তের দ্বারা আবিষ্কৃত। এই গ্রন্থ পূর্ব্বোক্ত শিবসূত্র অপেক্ষা প্রাচীনতর। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে—পূর্ব্বকালে যখন লোক সমূহ দ্বৈত-

দর্শনের দ্বারা মোহিত প্রায় হয়, তখন দেবদেব মহাদেবের ইচ্ছা হয় যে রহস্য অদ্বৈত সম্প্রদায়ের বিলোপ না ঘটে, এজন্য তিনি কাশ্মীরের মহাদেব গিরিতে খোদিত শিবসূত্র সমূহ আবির্ভূত করান। সিদ্ধাদেশে বা স্বপ্নাদেশে পরম মাহেশ্বর বসু গুপ্ত ঐ সকল সূত্র দেখিতে পান এবং উহা কল্লটাদি শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করান এবং উহার ব্যাখ্যান গ্রন্থও রচনা করেন। ঐ ব্যাখ্যাগ্রন্থ বোধ হয় কল্লটবিরচিত স্পন্দসূত্র বা স্পন্দকারিকার সহিত সংমিশ্রিত হয়। অভিনব গুপ্তের শিষ্য ক্ষেমরাজ স্পন্দসূত্র সংবাদিনী শিবসূত্রবিমর্শিনী নামধেয়া শিবসূত্রের একখানি টীকা রচনা করেন। বসু গুপ্ত নবম শতাব্দীর আরম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন, এজন্য শিবসূত্রও তদপেক্ষা প্রাচীন হইতে পারে না। এই শিবসূত্র তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে শিবত্বলাভের উপায় কথিত হইয়াছে। ইহা প্রত্যভিজ্ঞামতের সর্ব্ব প্রথম গ্রন্থ। ইহার পূর্ব্বে শৈবগন ব্রহ্মসূত্রের শিবপর ব্যাখ্যাদ্বারা স্বমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেন। শ্রীকণ্ঠশিবাচার্য্যের শৈব ভাষ্যই ইহার প্রমাণ। ইনিই বোধ হয় বসু গুপ্তের গুরু। এইরূপ চেষ্টার পর শৈবগণ নিজেদের সূত্রগ্রন্থ সমূহ প্রচার করিতে লাগিলেন। ইঁহারা সকলে একমত হইয়া একখানি গ্রন্থকে প্রামাণিক রূপে স্বীকার করিতে পারেন নাই। এইরূপে নানা প্রকার শিবসূত্র প্রচারিত হয়। তন্মধ্যে প্রত্যভিজ্ঞাসূত্র ও বসু গুপ্তের শিবসূত্র প্রত্যভিজ্ঞামতের প্রতিপাদক। প্রত্যভিজ্ঞামতে ষট্‌ত্রিংশ তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। যথা পঞ্চভূত, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি, পুরুষ, পঞ্চকঞ্চুক (কলা, বিদ্যা, রাগ, কাল, নিয়তি) ৩১ মায়া, ৩২ শুদ্ধবিদ্যা, ৩৩ ঐশ্বরতত্ত্ব, ৩৪ সদাশিবতত্ত্ব, ৩৫ শক্তিতত্ত্ব, ৩৬ শিবতত্ত্ব। সৃষ্টিক্রমে দেখিতে গেলে এই ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বকে বিপরীত ভাবে সাজাইতে হয়।

(১) প্রথমতঃ আত্মা বা পরমাত্মা সর্ব্বদা বিরাজমান। ইহাই প্রথম তত্ত্ব। এবং পরমার্থ দৃষ্টিতে ইহাই একমাত্র তত্ত্ব। ইহা হইতে অন্যান্য তত্ত্ব সমূহ সমুৎপন্ন। এই তত্ত্ব অন্য কয়েকটী নামেও পরিচিত, যথা চৈতন্য, পরা সংবিৎ, পরমেশ্বর, শিব, পরমশিব, শিবভট্টারক ইত্যাদি। ত্রিকমতে আত্মা সর্ব্ব পদার্থের সারভূত, অবিকারী ও অনন্যাপেক্ষী। ইহা হইতে উপাদানাদি ব্যতিরেকে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয়, কিন্তু ইহার কোন বিকার হয় না, ইহাই ইহার স্বাতন্ত্র্য শক্তি বা অনন্যাপেক্ষিত্ব। বাস্তবিক পক্ষে ইহা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ বর্ত্তমান নাই—ইহাই একমাত্র পদার্থ, অতএব ইহাকে বিশেষিত করিবার জন্য কোন বিশেষণের প্রয়োজন নাই। তথাপি ইহা অচেতনাদি পদার্থের আভাস গ্রহণ করে, এই আভাস সমূহে ইহার সমস্ত শক্তি আপাততঃ প্রতীত হয় না, এজন্য ইহার সম্পূর্ণ শক্তি বুঝিতে হইলে আভাস সমূহ হইতে ইহাকে পৃথক্ করিতে হয়, এজন্য ইহার নানা প্রকার বিশেষণ প্রদত্ত হয়। যথা পরমানন্দময়, প্রকাশৈকঘন ইত্যাদি। এই শিবতত্ত্ব বা পরম শিব বিশ্বাত্মকও বটে বিশ্বোত্তীর্ণও বটে। অর্থাৎ পরম শিব সর্ব্ব পদার্থে অন্তর্যামিরূপে বিরাজমান অথচ ইনি সে সকলের অতীতও বটে। সকল বস্তুই পরম শিবের (শক্তির) প্রকাশ মাত্র, কিন্তু তিনি সকল বস্তুর অতীত অব্যক্ত অচিন্ত্যও বটে। এই দুই প্রকার ভাব আছে বলিয়াই, তিনি অবিকারী কূটস্থ হইয়াও নানাবৈচিত্র্যসহস্রে পরিপূর্ণ জগৎ রূপে বর্ত্তমান। পরমেশ্বরের

বিশ্বাত্মক ভাবের নামই শক্তি, এজন্য শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্বে কোন প্রভেদ নাই। শক্তি ও শক্তিমান্ শিবের প্রভেদ কখনও শৈব গ্রন্থে বর্ণিত হয় না। পরমেশ্বরের শক্তি অনন্ত, অসংখ্যেয়। তন্মধ্যে এই মতে পাঁচটী প্রধান রূপে বর্ণিত হয়—১ ইচ্ছাশক্তি, ২ জ্ঞানশক্তি, ৩ ক্রিয়াশক্তি, ৪ চিৎশক্তি, ও ৫ আনন্দশক্তি। কেহ প্রথম তিনটীকেই প্রধান বলেন। পরমেশ্বর এই পঞ্চবিধ শক্তি দ্বারা :সৃষ্টি স্থিতি সংহার তিরোধান ও অনুগ্রহ এই পঞ্চবিধ কার্য্য করেন। (১) যে কোন আকার ধারণ করিবার ক্ষমতাই ক্রিয়াশক্তি! পরমেশ্বর এই শক্তিবলে নানা প্রকার রূপ ধারণ করেন, ইহাতেই নানা বৈচিত্র্যময় জগতের উৎপত্তি হয়। ইহাই এই মতে সৃষ্টি প্রক্রিয়া (২) সকল বস্তুকে যথাযথরূপে সম্পর্কযুক্ত করিয়া জানার ক্ষমতাকে জ্ঞানশক্তি বলে। এই শক্তিবলে জগতের স্থিতি ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। (৩) অপ্রতিহত ভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতাকে ইচ্ছাশক্তি বলে। ইহা দ্বারা সংহার ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। (৪:৫) পরমেশ্বর আনন্দশক্তি দ্বারা তিরোধান করেন ও চিৎশক্তি দ্বারা অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। পরমেশ্বর শক্তিদ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে স্বভিত্তিতে জগচ্চিত্র অঙ্কিত করান।

শ্রীধীরেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

জীর্ণ তরী।

১

বড় ভুল
ওরে উন্মত্ত বাতুল,
জীর্ণ তরী ল'য়ে তুমি কার তরে রয়েছ
বসিয়া?
কি লাগিয়া
এত মরিছ ডাকিয়া
জীবনের সন্ধ্যাতীরে তরণী বাঁধিয়া?

২

শত শত
ছুটিছে মানব কত
নয়ন সম্মুখে ওই সারি সারি রাজপথ দিয়া,
কে ফিরিবে
কেবা চমকি চাহিবে
ভগ্ন ও কণ্ঠের তব আহ্বান শুনিয়া?

৩

মগ্ন সবে
আজি আনন্দ উৎসবে
কে যাবে তোমার ডাকে বল আজি সে সুখ
ভুলিয়া?
বেদনার
অই রুদ্ধ অশ্রুভার
আকুল ক্রন্দন রবে কে যাবে গলিয়া?

৪

ব্যস্ত সবে
আপনারে লয়ে ভবে
মুহূর্ত্তের তরে কারো দাঁড়াইতে নাহি অবসর,
কে শুনিবে
বল তবে কে বুঝিবে
কিসের লাগিয়া তুমি ডাক নিরন্তর?

৫

ইসারায়
পথ দেখাও কাহায়,
কাহার সময় আছে তোমার নয়ন পানে চায়?
তোমা'পরে
যারা চাহে ক্ষণতরে
ভ্রুকুটি করিয়া শুধু বিরক্তি জানায়।

ধরামাঝে
নিত্য নিত্য নব সাজে
আনন্দের পোত ভাসে হের ওই বরষা বন্যায়,
তুচ্ছ করি
পূর্ণ-পক্ষ শুভ্র তরী
হে বৃদ্ধ নাবিক কেবা ডাকিবে তোমায় ?

৭

হেথা এসে
জীবনের কর্ম্মশেষে
মরণের বেলাভূমে বসে আছ আজি
অপেক্ষিয়া,
দেখ তায়
কত যাত্রী চলে যায়
দূর হ'তে যেন কার আহ্বান শুনিয়া।

৮

কেহ ধায়
প্রদীপ্ত মধ্যাহ্নে হায়
ক্ষিপ্র হস্তে কার্য্য সারি পথের সম্বল
গুছাইয়া,
কে আবার
ফেলি পেটী বাসনার
ছুটিছে পশ্চাতে চাহি ফিরিয়া ফিরিয়া।

৯

আর তুমি
বৃদ্ধ আকড়িয়া ভূমি
ভুগিতেছ নিশিদিন নিরাশায় তিক্ত অবসাদ,
দগ্ধ প্রাণ,
ম্লান মৌন অভিমান,
গর্ব্বিতের পরিহাস শত অপবাদ।

১০

তুলি শিরে
হীনতার বোঝাটীরে
চাহিতেছ চারিদিকে দীন হীন কাঙ্গালের মত
লাজে, ভয়ে,
গেছ আধখানা হ'য়ে,
দীর্ঘ জীবনের ভারে শীর্ণদেহ নত।

১১

কার গতি
তুমি করিয়া মিনতি
বাঁধিয়া রাখিবে বৃদ্ধ আজিকার এ শোভা
যাত্রায় ?
(তবে) দূরে সরি
দাঁড়ায়ে নয়ন ভরি
হের নব বিধানের শুভ্র সুষমায়।

১২

(কিম্বা) ত্বরা করি
খুলে দেও জীর্ণ তরী,
মানবের দৃষ্টি হ'তে লুকাইয়া ফেল আপনায়,
অইখানে
নব সাজে নব প্রাণে
নব পোত দাঁড়াক সে পূর্ণ মহিমায়।

১৩

(তার) বংশীরবে
নাচিয়া উঠুক সবে
মুছে যাক দ্বিধা তব সন্দেহের শির সঞ্চালন,
নব গানে,
নব বল লভি প্রাণে
হাসিয়া উঠুক বিশ্ব করনা বারণ।

শ্রীনলিনীনাথ দাসগুপ্ত।

গ্রীক দর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ষ্টোয়িসিজম্ (Stoicism)।

জেনো এবং ষ্টোয়িকগণ এপিকিউরাসের মতই জীবনের উৎকর্ষ হেতু বিজ্ঞানালোচনা আবশ্যক মনে করিতেন। সত্য মঙ্গলকর এবং প্রয়োজন সাধক বলিয়া সত্যানুসন্ধান আবশ্যক। সৃষ্টির আদি কারণানুসন্ধানও এই জন্য আবশ্যক যে, উহা হইতে চরমোদ্দেশ্যের (পরম মঙ্গলের) সন্ধান পাওয়া যায়। জ্ঞানই মানব জীবনের লক্ষ্য। জ্ঞান কল্পনা-ও-সাধনা ভেদে দ্বিবিধ। কল্পনা-মূলক জ্ঞান হইতে চিন্তাশক্তি পরিমার্জ্জিত এবং দ্রব্য সমূহের যথাযথ ধারণা হয় বটে, কিন্তু সাধনা মূলক জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। উহার বলে মানব বিচারানুমোদিত ন্যায়পথে চলিতে শিখে। যে কোন বিষয়ে জীবনের উন্নতি সম্ভব, তাহাই মঙ্গলকর; যাহাতে চরিত্রোৎকর্ষের সম্ভাবনা নাই, এবং যাহা হইতে প্রবৃত্তি দমনের সাহায্য হয় না, তাহাতে উপকার বা অপকার কিছুই হইতে পারে না। ন্যায়, দর্শন এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা হইতে যে পরিমাণে জীবনের উন্নতি সম্ভব, সেই পরিমাণেই ঐ সকল শাস্ত্র প্রয়োজন সাধক। ন্যায়, দর্শন প্রভৃতির আলোচনা হইতে নীতিবিজ্ঞানে অধিকার জন্মে এবং নীতি জ্ঞানই চরিত্রোৎকর্ষের উপায়। সাম্প্রদায়িক শিক্ষা সমূহের যদি কোন মূল্য থাকে, তবে নীতি চর্চ্চাই তাহার হেতু।

বৈরাগ্য দর্শন দ্বৈতভাবের বিরোধী; উহার মূলে ইচ্ছা-শক্তিরই প্রভাব লক্ষিত হয়। প্লেটো ভাব-জগৎকে স্থূল জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করায়, জেনো-মতাবলম্বিগণ উক্ত মতকে আমোল দেন নাই, বরং অ্যারিষ্টটল অপেক্ষা তাঁহারা উহাকে আরও দৃঢ়তার সহিত বর্জ্জন করিয়াছিলেন। ধারণা সমূহ (প্লেটো যাহাকে আদর্শ বলিয়াছেন) অথবা সাধারণ সংজ্ঞাগুলির, বাস্তব সত্তা নাই; তাহারা দ্রব্য সমূহের বহির্দ্দেশেও (প্লেটো) অবস্থিতি করে না, কিম্বা তাহাদের অন্তর্নিবিষ্টও (অ্যারিষ্টটল) নহে। অভিজ্ঞতার ফলে দ্রব্যাদি সম্বন্ধে যে মানসিক সংস্কার, তাহাই ধারণা; সংক্ষেপে চিন্তার সারভাগই ধারণা। উহার সহিত বাস্তবের কোন সম্পর্ক নাই, অর্থাৎ ধারণার অর্থে কোন সনাতন সত্য প্রকাশ পায় না। আবার, আত্মারও স্বকীয় বা স্বভাবজাত সংস্কার নাই। আত্মা নিষ্কলঙ্ক স্ফাটিক সদৃশ (Tabula rasa)। দ্রব্য বিষয়ক সমস্ত জ্ঞানই অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। ক্লিয়াস্থিসের মতে মনের উপর বহির্জ্জগতের যে সকল অঙ্কপাত হয়, তাহা, একটী জিনিষের উপরে আর একটী জিনিস দিয়া চাপ পাড়ার মত, ঠিক যেন গালা মোহরের ছাপ। ক্রিসিপাস এই অঙ্কপাতকে আত্মার পরিবর্তন বা বিকার (Modification) বলিয়াছেন। বহির্জ্জগৎ কর্ত্তৃক ইন্দ্রিয়গণের উত্তেজনাই সর্ব্ব সংস্কার বা ধারণার মূল। ধারণা মাত্রেরই লক্ষণ এই যে, উহা দ্বারা (১) স্থায়িত্ব বা সারবত্তা (Substantiality), (২) গুণ (Quality),

(৩) অবস্থা (Mode of being) এবং সম্বন্ধ (Relation) প্রকাশ পায়। কোন ধারণার সত্যতা নিরূপণ করিতে হইলে, উহাতে এই সকল লক্ষণ কি পরিমাণে বিদ্যমান, অর্থাৎ ধারণাটী কতদূর স্পষ্ট এবং স্বপ্রকাশ, তাহারই বিচার আবশ্যক। নাম মাত্রেই যদি কোন দ্রব্যের খাঁটি প্রতিরূপ না হয়, তবে তাহাকে সত্য ধারণা বলা যায় না। পর্ব্বত বা নদী বলিতে যদি পর্ব্বত বা নদীর প্রতিরূপ মানসপটে পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তবে ঐ দুই দ্রব্যের সঠিক ধারণা জন্মিয়াছে, বলিতে হইবে।

বিষয়ানুভূতি হইতে স্মৃতির উদয় হয়; এই দুই মানসিক ক্রিয়ার ফলই অভিজ্ঞতা। বিষয়ানুভূতির আলোচনা হইতে আমরা যে সকল মন্তব্যে উপনীত হই, তদ্দ্বারা দ্রব্য সমূহের বাহ্য প্রতিরূপের সৃষ্টি হয়। প্রতিরূপ গুলি যখন বিনা আয়াসে এবং অভিজ্ঞতার সাহায্য ব্যতীত স্বয়ংই উদিত হইতে থাকে, তখন তাহাদিগকে সাধারণ সংস্কার (Common concept) বলে। বিজ্ঞানকৃত তত্ত্বানুসন্ধানের পূর্ব্বেই সাধারণ সংস্কারের দ্বারা বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। বিজ্ঞান সাহায্যে সংস্কার গুলির সত্যতা প্রমাণিত হয়। বিজ্ঞান আবার নির্ভুল সংস্কার সৃষ্টি বিষয়ে সহায়তাও করে। বিজ্ঞানের যুক্তি অকাট্য; কেন না, এখানে চাক্ষুষ প্রমাণ বিদ্যমান। বাহ্য প্রতিরূপ হইতে আমরা যে কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করি, সেই জ্ঞানের সত্যতা নিরূপণ করিতে হইলে, প্রতিরূপের সহিত বিষয়ানুভূতির কতদূর ঐক্য ছিল, তাহাই নির্ণয় করা আবশ্যক।

ষ্টোয়িকদিগের মতে, আমাদের যত প্রকার সংস্কার জন্মে, তাহাদের কতক গুলির প্রকৃতিই এই যে, তাহাদিগকে গ্রহণ না করিয়া পারা যায় না। তাহাদের সত্যতায় বিশ্বাস করিতে আমরা বাধ্য। বিশ্বাস করি, তাহার কারণ, ঐ সকল সংস্কার যে সত্যমূলক, তদ্বিষয়ে প্রভূত প্রমাণ থাকে। যখনই কোন বাহ্য-প্রতিরূপকে আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করি, তখনই সেই বিষয় সম্বন্ধে আমাদের সম্যক এবং সঠিক ধারণা জন্মিয়াছে বলিতে হইবে। প্রতিরূপ এবং সংস্কারের উপকরণ একই, প্রভেদের মধ্যে, সংস্কারের সহিত সত্যের জ্ঞান বিদ্যমান, অর্থাৎ সংস্কারের সহিত যে বস্তু বা বিষয়ের সংস্কার, উভয়ের মধ্যে ঐক্য আছে বলিয়া প্রত্যয় থাকে।

উপরোক্ত বৃত্তান্ত হইতে জ্ঞানের চারিটী পর্য্যায় বা স্তর পাওয়া যাইতেছে; যথা, (১) বাহ্য প্রতিরূপ (Sense presentation) (২) স্বীকারোক্তি (Assent (৩) ব্যাপ্তি-বোধ (Comprehension) এবং (৪) উপলব্ধি (Understanding)। প্রথমতঃ বিষয়ানুভূতি হইতে স্মৃতির উদ্রেক হওয়ায় বিষয়টীর একটী মানসিক প্রতিকৃতি বা প্রতিরূপ জন্মে। পরে, প্রতিরূপটী সত্য হইলে তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়। তৎপরে, প্রতিরূপ হইতে যে সংস্কার জন্মে, তাহার সম্যগবধারণকে ব্যাপ্তি-বোধ বলা যায়। ব্যাপ্তি-বোধের পরের স্তর উপলব্ধি, অর্থাৎ এই স্তরে বিষয়টী যে কি, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। যে কোন বিষয়ে আমরা জ্ঞানলাভ করি, তাহার মূলে মোটামুটি এই চারি প্রকার মানসিক ক্রিয়া লক্ষিত হইবে।

কথিত আছে, জ্ঞান লাভের দৃষ্টান্ত স্বরূপ জেনো শিষ্যদিগের সম্মুখে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত দৃঢ়রূপে মুষ্টিবদ্ধ করতঃ তদুপরি বামহস্ত রক্ষা করিতেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে,

জ্ঞানলাভের পথে শৈথিল্য চলে না। আত্ম সংযম এবং দৃঢ়চিত্ততাই জ্ঞানলাভের উপায়।

অ্যারিষ্টটলের ন্যায় ষ্টৌয়িকগণও ব্যাকরণ এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের সহিত ন্যায় শাস্ত্রের ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্বীকার করিয়াছেন। সত্য বলিতে কি, ব্যাকরণ এবং অলঙ্কার সম্বন্ধে তাঁহারাই সেই জগদ্বিখ্যাত নৈয়ায়িকের উপযুক্ত শিষ্য। তাঁহাদিগের দ্বারাই পাশ্চাত্য ব্যাকরণ ও অলঙ্কারের অধিকাংশ শব্দভাণ্ডার সঙ্কলিত হইয়াছিল।

ষ্টৌয়িক অধ্যাত্ম দর্শন অ্যারিষ্টটলের দর্শনাপেক্ষা অধিকতর প্রত্যক্ষমূলক। ধরিতে গেলে উহা এক প্রকার সাকার শক্তিবাদ। শরীর এবং মন একই সত্তার ভিন্ন রূপ। নিখিল বিশ্ব সত্য-স্বরূপ, স্বয়ং প্রাণময় ঈশ্বর, যিনি সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বভূতে বিদ্যমান এবং মানবের ভাগ্যনিয়ন্তা। ঈশ্বর প্রেমময় এবং লোকহিতৈষী, অথচ মানবের সুখ দুঃখাদিতে অনাসক্ত। ষ্টৌয়িকগণ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্ব প্রীতিরও আরোপ করিয়াছেন; এজন্য তাঁহাদের মতের সহিত পেরিপ্যাটেটিক এবং এপিকিউরিয়ান মতের মূলতঃ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের সর্ব্বদেবত্ববাদে (Pantheism) ঈশ্বরের পরিণামদর্শিতারও আভাস পাওয়া যায়। এই মত যে মোটের উপর ধর্ম্মভাবোদ্দীপক, তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্ব্বপ্রকার মূর্তিপূজায় ষ্টৌয়িকদিগের আস্থা ছিল। তাঁহারা জুপিটরের অধস্তন দেবতাদিগের অস্তিত্বেও বিশ্বাস করিতেন। এই সকল দেবতা নক্ষত্ররূপে অথবা নৈসর্গিক বিপর্য্যয়ের কারণরূপে প্রকাশ পান। দেবগণ অমর নহেন; একমাত্র অনন্ত মহাসত্তা বা জগদীশ্বরই অমর।

ষ্টৌয়িক জড়বিজ্ঞানের সহিত হিরাক্লাইটাসের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। তাঁহাদের মতেও জীবশক্তির মূল কারণ অগ্নি। জগৎ একমাত্র সর্ব্বব্যাপী হুতাশনের লীলাভূমি। এই হুতাশনের সাময়িক প্রজ্বলন ও প্রশমন হইতেই জাগতিক সৃষ্টি ব্যাপার এবং যাবতীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। জীবন-সংগ্রামের ফলে প্রকৃতির যে অশেষ প্রয়োজন সাধিত হইতেছে, ষ্টৌয়িকগণ তাহারও আলোচনা করিয়াছিলেন। জগৎ ঈশ্বরেরই রূপ বলিয়া অসম্পূর্ণ হইতে পারে না, বরং উহা পূর্ণতার প্রতিমূর্ত্তি এবং অনিন্দ্যসুন্দর। পক্ষান্তরে, জগতের পূর্ণতা হইতে ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, জগৎ এক অদ্বিতীয় কল্যাণকর মহোদ্দেশ্যের বহিরাবরণ মাত্র। এই উদ্দেশ্য অ্যারিষ্টটলের ঈশ্বরের ন্যায় জগতের বহির্দ্দেশে বিদ্যমান থাকিয়া জগৎকে সঞ্চালিত করে না। মানবাত্মা যেমন দেহের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, ষ্টৌয়িকদিগের কল্পিত ঈশ্বরও সেইরূপ জগতের অণুপরমাণুগত, সর্ব্বত্র বিদ্যমান; অর্থাৎ, জগৎ এবং ঈশ্বরে প্রভেদ নাই।

ষ্টৌয়িকগণ ঈশ্বরে একান্ত নির্ভরশীল ছিলেন। শোকদুঃখাদি ক্লেশে ঈশ্বরের প্রতি তাঁহাদের অবিশ্বাস জন্মিত না। অধিকন্তু তাঁহারা ইহাই মনে করিতেন যে, বাদ্যযন্ত্রের একটা তার বেসুরো বাজিলে, তদ্দ্বারা যেমন সময়ে সময়ে ঐক্যতানটী নষ্ট না হইয়া অধিকতর মিষ্ট বোধ হয়, ছায়াসম্পাতে চিত্রের ঔজ্জ্বল্য যেমন হ্রাসপ্রাপ্ত না হইয়া বৃদ্ধিই পায়, সেইরূপ দুঃখের সমাবেশে সুখের মাধুর্য্যও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অন্যায়, ভীরুতা এবং অমিতাচারের পার্শ্বে ন্যায়, সাহস এবং মিতাচার অধিকতর উজ্জ্বল দেখায়। অনিষ্ট বা অমঙ্গল দ্বারা ভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্য্যে ষ্টৌয়িকদিগের বিশ্বাস বিচলিত না হইয়া বরং দৃঢ়ীভূতই হইত; তাহার কারণ, তাঁহাদের

মতে, অনিষ্ট বা অমঙ্গল ব্যক্তিগত, তদ্দ্বারা সার্ব্বজনীন সুখসমৃদ্ধির হানি না হইয়া, বরং তাহা অধিকতর তৃপ্তিপ্রদ হয়। ব্যক্তিগত হিসাবে কাহারও সুখ, কাহারও দুঃখ, কোন অনুষ্ঠান হিতকর, কোন অনুষ্ঠান অহিতকর; কিন্তু সমষ্টি হিসাবে দুঃখ, কষ্ট বা অসম্পূর্ণতার অস্তিত্ব নাই। তথায় যাহা কিছু সার্ব্বজনীন হিতকর বা সুখকর, যাহা কিছু পূর্ণ, পবিত্র ও উজ্জ্বল, তাহাই স্থান পাইয়াছে। তাহার কারণ, ভগবান পূর্ণব্রহ্ম।

অগ্নিশিখার সহিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের যে সম্বন্ধ, সমুদ্রের সহিত বারিবিন্দুর যে সম্বন্ধ, অনন্ত বিশ্বের সহিত মানবেরও সেই সম্বন্ধ। মানবদেহ বিশ্বোপাদানেরই এক অংশ এবং মানবাত্মা জগদাত্মারই একটী উপশ্বাস। ষ্টোয়িক মতে আত্মা এবং দেহে প্রভেদ নাই, এজন্য আত্মাকেও জড়ধর্ম্মী বলিতে হইবে। আত্মা জড়ধর্ম্মী না হইলে দেহ এবং আত্মার সম্বন্ধ দুর্ঘট হইত। উভয়ে সমধর্ম্মা না হইলে, একের দ্বারা অপরে বিচালিত হইত না। যে স্বয়ং অশরীরী, সে আবার শরীরের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে কিরূপে? তবে, আত্মার শারীর ধর্ম্ম থাকিলেই যে আলম্বনস্বরূপ দেহের অভাবে আত্মার বিলোপ ঘটে, এমন নয়। আর ইহাও সত্য যে, সর্ব্বসাধারণের পক্ষে পরলোকপ্রাপ্তির আশা না থাকিলেও, অন্ততঃ পুণ্যবানের পক্ষে আত্মা নিশ্চয়ই দেহের অবসানে লোপ পায় না। তবে কি পুণ্যবানের আত্মা অমর? তাহাও নহে। দেহান্তে শত শত বৎসর বিদ্যমান থাকিলেও আত্মার লয় আছে। এমন কি, পরমার্থজ্ঞ দার্শনিকের আত্মাও অমর নহে। প্রলয়কালে যাবতীয় দ্রব্যের সহিত আত্মাও সেই সর্ব্বগ্রাসী অনলপ্রবাহে প্রবিষ্ট হয়। একমাত্র ঈশ্বরই অমর। আত্মার লয় আছে, কিন্তু আত্মোপাদানের বিনাশ নাই। যে অনন্ত জীবন-প্রবাহ হইতে আত্মার উদ্ভব, পুনরায় তাহাতেই উহার মিলন অবশ্যম্ভাবী।

আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ষ্টোয়িকদিগের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। আত্মার অবিনাশিত্বে বিশ্বাস থাক বা না থাক, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহারা চরিত্রবিষয়ে একমত থাকিতেন, ততক্ষণ সকলেরই ষ্টোয়ার শিষ্যত্বলাভের অধিকার ছিল। তবে, চরিত্রাদর্শ সম্বন্ধে ষ্টোয়িকগণই প্রথম পথপ্রদর্শক নহেন। সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যাণ্টিস্থিনিস্ প্রভৃতি মহাত্মাগণ জেনোর বহু পূর্ব্বে চরিত্রকে উচ্চাসন দান করিয়াছিলেন। ষ্টোয়িকদিগের মতে ধর্ম্মার্থ ধর্ম্মচর্চ্চাই মানব জীবনের লক্ষ্য। তাঁহারা ধর্ম্মকে কর্ত্তব্যের স্থানে দাঁড় করাইয়াছিলেন, অর্থাৎ যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মচর্য্যা বা কর্ত্তব্যপালন ব্যতীত জগতে মানবের দ্বিতীয় শ্রেয়ঃ নাই। সুখ, সম্পদ, যশঃ ও স্বাস্থ্য, কিছুরই প্রকৃত মূল্য নাই, বরং যখন এই সকল বিষয়ই জীবন যাপনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় এবং শান্তির পরিবর্ত্তে উচ্ছৃঙ্খলতা আনয়ন করে, তখন উহাদের দ্বারা অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে। ধর্ম্মই একমাত্র সুখলাভের উপায়, তবে ধর্ম্ম নিষ্কাম হওয়া চাই। আবার, কেবলমাত্র বাহ্য সদনুষ্ঠান দ্বারাও ধর্ম্মসাধন হয় না। ধর্ম্মপালনে আত্মার ঐকান্তিক আগ্রহ না থাকিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। ধর্ম্ম এক বই দুই নয়। কোন এক বিষয়ে ধার্ম্মিক হইলে বিষয়ান্তরে অধার্ম্মিক হওয়া চলে না। ধর্ম্মই সর্ব্ব সদনুষ্ঠানের মূল এবং জ্ঞান, সাহস, মিতাচার ও ন্যায়পরতা, এই চারিটী গুণ ধর্ম্মচর্চ্চার ফল স্বরূপ আয়ত্ত হয়। এই কয়েকটী গুণের একটী

মাত্র আয়ত্ত হইলে অপরগুলি আপনা হইতেই আয়ত্ত হইবে এবং ইহাদের কোন একটীর অভাব হইলে অপর কয়টীরও অভাব অনিবার্য্য। ব্যক্তিমাত্রেই হয় সর্ব্ব বিষয়ে সৎ, না হয় সর্ব্ব বিষয়ে অসৎ। তাহার কারণ, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম, পুণ্য এবং পাপ, ইহাদের মধ্যে আর তৃতীয় অবস্থাভেদ নাই। মোটের উপর সমগ্র জনমণ্ডলী সাধু এবং অসাধু, এই দুই শ্রেণীতে বিভাজ্য, তবে কার্য্যক্ষেত্রে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে অনেকটা মেলামেশি ভাবও দেখা যায়। যে মহাজন জগতের গূঢ় রহস্য সমূহ অবগত থাকিয়া স্বীয় আত্মাকে এবং অপর সকলকে জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই ধার্ম্মিক এবং সিদ্ধকাম। সামাজিক প্রথা, সাময়িক পরিবর্ত্তন, লোকশাসন (যদি এই লোকশাসন ঐশী বিধানের অনুকূল না হয়) প্রভৃতি কোন বন্ধনেই তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না। তিনি সত্য সত্যই স্বাধীন, চিত্তজয়ী, সুতরাং জগজ্জয়ী। যা ঘটে ঘটুক, ষ্টোয়িক সাধু কিছুতেই বিচলিত নহেন। তাঁহার বিশ্বাস, ঘটনামাত্রেই স্বভাব বা নিয়তির অধীন এবং স্বভাব বা নিয়তির মূলে অনন্ত প্রজ্ঞা, ঐশ্বরিক বিধান এবং দয়াই দেখিতে পাওয়া যায়। চরাচর বিশ্বব্যাপিয়া একমাত্র বিধি নিত্য বিরাজমান, সৃষ্টিমাত্রই সেই বিধির অনুবর্ত্তন করিতে বাধ্য। এই বিধিরই বিধানে মানবের বিবেকবুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং বিবেকবুদ্ধি এবং জাগতিক নিয়মে প্রকৃতিগত পার্থক্য নাই।

প্রত্যক্ষসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে ষ্টোয়িকগণ যেরূপ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার সহিত তাঁহাদের নৈতিক আদর্শবাদের তুলনা করিলে সহজেই অসঙ্গতি দোষ দেখান যায়, কিন্তু এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ষ্টোয়িকমত একটী মাত্র লোকের যুক্তি ও তর্কের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে; উহা এক সম্প্রদায়ভুক্ত বহু মতাবলীর সারাংশ। প্রাচীন মতের সহিত যাঁহাদিগের অনৈক্য ঘটিয়াছিল এবং যাঁহারা পুরাতন সঙ্কীর্ণ মতের সহিত নূতন উদার মতের মিলন সাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন, ষ্টোয়িক ধর্ম্মমত তাঁহাদিগের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। ধরিতে গেলে উহা তাৎকালিক শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই একটী ধর্ম্মমত। সিসিরো এবং পম্পির শিক্ষক আপামিয়াবাসী (Apamia) পসিডোনিয়াস (Posidonius) এবং রোড্‌সের প্যানিটস্ (Panætus) কর্ত্তৃক ষ্টোয়িক উপদেশাবলী রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ লাভ করে এবং তথায় ইতালীয় ও সিমাইটদিগের জাতীয় ধর্ম্ম ভাবের সহিত উহার ঐক্য থাকায় অনেকেই ষ্টোয়িক ধর্ম্মের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। সিসিরো, কেটো, ব্রুটাস প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ, যাঁহারা সাধারণ তন্ত্রের অধঃপতন কালে সিজারবংশীয় নরপতিদিগের প্রভাব দমনকল্পে চেষ্টা করিয়া ভগ্নোদ্যম হন, তাঁহাদের সকলের মনেই ষ্টোয়িক ধর্ম্মোপদেশ সমূহ সুশীতল শান্তিবারি সিঞ্চন করিয়াছিল।

এপিকটেটাসের "নীতি উপদেশ" সেনেকার "নীতি-পত্রাবলী" (Moral Letters) সিসিরোর "ডি ফিনিবাস্" (De Finibus) এবং সম্রাট মার্কাস অরিলিয়াসের "অ্যাড্ সি ইপ্‌সাম্" (Ad se Ipsum) নামক দ্বাদশ খণ্ড নীতিগ্রন্থ, ষ্টোয়িক দর্শনাবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল। এই দর্শন এবং ধর্ম্মমত যতই প্রসিদ্ধিলাভ করুক, ইহার দোষ এই যে, ইহা একমাত্র শিক্ষিত সমাজেরই উপযুক্ত বলিয়া সাধারণ লোকের ভিতর বড় একটা প্রবেশ লাভ করে নাই; সাধারণের চিত্তা-

কর্ষণ করার মত ষ্টোয়িক ধর্ম্মের বিশেষ কিছু দেখা যায় না। এই ধর্ম্ম বিজ্ঞান-সম্মত এবং চিন্তা-সাপেক্ষ। সাধারণে ইহার মর্ম্ম-গ্রহণে অসমর্থ হওয়ায়, তাহাদের পক্ষে এই মতে এবং এপিকিউরাসের প্রত্যক্ষবাদে বিশেষ প্রভেদ ছিল না।

সংশয়বাদের প্রতিক্রিয়া (Sceptical Reaction)।

নাস্তিকতা (Pyrrhonism)।

অ্যারিষ্টটল কল্পনা-রাজ্যে উৎসাহী এবং স্বমত প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়চিত্ত ছিলেন। জেনো এবং এপিকিউরাস যদিও বিজ্ঞান হিসাবে বিজ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই, তথাপি জীবন ধারণের পক্ষে বিজ্ঞান যে প্রয়োজন-সাধক, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ ছিল না। পক্ষান্তরে ষ্টোয়িকগণের মত এই যে, বিজ্ঞান সাহায্যে স্বভাবের এবং জাতীয় ইতিহাসের অন্তরালে ভগবানের অনন্ত অস্তিত্ব অনুভব করা যায় এবং তাহার ফলে মানবগণ ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইতে এবং তাঁহারই নির্দ্দেশানুসারে চলিতে শিক্ষা করে। এপিকিউরিয়ানগণ বলিতেন যে, মানবের সুখশান্তি হরণকারী (দেবতা সম্বন্ধীয়) কুসংস্কার দূর করাই বিজ্ঞানের কার্য্য। ষ্টোয়িক এবং এপিকিউরিয়ান, উভয় সম্প্রদায়ের লোকই সত্য সম্বন্ধে এমন এক সর্ব্ববাদীসম্মত বিধি বা প্রমাণ স্বীকার করিতেন, যে বিধি বা প্রমাণের সাহায্যে সত্যকে সত্য বলিয়া চিনিতে পারা যায়। ডিমক্রিটাস এবং প্রোটাগোরাস কর্তৃক যে সন্দেহবাদের উদয় হইয়াছিল, তদ্দ্বারা অ্যারিষ্টটল-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের গোঁড়ামিতে আঘাত লাগে। অ্যারিষ্টটলের সমসাময়িক এবং আলেক্‌জন্দারের বন্ধু ইলিস বাসী পির্হো (Pyrrho) উক্ত সন্দেহবাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। জেনো, এপিকিউরাস এবং সক্রেটিক সম্প্রদায়ের ন্যায়, তিনিও বাস্তব সত্তা সম্বন্ধে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেন, অর্থাৎ বাস্তবসত্তা বলিয়া কিছু থাকিলেও থাকিতে পারে, তবে ইহা নিশ্চিত যে, অধ্যাত্ম শাস্ত্রের আলোচনা হইতে উহা অবগত হওয়া যায় না। সত্য বলিতে কি, কোন দুইটী দর্শন মতের মূল তথ্যে মিল নাই। সুতরাং এরূপ দর্শন চর্চ্চার ফলে, প্রকৃত শান্তিসুখের পরিবর্ত্তে অনিশ্চয়তা এবং সন্দেহ-জালেরই সৃষ্টি হয়। মোট কথা, অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের কোন আবশ্যকতাই নাই এবং অধ্যাত্ম শাস্ত্র বলিয়া কোন শাস্ত্র থাকাও অসম্ভব ; কেন না ; যে যুক্তি ও তর্কের উপর উহা প্রতিষ্ঠিত, সেই যুক্তি ও তর্ক বলে একই বিষয় সত্য ও মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে। বস্তুতত্ত্ব অনধিগম্য। পির্হো কোন বিষয়ের সত্যাসত্য সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট মন্তব্য প্রকাশ করিতেন না, বরং যথাসম্ভব স্বীয় মন্তব্য অপ্রকাশ রাখিতেই যত্ন করিতেন, এবং নিজের জিদ বজায় রাখার জন্য কখনও তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন না। তর্ক স্থলে কোন বিষয়ে 'হাঁ' কিম্বা 'না' এরূপ নিশ্চয়ার্থ বোধক মত প্রকাশ না করায়, তাঁহাকে গোঁড়া বলা যায় না ; আবার তার্কিকদিগের সহিতও তাঁহার প্রভেদ এই যে, তার্কিকগণ বস্তুতত্ত্বে বিশ্বাস করিতেন না, পির্হো তাহাতে সন্দিহান ছিলেন।

পির্হোর একজন ভক্ত বন্ধু এবং চিকিৎসক টাইমন (Timon) সন্দেহবাদ সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একখানি শ্লেষপূর্ণ কবিতাগ্রন্থও ছিল। ঐ পুস্তকে তিনি থেলিস হইতে আরম্ভ করিয়া অ্যাকাডেমির অধ্যাপক আর্কিসিলেয়স

(Arcesilaus) পর্য্যন্ত সমস্ত অধ্যাত্মবাদিগণের মত বিরোধ প্রদর্শন করিয়াছেন। "প্রিপারেশিও ইভাঞ্জেলিকা" (Præparatio Evangelica) নামক পুস্তকে ইউসিবিয়াস্ টাইমন কৃত গ্রন্থের কতকগুলি শ্লেষবাক্য লিপিবদ্ধ করেন। ঐ কয়টী বাক্য হইতে মোটের উপর তিনটী বিষয় অবগত হওয়া যায়। ১মতঃ, গোঁড়া দলের দার্শনিক কেহই তাঁহাদের মূল ধারণাটীকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন নাই। মূল প্রতিজ্ঞাটী যাহাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত দর্শন মতটী বিদ্যমান, তাহা কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ২য়তঃ, দ্রব্য সমূহের বাস্তব সত্তা বা বস্তুর প্রকৃত অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা মানবের সাধ্যাতীত। দ্রব্য সমূহ কি প্রকারে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয় এবং কি প্রকারেই বা শারীরিক ও মানসিক ভাবান্তর সাধন করে, আমরা তাহাই কেবল জানিতে পারি। ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তির বাহিরে তাহাদের অস্তিত্ব কি, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। ৩য়তঃ, তাহাই যদি হইল, তবে আর মিথ্যা বাগবিতণ্ডায় প্রয়োজন কি? মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য এই যে, সে অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক পরিত্যাগ করত সর্ব্বতোভাবে স্বভাবের অনুবর্ত্তন করিবে।

পিরোনিজমে অতি তীব্রভাবে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, দার্শনিকদিগের যিনি যতই বিচক্ষণ হউন, তাঁহাদের মূল প্রতিজ্ঞাগুলি সত্যমূলক হওয়া চাই। যে ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া সমগ্র দর্শন মত প্রতিষ্ঠিত, সেই ভিত্তিই যদি প্রমাণসাপেক্ষ হইল, অর্থাৎ তাহার সত্যতা সম্বন্ধে যদি সন্দেহই রহিল, তবে আর সেই দর্শন মত হইতে জগতের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হয় না। নিশ্চয়তাই দর্শনের মূল মন্ত্র। যাহা হউক, প্রাচীন পেরিপ্যাটেটিক এবং নব্য ষ্টোয়িক মতের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার ফলে সন্দেহবাদিগণ শীঘ্রই প্লেটোনিক মতের পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। তর্কশাস্ত্রের প্রথম অবতারণায় গ্রীসদেশে যে বিচারবুদ্ধির প্রসার হয়, অ্যারিষ্টটলের মৃত্যুর পর সেই তর্কশাস্ত্রের পুনরাবির্ভাব হইলেও তদ্দ্বারা হেলেনিক দর্শনের অবনতিই ঘটিয়াছিল।

সাম্প্রদায়িক সংশয়বাদ।

(Academic Scepticism)

অ্যাকাডেমি হইতে যে সন্দেহবাদের উদয় হয়, তাহা সাম্প্রদায়িক নেতৃদ্বয় প্লেটো এবং অ্যারিষ্টটলের মধ্যে যে সামান্য বিরোধ, তাহারই অত্যুক্তি মাত্র। সক্রেটিস এবং প্লেটোর মধ্যেও সন্দেহবাদ ছিল। সক্রেটিস হইতে যে সংশয়ের উদয় হয়, অ্যাকাডেমির মধ্য এবং নব্য যুগের অধিনায়ক আর্কিসিলেয়াস এবং কার্ণিয়াডিজ তাহারই পরিপোষক রূপে গণ্য হইয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক নেতা ক্রেটিসের শিষ্য, পিটেনবাসী আর্কিসিলেয়াস (খ্রীঃ পূঃ ৩১৮—২৪৪) সক্রেটিস-প্রবর্ত্তিত চিন্তাপ্রণালীর পক্ষপাতী হন। তিনি স্বয়ং কোন নূতন মত আবিষ্কার করেন নাই; যাহাতে শ্রোতৃবর্গ একাগ্রচিত্ত এবং ভাবগ্রাহী হইতে পারে, তদ্বিষয়েই তাঁহার দৃষ্টি ছিল। শ্রোতৃগণ কি প্রকারে আপনাপনি, অর্থাৎ স্বাধীন ভাবে, চিন্তা করিতে, তত্ত্বানুসন্ধান করিতে এবং সত্য মিথ্যার প্রভেদ বুঝিতে পারিবে, তিনি সর্ব্বদা তাহাই শিক্ষা দিতেন। তাঁহার ব্যবস্থার সারমর্ম্ম এই, 'কোন বিষয়ই নিরপেক্ষ ভাবে গ্রহণ করিও না'। কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশের পূর্ব্বে দেখা আবশ্যক, তাহার মূলে কোনও যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ আছে কি না।

প্রথমতঃ তিনি সমালোচক শ্রেণীর দার্শনিক ছিলেন, পরে জেনোর একগুঁয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ঘোর সন্দেহবাদী হইয়া পড়েন। জেনো বলিতেন, ধারণার স্পষ্টতাই সত্যতার মাপকাঠি। আর্কিসিলেয়াস উহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ইন্দ্রিয়গণ প্রতারক, তাহারা সময়ে সময়ে এমন ভ্রম জন্মাইয়া দেয় যে, তাহার ফলে অনেক অলীক ধারণার উৎপত্তি হয়। সুতরাং কেবল ধারণার স্পষ্টতার উপরই সত্য দাঁড়াইতে পারে না।" সক্রেটিস বলিতেন "আমি যাহা জানি, তাহা এই যে, আমি কিছুই জানি না।" আর্কিসিলেয়াস বলিয়াছিলেন, "আমি যে কিছুই জানি না, তাহাও নিশ্চয় বলিতে পারি না।" আর্কিসিলেয়াস কিন্তু তাঁহার বিশ্বাসানুরূপ কোন নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই।" তাঁহার মতে অধ্যাত্মবিদ্যায় সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না, তবে নীতিশাস্ত্রের আলোচনায় উহা কতক পরিমাণে সম্ভবপর। ষ্টোয়িকগণও এ বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত ছিলেন। আর্কিসিলেয়াসের শিষ্যবর্গ অধ্যাত্মবিদ্যা এবং নীতিশাস্ত্র, উভয়ের কোনটীতেই সত্যের সন্ধান পান নাই।

আর্কিসিলেয়াসের শিষ্যদিগের মধ্যে কার্ণিয়াডিস (Carneades) সর্ব্বাপেক্ষা বিচক্ষণ ছিলেন। তাঁহার সহিত খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর তার্কিকগণের পার্থক্য ছিল না। কি নীতিশাস্ত্রে, কি ধর্ম্মশাস্ত্রে, কি তর্কশাস্ত্রে, কি তত্ত্বজ্ঞানে, সর্ব্ব বিষয়েই তিনি ষ্টোয়িকদিগের বিপক্ষতা করিতেন। আশ্চর্য্য যুক্তি কৌশল বলে তিনি ষ্টোয়িক ধর্ম্মমতের অসংলগ্নতা দোষ দেখাইয়াছেন। নিম্নে তাঁহার যুক্তি-প্রণালীর কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। ষ্টোয়ার ঈশ্বর জগতের আত্মা; আত্মার ন্যায় ঈশ্বরেও অনুভব শক্তি বিদ্যমান; বিষয়ানুভূতির ফল পরিবর্ত্তন; অতএব ষ্টোয়িকদিগের ঈশ্বর পরিবর্ত্তনশীল। যাহা কিছু পরিবর্ত্তনশীল, তাহার উন্নতিও সম্ভব, অবনতিও সম্ভব, অর্থাৎ তাহা মৃত্যু বা ধ্বংস সাপেক্ষ। সুতরাং ষ্টোয়িকদিগের ঈশ্বর জরামৃত্যুর অধীন বলিয়া অনন্ত নহেন, অর্থাৎ তাঁহাদের অনুভবসিদ্ধ ঈশ্বর ঈশ্বরই নয়। আবার, যদি কেবল সচেতন পুরুষ হিসাবেই গণ্য করা যায়, তাহা হইলেও ষ্টোয়িক ঈশ্বর দেহবিশিষ্ট, সুতরাং পরিবর্ত্তন সাপেক্ষ এবং ঈশ্বর নামের অযোগ্য।

কার্ণিয়াডিস আরও বলিয়াছেন, যদি ধরিয়া লওয়া যায়, ঈশ্বর আছেন, তাহা হইলে তাঁহাকে হয় সান্ত, না হয় অনন্ত বলিতে হইবে। যদি সান্ত হন, তবে তিনি সমগ্র বস্তু জাতের অংশ মাত্র 'সব' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহারই খানিকটা, অর্থাৎ, তিনি সম্পূর্ণ, সমষ্টি বা পূর্ণব্রহ্ম নহেন। যদি বলি ঈশ্বর অনন্ত, তাহা হইলে ইহাও নিশ্চিত যে, তিনি নিত্য, স্থাণু এবং বিকার-রহিত। অর্থাৎ তিনি পুরুষ আখ্যার নহেন; প্রেম, দয়া, বিশ্বপ্রীতি প্রভৃতি কোন গুণই তাঁহাতে স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, তিনি সান্তও নহেন, অনন্তও নহেন। আবার, ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে হয় তিনি শরীরী, না হয় তিনি অশরীরী। অশরীরী হইলে অনুভব শক্তির অভাবে তাঁহাকে অচেতনই বলিতে হইবে। যদি শরীরী হন, তবে তিনি অনন্ত নামের অযোগ্য, অর্থাৎ ঈশ্বর পদবাচ্য নহেন। ঈশ্বর ধার্ম্মিক, কি অধার্ম্মিক? ধার্ম্মিক কাহাকে বলে? যিনি নিজের ইচ্ছাশক্তির উপরেও অপর কোন মঙ্গলময়ের ইচ্ছাশক্তিকে অবশ্য পালনীয় মনে

করেন এবং তাঁহারই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন, তিনিই ধার্ম্মিক। ঈশ্বরকে ধার্ম্মিক বলিলে তাঁহাপেক্ষাও মহত্তর পুরুষের কল্পনা আবশ্যক। ঈশ্বর তাহা হইলে এক এবং অদ্বিতীয় রহিলেন না। তবে কি ঈশ্বর অধার্ম্মিক? তাহাই বা কেমন করিয়া বলি? অধার্ম্মিক হইলে ত তিনি মানবেরও অধম। অতএব দেখা যাইতেছে, ঈশ্বর ধার্ম্মিকও নহেন, অধার্ম্মিকও নহেন। এইরূপে যে কোন দিক দিয়াই হউক, ঈশ্বর সম্বন্ধে নির্ব্বিরোধ ধারণায় উপনীত হওয়া অসম্ভব। অতএব, ষ্টৈয়িকদিগের ঈশ্বর কল্পনা-বহির্ভূত।

কার্ণিয়াডিস্ ন্যায়, কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব সম্বন্ধেও একই বিচার করিয়াছেন। রাজনৈতিক কার্য্যোপলক্ষে একদা তিনি রোমনগরে প্রেরিত হন। তথায় তিনি প্রথম দিবস ন্যায়পরতার স্বপক্ষে এবং দ্বিতীয় দিবস ন্যায়পরতার বিপক্ষে, বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে যুগপৎ বিস্মিত ও চমৎকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার মত এই যে, যেমন অধ্যাত্মশাস্ত্রে, তেমনি নীতিশাস্ত্রে, কোথাও অটুট, নির্ব্বিকার, সনাতন সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রমাণের অভাবে কল্পনাক্ষেত্রেই বল, আর কার্য্যক্ষেত্রেই বল, সত্য মিথ্যা, শুভাশুভের জন্য আমাদিগকে সম্ভাবনা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

কার্ণিয়াডিজের পরবর্ত্তী দার্শনিক নেতৃগণ নব্য সাম্প্রদায়িক (Neo-Academic) সংশয়বাদের যে পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন, তাহাতে প্লেটো, অ্যারিষ্টটল, জেনো, এপিকিউরাস এবং আর্কিসিলেয়াসের ভিন্ন ভিন্ন মত সমূহের এক প্রকার শৃঙ্খলাবিহীন ঐক্য সম্পাদনের চেষ্টা লক্ষিত হয়। ক্রমশঃ

শ্রীদিগ্বিজয় রায়চৌধুরী।

উপন্যাসে ধর্ম্ম প্রচার— বঙ্কিম বাবু। (৩)

আমি এইবার কাণা ফুলওয়ালী রজনীর চরিত্রে বঙ্কিম বাবু যে সকল নৈতিক-তত্ত্বের শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিব। আমি যখন এই প্রবন্ধমালা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তখন আমি এমন দুরাশা করি নাই যে, সকল পাঠকই আমার সহিত একমত হইবেন। বরঞ্চ ইহাই মনে করিয়াছিলাম; অনেক স্থূলদর্শী পাঠক ও সমালোচক মনে করিবেন যে, বঙ্কিমবাবু রজনী, কপালকুণ্ডলা প্রভৃতি উপন্যাসে যে ধর্ম্ম বা নীতিশিক্ষা দিয়াছেন, এ কথা কোন মতেই স্বীকার্য্য নহে। তাঁহাদিগের মতে বঙ্কিমবাবু, তিনখানি উপন্যাস (আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম) ব্যতীত অন্য উপন্যাস কেবল মাত্র পাঠকের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যেই লিখিয়াছেন, এমন কি, রজনী পুস্তকেও নৈতিকতত্ত্ব প্রতিপাদন বা প্রচার করা যে বঙ্কিমবাবুর উদ্দেশ্য, তাহা তাঁহারা সহজে ধারণা করিতে পারিবেন না। রজনী প্রভৃতি উপন্যাসে বঙ্কিমবাবু নীতিতত্ত্ব বা ধর্ম্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আমি যে সকল প্রবন্ধে যথাসাধ্য নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব, তাহা তাঁহারা বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে পাঠ করিবেন, এবং পদে পদে আমার ভ্রম প্রমাদ দেখিয়া, তাহা গদ্‌গদ ভাবে ব্যাখ্যা

করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবেন, এবং কোন কোন স্থানে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহাদিগের দুর্ভাগ্য-বশতঃ বঙ্কিমবাবু নিজেই রজনীর বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন যে, "যে সকল মানসিক বা নৈতিকতত্ত্ব প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, তাহা অন্ধ যুবতীর সাহায্যে বিশেষ স্পষ্টতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়াই ঐরূপ ভিত্তির উপর রজনীর চরিত্র নির্ম্মাণ করা গিয়াছে।" কোন কোন পাঠক বা সমালোচক বলেন যে, তাঁহারা শুনিয়াছেন, বঙ্কিমবাবু "নাকি" নিজেই বলিতেন যে, তিনি "দুর্গেশ-নন্দিনী" "কপালকুণ্ডলা" ও "মৃণালিনী" ধর্ম্মনীতি প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে লেখেন নাই। এখানে "নাকি" কথাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, বঙ্কিমবাবু যথার্থই যে এই কথা বলিয়াছিলেন, তাহার নিশ্চিত প্রমাণ নাই। তথাপি উক্ত পাঠক বা সমালোচক এই অনিশ্চিত সংশয়-জড়িত কথাকে ভিত্তি করিয়া তাহার উপর তাঁহাদের অভিমত বা সমালোচনার এমারত নির্ম্মাণ করিতে চাহেন। আর যদিই বঙ্কিমবাবু উপন্যাস বিশেষ নীতি বা ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশ্যে না লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলেও যে সেই উপন্যাসে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদত্ত হইতে পারে না, ইহা সিদ্ধান্ত হয় নাই। সেক্সপিয়ার ধর্ম্ম বা নীতি প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁহার নাটক লেখেন নাই, এ কথা সত্য হইতে পারে। তথাপি তাঁহার কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ নাটকে কি নীতি-শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহা একজন মহা পণ্ডিত সূক্ষ্মদর্শী পাদ্রি অতি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বেতাল পঞ্চবিংশতি যে কোন নীতিতত্ত্ব শিক্ষা দিবার নিমিত্ত লিখিত হয় নাই, এ কথা সত্য হইতে পারে। তথাপি সমালোচক ৺চন্দ্রনাথ বসু তাঁহার কোন কোন গল্পে নীতিশিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখাইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্র আমাকে বলিয়াছিল, তাহার কয়েকটী হাসির গান শুনিয়া আমাদের দেশের একজন মহানুভব ব্যক্তি (সম্ভবতঃ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) বলিয়াছিলেন যে, এই কয়েকটী গীতিতে বেশ নীতিশিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্র তাহাতে বলিয়াছিল, "আমি কিন্তু নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্যে ঐ গান রচনা করি নাই।" দ্বিজেন্দ্রের একটী হাসির গান সমালোচনা করিয়া ইংলিশম্যান সংবাদ পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিত একটী দীর্ঘ প্রবন্ধে, ঐ গানটীতে যে নীতিশিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছিল। গোল্ডস্মিথ অত্যন্ত দারিদ্র্যে পড়িয়া অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত তাঁহার Vicar of Wakefield লিখিয়াছিলেন, অথচ তাহাতে বেশ নীতিশিক্ষা আছে। ফলতঃ যে উপন্যাস বা কাব্য প্রকৃত পক্ষে সুন্দর, তাহাতে ঐ সুন্দর ভাবের মধ্যে ধর্ম্মভাব বা সুনীতির ভাব বর্ত্তমান থাকে। সেইজন্য যিনিই উৎকৃষ্ট উপন্যাস বা কাব্য লিখিয়াছেন, সুনীতি প্রচার তাঁহার উদ্দেশ্য না থাকিলেও, তাঁহার পুস্তকে ফলতঃ সুনীতি প্রচার হইয়া থাকে।

কোন কোন পাঠক বা সমালোচক দুর্গেশনন্দিনীর গোড়াতেই সংযমের চিত্র দেখিতে পান নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে চাহেন যে, দুর্গেশনন্দিনীতে সুনীতি শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে, ইহা সম্ভবপর নহে। জগৎ সিংহের চরিত্র মহৎ। তাঁহার প্রণয়ও পাপসিক্ত নহে। তবে এই প্রণয়ে কোন কোন স্থানে তাঁহার সংযমের অভাব দেখা যায়। সত্য বটে, তিনি গোপনে দুর্গস্বামীর

অজ্ঞাতে চোরের স্থায় দুর্গে প্রবেশ করিতে সম্মত হয়েন নাই। ইহাও সত্য যে,বিমলা কর্ণে এমন কোন কথা বলিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার বোধ হইল, বিমলার তাঁহাকে দুর্গে লইয়া যাইবার অধিকার আছে। তথাপি ইহাও সত্য, জগৎ সিংহের মহৎ চরিত্রে এবং বিমলার দৌত্যকার্য্যে অসংযম দেখা যায়। এই অসংযম অবলম্বন করিয়া বঙ্কিম বাবু অতি সুন্দর ভাবে নীতিশিক্ষা দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, এই অসংযমের পরিণাম ভীষণ হইয়াছিল। এই অসংযমে, জগৎ সিংহের দেহে রুধির ধারা বহিয়াছিল, বিমলা বিধবা হইয়াছিল, জগৎ সিংহের প্রণয়িনী তিলোত্তমা কষ্টে মৃতপ্রায় হইয়াছিল। পুস্তকে অসংযমের চিত্র থাকিলেই যে তাহাতে সুনীতির শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না, তাহা নহে। দেবীচৌধুরাণী, আনন্দমঠ ও সীতারামেও অসংযমের চিত্র আছে। সকলেই জানেন, বঙ্কিমবাবু এই উপন্যাসত্রয় সুনীতি ও ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশে লিখিয়াছিলেন। বস্তুতঃ অসংযমের ও সংযমের, উভয়ের চিত্র না থাকিলে, অসংযম যে অশান্তি, অধর্ম্ম ও নরক এবং সংযম যে শান্তি, ধর্ম্ম ও স্বর্গ, তাহা সম্যক্‌রূপে দেখান যায় না।

কোন কোন পাঠক ও সমালোচক বিবেচনা করেন যে, যে উপন্যাসে বা কাব্যে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার সমুদয় চিত্রই সংযমের বা পুণ্যের চিত্র হওয়া আবশ্যক। এইটী একটী মস্ত ভুল। মহাভারতে অনেক পাপচিত্র আছে। তথাপি মহাভারত ভারতে বহুকাল হইতে ধর্ম্ম বা সুনীতি প্রচার করিতেছে। রামায়ণেও ধর্ম্ম ও সংযম-বিরুদ্ধ কার্য্যের বর্ণনা আছে, তথাপি রামায়ণের ন্যায় ধর্ম্ম পুস্তক ভূমণ্ডলে বিরল। George Elliot প্রণীত Adam Bede নামক উপন্যাসে এক জমিদার-যুবকের সহিত এক অবিবাহিত গোপবালার পাপপ্রণয়, সেই প্রণয়ে গর্ভসঞ্চার এবং সদ্যোজাত শিশুর হত্যার সবিস্তার বর্ণনা আছে, তথাপি Adam Bede সুধীজন সমীপে ধর্ম্ম পুস্তক বলিয়া গণ্য হয়। যে উপন্যাস পাপের মধ্যে পুণ্যের মহামহিম জ্যোতি ফুটাইয়া তুলিতে পারে,পাপে জঘন্যতা ও পুণ্যের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে পারে, তাহাতেই ধর্ম্মপ্রচার হয়। আর একটী উদাহরণ দেই। ঋষিতুল্য Tolstoi-প্রণীত Resurrection উপন্যাসে আদি রসের অনাবৃত বর্ণনা আছে, পাপের বিস্তৃত বিবরণ আছে, তথাপি সমগ্র ইয়ুরোপ "Resurrection" পুস্তককে সুনীতি-প্রচারক পুস্তক বলিয়া আদর করে। যে পুস্তকে পাপের দমন ও পরাভব এবং স্ফূর্ত্তি ও জয়—পাপে নরক ও পুণ্যে স্বর্গ—ইহা দেখাইয়া দেয়, তাহাতে ধর্ম্ম প্রচার হয়।

কোন কোন শব্দের দুই অর্থ আছে, এ কথা অনেক পাঠক ও সমালোচক একেবারে বিস্মৃত হন। তাই সন্তানের জন্য জননীর আত্মত্যাগ বা নিঃস্বার্থ স্নেহ মনুষ্য জীবনে "পরের" হিতচেষ্টার বা পরোপকারের সর্ব্ব প্রথম দৃষ্টান্ত, মনুষ্যত্ব-বিকাশ-সোপানের প্রথম ধাপ—এই যে কথা Ascent of Man নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে আছে, তাহা পাঠ করিয়া মহামতি সমালোচক বলেন, লেখক খুব গম্ভীর ভাবে একটী কথা বলিতে গিয়া আমাদের কিছু হাসাইয়াছেন। 'পর' শব্দের একটী অর্থ নিজের স্ত্রী পুত্রাদি সম্বলিত পরিবার ব্যতীত অন্য লোক। আর একটী অর্থ স্বয়ং Self ব্যতীত অন্য লোক। সেই অর্থে Ascent of Manএ সন্তানের নিমিত্ত

জননীর আত্মত্যাগ পরোপকার বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

মহামান্য স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার "জ্ঞান ও কর্ম্ম" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন * * "আমি (অর্থাৎ আমার আত্মা) ভিন্ন আর সকলই পর।" "Ascent of Man" এবং "জ্ঞান ও কর্ম্ম" গ্রন্থে উক্ত কথাতে যিনি যত হাসিতে ইচ্ছা করেন হাসুন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। ক্ষুদ্র আমি "পর" শব্দ ঐরূপ অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। সুতরাং সুধী পাঠক বা সমালোচকের হাস্য পূর্ব্বক স্বকীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।

আমার এই সমালোচনাবলীতে আমি বঙ্কিম-ভক্তির বাড়াবাড়ি করিতেছি, অনেকে মনে করিবেন। তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতাম। আমি একদিন আমার রচিত "উত্তমানন্দ স্বামীর বক্তৃতা"তে অল্প পরিসরের মধ্যে বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থের ভাষা, উপন্যাসের নীতি, ধর্ম্ম ব্যাখ্যা প্রভৃতি প্রায় সমুদয় বিষয়ে তাঁহার বিপক্ষ দল যাহা কিছু নিন্দা করিয়া থাকেন, তাহা লিখিয়াছিলাম। যাঁহারা বঙ্কিম-নিন্দাতে হর্ষলাভ করেন, তাঁহারা সেই রচনা পড়িলে পরিতৃপ্ত হইবেন; তাহা পাঠ করিতে পারেন। কিন্তু আমি তাহা লিখিয়াছিলাম বলিয়া হর্ষলাভ করি না, বরঞ্চ অনুতপ্ত হই। আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি। সেই অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন যুগপ্রবর্ত্তক মহাত্মার ছিদ্র অন্বেষণ ও ঘোষণা করিবার জন্য এখন আমার প্রবৃত্তি হয় না, সে বিষয় আমার যোগ্যতাও নাই। আমার মত ক্ষুদ্র সমালোচক এবং বঙ্গে অন্য যত সমালোচক জীবিত আছেন, তাঁহাদের পক্ষে অসাধারণ প্রতিভাশালী বঙ্কিমের আদর্শে বঙ্কিমের সমালোচনা করার চেষ্টা করা সামান্য দুর্ব্বল ক্ষুদ্র প্রজার পক্ষে মহামহিম সম্রাটের শাসন কার্য্যের অনুকরণ করার ন্যায় বামনের পক্ষে চাঁদ ধরিবার জন্য উদ্বাহু হওয়ার ন্যায় বাতুলের কার্য্য।

আমরা এখন "রজনী" চরিত্র সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই। প্রথম পরিচ্ছেদেই দেখি, রজনী বলিতেছে "আমি জন্মান্ধ"। এই সামান্য কথাতে পাঠকের হৃদয়তন্ত্রী হইতে বঙ্কিমবাবু একটু করুণ সুর বাহির করিয়াছেন। রজনী জন্মান্ধ—পূর্ণিমার শশধরের কান্তিময়ী জ্যোৎস্না, অরুণোদয়ের সুন্দর হাস্য, অস্তাচলগামী রবির কিরণরঞ্জিত মেঘের লাবণ্য, কুসুমের সুষমা, পল্লবিত তরুরাজির শ্যামশোভা, চন্দ্রিকাচুম্বিত তরঙ্গিণীর হীরকখচিত বীচিমালা, মানবদেহের সৌন্দর্য্য—সংক্ষেপে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-জগতে অনবরত যে রূপের ফোয়ারা উঠিতেছে, ঝক্ ঝক্ করিতেছে, তাহার দর্শন হইতে জন্মান্ধ রজনী বঞ্চিত। ইহাতে পাঠকের মনে রজনীর জন্য দুঃখ হয়, রজনী দয়ার পাত্রী মনে হয়। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে আমাদিগের অবস্থা রজনীর অপেক্ষা যে বিশেষ ভাল, তাহা নহে। রজনীর চারিটী ইন্দ্রিয় আছে, আমাদের পাঁচ ইন্দ্রিয় আছে। "জ্ঞান ও কর্ম্মে" লিখিত হইয়াছে—"যেমন চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি (ঐ) মৃৎপিণ্ডের বর্ণ দেখিতে পায়, কিন্তু জন্মান্ধ ব্যক্তি তাহার বর্ণের বিষয় কিছু জানিতে পারে না, ও বর্ণ যে ঐরূপ পদার্থের একটা গুণ, তাহা জানিতে পারে না, তেমনই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ছাড়া কোন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-গুণ, ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব জানিতে পারে, কিন্তু আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব, সেই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অভাবে তাহার কিছুই জানিতে পারি না।" এই ইন্দ্রিয়তত্ত্ব Voltaire তাঁহার একখানি philosophical romance-

যে উৎকৃষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "Tell me" says Micromegas an inhabitant of one of the planets of the Dogstar to the Secretary of the Academy of Sciences in the planet Saturn, at which he had recently arrived in a journey through the heavens,—"Tell me, how many senses have the men on your globe?" "We have seventy two senses" answered the academician "and we are every day, complaining of the smallness of the number." * * "I can very well believe it" says Micromegas, "for in our globe we have very near one thousand senses, * *" আমরা যেমন রজনীর জন্য দুঃখিত হইতেছি, সম্ভবতঃ অন্যগ্রহবাসী এমন অনেক জীব আছেন, যাঁহারা আমাদের জন্য ঐরূপ দুঃখিত হইতে পারেন।

ভারতীয় দর্শনমতে সমুদয় জগৎ নামরূপাত্মক।

"রজনী" চরিত্রে প্রধানতঃ নামতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। নাম ও রূপতত্ত্ব অতি গভীর ও জটিল। আমি তাহা এখানে বুঝাইতে চেষ্টা করিব না। কেবল এই বলিব, নাম বা শব্দ বা ভাষা বা ভাবনিহিত চিন্তার মাহাত্ম্য নানা স্থানে প্রকাশ পায়। শব্দের শক্তি নানা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ওঙ্কার সৃষ্টির সার বলিয়া উক্ত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেও শব্দ সৃষ্টির আদি বলিয়া বর্ণিত আছে। স্বর্গীয় বিবেকানন্দ মহোদয় বলিয়াছেন "হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টিমহৎ প্রথমে আপনাকে নাম পরে রূপাকারে অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগদ্রূপে অভিব্যক্ত করেন।" ইহাতে বুঝা যায়, নামতত্ত্ব যাহা রজনী চরিত্রে বঙ্কিমবাবু বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা কত গভীর। আমি যদি তাহার যৎকিঞ্চিৎও রজনীতত্ত্বে বুঝাইতে পারি, তাহা হইলেই আমাকে কৃতার্থ মনে করিব। ক্রমশঃ

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

আত্মার স্বরূপ।

পৃথিবীতে যত সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, আত্মাই তাহাদের মধ্যে সারতম সত্য। আত্মা জীবন ও সৃষ্টির মূল। আত্মার 'জীবাত্মা' ও 'পরমাত্মা' এই দুই নাম ভেদের * দ্বারাই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত মূল সত্যের প্রকৃত তত্ত্ব আর্য্য ঋষিদিগের চিন্তাতে যেরূপ উদ্ভাসিত হইয়াছে, পৃথিবীতে আর কাহারও চিন্তাতে সেরূপ উদ্ভাসিত হয় নাই। সেই তত্ত্বের যথাসম্ভব আভাস প্রদান করিবার জন্যই আমরা এখানে প্রয়াস পাইব।

প্রথমে আমরা জীবাত্মা হইতেই আরম্ভ করিব। আর্য্যদর্শনেই জীবাত্মার তত্ত্ব বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেও বেদেই ইহার প্রথম অঙ্কুর দৃষ্ট হয়।

ঋষিগণ অসীম পর্য্যবেক্ষণ ও গভীর জ্ঞান বলে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, দেহের অন্য সমস্ত উপাদানের ধ্বংস হইলেও একটী উপাদানের কোনও ধ্বংসই হয় না, যথা—

"জীবো মৃতস্য চরতি স্বধাভিরমর্ত্ত্যো মর্ত্ত্যেনা সযোনিঃ॥" ৩০

ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৬৪ সূক্ত।

"মর্ত্ত্যের সঙ্গে একত্র উৎপন্ন মর্ত্ত্যের অমর-জীব স্বধাভক্ষণ করতঃ (চিরকাল) বিচরণ করে।"

* "আত্মাজীবে মৃতো দেহে স্বভাবে পরমাত্মনি॥"

এই "অমর্ত্ত্য জীবই" যে জীবত্মা, তাহা বুঝিতে কোন কষ্টই হয় না।

আমাদের জীবনের সঙ্গে এই আত্মার বিকাশ হইলেও ইহাকে নিত্য (অজ) বলিয়াই ঋষিগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যথা :—

"অজোভাগস্তপসা তং তপস্ব তং তে শোচিস্তপতু তং তে অর্চ্চিঃ ॥"৪

ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল, ১৬সূক্ত।

"এই মৃত ব্যক্তির যে অংশ অজ, অর্থাৎ জন্মরহিত, চিরকালই আছে, হে অগ্নি! তুমি সেই অংশকে তোমার তাপদ্বারা উত্তপ্ত কর, তোমার ঔজ্জ্বল্য, তোমার শিখা সেই অংশকে উত্তপ্ত করুক্।"

এই প্রকারে আত্মা যে 'অনাদি,' 'অমর', তাহাই ঋষিদিগের উক্তি হইতে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।

এই অনাদি অমর আত্মার প্রথম বিকাশ যে জ্যোতিরূপে হয়, নিম্নোদ্ধৃত বৈদিক ঋক্ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় :—

"ইদং ত একং পর উত একং তৃতীয়েন জ্যোতিষা সংবিশস্ব ॥" ১

ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল, ৫৬ সূক্ত।

"এই (অগ্নি) তোমার এক অংশ, আর এই (বায়ু) তোমার এক অংশ, তোমার তৃতীয় জ্যোতির্ম্ময় (আত্মা) স্বরূপ অংশ। এই তিন অংশ দ্বারা তুমি (অগ্নি বায়ু ও সূর্য্য) মধ্যে প্রবেশ কর।" রমেশবাবুর অনুবাদ।

"হিত্বায়াবদ্যং পুনরস্তমেহি সংগচ্ছাব তন্বাসুবর্চ্চাঃ।" ৮

"পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অস্ত (নামক গৃহে) প্রবেশ কর এবং উজ্জ্বল দেহ গ্রহণ কর।

উদ্ধৃত ঋক্ দুইটী হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, মৃত্যুর পর শরীরের অপর সমস্ত উপাদান স্খলিত ও নষ্ট হইলে একটী মাত্র উপাদানই অক্ষয় উজ্জ্বলরূপে বর্ত্তমান থাকে। ইহাই আত্মা। এই প্রকারেই আত্মা ঋষিদিগের নিকট জ্যোতির্ম্ময়রূপে প্রাতভাত হইয়াছে।

আত্মার উপরি উক্ত জ্যোতির্ম্ময়রূপ পাশ্চাত্য অধ্যাত্ম বিজ্ঞান (Spiritualism) দ্বারাও সমর্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য অধ্যাত্মবিজ্ঞান মতে আধ্যাত্মিক বলসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের দ্বারাই উক্ত জ্যোতির্ম্ময়রূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আমাদিগের ঋষিগণও অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিশক্তি দ্বারাই এইরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি। আমাদের উপনিষদে যে "আত্মাবারে দ্রষ্টব্যো শ্রুতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"—(বৃহদারণ্য ২।৪।৫) এই সুপ্রসিদ্ধ বাক্যে আত্মজ্ঞানের উপদেশ আছে—তাহা পূর্ব্বোক্তরূপ অতীন্দ্রিয়জ্ঞান বলিয়াই মনে হয়।

ঋষিগণ এই প্রকারে কেবল আধ্যাত্মিক ভাবেই যে আত্মার স্বরূপাবধারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা নহে, কিন্তু আধিভৌতিক ভাবেও চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে দেখা যায় যে, ঋষিগণ দেহগঠনের বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা দেহের পাঁচটী কোষ বা আবরকস্তর আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহারা বহিঃস্থূলাবরণ হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ নামে অভিহিত হইয়াছে। আমরা ইহাদিগের নামের দ্বারাই ইহাদিগকে অন্ন (আহার্য্যের বিকার) রূপ, প্রাণ (শ্বাস প্রশ্বাস) রূপ, মনো (চিন্তা) রূপ, জ্ঞানরূপ ও সুখরূপ বলিয়া বুঝিতে পারি; ইহারা ক্রমেই যে স্থূল হইতে সূক্ষ্মরূপ, তাহাও বুঝিতে পারি। এই সমস্তের মধ্য দিয়াই আত্মার কার্য্য হইয়া থাকে। আত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই প্রভু, তাহাতেই দর্শন বলিতেছে "আত্মেন্দ্রিয়াদ্যধিষ্ঠাতা" —ভাষা পরিচ্ছেদ। 'আত্মা ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা।' মন, ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে প্রধান। গীতায় উক্ত হইয়াছে "ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি" "আমি (ভগবান) ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে মন।" মনটী বিশেষ ভাবে আত্মারই করণ বা ইন্দ্রিয়—তাহাতেই মনের নাম "অন্তঃকরণ" হইয়াছে। আত্মা মনকে "সাধক" রূপ করিয়াই সমস্ত বাহ্যাভ্যন্তর কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। আমাদের সমস্ত কার্য্যই আবার জ্ঞানরূপে পরিণত হয়—গীতা বলিতেছে "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরি-

সমাপ্যতে।" আনন্দ বা সুখই জ্ঞানের চরম অবস্থা। এই প্রকারেই আমাদের আত্মা মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় হইয়াছে। ইহা হইতেই উপনিষদে পরম ব্রহ্ম বা পরমাত্মা "সচ্চিদানন্দ" স্বরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। জ্ঞানের ধর্ম্ম প্রকাশ বা দীপ্তি। তাহাতেই জ্ঞান আলোকরূপে কল্পিত হইয়া 'জ্ঞানালোক' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।* অজ্ঞান আবার অন্ধকাররূপে কল্পিত হইয়া "অজ্ঞানান্ধকার" শব্দেরও ব্যবহার হয়। আত্মা জ্ঞানময় বলিয়া ইহা যে প্রকাশাত্মক রূপে বর্ণিত হইবে, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। বেদে আত্মা যে জ্যোতির্ম্ময় রূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সহিত আত্মার প্রকাশাত্মক জ্ঞানময়রূপের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বেদে যে 'পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক' 'উজ্জ্বল দেহ গ্রহণ করার' উল্লেখ আছে—তাহাতে সম্পূর্ণরূপে পাপ নির্ম্মুক্ত না হইলে যে আত্মার উজ্জ্বলপ্রভা সম্যক্ প্রতিভাসিত হয় না, তাহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

বেদের বর্ণনায় আত্মার মুক্তির অবস্থাই অঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, দেহবন্ধন হইতে মুক্ত না হইয়া যখন ভোগ দেহ ধারণে আত্মাকে বাধ্য হইতে হয়, তখন আত্মা যে সূক্ষ্মদেহে অবস্থিত হয়, তাহার বর্ণনা পুরাণে এইরূপ পাওয়া যায় :—

"বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণশ্চ যোজীবপুরুষঃকৃতঃ।
বিভর্ত্তি সূক্ষ্মদেহং তং তদ্রূপং ভোগদেহবে॥
সদেহো নউদ্ভেন্ম জ্বলদগ্নৌ যমালয়ে।
জলেন নষ্টো দেহীবা প্রহারে সুচিরেকৃতে॥
নশস্ত্রে নচাস্ত্রেচ নতীক্ষ্ণকণ্টকে তথা।
তপ্তদ্রবে তপ্তলৌহে তপ্ত পাষাণ এবচ॥
প্রতপ্ত প্রতিমাশ্লেষেহপ্যূর্দ্ধপতনেহপিচ।
নচদগ্ধোনভগ্নশ্চ ভুঙ্‌ক্তে সন্তাপমেবচ॥
কথিতং দেহবৃত্তান্ত কারণঞ্চ যথাগমম্॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণম্।

এই সূক্ষ্ম শরীরই 'লিঙ্গ শরীর' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ইহাকে 'জীব-পুরুষ' নামে নির্দ্দেশ করায় ইহাকে জীবাত্মা বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে।

গীতায় জীবাত্মা সম্বন্ধে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা লিঙ্গ শরীরের বর্ণনার এরূপই অনুরূপ যে, উভয়কে এক বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণই দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে তুলনার জন্য আমরা গীতার বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো নশোষয়তি মারুতঃ।
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এবচ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো।
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে জীবাত্মাকে বেদোপপাদিত জন্মমৃত্যুরহিত নিত্যসত্য তত্ত্ব বলিয়াই জানা যাইতেছে।

জীবাত্মার স্বরূপই যে পরমাত্মা, তাহা গীতায় স্পষ্টাক্ষরেই কীর্ত্তিত হইয়াছে যথা—

"অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি
ন লিপ্যতে॥"

"হে কৌন্তেয়! অনাদিত্ব ও নির্গুণত্ব জন্য পরমাত্মা অবিকারী, এবং শরীরে অবস্থিত থাকিয়াও কিছুই করেন না এবং (কর্ম্মফলে) লিপ্ত হন না।" আর্য্যমিশন অনুবাদ।

পরমাত্মার অপূর্ব্ব প্রভা ও মহিমা যে জীবাত্মায় স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়, তাহা গীতায় পরিষ্কার রূপেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

"জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্যবিষ্ঠিতম্॥"

"তিনি সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ সকলেরও জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশক, অজ্ঞান হইতে পর অর্থাৎ তাহা কর্ত্তৃক অস্পৃষ্ট বলিয়া কথিত হন। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য অর্থাৎ সাধনা দ্বারা প্রাপ্য। এবং সমুদায় জীবের হৃদয়ে নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত।"

আর্য্যমিশন অনুবাদ।

এস্থলে আমরা আত্মা সম্বন্ধে বেদের সেই জ্যোতির্ম্ময় রূপের বর্ণনাই প্রাপ্ত হইতেছি।

পরমাত্মাও পরমেশ্বর (পরমব্রহ্ম) যে

* "সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদাতদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥"
১১—গীতা ১৪শ অধ্যায়।

আমাদের জীবাত্মারই প্রকৃত স্বরূপ, গীতায় তাহাও সুস্পষ্ট রূপেই অঙ্গীকৃত হইয়াছে, যথা

"উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষপরঃ॥"

"এই দেহস্থিত পরম পুরুষই সাক্ষীভূত, অনুজ্ঞাকারী, ভরণকারী, পালনকারী, পরমাত্মাও পরমেশ্বর (পরব্রহ্ম) বলিয়া কথিত হন।

ন্যায়দর্শনে 'ব্যোমতত্ত্ব' ব্রহ্মেরই তুল্য বলিয়া এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

"বিভত্বান্মহত্বাচ্চ তথানিত্যস্বরূপতঃ।
ব্রহ্মব্যোম্নোর্নভেদোঽস্তি চৈতন্যং ব্রহ্মণোঽধিকম্॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত প্রাচীন ন্যায়গ্রন্থঃ।

"বিস্তার ও বিরাটত্ব এবং নিত্যত্ব দ্বারা আকাশ ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ব্রহ্মের চৈতন্য মাত্রই অধিক।"

উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে ব্রহ্মকে যেরূপ বিশ্বের চরম 'চৈতন্যতত্ত্ব' বলিয়া বুঝা যাইতেছে, ব্যোম বা আকাশকেও তেমনই বিশ্বের চরম 'জড়তত্ত্ব' বলিয়া বুঝিতে পারা যাইতেছে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ব্যোম বা আকাশতত্ত্বের নাম ইথার, (Æther)। এই ইথারই বিশ্বের শেষ জড়তত্ত্ব বলিয়া বর্ত্তমান বিজ্ঞানে স্বীকৃত হইয়াছে।

এই ইথারই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলোপাদানরূপে বর্ত্তমান। Energy বা শক্তির সহযোগেই ইথারের দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে। ইথার, সমুদ্র বা 'কারণবারি' রূপে ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। শক্তির ক্রিয়াতে এই ইথার-সমুদ্রে যে তরঙ্গ উত্থিত হয়, তাহারই বুদ্বুদরূপে electron বা তাড়িতাণুরূপে সূক্ষ্মোপাদান সকল দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিরচিত হয়। উপরে আমরা ব্রহ্মেতে যে চৈতন্যতত্ত্বের সমাবেশ দেখিতে পাইয়াছি; তাহাকে আমরা পূর্ব্বোক্ত Energy বা শক্তিরই প্রতিরূপ বলিয়া মনে করি।

সৃষ্টির প্রাগবস্থায় চৈতন্য ব্যোমতত্ত্বের উপর কার্য্য না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে বর্ত্তমান থাকে। ইহাই 'কূটস্থ চৈতন্য' বলিয়া অভিহিত হয়। চৈতন্যতত্ত্বের এই নির্লিপ্ত ভাবেরই নাম 'পরব্রহ্ম' বা 'পরমাত্মা'। এই চৈতন্যতত্ত্ব ব্যোমতত্ত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলেই 'জীবাত্মা' নাম প্রাপ্ত হয়। ছান্দোগ্যোপনিষদে আত্মার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে ইহা 'আকাশাত্মা' বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে যথা—

"মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বামিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ।"

ছান্দোগ্য ৩য় অ ১৪ খণ্ড।

"এই পুরুষ মনোময়, প্রাণশরীর, তেজোরূপ, সত্যসঙ্কল্প, আকাশস্বরূপ, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বব্যাপী, বাক্যরহিত ও সম্ভ্রমরহিত।"

তৈত্তিরীয়োপনিষদেও (১ম বল্লী ৬ষ্ঠ অনুবাক) "আকাশশরীরং ব্রহ্ম" বলিয়া উক্ত হওয়ায় ব্রহ্ম যে আকাশের মধ্য দিয়াই শরীর বা রূপ ধারণ করেন,তাহা বুঝিতে পারা যায়।

সুতরাং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের Energy and Æther বা Matter and Forceকে আমরা আর্য্যদিগের "চৈতন্যোপহিত ব্যোম" কথা দ্বারাই অনুবাদ করিতে পারি। এই চৈতন্যোপহিত ব্যোমই "জীবাত্মা" শব্দ প্রতিপাদ্য। অতএব চৈতন্যোপহিত ব্যোম যে জীবাত্মার স্বরূপ এবং কূটস্থ চৈতন্য পরমাত্মার স্বরূপ, তাহাই আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি।

শ্রীশীতলচন্দ্র বিদ্যানিধি।

সঙ্গণিকা।

(১৮)

এবারকার সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রথম ১২ জনের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ও ভারতবাসীর মধ্যে একজন কেবল বাঙ্গালী। গবর্ণমেণ্ট কতজন এবার গ্রহণ করিবেন, ঠিক বুঝা যাইতেছে না। বাঙ্গালীর মধ্যে শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঙ্কুর দে তিন বিষয়ে প্রথম ও এক বিষয়ে

তৃতীয় হইয়াছেন। ভারতবাসীর মধ্যে তিনি পঞ্চম ও ১২ জনের মধ্যে একাদশ স্থান অধিকার করিয়াছেন। এবার ১২ জনকে গ্রহণ করা হইবে, পূর্ব্বে ঘোষিত হইয়াছিল, এখন শুনিতেছি যে, কেবল ৭ জন গৃহীত হইবে। তাহা হইলে ভারতবাসী মাত্র ২ জন চাকরী পাইবেন। বাঙ্গালী কেহই পাইবে না। এজন্য ২২শে (১৯১৬) সেপ্টেম্বরের "India" কাগজে সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখান হইয়াছে যে, ১২ জন গৃহীত না হইলে বড়ই অবিচার হইবে। এত অল্প সংখ্যক আর কখনও গৃহীত হয় নাই। ন্যায়বান গবর্ণমেণ্টের নিকট আমরা সুবিচারের আশা করিয়া বসিয়া আছি। জ্ঞানাঙ্কুরের দ্বারা বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি র‍্যাংলার ও বড় বড় মনীষীদিগকেও পরাভূত করিয়াছেন। এ হেন ব্যক্তির দ্বারা বংশ এবং বাঙ্গালীর গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে। এখন ষ্টেট-সেক্রেটারী মহোদয় জ্ঞানাঙ্কুরের প্রতি সুবিচার করিলে সকলের আনন্দের কারণ হয়। আশা করি, গবর্ণমেণ্ট তাহা করিবেন।

(১৯)

এবার শারদীয় উৎসবের সময়ে ঢাকায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ও গিরিধিতে নববিধান-সঙ্ঘের মহা সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। ঢাকার সম্মিলনে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এবং গিরিধিতে মহারাজ মাতা শ্রীযুক্তা সুনীতি দেবী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। নববিধান-সঙ্ঘ কোন প্রবীণ সাধুভক্তকে সভাপতির পদে বরণ করিলে ভাল হইত নাকি? বংশের মর্য্যাদা কি শেষে ব্রাহ্মসমাজে একমাত্র গণনার জিনিস হইবে?

গিরিধির সম্মিলনে—যে নূতন সঙ্গীতটী গীত হইয়াছিল, তাহার নীচের কয়েক পংক্তি এই,—

আজ,
আঁধারে যাহারা নাচে তাতা থই, বিরোধে যাহারা দেখায় ভয়,
ভক্তের যারা করে অপমান দেবতার তারা কেহত নয়!
অগ্নিমন্ত্রে লইয়া দীক্ষা বাহির হইলে ধর্ম্মবীর,
মন্ত্রমুগ্ধ শুনিল ধরণী, বিস্ময়ে শুধু নোয়াল শির।
বিষের বহ্নি তবুও জ্বালায়ে তোমারে যাহারা দহিল হায়,
ধূলি মাঝে তারা হয়ে যাবে ধূলি, সোণা হয়ে তুমি ফুটিবে তায়!

আমাদের বিশ্বাস ছিল, কালাপাহাড় ও কর্ত্তাভজাদের রাজত্ব এই বিংশ শতাব্দীতে তিরোহিত হইয়াছে, কিন্তু আজ মিলনক্ষেত্রে এ কি বাণী শুনিলাম? শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ, রাজেশ্বর গুপ্ত ও রাজেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি মহাত্মাগণ গিরিধি-সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়কে লিখিয়াছেন যে, ঐ সঙ্গীতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে লক্ষ্য করা হয় নাই। "ভক্তের প্রতি অপমান" যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ লক্ষণ, তাহা তাঁহারা মনে করেন না। তাঁহাদের এই মন্তব্য পড়িয়া সুখী হইলাম, কিন্তু শেষ চারি পংক্তি সম্বন্ধে তাঁহারা কি মনে করেন? বাঙ্গালা ভাষায় যাঁহাদের একটু অধিকার আছে, তাঁহারাই বলিবেন যে, ইহাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ কি আজও দূর হয় নাই? কবেকার কোন্ কথা লইয়া আলোচনা আর কতদিন চলিবে? মিলনের ভূমিতে এইরূপ বিদ্বেষের কথার উল্লেখ হয় কেন? শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ও ব্রজগোপাল প্রভৃতি ভক্তগণ যেখানে উপস্থিত ছিলেন, সেখানে এরূপ গান গীত হইল কেন? আমরা সর্ব্বদা নববিধান সমাজের গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকি, কিন্তু এই সঙ্গীতে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। উভয় সমাজের ভক্তগণের চরণে নিবেদন, এরূপ বিদ্বেষ উদ্গীরণ হইতে তাঁহারা প্রতিনিবৃত্ত হউন, নচেৎ সমাজের মঙ্গল নাই।

(২০)

এবার অনরেবল শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়কে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সভাপতি বরণ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। তিনি ফরিদপুরের আঁধার ঘরের মাণিক, বঙ্গের গৌরব। তাঁহার নিঃস্বার্থ স্বদেশসেবার সুফল ফলুক।

মহাকবি কালিদাস।

অন্যূন প্রায় পঞ্চাশ বর্ষ ধরিয়া মহাকবি কালিদাসের জাতি ও বাসস্থান সম্বন্ধে অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও পণ্ডিতমণ্ডলী মস্তিষ্ক চালনা করিয়া আসিতেছেন এবং এতদ্ সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। তবে ভারতের প্রাচীনেতিহাস ধারাবাহিক রূপে লিখিত না থাকায় বা কঠোর কালের কুক্ষীগত হওয়ায়, কিম্বা বিদেশীয়দিগের উপর্য্যুপরি ভারতাক্রমে উহা ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ায়, তাহার পুনরুদ্ধার বড়ই দুরূহ ব্যাপারে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কেবল কতকগুলি আনুমানিক বা পারিপার্শ্বিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ভারতীয় বিদ্বৎ-সমাজ যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন,সে আলোচনার ফল সম্পূর্ণরূপে প্রীতিপ্রদ হইতেছে না। যাহা হউক, মহাকবি কালিদাস যে পৃথিবীর সভ্য জগতের কাব্য ও নাট্যাকাশে একমাত্র চন্দ্রমা, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। সেই কবিরাজ চূড়ামণি কালিদাসের জাতি বা নিবাস সম্বন্ধে পূর্ব্বকার পণ্ডিতবর্গেরা কোন রূপ আলোচনা করিতেন না। তাঁহারা জগতের মধ্যে উঁহার অতুলনীয় কাব্য ও নাট্য রসাস্বাদ করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। মহাত্মা পরমহংস দেবের ভাষায় তাঁহারা আম খাইয়াই আনন্দ লাভ করিয়াছেন, কাহার আমগাছ, কাহার বাগানের আমগাছ, কে গাছটী পুঁতিয়াছিল ইত্যাদি রূপ কোন সংবাদই রাখিতেন না বা তজ্জন্য মস্তিষ্কের চালনা করিয়া জান নাই। কিন্তু আজ কাল মানুষ কেবল আম খাইয়া সন্তুষ্ট নহেন, ইঁহারা তাঁহার নাট্য বা কাব্যামৃত পান করিয়া তৃপ্ত নহেন। বর্ত্তমান কালের লোকেরা প্রত্যেক খ্যাতনামা লোকের বাসস্থানাদি জানিতে উৎসুক, অমুক পণ্ডিত, অমুক কবি, অমুক দার্শনিক, অমুক যোদ্ধা কোথায় জন্মিয়াছিলেন, তিনি কোন্ জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য লালায়িত। মানুষের এ আকাঙ্ক্ষা জাগতিক ক্রমোন্নতির ফল বিশেষ। কোন কোন স্থলে অনুসন্ধিৎসুগণের মুখ্য উদ্দেশ্য স্ব স্ব জাতির কোনরূপ গৌরব বৃদ্ধি করা, যেখানে অনুসন্ধিৎসুকেরা এই পন্থার অনুবর্ত্তী, সেখানে প্রায়ই তৃপ্তিপ্রদ ফল লাভ হয় না দেখিতে পাওয়া যায়। একারণ প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ যখন কোন ঐতিহাসিক রহস্যোদ্‌ঘাটনরূপ মহদ্‌কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তখন যেন তাঁহারা নিরপেক্ষ ভাবে ও নিঃস্বার্থপরায়ণপর হইয়া এরূপ গুরুতর কার্য্যে ব্রতী হইতে পারেন, ইহাই আমার ও জনসাধারণের সকলেরই বোধ হয় বাঞ্ছনীয়।

২। ইতঃপূর্ব্বে লোকের সাধারণ বিশ্বাস ছিল (এবং এখনও যে অনেকের নাই, তাহা বলিতে পারি না) যে কবিকুল-চূড়ামণি কালিদাস, যিনি অভিজ্ঞান শকুন্তলা ও রঘুবংশাদি কাব্যের প্রণেতা, পশ্চিম দেশবাসী ছিলেন, কিন্তু ইদানীং বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী বা প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন। উঁহাদের এই নব সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রধান সাক্ষ্য বা উপাদান কালিদাসের কাব্যের ও নাটকাদির বর্ণনা-চাতুর্য্য ও শব্দ-প্রয়োগের প্রণালী। যে কেহ কালিদাসের ভাষাচাতুর্য্যের আভ্যন্তরিণ ভাগ

ও শব্দ-প্রয়োগ আলোচনা করিবেন, তিনি কবিকে বাঙ্গালী না বলিয়া থাকিতে পারিবেন না। অধিকন্তু কালিদাসের "কালিদাস" এই নামটী ও "কবিরাজ" এই বিশেষণ পদটী, কবি যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহা অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া দিতেছে। আমরাও জানি বা শুনিয়া আসিতেছি, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজসভা নয়টী মহাপণ্ডিত দ্বারা সুশোভিত ছিল, কালিদাস সেই "নবরত্ন" নাম-প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর্গের মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন বা কহিনূর-মণি। আমরা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক অর্থাৎ

ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকমেব সিংহ শঙ্কু
বেতালভট্ট! ঘটকর্পর কালিদাসাঃ
খ্যাতৌ বরাহমিহিরৌ নৃপতেঃ সভায়াং।

হইতে দেখিতে পাই যে, শ্লোকের প্রকৃত ব্যাখ্যানুসারে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় নয়টীর পরিবর্ত্তে ১১টী রত্ন ছিল। যাহা হউক, এ বিষয় লইয়া আমাদের মস্তিষ্ক চালনার আবশ্যকতা দেখিতেছি না, কারণ আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় কবির জাতি ও বাসস্থান লইয়া। আমরা যদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটী বিশ্লেষণ করি ত বেশ বুঝিতে পারিব যে "কালিদাস" ছাড়া কোন রত্নেরই নাম বঙ্গদেশ প্রভব নহে। একমাত্র কালিদাস এই নামটী বাঙ্গালার নিজস্ব ও নিব্যূঢ় সম্পত্তি।

৩। শ্রদ্ধেয় ৺রামদাস সেন মহাশয় তাঁহার ঐতিহাসিক রহস্য নামক গ্রন্থে ইহাই প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন যে, 'মাতৃগুপ্ত" ও মহাকবি কালিদাস অভিন্ন ব্যক্তি। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ কখন এ তথ্য উৎঘাটনে প্রয়াস পান নাই। তাঁহার এ সিদ্ধান্তের ভিত্তি কবি কহ্লনের রচিত কাশ্মীরের ইতিহাস "রাজতরঙ্গিণী"। এই ইতিহাসের মতে মহারাজ বিক্রমাদিত্য কাশ্মীর রাজ্য অধিকার করিয়া কালিদাসকে উক্ত দেশের সিংহাসন দান করেন। মহাকবি কালিদাস তাঁহার বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন। ৺রামদাস বাবুর সিদ্ধান্ত পায়ে ঠেলিয়া ফেলিতে পারা যায় না, কারণ রাজতরঙ্গিণী একখানি প্রামাণ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ। আমারও মনে হয়, মহাকবি কালিদাস ও মাতৃব্যক্তি এক ব্যক্তি এবং কবিকুল-কেতু কালিদাস আমাদের শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির কহিনুর মণি।

৪। যে সমুদায় পণ্ডিত বা মনীষীগণ মহাকবি কালিদাসকে বাঙ্গালী বলিয়া স্থির করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাঁহাদের প্রধান সমস্যা দাঁড়াইতেছে,কালিদাসের জাতি লইয়া, কারণ কালিদাসকে বাঙ্গালী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে হইলে তাঁহাকে জাতিতে বৈদ্য (অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ) না ভাবিয়া থাকিবার কাহারও উপায় নাই। মহাত্মা কালিদাসের নামতত্ত্ব ও "কবিরাজ" এই উপাধিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া অনেকেই তাঁহাকে বাঙ্গালী বৈদ্য বলিয়া স্থির করিতেছেন। বর্ত্তমান কালে, 'মন্দার মালা'র সম্পাদক অশেষ বেদবিদ্ পণ্ডিত শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন উক্ত পণ্ডিতদিগের মধ্যে একজন। অবশ্য শ্রদ্ধেয় উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় নিজে বৈদ্য (অম্বষ্ঠ) কিন্তু তিনি তাঁহার এ সিদ্ধান্তে পূর্ব্বে যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা একবারে অবহেলা করাও একরূপ অসম্ভবপর। যাহা হউক, আমরা চাই সত্যের আবিষ্কার, যেরূপেই হউক সত্যানুসন্ধান। মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালী বলিয়া অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হইলে আমাদের বাঙ্গালা ভূমির যে মুখোজ্জ্বল হইবে,ইহা কে না চায়? আর জগৎবরেণ্য কালিদাস যদি জাতিতে

বৈদ্য হন, তাহাতেই বা আমাদের ক্ষতি কি? বাঙ্গালার বৈদ্যজাতি ত বাঙ্গালার একটী প্রধান অঙ্গ, কোন অঙ্গের যদি ভগবৎ-দত্ত সৌষ্ঠবতা থাকে, তাহাতেই বা অপরাপর অঙ্গের হিংসা-দ্বেষ করিবার কি আছে? পুরুষের দেহ সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি লইয়া, ব্যষ্টি লইয়াই সমষ্টি। আমরাত প্রায় দেখিতে পাই, কোন লোকের মস্তকটা বেশ সুন্দর, কাহার বা হাত দুখানি আজানুলম্বিত, কাহারও বা পদ্মোৎপল চক্ষু, কাহারও বা তিলফুলজিনি নাসা, তদ্বৎ বঙ্গীয় রূপ সমাজ-দেহে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থাদি রূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির কাহার কাহার ভিতর যদি ঈষদ্ তারতম্য থাকে, সে তারতম্য জন্য কি কাহার কিছু হিংসাদ্বেষ করিবার আছে? যদি এই ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থাদি রূপ এই মহান বঙ্গদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি পরস্পর হিংসা-পরায়ণ হয়েন, তাহার যে কি বিষময় ফল, তাহা প্রত্যেকেই অনুভব বা অনুমান করিতে পারেন। এ কলহের একমাত্র উপমা বালক-বালিকা-জ্ঞাত উদর ও অপর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির কলহের সহিত। ভগবানের সৃষ্টিতে কেহ পরিত্যক্ত হইবার নহে, সকলেরই বিশেষ বিশেষ আবশ্যকতা আছে। সেই জন্য সকলেরই স্ব স্ব স্থানে ভগবৎ-দত্ত প্রাধান্য আছে। আর যখন জগতে চিরকালই গুণেরই আদর এবং জাতিবিভাগ কেবল মাত্র সেই গুণ সাপেক্ষ, কারণ ভগবান গীতায় বলিয়াছেন "চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ" যখন মন্বাদি শাস্ত্রেও আছে "শূদ্র ব্রাহ্মণ্যামেতি। ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাং" তখন আর জাতি লইয়া ধুইয়া খাই-বার কি আছে? যখন আমরা পরম ভক্ত হরিদাস ঠাকুরকে মহাত্মা কবীরকে ও সেদিন-কার ক্ষণজন্মা বিবেকানন্দ স্বামীকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকি, তখন আর জাতি-বিদ্বেষানল যে কতদূর অর্ব্বাচীনতার পরি-চায়ক, তাহা সুধী মাত্রই ধারণা করিতে পারেন। তাই আমার একান্ত প্রার্থনা, সকলে বৃথা কলহ পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে সত্যপথে অগ্রসর হইতে পারেন, আসুন আমরা তাহাই করি।

৫। আমি এইমাত্র বলিয়াছি, বর্ত্তমান সময়ে 'মন্দার মালা'র সম্পাদক পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রদ্ধেয় উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় কবিরাজ শিরোমণি কালিদাসকে বাঙ্গালী বৈদ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তিনি যে সমুদায় কারণ-সমষ্টির উপর নির্ভর করিয়া এ সিদ্ধান্তে উপ-নীত হইয়াছেন, তাহার খণ্ডন সময় সাপেক্ষ ও ভবিষ্যৎ প্রমাণের উপরও নির্ভর করিতেছে। আর তিনি স্বয়ং জাতিতে বৈদ্য, কাজেই ক্ষুদ্র-মনা অনেকেই তাঁহার মত একবারে গ্রহণ করিতে রাজি নহেন। আমিও তজ্জন্য এতাবৎ অপেক্ষায় ছিলাম, কেহ উমেশ বাবুর মতের প্রতিবাদ করেন কি না। যে জাতিতত্ত্ব লইয়া বঙ্গীয় সমাজে দারুণ বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, সেই নির্ব্বাণোন্মুখ বহ্নিতে আর ঘৃতাহুতি দান করিতে অনিচ্ছুক ছিলাম। কিন্তু মধ্যে 'গৃহস্থ' মাসিক পত্রিকায় (১৩২০ সালের) "কালিদাস বাস ভবন" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয় মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় জগৎবরেণ্য কবি-কুল-চূড়ামণি কালিদাসকে জাতিতে বৈদ্যও তাঁহার বাসস্থান আমাদের বাঙ্গালায়, এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কাজে কাজেই আমাকে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ অতিশয় মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে হইয়াছে। তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণ হইয়া মহাকবি কালিদাসের বৈদ্যত্ব সম্বন্ধে উক্ত প্রবন্ধে যে সমুদায় কারণ-সম্ভার অবতরণ করিয়াছেন, তাহা বেশ

যুক্তিযুক্ত বলিয়া আমার মনে হইয়াছে। তিনি কালিদাসের বাসভবন ও জাতিতত্ত্ব বিচারের যে সমুদায় ঐতিহাসিক উপাদান, ঘটনাগত সাক্ষ্য সাহিত্য-জগতের ও প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণের সম্মুখীন করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বঙ্গবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ। তবে তাঁহার প্রবন্ধের কোন কোন স্থলে কিছু কিছু অসংশ্লিষ্ট বাক্যাবলি প্রযুক্ত হইয়াছে ও তজ্জন্য বাঙ্গালার বৈদ্যগণের অযথা মনকষ্ট উৎপাদন করিয়াছেন দেখিয়া আমি দুঃখিত আছি। আমার মনে হয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মনুসংহিতা, মহাভারত, হারীত সংহিতা ও অপরাপর বৈদ্যকুল-পঞ্জিকা ভাল পাঠ করা নাই, তজ্জন্য তাঁহাকে এক বিষম ভ্রান্তিতে পতিত হইতে হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ বিবাদ রূপ ত্রিদোষের প্রকোপ কালে আমাকে এ সুদূর উত্তর পশ্চিম প্রদেশে কার্য্যোব্যপদেশে বাস করিয়াও পুরাণ ইতিহাসাদি ও বৈদ্য জাতির প্রামাণ্য কুলপঞ্জিকাদি পাঠ করিতে হইয়াছে এবং এই সমস্ত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছি, তাহার ফলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রবন্ধের কোন কোন স্থল প্রমাদ-দুষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি। সেই ভুল ধারণা অপনোদনের জন্য আমি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কালিদাস সম্বন্ধে প্রবন্ধের সারাংশ অধ্যাহৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না এবং তৎসম্বন্ধে যুক্তিযুক্তি স্বমত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

"মহারাজ" সমুদ্রগুপ্তের বংশধরগণ যদি এদেশে আসিয়া বৈশ্য হইয়া থাকেন এবং যদি তাঁহাদের কন্যা বিবাহ করিয়া কালিদাস "মাতৃগুপ্ত" ঐ আখ্যা লাভ করিয়া থাকেন, তবে বিদ্যার গর্ভজাত পুত্রগণ বৈদ্যনামে কেন না অভিহিত হইবেন? ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়াং জাতোঽম্বষ্ঠ ইতি স্মৃতঃ" এখানেও "অম্বষ্ঠ" শব্দ মাতৃগুপ্তের আভাস আসিতেছে। অম্বষ্ঠ হইতে বৈদ্য জাতি যদি সম্যক পৃথক বর্ণ হয়, তাহা হইলেও তাহাদের সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ ঔরসে বৈশ্য কন্যার গর্ভজাত বলিয়া অনেক বচন শুনা যায়। যে ব্রাহ্মণ এরূপ সঙ্কর পুত্রের জন্ম দিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ধন্বন্তরি ছিল। এই মাতৃগুপ্তই সেই ধন্বন্তরি, কারণ গুপ্ত উপাধিধারী সকল বৈদ্যই ধন্বন্তরি গোত্রীয় বলিয়া পরিচয় দেন। মাতৃগুপ্ত যদি বৈদ্যদের পূর্ব্বপুরুষ ধন্বন্তরিই, তবে নবরত্নের অন্যতম ধন্বন্তরি হইতে পারে, তাহার পূর্ণ নাম এ কারণ মাতৃগুপ্ত ধন্বন্তরি হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। তিনিই কবিরাজ বা রাজকবি বা কবিশ্রেষ্ঠ ছিলেন। কবিরাজ কথাটার আভিধানিক সংজ্ঞা অন্যরূপ হইলেও ঐতিহাসিক সংজ্ঞা লোকাবগত সমুদায় বৈদ্যগণই আপনাদিগকে কবিরাজ বলিয়া থাকেন, অতএব তাঁহারা কবিরাজ মাতৃগুপ্ত ধন্বন্তরির শ্যালক-বংশীয় এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। কালিদাস বৈশ্যরাজকন্যা বিবাহ করিবার পরে উমাকালী অম্বাদাস বা মাতৃগুপ্ত এইরূপ কোন নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহাকে সুন্দরী বৈশ্যরাজকন্যা বিবাহ করিতে অনেকেই নিষেধ করেন, কিন্তু তিনি "সমাজ বা তপস্যোত্তাপকারী কার্য্য করিতে বিরত হন নাই" "বংশ বৃদ্ধির অনুপাত অনুসারে বৈদ্য জাতিকে নবদ্বীপের মূল জাতি বলিতে পারা যায় না, কিন্তু উহাকে ব্রাহ্মণ জাতির পতিত শাখা ধরিয়া মাতৃগুপ্তের সহিত সমন্বয় করা যাইতে পারে"। বৈদ্য জাতির নবদ্বীপের উপনিবেশ স্থাপন সম্বন্ধে বলিয়াছেন "এখনও সমুদ্রগড়ের অধ্যাপকগণ অশূদ্রগ্রাহী ব্রাহ্মণই আছেন, অথচ

তাঁহারা বৈশ্যের কর্ণে মন্ত্র দিয়া থাকেন, ইহাতে তত্রত্য বৈশ্যদের নৃপবংশীয়ত্বের পরিচয় দিতেছে" "গুর্জ্জর হইতে উন্নত জাতির আগমন কল্পনা করিলে বৈশ্যজাতিকে তাহাদের একটী ক্ষুদ্র শাখা মনে করা যায়; বাঙ্গালার ইতিহাসে বৈদ্য জাতির নাম নাই। আদিশূরীয় ব্রাহ্মণগণের বাঙ্গালায় আগমনের পূর্ব্বে ঐ দেশে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদিগকে সপ্তসতী আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল, কালিদাস এ সপ্তসতী ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।"

৬। মন্মথ বাবু বর্ত্তমান কালের মনুসংহিতা (যাহা প্রকৃত পক্ষে ভৃগুসংহিতা) হইতে "ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়াং অম্বষ্ঠঃনাম জায়তে" এই শ্লোক অধ্যাহার করিয়াও বৈদ্যগণকে কেন সঙ্কর পদবাচ্য করিয়াছেন, তাহা কোন শাস্ত্রাধ্যায়ীর বুদ্ধির অনবগম্য। তিনি যদি কেবল মাত্র মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও "চন্দ্রপ্রভা"র নিম্নলিখিত শ্লোক কয়টী পড়িতেন, তাহা হইলে বৈদ্যদিগকে একতর ব্রাহ্মণ না বলিয়া থাকিতে পারিতেন না।

(১) মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো
যেন জাতঃ স এবসঃ
(মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণ)

(২) ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাং জাতো,
ব্রাহ্মণস্যাৎ ন সংশয়
ক্ষত্রিয়ায়াস্তাতথৈব স্যাৎ
বৈশ্যায়াছপি চৈবহি।
৪৮—৪৭ অধ্যায়, অনুশাসন পর্ব্ব।

(৩) তিস্রোভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য
দ্বে ভার্য্যা ক্ষত্রিয়স্য তু
বৈশ্য স্বজাত্যাং বিন্দেত
তাস্বপত্যং সমং ভবেৎ।
(১১—৪৪ অধ্যায় অনু)

(৪) ত্রিষু বর্ণেষু জাতোহি ব্রাহ্মণাৎ
ব্রাহ্মণো ভবেৎ (মনু)

(৫) অধীরীয়ন্ ত্রয়ো বর্ণাঃ
স্বকর্ম্মাস্থ দ্বিজাতয়ঃ
প্রব্রুয়াৎ ব্রাহ্মণস্তেষাং
নেতরো ইতি নিশ্চয়ঃ
(মনু ১—১০ অ)

(৬) যস্য যস্য মুনের্যোয়ং
সন্তান স এবহি—
তৎ গোত্রাদিনা বৈদ্য
শ্রেষ্ঠ্যাদ্যস্থ স্বকর্ম্মণা (চন্দ্রপ্রভা)

(৭) তখন সংস্কৃত কলেজে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য জাতীয় সন্তানগণ অধ্যয়ন করিত। শূদ্র বালকের পক্ষে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন নিষেধ ছিল।

(৮) "আয়ুর্ব্বেদ দদ্যুস্তস্মৈ বৈদ্যনাম চ পুষ্কল" (বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণ)

[৺বিদ্যাসার মহাশয়ের জীবনী ৯০ পৃঃ পণ্ডিত শম্ভুনাথ বিদ্যারত্ন কৃত]

পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ বচনাবলি দ্বারা সকল শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ বলিতে বাধ্য হইবেন যে, বাঙ্গালার বৈদ্যেরা একতর ব্রাহ্মণ। আমার বিশ্বাস, কালিদাস বৈদ্যই ছিলেন। সঙ্কর বর্ণের উৎপত্তি বিষয়ে মহামান্য গীতায় "স্ত্রীষু দুষ্টাষু বাষ্ণেয় জায়তে বর্ণ সঙ্কর" মনুসংহিতাও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন

"ব্যভিচারেণ বর্ণানাং অবৈদ্যাবেদনেনচ
স্বকর্ম্মনাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করা॥"
(২৪—১০ অঃ)

কাজে কাজেই উঢ়ায়াঃ বৈশ্য কন্যায়াং জাত কালিদাসের সন্তানগণই যদি বৈদ্য হন, তাহাদিগকে সঙ্কর নামে অভিহিত করিয়া ভট্টাচার্য্য উপাধিধারী মন্মথবাবু বড়ই শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথাই বলিয়াছেন। আর তিনি

কোন শাস্ত্রাদি না পাঠ করিয়াও যদি বাঙ্গালার বৈদ্যদিগের তত্রস্থ মুখ্য ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় বেদাদি শাস্ত্রে পঠন ও পাঠনাধিকার আছে দেখিতেন, কত শত মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী শিরোমণি প্রভৃতি উপাধিধারী আবহমান কাল হইতে রহিয়াছেন, একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আর বৈদ্য ভ্রাতাগণের প্রতি অযথা কটুক্তি প্রয়োগ করিতে হইত না। তাঁহার এ কটুক্তি যে শুধু বৈদ্য জাতির প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে, আমি তাহা মনে করি না। তাঁহার এ উক্তি সমুদায় ব্রাহ্ম ও আর্য্য সমাজের প্রতিও প্রযুক্ত করা হইয়াছে। অসবর্ণ বিবাহ ত এই দুই সমাজেও প্রচলিত ও তাহা মন্বাদি শাস্ত্রানুমোদিত, তবে কি তিনি সমুদায় ব্রাহ্ম ও আর্য্যসমাজভুক্ত সন্তান সন্ততিগণকে সঙ্কর বলিতে চান? যাহা হউক, আমি মহামহোপাধ্যায় ব্যোপদেব গোস্বামীর বাঙ্গালীত্ব ও বৈদ্যত্ব প্রমাণ বিষয়ক যে প্রবন্ধ সাহিত্য পরিষৎ (মিরাট শাখায়) সভায় পাঠ করি ও যে প্রবন্ধের সারাংশ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার গত আষাঢ় সংখ্যায় উদ্ধৃত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে 'অর্চ্চনা' পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় ঐকমত্য প্রকাশ করিয়াছেন। মহাত্মা ব্যোপদেব গোস্বামী যখন বৈদ্য হইয়া দ্বিজ বিপ্র এই সমুদায় বিশেষণে বিশেষিত হইতে পারিয়াছেন, তখন তাঁহার দায়দগণ ও স্বজাতিরা কেন একতর ব্রাহ্মণ হইবেন না?

দ্বিতীয়তঃ ভট্টাচার্য্য মহাশয় গুপ্ত উপাধিধারী সকল বৈদ্যকে ধন্বন্তরি গোত্রীয় বলিয়া আর এক প্রমাদে পড়িয়াছেন। তিনি বোধ হয় কোন পুস্তকাদি না পড়িয়াই কোন ইংরাজি বিদ্যাবিশারদ অর্ব্বাচীন বৈদ্যের কাছে এ সংবাদ লইয়াছেন। কেবলমাত্র সেন গুপ্ত উপাধিধারী বৈদ্যগণেরাই অধিকাংশ ধন্বন্তরি গোত্রীয়, গুপ্ত উপাধিধারীদের অধিকাংশ কাশ্যপ গোত্রীয়। বাঙ্গালার বৈদ্যদের বিভিন্ন গোত্র ও প্রবর আছে। একমাত্র উৎকলকারিকা পাঠে মন্মথ বাবু তাহা জানিতে পারিতেন।

করশর্ম্মা ভরদ্বাজ ধরশর্ম্মাপরাশর
মৌদগোল্য দাশশর্ম্মা গুপ্তশর্ম্মা চ কাশ্যপঃ
ধন্বন্তরি সেনশর্ম্মা, দত্তশর্ম্মা পরাশরঃ
শাণ্ডিল্য চন্দ্র শর্ম্মা চ অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণাহ্বয়ে।

পূর্ব্বে বাঙ্গালার বৈদ্যরা শর্ম্মান্ত উপাধিতে ভূষিত ছিলেন, কালের মাহাত্ম্যে ও সমাজের অত্যাচারে বোধ হয় তাঁহাদের শর্ম্মোপাধি লোপ পাইয়াছে। কাজেই আজকাল তাঁহারা নষ্ট কুষ্টি উদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া অনেকে শর্ম্মোপাধি ব্যবহার করিতেছেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "অনেকে কালিদাসকে সুন্দরী বৈশ্য রাজকন্যা (বিদ্যাকে) বিবাহ করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু তিনি সমাজ বা তপস্যোত্তাপকারী কার্য্য করিতে বিরত হন নাই" এই উক্তির অর্থ বুঝিতে পারি নাই। যখন ব্রাহ্মণের পূর্ব্বতন কালে অসবর্ণ বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত ছিল, তখন কিরূপে সমাজ বা তপস্যোত্তাপকারী কথা লিখিয়াছেন, তাহা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিলেই ভাল হইত।

মন্মথ বাবু যে বাঙ্গালার বৈদ্যজাতিকে এক স্থলে ব্রাহ্মণ জাতির পতিত শাখা মনে করিয়াছেন, তাহা আমার মতে আংশিক সত্য বলিয়া বোধ হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রকোপ ভারতের সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালার বেশী অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল, তদানীন্তন বাঙ্গালার ব্রাহ্মণেরা অনেকেই শূদ্রাচারী ও বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাই অম্বষ্ঠ কুলতিলক মহারাজাধিরাজকে (শ্রীমৎ লক্ষ্মী-

নারায়ণ সেন) কান্যকুব্জ হইতে অনন্ত বেদপারগ সাগ্নিক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়া পুনরায় বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উত্থান করিতে হইয়াছিল (আমার মিরাট সাহিত্য পরিষৎ সভায় পঠিত ও ভারতবর্ষের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিতোন্মুখ "দেবভাষার উৎপত্তি চাতুর্বর্ণের উৎপত্তির সহিত ইহার সম্বন্ধ" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) যে সকল বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ (সপ্তসতি শাখার ব্রাহ্মণগণও হইতে পারে) কিম্বা গুর্জ্জর দেশ হইতে আগত অম্বষ্ঠগণ বা যাহারা বৈশ্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল, কিম্বা আচারভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তাহারাই ব্রাহ্মণ সমাজে (কান্যকুব্জাগত) অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্থান অধিকার করিয়া বৈদ্য নামে অভিহিত হইয়া গিয়াছে। মাতৃত্ব নিবন্ধন হউক বা বৈশ্যভাব-সম্ভূত হউক, অশৌচাদি সম্বন্ধে বাঙ্গালার বৈদ্যেরা কোথায় বৈশ্যবৎ কোথায় বা শূদ্রবৎ। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে অনুমান করিয়াছেন, বাঙ্গালার বৈদ্যগণ গুজ্জর দেশ হইতে আগত তাহা বৈদ্যকুল তত্ত্বের নিম্ন লিখিত শ্লোকের দ্বারা প্রমাণিত—

আর্য্যাবর্ত্তাৎ সমাগম্য
বঙ্গদেশে মহাবলাঃ
অম্বষ্ঠাঃন্বসবন্ রাজন্
আধিপত্যং ব্যতন্বতঃ (৫ পৃষ্ঠা)

মহাকবি কালিদাসের কাশ্মীর রাজ্য প্রাপ্তি রাজতরঙ্গিণীর এই বৃত্তান্ত আর এক মহান তথ্যের আলোক বিতরণ করিতেছে যে, কালিদাস নিশ্চয়ই মিশ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, কারণ পুরাণেতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি, ভারতের মুখ্য ব্রাহ্মণ কদাচিৎ রাজসিংহাসনে আরূঢ় হইয়া রাজ্য শাসন করিয়াছেন। বৈদ্য নামধেয় অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা সে দিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য আজ কাল যে ২।৪ জন ব্রাহ্মণ-জমিদার বা উপাধিপ্রাপ্ত রাজা, মহারাজা আছেন, তাঁহাদের জমিদারী বা কার্য্যপ্রাপ্তির ইতিহাস ভারতে বা বঙ্গদেশে মুসলমান আগমনের পর।

আমার মত অনেকে কবি কালিদাসকে বাঙ্গালার বৈদ্যজাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করায় পৃথিবীর ইতিহাস-লেখক উক্ত ইতিহাসের ৪র্থ খণ্ডে ২৯৫।২৯৬ পৃষ্ঠায় তাহার প্রতিবাদ রূপ নেপাল হইতে প্রাপ্ত পুঁথিতে লিখিত "ইতি মিশ্র কালিদাসকৃতে রঘুবংশে মহাকাব্যে একোনবিংশ সর্গ সমাপ্ত" এই শ্লোক অধ্যাহার করিয়া বলিয়াছেন যে, কবিরাজচূড়ামণি কালিদাস বারেন্দ্র সমাজভুক্ত মিশ্রব্রাহ্মণ ছিলেন। লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতিবাদের প্রধান উদ্দেশ্য, কালিদাসকে বৈদ্য জাতি শ্রেণীভুক্ত না করা। যিনি পৃথিবীর ইতিহাস লিখিতে বসিয়াছেন, তিনি যে তাহার পড়সী পড়োশীর বা হেন্‌সেলের খবর রাখেন নাই, তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। এতদিন আমার অদৃষ্টে তাঁহার প্রকাশিত পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই, তাই ইহাতে কি সাপ ব্যাং আছে জানিতে পারি নাই। লাহিড়ী মহাশয় যদি পৃথিবীর ইতিহাস লিখিবার পূর্ব্বে একবার "চন্দ্রপ্রভা" বা চতুর্ভুজাব্য বৈদ্যকুলপঞ্জিকাখানা পড়িয়া দেখিতেন, তাহা হইলে এরূপ ভ্রমে পড়িতেন না। বাঙ্গালার বৈদ্যেরা যে মিশ্র ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেউ কেটা নন, তাহা উক্ত গ্রন্থদ্বয় পাঠে তাঁহার অনায়াসে বোধগম্য হইত। চতুর্ভুজের বৈদ্য কুলপঞ্জিকা ৫০০।৬০০ বৎসরের গ্রন্থ, চন্দ্রপ্রভাও ২০০।৩০০ বৎসরের গ্রন্থ। উহাতে যে গ্রন্থকর্ত্তারা মিথ্যা কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমার মনে হয় না, বা কোন সুধী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মনে করিতে পারিবেন না। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে—

রামুসেনেন জগৃহে
নিজ দুর্দ্দৈব দোষতঃ
শ্যাম দাসস্য মিশ্রস্য
কন্যাকা কটকাস্থিত (১৯১ পৃঃ)

রাঢ়ের নিরোল গ্রামেও মিশ্রোপাধির বৈদ্য ছিলেন যথা—

নারায়ণায় সেনায়
পূর্ব্বাখানা সমুদ্ভবে
নিরোলে গ্রাম সেনায়
মিশ্রায় চ কনীয়সী।

ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, কটকের মিশ্রোপাধি ব্রাহ্মণে কন্যাদান করিতেও বৈদ্যেরা অপমানিত বোধ করিতেন। আমার তাই মনে হয়, মিশ্রোপাধি বৈদ্যেরা বৈদ্যসমাজে নীচ স্থান অধিকার করিতেন। আমি মন্মথ বাবুর প্রবন্ধের প্রতিবাদ বা লাহিড়ী মহাশয়ের ভুল ধারণার অপনোদনছলে যে সমুদায় শাস্ত্রীয় বচনাবলি অধ্যাহৃতি করিলাম, উহার গভীরতা উপলব্ধি করিয়া কবিকুলকেতু কালিদাসের "কালিদাস" এই নামটী, মিশ্র এই উপাধিটী "কবিরাজ" এই বিশেষণটী পুঙ্খানুরূপ আলোচনা করিয়া বর্তমান পণ্ডিতমণ্ডলী বা প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বিবেচনা করিবেন যে, মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালি বৈদ্য ছিলেন কি না। এতদ্সঙ্গে কবির সংস্কৃত রচনাকুশলতার আভ্যন্তরীণ ভাগ ও বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত তুলনায় কিরূপ সম্বন্ধে সমন্বিত, তাহাও তাঁহাদের বিবেচনার বিষয়।

উপসংহারে আমার বক্তব্য যে, আমি সত্যার্থ প্রকাশের খাতিরে এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মুখীন করিলাম, প্রতিবাদ করা আমার প্রধান উদ্দেশ্য নহে ও আমার স্বভাব নহে। আমি আজ প্রায় ৭।৮ বৎসর কাল এ সুদূর উত্তর পশ্চিম প্রদেশে কার্য্যোপলক্ষে বাস করিয়া এই প্রদেশস্থ, মথুরা দিল্লী লাহোর, এমন কি, কাশ্মীর দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গের সংশ্রবে আসিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, এতদ্দেশে যে সমুদায় ব্রাহ্মণেরা বৈদ্য বৃত্তিক, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই হয় অম্বষ্ঠ, সারস্বত, না হয় শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ। পশ্চিমে বৈদ্য বলিয়া কোন জাতি নাই, ভারতের আর কোথায় আছে কি না, বলিতে পারি না। মথুরার চোবে, দোবে, গয়ার গয়ালি ব্রাহ্মণেরা বলে উহাদের অনেক জ্ঞাতি পুরবীয় (অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশে বাস করিতেছে) তাহাদের মধ্যে অনেকেই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র ব্যবসায়ী। যদি আমার বঙ্গদেশীয় ভ্রাতৃগণ নিজ নিজ গণ্ডীর বাহির হইয়া একটু প্রশস্ত মনে বাঙ্গালার বৈদ্যদিগকে এই মিশ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আর বৃথা বাকবিতণ্ডায় বা জাতিবিদ্বেষের বহ্নিতে জ্বলসাইতে হয় না। এই সুদূর ভারতপ্রান্ত হইতে আমার বঙ্গীয় সমাজের ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থাদি ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট ইহাই সানুনয় প্রার্থনা, যেন তাঁহারা আত্মধ্বংসকারী রূপ বিবাদ হইতে ক্ষান্ত হইয়া যাহাতে জননী বঙ্গভূমির প্রকৃত কল্যাণ সাধনে সমর্থ হয়েন, সে বিষয়ে যত্নবান হন। গৃহ বিবাদে যে ভারত অধঃপাতে গিয়াছে, এ শিক্ষা পাইয়াও ভ্রমবশতঃ আর যেন সে পথের আর পথিক না হন।

শ্রীরাজকিশোর রায়।

লড়াইয়ের মুখে।

অচিন্ত্যপূর্ব্ব ঘটনাচক্রে অকস্মাৎ একশত টাকা বেতনের কর্ম্মটুকু হারাইয়া অকূল সাগরে পড়া গেল। শীঘ্রই উপার্জ্জনের অন্যবিধ উপায় সংগ্রহ করিতে না পারিলে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করা দুরূহ হইয়া পড়িবে—এই দারুণ দুশ্চিন্তায় আপিস হইতে আপিসান্তরের দ্বারে দ্বারে চাকরির উমেদারিতে ঘুরিতে ঘুরিতে Railway Recruiting Officerএর দপ্তরে উপনীত হইলাম। সেখানে সহজেই মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। অবিলম্বে যথারীতি চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হইয়া East African Railwayর Dy. Directorএর অধীনে হিসাব-নিকাশী কার্য্যের নিয়োগপত্র লাভ করিলাম ও শীঘ্রই কার্য্যক্ষেত্রের উদ্দেশে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে আদিষ্ট হইলাম। প্রলোভন নিতান্ত সামান্য নহে—পরিত্যক্ত পদের দ্বিগুণ বেতন, যাতায়াতের দ্বিতীয় শ্রেণীর পাথেয়, পথে ও কার্য্যক্ষেত্রে বিনাব্যয়ে উদরপোষণ, পরন্তু এইরূপে বৎসরেক কাল অতিবাহিত করিয়া সুখ্যাতির সহিত ফিরিতে পারিলে পদোপযোগী রাজসম্মান ও গুণো-পযোগী অন্য পদ লাভের আশা,—চাকরির চেষ্টায় চিন্তাকুল আমার বর্ত্তমান বুভুক্ষিত অবস্থায় এ প্রলোভন ত্যাগ করা সহজ হইল না। এদিকে, সামুদ্রিক সমীরণ সম্ভোগে শরীর সবল হইবে বলিয়া, মেজদাদা মহাশয় পরম উৎসাহ প্রকাশ করিলেন; অপর আত্মীয় বন্ধুগণের মধ্যে কেহ সুবাতাস কেহ বা কুবা-তাস দিলেন; গৃহিণীই কেবল পূর্ণ মাত্রায় অন্তরায় হইয়া উঠিলেন। এইরূপ উৎসাহ ও নিরুৎসাহের ঘাত-প্রতিঘাতে মনকে দৃঢ় করিয়া গন্তব্য পথে যাত্রাকল্পে স্থিরসঙ্কল্প হইলাম।

১৮ই বৈশাখ, সোমবার, ঘোর অমা-নিশায়, Mackinnon Mackenzci & Coর Okara জাহাজে, খিদিরপুর ডক্-সংলগ্ন ১৪ নং Shedএর সম্মুখভাগ হইতে যাত্রা স্থির হইল। অপরাহ্নে, মাহেন্দ্রক্ষণের সুযোগ পাইয়া, পুত্র-কন্যা-কলত্রের কাতরতার মধ্যে কোনরূপে বিদায় গ্রহণ করিয়া, সর্ব্বমঙ্গলার নাম স্মরণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম ও জাহাজ ছাড়িবার অনেক পূর্ব্বেই যথাস্থানে উপনীত হইয়া নিরূপিত cabinএর এক কোণে আশ্রয় লইলাম। জাহাজখানি কিছু জীর্ণ,—পূর্ব্বে ইহাতে উক্ত কোম্পানির কয়লা রপ্তানি হইত, এখন অবশ্য-প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত হইয়া উহা সরকারি কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে। উহার এক নবরচিত ক্যাম্বিশাচ্ছা-দিত cabin মধ্যে আমাদিগের চারিজনের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমার সহযাত্রি-গণের মধ্যে অতিসতর্ক দুই ব্যক্তি আমার আগমনের পূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়া উহার নিম্ন দুই আসন দখল করিয়াছিলেন, আমাকে অগত্যা উহার উপরিভাগস্থ এক আসনে (upper bunkএ) স্থান লইতে হইল। Cabinএর প্রবেশদ্বার ভিন্ন উহাতে বায়ু-গমনাগমনের গবাক্ষমাত্র ছিল না,—এ অব-স্থায় নিদাঘ-সন্ধ্যায় সেই bunkএ বাস করা মুক্তবায়ুসেবী মানুষের পক্ষে একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। ভাবিলাম, প্রবাসের প্রথম পরি-চ্ছেদেই এই দারুণ পরীক্ষাস্থল উপস্থিত, না জানি, শেষ পর্য্যন্ত উহা হইতে কিরূপে উত্তীর্ণ

হইব। যাহা হউক, সঙ্গে এক stretcher লইয়াছিলাম—ডেকের উপর তাহাই বিছাইয়া সে রাত্রির মত শয্যারচনা পূর্ব্বক বিশ্রামের নিমিত্ত কিয়ৎকাল তাহাতে 'চৌদ্দ পোয়া' হইলাম। সন্ধ্যার পরে, ৮টার মধ্যেই, খাদ্যাংশের জন্য ডাক পড়িল ; যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, সহযাত্রী বন্ধুগণের মধ্যে কেহ বা ইতিমধ্যেই দুই চারি গ্রাস মুখে তুলিয়াছেন, এমন সময়ে কোন আত্মীয় আসিয়া সন্নিকটস্থ তাঁহার বাসায় সে রাত্রিতে জলযোগের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। আত্মীয়ের অনুরোধ রক্ষার জন্যও বটে, আর স্বদেশী খাদ্যের শেষ রসাস্বাদের লোভ অসম্বরণীয় বলিয়াও বটে, সেই উপস্থিত অন্ন ত্যাগ করিয়া আত্মীয়ের অনুসরণ করিলাম। সেখানকার আদর-আপ্যায়নে পরিতুষ্ট, পরন্তু বিদাযাশ্রু-বিনিময়ে পরিম্লান হইয়া প্রত্যাগমনের পরেও দেখি, জাহাজ তখনও যাইবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই। আমাদিগের ন্যায় জন কয়েক কর্ম্মচারী ও এক পল্টন দেশীয় সৈনিক ও তাহাদিগেরই সর্দ্দার সুবেদার প্রভৃতি Officer ভিন্ন জাহাজে অন্য যাত্রী ছিল না। কিন্তু রেলপথ রচনোপযোগী সরঞ্জামে উহা আকণ্ঠ পূর্ণ হইয়াছিল, আর ঐ সরঞ্জাম উঠাইতেই বিলম্ব ঘটিতেছিল। এই ব্যাপারের পরিসমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া আমি অচিরে পদ্মনাভের শরণ লইলাম এবং নিদ্রা মায়াবিনীর কুহকগ্রস্ত হইয়া সেই নিদাঘ নিশীথের কোন্ মুহূর্ত্তে জাহাজ আমাদিগকে লইয়া সেই অজানা দেশের উদ্দেশে যাত্রা করিল, তাহা জানিতে পারিলাম না।

১০ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, প্রাতে আমরা মোম্বাসা বন্দরে উপনীত হইলাম। খিদিরপুর ত্যাগের পর পূর্ণ ২৫ দিন জলপথে কাটিয়া গেল। কলিকাতা হইতে মোম্বাসা আসিতে সচরাচর ১৬।১৭ দিন লাগে ; আমাদিগের জাহাজখানির বড়ই মন্থর গতি—উহা ঘণ্টায় ৮ মাইলের অধিক চলিতে পারিত না, পরন্তু সমুদ্রে তরঙ্গাধিক্য ঘটিলে উহার অর্দ্ধেক চলাও দুষ্কর হইত—এজন্য এত দীর্ঘকাল লাগিল ; অনভ্যস্ত সমুদ্রপথে যাত্রার পূর্ব্বে মনে বড়ই আশঙ্কা জন্মিয়াছিল, কিন্তু বিপদবারিণীর কৃপায় পথে বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই ;—দীর্ঘ ২৫ দিনের মধ্যে চারিদিন মাত্র তরঙ্গচাঞ্চল্যে জাহাজখানিকে কিছু অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল, আর একদিন প্রবল বৃষ্টির বেগ সহ্য করিতে হইয়াছিল, অবশিষ্ট ২০ দিন কোন বিঘ্ন ঘটে নাই। সমুদ্র-পীড়ার একটা দারুণ আতঙ্ক ছিল,—তাহাও সহ্য করিতে হয় নাই ; প্রবল তরঙ্গে দোদুল্যমান অবস্থায় এক দিন একটু বমনের ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু কলিকাতা হইতে সঞ্চিত কমলা ও জারক লেবুর কৃপায় সে ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় নাই। জাহাজে আহারের বেশ সুবন্দোবস্ত ছিল। কর্ত্তৃপক্ষের কড়া হুকুমে বাটলারবর্গ হিন্দুর রুচিমত খাদ্য পৃথক পাক করিয়া দিত,—খাঁটি হিন্দুয়ানি রক্ষার জন্য স্বপাকেরও সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। পূর্ব্বোক্ত পাঁচ দিন ব্যতিরেকে জাহাজের cabinএ বাস করি নাই ; গ্রীষ্মাতিশয্যে cabinএর মধ্যে বাস করার কষ্ট অনুভব করিয়া কাপ্তেন সাহেব কৃপা পূর্ব্বক upper deckএ tarpaulin বেষ্টনে সুবৃহৎ একটী কামরা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে আমরা ৮।৯ জন বাঙ্গালী পড়া-শুনা, গল্প-গুজব, তাস-পাশা, প্রভৃতিতে দিন কাটাইতাম ও স্বকীয় শয্যায় শয়ন করিয়া স্বচ্ছন্দে রাত্রিযাপন করিতাম। ফলতঃ জাহাজে সকল প্রকারেই যেরূপ সুখে

ছিলাম, তাহার তুলনায় বর্ত্তমান অবস্থা স্বর্গ মর্ত্ত্য পৃথক্।

মোম্বাসা হইতে, উগণ্ডা (Uganda) রেলপথে, ১০২ মাইল দূরবর্ত্তী 'ভয়' (Voi) নামক ষ্টেশনে আমরা ট্রেণযোগে নীত হইলাম। অদূরে, মোম্বাসার দক্ষিণে, ভারত মহাসাগরের উপকূলস্থিত অন্যতম বন্দর 'টাঙ্গা' (Tanga) হইতে 'মোস্‌চি' (Moschi) পর্য্যন্ত জার্ম্মান রেলপথ এখন ইংরেজের অধিকৃত। উল্লিখিত 'ভয়' ষ্টেশন হইতে শেষোক্ত জার্ম্মাণ রেলপথের মধ্যবর্ত্তী 'কাহে' (Kahe) ষ্টেশন পর্য্যন্ত ১০৯ মাইল দীর্ঘ নূতন রেলপথ রচনা উপলক্ষেই আমাদিগের এদেশে সমাগম। যুদ্ধের প্রারম্ভে, ১৯১৪ খ্রীঃ, ইংরেজরা প্রথমে 'ভয়' হইতে 'মাটকাণ' (Matkan) নামক স্থান পর্য্যন্ত ৫৫ মাইল রেলপথ রচনা আরম্ভ করেন; পরে 'মাটকাণ' হইতে আর ৫৪ মাইল অগ্রসর হইয়া এখন উহা জার্ম্মাণ রেলপথের 'কাহে' ষ্টেশনে মিশিয়াছে। ব্রিটিশহস্তের ক্ষিপ্রকারিতাগুণে এই শেষোক্ত পথটীর রচনা দুই মাস কাল মধ্যেই শেষ হইয়াছে। 'ভয়' হইতে ৭৬ মাইল, অতএব মোম্বাসা হইতে ১৭৮ ও 'কাহে' হইতে ৩৩ মাইল, দূরবর্ত্তী 'টাভেটা' (Taveta) নামক স্থানে আমাদিগের বর্ত্তমান কর্ম্মক্ষেত্র। এই টাভেটাই এখন জার্ম্মাণাধিকৃত প্রদেশে প্রবেশ কল্পে ব্রিটিশপক্ষের প্রধান সামরিক আয়োজনস্থল (military base); অচিরেই ইহা পূর্ব্বোক্ত টাঙ্গা নামক বন্দরে স্থানান্তরিত হইবার সম্ভাবনা।

টাভেটা স্থানটীর নৈসর্গিক দৃশ্য মনোরম —আমাদিগের দেশের শিমুলতলা বা ঝাঝা ষ্টেশনের মত। চতুর্দ্দিকে নাতি-উচ্চ পর্ব্বতমালা, মধ্যে প্রায় দেড়শত বর্গ মাইল-ব্যাপী দীর্ঘতৃণাচ্ছাদিত অসমান (undulating) প্রান্তর (prairies)—তাহাও সমুদ্রতলের সার্দ্ধ তিন সহস্র ফীট উর্দ্ধে অবস্থিত, অদূরে অধিকতর নিম্নভূমিতে শৈলনিঃসৃতা ক্ষীণসলিলা স্রোতস্বিনী রজতসূত্রের ন্যায় প্রবাহিতা। কিন্তু,দুঃখের বিষয়,এখানকার জলবায়ু, নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া, তেমন স্বাস্থ্যকর নহে;—এই প্রখর রৌদ্র ভোগ করিতেছেন, পরক্ষণেই সহসা মেঘ উঠিল, শীতল বাতাস বহিতে লাগিল, সর্ব্বশরীর কণ্টকিত করিয়া তুলিল; এজন্য একটু অসাবধান থাকিলেই এখানে pneumonia হইবার আশঙ্কা। টাভেটার পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলময় স্থান সমূহ আরও কদর্য্য। সেখানে, আসামের কালাজ্বরের মত, জঙ্গলী জ্বর যাহাকে ধরে, তাহার যমালয় যাত্রা অবশ্যম্ভাবী। এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরের প্রান্তে হরিণ, মহিষ, জেব্রা, বাইসন প্রভৃতি বহু বনজন্তু বিচরণ করে,—বনাকীর্ণ স্থানে ভীষণ সিংহ, শার্দ্দূল, গণ্ডার প্রভৃতি হিংস্র পশুও বিরল নহে, পরন্তু পাহাড়ের পাদদেশস্থ জলাশয় সকলে বিস্তর জলহস্তী বিরাজমান। উল্লিখিত নিম্নভূমি অপেক্ষাকৃত আর্দ্র; উহাতে ইক্ষু, ভুট্টা, কাফি, কদলী, রাবার, রাঙ্গা আলু ও আনারস গাছের মত তন্তু বৃক্ষের (fibre plantএর) চাষ হয়। ইহার মধ্যে কলার ভাগই অধিক;—৫০।৬০ বিঘাব্যাপী বাগানে সারি সারি কেবল কলাগাছ—কলাও সুন্দর,—দেখিতে কাঁচকলার মত লম্বা ও সবুজ, অথচ শিরাশূন্য সুগোল, ভিতরে মাখনের মত নরম শাঁস, আর খাইতে চাঁপার মত সুমিষ্ট ও সুগন্ধি। এক একটী কলার মূল্য এক সেণ্ট।*

* একশত সেণ্টে আমাদের দেশের এক টাকা হয়। এখানে আমাদের দেশের সিকি, আধুলি, টাকা ও নোট চলে,—কেবল আনি, দু'আনি ও পয়সা চলে না।

সাহেবেরাই এ দেশের লোককে এই সকল কৃষিকার্য্যে শিক্ষিত করিয়াছেন। এ দেশের লোকসংখ্যা অতি অল্প,—প্রতি বর্গ-মাইলে দুইটা লোক বাস করে কি না সন্দেহ। রেলপথের উভয় পার্শ্বে কোথাও পল্লী দৃষ্টি-গোচর হয় না; কচিৎ কোন কলাবাগানের বা ভুট্টাক্ষেতের প্রান্তভাগে দুই একটী কদর্য্য কুঁড়ে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেই দশ-পাঁচ জন বাস করে। ইহারা ভুট্টা, কলা, রাঙ্গা আলু ও মৃগয়ালব্ধ মৃগমাংস অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। জার্ম্মাণাধিকৃত যে সমস্ত স্থান ক্রমশঃ ইংলণ্ডেশ্বরের করতলগত হইতেছে, তাহার আদিম অধিবাসিগণ, আমাদিগের military রেল পথের পার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসিগণ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সভ্য হইয়াছে; তাহারা বস্ত্র বা মৃগয়ালব্ধ জন্তুর ছাল পরিধান করে,—ইহাদিগের একেবারে দিগম্বর মূর্ত্তি।* তাহারা কৃষিকার্য্যেও ইহাদিগের অপেক্ষা পটু। আমরা যতদূর দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি, তাহাদিগের অঞ্চলের মৃত্তিকার বর্ণ অনেকটা বাঙ্গালা দেশের মত,—উর্ব্বরতাও অল্প বোধ হয় না,—সুতরাং ক্ষেত্রগুলি বেশ শস্যশ্যামল,—তাহাতে স্থান বিশেষে ধান্য পর্য্যন্ত জন্মিতে দেখা যায়। আমাদিগের অঞ্চলের মাটি যেন ২নং সুরকি,—ইহাতে ধান বা গম, বোধ হয়, জন্মে না, নচেৎ—

এতই জমি র'য়েছে পতিত,
আবাদ ক'র্‌লে ফ'ল্‌ত সোনা!

জার্ম্মাণ আফ্রিকাতে বোম্বাই ও পঞ্জাবের অনেক লোক ব্যবসায় উপলক্ষে আসিয়া উপার্জ্জনের আকর্ষণে স্থায়িভাবে বসতি স্থাপন করিয়াছেন। এই সমস্ত স্থান ব্রিটিশ রাজ্য-ভুক্ত হওয়ার পর শান্তি স্থাপিত হইলে, গুজরাট, কচ্ প্রভৃতি স্থানের বণিকেরা দলে দলে আসিয়া ঐরূপ বাস করিবেন, এরূপ আশা করা যায়।

বলা বাহুল্য, এখানে আমাদিগের বার মাস তাঁবুতে বাস। তাহাও তেমন প্রশস্ত নহে—কোন মতে মাথা গুঁজিয়া থাকা চলে। আহার্য্য সামগ্রী সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবস্থা মন্দ নহে,—চাউল, দাইল, আটা, ঘৃত, লবণ, চা, চিনি, আলু, পেঁয়াজ, লঙ্কা, হরিদ্রা, শুঁঠ ও গুড় এবং অর্দ্ধপোয়া মেষ মাংস প্রতিদিন প্রত্যেকের প্রাপ্য। ভারতবাসী মাত্রেরই জন্য একই প্রকার ও একই পরিমাণের সামগ্রী ধার্য্য—ইতর-ভদ্রে কোন পার্থক্য নাই; ফলতঃ এ সম্বন্ধে একজন ঝাড়ুদার কুলী ও একজন সম্ভ্রান্ত বাবু এক শ্রেণিভুক্ত। বাবুর হারে আটা চাউল পাইয়া কুলি হয়ত উদর পূরিয়া খাইতে পায় না; আবার কুলির হারে ঘৃত চিনি পাইয়া বাবুর খাদ্যে বিতৃষ্ণা জন্মে;—ব্যবস্থার ইহাই বিষম ত্রুটি। যাহা হউক, ঐ সামগ্রীগুলিও যথারীতি নিয়মিত ভাবে পাইলে একরূপ সুখে আহার চলিয়া যাইত। কিন্তু সামগ্রী-সরবরাহকারী ঠিকাদার প্রভুগণের সৌজন্যে তাহাও সকল সময়ে সম্ভব হয় না। চাউল—আতপ, তাহাতে আমরা অনভ্যস্ত; তবে সে কথা ধরি না। আটা, বোধ হয়, আট মাসের পুরাতন, সুতরাং তিক্ত;—আলু অর্দ্ধেকের অধিক পচা;—পেঁয়াজের মাঝে মাঝে দেখা পাই, প্রতিদিন কভু পাই না। চিনি ত আসিয়া অবধি চক্ষে দেখি নাই; আর ঘৃত

* ইহাদিগের মধ্যে যাহারা Military campএ বা railwayতে মজুরি করিতে আসে, সরকার বাহাদুর তাহাদিগকে কাপড় বা চট কোমরে জড়াইতে দেন, নচেৎ উলঙ্গ থাকিতে দেন না।

এক অপূর্ব্ব পদার্থ! দেখিতে দিব্য সুন্দর, ঘ্রাণেও কাঁচা অবস্থায় মন্দ নহে, কিন্তু অগ্নির উত্তাপে অর্দ্ধেকের অধিক বাষ্পে পরিণত হয়, বক্রী অংশ একেবারে সুগন্ধবর্জ্জিত। আহারের এইরূপ অবস্থায় প্রথমে বড়ই কষ্ট হইত, অম্লশূল রোগ জন্মিবার উপক্রম হইয়াছিল—এখন অভ্যাসবশে ক্রমশঃ অনেকটা সহ্য হইতেছে, আর কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় চাউল ও ঘৃত পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পাওয়া যাইতেছে, বিতরণের ভার সম্প্রতি হস্তগত হওয়ায় আলুর মূর্ত্তিও দেখা যাইতেছে, তবে মাংস এখনও মহাপ্রসাদ বিশেষ? অষ্টাহে হয় ত একটী দুম্বা মিলিল, ৭০।৮০ জন লোকের মধ্যে বণ্টন করিতে তাহা অগত্যা 'চটকস্য মাংসং' হইয়া দাঁড়ায়। মৎস্যের মূর্ত্তি দেশে না গেলে দেখিতে পাইব না। যাহা হউক, ভাত বা ডাল-রুটি এই constant quantityতে এখন বড় বিঘ্ন জন্মিতেছে না।

আমাদিগের আহারোপযোগী কোন দ্রব্যই এখানে জন্মে না, সমস্তই ভারতবর্ষ হইতে আমদানি করা হয়। তরকারিও এখানে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, কেবল পূর্ব্বোক্ত রাঙ্গা আলু, আর কদাচিৎ কুমড়া ও কাঁচা পেঁপে দেখা যায়। অসভ্য কাফ্রি, বোধ হয়, পেঁপে পাকাইয়া খাইতে জানে না, নচেৎ উহার যেরূপ আকার দেখা যায়, তাহাতে বড় হইতে দিলে দুই সের পর্য্যন্ত ভারি হইত বোধ হয়, আর পাকিতে পাইলে উপাদেয় খাদ্য হইত, ইহা স্থির নিশ্চয়। আক, কলা, পেঁপে—তিনই বিলক্ষণ বড় আকারের জন্মে; আর সমুদ্রকূলবর্ত্তী স্থানসকলে বার মাস আম্র ফলে; পূর্ব্বোক্ত টাঙ্গা বন্দরে কমলালেবুও পাওয়া যায়। জগদম্বার কৃপায়, কার্য্যক্ষেত্র স্থানান্তরিত হওয়া উপলক্ষে, ঐ স্থানে থাকিতে পাইলে ঐ সমস্ত উপাদেয় ফল খাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারি। টাঙ্গা একটী ক্ষুদ্র সহর, সেখানে বাসের অসুবিধা সুবিধাও হইতে পারে। *

সরকারী সামগ্রীতে সকল অভাব পূর্ণ হয় না বলিয়া সময়ে সময়ে আপন ব্যয়ে অন্য উপকরণ সংগ্রহ করিতে হয়; কিন্তু দুর্ম্মূল্যতা বশতঃ আমাদিগের অবস্থায় তাহা নিতান্তই দুর্লভ। অপরিহার্য্য নিম্নলিখিত কয়েকটী দ্রব্য হইতেই একথার সত্যতা উপলব্ধ হইবে।

Huntley Palmer's 'Family' Biscuit, এক বাক্স	...	২।৹
Bombay made butter, এক পাউণ্ড		১৸৹
Lime juice, এক বোতল	...	১।৹
Bar soap, একখান	...	৸৹
Condensed milk, এক টিন		॥৵৹

সৌভাগ্যক্রমে, সরকারী আপিস সকলের Head Quarters বলিয়া বড় বড় সাহেব কর্ম্মচারী থাকায়, এখানে একখানি Oilman's Storesএর দোকান স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতেই ঐ সমস্ত দ্রব্য পাওয়া যায়, নচেৎ দশায় কি হইত, বিধাতাই জানেন। Goaবাসী এক খ্রীষ্টান সরকার হইতে ঐ দোকান খুলিবার আদেশ পাইয়াছেন; Oilman's Stores ব্যতীত তাঁহার দোকানে থান কাপড়ও পাওয়া যায়। তিনিই "সবে ধন নীলমণি!" সুতরাং সামগ্রী সুলভ হইবার আশা কোথা? তিনি এই সামান্য দোকানে মাসে প্রায় ছয় শত টাকা লাভ করেন। এখন মনে হয়, ভৃতিভুক্ না হইয়া যদি বণিক্ বেশে এদেশে আসা যাইত, তাহা হইলে অর্থাগমের পথ প্রশস্ত হইত।

---

* National Bank of India, Limited, ইতিমধ্যেই না-কি সেখানে তাঁহাদিগের এক Branch খুলিয়াছেন।

চাকর বা পাচক এখানে বড়ই দুষ্প্রাপ্য। আসিয়া দশ দিন কাল জল তোলা, পাক করা, ভোজনপাত্র মার্জ্জনা প্রভৃতি স্বহস্তেই করিতে হইয়াছে। এখন আমরা নয়জন বাঙ্গালী মিলিয়া এক mess করিয়াছি, একজন পঞ্জাবী পাচকব্রাহ্মণ পাওয়া গিয়াছে, আর এক কাফ্রির দ্বারা চাকরের কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে। অতএব এখন আর কোন বিশেষ কষ্ট নাই। পাচক সরকার হইতে ২২৲ টাকা বেতন পায়, অধিকন্তু আমাদিগকে ১৬৲ টাকা দিতে হয়; কাফ্রিটীকে ৬৲ টাকা দিলেই চলে। উভয়েরই আহার স্বতন্ত্র, তবে সরকার হইতে আমাদিগের নয় জনের যে রসদ মিলে, তাহাতে উহাদিগের আহারও চলিয়া যায়।

রজকের একেবারেই অসদ্ভাব। পরিধেয় বস্ত্র—আপিসের পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত—সাবানের সাহায্যে স্বহস্তেই পরিষ্কার করিতে হয়। সাহেবদিগেরও প্রায় সেই অবস্থা, কাফ্রি চাকরের দ্বারা তাঁহারা কোনমতে কাপড় কাচাইয়া লয়েন। মাটির গুণে সাদা কাপড় চলে না, —এক দিনেই ময়লা হইয়া যায়; এজন্য আমরা Ordnance হইতে খাকি রঙ্গের পোষাক পাইয়াছি, কাচিবার কষ্টে ইহাই সপ্তাহকাল পরা যায়। সাহেবদিগেরও সেই পরিচ্ছদ।

এখানে এখন শীতকাল—দিবাভাগে রৌদ্রের প্রখরতা অল্প, রাত্রিকালে লেপ অপরিহার্য্য। নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম; শুনিতে পাই, তখনও রাত্রিকালে শৈত্য অনুভব করা যায়,—আমাদিগের দেশের মত দারুণ গুমট হয় না। মার্চ্চ হইতে মে পর্য্যন্ত বর্ষা; সেই কালের জন্যই আশঙ্কা—তাম্বুর মধ্যে তখন আমাদিগের কি দশা ঘটিবে, জগদম্বাই জানেন।

আপিসে প্রথমতঃ বেশী কাজ ছিল না, এখন বড়ই বাড়িয়াছে। প্রতিদিন প্রায় দশঘণ্টা কাল খাটিতে হয়। খাটি—তাহাতে দুঃখ নাই, যদি পেট পুরিয়া খাইতে পাই। বলা বাহুল্য, আমরা এখানে সকলেই সামরিক বিধির (martial lawএর) অধীন। সেই বিধিবশে, কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেও, প্রয়োজন পড়িলে ও আদেশ পাইলে, কুলির কাজও অম্লানবদনে করিতে হইবে—'বাবু' বলিয়া অভিমান করিলে চলিবে না। জগদম্বার কৃপায় এযাবৎ আমাদিগকে সেরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। সেই বিধিবশে, প্রত্যেক পত্রে লিখিত বিবরণ আনুপূর্ব্বিক আপিসের কর্ত্তা কর্ণেল বা মেজর সাহেবকে সংক্ষেপে শুনাইতে ও তাহার সত্যতা সম্বন্ধে শপথ করিতে হয়। তাহার ফলে বিনা ব্যয়ে পত্র ব্যবহার-চলে, ইহাই পরম সুবিধা। আর সেই বিধিবশে, লড়ায়ের মুখে থাকিয়াও, মুখ ফুটিয়া তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলিবার আমাদিগের অধিকার নাই; অতএব উপস্থিত এইখানেই ইতি।

আফ্রিকা-প্রবাসী।

মাদাম ব্লাভাস্কির জীবন-কথা।

বিদায়।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ব্লাভাস্কি আবার শঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। অলকট তখন ব্রহ্মদেশে প্রচার করিতেছিলেন। সিংহলে ইহাঁদের বিপুল চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্ম ও সমাজের প্রভূত উন্নতি

সাধিত হইয়াছে শুনিয়া ব্রহ্মরাজ থিবো ইহাঁদিগকে আমন্ত্রণ করেন। এই আহ্বানে অলকট ব্রহ্মদেশে গমন পূর্ব্বক নানা স্থানে উত্তেজনাময়ী বক্তৃতা দ্বারা ব্রহ্মবাসীকে স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের সংস্কারার্থ জাগরিত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু তিনি বিশ্বস্তসূত্রে রাজার পাশব চরিত্রের কথা শুনিতে পাইয়া পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও তৎসহ সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। অলকটের সঙ্গে লেডবেটারও (Mr. C. W. Ledbeater) ছিলেন। লেডবেটার সাহেব পূর্ব্বে একজন খ্রীষ্টিয় পাদ্রী ছিলেন। ব্লাভাস্কির সহিত য়ুরোপ হইতে আসিবার পথে সিংহলে নামিয়া বিধিমত বৌদ্ধ পঞ্চশীল গ্রহণ করেন। অলকটের প্রচার ফলে ব্রহ্মদেশ ও বৌদ্ধ সমাজ আলোড়িত হইতেছিল, এমন সময় তিনি ব্লাভাস্কির কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইলেন। প্রচার কার্য্যের ভার লেডবেটারের উপর স্থাপন করিয়া তিনি ত্বরায় মান্দ্রাজ যাত্রা করিলেন। ব্লাভাস্কিকে বুঝি আর দেখিতে পাইবেন না, এই আশঙ্কায় ব্যাকুল ভাবে অলকট পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই সময়ের ডায়রিতে লিখিত আছে,—"হে সুহৃদ্! এত দিনে কি তোমার অদ্ভুত উদ্যমময়, যন্ত্রণাময়, পরস্পর বিরোধী প্রবল ভাবময়, বিশ্বমানবের হিতার্থ অবিচলিত অনুরাগময় জীবনের অবসান হইতে চলিল? হায়! যদি তুমি আমার স্ত্রী, প্রণয়িনী বা ভগ্নী হইতে, তাহা হইলে আমার এত ক্ষতি হইত না; কেন না, মহাপুরুষগণ আমাদিগকে যে দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, এক্ষণ হইতে একাকী আমাকে উহার গুরুভার বহন করিতে হইবে।"

অলকট যখন আদিয়ারে পহুঁছিলেন, তখন ব্লাভাস্কি জীবন মরণের সন্ধিস্থলে উপস্থিত। চিকিৎসকগণ বলিয়াছেন, যে কোন মুহূর্ত্তে তাঁহার মৃত্যু হইতে পারে। কখন তাঁহার শেষ নিশ্বাসটী নির্গত হয়, এজন্য সকলেই সদা চিন্তিত। সমস্ত গৃহটী যেন বিষাদের ছায়ায় আচ্ছন্ন। এমন সময় এক রাত্রে তাঁহার গুরুদেব আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন। পর দিবস হতাশ চিকিৎসকগণ ও অন্যান্য সকলে ব্লাভাস্কিকে সহসা সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত দেখিয়া একান্ত বিস্মিত হইলেন। এরূপ ঘটনা ব্লাভাস্কির জীবনে আমরা অনেক বার দেখিয়াছি। তিনি কতবার এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা যেন জড় বিজ্ঞানকে উপহাসপূর্ব্বক বৈজ্ঞানিকগণের নিকট এমন একটী প্রশ্ন স্থাপিত করিতেন, যাহার উত্তর দানে তাঁহাদের সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি, অধ্যয়ন অভিজ্ঞতা একেবারে বিফল হইয়া যাইত, তাঁহারা কেবল বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া থাকিতেন। আমেরিকায় অবস্থান কালে তাঁহার পায়ে একবার গুরুতর আঘাত লাগে। তজ্জন্য এরূপ অবস্থা হয় যে, ডাক্তারগণ পীড়া-দুষ্ট পদ কর্ত্তন (amputate) ব্যতীত প্রতিকারের অন্য কোন উপায় নাই বলিয়া মত প্রকাশ করেন। যে দিন তাঁহারা এই মত প্রকাশ করেন, তৎপর দিনই দেখা গেল, তিনি স্বচ্ছন্দে চলিয়া বেড়াইতেছেন। ডাক্তারগণ তাঁহাদের তীক্ষ্ণ অস্ত্র-পরীক্ষার একটী সুযোগ হইতে এইরূপে বঞ্চিত হইয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন কি না, জানি না, কিন্তু তাঁহারা যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঈদৃশ ব্যাপারের মীমাংসায় অসমর্থ হইয়া একান্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ব্লাভাস্কির অন্যান্য অদ্ভুত শক্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও, এইরূপ অনির্দ্দেশ্য উপায়ে বারম্বার

মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা প্রাপ্তি ব্যাপার তাঁহার জীবনের অলৌকিক ক্রিয়ার মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য।

ব্লাভাস্কি ক্রমশঃ স্বাস্থ্যলাভ করিলেন বটে, কিন্তু সে অল্প দিনের জন্য। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াই সমিতির কার্য্যে অতিরিক্ত শ্রম ও চিন্তায় তিনি আবার পীড়িত হইয়া পড়িলেন। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে কার্য্য হইতে একেবারে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক য়ুরোপের কোন স্বাস্থ্যকর নিভৃত স্থানে বাস করিবার ব্যবস্থা প্রদান করিলেন। তদনুযায়ী তিনি স্বীয় Corresponding Secretaryর পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পূর্ব্বেও তিনি একবার শারীরিক দৌর্ব্বল্যের জন্য পদত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু সভ্যগণের আগ্রহাতিশয্যে পুনরায় কার্য্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু এবার কেহই তাঁহাকে তদ্রূপ অনুরোধ করিতে সাহসী হইলেন না। ব্লাভাস্কি সমিতির নিকট যে পদত্যাগ পত্র প্রদান করেন, তাহার মর্ম্ম এই:—"ভদ্রমহোদয়গণ! আমি ১৮৮৩ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে পদত্যাগ করিয়াছিলাম,কিন্তু সমিতির বন্ধুগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আমাকে উহার প্রত্যাহার করিতে হয়। কিন্তু এক্ষণ আর কোন ক্রমেই পদত্যাগ না করিয়া পারিতেছি না। আমার বর্ত্তমান পীড়াচিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক মারাত্মক বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। আমার আয়ু হয় ত এক বৎসরের মধ্যেই শেষ হইতে পারে। এমতাবস্থায় Corresponding Secretaryর কর্ত্তব্যভার বহন করা আমার পক্ষে উপহাস মাত্র।

জীবনের অবশিষ্ট দিন-কয়েকটী অন্য চিন্তায় নিযুক্ত থাকিতে, এবং জল বায়ু পরিবর্ত্তনে যদি স্বাস্থ্যোন্নতির আশা থাকে, তবে স্বাধীন ভাবে তদনুকূল কার্য্য করিতে আমার ইচ্ছা। আমার বন্ধুবর্গ এবং যাঁহারা আমার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হৃদয়ের প্রীতি জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি। যদি ইহাই আমার অন্তিম বাক্য হয়, তবে আমার শেষ প্রার্থনা এই যে, যদি আপনাদের মানব জাতির মঙ্গল ইচ্ছা এবং স্বীয় কর্ম্মে বিশ্বাস থাকে, তবে আপনারা সমিতির প্রতি এরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ থাকিবেন যেন অশুভাকাঙ্ক্ষীরা ইহার উচ্ছেদ সাধন না করিতে পারে। কি জীবনে, কি মরণে, সৌভ্রাত্র বন্ধনে আবদ্ধ আপনাদের—এইচ, পি, ব্লাভাস্কি। আদিয়ার, ১৮৮৫ সাল, ২১শে মার্চ্চ।"

সমিতি ব্লাভাস্কির দর্শন বিজ্ঞান বিষয়ক মহৎ কার্য্যাবলী সম্বন্ধে উচ্চ মত ও গভীর কৃতজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া উপরোক্ত পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিলেন। তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তাঁহার স্থলে Corresponding Secretaryর পদে আর কেহ নিযুক্ত হইবেন না,—সভায় এইরূপ স্থিরীকৃত হইল।

ব্লাভাস্কি এপ্রেল মাসে আদিয়ার ত্যাগ করিয়া ইতালি গমন করিলেন। ইতালি হইতে জার্ম্মানির অন্তর্গত উর্স্বর্গ (Wursburg) গমন করেন। তথা হইতে এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, উর্স্বর্গ এক্ষণে তাঁহার পক্ষে মদিনার ন্যায়, কারণ প্রিয় আদিয়ার মক্কা হইতে এক্ষণ তিনি নির্ব্বাসিত। ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার Secret Doctrine গ্রন্থের উপকরণ সংগৃহীত হইতেছিল, এক্ষণে উহা কতকদূর অগ্রসর হইয়াছিল। তৎ সম্বন্ধে তিনি অলকটকে লিখিতেছেন,—"আমার এক্ষণ সময় অতি অল্প। প্রথম খণ্ডের অর্দ্ধেক মাত্র হইয়াছে। কিন্তু

২।১ মাস মধ্যে তোমাকে ছয় পরিচ্ছেদ পাঠাইব। মূল বিষয় ছাড়া Isis unveiled গ্রন্থ হইতে আর কিছুই গ্রহণ করি নাই। নানাবিধ ধর্ম্মের অন্তর্গত পৌরাণিক রহস্য, সাঙ্কেতিক চিহ্ন এবং মতপরম্পরা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের দিক দিয়া ব্যাখ্যাত হইতেছে। ইত্যাদি।"

এই সময় কাউন্টেস অব ওয়াট মিষ্টার (Countess of Wachtmeister) নাম্নী একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা ব্লাভাস্কির নিকট থাকিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। কাউন্টেসের স্বামী কিছুদিন তাঁহার স্বদেশ সুইডেনের (Sweden) রাজদূত রূপে লণ্ডনে বাস করিয়াছিলেন। ইনি ব্লাভাস্কির শিষ্যা ভক্ত ও চিরদিন তাঁহার অনুগত ছিলেন। সম্পদশালিনী হইলেও তিনি নানা কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক দেশ বিদেশে, পরাবিদ্যা সমিতির বার্ত্তা প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াও নানা স্থানে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় ভগিনীর ন্যায় ব্লাভাস্কির সেবা করিতেন।

ডিসেম্বর মাসে মান্দ্রাজে সমিতির দশম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইল। সমিতির এক সাধারণ অধিবেশনে ব্লাভাস্কি স্বাস্থ্যের উন্নতি বোধ করিলেই ভারতে পুনরাগমন করেন, এই অনুরোধজ্ঞাপক এক প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। মিশনরী ষড়যন্ত্র সত্বেও ব্লাভাস্কির প্রতি সভ্যগণের অবিচলিত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের যে কিছুমাত্র হানি হয় নাই, উক্ত মন্তব্য হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু হায়! মিত্রবর্গ ও ভারতবাসীর একান্ত ইচ্ছা সত্বেও তিনি আর তাঁহার প্রিয়ভূমি ভারতে প্রত্যাগমন করিতে পারেন নাই। শারীরিক অস্বাস্থ্য তাঁহাকে ভারতভূমি হইতে চিরবিদায় নিতে বাধ্য করিয়াছিল। ভারতবর্ষকে তিনি এতদূর প্রিয় মনে করিতেন যে, অন্যত্র বাস তিনি নির্ব্বাসন দণ্ডস্বরূপ বোধ করিতেন। এই সময়কার অনেক পত্রে তিনি আপনাকে "in exile"—অর্থাৎ 'নির্ব্বাসিতা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

উৎসবের সময় মান্দ্রাজে একটী ভয়ানক দুর্ঘটনা হয়। তথাকার Peoples' Park নামক স্থানে একটা মেলা উপলক্ষে বহু লোক একত্রিত হইয়াছিল। হঠাৎ তথায় এক অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়া ৩০০।৪০০ শত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ব্লাভাস্কি তখন বেলজিয়মের অষ্টেণ্ড (Ostend) নগরে। তিনি কিরূপে সেই অগ্নিকাণ্ডের বিষয় অবগত হইলেন, তাহা তাঁহার ৪ঠা জানুয়ারীর (১৮৮৬ খ্রীঃ) একখানা পত্রে ব্যক্ত হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠকের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে ঐ পত্রের মর্ম্মোদ্ধার করিয়া দিলাম,—

"প্রিয় অলকট,—এবার নববর্ষের প্রথম দিনটী সম্পূর্ণ একাকী কাটাইয়াছি,—যেন আমি কবরের মধ্যে ছিলাম। কেহ আসিল না। কাউন্টেস লণ্ডনে গিয়াছেন। একমাত্র আমার পরিচারিকা ও আমি এই বৃহৎ বাটীতে বাস করিতেছি। একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। আমি সমস্ত দিন লিখিতেছিলাম। একখানা পুস্তকের প্রয়োজন হওয়ায় আমি উঠিয়া পুস্তকাধারের দিকে যাইলাম। উপরে আদিয়ারের একখানা ফটোগ্রাফ্ ঝুলিতেছিল। ২৭শে ডিসেম্বর (যখন মান্দ্রাজে সমিতির উৎসব চলিতেছিল) আমি ঐ ছবির দিকে অনেকক্ষণ আগ্রহসহকারে চাহিয়া, তোমরা সকলে কি করিতেছ, তাহারই কল্পনা করিতেছিলাম। কিন্তু ১লা জানুয়ারী সে বিষয়ে আমি আদৌ কোন

মনোযোগ দিই নাই। কারণ সেইদিন আমি (Secret Doctrine গ্রন্থের) 'প্রাচীন যুগ' (Archaic Period) শীর্ষক পরিচ্ছেদটী সমাপ্ত করিতেই নিবিষ্ট ছিলাম। সহসা দেখিলাম, সমস্ত ছবিখানা যেন আগুন লাগিয়া জ্বলিতেছে। আমি ভীত হইলাম। ভাবিলাম, বুঝি আমার মাথায় রক্ত উঠিয়াছে। আবার দেখিলাম,—নদী, গাছপালা, গৃহ,—সব যেন প্রতিফলিত অগ্নিজ্বালায় দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। দেখিলাম, দীর্ঘ সর্প জিহ্বার ন্যায় অগ্নিশিখা দুইবার নদী পার হইয়া আমাদের গৃহ ও বৃক্ষগুলি স্পর্শ করিয়া আবার সরিয়া গেল, এবং তারপর আর কিছু দেখা গেল না। আমি বিস্ময় ও ভয়ে অভিভূত হইলাম, এবং আমার প্রথম ভাবনা হইল যে, আদিয়ারে আগুন লাগিয়াছে। নববর্ষের উৎসব উপলক্ষে দুই দিন ব্যাপিয়া সমস্ত অষ্টেণ্ড সহরটী সুরাপানে মত্ত ছিল, কাজেই কোন সম্বাদপত্র পাই নাই। আমার বড়ই কষ্ট হইতেছিল। আমি ২রা জানুয়ারী মান্দ্রাজ বা আদিয়ারে উক্ত দিবস কোন অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল কি না,সম্বাদ পত্র দেখিয়া আমাকে জানাইবার জন্য ইংলণ্ডে এক ব্যক্তিকে পত্র লিখিলাম। ৩রা তারিখ সে আমাকে তার করিল, 'মান্দ্রাজ Peoples' Parkএ ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড। ৩০০ শত ভারতবাসী কালা আদ্‌মি (natives) পুড়িয়া মরিয়াছে, তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই।' অদ্য আমি নিজেই বেলজিয়মের একখানা সম্বাদপত্রে এই সংবাদ দেখিলাম। সমিতির সভ্যদের মধ্যে কেহ মরিয়াছে কি ? আমি বড়ই ভীত হইয়াছি। আশা করি, তুমি সেখানে ছিলে না, কারণ তোমার সেদিন আদিয়ার ছাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল না। আর সেই মুর্খের (ইংলণ্ড হইতে যে ব্যক্তি ব্লাভাস্কিকে তার করিয়াছিল) কথা শুন! কোন চিন্তা নাই, ৩০০ শত ভারতবাসী মরিয়াছে মাত্র।' আমি তাহাকে উত্তরে লিখিয়াছি, যদি ৩০০ শত ভারতবাসী না মরিয়া ৬০০ শত য়ুরোপিয়ান মরিত, তাহা হইলে আমার এত কষ্ট হইত না।"

ভারতবাসীর জীবনের মূল্য এক শ্রেণীর শ্বেতাঙ্গের নিকট যে কিরূপ তুচ্ছ,তাহা অনেকেই জানেন। ব্লাভাস্কি ঈদৃশ ব্যবহার আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। এজন্য অনেক ধৃষ্ট, উদ্ধত ও উচ্চপদস্থ হইলেও হীনমতি শ্বেতাঙ্গ তাঁহার হস্তে তীব্র প্রতিবাদের কশাঘাত প্রাপ্ত হইয়া চৈতন্য লাভ করিয়াছে।

এবার উৎসবে শ্রীদামোদরের অভাব অনেকেই অনুভব করিলেন। আজ প্রায় এক বৎসর কাল গত হইল, দামোদর নিরুদ্দিষ্ট। এই জীবনীতে আমরা পূর্ব্বে কয়েক বার দামোদরের নামোল্লেখ করিয়াছি। দামোদর ব্লাভাস্কির পুত্রতুল্য স্নেহভাজন ছিলেন। ব্লাভাস্কিকে দামোদর মাতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। আমরা এখানে এই অসাধারণ ত্যাগশীল যুবক দামোদরের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

দামোদর মবালঙ্কার গুজরাটী ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন উচ্চমনা ব্যক্তি ছিলেন, এবং পরাবিদ্যা সমিতির একজন কার্য্যকরী সভ্য ছিলেন। গুর্জ্জর ব্রাহ্মণ সমাজের রীত্যনুসারে শৈশবেই দামোদরের বিবাহ হয়। বলা বাহুল্য, এরূপ বিবাহ তাঁহার সম্মতিক্রমে হয় নাই। এমন কি, তখন তিনি বিবাহের মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন কি না, তাহাই সন্দেহ। যখন তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া সংসার ধর্ম্ম পালন করিবার সময় আসিল, তখন দামোদর বিপদ গণিলেন।

দামোদর সন্ন্যাসী হইয়া জীবন যাপন করিবেন, ইহাই তাঁহার হৃদয়ের প্রবল ইচ্ছা। বাল্যে একবার তিনি গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হন। শয্যায় পড়িয়া ছটফট্ করিতেছেন, এবং প্রলাপ বকিতেছেন—এমন সময় দেখিলেন, কোন মহাপুরুষ নিকটে আসিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মধুর বাক্যে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, "দামোদর! তুমি এক্ষণে মরিবে না, তোমার দ্বারা অনেক সৎকার্য্য সাধিত হইবে।" দামোদর বাঁচিয়া উঠিলেন। নির্ম্মল-চরিত্র বৈরাগ্যবান যুবক দামোদর সন্ন্যাসের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট সংসারের সুখ-ভোগ-কল্পনা তিষ্ঠিতে পারিল না। স্ত্রীসহ গার্হস্থ্য জীবন যাপন তাঁহার পক্ষে বিষবৎ বোধ হইল। তিনি গৃহ হইতে অন্তরে থাকিয়া অধ্যাত্ম-জীবন যাপনে কৃতসংকল্প হইলেন। মহানুভব পিতা দামোদরের মনের গতি লক্ষ্য করিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন। দামোদর পৈতৃক সম্পত্তির নিজ অংশের প্রাপ্য প্রায় পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা বালিকা স্ত্রীর ভরণপোষণ ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কোন ব্যাঘাৎ না হয়, এই সর্ত্তে পিতার নামে লিখিয়া দিলেন। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া যুবক দামোদর পরাবিদ্যা সমিতির আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে কৃতচেষ্ট হইলেন। পরাবিদ্যা সমিতিতে যোগদান ফলে মানব হিতব্রতের এক মহোচ্চ আদর্শ দামোদরের নেত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং উহা তাঁহার আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া তাঁহাকে সমিতির ঐকান্তিক সেবায় পরিচালিত করিতে লাগিল। তিনি সমিতির অন্যতম পরিরক্ষক মহাত্মা কোথুমীর দর্শন লাভ করিলেন। দামোদর বিস্মিত নেত্রে দেখিলেন, ইনিই তাঁহার সেই বাল্যের সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সময়ে দৃষ্ট মহাপুরুষ। দামোদর এই মহাত্মার দাস হইলেন, এবং নবোৎসাহে সমিতির কার্য্যে কায় মন প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। দামোদরের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, কিন্তু ক্ষীণ দুর্ব্বল দেহ লইয়াও তিনি দিবারাত্র অসীম পরিশ্রম করিতেন। রাত্রি ভোর হইয়া যাইত, কিন্তু দামোদরের লক্ষ্য নাই,—তিনি তখনও সমিতি সংক্রান্ত লিপিকার্য্যে নিমগ্ন। অলকট আসিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে শয়ন করাইলে তবে তাঁহার কার্য্যের নিবৃত্তি হইত। দামোদর ছায়ার ন্যায় ব্লাভাস্কির অনুগামী ছিলেন। ব্লাভাস্কির সামান্য ইচ্ছা তাঁহার নিকট অলঙ্ঘ্য আদেশ স্বরূপ ছিল। সম্পদে বিপদে চিরদিন ব্লাভাস্কির প্রতি দামোদরের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অবিচলিত ছিল। ব্লাভাস্কির সহিত দামোদরও বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার আত্মীয় স্বজন রুষ্ট হইয়া তাঁহার ও সমিতির প্রতি অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন। ধ্যান ধারণা, সংযম, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি অভ্যাস করিতে করিতে দামোদরের যোগশক্তিও কতক পরিমাণে বিকশিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে দুই একটী আশ্চর্য্য ঘটনা এখানে বলা যাইতে পারে। অলকটের ডায়রিতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

১৮৮৩ খ্রীঃ দামোদর অলকটের সহিত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এই সময়ে প্রায় প্রতিদিন দামোদর সূক্ষ্ম শরীরে হিমালয়স্থ তদীয় গুরুর আশ্রমে যাতায়াত করিতেন। কানপুরে অবস্থান কালে অলকট ইটালি হইতে কোন ভদ্রলোকের এক খানি পত্র প্রাপ্ত হন। ঐ পত্রের মধ্যে ভদ্রলোকটী মহাত্মা কোথুমীর নামে একখানা পৃথক পত্র দিয়াছিলেন, এবং অলকটকে

মহাত্মার নামায় পত্রখানা কোন প্রকারে তাঁহার নিকট পৌছাইয়া দিতে অনুরোধ করেন। অলকট দামোদরকে পত্র দিয়া উক্ত অনুরোধ জানাইলেন। দামোদর ৪ঠা নভেম্বর রাত্রে সূক্ষ্ম শরীরে পত্র সহ গুরুর আশ্রমে গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার দর্শন পাইলেন না,—তিনিও তখন সূক্ষ্ম শরীরে স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। তৎপর এক প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া দামোদর অবশ ভাবে আদিয়ারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় মহাত্মার দর্শন পাইয়া পত্র দিলেন, এবং তাঁহার আদেশানুসারে কানপুরে ফিরিয়া আসিলেন। পর দিবস অর্থাৎ ৫ই নবেম্বর ব্লাভাস্কি ডাকযোগে ঐ পত্র অলকটকে ফেরৎ পাঠাইলেন। অলকট দামোদর প্রভৃতি কানপুর হইতে আলিগড়ে গমন করেন। ১০ই তারিখ ঐ পত্র আলিগড়ে পহুঁছিল। রেলযোগে আদিয়ার হইতে আলিগড় ৫ দিনের পথ। ৪ঠা তারিখ যে পত্র দামোদরকে দেওয়া হয়, উহা ডাকযোগে আদিয়ারে প্রেরিত হইলে কখনই ১০ই তারিখের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারিত না। অলকট যে সকল প্রমাণ সহ এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

একদা রেলযোগে ভ্রমণের সময় দামোদর বেঞ্চের উপর শুইয়াছিলেন,—হঠাৎ সন্ধ্যা ৬টায় উঠিয়া অলকটকে বলিলেন,—"আমি এই মাত্র আদিয়ারে গিয়া ফিরিয়া আসিলাম। দেখিলাম,ব্লাভাস্কি পড়িয়া গিয়া দক্ষিণ জানুতে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন।" অলকট পরবর্ত্তী ষ্টেশনে পৌছিবা মাত্র ঐদিন আদিয়ারে কোনও আকস্মিক ঘটনা হইয়াছে কি না, জানিবার জন্য ব্লাভাস্কিকে তার করিলেন। ব্লাভাস্কির উত্তরে দামোদর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই জানা গেল, অধিকন্তু দামোদরকে ঐ দিবস আদিয়ারে দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন, তাহাও লিখিয়াছিলেন।

অলকট, দামোদর ও অন্যান্য সঙ্গীগণ কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়া রাজঅতিথি রূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। এই স্থান হইতে ২৪শে নভেম্বর (১৮৮৩) প্রত্যূষে দামোদর অদৃশ্য হইলেন। দামোদরকে না দেখিয়া অলকট ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া এঘর ওঘর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ভৃত্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন,দামোদর ভোরে বাটী হইতে বাহির হইয়াছেন, এখনও ফিরিয়া আসেন নাই। অলকট নিজ কক্ষে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার টেবিলের উপর মহাত্মা কোথুমীর একখানা পত্র রহিয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে, দামোদরের জন্য কোন চিন্তা নাই,তিনি তাঁহার গুরুর আশ্রমে আছেন। ব্লাভাস্কি তারযোগে জানাইলেন, দামোদর শীঘ্রই ফিরিবেন, তাঁহার শয্যা ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি যেন অপর কেহ স্পর্শ না করে। ২৭শে নভেম্বর দামোদর ফিরিলেন। দুই দিনেই তাঁহার পরিবর্ত্তন দেখা গেল। যে দামোদর অতীব রুগ্ন, দুর্ব্বল ও সদা সঙ্কুচিত, সেই দামোদর আজ যেন কি মন্ত্রবলে সবল, দৃঢ়কায়, ও সাহসী হইয়াছেন।

এবার দামোদর ফিরিলেন বটে, কিন্তু ইহার দুই বৎসর পরে তিনি পুনরায় অদৃশ্য হইলেন, এবং অদ্যাপি প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তিনি আদিয়ার ত্যাগ করিলেন। পরে কয়েক স্থান ভ্রমণ করিয়া তিব্বত যাত্রা করেন। অলকট দারজিলিং গিয়া দামোদরের গতিবিধির সন্ধান লইয়াছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ তিব্বতীয় ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র

দাস রায় বাহাদুর মহাশয়ের সাহায্যে দামোদরের সঙ্গীয় কুলিদের নিকট অনেক কথা জানিতে পারিলেন। কুলিরা দামোদরের যে সকল অনাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ফিরাইয়া আনিয়াছিল, তন্মধ্যে একখানা পকেট ডায়েরী বহি ছিল। উক্ত ডায়েরী হইতে তাঁহার গতিবিধির কতক সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি প্রথমতঃ কলিকাতা আইসেন, তথা হইতে বহরমপুর ও জামালপুর (মুঙ্গের) গমন করেন। এই সকল স্থানের শাখাসমিতি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তৎপর কাশীধামে বরুণার মাতাজীর আশ্রমে কিছুদিন থাকেন। মাতাজী তাঁহাকে সমিতি ও ব্যক্তিগত সম্পর্কে অনেক রহস্য বার্ত্তা বলিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কয়েকটা ভবিষ্যদ্বাণীও ছিল, কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। কাশী হইতে পুনরায় কলিকাতা হইয়া দারজিলিং আইসেন। ১৩ই এপ্রেল দারজিলিং ত্যাগ করিয়া পাঁচ দিন পরে সিকিম উপস্থিত হয়েন। তথা হইতে কবি নামক স্থানে আইসেন। ২৩শে কবি ত্যাগ করিয়া আরও অগ্রসর হইতে থাকেন। এই স্থান হইতে তিনি তাঁহার অনাবশ্যকীয় দ্রব্যাদিসহ কুলিদিগকে বিদায় দিলেন। সুতরাং তারপর তিনি কোথায় গেলেন, ডায়েরী হইতে আর জানিবার উপায় নাই, কুলিরাও বলিতে পারিল না। কেহ কেহ বলেন, তিনি বরফে পড়িয়া মারা গিয়াছেন। অলকট বলেন, দামোদর তাঁহার অজ্ঞাতবাস হইতে ভারতের দুই ব্যক্তিকে তিনবার পত্র লিখিয়াছেন; এবং বোম্বাই নগরের তুকারাম, দামোদরের কি হইল জানিতে না পারিয়া, দুঃখপ্রকাশ পূর্ব্বক অলকটকে যে পত্র লিখেন, উহা অলকটের হস্তগত হইলে দেখা গেল, পত্রের এক পার্শ্বে মহাত্মা কোথুমীর হস্তাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে—দামোদর জীবিত আছেন, এবং গুরুর শিক্ষাধীনে থাকিয়া অধ্যাত্মমার্গে অগ্রসর হইতেছেন। এই সকল প্রমাণাবলম্বনে অলকট লিখিয়াছেন, দামোদর যে জীবিত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এবং তিনি যে পুনরাগমনপূর্ব্বক জগতের হিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন, তদ্বিষয়েও সন্দেহ নাই। যাহা হউক, সাধু, সরল, দৃঢ়নিষ্ঠ ত্যাগী দামোদর পরাবিদ্যা সমিতির ইতিহাস-পৃষ্ঠে তাঁহার উন্নত চরিত্রের যে উজ্জ্বল রেখাপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেক পথিকের পথ নির্দ্দেশ করিবে। বরফে পড়িয়াই হউক, বা অন্য প্রকারেই হউক, তাঁহার দেহপাতের কথা যদি সত্যই হয়, তথাপি যিনি আপন বিশ্বাসানুযায়ী জ্ঞানান্বেষণে জীবন দিতে কুণ্ঠিত নহেন, তাঁহার সেই আত্মত্যাগের প্রতিষ্ঠা কোথায় যাইবে? আজ ত্রিশ বৎসর পরেও সমিতির বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সভাপতি স্বীয় অভিভাষণের একস্থানে বলিতেছেন:—

"We have to thank the municipality of Madras for the help which they gave to two of these schools, one the Damodar school, and the other the Annie Besant, and the name of the former is so dear to the neighbours of the school that the municipality has altered the name of the street into 'Damodar street'; so now our good brother, up in Tibet, has had his name immortalised." *

অর্থাৎ, 'দামোদর স্কুল'কে সাহায্য

* General Report of the 39th Anniversary and Convention of the Theosophical Society held at Adyar, December 26th to 31st. 1914.

করিবার জন্য আমরা মান্দ্রাজ মিউনিসিপালিটিকে ধন্যবাদ দিতেছি। দামোদরের নাম চতুঃপার্শ্বস্থ জনসাধারণের এত প্রিয় যে, মিউনিসিপালিটি স্থানীয় রাস্তার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "দামোদর ষ্ট্রীট" রাখিয়াছেন। সুতরাং তিব্বতপ্রবাসী আমাদের সেই সাধু ভ্রাতার স্মৃতি এই সকল অনুষ্ঠানের সহিত জড়িত হইয়া এক্ষণ অমর হইল।

অষ্টেণ্ডে ব্লাভাস্কির পীড়ার প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু এখনও তাঁহার পৃথিবীর কার্য্য শেষ হয় নাই, এখনও তাঁহার জগদালোড়নকারী চিন্তারাশীর আধার স্বরূপ Secret Doctrine, Voice of the Silence, Key to Theosophy প্রভৃতি গ্রন্থ নিচয় প্রকাশিত হইতে বাকী আছে, সুতরাং তিনি অচিরেই আরোগ্য লাভ করিলেন। তিনি মূত্রাশয়ের পীড়ায় এরূপ আক্রান্ত হইয়াছিলেন যে, ডাক্তারদের মতে ঐরূপ অবস্থায় অচিরেই রোগীর মৃত্যু অনিবার্য্য। ব্লাভাস্কি কিরূপে প্রাণধারণ করিয়াছিলেন, ইহা চিকিৎসকগণ বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু ক্রমেই তাঁহার অবস্থা মন্দ হইতে লাগিল। তাঁহার মৃত্যু স্থির নিশ্চিত মনে করিয়া সকলের পরামর্শ মতে তাঁহার সম্পত্তির (সম্পত্তির মধ্যে নিজের ব্যবহার্য্য কয়েকটী দ্রব্য ও কয়েকখানি পুস্তক মাত্র বর্ত্তমান ছিল) 'উইল' লেখাইবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। যে দিন প্রাতে 'উইল' লিখিত হইবে, তাহার পূর্ব্ব রাত্রে রোগীর অবস্থা নিতান্ত মন্দ দেখিয়া তাঁহার শয্যা-পার্শ্বোপবিষ্টা সুশ্রূষাকারিণী কাউণ্টেস দুঃখভারাক্রান্তচিত্তে ব্লাভাস্কির অন্তিম দশা পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। চিন্তাক্লিষ্টা ও রাত্রিজাগরণে অবসন্নদেহা কাউণ্টেস নিশাশেষে হঠাৎ তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন সকালবেলা তিনি যখন জাগিলেন, তখন এই নিদ্রাকর্ষণের জন্য লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন, এবং তাঁহার ভয় হইল ব্লাভাস্কি বুঝি আর নাই। এমন সময় ব্লাভাস্কি ডাকিলেন,—"কাউণ্টেস, এদিকে এস।" কাউণ্টেস তাড়াতাড়ি তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন,—"একি! রাত্রে আপনার অবস্থা যেরূপ হইয়াছিল, এক্ষণ ত তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতেছি! কি হইল?"

ব্লাভাস্কি বলিলেন,—"হাঁ, প্রভু এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে, মরিতে চাই কি বাঁচিতে চাই, জিজ্ঞাসা করিলেন। যদি মরিয়া সকল যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইতে চাই ত মরিতে পারি, আর যদি Secret Doctrine শেষ করিবার জন্য বাঁচিতে চাই ত বাঁচিতে পারি। বাঁচিলে আমাকে এখনও অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। আমাকে নাকি ইংলণ্ডে যাইতে হইবে, এবং সেখানেও আমার জন্য অনেক দুঃখ সঞ্চিত আছে। কিন্তু আমি যখন আমার জ্ঞানান্বেষী শিষ্যবর্গ এবং হৃদয়ের রক্তসঞ্জাত পরাবিদ্যা সমিতির বিষয় ভাবিলাম, তখন তাহাদিগকে শিক্ষাদান এবং সমিতির উন্নতি কামনায় সমস্ত দুঃখভার বহন করিতে স্বীকৃত হইলাম। এখন আমাকে কিছু খাইতে দাও, আর আমার তামাকের কৌটাটী দাও।"

ব্লাভাস্কি বসিবার গৃহে গিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময় জনৈক ব্যারিষ্টার সহ আমেরিকার কন্সল ও দুইজন ডাক্তার উইল লিখাইবার জন্য আসিলেন। ডাক্তারদ্বয় মৃত্যুকবলগত রোগীর সহসা এইরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন

দেখিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। কন্সল মহাশয় ব্লাভাস্কিকে বলিলেন,—"আপনি এবার মৃত্যুকে ফাঁকি দিলেন।" পাঠক জানেন, এইরূপ কতবার মৃত্যু তাঁহার দ্বারে আসিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

ইতঃপূর্ব্ব হইতে তাঁহাকে লণ্ডনে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ পত্র আসিতেছিল। তাঁহার পীড়ার সময় মিঃ কিট্‌লি প্রভৃতি কতিপয় খ্যাতনামা সভ্য অষ্টেণ্ড নগরে আসিয়া তাঁহাকে লণ্ডনে আনিবার জন্য সবিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। ব্লাভাস্কি সম্মত হইলে তাঁহারা লণ্ডনে ফিরিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তিনি লণ্ডনে আগমন করিলেন। প্রথমতঃ তিনি যে বাটীতে ছিলেন, তথায় স্থানের সংকীর্ণতা প্রযুক্ত তাঁহার বড় কষ্ট হইতেছিল। পরে সেবকগণ তাঁহাকে অন্য এক প্রশস্ত বাটীতে লইয়া যান। এই বাটী হলাণ্ড পার্ক (Holland Park) নামক উদ্যানের পার্শ্বে নীরব পল্লীতে অবস্থিত। ব্লাভাস্কি নীচের ঘরে থাকিতেন, কারণ 'উঠা-নামা' তাঁহার পক্ষে নিতান্তই কষ্টকর ছিল। চলা ফেরা করিতে ইদানীং তিনি একান্ত অনভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যিনি এক সময়ে ক্রমাগত দশ বৎসরকাল পৃথিবীর দুর্গম স্থান সমূহ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণ দুই চারি পা চলিলেই ক্লান্ত হইয়া পড়েন। দীর্ঘকালব্যাপী রোগে তাঁহার দেহ এমনই ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ডাক্তার কিট্‌লি বলেন,—"ব্লাভাস্কির বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থায় তিনি যেরূপ পরিশ্রম করেন, তাহা ত দূরের কথা, বাঁচিয়া থাকাই এক অতি অদ্ভুত ব্যাপার। আমি একজন চিকিৎসক, কিন্তু ইহা কেবল আমার মত নহে, লণ্ডনের কতিপয় প্রধান ভিষগাচার্য্য বলিয়াছেন যে, এরূপ রোগীকে এক সপ্তাহকাল বাঁচিয়া থাকিতেও পূর্ব্বে তাঁহারা কখন দেখেন নাই।...কিন্তু তাঁহার স্থির বিশ্বাস, কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বে তিনি মরিবেন না। এবং সেই কার্য্য সম্পাদনে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকেন। তিনি সকাল ৬॥টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত কেবল আহারের জন্য কিঞ্চিৎ সময় ব্যতীত অবিশ্রান্ত ভাবে Secret Doctrineএর লিখন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। এতদ্ব্যতীত লণ্ডনে তাঁহার নব-স্থাপিত মাসিকপত্র "লুসিফার" (Lucifer) সম্পাদনের সমস্ত ভার তাঁহার উপর ছিল। ইত্যাদি।"

তাঁহাকে উঠিতে চলিতে না হয়, এজন্য লিখিবার কক্ষটীতে তাঁহার আসনের চারিদিকে আবশ্যকীয় পুস্তকের টেবিল ইত্যাদি সজ্জিত ছিল, এবং তিনি ইহার মধ্যে মধ্যে স্থাপিত ভারতবর্ষের স্মারক কাশী, কাশ্মীর, মোরাদাবাদ প্রভৃতি স্থানের উৎকৃষ্ট শিল্পজাত দ্রব্যে বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। Secret Doctrine এবং Luciferএর ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য এবং একটী পুস্তক প্রকাশ সমিতি স্থাপনের জন্য ভক্ত সেবকগণ প্রায় ২২০০০৲ বাইশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। এই বাটীতে ব্লাভাস্কিকে দর্শন ও তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে অনবরত লোক সমাগম হইতে লাগিল। বিজ্ঞান, দর্শন, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ আপন আপন অধীত বিদ্যা সম্বন্ধে ব্লাভাস্কিসহ বিচার আলোচনা করিতে আগমন করিতেন। রাত্রি ১২টা, কখন কখন ২টা পর্য্যন্ত এইরূপ আলোচনা চলিতে থাকিত। ব্লাভাস্কি রুগ্নদেহ

লইয়াও, কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া অক্লান্ত উৎসাহের সহিত সকলের প্রশ্নের সমাধান করিতে থাকিতেন। লোকশিক্ষার জন্য তাঁহার অসীম সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল। কিন্তু এইরূপ লোকসমাগমে তাঁহার গ্রন্থ-লিখন-কার্য্যে বড়ই ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল। এজন্য সকলের অভিমতানুসারে প্রতি সপ্তাহের শনিবার তাঁহার সহিত জিজ্ঞাসু-দিগের সাক্ষাতের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। শনিবার দিবা ২টা হইতে গভীর রাত্র পর্য্যন্ত তিনি আগন্তুকদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও বিচার আলোচনা করিতেন। স্বনামখ্যাত মিঃ ষ্টেড (W. T. Stead), লর্ড ক্রফোর্ড (Lord Crawford) প্রভৃতি জনহিতৈষী সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার নিকট সৃষ্টিতত্ব, মনস্তত্ব প্রভৃতি বিষয়ে নানা জটিল প্রশ্নের উত্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার মীমাংসা শ্রবণের জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকিতেন।

'আইসিস অনভিল্ড' (Isis Unveiled) গ্রন্থ যেরূপে রচিত হয়, তাহা আমরা যথাস্থানে বর্ণন করিয়াছি। 'সিক্রেট ডক্‌ট্রিন' গ্রন্থও তদ্রূপেই রচিত হয়। ব্লাভাস্কি এই গ্রন্থ রচনায়ও নিজের বিদ্যাবত্ত্বার কোন দাবি করেন না। অদ্ভুত সূক্ষ্ম দৃষ্টিবলে তিনি অতীত জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার আকাশ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতেন, এবং মহাত্মাগণ তাঁহার নেত্রসম্মুখে যে গূঢ় তত্বরাজি উন্মোচিত করিতেন, তাহাই তিনি লিপিবদ্ধ করিতেন। গ্রন্থ তাঁহার নিকট ৩০।৪০ খানার বেশী ছিল না, ইহার মধ্যেও কতকগুলি অভিধান গ্রন্থ মাত্র। অথচ তিনি নানা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ হইতে রাশী রাশী বাক্য উদ্ধৃত করিতেছেন। এই সকল উদ্ধৃতাংশের শুদ্ধতা পরীক্ষার-জন্য অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি British Museum-এর গ্রন্থাগারে গিয়া তত্তৎ পুস্তক বাহির করিয়া মিলাইয়া দেখিতেন, ব্লাভাস্কির উদ্ধৃত বিবরণে কোন ভ্রম নাই। কেবল অঙ্কের সম্বন্ধে বৈপরীত্য দৃষ্ট হইত। অর্থাৎ, তিনি যেখানে হয়ত ৩৪১ লিখিয়াছেন, সেখানে মূল পুস্তক খুলিয়া দেখা গেল, উহা ১৪৩। ইহার কারণ এইরূপ বলা হইয়াছে যে, আকাশে অঙ্কগুলি ছায়ার ন্যায় বিপরীত ভাবে প্রতিফলিত হইত, এবং যেরূপ দৃষ্ট হইত, ব্যস্ততাবশতঃ তিনি তদ্রূপই লিখিয়া লইতেন। কখনও কোন কারণে চিত্তের চাঞ্চল্য বশতঃ তিনি আকাশ-দৃষ্ট বিষয়ের প্রতিলিপি গ্রহণে ভুল করিতেন। এ সম্বন্ধে কাউন্টেস-বর্ণিত এক দিবসের ঘটনা এইরূপ। একদিন কাউণ্টেস্ তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গৃহের মেঝেতে রাশী রাশী লেখা কাগজ ছড়ান রহিয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্লাভাস্কি বলিলেন,—"আমি এই একটী পৃষ্ঠা বার বার শুদ্ধ করিয়া লিখিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু প্রতিবারেই গুরুদেব বলেন, ঠিক হয় নাই। আমি দেখিতেছি, এইরূপে পুনঃ পুনঃ একটী পৃষ্ঠা লিখিতে লিখিতে পাগল হইব। যাহা হউক, তুমি যাও, আমি একাকী থাকিব। যতক্ষণ না শুদ্ধ হইবে, ততক্ষণ ছাড়িব না, ইহাতে যদি সমস্ত রাত্রি বসিয়া লিখিতে হয় ত তাহাই হইবে।" কাউন্টেস তাঁহাকে এক পাত্র 'কাফি' পান করাইয়া চলিয়া গেলেন। এক ঘণ্টা পরে ব্লাভাস্কি তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, এতক্ষণে লেখাটী ঠিক হইল, কিন্তু ইহার জন্য গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।

অতঃপর ব্লাভাস্কি অবসন্ন দেহে সিগারেটের ধূম পান করিতেছেন। কাউন্টেস আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, এরূপ ভুল করিবার

কারণ কি? ব্লাভাস্কি উত্তর করিলেন, "দেখ, আমি কি করি জান? আমি সম্মুখস্থ আকাশে একটা স্থান (যেন অন্য সমস্ত চিন্তা-চিত্র উহা হইতে মুছিয়া ফেলিয়া) একেবারে শূন্য করিয়া লই। সেই শূন্য আকাশে স্বীয় দৃষ্টি স্থির ও একাগ্র করিয়া রাখি। অচিরাৎ দৃশ্যের পর দৃশ্য আমার দৃষ্টি-সম্মুখে ভাসমান হইতে থাকে। যদি (আমার নিকট নাই এমন) কোন পুস্তকের কোন বিষয় আমার জানিবার আবশ্যক হয়, তবে তদুপরি সংকল্প স্থির করিবা মাত্র উক্ত পুস্তকের সূক্ষ্ম প্রতিবিম্ব আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়। তখন আমার জ্ঞাতব্য বিষয় উহা হইতে গ্রহণ করি। মন যতই শান্ত ও বিক্ষেপশূন্য হইবে, এবং চিত্ত-সংযোগ যতই তীব্র হইবে, ঈদৃশ সূক্ষ্মদৃষ্টি যোগে বস্তু ততই সঠিক ভাবে সহজলভ্য হইবে। কিন্তু অদ্য অমুকের পত্র পাইয়া মন এতদূর বিরক্ত হইয়াছিল যে, কিছুতেই ভাল রূপে চিত্ত স্থির করিতে পারি নাই, তজ্জন্যই প্রতিলিপি গ্রহণে এই গোলযোগ। যাহা হউক, প্রভু বলিলেন, এইবার ঠিক হইয়াছে। অতএব চল গিয়া একটু চা পান করা যাউক।"

আকাশ-চিত্র হইতে তাঁহার গ্রন্থ লিখন বিষয়ে বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও মহিলা সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। সূক্ষ্ম দৃষ্টির সাহায্য না লইয়া তিনি যাহা স্বীয় সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে লিখিতেন, তাহাতে অনেক সময়ে ভ্রম প্রমাদ থাকিত। তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সংশোধন করিয়া দিতেন। এইরূপে লিখিত হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে কোন কোন অংশ তিনি মান্দ্রাজে খ্যাতনামা সুব্বা রাওএর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ইহার স্থান বিশেষে সুব্বা রাও-প্রদর্শিত ভ্রম পরে সংশোধিত হইয়াছিল, স্থান বিশেষে তাঁহার সংশোধনও গৃহীত হয় নাই। ব্লাভাস্কিকে কেহ তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করিলে তিনি অতীব সন্তুষ্ট হইতেন। অনেক সময় দেখা যাইত, তিনি যে রাশীকৃত লিখিত কাগজ রাত্রে টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া নিদ্রার্থ গমন করিতেন, প্রভাতে তাঁহার বহুস্থল তদীয় গুরুদেবের হস্তাক্ষরে পরিবর্ত্তিত, পরিশোধিত, কর্ত্তিত বা বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। উহার সূচিপত্রই একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থের আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এক কথায় উহাকে "Synthesis of Religion, Philosophy and Science," অর্থাৎ ধর্ম্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের সমন্বয় স্বরূপ বলা হইয়াছে। পৃথিবীর যাবতীয় অতীত ও বর্ত্তমান ধর্ম্মের নিগূঢ় তথ্য ও তত্ত্ব, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের আলোচনা ও সমস্যা, জীবের ক্রমবিকাশ-মূলক গতি ও পরিণতি-তত্ত্ব, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রত্নতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক সত্যের সাহচর্য্যে বিস্তৃত রূপে আলোচিত হইয়াছে। "Secret Doctrine" সমাপ্ত হইলে তিনি 'Key to Theosophy' এবং "Voice of the Silence" নামক আরও দুইখানি উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

ব্লাভাস্কির এই সকল কার্য্য শেষ হইল,—তাঁহার মহাযাত্রার দিনও সমীপবর্ত্তী হইয়া আসিল! তাঁহার তদানীন্তন দৈহিক অবস্থায় ভারতে প্রত্যাগমন অসম্ভব বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তে তিনি যে আদিয়ার হইতে য়ুরোপ যাত্রা করেন, উহাই তাঁহার প্রিয়তম ভারতের নিকট অন্তিম-বিদায়, তিনি এক্ষণ ইহা বুঝিতে পারিলেন, এবং জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়েকটীর জন্য য়ুরোপ বাস রূপ নির্ব্বাসন দণ্ড বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিলেন।

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ।

পুরাণে নব্য-ভূগোলের একটী মত।

নব্যভূগোলে পৃথিবীর গোলত্ব মতটী বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, পৃথিবীর বিপরীত পৃষ্ঠস্থিত লোকদিগের অবস্থান সম্বন্ধে একটী নূতন মত প্রচারিত হইয়াছে, ইহাকে "Antipodes" মত বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ পৃথিবীর বিপরীত পৃষ্ঠস্থ লোকদিগের পদ সকল তাহাদিগের পরস্পর বিপরীত ভাবে অবস্থিত, ইহাই ইহার অর্থ। কিন্তু ইহাতেও একটী সন্দেহের উদয় হইতে পারে। পৃথিবীর একটী যখন ঊর্দ্ধপৃষ্ঠ ও অপরটী নিম্নপৃষ্ঠ, তখন নিম্নপৃষ্ঠের লোক সকল নীচে পড়িয়া যায় না কেন? বিজ্ঞানে ইহার মীমাংসা থাকিলেও ভূগোলে তেমন পরিষ্কার মীমাংসা দেখা যায় না।

আমরা পুরাণে প্রাগুক্ত নব্যভূগোল মতটী যেরূপে প্রাপ্ত হই, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত সন্দেহ সুন্দর রূপেই নিরাকৃত হয়। এখানে আমরা পুরাণের সেই মতটী উদ্ধৃত করিতেছি,—

"পশ্যন্তি নারকান্ দেবাস্ত্বধোবক্ত্রান্ হ্যধোগতান্।
নারকাশ্চ তথা দেবান্ সর্ব্বান্ পশ্যন্ত্যধোমুখান্॥
অনগ্র মূলতা যস্মাদ্ধারণাশ্চ স্বভাবতঃ॥"
বায়ুপুরাণ—১০১ অধ্যায়।

"দেবগণ নরকবাসীদিগকে অধোগত ও অধোমুখে অবস্থিত দেখেন। আবার নরকবাসীরাও দেবগণকে অধোমুখে অবস্থিত দেখে। কেন না, সে স্থানের অগ্র নাই, মূল নাই, উহার স্থিরতা স্বাভাবিকী।"

নরক পৃথিবীর নিম্নভাগ বলিয়াই প্রসি[illegible] সুতরাং দেবগণ পৃথিবীর ঊর্দ্ধ ভাগেরই অধিবাসী হইতেছেন। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, নব্য ভূগোলের 'পদে'র কথা না ধরিয়া পুরাণ 'মুখের' কথা ধরিয়াছে। যে স্থলে নব্য ভূগোল, পৃথিবীর নিম্নপৃষ্ঠস্থ লোকদিগের পদ পৃথিবীর ঊর্দ্ধপৃষ্ঠস্থ লোকদিগের বিপরীত ভাবে অবস্থিত বলিয়া বলে, তৎস্থলে পুরাণ অধোবাসীদিগের মুখ ঊর্দ্ধবাসীদিগের মুখের বিপরীত দিকে অবস্থিত বলিয়া বলিতেছে। পুরাণের এই "বিপরীত মুখ" মতকে নব্য ভূগোলের ভাষায় "Antifaces" মত বলা যাইতে পারে।

এইরূপে বিপরীত পৃষ্ঠে অবস্থিত হইলেও অধিবাসিগণ কিরূপে একে অন্যকে অধোমুখস্থিত বলিয়া মনে করে, তৎসম্বন্ধে পুরাণের উত্তর এই যে, পৃথিবীর কোন 'মূল' বা নিম্নভাগ এবং 'অগ্র' বা ঊর্দ্ধ ভাগ নাই। বাস্তবিক পৃথিবী ঘুরিতেছে বলিয়া আমরা একবার নিম্নগামী ও একবার ঊর্দ্ধগামী হইলেও, আমরা সর্ব্বদাই ঊর্দ্ধে অবস্থিত বলিয়াই বোধ করিয়া থাকি এবং অপর পৃষ্ঠস্থ অধিবাসিগণ নিম্নমুখ হইয়া রহিয়াছে বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। পক্ষান্তরে অপর পৃষ্ঠের অধিবাসিগণও নিজদিগকে সর্ব্বদাই ঊর্দ্ধে অবস্থিত বলিয়া মনে করিতেছে এবং বিপরীত পৃষ্ঠবাসিগণও তাহাদের নিকট তুল্য রূপেই অধোমুখে অবস্থিত রহিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এই প্রকারে পুরাণের

বর্ণনা যে সম্পূর্ণরূপেই প্রকৃত অবস্থার সহিত মিলিতেছে, তাহা আমরা পরিষ্কার রূপেই দেখিতে পাইতেছি। পুরাণের পৃথিবীর 'অগ্র নাই,' 'মূল নাই' অর্থাৎ উর্দ্ধ ও অধঃ নাই, এইরূপ বর্ণনায় পৃথিবী যে নিয়ত আবর্ত্তিত হইতেছে ও উহা যে গোলাকার,তাহারও আভাস পাওয়া যায়। কারণ গোল বলিয়া পৃথিবীর মূল ও অগ্রভাগ নির্ণয় করা যেমন অসম্ভব, তেমনই পৃথিবীর নিয়ত আবর্ত্তন হেতু কখন ইহার কোন পৃষ্ঠ উপরে উঠিতেছে ও কোন পৃষ্ঠ নীচে নামিতেছে, তাহা নির্ণয় করাও অসম্ভব।

উভয় পৃষ্ঠের লোক সকলই নিম্নমুখ হইয়া অবস্থিত হইলেও কেন পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যায় না,পুরাণে তাহারও সংক্ষেপ উত্তর রহিয়াছে। সেই উত্তর এই যে, স্বভাবতঃই ইহারা স্থিরভাবে অবস্থান করে, স্খলিত হইয়া পড়ে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, স্থিরতাটী স্বভাবেরই কার্য্য। প্রকৃতির নিয়মেই অধোমুখ হইয়াও লোক সকল পৃথিবীপৃষ্ঠে ধৃত হইয়া থাকে; কখনও তথা হইতে পড়িয়া যায় না। সেই প্রাকৃতিক নিয়মটী যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ, তাহা আমরা বর্ত্তমান বিজ্ঞান হইতে জানিতে পারি। পুরাণ সাধারণ ভাবে কেবল স্বভাব বলিয়াই কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছে। ঈশ্বরেচ্ছা বা দৈবশক্তি প্রভৃতির উপর নির্ভর করে নাই। পুরাণে 'ধারণা' শব্দটীকে এখানে আমরা বিশেষার্থেরই দ্যোতক বলিয়া মনে করি। 'ধারণা' ধৃত হওয়ার অর্থই প্রকাশ করে। এই ধারণা যে পৃথিবীরই কার্য্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। 'ধারণা' যখন পৃথিবীরই কার্য্য হইতেছে, তখন ইহাকে 'স্বভাব' রূপে নির্দ্দেশিত করায়, 'ধারণা'কে পৃথিবীর স্বভাব অর্থাৎ ধর্ম্মই বলিতে হয়। এইরূপে 'ধারণা'কে পৃথিবীর 'স্বভাব' বলাতে আর 'মাধ্যাকর্ষণ' বলাতে যে বড় প্রভেদ নাই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

প্রাগুক্ত পর্য্যালোচনা সকল হইতে অভিনব ভৌগোলিক বিজ্ঞান মত যে বহু প্রাচীন পুরাণে কিরূপ স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ ভাবে অথচ সংক্ষেপে প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া প্রকৃতই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইতে হয়।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ীক দর্শন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রত্যক্ষ জ্ঞান মূলক সন্দেহবাদ (Sensationalistic scepticism)

ইনিসিডিমাস (Ænesidemus)।*

আদর্শ-জ্ঞান মূলক সন্দেহবাদের (Idealistic scepticism) উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, ইলিয়াটিক দর্শন হইতেই উহার আরম্ভ হইয়াছিল। প্রত্যক্ষজ্ঞান-মূলক সন্দেহবাদের দেশে উক্ত মতের গতি পরিবর্ত্তিত হয়। প্রোটাগোরাস, অ্যারিষ্টিপাস এবং টাইমন শেষোক্ত মতের প্রচারকর্ত্তা। এই তিনজন ছাড়া আরও কয়েক জন চিকিৎসা-ব্যবসায়ী পণ্ডিত উহার পোষকতা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, প্রকৃত সত্য

* ইনিসিডিমাস সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথমাংশে আলেকজান্দ্রিয়া নগরে বাস করিতেন।

নিরূপণের কোন উপায়ই নাই। যাহাকে আমরা বস্তু বলি, অর্থাৎ যাহা Thing-in-itself, তাহার যথাযথ ধারণা মানবের সাধ্যাতীত। আর্কিসিলেয়াস এবং কার্ণিয়াডিজ কেবলমাত্র তাহার ঘুরপেঁচের উপর নির্ভর করিয়াই স্ব স্ব যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রত্যক্ষসিদ্ধ সন্দেহবাদ, সোজা কথায় যাহাকে নাস্তিকতা বলে, তাহার সহিত শারীরবিদ্যা-সংক্রান্ত এবং পরীক্ষালব্ধ তথ্য সমূহের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে। এই শ্রেণীর সংশয়বাদিগণের মধ্যে ইনিসিডিমাসের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি ক্রীটের (Crete) অন্তর্গত নোসাস্ নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিসিডিমাস পির্হোনিজমের উপর আটখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। গ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ং এবং পির্হো যে সকল কারণে অভ্রান্ত সত্য মানব-জ্ঞানের অতীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, ইনিসিডিমাসের গ্রন্থে তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। কারণ গুলি সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

(১) জ্ঞাতার শারীরিক অবস্থা-বৈষম্য ও তাহার ফলে বিভিন্ন দ্রব্য সম্বন্ধে একরূপ, এবং এক জাতীয় দ্রব্য সম্বন্ধে বিরোধাত্মক জ্ঞান। উদাহরণ, কামোলা রোগগ্রস্ত ব্যক্তির চ'খে দ্রব্য মাত্রই পীতাভ দেখায়। আবার, দ্রষ্টার প্রকৃতিগত পার্থক্যানুসারে একই দ্রব্য বিভিন্ন বর্ণে এবং বিভিন্ন আয়তনে প্রতিভাত হয়।

(২) জ্ঞাতার দৈহিক গঠন-বৈষম্য। সকল দ্রব্যই যদি আমরা একই ভাবে অনুভব করিতে পারিতাম, তাহা হইলে সকলেরই এক প্রকার প্রতিরূপ (Impression), একই প্রকার ধারণা (Idea), সকলের সম্বন্ধে এক প্রকার রাগদ্বেষাদি ভাব (Emotion) এবং একই প্রকার বাসনা (Desire) জন্মিত ; কার্য্যতঃ কিন্তু তাহা হয় না। শারীরিক গঠনানুসারেও এক জাতীয় দ্রব্য সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্ঞান জন্মে।

(৩) জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের পার্থক্য। একই দ্রব্য দুইটী পৃথক ইন্দ্রিয়ের উপর পরস্পর বিরোধাত্মক সংস্কার সঞ্চার করে। উদাহরণ,—প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে সুন্দর হইলেও স্পর্শে কঠিন ; পক্ষী দর্শনে মনোজ্ঞ হইলেও শ্রবণে পরুষ (মন্দবাদি)। শুধু তাহাই নয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্য মাত্রই আমাদের নিকট বহু এবং বিভিন্ন গুণযুক্ত বোধ হয়। দৃষ্টান্ত, আপেল ফল (স্পর্শে) মসৃন, (ঘ্রাণে) সুগন্ধ, (স্বাদে) মধুর এবং (দর্শনে) হরিদ্রা বা রক্তবর্ণ। এরূপ হওয়ার দুইটী কারণ সম্ভব। ১মতঃ, ফলটী হয় ত একটী মাত্র গুণবিশিষ্ট ; চাকচিক্য, মিষ্টতা প্রভৃতি হয় ত ফলে বিদ্যমান নাই, পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসায় উহা আমাদের নিকট বহু গুণযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ২য়তঃ, আপেল হয়ত বহুগুণযুক্ত, অর্থাৎ উল্লিখিত গুণগুলি ফলেই বিদ্যমান এবং এমন কি, পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে এখন আমরা উহার যে কয়টী গুণ গ্রহণ করিতেছি, তদ্ব্যতীত উহাতে এমন অনেক গুণ আছে, যাহার বিষয় আমরা অবগত নই ; অর্থাৎ, সেই সকল গুণ গ্রহণ করিবার ক্ষমতাই আমাদের নাই।

(৪) জ্ঞাতার অবস্থাভেদে দ্রব্য জাতের ভিন্ন ভিন্ন মানসিক সংস্কার। জাগ্রৎকালে দ্রব্য সমূহের যেরূপ প্রতীতি হয়, স্বপ্নাবস্থায় তাহার ব্যতিক্রম ঘটে। একই জিনিষ বাল্যাবস্থায় যেমন, অধিক বয়সে তেমন বোধ হয় না। সুস্থ শরীরে যাহা আনন্দদায়ক, অসুস্থ দেহে তাহাই অসহ্য হইতে পারে ; শান্তচিত্তে

হে জিনিষটী যেমন, প্রমত্তাবস্থায় তাহা তেমন মনে হয় না।

(৫) অবস্থিতি, দূরত্ব এবং স্থানীয় সম্বন্ধ বশতঃ দ্রব্য নিচয়ের বিভিন্ন-জ্ঞান। গমনশীল জাহাজ দূরে থাকিলে নিশ্চল মনে হয়। উজ্জ্বল দিবালোকে প্রদীপের আলোক শ্বেতবর্ণ দেখায়। হস্তীকে দূর হইতে দেখিলে ক্ষুদ্রাকার, নিকটে দেখিলে বৃহৎকায় বোধ হয়। পারাবতের গলদেশের রং দ্রষ্টার অবস্থিতিভেদে পরিবর্ত্তনশীল। দ্রব্য সমূহ এই রূপে দূরত্ব এবং অবস্থিতি ভেদে বিভিন্ন জ্ঞানের সঞ্চার করে। যে কোন দ্রব্যই হউক, তাহা আমাদের নিকট হইতে কিছু না কিছু দূরে এবং কোন না কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিতি করায়, আমরা তাহাদের সম্বন্ধে এই মাত্র জানিতে পারি যে, দ্রব্যগুলি আমাদের 'এতখানি দূরে' এবং 'অমুক অমুক' স্থানে রহিয়াছে, কিন্তু এই দূরত্ব প্রভৃতি স্থানীয় সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিলে অর্থাৎ এই সকল সম্বন্ধের বাহিরে দ্রব্যগুলির যে কি অস্তিত্ব, তাহা জানিবার উপায় নাই। অভিজ্ঞতার ফলে আপেক্ষিক জ্ঞান ব্যতীত আর কোন জ্ঞানই লাভ হয় না।

(৬) বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ানুভূতি দুর্লভ। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ানুভূতির সহিত হয় বহির্জগৎ হইতে, না হয় দেহ বা মন হইতে, কিছু না কিছু ভিন্ন জাতীয় উপকরণ বিদ্যমান থাকে। উদাহরণ, শব্দ সমূহ বায়ুস্তরের গুরুত্বভেদে বিভিন্ন। মুক্তস্থান অপেক্ষা রুদ্ধ এবং উষ্ণ স্থানে সুগন্ধি দ্রব্যের উগ্রতা অধিক। জলের অপেক্ষা বায়ুতে দ্রব্য সমূহের অধিক গুরুত্ব বোধ। দর্শনেন্দ্রিয়ের গঠন, স্নায়ু এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রকৃতি ভেদে দর্শনীয়ের পার্থক্য; আমার প্রতিবেশীর নিকট যে দ্রব্য সবুজ, আমার নিকট তাহা নীল বোধ হইতে পারে। পক্ষান্তরে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বোধশক্তির দ্বারাও পার্থক্য জ্ঞান জন্মে। ইন্দ্রিয়জ উপাদান সমূহ যখন মনের সংস্পর্শে আসিয়া ধারণা বা সংস্কারে পরিণত হয়, তখন বোধশক্তির তারতম্যানুসারে ধারণা বা সংস্কার গুলিও বিকৃত হইয়া থাকে।

(৭) পরিমাণের সহিত গুণের সম্পর্ক। অখণ্ড ছাগ-শৃঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ, খণ্ডীকৃত হইলে শ্বেতবর্ণ দেখায়। অল্প মাদক সেবনে বল সঞ্চার হয়, অধিক সেবনে দৌর্ব্বল্য আসে। খাঁটী বিষপানে মৃত্যু ঘটে, অপর দ্রব্যের সহিত মিশাইয়া পান করিলে রোগ নিবারণ হয়।

(৮) দ্রব্য সকলের পরিবর্ত্তন এবং সম্বন্ধই আমাদের বোধগম্য; দ্রব্যগুলি যে প্রকৃত পক্ষে কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের সহিত এবং অন্যান্য দ্রব্যের সহিত তুলনায় কোন্ দ্রব্যটী কিরূপ, তাহাই জানা যায়; পরন্তু কোন দ্রব্যের নিজের সহিত নিজের তুলনা হয় না, অর্থাৎ দ্রব্যগুলির প্রকৃতি কি, সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

(৯) অভ্যাস, শিক্ষাদীক্ষা এবং সমাজ ও ধর্ম্মবিষয়ক সংস্কার হইতেও সংশয় জন্মে। উদাহরণ, প্রত্যহ সূর্য্যোদয় হয় বলিয়া সূর্য্যোদয়ে বিস্ময়ের কারণ নাই; ধূমকেতু বহুকাল পরে একবার উদিত হয়, এজন্য ধূমকেতুর প্রতিকৃতি মানসপটে অঙ্কিত থাকে। আমরা সাধারণতঃ দুর্লভ কিম্বা দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যেরই আদর করি, অনায়াসলভ্য হইলে তাহার প্রতি বেশী আদর থাকে না। জিহোভার উপাসক ইহুদীর নিকট জুপিটারের মূর্ত্তি চেতনাহীন পুত্তলিকা, জুপিটারের উপাসক গ্রীকের নিকট জিহোভা আবার মিথ্যা দেবতা। ইহুদী যদি গ্রীক হইয়া জন্মিতেন

এবং গ্রীক যদি আব্রাহামের বংশধর হইতেন, তাহা হইলে উভয় জাতির পূজা পদ্ধতিও বিভিন্ন হইত। ইহুদিগণের পূজায় জীবহিংসা নিষিদ্ধ, কারণ এইরূপ ব্যবস্থা তাঁহাদের ধর্ম্ম মতে গৃহীত হয় নাই। পক্ষান্তরে, গ্রীকগণ দেবতার সন্তোষার্থ জীবহিংসায় বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না; কেন না, তাঁহাদের পুরোহিতেরা ঐরূপ প্রথার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। ভিন্ন দেশের ভিন্ন রুচি। ইহা হইতে এইরূপই সিদ্ধান্ত হয় যে, মানব জাতির ধারণার বাহিরে ঈশ্বর যে কি বস্তু এবং জাতিগত সংস্কার ছাড়িয়া ন্যায়ান্যায়ের যে কি অস্তিত্ব, তাহা জানিবার উপায় নাই।

ইনিসিডিমাস কার্য্য-কারণ বিধির সমালোচনা করিয়াও সংশয়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহার বিচারের সার মর্ম্মগুলি ডেভিড্ হিউম (David Hume) কর্ত্তৃক পুনরুদ্ধৃত হইয়াছে। ইনিসিডিমাসের মতে, পার্থিব এবং অপার্থিব, উভয় ক্ষেত্রেই কার্য্য কারণ সম্বন্ধ ধারণার অতীত (inconceivable) এই বিধি দেহ এবং মন সম্বন্ধেও খাটে না। দেহের নিমিত্ত-কারণ কেবলমাত্র দেহ নহে। বাস্তবিক 'দুই' যে 'এক' হইতে কিরূপে আসিল এবং 'তিন' 'চারি' প্রভৃতি সংখ্যা যে কিরূপে 'দুই', 'তিন' হইতে উৎপন্ন হইল, তাহা বুদ্ধির অগম্য। সৃষ্টি সম্বন্ধেও মূল 'এক' (Absolute one) বা কেবলমাত্র জড় হইতে কিরূপে 'দুই' বা দ্রব্যজাতের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বুঝিবার যো নাই। এই হিসাবে, নিমিত্ত কারণ কেবলমাত্র অপার্থিব (immaterial) বস্তুও হইতে পারে না। তদ্ব্যতীত, যাহা অপার্থিব অর্থাৎ জড় নহে, তাহা পার্থিব অর্থাৎ জড়কে স্পর্শ করিতে, অথবা জড় কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইতে পারে না। অতএব কেহ কাহারও পরিবর্ত্তনসাধন করিতে অথবা কাহারও দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইতেও পারে না। পরিবর্ত্তনই যদি না হয়, তাহা হইলে সৃষ্টিও সম্ভব নয়। কেন না, যাহা কিছু কার্য্য বা ফলস্বরূপ, তাহা নিশ্চয়ই কারণের সহিত সমধর্ম্ম হইবে। অশ্ব হইতে মানবের উৎপত্তি, অথবা মানব হইতে অশ্বের উৎপত্তি অসম্ভব। বস্তুমাত্রই হয় পার্থিব, না হয় অপার্থিব, এই দুইয়ের কোন এক শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া এমন কোন দ্রব্যেরই উল্লেখ করা যায় না, যাহা অপর বস্তুর কারণ স্বরূপ গণ্য হইতে পারে।

গতি এবং বিরাম সম্বন্ধেও আমরা উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। বিরাম (rest) হইতে গতির (motion) উৎপত্তি হয় নাই, অথবা গতিও বিরামের কারণ নয়। এইরূপে বিরাম হইতে বিরাম, বা গতি হইতে গতির উৎপত্তিও হাস্যজনক।

কার্য্যকারণ সম্বন্ধ হইতে আরও দেখা যায় যে, তিন প্রকারে কারণের অবস্থিতি ঘটিতে পারে। কারণ, হয় কার্য্যের সমসাময়িক, না হয় কার্য্যের পূর্ব্বকালবর্ত্তী; আর তাহাও যদি না হয়, তবে কার্য্যের উত্তরকালবর্ত্তী হইবে। কিন্তু এ তিন অবস্থার কোনটীই সমীচীন নহে। কারণ যদি কার্য্যের সমসাময়িক (simultaneous) হয়, তবে কারণ ও কার্য্যের মধ্যে অন্তর না থাকায়, একের সহিত অপরে মিলিয়া যাইবে ও তাহার ফলে, কে কারণ আর কেই বা কার্য্য, স্থির হইবে না। যদি পূর্ব্বকালবর্ত্তী হয়, তবে যতক্ষণ না কারণের ক্রিয়া সমাপ্ত হয়, ততক্ষণ তাহার করণত্বই সিদ্ধ হইবে না; অসমাপ্ত ক্রিয়ার কারণ, কারণই নয়। আবার, ক্রিয়াটী একবার শেষ হইয়া গেলে, কার্য্যের সহিত

সম্বন্ধচ্যুত হয় বলিয়া কারণের কারণত্ব লোপ পায়; কেন না, ক্রিয়াহীন কারণ (inactive cause) কারণই নহে। তৃতীয়তঃ, কারণ কার্য্যের উত্তরকালবর্ত্তী হইলে তাহাকে ত কার্য্য-প্রসূত বলিতে হইবে; সুতরাং তাহার আর কারণত্ব কোথায়?

পুনশ্চ, যাহাকে আমরা কারণ বলি, তাহা হয় স্বয়ং ক্রিয়াশীল, না হয় তাহার ক্রিয়াশীলত্ব অপর কোন বস্তু-সাপেক্ষ। স্বয়ং ক্রিয়াশীল হইলে কারণের ক্রিয়া সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বকালেই বিদ্যমান থাকিবে, কিন্তু উহা যে সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বকালে বিদ্যমান নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। স্বয়ং ক্রিয়াশীল না হওয়ায়, যাহার অবলম্বনে বা সাহায্যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহাও কারণস্থানীয়। অতএব পূর্ব্বে যাহাকে কারণ স্থির করা গিয়াছিল, তাহাই একমাত্র কারণ নয়।

আবার, উপরোক্ত কল্পনাসিদ্ধ কারণের হয় একটীমাত্র গুণ, না হয় একের অধিক গুণ থাকিবে। কারণের যদি একটীমাত্র গুণই থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বাবস্থায় কারণের ক্রিয়া একইভাবে নিষ্পন্ন হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তাহা যে হয় না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সূর্য্য-কিরণে দ্রব্যসমূহ কখনও দগ্ধ হয়, কখনও দগ্ধ না হইয়া উষ্ণতাপ্রাপ্ত হয়, আবার কখনও বা দগ্ধ কিম্বা উষ্ণ না হইয়া, কেবলমাত্র আলোকিত হয়। সূর্য্যের তেজে কর্দ্দম কঠিন হয়, চর্ম্ম শুষ্ক হয়, ফলসমূহ রক্তবর্ণ ধারণ করে। অতএব বলিতে হইবে, সূর্য্য একাধিক বা বহুগুণবিশিষ্ট, কিন্তু তাহা যে কিরূপে সম্ভব, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না; যেহেতু সূর্য্য যদি একাধিক গুণবিশিষ্টই হইবে, তাহা হইলে তদ্দারা দ্রব্যসমূহ একই কালে দগ্ধ, দ্রবীভূত এবং কঠিনতাপ্রাপ্ত হয় না কেন? এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, সূর্য্যের ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াগুলি সূর্য্যেরই গুণগত না হইয়া, যে দ্রব্যের উপর যে ক্রিয়াটী নিষ্পন্ন হয়, তাহা সেই দ্রব্যেরই প্রকৃতিবশে হইয়া থাকে, কিন্তু এরূপ আপত্তি হইতে সংশয়বাদেরই প্রতিষ্ঠা হইবে; যেহেতু কর্দ্দমের কঠিনতা প্রাপ্তি এবং মোমের দ্রবীভবন, কর্দ্দম এবং মোমেরই গুণ বলিয়া, ঐ দুই দ্রব্যকে অর্থাৎ কর্দ্দম ও মোমকেও, সূর্য্যের মত, উহাদের অবস্থান্তরের কারণ বলিতে হইবে। কর্দ্দমের যদি কাঠিন্য গুণ না থাকিত, তবে কর্দ্দম কঠিন হইত না; মোমের যদি তারল্যগুণ না থাকিত, তবে তাহারও তরল ভাব ধারণ সম্ভব হইত না। যদি বলি, এরূপ অবস্থাভেদের প্রকৃত কারণ, সূর্য্যরশ্মি এবং দ্রব্যসমূহের সংস্পর্শ (contact) তাহা হইলে,এই 'সংস্পর্শ' বা কণ্ট্যাক্ট লইয়াও গোল বাধে। কেন না, এই সংস্পর্শই যে কি, তাহা বুঝা যায় না। সংস্পর্শ দুই প্রকারে ঘটিতে পারে; এক, প্রত্যক্ষভাবে; আর এক, অপ্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। পরোক্ষভাবে ধরিতে গেলে সে সংস্পর্শ, সংস্পর্শই নয়; কেননা, উহাতে তৃতীয় বস্তুর ব্যবধান অনিবার্য্য। আর যদি প্রত্যক্ষভাবে ধরা যায়, তাহা হইলেই বা তাহাকে সংস্পর্শ বলা কেন? যে দুই দ্রব্যের সংস্পর্শ, তাহাদের মধ্যে ব্যবধান বা অন্তর না থাকায়, দ্রব্য দুইটী পরস্পরের সহিত মিলিত ও একীভূত হইবে।

বস্তু মাত্রই হয় সক্রিয় না হয় নিষ্ক্রিয়, কিন্তু এই দুই ধর্ম্মের কোনটীই বুঝিবার যো নাই; যেহেতু, নিষ্ক্রিয়ত্বের অর্থ, কমিয়া যাওয়া, জীবনীশক্তির হ্রাস হওয়া। যে যতটুকু নিষ্ক্রিয় বা নিশ্চেষ্ট, তাহাতে সেই পরিমাণে জীবনীশক্তির অভাব। অতএব, একই বস্তু

এক সময়ে জীবিত এবং মৃত বলিতে হইবে, কিন্তু এরূপ উক্তি যে বিরোধাত্মক, তাহাতে সন্দেহ নাই। অধিকন্তু, পরিবর্ত্তনের ধারণা মাত্রেই বিরোধভাব দৃষ্ট হয়। কর্দ্দম কঠিন হয়, মোম কোমল হয়, এরূপ বলাই অসঙ্গত; কারণ, এরূপ বলিবার অগ্রেই ধরিয়া লওয়া হয় যে, কর্দ্দম একাধারে কোমল ও কঠিন, মোম একাধারে কঠিন ও কোমল। অর্থাৎ, একই দ্রব্য একবার জীবিত, একবার মৃত; একবার আছে, একবার নাই; এইরূপ বলা হইতেছে। সুতরাং পরিবর্ত্তনের (becoming এর) সংস্কারই ভ্রমসঙ্কুল। আবার পরিবর্ত্তন বলিয়াই যদি কিছু না থাকে, তবে কার্য্যকারণ সম্বন্ধও নাই, এবং কার্য্যকারণ সম্বন্ধের অভাবে পরিবর্ত্তনও থাকিতে পারে না।

ইনিসিডিমাসের মৃত্যুর প্রায় শত বৎসর পরে, অ্যাগ্রিপ্পা (Agrippa) নামে আর এক সংশয়বাদীও ধারণা সমূহের ব্যক্তিগত ভাব ও পরস্পরের সাপেক্ষত্ব, দার্শনিকদিগের মতদ্বৈধ, কল্পনার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, বৃত্তাকারে বিচার পদ্ধতি * (Reasoning in a circle), 'নিলজিজম' বা ত্র্যবয়ব বিচার-বাক্য সম্মত মীমাংসা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করতঃ তর্কশাস্ত্রের অসারতা দেখাইয়াছিলেন।

সেকস্টাস্ এম্পিরিকাস (Sextus Empiricus) সর্ব্বশেষ এবং সর্ব্বাপেক্ষা গোঁড়া সংশয়বাদী। ৩০০ খ্রীঃ অব্দের কাছাকাছি সময়ে তিনি আলেকজান্দ্রিয়া নগরে বাস করিতেন। তাঁহার রচিত দুইখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। পুস্তক দুইখানির নাম, (১) পির্হোণিক হাইপোটিপোসেস্' (Pyrrhonic Hypotyposes) বা পির্হোর স্পষ্টবাদিতা এবং (২) গণিত শাস্ত্রজ্ঞদিগের যুক্তিখণ্ডন (Against the Mathematicians)। বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে, বিজ্ঞানের মূল সূত্র গুলির সহিত জ্যামিতিক সাদৃশ্যবশতঃ বিজ্ঞানশাস্ত্রেই বস্তুতন্ত্রবাদের গোঁড়ামি চিরকালের জন্য আশ্রয় লাভ করিয়াছে। বিজ্ঞানের আবরণে আবৃত বলিয়াই শাস্ত্র সমূহের অসারতা ধরা পড়ে না। এই বিজ্ঞান যে কেবল ব্যাকরণ, ভাষা, সঙ্গীত, জ্যোতিঃশাস্ত্র এবং দর্শনের অনিশ্চয়তাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, তাহা নহে; বিজ্ঞানের দ্বারা সংখ্যা গণিত (Arithmetic) এবং জ্যামিতি শাস্ত্রেও অনিশ্চয়তা স্থান পাইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, জ্যামিতিক রেখা একাধারে বিস্তারবিশিষ্ট এবং বিস্তারবিহীন বিন্দু সমষ্টি। বিস্তারবিহীন বিন্দুর সমষ্টি যেমন বিজ্ঞানের মতে কল্পনা বহির্ভূত, বিস্তারবিশিষ্ট রেখাও তেমনি জ্যামিতিশাস্ত্রে অগ্রাহ্য। বস্তুতঃ কি কল্পনাক্ষেত্রে, কি কার্য্যক্ষেত্রে, কোন স্থলেই বিজ্ঞান নিশ্চয়ার্থ প্রতিপাদক নয়;—সমস্তই অনিশ্চিত ও বিরোধভাবাপন্ন। অঙ্ক, ন্যায়শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র,—কোন শাস্ত্রই এই সংশয়, অনিশ্চয়তা এবং বিরোধের হাত হইতে মুক্তি পায় নাই। এম্পিরিকাসের এইরূপ উক্তির সহিত পির্হোর মতের অনৈক্য দৃষ্ট হইবে। তাহার কারণ, পির্হো এ কথা বলেন নাই যে, বিজ্ঞান মাত্রই অনিশ্চয়াত্মক; যেহেতু, এরূপ উক্তিতেও গোঁড়ামি প্রকাশ পায়। পির্হো একেবারেই গোঁড়ামিবর্জ্জিত ছিলেন। প্রকৃত সংশয়বাদে কোন প্রকারের স্বাভিমত স্থান পাইবে না। যদি কেহ বলেন,

* স্টোয়িকগণ জগতের পূর্ণতা হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব হইতে জগতের পূর্ণতা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন।

বস্তুতত্ত্ব বা পরমার্থের জ্ঞানলাভ একেবারেই অসম্ভব, তাহা হইলেও তিনি গোঁড়ামতাবলম্বী। পিরোমতাবলম্বীগণ এইজন্যই নব্য-অ্যাকাডেমির সংশয়বাদকে ভ্রান্তমত বলিয়াছেন। কেন না, শেষোক্ত মতে অধ্যাত্মশাস্ত্র হইতে তত্ত্বজ্ঞানলাভ একেবারেই সম্ভব নয়। যিনি প্রকৃত সংশয়বাদী, তিনি কোন বিষয়েই নিশ্চয়ার্থবোধক মত প্রকাশ করিতে পারেন না। এরূপ সংশয়বাদের উপকারিতা এই যে, সর্ব্ববিষয়ে অপক্ষপাত আচরণের ফলে, সম্পূর্ণরূপ ঔদাসীন্য বা নির্ব্বেদ ভাব না জন্মিলেও, এমন এক সাম্যভাবের উদয় হয়, যাহাতে মানবগণ সংসারে থাকিয়া শান্তিলাভ করিতে পারে।

ষ্টোয়িক এবং এপিকিউরীয়দিগের ন্যায়, সংশয়বাদিগণও কল্পনাপেক্ষা কর্ম্মের প্রতি অধিক অনুরাগ প্রকাশ করিতেন, এবং কর্ম্মজগতে অভীষ্ট (সুখ) লাভের জন্য তত্ত্বচিন্তা হইতে একেবারে বিরত থাকা প্রয়োজন বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। তাঁহাদের দর্শনমতের কোন বিশিষ্ট পদ্ধতি ছিল না। সময়ে সময়ে তাঁহারাও গোঁড়ামির প্রতি প্রলুব্ধ হইতেন, তবে সে গোঁড়ামি নিজেদেরই সংশয়বাদ সম্বন্ধে। সংশয়বাদও সংশয়ের হাত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। সত্ত্বশাস্ত্রের আলোচনা হইতে বিরত থাকিয়া তাঁহারা ক্রমান্বয় স্ব স্ব মন্তব্যগুলিকেও আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে, মূল সংশয়বাদ ক্রমশঃ শিথিল হওয়ায়, সংশয়ের স্থলে পুনরায় সম্ভাবনার উদয় হয়; অর্থাৎ, সন্দেহের নাস্তিত্বভাব কাটিয়া যাওয়ায় আস্তিকতার সূত্রপাত হইয়াছিল।

বিজ্ঞানের উন্নতি।

(Scientific Movement.)

অবনতির পথে অবতরণ করিতে করিতে গ্রীকদর্শন যে সময়ে নিরস কঠোর সন্দেহবাদে পরিণত হয়; সেই সময়েই ভূমধ্যসাগরের দ্বীপাবলী এবং মিশরদেশে বিজ্ঞানের প্রভূত চর্চ্চা হইতেছিল। গ্রীস যখন বর্ব্বরতার গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন, তখনই মিশরে প্রথম অঙ্কশাস্ত্রের আবির্ভাব হয়। তবে, তৎকালে জড়বিজ্ঞান সমধিক প্রসারলাভ করিতে পারে নাই; তাহার কারণ, ইন্দ্রিয়গণ প্রতারণাপরায়ণ এবং বিচারবুদ্ধির দ্বারা ইন্দ্রিয়জের ভ্রমসংশোধন হয় না, দর্শনের ন্যায় জড়বিজ্ঞানেও এইরূপ সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। বাধা জন্মিবার আরও কারণ এই যে, গ্রীকগণ স্বভাবতঃ চঞ্চলমতি বলিয়া, বৈজ্ঞানিক সত্য নিরূপণের একমাত্র উপায় স্বরূপ অবধারণ (Observation) এবং পরীক্ষা (Experiment) সম্বন্ধে যে ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তজ্জন্য তাঁহারা যথোচিত কালক্ষেপ করিতে অসমর্থ ছিলেন। পক্ষান্তরে, তাঁহারা প্রখর চিন্তাশক্তি প্রভাবে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার ও তৎসংক্রান্ত তর্ক মীমাংসা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন; এজন্য জড়বিজ্ঞানের পথে যতই বিঘ্ন থাকুক, বিশুদ্ধ গণিত এবং গণিতবিজ্ঞানের যে শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি ঘটিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই দুইটী বিষয় প্রধানতঃ তর্কশাস্ত্রের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, এবং ইহারাই কেবল সেকালের সেই সর্ব্বগ্রাসী সংশয়বাদের হাতে পরিত্রাণ পায়। অভিজ্ঞতার প্রবল ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও 'দুই' আর 'দুই'য়ে যে 'চারি' হয়, এবং ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি যে দুই সমকোণের সমান, তাহা অস্বীকার করিবার যো ছিল না।

সিসিলিদ্বীপে তখনও পিথাগোরীয় সিদ্ধান্ত সমূহ একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। খ্রীঃ পূঃ আনুমানিক তৃতীয় শতাব্দে সাইরাকিউজবাসী হিকেটস্ (Hicetas) এবং আর্কিমিডিজ্

(Archimedes), একপ্রকার জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রচার করেন, যাহার সহিত কোপার্ণিকাসের মতের মিল ছিল। আর্কিমিডিস্ কর্তৃক জড়বিজ্ঞানে আপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপণের উপায় উদ্ভাবিত হয়। তদ্ব্যতীত, তিনি আতসী কাঁচ (Sun-glass) এবং লেভার যন্ত্রের সাহায্যে ব্যবহারিক বিজ্ঞানেরও (Science of mechanics) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই সময়েই পিথাগোরাসের স্বদেশবাসী সামোস নগরের আরিষ্টারকাস্ (Aristarchus) প্রচার করেন যে, পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্র নহে ; পরন্ত, পৃথিবীই সূর্যমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। ব্যাবিলোনিয়ার অন্তর্গত সিলিউসিয়াবাসী সিলিউকস (Selucus) আরিষ্টারকাসের নূতন মত গ্রহণ করতঃ তাহার পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ষ্টোয়িকগণ উহাকে বিধর্ম্মীর মত বলিয়া উপেক্ষা করেন এবং আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ স্বয়ং টোলেমী কর্তৃকও উহা পরিত্যক্ত হয়। বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভে কোপার্ণিকাস, কেপলার এবং গ্যালিলিও যতদিন না আরিষ্টারকাসের মতের সমর্থন করিয়াছিলেন, ততদিন অ্যারিষ্টটলের মতানুসারে পৃথিবীকেই জগতের কেন্দ্র বলিয়া গণ্য করা হইত। ইহাই অ্যারিষ্টটলের 'জিওসেন্ট্রিক্ সিষ্টেম্'।

সিসিলি দ্বীপের অপর দিকে ভূমধ্যসাগরের তীরে, খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভুবনবিজয়ী আলেকজান্দার কর্তৃক আলেকজান্দ্রিয়া নগর স্থাপিত হয়। আলেকজান্দ্রিয়া নগরই টোলেমীদিগের অদম্য উৎসাহে বাণিজ্য ব্যবসায় এবং শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিল। প্লেটো এবং অ্যারিষ্টটলের ভৌতিক আত্মা এথেন্সের সম্প্রদায় সমূহের প্রতি বিরূপ হইয়াই যেন এইস্থানে নবজীবন লাভ করে। এথেনীয়গণ স্বয়ং বিজ্ঞানরাজকেই নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন ; তাহার ফলে এথেন্সের সৌভাগ্য-রবি চিরকালের মত অস্তমিত হয়। অ্যারিষ্টটলের শক্তি প্রথমে তাঁহার শিষ্য আলেকজান্দারের আত্মায় সংক্রমিত হইয়াছিল, পরে উহা টোলেমীতে এবং টোলেমীর পর, তদীয় বংশধরগণে বিকাশলাভ করে। মিশরের নূতন রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়ায় তাঁহারা যে জাদুঘর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহা পৃথিবীর অপূর্ব্ব সৃষ্টি। বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে এইস্থানে যে বিরাট ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার সহিত কোন বিষয়েরই তুলনা হইতে পারে না। চতুষ্পার্শ্বস্থ রাজ্যসমূহ হইতে বিভিন্ন জাতীয় সহস্র সহস্র শিক্ষার্থী জ্ঞানলাভের জন্য এইস্থানে সমবেত হইতেন এবং তাঁহাদের সমস্ত ব্যয়ভার রাজসরকারই বহন করিতেন। এখানে উদ্ভিদ্ বিদ্যার উন্নতিকল্পে বোটানিক্যাল গার্ডেন ছিল ; প্রাণীবিজ্ঞানের উৎকর্ষ হেতু অসংখ্য পশুপক্ষী সংগৃহীত হইত এবং ব্যবচ্ছেদ-গৃহও নির্ম্মিত হইয়াছিল। জ্যোতিঃশাস্ত্রের আলোচনাকল্পে প্রকাণ্ড মানমন্দির ছিল, এবং ভাষাশিক্ষার জন্য চতুষ্পাঠীরও অভাব ছিল না। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এখানকার প্রকাণ্ড পুস্তকাগারে সাতলক্ষ পুস্তক স্থান পাইয়াছিল। এই আলেকজান্দ্রিয়া নগরেই ইউক্লিড ২৯০ অব্দে জ্যামিতি শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ, যথা সঙ্গীত শাস্ত্রবিষয়ক 'হারমনি' (Harmony), আলোক বিষয়ক 'অপ্‌টিকস্' এবং প্রতিবিম্ব সংক্রান্ত 'ক্যাটপ্‌ট্রিকস্' (Catoptrics)ও এইস্থানে রচিত হয়। রাজকীয় পুস্তকাধ্যক্ষ ইরেটোস্থিনিস্ (Eratos-

thenes) এই আলেকজান্দ্রিয়া নগরেই ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং জ্যোতিঃশাস্ত্র সংক্রান্ত তত্ত্বনিরূপণের জন্য অমিত অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। পারগার অ্যাপোলোনিয়াস এই স্থানেই তাঁহার বক্ররেখাগণিত 'কণিক্‌সেকশন' সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী রচনা করেন। অ্যারিষ্টিলাস (Arystillus) এবং টাইমোকেরাস (Timocharus)ও এইস্থানে অবধারণ যোগে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহারই বলে জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ হিপ্পার্কাস (Hipparchus) 'ইকুইনোক্স' বা বৎসরের কোন্ কোন্ দিন দিবারাত্র সমতা প্রাপ্ত হয়, তাহার নির্দ্ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন। টোলেমীর 'আল্‌মাজিষ্ট' (Almagest) নামক সুবৃহৎ গণিত ও জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান এবং তদীয় ভূগোলশাস্ত্রও এই আলেকজান্দ্রিয়া নগরেই রচিত হইয়াছিল। কোপার্ণিকাসের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই আলমাজিষ্ট গ্রন্থের অটুট প্রভাব ছিল, এবং তাঁহার ভূগোলশাস্ত্র চৌদ্দশত বৎসর যাবত ইউরোপীয় বিদ্যালয় সমূহে পঠিত হয়। পৃথিবীর গোলত্ব, সুমেরু-কুমেরু বৃত্ত, মেরুদণ্ড, বিষুবরেখা, উত্তর-দক্ষিণ প্রান্তপ্রদেশ, দিবারাত্রের সমতাসূচক বিন্দু, অয়নান্তবিন্দু (Solstices) দেশভেদে আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন, প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল ধারণা বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে, এই সময় হইতেই তাহাদের সূত্রপাত হইয়াছিল।

রাজদরবারের বদান্যতায় এই সময়ে ভাষা এবং কলাবিদ্যারও যথেষ্ট উন্নতি হয়। সাহিত্য ও সাহিত্যেতিহাস, ভাষাতত্ত্ব ও সমালোচনা, ইহাদের প্রত্যেকেই বিজ্ঞানের আসন গ্রহণ করে। ইহুদী বাইবেল গ্রন্থ এবং অন্যান্য প্রাচ্যদেশ-সম্ভূত গ্রন্থাবলী গ্রীক-ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত, বৌদ্ধ এবং ইহুদী, গ্রীক এবং মিশরী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমতের আদান-প্রদান চলিতে থাকে। এই সকল কারণে একদিকে যেমন আপেক্ষিক ধর্ম্মশাস্ত্রের (Comparative Theology) পুষ্টিসাধন হয়, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন ধর্ম্ম বিশ্বাসের মিলন হইতে একপ্রকার নূতন ধর্ম্মের উদয় হইয়াছিল, যাহাকে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় 'একলেক্টিসিজম্' বলা যাইতে পারে এবং যাহার ফলে প্রাচীন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় পরস্পরের সহানুভূতিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীদিগ্বিজয় রায়চৌধুরী।

পাপের বোঝা।

(প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।)

ইস্লাম-ভূপতি খলিফা ওমর
গুণী জ্ঞানী, বীরবর ;
রাজনীতি সনে ধর্ম্মের প্রচারে
শ্রেষ্ঠ হ'তে শ্রেষ্ঠতর।

অসীম তাঁহার পৌরুষ, প্রতাপ,
উদার শাসন-রীতি ;
আত্মবন্ধু জনে বিশ্বস্ত হৃদয় ;
অনুগতে চিরপ্রীতি।

বুঝিতেন ভূপ রাজত্ব মাঝারে
দুঃখ ক্লেশ, অত্যাচার
হয় অনুদিন ঔদাস্যে নৃপের
ক্রমেতে বর্দ্ধিতাকার।
থাক্ ধন, মান, দীনতা রাজার
শ্রেষ্ঠ সবাকার হ'তে ;
ছদ্মবেশে তাই ভ্রমিতেন ভূপ
নগর পল্লীর পথে।
হ'তেন বাহির হেরিবার তরে
রাজ কর্ম্মচারিগণ
কোথা ন্যায় ধর্ম্মে করি অনাদর
করে স্বার্থ অন্বেষণ।
প্রজাপুঞ্জ তাঁর ব্যথিত কোথায়
প্রবলের অত্যাচারে ;
অর্থ-লোলুপতা, স্বার্থ পক্ষপাত
উৎপীড়ন, অবিচারে।
পায়নাত দণ্ড নির্ব্বিরোধিজন,
পাপীত লভে না মুক্তি ;
বিরলে, গোপনে ক্রূরকর্ম্মাজন
করেনাত পাপযুক্তি।
ভাবেনাত মনে প্রজাগণ তাঁর
সম্রাট হৃদয়হীন ;
হৃদয় তাদের সিংহাসন হ'তে
প্রিয় তাঁর নিশিদিন।
বিলাসী মানবে, অত্যাচারী জনে
নিদারুণ ঘৃণা তাঁর ;
ভাবিতেন যেন পারি বহিবারে
বিধি-দত্ত এই ভার।
হেন নৃপতির রাজছত্র তলে
নিরুদ্বেগ শান্তি ল'য়ে ;
দস্যু-ভীতিহীন মহারাজ্য তাঁর
থাকিত নিঃশঙ্ক হয়ে।
রাজধর্ম্ম ভাতি সুগৌর ললাটে,
জয়লক্ষ্মী বাহুপরে ;
জ্ঞানের প্রসারে হৃদয় উদার,
করুণায় নেত্র ঝরে।
রাজ-গুণ স্মরি সৌভাগ্য-গর্ব্বিত
প্রজাগণ পরস্পর ;
কহিত মোদের ভূপতি প্রতাপে
সূর্য্য হ'তে খরতর।
সুহৃদ্ হ'তেও তিনি আপনার,
ভক্তি পাত্র পিতা হ'তে ;
সন্তান হতেও স্নেহের পুতলি,
উপদেষ্টা ধর্ম্মব্রতে।
নৃপ-গুণ মুগ্ধ নরনারী সবে
মুক্তকণ্ঠে নিরবধি
কহিত মোদের রাজ রাজেশ্বর
ঈশ্বরের প্রতিনিধি।
একদা ভূপতি দিবা দ্বিপ্রহরে
পথিকের ছদ্মবেশে
গেলেন ভ্রমণে দরিদ্র পল্লীতে
নগরের প্রান্তদেশে।
কেবা অন্নহীন, নিরাশ্রয় কেবা,
জীর্ণ, ভগ্ন কার দেহ ;
যথা শক্তি ভূপ দিবেন বাসনা
যার যাহে হয় শ্রেয়।
পল্লীপ্রান্তে এক কুটীরের দ্বারে
দাঁড়ালেন ভূপ ধীরে ;
দেখিলেন শীর্ণ বালক, বালিকা
একটী নারীরে ঘিরে
"আর দেরি কত বড় ক্ষুধা যে মা।"
বলি করে কোলাহল ;
রমণী গোপনে ছিন্নবাসে মুছে
অভাবের অশ্রুজল।
চুল্লীর সম্মুখে বসিয়া রমণী
তৃণ কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালি
মৃৎপাত্র স্থাপিয়া শুধু মাত্র জল
তাহাতে দিয়াছে ঢালি।

হল দণ্ড গত নীরব রমণী,
ফুটিছে শুধুই জল ;
"হল কি মা!" বলি শিশুগণ তার
তুলে মুহু কোলাহল।
হেন কালে রাজা অন্তরাল হ'তে
সম্মুখে দাঁড়াল আসি ;
সুধাল নারীরে "ওকি মা জননি!
যেন মমতায় ভাসি।
"অই পাত্র মাঝে ফুটে শুধু বারি,
আহার সামগ্রী কই ?"
করুণা-কাতর হেরি আগন্তুকে
কহে নারী স্নেহময়ী—
"কি কহিব, ভদ্র! প্রায় বর্ষকাল
গত পতি স্বর্গবাসে ;
অভাব-তাড়নে পুত্র কন্যা ল'য়ে
মরিতেছি নিরাশাসে।
তুমি দয়াবান দেখি হয় বোধ,
তোমারে কহি গো তাই ;
অনাহারী শিশু দুই দিন মোর
কিছুই উপায় নাই।
জ্বলন্ত ক্ষুধায় তপ্ত শিশু চায়
তুষিতে তাদের মন,
কঠিন পরাণে ওদের ছলিয়া
করেছি এ আয়োজন।
এই পাত্রে বারি থাকিলে ফুটিতে
তবুও বুঝিবে সবে,
আহার উদ্যোগ করিছেন মাতা,
ক্ষণেক সুস্থির রবে।"
মুছি আঁখি জল কহিলা রমণী,
"আশায় আশায় প্রাণ,
রেখেছি এমনি না হয় যদিন
দুঃখ দৈন্য, অবসান।"
নেত্র-প্রান্ত হ'তে বারি-বিন্দু মুছি
নৃমণি চলিলা ধীরে ;
ক্ষুধার তাড়নে কাঁদে শিশু হায়
বিধবা মায়েরে ঘিরে।
আসিয়া প্রাসাদে বিশ্রামবিহীন
নরপতি নিজ করে,
শর্করা, গোধূম, সুপক্ক খর্জুর
লইলা থলিকা ভরে।
আপনার পৃষ্ঠে চাপায়ে বোঝাটী
আসিলেন দ্বার-পথে ;
ছুটিয়া আসিল শত অনুচর,
প্রহরী দুয়ার হ'তে।
"একি একি প্রভো।" ডাকি কহে সবে
"হেন দৃশ্য হেরি কেন ?
মোরা আছি, তবু রাজরাজেশ্বর
বোঝা বহিছেন হেন!
একবার প্রভু করুন আদেশ
সহস্র সহস্র দাস
অবনত শিরে বহিবে এ বোঝা
ধন্য হ'বে অভিলাষ।"
হাসিয়া সস্নেহে ডাকি অনুচরে
শান্ত স্বরে রাজা ক'ন,
"হয়োনাক ক্ষুণ্ণ, তোমাদের ক্রটি
নাহি কিছু, বন্ধুগণ!
জানি আমি জানি বচনে আমার
শত ভক্ত অনুচর
লইবারে পারে শত গুণ বোঝা
এরও হ'তে ক্লেশকর।
কিন্তু, বন্ধুগণ! যে পাপ আমার
বাড়িয়াছে পলে পলে,
তার বোঝা বল বহিতে কি পারে
কোটী জন হেন হ'লে ?
রাজ্য মাঝে মোর দরিদ্রা অনাথা
শিশু পুত্র কন্যা সনে,
ভাসি অশ্রুজলে দুই দিন আজ
রহিয়াছে অনশনে।

আমার পাপের আমারি এ বোঝা,
আমিই বহিয়া তাই
আমার রাজার আদেশ পালিয়া
পাপমুক্ত হ'তে চাই।"

সে ভার আমার আর(ও) গুরুতর
সে পাপ বিষম অতি ;
প্রজার পালন না করিলে রাজা
এই দণ্ড রাজনীতি।

শ্রীমতী শৈলবালা বসু।

জড়ের মূল-উপাদান। (৩)

কালক্রমে বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইল। তাপ ও আলোক, তাড়িত ও চৌম্বক শক্তি নূতন নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বৈজ্ঞানিকের গবেষণার পথে নূতন নূতন দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। ইহাদের প্রকৃতি অনুসন্ধানে বিজ্ঞান জগতের সমস্ত শক্তি প্রযুক্ত হইল। নূতন সৌন্দর্য্যের মোহে লোকে পুরাতনের কথা বিস্মৃত হইল। স্থূল জড়ের স্থূল উপাদানের কথা কতকটা চাপা পড়িয়া গেল—জড়ের উপাসনা ছাড়িয়া লোকে শক্তির উপাসনা ধরিল। বৈজ্ঞানিকগণ ক্রমে দেখিতে পাইলেন, শুধু জড় নহে, জড় জগতে শক্তিও অবিনশ্বর। দেখিতে পাইলেন তাপ, আলোক, তাড়িত, ইহারা সকলেই যেন শক্তির এক একটা বিশিষ্ট মূর্ত্তি। পণ্ডিতগণ শক্তির লীলা-বৈচিত্র্যের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন।

ফলে, শক্তির উপাসনা ধরিয়া বৈজ্ঞানিকগণ একটা নূতন রাজ্যের সাক্ষাৎ পাইলেন। আলোকের প্রকৃতি অনুসন্ধানের ফলে ইহারা দেখিতে পাইলেন, আমাদের চিরপরিচিত এই স্থূল জড়পদার্থ গুলিই জগতের একমাত্র পদার্থ নহে। ইহাদিগকে ঘিরিয়া একটা বিশাল জগৎ রহিয়াছে—একটা বিশালতর পদার্থ রহিয়াছে—যাহার সহিত পরিচয় স্থাপন নিতান্তই আবশ্যক। পণ্ডিতগণ বিশ্বব্যাপী এক সূক্ষ্ম পদার্থের অস্তিত্ব স্পষ্ট উপলব্ধ করিলেন।

তাঁহারা দেখিলেন, আলোককে জড় পদার্থ বলা চলে না, কেন না আলোতে আলোতে কাটাকাটি ঘটে—আলোতে আলোতে মিলিয়া আঁধার হয়। আরও দেখিলেন, আলোকের সমস্ত ধর্ম্মের মূলেই একটা ওঠা-নামার ভাব—একটা আন্দোলনের ভাব—একটা তরঙ্গের ভাব নিহিত রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলিলেন, আলোক জড়ধর্ম্মী নহে—তরঙ্গধর্ম্মী, আলোক জড় নহে, উহা একটা বিশিষ্ট পদার্থের তরঙ্গ মাত্র। তাঁহারা এই বিশিষ্ট পদার্থটার নাম দিলেন ঈথর। তাঁহারা দেখিলেন, যতদূর এই জড় জগৎ, আলোকের প্রভাবও ততদূর বিস্তৃত। তাঁহারা বলিলেন, ঈথর বিশ্বব্যাপী। ঈথর স্থূলেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, কিন্তু উহা সর্ব্বব্যাপী—উহা জড়ের ভিতর ও বাহির, সমগ্র স্থান ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। এই ব্যাপ্তি ফাঁকশূন্য ব্যাপ্তি—ইহাতে ক্রমভঙ্গ নাই। ঈথরের গঠন জড়ের ন্যায় নহে,—উহার গঠন আণবিক গঠন নহে; ঈথর কণাময় নহে, নিরবচ্ছেদে এক। বৈজ্ঞানিক ক্রমে দেখিলেন, শুধু আলোক নহে, তাপ ও তাড়িত ও চৌম্বক শক্তির মূলেও এই একই ঈথর রহিয়াছে—উহারাও ঈথরেরই ক্রিয়া বিশেষ

মাত্র। ঈথরকে আশ্রয় করিয়াই শক্তি আলোক-তরঙ্গরূপে এক জড় হইতে অন্য জড়ে সঞ্চালিত হইয়া থাকে, আবার ঈথরকে অবলম্বন করিয়াই শক্তি, তাপ ও তাড়িতের মূর্ত্তিতে ফুটিয়া ওঠে।

বৈজ্ঞানিকগণ দেখিলেন, শক্তির আধার শুধু জড় নহে, শক্তির আধার ঈথরও বটে। ফলে, যাহা শক্তির আধার, তাহাকে জড় বলিলে ঈথরও জড়-পদবাচ্য হয়—অতীন্দ্রিয় হইলেও ঈথরে জড়ত্ব আরোপ করিতে হয়।

পণ্ডিতগণ দেখিলেন, জড়কে ছাড়িতে চাহিলেই ছাড়া যায় না, শক্তি গর্ব্বে জড়কে ভুলিতে পারা যায় না। ভোগাত দূরের কথা, এতদিন যাহা কেবল এক মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া আসিতেছিল, এখন হইতে তাহাকে দুই মূর্ত্তিতে ধ্যান করিতে হইবে। এতদিন কেবল জড়ের উপাদান লইয়া মাথা ঘামাইতে হইয়াছিল, এখন আবার ঈথরের উপাদানের অন্বেষণে নূতন পথে যাত্রা করিতে হইবে। পদার্থবিদ্যা শাস্ত্রকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় ভরসা দিলেন লর্ড কেলবিন। লর্ড কেলবিন পণ্ডিতগণের এই বিপদ-সাগরে কর্ণধার হইলেন।

কেলবিন বলিলেন, দেখ জড় ও ঈথর বিভিন্ন পদার্থ নহে—উহারা মূলে এক। ঈথর এক, জড় বহু, কিন্তু এই এক হইতেই এই বহুর উৎপত্তি ঘটিয়াছে। ঈথরই মূল পদার্থ, জড় ঈথর হইতেই অভিব্যক্ত, ঈথরেই লিপ্ত। জড়ের মূল উপাদান একটী মাত্র, উহা ঈথর। ঈথরই শক্তি-সহযোগে জড়মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। শক্তি সহযোগে ঈথর-সাগরে তরঙ্গের উৎপত্তি ঘটে—আলোক-তরঙ্গ বা তাড়িত তরঙ্গের উৎপত্তি ঘটে; আবার শক্তি সহযোগে ঈথর-সাগরে কতকগুলি আবর্ত্তেরও উৎপত্তি ঘটিয়াছে। এই আবর্ত্তগুলি ঠিক কোন্ সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে, বলিতে পারা যায় না, কিন্তু উহাদের ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। ঈথরের এই আবর্ত্তগুলিই জড়পদার্থ। এক একটী আবর্ত্ত এক একটী পরমাণু—এক এক রকমের আবর্ত্ত লইয়া এক এক রকমের পরমাণু। আবর্ত্ত ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির, তাই শত ধর্ম্মের শত পরমাণু। জড়ের মূল উপাদানের সংখ্যা অনন্ত নহে, শতও নহে—একমাত্র। এই মূল উপাদান কণাময় নহে, নিরেট। মূল উপাদানে রূপভেদও নাই, সংখ্যাভেদও নাই; উহা রূপ ও নামের সমাধি এবং উহাই রূপ ও নামের আকর। মূলে একরূপ, একসংখ্যা অথবা মূল রূপহীন ও সংখ্যাহীন। রূপের উপর সংখ্যা ফলাইয়া জড়জগৎ নির্ম্মিত হয় নাই—নির্ম্মিত হইয়াছে, অরূপের উপর শক্তি ফলাইয়া। শক্তিযোগে অরূপ সরূপ হইয়াছে, শক্তি সহযোগেই এক বহু হইয়াছে। যে প্রণালীতে রূপের উদ্ভব, সেই প্রণালীতেই সংখ্যারও উদ্ভব। রূপের সঙ্গেই সংখ্যার উৎপত্তি এবং সংখ্যার সঙ্গেই রূপের উৎপত্তি। কেবল রূপ আর রূপ লইয়া জগৎ নহে, কেবল সংখ্যা আর সংখ্যা লইয়াই জগৎ নহে, জগৎ উভয়কে লইয়াই এবং উভয়ই আবার রূপহীন ও সংখ্যাহীনের উপর শক্তির লীলাখেলা লইয়া। শক্তির লীলা-বৈচিত্র্যই সকল বিচিত্রতার মূল।

লর্ড কেলবিনের এই অভিব্যক্তিবাদ বিজ্ঞান জগতে যতটা সম্মান লাভ করিয়াছে, ততটা আদর লাভ করিতে পারে নাই। এই অভিব্যক্তিবাদের উৎপত্তি কেলবিনের অন্তঃদৃষ্টি হইতে এবং ইহার স্বপক্ষে যুক্তিগুলি শুধু উপমামূলক—পরীক্ষালব্ধ সত্যের উপর ইহার ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইল না। ফলে, বৈজ্ঞানিক-

গণ এই মতের উপর ততটা আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। স্বয়ং কেলবিনও পারেন নাই। মতটা সত্য হইলেই বেশ হয়, কিন্তু উহা যে প্রকৃতই সত্য, তাহার প্রমাণাভাব।

পণ্ডিতগণ দেখিলেন, সকল বৈচিত্র্যের মূলে শক্তির লীলাখেলা, শক্তি লইয়াই আসল কারবার, জড় বুঝিতে হইলেও শক্তি বুঝিতে হয়। কাজেই জিজ্ঞাস্য হইল, শক্তির প্রকৃত মূর্ত্তি কি, —শক্তি প্রকৃতই বহু না মূলতঃ এক? তাপ ও আলোক, তাড়িত ও চৌম্বক শক্তি, ইহাদের প্রকৃত রূপ কি? ইহারা বিভিন্ন প্রকৃতিরই বটে, না মূল প্রকৃতি সকলেরই এক? জড় সম্বন্ধে যে প্রশ্ন শক্তিসম্বন্ধেও সেই প্রশ্ন। একটা প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে উভয় প্রশ্নেরই মীমাংসা চাই। শক্তিতত্ত্ব আরও ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে হইবে, নতুবা জড়তত্ত্ব বুঝা চলিবে না। ফলে শক্তির বিভিন্ন মূর্ত্তি লইয়া—তাপ ও আলোক, তাড়িত ও চৌম্বক শক্তির মূল প্রকৃতি লইয়া গবেষণা চলিতে থাকিল।

তাপ প্রয়োগে ঠাণ্ডা জিনিস গরম হয়—স্পর্শে বুঝি গরম হয়। আরও তাপ প্রয়োগে জিনিসটা আরও গরম হয়। খুবই গরম হইলে দেখিতে পাই, উহা আলোকও বিকীরণ করিতে থাকে। এখন স্পর্শেও কিছু বুঝি, চোখেও কিছু দেখি। স্পর্শে যাহা বুঝি তাহাকে যদি তাপ বলি, চোখে যাহা দেখি, তাহাকে তাপ না বলিয়া আলোক বলি কেন? তাপ ও আলোক এক না দুই? অন্ধকার দূর করিতে আলো জ্বালি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাপওত পাই। আবার ভাত রাঁধিতে আগুন জ্বালি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আলোকওত পাই। সূর্য্য কিরণে আলোক ও তাপ, দুই রহিয়াছে। তাপের সহিত আলোকের এত সখ্যভাব কেন? হইতে পারে, মূলে একটা পিতৃভাব নিহিত রহিয়াছে, তাই উভয়ের মধ্যে এই ভ্রাতৃভাব।

নিউটন বহুপূর্ব্বেই দেখাইয়াছিলেন, আমরা সূর্য্য হইতে যে সাদা আলোক পাই, প্রকৃত পক্ষে ঐ আলোক একরঙ্গা নহে। সাদা রং একটা মূল রং নহে—উহা রংই নহে, বহু রংএর সমষ্টি। নিউটন দেখাইয়াছিলেন, শুধু একখানা কাঁচের কলমের সাহায্যে সূর্য্যের সাদা আলোক বিশ্লিষ্ট করিতে পারা যায়—দেখাইয়াছিলেন, মিশ্র আলোকের বিশ্লেষণ ঘটাইবার পক্ষে একটা কাঁচের কলম, খুব এক খানা ধারাল অস্ত্রের কাজ করে। ইহার সাহায্যেই নিউটন দেখাইয়াছিলেন, সূর্য্যের এই সাদা আলোক সহস্র রকমের মূল রং লইয়া। এই মূল রংগুলি যতক্ষণ হাত ধরাধরি করিয়া একই রশ্মিপথে চলিতে থাকে, ততক্ষণ উহাদের রং থাকে সাদা। কাঁচের কলমে ঢুকিলেই উহাদের গন্তব্য পথ বাঁকিয়া যায়। পথ সকলেরই বাঁকিয়া যায়, কিন্তু কাহারও বাঁকায় বেশী কাহারও কম। সবচেয়ে বেশী বাঁকায় ভায়লেট, সবচেয়ে কম বাঁকায় লাল রং এবং পীত, হরিৎ ও নীলের পথ মাঝামাঝি পরিমাণে বাঁকিয়া যায়। ফলে এই মূল রংগুলি ফাঁক ফাঁক হইয়া পড়ে এবং একটা বর্ণছত্রের উৎপত্তি হয়। এই বর্ণ ছত্রের এক প্রান্তে থাকে লাল, অপর প্রান্তে থাকে ভায়লেট এবং মধ্যে থাকে পীত, হরিৎ, নীল ইত্যাদি। মূল রং গুলি এইরূপে ফাঁক ফাঁক হইয়া পড়াতেই উহারা মূল রং বলিয়া ধরা দেয়। এইরূপে নিউটন দেখাইলেন, আলোকেরও উপাদান খোঁজা চলে এবং খুঁজিলে সাদা আলোকের মধ্যে সহস্রাধিক মূল রংএর সাক্ষাৎ

মিশে। চোখে ধরা পড়ে মাত্র ৫।৭টা রং কিন্তু সহস্র পথে যাত্রা দেখিয়া বলিতে হয়, রং শুধু ৫।৭টা নহে, সহস্র রকমের। দুইটা ঈষৎ বাঁকা পথে রং-এর যাহা পার্থক্য, তাহা আমরা চোখে ধরিতে পারি না, কাজেই সহস্র বর্ণের সমষ্টি বর্ণছত্রকে ৫টা বা ৭টা বর্গে ভাগ করিয়া আমাদিগকে দেখিতে হয়।

নিউটন এক রং-এর মধ্যে বহু রং দেখাইয়াছিলেন, নিউটনের পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণ বহু রং-এর পশ্চাতে এক রং দেখিতে প্রয়াসী হইলেন। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, আলোক ঈথরের তরঙ্গমাত্র; দেখিলেন, এক এক রং-এর আলোক এক এক আকারের তরঙ্গ লইয়া—কেহ বড় তরঙ্গ, কেহ ছোট তরঙ্গ, এই যা তফাৎ। এই ছোট বড় ভেদ লইয়াই সহস্র রং কিন্তু মূলে সকল রংই ঈথর তরঙ্গ। নিউটন বর্ণছত্রের বিভিন্ন পথে বিভিন্ন রং-এর আলোক দেখিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণ বর্ণছত্রের ভিন্ন ভিন্ন পথে ভিন্ন ভিন্ন আকারের ঢেউ দেখিতে লাগিলেন। নিউটন বর্ণছত্রের একপ্রান্তে লাল ও অপরপ্রান্তে ভায়লেট দেখিয়াছিলেন, ইহারা লালেরও উপরে উঠিলেন এবং ভায়লেটেরও নীচে নামিলেন। লালের উপরে চোখ রাখিলে দেখা যায়, শুধু অন্ধকার, কিন্তু হাত রাখিলে বুঝা বেশ গরম। বৈজ্ঞানিকগণ বলিলেন, এই তাপের রাজ্যও তরঙ্গের রাজ্য—ছোট, বড় বিভিন্ন আকারের তরঙ্গের রাজ্য। ইহারা বলিলেন, বর্ণছত্র শুধু বর্ণছত্র নহে, উহা তাপছত্রও বটে। বর্ণ শুধু আলোকেরই ধর্ম্ম নহে, বর্ণ তাপেরও ধর্ম্ম বটে। আলোকের ভিন্ন ভিন্ন রং, তাপেরও ভিন্ন ভিন্ন রং; আলোকের রঙ্গে রঙ্গে যে জাতীয় ভেদ, তাপেরও রঙ্গে রঙ্গে সেই জাতীয় ভেদ এবং আলোকের রং ও তাপের রঙ্গেও সেই জাতীয় ভেদ। আলোকের বর্ণও ঈথর-তরঙ্গ লইয়া, তাপের বর্ণও ঈথর তরঙ্গ লইয়া। আলোক-তরঙ্গ ছোট তরঙ্গ, তাপ-তরঙ্গ বড় তরঙ্গ, এইমাত্র ভেদ। ছোট ছোট তরঙ্গগুলি লইয়া আলোকছত্র বা বর্ণছত্র এবং এই ছোট তরঙ্গগুলিরই ছোট বড় ভেদ লইয়া বর্ণছত্রের বিভিন্ন রং। আবার বড় বড় তরঙ্গগুলি তাপছত্র, এই বড় তরঙ্গগুলির ছোট বড় ভেদ লইয়া। তাপছত্রেরও বিভিন্ন রং। আলোকও তরঙ্গ, তাপও তরঙ্গ—একই ঈথরের একই জাতীয় তরঙ্গ। ভেদ যাহা, তাহা শুধু তরঙ্গের আকার লইয়া। সূর্য্য হইতে আলোক ও তাপ আসিতেছে বলা ঠিক হয় না, বলিতে হয়, তরঙ্গ আসিতেছে—ছোট বড় নানা আকারের ঢেউ আসিতেছে। পরীক্ষার ফলে বৈজ্ঞানিকগণ দেখিতে পাইলেন, আলোক ও তাপ মূলে একই পদার্থ, উভয়েই ঈথর-তরঙ্গ; দেখিলেন, আলোক-শক্তি ও তাপ-শক্তি একই শক্তি বটে।

ভল্টা তাড়িত প্রবাহ উৎপন্ন করিবার প্রণালী আবিষ্কার করিলেন। উরস্টেড দেখাইলেন, যখন একটা তারে তাড়িত স্রোত বহিতে থাকে, তখন ঐ তারটার চতুষ্পার্শ্বে একটা চৌম্বক ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়—কতকগুলি চৌম্বক-রেখায় বা বল-রেখায় বা চৌম্বক বল রেখায় তারটাকে ঘিরিয়া ফেলে; ঠিক যেন উহা একখানা চুম্বক। তারটা তামার বটে, কিন্তু তাড়িত বহিলেই উহার ব্যবহার ঠিক একখানা চুম্বকের মত হয়; নিকটে একটা চুম্বকের কাঁটা রাখিলে তারটা উহাকে দোলাইয়া দেয়। অ্যামপিয়ার বলিলেন, তবেই দেখ, যত রাজ্যের চুম্বক রহিয়াছে, বুঝিতে হইবে, সবগুলির ভিতরেই তাড়িত-স্রোত

বহিতেছে, এবং বহিতেছে বলিয়াই উহারা চুম্বক। অ্যামপিয়ার বলিলেন, দেখ, চৌম্বক ধর্ম্ম একটা নূতন ধর্ম্ম নহে, উহা তাড়িতের আবর্ত্তন মাত্র—চৌম্বকশক্তি একটা নূতন শক্তি নহে, উহা তাড়িত শক্তিরই একটা বিশিষ্ট ধরণে বিকাশ মাত্র। এইরূপে বৈজ্ঞানিকগণ মানিয়া লইলেন, চৌম্বক-শক্তি ও তাড়িত শক্তিও মূলে একই শক্তি বটে।

তাড়িতপ্রবাহ আবিষ্কারের বহুপূর্ব্বেই স্থির তাড়িতের আবিষ্কার হইয়াছিল। কাঁচে ও রেশমে ঘষিলে তাড়িত উৎপন্ন হয়, দুইটা বিভিন্ন ধর্ম্মের তাড়িতের উৎপত্তি ঘটে, ইহা বহুদিন হইতেই জানা ছিল। একটার নাম সু-তাড়িত, অপরটার নাম কু-তাড়িত। কিন্তু তাড়িত দুইটা ঠিক কি রকমের পদার্থ এবং উহাদের বসতি ঠিক কোন্ স্থানে, সে সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত ধারণা ছিল না। লোকে ধরিয়া লইত, তাড়িত দুইটা কিস্তুত-কিমাকার পদার্থ এবং উহাদের বসতি ঐ কাঁচে ও ঐ রেশমে। যাহার বসতি কাঁচে, উহার নাম সু-তাড়িত, যাহার বসতি রেশমে, উহার নাম কু-তাড়িত।

ফ্যারাডে দেখাইলেন, ঘর্ষণের ফলেই হৌক আর যাহার ফলেই হৌক, এক জাতীয় তাড়িত উৎপন্ন হইলেই সঙ্গে সঙ্গে অপর জাতীয় তাড়িতও এবং ঠিক সমান পরিমাণেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। 'কু' কে ছাড়িয়া 'সু' আসে না এবং 'সু'কে ছাড়িয়াও 'কু' আসে না। উভয়ে এক সঙ্গেই আসিয়া থাকে এবং আসেও ঠিক সমান সমান পরিমাণে। 'ক' কে তাড়িত বিশিষ্ট করিবার সঙ্গে সঙ্গে 'খ'তেও ঠিক সমান পরিমাণের এবং ভিন্ন জাতীয় তাড়িতের উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে।

ফ্যারাডে আরও দেখাইলেন 'ক'কে তাড়িত বিশিষ্ট করিতে হইলে, অর্থাৎ দুইটা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ 'ক' ও 'খ'তে দুই রকম তাড়িতের উৎপত্তি ঘটাইতে হইলে যে শক্তি ব্যয় করিতে হয়, উহার পরিমাণ নির্ভর করে 'ক' ও 'খ'এর মাঝখানটায় যে মিডিয়ম রাখা যায়, তাহার উপর। উভয়ের মাঝখানে বায়ু থাকিলে যে শক্তি ব্যয় করিতে হয়, মাঝখানে গালা বা গন্ধক রাখিলে শক্তি ব্যয় করিতে হয়, তাহাপেক্ষা অল্প পরিমাণের। ফ্যারাডের পরীক্ষা হইতে বুঝা গেল, তাড়িত যাহাই হোক, 'ক' বা 'খ' তাড়িত-শক্তির আধার নহে; শক্তির আধার উহাদের মাঝখানে যে মিডিয়ম থাকে, তাহা—ঐ গালা বা গন্ধক, অথবা ঐ গালা বা গন্ধককে অধিকার করিয়া যে ঈথরের রাজ্য রহিয়াছে, তাহা। মাঝখানকার গালা বা গন্ধক সরাইয়া ফেলিলে থাকে বায়ু, বায়ু সরাইয়া লইলেও থাকে ঈথর। ঈথর থাকিয়াই যায়, অপর কোন একটা বিশিষ্ট মিডিয়ম না থাকিলেও চলে। বৈজ্ঞানিকগণ বলিলেন, ঈথরই আসল মিডিয়ম—ইহাই তাড়িত শক্তির আধার।

ফ্যারাডে আরও বলিলেন, যেমন একখানা চুম্বককে কতকগুলি চৌম্বক-বল-রেখায় ঘিরিয়া ধরে, সেইরূপ তাড়িত বিশিষ্ট পদার্থ মাত্রকেই কতকগুলি তাড়িত-বল-রেখায় ঘিরিয়া ফেলে। এই তাড়িত রেখাগুলির এক প্রান্তে থাকে 'ক', অপর প্রান্তে থাকে 'খ' এবং এই রেখাগুলিরও বসতি, 'ক' ও 'খ'এর মধ্যে যে মিডিয়ম রহিয়াছে—যে ঈথর রহিয়াছে, ঐ প্রদেশে। এই বল-রেখাগুলি ধরিয়াই তাড়িত-শক্তির বিন্যাস। এই বল-রেখাগুলিই শক্তির আধার এবং উহাদের সকলেরই শক্তি সমান। ফ্যারাডে বলিলেন, 'ক' ও 'খ'কে তাড়িত বিশিষ্ট করিবার অর্থ

শুধু উহাদের মাঝখানকার মিডিয়মে, এই বল-রেখাগুলি—এই তাড়িত রেখাগুলি উৎপন্ন করা। ঈথর-সাগরে এই তাড়িত-রেখাগুলি উৎপন্ন করিতে শক্তি ব্যয় করিতে হয়। যতই শক্তি ব্যয় করা যায়, রেখার সংখ্যাও ততই বাড়িতে থাকে। এই-বল-রেখাগুলি লইয়াই তাড়িত অথবা এই বল-রেখাগুলিই তাড়িত। উহাদের সংখ্যাই তাড়িতের পরিমাণ এবং উহাদের সম্মিলিত শক্তিই তাড়িতের শক্তি।

ফ্যারাডে আরও দেখাইলেন, যেমন 'ক'কে তাড়িত বিশিষ্ট করিবার সঙ্গে সঙ্গে 'খ'তে ভিন্ন জাতীয় তাড়িতের আবির্ভাব ঘটে, সেইরূপ, আবার 'ক'তে একটা তাড়িত প্রবাহ সঞ্চালিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে 'খ'তে একটা উল্টা প্রবাহের উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। দেখাইলেন, একটা তারে তাড়িতপ্রবাহ উৎপন্ন করিতে গেলেই, উহার আশে পাশে যত তার থাকে, ঐ গুলিতেও ক্ষণেকের জন্য একটা উল্টা প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফ্যারাডে আরও দেখাইলেন, যদি ধারে কাছে আর কোন তার নাও থাকে,—যদি একটীমাত্র তার লইয়া উহাতে একটা প্রবাহ উৎপন্ন করা যায়—তাহা হইলেও ঐ তারটাতেই একটা ক্ষণস্থায়ী উল্টা প্রবাহের উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। কেবল ইহাই নহে, প্রবাহটা থামাইতে গেলেও আবার একটা নূতন প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই নূতন প্রবাহটাও ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ইহার উৎপত্তি পুরাতনটার উল্টা দিকে নহে—একই দিকে।

ফলে দেখা যায়, প্রবাহ উৎপন্ন করিতে যাইয়া একেবারেই পূর্ণ প্রবাহ উৎপন্ন করা যায় না, আবার প্রবাহ থামাইতে গিয়াও তখনই উহাকে থামান যায় না। তাড়িতকে চালানও বিপদ, থামানও বিপদ—চালাইতে গেলেও বাধা পাইতে হয়, থামাইতে গেলেও বাধা পাইতে হয়। তাড়িতকে চালাইতেও বলের প্রয়োজন, থামাইতেও বলের প্রয়োজন। তাড়িত যেন জড়পদার্থ, উহা স্থির থাকিলে স্থিরই থাকিতে চাহে এবং চলিতে থাকিলে চলিতেই চাহে। বৈজ্ঞানিকগণ বলিলেন, তবেইত, তাড়িতকেও তবে জড়ভাবে ভাবিতে হয় দেখিতেছি।

ফ্যারাডে আবার দেখাইলেন, যখন জলের ভিতর তাড়িত প্রবাহ সঞ্চালিত করা যায়, যখন প্রবাহের ফলে বিশ্লেষণ হইয়া জলের মধ্য হইতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের উৎপত্তি ঘটে, তখন ঐ তাড়িত-প্রবাহের সহিত ঐ বিশ্লিষ্ট পদার্থ দুইটার, ঐ হাইড্রোজেন ও ঐ অক্সিজেনের, একটা পরিমাণগত সম্বন্ধ থাকে। ফ্যারাডে দেখাইলেন, যতটা তাড়িত বহিলে হাইড্রোজেনের একটা পরমাণু পাওয়া যায়, হাইড্রোজেনের দুইটা পরমাণু পাইতে হইলে ঠিক তাহার দ্বিগুণ তাড়িত চাই, তিনটা পরমাণু পাইতে হইলে তিনগুণ তাড়িত চাই, এইরূপ। আবার একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর বেলায় যতটা তাড়িত চাই, একটা অক্সিজেন পরমাণু পাইতে হইলে তাড়িত চাই তাহার দ্বিগুণ, কোন কোন পরমাণুর বেলায় তাড়িত চাই তাহার তিনগুণ, কোনটার বেলায় বা তাহার চতুর্গুণ, এইরূপ। দেখা যায়, হাইড্রোজেন পরমাণুর বেলাতেই তাড়িত চাই সব চেয়ে কম, যেন উহা অপেক্ষা কম পরিমাণের তাড়িত লইয়া কারবার চলে না। ঐটুক তাড়িত যেন একটুকরা গোটা তাড়িত, উহার দুইটা বা তিনটা লইয়া কারবার চলে কিন্তু উহার ভগ্নাংশ লইয়া চলে না। বৈজ্ঞা-

নিকগণ দেখিলেন, তাড়িতকে জড় বলিলেই যথেষ্ট হইল না, তাড়িতকে কণাময় বলিয়াও ভাবিতে হয়। হেলম্হোল্‌ৎ বলিলেন, তাড়িত কণাময়ই বটে; জড়ের ন্যায় তাড়িতের গঠনও আণবিক গঠন। এক এক জাতীয় পরমাণুর সহিত এক একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের তাড়িত গ্রথিত রহিয়াছে; আর হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত যতটা তাড়িত গ্রথিত, উহাই তাড়িতের ক্ষুদ্রতম অংশ—উহা তাড়িতের পরমাণু।

ফ্যারাডের পর ম্যাক্‌স্‌ওয়েল। ম্যাক্‌স্‌ওয়েল বলিলেন, দেখ 'ক' ও 'খ' কে তাড়িত বিশিষ্ট করার অর্থ উহাদের মাঝখানে কতকগুলি তাড়িত রেখা উৎপন্ন করা; ইহা ঠিক কথা—ফ্যারাডে ঠিক কথাই বলিয়া গিয়াছেন। এখন ফ্যারাডের এই তাড়িত রেখাগুলিকে—এই ফ্যারাডে-রেখাগুলিকে—আরও একটু চাপিয়া ধরা যাক। দেখ, তাড়িত রেখা উৎপন্ন করার অর্থ কি? অর্থ ঐ রেখা ক্রমে ঈথরকে টানিয়া ধরা। যখন 'ক' ও 'খ' তাড়িত বিশিষ্ট হয়, বুঝিতে হইবে, তখন উহাদের মাঝখানকার ঈথরে এই ফ্যারাডে রেখা ক্রমেই কতকগুলি টান পড়ে—যেন এক একটা ফ্যারাডে রেখা এক এক গাছ রজ্জু। এখন, রজ্জুকে টানিয়া ধরিলে উহার কি দশা হয়? দেখা যায়, রজ্জুটা একটু লম্বা হইয়া বা নুইয়া পড়ে। বুঝিতে হইবে, ফ্যারাডের তাড়িত রেখাগুলি যে উপাদানে নির্ম্মিত, ঐ উপাদানটাও ঐ তাড়িত-রেখা ক্রমেই নুইয়া পড়ে। কোন উপাদানে এই ফ্যারাডে রেখাগুলি গঠিত? এই তাড়িত রেখাগুলির উপাদান কি? তাড়িত না ঈথর? তাড়িতই বল বা ঈথরই বল, বুঝিতে হইবে, উহা নুইয়া পড়ে, এবং এইরূপ নুইয়া পড়ে বলিয়াই আমরা বলি 'ক' ও 'খ' তাড়িত বিশিষ্ট হয়। তাড়িত-রেখা ক্রমে টানিয়া ধরিলেই ঈথর বা তাড়িত নুইয়া আসে, এবং রেখাগুলির উভয় প্রান্তে—'ক' প্রান্তে 'খ' প্রান্তে তাড়িতের ক্রিয়া প্রকাশ পায়। এই টানের মাত্রা যতই বাড়ান যায়, মাঝখানকার ঈথর বা তাড়িত ততই নুইয়া পড়ে এবং "ক" ও "খ"তে তাড়িতের পরিমাণও ততই বাড়িয়া যায়। এই নোয়ান ব্যাপারই আসল ব্যাপার ইহার পরিমাণই তাড়িতের পরিমাণ এবং নোয়াইতে গিয়া যে শক্তি ব্যয় করিতে হয়, ইহাই স্থির তাড়িতের শক্তি। দেখ, রজ্জুকে নোয়াইতে শক্তি প্রয়োগের আবশ্যক হয়, কিন্তু সকল রজ্জুর বেলাতে সমান পরিমাণে নহে। দেখ, জলের রজ্জু শক্তি প্রয়োগের অপেক্ষাই রাখে না। আপনি নুইয়া পড়ে, কিন্তু রবারের বা কাঠের বা কাঁচের রজ্জু নোয়াইতে হইলেই খানিকটা শক্তি ব্যয় করিতে হইবে। দেখ, কাঁচ বা রবারের ন্যায় যাহার স্থিতিস্থাপকতা আছে, এইরূপ রজ্জুই শক্তি প্রয়োগের অপেক্ষা রাখে। কাজেই বুঝিতে হইবে, যাহাকে নোয়াইবার ফলে 'ক' ও 'খ' তাড়িত বিশিষ্ট হয় এবং যাহাকে নোয়াইতে গিয়া খানিকটা শক্তি ব্যয় করিতে হয়, উহাকে ঈথরই বল বা তাড়িতই বল, জড় পদার্থের ন্যায় উহারও স্থিতিস্থাপকতা আছে।

তারপর ম্যাক্‌স্‌ওয়েল আরও একটা মস্ত কথা বলিলেন। ম্যাক্‌স্‌ওয়েল বলিলেন, দেখ, তাড়িত-প্রবাহ কাহাকে বল? দেখ, তাড়িত বেগ বিশিষ্ট হইলেই প্রবাহের উৎপত্তি ঘটে, বেগবিশিষ্ট তাড়িতের নামই তাড়িত-প্রবাহ। দেখ, রজ্জু যখন নুইয়া পড়ে, তখন উহার প্রত্যেক অংশই বেগবিশিষ্ট হয়, উহার উপর যে দিকে টান পড়ে, ঐ দিকে উহার প্রত্যেক

অংশই একটু করিয়া সরিয়া যায়। দেখ, যখন 'ক' ও 'খ' তাড়িতবিশিষ্ট হয়, যখন উহাদের মাঝখানকার ঈথর বা তাড়িত রেখা ক্রমে ছুইয়া পড়ে, তখন ঐ ঈথর বা তাড়িতও ঐ তাড়িত-ক্রমেই একটু করিয়া সরিয়া যায়, তখন ঐ ঈথর বা তাড়িতেও ক্ষণেকের জন্য একটা বেগ উৎপন্ন হয়। তবেই দেখ, 'ক' ও 'খ'এর মাঝখানে যে ফাঁকা যায়গা বা ঈথর রহিয়াছে, ঐ স্থানেও তাড়িত-প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেখ, তাড়িত-প্রবাহ শুধু তামার তারে বা লোহার তারে নহে,—তাড়িত-প্রবাহ ঈথরেও উৎপন্ন হইতে পারে। ইচ্ছা হয় ইহাকে শুধু ঈথর-প্রবাহ বল অথবা শুধু তাড়িত-প্রবাহ বল, ইচ্ছা হয় ঈথরকেই তাড়িত বল, কিন্তু প্রবাহ যে উৎপন্ন হয়,তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। ঈথরকে তাড়িত বলিলে ভুলও হইতে পারে, কিন্তু ঈথরেও যে তাড়িত-প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আবার তাড়িত-প্রবাহ উৎপন্ন হয় বলিলেই সবটা বলা হইল না—তাড়িত-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে ঈথরে চৌম্বক-রেখাও উৎপন্ন হইয়া থাকে। না হইবে কেন? তামার তারে তাড়িত বহিলে চৌম্বক রেখা উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঈথর-সমুদ্রে তাড়িত বহিলে চৌম্বক রেখার উৎপত্তি না ঘটিবে কেন? বুঝিতে হইবে, যখন ঈথরে তাড়িত-প্রবাহ উৎপন্ন হয়—যখন ফ্যারাডে রেখাক্রমে ঈথরে তাড়িতের স্রোত বহিতে থাকে, তখন ঐ তাড়িত রেখাগুলিকে বেড়িয়া কতকগুলি চৌম্বক রেখারও সৃষ্টি হইয়া থাকে—একটা তারে তাড়িত বহিতে থাকিলে যেরূপ ঐ তারটাকে ঘিরিয়া চৌম্বক রেখার আবির্ভাব হয়, ঐ তাড়িত রেখাগুলি বেড়িয়াও ঠিক ঐরূপ চৌম্বক রেখার আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে।

এইরূপে তাড়িত ও চৌম্বক শক্তির প্রকৃতি লইয়া বিজ্ঞান-জগতে গবেষণা চলিতে থাকিল, ফ্যারাডের পরীক্ষা ও ম্যাক্স্‌ওয়েলের গবেষণা হইতে বৈজ্ঞানিকগণ ক্রমে বুঝিতে পারিলেন, কেবল স্থূল জড়ের আলোচনায় ফল নাই, আমাদের আসল কারবার সমগ্র ঈথর-প্রদেশ লইয়া। এই ঈথরের রাজ্য শুধু আলোক ও তাপের রাজ্য নহে, ইহা তাড়িত ও চৌম্বক শক্তিরও লীলাভূমি। কিন্তু গবেষণা এইখানেই থামিল না।

পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল,তাড়িত-বিশিষ্ট 'ক'কে তাড়িত-বিশিষ্ট 'খ'এর সহিত একটা তার দিয়া যোগ করিয়া দিলে, ঐ তারের ভিতর দিয়া উভয়ের তাড়িত মিশিয়া যায়, ফলে ক্ষণেকের জন্য একটা প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া উভয় তাড়িতের লোপ প্রাপ্তি ঘটে। লর্ড কেলবিন গণনা করিয়া দেখিলেন, ঐ তারটা যদি খাটো ও মোটা হয়, তাহা হইলে এই তাড়িত প্রবাহটা একটা আন্দোলনের আকার ধারণ করে—ঘড়ির পেণ্ডুলমের ন্যায় তাড়িত তারটার প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত দুলিতে থাকে এবং তারটা বেশ ভাল তার হইলে এই আন্দোলন বহুক্ষণ চলিতে পারে।

ম্যাক্স্‌ওয়েল বলিলেন, তাড়িতের এই আন্দোলন কেবল তারে নহে, উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ঈথরেও ঘটিয়া থাকে। তারে তাড়িত প্রবাহ উৎপন্ন হইলে ঈথরেও তাড়িত-প্রবাহ উৎপন্ন হয়, আবার তারের প্রবাহটা আন্দোলনের আকার ধারণ করিলে ঈথরেও প্রবাহটা আন্দোলনের আকার ধারণ করে।

যখন 'ক' ও 'খ' তাড়িত বিশিষ্ট হয়,তখন উহাদের মাঝখানকার ঈথরে একটা টান

পড়ে—তাড়িত-রেখা ক্রমে টান পড়ে; আবার একটা তার দিয়া 'ক' ও 'খ'কে যোগ করিয়া দিলে এই টানটা ছাড়িয়া যায়। টান ছাড়িয়া দিলেই স্থিতিস্থাপক ঈথর দুলিতে থাকে, অথবা ঈথর দুলিতে থাকে না বলিয়া বল, তাড়িত দুলিতে থাকে—একটা স্প্রিংকে বা রবারকে টান দিয়া ছাড়িয়া দিলে উহা যেমন দুলিতে থাকে, ঠিক সেইরূপ দুলিতে থাকে। তাড়িতের এই আন্দোলন বহুবার ঘটিয়া থাকে।

কিন্তু যেখানে আন্দোলন, সেইখানেই তরঙ্গ। ম্যাকস্‌ওয়েল বলিলেন, কেবল তাড়িত আন্দোলন দেখিয়াই অবাক্ হইলে চলিবে না; দেখ, আন্দোলনের ফল ঈথর-সাগরে তরঙ্গেরও উৎপত্তি ঘটে। এই তরঙ্গ তাড়িত-তরঙ্গ—তাড়িতান্দোলনের ফলে তাড়িত তরঙ্গ।

দেখ, আন্দোলন মাত্রেরই দুইটা ভাব—স্থিতির ভাব ও গতির ভাব—স্থিতির পর গতি, গতির পর স্থিতি। দেখ, এই দুইটা ভাবই পর পর, ঈথর বহিয়া ছুটিয়া চলে—একই বেগে ছুটিয়া চলে। ফলে, উহারা পর পর দেশে সজ্জিত হইয়া পড়ে। কাল যাহা ঘটায়, দেশ তাহাই সাজায়। আন্দোলনে যাহা পর পর সংঘটিত হয়, তাহাই একটা নির্দ্দিষ্ট বেগে ছুটিতে গিয়া দেশের মধ্যে পর পর সজ্জিত হইয়া পড়ে। এই পর পর সজ্জা লইয়া— এই বিন্যাসের ভাব লইয়াই তরঙ্গ।

তরঙ্গেও দুইটা ভাব নিহিত রহিয়াছে। যে দুইটা ভাব লইয়া তাড়িতের আন্দোলন, সে দুইটা ভাব লইয়াই তাড়িত তরঙ্গ। আন্দোলনে যে দুইটা ভাবের ক্রমবিকাশ, তরঙ্গে ঐ দুইটা ভাবেরই ক্রম-বিন্যাস। তরঙ্গও স্থিতির ভাব ও গতির ভাব লইয়া। এই স্থিতির ভাব ও এই গতির ভাব ঈথরেরই বল বা তাড়িতেরই বল, বিশেষ যায় আসে না।

অথবা বল, তরঙ্গ দুই জাতীয় রেখা লইয়া—তাড়িত রেখা লইয়া ও চৌম্বক-রেখা লইয়া। তাড়িতের স্থিতির ভাব হইতে তারিত-রেখা ও উহার গতির ভাব হইতে চৌম্বক-রেখা। কাজেই বল, এই দুই জাতীয় বল-রেখা লইয়াই তাড়িত-তরঙ্গ, এবং এই দুই জাতীয় রেখা লইয়াই তাড়িত-তরঙ্গ ঈথর বাহিয়া ছুটিয়া চলে। কিন্তু এই তাড়িত-তরঙ্গের বেগ কি ভীষণ! ম্যাক্‌স্‌ওয়েল গণনা করিয়া দেখিলেন, আশ্চর্য্য ব্যাপার!—তাড়িত-তরঙ্গের বেগ ঠিক আলোকের বেগের সমান—সেকেণ্ডে প্রায় লক্ষ ক্রোশ। দেখিলেন, যে বেগে আলোক-তরঙ্গকে ঈথর বহিয়া ছুটিতে হয়, ঠিক সেই বেগেই তাড়িত তরঙ্গকেও সেই ঈথর বহিয়া ছুটিতে হইবে। ম্যাক্‌স্‌ওয়েল বলিলেন, তবেই দেখ, তাড়িত-তরঙ্গ ও আলোক-তরঙ্গ মূলে একই জিনিস। আলোক-তরঙ্গ তাড়িতেরই তরঙ্গ বটে এবং যে আন্দোলন হইতে আলোকের উৎপত্তি, ঐ আন্দোলনও তাড়িতেরই আন্দোলন বটে।

ম্যাক্‌স্‌ওয়েলের এই সিদ্ধান্তের—এই আলোকতত্ত্বের সত্যতা প্রমাণ করিলেন হার্টজ্। হার্টজ্ যন্ত্র সহযোগে তাড়িত-তরঙ্গ উৎপন্ন করিয়া দেখাইলেন, এই তরঙ্গগুলির ধর্ম্ম সর্ব্বাংশে আলোক-তরঙ্গের অনুরূপ। হার্টজের পরীক্ষা হইতে প্রমাণিত হইল, আলোক-তরঙ্গ তাড়িত-তরঙ্গই বটে। হার্টজ্ অল্পদিন হইল এবং অল্প বয়সেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

এইরূপে শক্তির দিক হইতে জগৎটা আলোচনা করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বৈজ্ঞানিকগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত

হইলেন, তাহা এই। চৌম্বক-ধর্ম্ম একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম নহে—উহা তাড়িতেরই ধর্ম্ম। তাপ-তরঙ্গ ও আলোক-তরঙ্গ একই তরঙ্গ—উভয়েই তাড়িত-তরঙ্গ। সকল শক্তির মূলেই তাড়িতের মূর্ত্তি; তাড়িতকে বুঝিলে সকলকেই বুঝা যাইবে।

কাজেই প্রশ্ন হইল, তাড়িত পদার্থটা কি?—তাড়িত জড় না ঈথর? ম্যাক্স্ওয়েল স্পষ্ট করিয়া ইহার উত্তর দেন নাই। হয়ত তাড়িত জড়, অথবা হয়ত উহা ঈথর। হয়ত তাড়িত কণাময় অথবা উহা নিরেট, কোন্‌টা ঠিক, বলা যায় না। হয়ত তাড়িত জড়ও বটে, ঈথরও বটে—হয়ত জড় ও ঈথর একই বটে—হয়ত তিনই এক, একই তিন; কিন্তু ঠিক বলা যায় না।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

উপন্যাসে ধর্ম্মপ্রচার—বঙ্কিম বাবু।

গুরুদাস বাবু তাঁহার "জ্ঞান ও কর্ম্মে" লিখিয়াছেন—"* * দাম্পত্য প্রেম ও অপত্য স্নেহ হইতে ক্রমশ: চিত্তের সৎপ্রবৃত্তি বিকাশ ও তদ্দ্বারা মনুষ্যের স্বার্থপরতা ক্ষয় "পরা"র্থপরতা বৃদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ" হয়। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ড্রুমণ্ডও ঐ ভাবের কথা লিখিয়াছেন। ইহাতে যদি কোন পাঠক প্রবীণ গুরুদাস বাবু ও প্রসিদ্ধ ড্রুমণ্ড সাহেবকে উপহাসের পাত্র বিবেচনা করেন, তাহা হইলে অবশ্য তাঁহাদিগের উভয়েরই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। সন্তানের প্রতি জননীর স্নেহে পরার্থপরতা বা পরোপকার। ইহারা আবার গ্রন্থকার—পাঠক যদি এইরূপ বিবেচনা করেন, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, পাঠক প্রাজ্ঞ গুরুদাস বাবু ও বিখ্যাত গ্রন্থকার ড্রুমণ্ড অপেক্ষা বুদ্ধিমান। যাহা হউক, পাঠক যাহাতে নিরাশ না হন, তজ্জন্য আমি আর এক কথা বলিয়া রাখি। যাঁহারা নিন্দার বুকনি না থাকিলে প্রশংসা সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের জন্য আমার এই প্রবন্ধমালা নহে।

রজনীর কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে একটু বলিয়াছি। এই প্রবন্ধে সেই কথা আবার বলিতেছি। রজনী ফুলওয়ালী। রজনীর সহিত ফুলের সাদৃশ্য আছে। ফুল কোমল; রজনীর হৃদয় কোমল। ফুল সুন্দর, রজনী সুন্দর। ফুলের সুগন্ধ আছে; রজনীর গুণ আছে। ফুল পবিত্র; রজনী পবিত্র। ফুল নিজেকে দেখিতে পায় না; রজনীও নিজেকে দেখিতে পায় না। কোমল সুন্দর সুগন্ধী পবিত্র দৃষ্টিহীন কুসুমের সহিত কোমল সুন্দরী গুণবতী পবিত্র অন্ধ রজনীর একবার তুলনা করিয়া ভাবিয়া দেখ। কেমন সুন্দরে সুন্দরে মিলিয়া গিয়াছে। আর রজনী নিজে যে সেকালের হীরা মালিনীর কথা বলিয়াছে, তাহার সহিত ফুলের একবার তুলনা কর। দেবতার অর্চ্চনার জন্য যে ফুল, তাহা যে হীরা স্পর্শ করিত, তাহা হীরা যোগাইত, তাহাতে কি দুঃখ হয় না? এমন পবিত্র যে ফুল, ঐশ শিল্পের এমন পবিত্র ও সুন্দর যে সৃষ্টি, তাহা কিনা হীরার হস্তে! কি বিড়ম্বনা! আর রজনীর সহিত হীরার একবার তুলনা কর—কি বৈপরীত্য! রজনী ও হীরা—যেন পুষ্প ও কণ্টক, যেন চন্দন ও

পুরীষ,যেন কপোত ও কাকোদর, যেন পূর্ণিমা ও অমাবস্যা, যেন স্বর্গ ও নরক, যেন পুণ্য ও পাপ। এমন যে পাপিষ্ঠা মালিনী, তাহার দুঃখেও কোমলহৃদয়া রজনীর দুঃখ। তাই সে বলিতেছে "ফুলের মধু খেলে বিদ্যাসুন্দর,কিন্ত খেলে হীরা মালিনী" "সুন্দরের সেই রামরাজ্য হইল—কিন্তু মালিনীর কিল আর ফিরিল না।" রজনী পবিত্র ও অন্ধ কিন্তু যুবতী, তাই তার রসজ্ঞান হইয়াছে। "ফুলের মধু" খাওয়া এই কথায় বুঝা গেল। এই রসজ্ঞানযুক্তা রজনী, যখন যৌবনের ভাবে আকাঙ্ক্ষায় ঢল ঢল করিতেছে, তখন সে একদিন যুবা শচীন্দ্র বাবুর মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনিল—"এ কে ছোট মা?" সেই কণ্ঠধ্বনি তাহার কর্ণবিবর ভরিয়া সুধা ঢালিয়া দিল। গম্ভীরনাদি বারিধি-তীরে নবকুমার কপালকুণ্ডলার মৃদু কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলেন, "পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?" এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নবকুমারের হৃদয়বীণা বাজিয়া উঠিয়াছিল। সংসারযাত্রা সেই অবধি সুখময় সঙ্গীত প্রবাহ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। যখন ঐ স্বর নবকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন তাহার বোধ হইল, ধ্বনি যেন হর্ষ বিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল; যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল; বৃক্ষপত্রে মর্ম্মরিত হইতে লাগিল, সাগরনাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল। নবকুমার-শ্রুত এই ধ্বনি, আর রজনী শ্রুত উপরি উক্ত ধ্বনির সহিত তুলনা কর। দেখিবে,ধ্বনিতে উভয়েরই হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠিয়াছিল, উভয়েরই হৃদয়-সাগরে মধুর কল্লোল উঠিয়াছিল। কিন্তু—কপালকুণ্ডলার অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের মোহিনীশক্তি তাহার ধ্বনির মধুরতার সহিত মিশ্রিত হইয়াছিল। অর্থাৎ নবকুমারকে রূপ ও ধ্বনিতে মুগ্ধ করিয়াছিল। রজনীকে শুধু ধ্বনিতে মুগ্ধ করিল। রূপ দেখিল না, তবুত কম মুগ্ধ হয় নাই। নবকুমারের হৃদয়ে ধ্বনির সহিত রূপ মিশ্রিত। রজনীর হৃদয়ে ধ্বনির সহিত স্পর্শ মিশ্রিত। কারণ শচীন্দ্র তাহার চক্ষু পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার চিবুক ধরিয়া নিজের দিকে তাহার মুখ ফিরাইয়াছিলেন। আ মরি মরি—সে স্পর্শ নবনীত সুকুমার পুষ্প গন্ধময় বীণা ধ্বনিবৎ। নবকুমারের হৃদয়ে রূপ ও ধ্বনি; রজনীর হৃদয়ে, স্পর্শ ও ধ্বনি—উভয় একই কার্য্য করিয়াছিল—হৃদয়ে "অর্গানে"র চাবি ফিরাইয়া দিয়াছিল। ঐ চাবি ফিরণের পর কত রকম সুর, কত রকম গৎ "অর্গানে" বাজিয়াছিল। সুতরাং আমরা দেখিলাম, রজনী রূপ দর্শনের অভাবে কম পরিমাণে প্রণয়সুখ অনুভব করে নাই। সে শচীন্দ্রের রূপ দেখিতে পায় না, তথাপি এক শব্দ শুনিবা মাত্র আশায় শচীন্দ্র-ভবনে যাইত। যেন কে চুল ধরিয়া তাহাকে লইয়া যাইত। তাই সে বলিয়াছে "শুনিয়াছি স্ত্রী-জাতি পুরুষের রূপে মুগ্ধ হইয়া ভালবাসে, আমি কাণা, কাহার রূপ দেখিয়াছি? তবে কেন যাই? শুধু ধ্বনি, মধুর ধ্বনি শুনিয়া কি আমি মোহিত হইয়াছি? যদি তাই হইত, তবে বাদ্য শুনিবার জন্য বাদকের বাড়ী যাই না কেন? সেতার, সারেঙ্গ, এসরাজ, বেহালার অপেক্ষা কি শচীন্দ্র সুকণ্ঠ?" তবে কি স্পর্শ? ফুলের অপেক্ষা শচীন্দ্র হস্ত কি কোমল? তা নয়। তবে কি? তখন রজনী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল, "রূপ রূপবানে নাই, রূপ দর্শকের মনে—নইলে একজনকে সকলেই সমান রূপবান দেখে না কেন? এক জনে সকলেই আসক্ত হয় না কেন?" রজনী রূপ দেখে নাই, তবু এই সিদ্ধান্ত করিল। কেমন করিয়া? শব্দ ও স্পর্শের সুখের সহিত

তাঁহার অজ্ঞাত বস্তু রূপের সাদৃশ্য অনুমান করতঃ সিদ্ধান্ত করিল—শব্দ যেমন মনের সুখ মাত্র, স্পর্শ যেমন মনের সুখ মাত্র, রূপও তেমনি দর্শকের একটী সুখ মাত্র। পাঠক দেখিতেছেন, অন্ধ হইলে কখন কখন আভ্যন্তরিক দৃষ্টি অর্থাৎ চিন্তাশক্তি বাড়ে। তাই রজনী ভাল বাসিয়া Psychology মনোবিজ্ঞান চর্চ্চা করিতেছে। এমন শুনিতে পাওয়া যায়, কোন দার্শনিক চিন্তাশক্তি বাড়াইবার জন্য ইচ্ছা করিয়া অন্ধ হইয়াছিলেন। অধ্যাপক ফসেট (Fawcett) অন্ধ হইলে তাঁহার চিন্তাশক্তি বাড়িয়াছিল বই কমে নাই। তাহা তাঁহার গ্রন্থে ও বক্তৃতায় প্রকাশ পায়। পরে তিনিও অন্ধ হওয়ার পর কণ্ঠধ্বনি দ্বারা চালিত হইয়া রজনীর ন্যায় প্রণয়বদ্ধ হইয়াছিলেন। তবে Fawcett অন্ধতার জন্য, Milton, হেমচন্দ্র ও রজনীর ন্যায় আক্ষেপ করেন নাই। তিনি তাহা একটা অসুবিধা মাত্র বলিয়া, তাহাকে তুচ্ছ করিয়া "নবলীলা" কবিতার বিজয়চন্দ্রের ন্যায় জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, ভারতীয় দর্শনমতে সমুদয় জগৎ নাম রূপাত্মক। অন্ফসেট ও রজনীকে, "রূপ" বঞ্চিত হইব, "নাম" বা শব্দ বা ধ্বনি বা ভাব বা চিন্তার উপরই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতে হইত। তথাপি তাহাদিগের জীবন, মন ও হৃদয় খুব বিকশিত হইয়াছিল। এইজন্য কেহ কেহ বলেন, রূপের অপেক্ষা নামের বা শব্দের প্রভাব অধিক। ঈশ্বর নামাত্মক, শব্দাত্মক, নাম-সূচিত-চিন্তা ও ভাবময়। তাই হিন্দু দার্শনিক বলেন, "হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টি মহৎ প্রথমে আপনাকে নাম পরে রূপাকারে অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগদ্রূপে অভিব্যক্ত করেন।" আমি এই বিষয় এখানে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ জটিল করিব না। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, রজনী অন্ধ বলিয়া দুঃখ করিয়াছে। এখানে সে কথাটা একটু বিস্তৃত ভাবে বলি।—রজনী দুঃখে বলিতেছে—"মূর্ত্তিময়ী বসুন্ধরে! তুমি দেখিতে কেমন?" সে শুনিতে পায়, অন্য লোকে দেখিতে পায়। কিন্তু দেখা যে কি, তাহা সে জানে না। তাহার মনে হইয়াছে, শচীন্দ্র দেখিতে কেমন—"যাকে লোকে সুন্দর বলে, সে সব দেখিতে কেমন।" সে বসুন্ধরাকে ডাকিয়া বলিতেছে—"বলনা তোমার হৃদয়ের সারভূত পুরুষজাতি দেখিতে কেমন?" "দেখাও না তাহার মধ্যে, যাহার করস্পর্শে এত সুখ, সে দেখিতে কেমন?" শচীন্দ্র বাবু দেখিতে কেমন? "দেখা কেমন? দেখিলে কিরূপ সুখ হয়? এক মুহূর্ত্ত জন্য এই সুখময় স্পর্শ দেখিতে পাই না?" স্পর্শে সুখ আছে, দেখাতে নাকি সেইরূপ একপ্রকার সুখ আছে। সেই সুখ আমাকে একবার অনুভব করাও। চোখ না থাকিলেও তাহা কি অনুভব করা যায় না?" "দেখ মা! বাহিরের চক্ষু নিমীলিত থাকে, থাকুক মা! আমার হৃদয়ের মধ্যে চক্ষু ফুটাইয়া দে, আমি একবার অন্তরের ভিতর লুকাইয়া, মনের সাধে রূপ দেখে, নারী জন্ম সার্থক করি।" কিন্তু রজনী হৃদয় মধ্যে খুঁজিয়া দেখিল, "শুধু শব্দ গন্ধ স্পর্শ" পাইল, আর কিছু পাইল না। তাই তাহার অন্তর বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনি উঠিতে লাগিল "কে দেখাবি গো—আমায় রূপ দেখা।"

রজনী কখন জগৎ দেখে নাই, তবু তার দুঃখ হইতেছে যে, সে দেখিতে পায় না; কারণ সকলের মুখে অহোরহ দেখার কথা শুনিতে পায়। মনুষ্যের সুখ দুঃখ কতকটা তুলনামূলক। সকলের যাহা আছে, আমার তাহা

নাই, তাহা ভাবিয়া দুঃখ হয়। আর আমার যাহা নাই, তাহা কাহারও নাই, তাহাতে দুঃখ হয় না। যখন কেহ পুত্রশোকে কাতর হয়, লোকে তাহাকে এই বলিয়া বুঝায় যে, সকলেই মৃত্যুর অধীন।

যে পূর্ব্বে দেখিতে পাইত, এখন দেখিতে পায় না, তাহার দুঃখ এক হিসাবে কম, কেন না সে জগৎটা দেখিয়াছে, তাহার রূপ তাহার স্মৃতিতে আছে। আর এক হিসাবে তাহার দুঃখ বেশী—এক সময়ে তাহার দেখায় সুখ ছিল, এখন তাহাতে সে বঞ্চিত। তাই মিল্টন অন্ধ হইয়া স্যামসনের মুখে তাহার নিজ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন—"অন্ধকার, অন্ধকার, অনতিক্রমনীয় অন্ধকার—হে স্পর্শ, যে ইন্দ্রিয় এত মহামূল্য, এত আবশ্যক, যাহার অভাবে মানুষ এত কাতর, এত দুঃখী, তাহা কেন শরীরের দুইটী ক্ষুদ্র গোলকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ? তাহা কেন সর্ব্বশরীরে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখ নাই?" আমাদের কবি হেমচন্দ্রও অন্ধ হইয়া করুণ বিলাপ করিয়াছেন। আর শ্রীমান বিজয়চন্দ্র মজুমদার "নবলীলা" কবিতাতে বিলাপের সহিত এক মহতী শক্তি মিশ্রিত করিয়াছেন—মানসিক শক্তি, নৈতিক শক্তি—তাহা এই, কিছুতেই দমিব না। পরোপকারে জীবন উৎসর্গ করিয়া অন্ধতার সকল দুঃখ দূর করিব। বাহিরের চক্ষু নিমীলিত থাকিলেও আমার হৃদয়ের মধ্যে এমন এক চক্ষু ফুটাইব, যাহাতে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে এক নবজ্যোতি ফুটিয়া উঠিবে, যাহাতে দুঃখের ভূমি হইতে সুখের ফোয়ারা উঠিবে। রজনী কিন্তু এরূপ চিন্তা, এবম্বিধ প্রতিজ্ঞা করিতে পারে নাই। শব্দে হোক, স্পর্শে হোক, শূন্য রমণী হৃদয়ে সুপুরুষ সংস্পর্শ হইল, প্রেম জন্মিল, অন্ধের হৃদয়েও প্রেম জন্মিল। নয়ন নিরুদ্ধ বলিয়া হৃদয় কেন প্রস্ফুটিত হইবে না? কিন্তু রজনীর মনে হইল যে তাহার প্রেম-সঞ্চার যন্ত্রণার জন্য। অন্ধ যুবতীর হৃদয়ে বিধাতা কেন সুখ দুঃখ সমাকুল প্রণয় লালসা পূরিল? রজনী ভাবিল, "অনন্ত দুষ্কৃতকারীও চক্ষে দেখে, আমি জন্ম পূর্ব্বেই কোন্ দোষ করিয়াছিলাম যে, আমি চক্ষে দেখিতে পাইব না? এ সংসারে বিধাতা নাই, বিধান নাই, পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার নাই—আমি মরিব।" এখানে রজনীর অন্ধতায় ঘোর নাস্তিকতা আসিয়া পড়িল, শচীন্দ্রপ্রেমে তাহার ঈশ্বর-প্রেম নষ্ট হইল? না, নষ্ট হয় নাই, সূর্য্য যেমন মেঘে আচ্ছন্ন হইলে তাহাকে দেখা যায় না, তেমনি রজনী-হৃদয়াকাশে দুঃখের মেঘে ঈশ্বর তখন আচ্ছন্ন। তাই সে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইল না। তাই তাহার আত্মহত্যার কথা মনে পড়িল। তখন তাহার প্রাণ শচীন্দ্রগত, অন্ধতা নিবন্ধন শচীন্দ্র-প্রাপ্তি বিষয়ে নিরাশ হইয়াছে। বাহিরে যেমন অন্ধকার, অন্তরে তেমনি অন্ধকার দেখিতেছে। বাহ্য অন্ধকারে আভ্যন্তরিক অন্ধকার, নৈরাশ্যের অন্ধকার, সৃজন করিয়াছে। তখন সেই অন্ধকারের ভিতর দিয়া বিধাতা দেখিতে পাইল না। তখন এই দুই অন্ধকারের পীড়নে মৃত্যুরূপ তৃতীয় অন্ধকারে মিশিয়া যাইবার জন্য তাহার একবার ইচ্ছা হইল। তখন সে যে "নবলীলা" কবিতার বিজয়ের ন্যায় পরসেবাতে আলোক দেখিবার চেষ্টা করে নাই, তাহা বিচিত্র নহে। যাহা হউক, রজনী এই অবস্থায় রোহিণীর ন্যায় আত্মহত্যার চেষ্টা করে নাই, কুন্দনন্দিনীর ন্যায় বিষ খায় নাই। তাহাদিগের সংযম ছিল না; তাহাদিগের অপেক্ষা রজনীর সংযম ছিল। রজনী যে কি ধাতুর নারী, তাহা গ্রন্থকার প্রকাশ করিয়াছেন।

এখন রজনীর দোষ বলি। তাহারও একবার সংযমের অভাব হইয়াছিল। তাই সে নিজেই পরে তাহা বুঝিয়া বলিয়াছে—"রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে ঠক্ ঠক্ করিয়া অল্প শব্দ হইল। আমি জাগ্রত ছিলাম, আমি দ্বারোদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক বাহির হইলাম, বুঝিলাম, চাঁপা দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সঙ্গে চলিলাম। একবার বুঝিলাম না যে কি দুষ্কর্ম্ম করিতেছি। পিতা মাতার জন্য মন কাতর হইল বটে, কিন্তু তখন মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, অল্প দিনের জন্য যাইতেছি। বিবাহের কথা নিবৃত্তি পাইলেই আবার আসিব।" রজনী, পাছে শচীন্দ্র ব্যতীত অন্যের সহিত অভিভাবক বল পূর্ব্বক তাহার বিবাহ দেন, এই ভয়ে গৃহ হইতে রজনীযোগে পলাইতেছে। কুলবালার পক্ষে গোপনে গৃহ ত্যাগ করা, পিতা মাতা স্বজনকে ত্যাগ করা বড় দোষের, অতিশয় অসংযমের কার্য্য—তাহাতে কখন মঙ্গল হয় নাই। সূর্য্যমুখী, কুন্দ পলাইয়াছিল। দেসদিমনা আর Kenilworth এর য়্যামি (Amy) রবসার্ট পিতাকে ত্যাগ করিয়া পলাইয়াছিল। এইরূপ কার্য্য পাপ! বঙ্কিম বাবু দেখাইলেন, সূর্য্যমুখী ও কুন্দ পলায়ন হেতু কত কষ্ট পাইল। সেক্ষপিয়ার দেখাইয়াছেন, পলায়ন পূর্ব্বক বিবাহ করিয়া দেসদিমনা, যাহার জন্য পলাইয়াছিল, সে-ই তাহাকে হত্যা করিল। স্কট দেখাইলেন, য়্যামি পলায়ন পূর্ব্বক আর্ল অব লেষ্টারকে বিবাহ করিয়া মরিল। আর—রজনী পলায়ন করিয়াছিল বলিয়া তাহার কত খোয়ার হইল! তাই বঙ্কিম বাবু কপালকুণ্ডলা প্রভৃতি গ্রন্থে যে সামাজিক ও ঐশিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, অন্ধ দার্শনিক অন্তর্মুখী রজনী তাহা নিজেই বলিতেছে—"তখন জানিতাম না যে, ঐশিক নিয়ম বিচিত্র মনুষ্যের বুদ্ধির অতীত—আমরা যাহাকে দয়া বলি, ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের কাছে তাহা দয়া নহে—আমরা যাহাকে পীড়ন বলি—ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের কাছে তাহা পীড়ন নহে। তখন জানিতাম না যে, এই সংসারের অনন্তচক্র দয়া-দাক্ষিণ্য-শূন্য, সে চক্র নিয়মিত পথে অনতিক্ষুণ্ণ রেখায় অহরহঃ চলিতেছে, তাহার দারুণ বেগের পথে যে পড়িবে—অন্ধ হউক, খঞ্জ হউক, আর্ত্ত হউক, সে-ই পিশিয়া মরিবে। আমি অন্ধ নিঃসহায় বলিয়া, অনন্ত সংসারচক্র পথ ছাড়িয়া চলিবে কেন?" এখানে আবার দেখুন, রজনী দার্শনিক। যে পূর্ব্বে বলিয়াছিল, "সংসারে বিধাতা" নাই, সে এখানে ঈশ্বরের "অনন্ত জ্ঞানের" কথা বলিতেছে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, রজনী সংযম গুণে মরিল বলিয়া মরে নাই। কিন্তু রজনী পলায়ন করিয়া আত্ম দুর্ব্বুদ্ধিজনিত প্রাপীড়নের পেষণে,—সংযম-বুদ্ধি হারাইয়া গঙ্গার জলে ডুবিল। সে ডুবিল, কিন্তু মরিল না। সে প্রভাত-বায়ু-তাড়িত গঙ্গাজল প্রবাহ মধ্যে নিমগ্ন হইয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিল। ক্রমে তাহার চেতনা বিনষ্ট হইয়া আসিল। তাহার পর তাহার জীবন রক্ষা হইল বটে, কিন্তু পাপের লাঞ্ছনা। এসব তাহার গৃহত্যাগের ফল।

তৎপরে রজনী ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে সহসা অতুল ঐশ্বর্য্য পাইল। তখনও সেই শচীন্দ্রের ধ্যান করিতে লাগিল। শচীন্দ্রের কণ্ঠস্বর প্রথম যখন শুনে, তখনই যে তাহার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিয়াছিল, হৃদয়ের মধ্যে একটা সঙ্গীত আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা আর থামে নাই। যেমন শ্রীকৃষ্ণের মুরলী ধ্বনিতে রাধা মুগ্ধ হইয়াছিলেন, প্রেমে উন্মাদিনী হইয়াছিলেন, কতকটা সেইরূপ শচীন্দ্রের কণ্ঠস্বরে রজনী মুগ্ধ হইয়াছিল, প্রেমে উন্মাদিনী হইয়া-

ছিল। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনের লীলা বংশীরব-তত্ত্ব। রজনীর জীবনও বংশীধ্বনি তত্ত্ব—"নাম"তত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব। রজনী "রূপ" বা জগৎ দেখে নাই। তাহার হৃদয়ে যে প্রেমের খেলা, তাহা "নামে"র খেলা, শব্দের বা ধ্বনির কার্য্য। তাহার হৃদয়ে যে সঙ্গীত নিদ্রিত ছিল, তাহা শচীন্দ্রের কণ্ঠে জাগিয়াছিল। সঙ্গীত বা শব্দ, রূপ বা জগৎ, সবইত মনুষ্য-হৃদয়ের গুপ্ত কক্ষে নিহিত থাকে, বাহ্য জগতের উদ্বোধনে তাহা বাহির হয় মাত্র। অথবা আর এক কথায় বলি, এই যে ব্রহ্মাণ্ড, যাহা আমরা বাহিরে দেখিতেছি, তাহা আমাদের মনেই আছে। তাই রজনী বলিয়াছে, রূপ শব্দ স্পর্শ সব মনের অবস্থা মাত্র। এ কথাটা যে এক রকম মায়াবাদ। আমরা যাহা যখন দেখি বা শুনি, তাহা আমাদের মনের কোটী কোটী ঘরে কোটী কোটী ভাবে থাকে, যেন নিদ্রিত ভাবে থাকে। যখন সেই গুলি স্মরণ করি, তখন সেইগুলি যেন নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠে। তেমনি এই জগতের যে সব বস্তু কখন দেখি নাই, যে শব্দ কখন শুনি নাই, তাহারাও যেন মনের ভিতর, মনের অস্তিত্বে প্রারম্ভ হইতেই নিদ্রিত থাকে। বাহ্য জগতের আহ্বানে তাহারা জাগিয়া উঠে। আমরা এ কথা বলিতে পারি, যাহা জগতে আছে, তাহা মনের ভিতর আছে, আর যাহা মনের ভিতর আছে, তাহাই জগতে আছে। ঈশ্বর আমাদিগের এই ক্ষুদ্র মস্তকের ভিতর, এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া রাখিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ড তরঙ্গময়—ঈথারের তরঙ্গ, আলোক—পবন তরঙ্গ শব্দ—ইত্যাদি নানাবিধ তরঙ্গে বা স্পন্দনে এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ড আমাদিগের নিকট প্রকাশিত। আর আমাদিগের মনও তরঙ্গময়—ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় তরঙ্গই মনে। না, আর না, বিষয় অতি জটিল। আমরা তাহা বুঝি না। একটু একটু কখন আভাস পাই মাত্র।

এখন প্রত্যাবর্ত্তন করি। যখন কাণী ফুলওয়ালী অপ্রত্যাশিত বিষয় পাইল, তখন তাহার ঐ ন্যায্য ত্যাগের প্রস্তাবে চিত্তের সংযম, হৃদয়ের সৌন্দর্য্য বিশেষরূপে প্রকাশিত হইল। তাই অমর নাথের মুখে বঙ্কিম-বলিয়াছেন "রমণীকুলে অন্ধ রজনী অদ্বিতীয় রত্ন। লবঙ্গলতার প্রোজ্জ্বল জ্যোতিও তাহার কাছে ম্লান হইল।" আমরা বলি, বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর আকাশে রজনী আর লবঙ্গলতা যুগল তারকা—প্রোজ্জ্বলভাবে পাঠক ও পাঠিকাগণকে ধর্ম্মনীতির শিক্ষা দিতেছে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

তীর্থ ভ্রমণ।

(গ্রন্থ পরিচয়)

তীর্থ-ভ্রমণ বা "৺যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী রচিত তাঁহার ভ্রমণের রোজনামচা।"

এই গ্রন্থখানি গতবৎসর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ভ্রমণ-কাহিনী ৬১৫ পৃষ্ঠা এবং মুখবন্ধ ও পরিশিষ্টাদিতেও শতাধিক পৃষ্ঠা। এই বিরাট গ্রন্থখানির মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র।

গ্রন্থের মুখবন্ধে সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব মহাশয় গ্রন্থের

বিস্তারিত পরিচয়, গ্রন্থকারের কুল-পরিচয় ও জীবনকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, মনীষী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়গণ গ্রন্থের ভাষার পরিচয় দিয়াছেন। পাদটীকা, টিপ্পনি ও নামের বর্ণানুক্রমিক সূচী প্রভৃতিতে গ্রন্থের সম্পাদন কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার চেষ্টার ত্রুটী হয় নাই।

সম্পাদক মহাশয় 'মুখবন্ধে' বলিয়াছেন. এই "তীর্থভ্রমণ বঙ্গভাষায় একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ।" এ কথা ঠিক, এরূপ ধরণের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বঙ্গভাষায় এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, বোধ হয় রচিতও হয় নাই। প্রায় ৬৪ বর্ষ পূর্ব্বে (১২৬০ সালে) ৺ যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হয়েন এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের যাবতীয় তীর্থ দর্শন করিয়া, তাঁহার গৃহে—খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকট রাধানগরে—ফিরিতে প্রায় চারিবর্ষ কাল অতিবাহিত হয়। সে সময়ে লৌহবর্ত্ম ছিল না—অধিকাংশ স্থলে পদব্রজেই সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে ভ্রমণকার্য্য সমাধা করিতে হয়। তৎকালে তাঁহার বয়স ৪৮ বৎসর এবং তিনি শূল বেদনায় ক্লিষ্টদেহ, বত্রিশটী টাকা মাত্র সম্বল করিয়া তিনি বৃন্দাবনধামে যাইবার উদ্দেশে প্রথম গৃহ হইতে বহির্গত হয়েন। আমাদের ধারণা ছিল, ডায়েরী লেখার প্রথা আমরা ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে শিখিয়াছি, কিন্তু পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বেই সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তাঁহার এই তীর্থ ভ্রমণের রোজনামচা লিখিয়া গিয়াছেন। তীর্থপর্য্যটনের শ্রমের ও ক্লেশের মধ্যেই এই দৈনন্দিনলিপি তিনি লিখিয়াছিলেন এবং ইহাতে তিনি শুধু তাঁহার চাক্ষুসদর্শনের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই, তীর্থ সমূহের সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ও প্রবাদ কথা, প্রাচীন ইতিহাস, শিল্প, বাণিজ্য, আচার, ব্যবহার, খাদ্য, পরিচ্ছদ, প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রভৃতি এত কথাই লিখিয়া গিয়াছেন যে, গ্রন্থখানিকে একখানি উত্তর ভারতের সর্ব্ব-তথ্যকোষ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। অথচ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের অপূর্ব্ব রচনা-ভঙ্গীর গুণে গ্রন্থখানি আদ্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ও সুখপাঠ্য। গতবর্ষে "ভারতবর্ষ" পত্রে মাননীয় ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের ইউরোপ ভ্রমণকাহিনী পাঠ করিয়া তাঁহার রচনা-ভঙ্গীর মনোহারিত্বে আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম—এখন দেখিতেছি, তাঁহার সেই রচনা-ধারা (Style) তিনি পিতামহের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছেন—উহা সর্ব্বাধিকারী মহাশয়দের কৌলিক বিশেষত্ব।

গ্রন্থকারের ভাষা "সেকালের ভাষা" হয়ত একালের পাঠকদের প্রীতিপ্রদ হইবে না, ভাবিয়া গ্রন্থকারের সুযোগ্য বংশধরগণ গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে দিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সেরূপ আশঙ্কার কোনও কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের ভাষায়, মধ্যে মধ্যে কয়েকটী অপ্রচলিত কথা থাকিলেও সে ভাষা সর্ব্বত্র বিশদ এবং প্রসাদ-গুণ-বিশিষ্ট। গ্রন্থকারের মনও যেমন সরল ভগবৎভক্তিতে পূর্ণ, তাঁহার ভাষাতেও তেমনি কি সরল লালিত্য আছে, যাহাতে তাঁহার 'চাবেনা' (ছোলা ভাজা), 'সহরপানা' (নগর প্রাচীর) প্রভৃতি এখনকার অপ্রচলিত কথাগুলি কিছুমাত্র শ্রুতিকঠোর বলিয়া বোধ

হয় না, বরং শিশুর অস্ফুট বাক্যধ্বনির মত স্বতঃই পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করে। সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের পরে অনেকে ভ্রমণকাহিনী লিখিয়াছেন, কোন কোন কাহিনীর ভাষা সুমার্জ্জিত এবং লিপিকৌশল অনিন্দ্যসুন্দর, কিন্তু সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের রচনায় কি এক বালভাষিতার মাধুরী, তাঁহার লিখন-ভঙ্গীতে কি এক সরল সৌন্দর্য্য আছে, যাহার তুলনা নাই।

এই ভ্রমণ-বিবরণে গ্রন্থকার সরল বিশ্বাসে এমন অনেক কথা লিখিয়াছেন, যাহা ভ্রমাত্মক। কিন্তু ইহা মনে হয় না, তিনি কল্পনার বশীভূত হইয়া, জানিয়া শুনিয়া তাঁহার বিবরণ কোথাও অতিরঞ্জিত করিয়াছেন। অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয়ের 'পুরাতন প্রসঙ্গ' বিষয়ক একটী রচনায় পড়িয়াছিলাম, পণ্ডিতবর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় একদিন এ-যুগের শ্রেষ্ঠ ভ্রমণকাহিনী লেখক জলধর সেন মহাশয়কে সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি হিমালয়ের ভ্রমণ বিষয়ে যে সকল কথা লিখিয়াছেন, সেগুলি কি সব সত্য। অবশ্য জলধর বাবু ঐ প্রশ্নের সদুত্তর দানে পণ্ডিতপ্রবরের মনের সন্দেহ দূর করেন। সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের ভ্রমণকাহিনীতে বিস্ময়কর ও ভ্রমাত্মক কথার উল্লেখ থাকিলেও সেগুলি যে তিনি সরল বিশ্বাসের বশীভূত হইয়াই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, সুতরাং কৃষ্ণকমল বাবুর মত সন্দেহসূচক প্রশ্ন সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের ভ্রমণকাহিনী সম্বন্ধে উঠিতে পারে, এরূপ আমাদের মনেই হয় না।

সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এমন অনেক বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন, যাহার প্রকৃত নাম বা ইতিহাস তিনি জানিতে পারেন নাই—কিন্তু তাহা আমরা তাঁহার বর্ণনা হইতে সহজেই বুঝিতে পারি। কয়েকটী উদাহরণ দিব। বিহারপ্রদেশে সাসেরামের বর্ণনা স্থলে তিনি লিখিয়াছেন, "এক পুষ্করিণী আছে, তাহার মধ্যস্থলে এক বাড়ী আছে", সর্ব্বাধিকারী মহাশয় অবগত ছিলেন না যে, যে রাজবর্ত্ম (Grand Trunk Raod) অবলম্বন করিয়া তিনি বঙ্গদেশ হইতে সুদূর পশ্চিমে গিয়াছিলেন, সেই রাস্তাটী যিনি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন "সেই বাড়ী" প্রজাহিতৈষী সম্রাট সেরসাহের সমাধিভবন। প্রাচীন দিল্লীতে পৃথ্বিরাজের যজ্ঞস্থল বর্ণনা কালে তিনি লিখিয়াছেন (লৌহ স্তম্ভের) কিঞ্চিৎ দূরে, এক প্রস্তর-নির্ম্মিত শুণ্ডাকৃতি বৃহৎ ও উচ্চ এক ঘর আছে, ক্রমে ছয়তলা উচ্চ। ঐ শুণ্ডাকৃতি ঘরে কল আছে।" এই বর্ণনা পাঠ করিলে কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, তিনি কুতবমিনারের কথাই বলিতেছেন। মিনারের বারাণ্ডাগুলিকে এক একটী তলা ধরিয়াছেন,—অবশ্য 'তলা'গুলির উচ্চতার সহিত সাধারণ বাটীর তলার তুলনা হয় না—স্তম্ভটী ২৩৮ ফিট উচ্চ, কলিকাতার মনুমেণ্টের প্রায় দ্বিগুণ হইবে। আগ্রার উপকণ্ঠে সেকেন্দ্রার বর্ণনা কালে তিনি লিখিয়াছেন "ঐ বাগে (সেকেন্দ্রাবাগে) সেকেন্দর বাদসাহের এক মসজিদ আছে, ঐ মসজিদ নানারঙ্গের প্রস্তরে নির্ম্মিত।" এস্থলেও সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের বর্ণনার বিষয়টী আকবর বাদসাহের সুরম্য সমাধিভবন সেকেন্দ্রা। বর্ত্তমান অযোধ্যা নগরের বর্ণনাস্থলে সর্ব্বাধিকারী মহাশয় লিখিয়াছেন "এই অযোধ্যাপুরী সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের প্রথমাবধি রাজধানী। * * যে স্থানে রাজসিংহাসন ছিল, উচ্চ ঢিপের ন্যায় হইয়াছে।"

ভক্ত যদুনাথ এক্ষণে জীবিত থাকিলে শুনিয়া বিস্মিত হইতেন এবং হয়ত ক্ষুব্ধ হইতেন ও নাস্তিকের কথা বলিয়া অগ্রাহ্য করিতেন, আধুনিক প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদেরা বলেন যে, বর্ত্তমান অযোধ্যানগরী যেখানে বিরাজমান, ঠিক সেইখানে রামায়ণের বর্ণিত অযোধ্যাপুরী ছিল কি না, তাহার কোন প্রমাণ নাই এবং সর্ব্বাধিকারী মহাশয় যে 'উচ্চ ঢীপে'র কথা বলিয়াছেন, সেটী একটী বৌদ্ধ স্তুপের ভগ্নাবশেষ বলিয়া তাঁহারা অনুমান করেন। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় যে সময়ে তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন, তাহার পর তাঁহার দৃষ্ট নগরাদির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, "লক্ষ্ণৌ সহরে মচ্ছিভবন নামে এক বৃহৎ বাড়ী আছে। * * যে বেলিগারদ আছে, লালদীঘির উত্তর যেমন ইংরাজী ব্যারাক—সৈন্যগণের বাসস্থান আছে, সেই মত বারিক কোথাও নাই।" অল্পদিন পরেই সিপাহী-বিদ্রোহের সময় সেই মচ্ছিভবন ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে এবং সেই "বারিক" ও "বেলিগারদ" কামানের গোলার আঘাত চিহ্ন সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিয়া কঙ্কালসার অবস্থায় সেই লোমহর্ষণ কাণ্ডের স্মৃতি জাগরুক রাখিয়াছে। মুঙ্গেরে গিয়া সর্ব্বাধিকারী মহাশয় "সীতাকুণ্ড" দেখিয়া আসিয়াছিলেন। এক্ষণে আর একটী উষ্ণ জলের প্রস্রবণ ফিবিস কুণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের তীর্থ ভ্রমণের পরে পথ ঘাটের ও নগরাদির অল্প বিস্তর পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অটল অচল তুষারমণ্ডিত নগনদী-কান্তার-ভূষিত হিমালয়ের কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই—যাত্রাপথের অনেক সুবিধা হইয়াছে, লছমন ঝোলা, সেতুতে পরিণত হইয়াছে—কিন্তু হরিদ্বার হইতে বদরী-নারায়ণের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের সেই দৃশ্য সমূহের বর্ণনার মাধুর্য্য চিত্তহারী। তাঁহার সেই দুর্গম তীর্থ প্রয়াণের বিবরণ, মহাপ্রস্থানের পন্থার কথা, হরিদ্বারে কুম্ভমেলার বর্ণনা কৌতূহলপ্রদ, আনন্দদায়ক ও শিক্ষা-প্রদ। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন "কেদার নাথ গমনে চারি দিবসের পথ কেবল গোলা-পের গাছ; পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া বন পর্ব্বত সুশোভিত, গন্ধে আমোদিত, আর পথে পথে কত শত স্থানে কুন্দ শেফালিকা করবী ইত্যাদি আছে। বদরীনারায়ণ যাইবার পথে তিন দিবসের পথ সেওতি, দুই দিবসের পথ গোলাপ পুষ্পের বন, বরাক পুষ্পের গাছ সকল, জবাপুষ্পের ন্যায় অন্তর হইতে দৃষ্ট হই-তেছে—এইরূপে পর্ব্বত সকল সুশোভিত। পর্ব্বতে ভ্রমণ করিলে দুঃখ ক্লেশ, মায়ামোহ কিছু থাকে না।" এইরূপ বর্ণনা পড়িয়া আমা-দের মনে হয়, আমরা কি দুর্ভাগ্য—এ দৃশ্য দেখিয়া নয়ন মন তৃপ্ত জীবন সার্থক করিতে পারিলাম না। বসোরা রোজ, ব্লাক প্রিন্স, মটিকুষ্ট, মার্শাল নীল প্রভৃতি বিদেশীয় নাম গুলি শুনিয়া আমাদের ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল, বুঝি গোলাপ গাছ বিদেশীয় আমদানি—ভার-তীয় নহে—কিন্তু সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের বর্ণ-নায় আমাদের সেই ভ্রম বিদূরিত হয়—আমরা বুঝিতে পারি, প্রাকৃতিক দৃশ্যে ভারতভূমি অপরাজেয়—এই মহীমণ্ডলের একটী ক্ষুদ্র কিন্তু সুসম্পূর্ণ সংস্করণ বিশেষ।

অপরাপর সহজগম্য তীর্থাদির বর্ণনাতেও সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের লিপি-কুশলতার বিশে-ষত্ব জাজ্জ্বল্যমান। বিশেষতঃ তাঁহার মথুরা, ব্রজভূমি ও বৃন্দাবন ধামের বর্ণনা, চাবিট,

চ্যাবিদের দ্বাদশ বন প্রভৃতির বর্ণনা, বারাণসী ধামের বিবরণে জানিবার, শিখিবার অনেক কথা আছে—তাঁহার বিশ্বেশ্বরের আরতি বর্ণনা উপাদেয়। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের এবং বৃন্দাবনে গোবিন্দদেবের প্রাচীন মন্দিরের আওরংজেবের রাজত্বকালে ভাগ্য-বিপর্যায়ের কথা, করুণরসোদ্দীপক। জলন্ধর হইতে দিল্লীর পথে রেওয়াড়েশ্বর তীর্থের বিবরণে তিনি লিখিয়াছেন "রেওয়াড়েশ্বর তীর্থকুণ্ড মধ্যে প্রস্তর উপরে মৃত্তিকা, তদুপরি বৃক্ষাদি হইয়াছে, ঐ পর্ব্বত জলে ভাসিয়া বেড়ায়, তাহার নাম বেড়া কহে, পৃথক পৃথক নাম আছে। কুণ্ডের জল অতলস্পর্শ, দীর্ঘে প্রস্থে দুই ক্রোশের পরিক্রম। ঐ জলমধ্যে সাত বেড়া আছে।" ঐ "বেড়া"গুলির বর্ণনা বিস্ময়কর ও কৌতূহলপ্রদ।

জয়পুরে গিয়া সর্ব্বাধিকারী মহাশয় মহারাজা জয়সিংহের প্রতিষ্ঠিত শীলাদেবী দর্শন করেন। সেই প্রসঙ্গে প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব মহাশয় এই গ্রন্থের, মুখবন্ধে লিখিয়াছেন, "সর্ব্বাধিকারী মহাশয় স্বচক্ষে শীলাদেবী দর্শন করিয়া রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রেরই সমর্থন করিয়াছেন, অথচ যশোর, খুলনার ইতিহাস লেখক প্রমাণ করিতে চান যে, যশোরেশ্বরী মূর্ত্তি মলই পরগণার অন্তর্গত কপিলমুনি নামক স্থানে বিরাজ করিতেছেন।" আমরা প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের এই মন্তব্যের সার্থকতা বুঝিলাম না। মানসিংহ যে বঙ্গদেশ হইতে শিলাদেবীকে লইয়া গিয়া জয়পুরে স্থাপনা করেন এবং সেই শিলাদেবী যে প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরী বলিয়া প্রচার করেন, একথা সকলেই জানেন। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সেই শিলাদেবীকে ৬০ বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয় এখনও গিয়া সেই মূর্ত্তি দেখিয়া আসিতে পারেন। এমন কি, সেই শিলাদেবীর যে দেবল ব্রাহ্মণগণকে যশোহর হইতে লইয়া গিয়া মানসিংহ জয়পুরে বাস করাইয়াছিলেন, তাহাদের বংশধরগণকে দেখিয়া আসিতে পারেন। তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। কথা হইতেছে এই যে, মানসিংহ যে শিলাদেবীকে লইয়াছিলেন, সেইটীই প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরী, না সেই মূর্ত্তি গোপন করিয়া রাখিয়া যশোহর-বাসীরা তাঁহাকে অন্য একটী শিলাদেবী দিয়াছিল? বঙ্গদেশে তৎকালে যে একাধিক শিলাদেবী ছিলেন, একথা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়কে স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমাদের ধৃষ্টতা মাত্র। তিনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, মানসিংহ যে সময়ে প্রতাপাদিত্যকে জয় করেন, সেই সময়ে তিনি বিক্রমপুরের কেদার রায়কেও পরাজিত করিয়া শ্রীপুর হইতে চাঁদ রায় কেদার রায় ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতিষ্ঠিত শিলাদেবীকেও জয়পুরে লইয়া যান। সুতরাং মানসিংহ যে দেবী প্রতিমাকে প্রতাপাদিত্যের শিলাদেবী বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সেই শিলাদেবীই যে প্রতাপাদিত্যের প্রকৃত যশোরেশ্বরী মূর্ত্তি, একথা সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের স্বচক্ষে দেখাতে প্রমাণ হয় না। সে যাহা হউক, সর্ব্বাধিকারী মহাশয় শিলাদেবীর যে পূর্ব্ব ইতিহাস দিয়াছেন ও বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি লিখিয়াছেন, "পাহাড়ের উত্তর পশ্চিম ছয় ক্রোশ যাইয়া পাহাড়ের উপরে শিলাদেবী আছেন, ঐ দেবী পূর্ব্বে মথুরাতে কংশ রাজার রঙ্গস্থলে শিলারূপে ছিলেন। ঐ শিলাতে দেবকীর সন্তানগণকে আছাড়িয়া বিনষ্ট করিত। যৎকালে যোগমায়াকে ঐ শিলার উপর আছড়াইতে গিয়াছিল, শিলা স্পর্শ মাত্র দেবী অষ্টভূজা

হইয়া শূন্যপথে গমন করিলেন। ঐ যে শিলা তথায় ছিল, যৎকালে প্রতাপাদিত্য যশোর নগর হইতে এতদ্দেশে আসিয়াছিলেন, ঐ প্রস্তরে এক দেবী মূর্ত্তি নির্ম্মিত করাইয়া স্বদেশে লইয়া যান।”

আজমীর দর্শন করিতে গিয়া স্থানীয় বিখ্যাত পীর মুনিউদ্দিন চিস্তির মর্ম্মর প্রস্তর-নির্ম্মিত সুরম্য সমাধি-ভবনের বা খাজা সাহেবের দরগার পূর্ব্ব ইতিহাস সম্বন্ধে সর্ব্বাধিকারী মহাশয় লিখিয়াছেন—

“আজমীর সহরে খাজা সাহেব বলিয়া এক পীর আছেন, বড় জাগ্রত। তাঁহার ফকিরগণ পথ হইতে যাত্রিগণকে লইয়া যায়। তথায় হিন্দু মুসলমান সর্ব্বজাতি দর্শনার্থে যায়,তাহার কারণ, ঐ স্থানে চন্দ্রনাথ নামে এক অনাদি শিব ছিলেন। তাঁহার নিকট এক বৃক্ষ ছিল। আজমীর সহরে মুসলমানের অধিক বসতি। একজন ভিস্তি জল সমেত আপন ভিস্তী ঐ গাছের উপর রাখিয়া আহারাদি করিতেছিল, ঐ গাছের উপর হইতে ভিস্তীর জল টোপা টোপা শিবের মস্তকে পতিত হওয়াতে,মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া প্রকট হইয়া ঐ ভিস্তীকে কহিলেন ‘আমি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে বর দিতে আসিয়াছি। তোমার যাহা ইচ্ছা হয়,তাহা চাহ, আমি দিব।’ ঐ ভিস্তী কহিল যে, ‘তুমি কে?’ শিব কহিলেন, ‘আমি এই স্থানে আছি। আমি চন্দ্রনাথ শিব, এই বৃক্ষমূলে আছি। তুমি আজ আমার মস্তকে জলধারা দিয়া তৃপ্ত করিয়াছ। এজন্য তোমাকে সদয় হইয়া বর দিতে আসিয়াছি।’ ঐ ভিস্তী তখন কহিল, “যদি আমাকে বর দিবে, তবে এই বর দেও, এই স্থানে তোমার যে নাম প্রকাশ আছে, তাহা গুপ্ত হইয়া আমার নাম প্রকাশ থাকে।’ তাহাতে শিবজি কহিলেন, ‘তথাস্তু’ অর্থাৎ তাহাই হইবে। ‘আমি গোপন হইলাম। আমার উপরে তোমার মসজিদ কবর হইবে, তাহাতে তোমার নাম খাজা সাহেব বলিয়া প্রকাশ থাকিবে। কিন্তু তোমার যে কেহ সেবাতি হইবে, তাহারা মুসলমানের ভক্ষ্য দ্রব্য আহার করিতে পারিবে না।’ তাহা সে স্বীকার করিল। মহাদেব আশুতোষ স্বভাবে বর দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তাহার পরিবারগণ ফকির হইয়া শুদ্ধাচারে আছেন।”

এইরূপ কৌতূহলোদ্দীপক প্রবাদ গল্পে সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের ভ্রমণ-কাহিনী হিরণ্য থালে সজ্জিত মরকত মাণিক্য মুক্তার নৈবেদ্যের ন্যায় ভক্তি ও বিশ্বাসের প্রভায় ঝলমল করিতেছে। শুধু যে স্বধর্ম্মনিষ্ঠাবান পাঠকের নিকট ভক্ত যদুনাথের এই ভ্রমণ কাহিনী ভক্তি-যত্ন আদরের বস্তু বলিয়া পূজিত হইবে, তাহা নহে, সাধারণ পাঠকগণ এই গ্রন্থে আনন্দ উপভোগ করিবার অনেক বিষয় পাইবেন।

সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস, স্মৃতি-কাহিনী প্রভৃতি ইংরাজীতে অগণ্য প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের মনে হয়, সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সেই বিদ্রোহ ঘটনাকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের কেন্দ্র স্থানীয় বারাণসীধামে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শনের ও শ্রুতি স্মৃতির যে বিবরণ, এই তীর্থ পর্য্যটন-কাহিনী পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা ইংরাজিতে অনূদিত হইলে সেই বিদ্রোহ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন ও গৌরব বর্দ্ধিত করিতে পারে। ইংরাজ পাঠকও যে আমাদেরই মত সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের বিনাড়ম্বর সরল কাহিনীতে মুগ্ধ হইবেন, ইহা আমাদের ধ্রুব ধারণা।

সাহিত্য পরিষৎ হইতে এতাবৎকাল যে

সকল প্রাচীন গ্রন্থ বা পুঁথি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ভাষাতত্ত্বের ও প্রাচীন কাব্যের অনুশীলনকারী সুধীবৃন্দ উপকৃত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু বঙ্গীয় পাঠক সাধারণ যে সেই সকল গ্রন্থ পাঠে আগ্রহ প্রকাশ করিবেন, এরূপ বলা যায় না। উপস্থিত ক্ষেত্রে কিন্তু সাহিত্য-পরিষৎ 'এক ঢিলে দুই পাখী মারিয়াছেন'—রামমোহন রায়ের অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগের বাঙ্গালা গদ্য রচনার একটী উৎকৃষ্ট নমুনা সুধীসমাজে উপস্থাপিত করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে সাধারণ পাঠককেও একখানি সুখপাঠ্য, শিক্ষাপ্রদ ও উপাদেয় গ্রন্থপাঠের সুযোগ দিয়াছেন। সেজন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষগণ বঙ্গীয় পাঠকবৃন্দকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন, এবং গ্রন্থকারের দেশমান্য বংশধরগণও, একালের পাঠকগণের প্রীতিপ্রদ হইবে কি না, সেই সঙ্কোচ সন্দেহ পরিহার করিয়া, তাঁহাদের পূজার সামগ্রী লোকলোচনে প্রকাশ করিতে দিয়া, আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

শেষ কথা, ভক্ত যদুনাথের মত সরল স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বাঙ্গালীর আদর্শ ক্রমেই সমাজে বিরল হইয়া আসিতেছে, তাঁহার জীবনকথা ও ভ্রমণকাহিনী পাঠ করিয়া আমরা পরমানন্দ উপভোগ করিয়াছি,—ধন্য হইয়াছি, পাঠকের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারাও এই কাহিনী পাঠ করিয়া বিমল আনন্দ লাভ করুন—ধন্য হউন। শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

দেশের ও সাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু ৺ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী। (১)

(জন্ম—১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ—১৭ই সেপ্টেম্বর, ২৪ পরগণার অন্তর্গত বড়িশা গ্রামে।

স্বর্গারোহণ—৩০শে জুন, ১৯১৬, উড়িষ্যা—কটকে।)

মহামতি ডিরোজিওর আদর্শছাত্র রামতনু এবং রিচার্ডসনের আদর্শছাত্র রাজনারায়ণ বঙ্গের আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। তাঁহাদের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, পুণ্যশ্লোক প্যারীচরণ সরকার। তাঁহাদের স্থান পরবর্ত্তীকালে অধিকার করিয়াছিলেন, ৺ রত্নমণি গুপ্ত, ৺ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত জগবন্ধু লাহা, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন প্রভৃতি। ভুবনমোহনের চরিত্রাদর্শে ৺নবকৃষ্ণ ভাদুড়ী, ৺রসিকলাল রায় প্রভৃতির উত্থান হইয়াছিল। সে কথা আমরা অন্যান্য প্রবন্ধে লিখিব। ক্ষীরোদচন্দ্রের শিক্ষার আদর্শে শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত এ, চৌধুরী, শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির অভ্যুদয় হইয়াছে। এই মহাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবনের কার্য্যাবলি ও অন্যান্য সহযোগিগণ এবং একজন সহপাঠী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিয়া পরে ক্ষীরোদচন্দ্রের প্রস্ফুট জীবনের বিশেষত্ব ঘোষণা করিব।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে—বি-এ পাশ।

১৮৭৩ „ উত্তরপাড়া গভর্ণমেণ্ট স্কুলে চাকরী।

১৮৭৪ „ এম্-এ পাশ—প্রথম স্থান অধিকার করেন।

প্রথম বিবাহ হিন্দুসমাজে করেন, তারিখ অজ্ঞাত।

১৮৭৪ „ এম-এ, পরীক্ষা দিবার পর দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হন। আগ্রা, দিল্লী, আজমীঢ়, অমৃতসর, লাহোর প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ।

১৮৭৫ „ ভাগলপুরের হেডমাষ্টারী।

১৮৭৭ „ হেয়ার স্কুলের চাকুরী।

১৮৭৮ „ প্রথম উড়িষ্যায় আগমন, রেভেন্সা স্কুলের হেডমাষ্টারী (ইহার বিবরণ 'পত্রাবলী'র প্রথম প্রবন্ধে দেখিবেন।)

১৮৭৮ „ দ্বিতীয় বিবাহ।

১৮৭৯ „ পুরী জিলা স্কুলের হেডমাষ্টারী।

১৮৮১ „ কৃষ্ণনগরে গমন, তথাকার স্কুলের হেডমাষ্টারী।

১৮৮২ „ 'বঙ্গবাসী' প্রকাশে বিশেষ সহায়তা। (পত্রাবলী দেখুন)

১৮৮২ „ বহরমপুর কলেজে চাকুরী, তথায় চারিবর্ষ ছিলেন।

১৮৮৭ „ সাঁওতাল পরগণায় ডেপুটি ইনস্পেক্টরী।

তৎপরে ছাপরা জিলা স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়া যান। এখানে যখন তিনি প্রথম যান, তখন ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩০০, কিন্তু স্কুল ছাড়িয়া আসিবার সময় ছাত্র সংখ্যা হইয়াছিল ৭০০।

হুগলীতে গমন। তথাকার কলেজের প্রিন্সিপালি।

পুনরায় কটকে র‍্যাভেন্সা কলেজে প্রিন্সিপাল হইয়া আসেন।

চট্টগ্রামে গমন—কলেজের প্রিন্সিপালী, বৌদ্ধসভা প্রভৃতি স্থাপনে বক্তৃতা ও চাঁদা সংগ্রহ ইত্যাদি। (বৌদ্ধবন্ধু মন্তব্য দ্রষ্টব্য।—আষাঢ় ১৩২৩ দেখুন) চট্টগ্রামে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় ও পেন্সন লইয়া কটকে আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করেন।

১৮৯৯—পুনরায় বিবাহ করেন। আসামের সুপ্রসিদ্ধ রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুরের কন্যা। রায়বাহাদুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য ছিলেন। তিনি নব আসামের অভ্যুদয়ের কারণ।

১৯০৫—ষ্টার-অব-উৎকল নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ। ক্রমে ইহা সপ্তাহে দুইবার ও পরে তিনবার প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯০৯—"মৃণ্ময়ী"নাম্নী বাঙ্গালা পত্রিকা প্রকাশ। কয়েক বর্ষ সুদক্ষতার সহিত পরিচালিত হইবার পর উহা উঠিয়া যায়।

ষ্টার-প্রেস সংস্থাপন ও ষ্টার-অব-উৎকল নিজের প্রেস হইতে বাহির করেন।

১৯১৪—স্বাস্থ্যভঙ্গ। অত্যন্ত পরিশ্রম ইহার কারণ। ডাক্তারেরা বারবার কাজ বন্ধ করিতে বলেন। কিন্তু দৃঢ়চেতা তিনি সে কথায় কাণ দেন নাই।

১৯১৫—গভর্ণমেন্ট 'ষ্টার-অব-উৎকলের' জন্য জামীন চান। স্বাধীনচেতা বীর তাহাতে সম্মত না হইয়া কাগজ উঠাইয়া দেন।

১৯১৫—'হিন্দুকালেজ' নামক স্কুল স্থাপন। প্রথমে মাত্র বারটী ছাত্র লইয়া স্কুল আরম্ভ হয়। এবং যখন স্কুলের অবস্থা খুবই ভাল, তখন তাঁহার সহকারী শিক্ষক জগবন্ধু ব্যানার্জ্জী (তিনকড়ি বাবু উকীলের পুত্র ; যখন তিনকড়ি বাবু প্রথম কটকে আসেন, তখন তাঁহারই বাসাতে ছিলেন) স্কুলের খাতাপত্র ও Furniture লইয়া নিজে স্কুল চালাইতে আরম্ভ করেন। বলা বাহুল্য তিনি (ক্ষীরোদ চন্দ্র) নিজে ঘর হইতে টাকা দিতেন। তাহাতে না দমিয়া ক্ষীরোদচন্দ্র স্বীয় চারিটী পুত্র লইয়া অপর এক জায়গায় স্কুল চালান। এখন তাহার ছাত্রসংখ্যা দুই শতেরও অধিক। এই স্কুল চালাইতে তাঁহাকে অনেক অত্যাচার,

অনেক গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রকন্যা সকলেই স্কুল বন্ধ করিয়া rest লইতে বলিয়াছিল; কিন্তু তিনি তাহা শুনেন নাই। ডাক্তারেরা সকলেই এ কার্য্য হইতে অবসর লইতে উপদেশ দিয়াছিল, কিন্তু ক্ষীরোদচন্দ্র তাহাতে কাণ দেন নাই। বলিতে কি, এই স্কুলই তাঁহার কাল হইল। ২৭ এ জুন স্কুলে গিয়া তিনি শুনিলেন—সেই জগদ্বন্ধুর ষড়যন্ত্রে কতকগুলি শিক্ষক ও ছাত্র স্কুল হইতে বাহির হইয়া যাইতে চায়। তথায় তিনি অনেক বকাবকি করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন। গৃহে ফিরিবার পরেই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। পূর্ব্বের জ্ঞান আর ফিরিল না! চিকিৎসার ত্রুটি হয় নাই। সেবারও ত্রুটী হয় নাই। কিন্তু সে মহাত্মার মুদিত চক্ষু আর বারেকের তরে খুলিল না! ৩০শে জুন প্রাতে সকলই শেষ হইয়া গেল!

কিছুদিন পূর্ব্বে 'পত্রাবলী'তে যে তিনি লিখিয়াছিলেন "সেমধুচক্র ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; এখন কটকে একজন মরিলেও অপরে তাহার সংবাদ লয় না।" ইহার প্রমাণ তাঁহার মৃত্যুতে আমরা পাইয়াছি। যে কটকে ৬০,০০০ লোকের বাস, তাহার মধ্যে ৫০০ শত লোকও তাঁহার মৃত্যুতে মর্ম্মাহত হয় নাই। শ্মশানে একশত লোকও যায় নাই! মৃত্যুর কিছুদিন পরে Oriya People's Association নোটিশ প্রচার করিল যে শোকসভা হইবে। সে শোকসভা লোকের অভাবে হইল না। সেক্রেটারী নিজে নোটিশ দিলেন, কিন্তু সভায় উপস্থিত হন নাই।

একদিনে তিনি শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচার্য্য (শাস্ত্রী) ৺আনন্দমোহন বসু, ৺কৃষ্ণবিহারী সেন, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত, ৺অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িবারকালে তাঁহার সহপাঠী ছিলেন—শ্রীনাথ দত্ত, ৺রজনীনাথ রায়, শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

অতি অল্প বয়সেই তিনি পিতৃহীন হন। চৌদ্দ বর্ষ বালকের মস্তকের উপর সংসারের ভার পড়ে। বিধবা মাতা, এক বিধবা ভগ্নী, ভ্রাতা প্রভৃতির প্রতিপালক হইলেন—বালক ক্ষীরোদচন্দ্র। সেই সংসার গুছাইয়া কুঁড়েঘর হইতে দ্বিতল গৃহ নির্ম্মাণ করান। তাঁহার ভ্রাতাকে বরাবর সাহায্য করিয়াছিলেন। কতবার কত বিপদ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র ভাল ছিল না, সুতরাং অনেকবার তাঁহাকে অনেক বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। সেই ভ্রাতার অনাথ পুত্রকে তিনি স্বীয় গৃহে রাখিয়া প্রতিপালন করিতেছিলেন।

বন্ধুপ্রেম—তাঁহার জীবনের এক প্রধান গুণ ছিল। ছাত্রাবস্থায় তিনি একবার একটী খুব ভাল চাকরী পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন যে, তাঁহার বন্ধু রজনীনাথ অর্থাভাবে এক মহিলাকে বিবাহ করিতে পারিতেছেন না—উদারচরিত তিনি তৎক্ষণাৎ সে চাকুরী বন্ধুকে দিয়া দিলেন। পঠদ্দশায় তাঁহাকে অশেষ ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। দৈনিক দুই পয়সার বেশী খরচ করিতেন না। তাহাতেই তাঁহার খাওয়া চলিত। প্রত্যহ বঁড়িশা হইতে স্কুল যাইতেন ও ফিরিয়া আসিতেন।

তাঁহার ছাত্রবৃন্দ—তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই আজ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

১। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—বরিশাল।

তিনি মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে গল্প করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—'আমার ছাত্রের মধ্যে কেহ কেহ আজ প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার, ডাক্তার,কেহ হাইকোর্টের জজ, কেহ ভাইস-চেন্সলার—কিন্তু আমার নাম রক্ষা করিয়াছে জগদীশ।'

২। শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত পত্রালাপ ছিল।

৩। শ্রীযুক্ত জষ্টিশ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

৪। ,, ,, আশুতোষ চৌধুরী।

৫। ,, নদীপুরের মহারাজা।

৬। ,, হীরালাল বসু।

৭। আসামের চারুচন্দ্র গোস্বামী।

৮। বেহার হাইকোর্টের জজ মল্লিক প্রভৃতি।

তাঁহার সাহিত্যিক জীবন। তাঁহার বাঙ্গালা বহিগুলির নাম।

১। মানব-প্রকৃতি। ২। বনফুল। ৩। প্রেমহার। ৪। বিবিধ প্রবন্ধ। ৫। ভারতবর্ষের ইতিহাস। ৬। কুসুমিকা।

তাঁহার ইংরেজী গ্রন্থের মধ্যে Aborigines of Bengal নামক পুস্তকখানিতে তিনি খুব সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু ইংরাজী কাব্য ও গ্রন্থের Note লিখিয়াছিলেন।

'মানব-প্রকৃতি' পুস্তক তাঁহার রচিত গ্রন্থরাজির মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এ সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় আর পুস্তক লিখিত হয় নাই। ইহা তামিল, তেলুগু, মারহাট্টা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। 'মানব-প্রকৃতি' পুস্তক প্রণয়নে তাঁহার অনেক কষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। পুস্তকখানির পাণ্ডুলিপি যখন লেখা হইয়া গিয়াছে ও যখন তিনি তাহা Revise করিতেছিলেন, এরূপ সময়ে এক-দিন তাঁহার পত্নী (দ্বিতীয়) ভাত বাড়িয়া তাঁহাকে ভাত খাইতে ডাকেন। তিনি তখন এত একাগ্রচিত্তে পুস্তক দেখিতেছিলেন যে, তিনি সে কথা ভুলিয়াই গেলেন। কিয়ৎকাল পরে বারম্বার ডাকার পরও যখন জবাব পাইলেন না, তখন ক্রুদ্ধা পত্নী আসিয়া পুস্তকখানি লইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। এই অবস্থা দেখিয়া ক্ষীরোদচন্দ্র তৎক্ষণাৎ পাগলের মত হইয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া যান। তখন ৺ব্রজসুন্দর বসু মহাশয় (শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ার পিতা) বহরমপুরে থাকিতেন। ক্ষীরোদচন্দ্র তাঁহার গৃহে গেলেন। ব্রজসুন্দর বাবুর অন্যতমা কন্যা শ্রীমতী সৌদামিনী তখন সেখানে থাকিতেন। তিনি ক্ষীরোদচন্দ্রের নিকট হইতে সকল ঘটনা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ও সেই ছিন্নভিন্ন কাগজের টুকরা আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া আসেন। এক মাস পরে তিনি ক্ষীরোদচন্দ্রকে সেই পাণ্ডুলিপি নূতন কপি করিয়া দেন। তিনি প্রত্যেক টুকরা সেলাই করতঃ page মিলাইয়া তাহা ঠিক করিয়া কপি করেন। ইহা না হইলে 'মানবপ্রকৃতি' বাহির হইত কি না সন্দেহ। 'মানবপ্রকৃতি' বিক্রয় করিয়া তিনি কলিকাতার সমাজপাড়ায় এক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "Antiquities of Orissa পুস্তকের প্রধান সহায়ক যে তিনি ছিলেন,ইহা ডাক্তার মিত্র মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ('মৃণ্ময়ী' দ্বিতীয় বর্ষ দেখুন।)

বৈষ্ণব ও বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগ। রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সহিত তাঁহার আলাপ হয় বৈদ্যনাথে। আলাপ করাইয়া দেন, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু। রাজনারায়ণ বাবু তাঁহাকে বৈষ্ণব

বলিয়া জানিতেন, কারণ তখন তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ব আলোচনা করিতেন। রাজনারায়ণ বাবু পূর্ণ দুই ঘণ্টাকাল তাঁহার সহিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বিদায় লইবার সময় যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি ইহাঁকে বৈষ্ণব মনে করেন?" রাজনারায়ণ বাবু চমকাইয়া উঠিয়া বলেন—'তবে'। তখন যোগীন্দ্র বাবু বলিলেন—'ইনি যে ব্রাহ্ম।' রাজনারায়ণ বাবু তখন তাঁহার সহিত আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—'আপনিই প্রকৃত ব্রাহ্ম। সকল ধর্ম্মেই যাঁহার অনুরাগ, তিনি আমার নমস্য।" তিনি অনেক পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেগুলি পাণ্ডুলিপি আকারে এখনও তাঁহার গৃহে আছে। ৺শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনি তাঁহার স্বহস্তে লিখিত একখানি পুস্তক ক্ষীরোদচন্দ্রকে প্রীতি-উপহার দেন। 'মৃণ্ময়ী' প্রকাশ করিলে তিনি 'মৃণ্ময়ী'কে উদার বৈষ্ণব ধর্ম্মের মার্গে লইয়া যাইবেন বলিয়াছিলেন।

এক সময়ে তাঁহাপেক্ষা ক্ষমতাশালী বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত লেখক কেহ ছিলেন না। চট্টগ্রামে পালি শিক্ষারম্ভ করেন তিনি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালির পরীক্ষার সৃষ্টির মূলে ছিলেন তিনি। তিনি স্বয়ং ভগবান বুদ্ধের একজন ভক্ত ছিলেন। তিনি নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি দূর দেশ হইতে বুদ্ধমূর্ত্তি সংগ্রহ করেন। সেগুলি এখনও তাঁহার গৃহে আছে। পুত্রদিগকেও তিনি বৌদ্ধধর্ম্মালোচনায় নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেন ও তাহাদের দ্বারা লেখাইয়া প্রবন্ধ শ্রীমৎ শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামীর নিকট পাঠাইতেন। বৌদ্ধধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। "নব্যভারতে" তিনি এ বিষয়ে ধারাবাহিকরূপে প্রবন্ধ লিখিতেন। সে সকলগুলি পুস্তক আকারে প্রকাশ হইলে সুন্দর হয়। চট্টগ্রামে থাকিবার সময় তিনি বৌদ্ধদিগের জন্য এত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম যে, কেহ কেহ ভাবিত, বুদ্ধ রূপে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। পালিশিক্ষা দিবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন ও তাহারই ফলে আজ বৌদ্ধদিগের সুপ্রভাত। যখন "বৌদ্ধবন্ধু" প্রকাশিত হয়, তখন তিনি তাহার সম্পাদন কার্য্যে অশেষ প্রকারে সাহায্য করেন।

তিনি একজন প্রকৃত স্বদেশভক্ত ছিলেন। গোখলের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তিনি এতদূর মর্ম্মাহত হন যে, তাহার ফলে তিনি ভয়ানক অসুস্থ হইয়া পড়েন। তিনি তখন বলিতেন, 'দেশের এখন কি হবে? বাড়ীতে আর মাছমাংস আনিও না। স্বদেশের জন্য খাটিয়া খাটিয়া তিনি জীবন দিলেন। এত পরিশ্রম তাঁহার শরীরে সহিল না।'

শিক্ষাদান মহাব্রত তিনি যৌবনে লইয়াছিলেন। পুনরায় তাহাতেই তাঁহার জীবন শেষ হয়। রোগের দিন পর্য্যন্তও তিনি স্বীয় স্থাপিত বিদ্যালয়ে পূর্ণ তিন ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় শক্তিশালী শিক্ষক ভারতে বিরল। তিনি যখন পড়াইতেন, তখন ছাত্রেরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ থাকিত। মাত্র দেড়মাস পড়াইয়া তিনি স্বীয় স্কুল হইতে প্রাইভেট রূপে তিনটী ছাত্রকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করান। ঐ সকল ছাত্রেরা পূর্ব্বে ৩।৪ বার করিয়া ফেল হওয়াতে কেহ কখন ভাবেও নাই যে, জীবনে তাহারা কখনও Matric পাশ করিবে।

তিনি বলিতেন—I will die with my harness. কার্য্যতঃ তাহাই হইল।

সন্তান-বাৎসল্য। সন্তান সন্ততিদিগের

জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা অতি অল্প পিতাই করিতে পারে। তিনি ধনী কখনও ছিলেন না, সামান্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মাত্র; কিন্তু তাঁহার এক পুত্র ব্যারিষ্টার, একজন Professor ও এম-এ পরীক্ষার ইংরাজি সাহিত্যের পরীক্ষক, একজন Civil Surgeon, দুই কন্যা বি-এ পাশ, একজন বি-এ পড়িতেছেন। শেষ পক্ষের ছোট ছেলেগুলির জন্য তিনি যতদূর সম্ভব করিয়াছেন। যখন কলিকাতায় Hasting's House নামক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তখন তিনি তাঁহার অন্যতম পুত্র প্রদোষকে তথায় ভর্তি করিয়া দিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহাকে লইয়া কলিকাতায় যান। তথাকার মাসিক ব্যয় ১০০৲ টাকা। তখন তাঁহার আয় মাত্র ১৫০৲ টাকা !!! কিন্তু তথায় গিয়া যখন দেখিলেন যে, তথায় বিলাসিতা আছে, তখন তিনি পুত্রকে লইয়া ফিরিয়া আসেন। সংশিক্ষার জন্য তিনি দেড় শত টাকা আয় হইতে ১০০৲ টাকা দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

Bengal Govt. হইতে যখন একটী ইঞ্জিনিয়ারকে কণারক সম্বন্ধে লিখিতে আজ্ঞা দেওয়া হয়, তখন তিনি সেই ভদ্রলোককে অশেষ প্রকারে সাহায্য করেন। 'কণারক' পুস্তকের ভূমিকায় তাহার স্বীকৃতি আছে।

মধুপুরের নূতন স্কুল সংস্থাপনের সময় তাঁহাকে কিছু দিন তথায় হেডমাষ্টারী করিতে হইয়াছিল।

ক্রমশঃ

সঙ্গণিকা।

(২১)

আনন্দের সহিত ঘোষণ করিতেছি, মহামতি ভারত ষ্টেট-সেক্রেটারী মহাশয় শ্রীমান্ জ্ঞানাঙ্কুর দেকে সিবিলসার্ব্বিসে (I C. S.) গ্রহণ করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। আর দুইজন ভারতবাসীকেও গ্রহণ করিয়াছেন। জ্ঞানাঙ্কুরের অতি শৈশবে আমরা ব্যক্ত করিয়াছিলাম, এই ছেলের মধ্যে বড় লোকের বহু লক্ষণ রহিয়াছে। জ্ঞানাঙ্কুরের নামও আমরা দিয়াছিলাম। জ্ঞানাঙ্কুর রূপে, গুণে, মহত্বে ও চরিত্রে মহীয়ান পুরুষ। বিধাতা তাহাকে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করুন। তাহার দ্বারা বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল হউক।

(২২)

ভুঁইফোড় পরনিন্দুক সাহিত্যিকদিগের কণ্ডূয়নে এত সাধের সাহিত্য-সম্মিলনী "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া"য় পরিণত হইতে চলিয়াছে। হামবড়া চরিত্রহীন সাহিত্যিকগণের আস্ফালন না কমিলে সাহিত্যের মঙ্গল নাই। যাহারা কিছু জানে না, কিছু করে নাই, তাঁহারাই আজকাল বড় বড় সাহিত্যিক! তাঁহাদের অসংযত লেখায় ও নবনৃত্যে ধরা টলটলায়মান। বিধাতা অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা-মূলক দলাদলির হস্ত হইতে সাহিত্যকে রক্ষা করুন।

(২৩)

শুনিতেছি, এবার লক্ষ্ণৌয়ে কংগ্রেসের দলাদলি ঘুচিবে। যদি তাহা হয়, দেশের পক্ষে পরম মঙ্গলের কথা, আবেদন-নিবেদনে কিছু হউক বা না হউক, মায়ের সব সন্তানকে একাত্মক হইতে দেখিলে কাহার না আনন্দ হয়? বড় বড় লোকদিগের শুভবুদ্ধি হউক।

(২৪)

বিলাতের মন্ত্রি-সভার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মহামতি শ্রীযুক্ত এস্কুইথ কার্য্য ত্যাগ করিয়াছেন, এবং লয়েড্ জর্জ্জ প্রধান মন্ত্রীত্ব পাইয়া পূর্ণোদ্যমে নবমন্ত্রী-সভা গঠন করিয়াছেন। ফ্রান্সে, রুশিয়ায় এবং ইতালিতেও এইরূপ হওয়ার আয়োজন হইতেছে। তাঁহাদের নবোৎসাহে যুদ্ধের অবসান হইলেই পৃথিবী রক্ষা পায়। পৃথিবী চরমদশায় উপনীত হইয়াছে। কাইজার শান্তি-স্থাপনের প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু কাজে কি হইবে, জানি না। বিধাতা সহায় হউন।

(২৫)

ব্রাহ্মসমাজের লোকদিগের মধ্যেও কেহ কেহ যুদ্ধের আবশ্যকতায় পক্ষপাতী, ইহা জানিয়া আমরা বড়ই বেদনা পাইয়াছি। রক্তপাতে মানব সমাজের যে কি উপকার হইতে পারে, আমরা জানি না। আমরা জন্ ব্রাইটের মতাবলম্বী। শান্তি সংস্থাপন ভিন্ন ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য আর কিছুই নাই, কিছুই হইতে পারে না।

(২৬)

স্বাধীন ত্রিপুরা বাঙ্গালার গৌরব, এখানে বাঙ্গালাভাষা রাজভাষা, এখানে অবৈতনিক শিক্ষাপ্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত। সম্প্রতি শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম যে, ১৩২৩ সালের বৈশাখ মাস হইতে আগরতলার নবমন্ত্রী, বিদেশীয়গণের পক্ষে বৈতনিক শিক্ষা-প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন। ইহাতে আয় যে বেশী হইতেছে, তাহা নহে, অথচ একটী সনাতন প্রথার মূলে কুঠারাঘাত পড়িয়াছে। আশা করি, সহৃদয় মন্ত্রী মহাশয় অতি প্রাচীন রাজকীর্ত্তি বিলুপ্ত করিবেন না—আর একবার ভাবিয়া দেখিবেন।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৩১। রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি-মন্দিরের অনুষ্ঠান পত্র। আমরা এই অনুষ্ঠান পত্রখানি পাইয়া বড়ই বাধিত হইয়াছি। খানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজের বার্ষিক অধিবেশনে যখন আমরা সভাপতি হইয়াছিলাম, তখন রাধানগরে রাজার স্মৃতি সংস্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলাম। এতদিন পর এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত। যে সকল মহাত্মার ঐকান্তিক যত্নে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল, তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেছি। দেশের সর্ব্বসাধারণ এই কার্য্যে সাহায্য করিবেন, আমরা আশা করি। ৭১ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে সম্পাদকের নামে সাহায্য পাঠাইতে হইবে।

৩২। মহাপরিব্রাজক লিভিংষ্টোন। সেবক শ্রীলক্ষ্মীপ্রসাদ চৌধুরী কর্ত্তৃক লিখিত ও সংগৃহীত ; মূল্য ।০। পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষের পুণ্য কাহিনী। যেমন বিষয় বিবৃতি, তেমনি ভাষার প্রাঞ্জলতা। পুস্তকখানি পাইয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। বিধাতা গ্রন্থকারকে অতুল গুণগৌরবে ভূষিত করুন।

৩৩। নৃপেন্দ্র-স্মৃতি। শ্রীদীনদয়াল চৌধুরী প্রণীত। এই পুস্তকে সংক্ষেপে অনেক জ্ঞাতব্য কথা বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকখানি উপন্যাসের ন্যায় সরস। দীনদয়াল বাবু বন্ধুপ্রীতি এই গ্রন্থে ঢালিয়া দিয়াছেন। পড়িয়া সুখী হইলাম।

৩৪। সঙ্গীত-সুধা। শ্রীশ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজী বিরচিত, কিরণচাঁদ দরবেশ গ্রথিত, মূল্য ৵০। এই পুস্তকের সঙ্গীত, সকল ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বত্র আদৃত ও পরিচিত। ভক্তের হৃদয়োচ্ছ্বাস—পড়িতে পড়িতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, অভক্তের চক্ষু হইতেও ধারা বহিতে থাকে। ইহাতে বক্তৃতা বা কথার ছাদনি মোটেই নাই—সরল হৃদয়ের ভক্তির সরল কথা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। ভক্তের চরণে কোটী কোটী প্রণাম।

৩৫। ধর্ম্মের কাহিনী। শ্রীমোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, মূল্য ।০। নিরপেক্ষ ভাবে অনেক সুন্দর কথা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যিনি পড়িবেন, তিনিই উপকৃত হইবেন।

মহাকবি কালিদাস।

অনূন প্রায় পঞ্চাশ বর্ষ ধরিয়া মহাকবি কালিদাসের জাতি ও বাসস্থান সম্বন্ধে অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও পণ্ডিতমণ্ডলী মস্তিষ্ক চালনা করিয়া আসিতেছেন এবং এতদ্ সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। তবে ভারতের প্রাচীনেতিহাস ধারাবাহিক রূপে লিখিত না থাকায় বা কঠোর কালের কুক্ষীগত হওয়ায়, কিম্বা বিদেশীয়দিগের উপর্য্যুপরি ভারতাক্রমণে উহা ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ায়, তাহার পুনরুদ্ধার বড়ই জটিল ব্যাপারে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কেবল কতকগুলি আনুমানিক বা পারিপার্শ্বিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ভারতীয় বিদ্বৎ সমাজ যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সে আলোচনার ফল সম্পূর্ণরূপে প্রীতিপ্রদ হইতেছে না। যাহা হউক, মহাকবি কালিদাস যে পৃথিবীর সভ্য জগতের কাব্য ও নাট্যাকাশে একমাত্র চন্দ্রমা, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। সেই কবিরাজ চূড়ামণি কালিদাসের জাতি বা নিবাস সম্বন্ধে পূর্ব্বকার পণ্ডিতবর্গেরা কোন রূপ আলোচনা করিতেন না। তাঁহারা জগতের মধ্যে উঁহার অতুলনীয় কাব্য ও নাট্য রসাস্বাদ করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। মহাত্মা পরমহংস দেবের ভাষায় তাঁহারা আম খাইয়াই আনন্দ লাভ করিয়াছেন, কাহার আমগাছ, কাহার বাগানের আমগাছ, কে গাছটী পুতিয়াছিল ইত্যাদি রূপ কোন সংবাদই রাখিতেন না বা তজ্জন্য মস্তিষ্কের চালনা করিয়া জান নাই। কিন্তু আজ কাল মানুষ কেবল আম খাইয়া সন্তুষ্ট নহেন, ইঁহারা তাঁহার নাট্য বা কাব্যামৃত পান করিয়া তৃপ্ত নহেন। বর্ত্তমান কালের লোকেরা প্রত্যেক খ্যাতনামা লোকের বাসস্থানাদি জানিতে উৎসুক, অমুক পণ্ডিত, অমুক কবি, অমুক দার্শনিক, অমুক যোদ্ধা কোথায় জন্মিয়াছিলেন, তিনি কোন্ জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য লালায়িত। মানুষের এ আকাঙ্ক্ষা জাগতিক ক্রমোন্নতির ফল বিশেষ। কোন কোন স্থলে অনুসন্ধিৎসুগণের মুখ্য উদ্দেশ্য স্ব স্ব জাতির কোন রূপ গৌরব বৃদ্ধি করা, যেখানে অনুসন্ধিৎসুকেরা এই পন্থার অনুবর্ত্তী, সেখানে প্রায়ই তৃপ্তিপ্রদ ফল লাভ হয় না দেখিতে পাওয়া যায়। একারণ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ যখন কোন ঐতিহাসিক রহস্যোদ্ঘাটনরূপ মহদ্‌কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তখন যেন তাঁহারা নিরপেক্ষ ভাবে ও নিঃস্বার্থপরায়ণপর হইয়া এরূপ গুরুতর কার্য্যে ব্রতী হইতে পারেন, ইহাই আমার ও জনসাধারণের সকলেরই বোধ হয় বাঞ্ছনীয়।

২। ইতঃপূর্ব্বে লোকের সাধারণ বিশ্বাস ছিল (এবং এখনও যে অনেকের নাই, তাহা বলিতে পারি না) যে কবিকুল-চূড়ামণি কালিদাস, যিনি অভিজ্ঞান শকুন্তলা ও রঘুবংশাদি কাব্যের প্রণেতা, পশ্চিম দেশবাসী ছিলেন, কিন্তু ইদানীং বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী বা প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন। উঁহাদের এই নব সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রধান সাক্ষ্য বা উপাদান কালিদাসের কাব্যের ও নাট্যাদির বর্ণনা-চাতুর্য্য ও শব্দ-প্রয়োগের প্রণালী। যে কেহ কালিদাসের ভাষাচাতুর্য্যের আভ্যন্তরিণ ভাগ

ও শব্দ-প্রয়োগ আলোচনা করিবেন, তিনি কবিকে বাঙ্গালী না বলিয়া থাকিতে পারিবেন না। অধিকন্তু কালিদাসের "কালিদাস" এই নামটী ও "কবিরাজ" এই বিশেষণ পদটী, কবি যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহা অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া দিতেছে। আমরাও জানি বা শুনিয়া আসিতেছি, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজসভা নয়টী মহাপণ্ডিত দ্বারা সুশোভিত ছিল, কালিদাস সেই "নবরত্ন" নাম-প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর্গের মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন বা কহিনুর-মণি। আমরা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক অর্থাৎ

ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকমের সিংহ শঙ্কু
বেতালভট্ট ! ঘটকর্পর কালিদাসাঃ
খ্যাতৌ বরাহমিহিরৌ নৃপতেঃ সভায়াং।

হইতে দেখিতে পাই যে, শ্লোকের প্রকৃত ব্যাখ্যানুসারে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় নয়টীর পরিবর্ত্তে ১১টী রত্ন ছিল। যাহা হউক, এ বিষয় লইয়া আমাদের মস্তিষ্ক চালনার আবশ্যকতা দেখিতেছি না, কারণ আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় কবির জাতি ও বাসস্থান লইয়া। আমরা যদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটী বিশ্লেষণ করি ত বেশ বুঝিতে পারিব যে "কালিদাস" ছাড়া কোন রত্নেরই নাম বঙ্গদেশ প্রভব নহে। একমাত্র কালিদাস এই নামটী বাঙ্গালার নিজস্ব ও নিব্যূঢ় সম্পত্তি।

৩। শ্রদ্ধেয় ৺রামদাস সেন মহাশয় তাঁহার ঐতিহাসিক রহস্য নামক গ্রন্থে ইহাই প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন যে, "মাতৃগুপ্ত" ও মহাকবি কালিদাস অভিন্ন ব্যক্তি। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ কখন এ তথ্য উৎঘাটনে প্রয়াস পান নাই। তাঁহার এ সিদ্ধান্তের ভিত্তি কবি কহ্লনের রচিত কাশ্মীরের ইতিহাস "রাজতরঙ্গিণী"। এই ইতিহাসের মতে মহারাজ বিক্রমাদিত্য কাশ্মীর রাজ্য অধিকার করিয়া কালিদাসকে উক্ত দেশের সিংহাসন দান করেন। মহাকবি কালিদাস তাঁহার বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন। ৺রামদাস বাবুর সিদ্ধান্ত পায়ে ঠেলিয়া ফেলিতে পারা যায় না, কারণ রাজতরঙ্গিণী একখানি প্রামাণ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ। আমারও মনে হয়, মহাকবি কালিদাস ও মাতৃব্যক্তি এক ব্যক্তি এবং কবিকুল-কেতু কালিদাস আমাদের শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির কহিনুর মণি।

৪। যে সমুদায় পণ্ডিত বা মনীষীগণ মহাকবি কালিদাসকে বাঙ্গালী বলিয়া স্থির করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাঁহাদের প্রধান সমস্যা দাঁড়াইতেছে, কালিদাসের জাতি লইয়া, কারণ কালিদাসকে বাঙ্গালী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে হইলে তাঁহাকে জাতিতে বৈদ্য (অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ) না ভাবিয়া থাকিবার কাহারও উপায় নাই। মহাত্মা কালিদাসের নামতত্ত্ব ও "কবিরাজ" এই উপাধিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া অনেকেই তাঁহাকে বাঙ্গালী বৈদ্য বলিয়া স্থির করিতেছেন। বর্ত্তমান কালে, 'মন্দার মালা'র সম্পাদক অশেষ বেদবিদ্ পণ্ডিত শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন উক্ত পণ্ডিতদিগের মধ্যে একজন। অবশ্য শ্রদ্ধেয় উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় নিজে বৈদ্য (অম্বষ্ঠ), কিন্তু তিনি তাঁহার এ সিদ্ধান্তে পূর্ব্বে যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা একবারে অবহেলা করাও একরূপ অসম্ভবপর। যাহা হউক, আমরা চাই সত্যের আবিষ্কার, যেরূপেই হউক সত্যানুসন্ধান। মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালী বলিয়া অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হইলে আমাদের বাঙ্গালা ভূমির যে মুখোজ্জ্বল হইবে, ইহা কে না চায় ? আর জগৎবরেণ্য কালিদাস যদি জাতিতে

বৈশ্য হন, তাহাতেই বা আমাদের ক্ষতি কি? বাঙ্গালার বৈশ্যজাতি ত বাঙ্গালার একটী প্রধান অঙ্গ, কোন অঙ্গের যদি ভগবৎ-দত্ত সৌষ্ঠবতা থাকে, তাহাতেই বা অপরাপর অঙ্গের হিংসা-দ্বেষ করিবার কি আছে? পুরুষের দেহ সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি লইয়া, ব্যষ্টি লইয়াই সমষ্টি। আমরাত প্রায় দেখিতে পাই, কোন লোকের মস্তকটা বেশ সুন্দর, কাহার বা হাত দুখানি আজানুলম্বিত, কাহারও বা পদ্মোৎপল চক্ষু, কাহারও বা তিলফুলজিনি নাসা, তদ্বৎ বঙ্গীয় রূপ সমাজ-দেহে ব্রাহ্মণ বৈশ্য কায়স্থাদি রূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির কাহার কাহার ভিতর যদি ঈষদ্ তারতম্য থাকে, সে তারতম্য জন্য কি কাহার কিছু হিংসাদ্বেষ করিবার আছে? যদি এই ব্রাহ্মণ বৈশ্য কায়স্থাদি রূপ এই মহান বঙ্গদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি পরস্পর হিংসা পরায়ণ হয়েন,তাহার যে কি বিষময় ফল,তাহা প্রত্যেকেই অনুভব বা অনুমান করিতে পারেন। এ কলহের একমাত্র উপমা বালক-বালিকা-জ্ঞাত উদর ও অপর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির কলহের সহিত। ভগবানের সৃষ্টিতে কেহ পরিত্যক্ত হইবার নহে,সকলেরই বিশেষ বিশেষ আবশ্যকতা আছে। সেই জন্য সকলেরই স্ব স্ব স্থানে ভগবৎ-দত্ত প্রাধান্য আছে। আর যখন জগতে চিরকালই গুণেরই আদর এবং জাতিবিভাগ কেবল মাত্র সেই গুন সাপেক্ষ, কারণ ভগবান গীতায় বলিয়াছেন "চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ" যখন মন্বাদি শাস্ত্রেও আছে "শূদ্র ব্রাহ্মণ্যামেতি। ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাং" তখন আর জাতি লইয়া ধুইয়া খাই-বার কি আছে? যখন আমরা পরম ভক্ত হরিদাস ঠাকুরকে মহাত্মা কবীরকে ও সেদিন-কার ক্ষণজন্মা বিবেকানন্দ স্বামীকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকি, তখন আর জাতি-বিদ্বেষানল যে কতদূর অর্ব্বাচীনতার পরি-চায়ক, তাহা সুধী মাত্রই ধারণা করিতে পারেন। তাই আমার একান্ত প্রার্থনা, সকলে বৃথা কলহ পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে সত্যপথে অগ্রসর হইতে পারেন, আসুন আমরা তাহাই করি।

৫। আমি এইমাত্র বলিয়াছি, বর্ত্তমান সময়ে 'মন্দার মালা'র সম্পাদক পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রদ্ধেয় উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় কবিরাজ শিরোমণি কালিদাসকে বাঙ্গালী বৈশ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তিনি যে সমুদায় কারণ-সমষ্টির উপর নির্ভর করিয়া এ সিদ্ধান্তে উপ-নীত হইয়াছেন, তাহার খণ্ডন সময় সাপেক্ষ ও ভবিষ্যৎ প্রমাণের উপরও নির্ভর করিতেছে। আর তিনি স্বয়ং জাতিতে বৈশ্য, কাজেই ক্ষুদ্র-মনা অনেকেই তাঁহার মত একবারে গ্রহণ করিতে রাজি নহেন। আমিও তজ্জন্য এতাবৎ অপেক্ষায় ছিলাম, কেহ উমেশ বাবুর মতের প্রতিবাদ করেন কি না। যে জাতিতত্ত্ব লইয়া বঙ্গীয় সমাজে দারুণ বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, সেই নির্ব্বাণোন্মুখ বহ্নিতে আর ঘৃতাহুতি দান করিতে অনিচ্ছুক ছিলাম। কিন্তু মধ্যে 'গৃহস্থ' মাসিক পত্রিকায় (১৩২০ সালের) "কালিদাস বাস ভবন" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয় মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় জগৎবরেণ্য কবি-কুল-চূড়ামণি কালিদাসকে জাতিতে বৈশ্যও তাঁহার বাসস্থান আমাদের বাঙ্গালায়, এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কাজে কাজেই আমাকে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ অতিশয় মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে হইয়াছে। তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণ হইয়া মহাকবি কালিদাসের বৈশ্যত্ব সম্বন্ধে উক্ত প্রবন্ধে যে সমুদায় কারণ-সম্ভার অবতরণ করিয়াছেন, তাহা বেশ

যুক্তিযুক্ত বলিয়া আমার মনে হইয়াছে। তিনি কালিদাসের বাসভবন ও জাতিতত্ত্ব বিচারের যে সমুদায় ঐতিহাসিক উপাদান, ঘটনাগত সাক্ষ্য সাহিত্য জগতের ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের সম্মুখীন করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বঙ্গবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ। তবে তাঁহার প্রবন্ধের কোন কোন স্থলে কিছু কিছু অসংশ্লিষ্ট বাক্যাবলি প্রযুক্ত হইয়াছে ও তজ্জন্য বাঙ্গালার বৈদ্যগণের অযথা মনকষ্ট উৎপাদন করিয়াছেন দেখিয়া আমি দুঃখিত আছি। আমার মনে হয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মনু সংহিতা, মহাভারত, হারীত সংহিতা ও অপরাপর বৈদ্যকুল-পঞ্জিকা ভাল পাঠ করা নাই তজ্জন্য তাঁহাকে এক বিষম ভ্রান্তিতে পতিত হইতে হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ বিবাদ রূপ ত্রিদোষের প্রকোপ কালে আমাকে এ সুদূর উত্তর পশ্চিম প্রদেশে কার্য্যোব্যপদেশে বাস করিয়াও পুরাণ ইতিহাসাদি ও বৈদ্য জাতির প্রামাণ্য কুলপঞ্জিকাদি পাঠ করিতে হইয়াছে এবং এই সমস্ত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছি, তাহার ফলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রবন্ধের কোন কোন স্থল প্রমাদ-দুষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি। সেই ভুল ধারণা অপনোদনের জন্য আমি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কালিদাস সম্বন্ধে প্রবন্ধের সারাংশ অব্যাহৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না এবং তৎসম্বন্ধে যুক্তাযুক্তি স্বমত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

"মহারাজ" সমুদ্রগুপ্তের বংশধরগণ যদি এদেশে আসিয়া বৈশ্য হইয়া থাকেন এবং যদি তাঁহাদের কন্যা বিবাহ করিয়া কালিদাস "মাতৃগুপ্ত" ঐ আখ্যা লাভ করিয়া থাকেন, তবে বিদ্যার গর্ভজাত পুত্রগণ বৈদ্যনামে কেন না অভিহিত হইলেন? ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়াং জাতোঽম্বষ্ঠ ইতি স্মৃতঃ" এখানেও "অম্বষ্ঠ" শব্দ মাতৃগুপ্তের আভাস আসিতেছে। অম্বষ্ঠ হইতে বৈদ্য জাতি যদি সম্যক পৃথক বর্ণ হয়, তাহা হইলেও তাহাদের সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ ঔরসে বৈশ্য কন্যার গর্ভজাত বলিয়া অনেক বচন শুনা যায়। যে ব্রাহ্মণ এরূপ সঙ্কর পুত্রের জন্ম দিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ধন্বন্তরি ছিল। এই মাতৃগুপ্তই সেই ধন্বন্তরি, কারণ গুপ্ত উপাধিধারী সকল বৈদ্যই ধন্বন্তরি গোত্রীয় বলিয়া পরিচয় দেন। মাতৃগুপ্ত যদি বৈদ্যদের পূর্ব্বপুরুষ ধন্বন্তরিই, তবে নবরত্নের অন্যতম ধন্বন্তরি হইতে পারে, তাহার পূর্ণ নাম এ কারণ মাতৃগুপ্ত ধন্বন্তরি হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। তিনিই কবিরাজ বা রাজকবি বা কবিশ্রেষ্ঠ ছিলেন। কবিরাজ কথাটার আভিধানিক সংজ্ঞা অন্যরূপ হইলেও ঐতিহাসিক সংজ্ঞা লোকাবগত সমুদায় বৈদ্যগণই আপনাদিগকে কবিরাজ বলিয়া থাকেন, অতএব তাঁহারা কবিরাজ মাতৃগুপ্ত ধন্বন্তরির প্যালক-বংশীয় এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। কালিদাস বৈশ্যরাজকন্যা বিবাহ করিবার পরে উমাকালী অম্বাদাস বা মাতৃগুপ্ত এইরূপ কোন নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহাকে সুন্দরী বৈশ্যরাজকন্যা বিবাহ করিতে অনেকেই নিষেধ করেন, কিন্তু তিনি "সমাজ বা তপস্যোত্তাপকারী কার্য্য করিতে বিরত হন নাই" "বংশ বৃদ্ধির অনুপাত অনুসারে বৈদ্য জাতিকে নবদ্বীপের মূল জাতি বলিতে পারা যায় না, কিন্তু উহাকে ব্রাহ্মণ জাতির পতিত শাখা ধরিয়া মাতৃগুপ্তের সহিত সমন্বয় করা যাইতে পারে"। বৈদ্য জাতির নবদ্বীপের উপনিবেশ স্থাপন সম্বন্ধে বলিয়াছেন "এখনও সমুদ্রগড়ের অধ্যাপকগণ অশূদ্রগ্রাহী ব্রাহ্মণই আছেন, অথচ

তাঁহারা বৈশ্যের কর্ণে মন্ত্র দিয়া থাকেন, ইহাতে তত্রত্য বৈশ্যদের নৃপবংশীয়ত্বের পরিচয় দিতেছে" "গুর্জ্জর হইতে উন্নত জাতির আগমন কল্পনা করিলে বৈশ্যজাতিকে তাহাদের একটী ক্ষুদ্র শাখা মনে করা যায়; বাঙ্গালার ইতিহাসে বৈদ্য জাতির নাম নাই। আদিশূরীয় ব্রাহ্মণগণের বাঙ্গালায় আগমনের পূর্ব্বে ঐ দেশে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদিগকে সপ্তসতী আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল, কালিদাস এ সপ্তসতী ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।"

৬। মন্মথ বাবু বর্ত্তমান কালের মনুসংহিতা (যাহা প্রকৃত পক্ষে ভৃগুসংহিতা) হইতে "ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়াং অম্বষ্ঠোনাম জায়তে" এই শ্লোক অধ্যাহার করিয়াও বৈদ্যগণকে কেন সঙ্কর পদবাচ্য করিয়াছেন, তাহা কোন শাস্ত্রাধ্যায়ীর বুদ্ধির অনবগম্য। তিনি যদি কেবল মাত্র মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও "চন্দ্রপ্রভা"র নিম্নলিখিত শ্লোক কয়টী পড়িতেন, তাহা হইলে বৈদ্যদিগকে একতর ব্রাহ্মণ না বলিয়া থাকিতে পারিতেন না।

(১) মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো
যেন জাতঃ স এবসঃ
(মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণ)

(২) ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাৎ জাতো,
ব্রাহ্মণস্যাৎ ন সংশয়
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাৎ
বৈশ্যায়ামপি চৈবহি।
২৮—৪৭ অধ্যায়, অনুশাসন পর্ব্ব।

(৩) তিস্রোভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য
দ্বে ভার্য্যা ক্ষত্রিয়স্য তু
বৈশ্য স্বজাত্যাং বিন্দেত
তাস্বপত্যং সমং ভবেৎ।
(১১—৪৪ অধ্যায় অনু)

(৪) ত্রিষু বর্ণেষু জাতোহি ব্রাহ্মণাৎ
ব্রাহ্মণো ভবেৎ (মনু)

(অধীয়ীরন্ ত্রয়ো বর্ণাঃ
স্বকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ
প্রব্রুয়াৎ ব্রাহ্মণস্তেষাং
নেতরো ইতি নিশ্চয়ঃ
(মনু ১—১০ অ)

(৬) যস্য যস্য মুনের্যোবং
সন্তান স এবহি—
তৎ গোত্রাদিনা বৈদ্য
শ্রেষ্ঠ্যাদাস্ত স্বকর্ম্মণা (চন্দ্রপ্রভা)

(৭) তখন সংস্কৃত কলেজে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য জাতীয় সন্তানগণ অধ্যয়ন করিত। শূদ্র বালকের পক্ষে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন নিষেধ ছিল।

(৮) "আয়ুর্ব্বেদ দত্তস্তস্মৈ বৈদ্যনাম চ
পুষ্কল" (বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণ)

[৺বিদ্যাসার মহাশয়ের জীবনী ৯০ পৃঃ পণ্ডিত শম্ভুনাথ বিদ্যারত্ন কৃত]

পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ বচনাবলি দ্বারা সকল শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ বলিতে বাধ্য হইবেন যে, বাঙ্গালার বৈদ্যেরা একতর ব্রাহ্মণ। আমার বিশ্বাস, কালিদাস বৈদ্যই ছিলেন। সঙ্কর বর্ণের উৎপত্তি বিষয়ে মহামান্য গীতায় "স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণ সঙ্কর" মনুসংহিতাও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন

"ব্যভিচারেণ বর্ণানাং অবৈদ্যাবেদনেনচ
স্বকর্ম্মনাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করা॥"
(২৪—১০ অঃ)

কাজে কাজেই ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্য কন্যায়াং জাত কালিদাসের সন্তানগণই যদি বৈদ্য হন, তাহাদিগকে সঙ্কর নামে অভিহিত করিয়া ভট্টাচার্য্য উপাধিধারী মন্মথবাবু বড়ই শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথাই বলিয়াছেন। আর তিনি

কোন শাস্ত্রাদি না পাঠ করিয়াও যদি বাঙ্গালার বৈদ্যদিগের তত্রস্থ মুখ্য ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় বেদাদি শাস্ত্রে পঠন ও পাঠনাধিকার আছে দেখিতেন, কত শত মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী শিরোমণি প্রভৃতি উপাধিধারী আবহমান কাল হইতে রহিয়াছেন, একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আর বৈদ্য ভ্রাতাগণের প্রতি অযথা কটুক্তি প্রয়োগ করিতে হইত না। তাঁহার এ কটুক্তি যে শুধু বৈদ্য জাতির প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে, আমি তাহা মনে করি না। তাঁহার এ উক্তি সমুদায় ব্রাহ্ম ও আর্য্য সমাজের প্রতিও প্রযুক্ত করা হইয়াছে! অসবর্ণ বিবাহ ত এই দুই সমাজেও প্রচলিত ও তাহা মন্বাদি শাস্ত্রানুমোদিত,তবে কি তিনি সমুদায় ব্রাহ্ম ও আর্য্যসমাজভুক্ত সন্তান সন্ততিগণকে সঙ্কর বলিতে চান? যাহা হউক, আমি মহামহোপাধ্যায় ব্যোপদেব গোস্বামীর বাঙ্গালীত্ব ও বৈদ্যত্ব প্রমাণ বিষয়ক যে প্রবন্ধ সাহিত্য পরিষৎ (মিরাট শাখায়) সভায় পাঠ করি ও যে প্রবন্ধের সারাংশ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার গত আষাঢ় সংখ্যায় উদ্ধৃত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে 'অর্চ্চনা' পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় ঐকমত্য প্রকাশ করিয়াছেন। মহাত্মা ব্যোপদেব গোস্বামী যখন বৈদ্য হইয়া দ্বিজ বিপ্র এই সমুদায় বিশেষণে বিশেষিত হইতে পারিয়াছেন,তখন তাঁহার দায়দগণ ও স্বজাতিরা কেন একতর ব্রাহ্মণ হইবেন না?

দ্বিতীয়তঃ ভট্টাচার্য্য মহাশয় গুপ্ত উপাধিধারী সকল বৈদ্যকে ধন্বন্তরি গোত্রীয় বলিয়া আর এক প্রমাদে পড়িয়াছেন। তিনি বোধ হয় কোন পুস্তকাদি না পড়িয়াই কোন ইংরাজি বিদ্যাবিশারদ অর্ব্বাচীন বৈদ্যের কাছে এ সংবাদ লইয়াছেন। কেবলমাত্র সেন গুপ্ত উপাধিধারী বৈদ্যগণেরাই অধিকাংশ ধন্বন্তরি গোত্রীয়, গুপ্ত উপাধিধারীদের অধিকাংশ কাশ্যপ গোত্রীয়। বাঙ্গালার বৈদ্যদের বিভিন্ন গোত্র ও প্রবর আছে। একমাত্র উৎকলকারিকা পাঠে মন্মথ বাবু তাহা জানিতে পারিতেন।

করশর্ম্মা ভরদ্বাজ ধরশর্ম্মাপরাশর
মৌদগোল্য দাশশর্ম্মা গুপ্তশর্ম্মা চ কাশ্যপঃ
ধন্বন্তরি সেনশর্ম্মা, দত্তশর্ম্মা পরাশরঃ
শাণ্ডিল্য চন্দ্র শর্ম্মা চ অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণাঃমে।

পূর্ব্বে বাঙ্গালার বৈদ্যরা শর্ম্মান্ত উপাধিতে ভূষিত ছিলেন, কালের মাহাত্ম্যে ও সমাজের অত্যাচারে বোধ হয় তাঁহাদের শর্ম্মোপাধি লোপ পাইয়াছে। কাজেই আজকাল তাঁহারা নষ্ট কুষ্টি উদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া অনেকে শর্ম্মোপাধি ব্যবহার করিতেছেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "অনেকে কালিদাসকে সুন্দরী বৈশ্য রাজকন্যা (বিদ্যাকে) বিবাহ করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু তিনি সমাজ বা তপস্যোত্তাপকারী কার্য্য করিতে বিরত হন নাই" এই উক্তির অর্থ বুঝিতে পারি নাই। যখন ব্রাহ্মণের পূর্ব্বতন কালে অসবর্ণ বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত ছিল, তখন কিরূপে সমাজ বা তপস্যোত্তাপকারী কথা লিখিয়াছেন, তাহা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিলেই ভাল হইত।

মন্মথ বাবু যে বাঙ্গালার বৈদ্যজাতিকে এক স্থলে ব্রাহ্মণ জাতির পতিত শাখা মনে করিয়াছেন,তাহা আমার মতে আংশিক সত্য বলিয়া বোধ হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রকোপ ভারতের সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালার বেশী অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল, তদানীন্তন বাঙ্গালার ব্রাহ্মণেরা অনেকেই শূদ্রাচারী ও বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাই অম্বষ্ঠ কুলতিলক মহারাজাধিরাজকে (শ্রীমৎ লক্ষ্মী-

নারায়ণ সেন) কান্যকুব্জ হইতে অনন্ত বেদ-পারগ সাগ্নিক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়া পুনরায় বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উত্থান করিতে হইয়াছিল (আমার মিরাট সাহিত্য পরিষৎ সভায় পঠিত ও ভারতবর্ষের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিতোন্মুখ "দেবভাষার উৎপত্তি চাতুর্বর্ণের উৎপত্তির সহিত ইহার সম্বন্ধ" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) যে সকল বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ (সপ্তসতি শাখার ব্রাহ্মণগণও হইতে পারে) কিম্বা গুর্জ্জর দেশ হইতে আগত অম্বষ্ঠগণ বা যাহারা বৈশ্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল, কিম্বা আচারভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তাহারাই ব্রাহ্মণ সমাজে (কান্যকুব্জাগত) অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্থান অধিকার করিয়া বৈদ্য নামে অভিহিত হইয়া গিয়াছে। মাতৃত্ব নিবন্ধন হউক বা বৈশ্যভাব-সম্ভূত হউক, অশৌচাদি সম্বন্ধে বাঙ্গালার বৈদ্যেরা কোথায় বৈশ্যবৎ কোথায় বা শূদ্রবৎ। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে অনুমান করিয়াছেন, বাঙ্গালার বৈদ্যগণ গুজ্জর দেশ হইতে আগত তাহা বৈদ্যকুল তত্ত্বের নিম্ন লিখিত শ্লোকের দ্বারা প্রমাণিত—

আর্য্যাবর্ত্তাৎ সমাগম্য
বঙ্গদেশে মহাবলাঃ
অম্বষ্ঠাঃ স্বসবন্ রাজন্
আধিপত্যং ব্যতম্বতঃ (৫ পৃষ্ঠা)

মহাকবি কালিদাসের কাশ্মীর রাজ্য প্রাপ্তি রাজতরঙ্গিণীর এই বৃত্তান্ত আর এক মহান তথ্যের আলোক বিতরণ করিতেছে যে, কালিদাস নিশ্চয়ই মিশ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, কারণ পুরাণেতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি, ভারতের মুখ্য ব্রাহ্মণ কদাচিৎ রাজসিংহাসনে আরূঢ় হইয়া রাজ্য শাসন করিয়াছেন। বৈদ্য নামধেয় অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা সে দিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য আজ কাল যে ২।৪ জন ব্রাহ্মণ-জমিদার বা উপাধিপ্রাপ্ত রাজা, মহারাজা আছেন, তাঁহাদের জমিদারী বা কার্য্যপ্রাপ্তির ইতিহাস ভারতে বা বঙ্গদেশে মুসলমান আগমনের পর।

আমার মত অনেকে কবি কালিদাসকে বাঙ্গালার বৈদ্যজাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করায় পৃথিবীর ইতিহাস-লেখক উক্ত ইতিহাসের ৪র্থ খণ্ডে ২৯৫।২৯৬ পৃষ্ঠায় তাহার প্রতিবাদ রূপ নেপাল হইতে প্রাপ্ত পুঁথিতে লিখিত "ইতি মিশ্র কালিদাসকৃতে রঘুবংশে মহাকাব্যে একোনবিংশ সর্গ সমাপ্ত" এই শ্লোক অধ্যাহার করিয়া বলিয়াছেন যে, কবিরাজ-চূড়ামণি কালিদাস বারেন্দ্র সমাজভুক্ত মিশ্র-ব্রাহ্মণ ছিলেন। লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতিবাদের প্রধান উদ্দেশ্য, কালিদাসকে বৈদ্য জাতি শ্রেণীভুক্ত না করা। যিনি পৃথিবীর ইতিহাস লিখিতে বসিয়াছেন, তিনি যে তাহার পড়সী পড়োশীর বা হেন্‌সেলের খবর রাখেন নাই, তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। এতদিন আমার অদৃষ্টে তাঁহার প্রকাশিত পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই, তাই ইহাতে কি সাপ ব্যাং আছে জানিতে পারি নাই। লাহিড়ী মহাশয় যদি পৃথিবীর ইতিহাস লিখিবার পূর্ব্বে একবার "চন্দ্রপ্রভা" বা চতুর্ভুজাব্য বৈদ্যকুলপঞ্জিকাখানা পড়িয়া দেখিতেন, তাহা হইলে এরূপ ভ্রমে পড়িতেন না। বাঙ্গালার বৈদ্যরা যে মিশ্র ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেউ কেটা নন, তাহা উক্ত গ্রন্থদ্বয় পাঠে তাঁহার অনায়াসে বোধগম্য হইত। চতুর্ভুজের বৈদ্য কুলপঞ্জিকা ৫০০।৬০০ বৎসরের গ্রন্থ, চন্দ্রপ্রভাও ২০০।৩০০ বৎসরের গ্রন্থ। উহাতে যে গ্রন্থকর্ত্তারা মিথ্যা কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমার মনে হয় না, বা কোন সুধী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মনে করিতে পারিবেন না। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে—

রামুসেনেন স্বগৃহে
নিজ দুর্দ্দৈব দোষতঃ
শ্যাম দাসস্থ মিশ্রস্য
কন্যাকা কটকাস্থিত (১৯১ পৃঃ)

রাঢ়ের নিরোল গ্রামেও মিশ্রোপাধির বৈদ্য ছিলেন যথা—

নারা... সেনায়
পুত্রাখ্য ... ভবে
নিরোলে গ্রাম সেনায়
মিশ্রায় চ কনীয়সী।

ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, কটকের মিশ্রোপাধি ব্রাহ্মণে কন্যাদান করিতেও বৈদ্যেরা অপমানিত বোধ করিতেন। আমার তাই মনে হয়, মিশ্রোপাধি বৈদ্যেরা বৈদ্যসমাজে নীচ স্থান অধিকার করিতেন। আমি মন্মথ বাবুর প্রবন্ধের প্রতিবাদ বা লাহিড়ী মহাশয়ের ভুল ধারণার অপনোদনছলে যে সমুদায় শাস্ত্রীয় বচনাবলি অধ্যাহৃত করিলাম, উহার গভীরতা উপলব্ধি করিয়া কবিকুলকেতু কালিদাসের "কালিদাস" এই নামটী, মিশ্র এই উপাধিটী "কবিরাজ" এই বিশেষণটী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান পণ্ডিতমণ্ডলী বা প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বিবেচনা করিবেন যে, মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালি বৈদ্য ছিলেন কি না। এতদ্‌সঙ্গে কবির সংস্কৃত রচনাকুশলতার আভ্যন্তরীণ ভাগ ও বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত তুলনায় কিরূপ সম্বন্ধে সমন্বিত, তাহাও তাঁহাদের বিবেচনার বিষয়।

উপসংহারে আমার বক্তব্য যে, আমি সত্যার্থ প্রকাশের খাতিরে এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মুখীন করিলাম, প্রতিবাদ করা আমার প্রধান উদ্দেশ্য নহে ও আমার স্বভাব নহে। আমি আজ প্রায় ৭।৮ বৎসর কাল এ সুদূর উত্তর পশ্চিম প্রদেশে কার্য্যোপলক্ষে বাস করিয়া এই প্রদেশস্থ, মথুরা দিল্লী লাহোর, এমন কি, কাশ্মীর দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গের সংশ্রবে আসিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, এতদ্দেশে যে সমুদায় ব্রাহ্মণেরা বৈদ্য বৃত্তিক, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই হয় অম্বষ্ঠ, সারস্বত, না হয় শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ। পশ্চিমে বৈদ্য বলিয়া কোন জাতি নাই, ভারতের আর কোথায় আছে কি না, বলিতে পারি না। মথুরার চোবে, দোবে, গয়ার গয়ালি ব্রাহ্মণেরা বলে উহাদের অনেক জ্ঞাতি পুরবীয় (অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশে বাস করিতেছে) তাহাদের মধ্যে অনেকেই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র ব্যবসায়ী। যদি আমার বঙ্গদেশীয় ভ্রাতৃগণ নিজ নিজ গণ্ডীর বাহির হইয়া একটু প্রশস্ত মনে বাঙ্গালার বৈদ্যদিগকে এই মিশ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আর বৃথা বাকবিতণ্ডায় বা জাতিবিদ্বেষের বহ্নিতে ঝলসাইতে হয় না। এই সুদূর ভারতপ্রান্ত হইতে আমার বঙ্গীয় সমাজের ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থাদি ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট ইহাই সানুনয় প্রার্থনা, যেন তাঁহারা আত্মধ্বংসকারী রূপ বিবাদ হইতে ক্ষান্ত হইয়া যাহাতে জননী বঙ্গভূমির প্রকৃত কল্যাণ সাধনে সমর্থ হয়েন, সে বিষয়ে যত্নবান হন। গৃহ বিবাদে যে ভারত অধঃপাতে গিয়াছে, এ শিক্ষা পাইয়াও ভ্রমবশতঃ আর যেন সে পথের আর পথিক না হন।

শ্রীরাজকিশোর রায়।

বাঁকীপুর সাহিত্য-সম্মিলনীর বিজ্ঞান শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

আপনারা আমাকে এই গৌরবান্বিত পদে মনোনীত করায় আমি আপনাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। আমি জানি, আমি এই আসনের যোগ্য নহি। দেশবিখ্যাত, জগৎবিখ্যাত ব্যক্তিগণের সমক্ষে এই আসন অধিকার করা আমার শোভা পায় না। তথাপি আপনাদিগের আহ্বান আমি উপেক্ষা করিতে পারি নাই। জানি না, কোন্ হেতু ভগবান আপনাদিগের মুখ হইতে এই আদেশ বাহির করিয়াছিলেন; কিন্তু জানি, এবং বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের জন্ম হইতেই জানি, ইহাকে আমি অকৃত্রিম ভালবাসি।

বিজ্ঞানের প্রাধান্য।

বিজ্ঞানালোচনাকে ইহকাল এবং পরকালেরও সম্বল বলিয়া মনে করি। একথা বহুবার বলিয়াছি; কখনও বা এ নিমিত্ত কিঞ্চিৎ তিরস্কৃতও হইয়াছি। কিন্তু বিজ্ঞানকে আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষভাবে আলোচ্য বলিয়া আমার যে দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিতে কখনও কুণ্ঠিত হই নাই। এই বিজ্ঞান-শাখারই স্বতন্ত্র অধিবেশন যে কি কষ্টে সাধন করিতে হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। যে জগদ্বিখ্যাত জ্ঞানযোগী ডাঃ রায়ের আবির্ভাবে আমার দেশ পূজ্য হইয়াছে, তাঁহার সহায়তাই আমাদিগের প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল। তিনি চুঁচড়াতে আমাদিগের এই শাখার প্রথম সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া এই শাখার সুতরাং অন্যান্য শাখারও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্ভবপর করিয়াছিলেন। সে দিনের কথা মনে করিয়া আনন্দে মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সেই দিন আমরা সম্মিলন-ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রথম আশা কার্য্যে পরিণত করি।

যা'ক্, সে গর্ব্ব প্রকাশ আজি শোভনীয় না হইতে পারে। হয়ত, কাহারও বা অপ্রীতিকরও হইতে পারে। সুতরাং আমি আর তাহার উল্লেখ করিব না।

আমার ন্যায় ব্যক্তির নিকট আপনারা কি আশা করেন? আমি কি জানি? আপনাদিগকে কি বুঝাইব? আমি স্বয়ং অসিদ্ধ, আপনাদিগকে সিদ্ধির পথ দেখাইব কেমন করিয়া? গভীর গবেষণা-সম্ভূত তথ্য, আমি কোথায় পাইব? তথাপিও আমার যে দুই একটী কথা বলিবার আছে, তাহাও যদি যথাযোগ্য ভাবে বলিতে পারিতাম, যদি আপনাদিগের হৃদয়ে জ্ঞানতৃষ্ণা আরও পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারিতাম, তাহা হইলেই নিজকে কৃতার্থ মনে করিতাম।

আবশ্যকতা।

আমাদিগের এই বিজ্ঞান শাখার, এমন কি, সাহিত্য-সম্মিলনেরই বা আবশ্যকতা কি? আমরা কি কারণে বর্ষে বর্ষে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, নানা আয়াস স্বীকার করিয়া নানাস্থানে সম্মিলিত হইতেছি? কোন্ আশা, কোন্ আকাঙ্ক্ষা আমাদিগকে সাহিত্য-আলোচনায় প্রবৃত্ত করিতেছে? ইহাই পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। আত্ম-দর্শন, আত্ম-

বিশ্লেষণ সকল অবস্থাতেই, বিশেষতঃ আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় অত্যাবশ্যক হইয়াছে। আমি যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে আমরা জাতীয় উন্নতির আশাকে হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বর করিয়াছি। এ আশা আমরা জীবনের মূলমন্ত্র করিয়াছি। ইহার অন্যথা কিছুতেই হইবার নহে। আর বুঝিয়াছি, জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি ভিন্ন জাতীয় উন্নতি সম্ভব নহে। এই কারণেই আমরা জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির নিমিত্ত এত আয়াস স্বীকার করিতেছি। এই নিমিত্তই বর্ষে বর্ষে নানাস্থানে সম্মিলিত হইতেছি।

আলোচ্য বিজ্ঞান।

জাতীয় উন্নতি—কথাটী বলিতে ও শুনিতে মন প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠে। আমরা ধনে জনে, জ্ঞানে, সামর্থ্যে অতি গৌরবান্বিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম। আজি সে ধনবল নাই, সে জনবল নাই, সে জ্ঞানবল নাই। আমরা কত উচ্চ হইতে কত নিম্নে পতিত হইয়াছি। একথা মনে করিতেও দেহ মন অবসন্ন হয়। আজি বিধাতার আশীর্ব্বাদে, আমাদিগের এ অবসাদ, এ তন্দ্রা, এ মোহনিদ্রা ভাঙ্গিতেছে। আমরা জাগিতে চাই, আমরা উঠিতে চাই, আমরা সভ্য-সমাজে দশ জনের একজন হইতে চাই। ধন ধার করিয়া, জন ভাড়া করিয়া, জ্ঞান অপহরণ করিয়া, নতশিরে জীবন যাপন করিতে চাই না। আমাদিগের এ আশা কি দুরাশা? ধন এখন বিজ্ঞানের অধীন; লক্ষ্মী সরস্বতীর বিবাদ এখন মীমাংসা হইয়া গিয়াছে! রসায়ন শাস্ত্র, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, এঞ্জিনিয়ারিং ভূতত্ব, জীবতত্ব, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদির আলোচনা এবং কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ ভিন্ন ধনাগমের আশা করা বর্ত্তমান যুগে অসম্ভব। জনও বিজ্ঞান সাপেক্ষ। সুপ্রজনন শাস্ত্র, (Eugenics) ধাত্রীবিদ্যা, শারীরতত্ব, দ্রব্যগুণতত্ব, চিকিৎসা-শাস্ত্র, সমাজতত্ব, এ সকল আলোচনা ও প্রয়োগ করা ব্যতীত জনবল লাভের আশাও সুদূরপরাহত। ধনে জনে জ্ঞানে বড় হইতে চাই; এ সকলই একমাত্র জ্ঞানের আয়ত্ত। সুতরাং উপরে যে সকল শাস্ত্রের উল্লেখ করিলাম, তাহাদিগের আলোচনা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। জ্ঞানবল সকল বলের রাজা; জ্ঞানই শক্তি। সে শক্তি আমরা বহু শতাব্দ হইতে হারাইয়াছিলাম। কিন্তু কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশত বর্ষ হইল যে দুই মহাত্মা এতদ্দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন, সেই ডাঃ বসু এবং ডাঃ রায় স্ব স্ব সাধনা দ্বারা দেখাইতেছেন, আমরা আর পরের ধনে পোদ্দারী করিতে সম্মত নহি। আমরা আর ধার করিয়া, ভিক্ষা করিয়া, পরের জ্ঞানে জ্ঞানবান হইবার ভাণ করিতে প্রস্তুত নহি। আমাদিগের নিকট হইতে জগৎ চিরদিন ধার করিয়াছে, আবারও করিবে। অল্পদিনের মধ্যেই অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীমান তারিণীচরণ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রসিকলাল দত্ত, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বনওয়ারীলাল চৌধুরী, শ্রীমান রমাপ্রসাদ চন্দ, শ্রীমান রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা বহু জ্ঞানলাভ করতঃ মানব সমাজকে ঋণী করিতেছেন। জ্ঞানে মানুষ মানুষ হয়। ভাবে হয় না, তাহা বলিতেছি না। ভাবেও হয়, জ্ঞানেও হয়। আমাদিগের ন্যায় ভাবের দেশ কোথায় আছে? আমাদিগের ন্যায় কাব্য, সঙ্গীত, স্থাপত্য, নীতিশাস্ত্র, দর্শন, মনোবিজ্ঞান কোথাও নাই। আমাদিগের ন্যায় জ্ঞানচর্চ্চা, সর্ব্বত্যাগী জ্ঞানচর্চ্চা কোথাও ছিল

না,কোথাও নাই। আমরা আবার সেই ভাবরাজ্যে, আবার সেই জ্ঞানরাজ্যে জগতের সমক্ষে মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইতে চাই। শুধু তাহাই নহে, বিধাতার আশীর্ব্বাদে দাঁড়াইব। মানব সমাজে আমাদিগের ভাবময়, জ্ঞান ও নীতিমূলক সভ্যতার প্রয়োজন আছে। বিধাতার জগতে হিন্দু জাতির মনুষ্যত্ব-প্রধান বিশেষ সভ্যতার আবশ্যকতা আছে; মানুষকে মানুষ করিতে হইলে, আবশ্যকতা আছে। তাই, আমরা মরিয়াও মরি নাই।

আমরা মরণোন্মুখ জাতি নহি।

যাঁহারা বলেন, [আমিও কদাচিৎ না বলিয়াছি তাহা নহে], আমরা মরণোন্মুখ জাতি, তাঁহারা আমাদিগের আশার মূলে অন্যায় কুঠারাঘাত করেন। সব গেলেও, প্রজনন শক্তির বিশেষ হানি না হইলে, কোন জাতিই মরে না। আমি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ভাগলপুর অধিবেশনে আমার কৃত উত্তর পূর্ব্ব বঙ্গের কতিপয় লোক পরীক্ষার ফল আপনাদিগের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলাম। আপনাদিগের স্মরণ থাকিতে পারে, আমি দেখাইয়াছিলাম, বিগত প্রায় একশত বর্ষ মধ্যে আমাদিগের জননশক্তি হ্রাস ত হয়-ই নাই, বরং কিছু বর্দ্ধিত হইয়াছে। গত ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের আদম সুমারীর ৫ বলাম ১ খণ্ড ২০১ পৃষ্ঠা হইতেও তাহাই জানা যায়। "The Hindus have made the greatest advance (6. 6 p. c) in Eastern Bengal • • • where the people seem to have unusual procreative energy." ইহা অমিশ্র আনন্দের হেতু না হইতে পারে, কিন্তু মরণোন্মুখের নৈরাশ্য হইতে অনেক দূরে, সন্দেহ নাই।

আমরা আত্ম হত্যা না করিলে মরিব না। গত ৩০ বৎসরে হিন্দুজাতি শতকরা ১৬, এবং মুসলমানগণ শতকরা ২৯ জন বাড়িয়াছে। ১৯০১ সাল হইতে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত হিন্দুগণের বৃদ্ধির হার তৎপূর্ব্ব দশ বৎসরের তুলনায় শতকরা ২.৩ কমিয়াছে সত্য; কিন্তু এখনও জননশক্তির হ্রাস হওয়া দেখা যাইতেছে না। মুসলমানগণের জননশক্তি হিন্দু অপেক্ষা অধিক; কিন্তু মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গে হিন্দুগণের সহিত অধিক পার্থক্য নাই। তাঁহাদিগেরও জননশক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস হওয়া দেখা যায় না। এ অবস্থায় আমরা মরণোন্মুখ জাতি নহি। তবে, নানা কারণে কিছুদিন হইল আধমরা হইয়া পড়িয়া আছি, এ কথা বলিলে স্বীকার করিতে সম্মত হইতে পারি। কিন্তু সময়োচিত ঔষধ পাইলে বাঁচিব-ই।

সে ঔষধ কি? কোন্ ঔষধের অভাবে পুরাকালে বহু জাতি উন্নত হইয়াও পতিত হইয়া গেল? আজি ধরাতলে তাহারা কথামাত্রে পরিণত হইয়াছে কেন? ঐতিহাসিক যাহাই বলুন, তাহারা মানুষ গড়িতে জানে নাই বলিয়াই পতিত হইয়াছে। মানুষই সমাজের একমাত্র সম্পত্তি; সেই মানুষ যদি স্বাস্থ্যে, শক্তিতে, ধনে, বংশে, চরিত্রে হীন হইয়া যায়, তবে সমাজ উন্নত হইবে কেমন করিয়া? পর পর বংশ ক্রমেই অধঃপতিত হইলে সমাজ কখনই উন্নত থাকিতে পারে না। এ অবস্থায় সমাজ অধঃপতিত হইবেই।

মানুষ গঠন অসম্ভব নহে।

মানুষ গড়িব কেমন করিয়া? মানুষ কি গড়া যায়? বিজ্ঞান বলিতেছে, গড়া যায়; অন্ততঃ, গড়া যায় না, এ কথা নীরবে স্বীকৃত হইতে পারে না। এদিকে মানব সমাজ কোন দিনই বিশেষ চেষ্টা করে নাই; সে চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য। মানবকে বংশপরম্পরায়

উন্নত করা, পতিত সমাজকে উদ্ধার করা, ইহা অপেক্ষা মহত্তর ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। এ বিষয়ে জীব-বিজ্ঞান কি বলিতেছে, জীব-বিজ্ঞান কোন্ আশার বাণী লইয়া আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে; তাহাই আমি আপনাদিগের সমক্ষে কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা করি। আপনারা এ বিদ্যায় মানব সমাজের অগ্রণী হউন, ইহাই আমার ভগবচ্চরণে একান্ত প্রার্থনা। যে জাতি সর্ব্বাগ্রে এই বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়া ইহার বিধিনিষেধ প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইবে, সেই জাতিই মানব সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

এ বিদ্যা কি? ইহার উদ্দেশ্য কি? কি উপায়ে ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে? এ বিদ্যার জন্মদাতা ও প্রতিষ্ঠাতা সার ফ্র্যান্সিন্ ল্যাল্টে(মহোদয়ের ভাষাই আমি এস্থলে উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি। তিনি বলিতেছেন, "Eugenics is the science which deals with all influences that improve the inborn qualities of a race; also those that develop them to the utmost advantage" যে সকল কারণে জাতিস্থ ব্যক্তিগণের জন্মগত গুণ সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ব্যক্তির জীবনে ঐ গুণ সকল পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়া সমাজের কল্যাণকর হয়, সেই সকল কারণ আলোচনা করা Eugenics অর্থাৎ সুপ্রজনন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। প্রত্যেকেই এক একটী জন্মগত ব্যক্তিত্ব লইয়া জাত হন; পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহার বিনাশ অথবা বিকাশ সাধন করিতে পারে; কিন্তু যাহার যাহা নাই, তাঁহাকে তাহা দিতে পারে না।* একটী জাতি মধ্যে সকলেই জন্মগত গুণের অধিকারী হইতে পারে না; এবং সকলকেই সমান গুণে গুণবান করা যায় না। সমাজে কি প্রকার ব্যক্তি, কি চরিত্রের ব্যক্তি অধিক হইলে উপকার অধিক হইতে পারে, সে সম্বন্ধেও বহু মতভেদ হওয়া সম্ভব। এ নিমিত্ত তর্কে প্রবৃত্ত না হইয়া, সমাজে বর্ত্তমান কালে যে সকল বিবিধ প্রকার গুণী ব্যক্তির সদ্ভাব দেখা যাইতেছে, এবং যে প্রকার চরিত্রের ব্যক্তি সর্ব্ববাদি সম্মত রূপে বাঞ্ছনীয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছেন, সেই প্রকার ব্যক্তিই যাহাতে অধিক পরিমাণে জাত হইতে পারেন, তদ্রূপ নিয়ম সকল যথাসম্ভব আলোচনা করিতে পারিলেই প্রথম প্রথম সুপ্রজনন শাস্ত্রালোচনা সফল হয়। কবি, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, সৈনিক, শিল্পী, ব্যবসায়ী, কৃষিজীবী, প্রভৃতি নানা শ্রেণীর ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান সময়ে সমাজের উপকারী বলিয়া বিবেচিত হইতেছেন। আর, সকলেই সুস্থ, সবল, নীতিমান, সৎসাহসী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে সমাজের পক্ষে বাঞ্ছনীয় মনে করেন। এ নিমিত্ত এই সকল ব্যক্তি মধ্যে যিনি সমাজের যে স্তর অধিকার করিয়া আছেন, সেই স্তরই অথবা তদপেক্ষা উন্নত স্তর যাহাতে আরও উত্তম রূপে অধিকার করিতে পারেন; যাহাতে সমাজে নূতন নূতন উপকারজনক অনুষ্ঠান একাগ্রতার সহিত প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন ও সে সকলে সার্থকতা লাভ করিতে সমর্থ হন,

* We have no experience of any means by which transmission may be made to deviate from its course; nor from the moment of fertilization can teaching, or hygeine or exhortation pick out the particles of evil in that Zygote or put in one particle of good.

Thomson's Heredity 507.

তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া তদনুরূপ গুণী বংশসম্ভূত নরনারীকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করা, উত্তম অপত্য লাভের একমাত্র সাধারণ নিয়ম। এ দিকে দৃষ্টি করিতেই হইবে। ঈদৃশ ব্যক্তিগণ দ্বারা পরবংশের অধিকাংশ গঠিত করিতেই হইবে। নচেৎ যে কোন প্রকারে বিবাহ রূপ দায় নিষ্পন্ন করিয়া হাত ঝাড়িয়া বসিয়া থাকিলে, সমাজ অধঃপতিত হইবেই। তাহা কিছুতেই নিবৃত্ত হইবে না।

কে পরবংশ গঠন করিবেন ?

সকল সমাজেই কৃতী, অকৃতী, বুদ্ধিমান, নির্ব্বোধ, ভীরু, সাহসী, রুগ্ন, সবল, অপরাধী, নিরপরাধী, সমাজদ্রোহী ও সমাজসেবক ব্যক্তি আছে। যদি কোন সমাজে কোন সময়ে কৃতী অপেক্ষা অকৃতীর, সাহসী অপেক্ষা ভীরুর, সুস্থ অপেক্ষা রুগ্নের, সবল অপেক্ষা দুর্ব্বলের, নিরপরাধী অপেক্ষা অপরাধীর, ধীর অপেক্ষা অধীরের, সমাজসেবক অপেক্ষা সমাজদ্রোহীগণের সংখ্যা অতিমাত্র বর্দ্ধিত হয়, তবে সে সমাজের অবস্থা সে সময়ে কেমন হয় ? সকলেই বলিবেন, সে সমাজ তখন অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হয়। যদি ঐ সমাজে অকৃতিগণ, ভীরুগণ, রুগ্নগণ, দুর্জ্জনগণ,সমাজদ্রোহীগণ পরবংশের অধিকাংশ গঠিত করে ; স্ব স্ব অযোগ্যতা দ্বারা পরবংশের অধিকাংশ নরনারীকে দূষিত করে ; তবে সে সমাজ তখন অধঃপতনের দিকে আরও দ্রুতগতি অগ্রসর হইতে থাকে। ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। কৃতী সজ্জনগণ সমাজে যত অধিক থাকেন, সমাজ ততই উন্নত হয় ; অকৃতীর সংখ্যা সমাজে অধিক হইলে সমাজ পতিত হইয়া যায়। সুতরাং ইহা অনায়াসেই প্রতীয়মান হয় যে, কৃতী ও সজ্জনগণ পরবংশ অথবা তাহার অধিকাংশ গঠিত করিলে সমাজের মঙ্গল হয় ; অকৃতী ও দুর্জ্জনগণ পরবংশের অধিকাংশ গঠিত করিলে মঙ্গল নাই।

এটী মোটা কথা। একথা আরও তুলিয়া বুঝিতে হইবে। ইংলণ্ডাদি দেশে স্থূলতঃ এক পুরুষের প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণের ষষ্ঠাংশ দ্বারা পরবংশের অর্দ্ধাংশ গঠিত হয়। কিন্তু সে সকল দেশে বহু নরনারী অবিবাহিত থাকেন। এতদ্দেশে প্রায় সকলেই বিবাহ করিয়া থাকেন। সুতরাং এতদ্দেশে প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর কত অংশ দ্বারা পরবংশের কত অংশ গঠিত হয়, তাহা অনুসন্ধান দ্বারা নির্ণীত না হইলে বলা যায় না। এক পুরুষের জনসংখ্যার কত অংশ পরবংশের কত অংশ গঠিত করে, তাহা না জানা গেলেও, এ কথা বলা যাইতে পারে যে, এতদ্দেশে এক পুরুষের একটা বৃহৎ অংশ পরবংশের একটা বৃহৎ অংশ গঠিত করে। যদিও এই ভাগ্যহীন সমাজে বহু শিশু জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু এক বৎসর বয়স না হইতেই তাহাদিগের পঞ্চমাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাদিগের মধ্যে কত রত্ন জীবিত থাকিলে পরবংশ উজ্জ্বল করিতে পারিত, তাহা কে বলিতে পারে ? এক পুরুষের যে অংশ পরবংশের যে অংশই গঠিত করুক, ঐ প্রথমোক্ত অংশ স্বাস্থ্যে, উদ্যমে, সাহসে,ধীরতায়, নীতিজ্ঞানে যোগ্য হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান বাঙ্গালার জনসংখ্যা ন্যূনাধিক ৪॥০ কোটী ; তন্মধ্যে একটা বৃহৎ অংশের ঐ সকল গুণ থাকা অত্যাবশ্যক। নচেৎ উহার বিপরীত ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ দ্বারা পরবংশ গঠিত হইলে সমাজ উন্নত থাকিতে পারে না।

যোগ্যাযোগ্যের বংশানুক্রম।

এস্থলে আমরা স্বীকার করিয়া লইলাম যে, যোগ্য ও কৃতী ব্যক্তির অপত্য যোগ্য হয়,

অযোগ্যের অপত্য অযোগ্য হয়। যদিও এ নিয়মের ব্যভিচার কখন কখন দৃষ্ট হইয়া থাকে, তথাপি সাধারণতঃ এ নিয়ম সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

কে যোগ্য ও কৃতী ?

এস্থলে যোগ্য অর্থে দেশ ও কালের উপযোগী; অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুগত এবং প্রতিকূল অবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বী বুঝিতে হইবে। কৃতী অর্থে যিনি পূর্ব্বাবস্থার উন্নতি করিয়াছেন, তাঁহাকে বুঝিতে হইবে। বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন সময়ে অথবা একই সমাজে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তিকে যোগ্য বলা যাইতে পারে। সুতরাং এ শব্দের কোন নির্দ্দিষ্ট অর্থ হইতে পারে না। তথাপিও, এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, সকল সমাজে সকল সময়েই রুগ্ন অপেক্ষা সুস্থ যোগ্য; দুর্ব্বল অপেক্ষা সবল, ভীরু অপেক্ষা সৎসাহসী, চঞ্চল অপেক্ষা একাগ্রচিত্ত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নির্ব্বোধ অপেক্ষা বুদ্ধিমান, দুরাচার অপেক্ষা সজ্জন, যোগ্য। বলিয়াছি, যোগ্য হইতে যোগ্য এবং অযোগ্য হইতে অযোগ্যই সাধারণতঃ জাত হইয়া থাকে। তথাপি অনুসন্ধান করিলে এত-দ্বিপরীতও লক্ষ হইয়া থাকে। গ্যাল্টন এ সকল অনুসন্ধানের পথপ্রদর্শক। তিনি বহু পরিবারে অনুসন্ধান করিয়া ২৫০০ অতি অযোগ্য ব্যক্তির ৩ জন মাত্র সুযোগ্য অপত্য পাইয়াছিলেন; কিন্তু কেবল মাত্র ৩৫ জন সুযোগ্য ব্যক্তিরই উহা অপেক্ষা দ্বিগুণ অর্থাৎ ৬ জন সুযোগ্য অপত্য পাইয়াছিলেন। ১৮০ জন সুযোগ্যের ১০ জন সুযোগ্য অপত্য দেখা গিয়াছিল; কিন্তু ১৬১৪ জন অপেক্ষা-কৃত অযোগ্য ব্যক্তির ৫ জন সুযোগ্য অপত্যের ঊর্দ্ধ পাওয়া যায় নাই। সকল দেশেই ভদ্র লোকের মধ্যে যোগ্যের সংখ্যা অধিক ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে অল্প দেখা যায়। এই সকল আলোচনা করিয়া গ্যাল্টন বলেন, "The lower classes make their scores owing to their quantity and not to their quality." * অর্থাৎ যাহারা যোগ্যতায় নিম্ন শ্রেণীর তাহাদিগের বহু সংখ্যক মধ্যে অতাল্প উত্তম অপত্য জাত হয়; সংখ্যাই তাহাদিগকে জয়যুক্ত করে; গুণে নহে। সুতরাং নির্গুণ ব্যক্তিগণের বহু অপত্য উৎপাদন করায় ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক। ইহা অব্যভিচারী নিয়ম নহে, তবে এইরূপ সাধারণতঃ হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি বংশানুক্রমিক পীড়াগ্রস্ত, তাহার অপত্য ঐ পীড়া পাইবার সম্ভাবনা অধিক; যে অধীর, নির্ব্বোধ, দুষ্কর্ম্মী, তাহারও তদ্রূপ অপত্যই লাভ হইয়া থাকে। এ নিমিত্ত সমাজকে উন্নত করিতে হইলে সমাজ মধ্যে যোগ্য ও কৃতিগণের অপত্য, অযোগ্য-গণের অপেক্ষা অনুপাতে অনেক অধিক জাত হওয়া ও জীবিত থাকা অত্যাবশ্যক।

কর্ম্ম।

যোগ্যাযোগ্যের পরিচয় কর্ম্মে। কর্ম্ম বংশানুগত নহে; কিন্তু যেরূপ দেহ ও মন দ্বারা ঐ কর্ম্ম পূর্ব্বপুরুষগণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দেহ ও মন পরবংশ প্রাপ্ত হয়; সুতরাং ঐ কর্ম্ম অথবা উহার অনুরূপ কর্ম্ম, কিম্বা ঐ দেহ ও মন হইতে যেরূপ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইতে পারে, তাহাই পরবংশীয় ব্যক্তি করিতে সমর্থ হয়। কর্ম্মের প্রবণতা, কর্ম্মের উপযোগীতা পূর্ব্বপুরুষ হইতে আগত হয়; কর্ম্ম আগত হইতেও পারে, নাও পারে। আমি একজন বিখ্যাত ডাকাইতের নাম

* Essays in Eugenics p. 17.

শুনিয়াছিলাম; তাঁহার পুত্র ইংরাজি বিদ্যা শিক্ষা করতঃ বিচার-বিভাগে কার্য্য পাইয়াছিলেন। তিনি উৎকোচ লইয়া বিচার করিতেন। তাঁহার পিতার দুর্ব্বল স্নায়ুমণ্ডল ও দুর্ব্বল মস্তিষ্ক পরধন লাভের প্রলোভন সংযত করিতে পারে নাই; তাই তিনি ডাকাইত ছিলেন। পুত্রও তদ্রূপ দুর্ব্বল স্নায়ু সংস্থান লাভ করায় প্রলোভন জয় করিতে অসমর্থ ছিলেন। তিনি উৎকোচগ্রাহী হইয়া ছিলেন, ডাকাইত হন নাই।

বংশানুক্রমের পরিমাণ।

এইরূপে বংশানুক্রমের প্রভাব নানা দিক হইতে লক্ষিত হইয়া থাকে। দেহ ও মন দুই-ই বংশানুগত। তবে যাহাকে sport অর্থাৎ প্রকৃতির অদ্ভুত খেলা বলা যায়, তদ্রূপ আকস্মিক ব্যতিক্রম কখন কখন না হয়, তাহা নহে। যাহা হউক, পিয়ার্সন দেখাইয়াছেন যে, মোটামোটি পুত্র পিতার লক্ষণ অর্দ্ধ পরিমাণ প্রাপ্ত হয়; পিতামহের লক্ষণ পৌত্র $\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{3}$ এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হয়; প্রপিতামহের লক্ষণ প্রপৌত্র $\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{5}$ এক পঞ্চমাংশ প্রাপ্ত হয়।* এইরূপে ক্রমে উর্দ্ধতন পুরুষে বংশানুক্রমের প্রভাব কমিয়া যায়। কিন্তু কখনই সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না। কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি সম্বন্ধে এ কথা সত্য হইতে পারে, না হইতেও পারে; কিন্তু বহু ব্যক্তির গড় সম্বন্ধে ইহা সত্য হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক।

উন্নতির উপায়।

এক্ষণে বিবেচনা করুন, কোন বহুসংখ্যক ব্যক্তির সমষ্টিকে অর্থাৎ কোন জাতিকে উন্নত করিতে হইলে পরবংশ কিরূপে গঠিত করিতে হইবে? যোগ্যবংশীয় নরনারীকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে হইবে। যোগ্যতা বংশানুগত, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং যোগ্যবংশীয় নরনারীকে বিবাহিত করিতে পারিলে পরবংশও যোগ্য হইবে। বিবাহ-যোগ্য প্রাপ্তবয়স্ক যুবক যুবতীর যোগ্যতা কোন্ নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে বুঝিবার উপায় কি? ইহা না বুঝিতে পারিলে শুধু বংশগুণে যোগ্যতার সম্ভাবনা দেখিয়াই বিবাহ দিতে হয়। কিন্তু এরূপ করা অপেক্ষা প্রত্যেক যুবক যুবতীর বাল্যাবস্থা হইতে যোগ্যতার লক্ষণ সকল লিপিবদ্ধ থাকিলে তদ্দৃষ্টে অধিক নিশ্চয়তার আশা করা যায়। অভিভাবকগণ অথবা স্কুল কলেজের শিক্ষকগণ যদ্যপি প্রত্যেক বালক বালিকার স্বাস্থ্য, একাগ্রতা, ধীরতা, সাহস, উদ্যম এবং বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতির খাতা রাখেন, তবে তাহাদিগের যোগ্যতার অথবা অযোগ্যতার উত্তমরূপ অনুসন্ধান হইতে পারে। এইরূপে কর্ম্মচারিগণের প্রভুগণ যদ্যপি ঐরূপ খাতা রাখেন, তাহা হইতেও যোগ্যাযোগ্যের বিচার হইতে পারে। পূর্ব্বকালের ঘটকগণের ন্যায় বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক ঘটকগণ যদ্যপি যোগ্য বংশের এবং যোগ্য বালক বালিকা, যুবক যুবতীগণের তালিকা প্রস্তুত করিয়া পুস্তকাকারে রক্ষা করেন, তবে পরবংশ সুযোগ্য ভাবে গঠিত করিবার নিমিত্ত বিবাহ সময়ে ঐ সকল খাতা ও পুস্তক দৃষ্টে অনেক উপকার হইতে পারে। সুপ্রজনন কল্পে ইহাই প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। যোগ্য বংশের একবিন্দু রক্ত পাইয়া আমার পরিচিত চারিটী অযোগ্য বংশে উত্তম সন্তান লাভ হইয়াছে; তদ্দ্বারা সে চারিটী বংশ বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছে। তাহাদিগের নাম উল্লেখ করা সঙ্গত হইবে না।

* National Life p. 93.

পরবংশ।

উত্তম অপত্য লাভ করিতে হইলে সুস্থ, ধীর, সাহসী, বুদ্ধিমান, ধার্ম্মিক বংশীয় তদ্রূপ ব্যক্তিগণের দ্বারাই পরবংশের অধিকাংশ গঠিত হওয়া উচিত। রুগ্ন, অধীর, ভীরু, নির্ব্বোধ ও পাপীষ্ঠ ব্যক্তিগণের দ্বারা পরবংশ গঠিত হওয়া উচিত নহে। এ সকল পতিত ব্যক্তিগণের সন্তান উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করা সম্ভব নহে; তথাপিও যতদূর পারা যায়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। বর্ত্তমান সময়েও ক্ষয়কাশিগ্রস্ত, উন্মাদ, জড়, মূক, নির্ব্বোধ, কুষ্ঠী, মদ্যপ, রাজদ্বারে গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিগণের সহিত কেহই পুত্র অথবা কন্যা বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন না। কারণ তদ্রূপ পিতামাতা অপত্যগণকেও দূষিত করিবে, বলিয়া গুরুতর আশঙ্কা হইয়া থাকে। যেমন স্বভাবতঃই ঈদৃশ বর অথবা কন্যা সকলেই বর্জ্জন করিয়া থাকেন, তেমনই অন্যান্য প্রকারেও যোগ্যাযোগ্যের বিচার করিয়া বিবাহকার্য্য নিষ্পন্ন করিলেই ক্রমে পরপর বংশ নানা দোষে দুষ্ট হইবে না, বরং নানাগুণের অধিকারী হইবে। একটী জর্ম্মান রমণীর কথা নানা গ্রন্থে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। সে চোর ও মাতাল ছিল, যেখানে সেখানে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত। সে ৭০৯ ব্যক্তির পূর্ব্বপুরুষ থাকা জানা গিয়াছিল। তন্মধ্যে ১০৬ জন জারজ, ১৪২ জন ভবঘুরে ও ভিক্ষুক, ১৮০ জন বেশ্যা, ৭ জন নরহন্তা, ৭৬ জন দাগী ছিল। একজন অযোগ্য হইতে কত অযোগ্য জাত হইতে পারে, এই নারী তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত।

গত আদম সুমারি হইতে জানা যায়, এতদ্দেশে উন্মাদের সংখ্যা ১৯,৯১৮; মূক বধিরের ৩২,১২৫; অন্ধের ৩২,৭৪৭; কুষ্ঠ রোগীর ১৭,৪৮৫; ইহাদিগের সমষ্টি ১,০১,৬৮১; মোটামোটি এক লক্ষ বলা যাউক। এক্ষণে বিবেচনা করুন, অন্ধতা ভিন্ন অপর তিনটী পীড়ার দুইটী বংশানুগত, একটী সংক্রামক। ঐ দুই শ্রেণীস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি বিবাহ করিলে শত বৎসর মধ্যে ঐরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত কত অপত্য জাত হইতে ও জীবিত থাকিতে পারে। তাহাদিগের সংখ্যা অন্য উপায়ে হ্রাস করিতে পারিলেও মোটের উপর নগণ্য হইবে না। এইরূপে, এই সকল অযোগ্যের দ্বারা সমাজের যে অংশ গঠিত হইবে, তাহা কত অযোগ্য, কত অধঃপতিত। অন্ধ, মূক, বধির ইত্যাদিকে এক্ষণে উপার্জ্জনক্ষম করিবার নিমিত্ত বহুবিধ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ইহা তাহাদিগের পক্ষে কল্যাণকর, সন্দেহ নাই। কিন্তু ন্যূনাধিক উপার্জ্জনক্ষম হইলেই এ দেশে উহাদিগের বিবাহ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বাড়িয়া যাইবে। উহাদিগের অপত্য হইলে তিন চারি পুরুষের মধ্যেই সমাজের যে ভীষণ অবস্থা হইতে পারে, তাহা কল্পনা করিতেও সাহস হয় না। যে কোনও প্রকারে অযোগ্যের বিবাহ করা সহজ হয়, এবং সুযোগ্যের কঠিন হয় তাহাই দূষণীয়। রাজনৈতিক কারণে কখন কখন অযোগ্যের ভাগ্যে উচ্চ রাজকার্য্য প্রাপ্তি ঘটিয়া উঠে। তাহাতে উহাদিগের বিবাহ করারও পর বংশকে যোগ্যতায় হীন করার সম্ভাবনা বৃদ্ধি হয়। সুতরাং এরূপ করা সঙ্গত নহে।

যাক, এক্ষণে আমাদিগকে পরবংশ উন্নত করিতে হইবে। প্রশ্ন ছিল, তাহার উপায় কি? জীব-বিজ্ঞানের সুপ্রজনন তত্ত্ব ইহার কি উপায় ইঙ্গিত করে? আমি "নির্দ্দেশ করে," বলিতেছিলাম; কিন্তু এ শাস্ত্রের এখনও এরূপ আয়ু হয় নাই যে,

"নির্দ্দেশ" করিতে পারে; ইঙ্গিতমাত্র করিয়াই বর্ত্তমানে ইহার তুষ্ট হওয়া উচিত। আরও বহু অনুসন্ধান বাকী আছে। সৌভাগ্যক্রমে এ শাস্ত্রের অনুশীলন ও মৌলিক গবেষণা প্রায় সকলেই করিতে পারেন। ইহার উপাদান মানুষ; মন্ত্রাগার, পথ, ঘাট, মাঠ, বাড়ী, গ্রাম, সহর, সর্ব্বত্র বিস্তৃত। জাতীয় উন্নতির ইচ্ছা প্রবল হইলে একটু ক্লেশ স্বীকার করিলেই বহু তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

পরবংশ গঠন।

আমাদিগের প্রশ্নের সদুত্তর দিতে হইলে দেখিতে হইবে, কিরূপে সমাজে সু সন্তান অধিক জাত হয়। ইহার একমাত্র উপায়ই, বিবেচনা পূর্ব্বক বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করা।

(১) বংশানুক্রমিক অথবা দুরারোগ্য অথবা সংক্রামক পীড়াতে যাঁহারা পীড়িত হইয়াছেন, তাঁহারা (যথাসাধ্য) সন্তান উৎপাদনে বিরত থাকিবেন।

(২) ম্যালেরিয়া, বহুমূত্র প্রভৃতি জননশক্তির ক্ষতিকর পীড়া; ব্যভিচার, বিলাসিতা, অতিরিক্ত মদ্য পান, অহিফেন, গাঁজা ইত্যাদি সেবন জননশক্তির ক্ষতিকর দোষ। যাহারা এই সকল জননশক্তির ক্ষতিকর পীড়াগ্রস্ত কিম্বা তদ্রূপ দোষদুষ্ট, তাহাদিগের অপত্যকে অতি যত্ন পূর্ব্বক প্রতিপালন করিতে ও বিশেষজ্ঞ দ্বারা ব্যবহার শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। নচেৎ সমাজ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। মদ্য, অহিফেন ইত্যাদি এত তীব্র ও স্থায়ী বিষ যে শুক্র শোণিতকে নষ্ট অথবা বিকৃত করিয়া অপত্যগণকে বিকলাঙ্গ অথবা বিকৃতমনা করিতে পারে; অনেকস্থলে অতিমাত্র সেবনে জননহীনতাই ঘটাইয়া তুলে। এ সকল পীড়ায় পীড়িত, এ সকল দোষে দুষ্ট ব্যক্তিগণের অপত্য দেহে ও মনে দূষিত হওয়া সম্ভব। সে সম্ভাবনা সম্পূর্ণ দূর করা অসাধ্য; তথাপি শিশুকাল হইতে অতি সাবধানে ও বিবেচনা পূর্ব্বক তাহাদিগকে লালন পালন করিলে জন্মগত কুফলের বাহ্য বিকাশ কিয়দংশে দমন করা যাইতে পারে। ঐ সকল ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে নিষেধ করা সম্ভব নহে এবং বোধ হয় মোটের উপর সঙ্গতও নহে।

(৩) যাঁহারা সুস্থ, সচ্চরিত্র, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সাহসী, এরূপ নরনারী দ্বারা পরবংশের অধিকাংশ গঠিত হওয়া জাতীয় উন্নতি পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এরূপ ব্যক্তিগণ যদ্যপি নিঃস্ব অথবা অর্থহীন থাকেন তবে সমাজ তাঁহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়া বিবাহ-কার্য্যে সহায়তা করিবেন। এস্থলে সমাজ শব্দ দ্বারা আমি রাজাকেই ইঙ্গিত করিলাম। নচেৎ দেশমধ্যে গুণীর সংখ্যা হ্রাস হইয়া যাইবে।

(৪) যাঁহাদিগের জননশক্তি পুরুষানুক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে, তদ্রূপ নরনারী বর্জ্জনীয়। বিবাহযোগ্য নরনারীর দোষ গুণ এই ভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলেই প্রচুর হয় না। বর কন্যার বয়স, বিবাহের প্রণালী, বিবাহক্ষেত্র ইত্যাদিও বিবেচনা করা আবশ্যক। বয়স সম্বন্ধে বহুকাল হইতে নানাবিধ মত প্রচলিত আছে। এইদেশে পুরাকালে কখন কখন যুবক যুবতীর বিবাহ হইত; কখন বা নিতান্ত বালক বালিকার বিবাহ হইত। এখনও হয়। স্মৃতিশাস্ত্র অথবা আয়ুর্ব্বেদের নির্দ্ধারণ এস্থলে উল্লেখ না করিয়াও শুধু জীব-বিজ্ঞানের দিক হইতে এই সকল মতের একটা মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকগণ তাহা করিয়াওছেন। সে চেষ্টা কত

দূর সফল হইয়াছে, জানি না; কিন্তু ইহা জানি যে, সকল সমাজের পক্ষে সকল সময়ে একরূপ নিয়ম সঙ্গত হইতে পারে না।

বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ।

যে সমাজে আরও অধিক জনবল চাই, সে সমাজে বাল্য বিবাহ, পুরুষের বহু বিবাহ ইত্যাদি প্রচলন করা সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু যে সমাজে জনসংখ্যা অধিক, সে সমাজে ঐ সকল কার্য্য অসঙ্গত বিবেচিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপে বহু ব্যক্তি যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই পরবংশ গঠন করিবার, এবং বংশপরম্পরা উন্নত করিবার যোগ্য ছিলেন। তাঁহাদিগের অভাবে, পরবংশ কে গঠিত করিবে? যাহারা ভীরু, দুর্ব্বল, যাহাদিগের দেশপ্রীতি নাই, সৎসাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নাই, বুদ্ধিবল ও জ্ঞানবল নাই; অন্ধ, খঞ্জ, জড়, পীড়াগ্রস্ত—তাহারাই পরবংশ গঠিত করিবে। সুতরাং ২।৩ পুরুষে ইউরোপ অধঃপতিত হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যেমন হিন্দু জাতির অধঃপতন হইয়াছে, বর্ত্তমান যুদ্ধের পর ইউরোপেও তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত। এক্ষণে বিবেচকগণ ঐ সকল মুমূর্ষু সমাজকে রক্ষা না করিলে আর রক্ষার উপায় দেখা যায় না। যে সকল অল্প সংখ্যক গুণী ও যোগ্য ব্যক্তি দেশের প্রয়োজনানুরোধে অথবা অন্য কারণে সমরক্ষেত্রে অবতরণ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগের অথবা তাঁহাদিগের নিকট-বংশীয় ব্যক্তিগণের বহু অপত্য জন্মদান করা এস্থলে বাঞ্ছনীয়। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের বহু বিবাহ দ্বারা এই দেশহিতকর উদ্দেশ্য যেমন সিদ্ধ হইতে পারে, তেমন আর কিছুতেই নহে। তৎপর, ঈদৃশ অবস্থায় বাল্য বিবাহও নিতান্ত প্রয়োজন হইতেছে। নারীগণের ১৩।১৪।১৫ বৎসরের বয়স হইতে ৪০।৪৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অপত্য জন্মিলে অধিক সংখ্যক অপত্য জাত হইতে পারে। কিন্তু ২০।২৫।৩০ বৎসর হইতে ৪০।৪৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সন্তান হইলে, তত অধিক হয় না। যে সকল যুবতী ২০।২৫।৩০ বয়স হইতে সন্তান প্রসব আরম্ভ করেন, তাঁহারা ১৪।১৫ বৎসর বয়স হইতে অন্ততঃ দশ বৎসর কাল সন্তান ধারণযোগ্যা হইয়াও সন্তান ধারণ করেন না। ইহাতে সমাজে ভবিষ্যৎ বংশে লোকসংখ্যা কমিয়া যায়। বিবাহ সত্য সত্যই পুত্রার্থে নিষ্পন্ন হওয়া উচিত। নিজের জন্য, ব্যক্তিগত সুখের আশায় গৃহস্থধর্ম্ম নহে। বিবাহ-প্রথার ইতিহাস যাহাই হউক, উন্নত সমাজে ইহার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, পরবংশ গঠন করিয়া দেশের ও সমাজের কল্যাণ সাধন করা। এ কল্যাণ একমাত্র বিবাহেরই সাধ্য। "যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী সুতং সূতে তথাবিধং"; সুপ্রজনন শাস্ত্র মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রের এই মহাবাক্যেরই ঝঙ্কার মাত্র। সুতরাং ভবিষ্যৎ বংশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে যদি বালিকা বিবাহ আবশ্যক হয়, তাহা করিতেই হইবে। ঈদৃশ বিবাহের অপত্য ক্ষীণ ধাতু হওয়া সম্ভব। তথাপি লোকক্ষয়, সুতরাং ক্রমে জাতীয় বিলোপ নিবৃত্ত করিতে হইলে, বরং অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ-ধাতু ব্যক্তি জন্মাও বাঞ্ছনীয়, সন্দেহ নাই। সার ফ্রান্‌সিস গ্যাল্টন্ এই দিক হইতে বিষয়টীর আলোচনা করতঃ মীমাংসা করিতেছেন যে, নিরবচ্ছিন্ন যুবতী-বিবাহ জাতীয় বিলোপ সাধক।

"The general result is that group B gradually dis-appears,

and the group A more than supplants it. Hence if the races best fitted to occupy the land are encouraged to marry early, they will breed down the others in a very few generations."*

B শ্রেণী ২৯ বৎসর এবং A শ্রেণী ২০ বৎসর বয়স্কা নারী।†

একথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, বাল্যবিবাহ জাতীয় বলক্ষয়কর; উহা কেবল সামাজিক প্রয়োজন বশতঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত প্রবর্ত্তিত করা হইতেছে। সুতরাং জনসংখ্যা বাঞ্ছিত মত বৃদ্ধি হইয়া গেলে উহা আর অনুষ্ঠেয় নহে। সমাজের প্রয়োজন বশতঃ কখন বাল্যবিবাহ, কখন যৌবন বিবাহ; অথবা এক সময়েই সমাজের বিভিন্ন অংশে এই দুই বিভিন্ন প্রথা অবলম্বিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ দেশ, কাল, ও অবস্থা বিবেচনায় সকল প্রথাই অবলম্বন ও পরিত্যাগ করা উচিত। সকল অবস্থায় একটা নির্দ্দিষ্ট বিধি গ্রহণীয় নহে। আমাদিগের দেশে জনসংখ্যা এখনও প্রচুর নহে। বঙ্গদেশীয় নানা জেলায় মোটের উপর দেখা যায় যে, প্রতি বর্গ মাইলে ৩২৫ জন হইতে ৯২৫ জন ব্যক্তি বসবাস করে। ইহার গড় ধরিলে প্রতি বর্গ মাইলে ৫৬৭ লোকের বাস। বঙ্গের আয়তনের শতকরা ৭০ বিঘা আবাদযোগ্য; অবশিষ্ট এখনও আমরা চেষ্টা করিয়া আবাদযোগ্য করি নাই। পরিতাপের বিষয় এই যে, উল্লেখিত আবাদযোগ্য ভূমিরও অর্দ্ধেক মাত্র আমরা আবাদ করি (৪৯·৫); অপরার্দ্ধ আমরা আবাদ করি না। যদি আমরা দেশের বহু পতিত অথবা আবাদের অযোগ্য ভূমি হইতে শস্য উৎপন্ন করিতে জানিতাম; যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ও গুণ বাড়াইতে পারিতাম; তবে আরও বহু লক্ষ ব্যক্তি জাত হইলেও খাদ্যের অভাব হইত না; অথচ সমাজের বলবৃদ্ধি হইত। একদিকে, কত জমি পড়িয়া রহিয়াছে; এবং অন্য দিকে কত অবিবাহিত নর-নারী এবং বিপত্নীক পড়িয়া রহিয়াছেন। ইহা স্মরণ করিলে গভীর পরিতাপের কারণ হয়। পুরাকালে সমাজ বহুবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; সমাজের অবস্থানুসারে পুনঃ পুনঃ স্মৃতিগ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। এখন যেন আমরা জমিয়া যাইতেছি। অবস্থানুসারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারি না। যদিও চেষ্টা করি, মুহূর্ত্ত মধ্যেই সে চেষ্টা ধপ্ করিয়া নিবিয়া যায়। যাহা হউক, সমাজের প্রয়োজনানুসারে কখন বাল্য বিবাহ, কখন যৌবন-বিবাহ, কখন এক বিবাহ, কখন বহু বিবাহ প্রচলিত থাকা আবশ্যক।

বিবাহের প্রণালী।

এক্ষণে বিবাহের প্রণালী ও ক্ষেত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা সঙ্গত বোধ করি। বিবাহের প্রণালী দ্বিবিধ। নিজ দল, গোষ্ঠী, গোত্র ও জাতির মধ্যে কোনটীর অভ্যন্তরে, কোনটীর বহির্ভাগে এতদ্দেশীয় হিন্দুসমাজে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। নিজ জাতি ও দলের মধ্যে; এবং নিজ গোষ্ঠী ও গোত্রের বাহিরে আমাদিগের বিবাহ করিতে হয়। বংশপরম্পরায় এই একমাত্র প্রণালীতে বিবাহ করিলে কতিপয় পুরুষ পরে দেহে ও মনে দুর্ব্বলতা আসে। নিজ দলের (অর্থাৎ মেল বা পটির) মধ্যে, বহুকাল বিবাহকে সীমাবদ্ধ

* Inquiries into human faculty 210.

† বিলাতের ২০ এবং ২৯ বৎসর বয়স্কা নারীর সহিত এতদ্দেশের ১৩।১৪ এবং ২১।২২ বৎসর বয়স্কা নারীর তুলনা করা যাইতে পারে।

করিলে প্রায় একই প্রকার ধাতুর সংমিশ্রনে দীর্ঘকাল পরে জাতীয় চরিত্র বৈচিত্র্য হীন হয়, বংশগত পীড়া বদ্ধমূল হইয়া বহুভাবে প্রকাশিত হয়। জাতীয় চরিত্র "বৈচিত্র্য-হীন" হওয়া বড়ই কঠিন কথা। একই প্রকার অথবা প্রায় একই প্রকার ধাতু বংশানুক্রমে মিশ্রিত হইলে অপত্যে জড়তা আসে; উদ্ভাবনী শক্তি কমিয়া যায়; উদ্যম ও চেষ্টা ক্রমে লোপ হইয়া আসে। এ সকল জাতীয় মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ। নিজ দলমধ্যে বিবাহকে সীমাবদ্ধ করিলে জাতীয় চরিত্র একটা স্থায়ী ভাব ধারণ করে, সন্দেহ নাই; কিন্তু সে স্থায়ী ভাব অর্থ জমিয়া যাওয়া। দেহের ও মনের স্থিতিস্থাপকতা গেলে, ব্যক্তি যখন জমাট বাঁধিয়া যায়, কেবল পুরাতন কর্ম্ম ও চিন্তা ব্যতীত, কেবল স্মৃতিমাত্র রোমন্থন ব্যতীত যখন আর তাহার কিছুই থাকে না, এক ভাবেই বসিয়া থাকে; তখন সে ব্যক্তি জরাগ্রস্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে; তাহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। ব্যক্তির ন্যায় জাতিরও তাহাই হয়। একরূপ শুক্রশোণিত পুনঃ পুনঃ মিশ্রিত হইতে হইতে কতিপয় বংশ পরে জাতির দেহ ও মন জমাট বাঁধিয়া যায় অর্থাৎ জরাগ্রস্ত হয়; তখন তাহার পরিণাম বুঝিতে আর বাকী থাকে না।

পক্ষান্তরে, বহু বংশপরম্পরায় নিজ দলের অথবা নিজ জাতির বহির্ভাগে বিবাহ-কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে থাকিলে ক্রমে অপত্যে সুতরাং সমাজ-চরিত্রে একটা অস্থিরতা আসে; বহু নূতন পীড়া সমাজের দেহে ও মনে প্রবেশ করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হয়। সমাজ-চরিত্রের অস্থিরতাও বড় কঠিন কথা। নানা ভাবের শুক্রশোণিত সংমিশ্রিত হইতে হইতে দীর্ঘকালে জাতীয় চরিত্রের স্থায়ীত্ব নষ্ট হয়; সে সমাজ এত অস্থির হইতে পারে যে, দ্রুত পরিবর্ত্তনই তাহার স্বভাব হইয়া উঠে। ইহাতে পূর্ব্ব আচার অনুষ্ঠান নিয়ত ভাঙ্গিতে থাকে; গড়া অতি কম-ই হয়। এ অবস্থাও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নহে।

তথাপি এস্থলে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। বরং অস্থির হওয়া ভাল, তথাপি জমিয়া যাওয়া কিছু নহে। মানুষের সকল কার্য্যেই অপূর্ণতা; অমিশ্র মঙ্গল তাহার ভাগ্যে নাই। দলের গোষ্ঠির অথবা গোত্রের ভিতরেও বিবাহ করা মঙ্গলজনক নহে, বাহিরেও নহে। দুই দিকেই জাতীয় অনিষ্ট আশঙ্কা করা যাইতেছে। এখন মানব করে কি? এস্থলেও বাল্য-বিবাহ এবং যৌবন-বিবাহের সমস্যার ন্যায় হইয়া উঠিল। সমাজের প্রয়োজন বুঝিয়া কখনও বা দলের মধ্যে বিবাহ করতঃ জাতীয় চরিত্রে স্থায়ীত্ব বিধান করা উচিত; কখনও বা দলের বাহিরে বিবাহ করতঃ সমাজ-দেহে নূতন রক্তের সহিত নূতন উত্তেজনা আনয়ন করা আবশ্যক*; অথবা এক সময়েই এই দ্বিবিধ প্রণালী অনুষ্ঠিত হইলেও মোটের উপর মঙ্গলই আশা করা যায়। একের অমঙ্গলজনকত্ব অন্যের মঙ্গল-জনকত্ব দ্বারা প্রতিহত হইতে পারে। এই বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করতঃ অধ্যাপক টম্‌সন বলেন "There seems much to be said for his (Reibmayn's) thesis that the establishment of a successful race or stock requires the alternation of periods of in-breeding (endogamy) in which characters are fixed, and periods of out-breeding (exogamy) in which by the introduction of fresh blood, new

* Heredity p. 537.

variations are promoted." কিন্তু এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, কিঞ্চিৎ বি-সম ধাতুর নরনারী বিবাহিত হইলে মঙ্গলজনক হইতে পারে; কিন্তু অত্যন্ত বিভিন্ন ধাতুর নরনারীর অপত্য দেহে ও মনে অধম হইয়া যায়। ইহার দৃষ্টান্ত স্থল মুলেটো, মেটে ফিরিঙ্গি ইত্যাদি।

পণপ্রথা।

বিবাহের প্রণালী বিবেচনা করিতে পণ দান প্রথা বিবেচনা করা অসঙ্গত নহে। এ বিষয়টী অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত হইলেও সমাজ-তত্ত্বের সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট। এই প্রথা যে পরিমাণে অপত্যের অর্থাৎ পরবংশের দোষ গুণের সুতরাং জাতীয় উন্নতি অবনতির সহিত সংযুক্ত, সেই পরিমাণেই ইহার বিষয় এস্থলে উল্লেখ করিব। ইহা অনায়াসেই বুঝা যাইতেছে যে,যে সকল উত্তম বর অথবা উত্তম কন্যা পরবংশ গঠন করিবার সম্পূর্ণ যোগ্য, তাহাদিগের পিতা মাতার অথবা অন্য অভি-ভাবকের দারিদ্র্য বশতঃ বিবাহ হইতে না পারিলে সমাজ অনেক সু-সন্তান হইতে বঞ্চিত থাকে। উচ্চ জাতিতে কন্যার অভিভাবকের এবং নিম্ন জাতিতে বরের অভিভাবকের অস্থি-চর্ম্ম অতিমাত্র চর্ব্বণ করাই অধুনা কুটুম্বিতার প্রধান লক্ষণ হইয়াছে। যাঁহারা অবস্থাপন্ন, তাঁহারাই অনেক ক্ষেত্রে অধিক লোভী, দেখা যায়। যাহা হউক, অর্থগৃধ্নু বরকর্ত্তা অথবা কন্যাকর্ত্তার উৎপীড়নে সুযোগ্যগণের বিবাহ তো অনেক সময় হইতেই পারে না; বরং রুগ্ন, বৃদ্ধ, পাপীষ্ঠ ইত্যাদি অতি-অযোগ্য বর কন্যাও বহুক্ষেত্রে বিবাহিত হয়। এরূপ হইলে সমাজ কখনই উন্নত থাকিতে পারে না; পতন নিশ্চিত। বিবাহক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থলোভ অল্প দিন হইল সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। ইহার অন্য যত কারণই থাকুক, আমার বিবেচনায় সমাজে দারিদ্র্য এবং বিলাসিতা বৃদ্ধি হওয়াই ইহার দুইটী গুরুতর কারণ। ইহাদিগের মধ্যে একটী কারণ (দারিদ্র্য) দমন করা দুঃসাধ্য; অপরটী (বিলাসিতা) দমন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইলেও ক্রমেই যেন দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। যাহা হউক,এ সকল বিষয় আমার আর উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। আমি কেবল এই মাত্র বলিতে চাই যে, পণগ্রহণ-প্রথা ক্রমে সমাজকে অধঃপতনের দিকে লইবেই। উত্তম বিবাহের বাধা জন্মাইয়া অপত্যের দেহে ও মনে দোষরাশি সঞ্চয় করিবে; লোকক্ষয় করিবে; গুণীর সংখ্যা হ্রাস করিবে; চরিত্র হানি করিবে;—"করিবে" বলি কেন? বর্ত্ত-মান কালেও বহুক্ষেত্রে করিতেছে; ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

ক্ষেত্র।

বিবাহ-ক্ষেত্র সম্বন্ধে প্রধান কথাই এই যে, ইহা যত সংকীর্ণ হইবে, ততই আমরা অযোগ্য পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতে বাধ্য হইব। বহু বরের মধ্য হইতে যোগ্যকে বাছিয়া লওয়া কঠিন নহে; কিন্তু যে ক্ষেত্রে বরের সংখ্যা কম, সেস্থলে অনন্যোপায় হইয়া অযোগ্যকেও লোকে কন্যাদান করিতে বাধ্য হয়। ইহার আর এক ফল পাত্রের মূল্য বৃদ্ধি। যে দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য তাহার মূল্য বেশিই হয়। যে দ্রব্য অনেক পাওয়া যায়, তাহার মূল্য তাদৃশ অধিক হয় না। একারণেও বরপণ গ্রহণ প্রথা স্থায়ী হইয়া উঠে। এতদ্দেশে যে সকল মেল ও পঠী আছে, তদ্দ্বারা বিবাহ-ক্ষেত্র নিতান্ত সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহা আমাদিগের জাতীয় অবনতি দ্রুতবেগে আনয়ন করিতেছে।

মেণ্ডেলের বিধান।

আমরা সদসৎ বিবেচনা পূর্ব্বক বিবাহ-কার্য্য নিষ্পন্ন করাকেই জাতীয় উন্নতি অবনতির প্রধান কারণ বলিয়া পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি। বিবাহে যোগ্যাযোগ্য বিচারই মানুষ গড়িবার প্রধান, এমন কি, একমাত্র উপায়। বংশানুক্রমের বিধান অনুসারেই এই কার্য্য সিদ্ধ হয়। সেই বিধানের অন্তর্গত মেণ্ডেলের নিয়ম (Mendel's law) নামক নিয়মানুসারে, অযোগ্যে ও সুযোগ্যে মিলন হইলেও তো অযোগ্যতা কালক্রমে দূরীভূত হইতে পারে। তবে আমাদিগের পূর্ব্বোল্লিখিত কথা সকল স্বীকার করা যায় কি প্রকারে? এরূপ আপত্তি উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে। মেণ্ডেলের নিয়মানুসারে কোনও বংশপরম্পরায় অযোগ্যতা দূর হইতে পারে সত্য; কিন্তু অন্য বংশপরম্পরায় অযোগ্যতা বৃদ্ধি হওয়াও অনিবার্য্য। মেণ্ডেলের বিধান সংক্ষেপে এই:—দুইটী বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত প্রাণী হইতে যে সকল অপত্য জাত হয়, তাহাদিগের মধ্যে এক চতুর্থাংশ একটী লক্ষণ এবং অপর এক চতুর্থাংশ অন্য লক্ষণটী প্রাপ্ত হয়; অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ অপত্য উভয় লক্ষণই প্রাপ্ত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ঐ দুইটী লক্ষণ প্রথম পুরুষেই পৃথক হইয়া গেল; কিন্তু সে অপত্য সংখ্যার অর্দ্ধাংশ সম্বন্ধে। অপর অর্দ্ধাংশ সঙ্কর ভাবাপন্ন হইল। প্রথম অর্দ্ধাংশে যে দুইটী লক্ষণ পৃথক হইয়া গেল, উহার প্রত্যেক লক্ষণযুক্ত প্রাণিগণ স্ব স্ব লক্ষণযুক্ত প্রাণীগণের সহিত সংযুক্ত হইলে যে সকল অপত্য জাত হয়, তাহারা বংশানুক্রমে স্ব স্ব লক্ষণ স্থায়ী ভাবে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রথম পুরুষে যে অর্দ্ধাংশ সঙ্কর ভাবাপন্ন হইয়াছিল, তাহারা পরস্পর মিলিত হইলে, যে সকল অপত্য জাত হয়, তাহারাও প্রথম পুরুষের ন্যায় $\frac{1}{4}$ এক লক্ষণ, অপর $\frac{1}{4}$ অন্য লক্ষণ, এবং অর্দ্ধাংশ উভয় লক্ষণযুক্ত সঙ্কর ভাবাপন্ন হয়। এই বিধান নিম্নে অক্ষর দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে:—ক, খ, দুইটী পৃথক লক্ষণযুক্ত ব্যক্তি;

ক × খ

ক ($\frac{1}{4}$) ... কখ ($\frac{1}{2}$) ... খ ($\frac{1}{4}$)

ক	ক $\frac{1}{4}$	কখ $\frac{1}{2}$	খ $\frac{1}{4}$	খ
ক	ক $\frac{1}{4}$	কখ $\frac{1}{2}$	খ $\frac{1}{4}$	খ
				খ

ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ক এবং খ, এই দুইটী পৃথক লক্ষণযুক্ত জীব হইতে "ক" লক্ষণ (যুক্ত জীব) বংশানুক্রমে পৃথক হইয়া গেল; খ লক্ষণও তাহাই হইল। আর ক খ লক্ষণ বংশানুক্রমে যুক্ত হইয়া গেল। ইহাদিগের অনুপাত ।০, ।০র ॥০ মাত্র, সুতরাং অযোগ্য বংশে ।০ আনা যোগ্য অপত্য সম্ভব হইলেও তদপেক্ষা অনেক অধিক অযোগ্যের সম্ভাবনা হইতেছে।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, মেণ্ডেলের বিধান উদ্ভিদ সম্বন্ধে যেরূপ সুপ্রমাণিত হইয়াছে, জন্তু সম্বন্ধে, বিশেষতঃ মানব সম্বন্ধে তদ্রূপ সুপ্রমাণিত হয় নাই। কিন্তু নিত্যই জন্তু সম্বন্ধেও প্রমাণিত হইবার পথে অগ্রসর হইতেছে। কলিকাতার মেটে ফিরিঙ্গি সমাজে অনুসন্ধান করিবার সময় আমার ধারণা হইয়াছে যে, মানব সম্বন্ধেও মেণ্ডেলের বিধান সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে। এতদ্দেশে আপনারা সকলেই এই বিধানটী সঙ্করগণ মধ্যে পরীক্ষা করিতে পারেন। আমি এক দিন দুইটী ফিরিঙ্গিকে তাস খেলিতে দেখিয়া

ছিলাম। তাহাদিগের মুখের আকৃতি দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম, তাহারা দুইটী ভাই। কিন্তু একজন গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, অপর জন গৌর বর্ণ; অনায়াসে খাঁটি শ্বেত-সমাজে স্বজাতি বলিয়া চলিয়া যাইতে পারে। আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারা কি দুই ভাই?" কৃষ্ণবর্ণ ভ্রাতা উত্তর করিল, "হাঁ, আমরা দুই সহোদর"। তখন আমি অত্যন্ত বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, (একটু ভয়ও মনে না হইয়াছিল, তাহা নহে) "আপনাদিগকে কি আমিও ভাই বলিয়া দাবি করিতে পারি?" উত্তরে সেই কৃষ্ণকায় ব্যক্তি বলিলেন, "আমাদিগের মাতা ভারতীয় মহিলা।" এক্ষেত্রে আমি বিবেচনা করিলাম যে, মেণ্ডেলের বিধান অনুসারে শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণ অপত্যে পৃথক হইয়া গিয়াছে। এইরূপ আরও কয়েকটী ক্ষেত্রে আমি দেখিয়াছি। আবার শ্বেত কৃষ্ণ বর্ণের সংমিশ্রণে কটাবর্ণ অপত্য জাত হওয়া আপনারা অনেকেই দেখিয়াছেন। আমাদিগের মধ্যেও এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বর্ণ সম্বন্ধে পরীক্ষা করা যত সহজ হইয়াছিল, মানসিক অবস্থা পরীক্ষা করা তত সহজ নহে; বরং অত্যন্ত কঠিন। মানসিক দোষ গুণ পরীক্ষা করিতে গিয়া আমি মেণ্ডেলের বিধানের সত্যাসত্য কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তথাপি, এ কথা আমার একরূপ মোটামোটি ধারণা হইয়াছে যে, পুত্র এ বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে মাতৃভাবাপন্ন এবং কন্যা পিতৃভাবাপন্ন হওয়া সম্ভব। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও অনেক দেখিয়াছি। ফলতঃ, অনেক অনুসন্ধানের ফল না দেখিয়া এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলা সঙ্গত নহে।

এক্ষণে উপরের লিখিত সন্দেহের মীমাংসা হইতে পারে। অযোগ্যগণ হইতেও সুযোগ্য অপত্য লাভ হইতে পারে সত্য; কিন্তু অন্য দিকে উহাদিগের সংমিশ্রণ হইতে বহু বংশে ধারাবাহিক রূপে অযোগ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া যায়। এবং যোগ্যাযোগ্যের সংমিশ্রণ অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠে। বহু অপত্য হইলেই সমাজ লাভবান হয় না; কথা হইতেছে এই যে, উহাদিগের মধ্যে কি পরিমাণ জীবিত থাকিবার ও বংশবৃদ্ধি করিবার যোগ্য, এবং কি পরিমাণে ফাঁসির কাঠে ঝুলিবার উপযুক্ত? শেষোক্ত অপত্যগণ যত ঝোলে, ততই মঙ্গল। যাহা হউক, ইহাদিগের বিবাহ সম্পূর্ণ নিষেধ করা সম্ভব নহে। সুতরাং বিবাহ-ক্ষেত্রে ইহাদিগকে যত কম গ্রহণ করা যায়, এবং যোগ্য যোগ্যাগণকে অথবা তদ্রূপ বংশীয়গণকে যত অধিক গ্রহণ করা যায়, ততই মঙ্গল।

এই একটী কার্য্য—অর্থাৎ বিবাহ-সংস্কার, বিবেচনা পূর্ব্বক করিতে জানিলেই জাতীয় জন্মগত গুণ সকলের উন্নতি বিধান করা সম্ভব হয়; নচেৎ মানবকে বংশপরম্পরায় উন্নত রাখা সম্ভব নহে। সুপ্রজনন তত্ত্বের ইহাই প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, মহাত্মা গ্যাল্টনের উপরি উদ্ধৃত সংজ্ঞা হইতেই বুঝা যাইতেছে "also those that develop the inborn influences to the utmost advantage" অর্থাৎ ব্যক্তির জন্মগত গুণ সকলের এরূপ ভাবে বিকাশ সাধন করা উচিত যে, জাতির কল্যাণকর হয়। ইহা প্রতিপালন ও শিক্ষাদানের উপর নির্ভর করে। এই বিষয়টী অতিশয় বৃহৎ এবং নানা ভাগে বিভক্ত। এ স্থলে সে সকলের আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। তবে, এই কথাটী না বলিয়া নীরব হইতে পারি না যে, যে শিক্ষায় ব্যক্তিকে তাহার জাতীয় কর্ম্মের

যোগ্যতা প্রদান করে না, পক্ষান্তরে প্রতি পদেই অপরের মুখাপেক্ষী করে, তাহা জাতীয় অধঃপতনের একটী প্রধান উপায়। এ কথা বিস্মৃত হইলে ব্যক্তিরও অধোগতি, জাতিরও অধোগতি।

আপনাদিগের মধ্যে অনেকের অনেক গুরুতর কথা বলিবার আছে; তাহা শ্রবণ করিয়া আমরা বিশেষ ভাবে লাভবান হইব, সন্দেহ নাই। আমি আপনাদিগের আর অধিক সময় লইব না। কিন্তু এ কথাটী বিশেষ নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিবই, জাতীয় উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে হইলে সদসৎ বিচার পূর্ব্বক বিবাহ-কার্য্য নিষ্পন্ন করাই প্রধান কথা। এ কার্য্যে সজ্জন ও সদ্বংশের দিকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য করিতে হয়। ঈদৃশ আচরণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আমরা যে দেশে, যে সমাজে ও যে পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাহাকে ক্রমাবনতি হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা প্রত্যেকেরই গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এ কর্ত্তব্যের অবহেলার ন্যায় মহাপাতক আর নাই। সাহিত্যের উন্নতিই জাতীয় উন্নতির প্রধান উপায়। বাঞ্ছিত পথে সাহিত্যকে পরিচালিত করা, বিচার পূর্ব্বক একাগ্র হইয়া সেই পথে দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হওয়া ব্যতীত, এ সাধনায় সিদ্ধি লাভের আশা করা যায় না। তুচ্ছ সাহিত্যিক ক্রীড়া লইয়া আর সময় ক্ষেপণ করা চলে না। শূন্য হস্তের করতালি লাভ করা সহজ হইতে পারে; কিন্তু সাধনা বড়ই কঠিন বস্তু। সকল সাধনার প্রধান সাধনা যথাযোগ্য মানবকে লাভ করা; মানুষের দেহ ও মন বর্ত্তমান অবস্থার ও ভবিষ্যৎ আশার উপযোগী করা, এবং সমাজের ও দেশের কল্যাণ সাধনের যোগ্য করা। পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর জয়ী হইতে না জানিয়া পুরাকালে কত জীব মরিয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। আজি তাহাদিগের কঙ্কাল মাত্র ধরাগর্ভে পড়িয়া রহিয়াছে, সে অস্থিপুঞ্জ নীরবে কি মহা শিক্ষাই দিতেছে। কত বিষয়ে কত উন্নতি লাভ করিয়াও, মানুষ গড়িতে না জানায়, বিচার পূর্ব্বক বিবাহ করিতে না জানায়, কত সমাজ পুরাকালে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমরা যেন সে শিক্ষা গ্রহণ করিতে অবহেলা না করি। মানবকে বেষ্টনীর উপর জয়ী হইতেই হইবে, প্রকৃতিকে অনুসরণ করাই জয়ী হইবার মূল মন্ত্র। সে মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইলে প্রকৃতি কি উপায়ে মানবকে ধনে জনে ন্যায়ে ও সামর্থ্যে বড় করেন, আবার কোন উপায়ে তাহাকে অধঃপতিত করেন, এ সকল গভীর গবেষণা দ্বারা অবগত হইতেই হইবে। এ মন্ত্র লাভ করা ভিন্ন জাতীয় মৃত্যু নিবৃত্ত হইবার নহে। জাতীয় জড়তা এবং জননহীনতা মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ ;— এ সকল বিনা কারণে হয় না। সেই কারণ-পরম্পরা জ্ঞাত হইলেই উহার প্রতিকার করিবার পন্থা আবিষ্কৃত হয়; তখন সৎসাহস অবলম্বন করিয়া সেই পথে অগ্রসর হইতে পারিলেই জাতীয় জীবন রক্ষা করিবার আশা করা যায়। এ বিষয় এস্থলে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা সম্ভব নহে। তথাপিও যদি আমি এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে আপনাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হই; আপনাদিগের মধ্য হইতে কাহারও হৃদয়ে মানবতত্ত্ব আলোচনার স্পৃহা আরও প্রবল ভাবে জাগ্রত করিয়া দিতে সক্ষম হই, আমার এই জ্ঞান-গৌরব-মণ্ডিত দেশে আবার যদি আয়াসসাধ্য মৌলিক জ্ঞানানুসন্ধানের প্রতিজ্ঞা উন্নত শিরে আত্মপ্রকাশ করে, তবেই আমাদিগের এই সাহিত্য-সম্মিলন সফল হয়, আমরাও কৃতার্থ হই ; নচেৎ আমরা

"পরি দীপমালা নগরে নগরে,
মোরা যে তিমিরে, মোরা সে তিমিরে।"

শ্রীশশধর রায়।

মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত।

বৃহদাকার বপুই বলবানের লক্ষণ নহে ; মালা, তিলক বা উপবীতধারী হইলেই, ব্রাহ্মণ বা ভগবদ্ভক্ত হয় না। মুচি, মেথর, ডোম, চণ্ডাল হইলেই হেয়, অস্পৃশ্য, অসাধু, মনুষ্যত্ব-বিবর্জ্জিত হইবে, এমন কথা, পুরাণ অথবা শাস্ত্রকারগণও স্বীকার করেন নাই। মহা-পুরাণ মহাভারতে আছে :—

"চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

অতীত কালের নীচ জাতিসম্ভূত—গুহক, শবরী, কবির, হরিদাস প্রভৃতি মহাভাগবৎ তুল্য মহাত্মাবর্গের কথা বাদ দিলেও, অধুনা এই পুণ্যভূমি ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ, দৈন্য-দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত, পরকীয় রজোগুণের আত্মসর্ব্বস্ব ভাবাচ্ছাদিত হইলেও, সাধুভক্ত উদার মহা-প্রাণ, জননশীল উর্ব্বরা শক্তি হ্রাস করিতে সমর্থ হয় নাই। এই প্রবল উর্ব্বরা-শক্তির নিকট বিরুদ্ধ শক্তি ম্লান, পরাজিত। তাই আজও নীচ জাতি বলিয়া যাহারা উপেক্ষিত, অনাদৃত, ঘৃণ্য, তাহাদের মধ্য হইতেই অজস্র ঐ মহৎ ভাবাপন্ন মানুষ জন্মাইয়া, জগতকে স্তম্ভিত করার উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে। আজ আমি ক্ষুদ্র বরিশাল সহরের চারিটী মুচির পরিচয় পাঠকবর্গকে উপহার দিয়া নিজকে পবিত্র করিব।

প্রথম চিত্র।

১৩০৭ সালের মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথি দিবসের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মুচি-দের একশত এক বৎসর বয়স্ক কুলগুরু চিরকুমার লালদাস, শিষ্যবর্গের নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া, সমবেত শিষ্যবর্গকে বলিলেন—"আজ আমি যাত্রা করার সঙ্কল্প করিয়াছি, তোমরা শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন কর, (ভজন গাও)"। শিষ্যমণ্ডলী ভাবিল, গুরুদেব বোধ হয় তীর্থ ভ্রমণাদি ব্যপদেশে বা জন্মভূমি ফরক্কাবাদ কি আচানক আশ্রমে, এইরূপ কোন স্থানে যাইবেন। স্বেচ্ছাধীন গুরুর স্বাতন্ত্র্য তাহা-দের অবগত থাকায়, তাহারা অন্য কোন প্রশ্ন না করিয়া গুরু-আজ্ঞা পালন করিল—নাম সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। গুরু যোগাসনে উপ-বিষ্ট, সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবৎ গ্রন্থ ; দণ্ডক্ষণব্যাপী কীর্ত্তন চলিতেছে, বৃদ্ধ গুরু, যুবার ন্যায় স্থির মেরুদণ্ডে, স্তিমিতলোচনে—নিস্পন্দ নির্ব্বাক। তখন সূর্য্যকিরণ চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়াছে। কীর্ত্তন-শ্রান্ত শিষ্যমণ্ডলী ইঙ্গিত প্রাপ্তির জন্য, ঔৎসুক্যের সহিত, শ্রীগুরুর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন,—মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহারা বিস্মিত ও স্তম্ভিত চিত্তে কীর্ত্তন বন্ধ করিল। সামান্য অনুধাবনান্তেই তাহারা বুঝিল,—গুরুদেব যাত্রাচ্ছলে মহা যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহার প্রাণপাখী, পঞ্চভূতাত্মক দেহ-পিঞ্জর শূন্য করিয়া, মুনি ঋষির কঠোর সাধনের লক্ষ্যস্থল, অনন্ত শান্তিময়ের ক্রোড়ে চির আশ্রয় লাভ করিয়াছে।

ক্ষণকাল মধ্যে এ ইচ্ছা-মৃত্যুর সংবাদ সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। চতুর্দ্দিক হইতে লোকসঙ্ঘ ঐ অপ্রাকৃত দেহ দর্শন মানসে সমবেত হইল, তখন ঐ ভক্তদেহ অগুরু-চন্দন-চর্চ্চিত করিয়া আসনাবদ্ধ অবস্থায়ই পত্র-পুষ্প বিশোভিত মঞ্চোপরি স্থাপিত করিয়া, এক বিরাট শোভা-যাত্রা সহর ভেদ করিয়া, মুচিদের জাতীয় কবর স্থানের দিকে

চলিতে লাগিল। শিষ্যমণ্ডলী আজ উন্মাদিয়া সঙ্কীর্ত্তনে, জগত সমক্ষে স্বীয় গুরুদেবের বিজয় বার্ত্তা সগৌরবে ঘোষণা করিতে লাগিল। শোভাযাত্রা ক্রমে উচ্চ জাতীয় ভদ্র শ্রেণী দ্বারা পুষ্ট হইতে লাগিল। পুরনারীগণ যথা-সম্ভব দূর হইতে ঐ পূত পবিত্র দেহ দর্শন মানসে সমবেত হইতে লাগিল। মাঘী সপ্তমীর পুণ্য দিনে, বরিশালবাসী এ জগত মঙ্গল ভক্ত কাহিনী শ্রবণ ও দর্শন করিয়া তিথির সার্থকতা উপলব্ধি করিলেন। লাখুটীয়া যাইবার রাস্তা হইতে,ঐ কবর স্থানে যে একটী মাত্র ইষ্টক-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র স্তম্ভ দৃষ্ট হয়, উহাই ঐ পরম পবিত্র মুচি-কুলগুরু লালদাসের সমাধি-স্থল।

দ্বিতীয় চিত্র।

ঝড়ু নামে এক প্রৌঢ় মুচি, লুকাস সাহেবের কুঠীর সম্মুখে লিচুতলায় বসিয়া জুতা মেরামত করে। 'চামার পট্টী'তে স্ত্রী পুত্র লইয়া বাসা করিয়া আছে, পরিবার প্রতিপালনের ব্যয়াধিক্য বশতঃ ক্লেশের সহিত দিন যাপন করিতে হয়।

একদিন অপরাহ্নে একটী ভদ্রলোক জুতা মেরামত করিতে আসিয়া, অসতর্কতা বশতঃ একটী মূল্যবান স্বর্ণাঙ্গুরী ঝড়ুর বাক্সের নিকট ফেলিয়া যায়। সন্ধ্যায় যখন ঝড়ু বাসায় যাইবে, তখন সে দেখিল, একটী স্বর্ণাঙ্গুরী তাহার নিকটেই পড়িয়া আছে। নির্লোভ ঝড়ু তাহা বাসায় লইয়া যাওয়া সঙ্গত মনে করিল না, স্তুপাকারে রক্ষিত কাটা টুকরা চামড়া ও আবর্জ্জনার ভিতর ফেলিয়া রাখিয়া বাসায় চলিয়া গেল। এ দিকে রাত্রে সেই ভদ্রলোকটীর হুঁশ হইল যে, তাহার অঙ্গুরী নাই, তখনই সে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান জন্য বাহির হইল। সন্দিগ্ধ স্থান মধ্যে চামারের কাছেও পড়িতে পারে, এইরূপ সন্দেহ হইলে, রাত্রেই ঐ মুচির বাসা খোঁজ করিয়া চামার-পট্টী উপস্থিত হইল। ঝড়ু তখন জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিল—"আপনাদের আংটী হইলে নিশ্চয়ই পাইবেন। কিন্তু আজ রাত্রে পাবেন না, কাল সকাল বেলা আমার বসিবার স্থানে যাইবেন।" অগত্যা ভদ্র লোকটী বাসায় ফিরিয়া গেল। পরদিন প্রত্যূষে, মুচি পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ভদ্রলোকটী নির্দ্ধারিত স্থানে দাঁড়াইয়া আছে। মুচি আসিয়া ঐ ছিন্ন টুকরা চামড়ার স্তুপ হইতে তালাস করিয়া আংটী বাহির করিল। ঝড়ু তাহার নিকট আংটী না দিয়া,তাহার বাসা কোথায়, জিজ্ঞাসা করিল,প্রত্যুত্তরে ভদ্রলোকটী বলিল, "আমি সরকারী উকিল গণেশ বাবুর বাসায় থাকি"। ঝড়ু ঐ ভদ্রলোক সহিত গণেশবাবুর বাসায় উপস্থিত হইয়া, ঐ ভদ্রলোকটীই যে অঙ্গুরীর সত্বাধিকারী, তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া, অঙ্গুরী প্রদানান্তর চলিয়া আসিতেছে, তখন ঐ বাসার সকলে পরামর্শ করিলেন যে, উহাকে কিছু পুরস্কার দেওয়া উচিত। রাস্তা হইতে মুচিকে ফিরাইয়া আনা হইল, এবং পুরস্কার স্বরূপ তিনটী টাকা প্রদান করা হইল। মুচি বলিল "কেন বাবু? তোমার জিনিষ তোমাকে দিলাম, তাতে আবার টাকা নিব কেন?" উপস্থিত ব্যক্তিগণ তাহার প্রত্যাখ্যানের ভাবে বিস্মিত হইলেন। তথাপি পুনঃ পুনঃ জেদ করিতে লাগিলেন। ঝড়ু তখন একটু নীরবে চিন্তা করিয়া বলিল, "আচ্ছা বাবু! আমার ছেলে মেয়েদের মিঠাই কিনিয়া দিতে এই এক টাকা নিলাম।" এই বলিয়া একটী টাকা তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। প্রশংসাবাদ বা স্তুতি শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিল না।

তৃতীয় চিত্র।

তার নাম লালা মুচি—কেহ ডাকে, রামপ্রসাদ। চামার-পট্টীতে বাসা আছে। কালীবাড়ী পোষ্টাফিসের কিছু পশ্চিমে, ঝাউগাছ তলায় বসিয়া সে জুতা মেরামত করে, আজ প্রায় ১৫ বৎসরের অধিক কাল গত হইল, সে ঐ ঝাউতলার স্থান পরিবর্ত্তন করে না। নিরানন্দের পয়সা ধার ধারে না, বাবুদের কাছে ইংরেজীতে পয়সা চায়। ভদ্র পরিবারের মেয়ে বউদের নাম ধরিয়া ডাকে; ইচ্ছা পূর্ব্বক ভদ্র লোকদের সহিত সম্মান রক্ষা করিয়া কথা কয় না। অথচ কেউ তার উপর অসন্তুষ্ট নয়। লালা ক্ষুদ্র হইলেও তাহার জনপ্রিয়তা বড় লোকেরও লোভনীয়।

একদিন সকাল বেলা একটী ব্রাহ্মণ জুতা মেরামত করিতে আসিয়া, সঙ্গীয় শতাধিক টাকার একটী পুটলী লালার সরঞ্জামের নিকট ফেলিয়া চলিয়া যায়। লালা মধ্যাহ্নে যখন বাসায় যাইবে, তখন ঐ টাকার পুটলী দেখিয়া তাহার জুতার বাক্সের ভিতর রাখিয়া চলিয়া গেল। অপরাহ্নে ব্রাহ্মণটী ম্রিয়মাণ হইয়া লালার কাছে দাঁড়াইয়া আছে, ব্রাহ্মণটী স্থির করিতে পারে নাই যে,কোথায় টাকার পুটলী ফেলিয়া গিয়াছে। লালা কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছে যে, এই লোকই টাকা ফেলিয়া গিয়াছে। লালা তাহার দিকে চাহিয়াই জিজ্ঞাসা করিল "আপনাকে এমন শুষ্ক দেখা যাইতেছে কেন?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মন বড় খারাপ"। লালা বলিল "কেন, কি হইয়াছে বলুন না?" লালা জেদ করায় ব্রাহ্মণটী টাকার বৃত্তান্ত বলিল। লালা তখন বলিল—"আপনার টাকাই কি সত্য? যদি আপনার সত্যের টাকা হয়, তবে নিশ্চয়ই পাবেন, ভয় কি?" লালার কথায় ব্রাহ্মণ একটু আশার ইঙ্গিত পাইয়া, সাশ্রু নয়নে লালার হাত ধরিয়া বসিয়া পড়িল। লালা তখন বাক্স হইতে টাকার পুটলী বাহির করিয়া বলিল "আপনার টাকা গণিয়া দেখুন"। ব্রাহ্মণ টাকা গণিতে চাহিল না, গদ্‌গদ্ কণ্ঠে লালার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিল। এইরূপে অশ্রুপূর্ণ নয়নে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইল,ব্রাহ্মণ পুটলী হইতে পাঁচটী টাকা বাহির করিয়া গ্রহণ করার জন্য লালার হাত ধরিয়া সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিল। লালা কিছুতেই তাহা গ্রহণ করিল না, বরং সত্বর তাহাকে বিদায় দিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণের সকৃতজ্ঞ আশীর্ব্বচনে সে লজ্জিত হইতেছিল। উল্লিখিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় চিত্র লিখিত ঘটনা দুই বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে সংঘটিত, ঝড়ুর নিকট জিজ্ঞাসায় বুঝিয়াছি—এ কাজটা যে তেমন গৌরবজনক কিছু, এ ধারণাই তাহার নাই। উহারা জাত্যাংশে—অস্পৃশ্য, বিদ্যায় নিরক্ষর, সংসর্গ মদ্যপায়ীর। আজ যাহারা শিক্ষালোক-গর্ব্বিত, তাহাদের মধ্যে এমন একটী নির্লোভ অনুষ্ঠান কাহারও দ্বারা সম্পাদিত হইলে, তাহা ঢাক ঢোল পিটাইয়া জাহির করার চেষ্টায় কয়জন বিরত থাকিত, তাহা ভাবিবার বিষয় নয় কি? তৎপর লোকচক্ষুর অন্তরালে, জনসমাজে সাধুতা বজায় থাকিবার কোন ব্যাঘাত না জন্মিলে, বিষয় বিশেষে কয়জন লালসাবিহীন মুক্তচিত্ততার পরিচয় দিতে পারেন, জানিনা। সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক, প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক থাকা কালীন, বাঘআঁচড়ার আশ্রমে নিজ মানসিক উৎকর্ষতার বিষয় চিন্তা করিতেছেন, তখন দেখিলেন, নির্ব্বিরোধে লালসাময়ী অসঙ্গত কার্য্য সমাধার সুযোগ

প্রাপ্ত হইয়াও তাহা দৃঢ়তার সহিত পরিত্যাগ করার মত মন এখনও তৈয়ারী হয় নাই। যদিও এই অভাব উপলব্ধির অনতিকাল মধ্যেই তাঁহার অবস্থান্তর হইয়াছিল, তবুও বলি, যিনি মহর্ষি প্রভৃতির মতে প্রচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করিলেন, সেই মহাত্মার অকপট সত্যবাণী, যাহা আমরা ক্ষুদ্র হইলেও প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করি বা অকপটে অমন সত্য প্রকাশ করিতে অক্ষম বলিয়াই ক্ষুদ্র। তাই মনে হয়, ঐ দেবদুর্লভ মহত্ত্ব রূপ "সাধ্যবস্তু" বিনা সাধনে রাস্তার মুচির জীবনে প্রতিফলিত দেখিলে কি মনে হয় না যে, অভিমানী আমরা কোন্ পুতিগন্ধময় অন্ধকূপে থাকিয়া, উচ্চ জাতিকুল-পাণ্ডিত্য লইয়া অভিমান করিতেছি?

চতুর্থ চিত্র।

একদিন শ্রদ্ধেয় ডাক্তার কালীনাথ বাবু বলিলেন "শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের বাসার পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে যে মুচি আছে, তার কাছে জুতা মেরামত করিতে গেলাম, কিন্তু মুচি বলিল, বাবু! আজ আর কাজ করবো না। হেতু জিজ্ঞাসায় মুচি উত্তর করিল, 'আজ আমার যে পয়সার দরকার তা পেয়েছি'। শুনিবামাত্র মনে হইল, মুচি এ সাধন-দুর্লভ বৈরাগ্যের কথা কোথায় পাইল? "সঞ্চয় করা নহে বৈরাগীর ধর্ম্ম"। তদবধি তার সন্ধান লইতে প্রাণ উদ্‌গ্রীব হইল, তাই সে-খানে গিয়া একদিন তার বাক্সের উপর বসিলাম, অবগত হইলাম, তার নাম জবিদ নারায়ণ, এখানে পরিবার পরিজন কেহ নাই, ঐ রাস্তার পার্শ্বেই অনুমান দুই হস্ত দীর্ঘ দেড় হস্ত প্রস্থ পর্ণকুটীরই তাহার বাসস্থান, ঐ ক্ষুদ্র স্থান মধ্যে নানাবিধ পত্র পুষ্প ফল দ্বারা তার ইষ্টদেবের পূজা করায় ঐ ঘরের এক চতুর্থ পরিমিত স্থান আটক রহিয়াছে। নিজে পাক করিয়া খায় না; যদি কেহ পাক করা সামগ্রী দেয় তবে খাইতে আপত্তি নাই। শুনিলাম চারি মাস মধ্যে তিন দিন ভাত খাইয়াছে; শুষ্ক, ভাজা অথবা ফল দ্বারাই সাধারণতঃ উদর পূর্ত্তি করে। প্রায় প্রত্যহই কাশীপুরের জঙ্গল হইতে বন্য ফল ফুল সংগ্রহ করিয়া আনে ও তাহার প্রভুর ভোগ লাগায়। বহু সময় দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত গীতা অধ্যয়ন করে। এক ভদ্রলোকের নিকট শুনিলাম, বোর্ডিংএর কোন কোন গরীব ছেলেকে বিনা পয়সায় জুতা সারিয়া দিয়া থাকে। এতাধিক আর কোন পরিচয় দিতে পারিলাম না। তবে বোধ হয় গীতার সার গ্রহণের সামর্থ্যতা বুঝি বহুল পরিমাণে লাভ করিয়াছে। কেবল মনে পড়ে "আজকের প্রয়োজনীয় পয়সা পাইয়াছি, আর কাজ করিব না"—মুচির মুখে এ বেদ-পুরাণ-মথিত অমিয়বাণী কে বলাইল? এমন বিশ্বাস, এমন প্রেম, নির্ভর, মহত্ব যিনি মুচি-হৃদয়ে প্রেরণ করিয়া, অভিমানীর অভিমান—অহঙ্কারীর অহঙ্কার চূর্ণ করিবার ব্রহ্মাস্ত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছেন, সেই বিগ্রহকে ভূয়োঃ ভূয়োঃ নমস্কার! মুচিকে নমস্কার!—আর সেই দেশকে নমস্কার!—যে দেশের জল বায়ুতে বিধিমার্গে অস্পৃশ্যকুল হইতেও এই সমস্ত আদর্শ জন্মিবার ক্ষমতা রক্ষিত আছে। আবার সেই বেদ বিধির পরপারের আচণ্ডালের আশার বাণী কহিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি—

"সংকুল বিপ্রই নহে ভজনের যোগ্য।
হীন নীচ জাতি নহে ভজনে অযোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্তহীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥"

(চৈতন্য চরিতামৃত)

শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত।

জাতকের ইতিহাস।

অধ্যাপক ফৌস্‌বোল-সম্পাদিত "জাতকার্থ-বর্ণনা" নামক পালি গ্রন্থের জাতক-সংখ্যা ৫৪৭। জাতকার্থবর্ণনা কেবল জাতক-সংগ্রহ নহে ; ইহাতে নিদানকথাকারে অতীত-বুদ্ধগণের, বিশেষতঃ গৌতমবুদ্ধের, জীবন-বৃত্তান্ত, প্রত্যেক জাতকের উৎপত্তির ইতিবৃত্ত এবং গাথাসমূহের সবিস্তর ব্যাখ্যা আছে। গত দুই বৎসর নব্যভারত, সাহিত্য, সাহিত্য-সংহিতা, জগজ্জ্যোতিঃ, হিতবাদী, বসুমতী প্রভৃতি কতিপয় মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রে এই অনুবাদের কোন কোন আখ্যায়িকা প্রকাশিত হইয়াছিল বটে ; কিন্তু তন্মাত্র পাঠ করিয়া জাতকরূপ সুবিশাল গ্রন্থের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। অতএব এ সম্বন্ধে অগ্রে দুই একটী স্থূল স্থূল কথা বলা আবশ্যক।

জাতক।—বৌদ্ধদিগের মতে জাতকগুলি ভগবান্ গৌতম বুদ্ধের অতীতজন্মবৃত্তান্ত। তাঁহারা বলেন, শুদ্ধ এক জন্মের কর্ম্মফলে কেহই গৌতম প্রভৃতির ন্যায় অপারবিভূতি-সম্পন্ন সম্যক্‌সম্বুদ্ধ হইতে পারেন না ; তিনি বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধাঙ্কুরবেশে কোটিকল্পকাল নানা যোনিতে জন্মজন্মান্তর পরিগ্রহপূর্ব্বক দানশীলাদি পারমিতার অনুষ্ঠান দ্বারা উত্তরোত্তর চরিত্রের উৎকর্ষসাধন করেন এবং পরিশেষে পূর্ণপ্রজ্ঞা লাভ করিয়া অভিসম্বুদ্ধ হন। অভিসম্বুদ্ধ অবস্থায় তাঁহার 'পূর্ব্বনিবাস-জ্ঞান' জন্মে, অর্থাৎ তিনি স্বকীয় ও পরকীয় অতীতজন্ম-বৃত্তান্তসমূহ নখদর্পণে দেখিতে পান। * গৌতমবুদ্ধেরও এই অলৌকিক ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। তিনি শিষ্যদিগকে উপদেশ দিবার সময় ভবান্তর-প্রতিচ্ছন্ন অতীত কথাসমূহ শুনাইয়া তাঁহাদিগকে নির্ব্বাণ-সমুদ্রের অভিমুখে লইয়া যাইতেন। তিনি মহাধর্ম্মপালজাতক বলিয়া নিজের পিতাকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, চন্দ্রকিন্নরজাতক বলিয়া, যশোধারার পাতিব্রত্যধর্ম্ম যে পূর্ব্বজন্ম-সংস্কারজ তাহা বুঝাইয়াছিলেন এবং স্পন্দন, দদ্দভ, লটুকিক, বৃক্ষধর্ম্ম ও সম্মোদমান এই পঞ্চ জাতক শুনাইয়া শাক্য ও কোলিয়দিগের বিরোধ নিবারণ করিয়াছিলেন। * প্রত্যেক জাতকই এইরূপ কোন না কোন বর্ত্তমান প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছিল এবং উত্তরকালে গৌতমের শিষ্যগণ অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় এই সকল আখ্যায়িকাও লোকহিতার্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গৌতমপ্রোক্ত জাতকগুলি বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রের নবাঙ্গের এক অঙ্গ এবং সুত্তপিটকান্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের শাখা। ধম্মপদ, থেরগাথা, থেরীগাথা, বুদ্ধবংস, চরিয়াপিটক প্রভৃতি প্রসিদ্ধগ্রন্থও খুদ্দকনিকায়েরই ভিন্ন ভিন্ন অংশ।

পালিভাষা।—জাতকার্থবর্ণনা পালিভাষায় রচিত। পালি সংস্কৃতের সোদরা বা পুত্রী, ইহার উৎপত্তি-স্থান মগধে বা কলিঙ্গে, তাহা ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দিগের বিচার্য্য। শব্দগত, উচ্চারণ-গত, এমন কি ব্যাকরণগত সাদৃশ্য দেখিলে মনে হয়, ইহা উৎকল, বঙ্গ প্রভৃতি কতিপয় প্রাচ্য ভাষার জননীও হইতে পারে। অধ্যাপক

* পূর্ব্বনিবাসজ্ঞান কেবল অভিসম্বুদ্ধ-লক্ষণ নহে ; যাঁহারা অর্হত্ত্ব লাভ করেন তাঁহাদেরও এই ক্ষমতা জন্মে।

* মহাধর্ম্মপালজাতক (৪৪৭), চন্দ্রকিন্নরজাতক (৪৮৫), স্পন্দনজাতক (৪৭৫), দদ্দভজাতক (৩২২), লটুকিকজাতক (৩৫৭), সম্মোদমানজাতক (৩৩) এবং বৃক্ষধর্ম্মজাতক (৭৪)।

অটো ফ্রাঙ্ক বলেন যে এক সময়ে ভারতবর্ষে ও লঙ্কাদ্বীপে পালিই আর্য্যদিগের সাধারণ ভাষা ছিল। সে যাহা হউক, প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতির পূর্ব্বে ইহাতে যে কোন গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না; কিন্তু গৌতমবুদ্ধের শিষ্য প্রশিষ্যগণের প্রযত্নে শেষে ইহা নানাগ্রন্থের প্রসূতি হইয়াছিল। উত্তরে কপিলবস্তু ও শ্রাবস্তী হইতে দক্ষিণে রাজগৃহ ও বুদ্ধগয়া, পশ্চিমে সাঙ্কাশ্য হইতে পূর্ব্বে অঙ্গ ও বৈশালী, এই সুবিশাল অঞ্চল গৌতমবুদ্ধের প্রধান লীলাক্ষেত্র। আপামর সাধারণকে মুক্তিমার্গ প্রদর্শন করাই যখন তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি প্রচলিত ভাষাতেই ধর্ম্মদেশন করিতেন এবং তাঁহার শিষ্যগণ যত্নসহকারে তাঁহার বাক্যগুলি যথাসাধ্য অবিকৃত অবস্থায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। অতএব পালি যে উল্লিখিত সমস্ত অঞ্চলেই জনসাধারণের ভাষা ছিল এরূপ অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। উত্তরকালে বৈষ্ণবদিগের প্রযত্নে হিন্দী ও বাঙ্গালাভাষার যে সৌষ্ঠব সাধিত হইয়াছে, বৌদ্ধদিগের চেষ্টায় পালির তদপেক্ষাও অধিক সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। তিপিটক, বিসুদ্ধিমাগ্গ, দীপবংস, মহাবংস, মলিন্দপঞ্হ প্রভৃতি পালি গ্রন্থ সাহিত্যভাণ্ডারে মহার্ঘ রত্ন।

জাতকার্থবর্ণনা।—দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধেরা বলেন যে খ্রীষ্টের ২৪১ বৎসর পূর্ব্বে মৌর্য্য সম্রাট্ ধর্ম্মাশোকের পুত্র স্থবির মহেন্দ্র * যখন ধর্ম্ম প্রচারার্থ সিংহলে গমন করেন, তখন তিনি পালি ভাষায় লিখিত সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র ও তাহাদের অর্থকথা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন এবং সিংহলী ভাষায় অর্থকথাগুলির অনুবাদ করিয়াছিলেন। শেষে, কি কারণে বলা যায় না, অর্থকথাসমূহের পালি মূল বিনষ্ট হইয়া যায়। অনন্তর খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে মাগধব্রাহ্মণ-কুলজাত সুপ্রসিদ্ধ বুদ্ধঘোষ সিংহলে গিয়া পালিভাষায় উহাদিগের পুনরনুবাদ করেন। বিস্ময়ের কথা এই যে শেষে সৈংহল অনুবাদও বিনষ্ট হইয়াছিল এবং সিংহলবাসীরা বুদ্ধঘোষের পালি অনুবাদকেই মূলস্থানীয় করিয়া পুনর্ব্বার উহার অনুবাদ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, জাতকার্থবর্ণনাও বুদ্ধঘোষের লেখনীপ্রসূত। কিন্তু ইহা বোধ হয় সত্য নহে। বুদ্ধঘোষ ভারতবর্ষে রেবতের নিকট এবং সিংহলে সঙ্ঘপালির নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু জাতকার্থবর্ণনার প্রারম্ভে গ্রন্থকার ইহাদের কোন উল্লেখ না করিয়া আপনাকে অর্থদর্শী, বুদ্ধমিত্র ও বুদ্ধদেব নামক অপর তিনজন পণ্ডিতের নিকট ঋণী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধঘোষ-কর্ত্তৃক অনূদিত না হইলেও জাতকার্থবর্ণনা তাঁহারই সময়ে বা তাঁহার অব্যবহিত পরে পুনর্ব্বার পালিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

জাতকের অংশত্রয়।—প্রত্যেক জাতকের তিনটী অংশ। প্রথম অংশের নাম প্রত্যুৎপন্নবস্তু বা বর্ত্তমান কথা। গৌতমবুদ্ধ কি উপলক্ষ্যে বা কোন্ প্রসঙ্গে আখ্যায়িকাটী বলিয়াছিলেন তাহা বুঝাইয়া দেওয়া এই অংশের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় অংশটী প্রকৃত জাতক, অর্থাৎ মূল আখ্যায়িকা; ইহার নাম অতীতবস্তু, কারণ ইহা গৌতমবুদ্ধের অতীতজন্ম-বৃত্তান্ত। পরিশেষে সমবধান অর্থাৎ অতীতবস্তু-বর্ণিত পাত্রদিগের সহিত বর্ত্তমানবস্তু-বর্ণিত ব্যক্তিদিগের অভেদ প্রদর্শন।

* উদীচ্য বৌদ্ধগ্রন্থে মহেন্দ্র অশোকের ভ্রাতা বলিয়া বর্ণিত।

জাতকে জন্মান্তরবাদ।—উল্লিখিত অংশ-বিভাগ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে বর্ত্তমানবস্তুটী মূল জাতকের অঙ্গ নহে, ব্যাখ্যামাত্র। সমবধানগুলি বৌদ্ধদিগের জন্মান্তরবাদের সমর্থক। যাঁহারা আত্মা মানেন না তাঁহারা পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করেন ইহা কিছু বিচিত্র নয় কি?* বৌদ্ধমতে জীবগণ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চ স্কন্ধের সমষ্টি; † মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই স্কন্ধগুলির ধ্বংস হয়; কিন্তু জীবের কর্ম্ম তন্মুহূর্ত্তে নূতন স্কন্ধ উৎপাদিত করিয়া লোকান্তরে নবজীবন লাভ করে। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদি এরূপ হয়, তবে কর্ম্মকেই আত্মা বল না কেন? বৌদ্ধেরা উত্তর দিবেন, নামে কিছু আসিয়া যায় না; কিন্তু আত্মবাদীরা আত্মা নামে যে নিত্য পদার্থ স্বীকার করেন, কর্ম্ম তাহা নহে; স্কন্ধ অপেক্ষা কর্ম্মের স্থায়িত্ব অধিক বটে; কিন্তু কর্ম্মও নশ্বর—বহু 'সংসার' ভ্রমণের পর, বহু সাধনা ও ধ্যান ধারণার পর কর্ম্মের লয় হয়; তখন আর পুনর্জ্জন্ম ঘটে না; ইহারই নাম নির্ব্বাণ। ‡ জগতে আকাশ ও নির্ব্বাণ কেবল এই পদার্থ দুইটী নিত্য, অন্য সমস্ত অনিত্য।

জাতকের সংখ্যা।—মূল জাতকগুলির প্রকৃত সংখ্যা কত তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। উদীচ্য বৌদ্ধদিগের জাতকমালা নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। ইহাতে ৩৪টী মাত্র জাতক দেখা যায়।* কেহ কেহ বলেন, এই ৩৪টীই আদিজাতক এবং এই সমস্ত জানিতেন বলিয়া গৌতমবুদ্ধ "চতুস্ত্রিংশজ্জাতকজ্ঞ" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ অনুমান নিতান্ত ভিত্তিহীন, কারণ চৌত্রিশটী জাতক জানা অসাধারণত্বের পরিচায়ক নহে; বিশেষতঃ উদীচ্য বৌদ্ধদিগেরই মহাবস্তু নামক অপর একখানি গ্রন্থে প্রায় ৮০টী জাতকের উল্লেখ দেখা যায়। অধ্যাপক হজসনও বলেন তিব্বতদেশে নাকি ৫৬৫টী জাতকবিশিষ্ট একখানি বৃহৎ জাতকমালা আছে। অতএব ইহাই বুঝিতে হইবে যে বুদ্ধের "চতুস্ত্রিংশজ্জাতকজ্ঞ" নাম আর্য্যশূর-রচিত জাতকমালার পরবর্ত্তী সময়ে কল্পিত হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধ শাস্ত্র উদীচ্য বৌদ্ধশাস্ত্র অপেক্ষা বহুপ্রাচীন। ইহাতে জাতকের সংখ্যা ৫৫০ বলিয়া দেখা যায়। কিন্তু ইহাও বোধ হয় স্থূলনির্দ্দেশ মাত্র। পালিগ্রন্থকারেরা বহুসংখ্যাদ্যোতনার্থ এক একটা স্থূলসংখ্যা-

* যাঁহারা আত্মা মানেন তাঁহারা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত—শাশ্বতবাদী ও উচ্ছেদবাদী। শাশ্বতবাদীদিগের মতে আত্মা অবিনশ্বর; উচ্ছেদবাদীরা বলেন, দেহের সঙ্গেই উহার বিনাশ ঘটে। বৌদ্ধমতে এ জন্মেই বল, জন্মান্তরেই বল, আত্মা নামে কোন পদার্থ নাই।

† প্রাণিভেদে স্কন্ধের তারতম্য ঘটে। যাঁহারা অরূপব্রহ্মলোকবাসী, তাঁহাদের রূপস্কন্ধ নাই।

‡ কেহ কেহ বলেন, নির্ব্বাণ দ্বিবিধ—উপাধিশেষ এবং নিরুপাধিশেষ। উপাধিশেষ নির্ব্বাণ ইহলোকেই লভ্য—ইহা বৈদান্তিকদিগের জীবন্মুক্তি। নিরুপাধিশেষ নির্ব্বাণের নামান্তর পরিনির্ব্বাণ। ইহা লাভ করিলে পুনর্জ্জন্ম ভোগ করিতে হয় না।

* এই জাতকগুলির নাম:—ব্যাঘ্রী, শিবি, কুল্মাষপিণ্ডী, শ্রেষ্ঠী, অবিসহ্য শ্রেষ্ঠী, শশ, অগস্ত্য, মৈত্রীবল, বিশ্বন্তর, যজ্ঞ, শক্র, ব্রাহ্মণ, উন্মদয়ন্তী (উন্মাদয়ন্তী), সুপারগ, মৎস্য, বর্ত্তকাপোতক, কুম্ভ, অপুত্র, বিস, শ্রেষ্ঠী (২য়), চুল্ল বোধি, হংস, মহাবোধি, মহাকপি, শরভ, রুরু, মহাকপি (২য়), ক্ষান্তি, ব্রহ্ম, হস্তী, সুতসোম, অয়োগৃহ, মহিষ, শতপত্র। ইহাদের মধ্যে ব্যাঘ্রী, মৈত্রীবল, অপুত্র ও হস্তী এই চারিটী ব্যতীত অন্যগুলি জাতকার্থবর্ণনায় দেখা যায়; তবে আখ্যায়িকাগুলির নাম উভয়ত্র এক নহে; যেমন জাতকমালার শ্রেষ্ঠিজাতক পালিতে খরিরাঙ্গারজাতক (৪০); জাতকমালার যজ্ঞজাতক পালিতে দুমের্ধাজাতক (৫০)।

নির্দ্দেশের বড়ই পক্ষপাতী। যিনি ধনী তিনি অশীতি কোটি সুবর্ণের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত; যিনি আচার্য্য তিনি পঞ্চশত-শিষ্য-পরিবৃত; যিনি সার্থবাহ তিনি পঞ্চশত শকট লইয়া বাণিজ্য করিতে যান। সম্ভবতঃ এই অভ্যাসবশতঃই তাঁহারা জাতকের সংখ্যা ৫৫০ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জাতকার্থবর্ণনার ৫৪৭ জাতকেই দেখা যায় সূক্ষ্মভাবে গণনা করিলে এ সংখ্যা প্রকৃত নহে। উদাহরণ-স্বরূপ এখানে বর্ত্তমান খণ্ডের কুলায়কজাতক (৩১) প্রদর্শন করা যাইতে পারে। এই একটী মাত্র জাতকে বোধিসত্ব দুইবার জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া লেখা আছে এবং চারিটী ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায়িকা কষ্টকল্পনাসূত্রে নিবদ্ধ হইয়াছে। পক্ষান্তরে একই জাতক ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে, কোথাও ভিন্ন ভিন্ন নামে, কোথাও বা একই নামে পুনরুক্ত হইয়াছে। প্রথমখণ্ডের মুণিকজাতক (৩০) এবং দ্বিতীয়-খণ্ডের শালূকজাতক (২৮৬), প্রথমখণ্ডের মৎস্যজাতক (৩৪) এবং দ্বিতীয়খণ্ডের মৎস্য-জাতক (২১৬), প্রথমখণ্ডের আরামদূষক-জাতক (৪৬) এবং দ্বিতীয়খণ্ডের আরাম-দূষজাতক (২৬৮), প্রথমখণ্ডের বানরেন্দ্রজাতক (৫৭) এবং দ্বিতীয়খণ্ডের কুম্ভীরজাতক (২২৪) প্রভৃতি কতকগুলি কথা উপাখ্যানাংশে এক, কেবল গাথার সংখ্যানুসারে বিভিন্ন। আবার প্রথমখণ্ডের সর্ব্বসংহারক-প্রশ্ন (১১০), গর্দ্দভ-প্রশ্ন (১১১) ও অমরাদেবী-প্রশ্ন (১১২) এবং দ্বিতীয়খণ্ডের কৃকণ্ঠকজাতক (১৭০), শ্রীকাল-কর্ণীজাতক (১৯২) ও মহাপ্রণাদজাতক (২৬৪) কেবল সংখ্যাপূরণের জন্য তালিকাভুক্ত হইয়াছে; ইহাদের উপাখ্যানাংশ জানিতে হইলে প্রথম পাঁচটীর জন্য মহাউম্মার্গজাতক (৫৪৬) এবং ষষ্ঠটীর জন্য সুরুচিজাতক (৪৮৯) পাঠ করিতে হইবে। একই খণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন জাতকের পুনরুক্তিও নিতান্ত বিরল নহে। প্রথমখণ্ডে ভোজাজানেয়জাতক (২৩) এবং আজন্যজাতক (২৪) একই আখ্যায়িকা; শুদ্ধ ভিন্নাকারে বর্ণিত। সেইরূপ প্রথম মিত্রবিন্দকজাতকে (৮২) এবং দ্বিতীয় মিত্র-বিন্দকজাতকে (১০৪), পরসহস্রজাতকে (৯৯) এবং পরশতজাতকে (১০১), ধ্যানশোধন-জাতকে (১৩৪) ও চন্দ্রাভাজাতকে (১৩৫) পার্থক্য অতি সামান্য। অতএব দেখা যাই-তেছে যে প্রকৃত 'জাতকের' সংখ্যা, অর্থাৎ যে সকল কথায় বোধিসত্ব এক একবার জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত সেইগুলি গণনা করিলে, জাতকার্থবর্ণনার জাতকসংখ্যা ৫৪৭টী অপেক্ষা কম হইবে। কিন্তু জাতকার্থবর্ণনার জাতকগুলিই সমগ্র জাতক নহে। জাতকার্থ-বর্ণনার নিদানকথাতে মহাগোবিন্দজাতকের নাম দেখা যায়; অথচ পরবর্ত্তী ৫৪৭টী জাতকের মধ্যে উহা স্থান পায় নাই। সূত্ত-পিটক প্রভৃতি গ্রন্থে এবং শ্যাম, তিব্বত প্রভৃতি দেশেও কয়েকটী স্বতন্ত্র জাতক আছে। ফলতঃ জাতক নামে অভিহিত আখ্যানগুলির কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা নাই। যিনি যখন সুবিধা পাইয়াছেন, তিনি তখন প্রচলিত কোন আখ্যানকে বৌদ্ধবেশে সজ্জিত করিয়া এবং বোধিসত্বকে তাহার নায়কের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জাতক নামে চালাইয়া গিয়াছেন। এই সকল আখ্যানের সঙ্কলন দ্বারা পণ্ডিতেরা নানা সময়ে নানা গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তন্মধ্যে তিব্বৎদেশীয় বৃহজ্জাতকমালা এবং সিংহলের জাতকার্থবর্ণনা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। জাতকার্থবর্ণনার সংগ্রাহক বোধ হয় ৫৫০টী জাতকই লিপিবদ্ধ করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কারণ প্রথম খণ্ডে প্রথম

পঞ্চাশটী জাতকের শেষে তিনি "পঠমো পঞ্‌ঞাসো" এবং দ্বিতীয় পঞ্চাশটীর শেষে "মজ্‌ঝিম পঞ্‌ঞাসকো নিট্‌ঠিতো" এইরূপ উপসংহার করিয়াছেন। জাতকের সংখ্যা ৫৫০ হইবে এরূপ বিশ্বাস না থাকিলে তাহাদিগকে পঞ্চাশটী করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিবার চেষ্টা সম্ভবপর হইত না।

যদি "জাতকের" সংখ্যা গণনা না করিয়া আখ্যান, উপাখ্যান প্রভৃতির সংখ্যা গণনা করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে জাতকার্থবর্ণনার প্রত্যুৎপন্ন ও অতীত বস্তুসমূহে ন্যূনাধিক তিন সহস্র প্রাচীন কথা স্থান পাইয়াছে। এক মহাউম্মার্গজাতকেই শতাধিক উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায় জাতকার্থবর্ণনা কি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। পৃথিবীর নানাদেশীয় প্রচলিত কথাকোষের মধ্যে ইহা যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কেবল তাহা নহে; পরে প্রদর্শিত হইবে যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনও বটে।

জাতকার্থবর্ণনার অধ্যায়-বিভাগ নিপাত—জাতকার্থবর্ণনার জাতকগুলি গাথার সংখ্যানুসারে ২২টী অধ্যায়ে বিভক্ত। যে সকল জাতকে একটীমাত্র গাথা আছে সে গুলি "এক নিপাত" (এক নিপাঠ, অর্থাৎ এক শ্লোকের প্রবন্ধ) নামে অভিহিত। এইরূপ দুক নিপাত, তিক নিপাত ইত্যাদি। প্রথম তেরটী নিপাতে ৪৮৩টী জাতক শেষ হইয়াছে। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ১৩টী জাতক "পকিণ্ণক (প্রকীর্ণক) নিপাত"ভুক্ত, কারণ ইহাদের গাথার সংখ্যার কোন বান্ধাবান্ধি নাই, কোনটীতে ১৫টা, কোনটীতে ৪৮টা পর্য্যন্ত গাথা দেখা যায়। ইহার পর সাতটী নিপাতের নাম যথাক্রমে বীসতি, তিংস, চত্তালীস, পঞ্‌ঞাস, সট্‌ঠি, সত্ততি ও অসীতি। যে গুলিতে ২০ হইতে ২৯ পর্য্যন্ত গাথা আছে সেগুলি বীসতিপর্য্যায় ভুক্ত। এইরূপ তিংস ইত্যাদি। সর্ব্বশেষে ৫২৮ হইতে ৫৪৭ পর্য্যন্ত দশটী জাতক মহানিপাতের অন্তর্ভূত। ইহাদের প্রত্যেকেরই গাথার সংখ্যা শতাধিক।

এরূপ বাহ্যলক্ষণ দ্বারা অধ্যায় নির্দ্দেশ করা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ; কারণ ইহাতে আখ্যানগুলির বিষয়গত কোন ভাব ব্যক্ত হয় নাই, একই উপদেশাত্মক ভিন্ন ভিন্ন আখ্যান ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থকার গাথার সংখ্যানির্দ্দেশে নিজেও যে ভ্রমে পতিত হন নাই তাহা নহে। "দশ নিপাতে" দেখা যায় কৃষ্ণ-জাতকের গাথার সংখ্যা দশ না হইয়া তের হইয়াছে। এইরূপ আরও কোন কোন জাতকে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তথাপি পালি গ্রন্থকারেরা গাথার সংখ্যা দ্বারা অধ্যায় নির্ণয় করিবারই পক্ষপাতী ছিলেন, কারণ গাথাগুলিই প্রায় সর্ব্বত্র প্রবন্ধের বীজ বা প্রাণস্বরূপ।

বর্গ।—আবার এক হইতে নবনিপাত পর্য্যন্ত কতকগুলি জাতক লইয়া এক একটী "বগ্‌গ" (বর্গ) গঠিত হইয়াছে। এক নিপাতে এইরূপ ১৫টী বর্গ আছে। ইহাদের কোন কোনটী স্ব স্ব শ্রেণীর প্রথম জাতকের নামে অভিহিত, যেমন অপণ্ণক বগ্‌গ (১-১০); আবার কোন কোনটী বিষয়গত সাদৃশ্য লইয়া কল্পিত, যেমন সীলবগ্‌গ (১১-২০), ইত্থি বগ্‌গ (স্ত্রীবর্গ, ৬১-৭০); কিন্তু ইহাতেও যে ভ্রম প্রমাদ না আছে এরূপ বলা যায় না। স্ত্রীবর্গেই দেখা যায় কুদ্দালজাতকের সহিত ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটী জাতকের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই।

জাতকের নাম।—একই জাতক সর্ব্বত্র এক নামে অভিহিত নহে। জাতকার্থবর্ণনায় দেখা যায় গ্রন্থকার প্রথম খণ্ডের তৈলপাত্র-জাতককে স্থানান্তরে তক্ষশিলাজাতক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেইরূপ যাহা প্রথম খণ্ডে বানরেন্দ্রজাতক, তাহা দ্বিতীয় খণ্ডে কুম্ভীরজাতক আখ্যা পাইয়াছে। জাতকার্থবর্ণনার কচ্ছপজাতক ধম্মপদে বহুভাণিজাতক বলিয়া অভিহিত। বেরুট স্তূপেও একটী চিত্র বিড়ালজাতক ও কুক্কুটজাতক উভয় নামেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এরূপ নামভেদের কারণ সহজেই বুঝা যায়। কোন কথার নামকরণ-সময়ে কেহ উহার উপদেশটীর দিকে লক্ষ্য করেন এবং 'সাধুতার পুরস্কার' এইরূপ কোন নাম দেন, কেহ বা কথাটীর পাত্রদিগের দিকে লক্ষ্য করেন এবং উহাকে 'কাঠুরিয়া ও জলদেবতা' এই নামে অভিহিত করেন। অন্য এক জন হয়ত উহাকে 'অসাধু কাঠুরিয়াও' বলিতে পারেন। বিরোচনজাতকটী নামকারকের ইচ্ছামত 'সিংহজাতক' বা 'শৃগাল জাতক' বা 'দুরাকাঙ্ক্ষার পরিণাম' আখ্যাও পাইতে পারে। জাতকার্থবর্ণনায় দেখা যায় কোন কোন জাতক শুদ্ধ গাথার আদি শব্দ দ্বারা অভিহিত। উদাহরণ স্বরূপ প্রথম খণ্ডের "সত্যংকির" জাতক প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

গাথা।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে গাথাগুলিই জাতকের বীজ বা প্রাণস্বরূপ। ইহাদের ভাষা অতি প্রাচীন,—এত প্রাচীন যে অংশ-বিশেষে দুর্ব্বোধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে অনুমান হয় যে প্রাচীন সময়ে, আখ্যানগুলি লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, তাহাদের সারাংশ সচরাচর গাথাকারেই লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল, গাথা শুনিয়া লোকে হয় সমস্ত আখ্যানটী, নয় তাহার উপদেশ বুঝিয়া লইত। এখনও দেখা যায়, "যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে, ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেবহি," "এক বুদ্ধিরহং ভদ্রে ক্রীড়ামি বিমলে জলে" প্রভৃতি শ্লোকের বা শ্লোকাংশের, এবং "পুনর্মূষিকো ভব," "বিড়ালতপস্বী," "বকোহহং পরম-ধার্ম্মিকঃ," "অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ" ইত্যাদি বাক্যের বা বাক্যাংশের সাহায্যে কত প্রাচীন কথা সাহিত্যে ও কথাবার্ত্তায় প্রচ্ছন্নভাবে প্রচলিত রহিয়াছে।

কোন কোন জাতকের গাথায় এবং তৎ-সংলগ্ন গদ্যাংশে ভাষার ও ভাবের কোন প্রভেদ নাই; গদ্যাংশ যেন গাথারই পুনরুক্তি মাত্র। ইহাতেও বোধ হয় গাথার প্রণয়ন আখ্যায়িকাগুলি লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী। আখ্যায়িকাকার গাথাগুলি সন্নিবেশিত করিবার সময় অনবধানতাবশতঃ পুনরুক্তি-দোষ পরিহার করিতে পারেন নাই।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, জাতকার্থবর্ণনা যখন সৈংহল অনুবাদের অনুবাদ, তখন প্রাচীন পালি গাথাগুলি অবিকৃত রহিল কিরূপে? ইহার কারণ বোধ হয় এই যে ভিক্ষুসমাজে পালি গাথাগুলি পুরুষপরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল। অপিচ, সমস্ত গাথাই যে জাতকের নিজস্ব তাহাও নহে; ধম্মপদ প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থেও ইহাদের অনেকগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল গাথা জাতকের নিজস্ব, সে গুলিতে প্রায়শঃ আখ্যানটীর ধ্বনি আছে। বম্ভপথ-জাতকের গাথাতে সমস্ত আখ্যানটীই সংক্ষিপ্তাকারে বিবৃত রহিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে উপদেশাংশ সংযোজিত হইয়াছে। আরও অনেক জাতকে এইরূপ দেখা যাইবে।

উত্তরকালে পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থেও কতকগুলি শ্লোক শুদ্ধ আখ্যানের জন্যই রচিত হইয়াছে, যেমন—"কঙ্কণস্য তু লোভেন মগ্নঃ পঙ্কে সুদুস্তরে বৃদ্ধ ব্যাঘ্রেণ সম্প্রাপ্তঃ পথিকঃ সংমৃতো যথা," "মার্জ্জারস্য হি দোষেণ হতো গৃধ্রো জরদ্গবঃ," ইত্যাদি। আবার কতকগুলি শ্লোক মহাভারত, শান্তি-শতক প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেও গৃহীত হইয়াছে।

ভাষা ও ভাবেও সমস্ত গাথা এক নহে, কোথাও ভাষা নির্দ্দোষ, ভাব কবিত্বপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী; কোথাও ভাষা জটিল এবং ভাবের দৈন্যে নিকৃষ্ট গদ্য অপেক্ষাও অপকৃষ্ট। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকর্ত্তৃক রচিত না হইলে এরূপ পার্থক্য ঘটিতে পারে না।

জাতকের অধিকাংশ গাথার বক্তা বোধিসত্ত্ব কিংবা অতীতবস্তু-বর্ণিত অন্য কোন প্রাণী; কিন্তু কোথাও কোথাও বুদ্ধপ্রোক্ত গাথাও দেখা যায়। প্রবাদ আছে যে বুদ্ধ আখ্যানটী বলিতে বলিতে, কিম্বা উহার উপ-সংহার কালে অভিসম্বুদ্ধ হইয়া ঐ সকল গাথা বলিয়াছিলেন। ইহারা "অভিসম্বুদ্ধ গাথা" নামে অভিহিত।

জাতকের প্রাচীনত্ব।

জাতকের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৌদ্ধদিগের মত বলা হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত জাতকই যে গৌতম-বুদ্ধকর্ত্তৃক রচিত, প্রাচীন সাহিত্য অনুসন্ধান করিলে ইহা স্বীকার করা যায় না। আখ্যান-গুলির রচনার পার্থক্য, পুনরুক্তি-দোষ এবং গাথাসমূহের ভাষাগত ও কবিত্বগত বিভেদ হইতে দেখা যায়, এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারাই রচিত হইয়াছিল। কোন কোন আখ্যায়িকায় বৌদ্ধভাব নিতান্ত কৃত্রিম বলিয়াও প্রতীয়মান হয়; তাহাতে বোধিসত্ত্ব বৃক্ষদেবতাদিরূপে ঘটনাটী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন মাত্র; নিজে কোন ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করিতেছেন না।

কথার উৎপত্তি।—কথাচ্ছলে সদুপদেশ দিবার পদ্ধতি স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। মৃগয়াজীবী ও অরণ্যবাসী প্রাচীন মানব সর্প শৃগাল-কাক-পেচক-উষ্ট্র-গর্দ্দভাদির প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইতেন; তিনি রসজ্ঞ হইলে ইহাদের চরিত্র অবলম্বন পূর্ব্বক কথা রচনা করিতেন, ঐ সকল কথাদ্বারা কখনও সভা সমিতিতে লোকের চিত্তরঞ্জন করিতেন, কখনও মানব হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য লক্ষ্য করিয়া পরিহাস করিতেন, কখনও শিশুদিগকে বা শিশুকল্প প্রতিবেশীদিগকে সাধুতা, প্রভুপরায়ণতা পিতৃ-ভক্তি প্রভৃতি সহজ ধর্ম্মগুলি শিক্ষা দিতেন।

ক্রমে সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলিরও উন্নতি হইল; পশুপক্ষীর পর ভূত, প্রেত, মনুষ্য প্রভৃতি কল্পিত ও প্রকৃত প্রাণী এবং জিহ্বা, উদর, মৃন্ময়পাত্র, কাংস্য-পাত্র প্রভৃতি নির্জীব পদার্থও কুশীলবরূপে দেখা দিল, সাধুতা, সত্যবাদিতা, ত্যাগ, দান, একতার গুণ, অসমীক্ষ্যকারিতার দোষ প্রভৃতি অনেক জটিল ধর্ম্ম তাহাদের উপদে-শের বিষয়ীভূত হইল। যে কথা অল্পে অধিকভাব ব্যক্ত করিত, হাসাইয়া কান্দাইত বা কান্দাইয়া হাসাইত, তাহাই অধিক চিত্ত-গ্রাহিণী হইত। তাহাতে যুক্তাযুক্ত-বিচারণা ছিল না; কোন্ অংশ স্বাভাবিক, কোন্ অংশ অস্বাভাবিক লোকে সেদিকে লক্ষ্য করিত না। ব্যাঘ্র কখনও কঙ্কন পরিধান করে কি না, ব্যাঘ্রে চান্দ্রায়ণব্রত করিতেছে একথা কখনও মানুষে বিশ্বাস করিতে পারে কি না, লোকের মনে এরূপ প্রশ্নের উদয় হইত না; মোটের উপর কথাটী রসযুক্ত হইলেই তাহারা যথেষ্ট

মনে করিত। রচকদিগেরও ক্রমে সাহস বাড়িয়া যাইত; তাঁহারা ব্যাঘ্রদ্বারা মহাভারতের বচন আবৃত্তি করাইতেন, বিড়ালকে তপস্বী সাজাইয়া তাহার মুখে আতিথ্যধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেন।

এইরূপে কত কথার উৎপত্তি ও বিলয় হইত, তাহা কে বলিতে পারে। যে গুলি সরস ও সারগর্ভ লোকে তাহা সযত্নে স্মরণ রাখিত; যেগুলি অসার ও নীরস তাহা উৎপত্তির পরেই বিলুপ্ত হইত। সম্ভবতঃ সকল দেশেই প্রাগৈতিহাসিক সময়ে এইরূপে বহুকথার উৎপত্তি হইয়াছিল; কিন্তু সকল দেশে সেগুলি লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হয় নাই। কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিবার প্রথম চেষ্টা দেখা যায় কেবল ভারতবর্ষে এবং গ্রীস্ দেশে। এখনও যে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তা। নহে; এখনও এদেশেই কত মন্ত্র লিপি গল্প বা খোস্ গল্প কেবল লোকের মুখে মুখে চলিতেছে।

নানা বিষয়ে কথার প্রয়োগ।—শুদ্ধ ধর্ম্মনীতি-সম্বন্ধে কেন, তর্কশাস্ত্রে এবং রাজনীতিতেও আখ্যায়িকার মনোমোহিনী শক্তি অপরিজ্ঞাত ছিল না। অন্ধ-গোলাঙ্গুল-ন্যায়, লাঙ্গাবন্ধন-ন্যায়, অর্দ্ধজরতী ন্যায়, অন্ধ-হস্তিন্যায় প্রভৃতি দৃষ্টান্তে তর্কশাস্ত্রে, কথার প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। একপর্ণজাতক (১৪৯), ব্যাঘ্রাববাদজাতক (১৫১), বর্দ্ধকিশূকরজাতক (২৮৩) প্রভৃতি রাজনীতিমূলক; পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের ত কথাই নাই, কারণ এই গ্রন্থদ্বয় রাজকুমারদিগেরই শিক্ষাবিধানার্থ রচিত হইয়াছিল। প্রতীচ্য খণ্ডেও দেখা যায়, গ্রীসে ও রোমে কথার প্রভাবে সময়ে সময়ে রাজনীতিঘটিত জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হইত। ঈষপ শৃগাল, শল্লকি ও জলৌকার কথা বলিয়া রাজদ্রোহাভিযুক্ত এক ব্যক্তির পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন; মেনিনিয়াস এগ্রিপা উদরের সহিত অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিবাদ ও তাহার পরিণাম শুনাইয়া প্রাচীন রোমের কুলীনসম্প্রদায়দ্বেষী জনসাধারণকে বশে আনিয়াছিলেন।

প্রাচীন সাহিত্যে কথার প্রয়োগ।—কথা সমূহ সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বেই সাহিত্যে তাহাদের প্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছিল। পৃথিবীর মধ্যে বেদচতুষ্টয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। ইহাদেরও কোন কোন অংশে কথা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুরবা ও উর্ব্বশীর আখ্যায়িকা অনেকেরই সুবিদিত। অনেকে মনে করেন ঋগ্বেদে (১০।২৮।৪) ক্ষুদ্রকায় মৃগকর্ত্তৃক মদোন্মত্ত সিংহের প্রাণনাশসংক্রান্ত কথার ধ্বনি আছে। দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে যে বিবাদ ঘটিয়াছিল তাহার আভাস ছান্দোগ্য উপনিষদে দৃষ্ট হয়। * রসাল ও স্বর্ণলতিকার কথা মহাভারতে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। এ সমস্ত গ্রন্থই গৌতমবুদ্ধের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী। ইহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, যখন গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, তখনও গ্রাম্য কথাগুলি সাহিত্যের মধ্যে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতেছিল এবং তাহাদের চিত্তাকর্ষিণী শক্তি লক্ষ্য করিয়াই গৌতমবুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যগণ সেগুলিকে ধর্ম্মদেশনের সহায় করিয়া লইয়াছিলেন। উত্তরকালে যীশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি লোকশিক্ষকেরাও প্রচলিত গ্রাম্য কথাবলম্বনে ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

* ঠিক এই ভাবে না হউক, এই আকারে গঠিত একটী গল্প প্রাচীন মিশরে ও পারস্য দেশে প্রচলিত ছিল। মিশরের গল্পটী বোধ হয় খ্রীষ্টের বার তের শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত।

বৌদ্ধেরা যে সকল প্রচলিত কথা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে যে বৌদ্ধবেশে সজ্জিত করিবেন ইহা স্বতঃসিদ্ধ। যে পশু বা মনুষ্য বা দেবতা দান-ত্যাগ শৌর্য্য-বীর্য্যাদি কোন বিশিষ্ট গুণে অলঙ্কৃত বলিয়া আখ্যানের নায়কস্থানীয়, সে বোধিসত্ত্বের পদ লাভ করিত এবং তাহার শত্রু, মিত্র ও সহচরগণ বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী ও পারিপার্শ্বিকরূপে কল্পিত হইত।*

জাতকের ব্রহ্মদত্ত।—অধিকাংশ জাতকের প্রারম্ভেই "অতীতে বারাণসিয়াম্ ব্রহ্মদত্তে রাজ্জং কারেন্তে" এইরূপ ভণিতা আছে।* আরব্য নৈশোপাখ্যানমালাতেও অনেক গল্পে "খলিফা হারুণ উর্ রসিদের রাজত্বকালে" এইরূপ ভণিতা দেখা যায়। হারুণ অর্ রসীদ ইতিহাস-বর্ণিত ব্যক্তি, অস্মদ্দেশীয় বিক্রমাদিত্যের ন্যায় নানা বিষয়ে অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইয়া আদর্শমহীপালরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন; অতএব কথায় মনোহারিত্ব-সম্পাদনের জন্য লোকে যে তাঁহার সহিত এবংবিধ লোকরঞ্জক ভূপালের নাম সংযোজিত করিবে ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু জাতকের ব্রহ্মদত্ত কে?

বৌদ্ধমতে গৌতমের পূর্ব্বে বহুকল্পে বহু বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। গৌতমের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধের নাম কাশ্যপ। কাশ্যপ সম্বন্ধে বৌদ্ধ সাহিত্যে এই বর্ণনা দেখা যায়:—তাঁহার জন্মস্থান বারাণসী এবং পিতার নাম ব্রহ্মদত্ত। তাঁহার দেহ দ্বাবিংশতিহস্ত পরিমিত এবং আয়ুষ্কাল বিংশতিসহস্র বৎসর, ইত্যাদি। এই ব্রহ্মদত্ত এবং জাতকের ব্রহ্মদত্ত কি এক?

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বেব্রিয়াস্ নামক এক ব্যক্তি রোম সম্রাট্ আলেকজাণ্ডার সেভেরাসের পুত্রের শিক্ষাদানার্থ গ্রীক্‌ভাষায় প্রায় তিন শত কথা লিপিবদ্ধ করেন। ইনি নিজের গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে লীবিয়া দেশের প্রাচীন কথাকারের নাম কৈবিসেস্।† বেব্রিয়াসের বহু পূর্ব্বে এরিষ্টটলও লীবিয়াদেশজ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল কথার কোন

* কতটী জাতক কোথায় কথিত হইয়াছিল এবং অতীত বস্তুতে বোধিসত্ত্ব কতবার কি বেশে দেখা দিয়াছেন, কেহ কেহ গণনাদ্বারা তাহা এইরূপ স্থির করিয়াছেন:—

কথনস্থানানুসারে:—জেতবন-বিহারে ৪১০টী, জাতক, বেণুবনে ৪৯টী, শ্রাবস্তীতে ৬টী, রাজগৃহে ৫টী, কৌশাম্বীতে ৫টী, কপিলবস্তুতে ৪টী, বৈশালীতে ৪টী, আলবীতে ৩টী, কুণ্ডলদহে ৩টী, কুশিনগরে ২টী, মগধে ২টী, লট্‌ঠিবনে ১টী, দক্ষিণগিরিতে ১টী, মৃগদাবে ১টী, মিথিলাতে ১টী এবং গঙ্গাতীরে ১টী। সর্ব্বশুদ্ধ ৪৯৮টী জাতক কথিত হইয়াছিল এইরূপ দেখা যায়। বোধিসত্ত্ব ৮৫টী জাতকে রাজা, ৮৩টীতে ঋষি, ৪৩টীতে বৃক্ষদেবতা, ২৬টীতে আচার্য্য, ২৪টীতে অমাত্য, ২৪টীতে ব্রাহ্মণ, ২৪টীতে রাজপুত্র, ২৩টীতে ভূম্যধিকারী, ২২টীতে পণ্ডিত, ২০টীতে শক্র, ১৮টীতে বানর, ১৩টীতে শ্রেষ্ঠী, ১২টীতে আঢ্যলোক, ১১টীতে মৃগ, ১০টীতে সিংহ, ৮টীতে রাজহংস, ৬টীতে বর্ত্তক, ৬টীতে হস্তী, ৫টীতে কুক্কুট, ৫টীতে দাস, ৫টীতে গৃধ্র, ৪টীতে অশ্ব, ৪টীতে গো, ৪টীতে ব্রহ্মা, ৪টীতে ময়ূর, ৪টীতে সর্প, ৩টীতে কুম্ভকার, ৩টীতে নীচজাতীয় লোক, ৩টীতে গোধা, ২টীতে মৎস্য, ২টীতে গজচালক, ২টীতে মূষিক, ২টীতে শৃগাল, ২টীতে কাক, ২টীতে কাষ্ঠকূট্টক, ২টীতে চোর, ২টীতে শূকর, এবং এক একটীতে কুক্কুর, বিষবৈদ্য, ধূর্ত্ত, বর্দ্ধকী, কর্ম্মকার ইত্যাদি রূপে বর্ণিত। এই গণনায় ৫৩০টী জাতক পাওয়া যায়।

একই জাতক কোথাও কোথাও সংখ্যাপূরণের জন্য ২।৩ বার ধরা হইয়াছে বলিয়া উভয়ত্রই নির্দ্ধারিত সংখ্যা ৫৪৭ অপেক্ষা কম হইয়াছে।

* ৫৪৭ জাতকের মধ্যে ৩৭২টীর ঘটনা বারাণসী রাজ্যে ঘটিয়াছিল বলিয়া বর্ণিত।

† Kybises.

কোনটী জাতক—কেবল দেশকালভেদে সামান্যভাবে পরিবর্ত্তিত। ইহাতে বোধ হয় কৈবিসেস্ লীবিয়া দেশের লোক নহেন, ভারতবর্ষের লোক। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের সহিত মিশরের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল; খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সিংহল হইতে বৌদ্ধদূতেরাও আলেক্জান্দ্রিয়া নগরে গিয়াছিলেন এবং সেখানে অনেক জাতককথা প্রচার করিয়াছিলেন। গ্রীকেরা যখন ঐ সকল কথা গ্রহণ করেন তখন তাঁহারা উহাদিগকে লীবিয়াদেশজ বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু কৈবিসেস্ কে? কেহ কেহ অনুমান করেন যে য়িহুদিদিগের প্রাচীন সাহিত্যে কুবসিস্ নামক যে কথাকারের উল্লেখ দেখা যায় তিনি এবং বেব্রিয়াসের কৈবিসেস্ একই ব্যক্তি এবং ভাষাভেদে উচ্চারণ-প্রভেদ বিবেচনা করিলে কৈবিসেস্ এবং কাশ্যপ এই নামদ্বয় অভিন্ন। অতএব কোন কোন জাতক এত প্রাচীন যে তাহারা গৌতমের লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে কাশ্যপবুদ্ধ-কর্তৃক রচিত হইয়াছিল বলিয়া লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল এবং এই বিশ্বাস ভিন্ন দেশীয় সাহিত্যেও স্থান পাইয়াছিল। এই কারণেই উল্লিখিত অনুমাতাদিগের মতে কাশ্যপের পিতা ব্রহ্মদত্তের নামকীর্ত্তনপূর্ব্বক জাতকারম্ভ-প্রথার উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ অনুমানপরম্পরা কষ্টকল্পনাপ্রসূত বলিয়াই মনে হয়। বারাণসী বৌদ্ধদিগের একটী প্রধান তীর্থ গৌতমের ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনের স্থান কাজেই আখ্যায়িকাগুলির সহিত বারাণসীর সম্বন্ধস্থাপন বৌদ্ধগ্রন্থকারের পক্ষে বিচিত্র নহে। অপিচ, কাশ্যপবুদ্ধের পিতা ব্রহ্মদত্ত রাজা ছিলেন না; তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আমাদের বোধ হয় "বারাণসী-রাজ ব্রহ্মদত্ত" একটী কল্পিত নাম মাত্র। সকল দেশেই একটা না একটা মামুলি ভাবে কথা আরম্ভ করিবার রীতি আছে। পাশ্চাত্য কথাকারেরা 'একদা' (once upon a time) দ্বারা যে কাজ করেন, জাতককার 'বারাণসী-রাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্ব সময়ে' দ্বারাও তাহাই সিদ্ধ করিয়াছেন।

জাতকাখ্য সমস্ত কথার প্রথম রচক না হইলেও বৌদ্ধেরাই যে এদেশে তাহাদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্কলনে অগ্রণী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইতঃপূর্ব্বে বিনয়পিটক ও সুত্তপিটকের * জাতকগুলির কথা বলা হইয়াছে। চরিয়াপিটকে ৩৫টী জাতক দেখা যায়; ইহাদের দুই [illegible] ব্যতীত অন্য সমস্তই জাতকার্থবর্ণনার অন্তর্ভূত হইয়াছে। বৌদ্ধেরা বলেন, গৌতমের দেহত্যাগ ঘটিলে সপ্তপর্ণীগুহায় যে সঙ্গীতি সমবেত হয়, পিটকত্রয় তাহাতেই সঙ্কলিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের কেহ কেহ ইহা বিশ্বাস করিতে চান না; কিন্তু তাঁহারাও স্বীকার করেন যে মহাপরিনির্ব্বাণের এক শত বৎসর পরে (অর্থাৎ পূঃ ৩৭০ অব্দে) বৈশালীতে যে সঙ্গীতি হইয়াছিল, তাহাতেই পিটকগুলির অধিকাংশ বর্ত্তমানাকার ধারণ করিয়াছিল। অতএব শেষোক্তমতের অনুসরণ করিলেও দেখা যায় জাতকসমূহের সঙ্কলনকার্য্য খ্রীষ্টের অন্ততঃ ৩৭০ বৎসর পূর্ব্বে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। ইহার সঙ্গে তুলনা করিলে বৃহৎকথা, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগরাদি সে দিনের গ্রন্থ মাত্র।

জাতকাখ্য আখ্যায়িকাগুলির উৎপত্তির কাল-বিচার।—অপিচ, অনেকগুলি জাতকের

---

* দীঘনিকায়, মজ্ঝিমনিকায় ও সংযুত্তনিকায় সুত্তপিটকেরই শাখা। এই সকল গ্রন্থেও কোন কোন জাতক দেখা যায়।

উপাখ্যানভাগ গৌতমবুদ্ধ স্বয়ং কিংবা তাঁহার শিষ্যগণ রচনা করিয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অপণ্ণকজাতক, ন্যগ্রোধমৃগ-জাতক, খদিরাঙ্গার জাতক, লোশকজাতক, নক্ষত্রজাতক, মহাশীলবজ্জাতক, শীলবন্নাগ জাতক, তৈলপাত্রজাতক প্রভৃতি আখ্যায়িকায় বৌদ্ধভাব এতই পরিস্ফুটিত যে তাহাদিগকে বৌদ্ধেতর ব্যক্তিকর্ত্তৃক রচিত মনে করা যায় না। তবে জাতকার্থবর্ণনার অধিকাংশ কথার কোন্ কোন্‌টী বৌদ্ধ সময়ে, কোন্ কোন্‌টী গৌতমের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে রচিত ইহা নির্ণয় করা অসাধ্য। ইহাদের কোন কোন কথা মহাভারতে দেখা যায়; দশরথ জাতকটীত একখানি ছোটখাট রামায়ণ। কিন্তু এসম্বন্ধে কে কাহার পূর্ব্ববর্ত্তী, কে উত্তমর্ণ, কে অধমর্ণ, ইহা বিচার করিতে গেলে সাহিত্যসেবীদিগের মধ্যে তুমুল বিবাদের সম্ভাবনা। অনেকে বলিবেন, মহাভারতপ্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থ এবং গৌতমবুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী; অতএব বুঝিতে হইবে যে বৌদ্ধেরাই এই সকল গ্রন্থ হইতে কথা অপহরণ করিয়া তাহাদিগকে নূতন বেশে সাজাইয়াছেন এবং নিজস্ব বলিয়া চালাইয়াছেন। কিন্তু প্রতিবাদীরা উত্তর দিবেন, "কে বলিল রামায়ণ ও মহাভারত গৌতমের পূর্ব্বেই তাহাদের বর্ত্তমান, আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল? মহাভারতে যে কত সময়ে কত আখ্যায়িকা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? অতএব ইহাই বা বলিব না কেন যে তদন্তর্গত জাতকসাদৃশ্যযুক্ত আখ্যায়িকাগুলিও প্রক্ষিপ্ত? যে সকল আখ্যায়িকা হিন্দু ও বৌদ্ধশাস্ত্রের সাধারণ সম্পত্তি, সেগুলি সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলেও বৌদ্ধ-আখ্যায়িকাগুলির পূর্ব্ববর্ত্তিতা প্রতিভাত হয়। সে সমস্ত বৌদ্ধের হস্তে অমার্জ্জিত, অসংস্কৃত ও কাব্যোৎকর্ষবর্জ্জিত; পক্ষান্তরে রামায়ণ-মহাভারতেই বল, বা পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশেই বল, বর্ণনা-চাতুর্য্যে ভাবমাধুর্য্যে ও চরিত্রবিশ্লেষণে উৎকৃষ্টতর। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে না কি যে জাতকসংগ্রহকালে বা তাহারও পূর্ব্বে এই সকল আখ্যানের অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল; শেষে বাল্মীকিব্যাসাদির প্রতিভাবলে মনোহর পুষ্প-পল্লবের বিকাশ হইয়াছে? মানবসমাজে সর্ব্বত্রই যখন ক্রমোন্নতি দেখা যায়, তখন সাহিত্যেই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণগুল্ম জন্মিয়া ও পচিয়া ভূমির সসারতা সম্পাদন করিলে তাহাতে শেষে শালতালাদি মহাবৃক্ষের উদ্ভব হয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র কবি, ক্ষুদ্র কথাকার প্রভৃতির উৎপত্তি ও বিলয়ের পরে তাহাদের সঞ্চয়সমবায়ের প্রভাবে মহাকবিদিগের আবির্ভাব ও পুষ্টিসাধন ঘটে। কেবল ভারতবর্ষে কেন, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি প্রতীচ্য দেশের সাহিত্যেও প্রাচীন কথার এইরূপ সংস্করণ ও পরিমার্জ্জন দেখিতে পাওয়া যায়। যে নিয়মে রামপণ্ডিতের ও কাঠহারিণীর কথা রামায়ণে ও শকুন্তলানুবাদে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, সেই নিয়মেই লিয়ারের ও ম্যাক্‌বেথের কথা সেক্‌স্‌পিয়ার প্রণীত তত্তন্নামধেয় নাটকে কাব্যোৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। অপিচ, বৌদ্ধজাতকগুলির রচনাকালে রামায়ণ ও মহাভারত যদি বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় জনসমাজে সুবিদিত থাকিত, তাহা হইলে বৌদ্ধ উপাখ্যানকারেরা বোধ হয় মূল ঘটনার কোন বিকৃতি ঘটাইতে সাহসী হইতেন না। সর্ব্বজনগ্রাহ্য কোন আখ্যানের অপকর্ষ ঘটাইলে শ্রোতার ও পাঠকের মনে বিরক্তিরই উদ্রেক হয়; তাহাতে ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধা

ঘটে না। যদি বলা যায় বৌদ্ধেরা রামায়ণ ও মহাভারত জানিতেন না, তাহাও অসম্ভব, কারণ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মহামহোপাধ্যায় ছিলেন, তাঁহাদের আদিগুরু গোতমও প্রব্রজ্যাগ্রহণের পূর্ব্বে ও পরে বহুশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান রামায়ণের ও মহাভারতের ন্যায় গ্রন্থ তাঁহাদের সময়ে প্রচলিত থাকিলে তাঁহারা যে সেগুলি অধ্যয়ন করিতেন না, ইহা একেবারেই অবিশ্বাস্য।*

বৌদ্ধদেশে জাতকের প্রভাব।—জাতক যে বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম, শ্যাম, তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি বৌদ্ধদেশে অনেক জাতক তত্তৎস্থানীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। যেমন পুরাণ-শ্রবণে নিরক্ষর লোকে হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্ব শিক্ষা করিতে পারে, সেইরূপ জাতক-শ্রবণে বৌদ্ধদেশেও জনসাধারণে বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া থাকে। সিংহলপ্রভৃতি দেশে দিনান্তে বিশ্রাম করিবার সময় জাতক শ্রবণ একরূপ নিত্যকার্য্য। এদেশের শিশুরা সন্ধ্যার পর যেমন উপকথা শুনে, সিংহলের শিশুরাও সেইরূপ জাতক-কথা শুনিয়া থাকে। শিশুরা শুনে, বৃদ্ধেরাও শুনেন। বক-জাতক বা ভীমসেন-জাতক বা কটাহক-জাতক শুনিলে শিশুর মুখে হাস্য দেখা দেয়; বিশ্বন্তর জাতক বা শিবি-জাতক শুনিলে বৃদ্ধের চক্ষু প্রেমাশ্রুপ্লাবিত হয়।

যখন বৌদ্ধপ্রভাব ছিল তখন ভারতবর্ষে আপামরসাধারণ সকলেই জাতককথা জানিত। বেরুটে যে বৌদ্ধস্তূপ আছে, তাহাতে অনেকগুলি জাতকের চিত্র শিলা-

---

* আশ্বলায়ন সূত্রে মহাভারতের উল্লেখ দেখা যায়। উহা খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত, অতএব গৌতমবুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডনেল্ বলেন যে মহাভারতের মূল ঘটনা অর্থাৎ কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ-বৃত্তান্ত এই সময়ে বা ইহার কিছু পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল; তবে শিবি রাজার উপাখ্যান প্রভৃতি কোন কোন গল্প এতদূর বৌদ্ধভাবাপন্ন যে মনে হয় সেগুলি উত্তরকালে জাতকাদি গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়া ঐ মহাকাব্যের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

রামায়ণ সম্ভবতঃ মূল মহাভারতের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। ইহার এক অংশে বুদ্ধদেবের নাম দেখা যায় বটে; কিন্তু উহা পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। যদি এই অনুমান সত্য হয় তবে দশরথজাতকের সহিত রামায়ণের আখ্যানের পার্থক্য ঘটিবার কারণ কি? "দস বস্‌স সহস্‌সানি সট্‌ঠি বস্‌স সতানি চ কম্বুগীবো মহাবাহু রামো রাজ্যং অকারয়ি" দশরথজাতকের এই গাথাটীর প্রথমার্দ্ধ সংস্কৃতাকারে বাল্মীকির কাব্যে অবিকৃতভাবে দেখিতে পাওয়া যায় (রামায়ণ, বালকাণ্ড, প্রথম সর্গ, ৯৮ শ্লোক—দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষ শতানি চ রামরাজ্য-মুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি।) কাজেই সন্দেহ জন্মে যে, জাতককারই সমস্ত আখ্যানটী রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বিকৃতি ঘটাইয়া আখ্যানটীর অপকর্ষ সম্পাদন করা জাতককারের উদ্দেশ্যবিরুদ্ধ এ যুক্তিও নিতান্ত দুর্ব্বল নহে। তবে কি বলিতে হইবে যে জাতকরচনার সময়েও রামায়ণের শ্লোকগুলি নানাস্থানে নানাভাবে চারণাদির মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল; অতঃপর তাহাদের সঙ্কলন সম্পাদিত হয়?

ঘটজাতকটী একখানা ছোট খাট ভাগবত। ভাগবতের দশম স্কন্ধে কৃষ্ণচরিত্র যে ভাবে বর্ণিত আছে, ঘটজাতকে তাহার সামান্য মাত্র ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। রামায়ণ-মহাভারত-সম্বন্ধে যাহাই বলা যাউক, ভাগবত যে জাতকের বহুপরবর্ত্তী গ্রন্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে জাতককারদিগের সময়েও যে কৃষ্ণের বাল্যলীলা লোকসমাজে সুবিদিত ছিল ইহা হইতে তাহার বেশ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কেবল জাতকরচনাকালে কেন, মহাকবি ভাসের সময়েও কৃষ্ণলীলা অপরিজ্ঞাত ছিল না। ঘটজাতকের বঙ্গানুবাদ ইতঃপূর্ব্বে সাহিত্যসংহিতায় প্রকাশিত হইয়াছে।

খণ্ডে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহাদের কোন চিত্রের পার্শ্বে তত্তৎ জাতকের নাম পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে উক্ত স্তূপের নির্ম্মাণকালে, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে, ঐ সকল জাতক লোকসমাজে সুবিদিত ছিল। হর্ষ-চরিতে বাণভট্ট বিন্ধ্যাটবীস্থিত দিবাকর মিত্রের আশ্রমবর্ণনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে তত্রত্য পেচকগুলি পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ শ্রবণহেতু বৈাধিসত্ত্বজাতকসমূহ জপ করিতে শিখিয়াছিল। শেষে ভারতবর্ষে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি ঘটে তখন জাতকগুলির বৌদ্ধভাবও ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়; অনেক জাতক নূতন আকারে হিন্দুদিগের গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়, অনেকগুলি বা এদেশ হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়।

ভারতবর্ষীয় সাহিত্যে জাতকের প্রভাব।

বৃহৎকথা।—রামায়ণ ও মহাভারতে যে জাতক-কথা পরিদৃষ্ট হয় তাহা পূর্ব্বে হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অন্ধ্ররাজ হালের রাজত্বকালে গুণাঢ্য নামক এক ব্যক্তি "বৃহৎকথা" নাম দিয়া পৈশাচী ভাষায় এক বৃহৎ কথাকোষ রচনা করিয়াছিলেন। অন্ধ্র রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন, কি হিন্দু ছিলেন ইহা লইয়া মতভেদ আছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে তাঁহাদের শাতকর্ণি গোত্রে জন্ম ব্রাহ্মণত্বের প্রতিপাদক। তাঁহাদের কেহ কেহ বৌদ্ধমত অবলম্বন করিয়াছিলেন কি না নিশ্চিত বলা যায় না, তবে তাঁহাদের অনেকেই যে হিন্দুবৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মের হিতার্থে বহু দান করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণস্বরূপ কতিপয় অনুশাসনপত্র পাওয়া গিয়াছে। গুণাঢ্যের গ্রন্থ কিরূপ ছিল তাহাও জানা অসম্ভব, কারণ উহা এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। বাণের হর্ষচরিতে, দণ্ডীর কাব্যাদর্শে, ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরীতে এবং সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে বৃহৎকথার নাম দেখা যায়; তাহার পর ইহা যে কাহারও দৃষ্টিগোচর হইয়াছে এমন বোধ হয় না। হর্ষচরিতে বৃহৎকথার 'কৃতগৌরীপ্রসাধনা' এই বিশেষণ দ্বারা রচকের হিন্দুভাবই লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু সোমদেব যখন বৃহৎকথা অবলম্বন করিয়াই কথাসরিৎসাগর রচনা করিয়াছিলেন এবং সোমদেবের গ্রন্থে যখন অনেক জাতকের আখ্যান দেখা যায়, তখন বৃহৎকথাতেও যে জাতকের প্রভাব ছিল ইহা নিঃশংসয়ে বলা যাইতে পারে।

পঞ্চতন্ত্র।—বৃহৎকথার পর খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ পঞ্চতন্ত্র প্রণীত হয়। ইহার কোন কোন কথা বৌদ্ধ-জাতক হইতে এবং অনেকগুলি সম্ভবতঃ বৃহৎ-কথা হইতে ও জনশ্রুতি হইতে সংগৃহীত। পণ্ডিতবর বেন্‌ফি দেখাইয়াছেন যে প্রাচীন-কালে এই গ্রন্থ দ্বাদশ কিংবা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল; তখন ইহার নামও বোধ হয় স্বতন্ত্র ছিল; শেষে কি কারণে বলা যায় না, পাঁচটী অংশ পৃথক্ হইয়া পঞ্চতন্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছে।* বেন্‌ফির মতে পঞ্চতন্ত্র বৌদ্ধগ্রন্থ, কারণ ইহাতে অনেক জাতকের আখ্যান আছে; জাতকের ন্যায় ইহার আখ্যানগুলিও গদ্যপদ্য-মিশ্রিত; এমন কি কোথাও কোথাও পালি গাথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে অনূদিত। অধিকন্তু কোন কোন আখ্যানের

* কেহ কেহ বলেন আদিম অবস্থায় এই গ্রন্থ সম্ভবতঃ 'করটক ও দমনক' নামে অভিহিত হইত এবং পারস্য, আরব প্রভৃতি দেশের লোকে এই নামই গ্রহণ করিয়াছিলেন। করটক ও দমনক পঞ্চতন্ত্রবর্ণিত দুইটী শৃগালের নাম।

বৌদ্ধভাব সুস্পষ্ট, কোথাও কোথাও ব্রাহ্মণদিগের প্রতি পরিহাস-কটাক্ষও লক্ষিত হয়। অধ্যাপক ম্যাকডনেল কিন্তু বলেন যে পঞ্চতন্ত্রের গ্রন্থকার হিন্দু ছিলেন। আমাদেরও সেই বিশ্বাস, কারণ গ্রন্থারম্ভে লেখক আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন। তিনি লোকচরিত্রের যে সকল দোষ দেখাইয়াছেন তাহা সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নহে। দোষী হইলে হিন্দু বৌদ্ধ সকলেই তাহার নিকট তুল্য নিন্দার পাত্র। আরও একটী কথা এই যে যদি তিনি বৌদ্ধ হইতেন তাহা হইলে কখনও জাতকমূলক কথাগুলি হইতে বোধিসত্ত্বকে বিলুপ্ত করিতে পারিতেন না।

তথাপি তিনি যে বৌদ্ধ জাতকের নিকট ঋণী তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু তাঁহার রচনাকৌশল অতিসুন্দর। তাঁহার হাতে পড়িয়া বকজাতক, বানরেন্দ্রজাতক, কূটবাণিজজাতক, মিতচিন্তিজাতক, সঞ্জয়জাতক প্রভৃতি বৌদ্ধকথা শতগুণে সরস ও চিত্তরঞ্জক হইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের কথাগুলি পৃথগ্‌ভাবে কথিত নহে; এক একটী তন্ত্রে এক একটী কথাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহার আশে পাশে অন্য বহু কথা সংযোজিত হইয়াছে। উত্তরকালে অস্মদ্দেশে বেতালপঞ্চবিংশতি ও হিতোপদেশ প্রভৃতি, আরবে নৈশোপাখ্যানমালা, য়ুরোপে Decameron, Pentameron, Heptameron, Canterbury Tales প্রভৃতি গ্রন্থের রচনাতেও এই পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের কথাগুলি উক্তরূপে একসূত্রে নিবদ্ধ না থাকিলে বোধ হয় দেশদেশান্তরে ভ্রমণের সময় ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইত।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যরাজ খসরু নশীরবানের রাজত্বকালে পঞ্চতন্ত্র পহ্‌লবী ভাষায় অনূদিত হয়। অতঃপর খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সিরিয়াক এবং আরবী ভাষাতেও ইহার অনুবাদ হইয়াছিল। ইহার নাম সিরিয়াক ভাষায় "কলিলগ ও দমনগ", এবং আরবীভাষায় "কলিলা ও দিমনা।" ইহা পঞ্চতন্ত্র-বর্ণিত করটক ও দমনক নামক শৃগালদ্বয়ের নামের রূপান্তর। আরববাসীরা মনে করিতেন কলিলা ও দিমনার আদিরচক বিদপাই (বিদ্যাপতি)। এই বিদ্‌পাই শব্দ অপভ্রষ্ট হইয়া শেষে "পিল্‌পাই" বা "পিল্পে" হইয়া পড়ে; কাজেই য়ুরোপবাসীরা যখন কলিলা ও দিমনা স্ব স্ব ভাষায় অনুবাদ করিলেন, তখন পঞ্চতন্ত্রের আখ্যানগুলি য়ুরোপখণ্ডে 'পিল্পের গল্প' নামে প্রচারিত হইল। হিন্দুই হউন, বৌদ্ধই হউন, পঞ্চতন্ত্রকার অতি শুভক্ষণে লেখনীধারণ করিয়াছিলেন। লোকমুখে বা গ্রন্থাকারে তাঁহার কথাগুলি সভ্য অসভ্য সর্ব্বদেশে যেরূপভাবে পরিজ্ঞাত হইয়াছে, পৃথিবীতে অন্য কোন পুস্তকের ভাগ্যে সেরূপ ঘটে নাই।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যান পিল্পের গল্প নামে পরিচিত। ইহাতে বোধ হয়, পহ্‌লবী ভাষায় যে গ্রন্থের অনুবাদ হয় তাহা আদিম দ্বাদশখণ্ডাত্মক "পঞ্চতন্ত্রের" অংশ। উত্তরকালীন অনুবাদকেরা ইচ্ছামত ইহার কোন কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছেন বা পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া গল্পগুলিরও পার্থক্য ঘটিয়াছে।

হিতোপদেশ।—হিতোপদেশকে পঞ্চতন্ত্রের সংক্ষিপ্তসার বলিলেও চলে। ইহাতে শ্লোকের প্রয়োগ অধিক এবং সেই সকল শ্লোকের অধিকাংশই সুরচিত ও উৎকৃষ্টভাবপূর্ণ। পঞ্চতন্ত্রের ন্যায় হিতোপদেশেও অনেক জাতককথা পরিবর্ত্তিত আকারে স্থান পাইয়াছে।

কথাসরিৎসাগর।—খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে গুণাঢ্যের বৃহৎকথাবলম্বনে কাশ্মীর দেশীয় ক্ষেমেন্দ্র বৃহৎকথামঞ্জরী এবং সোমদেব কথাসরিৎসাগর রচনা করেন। ক্ষেমেন্দ্র "মঞ্জরী" নাম দিয়া মহাভারতেরও একখানি সংক্ষিপ্তসার রচনা করিয়াছিলেন। শুক্ক নামক জনৈক বৌদ্ধবন্ধুর অনুরোধে তিনি বৃহৎকথামঞ্জরী সঙ্কলন করিয়াছিলেন। কথাসরিৎসাগর অতি বিশাল গ্রন্থ। ইহাতে পঞ্চতন্ত্রের প্রথম তিনটী তন্ত্র আছে, সমগ্র বেতালপঞ্চবিংশতি খানি আছে, শিবিরাজার ও বাসবদত্তার কথা আছে, আরও কত শত কথা আছে। পঞ্চতন্ত্রে যে সকল জাতককথা দেখা যায়, কথাসরিৎসাগরে তাহার অতিরিক্ত দুই চারিটী লক্ষিত হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ এখানে চুল্লশ্রেষ্ঠিজাতকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সোমদেব ইহা বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে অবিকলভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

সংস্কৃত ভাষায় সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা, শুকসপ্ততি প্রভৃতি আরও কয়েকখানি আখ্যায়িকাসংগ্রহ আছে। জৈনেরাও কথাকোষ প্রভৃতি অনেক আখ্যায়িকাগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। উল্লিখিত প্রায় সকল গ্রন্থেই অংশবিশেষে বৌদ্ধজাতকের প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

উদীচ্য বৌদ্ধসাহিত্যে "অবদান" নামে অভিহিত গ্রন্থগুলি প্রধান কথাভাণ্ডার। অবদানসমূহ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। 'জাতক' বলিলে বুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের ইতিহাস বুঝায়; অবদান বলিলে অন্যান্য মহাপুরুষদিগেরও অতীতজন্ম বৃত্তান্ত বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমান খণ্ডে চুল্লশ্রেষ্ঠিজাতকের এবং লোশকজাতকের প্রত্যুৎপন্নবস্তু অবদানস্থানীয়। উদীচ্য বৌদ্ধদিগের অবদানগুলি জাতকের অনুকরণেই রচিত। তাহাদের যেগুলি বোধিসত্ত্বের নামে প্রচলিত সেগুলি জাতকস্থানীয়।

বিদেশের সাহিত্যে জাতকের প্রভাব।

ঈষপের গল্প।—বিদেশের প্রস্তাবে সর্ব্বপ্রথম গ্রীকদিগের কথা তুলিতে হয়, কারণ অনেকের বিশ্বাস গ্রীস্ দেশের ঈষপ নামধেয় এক ব্যক্তিই আদিম কথাকার। পক্ষান্তরে কাহারও কাহারও মতে ঈষপনামে প্রকৃত কোন ব্যক্তি কখনও বর্ত্তমান ছিলেন কি না তাহাই সন্দেহস্থল। সে যাহাই হউক, ইহা নিশ্চয় যে, যে সকল কথা ঈষপের গল্প বলিয়া ইদানীন্তন সাহিত্যে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহাদের অধিকাংশই ঈষপরচিত নহে, অনেকগুলি জাতকের রূপান্তর, অনেকগুলি বা অপরের রচনা।

গ্রীকসাহিত্যে ঈষপের প্রথম উল্লেখ দেখা যায় হেরোডোটাসের গ্রন্থে।* তদনুসারে ঐ কথাকার খ্রীষ্টের প্রায় ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধের জন্মসময়ে জীবিত ছিলেন; তিনি সেমস্ দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং য়্যাড্‌মন নামক এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন। পশুপক্ষিসম্বন্ধে কথা রচনা করিতে তাঁহার অদ্ভুত নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল এবং তিনি ডেল্‌ফাই নগরে নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার কথাগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পরিহাসচ্ছলে লোকচরিত্রের তীব্র সমালোচনা করা। তৎকালে গ্রীস্‌দেশে অনেকে বিধিবিরুদ্ধ রাজকীয় ক্ষমতা ভোগ করিতেন। সম্ভবতঃ এইরূপ রাজপদস্থ এক ব্যক্তির চরিত্র লক্ষ্য করিয়া কোন কথা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ঈষপ তাঁহার কোপদৃষ্টিতে পতিত হন এবং উৎকোচবশীভূতা দৈববাণীর আদেশে প্রাণদণ্ড ভোগ করেন।

* ২।১৩৪ (হেরোডোটাসের গ্রন্থ খ্রীষ্টের প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত)।

গ্রীকসাহিত্যে কথার প্রয়োগ।—কিন্তু প্রচলিত কথাগুলির মধ্যে কোন্ কোন্‌টী ঈষপ-প্রণীত তাহা কিরূপে বলা যাইবে। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে বিখ্যাত পণ্ডিত আরিষ্টটল তাঁহার অলঙ্কারসংক্রান্ত গ্রন্থে রাজনীতিক বক্তৃতায় কথার উপযোগিতা প্রদর্শন করিতে গিয়া দুইটী কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন:—একটী অশ্ব ও হরিণের সম্বন্ধে, অপরটী শৃগাল, শল্লকি ও জলৌকার সম্বন্ধে।* ইহাদের মধ্যে প্রথমটী তিনি ষ্টেসিকোরাশ-প্রণীত (খ্রীঃ পূঃ ৫৫৬) এবং দ্বিতীয়টী ঈষপ-প্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে দুইটাই ঈষপের নামে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তৎপূর্ব্বে গ্রীসদেশে আরও অনেক কথা প্রচলিত ছিল এবং সাহিত্যে স্থান পাইয়াছিল। হেসিয়ডের কাব্যে (খ্রীঃ পূঃ ৮০০) বুল্‌বুল পক্ষীকে অবলম্বন করিয়া রচিত একটী কথা দেখা যায়; আর্কিলোকাস্ (খ্রীঃ পূঃ ৭০০), সোলন (খ্রীঃ পূঃ ৬০০), এলসিউস্ (খ্রীঃ পূঃ ৬০০) প্রভৃতিও কথার প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইহারা ঈষপের পূর্ব্ববর্ত্তী। হেরোডোটাস্ তাঁহার গ্রন্থে (১ম অধ্যায়, ১৪১ম প্রকরণে) একটী কথা দিয়াছেন; উহা পারস্যরাজ সাইরাস্ গ্রীক্‌দূতদিগকে বলিয়াছিলেন। ইহাতে দেখা যায় অতি প্রাচীন সময়েই প্রাচ্যখণ্ড হইতে প্রতীচ্য খণ্ডে কথার বিস্তার হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে অতঃপর সবিস্তর আলোচনা করা যাইতেছে। এখানে ইহা বলিলেই বোধ হয় পর্য্যাপ্ত হইবে যে অধুনা যে সকল কথা ঈষপের গল্পনামে পরিচিত, তাহাদের অধিকাংশই নানা সময়ে নানা ব্যক্তিকর্ত্তৃক রচিত এবং নানা দেশ হইতে গৃহীত। কিন্তু ঈষপ একজন প্রসিদ্ধ কথাকার ছিলেন, এবং কথারচনার জন্যই প্রাণদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন এই জনশ্রুতিবশতঃ উত্তরকালে সমস্ত কথাই তাঁহার নামে প্রচলিত হইয়াছিল। অনেক উৎকৃষ্ট উদ্ভট কবিতা যেমন কালিদাসের রচনা বলিয়া গৃহীত, অনেক ডাকের বচন যেমন খনার বচন নামে অভিহিত, অনেক উৎকৃষ্ট কথাও সেইরূপ ঈষপ-রচিত বলিয়া কল্পিত।

গ্রীক্‌সাহিত্যে জাতক।—খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীর গ্রীক্ সাহিত্যেও কতিপয় কথা দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে ডেমক্রিটাস্ বর্ণিত কুকুর ও প্রতিবিম্বের এবং প্লেটোবর্ণিত সিংহচর্ম্মাচ্ছাদিত গর্দ্দভের কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ এই উভয় কথাই আমরা বৌদ্ধ জাতকে দেখিতে পাই। কুকুর ও প্রতিবিম্বের কথা চুল্লধনুগ্গহজাতকের (৩৭৪) রূপান্তর। গ্রীক্ কথায় দেখা যায় কুকুর প্রতিবিম্বকে মাংসখণ্ড মনে করিয়াছিল; ইহা কিছু অস্বাভাবিক। জাতকে (এবং তৎপরবর্ত্তী পঞ্চতন্ত্রে) দেখা যায় শৃগাল নদীতটে মাংস রাখিয়া মৎস্য ধরিতে গিয়াছিল, ইত্যবসরে শকুনে উহা লইয়া যায়; ইহা স্বাভাবিক। সিংহচর্ম্মাচ্ছাদিত গর্দ্দভের কথাও সিংহচর্ম্মজাতকের (১৮৯) অনুরূপ। গ্রীক্

* (১) হরিণ মাঠের ঘাস খাইত দেখিয়া অশ্ব তাহাকে দণ্ড দিবার জন্য মানুষের সাহায্য প্রার্থনা করে; মানুষ অশ্বের মুখে বল্গা দিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া হরিণ মারিল; কিন্তু তদবধি অশ্ব মানুষের দাস হইল। (২) শৃগাল নদী পার হইবার সময় স্রোতাবেগে নর্দ্দামায় পড়িয়া গেল; সেখানে তাহার গায়ে অনেক জোঁক লাগিল। সজারু তাহার কষ্ট দেখিয়া জোঁকগুলি তুলিয়া ফেলিতে গেল, কিন্তু শৃগাল বলিল "না ভাই। তুলিয়া কাজ নাই। ইহারা যতদূর সাধ্য রক্ত খাইয়াছে; ইহাদিগকে ফেলিয়া দিলে আর এক দল আসিয়া জুটিবে।"

গল্পে গর্দ্দভের সিংহচর্ম্ম পরিধান করিবার কোন হেতু দেখা যায় না; কিন্তু বৌদ্ধ গল্পে দেখা যায় গর্দ্দভস্বামী তাহাকে সিংহচর্ম্মে আচ্ছাদিত করিয়া শস্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিত। অতএব উক্ত আখ্যায়িকাদ্বয়ের রচনা-পদ্ধতিতে ভারতবর্ষীয় কথাকারেরাই অধিকতর নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন; বিশেষতঃ সিংহ ভারতবর্ষের লোকের নিকট যত পরিচিত ছিল, গ্রীক্‌দিগের নিকট তত ছিল না। অতএব একথা বলা যাইতে পারে কি না যে উক্ত কথা দুইটী ভারতবর্ষ হইতেই গ্রীসে গিয়াছিল? পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে হেরোডোটাস একটী আখ্যায়িকাকে পারস্যদেশ হইতে গৃহীত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

কতকগুলি কথা নানাদেশে একই রূপ, ইহার কারণ কি?—পশুপক্ষিপ্রভৃতি-সংক্রান্ত অনেক কথা ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রায় একরূপ কেন, সাধারণতঃ ইহার ত্রিবিধ হেতুনির্দ্দেশ হইয়া থাকে। জার্ম্মাণ দেশীয় কথাসংগ্রাহক গ্রীম্ ভ্রাতৃদ্বয় বলেন, ভিন্ন ভিন্ন আর্য্যসম্প্রদায় যখন একত্র বাস করিতেন, তখনই এই সকল সাধারণ কথার উৎপত্তি হইয়াছিল। ম্যাক্স্‌মূলার প্রভৃতি বলেন শুদ্ধ আর্য্যসম্প্রদায় লইয়া বিচার করিলে চলিবে কেন? আর্য্যেতর জাতিদিগের মধ্যেও ত এই সকল সাধারণ কথার প্রচলন দেখা যায়। অপিচ, ভিন্ন ভিন্ন আর্য্যসম্প্রদায়ের মধ্যেও একইরূপ কথা ভিন্ন ভিন্ন আকারে ও ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য প্রচলিত হইয়াছে। যদি এগুলি আর্য্যজাতির আদিম বাসভূমিতে উৎপন্ন হইয়াছিল, তবে এত পার্থক্য ও পরিবর্ত্তন ঘটিবার কারণ কি? তাঁহারা বলেন, মনুষ্য প্রায় সকল দেশেই উপমাপ্রয়োগপ্রবণ। পর্য্যবেক্ষণশীল মানব সকল দেশেই কাকের লৌল্য, শৃগালের ধূর্ত্ততা, সিংহের সাহস প্রভৃতি দোষগুণ দেখিতে পাইত এবং উপমাপ্রয়োগ-প্রিয়তাবশতঃ সেই সকল অবলম্বন করিয়া কথা রচনাপূর্ব্বক সমসাময়িক লোকের চরিত্র সমালোচনা করিত বা জনসাধারণকে উপদেশ দিত। অতএব ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্বাধীন-ভাবেও যে একরূপ কথার উৎপত্তি হইতে পারে ইহা আর বিচিত্র কি? বেন্‌ফি বলেন, অন্য আখ্যানসম্বন্ধে যাহাই হউক, যে সকল সাধারণ কথায় কেবল পশুপক্ষ্যাদির উল্লেখ দেখা যায়, সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্বাধীন-ভাবে রচিত হইলে তাহাদের মধ্যে কখনও বর্ণনাগত এত সাদৃশ্য থাকিত না। কাকের স্তুতিবাদ করিয়া তাহাকে কথা বলাইতে হইবে, নচেৎ জম্বুফল বা ক্ষীরের মিঠাই পাইব না, শৃগালের এই বুদ্ধি, হৃৎপিণ্ডটা গাছে রাখিয়া আসিয়াছি বলিয়া প্রত্যুৎপন্নমতি মর্কটের আত্মরক্ষা, হংসদিগের সাহায্যে কচ্ছপের আকাশপথে গমন এবং কথা বলিতে গিয়া পতন ও মৃত্যু—এরূপ সৌসাদৃশ্য আদান-প্রদানের ফল, স্বাধীন রচনার নিদর্শন নহে।

গ্রীসের সহিত ভারতবর্ষের পরিচয়।—আদান প্রদানের কথা তুলিতেই পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার করিতে হইবে। গ্রীক্‌জাতি যে স্বাধীন-ভাবে কতকগুলি কথা রচনা করিয়াছিলেন ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যে সকল গ্রীক্‌কথা ভারতবর্ষেও প্রচলিত ছিল, তাহা-দের সম্বন্ধে কে উত্তমর্ণ, কে অধমর্ণ তাহা বিচার করা আবশ্যক। এখন দেখা যাউক কোন্ সময়ে গ্রীসেরা ভারতবর্ষের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন? সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্ দার্শনিক পিথাগোরাস খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসিয়া দর্শন শাস্ত্র ও জ্যামিতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ইহা নিতান্ত সম্ভবপর। ঐ শতাব্দীতে পারস্যরাজ

দরায়ুস পাঞ্জাবের কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন এবং গ্রীস্ দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জারক্‌সেস্‌ও গ্রীস্ জয় করিতে গিয়া অপদস্থ হইয়াছিলেন। দরায়ুসের সময়ে এবং তাঁহার পূর্ব্বেও সাইরাস প্রভৃতির রাজত্বকালে পারস্য রাজসভায় গ্রীক্ ও হিন্দু উভয় জাতিরই গতিবিধি ছিল। যে বিপুলবাহিনী গ্রীস্ জয় করিতে গিয়াছিল, তাহার মধ্যে অনেক ভারতবর্ষীয় ভৃতিভুক্ সৈনিক ছিল। জারক্‌সেসের পুত্র আর্টাজারাক্‌সেসের সভায় টিসিয়াস্ নামক একজন গ্রীক্ চিকিৎসক ছিলেন; তিনি ভারতবর্ষসম্বন্ধে অনেক প্রকৃত ও অনেক অপ্রকৃত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অতএব গৌতমবুদ্ধের সময়ে, অথবা তাঁহার কিছু পূর্ব্বেও গ্রীকেরা অন্ততঃ পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষের পরিচয় পাইয়াছিলেন। এ অবস্থায় ডিমিক্রিটাস্ ও প্লেটো যে পূর্ব্ববর্ণিত কথা দুইটীর জন্য পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষের নিকটই ঋণী ইহা বলা অসঙ্গত নহে। তাঁহারা লোকমুখে এই কথা দুইটী শুনিয়াছিলেন এবং স্ব স্ব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে আলেক্‌জাণ্ডারের অভিযান উপলক্ষ্যে গ্রীক্ ও হিন্দুর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে এবং অতঃপর বৌদ্ধপ্রচারকদিগের চেষ্টায় উভয় জাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। বৌদ্ধপ্রচারকেরা য়ুরোপখণ্ডেও ধর্ম্মদেশন করিতে যাইতেন। খ্রীষ্টের জন্মের কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে অগাষ্টাস্ সীজারের রাজত্বকালে ভৃগুকচ্ছনিবাসী একজন শ্রমণকাচার্য্য এথেন্সনগরে অগ্নি প্রবেশপূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন। গ্রীকেরা এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার চিতার উপর একটী সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

গ্রীক্‌ভাষায় কথাসংগ্রহ।—গ্রীক্‌দিগের সর্ব্বপ্রাচীন কথাসংগ্রহ আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর কিছু পরে সম্পাদিত হয় (খ্রীঃ পূঃ ৩০০)। আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া নগরের বিখ্যাত পুস্তকভাণ্ডারপ্রতিষ্ঠাতা ডেমিট্রিয়াস্ ফেলিরিয়স্ এই সংগ্রহের কর্ত্তা। ইনি প্রায় দুই শত কথা সংগ্রহ করেন এবং সর্ব্বপ্রথম সেগুলিকে "ঈষপের কথা" নাম দিয়া প্রচার করিয়া যান। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ফিড্রাস্ নামক একজন গ্রীক্ ঐ কথাগুলি লাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। পাশ্চাত্য কথাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ফিড্রাসের অনুবাদই এখন অবিকৃতভাবে বা ঈষৎপরিবর্ত্তিত আকারে ঈষপের গল্প বলিয়া প্রচলিত।

এদিকে বাণিজ্যাদির উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের লোকের সহিত মিশরের লোকের মিশামিশি হইয়াছিল এবং ভারতবর্ষজাত অনেক কথা মিশরে প্রচলিত হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীক্ এবং রোমকেরা সেগুলিকে লোকমেন্‌(কাশ্যপ)-প্রণীত বলিয়া লিপিবদ্ধ করেন। ফিড্রাস্-সংগৃহীত ঈষপ এবং এই সকল প্রাচ্যকথা অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে নিকষ্ট্রেটাস্ নামক এক ব্যক্তি এক কথাকোষ প্রচার করেন এবং ইহারও কতিপয় বৎসর পরে বেব্রিয়াস নামক একজন রোমকলেখক উক্ত উভয়বিধ কথা অবলম্বন করিয়া গ্রীক্‌ভাষায় আর একখানি পদ্য ঈষপ্ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে প্রায় তিনশত কথা আছে।

প্রাচ্যের অনুকরণে কথার সহিত উপদেশের যোজনা।—এইরূপে অনেক জাতক, ও ভারতবর্ষজাত অন্যান্য কথা য়ুরোপে প্রচারিত হইয়াছিল।* বেব্রিয়াস প্রভৃতি

* উদাহরণস্বরূপ নিম্নে কয়েকটী জাতকের এবং তথাকথিত ঈষপের কয়েকটী আখ্যানের নাম করা যাইতেছে :—

যে প্রাচ্যের আদর্শে কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার অপর একটী প্রমাণ প্রত্যেক কথার শেষে তাহার উপদেশ-ব্যাখ্যা। এই প্রথা জাতকার্থবর্ননাদিতেই প্রথম দেখা যায়; কিন্তু ইহা রচনানৈপুণ্যের পরিচায়ক নহে। যে কথা সুরচিত, তাহার উপদেশ ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন থাকে না। তাহা শুনিবামাত্র লোকে আপনা হইতেই উপদেশটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে; স্বতন্ত্রভাবে তাহার উপদেশ শুনাইতে গেলে পুনরুক্তি ও রসভঙ্গ ঘটে। কিন্তু প্রাচ্য কথাসংগ্রাহকেরা, প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক, একটা না একটা উপদেশ যোজনা করিয়া কথাগুলিকে নিরর্থক ভারাক্রান্ত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অনুকরণ করিতে গিয়া পাশ্চাত্যেরাও এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অধিকন্তু মূলের সহিত প্রকৃষ্ট পরিচয় না থাকায় পাশ্চাত্য লেখকেরা উপদেশব্যাখ্যায় সর্ব্বত্র কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কচ্ছপ-জাতকে বাচালতার পরিণাম প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু তথাকথিত ঈষপের সংগ্রাহক ইহা ধরিতে পারেন নাই।

প্রাচ্যের অনুকরণে চিত্রদ্বারা কথার ব্যাখ্যা।—কেবল উপদেশ-যোজনার প্রথা নহে, ছবিদ্বারা কথাগুলি লোকের প্রত্যক্ষীভূত করিবার রীতিও য়ুরোপবাসীরা ভারতবর্ষ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেরুট-স্তূপের ছবিগুলি যে কত প্রাচীন তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। উত্তরকালে বিদ্‌পাইএর গল্প প্রভৃতিতে আরববাসীরাও ছবি ব্যবহার করিতেন এবং য়ুরোপবাসীরা এই সমস্ত গ্রহণ করিবার সময় শুদ্ধ আখ্যানগুলির অনুবাদ

জাতক	ঈষপ
মুণিকজাতক (৩০)	ষণ্ড ও গোবৎস (The Ox and the Calf).
নৃত্যজাতক (৩২)	কিকি ও ময়ূর (The Jay and the Peacock).
মশকজাতক (৪৪)	খল্লাট ও মক্ষিকা (The Baldman and the Fly).
সুবর্ণহংসজাতক (১৩৬)	স্বর্ণডিম্বপ্রসবিনী হংসী (The Goose with golden eggs).
সিংহচর্ম্মজাতক (১৮৯)	সিংহচর্ম্মাচ্ছাদিত গর্দ্দভ (The Ass in a lion's skin).
কচ্ছপজাতক (২১৫)	কচ্ছপ ও ঈগলপক্ষী (The Eagle & the Tortoise).
জম্বুজাতক (২৯৪)	কাক ও শৃগাল (The Crow and the Fox).
জবশকুনজাতক (৩০৮)	নেকড়ে বাঘ ও বক (The Wolf and the Crane).
চুল্লধনুর্গ্রহজাতক (৩৭৪)	কুক্কুর ও প্রতিবিম্ব (The Dog and the Shadow).
কুক্কুটজাতক (৩৮৩)	শৃগাল, কুক্কুট ও কুক্কুর (The Fox, the Cock and the Dog).
দীপিজাতক (৪২৬)	নেকড়ে বাঘ ও মেষশাবক (The Wolf and the Lamb).

জাতকের সিংহ বা দীপী ঈষপে নেকড়ে বাঘ; জাতকের হংস ঈষপে ঈগলপক্ষী, জাতকের ছাগী ঈষপে মেষশাবক, জাতকের কাঠকুট্ট ঈষপে বক, এইরূপ সামান্য প্রভেদ থাকিলেও উপাখ্যানাংশে ইহারা একরূপ। এক প্রাণীর পরিবর্ত্তে অন্য প্রাণীর উল্লেখ দেশভেদে স্বাভাবিক, কারণ সকল দেশে সকল প্রাণী নাই। তথাপি পাশ্চাত্য কথাকারেরা ময়ূর, হস্তী, সিংহ প্রভৃতি ভারতবর্ষজাত প্রাণীদিগকে একেবারে পরিহার করিতে পারেন নাই।

ভারতবর্ষজাত অন্য যে আখ্যানগুলি 'ঈষপে' স্থান পাইয়াছে তাহাদের সংখ্যা আরও অধিক। উদাহরণস্বরূপ ঈষপের কুক্কুট ও মুক্তা, কৃষক ও কৃষ্ণসর্প, সহরের ইন্দুর ও পাড়াগাঁয়ের ইন্দুর, শৃগাল ও ঈগলপক্ষী, কাক ও ঈগলপক্ষী, সিংহ ও মূষিক, ষণ্ড ও ভেক ইত্যাদি কথার নাম করা যাইতে পারে।

করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, ছবিগুলিও নকল করিয়া লইতেন।

য়িহুদিদিগের সাহিত্যে ও বাইবলে জাতকের প্রভাব।—প্রাচ্যখণ্ডেও প্রচারকদিগের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার ঘটিয়াছিল এবং অনেক জাতককথা ইহুদিপ্রভৃতি জাতির সুবিদিত হইয়াছিল। বাইবলের উত্তর খণ্ডে * সলোমনের অদ্ভুতবিচারপটুতা সম্বন্ধে একটী আখ্যান আছে। দুই গণিকা একটী বালক লইয়া বিবাদ করিতে করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। প্রত্যেকেই বলে বালকটী তাহার গর্ভজাত সন্তান। সলোমন তরবারি হস্তে লইয়া প্রস্তাব করিলেন, বালকটীকে দুই খণ্ড করিয়া দুইজনকে দেওয়া যাউক। যে প্রকৃত জননী নহে সে ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিল; কিন্তু দ্বিতীয়া রমণী বলিল, "কাটিয়া কাজ নাই; আমার প্রতিদ্বন্দ্বিনীই বাছাকে লইয়া যাউক।" মহা-উন্মার্গ জাতকেও বোধিসত্ত্বের বিচারনৈপুণ্য প্রদর্শনার্থ এই আখ্যায়িকার বর্ণনা আছে। এক যক্ষিণী ও এক মানবী একটী শিশু লইয়া উক্তরূপে বিবাদ করিতে করিতে বোধিসত্ত্বের নিকট বিচার প্রার্থনা করে। বোধিসত্ত্ব মাটিতে একটী রেখা আঁকিয়া তাহার উপর শিশুটীকে রাখিয়া দিলেন এবং বিবদমানা রমণীদ্বয়কে বলিলেন, তোমরা শিশুটীর পা ধরিয়া টান, যে উহাকে নিজের দিকে লইয়া যাইতে পারিবে সেই উহার গর্ভধারিণী বলিয়া স্থির হইবে। কিন্তু রমণীদ্বয় শিশুটীর পা ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিলে সে যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া প্রকৃত গর্ভধারিণী কান্দিতে কান্দিতে উহার পা ছাড়িয়া দিল।

এই আখ্যানটী খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে ইটালী পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত হইয়াছিল, কারণ পম্পিয়াই নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ইহার একটী ছবি পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিতবর গেইডোজ দেখাইয়াছেন যে রোমানেরা ইহা ভারতবর্ষ হইতে পাইয়াছিলেন, য়িহুদিদিগের নিকট হইতে নহে। সত্য বটে পোম্পিয়াই নগরের ছবিতেও শিশুটীকে দুইখণ্ড করিবার চেষ্টা প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু সম্ভবতঃ গল্পটীতে আদিম অবস্থায় এইরূপ বর্ণনাই ছিল; পরে জীবহিংসাবিরত বৌদ্ধদিগের দ্বারা কাটিবার পরিবর্ত্তে টানিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বাইবলের এই অংশে ভারতবর্ষীয় কতিপয় দ্রব্যের সংস্কৃতজাত নাম দেখা যায়।* ফিনিকীয় বণিকেরা ভারতবর্ষের পশ্চিমোপকূলবর্ত্তী অভীর নামক পট্টন হইতে য়িহুদিরাজের জন্য এই সমস্ত দ্রব্য লইয়া গিয়াছিল। অতএব জাতকের কথাটী যখন বাইবলের এই অংশ অপেক্ষা প্রাচীন, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে য়িহুদিরাই ইহা এদেশ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। শুদ্ধ জাতকের আখ্যায়িকা কেন, বাইবলের কোন কোন অংশে বেদের প্রভাবও লক্ষিত হয়। বাইবলের উত্তরখণ্ডের ত কথাই নাই; তাহাতে বৌদ্ধপ্রভাব জাজ্বল্যমান। মথিলিখিত সুসমাচারে দেখা যায় যীশু খ্রীষ্ট দুইবার অতি অল্প খাদ্য দ্বারা বহু লোকের ভূরিভোজন সম্পাদন করিয়াছিলেন। ঔল্লীশজাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে দেখা যায়, গৌতমও ঠিক এইরূপে নিজের

* 1 Kings 3.

* যথা, তুকিম্‌, কোফ্‌, শেন্‌হবিম্‌, কার্পাস। তুকিম তামিল-মলয়ালাম্‌ ভাষার তুকেই (সংস্কৃত শিখী অর্থাৎ ময়ূর); কোফ্‌—কপি; শেন্‌হবিম্‌—গজদন্ত (সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'ইভ'শব্দজ)।

লোকাতীত শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। এবংবিধ সাদৃশ্যপরম্পরা দেখিয়া আর্থার লীলিপ্রমুখ পণ্ডিতেরা বলেন যে, খ্রীষ্টীয় সুসমাচারগুলির অনেক কথা গৌতমবুদ্ধের জীবনবৃত্তান্তের পুনরুক্তি মাত্র।

য়িহুদিদিগের প্রাচীন সাহিত্যে যে সমস্ত কথা দেখা যায়, তাহাদের কতকগুলি ভারতবর্ষ ও গ্রীস্ উভয়ত্রই প্রচলিত ছিল, কতকগুলি ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, কিন্তু গ্রীসে ছিল না, কতকগুলি গ্রীসে প্রচলিত ছিল কিন্তু ভারতবর্ষে ছিল না; আর কতকগুলি ভারতবর্ষেও ছিল না, গ্রীসেও ছিল না। প্রথমোক্ত শ্রেণীর মধ্যে বিরোচনজাতকের, জবশকুনজাতকের এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে কাকজাতকের ও সঞ্জীবজাতকের আখ্যান দেখা যায়; তদ্‌ভিন্ন পঞ্চতন্ত্রবর্ণিত কোন কোন কথাও পাওয়া গিয়াছে। য়িহুদিরা কখনও পশুপক্ষিসংক্রান্ত গল্পরচনায় নৈপুণ্য লাভ করেন নাই। তাঁহাদের সাহিত্যে এইরূপ কথার সংখ্যা ত্রিশের অধিক হইবে না। ইহার মধ্যে পাঁচ ছয়টী মাত্র তাঁহারা আত্মরচিত বলিতে পারেন। ইহাতে স্বতঃই মনে হয়, এ সম্বন্ধে ভারতবর্ষ দাতা এবং য়িহুদিরা গৃহীতা। কতকগুলি কথা কৈবিসেস্-প্রণীত এই পরিচয় দিয়া য়িহুদিরাও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। যেমন গ্রীসে, সেইরূপ যুডিয়াতেও রাজনীতিক আলোচনার জন্যই পশ্বাদিসংক্রান্ত আখ্যানের প্রচলন ঘটে (খ্রীঃ প্রথম শতাব্দী)।

খ্রীষ্টানসমাজে গৌতমবুদ্ধ সাধুপুরুষরূপে অর্চিত।—খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবসম্বন্ধে এখানে প্রসঙ্গক্রমে আর একটী বিস্ময়কর ব্যাপার বলা যাইতে পারে। অষ্টম শতাব্দীতে ডামাস্কাস নগরবাসী জন্ নামক এক সাধুপুরুষ গ্রীক্‌ভাষায় অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে একখানির নাম "বার্লাম্ ও যোয়াসফ্"। যোয়াসফ্ বা যোসাফট্ ভারতবর্ষের এক রাজপুত্র; তিনি বার্লামের নিকট দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন।* ইতঃপূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিবার জন্য এরূপ কোন আখ্যায়িকা লিখিত হয় নাই; এই নিমিত্ত 'বার্লাম ও যোয়াসফ্' য়ুরোপখণ্ডের সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল। লাটিন, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান, জার্ম্মাণ, স্পেনিশ্, সুইডিস্, ওলন্দাজ, আইস্‌ল্যাণ্ডিক প্রভৃতি ভাষায় ইহার অনুবাদ হয়; এবং রোমাণ কাথলিকদিগের উপাসনাদিক্রিয়ায় অন্যান্য খ্রীষ্টান সাধুপুরুষদিগের নামের ন্যায় বার্লাম্ ও যোসাফটের নাম উচ্চারণ করিবার ব্যবস্থা হয়। যেমন বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রভুদিগের আবির্ভাব বা তিরোভাব স্মরণ করিবার জন্য এক একটী দিন উৎসর্গ করা হইয়া থাকে, রোমাণ কাথলিক সাধুপুরুষদিগের জন্যও সেইরূপ প্রথা আছে। এই নিয়মানুসারে ২৭ শে নবেম্বর বার্লামের ও যোসাফটের স্মরণার্থ উৎসর্গ করা হইত। য়ুরোপের প্রাচ্য খ্রীষ্টান সমাজেও যোসাফটকে 'যোসাফ' এই নামে সাধুশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল; কিন্তু সেখানে বার্লাম্ কোন

* প্রথমে ইহা আরবী ভাষায় 'বোদাসফ্' এইরূপ উচ্চারিত হইত, পরে লিপিকরপ্রমাদবশতঃ 'বে' অক্ষরের পরিবর্ত্তে 'য়া' অক্ষর ব্যবহৃত হইয়া 'য়োদাসফ্' এই রূপান্তর গ্রহণ করে; অতঃপর আরবী হইতে গ্রীকে যাইবার সময় পুনর্ব্বার লিপিকরের দোষে 'ডেলটা' অক্ষরের পরিবর্ত্তে 'আল্‌ফা' অক্ষর প্রযুক্ত হইয়া 'য়োয়াসফ্' রূপ ধারণ করিল। এদিকে বাইবলে 'যেহোসাফট্' নামক রাজার উল্লেখ আছে; খ্রীষ্টানেরা এই শব্দের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত মনে করিয়া 'য়োয়াসফ্‌কে' শেষে 'য়োসাফট' করিয়া তুলিলেন।

স্থান পান নাই। প্রাচ্যসমাজে ২৬শে আগষ্ট সাধু যোসাফটের স্মারক দিন।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে যোসাফট্ কে? তিনি যে ভারতবর্ষীয় রাজপুত্র,ইহা গ্রন্থকারই বলিয়াছেন। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা দেখাইয়াছেন যে, তিনি আর কেহ নহেন—স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ। বুদ্ধত্বলাভের পূর্ব্বে গৌতম ছিলেন 'বোধিসত্ব'। এই শব্দটী আরবী ভাষায় হইয়াছিল 'য়োদাসফ্' এবং আরব হইতে গ্রীসে প্রবেশ করিবার সময় হইয়াছিল 'য়োসাফট্'।* যোসাফটের জীবনবৃত্তান্ত সেণ্ট জন্ যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, গৌতমবুদ্ধই তাঁহার গ্রন্থের নায়ক। জাতকের অনেক কথাও ঐ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।† কপিলবস্তুর করুণাসিন্ধু যে অদ্যাপি রোমাণ কাথলিকদিগের নিকট সাধুশ্রেণীভুক্ত হইয়া পূজা পাইতেছেন, ইহা ভাবিলে এদেশে এমন কে আছেন,যাঁহার হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দরসের উৎস না ছুটিবে? যাঁহারা প্রকৃত মহাপুরুষ, তাঁহারা এইরূপেই সর্ব্বত্র বরেণ্য হইয়া থাকেন।

জাতককথার দেশভ্রমণ।—কোন কোন জাতককথার দেশভ্রমণবৃত্তান্ত বলা হইল। যাঁহারা জাতক সাহিত্যের অত্যধিক ভক্ত, তাঁহারা ইহাতে অডিসিউসের ভ্রমণবৃত্তান্তেরও আভাস পাইয়াছেন (যথা মিত্রবিন্দকজাতক)। কিন্তু অনেকেই ততদূর অগ্রসর হইতে সাহস পাইবেন না। তথাপি মনে হয়, মিত্রবিন্দকের সহিত সিন্দবাদের হয়ত কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে। ইটালী দেশীয় পণ্ডিত কম্পারেটির মতে মিত্রবিন্দকই সিন্দবাদের আদিপুরুষ। রাধাজাতক প্রভৃতি দুই একটী জাতক যে আরব্য নৈশোপাখ্যানমালাতে স্থান পাইয়াছে, ইহা আমরাও বুঝিতে পারি। নৈশোপাখ্যানমালা খুব প্রাচীন গ্রন্থ নহে। মুসলমানধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে এশিয়ার মধ্যখণ্ডে বৌদ্ধধর্ম্মেরই প্রভাব ছিল; আবার এই বৌদ্ধেরা শেষে মুসলমান হইয়াছিলেন। কাজেই তাঁহাদের অনেক আখ্যান মুসলমান সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছিল। আরববাসীদিগের সংস্পর্শে আসিয়া নিরক্ষর নিগ্রোরা পর্য্যন্ত জাতককথা শিখিয়াছে। দক্ষিণ কারোলিনার নিগ্রো শিশুরা রিমাস্ কাকার যে কথা শুনে, তাহা শ্রেষরোমজাতক ভিন্ন আর কিছু নহে। উত্তরকালে যখন যীশুখ্রীষ্টের সমাধিমন্দির লইয়া প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের সঙ্ঘর্ষ হয়, তখনও কোন কোন প্রাচ্যকথা য়ুরোপে প্রবেশ করে। ইংল্যাণ্ডরাজ সিংহবিক্রম রিচার্ড স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিদ্রোহী ভূস্বামীদিগকে ভৎর্সনা করিবার সময় সত্যংকিরজাতকের আখ্যায়িকাটী বলিয়াছিলেন; মহাকবি চসার বেদব্ভজাতক অবলম্বন করিয়া Pardoner's Tale রচনা করিয়াছিলেন। সেক্সপিয়ারপ্রণীত Marchant of Venice নামক নাটকে অর্দ্ধসের মাংসের এবং পেটিকাত্রয়ের সম্বন্ধে যে বিবরণ আছে,তাহাও পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষীয় কথা হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। আধুনাতন সময়ে লা-ফণ্টেন প্রভৃতি কথাকারেরাও ভারতবর্ষীয় কথাকারদিগের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, গ্রীম্‌ভ্রাতৃদ্বয়-সংগৃহীত কথাকোষেও দধিবাহনজাতক প্রভৃতি সতর আঠারটী জাতকের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

জাতকের উপযোগিতা।

এখন জাতকের উপযোগিতা সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। কথাতত্ত্বের আলোচনা

* Greek Church.

† যেমন অলম্বুষাজাতক (৫২৩)।

করিতে হইলে এবংবিধ প্রাচীন গ্রন্থ যে নিতান্ত আবশ্যক, ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। যে সকল কথা সাহিত্যে ও মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে, আদিম অবস্থায় তাহারা কিরূপ ছিল ও কি উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল, কি কারণে দেশভেদে তাহাদের পরিবর্ত্তন ঘটিল, ইত্যাদি নির্ণয় করিতে হইলে জাতক ও অন্যান্য প্রাচীন কথা পাঠ করিতে হয়। এই উপযোগিতা দেখিয়াই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা জাতকের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সমগ্র পালি জাতকার্থবর্ণনা ইংরাজী অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে এবং ইংরাজী ভাষায় ইহার অনুবাদ সম্পন্ন হইয়াছে। গত পঁচিশ বৎসরে জাতকগুলি য়ুরোপবাসীদিগের এতই ভাল লাগিয়াছে যে, তাঁহারা ইহাদের কোন কোন চিত্তরঞ্জক আখ্যান অবলম্বন করিয়া শিশুপাঠ্য-গ্রন্থরচনাতেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন। জাতকের আলোচনা করিলে আমাদের কি কি উপকার হইতে পারে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল:—

জাতক উপদেশাত্মক। প্রথমতঃ—জাতকের সমস্ত কথাই উপদেশাত্মক, এবং ইহাদের সকলগুলি না হউক, অধিকাংশ মহাপুরুষ-বাক্য। কাজেই ইহা হইতে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে নির্ম্মল আনন্দের সহিত উপদেশ লাভ করিতে পারিবে। ইহার কোনও কোনও অংশ এমন সুন্দর যে, পাঠের সময় মনে হয়, যেন সেই করুণাবতার জগদ্‌গুরুর অমৃতময়ী বচনপরম্পরা এখনও আমাদের কর্ণকুহরে ঝঙ্কৃত হইতেছে। কিরূপে কথাচ্ছলে ও বচনমাধুর্য্যে অতি দুরূহ ধর্ম্মতত্ত্বও সর্ব্ব-সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারা যায়, জাতকে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন আছে।

জাতকে বিশ্বপ্রেম। দ্বিতীয়তঃ—জাতক-পাঠে সৃষ্টির একত্ব উপলব্ধি হয়, সর্ব্বজীবে প্রীতি জন্মে। খ্রীষ্টধর্ম্মে বলে, মানবমাত্রকেই ভ্রাতৃভাবে দেখ। বৌদ্ধধর্ম্মে বলে, জীবমাত্র-কেই আত্মবৎ বিবেচনা কর। যিনি এ যুগে বুদ্ধ, তিনি অতীত যুগে মৃগ, মর্কট, মৎস্য, বা কূর্ম্ম ছিলেন; যে এ যুগে মৃগ বা মর্কট, সেও ভবিষ্যদ্‌যুগে পূর্ণেন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়া দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিবে। অতএব, অদ্যই হউক, আর কল্পান্তেই হউক, সমস্ত জীবই এক—স্কন্ধসমষ্টিমাত্র—এবং কর্ম্মক্ষয়ান্তে সক-লেই নির্ব্বাণ লাভ করিবে।

জাতকে পুরাতত্ত্ব।—তৃতীয়তঃ—জাতকের অনেক আখ্যায়িকায়, বিশেষতঃ প্রত্যুৎপন্ন-বস্তুতে পুরাকালের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। কথা কল্পনাসম্ভবা, কিন্তু সত্যগর্ভা। কথাকার অসম্ভবকে সম্ভবপর বলিয়া বর্ণনা করিবেন, ইহাই তাঁহার ব্যবসায়; কিন্তু তিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থার বাহিরে যাইতে পারেন না; নানা প্রসঙ্গে সমসাময়িক বিধিব্যবস্থা, রাজনীতি ও সমাজনীতি হয় স্পষ্টভাষায়, নয় ধ্বনি দ্বারা বলিয়া যান, নচেৎ তাঁহার কথার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া পড়ে। জাতক-সংগ্রহ-কালে দেশান্তরের সংস্পর্শে ভারতবর্ষের বিকৃতি ঘটে নাই; কাজেই তদানীন্তন সমাজের নিখুঁৎ চিত্র দেখিতে হইলে, এই সকল আখ্যায়িকা পাঠ করা আবশ্যক। আমরা দেখিতে পাই, তাদৃশ প্রাচীন সময়েও এতদ্দেশীয় ধনী লোকে সপ্তভূমিক প্রাসাদে বাস করিতেন; বণিকেরা পোতারোহণে দ্বীপান্তরে বাণিজ্য করিতে যাইতেন; জল-পথে জল-নিয়ামকেরা ও স্থলপথে মরুকান্তার অতিক্রম করিবার সময় স্থলনিয়ামকেরা পথ প্রদর্শন করিয়া দিতেন; মহানগরসমূহের

অধিবাসিগণ চাঁদা তুলিয়া অনাথাশ্রম চালাইতেন এবং অনাথ বালকেরা পুণ্যশিষ্যরূপে পরিগৃহীত হইয়া অধ্যাপকদিগের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিত। পাঠশালার বালকেরা কাষ্ঠফলক বা তক্তিতে লিখিত ও অঙ্ক কষিত। তখন ভারতবর্ষের মধ্যে তক্ষশিলা নগরই বিদ্যালোচনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান ছিল; কাশী প্রভৃতি দেশ হইতে শতসহস্র ছাত্র বিদ্যাশিক্ষার্থ তক্ষশিলায় যাইত। তখন তক্ষশিলায় চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা দিবার অতি সুন্দর ব্যবস্থা ছিল এবং তত্রত্য কোন কোন ছাত্র শল্য-চিকিৎসায় এরূপ নৈপুণ্যলাভ করিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান শল্যকর্ত্তাদিগের মধ্যেও সে শ্রেণীর লোক সচরাচর দেখা যায় না।

তখন এ দেশে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল, অবস্থাপন্ন লোকে মূল্য দিয়া দাস ক্রয় করিতেন। তখন শাসনপ্রণালী সাধারণতঃ রাজতন্ত্র ছিল বটে, কিন্তু রাজপদ নিতান্ত নিরাপদ্ ছিল না। রাজা অত্যাচারী হইলে প্রজারা বিদ্রোহী হইত এবং সময়ে সময়ে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত বা নিহত করিয়া অন্য কাহাকেও রাজত্ব দিত; কখনও কখনও রাজার পুত্রেরা পর্য্যন্ত পিতার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিতেন। এই নিমিত্ত রাজাকে সর্ব্বদা অতি সাবধানভাবে চলিতে হইত। তখন কন্যাগণ যৌবনোদয়ের পর পাত্রস্থা হইতেন; ক্ষত্রিয়েরা পিতৃষস্বসুতা প্রভৃতি নিকট আত্মীয়দিগকে বিবাহ করিতে পারিতেন। তখন রমণীদিগের মধ্যে অনেকে সুশিক্ষা লাভ করিতেন; সম্ভ্রান্ত বংশেও বিধবার পুনর্বিবাহ হইত এবং পতি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে পত্নীর পক্ষে পত্যন্তরগ্রহণ বিধিসঙ্গত ছিল। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখনও লোকে দুঃস্বপ্ন ও দুর্নিমিত্ত দেখিয়া ভয়ে কাঁপিত, ভূতবলি, পিশাচবলি প্রভৃতি দিয়া শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিত; তখন লোকে অর্থদ্বারা অপরের পুণ্যাংশ ক্রয় করিত।

যাঁহারা প্রব্রাজক হইতেন, তাঁহারা কামিনী ও কাঞ্চনকে ভয় করিতেন। এই জন্য কোন কোন জাতকে নারীচরিত্রের প্রতি ঘোর অবিশ্বাস করা হইয়াছে—উদ্দেশ্য, যাহাতে ভিক্ষুদিগের মনে নারীসম্বন্ধে বিতৃষ্ণার উদ্রেক হয়। কিন্তু উৎপলবর্ণা, বিশাখা, আম্রপালী প্রভৃতির ইতিবৃত্তে দেখা যায়, তখন নারীরাও ধর্ম্মচর্য্যায় পুরুষদিগের তুল্যকক্ষ ছিলেন।

জাতক প্রাচীন ইতিহাসের অন্যতম ভাণ্ডার।—চতুর্থতঃ—জাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে প্রাচীন ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ কোশল, বৈশালী ও মগধরাজ্যের, অনেক ইতিবৃত্ত আছে। কেহ কেহ বলেন, প্রত্যুৎপন্ন অংশ যখন অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সময়ে রচিত, তখন তদন্তর্গত ঐতিহাসিক বিবরণ সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য নহে। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে রচিত হইলেও ইহা নিতান্ত অপ্রাচীন নয়,—কারণ ইহা বর্ত্তমান সময়ের প্রায় সার্দ্ধসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। সার্দ্ধসহস্রবৎসর পূর্ব্বে পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, প্রামাণিক ইতিবৃত্তের বিরোধী না হইলে তাহা আমরা অবিশ্বাস করিব কেন? আমরা দেখিতে পাই, প্রসেনজিতের পিতা মহাকোশল বিম্বিসারকে কন্যা দান করিয়াছিলেন এবং স্নানাগারের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কাশীগ্রাম যৌতুক দিয়াছিলেন। দেবদত্তের কুপরামর্শে বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু পিতৃবধ করিলে প্রসেনজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ গ্রাম বিনষ্ট করিয়াছিলেন; তন্নিবন্ধন অজাতশত্রুর সহিত তাঁহার যুদ্ধ ঘটিয়াছিল; ঐ যুদ্ধে প্রসেনজিৎ

প্রথমে পরাস্ত হইলেও পরে জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং অজাতশত্রুকে কন্যাদান করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন। অতঃপর প্রসেনজিৎও নিজের পুত্র বিরূঢক-কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন এবং নির্ব্বাসিত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন; এই বিরূঢকই কিয়ৎকাল পরে কপিলবস্তু বিধ্বস্ত করিয়া শাক্যকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু পরিণামে অনুতপ্ত হইয়া বুদ্ধের শরণ লইয়াছিলেন। তখন আর্য্যাবর্ত্তে চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী ও বারাণসী, এই ছয়টী নগর সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য ছিল; ইহাদের মধ্যে বারাণসীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখনও বারাণসীর কৌষেয়বস্ত্র সর্ব্বত্র সমাদৃত হইত। বৈশালী সমৃদ্ধিশালী হইলেও উক্ত নগরগুলির তুল্যকক্ষ হইতে পারে নাই। বৈশালীতে কুলতন্ত্র-শাসন প্রবর্ত্তিত ছিল; তত্রত্য লিচ্ছবিগণ সম্প্রীতভাবে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এবং সকলেই রাজা নামে অভিহিত হইতেন। এইরূপ অনেক বৃত্তান্ত জাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তু হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে এবং এ সমস্ত অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। বিন্‌সেণ্ট স্মিথ্ প্রভৃতি পুরাবৃত্তকারেরা জাতককে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের অন্যতম ভাণ্ডার বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বৌদ্ধশিল্পে জাতকের প্রভাব। পঞ্চমতঃ—যেমন গ্রীক্ শিল্পে হোমারের ও হেসিয়ডের, হিন্দুশিল্পে বাল্মীকির ও ব্যাসের, সেইরূপ বৌদ্ধ শিল্পে জাতককারের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সাঁচী, বেরুট, বড় বুদোরো * প্রভৃতি স্থানের ধ্বংসাবশেষে পুরাতন বৌদ্ধ তক্ষকগণের অদ্ভুত প্রতিভার যে সকল নিদর্শন আছে, তাহা সুন্দররূপে বুঝিতে হইলে জাতকের সহিত পরিচয় আবশ্যক।

ষষ্ঠতঃ—জাতকপাঠে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃতি অতি বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়। অনেকের বিশ্বাস, বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী। কিন্তু শাক্ত, শৈব, সৌর, বৈষ্ণব প্রভৃতি মতের ন্যায় বৌদ্ধ মতকেও হিন্দু ধর্ম্মেরই একটী শাখা বলা যাইবে না কেন? ইহাতে পরলোক আছে, স্বর্গ ও নরক আছে, কর্ম্মফল আছে; ইহাতে ইন্দ্রাদিদেবতা, বলিপ্রতিগ্রাহিদেবতা, বৃক্ষদেবতা, যক্ষরাক্ষসাদি অপদেবতা আছেন। ইহা সার্ব্বজনীন হইলেও উচ্চজাতির প্রাধান্য স্বীকার করে, শ্রমণ ব্রাহ্মণকে সমান আদর করে, নীচ বর্ণে জন্মপ্রাপ্তি পাপের পরিণাম বলিয়া মনে করে। ইহার ক্ষণিকত্ববাদ, শূন্যবাদও বোধ হয় নিতান্ত অহিন্দু নহে; ইহার পরিনির্ব্বাণে ও হিন্দুর কৈবল্যে প্রভেদ অতি অল্প। তবে ধর্ম্মের যাহা বহিরঙ্গমাত্র, যাহাতে আড়ম্বর আছে, কিন্তু নিষ্ঠা বা কর্ম্মশুদ্ধি নাই, যাহাতে যজ্ঞ হয় প্রাণিবধের জন্য, বৌদ্ধেরা তাহারই বিরোধী। সে ভাব ত

* বরবুদোরো যবদ্বীপের অন্তঃপাতী একটী স্থান। বেরুটস্তূপে নিম্নলিখিত জাতকগুলির ছবি চিনিতে পাওয়া গিয়াছে:—মখাদেব জাতক (৯), ন্যগ্রোধমৃগজাতক (১২), নৃত্যজাতক (৩২), আরামদূষক জাতক (৪৬), অক্ষভুক্তজাতক (৬২), দুভিয় মর্কটজাতক (১৭৪), অসদৃশজাতক (১৮১), কুরঙ্গমৃগজাতক (২০৬), কর্কটজাতক (২৬৭), সুজাতজাতক (৩৫২), লাটুকিক জাতক (৩৫৩), কুক্কুটজাতক (৩৮৩), দশরথজাতক (৪৬১), চন্দ্রকিন্নরজাতক (৪৮৫), ষড়্দন্তজাতক (৫১৪), ঋষ্যশৃঙ্গজাতক (৫২৩), মৃগপক্ষজাতক (৫৩৮), জনকজাতক (৫৩৯), বিধুরজাতক (৫৪৫)। তদ্ভিন্ন এখানে নিদানকথাবর্ণিত অনেক দৃশ্যও শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। সাঁচি স্তূপে শ্যামজাতকের (৫৪২), অসদৃশ জাতকের এবং বিশ্বন্তরজাতকের ছবি পাওয়া গিয়াছে।

বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও দেখা যায়। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজেও বৌদ্ধপ্রভাব সর্ব্ববাদিসম্মত। যখন আমরা নিরীশ্বর সাংখ্যকারকে হিন্দু বলিতে কুণ্ঠিত নহি, তখন বুদ্ধকেই বা অহিন্দু বলিতে যাইব কেন? আমরা বরং তাঁহাকে ও তাঁহার শিষ্যগণকে হিন্দু বলিব। তাহা হইলে বুঝিব, হিন্দুর মাহাত্ম্য, হিন্দুর আধ্যাত্মিক প্রভাব কেবল ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ নহে; সমগ্র ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান—বুঝিব যে হিন্দুর সংখ্যা বিংশতি কোটি নহে, সপ্ততি কোটি, বুঝিব যে কেবল দশগুণোত্তর অঙ্কলিখন নয়, কেবল বীজগণিতে বা রেখাগণিতে বা চিকিৎসাবিদ্যায় নয়, ধর্ম্মে ও দর্শনেও হিন্দু জগদ্‌গুরু। বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট খ্রীষ্টধর্ম্মের ঋণ এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের নিকট মোহম্মদীয়ধর্ম্মের ঋণ এখন আর অস্বীকারের বিষয় নহে।

সপ্তমতঃ—জাতক পাঠ করিলে দেখা যায়, বৌদ্ধেরা তখন কিরূপ উৎসাহের সহিত কুসংস্কারের বিরোধী হইয়াছিলেন। তাঁহারা যখনই সুবিধা পাইতেন, তখনই ফলিত-জ্যোতিষ, শকুনবিদ্যা প্রভৃতির অসারত্ব বুঝাইয়া দিতেন। ইহার নিদর্শনস্বরূপ বর্ত্তমান খণ্ডের নক্ষত্র জাতকের (৪৯) ও মঙ্গল-জাতকের (৮৭) গাথাগুলি দ্রষ্টব্য। মানবের মনকে ভ্রমপাশ হইতে মুক্ত করা, শাস্ত্র অপেক্ষা যুক্তির প্রাধান্য ঘোষণা করা বৌদ্ধদিগের প্রধান কার্য্য। তাঁহারা স্ব স্ব যতদূর পারিয়াছিলেন এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষে নানা বিষয়ে এত উন্নত হইয়াছিল।

অষ্টমতঃ—বাঙ্গালা ভাষার নিত্যব্যবহৃত অনেক শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করিতে হইলে পালি সাহিত্যের, বিশেষতঃ জাতকের, আলোচনা আবশ্যক। অনেক শব্দ সংস্কৃতজাত হইলেও এত বিকৃতি পাইয়াছে যে, আমরা সহজে তাহাদিগের মূল নির্দ্ধারণ করিতে পারি না এবং অভিধানাদিতে তাহাদিগকে 'দেশজ' আখ্যা দিয়া 'সাধুভাষার' বাহিরে রাখি। কিন্তু পালির সাহায্যে সময়ে সময়ে আমরা এই বিকৃতির প্রথমসোপান প্রত্যক্ষ করি, কাজেই তাহাদের উৎপত্তিনির্ণয় সুকর হয়। জাতকপাঠ করিবার পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল 'নর্দ্দামা' শব্দ দেশান্তরাগত, প্রকৃতিবাদ-প্রণেতা ইহাকে দেশজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু যখন কুক্কুর-জাতকে (২২) দেখিলাম, রাজভৃত্যেরা বলিতেছে, "দেব, নিদ্ধমনমুখেন সুনখা পবিসিত্বা রথস্স চম্মং খাদিংসু" (মহারাজ, কুকুরেরা নর্দ্দামার মুখ দিয়া প্রবেশ করিয়াছে এবং রথের চর্ম্ম খাইয়াছে), তখন বুঝিলাম, এই সমাজচ্যুত শব্দটী বহুপ্রাচীন এবং ভদ্রবংশজাত—সংস্কৃত ধ্মা ধাতু হইতে উৎপন্ন। সুশ্রুতে 'নির্ধ্মাপণ' শব্দ দেখা যায়। ইহার অর্থ ফুৎকার দ্বারা নিষ্কাষিত করা। অনন্তর বোধ হয় লক্ষণদ্বারা ইহা জলনিষ্কাশক প্রণালী বুঝাইয়াছে। 'ছানি' (চক্ষুরোগ বিশেষ) আপাত দৃষ্টিতে ছদ্‌ ধাতুজ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু পালিতে দেখা যায় 'সানি' শব্দটী 'পর্দ্দা' অর্থে ব্যবহৃত হইত; ইহা 'শণ' শব্দজ, এবং ইহার উৎপত্তিগত অর্থ শণসূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র বা চট। প্রকৃতিবাদকার কিন্তু ইহাকে এতই অন্ত্যজ মনে করিয়াছেন যে, অভিধানে ইহাকে স্থান দেন নাই। পূর্ব্ববঙ্গে চাষারা বলে "অমুক ঘরে নাই, পাট লইতে গিয়াছে"। শকুন জাতকে (৩৬) দেখা যায়, চাষারা ক্ষেত নিড়াইয়া, ফসল কাটিয়া ও মলিয়া (নিড্ডায়িত্বা, লায়িত্বা ও মদ্দিত্বা) ভিক্ষুর পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিবে বলিয়াছিল। কাজের এখানে কেবল 'লওয়া' শব্দের নহে,

'নিড়ান' এবং 'মলন' শব্দেও মূল বাহির হইল—বুঝা গেল যে প্রথম দুইটী যথাক্রমে ছেদনার্থক 'লূ' ও 'দা' ধাতুর সহিত এবং তৃতীয়টী 'মর্দ্দ' ধাতুর সহিত সম্বদ্ধ।

অপিচ,জাতকপাঠে দেখা যায়, পুরাকালে এমন অনেক প্রয়োজনীয় শব্দ ছিল, যাহা এখন আমরা হারাইয়াছি। তখন pilot ছিল, তাহারা 'জলনিয়ামক' নামে অভিহিত হইত; তখন foundation stoneকে মঙ্গলেষ্টক, laying the foundationকে মাঙ্গলেষ্টক-স্থাপন, Viceroyকে উপরাজ, Viceroyaltyকে উপরাজ্য, crown-princeকে পরিনায়ক, hospitalকে বৈদ্যশালা, surgeonকে শল্যকর্ত্তা, nosegayকে পুষ্পগুল, sugarmilkকে গুড়যন্ত্র, benchকে ফলকাসন, earnest money (বায়না) কে সত্যঙ্কার এবং সায়াহ্নভোজনকে সায়মাশ বলা হইত। এই সকল অচল শব্দ গ্রহণ করিলে আমাদের ভাষার সৌষ্ঠব সম্পাদিত হয় কিনা, তাহা সাহিত্যসেবীদিগের বিবেচ্য।

উপসংহার।

জাতকার্থবর্ণনার নিদান কথা তিন অংশে বিভক্ত—দূরে নিদানম্,অবিদূরে নিদানম এবং সন্তিকে নিদানম্। দীপঙ্কর বুদ্ধের সময় বোধিসত্ত্ব সর্ব্বপ্রথম বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির সঙ্কল্প করেন। সেই সময় হইতে বিশ্বন্তর লীলাবসানে তুষিত স্বর্গে গমন পর্য্যন্ত দূরে নিদানে বর্ণিত। তুষিত স্বর্গ ত্যাগ হইতে বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধত্বলাভ পর্য্যন্ত অবিদূরে নিদানের কথা। ইহাতে দীপঙ্কর হইতে কাশ্যপ পর্য্যন্ত ২৪ জন অতীত বুদ্ধের কথা আছে। অতঃপর গৌতমবুদ্ধের নানাস্থানে ভ্রমণ, ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন প্রভৃতি ঘটনা সান্তিক নিদানে বর্ণিত। এই অংশে গৌতমবুদ্ধের সমস্ত জীবনবৃত্তান্ত নাই; অনাথপিণ্ডদকর্ত্তৃক জেতবন-বিহারের উৎসর্গ বর্ণনা করিয়াই গ্রন্থকার উপক্রমণিকাংশ শেষ করিয়াছেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ।

জড়ের মূল উপাদান। (শেষ)

ঠিক এই সময়ে বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণা একটা নূতন পথের সন্ধান আনিয়া দিল। এই পথে চলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বুঝিতে পারিলেন যেন সমস্যার পূরণ হইয়া আসিতেছে। ক্রমে যেন স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল, একই তিন, এবং তিনই এক।

পরীক্ষা আরম্ভ হইল নিতান্ত সাধারণ রকমের যন্ত্র লইয়া, কিন্তু ফল মিলিল অদ্ভুত। একটী কাঁচের গোলক,—তাহার দুই পাশে দুইটা মোটা সূঁচ বসান। সূঁচ দুইটার মাথার দিক রহিয়াছে গোলকের ভিতরে, এবং গোড়ার দিকটা রহিয়াছে বাহিরে। বায়ুনিষ্কাসন যন্ত্রের সাহায্যে গোলকের ভিতরকার প্রায় সমস্তটা বায়ু বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে। যে সামান্য পরিমাণের বায়ু ইহার ভিতরে রহিয়াছে, তাহার চাপ খুবই কম। এই রকম কাঁচের গোলক লইয়াই সকল

এই কাঁচের গোলকের ভিতর তাড়িত-প্রবাহ সঞ্চালিত করিতে পারা যায়। সূঁচ দুইটার গোড়ার দিকে, উহার ছিদ্র মুখে, দুইটা তামার তার পরাইয়া, ঐ তারের অপর প্রান্তদ্বয় একটা তাড়িতোৎপাদক যন্ত্রের সহিত —উহার সু-প্রান্ত ও কু-প্রান্তের সহিত—যোগ

করিয়া দিলেই গোলকের ভিতর,ঐ সূচীদ্বয়ের মাঝখানে, একটা তাড়িত-প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে ; এবং সঙ্গে সঙ্গে এই প্রবাহ-পথটাও আলোকিত হইয়া পড়ে। গোলকের ভিতরে বায়ুর পরিমাণ একটু কমাইলে বা বাড়াইলে দেখা যায়, এই আলোকটা নানা রকমের ভঙ্গী প্রকাশ করে ;—ঐ দুই সূচীর মাঝে থাকিয়াই আলোকটা কখন বা স্তম্ভাকারে প্রকাশ পায়, আবার কখনও বা উহা স্তরে স্তরে বিভক্ত হইয়া পড়ে। উভয় ক্ষেত্রেই একটা অস্থিরতার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়,—যেন ভিতরে একটা ছুটাছুটী,ধাক্কাধাক্কি এরূপ কিছু চলিতেছে। কি যে ব্যাপার, বৈজ্ঞানিকগণ প্রথমটা কিছুই ঠাহর করিতে পারিলেন না। কিছুদিন এই ব্যাপারগুলি দেখিতে সুন্দর ভাবেই রহিয়া গেল, এবং কিছু দিনের জন্য এই কাঁচের গোলকগুলি শুধু তামাসা দেখাইবার জন্যই ব্যবহৃত হইতে লাগিল।

তারপর, ক্রুকস্ সাহেব পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। ইনি উন্নত ধরণের বায়ু-নিষ্কাসন যন্ত্রের সাহায্যে গোলকের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর পরিমাণ খুবই কমাইয়া ফেলিলেন। তখন দেখা গেল,গোলকের ভিতরে আর কিছু দেখা যায় না,—বায়ুর পরিমাণ খুবই কমাইলে, ভিতরটা একেবারে অন্ধকার হইয়া পড়ে। গোলকের ভিতরটা অন্ধকার হয় সত্য, কিন্তু উহার দেওয়ালের খানিকটা অংশ,—উহার ঐ কাঁচময় আবরণটা, তখন বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। দেখা যায়, কাঁচের যে অংশটা কু-সূচীর ঠিক সম্মুখে, ঐ অংশটাই বেশ দীপ্ত হইয়া উঠে। স্পর্শ করিলে বুঝা যায়, ঐ অংশটা বেশ গরম। ক্রুকস্ বলিলেন, বুঝিতে হইবে, ঐ কু-সূচী হইতে বহু সংখ্যক খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা অতি বেগে ধাবিত হইয়া ঐ কাঁচের দেওয়ালে ক্রমাগত আঘাত প্রদান করিতেছে। এই কণাগুলি তড়িন্ময়, ও উহারা কু-তড়িত বিশিষ্ট। এই কু-তড়িতের কণাগুলি,—এই কু-কণাগুলি অণু হইতে সূক্ষ্ম, পরমাণু হইতে সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম। উহারা কঠিন নহে, তরল নহে, অনিলও নহে—উহারা জড়ের এই ত্রিবিধ অবস্থার অতীত। উহারা জড়ের চতুর্থ অবস্থা জ্ঞাপন করে। গোলকের ভিতরটা আঁধার বটে, কিন্তু অন্ধকারের ভিতরই এই কু-কণাগুলির বিচিত্র লীলা। আঁধার রাজ্যের ভিতর দিয়াই উহারা বেগে ছুটিয়া চলে, এবং পাত্রের গায়ে অনবরত ধাক্কা দিতে থাকে। যে পথে কণাগুলি ছুটিয়া চলে, উহার এক একটী পথ এক একটী রশ্মি—আলোক-রশ্মি নহে,—অন্ধকার-রশ্মি। এই অন্ধকার-রশ্মি সম্পাতেই কাঁচ-পাত্রটা আলোকিত হয়। ক্রুকসের এই অন্ধকার রশ্মিগুলির কতকগুলি বিশিষ্ট ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া গেল। যথাঃ—

এই অন্ধকার-রশ্মি পথে, কাঁচের গোলাটার মাঝখানে, ধাতু নির্ম্মিত কোনও একটা পদার্থ রাখিয়া দিলে, উহার পশ্চাদ্ভাগে, ঐ উজ্জ্বল কাঁচের দেওয়ালে, ঐ ধাতব পদার্থটার একটা ছায়া পড়ে। এই ছায়া দেখিলে বুঝা যায়,এই অন্ধকার রশ্মিগুলির পথ সরল। দেখা যায়, এই রশ্মিগুলির দিক্ নির্ভর করে শুধু কু-সূচীর অবস্থানের উপর—সু-সূচীর উপর একেবারেই না। একটা পাঁচ সূচীওয়ালা কাঁচের গোলক লইয়া উহার ভিন্ন ভিন্ন সূচীকে সু-প্রান্ত করা চলে, কিন্তু দেখা যায় যে, সূচীটাকেই সু-প্রান্ত করা যা'কনা কেন, প্রতিবারেই গোলকের যে অংশটা কু-প্রান্তের সম্মুখে থাকে, শুধু ঐ অংশটাই আলোকিত হয়।

আরও দেখা গেল, ঐ কাঁচের গোলকের কাছে যদি একখানা চুম্বক রাখা যায়, তাহা হইলে গোলকের ঐ উজ্জ্বল অংশটা উহার এক পার্শ্বে সরিয়া আসে। উজ্জ্বল অংশটা ছিল কু-সূচীর ঠিক সম্মুখে, একখানা চুম্বক কাছে আনিলেই উহা ডাহিনে বা বামে সরিয়া যায়। দেখা গেল, চুম্বকের প্রভাবে এই আধার রশ্মিগুলির পথ বাঁকিয়া যায়। তাড়িত-প্রবাহ যুক্ত একটা তামার তার চুম্বকের প্রভাবে যে ভাবে ঘুরিয়া যায়, এই অন্ধকার রশ্মিগুলিও চুম্বকের আকর্ষণে ঠিক সেই ভাবেই ঘোরে। চুম্বকের এই প্রভাব দেখিয়া বুঝা গেল, এই অন্ধকার রশ্মি সমূহ কতক-গুলি তাড়িত প্রবাহের সমষ্টি মাত্র। রশ্মিগুলির ঘুরিবার দিক দেখিয়া আরও বুঝা গেল, এই রশ্মিময় প্রবাহটা কু-তাড়িতেরই প্রবাহ, সু-তাড়িতের নহে—উহারা কু-রশ্মিই বটে, সু-রশ্মি নহে।

আরও দেখা গেল, কাঁচের গোলকের মাঝখানে, ঐ রশ্মিগুলির পথে একটা ছোট রেলপথ বসাইয়া, উহার উপর একখানা ছোট গাড়ী রাখিয়া দিলে, ঐ গাড়ীর চাকা ঘুরিতে থাকে ও গাড়ীখানা চলিতে আরম্ভ করে। বুঝা গেল, এই কু-কণাগুলি একটা জড় দ্রব্যে আঘাত করিয়া উহাতে গতিও উৎপন্ন করিতে পারে।

অধ্যাপক রঞ্জন সাহেব দেখিলেন, ঐ অন্ধকার রশ্মিপথে একখানা ধাতুনির্ম্মিত চাকৃতি বসাইয়া রাখিলে, ঐ চাকৃতি খানা হইতে আবার একটা নূতন রকমের আলো নির্গত হইতে থাকে। রঞ্জন দেখিলেন, এই আলোটা একটু অদ্ভুত গোছের। ইহা কাঠ, কাগজ, রক্ত, মাংস ভেদ করিয়া যায়। দেখিলেন, সাধারণ আলোক যে সকল পদার্থ ভেদ করিতে পারে না, এই আলোক তাহাদের অনেককেই অক্লেশে ভেদ করিয়া থাকে,—যাহারা অস্বচ্ছ ছিল, এই নূতন আলোকের প্রভাবে তাহারা স্বচ্ছ হইয়া পড়ে। রঞ্জন-আবিষ্কৃত এই আলোক—এই রঞ্জনরশ্মি, এখন আর নূতন কথা নহে; কিন্তু এই রঞ্জনরশ্মির উৎপত্তি ক্রুক্‌সের ঐ অন্ধকার রশ্মি হইতে; ক্রুক্‌সের তিরোভাবে রঞ্জনের আবির্ভাব,—নিশার অবসানে দিবার উদ্ভব।

তারপর, পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন, অধ্যাপক জে, জে, টম্‌সন্ ও তাঁহার শিষ্যগণ। ইহাঁদের পরীক্ষার ফলে কু-কণাগুলির বেগ নির্ণীত হইল। দেখা গেল, এই কুকণাগুলির বেগ অতি ভীষণ। সকল কণার বেগ সমান নহে। কিন্তু দেখা গেল, সকলেরই বেগ আলোকের বেগের সহিত তুলনীয়। আলোক সেকেণ্ডে প্রায় লক্ষ ক্রোশ চলে; এই কু-কণাগুলির বেগ উহার দশ ভাগের ভাগ বা পাঁচ ভাগের ভাগ—এইরূপ।

এই তাড়িত কণাগুলির তাড়িতের পরিমাণও নির্ণীত হইল। দেখা গেল, বেগ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাড়িতের পরিমাণ সকল কণার পক্ষেই সমান। আরও দেখা গেল, জলে তাড়িত প্রবাহ সঞ্চালন করিয়া হাইড্রোজেন উৎপন্ন করিবার কালে এক একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত যতটা তাড়িত গ্রথিত থাকে, এই কু-কণাগুলির তাড়িতের পরিমাণও ঠিক তাহাই। গোলক মধ্যস্থ তাড়িত প্রবাহটা প্রবলতর করিয়া দেখা গেল, উহার কু-প্রান্ত যে ধাতুতে নির্ম্মিত, ঐ ধাতুর পরিবর্ত্তন করিয়া দেখা গেল, গোলকের অভ্যন্তরে বায়ুর পরিবর্ত্তে অন্যান্য গ্যাস্ রাখিয়া দেখা গেল,—দেখা গেল, কু-কণাগুলির তাড়িতের পরিমাণ কিছুতেই বদলায় না। বেগ বদলা-

ইয়া যায়, কিন্তু উহাদের তাড়িতের পরিমাণে ইতর বিশেষ ঘটে না। বুঝা গেল, একটা বিশিষ্ট পরিমাণের তাড়িত লইয়াই এই কু-কণাগুলির দেহ গঠিত হইয়াছে।

তাড়িত কণাগুলির বস্তু পরিমাণও নির্ণীত হইল। দেখা গেল, বস্তু-পরিমাণও সব কণাগুলিরই সমান। সকল কণার একই বস্তু, কিন্তু এই বস্তু নিতান্তই সামান্য। এত ক্ষুদ্র বস্তুর সহিত পূর্ব্বে কখনও সাক্ষাত ঘটে নাই, এত ক্ষুদ্র বস্তু, বৈজ্ঞানিকের মাপ কাটি, ইহার পূর্ব্বে কখনও মাপে নাই। দেখা গেল, একটা তাড়িত কণার বস্তু একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর তুলনায়ও অতি নগণ্য—উহার প্রায় দুই হাজার ভাগের ভাগ মাত্র। দেখা গেল, কণাগুলির বেগ ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু তাড়িতের পরিমাণে বা বস্তু পরিমাণে কণায় কণায় ভেদ নাই।

কণাগুলির আয়তনও নির্ণীত হইল। দেখা গেল,একটা তাড়িত কণার ব্যাস একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর ব্যাসের অতি সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। কণাগুলির বস্তুও ক্ষুদ্র, আয়তনও ক্ষুদ্র।

ক্রমে দেখা গেল, এই তাড়িত কণাগুলির উদ্ভব শুধু ক্রুকস্ সাহেবের গোলকের মধ্যে নহে—উহারা স্থলে, জলে, অনলে, অনিলে স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরীক্ষার ফলে দেখা গেল, উৎপত্তি স্থল যাহাই হউক, বস্তু-পরিমাণে বা তাড়িতের পরিমাণে কণায় কণায় পার্থক্য নাই।

দেখিয়া শুনিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বলিলেন, জড় পরমাণু বিভাজ্য। পরমাণুকে ভাঙ্গা চলে এবং ভাঙ্গিলে সর্ব্বত্রই মিলে, একই ধর্ম্মের একই কণা। সর্ব্বত্রই মিলে তাড়িত কণা,—তাড়িত বিশিষ্ট জড়কণা বা জড়ত্ব বিশিষ্ট তাড়িত কণা। ইহা অনুমান নহে, ইহা পরীক্ষালব্ধ সত্য।

রাদারফোর্ড, কুরী-দম্পতি ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণের পরীক্ষা হইতে আরও নূতন নূতন কথা বাহির হইয়া পড়িল। দেখা গেল, ইউরেনিয়াম্, রেডিয়াম্, প্রভৃতি কতকগুলি ধাতব পদার্থ রহিয়াছে—যাহাদের ধর্ম্ম একটু অদ্ভুত রকমের। এই পদার্থগুলি হইতে কয়েকটা বিশিষ্ট ধরণের রশ্মি বা তেজ নির্গত হইয়া থাকে ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ক্রমাগত তেজ নির্গমেও, উহাদের তেজের হ্রাস হইতে দেখা যায় না ; আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,তেজ নির্গত হইবার ফলে এই পদার্থগুলির রূপান্তরও সাধিত হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ দেখিতে লাগিলেন, সত্য সত্যই একটা মূল পদার্থ ক্রমে আর একটা মূল পদার্থে পরিণত হইয়া থাকে। এতদিনে বৈজ্ঞানিকের স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইতে চলিল। বৈজ্ঞানিকগণ বুঝিলেন, প্রাচীন অ্যালকেমিষ্টগণ বাতুল ছিলেন না,—বুঝিলেন,লোহাকে সোণা করা অসম্ভব ব্যাপার নহে। ক্রমে দেখা গেল রেডিয়ম জাতীয় পদার্থের সংখ্যা মাত্র ২।১টী নহে ; অনেক পদার্থেরই ধর্ম্ম রেডিয়ামের মত। কোনটার রূপান্তর ঘটে দ্রুত, কোনটার ঘটে অতি ধীরে—খুবই ধীরে ; কিন্তু পরিবর্ত্তন সর্ব্বত্রই। দেখা গেল, পরমাণুকে শুধু ভাঙ্গিতে পারা যায় না, পরমাণু ভাঙ্গিয়াই আছে। ভাঙ্গিয়া যাওয়াই পরমাণুর স্বভাব ; ইহাই প্রকৃতির বিধান। বিধানটা যে এতদিন চোখে পড়ে নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। আরও দেখা গেল, এই রেডিয়ম্ নির্গত তেজ বা রশ্মিগুলির মধ্যেও তাড়িত-কণা রহিয়াছে,—সেই তাড়িত কণা,—ক্রুক্সের কাঁচ-গোলকের মধ্যে যাহাদের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ

সেই তাড়িত কণা,—সেই বস্তু, সেই তাড়িত, সেই কু-কণা।

অধ্যাপক টম্‌সন্ দেখিলেন,ডাল্টনের পরমাণুগুলি সকলেই ভাঙ্গিয়া যায়, এবং ভাঙ্গিয়া সর্ব্বত্রই উৎপন্ন হয়, একই ধর্ম্মের তাড়িত কণা। টম্‌সন্ বলিলেন, পরমাণু মাত্রেরই একটা সাধারণ উপাদান এই তাড়িত কণা। তাড়িত কণার অতিরিক্ত আর কোন পদার্থ কোন পরমাণুতে আছে কি না,তাহা বলা যায় না, কিন্তু তাড়িত কণা যে পরমাণু মাত্রেরই—জড়মাত্রেরই একটা সাধারণ উপাদান, ইহাতে ভুল নাই,—ইহা পরীক্ষালব্ধ সত্য।

সকল পরমাণুতেই তাড়িতকণা রহিয়াছে; আর কিছু আছে কি না,তাহার প্রমাণ নাই; যদি আর কিছু না থাকে, তবে বলিতে হইবে, জড় জগতে মূল পদার্থ একটী মাত্র—উহা তাড়িত কণা। বলিতে হইবে জড়ের মূল উপাদান একটী মাত্র—উহা তাড়িত কণার উপাদান, বলিতে হইবে মূল উপাদানের গঠন—আণবিক গঠন—মূল উপাদান কণাময়। কণা বহু, কিন্তু উপাদান এক। বলিতে হইবে একটা বিশিষ্ট রূপের উপর সংখ্যা ফলাইয়াই এই বিচিত্র জড় জগতের নির্ম্মাণ।

কিন্তু জিজ্ঞাসা এই খানেই থামে না; জিজ্ঞাস্য হয়—তাড়িত কণার স্বরূপ কি? তাড়িত কণা জড় কণা না তাড়িতেরই কণা? উহার বস্তুও আছে, উহাতে তাড়িতও আছে, কিন্তু প্রাধান্য কাহার?—বস্তুর না তাড়িতের? কণার প্রকৃত মূর্ত্তি কি? উহার এক মূর্ত্তি না দুই মূর্ত্তি? উহার মূর্ত্তি জড়ের মূর্ত্তি না তাড়িতের মূর্ত্তি, না উভয়েরই মূর্ত্তি? মূল কথার এখনও মীমাংসা হয় নাই।

অধ্যাপক টম্‌সন্ ইহারও মীমাংসা করিয়াছেন, অন্ততঃ আংশিক ভাবে করিয়াছেন। তাঁহার বিচার-প্রণালী কতকটা এই রকম:—দেখ জড়ের লক্ষণ কি? যাহাকে চালাইতে গেলে শক্তি প্রয়োগের আবশ্যক হয়, যাহা চালিত হইলে শক্তির আধার হয়, তাহাই জড়।

একটী তামার বা লোহার গোলাকে বেগ উৎপন্ন করিতে গেলে শক্তি প্রয়োগের আবশ্যক হয় এবং বেগবিশিষ্ট হইলে গোলাটা শক্তির আধার হয়। শক্তি প্রয়োগের আবশ্যক হয়, আমরা শুধু এইটাই অনুভব করিয়া থাকি এবং ইহা অনুভব করিয়াই আমরা বলি—তামার বা লোহার গোলাটা জড়পদার্থ। তাড়িতকে চালাইতেও যদি শক্তি প্রয়োগের আবশ্যক হয়; তাড়িতও যদি বেগবিশিষ্ট হইলে শক্তিবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে বলিতে হইবে, তাড়িতও জড়পদার্থ।

দেখ, একটা তারে তাড়িতের প্রবাহ উৎপন্ন করিতে যাইয়া শক্তি ব্যয় করিতে হয়—ফ্যারাডের পরীক্ষা হইতে আমরা ইহা জানিতে পারিয়াছি। দেখ ঈথরের মধ্যে তাড়িত প্রবাহ উৎপন্ন করিতে যাইয়াও শক্তি ব্যয় করিতে হয়—'ম্যাক্সওয়েলের থিওরি' (theory) হইতে আমরা ইহা বুঝিতে পারিয়াছি। আবার দেখ, একটা তামার গোলাকে তাড়িতবিশিষ্ট করিয়া যদি উহাকে চালাইয়া দেওয়া যায়, তবে ঐ গোলাটার সঙ্গে সঙ্গে উহার তাড়িতকেও চলিতে হয়—একই বেগে চলিতে হয়। এই যে তাড়িত—যাহা গোলার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলে, উহার বেগোৎপন্ন করিতে শক্তি প্রয়োগের আবশ্যক না হইবে কেন? বুঝিতে হইবে, গোলার তাড়িতেও বেগোৎপন্ন করিতে শক্তি ব্যয় করিতে হয় এবং এই শক্তিটাও একটা বিশিষ্ট মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। দেখ,

গোলার তাড়িত যখন গোলার সঙ্গে ছুটিয়া চলে, তখন যে পথে গোলাটা ছুটিতে থাকে, ঐ পথে একটা প্রবাহ উৎপন্ন হয়—তারে যেরূপ তাড়িত প্রবাহ উৎপন্ন হয়, ঠিক সেইরূপ একটী প্রবাহ উৎপন্ন হয়। এই যে তাড়িত প্রবাহ, ইহার ফলেও চৌম্বক রেখার উৎপত্তি ঘটে এবং এই চৌম্বক রেখাগুলি ঐ প্রবাহ পথটাকে ঘিরিয়া ধরে—একটা তারে তাড়িত বহিলে ঐ তারটাকে যে ভাবে ঘিরিয়া ধরে, ঠিক সেইরূপ ঘিরিয়া ধরে। দেখ, প্রবাহ পথকে ঘিরিয়া উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ঈথরে কতকগুলি চৌম্বক রেখার সৃষ্টি হয়। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে, এই ঈথর প্রদেশটা চৌম্বক শক্তির আধার হয়। বুঝিতে হইবে, তাড়িত চলিতে আরম্ভ করিলেই ঈথর-সাগরে চৌম্বক শক্তির আবির্ভাব ঘটে, তা, তাড়িত তার বাহিয়াই চলুক বা গোলায় চাপিয়াই চলুক—আর ঈথারে এই চৌম্বক শক্তির আবির্ভাব ঘটাইতে হয় বলিয়াই তাড়িতকে চালাইতে শক্তি প্রয়োগের আবশ্যক হয়।

দেখ শুধু একটা তামার গোলাকে চালাইতেও শক্তি প্রয়োগের আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু ঐ গোলাটাকে তাড়িত বিশিষ্ট করিয়া চালাইতে গেলেই একটু অধিকতর মাত্রায় শক্তি প্রয়োগের আবশ্যক হয়। গোলার সঙ্গে সঙ্গে তাড়িতকেও চালাইতে হয়—একটা প্রবাহ উৎপন্ন করিতে হয়—ঐ প্রবাহকে ঘিরিয়া কতগুলি চৌম্বক রেখার সৃষ্টি করিতে হয়, তাই অধিকতর শক্তি প্রয়োগের আবশ্যক হয়। কাজেই দেখ, শুধু ঐ তাড়িতটাকে চালাইতেই একটা বিশিষ্ট পরিমাণের শক্তিপ্রয়োগের আবশ্যক হয়। অর্থাৎ কি না, তাড়িতের আবির্ভাবে গোলাটার জড়ত্ব বাড়িয়া যায়। বাড়ে যে, তাহা উহাকে চালাইতে গিয়াই ধরিতে পারা যায়—চালাইতে গিয়া যে শক্তি ব্যয় করিতে হয়, উহার মাত্রা দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। শুধু তাড়িতকে চালাইতে যে শক্তি ব্যয় করিতে হয়, তাহা চৌম্বকশক্তির আকার ধারণ করে। শুধু গোলাটাকে চালাইতে যে শক্তিটা ব্যয় করিতে হয়, তাহা ঐ আকার ধারণ করে না। এই যে চৌম্বক শক্তি, ইহা শুধু গোলার তাড়িতেরই জড়ত্ব নির্দ্দেশ করে। উহা গোলাটার জড়ত্ব নির্দ্দেশ করে না।

দেখ, তাড়িতবিশিষ্ট এই তামার গোলাটার জড়ত্বের দুইটা দিক—দুইটা ভাগ রহিয়াছে। একটা দিক, শুধু সাধারণ জড়ত্ব—উহা তামা মূলক, আর একটা দিক একটু বিশিষ্ট ধরণের—উহা তড়িন্মূলক। দেখ এই তড়িন্মূলক জড়ত্বও মাপা চলে। দেখ, জড়ত্ব মাপিবার সাধারণ প্রণালী যাহা, এই তড়িন্মূলক জড়ত্বও মাপিতে হইবে, সেই প্রণালী ধরিয়া—জড়ত্ব সর্ব্বত্রই মাপিতে হইবে, শক্তিপ্রয়োগের মাত্রা মাপিয়া। তবে তড়িন্মূলক জড়ত্বের বিশেষত্ব এই যে, এই জড়ত্ব মাপিতে হইবে চৌম্বকশক্তি মাপিয়া।

এই তড়িন্মূলক জড়ত্বের আরও কয়েকটা বিশেষত্ব রহিয়াছে। একটা বিশেষত্ব এই যে, এই জড়ত্বের আধার ঐ তামার গোলাটা নহে,—ইহার প্রকৃত আধার উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ইথর প্রদেশ। তাড়িতের বেগ জন্মিলে চৌম্বকশক্তির বিকাশ ঘটে; কিন্তু এই শক্তির বিকাশ ঘটে—গোলাটার বাহিরে যে ঈথরের রাজ্য রহিয়াছে, ঐ রাজ্যে। সমগ্র ঈথর প্রদেশটাই চৌম্বকশক্তির আধার হয়, কাজেই গোলাটার যেটুকু জড়ত্ব উহার তাড়িত লইয়া তাহার ব্যাপ্তিও সমগ্র ঈথরে যে জড়ত্বের মূলে তাড়িত, ঐ জড়ত্বের বসতি

সমগ্র ঈথরে। গোলার যেটুকু বস্তু তড়িন্মূলক, তাহার আধার ঐ গোলাটা নহে—ঈথর।

ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই। গোলাটার যে তাড়িত, তাহারও আধার সমগ্র ঈথরপ্রদেশ। দেখ, ফ্যারাডে বলিয়াছেন, গোলাটাকে তাড়িত বিশিষ্ট করার অর্থ, উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ঈথরে কতকগুলি তাড়িত রেখা উৎপন্ন করা। দেখ, গোলাটা ছুটিয়া চলিলে তাড়িত ছুটিয়া চলে। তাড়িত ছুটিয়া চলে ইহার অর্থ কি? অর্থ, এই তাড়িত রেখাগুলি—এই ফ্যারাডে রেখাগুলি, ঈথর বাহিয়া ছুটিয়া চলে। ইহারই নামান্তর তাড়িত প্রবাহ। ইহারই ফলে চৌম্বকশক্তির বিকাশ। তাড়িতের বেগ উৎপন্ন করার অর্থ—এই ফ্যারাডে রেখাগুলির বেগ উৎপন্ন করা—ঈথর ব্যাপী ফ্যারাডে রেখাগুলিকে ঈথর বাহিয়া চালাইয়া লইয়া যাওয়া। ঈথর-ব্যাপী তাড়িত রেখাগুলির ঈথরের মধ্যে বেগ উৎপন্ন করিতে যাইয়া ঈথরের মধ্যে চৌম্বকশক্তির আবির্ভাব ঘটে। কাজেই তাড়িত লইয়া যে জড়ত্ব ঈথরই তাহার আধার।

এই তড়িন্মূলক জড়ত্বের আর একটা বিশেষত্ব এই যে, এই জড়ত্বের পরিমাণ কতকটা নির্ভর করে তাড়িতের পরিমাণের উপর; আবার কতকটা নির্ভর করে ঐ গোলাটার আয়তনের উপর। তাড়িতের পরিমাণের উপর অর্থাৎ কি না ফ্যারাডের রেখাগুলির সংখ্যার উপর। কতখানি তাড়িত ছুটিয়া চলিয়াছে—কতগুলি ফ্যারাডে রেখা ছুটিয়া চলিয়াছে—ইহার উপর তড়িন্মূলক জড়ত্বের পরিমাণ নির্ভর করিবে। তাড়িতের পরিমাণ যতই বাড়িবে—ফ্যারাডে রেখা সংখ্যা যতই বাড়িবে—তড়িন্মূলক জড়ত্ব ততই বাড়িয়া যাইবে। অধ্যাপক টম্‌সন্ গণনা করিয়া দেখিতে পাইলেন, তাড়িতের পরিমাণ যে অনুপাতে বাড়ান যায়, অর্থাৎ ফ্যারাডে রেখার সংখ্যা যে অনুপাতে বাড়ান যায়—এই তড়িন্মূলক জড়ত্ব বাড়ে তাহার বর্গের অনুপাতে।

এই তড়িন্মূলক জড়ত্বটা তাড়িতের পরিমাণের উপরও নির্ভর করে, আবার ঐ গোলাটার আয়তনের উপরও নির্ভর করে। ফ্যারাডে-রেখা সংখ্যার উপর নির্ভর করে, আবার এই ফ্যারাডে রেখাগুলি যাহাকে অবলম্বন করিয়া দাঁড়ায়—যাহাকে আশ্রয় করিয়া ছুটিয়া চলে—ঐ গোলাটা কত বড়, উহার ব্যাস কতখানি, ইহার উপরও নির্ভর করে। গোলাটায় তাড়িতের পরিমাণ যাহা আছে, তাহাই থাকুক, উহা যে বেগে চলিতেছে, ঐ বেগেই চলিতে থাকুক, অর্থাৎ কিনা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার কতকগুলি ফ্যারাডে রেখা লইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট বেগে গোলাটা ছুটিতে থাকুক, কিন্তু গোলাটা ক্রমে বড় হইতে থাকুক। ফলে গোলাটার বাহিরে যে ঈথরের রাজ্য রহিয়াছে—যে রাজ্য ভেদ করিয়া ফ্যারাডে রেখাগুলি বেগে অগ্রসর হইয়াছে এবং যে রাজ্য চৌম্বকশক্তির আধার হইয়াছে, ঐ রাজ্যটা ক্রমে সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে। গোলাটা যতই বড় হইবে, উহার বাহিরের ঈথরের রাজ্যটাও ঐ চৌম্বকশক্তির রাজ্যটাও ততই সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে এবং শেষটা একেবারে লোপ পাইবে। রাজ্যহ্রাসে চৌম্বকশক্তিরও হ্রাস ঘটিবে। এবং শেষটা চৌম্বকশক্তির লোপ ঘটিবে, তখন গোলাটার তড়িন্মূলক জড়ত্বের পরিমাণ হইবে শূন্য। কাজেই যে জড়ত্বের মূলে তাড়িত ঐ জড়ত্বের পরিমাণ গোলাটার আয়তনের উপরও

নির্ভর করে। আয়তন যত ক্ষুদ্র হইবে, তড়িমূলক জড়ত্বের পরিমাণ ততই বাড়িবে। টম্‌সন্‌ হিসাব করিয়া দেখিলেন, গোলাটার ব্যাস যে অনুপাতে কমে, উহার তড়িন্মূলক জড়ত্বও ঠিক সেই অনুপাতে বাড়ে। মনে রাখিতে হইবে, তাড়িত অর্থ তাড়িত রেখা বা ফ্যারাডে রেখা—ঈথরব্যাপী ফ্যারাডে রেখা; গোলাটার অর্থ বাস্তভূমি—যাহাতে অবলম্বন করিয়া এই তাড়িত রেখাগুলি দাঁড়ায়। গোলাটা ছোট হওয়ার অর্থ তাড়িতের বাস্তভূমি ক্ষুদ্র হওয়া। তাড়িতের বস্তুভূমি যতই ক্ষুদ্র হইবে, তাড়িতের জড়ত্বও ততই বাড়িবে।

তাড়িন্মূলক জড়ত্বের আর একটা বিশেষত্ব এই যে—উহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এই জড়ত্বটা কেবল তাড়িতের পরিমাণ বা উহার বাস্তভূমির আয়তন লইয়াই নহে, এই জড়ত্বটা গোলাটার বেগের উপরও অনেকটা নির্ভর করে। গোলাটা ছুটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার তাড়িতও অর্থাৎ উহার উপর দণ্ডায়মান ঐ ফ্যারাড়ে রেখাগুলিও ছুটিয়া চলে। কিন্তু রেখাগুলি ছুটিয়া চলে বলিলেই সবটা বলা হইল না। বেগবিশিষ্ট হইলেই ঐ রেখাগুলির বিন্যাসেরও কতকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। বেগহীন অবস্থায় গোলাটার উপর এই রেখাগুলির বিন্যাস ঠিক কদম্ব কেশরের মত। বেগবিশিষ্ট হইলেই এই তাড়িত রেখাগুলি—এই কেশরগুলি—একপাশে ঢলিয়া পড়ে; আর বেগ যতই বাড়ে, উহারা ততই হেলিতে থাকে, যেন উহাদের উপর দিয়া একটা ঝড় বহিতেছে। গোলাটার বেগ যদি খুবই বাড়িয়া যায়, যদি উহার বেগটা প্রায় আলোকের বেগের সমকক্ষ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে এই তাড়িত রেখাগুলি অতিরিক্ত মাত্রায় হেলিয়া পড়ে, তখন উহারা সকলেই বেগের মুখ ছাড়িয়া গোলাটার সম্মুখ এবং পশ্চাৎ ত্যাগ করিয়া, উহার মধ্যস্থলে—বিষুব রেখায় ক্রমে আশ্রয় গ্রহণ করে। বেগের ফলেই তাড়িত রেখাগুলির এই বিন্যাসের পরিবর্ত্তন; কিন্তু যাহার ফলেই হউক, বিন্যাসের এই পরিবর্ত্তন সাধন করিতেও শক্তি প্রয়োগের আবশ্যক হয়। তাড়িত রেখাগুলির শুধু বেগ উৎপন্ন করিতেই খানিকটা শক্তি ব্যয় করিতে হয়। আবার বেগের সঙ্গে সঙ্গে রেখাগুলির বিন্যাসের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে যাইয়া আরও একটু অধিক মাত্রায় শক্তি প্রয়োগের আবশ্যক হয়। অধ্যাপক টম্‌সন্‌ গননা করিয়া দেখিলেন, নিতান্ত সাধারণ বেগে তাড়িত রেখাগুলির বিন্যাস বড় একটা বদলায় না। গোলাটাকে অল্প বেগে চালাইতে হইলে শক্তি ব্যয় করিতে হয়, শুধু ঐ অল্পবেগ জন্মাইতে গিয়া—তাড়িত রেখাগুলির অল্প বেগ উৎপন্ন করিতে যাইয়া, উহাদের বিন্যাসের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া নহে। যদি গোলাটার বেগ ক্রমে বাড়ান যায়,—যদি বেগ বাড়াইতে বাড়াইতে উহার বেগটা প্রায় আলোকের বেগের সমান করিয়া তোলা যায়, তখন তাড়িত রেখাগুলির বিন্যাসেরও অতিক্রত পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। তখন এই বিন্যাসের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে যাইয়া সহসা অতিরিক্ত মাত্রায় শক্তিপ্রয়োগের আবশ্যক হয়। তখন তাড়িতের জড়ত্বও সহসা বাড়িয়া যায়।

ফলে দেখা যায়, যে জড়ত্বের মূলে তাড়িত, এ জড়ত্বের কয়েকটা বিশেষত্ব রহিয়াছে। উহার বসতি সমগ্র ঈথরে। এই জড়ত্বের একটা ধরা বাঁধা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই। উহার পরিমাণ কতকটা নির্ভর করে বাস্ত-

ভূমির আয়তনের উপর, আবার কতকটা নির্ভর করে ঐ বাস্তুভূমিরই বেগের উপর।

অধ্যাপক টম্‌সন্‌ আরও বলিলেন—তাড়িতের জড়ত্বের এই বিশেষত্ব হইতে কোন একটা দ্রব্যের জড়ত্ব শুধু তড়িন্মূলক কিনা, ইহা নির্দ্ধারণ করা চলে। টম্‌সন্‌ বলিলেন, দেখ, তাড়িতবিশিষ্ট তামার গোলাটার জড়ত্ব কতকটা উহার তাড়িত লইয়াও বটে, কতকটা উহার তামা লইয়াও বটে। যদি গোলাটার বেগ ক্রমে বাড়িতে থাকে, তবে উহার জড়ত্বও ক্রমে বাড়িয়া যাইবে, কিন্তু উহার জড়ত্বের শুধু একটা ভাগ—শুধু তাড়িতের দিগকার ভাগটা ক্রমে বাড়িয়া যাইবে এবং বাড়িবে ঠিক চৌম্বক শক্তির অনুপাতে। জড়ত্বের একটা ভাগ বাড়িবার ফলে গোলাটার মোট জড়ত্বও বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু জড়ত্বের এই মোট ফলের বৃদ্ধি ঠিক চৌম্বক শক্তির অনুপাতে ঘটিবে না। তামামূলক জড়ত্বটুক বেগের সঙ্গে বাড়িয়া উঠিবে না, কাজেই মোট জড়ত্বটা ঠিক চৌম্বক শক্তির অনুপাতে বাড়িতে পাইবে না। কিন্তু এমনই যদি দেখা যায় যে, গোলাটার সবটা জড়ত্বই বাড়ে ঠিক চৌম্বক শক্তিরই অনুপাতে — তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, উহার জড়ত্বের যে অংশটা শুধু তড়িন্মূলক, উহাই প্রকৃত জড়ত্ব, আর যে অংশটা তামামূলক উহা হয় জড়ত্ব নহে, অথবা ঐ জড়ত্বও তড়িন্মূলকই বটে। বুঝিতে হইবে, আমরা তামাতে যে জড়ত্ব আরোপ করি, উহারও মূলে শুধু তাড়িত।

অধ্যাপক টমসন বলিলেন, তামার গোলাটা ছাড়িয়া দিয়া ক্রুক্‌সের কাচের গোলাটার দিকে তাকাও। উহার মধ্যবর্ত্তী একটা তাড়িত কণার দিকে তাকাও। কণাটা তাড়িত বিশিষ্ট; অতএব উহার জড়ত্বের কতকটা অংশ শুধু ঐ তাড়িত লইয়া। কণাটা বেগ বিশিষ্ট, অতএব উহার জড়ত্বের এই অংশটা মাপা চলে। উহার বেগের হ্রাসবৃদ্ধি আছে। অতএব এই জড়ত্বেরও হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। কণাটা নিতান্তই ক্ষুদ্র, অতএব উহার জড়ত্বের যে অংশ শুধু তাড়িন্মূলক, এ অংশটা উপেক্ষণীয় নহে। উপেক্ষণীয় নহে বলিলেই যথেষ্ট হইল না। হয়ত কণার যা কিছু জড়ত্ব, সবটাই শুধু উহার তাড়িত লইয়া। পরীক্ষা কর—বিভিন্ন বেগের বিভিন্ন তাড়িত-কণা লইয়া পরীক্ষা কর। উহাদের জড়ত্ব নির্ণয় কর এবং উহাদের চৌম্বক শক্তির হিসাব কর। উহাদের জড়ত্বের সহিত এই চৌম্বক শক্তির সম্বন্ধ কি রকম, তাহা দেখ।

ক্যাফ্‌ম্যান সাহেব পরীক্ষা করিলেন। ক্যাফ্‌ম্যান দেখিলেন, রেডিয়ম-নির্গত তাড়িত কণাগুলির বেগ ভিন্ন ভিন্ন এবং ইহাদের বেগ প্রায় আলোকের বেগের কাছা কাছি। ক্যাফ-ম্যান এই কণাগুলির বস্তু মাপিলেন, অর্থাৎ মোট জড়ত্ব মাপিলেন। দেখিলেন, ইহাদের বস্তু পরিমাণ ভিন্ন ভিন্নই বটে; যাহার বেগ বেশী, তাহার বস্তুও বেশী; যাহার বেগ কম, তাহার বস্তুও কম। দেখিলেন, কণার বেগ বাড়িলে উহার বস্তুও বাড়ে বটে।

টমসন্‌ এই বিভিন্ন বেগের কণাগুলির শক্তির হিসাব করিলেন। উহাদের বেগের ফলে এবং বেগের সঙ্গে সঙ্গে তাড়িত রেখাগুলির বিন্যাসের ফলে যে চৌম্বক শক্তি —সেই চৌম্বক শক্তির হিসাব করিলেন। হিসাবে দেখা গেল, কণাগুলির এই চৌম্বক শক্তির অনুপাতের সহিত ইহাদের বস্তুর অনুপাত—ক্যাফম্যানের পরীক্ষা হইতে উহাদের মোট বস্তুর যে অনুপাত পাওয়া যায়, সেই অনুপাত ঠিক ঠিক মিলিয়া যায়। টম্‌সন্‌

বলিলেন, তবেই দেখ, তাড়িত কণাগুলির জড়ত্বের শুধু একটা ভাগই তাড়িত লইয়া নহে, উহার যা' কিছু জড়ত্ব—যা' কিছু বস্তু—উহার সবটাই তড়িন্মূলক। দেখ, এইরূপ কতকগুলি তাড়িত কণা লইয়াই যাহাদের জড়ত্বের মূলে কেবল তাড়িত আর তাড়িত—এইরূপ কতগুলি কণা লইয়াই এক একটী জড়দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

টমসন্ বলিলেন,—জড়ের আসল রূপ একটী মাত্র—উহা তাড়িত কণার রূপ, জড়ের মূল উপাদান একটী মাত্র,—উহা তাড়িত কণার উপাদান। এই মূল উপাদান জড় নহে, উহা তাড়িত। ব্যাপ্তি, জড়ের বিশিষ্ট ধর্ম্ম নহে—জড়ে জড়ে স্থিতি-বিরোধ নাই। জড় সান্ত নহে—অনন্ত বিস্তৃত। এই ব্যাপ্তি প্রকৃত পক্ষে জড়ের নহে, তাড়িতের। জড়ত্ব জড় লইয়া নহে—তাড়িত লইয়া। 'বস্তু' কথার অর্থ নাই; 'বস্তু' পদার্থের স্থায়ী ধর্ম্ম নহে—একটা আগন্তুক ধর্ম্ম মাত্র; উহা তাড়িতেরই ধর্ম্ম।

জড় অবিনশ্বর নহে। জড়ের সৃষ্টি একটা বিশিষ্ট মুহূর্ত্তে ঘটে নাই, জড়ের ধ্বংসও একটা নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে ঘটিবে না। সৃষ্টি ও ধ্বংস দৈনন্দিন ব্যাপার, উহা অহরহই সম্পন্ন হইতেছে। জড়ের লোপ ঘটিলেও তাড়িত থাকিয়া যাইবে, তাড়িতের লোপ ঘটিলে বস্তুও থাকিবে না, জড়ত্বও থাকিবে না। শুধু জড়ের দিক হইতে জড়ের মূল উপাদানের অন্বেষণে কোন ফল নাই। মরীচিকাতে জল ভ্রম করিও না। জড় বলিয়া কোন বিশিষ্ট পদার্থ নাই; জড়ত্ব বলিয়া কোন স্থায়ী ধর্ম্ম নাই। জগতে একটী মাত্র মূল পদার্থ রহিয়াছে—উহা তাড়িত।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

উপন্যাসে ধর্ম্মপ্রচার-বঙ্কিম বাবু।

"উপন্যাসে ধর্ম্মপ্রচার" সম্বন্ধে আমি এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিয়াছি, তাহাতে সংযমই ধর্ম্মের ভিত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। ধর্ম্ম যে কি, তাহা মোটামোটি সকলেরই জানা আছে। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান ও সমাজের শিক্ষা-হেতু কোন্‌টা ধর্ম্মকার্য্য, কোন্‌টা পাপকার্য্য, কোন্‌টা প্রশংসনীয়, কোন্‌টা নিন্দনীয়, তাহা প্রায় সকলেরই ধারণা হইয়া থাকে। ধর্ম্ম-কার্য্য কি, তাহা বুঝা কঠিন নহে, তাহা করাই কঠিন। ধর্ম্মজ্ঞানের ও কার্য্যের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করাই কঠিন। যখন পাপশক্তি, ক্ষণিক সুখলাভ বাসনার উদ্দাম উত্তেজনা হৃদয়কে বলপূর্ব্বক টানে, তখন সংযম মানুষকে রক্ষা করে; সারথি যেমন দুষ্ট অশ্বগণকে রশ্মি টানিয়া গন্তব্য পথে চালনা করে, সংযম তেমনি রিপুগণকে দমন করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত ও চালনা করে। এইজন্য আমি পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধ কয়েকটীতে সংযমের কথাই প্রধানতঃ বলিয়াছি।

কিন্তু আমাকে যে আদর্শে বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসাবলীর ধর্ম্মনীতি আলোচনা করিতে হইবে, তাহাতে ধর্ম্মের আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা আবশ্যক। এই প্রবন্ধে সেই ব্যাখ্যার কতক অংশ বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব।

ধর্ম্মের প্রথম স্তর নিষেধমূলক :—তুমি হত্যা করিবে না, চুরি করিবে না, ব্যভিচার করিবে না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না—ইত্যাদি। মুসা প্রধানতঃ এই নিষেধমূলক ধর্ম্মনীতি ইজরেয়েলদিগের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। এখানে ধর্ম্মক্ষেত্রের চৌহদ্দি "নেতি নেতি"। এই চৌহদ্দি অতিক্রম না করিয়া "ইতি ইতি" কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে হইবে। যাহাতে প্রলোভনে পড়িয়া মানুষ নিষেধের বেড়া ভাঙ্গিয়া অধর্ম্মক্ষেত্রে না যায়, তাহার জন্য সংযম আবশ্যক। খ্রীষ্ট তাঁহার প্রসিদ্ধ Sermon in the mountএ এই নিষেধমূলক ধর্ম্মনীতি আরও বিস্তৃত করিলেন। প্রলোভনের মূল চিত্ত। চিত্ত শুদ্ধ কর। কেবল যে বাহিরে পাপ করিবে না, তাহা নহে; অন্তরেও পাপের ছায়া যাহাতে না পড়ে, তাহা কর। পাপের মূল হৃদয়ে, হৃদয়ে পাপের মূল উন্মূলিত কর। তাই তিনি বলিয়াছিলেন যে,—তোমরা প্রাচীন ধর্ম্ম কথা শুনিয়াছ যে 'হত্যা করিবে না'; কিন্তু আমি বলি, যে ব্যক্তি ক্রোধ করিবে, সে ঈশ্বরের নিকট দণ্ডনীয় হইবে। যতক্ষণ কোন ব্যক্তির প্রতি তোমার ক্রোধ থাকে, অথবা যতক্ষণ তোমার প্রতি কোন ব্যক্তির ক্রোধের কারণ থাকে, ততক্ষণ ঈশ্বর তোমার পূজা লইবেন না। আবার তোমরা পুরাকালের ধর্ম্মের নীতি শুনিয়াছ যে "পরদার করিবে না"; কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কামনেত্রে কোন রমণীর প্রতি দৃষ্টি করে, সে তাহার অন্তঃকরণে ঐ দৃষ্টিপাতেই ব্যভিচার করিয়াছে।—এইরূপে খ্রীষ্ট, চিত্ত দূষিত করিবে না, এই মর্ম্মের ধর্ম্মনীতি প্রচার করিলেন। কিন্তু তিনি ইতি ইতি বিধিমূলক ধর্ম্মনীতিও প্রচার করিয়াছিলেন—নম্র হইবে, সতত ধর্ম্মপিপাসু হইবে, অন্য লোকের মধ্যে বিবাদ হইলে তাহাদিগের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিবে—ইত্যাদি। কিন্তু তিনি দেখিলেন, এইরূপ নিষেধমূলক এবং বিধিমূলক ধর্ম্মনীতি খণ্ডশঃ প্রচার করিলেই ধর্ম্মনীতি যথেষ্ট প্রচারিত হয় না। তাই তিনি এই সকল খণ্ড খণ্ড ধর্ম্মনীতিগুলি একটী সহজ সমগ্র অখণ্ড ধর্ম্মনীতিসূত্রে প্রচার করিলেন:—অন্য লোকে তোমার প্রতি যেরূপ আচরণ করিবে, তুমি ইচ্ছা কর, অন্যের প্রতিও তুমি সেইরূপ আচরণ করিবে। আমাদিগের গীতাতেও আছে, তোমার যেরূপ সুখ দুঃখ অনুভব হয়, অন্যেরও সেইরূপ হয়, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া কার্য্য করিবে—অর্থাৎ তোমার যাহাতে দুঃখ না হয় এবং যাহাতে তোমার সুখলাভ হয়, তজ্জন্য তুমি যেমন যত্ন কর, অন্যেরও যাহাতে দুঃখ না হয় এবং যাহাতে সুখলাভ হয়, তদ্বিষয়ে তেমনি যত্নবান্ হইবে। খ্রীষ্টের এবং শ্রীকৃষ্ণের এই আদেশে নিষেধ ও বিধি, দুইই নিহিত আছে:—অন্যের যাহাতে দুঃখ হয়, তাহা করিবে না, এবং অন্যে যাহাতে সুখী হয়, তাহা করিবে। তুমি আপনাকে "আমি" এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিবে না। তোমার আত্মাকে বিস্তৃত করিয়া অন্য লোকের সহিত মিলাইয়া দেও। ক্ষুদ্র "আমি"কে মহৎ আমি কর; সীমাবদ্ধ "আমি"কে অসীম কর; নিজের সুখ স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া, পরার্থপর হও; অন্যের সুখের জন্য নিজের ভোগ ত্যাগ করিতে শিক্ষা কর; সংক্ষেপে আত্মত্যাগী হও। হিন্দুদর্শনে বলিতেছে, প্রবৃত্তি মার্গত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিমার্গ অনুসরণ কর। যখন তুমি স্বার্থপর, তখন তোমার নিজের সুখই তোমার জীবনের কেন্দ্র; তোমার সমুদয়

কার্য্য এই কেন্দ্রের দিকে ছুটিতেছে, তখন তুমি কেন্দ্রানুগ শক্তির বশীভূত। যখন তুমি পরের সুখের জন্য আত্মত্যাগী হইলে, তখন তোমার কার্য্য আপনাকে, অর্থাৎ আপনার সুখ ছাড়িয়া অন্যের দিকে ধাবমান হয়। তখন তুমি কেন্দ্রাতিগ শক্তির বলে তেজস্বী, তখন আপনার সুখের জন্য যে প্রবৃত্তি, যে লালসা, তাহা পায় ঠেলিয়া নিবৃত্তি পথে যাইতে থাক। তখন তোমার সৎকর্ম্মের শক্তি এই নিবৃত্তিমার্গে তোমাকে এমন স্থানে লইয়া যাইবে, যেখানে তুমি অপরের জন্য তোমার প্রাণ, তোমার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে উদ্যত হইবে। তখন জ্ঞানী যেখানে জ্ঞান সাধনার দ্বারা এবং ভক্ত যেখানে ভক্তি সাধনা বা উপাসনা দ্বারা উপনীত হইয়াছেন, তুমিও সেখানে পঁহুছিবে। তাই, এক মহাত্মা বলিয়াছেন যে, "ভিন্ন ভিন্ন দর্শন ও ধর্ম্মের মধ্যে যতই মতভেদ থাক না কেন, যে ব্যক্তি অপরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হয়, তাহার সমক্ষে সকল মনুষ্যই ভয়-ভক্তি সহকারে দণ্ডায়মান হয়"। কেননা, তখন সে "ক্ষুদ্র আমি" নহে, তখন সে "বিরাট্ আমি"। তখন সে পরমাত্মার বলে বলীয়ান্, তখন সে, নিজেতে ও অপরে একই পরমাত্মা বিদ্যমান, তাহা প্রকাশ করিতেছে, তখন তাহার ললাটে পরমাত্মার জ্যোতিঃ নির্গত হইতে থাকে। সৎকর্ম্মের মত, পরার্থপরতার ন্যায়, এমন শিক্ষাদাতা, এমন গুরু, এমন পরিত্রাতা আর নাই। তাই, বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন "আমি ঈশ্বর-সম্বন্ধে তোমার ভিন্ন ভিন্ন মত শুনিতে চাহি না। আত্মা সম্বন্ধে জটিল মতামত আলোচনা করার দরকার নাই। সৎ হও, সৎকার্য্য কর। সৎকার্য্যই অভ্রান্ত পথপ্রদর্শকের ন্যায় তোমাকে, যাহাই সত্য হউক না, তাহাতেই লইয়া যাইবে। গীতাতে আছে, সৎকর্ম্ম করিবে, তাহার ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য করিবে না, তাহা ঈশ্বরের উপাসনা, এই বিবেচনা করিবে। কিন্তু বুদ্ধদেব ঈশ্বরের নামটীও করিলেন না। অথচ তিনি যে সৎকর্ম্মের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই পথে চলিলে চিত্ত-শুদ্ধি হইবে; চিত্তশুদ্ধি হইলে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়, তাহা খ্রীষ্ট ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ই বলিয়াছেন। সুতরাং খ্রীষ্টের, শ্রীকৃষ্ণের ও বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম একই গন্তব্য স্থানে লইয়া যায় —যেখানে মনুষ্য মমতা, বিষয় বাসনা হইতে মুক্ত হয়; দেহের মধ্যে থাকিয়াও দেহের শতগ্রন্থির বন্ধন হইতে মুক্ত হয়; যেখানে মানুষ দেহপিঞ্জরে বদ্ধ থাকিয়াও যেন সূক্ষ্ম শরীরে দেহ হইতে নির্গত হইয়া সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মার আকাশে উর্দ্ধে উঠিতে থাকে, গ্রহনক্ষত্র সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ ও অতিক্রম করিয়া আরও উর্দ্ধে গোলক বৈকুণ্ঠ অতিক্রম করিয়া, আরও উর্দ্ধে ব্রহ্মলোকে উপনীত হয়, ব্রহ্মের হৃদয়ে লীন হয়। তাই উপনিষদে আছে, আত্মা ব্রহ্মকে দেখিলে তাহার অবিদ্যা বাসনা লক্ষণ হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হয় এবং তাহার সকল কর্ম্মেরই বন্ধন ক্ষয় হইয়া যায়। এই অত্যুচ্চ অবস্থা নিষ্কাম সৎকর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসে যে ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, তাহা প্রথম প্রথম সংযম শিক্ষাই দিয়াছে; ক্রমে তাহার উপন্যাসের ধর্ম্মনীতি বিকশিত হইয়া দেবী-চৌধুরাণীর নিষ্কাম পারিবারিক ধর্ম্মচর্চ্চা, সত্যানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীর নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেম এবং জয়ন্তী সন্ন্যাসিনীর নিষ্কাম ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। সেখানে নিষেধমূলক সংযম ধর্ম্মনীতি ত আছেই,

তাহার উপর বিধিমূলক, প্রীতিমূলক, পরার্থ-পরতামূলক, আত্মবিস্মৃতি-সাধক, দেহের ও বাসনার বন্ধনমুক্তিসাধক ধর্ম্ম—মহাপ্রাণতাত্মক ধর্ম্ম আছে। সংযম হইতে আরম্ভ করিয়া বিষ্ণুপ্রাণ নিষ্কাম ধর্ম্মের ব্যাখ্যা, বঙ্কিমবাবু যাহা ক্রমে ক্রমে তাঁহার উপন্যাসাবলীতে বিকশিত করিয়াছেন — ক্ষুদ্রমতি আমি তাহার অর্থ কিরূপে বুঝাইব? যথাশক্তি চেষ্টা করিব। আর, আমি ভরসা করি, বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস পাঠকালে, ধর্ম্মনীতির দিকে পাঠকের দৃষ্টি ও চিন্তা আকর্ষণ করিলে, আমি নিজে যাহা ভাল বুঝাইতে পারি নাই, পাঠক তাহা নিজ চিন্তা ও সাধনা বলে ভাল করিয়া বুঝিবেন—এবং তাঁহাদের মধ্যে কোন যোগ্য ব্যক্তি বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস সর্ব্বজন হৃদয়ানুভূতি সদুপদেশ আমা অপেক্ষা ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করিবেন; এবং এইরূপে বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের সর্ব্বজনহৃদয়ানুভূত মনোহারিতার সহিত ধর্ম্মনীতিচর্চ্চা সংযুক্ত করিয়া ধর্ম্মনীতি প্রচারের সহায়তা করিবেন। ওঁ

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

সুপ্রভাত।

যামিনী হইল সুপ্রভাত—
উষার কাঞ্চন-রেখা,　স্বর্ণাচলে দিল দেখা,
অস্তাচলগামী নিশানাথ।
এখনো আকাশে তারা, এখনো শিশির ধারা,
টুপ্ টুপ্ হ'তেছে প্রপাত;
নব জাগরিত পাখী,　গান গাহে নীড়ে থাকি,
বিশ্ব জাগে, জয় জগন্নাথ!

এত ভোরে দুয়ারে আমার—
কে ত্যজিয়া শীত-ভীতি,　বালকণ্ঠে গায় গীতি,
ভিখারীর ঘুম নাহি আর!—
এমন ভীষণ শীতে,　কেবা যাবে ভিক্ষা দিতে,
কোন বোধ নাহি অভাগার!—
গাউক আপন মনে,　পাখী যথা গায় বনে,
মোর শক্তি নাহি উঠিবার!

শুভ সুপ্রভাত বিশ্বময়—
কিন্তু এ শীতের দাপে,　নিয়ত শরীর কাঁপে,
দেহে যেন রক্ত নাহি বয়।
দিনেও সোয়াস্তি নহে,　উত্তরের বায়ু বহে,
তপনে সে তেজঃ নাহি রয়;
নিশার কম্বল লেপে,　এত করি রাখি চেপে,
তথাপি সর্ব্বাঙ্গ শিহরয়!
কত কাজ পড়ি আছে, শীতে যদি প্রাণ বাঁচে,
সুবসন্তে খাটিব নিশ্চয়!

ভিখারী ত এ অশিষ্ট
কিন্তু কণ্ঠ বড় মিষ্ট—
পুরবীর বাঁশরী বা কার!—
গায় কি বিষাদ-সুরে,
কচি বুক ভেঙে চুরে,
বাহিরে যে সেই সুধা-সার!-
মা যশোদা কেঁদে কেঁদে,
শ্রীদামেরে সেধে সেধে,
সঁপি দেয় নীলমণি তার।

সুপ্রভাতে নিয়া বুকে,
কোটি চুমো চাঁদ মুখে—
সে "বিদায়" কি বেদনা মা'র!

৫

আদরের লেপ ছাড়ি,
উঠিলাম তাড়াতাড়ি,
দাঁড়াইনু—বারাণ্ডায় ঝুঁকে,
দেখি তার দেহ শীর্ণ,
গাত্র বস্ত্র বড় জীর্ণ,
গায় গান শীত-পাণ্ডু-মুখে!
হায়রে অভাগা ছেলে,
কি ভাবিয়া হেথা এলে,
আমি ঘরে শুয়েছিনু সুখে—
গাও বাছা! মোর মত,
হিয়াহীন আছে যত,
প্রাণ পাক্ মা যশোদা দুখে!

৬

থামিল মধুর গান,
লইবারে কিছু "দান"
চাহিল সে আকুল নয়নে;
কহিলাম "এত শীতে
কেন এলি ভিক্ষা নিতে,
ভাঁড়ারে সে যাইব কেমনে?"
বড় অপরাধী মত, মিনতি করিয়া কত,
কহিল সে বিনীত বচনে,
"বড়ই অসুখ মা'র,
কেহ আর নাই তাঁর
আমি শুধু আনত আননে!

৭

কমল নয়নে জল,
করে যেন টল মল,
ঝরি যাবে একটু আদরে;
সংযমে হৃদয় চাপি,
অালোয়ানে মুখ ঝাঁপি,
শুধিলাম "বল তার পরে"

"আমি রাঁধি আমি ঢালি,
আমি যে একেলা খালি;
নিত্য যাই ঔষধের তরে;
বেলা হ'লে কাজ পড়ে,
তাই ভিক্ষা করি ভোরে"
কহিল সে বড়ই কাতরে!

৮

"বাবা ছিল আপিসব,
ছিল পাকা বড়ী ঘর
সব গেছে—" কহে ধীরে ধীরে,
কলেজে পড়িত দাদা,
—সর্ব্বস্ব মা দিল বাঁধা—
সেও গেল জাহ্নবীর তীরে!
মহাজন করি ডিক্রি
সকলি করিল বিক্রি,
থাকি আজি আঁধার কুটীরে!—
অভাগিনী মা' আমার,
আমি শুধু আছি তাঁর!"
এবার ভাসিল আঁখি নীরে!

৯

সবি বুঝিয়াছি হায়,
হতভাগী মৃতাপ্রায়,
এ বালক কেবলি সম্বল,
ভিক্ষা মাগি ঘরে ঘরে,
পথ্যাদি সংগ্রহ করে,
এই দেয় শুষ্ক মুখে জল!
ওরে বাছা! আমি দীন,
সকল শকতি হীন,
তোরে আজি কিবা দিব বল—
নিয়ে যা'রে মাতৃভক্ত!
নারক্ত বুকের রক্ত,
প্রাণ গ'লা নয়নের জল!

১০

সহসা "অবস্থা" ভুলি,
দিনু যাহা হাতে তুলি,
সে বিস্মিত—চাহে মুখ পানে,

বলিলাম "ওরে দুষ্ট !
তোর গলা বড় মিষ্ট,
পুনঃ গা'বি বৃন্দাবনী-তানে ;
প্রতি রবিবার ভোরে,
আসিবি আমার দোরে,
বুঝিলি ত শুনিলি যা' কাণে ?"

সে যুড়ি দু'খানি কর,
ঠেকায়ে ললাট-পর,
গেল চলি মাতৃ সন্নিধানে !

১১

ত্রিযামা হইল সুপ্রভাত ;
শিব দুর্গা অন্নপূর্ণা !　　কর বসুমতী-পূর্ণা,
বিশ্ব জা'গ স্মরি বিশ্বনাথ,
আজি মোর বড় সুপ্রভাত।

শ্রীবীরকুমার-বধ রচয়িত্রী।

সঙ্গণিকা।

(২৭)

স্বাধীনচেতা অশেষগুণান্বিত ৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।—জন্ম—১২৫৪ সাল, ৫ই শ্রাবণ, নলকুঁড়ায়। মৃত্যু—৭ই পৌষ, শুক্রবার, ভবানীপুরে।

৭ই পৌষ, (১৩২৩) এদেশের পক্ষে বড় দুর্দ্দিন গিয়াছে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীযুক্ত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার বাড়ীর নিকটের ট্রাম ধরিবার সময়, চালকের অসতর্কতায় গাড়ীর নীচে পড়িয়া যান, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। এরূপ আকস্মিক বিপদের সংবাদে কলিকাতা সহর বিষাদে পূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিতেছে, কেহ তাহার প্রতিবিধানে মনোযোগী হইতেছেন না, ইহা গভীর দুঃখের বিষয়। চণ্ডীচরণ সামান্য অবস্থা হইতে নিজের শক্তিবলে অসাধারণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যে অবিনশ্বর দেবোপম চরিত্র লাভ করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণে ও মননে পুণ্য সঞ্চয় হয়। তিনি সামান্য অবস্থা হইতে স্বীয় প্রতিভাবলে যে উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা অনুধাবনে আশার বীজ হৃদয়ে ফলবতী হয়। তিনি ধনী ছিলেন না, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ছিলেন না, কিন্তু তিনি হৃদয়বলে মহা-মহীয়ান পুরুষ ছিলেন। তিনি গভীর জ্ঞানে মানবসমাজে অপরাজিত প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম ছিলেন, কিন্তু তিনি ব্রাহ্ম হইয়াও সাধনাবলে হিন্দুত্বের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি সুলেখক ও সুবক্তা ছিলেন। তাঁহার "বিদ্যাসাগর জীবনী" প্রভৃতি পুস্তক অমরগ্রন্থ। তিনি যখন প্রকাশ্য সভায় দাঁড়াইয়া কোন কথা বলিতেন, তখন মন্ত্রমুগ্ধবৎ লোকেরা তাহা শুনিত। কিন্তু সে বিশেষত্বে তিনি অমরত্ব লাভ করেন নাই, তিনি অদম্য সাহসে অসীম শক্তি—মহা চরিত্র-রত্ন লাভ করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন,—সেই চরিত্রের আদর্শ তাঁহাকে চিরজীবিত করিয়া রাখিবে। বলিয়াছি, তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন, কিন্তু অন্ধতা, গণ্ডি ভক্তি, দল-মাহাত্ম্য তাঁহাকে সাম্প্রদায়িকতার পূতি-গন্ধে নিমজ্জিত করিতে পারে নাই, তিনি সিংহবিক্রমে দল-গণ্ডির সান্ত বা সীমাবদ্ধ

অবস্থা হইতে চির মুক্তি লাভ করিয়া হৃদয়ের প্রশস্ততা, চরিত্রের মাধুর্য্য, এবং জ্ঞানের বিশালতায় সর্ব্ব শ্রেণীর লোককে মোহিত করিতে সক্ষম হইতেন। গণ্ডি-ভক্তি থাকিলে তিনি হিন্দুসমাজ বা ব্রাহ্মসমাজে অদ্বিতীয় ব্যক্তিরূপে গণ্য হইতে পারিতেন। তিনি গণ্ডি-মাহাত্ম্য ভুলিয়া সার্ব্বভৌমিকত্বে পৌছিয়াছিলেন। যিনি তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন, তিনিই মোহিত হইতেন। তদীয় পুণ্য জীবনের পুণ্য কাহিনী শ্রবণে সকলেরই আগ্রহ হইতে পারে, কিন্তু আমরা শোক-দগ্ধ, আজ তাহা লিপিবদ্ধ করিতে অক্ষম। তিনি ইন্দুপ্রকাশের ন্যায় কৃতী সন্তানের আকস্মিক মৃত্যুতে ম্রিয়মাণ হইয়া অর্দ্ধমৃতবৎ ছিলেন,—অবশেষে তাঁহার সেই গুণধর্ম্মী পুত্রের ন্যায় তাঁহারও আকস্মিক মৃত্যু হইল। ইহা বিধাতার দুরবগাহ বিধান। সেই বিধানে আমরা আত্মসমর্পন করিয়া আজ বিদায় গ্রহণ করিলাম, তিনি অবসর দিলে, ভবিষ্যতে আরো কথা শুনাইব।

(২৮)

নীরব-সাধক, প্রাতঃস্মরণীয় ৺গুরুচরণ মহলানবীশ। জন্ম—১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ, ঢাকার অধীন পঞ্চসার গ্রামে। মৃত্যু—১১ই পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩২৩, কলিকাতায়।

মানব শ্রেয়ের ও প্রেয়ের সংগ্রামে সদা পর্য্যুদস্ত,—ভাল মন্দ তদীয় জীবনের অমোঘ চিহ্ন। যদি বল, অমুক ব্যক্তি শুধুই ভাল, মিথ্যা বলা হইবে; যদি বল, অমুক ব্যক্তি শুধুই মন্দ—আরো মিথ্যা বলা হইবে। এমন মানুষ নাই, যাহার ভিতরে ভাল নাই, এমন মানুষ নাই, যাহার ভিতর মন্দ নাই। ভাল মন্দে জীবন গঠিত—দেবত্ব এবং অসুরত্বে মানবজীবন পূর্ণ। আমরা সেই সেই জীবনেরই গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকি, অসুরত্ব জয় করিয়া যাঁহারা পুণ্যময় দেবত্বে উন্নীত হইয়াছিলেন। আদর্শ-জীবন পুণ্যশ্লোক গুরুচরণ মহলানবীশ সেই শ্রেণীর লোক। হঠাৎ তাঁহার তিরোধানে আমরা যারপরনাই বেদনা পাইয়াছি, পাড়া যেন শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

ছাবঘাটীর-মুখ হইতে মণ্ডিলপুর হইয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত যে নদী প্রবাহিত হইত, তাহাকে লোকেরা ভাগীরথী বলে, আমরা বলি, উহা সলিল নয়, উহা ভক্তি-বিশ্বাসের তরলবাহিনী। উহা যেন শ্রীচৈতন্য, অদ্বৈত গোস্বামী, রামকৃষ্ণ পরমহংস, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ভক্ত কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, উমেশচন্দ্র, শিবনাথ প্রভৃতি মহাজনবর্গের এবং কালীঘাটের শাক্ত ধর্ম্মের বিশ্বাস-ভক্তির প্রবল বাহিনী। এই বাহিনীতে অবগাহন করিয়া পূতজীবন লাভ করিবার জন্য যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে কলিকাতা আগমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে গুরুচরণ অন্যতর। দালালের সাহায্যে মহর্ষির সঙ্গ-লাভ-স্পৃহা তদীয় জীবনের আদি-বিশেষত্ব। আসিলেন ত আসিলেন, আসিয়া সুদীর্ঘকাল ঘোর দারিদ্র্য-সংগ্রামে প্রপীড়িত হইলেন, কিন্তু ভক্তি বিশ্বাসের মাধুর্য্য ভুলিতে পারিলেন না। থাকিতে, থাকিতে, থাকিতে — অবগাহন করিতে, করিতে, করিতে, তিনি বিশ্বাস-ভক্তির প্রকট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে যে নিন্দা-বিদ্বেষ, অত্যাচার-আন্দোলন-ফেউ লাগিয়াছিল, তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইল, গুরুচরণ অবিচলিত-চিত্তে, অথবা অদম্য স্পৃহায়, অথবা অসংযত বাসনায় বীরের ন্যায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যেমন ছিলেন, সংস্কাররাজ্যে দুর্গামোহন দুর্দ্ধর্ষ এবং অপরাজিত, তেমনই ছিলেন গুরুচরণ। দুষ্টের ভ্রুকুটীভঙ্গি, নিন্দু-

কের নিন্দাবাণ, বিদ্বেষীর বিদ্বেষ, তদুপরি দারিদ্র্যের কশাঘাত সহ্য করিতে করিতে দেহের মলিনতা, মনের কালিমা যেন সহসা অন্তর্হিত হইল—দেবোপম ভক্তি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। আমরা ধীরে ধীরে, পার্শ্বে পার্শ্বে থাকিয়া বিধাতার লীলামাধুর্য্য দেখিয়া মোহিত হইতে লাগিলাম। লোকেরা বলে, তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সময় কার্য্যকরী শক্তির যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। আমরা যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য-বিভাগের কার্য্যভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ করিলাম, সেই সময় হইতে, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত দরিদ্রের সেবা করিয়া তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন, তাহা তুলনা-রহিত। যে দেশে দয়ার অবতার বিদ্যাসাগর ছিলেন, মহারাণী স্বর্ণময়ী জীবনধারণ করিয়াছিলেন, দুর্গামোহন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে দেশে অন্য ক্ষেত্রে দয়ার দৃষ্টান্তের কথা না শুনিলেও চলে। তিনি যে কর্ম্মী ছিলেন, সে কথা অগ্রাহ্য করিতেছি না, কিন্তু এ সকল কর্ম্মের বিশেষত্বে গুরুচরণ অদ্বিতীয় বা অসাধারণ নহেন। সামান্য মানুষ নীরব সাধনা-বলে যে অমরত্ব লাভ করিতে পারে, তিনি তাহারই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনের শত শত মহত্ত্বের কথা জানি, বলিতে বসিলে শীঘ্র তাহা শেষ হইবার নয়। তাঁহার সুমধুর চরিত্রের কত কত ঘটনার দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি, তাহা দেখাইতে বসিলে শক্তিতে কুলাইয়া উঠিবার নয়। আমরা তাহা করিব না, তজ্জন্য অন্য বহু অসাধারণ ব্যক্তি আছেন। আমরা কেবল এই কথা বলিতে চাহি, তিনি মহর্ষির সংস্পর্শ লাভের পর ক্রমে ক্রমে নীরব সাধনাবলে চরিত্রের অটলত্ব লাভ করিলেন—সাধনায়, নিষ্ঠায় তিনি যেন অক্ষয় কৈবল্য লাভ করিতে লাগিলেন। কোন কোন মহাপুরুষকে জানি, তাঁহারা নিজের গুণ-কীর্ত্তনে সদা ব্যস্ত,—তজ্জন্য কত অর্থব্যয়ই করিতেছেন, কিন্তু গুরুচরণ আত্মপ্রশংসা শুনিলে চমকিয়া উঠিতেন। সিটী কলেজ, ব্রাহ্ম বালিকা ও বালক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণে তিনি যে অমানুষী শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, সে কথা যদি কেহ তাঁহাকে বলিত, লজ্জায় তাঁহার বদন মলিন হইয়া যাইত, তিনি অন্যের মহত্ত্বের কথা ও অন্য প্রকারের শত শত কথা বলিয়া তাহা উড়াইয়া দিতেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তিনি অকৃত্রিম সেবক ও সহায় ছিলেন, সে কথা বলিলেও লজ্জিত হইতেন। এমন যশে নিস্পৃহা, সম্মানে বীতরাগ, কার্য্যে নিরাড়ম্বর আমরা আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তিনি যে কাজে হাত দিতেন, তাহা কখনও ছাড়িতেন না, কিন্তু তাহার কৃতিত্ব বা স্বামীত্ব গ্রহণে তিনি সদা কুণ্ঠিত হইতেন। তিনি আত্মত্যাগী নীরব সাধক;—নিষ্ঠায় এবং সাধনায় অটলত্ব রাখিয়া দেহরক্ষা করিয়াছেন। ভক্তি বিশ্বাস তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল—তাহারই জন্য কলিকাতা আসিয়াছিলেন, তাহারই আদর্শ রক্ষা করিয়া বীরদর্পে পুণ্যময় কৈবল্যে আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। জ্ঞানে বিজ্ঞানে তিনি বড় ছিলেন, এমন কথা আমরা বলি না, প্রতিভা এবং বিচক্ষণতায় তিনি প্রধান ছিলেন, সে কথাও বলি না, কিন্তু নিষ্ঠায়, সাধনায়, নীরবতায়, নিরাড়ম্বরে, নিস্পৃহায় এবং সংযমে তিনি আত্মত্যাগী মহাপুরুষ ছিলেন, একথা সর্ব্ববাদীসম্মত কথা। তাঁহার আবির্ভাবে বঙ্গভূমি ধন্য হইয়াছে,

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। বিধাতার মঙ্গলকার্য্য তাঁহার জীবনে সংসাধিত হইয়াছে—তিনি অমরত্ব লাভ করিয়া কৈবল্যে উন্নীত হইয়াছেন। তাঁহার বংশ ধন্য, কুল পবিত্র, পরিবার মহীয়ান হইয়াছে। জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৩৬। কর্ম্মক্ষেত্র। ক্ষুদ্র পুস্তিকা। শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য /০। এই পুস্তিকায় অনেক কাজের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুচিন্তিত প্রবন্ধ।

৩৭। ধর্ম্মজীবন। ডাক্তার শ্রীধর্ম্মদাস বসু প্রণীত, মূল্য ১৷৷০। এই পুস্তকে মানবজীবন, ধর্ম্মজীবন, ধর্ম্ম, ধর্ম্মের আবশ্যকতা ও স্থায়িত্ব, ধর্ম্মের উপকারিতা ও প্রাধান্য, বিশ্বাস, ধর্ম্মবিশ্বাস, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের হেতু, ঈশ্বরের স্বরূপ, উপাসনা, প্রার্থনা, আত্মার অমরত্ব ও পরজন্ম, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মত, হিন্দু শাস্ত্রের মত, ব্রাহ্মসমাজের মত প্রভৃতি প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। প্রত্যেক বিষয়ে গভীর গবেষণা এবং আধ্যাত্মিক জীবনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পুণ্যময় জীবনের পুণ্য কথা পড়িতে পড়িতে আমরা তন্ময় হইয়া গিয়াছি, কত যে উপকার পাইয়াছি, ভাষায় তাহা ব্যক্ত করার সাধ্য নাই। ইমিটেসন অফ্ ক্রাইষ্ট, গীতা প্রভৃতি গ্রন্থের ন্যায় সর্ব্বত্র এ গ্রন্থের আদর পাওয়া উচিত। এই একখানি পুস্তক পড়িলে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ পুস্তকের সারতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। এই গ্রন্থখানির সর্ব্বত্র আদর হউক।

৩৮। তর্পণ। শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত, মূল্য ৷৷০। এদেশের প্রায় সকল মহাপুরুষের প্রতি গ্রন্থকার ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন। এরূপ নিরপেক্ষ গ্রন্থ এদেশে আর প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার যে অসাম্প্রদায়িকতা, উদারতা এবং নিরপেক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। তাঁহার তুলনা কেবল তিনিই। অন্যের মধ্যে যিনি দেখিতে পান, তিনি মানব-দেহে দেবত্ব পাইয়াছেন। নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়কে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেছি।

পুস্তকখানিতে যে অসাধারণ কবিত্ব ফুটিয়াছে, তাহাও তুলনা-রহিত। তিনি যেন দ্বিতীয় বিহারীলাল বা নিত্যকৃষ্ণ। তাঁহার লেখনীতে দেবতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।

৩৯। দ্বিজেন্দ্রলাল। শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত, মূল্য ১৷৷০। নবকৃষ্ণ বাবু দ্বিজেন্দ্রভক্ত, কিন্তু অন্য কবিদের বিরোধী নহেন। এই পুস্তকে অন্যান্য ব্যক্তিগণের ও সংবাদপত্রের মতই অধিক গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে মহাত্মার জীবন-বিশ্লেষণে কিছু অন্তরায় ঘটিয়া থাকিলেও, আন্তরিকতার আতিশয্যে গ্রন্থখানি বড়ই উপাদেয় হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় না। গ্রন্থকার দোষান্ধ নহেন, তিনি গ্রন্থকারের দোষেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কৃতিত্বের সহিত প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, দ্বিজেন্দ্রলাল নাস্তিক ছিলেন না। নবকৃষ্ণবাবুর এই জীবনালেখ্যের পরও আমরা দেবকুমারের গ্রন্থ পাঠের জন্য উৎকণ্ঠিত রহিলাম। সকল পিপাসার নিবৃত্তি হইয়াছে বলিতে পারি না। কবির জীবন অমৃতের সমান, যত সম্ভোগ করা যায়, ততই উপকার হয়। আমরা এই গ্রন্থ পড়িয়া যে উপকার পাইয়াছি, তজ্জন্য গ্রন্থকারের নিকট চিরঋণী রহিলাম। তাঁহার উদার হৃদয় আরো উদার হউক।

বেদান্ত দর্শন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

চেতন, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম,—এই জড় জগতের কারণ। ব্রহ্ম এই জগতের 'কারণ'; এই জগৎ ব্রহ্মের 'কার্য্য'। ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে, কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ আছে। আমরা এতদিন বেদান্তের এই সিদ্ধান্তেরই আলোচনা করিয়াছি। এই আলোচনা-প্রসঙ্গে, ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে যে সকল আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে, সেই সকল আপত্তিরও খণ্ডন করিয়াছি।

সম্প্রতি সাংখ্য-মত ও ন্যায়-মত খণ্ডন করিয়া, চেতন ব্রহ্মকে জগতের মূল কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইবে। সাংখ্যকার অচেতন প্রকৃতিকে এবং ন্যায়কার পরমাণুকে,—জড় জগতের মূলে দেখিতে পাইয়াছেন। ইহাঁরা চেতন পুরুষ ও চেতন আত্মা স্বীকার করেন বটে; কিন্তু ইহাঁরা প্রকৃতিকে ও পরমাণুকে স্বতন্ত্র, স্বাধীন বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাঁদের এই সিদ্ধান্ত যুক্তি-দ্বারা খণ্ডন করা আবশ্যক। এখন আমরা তাহাই প্রদর্শন করিব। প্রথমতঃ, সাংখ্যমত আলোচিত হইবে।

কেবল তর্কযুক্তিদ্বারা ব্রহ্মনির্ণয় করা বেদান্তদর্শনের উদ্দেশ্য নহে। বেদান্ত বা উপনিষদ্ গ্রন্থ সমূহে যে সকল বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে, ঐ বাক্য গুলির যে একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়—ব্রহ্মচৈতন্য, তাহা প্রদর্শন করাই বেদান্ত দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমরা ইতিপূর্ব্বে, উপনিষদ্ বাক্য দ্বারা নিজপক্ষ সংস্থাপন করিয়াছি। উহাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু তথাপি, উপনিষদ্-কথিত সিদ্ধান্তের প্রতিকূল সাংখ্যমত ও কণাদাদির মত খণ্ডন করিতে পারিলে, নিজের পক্ষটী সুদৃঢ় হইয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে পরমত খণ্ডন করারও আবশ্যকতা আছে। সাংখ্যমতেও মুক্তি-লাভের কথা ও উপায় বর্ণিত আছে। কেহ যদি ঐ সকল মতকে মুক্তিলাভের প্রকৃত পথ বলিয়া গ্রহণ করিয়া বসে, এই নিমিত্তও, ঐ সকল মত যে দোষ-দুষ্ট, তাহা প্রদর্শন করা আবশ্যক। এখন, যুক্তিদ্বারা সাংখ্যাদি মতের অসারতা প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। সাংখ্যকারের প্রণালী এইরূপ—

কতকগুলি বিশেষ বিশেষ গুণ ও ধর্ম্মাদি বিশিষ্ট বস্তুর প্রত্যেকটীতে যদি কোন সাধারণ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝা যায় যে, ঐ সাধারণ লক্ষণটী—'কারণের' লক্ষণ। কারণের লক্ষণটীই, বিশেষ বিশেষ 'কার্য্যবর্গের' মধ্যে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ঘট, শরাব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুগুলির প্রত্যেকটীতেই মৃত্তিকাকে অনুস্যূত দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং মৃত্তিকাকেই উহাদের সাধারণ 'কারণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এইরূপ, যাবতীয় পদার্থেই সুখ-দুঃখ জাড্য অনুগত হইয়া রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব, সুখ-দুঃখ-জাড্যই তাবৎ বস্তুর 'কারণ'। সাংখ্য কল্পিত প্রকৃতি নামক বস্তুটী অচেতন এবং সুখদুঃখ-জাড্যাত্মক। এই প্রকৃতি, চেতন পুরুষবর্গের প্রয়োজন-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে, আপনি স্বাধীন ভাবে বিবিধ বিকারে পরিণত হইয়াছে। সকল বস্তুই পরিমিত,

পরিচ্ছিন্ন। এই পরিমিত গুণ বা ধর্ম্মদ্বারাও প্রকৃতি নামক পদার্থটীর অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সাংখ্যকার এইরূপ অনুমানের বলে, জগতের মূলে প্রকৃতিকে স্থাপন করিয়াছেন এবং জড় প্রকৃতিকেই জড়জগতের মূল 'কারণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বেদান্তদর্শন, এই স্বাধীন জড় প্রকৃতিকে মূলকারণ বলিতে পারেন নাই। বেদান্তের যুক্তি এই যে, চেতন দ্বারা পরিচালিত ও প্রবর্ত্তিত না হইলে, জড় কখনই আপনা আপনি কোন বিশেষ প্রয়োজন সাধনের অনুকূল বিশেষ আকার ধারণ করিতে পারে না। এই যে আমাদের দেহ ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গুলি আপন আপন কার্য্যসিদ্ধির অনুকূল আকারে পরিণত হইয়াছে, ইহাদের মূলে চেতন আত্মার প্রেরণা ও ক্রিয়া রহিয়াছে। ইহারা স্বয়ং আপনা আপনি কখনই একটা একটা বিশেষ প্রয়োজনের অনুকূল আকার ধারণ করিতে পারিত না। এই যে জগতে অগণিত পদার্থগুলি, পরস্পর বিবিধ সম্বন্ধে দৃঢ় সম্বন্ধভাবে কার্য্য করিতেছে, এই যে ইহারা আপন আপন প্রয়োজন ও তাবৎ বস্তুর প্রয়োজন কেমন সুশৃঙ্খলতার সহিত সুসম্পন্ন করিবার উপযোগী আকার ধারণ করিয়াছে,—একটী চেতন চালক না থাকিলে, উহাদের পরস্পর প্রয়োজনের অভিজ্ঞ একজন প্রবর্ত্তক না থাকিলে, উহারা কখনই, ঐ ঐ বিশেষ আকার গ্রহণ করিতে পারিত না।

মৃত্তিকা হইতে ঘট উৎপন্ন হয় সত্য, কিন্তু কুম্ভকারই ত ঘটের আকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। এস্থলে, কুম্ভকারকে ত্যাগ করিয়া, কেবল মাত্র মৃত্তিকাকেই ঘট নির্ম্মাণের 'কারণ' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে চলিবে কেন? ব্রহ্মচৈতন্যকে একেবারে ছাড়িয়া দিয়া, কেবল জড় প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে, চলিবে কেন? অতএব, অচেতনকে জগতের মূল কারণ বলা যায় না। অচেতন কখনই স্বয়ং প্রয়োজন-সিদ্ধির উপযোগী আকার দিতে পারে না।

সাংখ্যকার, প্রত্যেক বস্তুতে সুখদুঃখমোহকে অনুগত বলিয়া দেখিতে পাইয়াছেন। কিন্তু সুখদুঃখাদি ত বাহ্যবস্তুতে থাকে না; উহারা অন্তরে অনুভূত হয়। বাহ্যবস্তুই ত, অন্তরে সুখদুঃখাদি জন্মাইয়া দেয়। এমনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, চিত্তের অবস্থার তারতম্য-বশতঃ, একই বাহ্যবস্তু সুখদুঃখাদি বিবিধ ভাবের উৎপাদন করিয়া দেয়। সুতরাং, সুখদুঃখাদি কখনই বাহ্যবস্তুতে নিবদ্ধ নহে; উহারা চিত্তের ধর্ম্ম। এই সকল হেতুতে বেদান্তদর্শন, জড়প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই।

আর এক কথা। আপন আপন প্রয়োজন ও পরস্পরের প্রয়োজন সিদ্ধির উপযোগী আকার গ্রহণের কথা ছাড়িয়া দিলেও, প্রকৃতিকে স্বতন্ত্রভাবে জগতের কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না। সত্ত্ব, রজ ও তমঃ—এই তিন জাতীয় মূল বস্তুর সাম্যাবস্থাকে সাংখ্যকার প্রকৃতি শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জাতীয় বস্তুগুলি যখন পরস্পর তুল্যবল হইয়া অবস্থান করে (Equillibrium), তাহাই প্রকৃতি। সৃষ্টিকালে, এই অবস্থার বিচ্যুতি ঘটে। তখন কোন একটীর বল বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই যে তুল্যবলের বিচ্যুতি, এই যে একটা বিশেষ ক্রিয়া করিবার প্রবৃত্তি, এই যে জগতের আকার ধারণের উন্মুখিতা,—ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? কে ইহাদিগের মধ্যে এই প্রবৃত্তি

উৎপাদন করিল? আপনা আপনি কেন ইহাদের শক্তিবৃদ্ধি উপস্থিত হইল? কে ইহাদের সাম্যাবস্থা ভাঙ্গিয়া দিল? ইহাদের মধ্যে এমন ত কিছু ছিল না, যাহা এই গতিকে উৎপন্ন করিবে? ইহা নিশ্চয়ই তবে চেতন দ্বারা উৎপন্ন। নতুবা উহা আপনা আপনি কখনই উৎপন্ন হইতে পারিত না। মৃত্তিকাদিতেও ইহা দৃষ্ট হয়। কুম্ভকারই ত মৃত্তিকায় ঘটাকার ধারণের ক্রিয়া উৎপাদন করে; মৃত্তিকা স্বয়ং আপনা-আপনি ঐ ক্রিয়া জন্মায় না। অতএব, সৃষ্টিকালে, প্রকৃতিতে এই যে গতি উৎপন্ন হইয়াছিল, তদ্দ্বারা চৈতন্যেরই মূল ক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং কেবল জড় প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না।

এ স্থলে একটা প্রশ্ন আসিতে পারে যে, এজগতে জড়কে ছাড়িয়া, কেবল চৈতন্য কোথায় দেখিয়াছ? সুতরাং ক্রিয়া কাহার? জড়ে যে ক্রিয়া দৃষ্ট হয়, উহা জড়ের, না চেতনের? জড়ছাড়া যখন চৈতন্যকে দেখা যায় না, তখন ক্রিয়া যে জড় হইতেই উৎপন্ন হয় নাই, ইহা তোমাকে কে বলিল? দেহাদিতেই ক্রিয়া দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু চৈতন্য বিশিষ্ট দেহাদি ছাড়া ত ক্রিয়া দেখা যায় না। অতএব, চেতন হইতেই জড়ে ক্রিয়া আসিয়াছে,—ইহা বলাই সুসঙ্গত। কেন না, চৈতন্য চলিয়া গেলে ত মৃত দেহাদিতে ঐ সকল ক্রিয়া দেখা যায় না। কাষ্ঠাদি জড়-দ্রব্যের আশ্রয়ে অগ্নির তাপ ও আলোক প্রকাশ পায়, কেবল অগ্নিতে উহা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু অগ্নি না হইলে, কেবল কাষ্ঠেত তাপ ও আলোক আসিতে পারে না। অতএব, জড়ে ক্রিয়া দর্শনে, জড়মধ্যস্থ চৈতন্যের অস্তিত্ব কল্পনা করাই সঙ্গত।

যদি বল যে দেহাদিতে সংযুক্ত আত্মা ত নির্ব্বিকার, জ্ঞান স্বরূপ। যাহা কেবল মাত্র জ্ঞান স্বরূপ, তাহা ত সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়া-রহিত; অতএব চেতন আত্মা কিরূপে দেহাদির প্রবর্ত্তক হইতে পারে? ইহার উত্তর দৃষ্টান্ত দ্বারা দেওয়া যাইতে পারে। অয়স্কান্ত মণি নিজে প্রবৃত্তি-শূন্য; কিন্তু তথাপি উহা লৌহের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। এইরূপে, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি আত্মচৈতন্য, নিজে প্রবৃত্তিরহিত হইয়াও, সর্ব্বপদার্থের প্রেরক হইবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কথা কি আছে? কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা ধরিয়া, যতক্ষণ না আমাদের বুদ্ধি, আদি মূলকারণে উপস্থিত হয়, ততক্ষণ বুদ্ধি নিবৃত্ত হইতে চায় না। জড়ীয় কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার মধ্যে, কাহাকেও আদিম, স্বাধীন কারণ বলা যায় না। কেন না, যাহা একের কারণ, তাহা আবার অপরের কার্য্য। এইরূপে প্রত্যেক কারণটী আবার কার্য্যরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। অতএব, এই জড়ীয় কারণ-পরম্পরার শেষ সীমায়, ইহাদের অতীত, ইহাদের হইতে স্বতন্ত্র, স্বাধীন, চেতন মূলকারণে গিয়া, আমাদের বুদ্ধি স্থির হইয়া দাঁড়ায়। পরস্পর সাপেক্ষ (Mutually dependent) পদার্থ সকল, ইহাদের হইতে স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ, স্বাধীন বস্তুকে অপেক্ষা করে এবং উহারই আশ্রয়ে বিধৃত হইয়া ক্রিয়া করে। সুতরাং জড়ীয় কার্য্য-কারণ-পরম্পরার মূলে, একটী স্বাধীন চেতন-কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে *। সর্ব্বজ্ঞ,

* জড়ীয় কার্য্যকারণ-পরম্পরার মধ্যে, যাহাকে আমরা 'কারণ' বলি, প্রকৃতপক্ষে উহা 'বিকার' মাত্র। উহাদের কেহই আদি কারণ হইতে পারে না। যেটী আদি কারণ সেটী নির্ব্বিশেষ—নির্ব্বিকার; নতুবা উহা বিকারী হইয়া উঠে। যেটী আদি কারণ, যেটী পরম-

সর্ব্বশক্তি, চেতন ঈশ্বরকে মায়ার প্রবর্ত্তক বলিতেই হইবে। এই চেতন হইতেই মায়ার ক্রিয়া আসিয়াছে। মায়া—চেতনেরই শক্তি মাত্র, স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে। ইহাই জড়ীয় সকল বিকারে অনুস্যুত হইয়া আসিয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, এম্-এ।

বাণী।

(৬ই মাঘ, ১৩২৩, আনন্দ আশ্রমের উৎসবে পঠিত)

আনন্দ-আশ্রমের এবারকার উৎসব, আনন্দ এবং নিরানন্দের উৎসব। একদিকে "প্রমিতি"র আবির্ভাব, অন্য দিকে রসিকলালের স্বর্গারোহণ। ইহকাল এবং পরকাল যেন এক সূত্রে গ্রথিত,—অথবা আসক্তি এবং বৈরাগ্যের মহা-মহিমান্বিত মিলন একত্রে জড়িত। পীড়িত রসিকলালকে যখন আনন্দ-আশ্রম সেবা ও শুশ্রূষার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "সবে সহচরী, বাহু দুটী ধরি, বাঁধিও তমাল ডালে! আনন্দ-আশ্রম আমার পক্ষে সেই তমাল ডাল।" তাঁহার মুখে যখন এই নিদারুণ কথা শুনিয়াছিলাম, তখন মনে করিতে পারিয়াছিলাম না যে, সত্যই তিনি আনন্দ-আশ্রমে দেহ ত্যাগ করিবেন। অপরাজিতা, সতীশচন্দ্র, বিদ্যুল্লতা, ত্রিপুরাচরণ ও প্রণব আনন্দ-আশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রসিকলালের ন্যায় কেহই ভবিষ্যৎ বাণী প্রকাশ করিয়া যান নাই; তিনি বলিয়াছিলেন, "আনন্দ-আশ্রম আমার শেষ গতি,—অথবা মুক্তির সোপান।" দেহত্যাগই যে মুক্তি, একথার তিনি স্পষ্ট আভাস দিয়াছিলেন। কমলকামিনী আনন্দ-আশ্রমের দেবী, তিনি পুরুষোত্তমে দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন, অদেহী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আনন্দ-আশ্রমে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। বিরজাও আনন্দ-আশ্রমের দেবী, বিরজা, রসিকলালের অল্প পূর্ব্বে গিরিধিতে দেহ রাখিয়া অদেহী মূর্ত্তিতে আনন্দ-আশ্রমে আজ আবির্ভূতা। তাহার পর—চণ্ডী-

---

কারণ, তাহাকে জড়ীয় কার্য্য-কারণ-পরম্পরার মধ্যে খুঁজিলে পাওয়া যাইবে না। কেন না, জড়ীয় কার্য্য-কারণ-পরম্পরার মধ্যে কেহই প্রকৃত কারণ নহে। যাহা একের কারণ, তাহা অন্যের কার্য্য। অতএব যাহা আদি কারণ, তাহা এই জড়ীয় কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার অতীত। উহার আর কোনই পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ নাই; কেন না উহা কাহারও বিকার বা কার্য্য নহে। ইহা সর্ব্বাতীত এবং স্বতঃসিদ্ধ (Self-existent and independent)। জড়ীয় কার্য্যমাত্রেই উহার পূর্ব্বগত কারণদ্বারা উৎপন্ন; উহার কেহই প্রকৃত কারণ নহে। যতক্ষণ বুদ্ধি না এই স্বতঃসিদ্ধ আদিকারণে উপস্থিত হয়, ততক্ষণ উহা স্থিরতা লাভ করিতে পারে না। জড়ীয় কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলার কোনটীই স্বাধীন স্বতঃসিদ্ধ নহে; উহাদের একটী অন্যটীর অধীন, সাপেক্ষ। কিন্তু আদিকারণটী স্বাধীন ও অন্যনিরপেক্ষ। ইহা অসীম, অনন্ত। কেননা, যদি ইহাকে অনন্ত না বল, তবে অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয়, সে বস্তু ইহাকে সান্ত করে। এবং সেই বস্তুকেই অনন্ত বলিতে হয় ও উহাকেই আদিকারণ বলিতে হয়। এরূপ কল্পনায়, কাহাকেই আদিকারণ বলা চলে না। অতএব, আদিকারণ সান্ত নহে, উহা অনন্ত। আদিকারণের সিদ্ধি অন্যের উপর নির্ভর করে, একথাও বলা চলে না। কেননা, যাহার উপর নির্ভর করে, তাহাকেই তবে আদিকারণ বলিতে হয়। অতএব, আদিকারণটী স্বতঃই স্বতঃসিদ্ধ। সকল বস্তুর অভাবেও, ইহার অস্তিত্ব নিত্য বর্ত্তমান।

চরণের আকস্মিক তিরোধান, পাড়ার শিরোমণি গুরুচরণের দেহরক্ষা, তৎপর এই পাড়ার জয়শঙ্করের স্বর্গারোহণ। এ সকলই আনন্দ-আশ্রমের পক্ষে শোকের নিদারুণ কশাঘাত। আনন্দ-আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইতে তাঁহারা স্নেহ চক্ষে ইহাকে দেখিতেন। গুরুচরণকে পাড়ার সম্মুখে আদর্শরূপে রাখিয়া আমরা সেবা করিতাম। আজ তাঁহাদিগকে হারাইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিতেছি ;—এই ঘোর আঁধারের মধ্যে "প্রমিতি" জ্যোতি রূপে যেন ফুটিতেছেন। বিধাতার ধ্রুবজ্ঞান প্রমিতির ললাটে অঙ্কিত দেখিয়া আজ ইহকাল এবং পরকাল,—আনন্দ এবং নিরানন্দ, আসক্তি এবং বৈরাগ্যকে প্রণাম করিতেছি। তিনি আজ আনন্দ এবং নিরানন্দ রূপে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত।

জনক বলেন, সংসারই মুক্তির সোপান, মহাদেব বলেন, শ্মশানই মুক্তির পথ। জনক সংসার সাধন করিলেন, কিন্তু আসক্তিতে মজিলেন না,—মায়া-অগ্নিতে যখন সব পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইতেছে, তখনও তিনি নির্ব্বিকার-চিত্ত। আর হর যখন শব-সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলেন, তখন গৌরীর আসক্তিতে মজিলেন। জনকের সংসার-সাধন, বৈরাগ্যের মহা-সাধন ; হরের শ্মশান-সাধন, আসক্তির মহা-সাধন। আজ আনন্দ-আশ্রমের উৎসবের দিনে আসক্তি এবং বৈরাগ্যকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেছি।

আমি কখনও গৈরিকধারী হই নাই, কিন্তু আজন্ম কঠোর সন্ন্যাসী। বাল্যে আমার আত্মীয় আত্মীয়ারা বড়ই ভয় পাইতেন যে আমি সংসার পাতিব না, গৃহে আবদ্ধ হইব না। কিন্তু বিধাতার বিধানে যখন কমলকামিনী আসক্তিরূপে সম্মুখে আসিলেন, আমি আসক্তিকে বরণ করিয়া লইলাম। আমার কি মহা-পতন হইল! কিন্তু আসক্তির পথে চলিয়াও সুখান্বেষণ করিলাম না ; ভাল বসন ভূষণ কখনও দেহে ধারণ করিলাম না, এক জোড়া মোজাও কখনও পায়ে দিলাম না ; কিম্বা শাল বনাত গায়ে দিলাম না ; পরন্তু কমল-কামিনীর সামান্য অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া দরিদ্রের সেবায় নিযুক্ত হইলাম, আনন্দ-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল, কমলকামিনী অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দরিদ্রের সেবায় দেহ মন উৎসর্গ করিলেন। কোথায় আজ কালীপ্রসন্ন দত্ত এবং ভট্টাচার্য্য, কোথায় আজ চন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, রসিকনাথ দত্ত, আতর সিংহ এবং বজির সিংহ—কে আজ সন্ন্যাসীর সংসার-সাধনার সাক্ষ্য দিতে বর্ত্তমান? আমার সংসার-সাধন কেবল সেবার সাধন,—আমার বড় ইচ্ছা হয়, আমি মরিয়া মরিয়া কেবল অন্যের সেবা ও পরিচর্য্যার জন্য জীবন ধারণ করি। বিরজা, এবং কমলকামিনী, ননদ ও ভাজ, অহেতুকী প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া এই সেবাব্রত-পালন করিয়া করিয়া, দেহ-রক্ষায় সিদ্ধি লাভ করিয়া, আমাকে, আজ নিভৃতে, নির্জ্জনে ডাকিয়া ডাকিয়া নিয়ত বলিতেছেন, "আমরা সেবা শেষ করিয়া আসিয়াছি, তুমি কবে আসিবে?" কালীপ্রসন্নেরা এই কথাই বলিতেছেন,—আর রসিকলাল এবং চণ্ডীচরণ এই কথারই আভাস দিতেছেন। আমি আসক্তি এবং বৈরাগ্যের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া নিয়ত ভাবিতেছি, এখন করি কি, যাই কোথা?

এক এক বার ইচ্ছা হয়, সেবাত যথেষ্ট করিয়াছি, এখন বৈরাগ্য সাধনের জন্য গহন অরণ্যে চলিয়া যাই। কিন্তু কে যেন অন্তর কাঁপাইয়া বলেন,—"এই যে প্রসূন, প্রণতি এবং প্রমিতি, সুচেতা এবং সুচরিত্র, প্রভাত এবং সান্ত্বনা, ফুল্লনলিনী এবং সুপ্রসন্ন ; ইহা-

দের চক্ষের জল তুমি দেখিতে পারিবে কি? ইহারা তোমার ব্রত পালনে অক্ষম হইয়াছে কি? অরণ্য আমার,সংসার কি আমার নয়?" মহামায়ার এই বাণী শুনিয়া আমি থমকিয়া দাঁড়াই, কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অক্ষম হইয়া পড়ি। এবার সৈকতময় তরঙ্গায়িত সাগর-তীরে নিভৃত সাধন করিতে করিতে কত সময় ইহকাল এবং পরকালের স্মৃতি-চিন্তনে বিভোর হইয়া আমি ভাবিয়াছি, কি সম্মোহন!—ঐ অচ্যুত ধামে অদেহী কমলকামিনী, অপরাজিতা, বিরজা এবং অসংখ্য আত্মীয় আত্মীয়া এবং বন্ধুবান্ধব—এ ধামে আমি একাকী সংসার-বেলাভূমে সাধনার তরঙ্গে আন্দোলিত, সাথীহারা, বন্ধুহারা, বুঝিবা সর্ব্বস্বহারা, আর কতদিন এই আনন্দ-আশ্রমের বোঝা বহন করিব? কমলকামিনীর হস্তে এই বোঝা চাপাইয়া যদি আমি যাইতে পারিতাম, না জানি কত শান্তি পাইতাম। এখন কাহার হাতে ইহাকে সমর্পণ করিয়া যাইব? কে রক্ষা করিবে? সাধুরা বলেন, যাঁহার সৃষ্টি, তিনিই রক্ষা করিবেন। সেরূপ আত্মনির্ভর নাই;—নাই এই জন্য যে, বিধাতার কত সুন্দর সৃষ্টি দানব মানব নিয়ত নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে যে! সে প্রেরণা কই? সে অহেতুকী নিষ্কাম ব্রতপরায়ণতা কই? ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতা-সুখ-মগ্ন নরনারী সেবার ভার মাথায় নিতে চান কই? আনন্দ-আশ্রম থাকিবে, না যাইবে, এই বার্দ্ধক্যে এই চিন্তায় আমি আত্মহারা; সংসার-সাধন যেন ভীষণ সাধনে পরিণত হইয়াছে।

বিষ্ঠা চন্দনে সমজ্ঞান না হইলে সংসার সাধন ভণ্ডামী বই আর কিছুই নয়, তাহা মুক্তির সোপান নয়। সংযম ভিন্ন কেহই সকল রমণীতে মাতৃজ্ঞান লাভে সমর্থ নয়। অনেক জীবের সংসার সাধন কেবল সুখ-সাধন। প্রাণকৃষ্ণ এবং ক্ষান্তমণি রাস্তার বালক কুড়াইয়া কোলে লইতেন, ফাদার ড্যামিয়েন ঘৃণিত কুষ্ঠরোগীকে আলিঙ্গন করিতেন, জর্জ্জমুলার ধূলা-কাদা-মাখা পরিত্যক্ত ছেলে মেয়েদিগকে লইয়া সংসার সাধন করিতেন। শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বিশ্বাসও এই কলিকাতায় তাহাই করিতেছেন। আর ম্যাট্সিনি? ইটালি এবং তিনি একাত্মক—ভিন্নতাবোধ নাই, পর-পর-ভাব নাই, নিজের সুখের কামনা নাই; অবিবাহিত ম্যাট্সিনি দেশের জন্য জীবন দান করিলেন। আর খ্রীষ্ট? এই সংসার-সাধন, তাঁহার পক্ষে কৈবল্যসাধনেরই নামান্তর মাত্র। একাকিনী লেডি ম্যাগডেলিন একদিন তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন, আর আজ জগৎ সে কথা স্বীকার করিয়া ধন্য হইতেছে। আমার বলিতে ইচ্ছা হয়—কমলকামিনী এবং বিরজা, রসিকলাল এবং ত্রিপুরাচরণ কেন সহস্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার প্রাণকে অহেতুকী ভ্রাতৃ-সঙ্ঘে, অথবা অখণ্ড সচ্চিদানন্দময়ী কুলকুণ্ডলিনীর সদ্যজাগ্রত মাতৃরাজ্যে আমাকে লইয়া গেল না? বিশ্বরূপিণী কি ভুবনমোহিনী? তিনি কি দেহাত্মিকা বুদ্ধি? তিনি কি আসক্তি এবং বৈরাগ্য? তিনি কি সংসার এবং শ্মশান? তিনি কি নির্ব্বাণ এবং মুক্তি? তিনি কি সাধনা এবং সিদ্ধি? তিনি কি মৃণ্ময় এবং চিন্ময়? আমি আজকাল নিয়ত কেবল এই কথাই ভাবিতেছি। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা—আমি এখন সেই দেবীর আরাধনায় আত্মসমর্পণ করিতে চাই। তোমরা বল, সংসার এবং শ্মশান পৃথক—আমি বলি, উহা একেরই দুই রূপ। তোমরা বল, সাকার ও নিরাকার পৃথক্, আমি বলি, উহা একেরই দুই মূর্ত্তি। তোমরা বল, ইহকাল ও পরকাল

পৃথক, আমি বলি, এই দুই একেরই দুই মূর্ত্তি। দেখিতে চাও যদি, দেখ, এই আমিত্বের ভিতরে শুধু সেই বিভূতি, সেই ঐশ্বর্য্য, সেই সর্ব্বস্ব। জলে স্থলে, আকাশে ব্যোমে, সাগরে প্রান্তরে, কানন-কুন্তলা প্রকৃতিতে শুধু কেবল একজন ভুবনমোহনরূপ ধরিয়া বসিয়া আছেন। আজ ভক্তির সহিত তাঁহার চরণে কোটী কোটী প্রণাম করিতেছি। সেই চিরন্তন একের ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলাইয়া জড়ভরতের ন্যায় থাকিতে পারিলেই সকল সাধ যেন পূর্ণ হয়। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের সারকথা, ঈশ্বরে মতি রাখ, ভাল হও এবং পরসেবা কর। সকল বক্তৃতা, বাক্য-বাণ-নিক্ষেপ থামিয়া যাক্, কেবল ইচ্ছায় ইচ্ছার মিলন হউক এবং মিলনের মহাবাণী ধরাকে প্রকম্পিত করুক।

আনন্দ-আশ্রম শুধু কেবল এই কথা ঘোষণার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে যে, দ্যুলোকে, ভূলোকে ত্রিভুবনবিজয়ী সেই একেরই প্রকট মূর্ত্তি। দারুণ শোকে ইহাই সান্ত্বনা—নিরানন্দে ইহাই আনন্দ,—প্রণব আর প্রমিতি একাত্মক, অপরাজিতা আর সান্ত্বনা একাত্মক। আমি মৃন্ময় চিন্ময়-যুগলমূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত। আজ ধ্রুব জ্ঞানে আত্মসমর্পণ করিয়া স্বতন্ত্র ইচ্ছাবর্জ্জিত হইয়া নির্ভয়ে বৈকুণ্ঠের পথে চলিয়া যাই। মায়ের মহা ইচ্ছা, জীবনে ও মরণে, আসক্তি ও বৈরাগ্য-সাধনে পূর্ণ হউক।

বাঁকীপুর সাহিত্য-সম্মিলনের আলোচনা।

সাহিত্য-সেবাকে আমার জীবনের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার মতই সার্থক সাধনা করিয়া লইয়াছি বলিয়া, সেই সাহিত্যের সম্মিলন ক্ষেত্র আমার কাছে মহাতীর্থ। বীণারঞ্জিত পুস্তকহস্তা ভারতীর সপ্তস্বরা বীণা যেখানে বাজে, সেখানে যাইতে ভারতীর কোন্ সন্তানের প্রাণ না নাচিয়া উঠে? সেই মধুর বীণার ঝঙ্কার, বিশ্বেশ্বরী পুরী বারাণসী ধামে বসিয়া যখন শুনিতে পাইলাম, তখন আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, বাঁকীপুর যাইবার জন্য ছুটিলাম। সম্মিলনের প্রথম দিবসে উপস্থিত হইয়া পূর্ণেন্দু বাবুর আহ্বান শুনিতে পাইলাম না, স্যর আশুতোষের গম্ভীর অভিভাষণ শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিলাম না, সে দুঃখ আর রাখিবার স্থান নাই। আমি মধ্য রাত্রির আধ জ্যোৎস্না আধ আঁধারের মধ্যে লুকাইয়া নীরবে সকলের অজ্ঞাতসারে বাঁকীপুরে নামিলাম। স্বেচ্ছাসেবক কেহ ছিল না, আমি ভারতীর পূজা করিতে আসিয়াছি, ভারতীর সন্তানগণের সেবা লইতে আসি নাই। আমার স্বেচ্ছাসেবকের কোন আবশ্যক ছিল না। আমি শিষ্যবাড়ী উঠিব, তথায় থাকিয়া সাহিত্য-সম্মিলনের মণ্ডপে দীনভক্তের মত উপস্থিত হইব, আমার কাহারও সাহায্যের আবশ্যক ছিল না।

দ্বিতীয় দিন সাহিত্য-সম্মিলনের মন্দির দ্বারে আসিয়া পৌঁছিলাম, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের নিকট চকিতে আমার পরিচয় দিলেন। আমি তাঁহার নির্দ্দেশ মত আসনে বসিলাম। সে সময়ে সুপ্রসিদ্ধ

ব্যারিষ্টার সাহিত্য-শাখার সভাপতি মধুস্রাবী ভাষায় ধীরে ধীরে "বাঙ্গালার গীতি কবিতা" প্রবন্ধটী পাঠ করিতেছিলেন। ভাবে ও কবিত্বে; বিশ্লেষণে ও মৌলিক চিন্তাশক্তিতে প্রবন্ধটী বস্তুতই বড়ই মধুর, বড়ই ঝঙ্কারময় বলিয়া বোধ হইতেছিল। গদ্য হইয়াও পদ্যের মত লাগিতেছিল। এই কি সেই ব্রাহ্ম চিত্তরঞ্জন—যিনি সে দিন আপনার কল্যাণীয়া কন্যার, পুরোহিত দ্বারা মন্ত্রপাঠ করাইয়া শালগ্রাম শিলা সম্মুখে রাখিয়া, বিবাহ দিয়া দেশের মধ্যে একটী আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন? আমি সতৃষ্ণ লোচনে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলাম। ইনি আমাদের গ্রামের ক্ষুদ্র সম্মিলনীতে "নারায়ণ" পত্রিকা দান করিয়া অগ্রেই কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। এজন্য ইঁহার উপর স্বভাবতই আমার একটী সম্মান ও শ্রদ্ধার ভাব ছিল। নারায়ণ পত্রিকাতেই লোকে প্রবন্ধ পড়ুক, তাই কি নারায়ণ-সম্পাদক মুদ্রিত করিয়া প্রবন্ধটী সভাক্ষেত্রে বিতরণের ব্যবস্থা করেন নাই? বাঙ্গালার গীতি-কবিতা প্রবন্ধটীর আগাগোড়া সম্যক রসাস্বাদন করিতে পারিয়াছি বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারি না, কিন্তু তাহা যে বড়ই ভাল লাগিয়াছে, ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। একটী স্থানে আমার বড় সংশয় জাগিয়াছে, আমি সেটী উদ্ধৃত করিয়া সংশয় জন্মিবার কারণটী ব্যক্ত করিতেছি; লেখক বা তাঁহার কোন বন্ধু যদি আমাকে সেটী বুঝাইয়া দেন, তবে বড়ই সুখী হইব। আমি ইহা প্রশ্ন করিতেছি মাত্র। উত্তর পাইলে আমার সংশয় ঘুচিয়া যাইবে, পরস্পর বিরুদ্ধবৎ প্রতীত স্থলটী পরিষ্কার হইবে, এ আশা আমি করি। লেখক বলিয়াছেন—

"চণ্ডীদাস দুঃখের কবি, বিদ্যাপতি সুখের কবি, তাঁহারা বোধ হয়, জীবনের সুখ দুঃখকে ভাল করিয়া বুঝেন নাই।"

ইহার কারণটী তিনি যে ভাবে বুঝাইয়াছেন, সেই ভাবের দিক দিয়া অতি সুন্দর, তাহাতে আমার কোন বক্তব্যই নাই। কিন্তু অন্যস্থলে আবার তিনি এই কথা বলিতেছেন—

"বিদ্যাপতির প্রেমে বেদনা অপেক্ষা সুখের আতিশয্যই বেশী। তাহাতে দুঃখটুকু যেন সোহাগ করিয়া ঢালিয়া দেওয়া, তাহাতে প্রাণের সে তীব্রতা, সে আকুলতা নাই। কিন্তু প্রাণের ভিতর যে অতলস্পর্শ সমুদ্র আছে, তাহাতে অবগাহন করিতে পারেন নাই। সে ত্রিভুবনব্যাপী তন্ময় বিরহ বিদ্যাপতির নাই।"

বিদ্যাপতির প্রেমে যখন সুখের আতিশয্যই বেশী, চণ্ডীদাসের প্রেমে যখন দুঃখ বা বেদনার আতিশয্যই অধিক, তখন "বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি" কথাটাই ত মানা হইল। তবে জীবনের সুখ দুঃখ ভাল বোঝেন নাই বলিয়া অনুযোগ করা হইল কেন, তাহাত বুঝিলাম না। যাহার আতিশয্য বেশী, সেই নামই ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহাই ত নিয়ম। শরীর পাঞ্চভৌতিক, কিন্তু পার্থিব ভোগের আতিশয্য নিবন্ধনই শরীরের পার্থিব আখ্যা। সূক্ষ্ম পঞ্চভূত তরল অপ্ বহুল বলিয়া পঞ্চভূতের অপ্ শব্দ বাচ্যতা। ইহা পরস্পর বিরুদ্ধ কি না, জানি না, অন্ততঃ বিরুদ্ধ রূপে প্রতীত হইতেছে। আশা করি, প্রশ্ন-মত বুঝিয়াই কথাটীর উত্তর দিতে লেখক বা তাঁহার কোন বন্ধু, বা যে কোন ব্যক্তি অনিচ্ছুক হইবেন না—ইহাই আমার অনুরোধ।

তারপর সাহিত্যসেবী চক্ষুহীন শ্রীযুক্ত

বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় ইতিহাস শাখার সভাপতি রূপে যখন জলদগম্ভীর ভাষায় তাঁহার অভিভাষণটী বক্তৃতা আকারে বলিতে-ছিলেন, তখন সভাক্ষেত্রে একটী উত্তেজনার ভাব দেখা দিল, গম্ভীর আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হইয়া মণ্ডপের চতুষ্পার্শ্বে একটী গমগমে ভাব সৃষ্টি করিল। চিত্তরঞ্জনের কোমল ঝঙ্কারের পরই এই বিজয়ভেরী নিনাদ বড়ই ভাল লাগিল। তন্ময়তার পরই উন্মাদনা আসিয়া আবির্ভূত হইল।

তৎপরে টাকীর বদান্য জমিদার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-পূর্ণ সুদীর্ঘ অভিভাষণটী বেশ ধীর ভাবে পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। গভীর পাণ্ডিত্য প্রকাশের সঙ্গে অনেকগুলি কাজের কথা বলিয়াছেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম মতের দার্শনিকতার দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের যত্ন পাইয়াছেন, সকল মতগুলিই সমন্বয় পন্থা অনুসারে নির-পেক্ষ বিচারে আলোচনা করিয়াছেন।

বাস্তবিক অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই ধারণা, জ্ঞানবাদই যুক্তি তর্কের বিষয়, ভক্তি-রাজ্য নহে। ভক্তিবাদ কেবল ভাবের উপ-রই প্রতিষ্ঠিত হৃদয়েরই বস্তু। ইহা সত্যের একটী দিক মাত্র। গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম মত ভাবমূলক বলিয়া ইহার প্রাধান্য, কিন্তু দার্শ-নিক যুক্তি তর্কের উপরই ইহা প্রতিষ্ঠিত। জীব গোস্বামীর ষট্ সন্দর্ভ প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, কি গভীর সুক্ষ্ম দার্শনিক চিন্তা ইহার মধ্যে বিদ্যমান। যাহাতে এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম মতের দার্শনিক গ্রন্থগুলি অন্ততঃ অন্যতম পাঠ্য রূপে পরিগণিত হয়, তাহার ব্যবস্থা যতীন্দ্র বাবু করুন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের সাহায্যে ইহা সহজেই হইতে পারে, এই গুলির অনুবাদ তাৎপর্য্য প্রকাশক ব্যাখ্যা প্রথমে মাসিক পত্রে প্রকাশিত করার আয়োজন হউক; পরি-শেষে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হওয়ারও যত্ন পাইতে হইবে। এই মতের দার্শনিকতার দিকটী যাহাতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে, তাহার জন্য প্রাণপণ করা প্রত্যেক বৈষ্ণবের অবশ্য কর্ত্তব্য। বাঙ্গালার গৌরব ন্যায় শাস্ত্রের মত ইহারও প্রাধান্য দার্শনিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত হউক। বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পত্তি কোন্ বাঙ্গালীর না আনন্দের বস্তু?

প্রাতঃকালের সভাভঙ্গের পর শিষ্যবাড়ীতে আহারাদি সমাপন করিয়া সম্মিলন-মণ্ডপে উপস্থিত হইলাম। সভা বসিবার বহু বিলম্ব দেখিয়া আমি যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের বাড়ীতে গেলাম। সাহিত্য-পঞ্জিকা পূর্ব্বদিন বিতরিত হইয়াছে। আমার ঐ পঞ্জিকা এক-খানি সংগ্রহের বড় ইচ্ছা। কারণ উহাতে আমার পুস্তকের নাম উল্লিখিত হইয়াছে কি না, কাঁঠালপাড়া সম্মিলনী পাঠাগার তালিকায় অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে কি না, কোন প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে কি না, দেখিবার কৌতূহলও ছিল। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ নির্ব্বাচনে প্রায়শঃই পক্ষপাত ও অক্ষমতাই দৃষ্ট হয়, এই পঞ্জিকায় উক্ত দোষগুলি তাণ্ডব নৃত্যে বিরাজ-মান কি না, জানিবার সাধও ছিল। দ্বিপ্র-হরে ব্রাহ্মণ অতিথিকে একখানি বিনামূল্যে বিতরিতব্য পঞ্জিকা না দিয়া তিনি হয়তঃ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, আমি কিন্তু তাহাতে বড় ব্যথাই অনুভব করিয়াছিলাম। পূর্ণেন্দু বাবুর চিঠি না দেখাইলে আমি পাইব না, শুনিলাম। তখন আমারও জেদ হইল, আমি পূর্ণেন্দু বাবুর চিঠি লইয়াই সেই পঞ্জিকা আদায় না করিয়া ছাড়িলাম না। সানুবন্ধ প্রার্থনা যোগীন্দ্র সমাদ্দারের নিকট বিফল

হইল, তজ্জন্য অবশ্য দোষী আমিই। পূর্ণেন্দু বাবু ব্রহ্মবিদ্যার অন্যতর সম্পাদক, আমি তাঁহার পত্রিকার একজন লেখক, কাজেই তিনি আদর করিয়াই পত্রখানি দিলেন।

১৩২২ সালে যে কয়খানি পত্রিকায় আমি লিখি,তন্মধ্যে কোন্ কোন্ প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে দেখিবার অগ্রেই প্রয়াস পাইলাম। দেখিলাম, হিন্দু-পত্রিকা, শাশ্বতী ও ব্রহ্মবিদ্যা হইতে পুনর্জ্জন্মবাদ, পরলোক-রহস্য, মোক্ষতত্ত্ব, এই তিনটী উল্লিখিত হইয়াছে, নব্যভারত, ব্রাহ্মণসমাজ, পন্থা, আলোচনা, জন্মভূমি ও বসুধায় উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের উল্লেখ আছে কি না, দেখিতে যাইয়া দেখিলাম, এগুলির নামই নাই! কি আশ্চর্য্য, যে নব্যভারত পত্রিকা বর্ত্তমানে প্রবন্ধ-গৌরবে সকলের অপেক্ষা সমৃদ্ধ বলিয়া অনেকের বিশ্বাস, সে পত্র বাদ পড়িল! ব্রাহ্মণ সভার মুখপত্র ব্রাহ্মণসমাজ, আধ্যাত্মিক পত্রিকা পন্থা, উৎসবও ত্যক্ত হইল! কৈফিয়ত শুনিলাম, নব্যভারত পত্রিকা প্রভৃতি তাঁহাদিগকে বিনামূল্যে দেওয়া হয় নাই,তাই এই ব্যবস্থা।* হইতে পারে, তাঁহাদের দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তথাপি যে কোন উপায়ে সংগ্রহ করিয়া লওয়া নির্ব্বাচকের পক্ষে উচিত ছিল না কি? ১৩২২ সালে কি কি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য, তাহা যিনি নির্ব্বাচন করিতেছেন, এই পত্রিকাগুলি বাদ পড়ায় তাঁহার কার্য্য অসম্পূর্ণ ও দুষ্ট হইয়া পড়িল না কি? নির্ব্বাচনে পক্ষপাত বড় দেখিলাম না সত্য, কিন্তু উপরোক্ত ত্রুটি অমার্জ্জনীয়, ইহা না বলিয়াও থাকিতে পারিলাম না। অনেককেই সম্মিলনে উপস্থিত দেখিলাম। নিখিল বাবুর নাম বাল্যকাল হইতেই শুনিয়া আসিয়াছিলাম, শাশ্বতীর সম্পাদকরূপে তিনি অনেকবার আমার সহিত পত্র-ব্যবহার করিয়াছেন। কাজেই পরোক্ষ আলাপের পর তাহার সহিত চাক্ষুষ মিলন বেশ ভালই লাগিল। শাশ্বতীর লেখক বলিয়াই এই মিলনে আমি বিশেষ ভাবে আপ্যায়িত হইলাম।

৩টার সময় দর্শন শাখা বসিল। আমি দর্শন শাখায় আসন পাইলাম। সভাপতি মহাশয় আমাকেই প্রথমে প্রবন্ধ পড়িতে অনুমতি দিলেন। "সন্ন্যাস ও ত্যাগ" শীর্ষক প্রবন্ধ পড়িলাম। সভাপতি মহোদয় আদ্যোপান্ত শুনিলেন,অপর কে শুনিলেন, তাহা লক্ষ্য করি নাই। প্রবন্ধ বিষয়ক আলোচনা করিতে কেহই উঠিলেন না। তৎপরে হেমচন্দ্র বসু একটী প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি পাইয়া আমি রাধা ও গোপিকাদের প্রেম,লজ্জা ধর্ম্ম ত্যাগ প্রসঙ্গে দুই চারিটী কথা বলিলাম। শেষে সেই বিদ্বৎ সভায় আমি লজ্জা ধর্ম্ম ত্যাগ সম্বন্ধে একটী বিপ্রতিপত্তি দেখাইয়া তাহার মীমাংসার জন্য আহ্বান করিলাম। পূর্ণেন্দু বাবু (অভ্যর্থনা সভার সভাপতি) অনেকক্ষণ তৎপ্রসঙ্গে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা অতি সারগর্ভ ও সুন্দর হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত আমারই প্রায় অনুকূল হইল। যতীন্দ্রবাবু আমার কথার উত্তরে অনেক সুন্দর বৈষ্ণব ধর্ম্ম কথার অবতারণা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে আনন্দিত করিলেন। মধ্যে মধ্যে সেই সভাক্ষেত্রে আমার সহিত বাদ-বিচার হইতেছিল, এমন

* আমাদের নিকট বিনামূল্যে পত্রিকা পাওয়ার পত্র কখনও উপস্থিত হয় নাই বা বিনিময়ের পত্রিকাও পাওয়া যায় নাই। সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিমন্ত্রণও হয় নাই। ইহা যে দলাদলির যুগ। সাহিত্য-সম্মিলন ত ব্যক্তিগত প্রাধান্যেরই কথা ন। পণ্ডিত মহাশয় বিরক্ত হইলেন কেন? ন, স।

সময়ে পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় আসিয়া পড়িলেন। তখন বাদ প্রতিবাদ বন্ধ হইয়া গেল। বলা বাহুল্য যে, দর্শন শাখায় অতি অল্প লোকই বসিয়াছিলেন, কিন্তু বাদ বিচার কালে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। পণ্ডিতরাজ আবার যখন "গম্ভীর অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী" জোর গলায় বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, তখন চারিদিক ঝেঁটিয়া যত লোক দর্শন শাখার চারিদিকে আসিয়া দাঁড়াইল। সাধ্য, পক্ষ ও হেতু কি,পরামর্শ, ব্যাপ্তি ও অনুমান কাহাকে বলে, ইহা তিনি বুঝাইতে বসিলেন। অজীর্ণ পেটরোগা লোকদিগকে অপর্য্যাপ্ত ক্ষীর ছানা রাবড়ী প্রভৃতি খাওয়াইতে দেখিয়া বিদ্যাভূষণ (মহামহোপাধ্যায়) একবার পণ্ডিতরাজকে ব্যর্থ শ্রম করিতে সবিনয়ে নিষেধ করিলেন। বক্তৃতা চলিতে লাগিল। যত দূর সরল হওয়া সম্ভব, তাহা হইলেও লোকে বুঝিতেছিল কি না, জানি না, কিন্তু সকলে যে এক মনে শুনিতেছিল, ইহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি। বিদ্যাভূষণ একবার উঠিবার ইচ্ছা করিলে পণ্ডিতরাজ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-সুলভ সরলতায় তাঁহার হাত ধরিয়া বসাইয়া দিলেন। এই অনাড়ম্বর সরল আবদার বড়ই সুন্দর লাগিয়াছিল। পণ্ডিত রাজের বাহাদুরী যে, তিনি সভায় দাঁড়াইয়া সাধারণ লোককে অনুমান কাণ্ডের দুর্ব্বোধ্য কথা কিছু না কিছু উদরস্থ করাইয়াছেন। সুরেশ বাবু, পাঁচকড়ি বাবু প্রভৃতিকে একবার দর্শন শাখায় আসিয়া কিছুক্ষণের জন্য বসিতে দেখিয়াছিলাম। সর্ব্বশেষে আমি যে বিপ্রতিপত্তি তুলিয়া সভাক্ষেত্রে একটী বাদ প্রতিবাদের তরঙ্গ তুলিয়াছিলাম, তাহা পাঠকবর্গকে শুনাইব। কোন বৈষ্ণব দার্শনিক ইহার সম্যক্ মীমাংসা করিয়া দিলে বড়ই ভাল হয়। বিপ্রতিপত্তি এই—রাধা ও গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে লজ্জা ধর্ম্ম ত্যাগাত্মক সর্ব্বস্ব অর্পণ সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছিল কি না? সর্ব্ব সময়ে, কিম্বা মাত্র রাসলীলায় ইহার সম্ভব হইয়াছিল? বিষয়টী পরিস্কার করিয়াই বলি—বেদান্তে জীব মুক্ত স্থলে অবিদ্যা সম্পূর্ণ উচ্ছিন্ন হইলেও যতদিন দেহের স্থিতি, ততদিন সংস্কার রূপে ঐ অবিদ্যা নাশ প্রাপ্ত হয় না। অবিদ্যা কার্য্য দেহেন্দ্রিয়াদি থাকিতে সংস্কার রূপে অবিদ্যার সূক্ষ্ম ভাবে অবস্থিতি কাটে না। এই দৃষ্টান্তে রাধা ও গোপীদের যতদিন মানবী দেহ বর্ত্তমান, ততদিন স্ত্রীত্বজ্ঞান ও সঙ্গে সঙ্গে তৎ সহজ লজ্জা প্রভৃতিও বিদ্যমান থাকিবে। লজ্জা সম্পূর্ণ ত্যাগ করা হইলেও সূক্ষ্মরূপে সেই লজ্জার অবস্থান সংস্কার রূপে অবিদ্যা স্থিতির ন্যায় কে নিবারণ করিবে?

লজ্জা ধর্ম্মের সংস্কার রূপে অবস্থিতি বৈষ্ণব ধর্ম্মানুমোদিত কি না? আবার সংস্কার রূপে অবস্থিতি মানিলে লজ্জা ধর্ম্ম প্রভৃতি সর্ব্বস্ব অর্পণই বা প্রকৃত হইল কৈ? আর সংস্কার রূপে অবিদ্যা জীবন্মুক্তেরই থাকে, বিদেহ মুক্তের থাকে না। তাই রামানুজ স্বামী জীবন্মুক্তি মানিয়াই যান নাই। রাধা গোপীদের লজ্জা ধর্ম্মের সূক্ষ্মাকারে অবস্থিতি প্রকৃত সর্ব্বস্ব ত্যাগই নহে—এরূপ কোন সাম্প্রদায়িক মত আছে কি না, জানি না।

রাসলীলার সময়ে লজ্জা ধর্ম্মও সূক্ষ্মাকারে থাকে না, পরে অবশ্য থাকে। সমাধি অবস্থা ভঙ্গ হইলে যেমন সাধকের দেহাত্ম জ্ঞান ফিরিয়া আইসে, সুষুপ্তি ভঙ্গের পর প্রবোধ প্রত্যাবৃত্ত হয়, তদ্রূপ রাধা ও গোপীদের স্ত্রীত্বজ্ঞান, সহজ ধর্ম্ম লজ্জা প্রভৃতির জ্ঞান

রাসলীলা অবসানে ফুটিয়া উঠে। ইহা সূক্ষ্ম ও স্থূল, দুইই হইতে পারে।

অথবা রাসলীলার সময়ে সূক্ষ্মাকারে স্ত্রীত্ব জ্ঞান ও সহজ ধর্ম্ম লজ্জা প্রভৃতি সূক্ষ্মভাবে থাকে, কিন্তু অনুভবে আইসে না, এই মাত্র। যেমন সাধকের সমাধি ভঙ্গের পর দেহাত্ম বোধ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, সমাধি অবস্থায় তাহার অনুভূতি না থাকিলেও সূক্ষ্মাকারে অবশ্য সে সময়ে ছিল। সুষুপ্তি ভঙ্গেও আমিত্বের ধারা ঠিক থাকে বলিয়া সুষুপ্তি কালে তাহার সূক্ষ্মাকারে অবস্থিতিও ছিল।

আবার প্রকৃত অনুভব না থাকিলেও যখন লজ্জা ধর্ম্ম প্রভৃতি সূক্ষ্মাকারে বর্ত্তমানই রহিল, তখন লজ্জা ধর্ম্ম প্রভৃতির সম্পূর্ণ ত্যাগ হইল কৈ? সম্পূর্ণ ত্যাগ না হইলে রাধা ও গোপীদের প্রেম সম্পূর্ণ রূপে কালুষ্য-বর্জ্জিত ও পাপ-শূন্যই বা হইল কৈ? মিলনে বা বিরহে ক্ষণিক তন্ময়তা মাত্রেই আত্মবিস্মৃতি দেখা যায়, সেই আত্মবিস্মৃতিকে প্রকৃত লজ্জা-ধর্ম্ম-ত্যাগাত্মক সর্ব্বস্ব অর্পণ বলা যায় কিরূপে?

বিপ্রতিপত্তি, সংশয় ও পূর্ব্বপক্ষ যাহাই বল, আমি উপস্থিত করিলাম। উপযুক্ত উত্তর পাইলে আমি তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।

নব্যভারতে যাঁহার গভীর চিন্তা-প্রসূত গবেষণার প্রবন্ধ পড়িয়াছি, একদিন যাঁহার সূক্ষ্ম তর্কশক্তি দর্শনে শত ধন্যবাদ দিয়াছি, সেই বিজ্ঞান শাখার সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি নাই।

তারপর সাহিত্যিকগণ পূর্ণেন্দু বাবুর বাগান-বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ গমন করিলেন। আমি সে নিমন্ত্রণ পাই নাই, কাজেই সে আমোদে যোগদান করিতে পারিলাম না। রাত্রিতে সম্মিলন-মণ্ডপে অভিনয়ও হইয়াছিল। যাহা হউক, আমি সেই দিনই রাত্রির ট্রেণে অজ্ঞাতসারে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, আধ জ্যোৎস্না, আধ-রাত্রির আবরণে আপনাকে আবৃত করিয়া জন্মভূমি কাঁঠালপাড়া অভিমুখে রওনা হইলাম। সাহিত্যিকগণের ভূরি ভোজন স্থলে বেড়াইয়া দেখিলাম, আয়োজন যথেষ্ট, বন্দোবস্তও খুব ভাল। আমি নিজে সে ভোজনের সহিত আদৌ পরিচিত নহি। কাজেই সে সম্বন্ধে সম্যক বিবরণ দিতে পারিলাম না। ভোজন-বিলাসীগণ ক্ষমা করিবেন। এ বৎসর আর সে রসিকলাল নাই, কে আর তেমন করিয়া সরস বর্ণনায় নব্যভারত-পাঠকবর্গকে তৃপ্ত করিবেন? গত বৎসর যশোহরে গিয়াও যাহা জানিতে পারি নাই, রসিক বাবুর প্রবন্ধে তদপেক্ষা বেশী জানিয়াছিলাম। পাঠকবর্গের দুর্ভাগ্য, রসগোল্লার পরিবর্ত্তে কাঠ চিবাইবেন।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ।

মহাশূন্য।

১

ওগো বিশ্বরাণি!
আজি সেই মহাশূন্যে কর গো বরণ,
যারে তুমি করি আলিঙ্গন
দুলি দুলি প্রেম ভরে করিছ নর্ত্তন,
যার অঙ্কে করিয়া শয়ন
হের নিত্য নব নব সৌন্দর্য্য আপন,
আজি সেই মহাশূন্যে কর গো বরণ।

২

তব কার্য্য করিতে সাধন
কক্ষে যার গ্রহগণ করে বিচরণ,
রবি শশী ধরি দুই কর
প্রসারিয়া আলো দান করে নিরন্তর,
হাতে ল'য়ে দীপ অগণন
আঁধারে তোমারে যে গো করে সম্ভাষণ,
আজি সেই মহাশূন্যে কর গো বরণ।

৩

কোটি কোটি সন্তান তোমার
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় চেয়ে মুখপানে যার,
যে করিছে তার আয়োজন,
তোমার শোণিতে নিত্য পীযূষ বর্ষণ,
আজি সেই মহাশূন্যে কর গো বরণ।

৪

বিহগের অই কলরোল,
তরঙ্গিণী মুখে মৃদু মধুর কল্লোল,
কিন্নরের সুধামাখা গান,
যাহার এ অযাচিত করুণার দান,
শুদ্ধ শান্ত মৃতের মতন,
বিশ্বহিত লাগি ওঠে করিয়া গর্জ্জন,
এমন যে আপনার জন,
আজি সেই মহাশূন্যে কর গো বরণ।

৫

শতমেঘে হাসি ওঠে সুনীল অম্বর
রঙ্গে বঙ্গে সাজিয়া সুন্দর,
নিদাঘের অপরাহ্নে পশ্চিম গগনে,
শ্রান্ত রবি নেমে যায় রক্ত-সিংহাসনে,
হিমনিশি হ'য়ে গেলে ভোর
তুষার কিরীট ওই গিরিশির তোর,
বালার্কের কিরণ পরশে
স্নিগ্ধ স্বরগের ছবি ফুটায় হরষে,
অই নিয়ে তায়
গর্জ্জিয়া উঠিছে সিন্ধু হের অনিবার,
তরঙ্গে তরঙ্গে কিবা সুখে
দিবানিশি ফেনপুঞ্জমুখে,
আছাড়িয়া বেলাভূমে করে উদ্গীরণ,
চকিতে থামিয়া ফিরে আলয়ে আপন,
ছায়া যায় পশ্চাতে তাহার
সিক্ত বালুকায় দাগি চিহ্ন আপনার,
যাহারে আশ্রয় করি, সেই মহাজন
তোমার সে অন্তরের ধন,
তবে সেই কীর্ত্তিমানে কর গো বরণ।

৬

বৃক্ষ, লতা, গিরি মনোরম
তাহারি অঙ্গপুটে লভেছে জনম,
তারি দেহে নিরমিয়া পথ,
পশু পক্ষী মানবেরা ছুটাইছে রথ,
অম্বুদ সে জীবের জীবন,
ভ্রমিয়া করিছে তার কর্ত্তব্য সাধন,
আপনি অভাব হ'য়ে সকলের ভাব,
করিছে সে মহাযোগী সতত পূরণ
আজি সেই মহাশূন্যে কর গো বরণ।

৭

ছুটে তরী গন্তব্যে আপন
লয়ে পণ্যভার তব, কিম্বা যাত্রীগণ
দলিয়া তরঙ্গ রাশি নাচিয়া নাচিয়া
গরবে তুলিয়া পাল হেলিয়া দুলিয়া
নিমিষের মাঝে হের তায়
তাহারি অঙ্গবাহী ভীম ঝটিকায়
তরীখানি দেয় ডুবাইয়া,
সম্পদ আরোহীসনে ফেলে লুকাইয়া
তরঙ্গিণী সাগরের সলিল বিবরে
অবোধ্য বিধির বিধি সাধিবার তরে।
অই পুনঃ দুরন্ত সমরে
শূন্যে উড়ি ভীম গোলা ছুটে আসি পড়ে,
যোদ্ধৃগণ মাঝে, যেন কালান্তক যম
মৃত্যুপথে ল'য়ে যায় নির্দ্দয় নির্ম্মম,

লক্ষ নরে চ'খের পলকে—
বক্ষঃ ভেদি রক্ত উঠে ঝলকে ঝলকে,
গৃহে গৃহে উঠে মহাশোকের ক্রন্দন,
ছার খার করে দেশ দারিদ্র্য ভীষণ,
সে দৃশ্যে সে স্থির নির্ব্বিকার
উদাসীন ভাবে সাধে কার্য্য আপনার,
সভয়ে তাহারে আজি করিয়া দর্শন
(সেই) রুদ্ররূপী মহাশূন্যে কর গো বরণ।

৮

সৃষ্টি হ'তে মায়ের মতন
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে আবরি যে জন,
ধ্বংসশেষে যায় অঙ্কমাঝে
লুকাইয়া রবে তুমি নিরাকার সাজে,
সৃষ্টিতে তোমারে পুনঃ যে দিবে জনম
সৃষ্টি স্থিতি ল'য়ে তব আশ্রয় চরম,
পিতৃরূপী তব সে গগন,
ভক্তিভরে তারে আজি কর গো বরণ।

৯

সৃষ্টি লয় যাঁহার বিধান,
মহাশূন্য ব্যাপিয়া যে পুরুষ প্রধান,
অনন্ত অনধিগম্য দিব্য চক্ষুষ্মান,
অধিষ্ঠাত্রী সেই দেবতায়
বিশ্বরাশি! বর আজি বর গো ত্বরায়।
এ বিশ্বের মঙ্গল কারণ
বিশ্ববাসি! বিশ্বেশ্বরে কর রে বরণ।

শ্রীনলিনীনাথ দাসগুপ্ত।

লড়া'য়ের মুখে।

(২)

ভগবৎ কৃপায় এখন প্রকৃতই আমরা টাঙ্গায় আসিয়া বসিয়াছি। পূর্ব্বলিখিত ব্যবস্থামত গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে আমাদিগের Expeditionary Force এর প্রধান আড্ডা টাভেটা হইতে এই স্থানে উঠিয়া আসিয়াছে। মোম্বাসা ও দারেস-সালেমের মধ্যবর্ত্তী ভারত-মহাসাগরের এক খাড়ির (creek এর) কূলে এই ক্ষুদ্র সহর সাধারণ মানচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব ইহার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বুঝাইবার নাই। মূল মহাসমুদ্র হইতে ইহার ব্যবধান তিন ক্রোশ মাত্র; মহাসমুদ্রে যেদিন উত্তাল তরঙ্গমালা খেলিতে থাকে, আকাশ পরিষ্কার থাকিলে, তাহা পুঞ্জীভূত কার্পাসকণার ন্যায় অল্প অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। Creek এর গাঢ় নীল লবণাম্বুরাশি নিস্তরঙ্গ,—যেন চল চল যমুনার জল!—প্রবল বায়ুহিল্লোলেও তাহা "কালিন্দী-জল-কল্লোল-কোলাহল" ভিন্ন মনে অন্য ভাবের সঞ্চার করে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, টাঙ্গা এত দিন জার্ম্মান উপনিবেশভুক্ত একটী বন্দর ছিল; এখন ইহা ব্রিটিশ-করতলগত। এখানকার জলবায়ু আমাদিগের দেশের বোম্বাই বা মান্দ্রাজের ন্যায় বোধ হয়। এখানে আসিয়া আমাদিগের একরূপ নবজীবনলাভ হইয়াছে। সুখের সমুদ্র যাত্রার পর টাভেটায় পৌঁছিয়া যখন দিনের পর দিন স্বহস্তে জল তুলিয়া; বাসন মাজিয়া, পাক করিয়া উদর পোষণ করিতে হইত,—কতদিন অন্ন কয়টী বা রুটি কয়খানি, উদরস্থ করিবার পক্ষে এক অর্দ্ধসিদ্ধ অড়হর দা'ল ভিন্ন অন্য উপকরণ মিলিত না,—ছয় দিন আপিসের কার্য্যে দেহপাত করিয়া

রবিবারের অবসরকালটুকুও রঙ্গকক্ষতো কাটাইতে হইত,—তখন মনে হইত না যে, চুক্তিপত্রের নির্দ্ধারিত কাল পূর্ণ করিয়া প্রভু সমক্ষে সম্ভ্রম রক্ষা করিতে পারিব। তবে, কুহকিনী আশা মাঝে মাঝে কর্ণে শুনাইত বটে —"এদিন যা'বে, র'বে না। ক্ষণেক অপেক্ষা কর, দুর্দ্দিন ঘুচিবে, সুদিন হইবে।"

এতদিনে আশার বাণী সার্থক হইয়াছে,—দুর্দ্দিনের পর সুদিন দেখা দিয়াছে। এখন প্রবাসী যক্ষের ন্যায় প্রিয়জনবিরহবেদনা ভিন্ন অন্য কষ্ট নাই।

এখানে জার্ম্মানদিগের সময় হইতে কতিপয় কচ্-ছি ও গুজরাটী হিন্দু সমাগত হইয়া ব্যবসায়াদি কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। আশা করা যায়, অতঃপর ঐ দুই স্থানের এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বা'য়ের অনেক ব্যবসায়ী আসিয়া তাঁহাদিগের দল পুষ্ট করিবেন। মাড়োয়ারি বন্ধুগণও, হয়ত, তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতে পারেন; কিন্তু আমাদিগের ন্যায় অন্নচিন্তামগ্ন ভৃতিভুক ভিন্ন বাঙ্গালীর সমাগম হওয়া নিতান্তই সন্দেহস্থল। ঐ সমস্ত হিন্দুগণের উপনিবেশপল্লীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের আচার, নিষ্ঠা ও বাসের শৃঙ্খলা দেখিলে মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়।—উহা যে সনাতন হিন্দু-নিকেতন ভারতবর্ষের সীমাবহির্ভূত কোন স্থান, এরূপ মনে স্থান পায় না। ইঁহারা যথারীতি সন্ধ্যা-বন্দনাদি ব্যতিরেকে জল গ্রহণ করেন না, ইতর জাতিস্পৃষ্ট অন্নব্যঞ্জন মুখে তুলেন না, মৎস্য মাংসের দিক্ দিয়া চলেন না। জাহাজে স্বদেশীয় সৈনিক-সুবাদারগণের স্বতন্ত্র পাকের ব্যবস্থা দেখিয়াছিলাম, আর এখানে এই কচ্-ছি ও গুজরাটী বন্ধুগণের সদাচারপরায়ণতা দেখিতেছি; ইহাতে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে, সঙ্কল্পভ্রষ্ট না হইলে,—স্বগৃহেই কি, আর বিদেশেই কি,—রেলপথেই কি, আর সমুদ্রবক্ষেই কি—কোথাও, কোন অবস্থাতেই, আপন সামাজিক আচার রক্ষা-কল্পে অন্তরায় উপস্থিত হয় না। হিন্দুমতে সমুদ্র-যাত্রার বিরুদ্ধে নানা কথা শুনা গিয়াছে,—বঙ্গীয় রঙ্গভূমি ঐ প্রসঙ্গ লইয়া বিলক্ষণ রসিকতা করিয়াছেন,—এমন কি, কৌলিক ইষ্টদেবতা সঙ্গে জয়পুরাধিপতির জলযাত্রা দর্শনেও অনেক নিষ্ঠাবান (?) হিন্দু নাসিকা কুঞ্চন করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে করযোড়ে জিজ্ঞাসা করি,—সামাজিক হিন্দুত্ব বা আন্তরিক সাত্ত্বিকতা রক্ষাকল্পে আফ্রিকা-প্রবাসী এই সমস্ত হিন্দুগণ প্রত্যবায়ভাগী কিসে? তাঁহারা দেখুন, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ভারতমহাসাগরের পরপারেও অক্ষুণ্ণ ভাবে বিরাজমান রহিয়াছে। তবে, যাঁহারা জাহাজে চড়িয়াই মাতৃভাষা ভুলিয়া যা'ন, বা মকারাদি হইতে আরম্ভ করিয়া বৃষবরাহে পরিসমাপ্তি ভিন্ন সমুদ্রযাত্রা সিদ্ধ বোধ করেন না, তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র;—সে সমস্ত মহাজনের সহিত অসভ্য আমাদিগের সহানুভূতি অল্প।

অবান্তর কথাপ্রসঙ্গে আমরা মূল কাহিনী হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি; এখন তাহার সূত্র পুনরায় অনুসরণ করা যাউক। টাঙ্গায়—শুধু টাঙ্গায় কেন, German East Africaর সমুদ্রতীরস্থ ভূভাগ মাত্রেই—বৎসরে দুইবার, ও প্রতিবারে দুইমাসব্যাপী, বর্ষা হয়; বাকী আটমাস গ্রীষ্ম,—শীত আদৌ নাই। ইহা, বোধ হয়, কাহারও অবিদিত নাই,—Monsoon নামক যে সাময়িক সমীরণ জগদীশ্বর ভারতবর্ষের কল্যাণার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা এই পূর্ব্ব-আফ্রিকা-সংলগ্ন ভারত-মহাসাগর হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রতি বৎসর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে সহচর জলধর সমভিব্যাহারে

ভারতবর্ষাভিমুখে অগ্রসর হয়। Monsoonএর সেই উৎপত্তিকালে—বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠমাসে—এখানে প্রথম বর্ষা হয়। তাহার পর, ভারতবর্ষের কার্য্য সমাপনান্তে, ভাদ্রের প্রারম্ভ হইতে আশ্বিনের শেষ পর্য্যন্ত, সেই অভিন্ন-হৃদয় Monsoon ও মেঘ যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন এখানে আবার বর্ষা দেখা দেয়; তবে, ভারতে বলক্ষয় প্রযুক্ত, এই দ্বিতীয় বর্ষা তেমন প্রবল হয় না।

বাঙ্গালা দেশের যাবতীয় ফল এদেশে জন্মে। আম, কাঁটাল, লিচু, জামরুল, কলা, পেঁপে, লেবু, পিয়ারা, আনারস, নারিকেল, প্রভৃতি সকল ফলই পাওয়া যায়,—অধিকন্তু, দুইবার বর্ষার ফলে, যত্ন করিলে, অধিকাংশ ফলই বৎসরে দুইবার জন্মে। আম সাধারণতঃ দুইবার ফলিয়া থাকে,—যত্ন করিলে, তিনবারও ফলে। একই বৃক্ষের কোন শাখায় মুকুল, কোনটায় অপক্ক আম, আবার কোনটায় সুন্দর সুপক্ক ফল ঝুলিতেছে! আমাদিগের দেশে কচিৎ কোন বাগানে দুই একটা গাছে এ দৃশ্য দেখা যায় বটে,—এখানে এই দৃশ্যই সাধারণ; ফলতঃ, এখানে জ্যৈষ্ঠ, অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন—বৎসরে এই তিনবার সুপক্ক আম্রের রসাস্বাদ পাওয়া যায়। জর্ম্মানেরাই অবশ্য এই সমস্ত আম্রকাননের স্রষ্টা। ইহাঁদিগের বৃক্ষ-রোপণপদ্ধতিতে একটু বিশেষ ত্ব আছে; এখানকার গাছ আমাদিগের দেশের মত কাছাকাছি বসান নহে—এক একটী গাছের পরস্পর ব্যবধান ৬০ ফুট—সে কারণ একটী বৃহৎ বাগানের বৃক্ষসংখ্যা, হয়ত, দশটী মাত্র; কিন্তু সেই দশটী বৃক্ষে এত অধিক আম ফলে, আমাদিগের দেশের দশটা বাগানেও তাহা ফলে না। ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষের নিবিড়তা নিবন্ধন আমাদিগের দেশে ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি হয়; গাছগুলিও সেই ম্যালেরিয়ার বিষাক্ত বাষ্প আকর্ষণ করিয়া জীর্ণ হইয়া পড়ায় আশানুরূপ ফল প্রদান করিতে পারে না। আশা করি, অতঃপর আমাদিগের দেশস্থ বন্ধুগণ নূতন বাগান রচনাকালে এই ইঙ্গিত অগ্রাহ্য করিবেন না।

টাভেটায় কাঁচা পেঁপের কথা লিখিয়াছিলাম, — এখানে পাকা পেঁপেও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। আকারে প্রকাণ্ড, ওজনে আড়াই সেরের কম নহে, খাইতেও বিলক্ষণ সুমিষ্ট। এখানে আমাদিগের দেশের মত মর্ত্তমান রম্ভাও বিরল নহে — সেইরূপ সুগন্ধি ও সুস্বাদু—মূল্যও প্রায় তদ্রূপ,— পয়সায় একটী। আকারে 'গোঁড়া'র মত এখানে একরূপ লেবু জন্মে, অপক্ক অবস্থায় অম্লত্বেও প্রায় তদ্বৎ, কিন্তু পাকিলে 'কমলা'র ন্যায় সুমিষ্ট; বেশ বড় 'পাতি'লেবুও পাওয়া যায়—পয়সায় দুইটী। ফলমূলের এই সুদীর্ঘ পরিচয়ে অনেকে, হয়ত, হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না; আমাদিগের কিন্তু আশা,— এই বিবরণের আকর্ষণে কৃষিপরায়ণ অর্থশালী বাঙ্গালিগণ যদি এদেশে আসিয়া বিস্তৃতভাবে ফলের বাগান করেন, তাহা হইলে, বাণিজ্যের ন্যায় লক্ষ্মী-সমাগম না হইলেও, 'তদর্দ্ধং' সুনিশ্চিত।

German Planterরা এদেশে নারিকেল, রবার ও কফির বড় বড় বাগান করিয়াছেন। এখানকার রেলপথে গমনাগমনকালে দেখিয়াছি, ৮০। ৯০ মাইল-ব্যাপী পথের দুইধারে জার্ম্মানদিগের রবারের আবাদ বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য অযত্নে পড়িয়া রহিয়াছে। এখন ইহা ইংরাজের সম্পত্তি;—কালক্রমে ইহা হইতে ইংরেজরা যে যথেষ্ট লাভ করিবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন দারেস-সালেম হইতে

ট্যাবোরা পর্য্যন্ত সাত-আটশত মাইল রেল-পথের দুই পার্শ্বে যে কত রবারের বাগান আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বোধ হয়, জার্ম্মানদিগের সমস্ত রবারের খরচ এই সকল বাগান হইতে নিষ্পন্ন হইত; এখন তাঁহাদিগের রবার পাওয়া দুর্ঘট হইবে। আমাদিগের দেশের ধনকুবেরগণের মধ্যে যাঁহাদিগের নারিকেল, রবার, কফি, প্রভৃতির আবাদ ও রপ্তানি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা এই বেলা এখানে আসিয়া ঐ সমস্ত বাগানের বা নূতন জমির ইজারা লইতে পারিলে, একটা বিলক্ষণ সম্পত্তি হয়। নচেৎ উহা সমস্তই দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ব্রিটিশ-প্রজাগণের হস্তগত হইয়া পড়িবে। এদেশের জঙ্গলবিহীন সমতল ভূভাগের জলবায়ু প্রায়ই ভারতবর্ষের মত;—rubber or fibre আবাদের জন্য কদলী, পাট বা ধান্যক্ষেত্রের ন্যায় জমির তাদৃশ সুচারুভাবে পরিপাট্যবর্দ্ধনের প্রয়োজন হয় না; আফ্রিকার মজুরও দুর্ম্মূল্য নহে—জন প্রতি দশ টাকা বেশী পড়ে না। এ অবস্থায় ভারতবাসী এই সুযোগ হেলায় হারাইবেন কেন?

নারিকেল এখানে প্রচুর জন্মে; মূল্যও সুলভ—এক মণ নারিকেল শাঁসের মূল্য ৩৷৷৹ টাকা মাত্র; কিন্তু পেষণ-যন্ত্রাভাবে তৈল দুষ্প্রাপ্য, সুতরাং দুর্ম্মূল্য—এক সেরের মূল্য প্রায় এক টাকা। যদি ঘানি বা কল বসাইয়া তৈল বাহির করিবার ব্যবস্থা হয়, ঐ এক সের ছয় আনা মূল্যে পাওয়া যাইতে পারে। নারিকেলের বাগান করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে তৈলযন্ত্র বসাইয়া, ভারতবর্ষে তৈল চালান দিতে পারিলে, ইহাতেও সামান্য লাভ হয় না।

আফ্রিকার যুদ্ধ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে censorএর কঠোরতাও অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়াছে। অনেক সৈন্যের দল ক্রমশঃ স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। কলিকাতার Volunteer Battery তাঁহাদের কর্ত্তব্য সমাপনান্তে * ইতিমধ্যেই তথায় ফিরিয়াছেন। আর ২।৩ মাসের মধ্যেই, বোধ হয়, জার্ম্মানীর নাম পূর্ব্ব আফ্রিকা হইতে বিলুপ্ত হইবে। এই যুদ্ধসূত্রে এক বিষয়ে জার্ম্মানীর রাজনৈতিক কূটবুদ্ধি সম্বন্ধে দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। জার্ম্মানরা অতি অল্পকালের মধ্যে অত্রত্য কাফ্রি-অধিবাসী Askalli জাতিকে নিতান্ত অসভ্য অবস্থা হইতে উন্নত করিয়া সমরবিদ্যায় এরূপ নিপুণ করিয়া তুলিয়াছিলেন ও তাঁহাদিগের কার্য্যে অমন অটুট বিশ্বাস স্থাপন করিতেন যে, তাহাদিগেরই সাহায্যে তাঁহারা এই দুই বৎসর-কাল প্রবল প্রতিপক্ষ ব্রিটিশবাহিনীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাধন করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। আস্কালিগণও কৃতজ্ঞ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ প্রভুভক্তের আদর্শ। তাহারা প্রত্যহ মুষ্টিমেয় মকাইমাত্র ভক্ষণ করিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছে ও জার্ম্মানরাজের জন্য প্রাণ দিয়াছে;—ইংরেজের জয় অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়াও একদিনও

* শুনিতে পাই, Calcutta Volunteer Batteryকে বিশেষ কিছু করিতে হয় নাই, যুদ্ধের আনুষঙ্গিক অপরিহার্য্য যন্ত্রণাভোগ ভিন্ন বিশেষ কোন বেগ পাইতে হয় নাই। তাঁহাদিগেরই দলস্থ কোন ব্যক্তি *Statesman* পত্রে লিখিয়াছিলেন—"It has been an interesting experience, but there is really nothing to tell. We have seen a little fighting, but not very much; we have had weeks and weeks of marching and camping out, without nothing to relieve the monotony, and we are rather proud to think that we have helped to take away Germany's last colony—and thats' about all I can tell you."

আস্মানের পক্ষ ছাড়ে নাই। আফ্রিকাযুদ্ধের ইতিহাসে এই আস্কালি জাতির ধৈর্য্য, বীর্য্য, শ্রমসহিষ্ণুতা ও অতুল প্রভুভক্তির পরিচয় সুবর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। ইংরেজবাহাদুর যদি আমাদিগের দেশের ডুলে-বাগদী, কুকী আকা, কোল ভীল প্রভৃতি ইতর ও অসভ্য জাতিগণকে সেইরূপ উন্নত ও সমরকৌশলে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, জন কয়েক ভদ্রসন্তানগঠিত Bengali Double Company অপেক্ষা অধিক ফল হইত, আর recruitএর চেষ্টায় conscriptionএর জন্য তুমুল আন্দোলন করিতে হইত না। তবে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সকল গুরুতর সমস্যার কথা আমাদিগের সমালোচনার সীমাবহির্ভূত। অতএব, এ ক্ষেত্রেও এই স্থানেই ইতি।

আফ্রিকা-প্রবাসী।

প্রতিবাদ।

আমাদের বালেশ্বর সহরে একটী ক্লব আছে, তথায় অনেকগুলি বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা, বিশেষতঃ ভারতবর্ষ, প্রবাসী, নব্য-ভারত, নারায়ণ, অর্চ্চনা, অর্ঘ্য প্রভৃতি পত্রিকা রীতিমত পড়িতে পাই। ভারতবর্ষ, নব্য-ভারতে সময় সময় উৎকল দেশ তথা ভাষা সম্বন্ধে অনেক প্রকৃত বৃত্তান্ত লিখিত থাকে, তজ্জন্য এই অঞ্চলে ঐ দুই পত্রিকার বিশেষ আদর এবং বহু গ্রাহক।

আমরা বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক সমস্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় উক্তি পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি, ভারতীয় জাতি সাধারণের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করাই সকলের উদ্দেশ্য ; বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাই বাঞ্ছনীয়। গৃহস্থ নামক বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আমরা পূর্ব্বে বিদিত ছিলাম না, কারণ এঅঞ্চলে ইহার গ্রাহক কেহই নাই। গত আগষ্ট মাসে আমি কটক গিয়াছিলাম,তথায় আমার বন্ধু উৎকল-সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয়ের আফিসে একখণ্ড পুরাতন গৃহস্থ দেখিতে পাই। প্রথম পত্রিকা খানি খুলিবা মাত্র একটী প্রবন্ধের উপর দৃষ্টি পতিত হইল, প্রবন্ধের নাম "ভাষা ও জাতি"। লেখক বাবু বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঠ করিয়া দেখিলাম,উড়িয়া জাতি সাধারণের নিতান্ত অলীক নিন্দাবাদে তাহা পরিপূর্ণ। একজন শিক্ষিত লোক একটা প্রাচীন ভুবন-খ্যাত ঐতিহাসিক জাতির কুৎসা রটনা করিবার জন্য অকারণ এত প্রকার মিথ্যা কৌশল অব-লম্বন করিতে পারেন,ইহা একটী আশ্চর্য্য অভি-নব বিষয়। যে প্রাচীন ভুবনখ্যাত জাতির শিল্প কৌশল, বীরত্ব, জ্ঞান গরিমা বিষয় কীর্ত্তন করিয়া মহামহোপাধ্যায় হণ্টর, টউণ্, টরনবী, বীমস,রাজেন্দ্রলাল, রঙ্গলাল, মনো-মোহন প্রভৃতি মহাজ্ঞানিগণ সাহিত্য-ক্ষেত্রে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সম্প্রতি গৃহস্থ পত্রিকা কি গৌরব লাভের জন্য শিক্ষিত ধর্ম্মভীরু লোকের সম্বন্ধে নিতান্ত গ্লানিজনক নিতান্ত মিথ্যা প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন, কারণ উদ্ভাবন করা সহজ কথা নহে। সে যাহা হউক, যে পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, প্রতিবাদ

সেই পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া উচিত। আমি গৃহস্থ-সম্পাদক মহাশয়ের নিকট এই প্রতিবাদটী পাঠাইয়াছিলাম, দুঃখের বিষয়, তিনি পত্রস্থ না করিয়া ফেরত পাঠাইয়া দিয়াছেন।

কয়েক মাস পূর্ব্বে আপনারা ঈদৃশ দেশ তথা জাতি নিন্দুকদিগের বিষয় উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঈদৃশ গ্লানিজনক লেখার প্রতিবাদ পাইলে নব্যভারত প্রকাশ করিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছেন। আপনাদের সেই প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া এই প্রতিবাদটী পাঠাইলাম। অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

প্রবন্ধলেখক বাবু বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত নহেন। নামটী যেন নূতন নূতন বোধ হইতেছে। কবি গাইয়াছেন "নূতন বলিয়া কিছু নিন্দনীয় নয়।" হউন নূতন, কিন্তু ভাষা তত্ত্ব সম্বন্ধে একটা মস্ত অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। লেখক মহাশয়ের বক্তব্যের সার মর্ম্ম হসন্ত শব্দ উচ্চারণই ভাষা-প্রাধান্য নিরূপণের প্রধান উপায়। বোধ করি, প্রবন্ধটীর প্রতি পাঠকগণের মন আকৃষ্টের জন্য গৃহস্থ-সম্পাদক মহাশয় তাহার শিরোভাগে একটী দীর্ঘ বিশদ ব্যাখ্যা লিখিয়া দিয়াছেন—তাহার সারমর্ম্ম—"ভাষার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা দ্বারা জাতির প্রকৃতি স্থির করিবার একটী রীতি আছে, কিন্তু আমাদের দেশে তাহা খুব কম লোকই অবলম্বন করিয়াছেন —ইত্যাদি"।

কিন্তু বাঙ্গালা শিক্ষিত সমাজের মধ্যে কথাটা কিছু নূতন নহে, তবে হসন্তটাই যে ভাষার মূল প্রকৃতি—কথাটা নূতন আবিষ্কৃত বটে। বিপিন বাবু আত্ম মত সমর্থনের জন্য একটী উদাহরণ দিতেছেন "যে জাতির কথিত ভাষায় এবম্বিধ হসন্ত শব্দ বা অক্ষরের প্রাচুর্য্য থাকে, সে জাতি বিশেষ তেজ বীর্য্যশালী এবং শক্তিমান। ইংরাজীর সহিত বাঙ্গালার তুলনা করিলেই বিষয় পরিস্ফুট হইবে। ইংরাজীতে যদি বলি come, বাঙ্গালায় বলিব এস। ইংরাজীতে যদি বলি love, বাঙ্গালায় বলিব ভালবাসা। ইংরাজীতে যদি বলি here, বাঙ্গালায় বলিব এখানে। এই প্রকার comparison তুলনা, food খাদ্য, কেবলই তাহা নহে, বিপিন বাবু ত জানেন, ভোজনে বসিলে মাতা ভগিনী মাসী পিসী কন্যারা অন্ন চড়চড়ি-শুক্তো পরিবেশন করিয়া যান, —তাহার পর ঝি তামাকু দিয়া যায়—বাবু বলুন দেখি, এত স্বরান্ত শব্দ যাহারা উচ্চারণ করেন,তাহারাই কি বাঙ্গালী পলটন ? পাঞ্জাবী গুর্খালী ভাষা সম্বন্ধে বিপিন বাবুর মত— "উক্ত ভাষাদ্বয় হসন্ত বহুল, সুতরাং ঐ জাতিদ্বয় বল বীর্য্যশালী।" আমাদের কিন্তু বিশ্বাস, এটা হসন্তের মাহাত্ম্য নহে, দেশের জল বায়ু, খাদ্য এবং পুরুষ পরম্পরাগত অভ্যাসের ফল। বিপিন বাবুর মতে হসন্ত উচ্চারণ করিলেই লোক বলিষ্ঠ হয়,তবে ব্যায়ামচর্চ্চা বা পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজনই বা কি ? লোকে হসন্ত শব্দ উচ্চারণ করিতে শিখুক, সহজেই বীর হইয়া পড়িবে।

বিপিন বাবু একটুক অনুসন্ধান করিলেই সহজে জানিতে পারিবেন, সুবিখ্যাত পলাশী যুদ্ধ ক্ষেত্রে স্বরান্ত বহুল ভাষী তেলেঙ্গু সিপাহীরাই বীরবর ক্লাইবের অবলম্বন মাত্র ছিলেন। "বর্গী এল দেশে" দিদিমার এই ছড়া শুনিয়া বিপিন বাবু ছেলে বেলায় ভয়ে জড়শড় হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতেন, সেই মহারাষ্ট্রীয়দিগের ভাষা স্বরান্ত-বহুল।

চীন এবং রুষ-বিজয়ী জাপানীদিগের ভাষা

স্বরান্ত এবং সানুনাসিক-বহুল, ইহা সর্ব্বজন-বিদিত বিষয়।

বিপিনবিহারী বাবু বলেন "বাঙ্গালা ভাষায় স্বরহীন শব্দ আছে, শুধু তাহা নহে, এমন ভাষা আছে,তাহাতে সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষা অপেক্ষায়ও অল্প সংখ্যক হসন্ত ব্যবহার দৃষ্ট হয়—শাস্তাল ভাষা তাহার একটা প্রমাণ। যেমন আমরা বলি, তোরা কোথায় যাচ্ছিস—শাস্তাল বলিবে, ওকাতে চালা কানা হো। আমরা যদি বলি,তোরা এদিকে আয়। শাস্তাল বলিবে—আহি জুমে হো। বাঙ্গালা অপেক্ষা শান্তালীতে সচরাচর হসন্ত শব্দের সংখ্যা কম দৃষ্ট হইলেও শাস্তালীতে যে হসন্ত শব্দের প্রয়োগ একেবারে নাই, এমন নহে, যেহেতু তাহারা ১৮৫৮ সালে বিদ্রোহ করিতে সাহস করিয়াছিল।" আমরা কিন্তু এই বিদ্রোহের অন্ত-রূপ কারণ বিদিত ছিলাম। হসন্ত যে তাহাব মূল কারণ, বিপিন বাবু প্রসাদাৎ এখন জানা গেল। ইহার পর বিপিন কি বলিতেছেন, শুনুন—"কিন্তু এমন একটী জাতি আছে, তাহাতে হসন্ত শব্দের প্রয়োগ এত অল্প যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা যেখানে কথিত ভাষায় হসন্ত শব্দ উচ্চারণ না করিয়া থাকিতে পারি না, সেখানে তাহারা স্বরান্ত উচ্চারণ করিবে। তাহাদের মেরুদণ্ডের অবস্থাও তাহাদের ভাষার সদৃশ। এমন দুর্ব্বল ভাষা এবং এমন দুর্ব্বল জাতি জগতে আছে কি না, সন্দেহ। পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন যে আমরা উড়িয়া ভাষা এবং উড়িশ্যাবাসিদের কথা বলিতেছি। উড়েদের ভাষা শুনিলেই মনে হয় যে, তাহাদের শরীরের সন্ধিস্থলের সমস্ত সংযোগ একেবারে শিথিল হইয়া গিয়াছে। একটী গল্প বলিয়া একথার সত্যতা দেখাইতে চাই। কোন সাহেবের এক উড়ে বেহারা ছিল, সে একবার ছুটী লইয়া দেশে যাইবার সময় অন্য এক উড়েকে তাহার স্থলে রাখিয়া যায়, এবং উপদেশ ছলে তাহাকে বলিয়া যায় যে, যখন সাহেবো বলিবে, বরং দি উআটর, ধাই করি জল পকাইবা। আর যখনো সাহেবো বলিবে ডেমো রাসকেলো, তখন বুঝলো যে কপালো ভাঙ্গলো" ইত্যাদি।

বিপিন বাবু উৎকল ভাষার এবং জাতির কুৎসা রটনার জন্য অনেক গুলি নিতান্ত অসঙ্গত ও অলীক কথা সাজাইয়া লিখিয়াছেন, তাহা এস্থানে পুনঃ উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। তিনি উড়িয়া বেহেরার মুখে উৎকল ভাষার যে অনুবাদ দিয়াছেন, তাহাত উড়িয়া ভাষা নয়ই,কোন উৎকলবাসী এরূপ ভাষা বলে না, কেহই ইহা বুঝিবে না, কথাগুলি শুনিলে নির্ব্বোধ পাগলের প্রলাপ বাক্যের ন্যায় বোধ হয়। বিপিন বাবুর উৎকল ভাষায় বিন্দু বিসর্গ জ্ঞান নাই, সাহস পূর্ব্বক আমরা একথা বলিতে পারি। কোন ভাষা-জ্ঞান-শূন্য লোকের সেই ভাষার প্রতি মন্তব্য প্রকাশ করা নিতান্ত হাস্যকর বিষয় নয় কি?

আমরা বিপিন বাবুর কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম, কিন্তু গৃহস্থ একখানি বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা, ইহার কতকগুলি পাঠক থাকিবার কথা, এই অসঙ্গত প্রবন্ধটী পাঠ করিলে উৎ-কল জাতি ও ভাষার প্রতি পাঠকের একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মিতে পারে। এক্ষেত্রে বিনা প্রতিবাদে বঙ্গসাহিত্য মধ্যে এমন একটা মিথ্যা-কল্পিত প্রবন্ধকে স্থান দেওয়া উচিত বলিয়া বোধ করি না।

শিক্ষিত বঙ্গবাসী মাত্রেই অবগত আছেন, —ভারতবর্ষে প্রচলিত তিন শতাধিক ভাষার মধ্যে চিহ্নিত ভাষা গণনায় উৎকল ভাষা অন্ত-তম। ২৫শত বৎসর পূর্ব্বে মহামুনি শাক্য-

সিংহ কপিলবস্তু গ্রামে ভাবী শ্বশুরের সম্মুখে যে ৬৪ লিপি লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে উৎকল লিপি অন্যতম। (ললিতবিস্তর)।

বাঙ্গালী ও ইংরাজের মহামহা জ্ঞানিগণ উৎকল ভাষা এবং জাতি সম্বন্ধে রাশি রাশি প্রবন্ধ পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন—বিপিন বাবু ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক সে সমস্ত না পড়ুন, অন্ততঃ কর্ম্মদেবী প্রভৃতি কাব্য লেখক কবি ৺রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন রহস্য সন্দর্ভ নামক মাসিক পত্রিকায় উৎকল ভাষায় লিখিত মহাকাব্য বৈদেহীয়াবিলাস সম্বন্ধে যে মন্তব্য ও অনুবাদ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা, এবং গ্রন্থকার-জমিদার পুরী জিলা গবর্ণমেন্ট প্লীডর বাবু গোপালচন্দ্র প্রহরাজ ভারতী মাসিক পত্রিকায় উৎকল ভাষা সম্বন্ধে যে একটী চিন্তাশীল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

সহস্রাধিক বৎসর প্রাচীন সুললিত সুগঠিত ভাষায় লিখিত সহস্রাধিক কাব্য নাটক ইতিহাস যে ভাষায় বিদ্যমান, সে ভাষা সম্বন্ধে ঈদৃশ কুৎসিত ভাষায় মন্তব্য প্রকাশ করা একজন শিক্ষিত বঙ্গবাসীর পক্ষে উচিত কি?

ভারতে এত জাতি ও ভাষা সত্ত্বেও বিপিন বাবু নিরক্ষর শান্তাল ভাষা উল্লেখ করিয়া উড়িয়া ভাষা যে তাহাদের অপেক্ষা অধম, ইহাই প্রমাণ করিতে চান, তজ্জন্য উৎকল ভাষা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিলাম।

বিপিন বাবু বলেন, উড়িয়াদের মেরুদণ্ড নাই, নিতান্ত দুর্ব্বল জাতি। বন্য শান্তালেরা ১৮৫৮ সালে কোথায় একটা বে-আইনী জনতা করিয়াছিল, তাহা উল্লেখ করিয়া বিপিন বাবু শান্তালদের বীরত্ব ঘোষণা করিয়াছেন—কর্ণাট-বিজেতা প্রাচীন বীর জাতি উড়িয়াদের বীরত্বের কোন প্রমাণ পান নাই, ইহা কিছু আশ্চর্য্য বিষয় নহে, প্রাচীন ঐতিহাসিক বিষয় যে-সে লোকের অবগত হওয়া সম্ভবপর নহে। বিপিন বিহারী বাবু প্রবন্ধ লিখিবার পূর্ব্বে, স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর কোন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলে সহজে জানিতে পারিতেন, ভারতবিজয়ী মহাবীর মহারাষ্ট্রেরা পুনঃ পুনঃ উৎকল আক্রমণ করিয়া কোন দিন সম্মুখ যুদ্ধে বিজয় লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। অবশেষে নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলা উড়িষ্যার রাজাদিগের নিকট হইতে কয়েক পণ মাত্র কড়ি নামমাত্র কর স্বরূপ গ্রহণ করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

২য়তঃ, ১২০৩ খ্রীঃ বক্‌তিয়ার বঙ্গদেশ অধিকার অবধি ১৪ শত খ্রীষ্টাব্দ শেষ ভাগ পর্য্যন্ত মুসলমানেরা উৎকল আক্রমণ করিয়া পুনঃ পুনঃ উড়িয়া পায়েক দ্বারা পরাজিত হইয়াছেন। উৎকল উত্তরাংশস্থ সুবর্ণ রেখা নদী অতিক্রম করিয়া অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম হন নাই।

(১৪ শত খ্রীষ্টাব্দের মধ্য ভাগে) একদা মুরশিদাবাদ সুবাদার সেনাপতি ১৫ সহস্র অশ্বারোহী এবং পদাতিক সেনা সহিত উৎকলের উত্তর দ্বার স্বরূপ সুবর্ণ রেখার পার্শ্ববর্ত্তী বারবাটিয়া দুর্গ অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া তত্রস্থ ২৫০ শত খণ্ডায়েত পায়েক দ্বারা কিরূপ পরাস্ত, লাঞ্ছিত এবং দাঁতন পর্য্যন্ত বিতাড়িত হইয়াছিলেন, শয়দ মুতাক্ষরীণ লিখিত পারস্য গ্রন্থে কিম্বা তাহার ইংরাজী অথবা বাঙ্গালা অনুবাদ নব্যভারতে বিপিনবাবু ইচ্ছা করিলে পাঠ করিতে পারেন।

মহামান্য ভারত-সম্রাট মহোদয়ের কলিকাতায় পদার্পণ সময়ে বহু শতাব্দী যুদ্ধবিদ্যায় অনভ্যস্ত উৎকলীয় বীর পায়েকদিগের কলি-

কাতা মধ্যে শোভাযাত্রা যাঁহারা দেখিয়াছেন, বিপিনবাবু তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে "উড়িয়াদের মেরুদণ্ড" আছে কি না, জানিতে পারিবেন। সম্প্রতি সাম্য, মৈত্রী, প্রেম প্রীতি প্রচারের সময় অজ্ঞতা অথবা বিদ্বেষ ভাবে জাতি বিশেষের কুৎসা রটনা দ্বারা প্রতিবাসী দুই জাতির মধ্যে অনর্থক বিবাদ বাধাইয়া দেওয়া কি ভদ্রসন্তানের পক্ষে উচিত? বিষয়টীর অনিষ্টকারিতা চিন্তা করিবার জন্য বিপিনবিহারী বাবুকে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীফকীরমোহন সেনাপতি।

৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(আদ্যশ্রাদ্ধোপলক্ষে পঠিত)

স্বর্গীয় প্রীতরাম বন্দ্যোপাধ্যায় ভুপুকুলিয়া কুলীন। এক শতাব্দীর পূর্ব্বে কৌলীন্য মর্য্যাদাই বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলীর প্রধান সম্মান ও সম্পদ বলিয়া পরিগণিত ছিল। সুতরাং প্রীতরামের পিতা ও পিতামহ তদানীন্তন সমাজের সর্ব্বোচ্চ সম্মান ও সম্পদের অধিকারী ছিলেন। প্রীতরাম বাঙ্গালা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পিতৃভবন পরিত্যাগ করিয়া (অধুনা) ২৪-পরগণার অন্তর্গত বারাসতের অদূরবর্ত্তী নলকুঁড়া গ্রামে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। সুস্বভাব, সরলচিত্ত, কুলমর্য্যাদাসম্পন্ন কৌলীন্য-সম্পদ সম্ভ্রমবিশিষ্ট প্রীতরাম মহারাজচক্রবর্ত্তী কৃষ্ণচন্দ্র প্রদত্ত পঞ্চাশ বিঘা ভূমি সম্বল লইয়া নূতন সংসারের সূচনা করিলেন। অন্নবস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সম্মানেরও অভাব হইল না। প্রীতরামের রচিত নূতন সংসারে, সন ১২১২ সালে একটী নবকুমার, পরবর্ত্তী ১৬ সালে একটী কন্যারত্ন ও ২১ সালে আর একটী পুত্ররত্ন ভূমিষ্ঠ হইল। প্রীতরাম জ্যেষ্ঠ পুত্রের নৃসিংহরাম ও কনিষ্ঠের রামকমল এবং কন্যার ত্রিপুরাসুন্দরী নাম রাখিলেন। পিতামাতার লোকান্তর গমনকালে রামকমল কিশোর-বয়স্ক বালক ছিলেন। রামকমল বিংশবর্ষে পদার্পণ করিলে নলকুঁড়ার নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণমুড়ার স্বর্গীয় রামরতন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা প্রসন্নময়ীর সহিত রামকমলের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। রামকমল যখন পরিণয়পাশে আবদ্ধ হন, সে সময়ে তিনি পাঠশালার সমগ্র পাঠ শেষ করেন, কিন্তু এই বিবাহ-বন্ধন তাঁহার গৃহে অবস্থান ও জ্ঞানার্জ্জনে বিঘ্ন ঘটাইল। অশান্তির মাত্রা অসহ্য হওয়ায় রামকমল কাহাকেও না বলিয়া চুপে চুপে গৃহত্যাগ করিলেন, দেশত্যাগ করিলেন এবং বহু দুঃখ কষ্ট ভোগের পর কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। রামকমলের কাশীযাত্রা কালে ষষ্ঠ বর্ষীয়া বালিকা পত্নী প্রসন্নময়ী মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন। রামকমল নিজ গুণে ত্বরায় কাশীর তদানীন্তন বাঙ্গালী ভদ্রমণ্ডলী মধ্যে প্রতিষ্ঠাবান হইয়া উঠিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক তেজস্বিতা, অকপটতা, ধর্ম্মে আস্থা ও আচারে নিষ্ঠা ত্বরায় তাঁহাকে সকলেরই সম্মানভাজন করিয়া তুলিল। সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে লোকের প্রিয়কার্য্য সাধন তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মে পরিণত হইল। কাশীধামে অবস্থান কালে রামকমল

একনিষ্ঠ হইয়া মনের সাধে বিদ্যোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্বভাব চরিত্র, আহার ব্যবহার, শীলতা সৌজন্য সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভ করিল। আট বৎসর কাল গুরুসন্নিধানে অবস্থান পূর্ব্বক পল্লীগ্রাম-বাসী রামকমল প্রকৃত জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব লাভে সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন সুন্দর একটী মানুষে পরিণত হইলেন। কি বাঙ্গালী, কি ভিন্নদেশ-বাসী, কি ইতর, কি ভদ্র, কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেই রামকমলের সহিত আলাপ পরিচয়ে ও তাঁহার বিদ্যাবত্তায় পরিতুষ্ট হইতেন। এইভাবে আট বৎসরকাল কাশী-ধামে অবস্থিতি করিয়া পাঠান্তে রামকমল, সার্ব্বভৌম উপাধিলাভ করিয়া, সম্মান সম্পদের অধিকারী হইয়া তীর্থযাত্রা করিলেন। ত্রয়োত্রিংশ বয়ঃক্রম কালে রামকমল বিদ্যাশিক্ষা, শাস্ত্রালোচনা ও তীর্থপর্য্যটন সমাপন করিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইলেন।

সন ১২৬৩ সালের ৫ই শ্রাবণ তারিখে রামকমলের গৃহে একটী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। গৃহের সকলেরই আনন্দের সীমা রহিল না। প্রতিবেশীবর্গের সমাগম ও আনন্দ-কোলাহলে গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। বলা বাহুল্য যে, ঐ সনের ঐ তারিখে রামকমলের গৃহে আমাদের পূজনীয় পিতৃদেব চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ছয় মাস অতীত হইলে নামকরণ ও অন্নপ্রাশনের সময় পিতৃদেবের নাম হইল বিশ্বেশ্বর ও আমাদিগের পিতামহী তাঁহার ডাক-নাম রাখিয়াছিলেন চণ্ডীচরণ। যে সকল কারণ বিদ্যমান থাকিলে, যে সকল অবস্থার সংঘটন হইলে শিশুর সৌভাগ্যের সীমা থাকে না, যে সকল উচ্চ অধিকার মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ অধিকার, সেই সকল গুলির সমাবেশের মধ্যস্থলে পিতৃদেব জন্মগ্রহণ করেন। আমার পিতামহের সমসাময়িক পণ্ডিতমণ্ডলী বঙ্গের গৌরবের জিনিষ। সে সময়ে কলিকাতার জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি মহোদয়গণের সহিত পিতামহের পরিচয় ও আত্মীয়তা ছিল। পিতামহের লোকান্তর গমনের প্রায় বিংশ বৎসর পরে আমার পিতৃদেবের পরিচয় গ্রহণ কালে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের পিতামহকে স্মরণ করিয়া তদীয় পুত্র বলিয়া পিতৃদেবকে বিশেষ সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমার পিতামহ বিদ্যাগৌরবে গৌরবান্বিত ব্যক্তি হইলেও তাঁহার চরিত্র-মর্য্যাদা তদপেক্ষা শতগুণে অধিক ছিল। আমাদের পিতৃদেবকে আমরা সেই পিতামহের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ দেখিয়াছি। আমার পিতৃদেবের আর তিনটী ভ্রাতা ও তিনটী ভগ্নী ছিলেন। নবম বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতৃদেব পিতৃহীন হন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবনের শেষ-সম্বল জননীকেও তিনি হারাণ। সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া সংসার পরিত্যাগ করিলে পিতা মাতার প্রাণে যে অপার্থিব আনন্দের সঞ্চার হয়, আমার পিতামহ পিতামহী কাহারও ভাগ্যে সে সুখ ঘটে নাই সত্য, তথাপি তাঁহাকে মানুষ করিবার রামকমলের সে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা তিনি সেই বয়সে জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই পিতৃদেবকে নানা প্রকার বিপদের ভিতর হইতে উদ্ধার করিয়া, জীবনে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে চিরদিন সহায়তা করিয়াছিল। তিনি মাতৃপিতৃহীন হইয়া যে ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে বুঝি পাষাণও গলিয়া যায়। আজ আমরা শোকসন্তপ্ত

হৃদয়ে তাহা স্মরণ আর যাতনা বৃদ্ধি করিতে চাই না। সাতটী ভ্রাতা ভগ্নীদিগের মধ্যে একে একে সকলেই পরলোক গমন করিলে পিতৃদেব এক কনিষ্ঠ ভগ্নী লইয়া মাতৃপিতৃহীন হন। তখন বালিকা ভগ্নী শ্বশুরালয়ে। পিতৃদেব তখন এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের নিকট আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। বিষয় সম্পত্তি যথেষ্ট ছিল, তাহা তাঁহার হস্তগত হইলে তাঁহাকে পথের ভিখারী করিয়া দিয়া নিজে-দের সম্পত্তি বৃদ্ধি করাই তাঁহার গ্রাম্য সুহৃদ্-দিগের একমাত্র অভিপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়া-ছিল। পিতৃদেব তাহা বুঝিয়াও বুঝিলেন না। সুতরাং যাহা ছিল, ত্বরায় নিঃশেষ হইয়া গেল। তিনি একাকী জীবনের পথে ভাসি-লেন। পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক জন্মভূমি ও তৎ-সংসৃষ্ট সমস্ত প্রিয় পদার্থ পশ্চাতে ফেলিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনাহারে অনিদ্রায় পথে পথে ঘুরিয়া নানা প্রকারে নির্যাতন ভোগ করিয়া কুটিল বুদ্ধি, সুরামত্ত ব্যক্তিদিগের ভিতর পড়িয়াও তিনি আপ-নাকে সৎপথে রাখিবার কত আয়োজন করিতেন এবং সংসারের প্রতিকূল অবস্থা কতবার যে তাঁহার সে যত্ন চেষ্টা ভাঙ্গিয়া দিত, তাহা বলিবার নহে।

এরূপ অবস্থায় দিন কাটিতে কাটিতে ভাগ্যদেবতা তাঁহার প্রতি একটু প্রসন্ন হইলেন। তিনি এক ভদ্রলোকের গৃহে আশ্রয় পাইয়া এবং পুত্রবৎ স্নেহ পাইয়া লেখাপড়া শিখিতে লাগিলেন। কিন্তু অচিরে তাঁহার সে সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হইল; সেই গৃহেরই আর একটী পালিত সন্তান তাঁহাকে গৃহের কর্ত্তা ও গৃহিণীর অসন্তোষভাজন করিবার জন্য প্রাণপণে যত্নবান হইল। পিতৃদেব যে অল্প সময়ের ভিতর নিজের গুণাবলীতে তাঁহাদের উভয়কে ও অপর দশজনকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহাদের হৃদয় মন জয় করিতে-ছিলেন, তাহা তাহার বিশেষ যাতনার কারণ হইল। সুতরাং তাঁহাকে অবিলম্বে সে গৃহ পরিত্যাগ করিতে হইল। এই অল্প সময়ের ভিতর তিনি যাহা কিছু লেখাপড়া শিখিয়া-ছিলেন, তাহা সম্বল করিয়াই চাকুরীর উদ্দেশ্যে ঘুরিতে লাগিলেন। নানা প্রকার ক্লেশভোগ করিয়া চটেরকলে এক চাকুরী পাইলেন এবং এক স্থানে রন্ধনের কাজ করিয়া লেখাপড়া চালাইতে লাগিলেন। কিছুদিন এই স্থানে কাটাইলে তিনি বুঝি-লেন যে,সে স্থান তাঁহার হৃদয় মন ও মর্য্যাদার সম্পূর্ণ অনুপযোগী। সুতরাং চাকুরী ছাড়িতে বাধ্য হইলেন। চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া ঘটনা-সূত্রে তিনি নড়াইল উপস্থিত হন এবং সেখানে সামান্য বেতনের এক স্কুলের চাকুরী সংগ্রহ করেন। তথায় অবস্থান কালে তত্রত্য ২।৪ জন ভদ্র ব্রাহ্ম বন্ধুর সমাগমে তাঁহার মন ব্রাহ্মসমা-জের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এইরূপে নড়াইলের রাজার ম্যানেজার পূজনীয় স্বর্গীয় রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পিতৃদেবের আলাপ হয়। তিনি ক্রমশঃ পিতৃদেবের পরিচয় পাইয়া, তাঁহার প্রকৃত অবস্থা অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন এবং তাঁহার ভিতরের উচ্চ ভাবের পরিচয় পাইয়া বুঝিলেন ও ভাবিলেন, ইহাকে মানুষ করিতে হইবে। অতএব পিতৃদেবকে পরামর্শ দিয়া স্কুলের চাকুরী হইতে সরাইয়া লইয়া নিজ গৃহে লইয়া যাইয়া অপত্য নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতে লাগিলেন এবং পুত্রের ন্যায় লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন। ফলতঃ, তিনি সে সময়ে সেই অসহায় যুবকের পিতার কার্য্য করিয়াছিলেন। পিতৃদেব সেই সময়ে গোপনে উপবীত পরিত্যাগ করেন।

পিতৃদেব লেখাপড়া শিখিয়া রাধাকান্ত বাবুর গৃহ হইতে অন্যত্র যান, পরে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বিদ্যা-বত্তার পরিচয় পাইয়া, তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া এবং তাঁহার নানাপ্রকার গুণে মুগ্ধ হইয়া উপযাচক হইয়া পোষ্ট আফিসের এক কাজে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। তখন তাঁহার বেতন সামান্য হইয়াছিল। সেই সময় পিতৃদেব তাঁহার বালিকা বিধবা ভগ্নীকে ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত করেন এবং ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে তাঁহার অসবর্ণ বিবাহ দেন। পিতৃদেব উচ্চ ব্রাহ্মণবংশ সম্ভূত হইলেও জাতিভেদ মানিতেন না। ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিরই আচার ব্যবহারে, শীলতা ও সৌজন্যে সকল বিষয়ে তাহাদিগকে ব্রাহ্মণের ন্যায় দেখিলে জাতি-নির্বিশেষে তাহাদিগকে ব্রাহ্মণের ন্যায় সমাদরে গ্রহণ করিতেন। নিজ জীবনেও তিনি তাহার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্ম-সমাজের তদানীন্তন সাধু ও সাধারণ জন-মণ্ডলীর সহিত তিনি পরিচিত ও আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁহার যে কি এক মোহিনী-শক্তি ছিল, যাহা দ্বারা লোকে অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইত। ইহা সকলের ভাগ্যে নিশ্চয়ই ঘটে না, সুতরাং ইহা তাঁহার ও আমাদের অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। এই সময়ে তিনি সাহাপুরের স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠনাথ রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহে তাঁহার গৃহে উপর্য্যুপরি ৪টী পুত্র সন্তান ও তিনটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মাতৃপিতৃহীন পরগৃহ-পালিত আমাদের পিতৃদেব সর্ব্ব প্রকারে তাঁহার যে উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা এক অপূর্ব্ব ঘটনা। আমরা পরে বুঝিয়া-ছিলাম, তিনি অসাধারণ জিনিষে গঠিত ছিলেন। তিনি অর্থ হিসাবে ধনী ছিলেন না, কিন্তু আর যে সকল বিষয়ে ধনী ছিলেন, তাহাতে অর্থের প্রয়োজন হয় না, সেখানে অর্থ খেলার সামগ্রী। অন্যান্য পুস্তকের সহিত প্রাতঃস্মরণীয় অমর পুরুষ মহাত্মা বিদ্যা-সাগরের জীবনী লিখিয়া সাহিত্যসমাজে তিনি তাঁহার নাম অক্ষয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সুবক্তা বলিয়াও তাঁহার অল্প প্রতিষ্ঠা ছিল না। জগতে কি ধনী কি দরিদ্র, অধিকাংশ লোকই অর্থোপার্জন করিয়া নিজ পরিবার পালনে সতত ব্যস্ত। কিন্তু পিতৃদেব অর্থে ধনী না হইয়াও দরিদ্রের দুঃখ মোচনের জন্য সতত যত্নবান ছিলেন। নিজ পরিবারের সহিত ক্লেশ ভোগ করিয়া অসংখ্য ব্যক্তির অন্ন-বস্ত্র যোগাইতেন। এবং তাহাতে কি অপূর্ব্ব আনন্দ ভোগ করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে না দেখিলেও, তাঁহার শেষ জীবনে দেখিয়াছি। তাঁহার ধর্ম্মজীবন অতি সুন্দর। শুধুই চোখ বুজিয়া উপাসনা করা তাঁহার ধর্ম্মের পদ্ধতি ছিল না। "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনামেব" ইহাই মানিয়া তিনি সারা-জীবন চলিয়াছেন। এইজন্য ব্রাহ্ম-সমাজে ব্রাহ্ম-ভ্রাতৃমণ্ডলীর সহিত তিনি একযোগে কাজ করিতে পারেন নাই। অতিশয় স্পষ্টবক্তা ছিলেন এবং ব্রাহ্ম-সমাজের জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াও আশাপ্রদ ফল প্রসূত হইতে না দেখিয়া ইদানীং তিনি সমাজের কার্য্যকলাপ হইতে দূরে দূরেই থাকিতেন। তাঁহার উদারতা, সহৃদয়তা, তেজস্বিতা প্রভৃতি সদ্গুণাবলী ও সাহিত্য সমাজে তাঁহার ভারতব্যাপী সুনাম তাঁহার সন্তানদিগের যে অতুল সম্পত্তি, তাহাতে কি সন্দেহ আছে ?

এই পুণ্যাত্মা বাণীর কৃতীসন্তান শেষ জীবনে যে নানাপ্রকারে ক্লেশ ভোগ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আজ শোকসন্তপ্ত হৃদয়কে আরও অধিক যাতনা প্রদান করিতেছে। কিছুকাল হইতে তিনি হৃদ্‌রোগে ভুগিতে-ছিলেন এবং অসুস্থ হইয়া পড়ায় সময়ে সময়ে অর্থের জন্য যে ক্লেশ পাইতে হয় নাই, তাহাও নহে। এই রুগ্ন শরীরে ষোড়শ বর্ষীয় সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র সুপ্রকাশকে হারান। সেই অবধি আমাদের পিতামাতার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তদুপরি বিধাতা তাঁহাদিগকে আর এক দারুণ যাতনা দিয়া জীবন্মৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আজ দেড় বৎসর হইল, আমেরিকা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কালে আমাদের অগ্রজ ইন্দুপ্রকাশ সাগর-গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছেন। এই সকল ক্লেশের উপর তাঁহার ন্যায় মহদ্ব্যক্তি নানা প্রকারে যে ক্লেশ ভোগ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অবর্ণনীয়। তিনি জীবিত থাকিতে তাঁহার ক্লেশ দেখিয়া জননী ও ভগিনীত্রয়ে কত সময়ে যে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়াছি, তাহা বলিবার নহে। তিনি এই জগতের সেই সকল ক্লেশের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন ভাবিলে, এই শোকদগ্ধ হৃদয়ে যে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাই, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে অগ্রজের ন্যায় পিতারও আকস্মিক অন্তর্ধানে হৃদয়ে যে দারুণ যাতনা বহন করিতেছি, তাহা বুঝি বিধাতা ভিন্ন কাহাকেও বুঝাইবার উপায় নাই। বিধাতা দেবলোকে সেই পুণ্যাত্মাকে শান্তিতে রাখুন, তাঁহার চরণে এই শোকদগ্ধ পরিবারের একান্ত প্রার্থনা।

শোকসন্তপ্তা কন্যা,

শ্রীশেফালিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঁকীপুর সাহিত্য-সম্মিলন।

বর্দ্ধমানের সম্মিলনেই বাঁকীপুরে সম্মিলন আহূত হইয়াছিল—সেই সময়েই বাঁকীপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ সুহৃদ্বর রায়সাহেব শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে তাঁহার আলয়ে আতিথ্যগ্রহণার্থে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। 'যাইব' বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলাম—ভগবদিচ্ছায় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি। যদিও নানা কারণে যশোহরে যাইতে পারি নাই—বাঁকীপুরে নানা বিঘ্নবাধা সত্বেও উপস্থিত হইয়া সুহৃদ্বর্গের ও বিদ্বজ্জনের সমাগম লাভে ধন্য হইয়াছি।

এবার সম্মিলন বড়দিনের ছুটিতে হইল—পূর্ব্বে এইরূপ আর হয় নাই। বড়দিনে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীর খ্রীষ্টমাস্‌ কন্‌সেশন থাকে—মধ্যম শ্রেণীরও কতকটা সুবিধা হয়—কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর কোনও সুবিধা হয় না। ১৯১২ অব্দ হইতে ইষ্টার্ণ-বেঙ্গল ও আসাম-বেঙ্গল-রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে এক ভাড়ায় যাতায়াত সকল শ্রেণীর যাত্রীর পক্ষেই বিহিত করিয়াছেন—এবার এ-বি-আর্‌ মাত্র কন্‌সেশন দিলেন—ই-বি-আর্‌ বা অন্য কোনও রেলওয়ের কর্ত্তারা তাহা দিলেন না। ইহাতে অপর শ্রেণীর বিশেষ কোনও অসুবিধা হইল না—কেবল তৃতীয়

শ্রেণীর আরোহিগণেরই সুবিধা হইল না। দরিদ্রের প্রতি অনুগ্রহ কে-ই বা করে?

সাহিত্য-সম্মিলন রবিবার (৯ই পৌষ) আরম্ভ হইবার কথা। তৎপূর্ব্বদিন শনিবার তদুপলক্ষে যে প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহার উদ্বোধন হয়। আমি শনিবার প্রত্যূষে বাঁকীপুর পৌঁছায় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন ব্যাপারে উপস্থিত ছিলাম। বিহারোৎকলের লেফ্‌টেনেণ্ট্ গভর্ণর স্যর্ এডওয়ার্ড গেইট্ বাহাদুর একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান পূর্ব্বক প্রদর্শনী খুলিয়া দিলেন। প্রদর্শনীর বস্তুজাত বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ ছিল—একবার সংক্ষেপে দেখিয়া লইলাম। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের অনুকম্পায় স্যর্ এড্‌ওয়ার্ড গেইট্ বাহাদুরের সমক্ষে উপস্থাপিত ও প্রদর্শিত হইলাম। তাঁহার প্রণীত আসামের ইতিহাস সমালোচনা উপলক্ষে এবং কামরূপ অনুসন্ধান-সমিতির ব্যাপারে গেইট্ বাহাদুরের সঙ্গে পত্রালাপ ছিল—এবার চাক্ষুষ হইল।

পরদিন রবিবার মধ্যাহ্নে সম্মিলনের কার্য্যারম্ভ হইল। রিপণ-দাশী থিয়েটারের প্রকাণ্ড গৃহে সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি-প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ষ্টেজের উপরে সমাসীন হইয়াছিলেন। অপর সাধারণ নিম্নে স্থান পাইয়াছিলেন।

এবার সম্মিলনের সভাপতি ছিলেন, মাননীয় জষ্টিস্ স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয়। তাঁহাকে দেখিবার জন্য সহরের আবালবৃদ্ধবনিতার, বিশেষতঃ বাঙ্গালী অধিবাসিবর্গের সমাগমে সুপ্রশস্ত গৃহটী এমন জনাকীর্ণ হইয়াছিল যে 'ন স্থানং তিল ধারণে'। ফলতঃ, বিদ্যাবুদ্ধিতে, পদ-পদার্থে গৌরবাস্পদ সভাপতি মহাশয়ের দর্শন-লাভ কাহার না স্পৃহনীয়?

সূচনায় যথারীতি স্তোত্র পাঠ, সঙ্গীত ইত্যাদির পরে গত বর্ষের সভাপতি মহা-মহোপাধ্যায় আচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় অভিভাষণানুকল্পে একটী বক্তৃতা প্রদান করিলেন—ইহাতে সার কথা বড় বেশী কিছু ছিল না—তবে আদ্যন্ত স্যর্ আশুতোষের স্তুতিবাদ ছিল। বিদ্যাভূষণ মহাশয় নানা ভাষায় কৃতী, উচ্চপদাভিষিক্ত, এবং সাহিত্য সেবায়ও অনুরক্ত; বিশেষতঃ তাঁহার স্বাভাবিক অমায়িকতায় সকলেই মুগ্ধ। কিন্তু স্যর্ আশুতোষের অতি প্রশংসা-বাদে একেবারে আত্মহারা হইয়া যে নিজেও উপহাসাস্পদ হন—অথচ স্তুতিভাজনকেও যে লঘু করেন, এটা তিনি বুদ্ধিমান্ হইয়া বুঝেন না, ইহাই দুঃখের বিষয়। যশোহর সাহিত্য-সম্মিলনের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণীতে দেখিলাম, তিনি ঐ সম্মিলনে যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে আছে—"গদ্য ও পদ্য সাহিত্যে যাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বনামধন্য স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ইত্যাদি"। অর্থাৎ বঙ্গভাষায় গদ্য পদ্য লেখকগণের নাম গ্রহণে স্যর আশুতোষের নাম সর্ব্বাগ্রে কীর্ত্তনীয়!!

আবার ইহাতে একটু বেশ রহস্যও আছে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় যশোহরে যে মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে গদ্য পদ্য লেখকগণের তালিকায় সর্ব্বাদৌ দূরে থাকুক, কুত্রাপি স্যর আশুতোষের নাম ছিল না—পরে কার্য্যবিবরণ মুদ্রিত হইবার সময়ে সম্ভবতঃ তিনি ভ্রম (?) সংশোধন পূর্ব্বক স্যর আশুতোষের নামটী শীর্ষস্থানে যুড়িয়া দিয়াছেন! ধন্য বিদ্যাভূষণ মহাশয়! পরিতাপের কথা যে, স্যর আশুতোষ এই সকলের প্রশ্রয় দিয়া থাকেন।

অতঃপর অনুপস্থিত ব্যক্তিগণের পত্র পঠিত হইল—তন্মধ্যে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পত্রখানিতে দু একটী অনর্থক বিষয়েরও উল্লেখ ছিল। পশ্চাৎ তৎসম্বন্ধে আলোচনাও হইয়াছিল।

ইহার পরে "বিহার মঙ্গল" নামক একটী বৈদিক সঙ্গীত হইল—তৎপরে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সৌম্যদর্শন মাঙ্গবর রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর তদীয় অভিভাষণ পাঠ করিলেন। উপসংহার ভাগে প্রাচীন মগধের মাহাত্ম্য বিষয়ক তদীয় সংক্ষিপ্ত কথাগুলি বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছিল।

তার পর সভাপতি নির্ব্বাচনকল্পে যথা-রীতি প্রস্তাব সমর্থন ও অনুমোদন হইল। স্যর আশুতোষের গুণের অভাব নাই—তিনি বিদ্বান্, প্রতিভাবান্, অত্যুচ্চ পদাভিষিক্ত গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী, নানা উপাধিতে বিভূষিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান আকারে এক প্রকার গঠনকর্ত্তাই বটেন। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি সাহিত্য সম্মিলনে আসিয়া যোগ দিলে সম্মিলনের গৌরব প্রভূত পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়—আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তি তাঁহার ন্যায় বড় লোকের এক পংক্তিতে বসিতে পারিলেই কৃতার্থন্মন্য হই। ফলতঃ, তাঁহাকে অমায়িক ভাবে সাহিত্যসেবীদের সঙ্গে মিশিতে দেখিলেও একটা উৎসাহ উদ্দীপনা জন্মে—ইহাতেই সম্মিলনের সার্থকতা। যেস্থলে 'কৃতার্থ-ব্যাপ্তি'ই যথেষ্ট, সেস্থলে স্তুতিবাদ অনাবশ্যক—বিশেষতঃ তাহা যদি অমূলক হয়, তবে বাস্তবিক বিরক্তিরই কারণ ঘটে। স্যর আশুতোষ সম্বন্ধে তাদৃশ একটী কথা বারংবার শ্রুত হইল; সেটী এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রবর্ত্তন স্যর আশুতোষ দ্বারাই হইয়াছে। বিদ্যাভূষণ-প্রমুখ ব্যক্তি-গণের উদ্যোগে আশুতোষের যে মর্ম্মর দেহার্দ্ধ বাস্ট (bust) বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহে সংস্থাপিত হইয়াছে—তাহার নিম্নে পশ্চাদ্ভাগে লেখা হইয়াছে,—

His noblest achievement surest of all
The place of his mother tongue in step-mother's hall. *

ইহা কতদূর বিচার-সহ, দেখা যাউক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইতে ১৮৬৮ অব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষা বি-এ পরীক্ষায়ও পাঠ্য ছিল—বি-এতে পুরুষপরীক্ষা, প্রবোধ-চন্দ্রিকা, বত্রিশ সিংহাসন, কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ইত্যাদি গদ্য-পদ্য, সাহিত্য এবং ব্যাকরণও ছিল। তৎপর ১৮৬৯ হইতে ১৮৮৪ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা পুরুষ পরীক্ষার্থীর জন্যে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা ব্যতীত অন্যান্য পরীক্ষায় উঠিয়া গেল। এণ্ট্রান্স সংস্কৃতের সঙ্গেও একটা ইংরেজীতে বাঙ্গালা অনুবাদের পরীক্ষা গৃহীত হইত।

১৮৮৫ হইতে পরীক্ষা প্রণালীর অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে—কিন্তু বাঙ্গালা তেমনই থাকিয়া গেল। কেবল ১৮৮৬ অব্দ হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় অনুবাদের সঙ্গে বাঙ্গালা রচনা লিখিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল।

১৮৯১ অব্দের বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে তদানীন্তন ভাইস্ চ্যানসেলার পুণ্য-শ্লোক স্যর শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন—

"I also deem it not merely desirable but necessary that we should encourage the study of those Indian Vernaculars that have a literature, by making them

* সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি তাঁর ইহাই নিশ্চয়
মাতৃভাষা স্থান পায় বিমাতা আলয়।

compulsory subjects of our examinations in conjunction with their kindred classical languages. The Bengali language has now a rich literature that is well worth study. * * * In laying stress upon the importance of the study of our vernaculars, I am not led by any mere patriotic sentiment excusable as such sentiment may be, but I am influenced by more substantial reasons. I firmly believe that we cannot have any thorough and extensive culture as a nation unless knowledge is disseminated through our own vernaculars."

বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার প্রবেশ অথবা পুনঃপ্রবেশ ব্যাপারের শুভ স্বস্তিবচন এই সদাচারপূত ব্রাহ্মণের দ্বারা হইল। পূজ্যপাদ স্যর গুরুদাস এইখানেই ক্ষান্ত হইলেন না। অল্পদিন পরে যখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্থাপিত হইল, পরিষদের ১৩০১ সালের ১১ই ভাদ্র (১৮৯৪ অব্দের ২৬শে আগষ্ট) তারিখের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত মহোদয়দ্বয়ের পত্রানুসারে পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপিত হইল যে, প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিগণের গণিত, ভূগোল ও ইতিহাসের পরীক্ষা তাহাদের মাতৃভাষায় গৃহীত হউক; এবং এফ্-এ, ও বি-এ, পরীক্ষায় সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষার পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারিত হউক। এই প্রস্তাব উপলক্ষে তর্কবিতর্ক হইয়া "অবশেষে স্থির হইল যে, মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়দিগকে অনুরোধ করা হউক যে, তাঁহারা এ বিষয়ের অনুকূল ও প্রতিকূল পক্ষ প্রদর্শন পূর্ব্বক একটী নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব পরিষদের নিকট উপস্থিত করুন। করিলে পরিষদ তৎসম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য বোধ করেন, তাহা করিবেন।" *

এই কমিটী একটী সার্কুলার পত্র শিক্ষানুরাগী প্রধান প্রধান ব্যক্তি দেখিয়া প্রায় ২০০ জনের নিকটে প্রেরণ করেন এবং তাঁহাদের উত্তর পাইয়া একটী রিপোর্ট পরিষদের সভাপতির নিকটে দাখিল করেন। (যাঁহারা সেই রিপোর্ট ও তৎসম্বন্ধীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অভিমত দেখিতে চান, তাঁহারা পরিষদ পত্রিকা দ্বিতীয় ভাগ, ২য় সংখ্যার পরিশিষ্ট দেখিবেন।) উহা পরিষদে ১৩০২ সালের ৩০শে ভাদ্র তারিখের অধিবেশন উপস্থাপিত হইলে স্থির হইল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট্ সমীপে পত্র লেখা হইবে—এবং সেই পত্রের মোসাবিদা করিবার ভার স্যর গুরুদাস গ্রহণ করিলেন।

১৮৯৫ অব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে সেই চিঠি † বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নিকটে প্রেরিত হইল।

পরবর্ত্তী বর্ষের মার্চ্চ মাসে ফেকাল্টি অব্ আর্টস্এর অধিবেশনে স্বয়ং স্যর গুরুদাস ঐ আবেদন পত্র পেশ্ করেন, এবং বহু আলোচনার পরে এতদ্বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কল্পে একটী কমিটি গঠিত করা হয়, তাহাতেও স্যর গুরুদাস বলেন—এবং সত্যের অনুরোধে বলা আবশ্যক যে, স্যর আশুতোষ ঐ কমিটিতে ছিলেন। তবে তিনি যে এ বিষয়ে কোনও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। উপরিউক্ত ফেকাল্টির ১২ই ডিসেম্বরের অধিবেশনে

* সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, প্রথম ভাগ—২য় সংখ্যা, ১২২ পৃষ্ঠা।

† সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, দ্বিতীয় ভাগ—৩য় সংখ্যা ৩৯৯ পৃষ্ঠা।

কমিটি রিপোর্ট দাখিল করেন—তাহাতে স্যর গুরুদাসের নাম সর্ব্বাদৌ দৃষ্ট হয়। আবার স্যর গুরুদাসেরই প্রস্তাবে এবং স্বর্গীয় নীলমণি মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের সমর্থনে উহা পরিগৃহীত হয়। অবশেষে ১৮৯১ সালের জানুয়ারি মাসে সেনেট্ সভাতে রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং স্যর গুরুদাসের সমর্থনে এই নির্দ্ধারিত হয় যে, এফ্-এ, ও বি-এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষার রচনা পরীক্ষা গৃহীত হইবে, কিন্তু উহাতে উত্তীর্ণ না হইলেও কাহারও এফ্-এ, বি-এ, পাসের ব্যাঘাত হইবে না—উত্তীর্ণ হইলে সার্টিফিকেটে তাহা উল্লেখিত হইবে।

লর্ড কর্জ্জনের আমলে যে ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি কমিশন গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে পূজনীয় স্যর গুরুদাস সভ্য ছিলেন। এই কমিশনে যে রিপোর্ট দেন, তাহাতে আছে :—

"The vernacular languages should be introduced (as at Bombay) in combination with English as a subject for M. A. Examination. The M. A. Examination in the vernacular should be of such a character as to ensure a thorough and scholastic study of the subject. The encouragement of such study by graduates who have completed their general course should be of great advantage for the cultivation and development of vernacular languages. * * * We hope that the inclusion of vernacular languages in the M. A. course will give an impetus to their scholarly study. * * * We also think that vernacular composition should be made compulsory in every stage of the B. A. course although there need be no teaching of the subject."

ইহাতে স্যর গুরুদাসের হাত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। স্যর আশুতোষ এই কমিশনের যে সকল অধিবেশন বাঙ্গালা প্রদেশে হয়, তাহাতে "লোকেল মেম্বর" স্বরূপ ছিলেন বটে, কিন্তু রিপোর্টে তাঁহার হাত ছিল না।

এই কমিশনের রিপোর্ট গবর্ণমেণ্ট্ অব্ ইণ্ডিয়ায় পেশ্ হইবার পরে ইণ্ডিয়ান্ ইউনিভার্সিটিস্ এক্ট পাশ্ হয়; তার পরে ঐ রিপোর্ট এবং এক্ট অনুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "নিউ রেগুলেশনস্" হয়। অবশ্য স্যর আশুতোষের এই রেগুলেশন গঠনে কৃতিত্ব খুবই আছে—কিন্তু নূতন বিধানে বাঙ্গালা ভাষা যে ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে, তাহাতে স্যর আশুতোষের উদ্ভাবিত নূতন কিছু আছে বলিয়া তো দেখা যাইতেছে না। তিনি ভাইস্ চান্সেলার রূপে সুদীর্ঘকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন, এবং এখনও অন্ততঃ বাঙ্গালা পাঠ্যাদি বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট কর্ত্তৃত্ব আছে। যদি তিনি বঙ্গভাষায় পূর্ব্বের মত গদ্য-পদ্য সাহিত্য ও ব্যাকরণ পাঠ্য করিতে পারিতেন, যদি দেখিতাম, প্রত্যেক কলেজে ইংরেজী এবং সংস্কৃতের ন্যায় বঙ্গভাষারও সাহিত্যাদির অধ্যাপনা হইতেছে, তবে বরং অনন্যমনস্কে তাঁহার প্রশংসা বাক্যের অনুমোদন করিতাম। বরং রীডার নিয়োগে এবং রচনা রীতির আদর্শ বলিয়া বাঙ্গালা পুস্তক নির্ব্বাচনে তিনি যথোচিত বিচক্ষণতা ও নিরপেক্ষতা দেখাইতে না পারিয়া অপ্রশংসারই ভাজন হইয়াছেন। যখন 'রীডারশিপে' রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় নিযুক্ত হন, তখন স্যর আশুতোষের প্রশংসাবাদী কেহ বলিয়াছিলেন, —"আশুবাবু কাজটা ভাল করেন নাই, এই রীডারশিপ্ সর্ব্বপ্রথম মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে দেওয়া উচিত ছিল,

তৎপর বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুরই ইহা পাওয়া উচিত ছিল, তার পরে বরং দীনেশ বাবুর কথা উঠিতে পারিত।" রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বঙ্গসাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ সেবক; আজকাল বঙ্গসাহিত্য সেবাকেই যাঁহারা উপজীবিকা করিয়াছেন, দীনেশবাবু তাঁহাদের মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছেন। ইহা বঙ্গভাষার গৌরবের কথা এবং আমাদেরও আনন্দের বিষয়। কিন্তু যে সকল গুণ বঙ্গভাষার রীডারের বেশী আবশ্যক, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, প্রাচীন লিপি ইত্যাদিতে সম্যক্ জ্ঞান—তাহা দীনেশ বাবুর অপেক্ষা যে হরপ্রসাদ বাবুর সমধিক আছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে কি? অভিজ্ঞতা হিসাবেও শাস্ত্রী মহাশয়ের তুলনা আছে কি? যাহা হউক, এ বিষয়ে ইতোঽধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। * তার পর বাঙ্গালা পুস্তক নির্ব্বাচনেও দেখিতেছি, নানারূপ বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে, এস্থলে একটীমাত্র কথার উল্লেখ করিব। রচনার আদর্শরূপে যে সকল গ্রন্থ নির্ব্বাচিত হয়, তাহাতে সদৃশ রচনারীতিই থাকা উচিত। শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহোদয়ের "হিমালয়" সাধারণ পাঠ্যপুস্তক হিসাবে অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার রচনারীতি কলিকাতায় প্রাদেশিক ভাষানুগত—এই গ্রন্থের সঙ্গে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এবং কালীপ্রসন্ন ঘোষের বিশুদ্ধ সাধুভাষায় লিখিত পুস্তক নির্দ্দেশিত হইলে ছাত্রেরা কোন্ রচনারীতিকে অবলম্বন করিবে?

এ বিষয়ে অধিক আলোচনা এস্থলে অনাবশ্যক, তবে যাহা লিখা হইল, তাহাতেই পাঠক-সাধারণ বুঝিতে পারিবেন, বিমাতৃমন্দিরে মাতৃভাষা স্থাননান ব্যাপারে স্যর আশুতোষের কতটা সংশ্রব ও কতটা কৃতিত্ব। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ এবিষয়ে আলোচনা করিয়া ধন্য হইয়াছেন; এবং যদি কোনও ব্যক্তিবিশেষ এতদ্বিষয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করিয়া থাকেন—তবে তিনি মহাত্মা স্যর গুরুদাস।

এখন প্রকৃতের অনুসরণ করা যাউক। স্যর আশুতোষ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াই স্বীয় অভিভাষণ পাঠ করিলেন। অভিভাষণটী অতি সুন্দর হইয়াছে—এবং সবিশেষ উদ্দীপনাপূর্ণ। সুবক্তা স্যর আশুতোষের পাঠরীতিও উৎকৃষ্ট—আমরা তন্ময় হইয়া তদীয় বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া ধন্য হইয়াছি। অভিভাষণের সব কথাই যে সকলের অনুমোদনীয়—বিশেষতঃ তাঁহার নিজের সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তৎসমস্তই যে বিচার-সহ, সে কথা বলিতে পারি না। আমরা অতীত দেখিব না—ভবিষ্যতের প্রতি উৎসুক-নেত্রে নিরীক্ষণ করিব। মাত্র বৎসর খানেক হইল স্যর আশুতোষ সাধারণের সঙ্গে মিশিয়া সাহিত্যের বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন—ভগবান্ করুন যেন তাঁহার এই 'আরম্ভ' শুভফলপ্রদ হয়। এখন হইতে যদি আমরা

* এক হিসাবে স্যর আশুতোষের দ্বারা প্রকারান্তরে বঙ্গসাহিত্যের একটা উপকার হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাবলীর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া সম্প্রতি যে "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা" শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, হরপ্রসাদ বাবু 'রীডার' হইলে, উহা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা হয়তো ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হইত, ইহাতে বাঙ্গালা ভাষায় গৌরব বাড়িত বটে, কিন্তু সম্পদ বাড়িত না। পরন্তু এই মহাগ্রন্থের "মুখবন্ধ" পাঠ করিলে বোঝা যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কি জিনিস, এবং ইঁহাকে চাপিয়া রাখার প্রচেষ্টা কতদূর ন্যায়বিগর্হিত।

দেখি, স্যর আশুতোষ সংস্কৃত উপাধি বিতরণ সভায় ইংরেজীতে বক্তৃতা না দিয়া বাঙ্গালা-ভাষায় অভিভাষণ পাঠ করিতেছেন—যদি দেখি, বাঙ্গালীর নিকট চিঠি পত্র ইংরেজীতে না লিখিয়া বঙ্গভাষায় লিখিতেছেন—যদি দেখি, এশিয়াটিক্ সোসাইটির ইংরেজী ভাষায় গ্রন্থসঙ্কলন না করিয়া সাহিত্য পরিষদের নিমিত্তে (সেই বহুকাল পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত) কাশীদাসের মহাভারত সংস্কার পূর্ব্বক সম্পাদন করিতেছেন, তবেই আমরা কৃতার্থ হইব। আমাদের এই আশা ফলবতী হইবে বলিয়াই মনে হয়—কেন না, এই সম্মিলনের বক্তৃতার মধ্যে একটা 'আন্তরিকতা'র ভাব যেন ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। স্যর আশুতোষ অসাধারণ শক্তিমান্ ব্যক্তি—অশেষ প্রতিভাবান্ পুরুষ —বহু পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত সমুত্তীর্ণ। তাই এই অভিভাষণের দ্বারা তিনি বঙ্গ-সাহিত্যসেবিগণের নিকটে যদিও নিজকে এক বিষম পরীক্ষায় ফেলিয়াছেন—আমাদের ভরসা হয়, তিনি তাহাতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হইবেন।

শ্রোতৃবর্গের আনন্দ কোলাহলের মধ্যে বক্তৃতার অবসানে স্যর আশুতোষ আসন পরিগ্রহ করিলে দু একটী প্রস্তাব উপস্থাপিত হইল। প্রথমতঃ অচির-মৃত সাহিত্যসেবি-গণের নিমিত্তে শোকপ্রকাশ; তার পরে স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তোফীর পরিবারবর্গের ভরণপোষণ এবং রমেশভবন নির্ম্মাণ। এই দুই বিষয়ে সর্ব্বসংগ্রহ করিবার নিমিত্তে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় যে পত্র লিখিয়া-ছিলেন, তাহার আলোচনা হইল। তদুপলক্ষে অনেকেই বক্তৃতা করিলেন; সেই সময়েই বিদ্যাসাগর-চরিত লেখক চণ্ডীচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের হৃদয়বিদারক অপঘাত সংবাদ শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলাম—হায়, কি ভীষণ দুর্ঘটনা। নীরব সাহিত্যসেবী সুহৃদ্বর রসিকলাল রায়ের নাম এই তালিকায় ছিল বলিয়া বোধ হইল না; কিন্তু পশ্চাৎ প্রস্তাবকারী শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি "ছিল" বলিয়াই বলিলেন—হয়তঃ অসাবধানতা বশতঃ উল্লেখিত হয় নাই।

এতদুপলক্ষে প্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত বিপিন-চন্দ্র পাল মহাশয়ের বক্তৃতার একটী কথা প্রাণে বাজিল; তাঁহার কথার মর্ম্ম এই—তিনি 'কায়স্থ', চাটুকারিতা ব্রাহ্মণের কাজ—তিনি তাই তোষামোদে অনভ্যস্ত ইত্যাদি। জানি না, এই কটাক্ষ স্যর আশুতোষ এবং তাঁহার তোষামোদকারীগণের প্রীতিকর হইয়াছিল কি না। যদি তাহাই হয়—তবে তাঁহাকে সবিনয়ে বলিব যে, যেদিন হইতে রঙ্গমঞ্চে 'বিদুষকের' আবির্ভাব হইয়াছে, সেই দিন হইতেই ব্রাহ্মণের এই বদনাম বহন করিতে হইতেছে, সন্দেহ নাই—কিন্তু সম্প্রতি এই বিষয়ে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বৈদ্য এই জাতিভেদ একান্ত অনাবশ্যক। রঙ্গপুরে তথা বাঁকীপুরে যে দুইটী ব্যক্তিকে আশুতোষের পার্শ্বে নন্দী-ভৃঙ্গীর ন্যায় বিচরণ করিতে দেখিয়াছি, ইঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন; বাঁকীপুরেও যাঁহারা স্যর আশুতোষের জয়-ঢক্কা অত্যুৎকটভাবে বাজাইয়াছেন, ইঁহাদের অধিকাংশই বিপিন বাবুর স্বগণ। স্বীকার করি, "তোষামোদ" দেশের সর্ব্বনাশ করি-তেছে—এ হেন স্যর আশুতোষকে মাটী করিয়াছে; অতিস্তুতি দেশভক্ত কবিবর রবীন্দ্রনাথকেও বিগড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু বিপিন বাবু দেখিবেন যে, তজ্জন্য ব্রাহ্মণই কেবল দায়ী নহে—বরং ব্রাহ্মণের মধ্যে কেহ কেহ অতি-সাহসের সহিত আশুতোষ বা রবীন্দ্রনাথের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

এইখানেই সেই সময়কার কার্য্যের যবনিকাপাত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় একটী সম্পূর্ণ অভিনব প্রস্তাব সম্মিলনে উপস্থাপিত করিলেন। প্রস্তাবটী সংক্ষেপতঃ এই—সম্মিলনকে রেজিষ্টারী করা হউক—এবং ইহার সংশোধিত নিয়মাবলী গঠনকার্য্য একটী কমিটির উপর অর্পিত হউক। এতাদৃশ নূতন প্রস্তাব বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতিতে উপস্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে সমালোচিত হইলে পরে সম্মিলনে পেশ্ করা উচিত ছিল। কিন্তু যতটা বোঝা গেল—স্যর আশুতোষ কার্য্যবশতঃ সেই দিনই কলিকাতায় চলিয়া যাইতেছেন, আর আসিবেন না—অথচ তিনি সভাস্থলে বর্ত্তমান থাকার সময়েই ইহা পেশ্ ও পাস্ করিতে হইবে, তাই এই রীতিব্যতিক্রম ঘটিল।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন কোন একটা সভা-সমিতি নহে—এটা একটা সাহিত্যিকগণের মজলিশ্, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক ইহারও সম্পাদক—পরিষদেরই সংসৃষ্ট সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি একটা আছে—যদিও ইহা দ্বারা বিশেষ কোনও কাজ হইতেছে না, কাজের প্রয়োজনও বিশেষ কিছু আছে কি না সন্দেহ। সম্মিলনক্ষেত্রে যে সকল নির্দ্ধারণ হয়, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার ভার সাহিত্যপরিষদের উপরেই অর্পিত হইয়া থাকে—দু একটা কাজ যে না হইয়াছে, এমন কথাও বলিতে পারি না। তবে টাকা পয়সা যাহাতে লাগে, তেমন কাজ অবশ্য কিছুই হয় নাই। সম্মিলন রেজিষ্টারী করিয়া ইহার একটা পৃথক্ সত্তা ঘটিলেই যে আপনা আপনি কাজ হইয়া যাইবে, এমনটা কল্পনায়ও আইসে না; এবং রেজিষ্টার্ড সম্মিলন যদি অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন, তবে সাহিত্য পরিষদের নামে অর্থ সংগ্রহ হইতে পারে না, ইহাই বা কিরূপে মনে করিতে পারি? স্যর আশুতোষ যদি দুঃস্থ সাহিত্যসেবীদিগের নিমিত্তে একটী ভাণ্ডার করিতে চান, তবে তাহা পরিষৎসংসৃষ্ট করিতে হানি কি? অথবা সম্মিলনের স্থায়িত্বকল্পে যদি একটী তহবিল করিতে চান, তাহাও পরিষদের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিলে ক্ষতির কারণ কি হইতে পারে, বুঝি না। এই অবস্থায় পরিষদরূপ একটা সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-সমিতি বর্ত্তমানে আর একটা রেজিষ্টারীকৃত সম্মিলন-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন কি, বুঝিলাম না। যাহা হউক, শশধর বাবুর এই প্রস্তাবের নানারূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে লাগিল—সভাপতি মহাশয় দৃঢ় হস্তে সমস্ত আপত্তি মিটাইয়া রেজিষ্টারী করার প্রস্তাবনা ভোটে দিয়া অধিকাংশের মতে পাস করাইয়া দিলেন। তৎপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং ডাক্তার আব্দুল গফুর এই পাঁচজন মিলিয়া এতদ্বিষয়ে যথাবিহিত কার্য্য করিবেন।

"সহসাবিদধীত ন ক্রিয়াম্" একটী বড় মূল্যবান্ উপদেশ। এই নীতি অনুসারে প্রস্তাবটী মুলতবি রাখিয়া সম্যক্ বিবেচনার অবসর দিবার নিমিত্ত শ্রীমন্মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর অনুরোধ করেন; কিন্তু তাঁহার কথা টিকিল না। আমারও বোধ হয়, কাজটা বড় হঠাৎ করা হইয়াছে। স্যর আশুতোষের এই প্রস্তাবে বিশেষ অনুকূলতা পরিলক্ষিত হইল, হয়তো তাঁহারই ইঙ্গিতে প্রস্তাবটী এই ভাবে উপস্থাপিত ও পরিগৃহীত

হইয়াছে। স্যর আশুতোষ এই সবে সম্মিলনে প্রথম পদার্পণ করিলেন ; আসিয়াই যে একটা পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত সম্ভাবিত করিলেন, তাহাতে অনেকেই একটু উদ্বেগিত হইয়াছেন। ভরসার কথা এই যে, স্যর আশুতোষ অভিভাষণে যেরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে কোনরূপ বিরোধের হেতুভূত হইবেন না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অভিভাষণ দ্বারা স্যর আশুতোষ নিজকে এক মহা পরীক্ষায় ফেলিয়াছেন—আবার এই প্রস্তাব পরিগ্রহণ পূর্ব্বক অপর এক পরীক্ষায় পড়িয়াছেন, দেখা যাউক, তিনি কিরূপে সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। অপর ভরসার বিষয় যে, আর চারিজন যাঁহারা স্যর আশুতোষের সহযোগী ছিলেন, ইঁহারা সকলেই পরিষদের শুভানুধ্যায়ী বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী, সম্মিলনের পক্ষপাতী এবং সর্ব্বোপরি স্বাধীনচেতা বলিয়া খ্যাতিমান্। *

অতঃপর স্যর আশুতোষ চলিয়া যাইবেন, তাই তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল, তাঁহার জয়ধ্বনির কলকোলাহলের মধ্যে সভা ভঙ্গ হইল।

সেই থিয়েটার হলের প্রাঙ্গনভূমিতে ৫টার সময়ে চৈতন্যহিন্দী সভার পক্ষ হইতে সম্মিলনে সমাগত ব্যক্তিগণের প্রীত্যর্থে উদ্যানসম্মিলন হইয়াছিল। বাঙ্গালায় শ্রীচৈতন্যের নামসংবলিত এই হিন্দীভাষী বিহারী কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তির সমিতিটী আমাদের স্বতঃই সহানুভূতিভাজন। তদুপরি সভার কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের আদর আপ্যায়নে এবং জলযোগের আয়োজনে সকলেই নিরতিশয় প্রীতিলাভ পূর্ব্বক সভার সর্ব্ববিধ কুশল কামনা করিয়া সন্ধ্যাগমে স্ব স্ব আবাসস্থানে প্রস্থান করিলেন। এই সভা সম্মিলনের শেষ দিবসের অধিবেশনে একটী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, যাহাতে বঙ্গভাষায় নাগরী অক্ষরের প্রচলন হয়। সম্মিলন এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন নাই—প্রায় সকলেই ইহাতে ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন। ফলতঃ, "একলিপি বিস্তারে"র সময় এখনও আইসে নাই।

রাত্রি প্রায় ৭৷৹ টার সময়ে বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন হইল। স্যর আশুতোষ যাইবার সময়ে সভাপতির বরমাল্য সাহিত্য-শাখার নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের কণ্ঠে অর্পণ করিয়া যান। কিন্তু তাঁহারও আসিতে বিলম্ব হওয়ায় ইতিহাস-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির সভাপতিত্ব করেন। সম্মিলন রেজিষ্টার্ড হইবে, উহার নূতন কলেবর হইবে, এই ভাবিয়া সম্মিলনে এবার কোন প্রস্তাব নূতন করে করা হয় নাই—পূর্ব্ববারের দুএকটী নির্দ্ধারণ বদলাইয়া লইবার ব্যবস্থা হইল মাত্র। পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি-এ ইতিহাস শাখার ন্যায় ভূগোলেরও একটী স্বতন্ত্র শাখা করিবার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন ; তর্কবিতর্কের পর স্থির হইল যে, ইতিহাসের সঙ্গে ভূগোলেরও নাম যুড়িয়া

* ভরসার কথা যখন বলিলাম, ভয়ের কারণও কিছু বলা উচিত। সম্প্রতি পরিষদের ভিতরে দলাদলির একটা ভাব দেখা যাইতেছে, এ কথা সত্য মিথ্যা জানি না, স্যর আশুতোষের তোষামোদকারী কেহ কেহ নাকি এই দলাদলিতে আছেন। আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, আশুতোষের তৃতীয় নেত্র উন্মিলিত হউক, যেন তাহা হইতে জ্ঞানাগ্নি নির্গত হইয়া ঐ সকল তোষামোদের পুষ্পবাণ বর্ষণকারিগণ ভস্মীভূত হইয়া যায়।

দেওয়া হইবে। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, সমস্ত শাখা সভাপতিগণের অভিভাষণ সম্মিলনের শাখা-বিভাগ হইবার পূর্ব্বে সমগ্র অভ্যাগত-মণ্ডলীর সমক্ষে পঠিত হওয়া আবশ্যক—পশ্চাৎ নানা স্থানে শাখাগুলির অধিবেশন হওয়া উচিত। প্রস্তাবটী পরিগৃহীত হইল।

পরদিন সোমবার প্রায় ৮॥০ ঘটিকার সময় থিয়েটার হলে শাখা সভাপতিগণের অভিভাষণ পাঠ আরব্ধ হইল। সর্ব্বপ্রথম সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস তদীয় অভিভাষণ পাঠ করিলেন। তিনি প্রবন্ধে বাঙ্গালার গীতি কবিতার আলোচনা করিয়াছেন—তবে আধুনিক সময়ের কবিগণের কোন কথা ইহাতে নাই। আমার বোধ হয়, তাহা সমীচীনই হইয়াছে — কেন না, আধুনিক কালের কোন কথা বলা বড় নিরাপদ নহে। তাঁহার বক্তৃতা অতি সুন্দর হইয়াছিল—মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনিয়াছি—ভাবে বিভোর হইয়া বক্তাকে মনে মনে শত ধন্যবাদ দিয়াছি। বক্তৃতা দীর্ঘ হইলেও শ্রোতৃবর্গের বিরক্তি অনুভব করা দূরে থাকুক—বরং যেন সত্বর ফুরাইয়া গেল বলিয়া মনে আক্ষেপের উদয় হইয়াছিল। ফলতঃ, চিত্তরঞ্জন বাবু এ ব্যাপারে সার্থকনামাই হইয়াছেন। বক্তৃতাবসানে মহামহোপাধ্যায় কবি সম্রাট্ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় বক্তাকে সজলনেত্রে যখন প্রেমালিঙ্গন দ্বারা অভিনন্দিত করিলেন—তখন শ্রোতৃবৃন্দ করতালির কলকোলাহলে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অতঃপর—শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার ইতিহাস শাখার সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করিলেন। বিজয় বাবু এক অসাধারণ ব্যক্তি; দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি অন্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে "বিধো, কি কারণে আমার" বলিয়া আক্ষেপ না করিয়া হৃদয়ের অদম্য তেজে সংসার-সংগ্রামে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন—এইটা এ দেশের পক্ষে এক অসামান্য আদর্শ বটে। ভাবিয়াছিলাম যে, তদীয় অভিভাষণ অপরের দ্বারা পঠিত হইবে। অনেক চক্ষুষ্মান্ও তাহা করাইয়া থাকেন, ইনতো প্রকৃতই অসমর্থ। কিন্তু তাহা হইল না—তিনি দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন—একজন তাঁহাকে সময়ে সময়ে দু'একটা কথা মাত্র স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। অভিভাষণের বিষয় পক্ষে আমাদের মতানৈক্য থাকিলেও এই প্রবীণ সাহিত্যসেবীর বক্তৃতা শুনিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। তৎপর দর্শন শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহোদয় তদীয় অভিভাষণ পাঠ করিলেন। তখন বেলা প্রায় ১১টা—অভিভাষণও মুদ্রিত ৮৭ পৃষ্ঠা-ব্যাপী একখানা পুস্তক বিশেষ। চিন্তাশীল বিদ্যোৎসাহী সুসামাজিক রায়চৌধুরী মহাশয়ের বক্তৃতা সমগ্র শুনিবার ধৈর্য্য থাকিল না—ঘণ্টাখানিক পরেই চলিয়া আসিলাম। কিন্তু মুদ্রিত অভিভাষণ পুস্তক বক্তৃতার পূর্ব্বেই বিলি হওয়াতে ঘরে বসিয়া তাহা পাঠ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। বক্তৃতাটী বেশ উপাদেয় এবং উপদেশ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ভগবদ্ভক্ত রায়চৌধুরী মহাশয়, ভগবানে পরানুরক্তিই যে জীবের চরম লক্ষ্য, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া প্রবন্ধটীর উপসংহার করিয়াছেন।

প্রায় আড়াই প্রহর অতীতে এই বেলার অধিবেশন শেষ হইয়াছিল। বিজ্ঞান শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় তদীয় প্রবন্ধ অপরাহ্নে এক স্বতন্ত্র স্থানে পাঠ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা শুনিতে

সমর্থ হই নাই। একটু বিলম্বে সভাস্থলে আসিয়াছিলাম। পরে বিজ্ঞান শাখার অনুসন্ধান পূর্ব্বক এক অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে গিয়া দেখি, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় বক্তৃতা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত শশধর বাবুর অভিভাষণ বিতরিত হয় নাই—সম্ভবতঃ পুস্তকাকারে তখনও মুদ্রিত হয় নাই। শুনিয়াছি, তিনি "ইউজেনিক্‌স্‌" অর্থাৎ সুপ্রজননবিদ্যা বিষয়েই বক্তৃতা করিয়াছিলেন—ইহাই প্রত্যাশিতও ছিল, কেন না ইনি এই বিষয়েই স্বীয় গবেষণা প্রয়োগ করিয়াছেন।

প্রত্যেক শাখার অধিবেশনস্থলে একবার গিয়া অবস্থা যাহা দেখিলাম, তাহাতে বোধ হইল, শাখাবিভাগ প্রথার অচিরেই বিলোপ ঘটিবে। এই বিষয়ে পূর্ব্বতন অধিবেশনের বিবরণীতে বহু বলিয়াছি—ইহা যে অসমীচীন, তাহা যথাশক্তি দেখাইয়াছি। অতএব এতদ্বিষয়ে এস্থলে আলোচনা অনাবশ্যক। এবার এক এক শাখায় এমনও ঘটিয়াছে যে, ৫।৭ জনের অধিক শ্রোতা নাই। প্রবন্ধের সংখ্যাও নাকি এবার বড়ই কম। যাহা হউক, ভবিষ্যতে যদি শাখাবিভাগ উঠিয়া যায়, তবে আমরা নিশ্চয়ই দুঃখিত হইব না।

এই দিবস সন্ধ্যার পরে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ মহাশয়ের বাড়ীতে প্রীতি-সম্মিলন হইয়াছিল। রসনার তৃপ্তিকর সামগ্রী যথেষ্ট ত ছিলই—চক্ষুঃশ্রোত্রের তৃপ্তিবিষয়ক ব্যবস্থাও যথোচিত ছিল। একজন বৈষ্ণব পদাবলী গান করিতেছিলেন, যেন অমৃতবর্ষণ হইতেছিল। ইঁহার মধুস্রাবী সঙ্গীত শুনিয়া যেন আশা মিটিতেছিল না। শুনিলাম, এই সকল সঙ্গীত শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের রচিত, গায়কও নাকি তাঁহার নিত্যসহচর। ধন্য চিত্তরঞ্জন বাবু! রাত্রিতে থিয়েটার হইল। "চন্দ্রগুপ্ত" অভিনীত হইয়াছিল—যাইতে পারি নাই।

পরদিন মঙ্গলবারে প্রাতঃকালে প্রথমতঃ শাখাগুলির বাকী রচনাবলী পঠিত হইল। যতীন্দ্রবাবু পূর্ব্বের দিবসেই কাজ সারিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। শশধর বাবুও পঞ্চানন বাবুর উপরে ভারার্পণ পূর্ব্বক সরিয়া পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক, এক দুই ঘণ্টার মধ্যেই শাখার কার্য্য শেষ হইয়া গেল—পরে সম্মিলনের সাধারণ অধিবেশন আরব্ধ হইল। দুই একটা নির্দ্ধারণ সত্বরই পরিগৃহীত হইল—পরে ধন্যবাদ আদান প্রদান হইল। অভ্যাগতগণের পক্ষে পাঁচকড়ি বাবু ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের বক্তৃতাই বেশ জাঁকাল হইয়াছিল।

বেলা প্রায় ১টার সময়ে সম্মিলনের কার্য্য সমাপ্ত হইল। সভাভঙ্গের পূর্ব্বে আগামী বর্ষে ঢাকায় এবং তৎপর-বর্ষে মুঙ্গেরে সম্মিলনের আমন্ত্রণ হইয়া গেল। বাঁকীপুরের এই সম্মিলনে অভ্যাগতের সংখ্যা যত হইবে বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, তত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হইল না। সাত বৎসর পূর্ব্বে ভাগলপুরের সম্মিলনে যেন ইহার অপেক্ষা অনেক অধিক লোকসমাগম হইয়াছিল। অথচ বাঁকীপুরে যাতায়াত অপেক্ষাকৃত সুকর। যাহা হউক, আদর অভ্যর্থনার কোনরূপ ক্রটি হয় নাই। যাঁহারা অভ্যাগতগণের কেম্পে অথবা ভদ্রলোকদের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন, সকলেই পরমসুখে ছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রাণপণ খাটিয়া নবাগতগণের শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। মাননীয় পূর্ণেন্দু বাবু, শ্রীযুক্ত মথুরানাথ সিংহ, শ্রীযুক্ত রামলাল সিংহ, শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র

নাথ সমদ্দার, শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় প্রভৃতি বাঁকীপুর-প্রবাসী বাঙ্গালী এই সম্মিলনের সৌষ্ঠব সম্বন্ধে প্রাণপণ খাটিয়া বাঙ্গালী সাহিত্য-সেবীর অশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

বাঁকীপুরে চারি দিন ছিলাম। স্বল্পবর রায় সাহেব ভুবনমোহনের অমায়িক ব্যবহারে —অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণের আদর আপ্যায়নে পরম সুখেই কয়দিন অবস্থান করিয়াছি। দ্রষ্টব্য জিনিষের মধ্যে খোদাবকস্ লাইব্রেরি, গোলাঘর এবং প্রাচীন পাটলিপুত্রের সংস্থান-ভূমি, এই কয়টীই উল্লেখযোগ্য। একবার চুপি দিয়া মাত্র লাইব্রেরিটী দেখিয়াছি—তাহাতে আর ইহার মাহাত্ম্য কতই বুঝিব। যাঁহারা মোসলমান আমলের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করিবেন, খোদাবকস্ লাইব্রেরিতে তাঁহাদের আগমন একান্তই আবশ্যক। তদ্বিষয়ক গ্রন্থ এখানে যত আছে, ভারতের অন্যত্র তত কমই আছে। গোলাঘরটী দূর হইতে অশোকের স্তূপ বলিয়া মনে হয়। প্রায় ১৫০ বৎসর হইল, ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ প্রশমন কল্পে শস্য সংগ্রহার্থেই নাকি ইহার নির্ম্মাণ। তবে তদর্থে ইহার ব্যবহার কদাপি হয় নাই—এখন সিঁড়ি দিয়া লোকে উপরে উঠিয়া সহর দেখে, ইহাই ইহার বর্ত্তমান সার্থকতা। সহর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে প্রাচীন পাটলী-পুত্রের ভূগর্ভে প্রোথিত স্তম্ভাদি মাটি খুঁড়িয়া বাহির করা হইতেছে। কাজ অতি অল্পই হইয়াছে—খনিত স্থানগুলি জলে ভরিয়া যাওয়ায় বড় বেশী কিছু দেখা যায় নাই।

সম্মিলনে অভ্যাগতগণের এই সকল ও অন্যান্য জায়গা বেড়াইয়া দেখিবার জন্য গাইড ও গাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া দিয়া অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণ ও স্বেচ্ছাসেবকগণ আমাদের সমধিক কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

দর্শন।

মিশ্রদর্শন (Electicism)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে, আলেকজান্দ্রিয়া প্রসঙ্গে যে বিজ্ঞানালোচনার বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহাও অধিক দিন স্থায়ী হইল না। প্রায় চারিশত বৎসর যাবত উপর্য্যুপরি নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে গ্রীক বৈজ্ঞানিকগন যে এক চমকপ্রদ জ্ঞানালোকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দে রোমের প্রবল প্রভাব বশতঃ সে আলোকও নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। এই সময় হইতে গ্রীক-প্রতিভায় সত্যসত্যই ভাটা পড়ে। সাহিত্য ও কলাবিদ্যাও দেখিতে দেখিতে প্রাণহীন হয়। দর্শন যে দুর্দ্দমনীয় সংশয়বাদের হাতে লাঞ্ছিত হইতে-ছিল, তাহা পূর্ব্বেই দৃষ্ট হইয়াছে। সত্য বলিতে কি, মাতৃভূমি হইতে উৎপাটিত হইয়া দর্শন যেন পুনরায় অঙ্কুরত্ব প্রাপ্ত হইল। একেই বলে কেঁচেগণ্ডূষ! সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক গেলেন এবং জ্যোতির্ব্বিদ্ টোলেমীর পর হইতে জড়বিজ্ঞান জড়ই রহিয়া গেল। এদিকে ধর্ম্মক্ষেত্রে আদিখ্রীষ্টীয় সমাজের গোঁড়ামিতে লোকে তৃপ্ত হইতে পারিল না; এমন কি, উক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা সাধারণের নিকট হেয় এবং অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া পড়িলেন। একমাত্র নীতিশাস্ত্র যদি ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিত, তাহা হইলেও উপকারের সম্ভাবনা থাকিত; তাহাও হইল না। একদিকে

এপিকিউরীয়দিগের অবিরাম ভোগবিলাস, অপর দিকে ষ্টোয়িকদিগের কঠোর আত্মনির্য্যাতন, এই দুই চরমপন্থীদলের ঘাতপ্রতিঘাতে নীতিশাস্ত্র তখন খাবি খাইতেছিল। কেবলমাত্র নীতিচর্চ্চায় পরমার্থ লাভ হইল না, নীতিজ্ঞানের বলে লোকে যতই আদর্শকে পাইতে চেষ্টা করিল, আদর্শ ততই দূরে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। গ্রীকগণ এই ঘোর দুর্দ্দিনে শক্তিলাভের জন্য আর একবার অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। সংশয়বাদের প্রতিও সন্দিহান হইয়া, অথচ নূতন কিছু আবিষ্কারে সমর্থ না হইয়া, তাঁহাদের এমন দশা ঘটিল যে, তাঁহারা যে কোন মত যুক্তিসিদ্ধ বা গ্রহণযোগ্য মনে করিলেন, তাহারই অনুকরণ করিতে লাগিলেন। অ্যাকাডেমি, ল্যাকেয়ম এবং ষ্টোয়া প্রভৃতি প্রাচীন সম্প্রদায়গুলি, যাহাদের সকলেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তিন শতাব্দী যাবত বিবাদের ফলে তাহারাও ঐক্যভাবাপন্ন হইয়া পড়ে এবং অবশেষে তাহাদের মতসমূহ পরস্পরের সহিত এমন ভাবে মিলিত হয় যে, কাহারও কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না।

গ্রীক প্রতিভার অবনতিই যে এই মহামিলনের একমাত্র কারণ, তাহা নয়। ইহুদীদিগের ধর্ম্মপ্রভাব যতদিন তাহাদের জাতীয় গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, ততদিন তাহার বড় একটা পরিচয় পাওয়া যাইত না। আলেকজান্দ্রিয়ার ফিলো (Philo) যখন মুশার মতের সহিত প্লেটোর উপদেশাবলীর ঐক্যপ্রদর্শন করিলেন এবং যিশু ও তাঁহার প্রিয়শিষ্য টরসাসের পল (St. Paul of Torsus) যখন ইহুদী ধর্ম্মের জাতীয় আবরণ উন্মোচন করিয়া দিলেন, তখন আর সম্মিলিত গ্রীস-রোম রাজ্যে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মপ্রসারের বিঘ্ন রহিল না। সাধারণের মধ্যে লোকের মন অনেকদিন হইতেই একেশ্বরবাদের দিকে ঝুঁকিয়াছিল। পেরিপ্যাটেটিক দর্শন মত এবং রোমীয় ষ্টোয়িক মতে এই একেশ্বরবাদের প্রবল প্রভাব থাকিলেও, এই দুই মত সাধারণের উপযোগী হয় নাই। একমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ই তাহাদের মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম সত্যসত্যই এই সর্ব্বজনীন একেশ্বরবাদের অভাব পূরণ করিয়া দেয়। কি বড় কি ছোট, কি ধনী কি নির্ধন, কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, যিশু যেন নূতন করিয়া সকলকেই সমাদরে গ্রহণ করেন এবং সকলেই তাঁহার মতের উদারতায় মুগ্ধ হন। খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম এই জন্যই এমন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন হইয়াছিল যে, তাহার নিকট প্রাচীন মতের সঙ্কীর্ণতা কাটিয়া গিয়া তৎস্থলে এক নূতন দর্শনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাইবেল-বর্ণিত অবতারের পরিবর্ত্তে পিথাগোরাস ও প্লেটোর আবির্ভাব হয় এবং ইহুদী ও খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ঈশ্বরের স্থলে অ্যারিষ্টটল, সক্রেটিস ও জেনোফ্যানিসের ঈশ্বর স্থান পাইল। এস্থলে ষ্টোয়িকদিগের দৃষ্টান্তানুসারে একপ্রকার সর্ব্বদেবত্ববাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, কিন্তু এই সর্ব্বদেবত্ববাদের বিশেষত্ব এই ছিল যে, তাহাতে লৌকিক বিশ্বাসানুরূপ কেবলমাত্র খণ্ডদেবতার সংস্কার দাঁড়াইতে পারে নাই, পরন্তু এক সর্ব্বব্যাপী মহাশক্তি সৃষ্টি মাত্রেই রন্ধ্রগতভাবে বিরাজ করিতেছেন এবং খণ্ডদেবতাসমূহ সেই মহাশক্তিরই বিভিন্ন প্রকাশ অথবা তাহারই অন্তর্ভুক্ত, এই প্রকার ধারণা জন্মে। এই সংস্কার অবশেষে খ্রীষ্টীয় 'নষ্টিক', সম্প্রদায়ের 'ইয়ন' (eons), ইহুদী কেব্বলিষ্ট নামধের পণ্ডিত সমাজের 'সেফিরথ' (sephiroth)

এবং ক্যাথলিক ধর্ম্মশাস্ত্রের 'হাইপোষ্টাসিস' এই তিন তত্ত্বের স্থান অধিকার করে। গ্রীক চিন্তায় সৎ ও সুন্দর, কুৎসিত ও কদর্য্য, আধ্যাত্মিক অবনতি ও নৈতিক অবনতির যে পার্থক্য ছিল, খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের প্রভাবে সেই পার্থক্য ক্রমান্বয়ে চলিয়া যাইতে লাগিল। এখন সৎমাত্রই শক্তি, রূপ বা আদর্শের ক্রিয়া এবং অসৎমাত্রই আদর্শের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ জড়ের ক্রিয়া, বলিয়া পরিগণিত হইল। কেহ কেহ মনে করিলেন, ঈশ্বর জড় ও চৈতন্য উভয়েরই কারণ, তবে সেই কারণের সহিত জড় ও চৈতন্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, অর্থাৎ ঈশ্বর নির্ব্বিকার, জগতের কোন অনুষ্ঠানেই তাঁহার হাত নাই। তিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা অথচ নির্লিপ্ত ভাবে জগতের বহির্ভাগে অবস্থিতি করিতেছেন। আবার কেহ কেহ ঈশ্বরকে শক্তিস্বরূপ বলিয়া গণ্য করিলেন বটে, তবে তাঁহাকে জড় ও চৈতন্যের মিলন-গ্রন্থি বা সন্ধিস্থল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের মতে জড় চৈতন্যের বিরোধী, অতএব ঈশ্বরের সহিত তাহার সম্পর্কই থাকিতে পারে না। জড় ঈশ্বরের কৃত নহে, উহা ঈশ্বরের সমসাময়িক এবং শক্তিতে তাঁহাপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নয়। এইখানেই দ্বৈতবাদ প্রবলতর রূপে বিরোধী দলের উপর প্রভুত্ব করিতে আরম্ভ করে। 'নষ্টিক'দলের এমনই বিশ্বাস হইয়াছিল যে, ঈশ্বরই যদি একমাত্র নিষ্পাপ হন, তবে তাহার কারণ, একমাত্র তিনিই জড়-বিবর্জ্জিত। আবার, জড়ই যদি সমস্ত অনিষ্টের মূল হয়, তবে দেহ বিশিষ্ট জীবমাত্রই পাপ-কলুষিত। সংসারে দেহ যদি সর্ব্বপাপের মূল কারণ হয়, তবে জ্ঞানিগণ ভোগ-লালসা-রহিত হইয়া এবং কঠোর সংযমব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক দেহেরই নিগ্রহ করিতে বাধ্য। খ্রীষ্টানদিগের সহিত প্লেটোমতাবলম্বীদিগের এই স্থলে অনৈক্য ঘটে; কেন না, শেষোক্ত সম্প্রদায় দেহহীন আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন; খ্রীষ্টানগণের বিশ্বাস ছিল যে, প্রলয়ান্তে জীব পুনর্জ্জন্মলাভে সমর্থ। অর্থাৎ একপক্ষ সৃষ্টি বিষয়ে কারণ ব্যতীত কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার করিতেন, অপর পক্ষ তাহা স্বীকার করিতেন না, তাঁহাদের মতে আত্মা এবং দৈহিক উপাদানের নাশ নাই বলিয়াই সৃষ্টি-সম্ভব হইতেছে।

প্রাচীন এবং নব্য-তন্ত্রের মধ্যে মূলতঃ যতই বিবাদ থাকুক, প্রাচীনপন্থিগণ এখন হইতে আর গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিতেন না, নব্যমতাবলম্বীদিগের সহিত স্ব স্ব মতের সামান্যমাত্র ঐক্য থাকিলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতেন। খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় মুশা, ঈশা এবং সেন্টপলকে অরফিউস্, পিথাগোরাস এবং প্লেটোর সহিত একাসনে স্থান দিলে এবং প্রাচীন গ্রীসের মনস্বিদিগকে বাগ্‌দেবীর প্রতিভূস্বরূপ গ্রহণ করিলেই উভয় দলের বিবাদ মিটিয়া যাইত। এখন হইতে সমস্ত ধর্ম্মই এক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সকল ধর্ম্মেরই মূলে অবতারবাদ স্বীকৃত হইল, অর্থাৎ ঈশ্বর-বাক্যই সকল ধর্ম্মের মূল, তবে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, জাতিগত আচার ব্যবহারের পার্থক্যই তাহার কারণ, এইরূপ বিশ্বাসের উদয় হইতে লাগিল। মডারেটাস (Moderatus), নাইকোমেকাস্ (Nicomachus) এবং নিউমিনিয়াস (Numenius) প্রভৃতি উদারপ্রকৃতি ভাবুকগণ মুশাকে ইহুদীদিগের প্লেটো এবং প্লেটোকে গ্রীসীয় মুশা বলিতে ভালবাসিতেন। উভয় দলের মধ্যে এই যে এক সাম্যভাব প্রবর্ত্তিত

হইয়াছিল, তাহাও কিন্তু অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। কয়েকজন খ্রীষ্টান পণ্ডিত ভিন্ন বিপক্ষদলের অধিকাংশ লোকেই মিশ্রদর্শন-রীতির বিরোধী হইতে লাগিলেন। তাঁহারা প্লেটোর মতের কোন কোন অংশ সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও, উক্ত মতের মৌলিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহাদের বিশ্বাস হইল যে, উহা বাইবেলগ্রন্থ হইতেই গৃহীত হইয়াছিল।

সে যাহা হউক, গ্রীক দার্শনিকগণ খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হইলে এখন আর তাঁহাদের প্রাচীন প্রথানুসারে বাক্‌বিতণ্ডা করিতেন না; করিলেও সে যুক্তির প্রতি লোকে উপেক্ষা প্রদর্শন করিত। খ্রীষ্টসমাজ-ভুক্ত কয়েকজন শিক্ষিত এবং উদারচেতা পাদরী ব্যতীত অপর সকলে ঠিক ইহুদীদিগের ন্যায়, যে দর্শনের সহিত খ্রীষ্টধর্ম্মের মূলতত্ত্বের ঐক্য না থাকিত, সে দর্শনকে দর্শন বলিয়া অথবা যে মহাজন বাক্যের সহিত বাইবেল-লিখিত ঈশ্বরবাক্যের সাদৃশ্য না থাকিত, তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করাকে আপত্তি-জনক মনে করিতেন। তখন সামাজিক অবস্থা আবার এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, দর্শন বা ধর্ম্ম-সম্বন্ধে লোকের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে হইলেই হয় কথায় কথায় বাইবেলের দোহাই দিতে হইত, না হয়, স্ব স্ব জ্ঞান ও বিশ্বাসে জলাঞ্জলি দিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইত। কেবলমাত্র বিশুদ্ধ বিচারবুদ্ধি বা প্রজ্ঞাসম্মত যুক্তি তর্কে আর লোকের মন টলিত না। সকল তর্কের মূলেই খ্রীষ্টধর্ম্মের আশ্বাসবাণী থাকা চাই, নতুবা সে তর্ক তর্কই নয়, সে যুক্তি স্বীকার্য্য নয়। এই নিমিত্ত সে সময়ের দার্শনিকদিগকে অসীম উদ্যম ও উৎসাহ সহকারে প্লেটো, অ্যারিষ্টটল প্রভৃতি প্রাচীন মনস্বিদিগের গ্রন্থরাজি নূতন করিয়া অধ্যয়ন করিতে ও তাহাদের নূতন নূতন ব্যাখ্যা এবং টীকাটিপ্পনী প্রচার করিতে হইয়াছিল। মূল গ্রন্থপাঠে তাঁহাদের এই নব উদ্যম কতক পরিমাণে গোঁড়ামিতে পরিণত হইলেও, গ্রীক দার্শনিকদিগের প্রকাশিত গ্রন্থমালা সৌন্দর্য্যে, ভাবে এবং ভাষায় বাইবেলেরই সমকক্ষ হয়; সেগুলি যেন সত্যসত্যই দেববাক্য-সম্ভূত। তখন সকলেই ঐ সকল পুস্তকের এত ভক্ত হইয়া পড়িলেন যে, ওরূপ পুস্তক আর কেহ লিখিতে পারে বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস রহিল না। পুস্তকগুলির প্রত্যেক ছন্দ ও শব্দের মধ্যেও তাঁহারা ঐশ্বরিক প্রভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। সাহিত্যিক, বৈয়াকরণিক এবং সমালোচক, সকলের মধ্যেই পুস্তকগুলির সংস্কার, সংশোধন, ব্যাখ্যা এবং প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রতিযোগিতা দৃষ্ট হইল। তাঁহারা যে প্লেটোর চিন্তাপ্রণালীরই অনুকরণ করিতে ভালবাসিতেন, তাহা নয়, প্লেটোর লিখন পদ্ধতিরও নকল করিয়া ছাড়িলেন। গ্রীক পণ্ডিতদিগের প্রকৃতিই এই ছিল যে, তাঁহারা ভাবের সহিত ভাবপ্রকাশের রীতিনীতিরও সমান আদর করিতেন। অল্‌সাইনাস্ (Alcinous) ও অ্যাটিকাস (Atticus) প্লেটোর গ্রন্থের টীকা বাহির করিলেন। অধিক কি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টীকাকার অ্যাফ্রোডিসিয়াসবাসী আলেকজান্দারই অ্যারিষ্টটলের ব্যাখ্যাকল্পে তাঁহার সমগ্র জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধি নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতি তখন তাঁহাদের এমনই অনুরাগ জন্মিল যে, প্লুটার্ক প্রভৃতি কয়েকজন মহাত্মা প্লেটোর রূপক-মালার প্রকৃত অর্থগ্রহণ না করিয়া স্বয়ং প্লেটোকে, সাধারণ লোকের মত, ঈশ্বরের

(৬৩৩ পৃষ্ঠায় বাকী অংশ দেখিবেন)

অণু ও পরমাণু

১। সোণা, রূপা, লোহা, জল, তেল, বায়ু প্রভৃতি জড় পদার্থ লইয়া আমাদের কারবার। ইহারা আমাদের নিকট নিরেট বলিয়াই প্রতীয়মান হয়; একখণ্ড সোণার মধ্যে বা এক গ্লাস জলের মধ্যে কোথায়ও ফাঁক আছে কিনা, আমরা দেখিতে পাই না; মনে হয়, স্বর্ণ খণ্ড ফাঁকশূন্য, উহা আগাগোড়া সোণাতেই ভরা। বস্তুতঃ কেবল স্থূল দৃষ্টির উপর নির্ভর করিলে আমাদিগকে বলিতে হয়, জড় দ্রব্যে ক্রম-ভঙ্গ নাই, জড়ের মধ্যে জড়শূন্য স্থান নাই—জড়পদার্থ নিরেট্।

২। আবার দেখা যায়, সকল জড়কেই ভাগ করা চলে—খুবই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে ভাগ করা চলে। কাষ্ঠফলকের উপর খড়ির আঁচর যে সকল মহাসত্য প্রচার করে, তাহাদের মধ্যে ধ্রুবসত্য হইতেছে, ঐ খড়িখানার সূক্ষ্মতা প্রাপ্তি। বায়ু-সাগরের ক্রীড়াশীল, রবিকরোজ্জ্বল ঐ ধূলিকণা সমূহ কত ক্ষুদ্র! কত সূক্ষ্ম জলকণার সমষ্টি, বিমানবিহারী ঐ মেঘখণ্ড সমূহের দেহ গঠিত করিয়াছে! এক টুকরা মেজেণ্টা একগামলা জলকে রঞ্জিত করে; একটুকরা মিছরী এক গ্লাস্ জলের মিষ্ঠতা সম্পাদন করে; একটুখানি মৃগণাভি বা কর্পূরের গন্ধে সমস্ত গৃহ আমোদিত হয়। এইরূপ সাধারণ পর্য্যবেক্ষণ হইতেই আমরা বুঝিতে পারি, জড় পদার্থ মাত্রই অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভাজ্য। ফলে, জড় মাত্রকেই কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। জড়দ্রব্য বিভাজ্য, অতএব উহা কণাময়।

৩। জড় বিভাজ্য ও কণাময়, ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু জড় প্রকৃতই নিরেট কিনা, তাহা সহসা বলা চলে না। কতকগুলি সোণার কণা লইয়াই স্বর্ণখণ্ড। কিন্তু সোণার কণাগুলির মধ্যে ফাঁক্ আছে কিনা, তাহা দেখিবার উপায় নাই। হয়ত কণায় কণায় ফাঁক্ আছে, কিন্তু কণাগুলি ও ঐ ফাঁক্‌গুলি এত সূক্ষ্ম যে, সহজ দৃষ্টিতে উহারা ধরা পড়ে না। আবার ফাঁক্ না থাকাও বিচিত্র নহে। কণাগুলির আকৃতি ইটের মত হইলে উহারা গায় গায় বেশ লাগিয়া থাকিতেও পারে; ফলে, স্বর্ণখণ্ড ফাঁক্‌শূন্যও হইতে পারে। কিন্তু কণাগুলি গোলাকার বা স্তম্ভাকার হইলে আর সেইরূপ হইবার জো নাই, কেননা নিবিড়তমস্পর্শেও গোলায় গোলায় বা স্তম্ভে স্তম্ভে ফাঁক্ থাকিয়াই যায়।

৪। মোটের উপর দেখা যায়, কণাময় হইয়াও জড় নিরেট্ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বিঘ্ন অনেক;—প্রথমতঃ কণাগুলির চেহারা সুবিধামত হওয়া চাই; তারপর উহাদের অঙ্গে অঙ্গে পূর্ণ মিল চাই এবং তজ্জন্য উহাদের বিন্যাসটাও বেশ পরিপাটি রকমের হওয়া চাই। আর যদি জড় নিরেট্ না হয়—যদি উহার মাঝে মাঝে ফাঁকের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়, তবে কণাগুলির আকৃতি লইয়া সুরুতেই একটা দুর্ভাবনা উপস্থিত হয় না।

৫। কেবল আকৃতি লইয়া নহে, জড়-পদার্থ যদি নিরেট্ হয়, তবে কণাগুলির আয়তন লইয়াও একটা সমস্যায় পড়িতে হয়। প্রশ্ন হয়, যদি কণা কণা করিয়া জড়কে ভাগ করিতে পারি—যদি নিরেট্ জড়কে কোটি খণ্ডে ভাগ করিয়া উহা হইতে নিতান্ত ক্ষুদ্র

অথচ ক্ষুদ্রতায় সসীম কোটি কণা পাইতে পারি, তবে উহাকে অনন্ত খণ্ডে ভাগ করিয়া উহা হইতে অসীম ক্ষুদ্র অনন্ত সংখ্যক কণাই বা না পাইব কেন? কোটি খণ্ডে ভাগ করিলেও নিরেট্ জড়ের খণ্ডগুলি নিরেটেই হইবে। যে প্রণালীতে ভাগ করিয়া এই খণ্ডগুলি পাই, সেই প্রণালীতে ভাগ করিয়া খণ্ড মাত্রেরই খণ্ড না পাইব কেন? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, যদি জড়কে নিরেট্ ও বিভাজ্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে বলিতে হইবে, উহা কেবল বস্তুখণ্ডে নহে, উহা অনন্ত খণ্ডেই বিভাজ্য বলিতে হইবে, জড়ের ক্ষুদ্রতম কণাগুলির ক্ষুদ্রতারও অন্ত নাই, উহাদের সংখ্যারও ইয়ত্তা নাই। ফল কথা, জড়কে নিরেট বলিয়া ধরিতে গেলেই উহার কণাগুলির আয়তন একেবারে শূন্য হইয়া পড়ে। কাজেই নিরেট্ জড়কে আর ঠিক কণাময় বলাই চলে না।

৬। জড় নিরেট্ নহে, ইহা স্বীকার করিলে কণাগুলির আকৃতি বা আয়তন লইয়া এরূপ খট্‌কা উপস্থিত হয় না। যদি জড় নিরেট্ না হয়, যদি উহার মাঝে মাঝে ফাঁক্ থাকে, তাহা হইলে ত জড়পদার্থ আপনি কণাময় হইয়া পড়ে। এইরূপ পদার্থকে ভাগ করিতে হইলে ঐ ফাঁক্‌গুলির অনুসরণ করিয়া যাওয়াই প্রশস্ত। এইরূপে ফাঁকে ফাঁকে ভাগ করিয়া গেলেই শেষ পর্য্যন্ত ঐ কণাগুলিতে যাইয়া পঁহুছিতে হইবে—গোটা গোটা কণা, যাহাদের আর ভাগ করা চলিবে না, অন্ততঃপক্ষে একটা নূতন প্রণালী অবলম্বন না করিলে যাহারা আর বিভক্ত হইবার নহে, এইরূপ কতকগুলি কণার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। এই কণাগুলি খুবই ক্ষুদ্র হইবে, সন্দেহ নাই, তথাপি উহাদের ক্ষুদ্রতার একটা সীমা আছে, এইরূপ মনে করিলে দোষের হইবে না। উহাদের আকৃতির জন্যও বিশেষ কিছু যায় আসেনা—উহারা গোলাকার বা স্তম্ভাকার বা যে কোন আকারের হইলেই চলিবে। এইরূপ কতগুলি কণা, যাহাদের এক একটা বিশিষ্ট আকৃতি ও আয়তন রহিয়াছে, যাহারা একেবারেই অবিভাজ্য, অথবা যাহাদের ভাগ করা খুবই কঠিন, এইরূপ কণাগুলিই প্রকৃত পক্ষে কণাপদবাচ্য। যদি জড়কে কণাময়ই বলিতে হয়, তবে উহাকে এইরূপ কতগুলি কণার সমষ্টিরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে; আর এইরূপ কণা লইয়াই যদি জড় দেহ গঠিত হয়, তবে জড় দ্রব্যের অভ্যন্তরে ফাঁক্ না থাকিলে চলে না।

৭। ফলে দেখা যায়, জড়কে কণাময় বলিলে উহাকে আর নিরেট বলা চলে না এবং নিরেট বলিলে উহাকে কণাময় বলা চলে না। হয় জড় নিরেট্ হইবে এবং অনন্ত খণ্ডে বিভাজ্য হইবে, অথবা উহা কণাময় হইবে এবং কণায় কণায় ফাঁক থাকিবে।

৮। এখন প্রশ্ন হইতেছে, দাঁড়াই কোথায়? বড়র বড় আছে, ছোটরও ছোট আছে; জড় সম্বন্ধেও কি এই কথা খাটে? এমন কি জড় নাই, যাহাকে আর ভাগ করা যায় না? বিভাজ্যতা জড়ের ধর্ম্ম, —কাটিয়া, পিশিয়া, গলাইয়া জড়কে খুবই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিতে পারি, কিন্তু ভাগ করিতে করিতে কি শেষ পর্য্যন্ত এমন একটা ক্ষুদ্র অংশ পাওয়া যাইবে না, যাহাকে আর ভাগ করা চলে না? হয়ত এমন অংশ আছে। কল্পনার সাহায্যে আমরা জড়কে অনন্তখণ্ডে বিভক্ত করিতে পারি বটে, কিন্তু প্রকৃতির বিধান হয়ত অন্যরূপ। হয়ত এমন সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ লইয়াই জড়দেহ গঠিত, যাহাদিগকে আমাদের প্রচলিত প্রণালী অবলম্বনে আর ভাগ করা চলে না—যাহারা জলে গলে না, খলে গুঁড়া হয় না, ঘর্ষণে ক্ষয় হয় না—যাহারা স্বাধীন এবং

পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন—যাহাদের এক একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে—যাহারা এক একটা বিশিষ্ট আকৃতি ও আয়তন লইয়া চলা ফেরা করে ও পরস্পরে মেশামিশি করে।

৯। হয়ত এইরূপ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা লইয়াই এক একটা জড় পদার্থ। হয়ত স্থূল দৃষ্টিতে নিরেট হইলেও প্রকৃত পক্ষে জড় কণা-ময়ই বটে, কিন্তু কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া জোর করিয়া কোন কথা বলা চলে না। কোন্ কথা সত্য, জড় নিরেট না কণাময়?

১০। প্রশ্নটা আজিকার নহে। প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুগণ * এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন, জড়দ্রব্য কণাময়; বহুসংখ্যক খুব গোটা গোটা কণা যাহাদিগকে আর ভাঙ্গিতে বা কাটিতে পারা যায় না, যাহাদের আর অংশ নাই, এইরূপ কতকগুলি সূক্ষ্ম কণা লইয়াই এক একটা জড় পদার্থ। উহারাই জড়ের ক্ষুদ্রতম অংশ বা পরমাণু। এই পরমাণুগুলি আবার পরস্পরে সংযুক্ত হইয়া এক একটী বৃহত্তর কণা গঠিত করে। এইরূপে দুইটা পরমাণু সংযোগে দ্ব্যণুকের ও তিনটা দ্ব্যণুকের সংযোগে ত্রসরেণুর উৎপত্তি হয়। এইরূপ, পরমাণু সংযোগেই যাবতীয় জড় পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে।

১১। যে বিচার প্রণালীর উপর হিন্দুর এই পরমাণুবাদ প্রতিষ্ঠিত, তাহা এইরূপে প্রকাশ করা চলে:—দেখ, সংসারে সবই অনিত্য—এই ঘট, পট, ঐ অভ্রভেদী হিমালয়, ইহারা কেহই চিরদিনের জন্য নহে। ইহারা সকলেই সৃষ্ট পদার্থ, কাজেই ইহাদের মধ্যে ধ্বংসের বীজও রহিয়াছে। সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেরই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু ধ্বংসের কথায় ভীত হইবার কারণ নাই। ঘট ভাঙ্গিয়া যাইবে, পট ছিঁড়িয়া যাইবে, জগৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু মাভৈঃ, সৃষ্টির পর প্রলয়, আবার প্রলয়ের পর সৃষ্টি। ইহাই জগতের নিয়ম। সৃষ্টির অর্থ কি? গড়িয়া তোলা। প্রলয় অর্থ কি? ভাঙ্গিয়া যাওয়া। এই ভাঙ্গা গড়া লইয়াই জগৎ। দেখ, যষ্টি প্রহারে ঘট ভাঙ্গিয়া যায়; আবার ভাঙ্গা টুকরাগুলি যোড়া দিলেই নূতন ঘটের আবির্ভাব হয়। এই যে লগুড়াঘাত, উহাই একটা খণ্ড প্রলয়, এবং ঐ যে যোড়া দেওয়া, উহাই একটা ছোটখাটো সৃষ্টি। ইহারই নাম সৃষ্টি ও ইহারই নাম প্রলয়—ব্যবহারিক সৃষ্টি ও ব্যবহারিক প্রলয়। এইরূপ সৃষ্টি ও প্রলয় লইয়াই,—এই ভাঙ্গা গড়া, এই সংযোগ ও বিয়োগ, এই মিলন ও বিচ্ছেদ লইয়াই আমাদের যা কিছু কারবার।

১২। আরও দেখ, ঘট গড়ান চলে। কিন্তু মাটী গড়ান চলে না; কুম্ভকার ঘট গড়ায়, কিন্তু মাটী গড়ায় না। আবার ঘট ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু মাটী ভাঙ্গে না। দেখ, গড়াইতে হইলেই একটা মশ্‌লা চাই—যাহাকে গড়ান চলে না, যাহা স্বয়ংসিদ্ধ, এরূপ একটা মশ্‌লা চাই। আবার ভাঙ্গিয়া ফেলিলে সেই মশলাটাই থাকিয়া যায়। বুঝিতে হইবে, এই জগৎটা অনিত্য বটে, কিন্তু উহার উপাদানটা নিত্য পদার্থ; উহা খাঁটি বস্তু, উহার সৃষ্টিও নাই, ধ্বংস নাই। বুঝিতে হইবে, ঐ নিত্য পদার্থ হইতেই এই অনিত্য জগতের উৎপত্তি এবং ঐ নিত্য পদার্থই এই অনিত্য জগতের লয়।

১৩। দেখ ঘটের উপর খণ্ড প্রলয় ঘটাইলে কত গুলি ঘটের টুক্‌রা পাওয়া যায়, আবার এই টুক্‌রা গুলির উপর প্রলয় ঘটাইলে

* মহর্ষি কণাদের বৈশেষিক দর্শন দ্রষ্টব্য।

আরও ছোট ছোট টুক্‌রারই সাক্ষাৎ মিলে। দেখ, টুক্‌রাগুলি ক্রমে ছোট করিতে পারা যায়, কিন্তু উহাদিগকে কোন মতেই এড়াইতে পারা যায়না। যতই ছোটহইতে থাকে, সংখ্যায় উহারা ততই বাড়িয়া চলে; যেন উহারা রক্ত-বীজের বংশ, একটা নাশ করিতেও সহস্রটা উৎপন্ন হইবে। ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, যে উপাদান লইয়া ঐ ঘট বা যে উপাদান লইয়া ঐ টুক্‌রা গুলি—ঐ উপাদনটা এটা নিত্য পদার্থ, উহা কিছুতেই বিনষ্ট হইবার নহে। তবেই দেখ, মহাপ্রলয় ঘটাইলেও, শেষ পর্য্যন্ত কতগুলি টুক্‌রা থাকিয়াই যায়—এই নিত্য উপাদানটাই তখন অসংখ্য টুক্‌রার আকার ধারণ করে। এই যে টুক্‌রাগুলি, যাহারা কোটি প্রলয়ের পরও স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম, যাহারা মহা প্রলয়ের সম্মুখেও বীরের ন্যায় অচল ও অটল ভাবে দণ্ডায়মান থাকে, উহারাই খাঁটি বস্তু। উহাদের উপাদানই ঘটের উপাদান এবং উহারাই ঘটের ক্ষুদ্রতম অংশ বা পরমাণু। বুঝিতে হইবে, এইরূপ কতগুলি পরমাণু লইয়াই এক একটা জড় পদার্থ। পরমাণু সংযোগেই ঘট, পট, পরমাণু সংযোগেই এই বিচিত্র জগৎ। জগৎ অনিত্য ও পরমাণু নিত্য। নিত্যের সহিত নিত্যের যোগেই অনিত্যের উদ্ভব এবং নিত্য হইতে নিত্যের বিয়োগেই অনিত্যের বিনাশ। ইহাই সৃষ্টি ও ইহাই প্রলয়—ইহাই ব্যবহারিক সৃষ্টি ও ব্যবহারিক প্রলয়।

১৪। দেখা যায়, প্রাচীন হিন্দুর এই পরমাণু তত্ত্বের মূলে একটা বিশিষ্ট উদ্দেশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। মুখ্য উদ্দেশ্য, জগৎ-সৃষ্টি ব্যাখ্যা করা, অথবা সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার একটা বিশেষ ক্রমের ব্যাখ্যা করা। দেখা যায়, এই জগৎ-সৃষ্টি ব্যাখ্যা করিতে যাইয়াই—সৃষ্টি ও সংহার ব্যাপারকে ভাঙ্গা-গড়ার চোখে দেখিতে যাইয়াই, জগতের গঠন প্রণালীতে এই আণবিক গঠন আরোপ করা, জগৎটাকে পরমাণু সমষ্টিরূপে গ্রহণ করা।

১৫। এই সৃষ্টি ব্যাখ্যার মধ্যে কোথাও গলদ আছে কি না, অথবা এই ব্যাখ্যাটাই জগৎ-সৃষ্টি সম্বন্ধে শেষ কথা কিনা, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু এই প্রণালীর সৃষ্টি ব্যাখ্যার সহিত এই ধরণের পরমাণুবাদ যে বেশ খাপ খায়, তাহাতে ভুল নাই।

১৬। তথাপি পরমাণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা স্বাধীন প্রমাণ উপস্থিত করাও হিন্দু-দর্শনকার আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন। পরমাণুর অস্তিত্ব প্রমাণে যুক্তিপ্রণালী এইরূপ; —প্রমাণ করিতে হইবে যে, পদার্থ মাত্রই কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি—যাহাদিগকে আর ভাঙ্গা যায় না, যাহাদের আর অংশ নাই, এরূপ কতকগুলি কণার সমষ্টি। অর্থাৎ কিনা প্রমাণ করিতে হইবে যে, পদার্থ মাত্রেরই বিভাজ্যতার একটা সীমা আছে—যে সীমায় পৌছিলে পদার্থকে আর ভাগ করা চলে না, এইরূপ একটা সীমা আছে। ইহার প্রমাণ অতি সহজ, কেন না, যদি এরূপ একটা সীমা না থাকিত, যদি পদার্থ মাত্রই অসীম খণ্ডে বিভক্ত হইত, তাহা হইলে ছোট বড় প্রত্যেক পদার্থকেই অনন্ত সংখ্যক কণার সমষ্টিরূপে গ্রহণ করিতে হইত। তাহা হইলে বলিতে হইত, যতগুলি কণা লইয়াই একটা সরিষা দানা, ঠিক ততগুলি কণা লইয়াই ঐ সুমেরু পর্ব্বত। ফলে দাঁড়াইত, সরিষা দানা = সুমেরু পর্ব্বত; কিন্তু ইহা অসম্ভব। কাজেই, পদার্থ মাত্রেরই বিভাজ্যতার একটা সীমা আছে, অর্থাৎ কিনা, পরমাণু আছে।

১৭। এইরূপ যুক্তি যে বিচারে টিকে

না,ইহা বলাই বাহুল্য, কিন্তু যে বিচার প্রণালীর উপর হিন্দুর এই পরমাণুবাদ প্রতিষ্ঠিত, তাহা এইরূপ এক একটা বিশিষ্ট প্রমাণের অপেক্ষাই রাখে না।

১৮। প্রাচীন হিন্দুর পর প্রাচীন গ্রীক্। গ্রীকদের মধ্যে দুইটা মত ছিল। একদল * ছিলেন কণাবাদী। ইহারা বলিতেন, জড় মাত্রেই কণাময় এবং কণায় কণায় ফাঁক আছে। এই কণাগুলি অতি ক্ষুদ্র, উহারা চক্ষুর অগোচর। কিন্তু এক একটা কণা এক এক একটা গোটা জিনিস,—উহাদের ভাঙ্গিতে বা কাটিতে পারা যায় না, উহারা অক্ষয়। ইহারাই অ্যাটম্ বা পরমাণু। জড়কে ভাগ করা চলে, খুবই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশেই ভাগ করা চলে, কিন্তু ক্রমাগত ভাগ করিতে থাকিলে শেষ পর্য্যন্ত অ্যাটমে গিয়া থাকিতে হইবে—অ্যাটম্‌কে আর ভাগ করা যাইবে না। জড় দ্রব্য অ্যাটম্‌ময় এবং অ্যাটমে অ্যাটমে দেশের ব্যবধান আছে।

১৯। অপর দল † ছিলেন ক্রমবাদী। ইহারা বলিতেন,জড় দ্রব্য কণাময় নহে,নিরেট। নিরেট জড়কে ভাগ করিতে করিতে শেষটা অ্যাটমে গিয়া থামিতে হইবে, এমন কোন নৈসর্গিক বাধা নাই। জড় নিরেট ও বিভাজ্য —অনন্ত খণ্ডেই বিভাজ্য ; শত খণ্ডে বা সহস্র খণ্ডে বা কোটি খণ্ডে মাত্র নহে। ইহাই প্রকৃতির বিধান। জড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ কল্পনা করিতে পার, কিন্তু কল্পনা-রথে চাপিয়া অগ্রসর হইতে থাকিলে ক্ষুদ্র হইতে ক্রমে ক্ষুদ্রতর অংশেরই সাক্ষাৎ লাভ ঘটিবে—কুত্রাপি রশ্মি সংযত করিবার আবশ্যক হইবে না। আর ভাঙ্গা যায় না, জড়ের এমন কোন অংশ নাই ; অ্যাটম্ বলিয়া কোন পদার্থ নাই।

২০। তখন ছিল শুধু কল্পনার যুগ। তখন পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ এতটা প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। তখন বিজ্ঞান ছিল না, ছিল শুধু দর্শন। দার্শনিকগণ শুধু কল্পনার সাহায্যে স্বকীয় মত স্থাপনে যত্নবান হইতেন।

২১। প্রাচীন গ্রীকের কল্পনা কেবল জড়ের গঠন প্রণালীর আলোচনাতেই নিবদ্ধ ছিল না। দেশ, কাল, জড়, তিন লইয়াই আমাদের কারবার। দার্শনিকগণ দেশের গঠন ও কালের গঠন লইয়াও বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন এবং জড়কেও দেশের কোঠায় বা কালের কোঠায় টানিয়া আনিয়াই জড়ের গঠন প্রণালী নিরূপণে প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহারা প্রশ্ন তুলিতেন, কালের সীমা নাই, দেশও সীমাহীন, কিন্তু উহাদের ভিতরের গঠন কেমন ? দেশের মধ্যে ও কালের মধ্যে অবচ্ছেদ কল্পনা করিতে হইবে কি না ? দেশ ও কাল কণাময় কি না ? কালের অংশ কল্পনা করিতে পারি। বৎসরের অংশ মাস, মাসের অংশ দিন, দিনের অংশ ঘণ্টা, ঘণ্টার মিনিট, মিনিটের সেকেণ্ড। সেকেণ্ডেরও অংশ কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত একটা সীমায় পঁহুছিতে হইবে কি না ?—একটু খানি কালের কণা বা একটা ক্ষণে পঁহুছিয়া কল্পনা স্রোত বাধা প্রাপ্ত হইবে কি না ? জড় সম্বন্ধে যে প্রশ্ন , কাল সম্বন্ধেও সেই প্রশ্ন এবং দেশ সম্বন্ধেও সেই প্রশ্ন। দেশ, কাল, জড়, তিনেরই গঠন প্রণালী প্রাচীনদের কল্পনার বিষয় ছিল।

২২। যাঁহারা ক্রমবাদী, তাঁহারা ভাগ-প্রণালীতে একটা সীমা নির্দ্দেশ করিতে চাহিতেন না। ইহারা ছিলেন, অসীম ক্ষুদ্রতার পক্ষ-

---

* ডেমোক্রাইটাস্, এপিকিউরাস্ প্রভৃতি।

† অ্যানাক্সগোরাস্, অ্যারিষ্টটল্ প্রভৃতি।

পাতী। ইঁহারা বলিতেন, দেশের বা কালের অংশ কল্পনা করিতে পারি,—খুবই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ কল্পনা করিতে পারি; কিন্তু হাজার ক্ষুদ্র হইলেও ক্ষুদ্র মাত্রেরই অংশ কল্পনায় বাধা নাই। দেশের অংশ দেশই বটে, কালের অংশ কালই বটে। কল্পনা বলে যাহাকে সহস্র বা লক্ষ খণ্ডে ভাগ করিতে পারা যায়, যাহাকে কোটি খণ্ডে ভাগ করিলেও ভাগের আরও শেষ রহিয়া যায়, তাহাকে অনন্ত খণ্ডে ভাগ করিতেই বা কল্পনা-বিমুখ হইবে কেন? দেশ ও কাল অনন্ত খণ্ডে বিভাজ্যই বটে; আবার দেশ ও কালের ন্যায় জড়েও ক্রম-ভঙ্গ নাই---সকলেই একটানা, সকলেই নিরেট, সকলেই অনন্তখণ্ডে বিভাজ্য। দেশ, কাল ও জড়ও অনন্তখণ্ডে বিভাজ্য। দেশ ও কালে ক্রম-ভঙ্গ নাই, আবার দেশ ও কালের ন্যায় জড় কোনটারই ক্ষুদ্রতার সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না। ক্ষুদ্রতার সীমা আরোপ করা শুধু দুর্ব্বলতার লক্ষণ। জড় কণাময় নহে, অনন্ত খণ্ডে বিভাজ্য; ইহাই ঠিক কথা।

২৩। আবার যাঁহারা কণাবাদী, তাঁহারা সর্ব্বত্রই দেখিতেন, কণা আর কণা—সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, অথচ সূক্ষ্মতায় সসীম, কণার দল। ইঁহারা (১) বলিতেন, কাল কণাময়; কাল মাত্রই কতকগুলি ক্ষণের সমষ্টি—যাহাকে আর ভাগ করা চলে না, এইরূপ কতকগুলি ক্ষণের সমষ্টি। * সেইরূপ দেশও কণাময়, জড়ও কণাময়। কণাবাদীগণ বলিতেন, দেখ গোটা গোটা মানুষ লইয়াই মনুষ্য সমাজ, গোটা গোটা নক্ষত্র লইয়া নক্ষত্র জগৎ, কণা কণা বালুকা লইয়াই বালুকাস্তূপ, সেই-

(১) জেনো প্রভৃতি।

* যাঁহারা এইরূপ ভাবিতেন, তাঁহাদের একটা গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটা একটা হেঁয়ালী। একিলিস্ রাস্তা দিয়া চলিয়াছেন, তাহার ঠিক এক হাত আগে চলিয়াছে একটা কচ্ছপ। একিলিস্ যান সেকেণ্ডে এক হাত করিয়া, আর কচ্ছপ যায় সেকেণ্ডে আধ হাত মাত্র। কতক্ষণ পরে একিলিস্ কচ্ছপকে ধরিয়া ফেলিবেন?

এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। একিলিস্ প্রতি সেকেণ্ডে আধ হাত বেশী যান, অর্থাৎ আধ হাতের ব্যবধান ঘুচাইতে একিলিসের এক সেকেণ্ড মাত্র সময় লাগে, কাজেই এক হাতের ব্যবধান ঘুচাইতে তাহার লাগিবে ঠিক দুই সেকেণ্ড; সুতরাং দুই সেকেণ্ড পরেই একিলিস্ কচ্ছপকে ধরিয়া ফেলিবেন, ইহাতে ভুল নাই।

কিন্তু তখনকার দিনে এ প্রশ্নটা একটা হেঁয়ালীর মধ্যে গণ্য ছিল। হেঁয়ালীটা এই রকম;—কচ্ছপটা আছে এক হাত ব্যবধানে। বেশ, একিলিস্ এক সেকেণ্ডে সেই এক হাত গেলেন; কিন্তু কচ্ছপটা ততক্ষণে ঠিক আধহাত অগ্রসর হইল। ভাল, একিলিস্ আধ সেকেণ্ডে সেই আধ হাত গেলেন, কিন্তু কচ্ছপও ততক্ষণে আবার সিকি হাত গেল। একিলিস্ সিকি সেকেণ্ডে সেই সিকিহাতও গেলেন, কিন্তু কচ্ছপ ততক্ষণে আবার গেল এক হাতের আট ভাগের ভাগ। কি আপদ! একিলিস্ সেই এক হাতের আট ভাগের ভাগও গেলেন, কিন্তু কচ্ছপ কিছুতেই হটিবার পাত্র নহে, সেও ততক্ষণে গেল এক হাতের ষোল ভাগের ভাগ। তারপর কচ্ছপ যাইবে, এক হাতের বত্রিশ ভাগের ভাগ; তারপর চৌষট্টী ভাগের ভাগ এইরূপ। কাজেই চিরকাল চলিলেও একিলিসের ভাগ্যে কচ্ছপ ধরা ঘটে কোথায়? তখনকার দিনে হেয়ালির উত্তর কিছু কঠিনই ছিল।

একিলিস্‌কেত ক্রমাগত চলিতেই হইবে। এক সেকেণ্ডের পর অর্দ্ধ সেকেণ্ড, তারপর সিকি সেকেণ্ড, তারপর সেকেণ্ডের অষ্টমাংশ, তারপর ষোড়শাংশ, এইরূপ অসংখ্য খণ্ডকাল; এই অসংখ্য খণ্ডকালগুলির সমষ্টি যাহা, একিলিস্‌কেত ততকালই চলিতে হইবে।

খণ্ডকাল গুলি ক্রমে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হই

রূপ, কতকগুলি দেশের টুকরা লইয়াই এই অসীম দেশ, কতকগুলি কালের খণ্ড লইয়াই এই অনন্তকাল এবং কতকগুলি অ্যাটম লইয়াই এই জড় জগৎ। দেখ, কণাবাদে সুবিধা কত। কোন পদার্থটা কত বড়, জানিতে চাহ? দেশ বা কাল বা জড়ের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে চাহ?— শুধু গণিয়া যাও। একটীর পর একটী, মুহূর্ত্ত গুলি গনিয়া যাও, কালের পরিমাণ পাইবে; একটী একটী করিয়া অ্যাটামগুলি গণিয়া যাও। জড়দ্রব্যের পরিমাণ পাইবে। এইরূপ সর্ব্বত্র। কেবল কণা লইয়াই কারবার—গোটা গোটা মুহূর্ত্ত, গোটা গোটা পরমাণু—শুধু কণার দল, শুধু সংখ্যার খেলা—এক, দুই, তিন, চারি, গণিয়া গেলেই হইল—কোথাও ভগ্নাংশের জঞ্জাল নাই, পরিমাণ নির্দ্দেশেও কোথাও ভুল ভ্রান্তি হইবার আশঙ্কা নাই। জড় অনন্ত খণ্ডে বিভাজ্য নহে, কণাময়ই বটে।

২৪। কণাবাদীগণের মধ্যে কেহ কেহ আবার অতটা গোঁড়ামীর পক্ষপাতী ছিলেন না। ইহারা বলিতেন, জড় কণাময় বটে, কিন্তু কাল বা দেশ যে অনন্ত খণ্ডে বিভাজ্য, তাহাতে ভুল নাই। কল্পনার সাহায্যে আমরা কাল বা দেশকে অনন্ত খণ্ডে ভাগ করিতে পারি; ইহাতে বাধা দিবার কেহই নাই। কিন্তু জড় সম্বন্ধে প্রকৃতির বিধান অন্যরূপ। এখানে কেবল কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিলে চলিবে না, এখানে ভিন্ন অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে। জড় জড় মাত্র, দেশও নহে, কালও নহে। জড় প্রকৃতিতে এমন কোন অস্ত্র নাই, যাহার সাহায্যে জড়কে অনন্ত খণ্ডে বিভক্ত করা যাইতে পারে। জড় কণাময় এবং কণায় কণায় ফাঁক আছে; কণাগুলি এই ফাঁকের মধ্যে দিয়া অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে। জড় দ্রব্য নিরেট হইলে কণাগুলির গতিই সম্ভব হইত না। দেশ কাল নিরেট বটে, কিন্তু জড় পদার্থ যে কণাময়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

তেছে সত্য, কিন্তু সকলেরই ত কিছু না কিছু ব্যাপ্তি রহিয়াছে; এইরূপ অসংখ্য খণ্ড কালের সমষ্টি। উঃ! অতকাল একিলিসের বাঁচিয়াও কাজ নাই এবং কচ্ছপ ধরিয়াও কাজ নাই।

এইরূপ বিচার প্রণালী যুক্তিযুক্ত বটে, কিন্তু উহাতে একটু দোষ রহিয়াছে। দোষ, কালের অংশ কল্পনায় নহে,—দোষ কালের অংশ মাত্রকেই সসীম কল্পনা করা,—হাজার ক্ষুদ্র হইলেও, খণ্ড কালগুলিতে ব্যাপ্তি আরোপ করা,—কালে বিভাজ্যতা আরোপ করিয়াও, উহা কোটী কোটী খণ্ডে বিভাজ্য, ইহা স্বীকার করিয়াও, উহা অনন্ত খণ্ডে বিভাজ্য, ইহা স্বীকার না করা।

কাল অনন্ত খণ্ডে বিভাজ্য, ইহা স্বীকার করিলেই হেঁয়ালীটার উত্তর পাওয়া যায়;—কাল অনন্ত খণ্ডে বিভাজ্য, কাজেই একিলিসের যাত্রা কালের মোট পরিমাণ হইতেছে, একটা অনন্ত শ্রেণীর যোগফল—এক সেকেণ্ড, অর্দ্ধ সেকেণ্ড, সিকি সেকেণ্ড, তার অর্দ্ধ, তার অর্দ্ধ, এইরূপ ক্রমে হ্রসমান, ফলে শেষ পর্য্যন্ত বিন্দু মাত্রে পরিণত, এইরূপ কতকগুলি খণ্ড কালের যোগফল। এখন, গণিত শাস্ত্রে বলে, এইরূপ একটা অনন্ত শ্রেণীর যোগফল হইতেছে মাত্র দুই সেকেণ্ড। কাজেই, দুই সেকেণ্ড পরেই যে একিলিস্ কচ্ছপকে ধরিয়া ফেলিবেন, তাহা অনিবার্য্য। গণিত শাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহা সহজেই দেখা যায় যে, যদিও ঐ খণ্ড কালগুলির সংখ্যার ইয়ত্তা নাই, তথাপি পর পর চলিয়া গেলে উহাদের ক্ষুদ্রতারও ইয়ত্তা পাওয়া যায় না। শ্রেণীটা অনন্ত শ্রেণী বটে, কিন্তু অসীম ক্ষুদ্রেরই অনন্ত শ্রেণী। যাহা সসীম, তাহাই দল পাকাইয়া একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড ঘটাইয়া থাকে। কিন্তু অসীম ক্ষুদ্রের অনন্ত শ্রেণীও একত্র করিলে সসীমই হয়। কাজেই একিলিসের যাত্রা কালটাও যে সসীম হইবে এবং মানানসই কালই হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই।

বঙ্গের বর্ত্তমান অবনতিশীল সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ।

কার্লাইল তাঁহার যুগের সাহিত্যের দুর্দ্দশা দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন,—"It is not literature they are swimming away; it is only book-publishing and book-selling. Literature is the thought of thinking souls; this by the blessing of God, can in no generation be swum away, but remains with us to the end." বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের অধঃপতন ও অবনতিকে লক্ষ্য করিয়া আমরাও কি আজ এই কথা বলিতে পারি না? কলার সাধনার সঙ্গে যখন অর্থের মলা প্রাধান্যলাভ করে, তখন কলা কলঙ্কে পরিণত হয়। পরমহংসদেব বলিতেন, "ধ্যান করবে বনে মনে আর কোণে।" সাধকের পক্ষে তিনি যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, সাহিত্যিকের পক্ষেও কি সেই উপদেশ সঙ্গত নহে? সাধক না হইলে কি সাহিত্যিক হওয়া যায়? —সাহিত্যও যে একটা সাধনা! গভীর তন্ময়ত্ব ও অভিনিবেশ ব্যতীত সাহিত্যিক হইতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

আজকাল সাহিত্যিক হইবার উচ্চাভিলাষ সকলেরই, দুই পাতা পড়ি আর না-ই পড়ি, দুই পাতা লিখিব এবং ছাপাইয়া নাম জাহির করিব,এই দুরাশাতেই অনেকে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত সাহিত্য এতটা সহজ এবং সুলভ নহে, যথেষ্ট পরিশ্রম ও সাহিত্যের জন্য জীবনপাত ব্যতীত সাহিত্যিক হওয়া যায় না। তাই সাহিত্যজগতে Art for Art's sake কথাটীর গুরুত্ব এত অধিক। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে Art for gain's sake বর্ত্তমান যুগকে ছাইয়া ফেলিয়াছে, ইহাই যেন সর্ব্বত্র লক্ষ্য করিতেছি। ব্যবসা বাণিজ্য অন্য সব ক্ষেত্রে চলিতে পারে, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যবসাদারীটা যে কতদূর বাঞ্ছনীয়, তদ্বিষয়ে ভাবুকমাত্রেরই একটা সন্দেহ আছে।

সাহিত্যিকের দুর্দ্দশা সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বকালেই ঘটিয়াছে এবং ঘটিবে। স্যর রবীন্দ্রনাথ, স্যার ওয়ালটার স্কটের ন্যায় অল্প সাহিত্যিককেই বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। ইঁহারা যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহা পাইয়াছেন। কার্লাইল লিখিয়া গিয়াছেন,—"Station in society, solid power over the good things of this world was Scott's avowed object; towards which the precept of precepts is that of Jago, "Put money in thy purse." এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ স্কটকেও পরাভব করিয়াছেন।

সাহিত্যিকের মধ্যে কাজের লোক যদি কেহ হইয়া থাকেন, তবে আমরা অকপটে বলিব, স্কট্ এবং রবীন্দ্রনাথ! 'The practical Scott, looking towards practical issues in all things, could not but find hard cash one of the most practical. If by any means cash could be honestly produced, more it by writing poems, were it by printing them, why not?" সে যুগের কার্লাইলের এই মিঠে-কড়া উক্তি আমরা দেখিতে পাইতেছি, এযুগেও খাটিয়া যাইতেছে।

Waverley series লিখিয়া "Walter Scott became Sir Walter Scott, Baronet of Abbotsford; on whom fortune seemed to pour her whole cornucopia of wealth, honor and worldly good." রবীন্দ্রনাথের ভাগ্য ইহা অপেক্ষাও সরস এবং সফল! রবীন্দ্রনাথ ধূলির মুঠি ধরিয়া সোণা মুঠি পাইলেন, তাঁহার রাবিশ গুলাও সোণার দরে বিকাইল!

যাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে কেবল ভাগ্যবান্ বলিয়া ঈর্ষা প্রকাশ করেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের মতের ঐক্য নাই। তাঁহার মত বিজ্ঞাপনই বা এজগতে কয় জন সাহিত্যিক দিতে পারিয়াছেন? তিনি যে আজ কবি-সম্রাট্ হইয়াছেন, ইহার অন্তরালে তাঁহার এষণাময় আত্ম-প্রচার কতটা কার্য্য করিয়াছে, ইহা অনেকে তলাইয়া দেখেন না। এতদ্ভিন্ন রবীন্দ্রনাথের শিষ্যসেবকগণের বাহিরের চেষ্টাও বড় কম নহে। রবীন্দ্রনাথ যত বড়ই হউন কেন, তিনি ভক্তাধীন, স্কন্ধে ভর দিয়া উঠিতেই পারেন না। রবীন্দ্রনাথ শিষ্যসেবকের সমভিহার ব্যতীত একা কোথায়ও যাইতে সাহসী হন না। Andrew বা Pearson থাকাই চাই। Sir Walter Scott কিন্তু এসব বিষয়ে বলিষ্ঠ ও আত্ম-নির্ভরশীল পুরুষ ছিলেন। কারণ তিনি স্যর রবীন্দ্রনাথের মত দুই নৌকায় পা দেন নাই। যশোলাভ স্কটের জীবনে গৌণ আকাঙ্ক্ষা ছিল, স্কট্ বুঝিতেন অর্থ ও farm-house! তিনি Waverly Novel লিখিতেছিলেন তাঁহার ভূসম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধির জন্য, শান্তি-নিকেতন বাড়াইবার জন্য! স্পষ্টবাদী কার্লাইল সাক্ষ্য দিতেছেন—"Fast as the new gold comes in for a new Waverly Novel, or even faster, it changes itself into moory acres, into stone, and hewn or planted wood."

কিন্তু কবি-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ শান্তি-নিকেতনেও সন্তুষ্ট নহেন, বিশ্ব-সিংহাসনে তিনি বসিবেন, এই তাঁহার উচ্চাভিলাষ; তাই রবীন্দ্রনাথের যত বয়স বাড়িতেছে, চুল পাকিতেছে, ততই যশের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিতেছে—বিশ্বের নিমন্ত্রণ পাইলেই লোভ সংবরণ করা তাঁহার পক্ষে সুকঠিন হইয়া পড়িতেছে। হায়, উচ্চাভিলাষই কি মানবের অধঃপতন নহে? বিচক্ষণ কার্লাইলই বলিয়াছেন—"Ambition, the desire of shining and outshining was the beginning of sin in this world." আত্ম-প্রশংসার দাবানলে নশ্বর পতঙ্গের মত পুড়িয়া মরিবার সাধ, তাই বুঝি, কবির জীবন-স্মৃতির আড়ম্বর ধরে না—"The golden calf of self-love has grown into a burning Phalaris' Bull, to consume its owner and worshipper.' চিন্তাশীল Jean Paulk এই বাণীটী কবি-সম্রাট্ এখনও ভাবিয়া দেখিয়া সাবধান হইতে পারেন। কবি-সম্রাট্ আড়ম্বর ত্যাগ করুন, ইহাই আমাদের শেষ নিবেদন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের সঙ্গে স্কটের জীবনের অনেক সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যবসাক্ষেত্রে উভয়ের মনস্তত্ব একই প্রকারের। কার্লাইলের "স্যার ওয়াল্টর স্কট" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিতে করিতে আমার স্যর রবীন্দ্রনাথকেই মনে পড়িতেছিল। সাহিত্য-জগতে এমন যুগল-মিলন আর কুত্রাপি দেখা যায় না। পাঠক মহাশয়দিগকে কার্লাইলের উক্ত প্রবন্ধটী পড়িতে সবিনয় অনুরোধ করি। তাহা হইলে অনেকেই বুঝিতে পারিবেন, সাহিত্যের মর্য্যাদা ও সাহিত্যিকের স্থান এই চাকচিক্য-প্রধান জগতের কত উচ্চে! Sir Walter Scottএর ন্যায় ঔপন্যাসিক ঋষি-প্রতিম Carlyleএর চক্ষে কীটেরও অধম হইয়া পড়িয়াছেন। জগতে শ্রেষ্ঠ হইতে হইলে অর্থবল যে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকে এবং একমাত্র চরিত্র-বলই যে মানবাত্মার শ্রেষ্ঠতার মাপ-কাঠি হয়, ইহাই কার্লাইল দেখাইয়া গিয়াছেন। কার্লাইলই বলিতে পারিয়াছেন—"On the other

hand, he (স্কট্) wrote many volumes, amusing many thousands of men. Shall we call this great? It seems to us there dwells and struggles another sort of spirit in the inward parts of great men!" আর আমাদের এই নিরঙ্কুশ দেশে সুবিধা-বাদী রবীন্দ্রনাথ এত সহজেই ঋষি হইতে যান? বিড়ম্বনা আর কাহাকে কহে? রবীন্দ্রনাথ কবি-সম্রাট্ হইতে পারেন, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব পাইতে পারেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে ত্রিকালজ্ঞ ঋষি—এ কথা বলিলে এদেশ আপত্তি তুলিবেই। এ অদ্ভুত সভ্যতার যুগে ভোটের জোরে ধনসম্রাট্ হইতে কবি-সম্রাট্ হওয়া কোনরূপ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে বটে, কিন্তু ঋষি মুনি হইবার আব্দার ধরিলে এদেশ তাহাও কি রক্ষা করিবে!

প্রকৃত কবি কোন দিনই সম্রাট্ নহেন, দুঃখ দরিদ্রতার ক্রোড়েই কবির তুষ্টি পুষ্টি, কোন কবিই আদুরে গোপালরূপে জগতে গঠিত হয় নাই। প্রকৃত কবি, প্রকৃত সাধক নির্য্যাতন ব্যতীত জগতের নিকট অন্য নিমন্ত্রণ পায় নাই। প্রকৃত কবির স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া কার্লাইল লিখিতেছেন—"The celestial element will not mingle with the clay of earth; both poet and man of the world he must not be; vulgar ambition will not live kindly with poetic adoration; he cannot serve God and Mammon."

কিন্তু এই জীবন-স্মৃতির বিজ্ঞাপনের যুগে, এই অপূর্ব্ব সাম্য তত্ত্বের যুগে ক্ষুদ্র বল্মীক স্তূপও লক্ষ্মীর কৃপায় হিমাদ্রি হইতে চলিল দেখিতেছি।

"যে জন পূজিবে ও পদ যুগল
সেই সে দরিদ্র হবে।"

কবির এ উক্তি বুঝি চিরদিনের মত বাঙ্গালাদেশ হইতে বিদায় লইল। ইহা সুসমাচার বটে, কবি-সম্বর্দ্ধনা দেশে বাড়িতে থাকুক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু যেন মোসাহেবী না বাড়িতে থাকে, কবি এবং তাঁহার কলা ভাড়াটিয়া না হইয়া পড়ে, অথবা কবিকে বড়লোকের আশাপথ চাহিয়া না চলিতে হয়। ইহাও ত দেখিতে পাই-তেছি, একদিকে কবি-সম্বর্দ্ধনাও চলিতেছে, অন্য দিকে একই সময়ে কবিকে হাঁসপাতাল-শায়ীও হইতে হইয়াছে। ইহাই কি বাঙ্গালীর গুণগ্রাহিতার পরিচয়? কবি যদি কতক-গুলি বড় লোক ও রাজা মহারাজার কৃপা-পাত্র হন, তদপেক্ষা কবির পক্ষে হীনতা এবং দীনতা আর কি আছে? বলা বাহুল্য, এরূপ কবিতে বাঙ্গালার আধুনিক কবিকুঞ্জ ক্রমশঃই ভরপুর হইয়া উঠিতেছে এবং কবিতাও ক্রমশঃ মনরক্ষা ও মোসাহেবীতে পরিণত হইতেছে।

অতি দুঃখেই টলষ্টয় বলিয়াছিলেন—"At present science is the slave and Art is the prostitute of the wealthy." কলার যে সত্যং শিবং সুন্দরম ভাবের পরিবর্ত্তে অসত্যং অশিবং কদর্য্যম্ ভাবই বিশেষ করিয়া দেখিতেছি। বাবুরা আজ কাল ধুয়া তুলিয়াছেন যে, তাঁহাদের আর্টে তাঁহার 'অপ্রিয় সত্য' বলিয়া থাকেন। এবং এই অপ্রিয় সত্যের দোহাই দিয়া রাবণের সঙ্কোচের মূল্যকে বাড়াইয়া তুলিয়া সীতার পাতিব্রত্যের মূল্যকে হ্রাস করেন। হায় রবীন্দ্রনাথ, এই নিস্তেজ বাঙ্গালীর দেশ বলিয়া তুমি পার পাইয়া গেলে, তুলসীদাসের দেশে গিয়া সীতার চরিত্রে এইরূপ আঘাত দিলে বুঝিতে পারিতে, তোমার এই অপ্রিয় সত্যের পরিণাম কিরূপ হইত। ধিক্ তুমি, আবার এশিয়ার রাজ-কবি—প্রাচ্যের প্রতিনিধি! বাল্মীকি যে চরিত্র-চিত্রনে আজিও কবিগুরু বলিয়া পূজিত হইতেছেন, তুলসীদাস যে চরিত্রকে আজিও ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উন্নত ও উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন, সেই ভারতের গৌরব-লক্ষ্মীর সীতার সতীত্বে অবিশ্বাস! বাঙ্গালার অকর্ম্মণ্য বাবুরা ইহাতে আমোদ অনুভব করিতে পারে, কিন্তু তোমার এই জঘন্য মনোভাব প্রকৃত বাঙ্গালী কখনই সমর্থন করিবে না।

"What is important is not the subject treated of, but the feeling the author imparts when deeling

with it." এই কথাটাই যে আমরা লিখিবার কালে ভুলিয়া যাই। অনেক অশ্লীল বিষয়ও গ্রন্থকারের রচনার গুণে মুক্তির সোপানে পরিণত হইয়াছে। ব্যাস পঞ্চমাধ্যায় গীতগোবিন্দ প্রভৃতি গ্রন্থকারের গুণে সাধকের পরমার্থের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

Zangwill তাঁহার Byond Prejudices গ্রন্থে এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "The aim of the artist is not to conceal art—there is none to conceal—but to conceal his indecencies decently, and yet in the most readily discoverable manner." অপ্রিয় সত্য বলিতে আমরা বাধা দিতেছি না, কিন্তু বীভৎসভাবে ধর কেন? কলাবিদ যিনি, তিনি নিরপেক্ষ থাকিবেন, তিনি চরিত্রের দোষগুণে আপনাকে ধরা দিবেন কেন? কেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সন্দীপ হইয়া বসেন? গ্রন্থকারের গোপন-চিত্তবিকার কেন সন্দীপের কলুষিত উক্তিগুলিতে ব্যক্ত হইয়া পড়ে? রবীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয় মনস্তত্ত্ববিদ বলিয়া আপনাকে প্রচার করেন, তবে সাইকলজি ও আর্টের এই অতি আবশ্যকীয় দায়িত্বটা কেন ভুলিয়া যান? Madridর বিখ্যাত সমালোচক ও মনোবেত্তা Armando Palacis Valdes এই বিষয়টাই বিশেষ করিয়া ধরিয়াছেন। তিনি তাঁহার "The decadence of Modern literature নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন—"In the novel, it is not the author who should speak, but the incidents and characters and if the work involve any philosopahy the reader should find it out for himself." বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ উপন্যাসে তাঁহার নিজের কথা এত বেশী যে, পাঠকের তাহা তৃপ্তিকর না হইয়া বিরক্তিকর (bore) হইয়া পড়ে। ফেনাইয়া ফেনাইয়া রবীন্দ্রনাথ এত বাড়াইয়া তোলেন যে, তখন পড়িতে পড়িতে মনে হয় "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।" ইহা কলাবিদের দুর্ব্বলতারই পরিচয়! শ্রেষ্ঠ কলাবিদগণের রচনায় পাঠকের সহিষ্ণুতাকে এমন ভাবে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। লেখকের পক্ষে প্রতিপাদ্য বিষয় যত সংযতভাবে প্রকাশিত হয়, ততই কৃতিত্বের পরিচয়, নচেৎ অযথা ফেনাইয়া ফেনাইয়া দীর্ঘ করিলে ভাবের গভীরতার ও ঘটনার ঘনিষ্ঠতার (intensity) সবিশেষ লাঘব হইয়া পড়ে।

"The author who writes voluminously should understand that all that his work gains in extension loses in intensity."—Valdes.

কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান কলাপীগণের মস্তিষ্কে একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে, মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে যিনি যত অধিক গল্পের ডিম্ব প্রসব করিতে পারিবেন, তিনি তত বড় লিখিয়ে! তাহা রাবিশ হউক বা আগাছাই হউক, তাহা দেখিবার কোন প্রয়োজন নাই। কেবল পরিমাণের দিকে লক্ষ্য, গুণের বিচার নাই।

রবীন্দ্রনাথের রচনার পরিমাণ অন্যান্য কবিগণের অপেক্ষা অসীম বলিয়া রবীন্দ্রনাথ হেম-মধু-নবীন-বঙ্কিমের মস্তকে বসিবেন, ইহাই যাহাদের ধারণা, তাহাদিগকে বুঝাইতে যাওয়া আমার সাধ্য নয়। মুদ্রাযন্ত্রের অভাবনীয় প্রভাবে বর্ত্তমান যুগে অনেক দ্রুত-লেখক সেক্‌স্পিয়র, কালিদাসকেও পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিবার দুরাশা করিতেছে বটে, কিন্তু তাহারা দিতেছে কি?—স্বর্ণকান্তি মাখাল! অথবা কার্লাইলের ভাষায় বলিতে হয়—"Straw that has been thrashed a hundred times without wheat, ephemeral sound of a sound" শস্য নাই, কেবল তুষ, বর্ষণ নাই কেবল গর্জ্জন! রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এই সব দ্রুত-লেখকদিগকে Dr. Nordan প্রভৃতি চরিত্র-বিশারদগণ বলিতেছেন, Grapho-maniacs অর্থাৎ রচনা-পাগল। এই সব উন্মাদদিগকে লক্ষ্য করিয়াই কার্লাইল বলিয়াছিলেন—"O ready-writer, to brag openly of thy rapidity and facility; to thee (if thou be in the manufacturing line) it is a benefit, an increase of wages;

but to me it is shear loss, worsening of my penny worth: why wilt thou brag of it to me?" পাঠক মহাশয়েরাও লেখকগণের নিকট হইতে উপরের প্রবচনটীর অনায়াসে দাবী করিতে পারেন, কারণ ক্ষতি-পাঠকগণেরই বেশী। ধনেপ্রাণে মারা যাইতেছেন তাঁহারাই! সাহিত্য ত manufacture নহে, সাহিত্য সৃষ্টি!—সাহিত্যকে প্রসব-বেদনাও বলিতে পারি। সৃষ্টি করিতে হইলে, তপস্যার আবশ্যক। পিতামহ ব্রহ্ম এইজন্যই কবি। এইজন্যই Dr. Nordan তাঁহার অভিনব গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"The emotion from which the divining work of art springs is the birth throe of the quick and vigorous organism pregnant with the future."

কলা বর্ত্তমানের আত্মতৃপ্তি নহে, কলা ভবিষ্য-প্রসূতি! কলা সৃষ্টির সম্ভোগ নহে, সৃষ্টির যন্ত্রণা! কলা কবির ধর্ম্মপত্নী সহধর্ম্মিণী, কলা কবির উপভোগ্যা বারাঙ্গনা নহে। রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনী, কমলা অথবা বিমলা কোনটাই কলা নহে, কলার ছলা মাত্র—পরকীয়া প্রীতির জঘন্য রুচি মাত্র! ইহাতে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন বাবুদের কামানল তৃপ্ত হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সাহিত্যিকের ইহা ধিক্কার-জনক। রবীন্দ্রনাথ অনুকরণ-তুষ্ট ঘরে-বাহিরে লিখিয়া সৃষ্টির আনন্দে বিভোর হইতে পারেন, কিন্তু সৃষ্টি-কুশলী টলষ্টয় Anna Karennina লিখিয়া শেষ বয়সে আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। (তাঁহার পুত্র-লিখিত জীবনী দ্রষ্টব্য।) যে রবীন্দ্রনাথ টলষ্টয়ের অনুকরণ করিয়া নাম কিনিতেছেন, সেই মহানুভব টলষ্টয় প্রকৃত আর্ট সম্বন্ধে কি কি বলিয়া গিয়াছেন, দেখুন,—"A real work of art can only arise in the soul of an artist occasionally, as the fruit of the life he has lived, just as child is conceived by its mother. But counterfiet art is produced by artisans and handicraftsmen continually, if only consumers can be found."

প্রকৃত কলাবিদ্ দৈবাৎ, অনেক সাধনা ও তপস্যার পর সৃষ্টি করেন, কিন্তু ক্ষুদ্র মক্ষিকাগণ অক্লান্ত ডিম পাড়িয়া থাকে। সাহিত্য-জগতেও এইরূপ নগণ্য মক্ষিকার অগণ্য ডিম্বের অভাব নাই। কার্লাইল সাক্ষ্য দিতেছেন—"Dante sees himself "growing lean" over his Divine comedy." অর্থাৎ ডিভাইন কমেডি রচনাকালে দান্তে শীর্ণকায় হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু আমাদিগের রবীন্দ্রনাথের সবুজপত্র "ঘরে-বাহিরে" দিয়া ভরাট করিতে দশমাস দশদিনও সবুর সহে নাই। সাহিত্য-গুদামের মাল নহে যে যখন ইচ্ছা তখন বাহির করিয়া দিবে, কিম্বা ডিম্বও নহে যাহা পাড়িবে, তাহার দিকে আর তাকাইবে না। তাই একজন এযুগের প্রকৃত কবির মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে—"It must be carefully remembered that first-class literature does not shine by any luminosity of its own; nor do its poems. They grow of circumstances and are evolutionary." Walt Whitman.

আর বাঙ্গাকল্পতরু রবীন্দ্রনাথ সর্ব্ব সময়েই সফল হইয়া বসিয়াছেন। Genius বটে! অন্ধ বাউল 'রবীন্দ্রনাথ' একটা নূতন কিছু করো'র মোহে পড়িয়া কেবল একটা সাময়িক হুজুগ তুলিয়াছেন, তাহাতে উদ্‌ভ্রান্ত বাবুদের পেট ভরিতে পারে বটে, কিন্তু অন্নক্লিষ্ট বাঙ্গালীর ক্ষুধা মিটিবে না। ঘরে-বাহিরে পড়িয়া অনুকরণপ্রিয় বাবুরা sex-questionএর দোহাই দিয়া রবীন্দ্রনাথকে বাহবা দিবে, কিন্তু প্রকৃত বাঙ্গালী এইরূপ কলাকে কলঙ্কই জ্ঞান করিবে।

জাতীয়তা এবং স্বদেশীয়তার ক্ষেত্র হইতে পলাতক পৃষ্ঠপ্রদর্শক রবীন্দ্রনাথ ঘরে-বাহিরে উপন্যাসে বঙ্কিমের বন্দেমাতরম্ political goddess দুর্গা প্রতিমার খুঁত ধরিয়া নিজের মতবাদকে নিখুঁত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, রবীন্দ্র-

নাথের মত যশের কাঙ্গালীর মুখে বিশ্ব-শক্তি অথবা বিশ্বমানবতা কথাটী কি শোভা পায়? তিনি কবি-সম্রাট্ হইলেও নিরন্ন, পরাধীন, পরমুখাপেক্ষী দেশের মানুষ, তাঁহার বিশ্বমানবতার ফাঁকা মৌখিকতা শুনিবে কে? অত বড় ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান, যাঁহার Leaves of grassএর পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে বিশ্বমানবতা অনুস্যুত, যাঁহাকে আমরা সাম্যের অবতার বলিলেও বলিতে পারি, তিনিও Nationalityকে বিসর্জ্জন দিতে পারেন নাই, তাঁহার মুখ হইতেও বাহির হইয়াছে—"Really great poetry is always the result of a national spirit and not the privilege of a polished and select few."

হুইট্‌ম্যান একজন প্রকৃত কবি ছিলেন, ভবিষ্যতের আমেরিকা তাঁহারি নমুনায় গঠিত হইবে। তাঁহার Leaves of grass অল্প আয়াসের ফল নহে। ওই অল্পকায় গ্রন্থখানি রচনা করিতে তাঁহার সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর লাগিয়াছিল, তবে তিনি আমেরিকার অন্তরাত্মাকে ধরিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হুইটম্যান বলিয়াছেন—"My book and I—what a period we have presumed to span! those thirty years—and America in them!" হুইট্‌ম্যান বাস্তবিকই আপনাকে স্বদেশ এবং স্বগ্রন্থের সহিত গ্রথিত করিয়া ফেলিয়াছেন। এমন অনুপ্রাণতা জগতের কবিগণের ইতিহাসে বড়ই বিরল। বর্ত্তমান যুগে ভগবানের বিশ্বরূপ যদি কেহ দেখিয়া থাকেন, তবে বলিব, ওয়াল্ট হুইটম্যান আর যশের কাঙ্গালী হইয়া রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-কবি হইতে চাহেন। অনুকরণ বহুল ঘরে-বাহিরে উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ইব্‌সেনের ন্যায় নেতা-বিদ্বেষ প্রকটিত করিয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কি একজন নেতা নহেন? নেতৃত্বের পথ, দল গঠিবার পথ তিনিইত দেখাইতেছেন। গড্ডালিকা প্রবাহের সৃষ্টি, flesh fliesএর সৃষ্টি তিনি যত করিয়াছেন, এমন আর কে? অন্ধ-ভক্তির প্রচার তাঁহার দ্বারা যতটা হইয়াছে, এমন বোধ হয় Sir Walter Scottও করিতে পারেন নাই। তাঁহার ভক্তবৃন্দের কাঁশির আওয়াজে তাঁহার আসল কাঁশি অনেক কাল চাপা পড়িয়াছে এবং তাঁহার নকল দিকটাই বাহির হইয়া পড়িতেছে। আমরা স্যর রবীন্দ্রনাথকে নেতা-বিদ্বেষ বন্ধ রাখিয়া মৌনব্রত হইতে অনুরোধ করি, কারণ বোবার শত্রু নাই। তিনি অসাড় ভাব ধারণ করিলে তাঁহার অধীন flesh fliesগুলা তাঁহার আব-হাওয়া দূষিত করিবে না এবং আমরাও তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিব। কার্লাইল এই চামুণ্ডাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—"A fatal species! These are what Schiller calls "the flesh-flies;" buzzing swarms of blue-bottles, who never fail where any taint of human glory or other corruptibility is in the wind."

আমরা যশোলিপ্সু কবি-সম্রাটকে সাবধান করিতে ও তাঁহার ব্রণ-মগ্ন মক্ষিকাকুলকে কিঞ্চিৎ সায়েস্তা করিতে স্কটের সহিত তাঁহার তুলনায় সমালোচনা করিলাম, কিন্তু এই হুজুগের যুগে তাঁহার গড্ডালিকা-প্রবাহের গতিরোধ সহজে হইবে কি? ভাড়াটিয়া ভালবাস, ভাড়াটিয়া আর্ট হইতেছে এখনকার রীতি, কি সাহিত্যে কি সমাজে, ব্যভিচার এবং যথেচ্ছাচারই এখন প্রবল। এই বিপ্লবের সময়ে সুনীতি যে ধ্রুবকে লইয়া অরণ্যে রোদন করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? সে যাহাই হউক, সাহিত্যে আমাদিগকে শত্রুতা-বৃদ্ধি করিতে হয়, তাহাও স্বীকার; তথাপিও তোষামোদ বৃদ্ধি করিব না। "সত্য বলিলে বন্ধু বিগ্‌ড়ে!" কিন্তু উপায় কি? ভাবের ঘরে চুরি করিতে কেবল পরমহংসদেব নিষেধ করেন নাই, জগতের মহৎব্যক্তি মাত্রেই ভাবের ঘরে চুরিকে বিশেষ দোষাবহ বলিয়া মনে করেন। যে মহাত্মার গ্রন্থ সাহায্যে এই প্রবন্ধ লিখিতে সাহসী হইয়াছি, সেই টুফেলড্রুকরূপী কার্লাইলই সাবধান করিয়া দিতেছেন—"Teufelsdrockh accepts Authorship as his divine calling. The scope of the command Thou shalt not steal." এই আদেশ যাহারা রক্ষা করিতে পারে না, সাহিত্যিকের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে যাওয়া তাঁহাদিগের জীবনে বিড়ম্বনা। যাঁহারা জীবনে কখনও স্বর্গীয় আদেশ পায় নাই, তাঁহাদের উপদেশে বিশ্বের কল্যাণ সুদূর-পরাহত।

শ্রীঅকিঞ্চন দাস।

পত্রাবলী।

পত্র নং ১৬, 41, Champatola 1st Lane.
Bangabasi office. Calcutta.

"ক্ষীরোদবাবু,

পত্র অনেক দিন পাইয়াছি, উত্তর দিতে দেরী হইল। জ্ঞানেন্দ্রবাবুর ভগ্নী এ পর্য্যন্ত ভাল হয় নাই। তিনি আসেন নাই, পীড়া খুব হইয়াছে, উপস্থিত যে পত্র পাইয়াছি, তাহাতে বাঁচিবার আশা হইয়াছে মাত্র।

আমরাও ৩১শে আশ্বিন নাগাইদ সব বাটী যাইতেছি। ১১।১২ কার্ত্তিক আসিব; আপনার সঙ্গে দেখা হইবে কি না? কোন সময় হওয়া সম্ভব? সবকথা সাক্ষাতে হওয়া উচিত। Herbert Lectures কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না। বৈঠকখানা, চৌধুরী মহাশয়দের বাড়ীতেও নাই। জ্ঞানেন্দ্রবাবুর নিকট থাকা সম্ভব, তাঁহাকে লিখিলাম। কি লিখেন, জানাইব। তাঁহার ঘরে কিন্তু নাই। অত্যন্ত মাথা ধরিয়াছে, আর কিছু লিখিতে পারিলাম না। আছেন কেমন? ছেলে ও আর সকলে কেমন আছেন?' আপনার উপেন্দ্র।

পত্র নং ১৭, বঙ্গবাসী-কার্য্যালয়—বুধবার।

"ক্ষীরোদবাবু,

জ্ঞানেন্দ্রবাবুর প্রমুখাৎ শুনিলাম, আপনি একরকম হিসাব করিয়াছেন, তাহাতে বৎসরে দুই হাজার টাকা লাভ থাকে। লাভ যে থাকে, তা আমি জানি, কিন্তু খরচপত্র এখন যেমন হইতেছে, বৎসরে দুই হাজারের উপর দেনা থাকে। মাসে দুগ্ধই ১২।১৩ টাকার লাগে। ব্যয় সংক্ষেপ একটু কঠোরভাবে করিতেই হইবে। দ্বারিকবাবু হইতে আমরা অনেক উপকার পাইতেছি। যত Political article, সবই তাঁর। কেবল......(অত্যন্ত অস্পষ্ট) আমি লিখিয়াছিলাম। দ্বারিকবাবু বেশ লেখক। তাঁকে টাকা দেওয়া সার্থক। Para and news ভাল হইতেছেনা—দোষ অবশ্য আমারই। কিন্তু আফিসের কার্য্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত দেখা এবং প্রতি সপ্তাহের প্রায় ২টী করিয়া লেখা, তারপর news and para সব লেখা আমার পক্ষে কিছু কষ্টকর নয় কি?

আপনার এখানে আসার সম্বন্ধে কিছুই স্থির খবর পাইলাম না। কবে আসিবেন? ছুটি কবে? কথা হইতেছে, আমাকে এবার বাটী যাইতে হইবে। আমি বিজয়াদশমীর পরদিন বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছি, আজ পর্য্যন্ত বাটী যাই নাই। মা ভাবি জেদ করিয়া বাটী যাইতে পত্র লিখিতেছেন। একবার বাটী না গেলে কোন মতেই স্থির হইতে পারিতেছেন না। আপনার যদি মে মাসের ১৫।১৬ তারিখে এখানে আসা হয়, তবে আগামী শুক্রবারে বা শনিবারে আমি বাটী রওনা হইব। সেখানে অন্ততঃ ৫।৬ দিন দেরী হইবে; আর আসিতে ২।১ দিন দেরী হইবে। হুগলীতে ২৫০ গ্রাহক হইয়াছে। আমি দু'দিন হুগলীতে থাকিলে আরও ৫০ জন গ্রাহক হইতে পারে। শনিবার রওনা হইলে আমি ঐ দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারিব। সেই সময় বোধ হয় আপনিও কলিকাতা পৌঁছিতে পারেন। কিন্তু আপনার কলিকাতায় আসার পর আমার বাটী যাইবার ইচ্ছা হইবে না। কারণ অনেক পরামর্শ আছে—কি করিয়া বাড়ী যাইব?

সুতরাং আপনার নিশ্চয় কবে আসা হইবে, জানিলে আমি রওনা হইতে পারি। এই পত্রের উত্তর শনিবার প্রাতে যেন পাই— শুক্রবার পাইলে ভালই হয়।

Nature আপনার নিকট আসিতেছে কি না, জানিতে পারিতেছিনা। এবার Frontier Policy and Burma সম্বন্ধে আমি দুটী প্রবন্ধ লিখিয়াছি। কেমন হইয়াছে, জানাইবেন। Deputy সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছি, কিন্তু ভাল হয় নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস। শ্রীযুক্ত অলকা সপুত্রা এখানে আসিবেন ত, না আপনি একা আসিবেন? অলকাকে আমার সম্মান-সম্ভাষণ দিবেন। আর লিখিবার সময় নাই

আপনার—শ্রীযোগেন্দ্র।"

পত্র নং ১৮, কলিকাতা বঙ্গবাসী কার্য্যালয়।

"ক্ষীরোদবাবু!

আপনার পত্র পাইলাম, ত্রিশ টাকা পাইয়াছি। জ্ঞানেন্দ্রবাবুকে বঙ্গবাসী ও ছাপাখানার অংশীদার করিয়া লইতে লিখিয়াছেন। বঙ্গবাসীর উন্নতির জন্য আমি কোন কার্য্য করিতে অসম্মত নহি। বঙ্গবাসীর কার্য্যে যখন প্রথম ব্রতী হই, তখন মাতৃপিতৃ বাক্য লঙ্ঘন করি। স্ত্রীর নিকট হইতে (বলপূর্ব্বক বলিলে অত্যুক্তি হয় না) গহনা গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হই নাই। আমার মত পাপী আছে? বঙ্গবাসীর জন্য সব করিয়াছি। উপেনবাবুর হাত ধরিয়া, উপেনবাবুর ভ্রাতার হাত ধরিয়া, খোসামদ করিয়া, কত রঙ্গ করিয়া (ভাবিলে হাসি পায়) উপেনবাবুকে বঙ্গবাসীর কার্য্যে লওয়াইয়াছিলাম, উপেন ভয় খাইত, আমি সাহস দিতাম। যখন আমার সাহসের কথায় উপহাস করিত, তখন আমি উপেনের হাত ধরিয়া বলিতাম, "ভাই! যাহাই বল, যদি কখন আমায় ভালবাসিয়া থাক, তবে আমার এই কথাটী শুনিতেই হইবে।" উপেন রিক্তহস্তে আমার সহিত যোগ দেন। Prospectus প্রকাশ হইবার পর যখন রোজ রোজ পঙ্গপালের মত গ্রাহকের নাম আসিতে লাগিল, তখন জ্ঞানেন্দ্রবাবু একটু সাহস পাইয়া কিছু টাকা বাড়ী থেকে আনাইলেন। তথাচ আমি যাহা টাকা দিয়াছি, উপেনবাবু তাহার অর্দ্ধেক বৈ দিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন আমি নিঃসহায়, সেই বিপদের সময় উপেনবাবু রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে অর্দ্ধেক অংশ দিতে অসম্মত হই নাই। সুতরাং যদি আমি জানি, জ্ঞানেন্দ্রবাবু সম্পাদক হইলে, জ্ঞানেন্দ্রবাবু অংশীদার থাকিলে বঙ্গবাসীর উন্নতি হয়, তবে তাঁহাকে কেন না লইব?

আপনি বোধ হয় জানেন, আমার সম্পাদক হইবার অভিলাষ নাই, বঙ্গবাসীর সম্পাদক পদ পাইয়া অহঙ্কারে হইবার আমার চেষ্টা নাই। যখন ২৪নং পটলডাঙ্গায় থাকি, তখন বাসার সকলকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম, যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে "আমি কে?— বলিও "ইনি Asst. Manager." আপনি —নীর নিকট আমাকে বঙ্গবাসীর সম্পাদক বলিয়া পরিচয় দেন, আপনার স্মরণ হইতে পারে, আপনাকে রাস্তায় বলি, আমার সম্পাদকের পরিচয় কাহারও নিকট দিবেন না। সুতরাং বঙ্গবাসীর সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রবাবু হইলে আমার অসন্তুষ্ট হইবার কোন কারণ নাই। আমি চাই, কেবল বঙ্গবাসীর উন্নতি।

দ্বিতীয় কথা, জ্ঞানেন্দ্রবাবুকে অংশীদার লওয়া। আপনি জানেন, প্রথম হইতে আমার ইচ্ছা ছিল যে, বঙ্গবাসীর অন্ততঃ দশজন অংশীদার হইলে ভাল হয়। তখন নানা লোককে নানারূপ খোসামোদ করিয়াছিলাম, কিন্তু

কেহই তখন হইতে চান নাই। অনেক অংশীদার হইলে যে বঙ্গবাসী আরও ভাল রকম চলিবে, এ বিশ্বাস আমার বঙ্গবাসী প্রকাশের পর ৫।৬ মাস পর্য্যন্ত ছিল,—কিন্তু এক্ষণে যত দেখিতেছি, জানিতেছি, দেশের লোকের বিষয় বুঝিতেছি, সে বিশ্বাস ততই কমিতেছে। এখন স্থির বুঝিয়াছি,বঙ্গবাসীর অনেক অংশীদার থাকিলে ক্রমে বঙ্গবাসী চলা দায় হইত, এমন কি লোপ পাইবার সম্ভাবনা ছিল। ইংরাজী হিসাবে Joint stock companyতে কাজ বাঙ্গালায় এখন চলে না।

জ্ঞানেন্দ্রবাবুকে আজ চারমাস দেখিতেছি। কে কেমন মানুষ, ক্রমে বুঝা যায়। জ্ঞানেন্দ্রবাবুর প্রকৃতি আমাদের প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বলা বাহুল্য, জ্ঞানেন্দ্রবাবু যে মন্দ প্রকৃতির লোক, তাহা নহে, কেবল পরস্পরের প্রকৃতির মিল নাই বলিতেছি। আমরা গরীব, পরিশ্রমী, কষ্টসহ দুঃখী চাই। বাসায় কাহারও ব্যারাম হইলে বঙ্গবাসী লইয়া পলাই না। প্রাণের ভয় নাই, এমন নহে, তবে বঙ্গবাসী রক্ষা করা প্রাণ রক্ষা করা অপেক্ষা অধিক কর্ত্তব্য মনে করি। বঙ্গবাসীর জন্য উপবাস করিয়া থাকিতে পারি।

এই প্রকৃতিগত বিভিন্নতা হেতু জ্ঞানেন্দ্রবাবুর সহিত মতের অমিল অবশ্যই আছে। জ্ঞানেন্দ্রবাবু খুব বুদ্ধিমান লোক, উভয়ের মতের অমিল দেখিলে তখন চাপিয়া যান। যখন আমার মতের অমিলেও কার্য্য হইয়া থাকে, তখন চাপিয়া যাই—জানি, জ্ঞানেন্দ্রবাবু আমাদিগকে ত্যাগ করিলে বঙ্গবাসীর ক্ষতি। আমি বঙ্গবাসীর জন্য কেবল মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতেছি। আমি অতি সাবধানী, তাই বাহ্যতঃ লোকে বুঝিয়া থাকে যেন অতি সমভাবে সুচারুমতে কার্য্য চলিতেছে।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু এখন সম্পাদক পদে ব্রতী থাকিলেও কার্য্যত আমি সম্পাদক, জ্ঞানেন্দ্রবাবু Contributor মাত্র। রহস্য বুঝেন কি? জ্ঞানেন্দ্রবাবু সপ্তাহে একটী article দিবেন। আমি সেই article ও অপরের articles লইয়া গুছাইয়া কাগজ বাহির করিব। একথা পূর্ব্বেই আপনাকে লিখিয়াছিলাম।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু অংশীদার হইলে এখানে তিনি অবশ্যই অপর কার্য্য করিবেন। ওকালতীই করুন বা বিদ্যাসাগরের কলেজে বা গবর্ণমেণ্ট কলেজে মাষ্টারী করুন—নিশ্চয় বোধ হয়,আর একটী কার্য্যও করিবেন। আমি দেখিয়াছি, যখন এখানে থাকিয়া অপর কোন কাজই না করিয়া তিনি শুধু বঙ্গবাসীর কার্য্যেই পরিশ্রান্ত বোধ করেন, তখন অপর কার্য্যও করিলে বঙ্গবাসী কিরূপে চালাইবেন? আর এক কথা, জ্ঞানেন্দ্রবাবু অংশীদার হইয়া যখন অর্থোপার্জ্জনের জন্য অপর রকম চাকুরী করিতে পারিবেন, তখন সেই হিসাবে আমরাও অর্থোপার্জ্জনের অপর একটী (কেরাণীগিরি প্রভৃতি) দেখিতে পারি। যদি আমরা তিন জন চাকুরীতে প্রবৃত্ত হই; তবে বঙ্গবাসী কিরূপে চলিবে?

সে যাহা হউক, আমার মিলিয়া মিশিয়া চলিবার অতিশয় ইচ্ছা আছে সত্য, এবং যাহাতে পরস্পরের সহিত সৌহৃদ্য থাকে,—মিছা কারণে কাহারও সহিত গোলযোগ না ঘটে, আমি বিবিধ প্রকারে এরূপ চেষ্টা করিয়া থাকি। আমি সামান্য কারণে কাহারও উপর চটি না। কিন্তু দোষ এই;—একবার কোন রকমে চটিলে আর মিল হওয়া দুষ্কর। 'সাধারণী' ছাড়ি—এক কথায়, এক মুহূর্ত্তও সময় লাগে নাই। অক্ষয়বাবু আমার কাছে লোক পাঠান, অবশেষে স্বয়ং আইসেন, তথাচ আর সাধারণীতে যোগ দিই নাই। সেইজন্য চারিদিকে দেখিয়া শুনিয়া ভাবিতেছি, জ্ঞানেন্দ্রবাবুর অংশীদার হওয়ার পর যদি কোনরূপে তাঁহার সহিত মনের গরমিল হয়, তখন উপায় কি? তখন যদি আমি বঙ্গবাসী ছাড়িয়া দি, অবশ্য তখন বঙ্গবাসীর কোন ক্ষতি হইবে না,—যা ক্ষতি তাহা আমারই হইবে। যখন দেখিতেছি, জ্ঞানেন্দ্রবাবু অংশীদার হইলে আমার ভবিষ্যৎ অমঙ্গলই আছে, তখন জ্ঞানেন্দ্রবাবুকে অংশীদার করা উচিত কি না, আপনি বেশ বুঝিয়া উপদেশ দিবেন।

ইতিপূর্ব্বে আমি জ্ঞানেন্দ্রবাবুকে বলিয়াছিলাম, আপনি ওকালতী করিবেন না দেখিতেছি। বিদ্যাসাগরের স্কুলে মাষ্টারী করুন; তাহা হইলে আপনার এখানে থাকা হইতে পারে। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, তিনি বঙ্গবাসীর সম্পাদক থাকেন। আমরা তাঁহাকে ৩০ টাকা করিয়া দিতে খুব চেষ্টিত থাকিব। জ্ঞানেন্দ্রবাবুর মাহিনা বাকী পড়িয়াছে, ভাল অবস্থা হইলেই তাহা শোধ করিয়া দিব।

ক্ষীরোদবাবু, আমি মনের কথা লিখিলাম। যাহা ভবিষ্যতে ঘটিবে দেখিতে পাইতেছি, তাহাই জানাইলাম।

এক্ষণে আমার যে কিরূপ বিশ্বাস, তাহা আপনি জানিতেন না বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রবাবুকে বোধ হয় অংশীদার হইতে লেখেন। জ্ঞানেন্দ্রবাবু অংশীদার হইলে পাছে গোলযোগ ঘটে, বঙ্গবাসীর কোন ক্ষতি হয়, ইহাই আমার ভয়। যাহাহউক, আপনার আমি অবাধ্য নহি। এই সকল বিষয় বুঝিয়া যাহা ভাল বিবেচনা করিবেন, তাহা আমাকে উপদেশ দিবেন। ইতি শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র।

(৬১৬ পৃষ্ঠার পর)

অবতাররূপে প্রচার করিলেন। পক্ষান্তরে, আলেকজান্দ্রিয়ার নবপ্লেটোনিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আমোনিয়াস স্যাকাস (Ammonius Saccas), প্রাকৃতিক গাম্ভীর্য্য বিষয়ক পুস্তক-প্রণেতা লঙ্গিনাস (Longinus), অ্যামোনিয়াসের শিষ্য ঈরেনিয়াস (Erennius) এবং সর্ব্বোপরি লাইকোপোলিস্-বাসী প্লোটিনাস (Plotinus of Lycopolis), প্রতিভার অবতার এই সুপ্রসিদ্ধ এথেনীয় পণ্ডিতের গভীর ভাবসমুদ্রে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন এবং তদীয় ধারণাসমূহ প্রকাশের পক্ষে ভাষার যে কিছু অসম্পূর্ণতা ছিল, তাহা দূর করিয়া দেন। গত দশ শতাব্দী যাবত গ্রীক পণ্ডিত-সমাজে যে ভাবের বন্যা ছুটিয়াছিল, নব্য আদর্শবাদে এবং প্লোটিনাসের দর্শনে সেই ভাবের পূর্ণাভিব্যক্তি হয়, এবং তাহার ফল স্বরূপ মানবাত্মা, জগৎ এবং জগদীশ্বর সম্বন্ধে যথাযথ ধারণায় উপনীত হওয়ার নিমিত্ত লোকের মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে।

নব্য আদর্শবাদ (Neo Plationism)।

প্লোটিনাস (Plotinus)।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে,প্লোটিনাস আলেকজান্দ্রিয়া-বাসী অ্যামোনিয়াস স্যাকাসের শিষ্য। মিশরের অন্তর্গত লাইকোপোলিস নগর ইঁহার বাসস্থান ছিল। প্লোটিনাস আনুমানিক ২৪৪খ্রীঃ অব্দে রোমনগরে গমন করতঃ, তথায় পঁচিশ বৎসর যাবত দর্শন শিক্ষা দেন। রোমনগরে তিনি যে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে বহু দেশের বহু লোক শিক্ষা লাভ করিত। চিকিৎসক, বক্তা, কবি এবং সিনেটর প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, এমন কি, সম্রাট গ্যালিনাস (Gallienus) এবং সম্রাজ্ঞী সালোনিনা (Salonina) পর্য্যন্ত উক্ত বিদ্যামন্দিরে উপনীত হইতেন। প্রাচীন দর্শন, প্রাচীন বিজ্ঞান এবং প্রাচীন সাহিত্যের তখনও যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, প্লোটিনাসের বিদ্যামন্দির তাহার কেন্দ্রস্বরূপ হয়। গ্রীক দর্শন সম্বন্ধে অসংখ্য টীকা রচিত হইয়াছিল। এই সময়ে খ্রীষ্টান সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত পুষ্টিলাভ করে। যিশু ও তাঁহার শিষ্যবর্গ যেমন খ্রীষ্টানদিগের নিকট উপাসিত হইতেন, দার্শনিকগণও সাধারণের নিকট তদ্রূপ পূজা পাইতে লাগিলেন। প্লোটিনাস পঞ্চাশ বৎসর বয়সে গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করিয়া ২৭০ খ্রীঃ অব্দে, অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, সর্ব্বশুদ্ধ চুয়ান্ন খানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল পুস্তক তদীয় শিষ্য পরফিরী (Porphyry) কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

প্লোটিনাসের মতে নিখিল বিশ্বসংসার এক অনন্ত মহাসত্তার প্লাবন-ধারা (a diffusion of divine life) এবং ঈশ্বরে পুনর্মিলনই (reabsorption in God) উহার চরম উদ্দেশ্য। প্লাবনের তিনটী পর্য্যায় নিরূপিত হইয়াছে, যথা (১) শক্তিমত্তা (spirituality) (২) সজীবতা (animality) এবং (৩) শারীরত্ব (corporeality)। পুনর্মিলনও যথাক্রমে (১) বিষয়জ্ঞান (sensible perception) (২) বিচারবুদ্ধি (reasoning) এবং তত্ত্বদর্শিতা (mystical intuition), এই তিন পর্য্যায়ে বিভক্ত। প্রথমে প্লোটিনাসের মূল বক্তব্য স্থির করিয়া, তৎপরে ক্রমোচ্চ সৃষ্টিপ্রণালীর বহির্ম্মুখীন ও অন্তর্মুখীন তিনটী স্তরের বিষয়ও আলোচনা করিতে হইবে।

ঈশ্বর,—বস্তুমাত্রই জড় ও রূপের সমাবেশ। ঈশ্বর (এক বা ঐক্য) এবং জড় নিখিল

সৃষ্টির মূলকারণ,—ঠিক যেন বিশ্বের দুইটী প্রান্ত বা শেষ সীমা। উভয়ের পার্থক্য এই যে, ঈশ্বর বস্তুমাত্রেরই উৎপাদক এবং জড় বস্তুমাত্রেরই উপাদান। ঈশ্বর স্বয়ং শক্তি বলিয়া কর্ত্তা,—এবং জড় শক্তিসম্পন্ন বলিয়া কর্ম্ম স্থানীয়। জড় নিত্যপরিবর্ত্তনশীল, দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তরে পরিণত হইতেছে; এজন্য মূলশক্তি হইতে উহা দৃশ্যতঃ বিভিন্ন। জড় যদিও ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা মূর্ত্তি গ্রহণে সমর্থ, অর্থাৎ মূর্ত্তিগ্রহণই জড়ের স্বভাব, তথাপি প্লোটিনাসের মতে জড় এবং শক্তির মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য নাই। বস্তু বিশেষের বিশ্লেষণ করিতে করিতে চরমসীমায় উপনীত হইলে, তখন আর উভয়ের কোন বিরোধ বা বৈপরীত্য ভাব দেখা যায় না; দেখা যায় যে, তপায় এক ভিন্ন দুই বলিয়া কিছুই নাই; সেই একই শক্তি বা ঈশ্বর।

ঈশ্বর বলিতে যে ঐক্য বা একের জ্ঞান জন্মে, সেই ঐক্য বা এক সংখ্যাবাচক নহে, তদ্দ্বারা সংখ্যা প্রকাশ পায় না। সংখ্যাবাচক এক হইতে দ্বৈতজ্ঞানের উদয় হয়, অর্থাৎ এই এক হইতে 'দুই' 'তিন' ইত্যাদি বহুত্বের ধারণা আসিয়া পড়ে। যে ঐক্য হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবধারিত হয়, তাহা সংখ্যা-মালার আদিসংখ্যা একের ন্যায় বিভাগশীল নহে, তাহার পরিমাণ সংখ্যায় প্রকাশ পায় না। সৃষ্টিমাত্রই অর্থাৎ অনন্ত বলিতে যাহা বুঝায়, এই একের দ্বারাও তাহাই প্রতিপন্ন হয়, এই এক আর অনন্তে ভেদ নাই; অনন্ত বিশ্বসংসার এই] একেরই নামান্তর এবং উহার বাহিরে জগতে আর কিছুরই অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। উহা মানবধারণার অতীত, সর্ব্ব রহস্যের শেষ রহস্য। এই এক যাবতীয় বস্তুর উৎপাদক, কাহারও উৎপাদ্য নয়, স্বয়ং সুন্দর না হইয়াও সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যের মূল, স্বয়ং মূর্ত্ত না হইয়াও মূর্ত্তিমাত্রেরই অব-লম্বন, স্বয়ং পুরুষ না হইয়াও বুদ্ধি বিবেকের উৎস; এমন কি, এই এক স্বয়ং বস্তু নহে, অথচ বস্তুমাত্রেরই চরম সীমা বা শেষ পরিণতি এবং নিয়মশৃঙ্খলা। এই একই বিশুদ্ধ চৈতন্য, যাহা হইতে জীবমাত্রেরই উৎপত্তি,—বিশুদ্ধ জ্ঞানালোক, যে আলোকের সাহায্যে আমরা দর্শনশক্তি লাভ করিয়াছি এবং যেজন্য বস্তু সমূহকে তাহারই সহিত অভিন্ন মনে করিতে পারি। (ক্রমশঃ)

শ্রীদিগ্বিজয় রায়চৌধুরী।

৺ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী। (২)

জন্মভূমির সুসন্তান, বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, শিক্ষা-বিভাগের অত্যুজ্জ্বল রত্ন ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় গত ১৬ই আষাঢ় কটকে দেহরক্ষা করিয়াছেন। অবসর-প্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারী হইয়াও তিনি এক দিনের তরেও সত্যের পথ হইতে, ন্যায়ের পথ হইতে, কাহারও বিরাগভাজন হইবার ভয়ে বিচলিত হ'ন নাই।

তাঁহার সহিত বহুদিনের পরিচয় আমার ছিল না, কিন্তু তাঁহাকে যতটুকু দেখিয়াছিলাম, তাহাতে এই বলিতে পারি যে, বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াও এমন মানুষ দুই একটীর অধিক দেখি নাই। আমি তাঁহার মৃত্যুর অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম তাঁহার সহিত পরিচিত হই। অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া চা খাইয়া ষ্টার-অফ-উৎকলের কার্য্য

—দৈনন্দিন লিখিবার কার্য্য আরম্ভ করিতেন। অনেক সময়ই বাসাস্থ লোকজনের ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য অযথা চীৎকার না করিয়া, তিনি নিজে চায়ের জল বসাইয়া দিতেন। বাড়ীতে দাসদাসী, ছাপাখানার লোকের অপ্রতুল ছিল না, কিন্তু তাঁহার হৃদয় এতদূর স্নেহপ্রবণ ছিল যে, হউক না স্ত্রী হউক না কেন পুত্র, হউক না কেন পাচক, হউক না ভৃত্য, কাহাকেও অযথা ক্লেশ দিতে ভালবাসিতেন না। যখন ভোরে তাঁহার কটকের বাসায় যাইতাম, যাইবামাত্র ছেলেদের চা আনিবার জন্য বলিতেন। আমি বলিতাম "আপনার চা কই?" তিনি হাসিয়া বলিতেন "সকলে যখন বিছানায়, তখন আমার চা খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে।" ইদানীং বাঙ্গালা বড় লিখিতেন না। বোধ হয়, "মৃণ্ময়ী" সম্পাদনের পর হইতেই বাঙ্গালা লেখা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি ষ্টারের (Star of Utkal) জন্য ইংরাজী লিখিয়া, বাঙ্গালা লেখা তদূরে থাকুক, সংসারের কাজ কর্ম্ম দেখিবারও অবসর অতি অল্পই পাইতেন। প্রথমে Star যখন সাপ্তাহিক ছিল, তখনকার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু পরে যখন Star সপ্তাহে তিনবার করিয়া বাহির হইতে লাগিল, তখন হইতে তাঁহার আদৌ অবসর ছিল না। একেলা লোক—লেখা, কাপি সংশোধন করা, সবই তাঁহাকে করিতে হইত। অনেক সময় আমাদিগকে সাহায্য করিতে বলিতেন এবং আমরাও অতীব আনন্দ সহকারে যথাসাধ্য সাহায্য করিতাম। উড়িষ্যার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। এবং সেই মন্ত্র-সাধনের উপায়—Star of Utkal. তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—Starকে দৈনিক পত্রে পরিণত করা। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ সে উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে নাই। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবার পূর্ব্বেই Star Press, জামীন না দেওয়ায়, উঠিয়া যায় এবং সেই সঙ্গে Star চিরকালের তরে ডুবিয়া গেল। তাঁহার গৃহে যেন নিত্য দরবার হইত—উড়িষ্যার করদমিত্র মহারাজা, রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্র মসীজীবী কেরাণী পর্য্যন্ত, যত উৎপীড়িত নিগৃহীত, সকলেই সমবেত হইতেন। অনেকেই স্বার্থসিদ্ধির জন্য যাইতেন এবং স্বার্থসিদ্ধি হইবামাত্র, উল্টা ঘাটে, মাঠে তাঁহারই নিন্দা করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার গৃহের দরবার দেখিয়া স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল ও স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষের গৃহের কথা স্বতঃই স্মরণ-পথে উদিত হয়। যে লোক আজ বিপদাপন্ন হইয়া, রাজপুরুষের বিরাগভাজন হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছে, সেই লোকই বিপদমুক্ত হইয়া তাঁহার নিন্দায় গগন বিদীর্ণ করিয়াছে, এ দৃশ্য তাঁহার বন্ধুবান্ধব বহুবার দেখিয়াছেন। তিনি সব বুঝিতেন, মাঝে মাঝে কেহ সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে, কেবল হাসিতেন। তাঁহার ইংরাজী রচনা অতি উচ্চশ্রেণীর ছিল। স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ ঘোষের ন্যায় ইংরাজী লিখিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল, এ কথা বলিলে, অত্যুক্তি হইবে না। শ্লেষে (Satire) তিনি দ্বিতীয় শিশিরকুমার ছিলেন। রাজপুরুষেরা যে তাঁহার মতের সমাদর করিতেন, এবং কোন কোন সময় Star of Utkalএর মতানুযায়ী কার্য্য করিতেন, ইহা অতীব সত্য কথা। কটকের মহিলা-কলেজ ইহার প্রমাণ। বিহার ও উড়িষ্যার বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা Sir Edward Gait এক সময়ে ষ্টারের গ্রাহক ছিলেন।

কিসে উড়িষ্যার উন্নতি হইবে, তিনি

সদাসর্ব্বদা সেই চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া, গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া, সংবাদপত্র প্রচার করিয়া—তিনি সাধনার পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু দেশের এমন দুর্ভাগ্য যে, যে প্রদেশের জন্য তিনি প্রাণপাত করিলেন, সে দেশে তাঁহার স্মরণার্থ, তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার্থ কোনই উদ্‌যোগ, আয়োজন হইল না! হইবার কথাও নয়, কারণ সে প্রদেশে এখন চতুর্দ্দিকে বাঙ্গালী-বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত। তদপেক্ষা আরও দুঃখের বিষয়, যে দেশ তাঁহার জন্মভূমি, তাঁহার বাল্যের, কৈশোরের, যৌবনের লীলাস্থল, সেই দেশবাসী, বঙ্গসাহিত্যানুরাগী, বঙ্গসাহিত্যসেবী প্রায় সকলেই তাঁহাকে বিস্মৃতির অতলজলে নিক্ষেপ করিয়াছেন! "বঙ্গবাসী" ও "নব্যভারত" ব্যতীত তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা আর কোনও পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। 'বেঙ্গলী' সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ, তাঁহার পরলোকগত সুহৃদের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করেন নাই, ইহা দারুণ আক্ষেপের বিষয়।

তাঁহার পারিবারিক জীবন অতীব মধুর ছিল। পত্নীর প্রতি প্রেম, সন্ততিবর্গের প্রতি স্নেহ, বন্ধুর প্রতি প্রণয়, ভৃত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ — তাঁহার পারিবারিক জীবনকে গৌরব-মণ্ডিত করিয়াছিল। যখনই তাঁহার গৃহে গিয়াছি, সকালে, দ্বিপ্রহরে, সন্ধ্যায়, রাত্রিতে, তখনই তিনি ও তাঁহার অশেষ গুণবতী পত্নী না খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দেন নাই। তিনি নিজে নিত্য নূতন নূতন জিনিষ খাইতে ভালবাসিতেন এবং অপরকে খাওয়াইয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেন। যদিও তাঁহার প্রকৃতি অতি মধুর ছিল, কিন্তু বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তাঁহাকে যমের মতন ভয় করিত, কারণ কোন প্রকার অশিষ্ট আচরণ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। ছাত্রজীবনকে সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতি ও বিলাস হইতে রক্ষা করিতে তিনি যত্নবান ও সচেষ্ট ছিলেন। এই আদর্শ গুরুর অনেক আদর্শ ছাত্র আজ বাঙ্গালার গৌরব স্থল, বাঙ্গালীর শীর্ষস্থানীয়।

তাঁহার "মানবপ্রকৃতি" বাঙ্গালায়, নিজ বিভাগে অদ্বিতীয় গ্রন্থ। আমাকে তিনি বলিয়াছেন যে, বহরমপুরে যখন তিনি শিক্ষক ছিলেন, সেই সময়ে ঐ গ্রন্থের কিয়দংশ তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী হঠাৎ একদিন রাগান্বিতা হইয়া, টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেন। বহু পরিশ্রমে, বহু কষ্টে সেই অংশ জোড়া লাগান হইয়াছিল। পুরাতন 'নব্যভারতে' প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধাবলী দ্বারা বঙ্গভাষা গৌরবান্বিতা হইয়াছেন।

তাঁহার পশুপক্ষী প্রতিপালনের খুব সখ ছিল। মাছ ধরিবার জন্য কখন কখন নিজ বাগানের মধ্যস্থিত পুষ্করিণীতে ছিপ হাতে বসিতেন। আবার অনেক সময় ময়দার গুলি তৈয়ারী করিয়া, স্বহস্তে, মৎস্যদিগকে খাওয়াইতেন।

তিনি মানুষ ছিলেন—তাঁহার দোষ ছিল, তাঁহার ত্রুটী ছিল, কিন্তু সে কথা আলোচনা করিয়া কোনও ফল নাই। তাঁহার অশেষ গুণাবলী স্মরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য। তাঁহার স্বদেশ-প্রীতি আমাদের আদর্শ স্থানীয় হউক। উৎকলের উন্নতি হউক, ক্ষীরোদচন্দ্রের স্বপ্ন সত্য হউক। ক্ষীরোদচন্দ্রের পরলোকগত আত্মা দেখিয়া আনন্দ লাভ করুক।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সান্যাল।

"নেতি"।

ইহা নহ, উহা নহ, তাহা নহ তুমি,
হে সুন্দর! তোমা-হীন এই বিশ্বভূমি,
কেমনে বিশ্বাস করি? মানে না হৃদয়,—
ভাবিতে শিহরে প্রাণ, অশ্রুধারা বয়!

অসীম আকাশ আর অনন্ত সাগর
কার ছায়া-চিত্রখানি আঁকে নিরন্তর
তৃষিত অন্তর পাশে? রবি-চন্দ্র-তারা
কার নেত্র-রশ্মি নিত্য ঢালে আত্ম-হারা
অন্ধ বসুন্ধরাতলে? বিহঙ্গ সঙ্গীতে
শুনি কার মধু-কণ্ঠ? ফুলের হাসিতে
ফুটে উঠে হাসি কার? কার পরশন
জাগে স্নিগ্ধ গন্ধবহে? কহ নারায়ণ!
কার করুণার ধারা অজস্র বহিয়া
উচ্ছসিত হর্ষাবেগে দু'কূল প্লাবিয়া
ধায় স্রোতস্বিনীদল? সে কি নহে তব?—
তুমি কি সহস্ররূপে সদা অভিনব
আপনা লুকায়ে রাখি সবাকার মাঝ
হে গোপন-লীলাচারি! হে ভুবন-রাজ!
করিছ না আপনারে আনন্দে প্রকাশ
অনিন্দ্য আত্মার কাছে? একি পরিহাস?
জনক জননী-বক্ষে, প্রেয়সীর প্রাণে,
যে নির্ম্মল স্নেহ-প্রেম বাধা নাহি মানে
উৎসারি উঠিছে স্বতঃ উৎসের মতন
বসুধায় স্বর্গ সৃজি' মর্ম্মের বন্ধন
করিয়া নিবিড় দৃঢ়, তাহারি মাঝার
নাহি তুমি, নাহি তব অরূপ অপার
স্নেহ-প্রেম-সুধা-কণা? মনে হয় নাথ!
প্রতি অনু-রেণুকায় কৃপা-আঁখি-পাত
পড়েছে অলক্ষ্যে তব, তোমারি সত্তায়
পূর্ণ সবে নিশিদিন! অজ্ঞাতে সবায়
তুমি আছ, তুমি আছ, হে সত্য দেবতা,
জড়াইয়ে ওতপ্রোত সতত সর্ব্বথা
এ নহে অসত্য কভু! সব-কিছু তুমি,—
তব স্নেহ আমাদের তপ্ত ভাল চুমি'
বিরাজিছে দশদিশে! করুণা আধার!
দুর্ব্বল অক্ষম সুতে অবনী মাঝার
জীবন-সংগ্রামে ঘোর পাঠায়ে একেলা
তুমি আছ দূরে সরি করি অবহেলা
মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ আকুল আহ্বান
সহস্র প্রাণের নিতি, কহ ভগবান!
কেমনে স্বীকার করি? এমন নিষ্ঠুর
তুমিত কখনো নহ! হে চির-মধুর!
আশা-আশ্বাসের দীপ তীব্র অন্ধকারে
কে জ্বালে হৃদয়-কোণে? মুছি অশ্রুধারে
কে কহে সান্ত্বনা বাণী? স্খলিত-চরণে
কে উঠায়ে হাতে ধরি রহি সনে সনে
দেখায় গন্তব্য-পথ—ধ্রুব লক্ষ্য তুমি
তব পানে নিয়ে যায়? থাকি যবে ঘুমি'
কে জাগায় স্নেহে ডাকি জীবন-সখায়
অর্চ্চিতে জীবন দিয়ে? সে যে তুমি হায়,
সে যে তুমি! সে যে তুমি! আমাদেরি মত
আপন সন্তানে রক্ষি হর্ষে' অবিরত
একান্ত আপনা করি লইবারে চাও
কতবার কত ভাবে! আপনা বিলাও
মোদেরি কল্যাণ তরে! মোরা যত ভুলি,—
সৃষ্টি হতে স্রষ্টা তোমা যুক্তি তর্ক তুলি'
দূরে রাখিবারে চাই, আরো তুমি তত
কাছে ঘনাইয়ে আস, উন্মত্তের মত
বাঁধ গাঢ় ভুজ-পাশে! জানিয়াছি স্থির
আছ, আছ, তুমি আছ, অন্তর বাহির
পূর্ণ করি ধন্য করি' করিয়া সুন্দর
জীবন-মরণ-সখা ভুবন-ঈশ্বর!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

সঙ্কলিকা।

(২৯)

এবার বড়দিনের সময় ভারতের নানা সভাসমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। ১। কংগ্রেস, ২। একেশ্বরবাদীদের সভা, ৩। ভারতীয় সামাজিক সমিতি, ৪। মসলেম্ লিগ, এবং ৫। ভারতীয় মাদক-নিবারণী সভা লক্ষ্ণৌ নগরে হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন কায়স্থ-সভা, মোক্তার সভা এবং সাহিত্য সম্মিলনেরও অধিবেশন এবার বড়দিনের সময় হইয়াছিল। কংগ্রেসে এবার শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার

মহাশয়, সভাপতি হইয়া, সমগ্র ভারতের অনুপ্রাণিত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র এবং তিলক প্রভৃতি চরম-পন্থীগণও এই অধিবেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কোনরূপ দলাদলি হয় নাই, ইহা বড়ই সুখের কথা। ছাদন-দড়ি দিয়া সকলের মুখ বাঁধিয়া দিয়া শেষে ছোটলাট মহামতি মেষ্টন সাহেব কংগ্রেসে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং পরে বড়লাট মহোদয় সভাপতি মহাশয়কে নিমন্ত্রন করিয়া ব্যারাকপুরে আপ্যায়ন করিয়াছিলেন। ইহাতে সকলেই আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন। পায়ে বেড়ি দিয়া বাঁধিয়া মুখে মধুর বাণী শুনানই যেন এখনকার নীতি। নানা সভা-সমিতিতে নব জাগরণের আভাস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অবাধ বক্তৃতার স্রোত না থামিলে এবং সকলে চরিত্র-বলে আপন আপন পায়ের উপর কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর না হইলে, ভারতের অবনতি দূর হইবে না। একেশ্বরবাদীদের সভায় খুব দলাদলি পাকিয়াছিল, ইহা যারপরনাই দুঃখের বিষয়।

সাহিত্য-সম্মিলনের অধিকাংশ সভাপতিই সভা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। বক্তৃতাগুলি খুব জমিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। মূল সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার নানা দোষ বসুমতী ও হিতবাদী ঘোষণা করিতেছেন। একদেশদর্শিতার কুহক না ভাঙ্গিলে এদেশের মঙ্গল নাই। পাঁচকড়ি বাবু ও বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতার পরও ব্যোমকেশ মুস্তোফীর পরিবারবর্গের জন্য কিছু চাঁদা উঠিল কি? পকেটে হাত দিতে এদেশের কোন্ হিতৈষী প্রস্তুত?

(৩০)

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য এদেশে আবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। বঙ্গবাসী তাহার বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় গালাগালি করিতেছেন। জাতিভেদ ভাঙ্গিলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, আমরা বুঝি না। বড় বড় লোকের বড় বড় মাথা, তাঁহাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা। যাহা এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে, সহস্র চেষ্টাতেও তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নয়। বৃথা চেষ্টা, বৃথা আয়োজন এবং বৃথা গালাগালি বর্ষণ।

(৩১)

এবার মাঘোৎসব কোন সমাজেই তেমন জমাট বাঁধে নাই। শেষে ঠাঁঠ বজায় রাখিলেন নাকি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কালীনাথ ঘোষ এবং সুগায়ক শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্দোপাধ্যায়। সকল সমাজেরই ভক্ত এবং বিশেষজ্ঞগণ স্বর্গারোহণ করিতেছেন, তাঁহাদের স্থান আর পূরণ হইতেছে না। রবীন্দ্রনাথ এবার বিদেশে, অন্যান্য সমাজে দারুণ দলাদলি — আসর জমিবে কেন? সঞ্জীবনী শাস্ত্রী মহাশয়ের যে অর্চ্চনা, আরাধনা ও উপদেশ ছাপাইয়াছেন, তাহা ভাল হয় নাই। উদ্বোধনের উপদেশ তত্ত্বকৌমুদীতে পড়িয়াছি, তাহা অসার জৃম্ভন মাত্র। চীৎকার, সুরসাধন এবং সুদীর্ঘ উপাসনা হইলেই কি জমাট বাঁধে? মহামতি কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র ১॥০ ঘণ্টার অধিক কখনও উপাসনা করিতেন না, তাঁহাদের শিষ্যগণ কেহ কেহ ৪ কি ৪½ ঘণ্টা উপাসনা চালাইতেছেন। ইহাতে সুনিদ্রারই সুবিধা বাড়িতেছে মাত্র। গভীর সাধনার অভাবই চতুর্দ্দিকে পরিলক্ষিত হইতেছে। এই অবস্থায় আবার দলাদলিও বাড়িতেছে। ওয়ার্লড এবং নিউডিসপেনসেসন্ কাগজে শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় পুরাতন কথা তুলিয়া অকথ্য ভাষায় শাস্ত্রী মহাশয় প্রভৃতিকে গালাগালি করিতেছেন। সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের নগরকীর্ত্তনটী কিছুই ভাল হয় নাই, গানটীতে না আছে ভাষাজ্ঞানের পরিচয়, না আছে সাধনার পরিচয়, না আছে ভক্তি বিশ্বাসের জমাট ভাবের পরিচয়। নববিধান সমাজের এবারকার গানটী ভাল হইয়াছে, দলাদলির কথা তাহাতে নাই দেখিয়া সুখী হইয়াছিলাম, কিন্তু এদিকে কাগজে খেউড় চলিতেছে দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতেছি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধনার ক্রম ক্রমেই নমিত হইতেছে, দেখিলে কষ্ট হয়। সুদীর্ঘকাল ব্রাহ্মসমাজ ঘোষণা করিয়াছেন যে, পরিবারে ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে, স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকার ইত্যাদি।

এখন সাধনাশ্রম মহিলাদিগকে বাদ দিয়া পুরুষের আড্ডা করিয়াছেন। সপ্ত প্রহর কাণের কাছে প্রেসের ঘরঘরাণি চলিতেছে, তাহাতে সাধনার ব্যাঘাত হয় না। ব্যাঘাত হয় মহিলারা থাকিলে!! মাঘোৎসবের সময় মহিলাদিগের বিশ্রাম, উপবেশন এবং মলমূত্র ত্যাগের কোন বন্দোবস্ত বা বিশ্রাম-গৃহ নাই। আছে কেবল প্রেসের ঘরঘরাণি। সাধনা ইহাতে জমাট বাঁধিবে কিরূপে? সাধন-আশ্রমের একদেশদর্শিতা তুলিয়া দিবার জন্য শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয় এই প্রস্তাবটী বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন—"গুরুদাস বাবু যে নূতন নিয়ম অনুসারে মহিলাদিগকে স্বতন্ত্র বাড়ীতে লইয়া গিয়াছেন, সেই নিয়মটী রহিত করিয়া সাধনার্থীগণ পূর্ব্বের ন্যায় সপরিবারে আশ্রমে বাস করিয়া সাধন ভজন করিতে পারিবেন, এই প্রস্তাবটী ধার্য্য হউক।" তাঁহার স্বর্গারোহণের সুবিধায় এ প্রস্তাবটী গৃহীত হয় নাই, আশ্রম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটী কামিটী হইয়াছে, অর্থাৎ প্রস্তাবটী ধামাচাপা দিবার আয়োজন হইয়াছে। শুনিতেছি, ইহাতে আন্দোলনকারী ব্যক্তিরাও সন্তুষ্ট হইয়াছেন। অনেক চেষ্টা ও অনুরোধের পর এই আশ্রমে এবার মাঘোৎসবের সময় কয়েক দিন মফঃস্বলের মহিলাদিগকে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল। শেষে তাঁহাদিগের উঠিতে একটু বিলম্ব হওয়ায় অপমানিত হইয়া উঠিতে হইয়াছে। ভগবদ্ভক্ত ৺জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের পত্নীর কতক টাকা-সম্বলিত একটী ট্রাঙ্ক চুরি যায়। পুলিস অনুসন্ধান করিতে আসিবেন, এই কারণে আশ্রম ছাড়িতে তাঁহার একটু বিলম্ব হওয়ায় অধ্যক্ষ মহাশয় নাকি বলিয়াছিলেন,—"হাত ধরিয়া তুলিয়া না দিলে উঠিবেন কেন?" তিনি একথা আশ্রমের কোন কোন মহৎ ব্যক্তিকেও নাকি বলিয়াছিলেন, তাঁহারা উত্তরে বলেন যে "আপনাকে নয়। অন্য মহিলাকে ঐ কথা বলা হইয়াছে।" অন্য মহিলাও মহিলা, তিনিও মহিলা, মহিলার হাত ধরিয়া অধ্যক্ষ তুলিয়া দিতে চান, এ কিরূপ সাধক? প্রাচীন কালের ভারতাশ্রমের একজন মহিলার প্রতি ব্যক্তিবিশেষের অপমান-সূচক কথা সুদীর্ঘকাল ইতিহাস বহিয়া আনিতেছে, আর এ কথাটী ধামাচাপা পড়িবে? মানুষের ন্যায় মানুষ থাকিলে জয়কালী দেবীর নিকট ক্ষমা চাওয়া হইত। যতদূর জানি, আজও ক্ষমা চাওয়া হয় নাই। সাধনার ক্রম কেমন প্রখর ভাবে চলিতেছে, তাহা বুঝুন। এই ক্রম-অনুসারেই স্বোত্থিত উপাধিধারীগণ এবং নব নব প্রচারকগণ অন্য সমাজকে অযথা ভাষায় গালাগালি দেন। প্রকৃত ভক্ত সকলকেই আলিঙ্গন করেন, এবং ভণ্ড ভক্ত আপন ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতে চাহেন না। ব্রাহ্মসমাজ কোন্ পথ ধরিয়া চলিবেন? বঙ্গীয় খ্রীষ্টসমাজের নিন্দা-বিদ্বেষ-জনিত প্রাচীন বক্তাদের বক্তৃতার আদর্শই কি ব্রাহ্মসমাজের নিয়ামক হইবে?

সকল পাপের শ্রেষ্ঠ পাপ মহিলা-নির্য্যাতন। এদেশ এই পাপে ডুবিতেছে। অবলা নির্য্যাতন কি শেষে ব্রাহ্মসমাজেরও প্রধান কার্য্য হইবে? মহাত্মা গুরুচরণের উদার প্রস্তাবের তর্ক বিতর্কের পর কিরূপে ভক্তনামধারী ব্যক্তিগণ সাধন-আশ্রমের সম্বন্ধে কথা বলাকে "পাপ করিতেছ" বলিয়া ক্রোধপ্রকাশ করিয়া সভা হইতে উঠিয়া গেলেন, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ভক্ত কেশবচন্দ্রকে খর্ব্ব করিতে যাঁহারা সাধারণের মতের সম্মান বাড়াইবেন, ঘোষণা করিয়া ভোট-প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেকালের ক্রোধান্ধ ব্রাহ্মণের ন্যায় তাঁহাদের অভিশাপ বর্ষণ করা সমীচীন কি? সাধনার ক্রম কোন্ পথ ধরিয়া চলিল? হায়রে সাধনা!!

(৩২)

চণ্ডীচরণের তিরোধানে ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই একটু শান্তি লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। প্রভুত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি কখন কি বলেন, সকলের যেন ভয় ছিল। এই ভয়ের অভিব্যক্তিতে এই নির্ম্মম কথা প্রকাশ পাইয়াছিল—"ইন্দুপ্রকাশ গিয়াছেন, ভালই হইয়াছে, আপনার ন্যায় ব্যক্তি

ইহাতে সংযম শিক্ষা করিবে।” এই ধর্ম্ম-দেখার আভাস চণ্ডীচরণের তিরোধানেও কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। যে চণ্ডীচরণের তিরোধানের কথা, একেশ্বরবাদীদের সভায় এবং সাহিত্য-সম্মিলনে উল্লিখিত হইয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুর কথা দুই লাইনে মেসেঞ্জার শেষ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, এই জন্যই শাস্ত্রী মহাশয় নিমতার উৎসবে গেলেন, বারম্বার অনুরুদ্ধ হইয়াও, পরিবারের শেষ সান্ত্বনা স্বরূপ আদ্যশ্রাদ্ধের উপাসনা করিলেন না এবং মাঘোৎসবের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে কেহই এই মৃত্যুর কথা প্রকাশ্যে উল্লেখ করিলেন না। দেখিয়া শুনিয়া আমরা হতবুদ্ধি হইয়াছি।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৩৯। ত্রিপদা। প্রথম খণ্ড, শ্রীনিতাইচাঁদ শীল প্রণীত, মূল্য ।০। লুৎফ উন্নিসা কবিতাটী খুব সুন্দর হইয়াছে। পতিপ্রাণা সতীর কাহিনী পড়িতে পড়িতে চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় না।

৪০। Sri Keshub Chander Sen, A Social Mystic by Principal T. L. Vaswani M. A. চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ। গ্রন্থকারের লেখা সুমিষ্ট এবং চিন্তাপূর্ণ।

৪১। বৈদিক শ্রীকৃষ্ণ। গোপালতাপনী উপনিষৎ। শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর বেদান্ত বাচস্পতি এম-এ, বি-এল কর্তৃক ব্যাখ্যাত। মূল্য ৷৷০। ব্যাখ্যা মনোজ্ঞ হইয়াছে।

৪২। জীবে দয়া। শ্রীতারানাথ রায়-চৌধুরী। গ্রন্থকার বলেন—“তান্ত্রিকেরা শ্রীদুর্গা ও শ্রীকালী পূজায় বলি দিয়া থাকেন। বলেন, তন্ত্রে আছে। আমরা পূজা করি বিশ্বমাতাকে, তিনি সর্ব্বজীবের জননী। পশু কীট পতঙ্গ স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বের তিনি জননী। অথচ তাঁহার নিকটই একটী জীবকে বলি দিয়া বলি, মাতার তুষ্টির জন্য! হায় অন্ধ! মা কি কখনও আপন সন্তান বলি লইয়া তৃপ্ত হন?”

তিনি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পশুবধে কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহা দেখাইয়াছেন। পুস্তকখানি সার কথায় পূর্ণ। সর্ব্বত্র আদৃত হইলে আমরা সুখী হইব।

৪৩। রিক্তা। শ্রীজীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৷৷০। শ্রীযুক্ত জলধর সেনের পরিচয়-পত্র-সম্বলিত।

পরিচয়-পত্রে পুস্তকের প্রশংসা কিছুই নাই। এরূপ পরিচয় না দিলেই ভাল হইত। পুস্তকে প্রশংসার বিশেষ কিছুই নাই বলিলেও চলে। লেখকের আরো সাধনার প্রয়োজন।

৪৪। প্রয়াগধামে কুম্ভমেলা। শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রণীত, মূল্য ১৲। তৃতীয় সংস্করণ।

পুস্তকখানি এই সংস্করণে প্রায় চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। সাধু ভক্তের কথা যে আজকাল এদেশের লোকেরা খুব শুনিতে চান, এই গ্রন্থের আদরই তাহার প্রমাণ। মনোরঞ্জন বাবু একজন সাধক ব্যক্তি, তিনি সর্ব্বশ্রেণীর সাধু ভক্তের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া এই উপাদেয় পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। ইহা পড়িয়া আমরা উপকৃত হইলাম। সব মতই যে মিলিবে, তাহা কখনও আশা করা যায় না। বিবৃতি মনোজ্ঞ ও রুচিপূর্ণ। সকলেরই এই পুস্তক ভাল লাগিবে, আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি।

বেদান্ত-দর্শন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আমরা দেখিয়াছি, চেতন স্বাধীন পরমাত্মা হইতেই জড়ে ক্রিয়া আসিয়াছে। এই চৈতন্যই জগতের মূল কারণ। স্বতন্ত্র, স্বাধীন প্রকৃতিতে আপনা আপনি প্রথম ক্রিয়া উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু সাংখ্যকার অচেতন, স্বাধীন প্রকৃতিকেই জগতের মূল কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সাংখ্যকার দৃষ্টান্ত দেন যে,—আপন বৎসের দেহ-পোষণের নিমিত্ত যেমন অচেতন স্তন্য দুগ্ধ আপনা আপনি প্রবর্ত্তিত হয়, তদ্রূপ অচেতন প্রকৃতিও আপনা আপনি, আত্মার বা পুরুষের প্রয়োজন সাধনার্থ, ক্রিয়ায় প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। পর্ব্বত-গাত্র হইতে নির্ঝরিণীর জল কি আপনা আপনি, লোকের উপকারার্থ, নিস্যন্দিত হইয়া প্রবাহিত হয় না? কিন্তু সাংখ্যকারের এ দৃষ্টান্ত ঠিক্ নহে। ঐ স্তন্য দুগ্ধ ও জল যে চেতনা দ্বারা প্রেরিত হইতেছে না, একথা ত প্রমাণিত হইতেছে না। শ্রুতিতে ও দৃষ্ট হয়—"এই অক্ষর পুরুষের শাসনেই পূর্ব্বদিগ্‌গামিনী নদী ও পশ্চিমদিগ্‌ প্রবাহিনী নদী ধাবিত হইতেছে।" চৈতন্যই সকল পদার্থের অন্তরে অবস্থান করিয়া সকল পদার্থকে নিয়মিত করিতেছেন"—ইত্যাদি। যেখানেই স্পন্দন, যেখানেই ক্রিয়া, সেই খানেই চেতনের অধিষ্ঠান ও চেতনের প্রেরণা রহিয়াছে, বুঝিতে হইবে। ধেনু ও ত চেতন পদার্থ। চেতন ধেনুর ইচ্ছা ও স্নেহ দ্বারা প্রেরিত হইয়াই ত স্তন্যদুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া থাকে; চেতন বৎসই ত মুখ দিয়া চুষিয়া স্তন্য আকর্ষিত করিয়া থাকে। বেদান্তের ইহাই সিদ্ধান্ত যে, পরমার্থ-দৃষ্টিতে, সকল ক্রিয়ার মূলেই, সর্ব্বত্র, চেতনের প্রেরণা ও অধিষ্ঠান রহিয়াছে। জড়ীয় যাবতীয় কার্য্য-কারণ-পরম্পরার মধ্যে এক স্বতন্ত্র স্বাধীন চেতন পরমেশ্বরের প্রেরণা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে।

সাংখ্যকার যে বলিয়া থাকেন যে,—তৃণাদি আপনা আপনি, অন্য কোন নিমিত্তের অপেক্ষা না রাখিয়াই, স্বভাবতঃ দুগ্ধাদিরূপে পরিণত হইয়া থাকে; এইরূপ, প্রকৃতিও অন্য কোন নিমিত্তের অপেক্ষা না রাখিয়া, আপন স্বভাব বশতঃ 'মহত্তত্ত্বাদির' আকারে পরিণত হয়। সাংখ্যকারের এ যুক্তিতে দোষ আছে। অন্য কোন নিমিত্তের অপেক্ষা না রাখিয়াই কি তৃণাদি বস্তু স্তন্যদুগ্ধের আকারে পরিণত হয়? যদি তাহাই হইবে, তবে ত বৃষ দ্বারা ভক্ষিত তৃণাদি, বৃষশরীরে দুগ্ধাকার ধারণ করিত। কিন্তু তাহা ত হয় না। ধেনু দ্বারা ভক্ষিত তৃণাদিই কেবল স্তন্যদুগ্ধাকারে পরিণত হইয়া থাকে। অতএব, স্তন্যদুগ্ধাদিকে তৃণাদির স্বাভাবিক পরিণতি বলিতে পারা যায় না। অতএব, অন্য কোন নিমিত্তের অপেক্ষা না রাখিয়া, প্রকৃতি স্বভাবতঃই জলদাকারে পরিণত হয়, এ নিয়ম কখনই যুক্তি সঙ্গত হইতেছে না। আর যদি সহকারী কোন কারণের অপেক্ষা না রাখাই নিয়ম হয়, তাহা হইলে, সাংখ্যকার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পুরুষের

ভোগ্য ও পুরুষের মুক্তির উদ্দেশ্যেই, প্রকৃতি স্বভাবতঃ জগতের আকারে পরিণত হইয়াছে —এই সিদ্ধান্ত ও টিঁকিতে পারে না। সাংখ্যমতে পুরুষ-চৈতন্য—নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত সর্ব্ব প্রকার বিশেষত্ব-শূন্য। এ অবস্থায়, পুরুষের বিষয়-ভোগ ও বিষয় হইতে বিমুক্তি কি প্রকারে সম্ভব হইবে? ভোগ ত আত্মার একটা বিশেষ অবস্থা। মুক্তি ও তাহাই। যিনি সর্ব্বদা একরূপ, যাঁহার কোন প্রকার বিশেষত্ব নাই; তাঁহার আবার ভোগাবস্থা ও মুক্তির অবস্থা কি প্রকারে স্বীকার করা যায়? পুরুষের ভোগাদি সিদ্ধির নিমিত্ত, প্রকৃতি উৎসুক হইয়া উঠে, এই উৎসুকতার সাফল্যের জন্য প্রকৃতিতে ক্রিয়ারম্ভ হয়,—এ কথাও ত বলা যায় না। কেন না, অচেতন, জড় প্রকৃতির আবার ইচ্ছা আসিবে কিরূপে? নির্ব্বিকার পুরুষ-চৈতন্যেই বা ইচ্ছার উদ্ভব স্বীকার করা কিরূপে সঙ্গত হয়? সর্ব্বদ্রষ্টা পুরুষের দৃষ্টি-শক্তি এবং সৃষ্টিকারিণী প্রকৃতির সৃষ্টিশক্তি,—এই দ্বিবিধ শক্তি নিষ্ফল হইয়া উঠিবার ভয়ে যদি, প্রকৃতিতে ক্রিয়ার উদ্ভব স্বীকার কর, তাহা হইলে ও তোমার রক্ষা নাই। কেন না, ঐ দুই শক্তি ত চিরদিনই আছে ও থাকিবে। সুতরাং চিরকালই সৃষ্টি হইতে থাকিবে এবং জীবের আর মুক্তিলাভ ও সম্ভব হইবে না। এই সকল যুক্তি দ্বারা,—সাংখ্যকারের উল্লিখিত, পুরুষের ভোগ ও মুক্তি লাভের নিমিত্ত প্রকৃতিতে প্রথম ক্রিয়ারম্ভের কথাটা, একেবারেই অসঙ্গত হইয়া উঠিতেছে।

সাংখ্যকার বলিয়া থাকেন যে, পুরুষ চৈতন্যে কোন প্রকার ক্রিয়া নাই; উহা কেবল দর্শন শক্তি সম্পন্ন। অর্থাৎ, সাংখ্য মতে পুরুষ নিষ্ক্রিয়, কিন্তু সর্ব্ব দ্রষ্টা। আর, প্রকৃতি জড়, অন্ধ; কিন্তু ক্রিয়া-শক্তি সম্পন্ন। দর্শনশক্তি বিহীন অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া গতিক্রিয়া-বিহীন পঙ্গু যেমন উহাকে চালাইয়া লইয়া যায়; অচল অয়স্কান্ত মণি যেমন লৌহকে সচল করিয়া থাকে; এইরূপ নিষ্ক্রিয় পুরুষকে প্রকৃতির প্রেরয়িতা বলিয়া স্বীকার করায় কোন হানি হয় না। কিন্তু সাংখ্যকারের এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইলে, অন্যদিকে দোষ উপস্থিত হইয়া উঠে। সাংখ্যকার প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র স্বাধীন পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন! প্রকৃতি যদি স্বাধীন হয়, তাহা হইলে, প্রকৃতিতে যে ক্রিয়ারম্ভ হয় তাহাতে পুরুষের ত কোন অপেক্ষা বা সাহায্য করিবার প্রয়োজন থাকে না। সাংখ্যকারের পুরুষ ও উদাসীন নিষ্ক্রিয়। সুতরাং এরূপ পুরুষ ও ত ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বা প্রেরক হইতে পারে না। অয়স্কান্ত যেমন লৌহের নিকটে উপস্থিত হইলেই, লৌহের আকর্ষণ-ক্রিয়ার উদ্ভব হয়; পুরুষ নিকটে থাকিলেই প্রকৃতিতে ক্রিয়ারম্ভ হইবে,—একথা ও ত বলা যাইতে পারে না। কেন না, পুরুষ ত সর্ব্বদাই প্রকৃতির নিকটে উপস্থিতই। তাহা হইলে, সর্ব্বদাই প্রকৃতিতে ক্রিয়ার উদ্ভব অনিবার্য্য হইয়া উঠে। আবার দেখ, অয়স্কান্ত মণিকে লৌহের নিকটবর্ত্তী স্থানে লইয়া গেলে, তবে উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু, প্রকৃতি ত জড়; পুরুষ ও নিষ্ক্রিয়, উদাসীন। অন্য কোন তৃতীয় পদার্থ ও নাই। সুতরাং পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্বন্ধ ঘটিবে কি প্রকারে? যদি বল উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ জন্মিবার যোগ্যতা ত রহিয়াছে;

সুতরাং এই যোগ্যতার বলেই উভয়ের সম্বন্ধ ঘটিবে। কিন্তু যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে, এই যোগ্যতা ত নিত্যই বর্ত্তমান; এ যোগ্যতার ত ধ্বংস কোন কালেই হইবে না। তবে ত, প্রকৃতির গ্রাস হইতে পুরুষের কখনই মুক্তিলাভের আশা থাকিবে না। তাহা হইলে ত, পুরুষের মুক্তির উদ্দেশ্যে যে প্রকৃতিতে ক্রিয়ারম্ভ হয় বলিয়া সাংখ্যকার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, সে সিদ্ধান্ত ও ত অলীক হইয়া উঠে। অতএব এই সকল কারণে, সাংখ্যমত আদরণীয় হইতে পারে না। প্রকৃতিতে আপনা আপনি, স্বভাবতঃ ক্রিয়ার উদ্ভব হয়,—সাংখ্যকারের এই সিদ্ধান্ত, অপসিদ্ধান্ত ও অযৌক্তিক হইতেছে। বেদান্ত মতে, পরমাত্মার ঔদাসীন্য তাঁহার স্বরূপ-গত; তাঁহার প্রেরকতা তাঁহার মায়াশক্তির আশ্রিত। মায়াশক্তি, পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র স্বাধীন কোন শক্তি নহে। উহা ব্রহ্মেরই শক্তি,—উহা ব্রহ্ম-ই।

সত্ত্ব, রজ ও তমঃ—এই তিন জাতীয় শক্তি তুল্যবল হইয়া যখন অবস্থান করে; কোনটী অপরটী হইতে অধিক হয় না;—সাংখ্যকার ইহাকেই প্রকৃতির স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু সৃষ্টিকালে যখন প্রকৃতিতে প্রথম ক্ষোভ উপস্থিত হইল, তখন কাহারও বল অধিক এবং অপর দুইটীর বল ন্যূন অবশ্যই হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ হইলে ত প্রকৃতির স্বরূপটীই বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রথম ক্রিয়ারম্ভের সময়ে প্রকৃতি আর প্রকৃতি থাকেন না; তাঁহার স্বরূপেরই অন্যথা হইয়া উঠে! সুতরাং প্রকৃতিতে আপনা আপনি, ক্রিয়ারম্ভ হয়, একথা স্বীকার করাই অসম্ভব হইয়া উঠে। কেননা, সাংখ্যকার তাঁহার প্রকৃতিতে যে স্বরূপটীর বর্ণনা করিয়াছেন, ক্রিয়ারম্ভে সেই স্বরূপেরই বিনাশ হইয়া উঠে। যদি বল যে, ক্রিয়াশীলতাই প্রকৃতির স্বভাব। কার্য্য-দর্শনেই ত বস্তুর স্বভাব নির্ণীত হয়। প্রকৃতি যখন কার্য্যবর্গের জননী; প্রকৃতি হইতেই যখন কার্য্যবর্গ উৎপন্ন হয়, তখন প্রকৃতির সাম্যাবস্থার সময়েও উহার ক্রিয়াশীলতা—ক্রিয়ার যোগ্যতা—থাকিয়াই যায়। সুতরাং প্রকৃতির স্বভাবনাশের আশঙ্কা কোথায়? কিন্তু একথা ও বলা চলিবে না। কেন না, প্রকৃতিতে যদি তৎকালে ক্রিয়াশীলতা স্বীকার কর, তাহা হইলে সর্ব্বদ্রষ্টা পুরুষের ত কোনই আবশ্যকতা থাকে না। সর্ব্বদ্রষ্টা পুরুষের সাহায্যে প্রথম ক্রিয়োৎপত্তি যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে ত বেদান্ত মতই আসিয়া পড়ে। আমরাই সর্ব্বদ্রষ্টা চেতনকে জগতের কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি। তুমিই ত স্বাধীন প্রকৃতিকে জগতের মূলে খাড়া করাইয়া দিয়াছ! আর সর্ব্বদ্রষ্টা চেতন পুরুষের সাহায্য ব্যতীত কেবল জড় প্রকৃতিতে ক্রিয়ারম্ভ হয় বলিলে, পূর্ব্বোক্ত সকল দোষ গুলিই আসিয়া পড়িবে প্রকৃতির সাম্যাবস্থায়, উহার ক্রিয়া করিবার যোগ্যতা থাকে,—একথা বলিলে ও তোমার নিষ্কৃতি নাই। কেন না, তৎকালে উহার ক্রিয়া করিবার যোগ্যতা থাকিলে ও বিনা কারণে কেন উহাতে ক্রিয়ার আরম্ভ হইবে? আর যদি ক্রিয়ারম্ভ হয়-ই,—তাহা হইলে উহা সর্ব্বদাই চলিতে থাকিবে; ক্রিয়া-নিবৃত্তি বা মুক্তির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইয়া উঠিবে!! অতএব সাংখ্যকারের সিদ্ধান্ত নিতান্তই অযৌক্তিক হইতেছে।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী,
বিদ্যারত্ন, এম্ এ।

মাদাম ব্লাভাস্কির জীবন কথা।

ব্লাভাস্কি-বেসান্ত-সংবাদ।

ব্লাভাস্কি জীবনে বেসান্ত-উদ্ধার পর্ব্ব নিতান্ত উপেক্ষার সামগ্রী নহে। পাঠক জানেন বেসান্ত ঘোরতর নাস্তিক ছিলেন। তাঁহার অধ্যাত্ম জীবন লাভ পুনর্জ্জন্ম বিশেষ। তিনি কিরূপে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিলেন, ইহা তাঁহার পূর্ব্ব জীবন আলোচনা করিলে অবগত হওয়া যায়। বেসান্তের জীবন সবিশেষ শিক্ষাপ্রদ, পরন্তু পরহিত রত কর্ম্মযোগীর আধ্যাত্মিক ক্রম বিকাশের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁহার পরিবর্ত্তন এক অদ্ভুত ব্যাপার ত বটেই, পরন্তু উহা পরাবিদ্যা সমিতির ইতিহাসে ও এক বিশিষ্ট ঘটনা। যখন ব্লাভাস্কির কার্য্যশেষ হইয়া আসিল, তাঁহার মহাযাত্রার দিন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, তখন নিয়তির কোন গূঢ় ইঙ্গিতে যেন বেসান্ত তাঁহার সন্মুখে উপস্থিত হইলেন। বেসান্ত ব্লাভাস্কির চক্ষে স্বীয় পরমা উপদেষ্টকে নিরীক্ষণ করিলেন, ব্লাভাস্কিও বেসান্তকে একটি উপযুক্ত আধার রূপে চিনিতে পারিলেন। ব্লাভাস্কির স্থান অধিকার করিবে কে? দৃশ্যমান আকাশে দ্বিতীয় সূর্য্যের স্থান কোথায়? কিন্তু সূর্য্যের আলোক চন্দ্রমা গ্রহণ করিয়া বিশ্বজগৎকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় পুলকিত করে। বেশান্ত ব্লাভাস্কির স্থান পূরণ করিতে না পারুন, কতকাংশে তৎপ্রদীপ্ত আলোকের আধার স্বরূপ বর্ত্তমান আছেন। অতএব আমরা বেসান্ত জীবনের একটু পরিচয় প্রদান আবশ্যক মনে করি। বলা-বাহুল্য ইহা সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র, কারণ এরূপ একটি ঘটনা বহুল নানা দিক প্রসারী জীবনের সম্যক বিবরণ এস্থলে অসম্ভব, এবং অনাবশ্যক। কি প্রকারে তাঁহার জীবন স্রোত নানা গতিতে, নানা ভঙ্গিতে প্রবাহিত হইয়া শেষে ব্লাভাস্কির জীবন প্রবাহে সঙ্গত হইল এবং পরাবিদ্যা সমুদ্রাভি-মুখে ধাবিত হইল ইহা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য।

১৮৪৭ খ্রীঃ লণ্ডন নগরে আনি বেসান্ত জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতৃকুল ইংরাজ এবং মাতৃকুল আইরিশ জাতীয়, পিতার মাতৃ-কুল ও আইরিশ জাতীয়। বেসান্ত বলেন —"আমার শোণিতের ¾ অংশ ইংরাজ এবং সমস্ত হৃদয়টা আইরিশ।" বেসান্তের মাতা বড়ই কোমল হৃদয়া, মধুর প্রকৃতি অথচ আত্ম সম্মান বোধ যুক্তা রমণী ছিলেন। পিতা ডাঃ উড চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন এবং নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি এক দিকে গণিত বিজ্ঞানবিৎ, অন্যদিকে গ্রীক, লাটিন, ফ্রেঞ্চ, জর্ম্মান প্রভৃতি যাবতীয় পাশ্চাত্য ভাষায় উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। দর্শন শাস্ত্রও তিনি অনুরাগের সহিত অনু-শীলন করিতেন। বোধ হয় তৎকালে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের কোন কোন মতকে তিনি নিতান্ত উপহাসাস্পদ মনে করিতেন। বেসান্তের মাতা ধার্ম্মিকা ছিলেন বটে, কিন্তু স্বামী সাহচর্য্যে তিনিও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচলিত কতকগুলি অযৌক্তিক মতে বিশ্বাস হারাইয়া-ছিলেন।

পঞ্চম বর্ষ বয়সে বেসান্তের পিতৃবিয়োগ হয়। ডাঃ উডের মৃত্যুর পর ইঁহাদের আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল হইয়া পড়ে।

বেসান্তের ভ্রাতার শিক্ষা সৌকর্য্যার্থ মাতা পুত্র ও কন্যাটি লইয়া লণ্ডন ত্যাগ করতঃ হ্যারো (Harrow) নগরে বাস করিতে লাগিলেন। এগার বৎসর কাল এই ক্ষুদ্র পরিবার এই স্থানে বাস করিয়াছিল। এই সময়ে প্রসিদ্ধ উপন্যাসিক Captain Marryatএর ভগিনী দয়াশীলা Miss Marryat নিজ ব্যয়ে বেসান্তের শিক্ষাভার গ্রহণ করিলেন। বাল্য শিক্ষার জন্য বেসান্ত ইঁহার নিকট ঋণী। ইঁহার সংসর্গে বালিকা বেসান্ত জাতীয় ধর্ম্মে সবিশেষ অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। Pilgrim's progress এবং Paradise lost পাঠে খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মে তাঁহার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইয়াছিল। কিন্তু ইহার কিঞ্চিৎ কাল পরেই তিনি মার্ক, মথি, লুক, যোহান লিখিত সুসমাচারে খ্রীষ্টের জীবন সম্বন্ধে পরস্পর বিরুদ্ধ বিবরণ দেখিয়া বাইবেলের সত্যতায় সন্দিহান হইয়া উঠেন। মিস্ মেরিএট্ সহ দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া বেসান্ত বাল্যেই ইউরোপের নানা স্থান দর্শন করিয়াছিলেন।

১৮৬৭ সালে বেসান্তের বিবাহ হয় তাঁহার স্বামী (Rev. Frank Besant) জনৈক ধর্ম্মযাজক ছিলেন। ধর্ম্মযাজকের পত্নীরূপে গরীব দুঃখীদের উপকার করিবার অবসর পাইবেন,—এই নিমিত্তই তিনি পাদ্‌রী বেসান্টকে বিবাহ করেন, নচেৎ তৎপ্রতি তাঁহার অনুরাগ আদৌ ছিল না, ইহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। কাজেই অনতি বিলম্বে উভয়ের মধ্যে মনান্তর উপস্থিত হইল। ১৮৬৯ সালে তাঁহার প্রথম পুত্র এবং ১৮৭০ সালে একটি কন্যা জন্মে। কন্যাটি কাশ রোগে আক্রান্ত হইয়া বড় কষ্ট পায়। শিশু কন্যার ভয়ানক রোগ যন্ত্রণা দেখিয়া এবং ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা সত্ত্বেও কোন ফলোদয় হইল না দেখিয়া দয়াবান ঈশ্বরের অস্তিত্বে বেসান্তের সন্দেহ জন্মে। স্বামী সহ কলহ, কন্যার পীড়া, তাঁহার বিধবা মাতার প্রতি জনৈক ব্যবহারজীবের প্রতারণাপূর্ণ ব্যবহার,—ইত্যাদি কারণে বেসান্ত ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া বিষপানে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মে তাঁহার অবিশ্বাস ও সন্দেহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি একজন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজকের নিকট সন্দেহ নিরসনের জন্য গমন করেন। কিন্তু তাঁহার নিকট কোন যুক্তিযুক্ত উত্তর পাইলেন না। তিনি পুনঃ পুনঃ বেসান্তকে কেবল বলিলেন,—"খ্রীষ্ট ধর্ম্মে বিশ্বাস না করিলে তোমার জন্য অনন্ত নরকের ব্যবস্থা।"

১৮৭২ সালে কোন গ্রামে জ্বরাতিসার (Typhoid) রোগের প্রাদুর্ভাব কালে বেসান্ত বহু দুস্থ লোকের সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। একদিন তথাকার ধর্ম্মমন্দিরে (church) একাকিনী বেড়াইতে গিয়া তাঁহার প্রকৃতিদত্ত বক্তৃতা শক্তির পরিচয় পাইলেন। চার্চ্চ তখন জন-মানব শূন্য। তাঁহার চিত্তে বক্তৃতা করিবার প্রবল ইচ্ছা হইল। শূন্য আসন শ্রেণীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি সেদিন ক্রীড়াচ্ছলে যে প্রথম বক্তৃতা প্রদান করিলেন, তাহা কেহ শুনিল না বটে,—কিন্তু তাহাতেই তিনি কি অতুল অনায়াস-লব্ধ বাক্‌বিভূতির অধিকারিণী—ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন। এই বৎসরেই কোন ধর্ম্মক্রিয়ায় যোগদানে অসম্মতি হেতু আইন অনুসারে Rev. Besant সহ তাঁহার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইল। তিনি শিশু কন্যাটিকে লইয়া অন্যত্র বাস করিতে লাগি-

লেন। তিনি কোন ভদ্রলোকের বাটিতে, একাধারে প্রধানা পাচিকা, ধাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

১৮৭৪ সালে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। এই সময়ে তিনি মিঃ স্কট্ (scott) নামক জনৈক ভদ্রলোকের জন্য "ঈশ্বরাদেশ" 'প্রায়শ্চিত্ত' 'মধ্যবর্ত্তিতা ও মুক্তি', 'অনন্ত নরক যন্ত্রণা' 'বালক বালিকার ধর্ম্মশিক্ষা' 'স্বাভাবিক বনাম ঈশ্বর প্রকাশিত ধর্ম্ম' নামক কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করেন, এবং ইহার পারিশ্রমিক স্বরূপ লব্ধ অর্থে কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার অভাব মোচন হয়। প্রবল পাঠানুরাগ চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি সমস্ত দিন British Museumএর বিরাট পুস্তকাগারে জ্ঞানান্বেষণে কাটাইতেন। মিলের (Examination of Sir William Hamilton's philosophy), কম্‌টের (Positivism) এবং অন্যান্য দার্শনিক গ্রন্থ আলোচনা ফলে ঈশ্বর বিশ্বাসের ক্ষীণ রেখাটি পর্য্যন্ত এই সময়ে তাঁহার চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হইল। তিনি 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি' সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা লিখিতে ছিলেন, এমন সময় ব্রাড্‌ল (Mr. Bradlaugh) সম্পাদিত 'জাতীয় সংস্কারক' (National Reformer) পত্রের একখণ্ড তাঁহার নয়ন পথে পতিত হয়। ইহাতে তাঁহার চিন্তার প্রতিধ্বনি পাইয়া ব্রাড্‌লর National seculiar society নামক স্বাধীন চিন্তা প্রণোদক ইহকালবাদী নাস্তিক সভার সভ্য হইলেন। ব্রাড্‌লর বক্তৃতা প্রথম দিন শুনিয়াই বেসান্ত একেবারে মুগ্ধ হইলেন। ব্রাড্‌লর অপূর্ব্ব যুক্তিতর্কময়ী মর্ম্মস্পর্শিনী বাগ্মিতায় তিনি ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষাদীক্ষার উপর ব্রাডলর চরিত্র কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে বেসান্ত স্বয়ং মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন—

"বাদপ্রতিবাদে তাঁহার অপূর্ব্ব যুক্তিতর্কবিন্যাস, খণ্ডনমণ্ডন প্রণালী এবং সুশিক্ষা সংযত বিচার পদ্ধতি হইতে আমি অমূল্য শিক্ষালাভ করিয়াছি। আমার কার্য্যের যদি কিছু মূল্য থাকে, তবে তজ্জন্য আমি অনেক পরিমাণে তাঁহার নিকট ঋণী। তাঁহার চরিত্র প্রভাব এমনি যে উহা এক দিকে যেমন লোককে কার্য্যে উত্তেজিত করে, অপর দিকে তেমনি তাহাকে সংযত রাখে।"

ব্রাড্‌ল সহ বেসান্ত নাস্তিকতা প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং ঈশ্বরে অস্তিত্ব বিষয়ক পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ ব্যতীত 'নাস্তিকতার সুসংবাদ' 'কেন আমি ঈশ্বরের বিশ্বাস করি না,' 'জীবন, মৃত্যু ও অমরত্ব' প্রভৃতি আরও কয়েক খানি পুস্তক প্রকাশিত করিলেন।

রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি স্বায়ত্ব শাসন তত্ত্ববাদী (Home Ruler) ছিলেন, এবং অদ্যাপি এই প্রৌঢ়েও তদীয় কার্য্যকলাপে অন্যদিকে অনেক পরিবর্ত্তনের মধ্যেও যৌবনের সেই রাজনৈতিক মতটি কিন্তু সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। তিনি সর্ব্বদা দুর্ব্বল জাতির পক্ষাবলম্বন করিয়া অকুতোভয়ে স্বমত প্রকাশ করিতেন।

১৮৭৭ সালে বেসান্তের জীবনে অনেক বিভ্রাট উপস্থিত হয়। ইহা 'নোল্‌টন পুস্তিকা' (Knowlton pamphlet) সংক্রান্ত আন্দোলন নামে খ্যাত। দারিদ্র্য নিবারণোদ্দেশ্যে অবাধ বংশ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে Rev. Mr, Malthus নামক জনৈক পাদরী ১৮৩৫সালে একখানা পুস্তক প্রণয়ন করেন। মিলের

ন্যায় পণ্ডিতগণও তাঁহার মতের পোষকতা করিয়াছিলেন। বিনা প্রতিবাদে ৪০ বৎসর কাল এই পুস্তক বিক্রীত হইতেছিল। তৎপর ডাঃ নোল্‌টন (Knowlton) নামক * আমেরিকার একজন চিকিৎসক কেবল উপদেশে কার্য্য হয় না দেখিয়া বংশ-বৃদ্ধি নিরোধক শারীর-বৈজ্ঞানিক উপায় নির্দ্দেশক এক পুস্তক প্রকাশিত করিয়া Malthusএর উপদেশকে কার্য্যকর করিতে চেষ্টা করেন। নোল্‌টনের গ্রন্থে দাম্পত্য পরিণাম দর্শিতা (Congugal prudence), পিতামাতার দায়িত্ব (Parental responsibility), ও সামাজিক পবিত্রতা রক্ষার্থ বাল্যবিবাহের আবশ্যকতা ও আলোচিত হয়। বাল্যবিবাহে পরিবার বৃদ্ধির সুতরাং দারিদ্র্য বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে, কিন্তু উহা তিনি তৎপ্রদর্শিত পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন দ্বারা প্রতিরুদ্ধ করিতে জনসাধারণকে উপদেশ প্রদান করেন। লণ্ডনে এই পুস্তকের প্রকাশককে গবর্ণমেণ্ট অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করিলেন, এবং পুস্তকের বিক্রয় একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। ব্রাড্‌ল ও বেসান্ত যে এই পুস্তকোক্ত সকল মতের সমর্থন করিতেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারা স্বাধীন চিন্তার (Free thought) সমর্থনকারী। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এইরূপে স্বাধীন চিন্তা ব্যাহত হইবে, ইহা তাঁহারা সহ্য করিতে পারিলেন না। সরকারী আদেশ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক তাঁহারা ঐ পুস্তক পুনর্মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহারা ধৃত ও রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলেন, এবং নিম্ন আদালতে দোষী হইয়া দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু বহুপরিশ্রম ও প্রমাণিত ও চেষ্টার ফলে আপিলে নির্দ্দোষী বলিয়া অব্যাহতি পাইলেন। তৎপর বেসান্ত স্বয়ং 'Laws of Population' অর্থাৎ 'জনসংখ্যার বিধি' নামক এক পুস্তক প্রণয়ণ পূর্ব্বক মলথুসীয় (Malthusian) মত প্রচার করেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই বেসান্ত নাস্তিক, সুতরাং কন্যার অভিভাবক হইবার অনুপযুক্ত, এই হেতুতে তাঁহার স্বামী আদালতের সাহায্যে শিশু সন্তানটিকে মাতার স্নেহময় ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন। তাঁহার গৃহের একমাত্রসঙ্গিনী ও আনন্দদায়িনী কন্যা হইতে বঞ্চিত হইয়া বেসান্ত পাগলিনীর প্রায় হইয়াছিলেন, এবং কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্বামীগৃহে কন্যাটিকে দেখিতে গেলেও তাঁহার প্রতি নানা প্রকার অপমান সূচক ব্যবহার করা হইত। পাছে ইহাতে সন্তানের চিত্তে আপন মাতার প্রতি অশ্রদ্ধার বীজ রোপিত হয়, এই জন্য তিনি তথায় যাওয়া বন্ধ করিয়া স্থির করিলেন,—

"Robbed of my own I would be a mother to all helpless children I could did, and cure the pain at my own heart by soothing the pain of others."

"নিজ সন্তানে বঞ্চিত হইয়া এক্ষণে আমি সকল অসহায় শিশু গণের মাতৃস্বরূপ হইব, এবং অপরের দুঃখে সান্ত্বনা দিয়া আপন হৃদয় বেদনার প্রতিকার করিব।"

এই সময়ে তিনি "ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ ও আফ্‌গানিস্থান" নামক পুস্তক প্রকাশিত করিয়া তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী লর্ড বিকন্স ফিল্ড (Lord Beaconsfield) অনুসৃত রাজ নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে তিনি ভারতের প্রতি সাধুতা ও স্বাধীনতা মূলক নীতির অনুসরণ

করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন,এবং আফগানিস্থান আক্রমণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ব্রাডলর নির্ব্বাচন ব্যাপারে ইংলণ্ডে যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়—যাহা পার্লামেণ্ট মহাসভার ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া প্রসিদ্ধ,—তাহাতেও বেসান্তের নাম ব্রাড্‌ল পক্ষীয়গণের অগ্রণী বলিয়া উল্লেখযোগ্য। আয়রলণ্ডের ভূমি সংক্রান্ত আইনের আন্দোলনেও বেসান্ত মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

আবার এই সময়েই পরাবিদ্যা সমিতির কথা প্রথম তাঁহার কর্ণগোচর হয়। তিনি এক খানি কাগজে উহার উদ্দেশ্য গুলি পড়িলেন,কিন্তু উহার প্রকৃতমর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ইহার কয়েক দিন পরে অলকটের একটি বক্তৃতা পড়িয়া সমিতি সম্বন্ধে তাঁহার এই ভ্রান্ত ধারণা হইল যে তাঁহার ন্যায় ইহকালবাদী নাস্তিকদিগের পরকালবাদ-রত পরাবিদ্যা সমিতিতে কোন স্থান নাই বা উহাতে যোগদানের কোন আবশ্যককতা নাই। তিনি এইরূপ লিখিত মত প্রকাশ করিলে "Theosophit" পত্রিকায় ব্লাভাস্কি উহার সমালোচনা মুখে বুঝাইয়া দিলেন যে পরাবিদ্যা সমিতি প্রত্যেক সভ্যকে নিজ মতানুসরণে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া থাকে, এবং বেসান্ত বা ব্রাড্‌ল অপেক্ষা কোন পরাবিদ্যার্থী অধিকতর অতিপ্রাকৃতবাদী (Supernaturalist) নহে,—অর্থাৎ যাহা কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকে অদ্ভূত অলৌকিক বলিয়া বিশ্বাস করে, বা নাস্তিকেরা স্বাভাবিক নিয়মবহির্ভূত অতি প্রাকৃতিক বলিয়া অবিশ্বাস যোগ্য মনে করে, তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির সূক্ষ্ম নিয়মান্তর্গত উচ্চস্তরাবস্থিত সত্য,—নিয়ম বিরুদ্ধ বা বহির্ভূত নহে। এইরূপে বেসান্ত ও ব্লাভাস্কি পরস্পরের লিখিত মতামতের মধ্যদিয়া পরস্পর কতক পরিচিত হইলেন, কিন্তু তখনও বেসান্তের পরাবিদ্যাথিনী হইবার সময় হয় নাই। বেসান্ত নিজেই বলিতেছেন—

"যদি আমি সেই সময়ে ব্লাভাস্কির সাক্ষাৎ পাইতাম, অথবা তাঁহার পুস্তক বা প্রবন্ধাদি পাঠ করিতে পারিতাম তাহা হইলেও তখন তাঁহার শিষ্য হইতাম, কিনা এই প্রশ্ন আমার মনে কখন ২ উদয় হইয়াছে। আমার বোধহয় হইতাম না। কারণ, তখনও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দীপ্তিতে আমার চক্ষু ঝলসিত, তখনও আমি খুবই অহমিকা পূর্ণ, বিতণ্ডাপ্রিয়, নিন্দাপ্রশংসায় বিচলিত, নিজের ভাবেই প্রমত্ত।" অতএব ইহা সত্য যে অধ্যাত্ম বিদ্যালোচনার অবসর তখনও তাঁহার আইসে নাই।

যাহা হউক, কর্ম্ম স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অতঃপর তিনি "সামাজিক সাম্যবাদ (Socialism) মতের আন্দোলনে যোগদান করিলেন। ব্রাড্‌ল ইহার পক্ষপাতী ছিলেন না। সামাজিক সাম্যবাদের সহিত পরকালে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোন সংশ্রব নাই, সুতরাং ইহকালবাদী সভার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট যোগ পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিল। সামাজিক সাম্যবাদের মূলমন্ত্র এই যে মূলধন (Capital), পরিশ্রম (Labour) এবং জমি (Land) এক সাম্যতন্ত্রের অধীনে আনয়ন এবং ঐ সকলের যথোপযুক্ত বিভাগ দ্বারা সমাজস্থ সকলের দুঃখ দারিদ্র্য মোচন। বেসান্ত তাঁহার সামাজিক সাম্যবাদের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ—

"কোন জাতির মহত্ত্ব উহার বড় বড় মহাজনদিগের উপর, বড় বড় মূলধনীদিগের

উপর, অথবা বড় বড় সম্ভ্রান্ত জমিদারদিগের বিলাস বৈভবের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে দারিদ্র্যের অভাব, আপামর সাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তার, সকলের জীবনে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সমতার উপর জাতীয় মহত্ব নির্ভর করে। প্রত্যেকের অংশেই প্রচুর কর্ম্ম, প্রচুর বিশ্রাম প্রচুর স্ফূর্ত্তি চাই ;—কাহারও ভাগ্যে খুব অল্প, কাহারও ভাগ্যে খুব বেশী নহে। ইহাই সামাজিক সাম্যবাদীর আদর্শ। ইত্যাদি।"

বেসান্ত এই আদর্শের সফলতার জন্য কঠিন পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি সুপ্রসিদ্ধ W. T. Stead মহোদয়কে পৃষ্ঠপোষক রূপে প্রাপ্ত হয়েন। বেসান্ত নাস্তিক, ষ্টেড স্বধর্ম্ম বিশ্বাসী। কিন্তু উভয়ের সাম্যবাদের আদর্শ এক। উভয়েই উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে এমন এক ভ্রাতৃ-সঙ্ঘটনের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, যাহার উদ্দেশ্য বিশ্বমানবরূপ খ্রীষ্টের উপাসনা। উভয়েই চাহেন এমন এক মন্দির প্রস্তুত করিতে, যাহাতে বিশ্বমানবরূপ দেবতার পূজা হইবে —অপর মন্দিরে যেরূপে ঈশ্বরের পূজা হয় সেইরূপ বিশ্বাস ও প্রেমের সহিত। নির্ব্বাক কোটী কোটী দরিদ্র নরনারীর অবস্থা উন্নয়নের জন্য উভয়ে মিলিয়া "Link" নামক একখানা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত করিলেন। এইরূপে বেসান্ত একদিকে ব্রাড্‌ল সাহচর্য্যে ঈশ্বরনাস্তিবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে ষ্টেড্‌ সাহচর্য্যে ঈশ্বরের স্থানে বিশ্বমানবকে বসাইয়া দরিদ্রের সেবা করিতে এবং জাতীয় জীবন হইতে সুখ দুঃখের তারতম্য ঘুচাইতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। শ্রমজীবী সম্প্রদায় তাঁহার অঙ্গুলী সঙ্কেতে পরিচালিত হইতে লাগিল। কোন কোন কারখানায় তাহারা ধর্ম্মঘট করায় দেশময় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। অচিরেই বেসান্তের কারারুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হইল। কিন্তু তিনি অটল রহিলেন।

এই সকল কার্য্য কোলাহলের মধ্যেই কিন্তু তাঁহার জীবন নাট্যে এক অদ্ভুত পট পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইতে লাগিল। তিনি সময় সময় ভাবিতে লাগিলেন তাঁহার অনুসৃত বিশ্বমানব পূজারূপ দার্শনিক মত অর্থ নীতিক গণনায় অতি উত্তম হইলেও যেন সম্পূর্ণ নিখুঁৎ নহে,—যেন জীবনতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের ভিতর তাঁহার অজ্ঞাত অনেক বিষয় পড়িয়া আছে। সেই সময়ে চারিদিকে আলোচিত ও অনুষ্ঠিত অনায়াত্ব লিখন (antomatic writing), সম্মোহনবিদ্যা (Mesmerism Hypnotism), প্রেতবিদ্যা (Spiritualism) সংক্রান্ত ক্রিয়ায় এত পরীক্ষিত ঘটনার বিবরণ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল যে তিনি তাহাতে একান্ত বধির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। রাশি রাশি প্রশ্ন,সমাধানের জন্য তাঁহার চিন্তা দ্বারে আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু এপর্য্যন্ত তিনি যে যে মতের অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহার কিছুতেই সে সকল প্রশ্নের সমাধান হইল না। তিনি নানা গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে সিনেটকৃত "রহস্য-জগৎ" (Occult world) নামক পুস্তকপাঠে সমধিক তৃপ্ত হইলেন। তিনি মনস্তত্ত্ব সংক্রান্ত কোন কোন বিষয়ে নিজে পরীক্ষা করিয়া যে যৎকিঞ্চিৎ ফললাভ করিলেন, তাহাতে তাঁহার অনুসন্ধান প্রবৃত্তি সাতিশয় উদ্রিক্ত হইল। একদিন তিনি একাকিনী গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া বসিয়া

আছেন। এই জীবন প্রহেলিকার সমাধান কোথায়? ইহাই তাঁহার চিন্তার বিষয়। মীমাংসা করিতে তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, অধ্যয়ন অভিজ্ঞতা,—সব পরাজিত হইল, তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। এমন সময় কাহার বাণী তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি শুনিলেন,—"হতাশ হইও না, আলোক নিকটবর্ত্তী!" বেসান্ত লিখিয়াছেন, এহেন পবিত্রতম শব্দ পূর্ব্বে আর কখনও তাহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। শুধু কর্ণেই প্রবেশ করিয়াছিল কি? বোধ হয় উহা তাঁহার 'মরমে পশিয়াছিল।' ভগবানের কৃপাবল, মহাজনের আশীর্ব্বাদ-বল, জন্মন্তরীন স্কৃতি-বল, প্রকৃতির নিয়ম বল, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশবল, যাহাই বল,—সরল তীব্র অনুরাগী অনুসন্ধিৎসুর নিকট আলোক বেশীদিন গুপ্ত থাকিতে পারে না। এই ঘটনার এক পক্ষান্তে মিঃ ষ্টেড্ দুইখণ্ড "সিক্রেট ডক্‌ট্রিন" (Secret Doctrine) গ্রন্থ সমালোচনার্থ বেসাণ্টের হস্তে সমর্পণ করিলেন। এই গ্রন্থ পড়িয়া তাঁহার কি ভাবান্তর হইল, ইহা তাঁহার নিজের কথায় শুনুন—

"Home I carried my burden and sat me down to read as I turned over page after page, the interest became absorbing, But how familiar it seemed, how my mind leapt forward to presoge the conclusions, how natural it was, how coherent, how subtle, yet how intelligible......all my puzzles riddles, problems seemed to disappear." Vide Mrs. annie Besant's antobiograply.

অর্থাৎ—"পুস্তক ভার বহন করিয়া আমি বাড়ী আসিলাম, ও পড়িতে বসিলাম। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা যতই অতিক্রম করিতে লাগিলাম, পরিবর্দ্ধিত কৌতূহল ততই চিত্ত মন অধিকার করিতে লাগিল। কেমন স্বাভাবিক যুক্তিযুক্ত কেমন সামঞ্জস্য পূর্ণ, কেমন সূক্ষ্ম তত্ত্বগর্ভ, অথচ কেমন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যান। আমার সমস্ত সংশয়, তর্ক, প্রশ্ন একে একে তিরোহিত হইতে লাগিল।"

তিনি সমালোচনা লিখিলেন, এবং মিঃ ষ্টেডের নিকট হইতে এক খানা পরিচয় পত্র লইয়া ব্লাভাস্কির সাক্ষাৎ উদ্দেশে চলিলেন। বেসান্তের বিদ্যাবত্তা, মার্জ্জিত বুদ্ধি এবং গভীর জনহিতৈষণার কথা ব্লাভাস্কি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন,এবং তজ্জন্য তিনি তাহার প্রতি প্রীতির ভাবই পোষণ করিতেন। সাক্ষাৎ হইল। ব্লাভাস্কি তাঁহার অভ্যাস মত সিগারেট পাকাইতে পাকাইতে তাঁহার ভ্রমণের এবং নানা দেশ দেশান্তরের গল্প গুজব করিতে লাগিলেন, কিন্তু উহার ভিতর তাঁহার সমিতি সম্বন্ধে একটি কথাও ছিল না। বেসান্ত যখন বিদায়ের জন্য গাত্রোত্থান করিলেন, তখন ব্লাভাস্কি একবার তাঁহার সেই উজ্জ্বল, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি বেসান্তের নেত্রের উপর স্থাপন করিয়া বলিলেন,—"মিসেস্ বেসান্ত! তুমি যদি আমাদের মধ্যে আসিতে!" এই একটী বাক্যে, একটি অপ্রত্যাশিত কৃপা আহ্বানে, বেসান্তের চিত্ত আলোড়িত করিয়া, তাঁহার পূর্ব্ব সংস্কার জাগরিত করিয়া, যেন তাঁহার নিজ জনকে চিনাইয়া দিল। সেই স্বরে সেই বশঙ্করী দৃষ্টিতলে বেসান্তের চিত্তে প্রবল ইচ্ছা হইল যে তখনি তিনি ব্লাভাস্কির সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া ভক্তি প্রদর্শন করেন কিন্তু অমনি আবার মনে মনে লজ্জিত হইলেন

ব্রাডলা, ষ্টেড প্রভৃতি মহারথীর সহযোগিনী প্রখ্যাতনাম্নী জননায়িকা বেসান্ত কি ব্লাভাস্কির নিকট অবনত হইবেন! এবার আত্মাভিমান পরিপন্থী হইল। ব্লাভাস্কির নিকট বেসান্তের চিত্ত অপরিজ্ঞাত রহিল না। কিছুদিন পরে তিনি এক সময়ে বেসান্তকে এই ব্যাপার স্মরণ করাইয়া বলিয়াছিলেন,—"বৎসে! তুমি দারুণ অভিমানিনী!"

তিনি আর একবার ব্লাভাস্কি সহ সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, এবার তিনি নিজেই পরাবিদ্যা সমিতি সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিলেন, ব্লাভাস্কি ইহার কোন উত্তর না দিয়া বেসান্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি আমার সম্বন্ধে S. P. R. এর (পূর্ব্বোক্ত লণ্ডনস্থ সাইকেল সভার) রিপোর্ট পড়িয়াছ কি?

বেসান্ত।—না, আমি কখন শুনি নাই।

ব্লাভাস্কি।—তবে যাও, সেই রিপোর্টখানা পড়। তার পর—রিপোর্ট পড়িয়া—যদি এখানে আবার আসিতে ইচ্ছা কর,—ভাল!

এ সম্বন্ধে আর একটি কথাও তিনি বলিলেন না। বেসান্ত বাড়ী গিয়া রিপোর্ট পড়িলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী বেসান্তের পক্ষে উহার অসারত্ব বুঝিতে বিলম্ব হইল না তিনি লিখিয়াছেন:—"এই রিপোর্টের সকল সিদ্ধান্তই কুলম দিগের সত্যবাদিতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু তাহারা প্রবঞ্চনা কার্য্যে আত্ম স্বীকৃত সহকারী' আমি সে দিন যাঁহার চক্ষে শিশুর সরলতা, সাধুতা, ও নির্ভিকতা দেখিলাম, যাঁহার উন্নত, আত্মমর্য্যাদা বিশিষ্ট, তেজ সম্পন্ন সত্য নিষ্ঠা নিরত প্রকৃতির কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয়ে বিমুগ্ধ হইলাম,—আমি কি তাঁহার চরিত্র ঐ রিপোর্টের অসার উক্তির দ্বারা পরীক্ষা করিব? 'সিক্রেট ডকট্রিন' গ্রন্থের লেখিকা কি সেই রিপোর্ট বর্ণিত নীচাশয় প্রতারক, অধম ঘৃণ্য জীব? ......আমি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলাম, এবং ঐ রিপোর্ট দূরে নিক্ষেপ করিলাম।"

পর দিবস (১০ ই-মে, ১৮৮৯ সাল) তিনি ব্লাভাস্কি সহ সাক্ষাতের পূর্ব্বেই একেবারে সমিতির কার্য্যালয়ে গিয়া সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন। তৎপর ব্লাভাস্কির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবনত মস্তকে ভক্তির চিহ্ন স্বরূপ তাঁহাকে চুম্বন করিলেন!

ব্লাভাস্কি।—তুমি সমিতিতে যোগদান করিয়াছ?

বেসান্ট।—হাঁ।

ব্লাভাস্কি।—তুমি রিপোর্ট পড়িয়াছ?

বেসান্ত।—হাঁ।

ব্লাভাস্কি। তার পর?

বেসান্ত নতজানু হইয়া ব্লাভাস্কির হস্ত-ধারণ করতঃ তাঁহার মুখের দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—"আমার উত্তর এইযে আপনি কি আমাকে আপনার শিষ্যা রূপে গ্রহণ করিবেন এবং আপনাকে আমার উপদেষ্ট্রী বলিয়া জগৎ সমক্ষে ঘোষণা করিবার সম্মান দান করিবেন।"

ব্লাভাস্কির চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে বেসান্তের মস্তকোপরি হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন,—

"তুমি একজন উচ্চহৃদয়া রমণী। প্রভু তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

বেসান্ত তদবধি ব্লাভাস্কির পদাঙ্কানুসরণ করিয়া অধ্যাত্ম বিদ্যার আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাহার পরবর্ত্তী কার্য্যাবলীর বর্ণনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতামালা, গভীর চিন্তা ও তথ্যপূর্ণ

অসংখ্য পুস্তক প্রবন্ধ ইহার যথেষ্ট সাক্ষ্যদান করিতেছে। ইদানীং এই শ্বেতাঙ্গিনীর ক্ষৌমবস্ত্র পরিহিতা, রুদ্রাক্ষধারিণী, ব্রহ্ম-বিদ্যা ব্যাখ্যা কারিণী মূর্ত্তি অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মহামনা অলকটের দেহান্তে বেসান্তই পৃথিবীব্যাপী সমিতির সভ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক সভাপতিরূপে মনোনীত হইয়াছেন। ইহাতেই তিনি স্বীয় দক্ষতা ও কার্যাকুশলতা দ্বারা সকলের শ্রদ্ধা কতদূর আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা বুঝা যায়। তিনি ভারতবাসীর—বিশেষতঃ হিন্দুজাতির—শিক্ষা ও অবস্থার উন্নতির জন্য সতত যত্নবতী। রাজনীতিক্ষেত্রে সকলের সহিত তাহার মত না মিলিলেও, তিনি ভারত-বর্ষের উন্নয়নের জন্য আপন বুদ্ধি অনুযায়ী সদুদ্দেশ্যে কার্য্য করিতেছেন,—ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। তাঁহার জীবনে দুইটী লক্ষ্য করিবার বিষয় দেখা যায়। প্রথমতঃ তিনি যখন যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, তখনি তাহাতে একেবারে কায়মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন। অনেকেই মনে মনে সৎকার্য্য করিবার ইচ্ছা পোষণ করে, কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করে কয়জন? বেসান্তের যেমন ইচ্ছা, অমনি কার্য্য,—ইহাতে যতই বাধা, বিপত্তি, ভয়ের কারণ থাকুক না কেন। তিনি তাঁহার আত্ম জীবন চরিতের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"দুর্ব্বল চিত্ত ব্যক্তিরা বলিয়া থাকে 'অমুক কার্য্যটি করা কর্ত্তব্য, কিন্তু আর কেহ করুক, আমি কেন করিব! আগ্রহশীল কর্ম্মী, যিনি কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য বিপদের সম্মুখীন হইতেও কুণ্ঠিত নহেন, তিনি বলেন,—অমুক কার্য্যটী করা কর্ত্তব্য, অতএব আমিই কেন না করিব? এই দুইটী বাক্যের মধ্যে, নৈতিকক্রম বিকাশ পথে, মানবের কত শতাব্দী কাটিয়া যায়।" উচ্চতর কর্ত্তব্যের জন্য শেষোক্ত কর্ম্ম কিরূপে আত্মোৎসর্গে ধাবিত হয়, বেসান্তের জীবন ইহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ। দ্বিতীয়তঃ, তিনি যখন যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা কখন কখন ভ্রান্তমত সঙ্কুল হইলেও, উহার প্রত্যেকটির মূলে জন হিতৈষনা বর্ত্তমান। তাঁহার মলথুসিয়ান' মত, 'সামাজিক সাম্যবাদ' প্রভৃতি সমস্তই হিতৈষণা দ্বারা প্রণোদিত। ইহা তাঁহার জীবনের একটি বিশেষত্ব।

ব্লাভাস্কি যখন বেসান্তের সামাজিক দুঃখ দারিদ্র্য মোচনোদ্দেশ্যে উদ্ভাবিত বংশবৃদ্ধি নিবারক উপায় উপদেশের কথা শুনিলে, তখন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে উহা কতদূর অসম্পূর্ণ তাহা বুঝাইলেন। ব্লাভাস্কি এ সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, বেসান্ত নিম্নলিখিতরূপে তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন :—

"তুমি যে প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়াছ উহা আধিভৌতিক উপায় মাত্র। কিন্তু যে রোগের মূল রহিয়াছে অধ্যাত্ম-ক্ষেত্রে, তাহার মূলোচ্ছেদ উক্ত উপায়ে হইতে পারে না। উহার প্রতিকারের একমাত্র উপায় নর-নারীর প্রবৃত্তি সংযম। সংযম অভ্যাস করিতে করিতে তাহারা ক্রমে ক্রমে উচ্চতর চিন্তাপ্রসূ মস্তিস্ক ও দেহ লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবে—তাহাতেই দুঃখ নিবৃত্তি হইবে।"

বেসান্তের বৈজ্ঞানিক উপায়ে অন্ততঃ লোকের দুঃখ কষ্টের সাময়িক প্রতিকারও হইতে পারে তিনি ইহা বলিলে, ব্লাভাস্কি উত্তর করিলেন :—

দৃষ্টি বর্ত্তমান ছাড়াইয়া একটু দূর প্রসারিত করিয়া দেখ,—দেখিতে পাইবে প্রত্যেক জন্মের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ ক্লেশ পুনঃ পুনঃ আসিবে, যতদিন না দুঃখের আশায় যে প্রবৃত্তি তাহা তিরোহিত হয়। হে তত্ত্ব-বিদ্যার্থি! তোমার পক্ষে এরূপ কার্য্য উচিত নহে, যাহাতে দুঃখ প্রকৃতপক্ষে দূরীভূত না হইয়া চিরস্থায়ী হয়। প্রবৃত্তি দমন নাই, সংযম নাই, অথচ কৃত্রিম বৈজ্ঞানিক উপায়ে জনসংখ্যা হ্রাস চেষ্টা,—ইহাতে কখনও স্থায়ী মঙ্গলের আশা নাই। সম্পূর্ণরূপে প্রবৃত্তি জয় করিতে হইবে, কামকে স্নেহপূত আত্মত্যাগমূলক প্রেমে পরিণত করিতে হইবে,—তাহা হইলে মানব এমন উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে যে তাহার প্রত্যেক মানসিক ও দৈহিক বৃত্তি কেবল পরিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ইঙ্গিতেই পরিচালিত হইবে। তবেই মানবজাতির মঙ্গল, অন্য উপায় নিস্ফল।" বেসান্তের চিত্তের ভ্রম বিদূরিত হইল। তিনি তাঁহার "Laws of Population" গ্রন্থের পুনর্মুদ্রন বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং উহার কাপি-রাইট (Copy right) বিক্রয় করিতেও অস্বীকৃত হইলেন। ইহ-সর্ব্বস্ববাদ প্রভৃতি মত সমস্তই তাঁহাকে বিসর্জ্জন করিতে হইল। তাঁহার শ্রদ্ধাভাজন সহযোগী ব্রাড্‌লার সহিত আর মিলিয়া কার্য্য করিতে পারিলেন না। ব্রাড্‌ল্ গভীর দুঃখের সহিত বেসান্তের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিলেন। যাঁহারা এতদিন সম্পদে বিপদে তাঁহার পৃষ্ঠপোষণ করিয়া আসিতেছিল, যাঁহারা এতদিন তাঁহার নেতৃত্বের মুখাপেক্ষা করিয়া নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই সুহৃদ, অনুচর, সহ-যোগীদিগের নিকট বিদায় লইতে তাঁহার হৃৎপিণ্ড ছিন্ন হইল। কিন্তু বেসান্তের কর্ত্তব্য পথ এক্ষন নব আলোকে প্রদীপ্ত। তিনি আর কিরূপে অবিশ্বাস, সংশয়, অজ্ঞানতার অন্ধকারে বিচরণ করেন।

যিনি এইরূপে জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় তাঁহার চক্ষু উন্মীলিত করিলেন, তাঁহার নিকট যে তিনি গভীর কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি? তিনি ব্লাভাস্কির সঙ্গলাভ করিয়া, তাঁহার অসাধারণ প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া লিখিয়াছেন—

"আমরা সর্ব্বদা তাঁহার পার্শ্বে পার্শ্বে থাকিতাম,—আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার চরিত্র পরীক্ষা করিবার অবসর পাইতাম। আমরা তাঁহার জীবনের নিঃস্বার্থময় সৌন্দর্য্যের তাঁহার চারিত্রিক মহত্ত্বের সাক্ষ্য দান করিতেছি। তিনি আমাদিগকে যে জ্ঞান দান করিয়াছেন, যেরূপে আমাদের জীবন পরিশোধিত করিয়াছেন, আমাদের চিত্তবল পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার চরণে আমরা সভক্তি কৃতজ্ঞতা উপহার দিতেছি। হে মহিয়সী রমণী! অন্ধ অজ্ঞ বাহিরের লোকেরা না বুঝিয়া তোমার প্রতি অন্যায় বিচার করিয়াছে। তোমার শিষ্যেরাও তোমাকে আংশিকরূপেই চিনিতে পারিয়াছে। তোমার নিকট আমরা যে কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ, জন্মে জন্মেও সে ঋণের শোধ করিতে পারিব না।"

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ।

৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(গৌহাটী বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদের শাখা সভাতে গঠিত শোক প্রস্তাব)

প্রস্তাব ঃ—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী প্রণেতা, বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবী ধর্ম্মপ্রাণ, ৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে গৌহাটিস্থ সাহিত্যপরিষদের শাখা সভা তাহাদের আন্তরিক গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে।"

বিগত ৭ই পৌষ সন্ধ্যায় ৫৯ বৎসর বয়সে, ৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই দিন সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে কার্য্যব্যাপদেশে তিনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে গমন করেন। এই যাত্রাই যে তাঁহার মহাযাত্রা হইবে, ইহা তিনি বা তাঁহার আত্মীয়স্বজনের কেহই স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। আশুবাবুর বাটী হইতে প্রত্যাগমন সময়ে ট্রামগাড়ী হইতে পড়িয়া তিনি গুরুতররূপে আহত হন। এই আঘাতই তাহার কাল হইল। সেই সন্ধ্যায়ই ভবানীপুরে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

এই দুর্ঘটনা তাহার আত্মীয়স্বজনকে কিরূপ শোকাকুলিত করিয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয়—লিখিয়া বুঝাইবার নহে। বিধাতার এ বিধান কেন হইল, তিনি জানেন। কিন্তু আমরা যখন চণ্ডীবাবুর এই আকস্মিক শোচনীয় পরিণামের কথা ভাবি এবং তৎসঙ্গে সাহিত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত তদীয় উপযুক্ত পুত্র ইন্দুপ্রকাশের লুসেটেনিয়া জাহাজের সমুদ্রগর্ভে মহাসমাধির কথা স্মরণ করি, তখন স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে একটী দারুণ মনস্তাপ অনুভূত হয়, হৃদয়ের অন্তঃস্থল যেন হাহাকার করিয়া উঠে তখন দৃঢ় বিশ্বাসীর মনেও বিধাতার এহেন বিধানের প্রতি একটা বিদ্রোহভাব জাগিয়া উঠে। উপর্য্যুপরি এইরূপ আকস্মিক শোকে চণ্ডীবাবুর পরিবার পরিজনেরা স্বতঃই অতিশয় বিহ্বল হইয়া পড়িয়া থাকিবেন। শোকের অংশী পাইলে শোকের তীব্রতা হ্রাস পায়। তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয় স্বজনকে আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, সমস্ত বঙ্গবাসী এই শোকে আজ তাহাদের অংশীদার। প্রত্যেকেই ইহাতে তাহাদিগকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।

সাহিত্যকে অনেকে অনেকভাবে সেবা করিয়া থাকেন। কেহ সখের জন্য, কেহ অর্থের জন্য, কেহ বা নামের জন্য সাহিত্যের সেবা করেন। কিন্তু আমার মনে হয় তিনিই যথার্থ সাহিত্যিক, যিনি প্রাণের টানে সাহিত্যের সেবা করেন, যিনি সাহিত্যকে প্রাণের মর্ম্ম করিয়া নিতে পারেন। চণ্ডীবাবু ঠিক এই শ্রেণীর সাহিত্যিক ছিলেন। তিনিই বলিয়াছেন—"সাহিত্যের বহুমূল্য মণিমুক্তা-চয়কে সংসারের অকিঞ্চিৎকর পণ্যদ্রব্যে পরিণত করা যাহাদের ব্যবসায়, তাহাদের নিকট আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি কোন প্রত্যাশাই রাখে না। যাঁহারা সাহিত্য-ক্ষেত্রে এতদপেক্ষা উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়া পবিত্র ও উদার সাহিত্যিক ধর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করেন, আমি ভিখারীর ন্যায় বিনীতভাবে তাঁহাদের দ্বারে দণ্ডায়মান। তাঁহাদের প্রদত্ত তিরস্কার পুরস্কার দুই'ই আমার সমান আদরের সামগ্রী।"

চণ্ডীবাবু বঙ্গভাষায় বহুতর গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ,

তৎপ্রণীত "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী"। এইরূপ উপাদেয় গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অতি বিরল। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন "চণ্ডীবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বস্‌ওয়েল (Boswell)" যদি তিনি একখণ্ড বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনীই লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিত। কিন্তু এতদ্ভিন্নও তিনি অনেকানেক মনোরম সামাজিক উপন্যাস ও প্রবন্ধাদি লিখিয়া বঙ্গভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ইহাদের মূল্যও নিতান্ত সামান্য নহে।

শিক্ষা ও সমাজ এবং ধর্ম্মসংস্কার তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল। তৎপ্রণীত গ্রন্থাবলীতে ইহার সম্যক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কি প্রকারে সন্তানদিগকে মানুষ করিতে হয়, তৎপ্রণীত 'মা ও ছেলেতে' তাহা অতি বিশদ্‌ভাবে দেখাইয়াছেন। অন্যান্য ভাষায় এই শ্রেণীর বহু বহু গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্গভাষায় এই প্রকার গ্রন্থের সংখ্যা অতি সামান্য। "গৃহলক্ষ্মী" ও 'সন্তান শিক্ষা' অনেকটা এই শ্রেণীর গ্রন্থ বটে। আমি আপনাদের প্রত্যেককে ঐ গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

বঙ্গবিধবাকুলের প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। হইতে পারে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী লেখক বলিয়াই এই ভাব তাহার হৃদয়ে বিশেষভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল অথবা এই ভাব হৃদয়ে ছিল বলিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূত জীবনী তাঁহাকে অতিশয় চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। এই কার্য্যকারণ সম্পর্ক যাঁহারা তাঁহাকে বিশেষ ভাবে জানেন তাঁহারাই বলিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠে ইহা নিশ্চয়-রূপে উপলব্ধি হয়, বঙ্গবিধবাদিগের করুণ কাহিনী তাঁহাকে অতিশয় ব্যাকুল করিয়াছিল। তৎপ্রণীত "দুখানি ছবি" "মনোরমার গৃহ" "কমলকুমার" প্রভৃতি উপন্যাসের বিধবা চরিত্রের প্রাধান্য ইহার পরিচায়ক।

ধর্ম্মজীবনে তিনি অনেকটা উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন এবং যাহাতে অপরেরাও উন্নত হইতে পারে তদুদ্দেশ্যেই বোধ হয় "পাপীর নব-জীবনলাভ" প্রনয়ণ করেন। উহা অনেকটা তাঁহার আত্ম-জীবনী বলিয়া বোধ হয়। বিবিধ প্রকার প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে অনবরত সংগ্রাম করিয়া, সৎ ও সাধু সঙ্গলাভদ্বারা তাঁহারই ধর্ম্ম-জীবনের পরিচয় যেন উহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'কমল-কুমার নামক গ্রন্থের পরিণতিও অনেকটা উঁহারই ছায়া বলিয়া মনে হয়। সাহিত্যের এহেন একনিষ্ঠ সেবক ধর্ম্মপ্রাণ চণ্ডীবাবুর শোচনীয় অকালমৃত্যুতে আমরা সকলেই মর্ম্মাহত। ভগবান তাঁহার পূত আত্মার ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের শান্তি প্রদান করুন।

শ্রীআনন্দকিশোর দাস।

—০—

সমবায় (১)।

কৃষি-শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে দুই উপায়ে করিতে হইবে। প্রথমতঃ সমবায় (Co-operation) প্রথানুযায়ী, দ্বিতীয়তঃ চলিত যৌথ (Joint stock) প্রথানুযায়ী, দুইই যৌথ চেষ্টার ফল। যাহাতে উভয় প্রণালীগত উক্ত দুই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে তজ্জন্য গভর্ণমেণ্ট এক্ষণে দুইটী আইন প্রনয়ণ করিয়াছেন। একটী Co-operative Societie's Act অপরটী Joint stock Company's Act. শেষোক্তটী পাশ্চাত্য নিয়মানুযায়ী বহু পূর্ব্বে প্রচলিত হইয়াছিল এবং প্রথমোক্তটী ১৯০৪ সালে এক মেটে মত প্রণীত হইয়া ১৯১২ সালে দোমেটে মত প্রস্তুত হইয়া প্রচলিত হইয়াছে।

ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত যে বৃহৎ কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে হইলে যৌথ চেষ্টার আবশ্যক। যেমন ব্যষ্টি লইয়া পরিবার, পরিবার লইয়া গ্রাম, গ্রাম লইয়া জনপদ, জনপদ লইয়া রাষ্ট্র তদ্রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূলধন লইয়া বৃহত্তর মূলধনের সৃষ্টি হইয়া বৃহত্তর কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু যদিও উভয়ই একই যৌথ চেষ্টার ফল তথাপি উভয়ের মধ্যে কি কোন্ পার্থক্য নাই?

সমবায় চেষ্টার (Co-operation) ফলে ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে কৃষি-শিল্পাদি এমন কি রাষ্ট্রাদি গঠিত ও পরিচালিত হইয়া উন্নতির চরম সীমায় আরূঢ় হইয়াছিল। নানা কারণে সেই সমবায় নষ্ট হওয়ায় কৃষি শিল্পাদির সহিত জ্ঞান বিজ্ঞানাদির অবনতি ঘটিয়াছে। [illegible] লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিতে হইলে [illegible]দের কোন প্রথার অনুসরণ করিতে হইবে তাহাই মাত্র বিবেচ্য।

বর্ত্তমানে আপাত চাকচক্যময়ী যৌথ প্রণালী—যাহাকে আমরা Joint stock বলিব তাহাই—অনুসরণের না বাহ্যাড়ম্বর শূন্য সমবায় বা Co-operation অবলম্বন করিব? ইহার মীমাংসা বড়ই দুরূহ। বর্ত্তমানে যাঁহারা রাতারাতি বড়মানুষ হইতে চাহেন তাঁহারা হয়ত যৌথ প্রণালী (Joint stock) অবলম্বনীয় বলিবেন। আবার কেহ কেহ হয়ত সমবায় (Co-operation) অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিবেন। অনু-রোধ" বলিতেছি এইজন্য যে সমবায়ে স্বার্থ ও ত্যাগ উভয় সমভাবে বর্ত্তমান, অথচ যৌথ প্রণালীতে স্বার্থমাত্র লেখক দেখিতে পাইতেছেন।

স্বার্থ নানা প্রকার। স্বার্থের প্রাচুর্য্যে বর্ত্তমানে সমবায় অচল। সম্পূর্ণ অভাবেও তাহাই। কারণ লোকের সেই অবস্থা হইলে সে সংসার-ধর্ম্ম পালন করিবে কেন? সে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া পরহিতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিবে। সমবায় (Co-operation ও যৌথ প্রণালী (Joint stock) সংসারধর্ম্ম পালনার্থ। সংসারধর্ম্মে দেবভাব ও অসুরভাব থাকিবেই। এই দেবাসুর ভাবের সমন্বয়ে সংসারধর্ম্ম। অসুরভাবে ঘোর সংসারী, দেবভাবে সন্ন্যাসী। সংসারধর্ম্মে উভয়ের সমতা হইলে সমবায় (Co-operation) তাই বলিতেছি যে সমবায়ে স্বার্থ ও ত্যাগের সমভাব (Balance) ইহাতেই সংসার চলিতেছে।

সমবায়ের মূলে আমরা আরও একটী জিনিষ দেখিতে পাই। সেটি ব্যষ্টি হীনতা। ব্যক্তিত্ব লোপ করিবার শিক্ষাই সমবায়ের প্রতিষ্ঠা। আজকালকার দিনে কি কেহ

তাহা স্বীকার করিবেন? করিবেন না বলিয়াই ত এই শ্রেণীর লোকে যৌথ প্রণালীকে প্রশংসা করিবেন এবং সমবায়কে পায়ে ঠেলিবেন। অথচ সমাজের প্রকৃত উপকার মাত্র "সমবায়ে" সম্ভব, যৌথ-প্রণালীতে নহে। ইহার উপায় কি?

উপায়—শিক্ষা ও আদর্শ, ফল বর্ণাশ্রম।

শ্রীজগদিন্দ্র দেবরায়কত।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

উষা।

(ঋগ্বেদ। ১ মণ্ডল, ৪৮ ও ১২৩ সূক্ত)।

হে দেব-দুহিতা উষা! কর আগমন
উজলিয়া দশ দিক্। দেহ, দেবি, ধন,
দেহ অন্ন; সুপ্রভাত কর বিভাবরী।
দানশীলা পুণ্যবতি, এস দয়া করি।
কুবের ভাণ্ডার তব, কর উদ্‌ঘাটন
দ্বার তার; মৃদুভাষে কর আলাপন
জাগায়ে প্রাণের মম ঘুমন্ত চেতনা।
অনন্ত দিগন্ত কোলে তোমার সাধনা
সার্থক হউক আজি দেবি; লভিবারে
বিপুল রতন-রাজি, ধন-লুব্ধ নরে
যেরূপ সাগরবক্ষে সাজায়ে তরণী
করে যাত্রা, সেইরূপ তুমিও হে রাণি,
চড়িয়া কিরণ-রথে জাগায়ে দ্যুলোক,
এস ছড়াইয়া দেবি অমৃত পুলক।
এস দেবি, এস রাণি, কর আগমন;
গৃহ-অধিষ্ঠাত্রী নেত্রী গৃহিনী মতন
পালন কর গো সবে। তব আগমনে
স্থাবর জঙ্গম প্রাণী পুলকিত মনে
নমিছে চরণ-প্রান্তে; শ্রান্ত পান্থজন
নিশীথ-বিরাম শেষে ছাড়িয়া আশ্রম
চলিল আপন পথে; নীড় ছাড়ি পাখী
উড়িল গগন-পথে তব জ্যোতি দেখি
অন্বেষণ করিবারে দিনের আহার।
হে নীহার-রাণি, খোল তোমার দুয়ার
স্নিগ্ধ জ্যোতি ব্যাপ্ত কর দীপ্ত চরাচরে।
পদ্ম হস্ত বুলাইয়া শুভ্র ধরা শিরে
হাস দেবি; হেরি হাসি মৃত্যু-ভীত জন
আয়ুশেষ হ'ল বলি' করুক্ ক্রন্দন।
লাজ-রক্ত-বাসে রঞ্জি' বিপুল পুলকে
অবগুণ্ঠনের কুণ্ঠা মুক্ত হয়ে সুখে
এল শুভ্র উষা-রাণী; কালিমা-আঁধার
ত্রস্ত হয়ে কালীমুখ লুকাল তাহার।
পশ্চাতে সবিতাদেব জ্যোতির্ম্ময় রথে
দিল দেখা; হেন স্ত্রৈণ কে আছে জগতে?
হেরিয়া স্বামীর চেষ্টা, কৌতুকে যুবতী
মৃদুহাসি রাঙ্গা-পদে করিল প্রণতি।
সোহাগে খুলিয়া গেল বক্ষের বসন।
দীপ্ত অনুরাগে বদ্ধ প্রেম-আলিঙ্গন।
পতি-উষ্ণ-বক্ষে সতী মুখ লুকাইয়া,
ধীরে ধীরে জ্যোতি মাঝে গেল মিলাইয়া।
জগৎ বিস্ময়ে মরি নমিল চরণে,
পড়িল প্রাণের সাড়া এ মহামিলনে।

দয়রেশ।

বাল-বিধবা।

বিধাতা গড়েছে বিশ্ব, তোরা তায় পবিত্রতা;
দগধ কাঞ্চন তোরা স্বরগের ছিন্নলতা।
বিষ্ণুর-চরণরেণু চিরশুদ্ধ নিরমল,
শিবের মাথার দিব্য জটাবাহি গঙ্গাজল।
শক্তির নয়ন বিভা জ্বলিছে তোদের মাঝে,
(তাই)ঘরে ঘরে বিরাজিছে নিষ্কাম সকল কাজে।
প্রভাতের শুকতারা, সায়াহ্নের শান্ত হাস,
হেথায় আছিস্ মাতা বেদনা করিতে নাশ।
অন্তরে স্নেহের ধারা, অমিয় তোদের মুখে,
পরশে ভকতি ফোটে নিখিল ধরার বুকে।
কঠোর সংযমে মাগো বেঁধেছ বাসনা সিন্ধু,
গৃহে পুণ্য-জ্যোতি জ্বেলে বাঁচায়ে রেখেছ হিন্দু।

শ্রীপ্রিয়কান্ত সেনগুপ্ত।

জনক।

তুমি ধর্ম্ম, তুমি স্বর্গ; তব সাধনায়
দেবের (ও) দেবতা প্রীত সুখী অতিশয়।
তুমি যে গো মহাভাগ তাঁরি একভাগ
সন্তান লাগিয়া জন্ম লয়েছ ধরায়।
জননীর (ও) গুরু তুমি, গৃহের নিয়ন্তা
সন্তানের কাছে সদা প্রত্যক্ষ দেবতা।
তোমার কাহিনী বাক্যে হয় কি কথিত?
জন্মদাতা শিক্ষাদাতা তুমি যে গো পিতা।
দেবাদর্শে গড়া উচ্চ চরিত্র তোমার
সন্তান তোমারি মাঝে হেরে পুণ্য-জ্যোতি
আকৃষ্ট উন্নতি-পথে; ঈশ্বর আদেশ
তোমার সেবায় হবে সন্তানের গতি।
অশোধিত ঋণ তব জীবনে জীবনে
আছে শুধু ভক্তি, তাই দিলাম চরণে।

শ্রীপুণ্যপ্রভা ঘোষ।

নির্ব্বেদ

১

জীবিতে মরার মত রহিতে বেদনা কত
কেমনে বুঝাব ভবে, কে রহে এমন?
আমারো সবার মত রহে মন প্রাণ-চিত,
চলিতে চরণ রহে, হেরিতে নয়ন।
লোহিত রুধির-ধারা বহে মোর দেহ-কারা,
রহে কর্ণ, রহে নাসা, যা'রহে সবার;
এত করিলেও দান, করিতে শকতি দান
যেন বা হইল ভুল, বিশ্ব-বিধাতার!
ধরা বুকে বোঝা মত রহি পড়ি অবিরত,
আমারে ডিঙ্গায়ে যায় কত মহাজন;
বেদনা চাপিয়া বুকে, রহি আমি অধোমুখে,
কে রহে আমার সম হেন অভাজন?

২

তোমারে হেরিয়া আজ, হে মহাশ্মশান-রাজ
ঘুমাতে বড়ই সাধ ও কোলে তোমার;!
তোমার পরশ লভি ঘুচিবে বেদনা সবি,
তুমি যে করুণাময়! প্রেমের আধার।
নাহি প্রাণে সাধ আর লও কোলে এইবার,
বিফলে জীবন যায় না রহে উপায়;
মাগি এই করযোড়ে, নিরাশ করোনা মোরে,
নাহি যে আমার ঠাঁই বিশাল ধরায়।

শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত।

বিদ্যাবিনোদ।

গত মাঘ মাসের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বাঁকীপুর-সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাস লেখার নাম করিয়া এমন অনেক কথা লিখিয়াছেন, যাহা তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির লেখা উচিত ছিল না। স্যর আশুতোষ এবং রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র

* এই কবিতাটী লেখিকার অন্তিম রোগ-শয্যায় লিখিত "বৈশাখী" নামক অপ্রকাশিত কাব্য হইতে সঙ্কলিত হইল।

সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার যথাযথ প্রতিবাদ করিতে হইলে অনেক কথা লিখিতে হয়। মহৎ ব্যক্তির নিন্দা করিলেও দোষ, শুনিলেও দোষ। আমি বাঁকীপুরে যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলাম, তাহাতে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় স্যর আশুতোষের "ইঙ্গিত" দেখিতে পাইয়াছেন; যেন আমার নিজের কোন সত্ত্বা নাই, অথবা ঐ প্রস্তাব আমি নিজে করিতে পারি না; স্যর আশুতোষের "ইঙ্গিতেই" করিয়াছি মাত্র। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় আমাকে এবং আমি তাঁহাকে অনেক দিন হইতে চিনি ও চিনেন। তথাপি তিনি এইরূপ অনুমান করেন। আমি যদি বলি, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়ের "ইঙ্গিতে" প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা কি তিনি ভালবাসিবেন? কেন বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কি স্বয়ং ঐ প্রবন্ধ লিখিতে পারেন না? শাস্ত্রী মহাশয়ের "ইঙ্গিত" আবশ্যক হইবে কেন? বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে বলিয়া রাখি, আমি এবারকার প্রস্তাব গত চারি পাঁচ বৎসর উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কোন কারণে উপস্থিত করি নাই; এবার সুসময় বোধ করিয়া উপস্থিত করিয়াছি। যদি বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ইহা বিশ্বাস করিতে আপত্তি না থাকে, তবে তিনি আমার সম্বন্ধে ঐরূপ লেখাতে অনুতপ্ত হইবেন, আশা করি; এবং ঐ বাক্য নব্যভারতের পর সংখ্যাতেই প্রত্যাহার করিবেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বন্ধে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় যত কথা লিখিয়াছেন, সবই সত্য; তথাপি আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য যে ভাবে গড়িয়া উঠা উচিত, জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের গতি যেদিকে চালিত হওয়া উচিত, সে সমস্ত প্রণিধান করিয়া কেহ যদি দীনেশবাবুকে তাঁহার কার্য্যের অধিকতর যোগ্য মনে করেন, তবে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সহিত মত ভেদ হইল, এই মাত্র; কিন্তু যিনি ঐরূপ মনে করেন, তাঁহার কুটিল অভিসন্ধি অনুমান করা সরল হৃদয়ের পরিচায়ক নহে। সকল কথাই বাঁকাইয়া একটা বদ মতলব বাহির করা সংকীর্ণ হৃদয়ের কার্য্য; বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে ত এভাবে কখনও জানিতাম না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রচলন উপলক্ষে যাঁহারা স্যর আশুতোষকে ধন্যবাদ দেন, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহাদিগের মত খণ্ডন করিতে পারেন নাই। স্যর গুরুদাস, সাহিত্য-পরিষদ, এমন কি বিদ্যাবিনোদ মহাশয় স্বয়ংও এবিষয়ে ধন্যবাদ পাইতে পারেন। তাহাতে কেহই আপত্তি করিবে না। কোন কার্য্যই এক কারণে হয় না। পূর্ব্ব হইতে নানা কারণ পরম্পরা মিলিত হইয়া একটী শুভ মুহূর্ত্ত আনয়ন করে। তখন যে মহাপুরুষ সেই শুভ মুহূর্ত্তের সুযোগ গ্রহণ করিয়া কোন কল্যাণকর অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করেন, তাঁহাকেই আমরা অব্যবহিত কারণ বলি। তিনিই সহস্র ধন্যবাদের যোগ্য, সন্দেহ নাই। তাঁহাকে পরিত্যাগ করা চলে না। যদি চলিত, তবে মহাত্মা রাজা রামমোহনরায়কেও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা সাহিত্য প্রচলনের কারণ বলা যাইত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কারণকে দূরবর্ত্তী কারণ বলিলে দোষ হয় না; কিন্তু অব্যবহিত কারণকে পরিত্যাগ করা যায় না। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে এই কথাটী প্রণিধান করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীশশধর রায়।

তাম্র-শাসনের অত্যুক্তি ইতিহাস নহে।

তাম্রশাসন ও শিলা-লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায়, সেনরাজগণ চন্দ্রবংশোদ্ভব ক্ষত্রিয়। কিন্তু তাম্রশাসন ও প্রস্তর ফলকাদি যেরূপ অত্যুক্তি দোষে পরিপূর্ণ, তাহাতে উক্ত তাম্রশাসনের বংশ-গৌরব-প্রশস্তি কখন বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণেতর জাতি রাজ্য লাভ করিলেই ক্ষত্রিয় সংজ্ঞা ধারণে উৎসুক হইতেন। সমসাময়িক ব্রাহ্মণগণও তাঁহাদের কামনা পূরণে কার্পণ্য প্রদর্শন করিতেন না। চারিশত বৎসর পূর্ব্বের নির্ভীক সমাজতত্ত্বজ্ঞ নুলোপঞ্চানন মহাশয়ও এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করিয়াছেন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন বৌদ্ধরাজা, জগন্নাথে কীর্ত্তি।
সাম্যবাদী, তবু বলায় ক্ষত্রিয়-বৃত্তি ॥
রাজা হলে রাজন্য, সেনাভাবে অন্যথা।
পতিত কাম্বোজাদি গৌড়ে ক্ষত্র যথা ॥

সম্বন্ধ নির্ণয়, ৩য় সংস্করণ। ৭৩৪। ৭৩৫ পৃষ্ঠা।

রাজাদিগের ক্ষত্রিয় হইবার বাসনা এতই বলবতী যে, ব্রহ্মদেশের উত্তরস্থ শান জাতীয় * অনার্য্য তিপ্রা জাতি ও ত্রিপুরা রাজ্য লাভ করিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইতেছেন, এবং ত্রিপুরপণ্ডিতগণ মুর্শিদাবাদের পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন দ্বারা চন্দ্রবংশীয় দ্রুহ্যু সন্তান † বলিয়া বর্ণিত হইতেছেন। পণ্ডিতগণ অবগত আছেন, যযাতি পুত্র দ্রুহ্যু ঋকবেদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক। তখন সমস্ত বঙ্গভূমি জলমগ্ন ছিল। এই সময়ে আর্য্যগণ পঞ্চনদভূমি ত্যাগ করিয়াছেন কিনা, গভীর সন্দেহের বিষয়। এ অবস্থায় দ্রুহ্যুকে ত্রিপুর রাজবংশের আদি পুরুষরূপে স্থাপন ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের দুরাশা মাত্র।

"৬৯৯ শকাব্দে স্থান রাজার ভ্রাতা শ্যামলুং মাগুয়াং নগরী হইতে দূত স্বরূপ ত্রিপুরায় আগমন করিয়াছিলেন, প্রত্যাগমন কালে তিনি মিতাই ভূমির (আধুনিক মণিপুর) মধ্য দিয়া গমন করেন। যে মণিপুরী অর্থাৎ মিতাইগণ অধুনা বব্রুবাহনের বংশধর (চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়) বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদানে গৌরবান্বিত হইয়া থাকেন, রাজকুমার শ্যামলুং সেই মিতাইগণকে কুকি জাতির ন্যায় উলঙ্গ নিতান্ত কদাচারী ও হীন অবস্থাপন্ন দর্শন করিয়াছিলেন"।

রাজমালা ২য় ভাগ, ৯।১০ পৃষ্ঠা।

উপরোক্ত তিব্বত ব্রহ্মজাতীয় মিতাইগণ ক্ষত্রিয় হইয়াছেন এবং ব্রাহ্মণগণ দ্বারাও তাহা প্রচারিত হইতেছে।

ক্ষত্রিয়ত্বের এতই মোহ যে, দ্বারবঙ্গাধিপতি ভূদেব ও সুসঙ্গাধিপতি ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রোচিত সিংহ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

এই সমস্ত কারণে তাম্রশাসনোক্ত সেন বংশের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মনে হয় না।

অধিকন্তু এক একখানি তাম্রশাসনের রচনা দেখিলেই ইহাকে স্তাবকগণের অযথা স্তুতিবাদ ভিন্ন কিছুই বলা যায় না। কেশবসেনের তাম্রশাসনে তাঁহাকে "অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি রাজ্যত্রয়াধিপতি" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সকলেই জানেন, কেশব সেন মাত্র পূর্ব্ব বঙ্গের কিয়দংশে কিছুদিন সামান্যভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি অশ্বপতি, নরপতি, গজপতি রাজ্যের মুখ কোন কালেই দেখেন নাই। আমরা

* কৈলাসচন্দ্র সিংহ কৃত রাজমালা, ১৮ পৃষ্ঠা।
† পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত তাম্রশাসনের উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য।

অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি রাজ্যের পরিচয় প্রদান করিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, তাঁহার প্রদত্ত তাম্রশাসনের অত্যুক্তি স্তুতি-বাদকের অতি স্তব মাত্র। উহাতে সত্যের লেশও নাই।

এক্ষণে অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি রাজ্য কাহাকে বলে, দেখা যাউক। অশ্বপতি, গজপতি শব্দ পারিভাষিক, ইহার সবিস্তর বিবরণ "নরপতি বিজয়" নামক জ্যোতিষ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। চতুর্দ্ধুরীণ মহামহোপাধ্যায় প্রাচীন টীকাকার নীলকণ্ঠ মহাভারতের ভীষ্ম পর্ব্বের ৩য় অধ্যায়ের ৩১শ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—

"সিন্ধুসাগর সঙ্গমাৎ গোদাবরী সাগর সঙ্গম পর্য্যন্তমেকারেখা তদ্দক্ষিণে নরপতিঃ। ততএব কর্ণপ্রাবরণ পর্য্যন্তং দ্বিতীয়া তদুত্তরে গজপতিঃ। তয়ো রেখয়োর্ম্মধ্যে অশ্বপতিঃ। হস্তিনাপুরং তু ঈশান দেশাস্থত্বাৎ গঙ্গাদ্বারাধ পূর্ব্বভাগে অস্তি ইতি গজপতি ছত্রান্তর্গত মেব। হরিদ্বারং তু দেহলীদীপন্যায়েন অশ্ব পতি গজপ্রত্যারন্তর্গতম্।"

অর্থাৎ নরপতি বিজয়ে ভারতবর্ষ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। সিন্ধুনদ যে স্থানে সমুদ্রে পতিত হইয়াছে, সেই স্থান হইতে গোদাবরী নদীর সাগর সঙ্গম বিন্দু পর্য্যন্ত একটী রেখা টানিতে হয়, উক্ত রেখার দক্ষিণদিকে যত স্থান আছে, তাহাকে নরপতি ছত্র নামক ছত্রের অন্তর্গত বলা হয়। ঐ স্থানের ছত্রপতি নরপতিদিগকে নরপতি বলে।

গোদাবরীর সাগরসঙ্গম বিন্দু হইতে হরিদ্বার পর্য্যন্ত দ্বিতীয় রেখা টানিতে হইবে। উক্ত রেখার উত্তরভাগে (অর্থাৎ ঈশানভাগে) গজপতি ছত্রান্তর্গত, অর্থাৎ ঐ রেখার উত্তর ভাগের রাজারা গজপতি। ঐ উভয় রেখার মধ্যবর্ত্তী স্থান অশ্বপতি ছত্রের অন্তর্গত অর্থাৎ ঐ দেশের রাজারা অশ্বপতি নামে প্রসিদ্ধ। অতএব হস্তিনাপুর (যাহা গঙ্গাদ্বার অর্থাৎ হরিদ্বার হইতে পূর্ব্ব দক্ষিণে গঙ্গাতীরে ছিল, তাহা) গজপতি ছাত্রান্তর্গত। অর্থাৎ দুর্য্যোধন গজপতি ছিলেন। পাঞ্চালেরাও তাহার পূর্ব্বে হওয়ায় উহা গজপতি ও অশ্বপতি উভয়েরই অন্তর্গত। ইন্দ্রপ্রস্থ অশ্বপতি ছত্রান্তর্গত।

গজপতি ছত্রের অন্তর্গত দেশ যথা—

তত্রৈব গঙ্গাদ্বারং কুরুক্ষেত্রং শ্রীকণ্ঠং হস্তিনা-
পুরম্।

অশ্ববক্তৈকপাদাশ্চ কর্ণ প্রাবরণ স্তথা॥
বিনশ্যন্তি চ তে সর্ব্বে দেশাস্ত্রীশান গোচরে॥

তারপর গোদাবরী সাগরসঙ্গম বিন্দু হইতে গঙ্গাদ্বার পর্য্যন্ত পাতের রেখার উত্তরে কলিঙ্গ, উৎকল, কর্ণাটাংশ, অঙ্গ বঙ্গ, মগধ, প্রয়াগ, মিথিলা, অযোধ্যা, কাশী, হস্তিনাদি এই সকল দেশের রাজারা গজপতি।

উভয় রেখার মধ্যে সিন্ধুদেশ, মদ্রদেশ (পঞ্জাব), কেকয়, নিষধ, চেদি ইত্যাদি অশ্বপতি। গজপতি, অশ্বপতি, নরপতি যাঁহার অনুগমন করেন, তিনিই সম্রাট। এক্ষণে কেহ কি বলিতে পারেন, কেশব সেন সমস্ত ভারতের সম্রাট ছিলেন? স্তাবক প্রশস্তি লেখকগণ যেমন কেশব সেনকে "অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি রাজ্যত্রয়াধিপতি" (১) বলিয়া মিথ্যা বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের মনে হয়, তাঁহাদের লিখিত সেন-বংশের চন্দ্রবংশোৎপত্তিও সেইরূপ মিথ্যা স্তুতিবাদ মাত্র।

(১) গৌড়ে ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট ২৫৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত তাম্রশাসন পাঠ দ্রষ্টব্য।

বিশেষতঃ সমস্ত পুরাণ একবাক্যে কলিকালে ক্ষত্রিয়াভাব বর্ণন করিয়াছেন। প্রথমতঃ ভগবান পরশুরামদ্বারা একবিংশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় হইয়াছে। তারপর যে সকল ক্ষত্রিয়ের অস্তিত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই সঙ্কর ক্ষত্রিয়। (২) তারপর বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়, মহানন্দীসূত মহাপদ্মনন্দ কর্তৃক অখিল ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হইয়াছে। তৎপরে মগধ সম্রাট বিশ্বস্ফটিক দ্বারাও ক্ষত্রবংশ নির্ম্মূল হইয়াছে। (বিষ্ণুপুরাণ) কুরুক্ষেত্র ও মৌসল যুদ্ধেও অগণ্য ক্ষত্রিয় ধ্বংস হইয়াছে। এই সকল কারণে মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন, চিৎসুখ যোগীন্দ্র, অশেষ শাস্ত্র পারীণ গাগাভট্ট প্রভৃতি মনিষীগণ কলিকালে ক্ষত্রাভাব বর্ণন করিয়াছেন।

ইহাতেও যদি কেহ মনে করেন, ক্ষত্রিয় একেবারে নির্ম্মূল হয় নাই, তদুত্তরে দেখা যায়, বিষ্ণুপুরাণ (৪।৪।৪৫—৪৮ শ্লোক), বায়ুপুরাণ, ভাগবত (১২।২।৩৭—৩৮ শ্লোক) পুরাণে সুস্পষ্ট লিখিত আছে—চন্দ্রবংশীয় রাজা দেবাপি, এবং ইক্ষাকু বংশীয় রাজা সুবর্চ্চা মহাযোগ অবলম্বন করতঃ যোগিজনগম্য হিমালয়স্থ কলাপ গ্রামে বাস করিতেছেন। ইহাঁরাই আগামী সত্যযুগে চন্দ্র, সূর্য্যবংশের প্রবর্ত্তক হইবেন। যদি কলিতে চন্দ্র, সূর্য্যবংশের অস্তিত্ব থাকিত, তাহা হইলে পুরাণকারগণ কখন ভাবী চন্দ্র সূর্য্যবংশের বীজপুরুষদিগকে যোগাবলম্বনে হিমালয়ে রাখিতেন না। যে কারণে পূর্ব্বভারতীয় (ত্রিপুরা, মণিপুর, উৎকল, বঙ্গীয়) রাজগণ আপনাদিগকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পণ্ডিতদিগের দ্বারা বর্ণন করাইয়াছেন, ঠিক সেই কারণে পশ্চিম ভারতীয় রাজগণ অনেকে সূর্য্যবংশ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, এইসকল কারণ পরম্পরায় আমরা তাম্রশাসনোক্ত চন্দ্রবংশ, ব্রহ্মক্ষত্রিয় বংশ প্রভৃতিকে ঐতিহাসিক সত্যরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। অলমিতি।

শ্রীসুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস।

শ্রীমদ্ভগবৎগীতার প্রণেতা ও তৎকাল নির্ণয়। *

মহামান্য শ্রীমদ্ভগবৎগীতার নাম হিন্দুমাত্রেরই নিকট সুপরিচিত এবং বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট অপরিচিত নহে। কাজেই এ পবিত্রা "যা পদ্মমুখ লাভস্য মুখপদ্ম বিনিসৃতা" গীতার পরিচয় দান আমার বাহুল্য মাত্র। গীতা গ্রন্থ যে

(২) বেদে এইরূপ প্রমাণ আছে যে, ক্ষেত্রজ—সন্তান উৎপন্ন হইলে সেই পুত্রপাণিগ্রহীতারই হইয়া থাকে; সেই সনাতন ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া ক্ষত্রিয়পত্নীরা ব্রাহ্মণ সমীপে অভিগমন করিতেন এবং ক্ষত্রিয়দিগের পুনর্ভবনিধি লোকেও দৃষ্ট হইতেছে। ক্ষত্রিয়কুল এইরূপে বদ্ধমূল হইয়াছে। মহাভারত (কালীপ্রসন্ন সিংহ) আদিপর্ব্ব ১০৪ (অধ্যায়)

* সাহিত্য পরিষৎ (মীরাটশাখায় পঠিত।)

ধর্ম্মজগতে ও দার্শনিক ক্ষেত্রের অত্যুজ্জ্বল রত্ন, সে সম্বন্ধে বোধ হয় আমাকে বিশেষ করিয়া পরিচয় প্রদান করিতে হইবে না। তবে যখন হরিনাম সংকীর্ত্তনে সকল কলুষ নাশ হয়, তখন এই পরম পবিত্র গ্রন্থের গুণানুকীর্ত্তনে কেন আমি বঞ্চিত থাকিব? পাঠক পাঠিকাগণ "যেমন হরিনামামৃতপানে জাত বিচার নাই —ধনী নির্দ্ধন সকলেই "জাতিবর্ণভেদে" একত্রে প্রাণের সাধে রসাস্বাদ করিতে পারেন, তখন আপনারা আসুন, আমার ন্যায় এ দীন লেখকের সহিত এই "সর্ব্বোপনিষদসার দোগ্ধা গোপাল নন্দনঃ" প্রাপ্ত সকল ধর্ম্মের ও সকল শাস্ত্রের সারাৎসার এই অত্যুৎকৃষ্ট ও উপাদেয় দুগ্ধ পান করিতে প্রয়াস পাওয়া যাউক। এই গীতা শাস্ত্রে কিবা হিন্দু, কিবা মুসলমান, সকলেরই নিজস্ব, সকলেই জাতি নির্ব্বিশেষে আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে পারেন। গীতা শাস্ত্রে সাম্প্রদায়িকতা নাই, কিম্বা সঙ্কীর্ণতাও নাই। গীতা জ্ঞানাকাশের সত্য ও সূর্য্যস্বরূপ। যিনি যে ভাবে গ্রহণ করিবেন, তিনি সেই ভাবেই ইহার রসাস্বাদন করিতে পারিবেন। এ মিছরীর ছুরী যিনি যে ভাবেই চাইবেন, তিনি ইহার মিষ্টতার ন্যূনতা পাইবেন না। গীতার সার্ব্বভৌমিকত্বই ভগবৎ উক্তির অন্যতম ও অব্যর্থ প্রমাণ। ভগবান যখন জগতস্থ সমুদায় স্থাবর জঙ্গমাদি সকল সৃষ্ট পদার্থের সাধারণ পিতামাতা, তখন তাঁর প্রচারিত ধর্ম্ম যে সকলের গ্রহণীয় হইবেক, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক যেমন বিদ্যালয়স্থ সমুদায় বালক-বালিকাকে সমভাবেই শিক্ষা দেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ভগবৎগীতায় তদ্রূপভাবে সকল মনুষ্য জাতিকে সমান ভাবে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাই "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহং" যথা গীতায় উক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, গীতার প্রতিপাদ্য ধর্ম্মে ও ইহার সার্ব্বজনীনত্ব ও সার্ব্বলৌকিক সম্বন্ধে পাঠক পাঠিকাগণকে বারান্তরে কিছু বলিবার বাসনা রহিল। তবে যে গ্রন্থের মর্ম্মার্থ "ব্যাস বেত্তি ন বেত্তিবা"— তাহার যে যথাযথ ভাব প্রকাশ করিতে পারিব, সে আশা রাখি না। "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাৎ উদ্বাহুরিব বামন" উপহাসস্ততাং পাইলেও ভগবৎ নামানুকীর্ত্তনে মানাপমান নাই, তাই লিখিব। গীতাই দার্শনিক ও ধর্ম্মতত্ত্বাদি বিষয়ে কিবা ভারতের কিবা ইউরোপের—বিদ্বৎমণ্ডলি নানা ভাবে নানা আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। আজ আপনাদের এ প্রবাসী ক্ষুদ্র লেখক ২৫।৩০ বৎসর গীতা-সিন্ধুতীরে দণ্ডায়মান হইয়া যে ২১৪ টী উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়াছে, (তাহার কিয়দংশ মন্দারমালা পত্রিকায় প্রথমংশ প্রকাশিত হইয়াছে) সাধারণের নিকট বিদুরের খুদ কুঁড়ারূপে অর্পণ করিতেছে। আশা করি, লেখকের বঙ্গীয় ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট উহা উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হইবে।

২। আমার বিশ্বাস ও বোধ হয় পনর আনা হিন্দুর বিশ্বাস যে, গীতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত। মহাভারত যুদ্ধের প্রাক্কালে আত্মীয়নাশকর যুদ্ধে পরাঙ্মুখ অর্জ্জুনকে মানবদেহধারী বৃষ্ণিবংশাবতংস ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগস্থ হইয়া ধর্ম্ম সাগর লঙ্ঘন করিয়া যে সমুদায় দার্শনিক ও অধ্যাত্ম-তত্ত্ব শিক্ষা দেন, সেই উপদেশ সকল মালা-কারে গ্রথিত হইয়া গীতা আখ্যা পাইয়াছে। অবতারবাদ যাঁহারা বিশ্বাস না করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান বলিয়া বিশ্বাস না

ক্ষরিতে পারেন, তাতে কোন ক্ষতি নাই। তবে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম যখন সকল উপনিষদের (ব্রহ্মবিদ্যার) সারভূত, তখন সে শিক্ষা গ্রহণ করিতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি থাকিবে না। গীতা উপনিষদের সারভূত হইলেও ইহার বিশেষত্ব এই যে, উপনিষদ বা বেদান্ত যেমন বিক্ষুর বা দণ্ডীর অবলম্বনীয়, গীতার প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম কিংবা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, কিম্বা সাংসারিক উভয়েরই অবলম্বনীয়, যখন সংসার রাখা ভগবানের উদ্দেশ্য, তখন কেবল উপনিষদ পড়িয়া সন্ন্যাসী হইলে চলিবে না। উপনিষদের এই বিষম অভাব, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় মোচন করিয়াছেন। যদি তাহা না হইত, গীতা-প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম প্রচারের অপর কোন আবশ্যকতা পরিলক্ষিত হইত না। গীতা কর্ম্ম ও জ্ঞানরাজ্যের সমন্বয়-সাধনকর্ত্তা। এ অপার্থিব গ্রন্থে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, এই ত্রিধারার একত্র সংযোগ হিন্দু ও জগৎবাসীর প্রয়াগ তীর্থ।

৩। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমার প্রতিপাদ্য বিষয় গীতার প্রণেতা কে? এবং এই গ্রন্থ কখন প্রণীত হয়, অর্থাৎ গীতার বয়স কত? রত্নপ্রসূ ভারতমাতার দুর্ভাগ্য যে ভারতের প্রাচীনকালের ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। ভারতের ইতিহাসের প্রত্নতত্ত্ব গভীর তমসাচ্ছন্ন। কাজেই কোন ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণ করিতে হইলে অনেককেই অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়, কাজে কাজেই ফল সর্ব্বত্র ও সার্ব্বজনীন হয় না। শঙ্করাচার্য্য আমাদিগের শ্রীধরাদি পূজ্যপাদ পণ্ডিতমণ্ডলী গীতাগ্রন্থের পাণ্ডিত্য পূর্ণ ও দার্শনিক ব্যাখ্যা-মূলক ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই অপার্থিব গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে কিছুই লিখিয়া যান না বা প্রয়াস পান না, বোধহয় তাঁহারা এবিষয়গুলি বিশেষ প্রীতিপ্রদ মনে করিতেন না, তাই এইরূপ কোন প্রয়াস পান নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়গণ বিভাগ ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিরূপণে নিযুক্ত। এরূপ ভাবে গ্রন্থাদির গবেষণার আকাঙ্ক্ষা আমরা পাশ্চত্য পণ্ডিতদিগের নিকট হইতেই পাইয়াছি, তজ্জন্য আমরা উঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ। তবে এইরূপ প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার ফল সময়ে সময়ে পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য আনয়ন করে, তাই দুঃখের বিষয়। এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন প্রত্নতত্ত্বের কাননে আমার ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি মসিজীবী প্রবেশ করিতে উদ্যত! হয়ত আমার পাঠক পাঠিকাগণ বলিতে পারেন "কেন তোমার এ দুঃসাহসিকতা! অন্ধকারাচ্ছন্ন বনে তুমি কোন্ সাহসে প্রবেশ করিতে চাও? গরীবের ছেলে প্রত্যাবৃত্ত হও, নচেৎ বাঘে ভাল্লুকে খাইয়া ফেলিবে। অবশ্য আপনাদের কথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষা বলিয়াও একটা জিনিস আছে, সেই দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া আমি একাজে হাত দিয়াছি। ভরসার মধ্যে আছে, ঐ গভীর বনের মধ্যস্থলে একটা কাল-সাপের মাথায় যে মাণিকটা জ্বলিতেছে, যদি কোনরূপে উহারই সাহায্যে উহাকে কোন রূপে গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে সাতরাজার ধন ঐ মাণিকটা পাইলে সকল কষ্টের লাঘব মনে করিব।

৪। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে তৎশিক্ষান্বিত কতিপয় বি-এ, এম-এ, উপাধিধারী সংস্কৃতজ্ঞ আমার ভারতবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ বলিতে সুরু করিয়াছেন যে, গীতা-গ্রন্থ মহাভারতের অংশীকৃত নহে, ইহা উহাতে

পরবর্ত্তীকালে প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং ইহাও বলিতেছেন যে, গীতা শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ-মুখনিঃসৃত বা মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত নহে। অনেকেই বলেন যে, মারামারি কাটাকাটির ইতিহাসে মহাভারত অপেক্ষায় এমন রচনার পরিপক্ক, মনোহর, বিবদ প্রাঞ্জল প্রসাদ-গুণোপেত মধুর রচনা-যুক্ত গ্রন্থ কখনকি সন্নিবেশিত হইতে পারে? তাঁহারা বলেন, গীতার লিখন ও গ্রন্থন চাতুর্য্য কি রামায়ণ কি মহাভারত ও কি মনুসংহিতা, সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর ও চিত্তোন্মদী। তাঁহারা আরও বলেন, কি অলঙ্কার, কি বস্তুসম্ভার, কি রচনা-বিন্যাস,কি মাধুর্য্য-গরিমা,কি পদলালিত্য, সর্ব্ববিষয়ে গীতা ভারতের সকল গ্রন্থকে পরাভূত করিয়াছে। কাজেই তাঁদের বিশ্বাস বা মত, এ গ্রন্থ কখন ব্যাসদেবের (যাহা এতদিন অনেকেরই বিশ্বাস আছে) রচিত হইতে পারে না। আজকাল ভারতবাসী হিন্দু-ভ্রাতাদের ও অপরাপরের যে এই নব ধারণা হইয়াছে, ইহার জন্মদাতা ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ। কাজে কাজেই তাঁহাদের শিষ্য ও প্রশিষ্য আমরাও তাহা বলিব না কেন? অবশ্য আমরা শাস্ত্রদর্শী ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গকে শত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না,কারণ তাঁহাদের অসাধারণ অধ্যবসায়ের বিষয় ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ বদ্ধপরিকর হইয়া ভারত-মহিমা সংস্কৃতশাস্ত্র-সাগর মন্থন করিতেছেন, আর আমরা অধিকাংশ নিশ্চেষ্ট ভাবে উহা দেখিতেছি বা ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছি। জানিনা ভারতের এ যোগ-নিদ্রার অবস্থা কবে দূর হইবে। কলিকালে ভারতের দেবতারা নিদ্রিত, শুনিতে পাই, কাজে কাজেই তদুপাসক ভারতবাসীও নিদ্রিত। ভারতবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ, যদি আপনারা উপনিষদের ধর্ম্ম বা গীতা-প্রতিবাদ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তবেই এই শুষ্ক ভারত-বৃক্ষ আবার পত্র পুষ্পে ও সুফলে সুশোভিত হইবে। সত্য শাস্ত্র অধ্যয়নে জাতীয় জীবনলাভ ও জাতীয় চরিত্র পাওয়া যায়, জানিবেন। চরিত্রলাভে অনন্তশক্তি আপনা হইতেই আসিবে, তজ্জন্য গলাবাজি বা কাহারও দ্বারস্থ হইতে হইবে না, উপযুক্ত হইলে ভগবৎ-কৃপায় ইষ্টদ্রব্য আপনি আসিয়া জুটিবে, নতুবা আসিলেও "বর্ব্বরস্ত-ধনঞ্জয়" রূপে পরিণত হইবে।

৫। পাঠকপাঠিকাগণ! প্রথমতঃ আমি শ্রীমদ্ভগবৎগীতার প্রণেতা ও তৎকাল সম্বন্ধে আমার বঙ্গবাসী দুই একজন প্রথিত-নামাদের মত প্রকাশ করিব। সাহিত্য-সম্রাট স্বর্গীয় পূজনীয় বঙ্কিমবাবু মহাভারতকে তৃতীয় স্তর-যুক্ত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন (তাঁহার শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) এবং গীতাগ্রন্থকে মহাভারতের দ্বিতীয় স্তরে ফেলিয়াছেন, অর্থাৎ গীতাগ্রন্থ মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমবাবু তাঁর শ্রীমৎভগবৎ-গীতা নামক গ্রন্থে এতৎ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ আমি আপনাদের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিলাম—"বাস্তবিক যে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধারম্ভ সময়ে কৃষ্ণার্জ্জুনে এইরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু গীতাকার এইরূপ কল্পনা করিয়া কৃষ্ণ-প্রচারিত সার ধর্ম্ম সঙ্কলিত করিয়া মহাভারতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে। যুদ্ধে প্রবৃত্তিসূচক যুদ্ধ কর্ত্তব্যাদি বাক্য গ্রন্থকারের কৌশল। যুদ্ধ-

ক্ষেত্রে উভয় সেনার সম্মুখে রথ স্থাপিত করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের যথার্থ যে এরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ। সেই সময়ে যে একপক্ষের সেনাপতি উভয় সৈন্তের মধ্যে রথ স্থাপন করিয়া অষ্টাদশ অধ্যায় যোগ-ধর্ম্ম শ্রবণ করিবেন. একথাটা বড় সম্ভবপর বলিয়াও বোধ হয় না। গীতায় ভগবৎ-প্রচারিত ধর্ম্ম সঙ্কলিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু গীতা গ্রন্থখানি ভগবৎ প্রণীত নহে. অন্য ব্যক্তি ইহার প্রণেতা। যে ব্যক্তি এই গ্রন্থের প্রণেতা, তিনি যে কৃষ্ণার্জ্জুনের কথোপকথন সেখানে উপস্থিত থাকিয়া স্বকর্ণে শুনিয়া সেইখানেই বসিয়া সব লিখিয়াছেন বা স্মৃতিধর মত স্মরণ রাখিয়াছিলেন, এমৎ কথা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।"

আমাদের মতে পূজনীয় ৺বঙ্কিমবাবুর এ উক্তি সম্পূর্ণ সত্য নহে। তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবান লেখকের বিরুদ্ধে মত প্রকাশে অনেকেই হয়ত খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতে পারেন, কিন্তু প্রত্যেক লোকের যখন স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিবার শক্তি ভগবৎ-দত্ত, তখন আমিও যে স্বমত প্রকাশ করিতে পারিব না, এটী বোধ হয় যুক্তিবাদী পাঠক-পাঠিকাগণ মনে করিতে পারেন না। তবে আমি এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে সমুদয় মতামত প্রকাশ করিব, তাহার গ্রহণাগ্রহণ-ভার পাঠকপাঠিকাগণের উপরই ন্যস্ত রহিল।

আমাদের মনে হয়, তিনি যে সমুদয় কথা বলিয়া গিয়াছেন, উহা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য, কাজেই যুগোপযোগী কথাই বলিয়াছেন। আমাদের ধারণা এই যে, মহর্ষি ব্যাসদেব যে আদি ভারত-গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহার শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ যে উহার কলেবর বর্দ্ধিত করিয়াছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমরা যে মহাভারত গ্রন্থ পাইয়াছি, উহা সেই আদিম ভারত গ্রন্থের বর্দ্ধিত কলেবর মাত্র। তবে কেমন করিয়া পূজনীয় ৺বঙ্কিম বাবু গীতাগ্রন্থকে একেবারে দ্বিতীয় স্তরে ফেলিয়াছেন, তাহা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি লেখকের অনবগম্য। গীতা গ্রন্থ যে ভারত-গ্রন্থের অন্তর্গত, তাহা মহাভারতের অনুক্রমণিকা অধ্যায়েই প্রকাশ পায়। মহাভারতের অনুক্রমণিকা দিতে(Introduction) এবম্প্রকার লিখিত আছে—

(১) যদা শ্রৌষং কশ্মলেনাভিপন্নে রথোপস্থ
সীদ মানেহ অর্জ্জুনে বৈ
কৃষ্ণং লোকান দর্শয়ান শরীরে তদা নাশংসে
বিজয়ায় সঞ্জয় (১৮১)

(২) কশ্মলে যত্র পার্থস্য বাসুদেবঃ মহামতি॥
(২৪৬)

মোহজং নাশয়ামাস হেতুভি মোক্ষ
স্পর্শেভিঃ

সমীক্ষ্যাধোক্ষজ ক্ষীপ্রং যুধিষ্ঠিরঃ হিতেরতঃ
(সর্ব্বসংগ্রহ)

(৩) অত্রোপ নিষদং পুণ্যাং কৃষ্ণ দ্বৈপায়নো-
ব্রবীৎ

বিদ্বদ্ভি কথ্যতে লোকে পুরাণে কবিসত্তমে
(২৫৪)

আরণ্যকঞ্চ বেদেভ্য ওষধিভ্যং মৃতং যথা।
(২৬৫)

সুতরাং ভগবৎগীতা যে ব্যাসদেবের লেখনী-প্রসূত, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। এ বিষয় আমরা ক্রমশঃ পাঠকপাঠিকাগণের নিকট পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা পাইব।

রাও বাহাদুর পি, ভি, বৈদ্য, এম-এ

এল. এল. বি. (Rao Bahadur C. V. Baidya L. L. B.) মহাশয় তাঁহার লিখিত Historical Studies in the Bhagabat Gita) শীর্ষক প্রবন্ধে (Indian Review, July,16 and subsequent issues) যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ আমি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—"But whoever reads Bhagabat Gita through, not once only but many times and that is the only way of studying the Book for oneself will find that the work is one whole piece fashioned out of the brain of one man. The connections are nowhere broken and no subsequent layers appear. The language is throughout the language of one gifted individual. Simple, deep, sonorous, nay more the work is singularly united. It has a beginning, a middle and end. The end sums up the whole book from the beginning and furnish with a preroration as eloquent as any writer can envy. The beginning is a refusal of Arjun to fight. the middle or climax is the Vishwarup darsan or the blowing of the universal form of God by Srikishna and the end to the entire resignation of Arjun to the will of Srikrishna. In my view this Bhagabatgita stands before us like some beautiful edifice as the Tajmahal—the outcome of one mind. In short, Bhagabat Gita appears to me to be one whole piece fashioned by the brain and hand of one man from the begining to the end." "The Bhagabat Gita cannot be conceived to have had any other form and it naturally comes in the Bharat as a dialogue between Srikrishna and Arjun at the commencement of the Great War."

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, ভাগবৎগীতা মহাভারতের অংশীভূত ও একজন লোকের দ্বারাই প্রণীত, তবে বৈদ্য L. L. B. মহাশয়ের মত এই যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপরতির পর মহাত্মা ব্যাসদেব বা তৎশিষ্য বৈশম্পায়ন এই গ্রন্থ রচনা করেন।

এই আধ্যাত্ম দার্শনিক গ্রন্থ যে ভারতের অংশীভূত নয়, তাহা কখনই মানুষের মনে উদয় হইতে পারে না। তবে যাঁহারা একেবারে পূচ্ছগ্রাহিতা দোষে দূষিত, যাঁদের চক্ষুতে ছানি পড়িয়াছে, তাঁদের চক্ষুর ছানি কোন শক্তিমান চিকিৎসকের দ্বারা উদ্ধৃত না হইলে আর উপায়ান্তর নাই। আমাদের তত দূর শক্তি নাই, কাজে কাজেই অস্ত্র প্রয়োগ তাঁদের চক্ষুর আরও পীড়াদায়ক হইবে মাত্র। কাজে কাজেই ক্ষান্ত হইলাম। তবে উপরি উপরি দু একটা প্রলেপস্বরূপে উহাদিগকে এই কয়টী গীতার শ্লোক দেখিতে বা পড়িতে অনুরোধ করি—

অশোচ্যানন্বশোচস্তং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে
"যুধ্যস্ব", বিগত জ্বর, মামনুস্মর যুদ্ধ চ
অমী চত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ
ভীষ্মঃ দ্রোণঃ সূতপুত্র স্তথাসৌ
দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ…সপত্নান্॥

আমরা যদি গীতার শিক্ষা, ভক্ত ও বীরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত অসংযুক্ত মনে করি, তাহা হইলে উহাদের জীবনাঙ্ক অসম্পূর্ণ হইবে। কাজে কাজেই

ভারত যুদ্ধের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম শিক্ষা আমরা কিছুতেই বিচ্ছেদ করিতে পারি না। প্রশ্ন হইতে পারে, এরূপ আত্মঘাতী যুদ্ধের পূর্ব্বে কখন কি এরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর? বঙ্কিমবাবুও এই সন্দেহে পড়িয়াছিলেন। এই প্রশ্নের উত্তরে বা সন্দেহের নিরসনে আমাদের ইহাই বক্তব্য যে, যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহারা যেন বর্ত্তমান যুগের নৈতিক তুলাদণ্ডে ভারত-যুদ্ধের সমকালীন সামাজিক অবস্থা না মাপেন। কারণ বর্ত্তমান আলোকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল ও তাৎকালীন রাজনীতি বা সমাজনীতি দেখিলে বিফলমনোরথ হইবেন। ভারত-যুদ্ধ, ধর্ম্ম-যুদ্ধ, আজকালকার মতন পরস্বাপহরণ বা রাজ্য বৃদ্ধির দুরাকাজ্ঞা-প্রণোদিত যুদ্ধ নহে, কারণ যে যুদ্ধের মূল কারণ ধর্ম্ম, সে যুদ্ধের প্রারম্ভে যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত অথচ সাময়িক চিত্তদৌর্ব্বল্যবশত তৎপরাঙ্মুখ সেনাপতিকে যুদ্ধে প্রবৃত্তি দান করা সকল বন্ধু-বান্ধবের অকর্ত্তব্য, তাহা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকের তৎকালোপযোগী বলিয়া মনে হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব চমূবাহিনীর শ্রেষ্ঠ সেনাপতিকে যে প্রোৎসাহিত করিয়া অন্যায় করিয়াছিলেন, তাহাও আমার মনে হয় না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সখা, কুটম্ব ও রথের সারথি। সারথির কর্ত্তব্য রথীকে উৎসাহিত করা। বেশ মনোযোগ পূর্ব্বক মহাভারত গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ কোথাও আপনাকে ভগবৎ-অবতার বলিয়া প্রকাশ করেন নাই, লোক-শিক্ষা দেওয়াই যখন তাঁহার ন্যায় মহানুভবের উদ্দেশ্য, তখন মানুষভাবে কার্য্য করিয়া বা উপদেশ দিয়া তদুপযুক্ততারই [illegible] করিয়াছিলেন। তবে অর্জ্জুন ত আমাদের মত যে সে লোক ছিলেন না যে, শ্রীকৃষ্ণের দু'এক কথাতেই যুদ্ধে লাগিয়া যাইবেন। তর্কের উপর তর্ক, প্রশ্নের উপর প্রশ্ন দ্বারা আত্ম-সন্দেহ নাশ করিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে জেরবার করিবার মতলব করায় শ্রীকৃষ্ণকে মানবশক্তির ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল, তাই তাঁহাকে জ্ঞানাকাশের উচ্চ শিখরে উত্থিত হইয়া বিশ্বম্ভর মূর্ত্তিতে বলিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল—"বীজং মা সর্ব্ব ভূতানাং বিদ্ধি পার্থ—সনাতনম্।" মানুষ যখন যোগের দ্বারা জীবাত্মাকে কূটস্থ পরমাত্মাতে আপনার মধ্যে একীভূত করিতে পারেন, তখনই এমন কথা স্বতঃনির্গত হয়। তখনই মানুষ "সোহং", "শিবোহং" বলিতে পারেন। সেই তুরীয় অবস্থার কল্পনাও আমাদের ন্যায় সংসারবদ্ধ জীব ধারণা করিতে পারে না। যাহা হউক, পাঠক-পাঠিকাগণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ে সময় অসময় ছিল, আজকালের যুদ্ধের মত দিবারাত্রিব্যাপী যুদ্ধ হইত না, যুদ্ধের পূর্ব্বে যোধ্যমান সেনাপতিরা পরস্পরের শিবিরে যাতায়াত পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন, তাহা মহাভারত পাঠে জানা যায়। অন্যায় যুদ্ধ সেকালে ভারত-রাজনীতির পুস্তকে স্থান পাইত না। কাজে কাজেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণান্তকর যুদ্ধে (যে যুদ্ধে এক পক্ষের বা উভয় পক্ষের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী) এইরূপ ধর্ম্ম-কথা হইতে পারে না, তাহা বোধ হয় কোন বিবেচক পাঠক মনে করিতে পারিবেন না।

অতঃপর আমি বর্ত্তমানকালের দু'একজন কৃতবিদ্য বঙ্গীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর এতৎসম্বন্ধীয় মতের উল্লেখ করিব, এবং তাঁহাদের যুক্তি খণ্ডনীয় কিনা, দেখাইতে চেষ্টা পাইব। মন্দারমালা-মাসিক-পত্রিকার সম্পাদক

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় উক্ত পত্রিকার ১৩২১ পৌষ (বৈশাখ) সংখ্যায় "গীতা ও শ্রীকৃষ্ণ" শীর্ষক প্রবন্ধে এক নূতন গীতা-প্রণেতা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার এ নবাবিষ্কারের সত্যাসত্যের ভার ভারতবাসী পণ্ডিতমণ্ডলী ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণের উপর ন্যস্ত করিলাম। কারণ আমি পণ্ডিতও নহি, কিম্বা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ও নহি। উক্ত সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, "গোপালনন্দন পদ্মনাভ-ঋষি এই গীতা গ্রন্থের প্রণেতা।" তিনি কোথা হইতে এই নূতন কথার অবতারণা করিলেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিলেই ভাল হইত। একথা কোন পুরাণ ইতিহাসেও দেখিতে পাইনা, যদি থাকে ত উক্ত পণ্ডিত মহাশয় জনসাধারণকে জানাইলে আমরা বড় সুখী হইব। পণ্ডিত মহাশয় যদি 'সর্ব্বোপ-নিষদগাবঃ দোগ্ধাগোপাল নন্দন" এবং "যা পদ্মমুখ নাভস্য মুখপদ্ম বিনিঃসৃতা" এইসব গীতা-মাহাত্ম্য শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার এইরূপ সিদ্ধান্ত বোধ হয় পণ্ডিত বা সুধী-মণ্ডলির গ্রহণযোগ্য হইবে না। গীতার ন্যায় জগৎপূজ্য গ্রন্থের প্রণেতার নাম যে অন্য কোন পুরাণ ইতিহাসে পাওয়া যাইবে না, তাহা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি লেখকের ধারণায় আইসে না। যদি তিনি অন্যত্র কোথাও গোপাল নন্দন মহর্ষি পদ্মনাভ নামীয় কোন পণ্ডিত নাম দেখাইতে পারেন ত বড়ই সুখের বিষয় হইবে। দেখাইতে পারিলেও বর্ত্তমান প্রবন্ধ সম্বন্ধে অর্থাৎ "গীতা গ্রন্থের প্রণেতা মহর্ষি পদ্মনাভ" এই মত কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা পরে বিবেচ্য। "পদ্মনাভ ও তৎ বিশেষণ" মুখপদ্মস্ত" শব্দের সাধারণ অর্থ ভগবানেই প্রযোগ্য; তবে যিনি ইহার অন্যবিধ কূটার্থ করিবেন, তাঁহার এই ব্যাখ্যায় আমা-দিগকে একটা সামান্য গল্প স্মরণ করাইয়া দেয়। যে সামান্য গল্পটার কথা আমি পাঠক-পাঠিকা-গণের নিকট বর্ণনা না করিয়া থাকিতে পারি-লাম না। "এক সাহেবের নাম ছিল স্যাভেজ (Savage) অর্থাৎ "বন্য"। ঐ সাহেব বন্য বিভাগে (Forest Dept এ) কাজ করিতেন। সাহেব নূতন বিলাত হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার এক নূতন খানসামা ছিল, সে দুই চারিটী ইংরাজি কথা জানিত। একদিন উক্ত সাহেবের মেম্ ঐ খানসামাকে বলে "টোম স্যাভেজ সাহেবকো বোলাও"। খানসামা কয়েকদিন "স্যাভেজ" কথা মাত্র শুনিতে পাইয়াছে। মনে মনে সাভেজ অর্থে "বন্য" স্থির করিয়া ভাবিতে ভাবিতে বন মধ্যে প্রবেশ করিল। এদিক ওদিক করিয়া ঘুরিতে লাগিল ও হঠাৎ একটী ব্যাঘ্রের মুখে পড়িয়া প্রাণ হারাইল। যাহা হউক, সর্ব্বত্রই বাক্যের কূটার্থ করিতে হইবে, এমন কথা কোন শাস্ত্রে লেখে নাই। যতটা সরলভাবে সমাজানুমোদিত বা লোকানুমোদিতভাবে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য, কারণ লোক শিক্ষাই যখন শাস্ত্রকারদিগের প্রধান উদ্দেশ্য, তখন তাহার কৃচ্ছসাধ্য অর্থ করা কাহারও উচিত নহে। পণ্ডিত মহাশয় উক্ত প্রবন্ধে আরও বলিয়াছেন, "ফলতঃ কৃষ্ণও ঘোড়া ঠেঙ্গাইতে ঠেঙ্গাইতে এ সকল কথা বলেন নাই, কোন ধর্ম্মোপদেশ দেওয়ার অভ্যাস তাঁহার ছিল না, অর্জ্জুনও ঐ সকল কথা শুনিয়া কার্য্য নির্ণয় করিয়াছিলেন না। এতৎ সমুদয়ই পদ্মনাভের নিজের তাঁতে বোনা, তাই তাঁহার উক্তিতে কুত্রাপি সামঞ্জস্য রক্ষা পায় নাই।" পণ্ডিত মহাশয়ের উক্ত প্রবন্ধের সম্পূর্ণ

প্রতিবাদ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক হইবে, তাই ক্ষান্ত হইলাম। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুধু যে গীতাতেই ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা নহে, মহাভারতের সর্ব্বত্রই বিক্ষিপ্ত ভাবে উপদেশ দান করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বে যে কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে উপদেশ দেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি। কেন পণ্ডিত মহাশয় এরূপ কথা তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩২৩ সাল) কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় মহাভারতের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটী অধ্যাহার করিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, ভগবৎগীতার প্রথম হইতে একাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত মহাত্মা ব্যাস-দেবের রচনা ও অপর অধ্যায় গুলি ব্যাসদেবের রচনা নহে।

(১) যেতু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎ পরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ
১২।২০

(২) ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদ মুক্তং ময়ানঘ
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমানস্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত।
১৫।২০

দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত অধ্যায় গুলি অপর কবির দ্বারা মূল ভারতে সংযুক্ত, এবং শেষ চারিটী অধ্যায় তৃতীয় কবির দ্বারা পরিসমাপ্ত। ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহার উক্তির সমর্থনে—

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদ মাবয়োঃ
জ্ঞান যজ্ঞেন তেনেহ মিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ।

শ্লোক অধ্যাহার করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকত্রয় পড়িলেই সাধারণ লোকেরা যে এ ধারণার বশবর্ত্তী হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমাদেরও মধ্যে ঐরূপ ভ্রম হইয়াছিল, তাই আমরা মন্দারমালা-পত্রিকায় "পিতাপুত্র সংবাদ শীর্ষক প্রবন্ধে" ঐরূপ লিখিয়াছিলাম, কিন্তু উক্ত বিষয় যে বিবেচনার বিষয়, তাই আমরা উক্ত প্রবন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করি। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি ও এখনও বলিতেছি, গীতাগ্রন্থ একবার পড়িলে উহার মর্ম্ম গ্রহণ করা দুরূহ-ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। এই গীতাদুগ্ধ একবার আধবার আওটাইলে উহার অমৃতাস্বাদ পাওয়া যায় না। গয়লার ছেলের দুগ্ধ যত বেশী মথন করা যায়, তত উৎকৃষ্ট নবনীত পাওয়া যায়। জ্ঞানাগ্নিতে যত পাক করিবেন, তত উৎকৃষ্টতর মেওয়া পাওয়া যাইবে। ভক্তিসহকারে পাঠ না করিয়া কেবল তর্কের খাতিরে বা নাটক উপন্যাসাদির ন্যায় পড়িলে গীতাদুগ্ধ কাটিয়া যায়, জল সরিয়া পড়ে, মিষ্টতা নষ্ট হইয়া যায় ও সময় বিশেষে বিষবৎ কার্য্য করে। আমাদের এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আজ প্রায় পঞ্চবিংশ বৎসর গীতাশাস্ত্র পাঠ ও শ্রবণে যাহা বুঝিয়াছি, তাহা পাঠক পাঠিকাগণের নিকট ব্যক্ত করিব। ভরসা করি, আমাদের পাঠকপাঠিকাগণ মনোযোগপূর্ব্বক ইহার গূঢ়মর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা মনে করেন যে, গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে সমুদয় দার্শনিক ও অধ্যাত্ম-তত্ত্ব উপদেশ দেন, তাহা অবিকল উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহারাই বিষম ভ্রান্তিতে পড়েন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-মুখ-নিঃসৃত বাক্যাবলী যে যথাযথ গীতায় শ্লোকাকারে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা কখন সম্ভবপর নয়। "ব্যাস প্রসাদাৎ" সঞ্জয় যাহা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-মুখ-নিঃসৃত বাক্যাবলী শ্রবণ করেন, তাহাই মহাত্মা ব্যাসদেবের নিকট বর্ণনা করেন। অবশ্য আপনারা বলিতে পারেন, সঞ্জয় কেমন করিয়া রাজধানীতে বসিয়া এই সমুদায় কথোপকথন শুনিলেন

পাইয়াছিলেন ? গীতায় যে "দিব্যচক্ষের" কথা আছে, তাহা যুক্তিবাদী পাঠকগণ অনৈসর্গিক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমবাবুও একথা বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু আমাদের মনে হয়, আজকাল যেমন War Correspondent আছে ও তাঁহারা সমুদায় যুদ্ধক্ষেত্রের কার্য্যাদি বা বাক্যাবলী লিখিয়া সাধারণকে জানান, সঞ্জয় তদ্রূপ কার্য্য করিয়াছিলেন,আর আপনারা যদি ভারতবর্ষকে ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন কালে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল, মনে করিতে পারেন, জ্ঞান সে সময় যে ব্যাসদেবের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ করিবেন মহাত্মা আজকালকার তারহীন তড়িৎবিদ্যা জানিতেন না,তাহা মনে হয় না,বোধহয় দু'একজনের মধ্যে জানা ছিল। সঞ্জয় এতদুপায়ে যুদ্ধক্ষেত্রের সমুদায় ব্যাপার জানিতে পারিয়াছিলেন। মহাভারত পাঠে আপনারা বোধ হয় জানেন যে, যখন দুর্ব্বাসা ঋষি যুধিষ্ঠিরকে অপমানিত করিবার জন্য ভিক্ষার্থ কাম্যবনে পাণ্ডবদের নিকট গমন করেন, তখন সশিষ্য দুর্ব্বাসার আতিথ্য সৎকারে অপারক হইয়া দ্রৌপদী নিরুপায়ের উপায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর এ বিপদের কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। যদি আমরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মনুষ্য বলিয়া স্থির করি, তাহা হইলে আমাদিগকে এটাও তৎসঙ্গে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে,যখন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় বসিয়া পাণ্ডবদের এ দুঃখ সংবাদ পাইয়াছিলেন, নিশ্চয়ই তৎকালে হয় টেলিপ্যাথি, অথবা তারহীন টেলিগ্রাফের কিম্বা এতদ্রূপ কোন না কোন রূপ বন্দোবস্ত ছিল, যাহাতে তদ্দ্বারা সংবাদাদি দূরদূরান্তে নীত হইত। অতি প্রাচীন ভারতে যে রেলওয়ে, তড়িতবাহিনী বার্ত্তাবহ, জলযান, বায়ুযান প্রভৃতি জানা ছিল, তাহা বেদাদি শাস্ত্রপাঠে আমরা জানিতে পারি। এসব শাস্ত্র সাধারণের গোচর ছিল না এবং তৎকালে মুদ্রাযন্ত্রাদি না থাকায় তৎসম্বন্ধীয় হস্তলিখিত পুস্তকাদি জনবিশেষের মধ্যেই সংবদ্ধ ছিল। কালের কালের কঠোর প্রকোপে আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারত-ভাণ্ডার হইতে লুপ্ত হইয়াছিল। তবে যখন নব বস্তুর ধ্বংস ও অন্য বস্তুর উৎপত্তি প্রাকৃতিক নিয়ম-বিরুদ্ধ (against Natural Laws), তখন কেননা সেই সকল প্রাচীনকালে ভারত হইতে লুপ্ত বিদ্যা আবার নূতন কলেবর পশ্চিম জগতে আবির্ভূত না হইবে? যাহা হউক; —এতৎসম্বন্ধে বিশেষভাব আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তাই ক্ষান্ত হইলাম।

আমরা বলিয়াছি যে, ব্যাসপ্রসাদাৎ কৌরব-মন্ত্রী সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণমুখ-নিঃসৃত যে সমদয় বাক্যাবলী শ্রবণ করেন, তাহাই মহাত্মা ব্যাসদেবের নিকট বর্ণনা করেন। মহর্ষি ব্যাসদেব সেই স্বর্গীয় অধ্যাত্ম-তত্ত্বরূপ মালমসলায় সুন্দর তাজমহল নির্ম্মাণ করেন। অথবা যেমন মালাকার এক একটী পুষ্পে সুন্দর মড়াহার তৈয়ার করেন,আর সেই হার নববধূর গলায় শোভা পায়, তদ্রূপ, মালাকার ব্যাসদেব ঐ ভগবৎ-দত্ত উপদেশরূপ পুষ্পের মালা গাঁথিয়া ভক্ত সুধীবৃন্দের গলায় পরাইয়া দিয়া গিয়াছেন। এই ভক্তি-সূত্র-গ্রথিত মালা ধর্ম্মরাজ্যের ভাণ্ডারে কহিনূর মণিরূপে জগতে চিরকাল বিরাজমান রহিয়াছে ও থাকিবে। এ মালোর জ্যোতিঃ নিত্য ও অক্ষয়। মহাভারত প্রধানতঃ কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ-সংঘটিত বর্ণনামাত্র; যতটা রাজনীতির ও সমাজনীতির কথা বলা আবশ্যক, উহাতে তাহাই উক্ত হইয়াছে,উপনিষদের অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ও বেদের কর্ম্মকাণ্ড

সম্বন্ধীয় কথা সংক্ষিপ্ত ভাবেই প্রদত্ত হইয়াছে। মহাভারত জ্ঞান রাজ্যের সৌধাবলি মাত্র। উহাতে মহারাজ্যের সুসজ্জিত মনোমোহনকারী হল আছে, আস্তাবলও আছে, আছে মানব জীবনের আবশ্যকীয় সমুদয়। তবে ভগবৎগীতায় আছে সকল সৌন্দর্য্য-ললামভূতা অসূর্য্যম্পশ্যারূপা কর্ম্মজ্ঞান ও ভক্তির মূর্ত্তিমতী দেবী। সৌধমণ্ডলীর মধ্যদেশে রত্ন সিংহাসনে যেমন রাজমহিষী আসীনা থাকেন, মহাভারতরূপ সৌধাগারের সপ্ততল অন্দর মহলে জ্ঞান-রাজ্যের সিংহাসনে "গীতা" দেবী রূপে আরূঢ়া। সে দেবী-দর্শন মানবের অনেক তপস্যা, অনেক চিন্তা, অনেক চেষ্টায় মেলে। কাজেই মূলতঃ ভগবৎভক্ত ব্যাসদেব যে গীতা রচনা কালে এরূপ শ্লোকের রচনা করিতে না পারেন, তাহা আমাদের মনে হয় না। এবং তজ্জন্য গীতাগ্রন্থের বিভিন্ন প্রণেতা অনুমান বা কল্পনা করা আবশ্যক দেখিনা। যদি গীতোক্ত "সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই শ্লোকের সহিত মহাত্মা অর্জ্জুনের জীবনাঙ্ক শেষ না করিলে অর্জ্জুনের জীবন অঙ্গহীন হইবে। গীতার প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম যে ভগবৎ-উক্তি, তাহার আর এক অব্যর্থ প্রমাণ গীতার স্বাতন্ত্র্য, অর্থাৎ ভারতের সর্ব্বশাস্ত্রাদিই প্রায়ই প্রক্ষিপ্তবাদ দোষে দূষিত, কিন্তু ভারতবাসী ঋষি মহর্ষি মুন্যাদি গীতাগ্রন্থকে এরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন যে, উহাতে একটা আধটা শ্লোকও কেহ রচনা করিয়া প্রবেশ করাইতে সাহস পান নাই—"গীতা" প্রণেতার হস্ত হইতে যেরূপ অবস্থায় প্রসূতা হইয়াছিল, ঠিক তদবস্থাতেই আমরা উহাকে পাইয়াছি, উহার কলেবর কেহ বর্দ্ধিত করিতে সাহস করেন নাই। প্রোফেসর সেগেল, ল্যাসেন প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গও গীতার এরূপ অপরিবর্ত্তনীয়তা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন যে, মহাভারতে ৭০০ শত শ্লোকে গীতাগ্রন্থ সমাপ্ত, উল্লিখিত হইয়াছে, সর্ব্বত্র সর্ব্বদেশেব্যাপ্ত হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথিতে ঐ ৭০০ শত শ্লোকের উপর একটীর অধিক শ্লোকবিশিষ্ট হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া যায় না। তবে বঙ্কিমবাবুর গীতার কোন কোন শ্লোকের গূঢ়ার্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া, শ্রীমৎগীতা-গ্রন্থে সেই সেই শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করিয়া গিয়াছেন। এরূপ করা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। আমাদের জ্ঞান পরিমেয়, আমরা সর্ব্বদা শাস্ত্রবাক্য আমাদের বিদ্যাবুদ্ধির রঙ্গিনকাচের মধ্যে দেখি, কাজেই আমরা গীতার কোন কোন শ্লোকের মনোমত অর্থ করিতে না পারিয়া উহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বসি। এটা আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষারও দোষ। কাজেই বঙ্কিমবাবুও এ দোষের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই।

পাঠক-পাঠিকাগণ! আসুন আমরা এখন আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর কিরূপ মতামত আছে, দেখিবার চেষ্টা করি।

পণ্ডিত-প্রবর ডাক্তার লরিণসর (Dr. Lorinsor) সাহেব ১৮৬৯ খ্রীঃ ব্রেস্‌লো (Breslau) সহরে জর্ম্মান-ভাষায় যে গীতার অনুবাদ করেন, উহাতে এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, গীতা খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্মের অনুকরণে লিখিত হইয়াছিল। তাঁহার এ ভ্রান্তধারণার কারণ এই যে তিনি বাইবেলের ও গীতার উপদেশ অনেকাংশে একরূপ দেখেন, প্রফেসর ডভিস (Prof. Davis) প্রফেসর ল্যাসেন ও বেবর সাহেব (Lassen and Webber) ও

লরিসন সাহেবের মতাবলম্বী, কাজেই বলিয়া গিয়াছেন যে, গীতা তিনশত শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত হয় নাই। তাঁহাদের মতের কিয়দংশ আমি পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এখানে অপ্যাহৃত করিলাম।

"This adaptation of the yoga system into the new system i.e. the new eclectic system maintained in Gita is a valid argument in favor of the opinion of Prof. Webber and Lassen and that the Bhagabat Gita was not written before the third century A. C. (App. to the Translation of the Bhagabat Gita by John Davis M.A. Cantab--member of the Royal Asiatic society (1882 Edin.) প্রফেসর ডেভিস্(Prof. Davis) বলিয়াছেন, Prof. Webber maintains that the Krishna legend is its latest development as affected by the knowledge of the facts recorded in the Gospels." The assumption that in all these respects the Christian writers borrowed from the Krishna legend and Hindu religious world does not need a reply. There is no ground whatever for such an assertion or supportion. The writers of all Chri-tain Gospels certainly knew nothing of the Hindu myths or the Krishna legend."—অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-ঘটিত সমুদায় ইতিবৃত্ত মহাত্মা যিশুখ্রীষ্টের জন্ম-বৃত্তান্তের ন্যায় লিখিত হইয়াছে। এবং গীতায় যখন যোগধর্ম্ম সম্বন্ধের কথা উক্ত হইয়াছে, এবং যখন যোগধর্ম্ম-প্রবক্তা মহর্ষি পতঞ্জলি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন (সাহেবদের গণনানুসারে) তখন গীতাগ্রন্থ অবশ্য ২।৩ শতাব্দীতে সংকলিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের এ সমুদায় বাগোচিত যুক্তির বিরুদ্ধে কোন কথা বলা উচিত মনে করি না, কেন না, বলিলেও চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী, উহাদের স্বজাত্যভিমান এত অধিক যে, উহারা পৃথিবীস্থ কাহাকেও মনুষ্য বলিয়া মনে করেন না। কাজেই ভারতীয় মত যে উহাদের মত খণ্ডন করিবে, ইহা উঁহারা কোনরূপে সহ্য করিতে পারিবেন না। পণ্ডিতবর কাশীনাথ ত্র্যম্বক টেলাং (K. T. Telang) ডাক্তার লরিসনের এসকল যুক্তির খণ্ডনে প্রয়াস পান এবং (Introduction to the Translation of Gita by Professor Muxmuller) ভট্ট মক্ষমুলার-কৃত গীতানুবাদের মহাত্মা তেলং উপক্রমণিকায় প্রমাণ করিতে চেষ্টা পান যে,গীতাগ্রন্থ কখনও ৪।৫০০ পূঃ খ্রীঃ পরবর্ত্তীকালে রচিত হইতে পারে না। আমরা মহাত্মা তেলাংএর সহিত একবারে ঐকামত প্রকাশ করিতে পারি না, তেলাংএর এ সিদ্ধান্ত অনেকটা কাজির বিচারের ন্যায় হইয়াছে। গীতাগ্রন্থ যে বৌদ্ধ-যুগের মধ্যে সংকলিত হইয়াছিল,তাহা আমাদের ধারণার মধ্যেই আইসে না। কাজেই পূর্ব্বোক্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের ও পূজনীয় ৺তেলাং মহাশয়ের মতের বিরুদ্ধে ২।৪টী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

প্রথমত: পূর্ব্বতন পাশ্চাত্যপণ্ডিতবর্গ যে পাতঞ্জল যোগসূত্রের "যোগ" শব্দের সহিত গীতায় উক্ত "যোগ" শব্দের সৌসাদৃশ্য দর্শনে গীতাগ্রন্থকে পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্রের অববজ্ঞ মনে করিয়াছেন, উহা তাঁহাদের সংস্কৃত

গ্রন্থের বিশেষত আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যবহৃত শব্দার্থের গভীরতা ও মর্ম্মার্থ গ্রহণে অসমর্থতাই প্রধান কারণ। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগ শব্দ নানা অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। মহর্ষি পতঞ্জলির "চিত্তবৃত্তি নিরোধ" যোগশব্দ গীতায় কদাচিত ব্যবহৃত হইয়াছে। যদি তাহাই উদ্দেশ্য হইবে, তবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ—"কর্ম্মযোগ" "জ্ঞানযোগ" "ভক্তিযোগ" এই সকলের কিরূপ অর্থ করিবেন? যোগ শব্দের প্রধানার্থ গীতাতেই উক্ত হইয়াছে—"সমত্বং যোগমুচ্যতে" যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং অর্থাৎ সুখদুঃখের অতীত হওয়ার অথবা কর্ম্মের কুশলতাই যোগ সংজ্ঞাপদবাচ্য। গীতার যোগ অর্থ ঈশ্বরে চিত্তার্পণ। পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বর একরূপ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন। কাজেই পতঞ্জলি-প্রতিপাদ্য যোগ শব্দের সহিত গীতায় উক্ত যোগ শব্দের কোন তোয়াক্কা থাকিতে পারেনা—গীতার প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম ভগবানকে ত্যাগ করিয়া একপদও অগ্রসর হইতে পারে না। পাতঞ্জল দর্শন মহর্ষি কপিল প্রণীত সাংখ্য দর্শন হইতে গৃহীত হওয়ায়, উহা একরূপ নাস্তিকতায় পরিণত হইয়াছে। আর মহর্ষি পতঞ্জলি যখন খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর লোক, তখন তাঁহার প্রচলিত যোগধর্ম্মের সহিত গীতা-প্রতিবাদ্য যোগ ধর্ম্মের কোন বিশেষ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। তবে যে মহাত্মা পতঞ্জলির পূর্ব্বে যোগধর্ম্ম ছিল না, আমাদের তাহা মনে হয় না। তবে ব্যাসদেব যেমন সমুদায় বেদের সংকলন-কর্ত্তা, মহাত্মা পতঞ্জলি সেইরূপ যোগশাস্ত্রের সংকলনকর্ত্তা। আমরা গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ২য় উত্তর শ্লোক অর্থাৎ "স কালেনেহ-মহতা যোগঃ নষ্টঃ! পরন্তপ। স এবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃপুরাতনঃ" এই উক্তি হইতে জানিতে পারি যে, পৃথিবীতে কোন ধর্ম্মপ্রচারক কোন নূতন তথ্য নিত্যরূপে আবিষ্কার করিতে পারেননা। তবে কাল প্রভাবে যখন কোন ধর্ম্ম বা বিদ্যা লুপ্ত হয়, ভগবৎ-প্রেরিত লোক দ্বারা সেই সমুদায় লুপ্তবিদ্যার পুনরুদ্ধার হয় মাত্র। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন, যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি। অভ্যুত্থানম ধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং—"ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় যুগে যুগে"

গীতা গ্রন্থ যে খ্রীষ্ট দুই তিন শতাব্দীতে রচিত, ইহা বাতুলের প্রলাপ বাক্য মাত্র। ইতিহাসোক্ত মহারাজা চন্দ্রগুপ্ত ও তৎমন্ত্রী চাণক্য পণ্ডিত যে চতুর্থ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দের লোক, ইহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের ও ভারতীয় পণ্ডিতবর্গের মত এবং আমরা যখন চাণক্য নীতি মালাতে দেখিতে পাই, চাণক্য পণ্ডিত গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের বিংশ শ্লোক অর্থাৎ দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেহনুপকারিণে, দেশেকালে চ পাত্রেচ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ অধ্যাহার করিয়াছেন, তখন গীতা গ্রন্থ যে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত অর্থাৎ চতুর্থ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে লিখিত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্বোক্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ গীতা-প্রতিপাদ্য শিক্ষা ও বাইবেলের অধিকাংশ আদেশবাণীর সৌসাদৃশ্য দেখিয়া গীতাকে যে বাইবেলের পরবর্ত্তী ঠাওরিয়া বসিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের হিন্দু শাস্ত্র জ্ঞানের অর্ব্বাচীনতাই প্রকাশ করিতেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ কি বলিবেন যে, মনুসংহিতায় "ক্রুদ্ধন্তং ন প্রতিক্রুদ্ধেৎ আক্রুষ্টং কুশলং বদেৎ" বাক্যের সহিত বাইবেলে উক্তি "Ye have heard that it has been said "An Eye for an Eye." and a tooth, for a tooth, But I say unto you that ye resist not

not evil but whosoever shall smite thee on thy right cheek turn to him the other also" (St. Matthew) অর্থাৎ এক "গালে চড় খাইলে অপর গাল বাড়াইয়া দিবে" কথার সৌসাদৃশ্য আছে, তখন মনুসংহিতা হইতে ভূরি ভূরি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারি যে,মনুসংহিতা-প্রচারিত নীতি বাক্য গ্রহণে বাইবেলের কলেবর পুষ্ট হইয়াছে। প্রবন্ধের আয়তন সুদীর্ঘ হইয়া পুস্তকাকারে পরিণত হইবে, সেই আশঙ্কায় ক্ষান্ত হইলাম। আমার অনুরোধ, পাঠক পাঠিকাগণ ইচ্ছা করেন ত উক্ত সংহিতা ও বাইবেল, এই দুইখানি যুগবৎ পাঠ করিতে পারেন। পড়িলে বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, মহাত্মা যীশুখ্রীষ্ট উক্ত সংহিতা গ্রন্থ উত্তমরূপে পাঠ বা শ্রবণ করিয়াছিলেন। প্রফেসর ডেভিস (Prof. Davis) সাহেব তাঁহার পূর্ব্বতন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতানুকরণ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন "But apart from this occasional intercourse a constant trade was carried on between Alexandria and Western India" Plotemy (138 B. C.) met some Hindus at Alexandria" ভারতবাসীরাই খ্রীষ্টানদিগের নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে গিয়াছিল ও করিয়াছে!!! হায়! হায়! উল্টা বুঝিলি রাম! ভারতের যে দিন এদুরদৃষ্টতা ঘটিবে, সেই দিন বোধ হয়, ভারত নাম পৃথিবীর ইতিহাস হইতে লুপ্ত হইবে। আমাদের বোধ হয়,পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ ইহাও বলিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না, যখন গীতাগ্রন্থ সর্ব্বোপনিষদগাব ইত্যাদি তখন বেদের জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ উপনিষদ্ ভাগ বা ব্রহ্মবিদ্যা ভারতবাসী ইউরোপ হইতে শিক্ষা করিয়াছে!!! বিজিত বলিয়া বোধ হয় এ সমুদায় কথা একদিন ভারতবাসীকে অম্লান বদনে শুনিতে হইবে!

ভারতবর্ষীয় অনেক পণ্ডিতবর্গের ও ইউরোপীয়গণের ধারণা, গীতায় যখন সাংখ্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন গীতা প্রণয়নের সময় ভগবান কপিলদেবের সাংখ্য মত প্রচলিত ছিল। মহাত্মা কপিলদেব যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হইতে বর্ষীয়ান্, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং তাহা "সিদ্ধানাং কপিলমুনি" উক্তি হইতেই আমরা জানিতে পারিয়াছি। তবে মহাত্মা কপিলদেবের সাংখ্য দর্শন তৎকালে প্রচলিত থাকিলেও গীতায় কদাচিৎ এতদর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় সাংখ্য শব্দ "জ্ঞান-যোগ' অর্থেই ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের সমন্বয় সাধন করিয়া জলদগম্ভীর স্বরে বলিয়া গিয়াছেন "যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তৎযোগেরপি-গম্যতে" এই শ্লোকটী মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারিব যে, ভগবানের এউক্তির উদ্দেশ্য, যাতে লোক উপনিষদ পাঠে সন্ন্যাসী না হয়, সংসার ত্যাগ না করে, এই শিক্ষাই যে গীতার বিশেষত্ব, তা আমি পূর্ব্বেই আপনাদিগকে বলিয়াছি। অনেকে গীতায় "নির্ব্বাণ" শব্দ ব্যবহৃত দেখিয়া গীতা প্রণয়ণের কাল বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী বলিয়া মনে করেন। প্রথমতঃ গীতায় কোথাও বুদ্ধদেবের নাম গন্ধ নাই। মহর্ষি পাণিনি-প্রণীত (যিনি বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের কয়েকশতাব্দী পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন) পাণিনি নামক ব্যাকরণ গ্রন্থেও "নির্ব্বাণ" শব্দ বিভিন্নার্থে ব্যবহৃত হইতে

দেখি। গীতায় "নির্ব্বাণ" শব্দ তদর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কাহার কাহার মতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল সাংখ্য দর্শন, যদিও সাংখ্য দর্শন ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম স্থূলত এক, কিন্তু উহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। সাংখ্যদিগের চরম কাল অপবর্গ অর্থাৎ পুরুষ, প্রকৃতির সংযোগ বিনাশ। বৌদ্ধদিগের চরম উদ্দেশ্য, নির্ব্বাণ অর্থাৎ জীবাত্মার নাশ। যদিও পণ্ডিত-মণ্ডলী সাংখ্য দর্শন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মকে নিরীশ্বর-বাদ মনে করেন, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা বুঝিনা। ঈশ্বর ছাড়িয়া কোন ধর্ম্মই এক পদ অগ্রসর হইতে পারে না। পুরুষ প্রকৃতির সংযোগে জগতের উৎপত্তি, পুরুষ প্রকৃতি বাহ্যিক জ্ঞানে বিভিন্ন হইলেও স্বরূপতঃ উহা এক—One Universal spirit এক অনন্ত শক্তি! একমেবাদ্বিতীয়ং। মোক্ষ পাইতে হইলে অর্থাৎ শরীর ধারণ বন্ধ করিতে হইলে যে বাসনার বা Attraction র "উৎপত্তি," তাহারই ধ্বংস অর্থাৎ একমেবাদ্বিতীয়ংতে মিলিত হওয়ার নাম সাংখ্যবাদীর অপবর্গ; আর বুদ্ধদেবের শিষ্য প্রশিষ্যগণ যে ভাবে "নির্ব্বাণ" অর্থ বুঝাইয়া গিয়াছেন বা এখনও বোঝেন, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আজ পঞ্চবিংশ বৎসর যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে বৌদ্ধ যাজকগণের অর্থ ভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়া মনে করি। আমাদের মনে হয়, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ অর্থ "কর্ম্মনাশ" অর্থাৎ বাসনা-ত্যাগ। যখন আমরা নির্ব্বাণ অর্থ সাধারণ ভাবে করি, তখন উহাতে নিবে যাওয়া মনে করি, অর্থাৎ শূন্যে মিশে যাওয়া। আমরা যখন প্রদীপ নিবাইয়া দিই, তখন উহার তেজ আকাশে বা শূন্যে মিশিয়া যায়, তদ্রূপ মানুষের কর্ম্মক্ষয়ে জীবাত্মা আকাশে মিশিয়া যায়। আর আকাশ অর্থে যখন ব্রহ্ম "আকাশঃ বৈ ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতি, তখন নির্ব্বাণ অর্থে দাঁড়াইল ব্রহ্মে মিশিয়া যাওয়া। তবে যে বুদ্ধদেব স্পষ্ট করিয়া ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহার করেন না, তাহা বোধ হয় তাৎকালীন লোকের মানসিক অবস্থা বা ধারণা শক্তির অল্পতা দৃষ্টে যুগধর্ম্মানুসারে কৌশল প্রকাশে "নির্ব্বাণ" শব্দ এরূপ বিশিষ্ট ধর্ম্মে ব্যবহার করিয়া যান। বলিতে পারি না, আমাদের পাঠক পাঠিকাগণ ও বর্ত্তমানকালের দার্শনিকগণ আমার এ নূতন অর্থবাদ গ্রহণ করিবেন কিনা? তবে বলিতে পারি, এরূপ ভাবে অর্থ করিলে সাংখ্য বা বৌদ্ধ ধর্ম্ম যে নিরীশ্বর বা নাস্তিকতার ধর্ম্ম বলিয়া এত দিন অনেকেরই চক্ষে ঘৃণার্হ ছিল, তাহা দূরীকৃত হইবে।

আমরা পূর্ব্বে দুই একজন সংস্কৃতজ্ঞ প্রাচীন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গীতার কাল ও প্রণেতা সম্বন্ধে মতামত জানিতে পারিলাম এবং তাঁহাদের মত যে কত ভ্রান্তিমূলক, তাহা দেখিলাম এবং পরে আমরা আরও দেখাইতে প্রয়াস পাইব। প্রফেসর ম্যাক-ডোনাল্ড (Prof. Macdonald) সাহেব ও তৎমতাবলম্বী বৈদ্য M. K. L. L B. মহাশয় শ্রীকৃষ্ণ ও ভারত-যুদ্ধ ঋকবেদ ও শত-পথ-ব্রাহ্মণ সঙ্কলনের মধ্যবর্ত্তী সময়ের, স্থির করিয়াছেন। বৈদ্য মহাশয়ের ধারণা, শতপথ-ব্রাহ্মণ প্রায় তিন হাজার পূর্ব্বখ্রীষ্টাব্দে সংকলিত হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ (Prof Weber প্রভৃতি) বলেন, এক হাজার পূর্ব্ব-খ্রীষ্টাব্দে, বৈদ্য মহাশয় স্বর্গীয় বালকৃষ্ণ দীক্ষিত মহাশয়েরই মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। পণ্ডিত দীক্ষিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনানুসারে প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, শতপথব্রাহ্মণ প্রায় তের শত পঞ্চাশ পূর্ব্ব-খ্রীষ্ট সংকলিত হয়।

আর আমরা যখন শতপথব্রাহ্মণে মহারাজ পরীক্ষিত ও জনমেজয়াদির উল্লেখ দেখিতে পাই, তখন শতপথব্রাহ্মণ যে ভারত যুদ্ধের অন্ততঃ ১৫০।২০০ বৎসর পরে সংকলিত হইয়াছিল, তাহা ধরিলে অসঙ্গত হইবে না। উপনিষদজ্ঞ মাননীয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ও তাঁহার উপনিষদ (ব্রহ্মতত্ব) গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠা জ্যোতিষ প্রমাণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হয়। শ্রদ্ধেয় বৈদ্য মহাশয় গীতোক্ত "মাসানাং মাগ শীর্ষোহং" "বসন্ত কুসুমকর" এই শ্লোকদ্বয় পাঠে স্থির করিয়াছেন যে, এই সূত্র দুইটী ব্রাহ্মণ সংকলনে ও বেদাঙ্গ জ্যোতিষ ও নিরুক্ত গ্রন্থের মধ্যবর্ত্তী কালে প্রণীত।

পণ্ডিতপ্রবর মনিয়র উইলিয়ম সাহেব (Prof. Monior Williams) ভারত ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের নিকট বেশ সুপরিচিত। কাজেই তাঁহার গীতার মতামত আমাদিগকে এখানে বলিতে হইল। তবে তাঁহার উক্তি যে কতদূর ভ্রান্তিপ্রদ, তাহা পাঠক-পাঠিকাগণ অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমাদের বোধ হয়, তিনি ভারতের কোন অর্ব্বাচীন পণ্ডিতের নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার হিন্দুইজম (Hinduism) নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, ভারতবাসী কোন ইংরাজী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবিষয়ে এতাবৎ তাহার কোন প্রতিবাদ করেন নাই, কিম্বা করিলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ এতাবৎ আমাদের তাহা চক্ষুগোচর হয় নাই। সত্যের খাতিরে একার্য্য করা উচিত ছিল, কারণ এরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ-পুস্তকপাঠে ইউরোপের জনসাধারণের ভুল ধারণা চিরকালের জন্য থাকিয়া যাইবে। বিশেষতঃ যখন মনিয়র সাহেবের এই পুস্তক ইংলণ্ডেরই ইউনিভারসিটিতে পড়ান হয়। মনিয়র সাহেব তাঁহার উক্ত পুস্তকের ২০৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়া গিয়াছেন,—

"The real author of the Bhagabat-Gita is unknown, nor it is known when the work was inserted in the Vishaparva of the Mohabharat in which the poem lies intact like a pearl contributing with other numerous episodes to the tesselated character of that Immense Epic. The author was probably an earnest Brahmin and nominally Baisnab, but really a philosopher whose mind was cast in a broad mould. He is supposed to have lived in India about the second or third century of our era" পুনরায় ২২০।২২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "The beautiful poem offers numerous parallels to the passages in our own secred scriptures. But if we examine the writings and recorded sayings of these great Roman Philosophers Seneca, Epectitus, and Marcus Anarcus. we shall find them so full of similar resemblances while there appears to be no ground whatsoever for supposing these eminent pagan writers and thinkers derived any of their ideas from either Jewish or Christian sources. "The Hindu system is like a vast ocean which has secured an infinite number of streams into which Christian

tribulations from turbid springs may possibly have found their way and become absorved" ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, মহাভারত গ্রন্থের ভীষ্মপর্ব্বাধ্যায়ে প্রক্ষিপ্ত এই অত্যুজ্জ্বল গীতাগ্রন্থ মুক্তাহাররূপে সুশোভিত আছে, ইহার প্রণেতা কে, তাহা জানা যায় না. সম্ভবতঃ লেখক একজন উন্নতমনা দার্শনিক বৈষ্ণব, আর যখন আমাদের বাইবেলের সহিত অনেকাংশে গীতার মিল আছে, তখন গীতা বাইবেলের অনুকরণেই লিখিত। মনিয়র উইলিয়াম সাহেবের এ উপসংহারে যে কোন বিবেচক পাঠক হাস্য সংবরণ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। আবার বলি, উল্‌টো বুঝিলি রাম! গীতা যখন রচিত হয়, তখন যে সমস্ত ইউরোপ খণ্ডে সভ্যতার ক্ষীণালোকও প্রবেশ করে নাই,তখন ইউরোপ খণ্ড অসভ্য জাতিতে অধ্যুসিত ছিল, তাহা সাহেবের মনে হয় নাই। তাই বলি, জাত্যভিমান মানুষকে এতই অন্ধ করিয়া রাখে। পরাজিতের যে কোন কিছু ভাল আছে, তাহা বিজেতাদিগের স্বীকার করিতে প্রায়ই কষ্টে আটকায়। মানব-দেবতা খ্রীষ্ট যে গীতা প্রতিপাদ্য-ধর্ম্ম শিক্ষা করেন ও মনুসংহিতা পাঠ করেন, তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। (Prof. Tiele) প্রফেসর টাইল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, মনুসংহিতা মহাত্মা বুদ্ধদেবের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে সংকলিত হয় Prof. Tiele considers the main features of Manu-shamhita to be pre-Budhistic (History of Ancient Religion P. 127) মহাত্মা খ্রীষ্ট যে ভারতীয় সন্ন্যাসীর নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করেন এবং মনুসংহিতা পাঠ করেন, তাহার সাক্ষ্য বাইবেল গ্রন্থই প্রদান করিতেছে, "Now when Jasus was born in Bethlehem of Judea in the day of Herod, the king behold there came wise men from the East to Jerusalem." (St. Matthew) নরদেবতা যীশু গীতাপাঠে তন্ময় হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রানুকরণ করিতে যাইয়া কৃষ্ণ (খ্রীষ্ট) নাম ধারণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতবর মনিয়র উইলিয়ম সাহেব নিজ বাক্যের বা মতের সামঞ্জস্য কোথাও ঠিক রাখিতে পারেন নাই। ইহা তাঁহার বৈয়াকরণ যাস্কের সময় নিরূপণ বিষয় হইতেই পাঠক পাঠিকাগণের প্রতীতি হইবে। মনিয়র সাহেব তাঁহার Indian Wisdom নামক পুস্তকের ১৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়া গিয়াছেন যে, মহর্ষি যাস্ক খ্রীষ্টীয় চারিশত শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু যাস্ক যে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা অনেকেই স্থির করিয়াছেন। পাঠক-পাঠিকাগণ ইচ্ছা করিলে শ্রদ্ধেয় ৺রজনীকান্ত গুপ্তের "পাণিনি ও তদীয় কালনির্ণয়" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সবিশেষ জানিতে পারিবেন এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (মানবের আদি জন্মস্থান গ্রন্থ প্রণেতা ও মন্দারমালার সম্পাদক) মহাশয়ের মন্দারমালায় প্রকাশিত "যাস্কের বয়স কত" এ প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন, ভট্ট-মক্ষমুলালের Ancient Sans. Literature P. 149ও দেখিতে পারেন।

মহাত্মা যীশু যে গীতা-প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম ইউরোপে খণ্ডে শিক্ষা দেন, তাহা ফরাসী পণ্ডিতপ্রবর মিঃ পেরট সাহেব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাহার লিখিত (God and Man) "ঈশ্বর ও মানব" নামক গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ আমি পাঠক পাঠিকাগণের অবগতির জন্য অধ্যাহৃত করিতেছি—

"The whole of the genesis of Moses is vague and superficial. There is no reasoning, no profound and thoughtout idea on the course of things. In that of Manu on the contrary all is study thought and reflexion. It bears the impress of the learned man of the sage who seeks to fathom all things—Moses presents to us an abstract imaginary being who creates nature without any explanation, in Manu on the contrary it is the essence of Nature herself who gives birth to the God Brahma and the forefathers of all creatures. How far Moses is from this conception. In his Genesis Moses copied the Hindu ideas of Narayana. This not only the Hebrew Genesis which has been modified on the Hindu Mythology, it is the whole of our modern religious system." Did not India possess long before us her *Z*eus Petri the sanskrit of the Father of Heaven of whom the Greeks have now Jupiter and the Hebrew Jehova ?

As to the word Dieu, it is derived either from Jeus or Deva, of Plustha in sanskrit meaning he who strikes by fire we have Pluto.

India has also her Trinity from which we have derived our own Brahma—the Father, Vishnu. the Son, Siva the spirit.

We have imitated the Hindu in the incarnation of Jesus Christ and the Virginity of his mother. The virgin Devaki to whom the God Bishnu appears was impregnated by the spirit of God and conceived (*This dates back more than 3500 years before our era.*

It follows that the Christian genesis is of the recent origin and only shortly precedes the first ages of trinity when it was modelled after the current traditions on the Genesis of Manu whose name was corrupted into Moses "

God and man—by Prof. J. M. Perrot,

বোধ হয়, এখন আপনারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সমুদায় খ্রীষ্টধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের মূলের উপর স্থাপিত। পাঠক পাঠিকাগণ ! আমরা এতাবৎ গীতার প্রণেতা ও তৎকাল সম্বন্ধে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য প্রথিতনামা পণ্ডিতবর্গের মতামত লইয়া আলোচনা করিয়াছি এবং জানিতে পারিয়াছি যে,পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতবর্গের গীতা সম্বন্ধে মত প্রমাদ-শূন্য নহে। আপনারা আসুন,আমরা দেখিতে চেষ্টা করি, গীতাগ্রন্থ হইতে আর কোন তথ্যে উপনীত হইতে পারি কি না ? আমরা যদি গীতোক্ত "চাতুর্ব্বর্ণং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ," এই শ্লোকটী বিশ্লেষণ করিতে আমরা কি দেখিতে পাইব ? আমরা কি, যে সময় গীতোক্ত এই শ্লোক লিখিত হয়, তদানীন্তন সামাজিক অবস্থার বিষয় জানিতে পারিতেছি না ? আমরা বায়ুপুরাণ হইতে জানিতে পারি যে,ভারতে জাতি বা বর্ণ বিভাগ ত্রেতা যুগেই আরম্ভ হয়. "বর্ণানাং প্রতিভাগশ্চ ত্রেতায়াং সংপ্রকীর্ত্তিতঃ"। কাজেই গীতাগ্রন্থ যখন রচিত হয়, তখনও ভারত সমাজে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের সুদৃঢ় বিভাগ স্থান পায়

নাই। তখন গুণ ও কর্ম্মানুসারেই সমাজে জাতি বিভাগ ছিল, অর্থাৎ সকল ব্যক্তি উত্তম গুণবিশিষ্ট ও সদাচারী হইলে তিনি নীচ বংশ জাত হইলেও উচ্চ বর্ণে বা জাতিতে উঠিতে পারিতেন। তদ্রূপ কোন ব্যক্তি কদাচারী ও হীনকর্ম্মা হইলে উচ্চ বংশে জন্মিয়াও নিজ বংশীয় বলিয়া পরিগণিত হইতেন। পুরাণ ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের অপ্রতুলতা নাই। (চতুবর্ণের সৃষ্টি ও দেব ভাষার উৎপত্তি শীর্ষক ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশোন্মুখ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) কাজে কাজে আমরা এই শ্লোক পাঠে কি এই অমোঘ সত্যে উপনীত হইতেছি না যে, যখন গীতা গ্রন্থ রচিত হয়, তখন ভারতের সামাজিক অবস্থা বর্ত্তমান কালের মত দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ ছিল না। প্রফেসর বুলার (Prof : Buhler) বলিয়াছেন যে, মহর্ষি অপস্তম্ভ তিন শত পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন "Prof : Buhlor in his preface book to his a (PXXXV) has adduced good reasons for holding that Apasthmba isprior to the third century B. C. and we therefore obtain that as a point of time prior to which the Gita must have been composed" এবং উক্ত মহর্ষি প্রণীত গ্রন্থে যখন ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের বংশগত বিভাগ নিয়ন্ত্রিত দেখিতে পাওয়া যায়, তখন নিশ্চয়ই গীতা গ্রন্থ ইহার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। কাজেই যে সকল পণ্ডিতবর্গ বলেন যে, গীতা গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে রচিত হয়, তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত! আমরা গীতার আভ্যন্তরীণ ও বাহিক প্রমাণ দ্বারাই জানিতে পারিলাম যে, উক্ত গ্রন্থ বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল, কিন্তু কত কাল পূর্ব্বে যে উক্ত গ্রন্থ রচিত হয়, তাহা এখনও আপনাদিগকে বলি নাই। আমরা ভারতীয় ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলে জানিতে পারিয়াছি যে মহর্ষি পাণিনি খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব নয় শত বৎসরের লোক। পাঠক-পাঠিকাগণ! আপনারা আসুন আমরা উঁহাদের এই সিদ্ধান্ত হইতে কোথায় যাইয়া উপনীত হইতে পারি। আমরা পাণিনি ব্যাকরণ হইতে (২।৪।৬৩) জানিতে পারি যে, মহামতি যাস্ক মহর্ষি পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী "যাস্কাদিভ্যঃ গোত্রে" যস্কস্য অপত্যং৩ পুমান যাস্ক। মহর্ষি যাস্ক প্রণীত নিরুক্ত ও তৎপরিশিষ্ট একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ। আমরা উক্ত গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, মহামতি যাস্ক গীতোক্ত "সহস্রযুগপর্য্যন্ত মহর্যদ ব্রহ্মণো বিদুঃ। রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্র বিদোজনাঃ"

৮।১৭

শ্লোক অধ্যাহার করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের মতে মহর্ষি যাস্ক প্রায় আঠার শত বৎসরের অধিক বর্ষিয়ান। অর্থাৎ যাস্ক বর্ত্তমান কাল হইতে প্রায় ৪৮০০।৯০০ শত বৎসরের লোক। আর মহামতি যাস্ক যখন গীতা গ্রন্থ হইতে পূর্ব্বোক্ত শ্লোক অধ্যাহার করিয়াছেন, তখন গীতা গ্রন্থ অবশ্যই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, শতপথব্রাহ্মণ জনমেজয়ের অন্তর্ধানের পর সংকলিত হয়। মহারাজ জনমেজয় যুধিষ্ঠির হইতে তৃতীয় পুরুষ—পরীক্ষীৎ পিতা, অভিমন্যু পিতামহ কিশোর বয়সেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মারা যান। যদি আমরা গড়ে এক শত বৎসর জীবিত কাল ধরি ত জনমেজয় কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের তিন শত বৎসর পরে বর্ত্তমান ছিলেন। কাজেই

আমরা যদি অনুমান করি যে, গীতা গ্রন্থ ব্যাসদেবের সময়েই সংকলিত হইয়াছিল, তাহা হইলে গীতা মহাভারতের সমসাময়িক অর্থাৎ প্রায় ৫০১০।১৫ বৎসরের, যদি তৎ শিষ্য বৈশাম্পায়ন দ্বারা সংকলিত হইয়া থাকে ত গীতার বয়স প্রায় ৪৯০০ বৎসরের কম নহে। পাঠক-পাঠিকাগণ! প্রত্নতত্ত্বের গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। ভগবৎ কৃপায় এ সামান্য বুদ্ধিতে যাহা লিখিলাম, তাহা যদি আপনাদের কথঞ্চিৎ মন সন্তুষ্টি সাধন করিতে পারে ও পাশ্চাত্য শিক্ষান্বিত কতিপয় আমার ভারতবাসী ভ্রাতৃবৃন্দকে পুচ্ছগ্রাহিতা দোষ হইতে রক্ষা করিয়া ভ্রান্তি অপনোদন করিতে পারে, আমি নিজে সফলমনোরথ ও ধন্য মনে করিব।

শ্রীরাজকিশোর রায়।

অণু ও পরমাণু। (২)

২৫। এইরূপ প্রাচীন গ্রীক্‌দের মধ্যে দুইটা পরস্পর বিরোধী মত প্রচলিত ছিল। একদল বলিতেন, জড়দ্রব্য নিরেট। অপর দল বলিতেন, জড় কণাময়। একদল বলিতেন, জড় অনন্ত খণ্ডে বিভাজ্য। অপরদল বলিতেন, না, কোটি কোটি খণ্ডে বিভাজ্য, ইহাই মাত্র বলা চলে। কিন্তু কোন মতটা প্রকৃতির বিধানের সহিত ঠিক মিলিয়া যায়, উহা নির্দ্ধারণপক্ষে তখন পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের একান্ত অভাব ছিল।

২৬। কোন্ কথা ঠিক? জড় দ্রব্যের অভ্যন্তরে ফাঁক্ আছে, না জড় নিরেট? বিনা পরীক্ষায় উত্তর দেওয়া চলে না? তবে সহজ পরীক্ষাতেই ইহার কতক উত্তর পাওয়া যাইতে পারে।

২৭। দেখা যায়, সকল জড় পদার্থই চাপ প্রয়োগে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। কোনটা সহজে সঙ্কুচিত হয়, কোনটাকে সঙ্কুচিত করা আয়াসসাধ্য, কিন্তু চাপ প্রভাবে সকলকেই অল্পবিস্তর সঙ্কুচিত হইতে হয়। বায়ুর সঙ্কোচনশীলতা প্রসিদ্ধ। আবার জলকে সঙ্কুচিত করা কঠিন। জলে অধিক চাপ প্রয়োগ করিলে উহা খুব সূক্ষ্ম কণার আকারে উহার আধার পাত্রের অদৃশ্যরন্ধ্র পথে বাহির হইয়া আসিতে চাহে, পাত্রের ভিতর সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে চাহেনা। এমন যে জল, উপযুক্ত যন্ত্র সাহায্যে উহাকেও বেশ সঙ্কুচিত করিতে পারা যায়।

২৮। ফলে দেখা যায়, জড় মাত্রই সঙ্কোচনশীল। বিভাজ্যতা যেমন জড়ের একটী সাধারণ ধর্ম্ম, সঙ্কোচনশীলতা সেইরূপ উহার আর একটী সাধারণ ধর্ম্ম, বিভাজ্যতা হইতে আমরা বুঝিতে পারি, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা লইয়াই জড়দেহ গঠিত; সঙ্কোচনশীলতা হইতে আমরা আরও একটু অধিক বুঝিতে পারি—বুঝিতে পারি, জড়ের অভ্যন্তর ভাগ সবটাই জড় কণায় পূর্ণ নহে, কণায় কণায় ফাঁক আছে। চাপ বাড়াইলে (অথবা ঠাণ্ডা করিলে) কণাগুলি পরস্পরের কাছাকাছি হয়, ফাঁকের আয়তন কমিয়া যায়, তাই জড়টা সঙ্কুচিত হয়। চাপ কমাইলে (অথবা গরম

করিলে) ফাঁকের আয়তন বাড়িয়া যায়, তাই জড়টা প্রসারিত হয়। এই কণাগুলি খুব সূক্ষ্ম এবং কণায় কণায় দেশের ব্যবধান ও কণাগুলির দেহের অনুরূপই সূক্ষ্ম, কাজেই স্থূল দৃষ্টিতে জড় পদার্থ নিরেট বলিয়াই বোধ হয়।

২৯। ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। নক্ষত্রগুলি কত প্রকাণ্ড, আর নক্ষত্রে নক্ষত্রে ব্যবধানও এত প্রকাণ্ড যে ঐ দূরত্বের ধারণা করিতে গেলে দিশেহারা হইতে হয়, কিন্তু নক্ষত্রের সমবায়ে যে ছায়াপথ, উহা আমাদের নিকট এক অবিচ্ছিন্ন মেঘ খণ্ডের ন্যায়ই প্রতীয়মান হয়। ফেলিবার দোষেই এরূপ ঘটে। বড় জিনিষকে কেহ খুব দূর হইতে দেখিলে দৃষ্টিরেখাগুলি অনেকটা কাছাকাছি হইয়া পড়ে, ফলে জিনিষটা ও উহার অভ্যন্তরস্থ ফাঁকগুলি অস্পষ্ট হইয়া দাঁড়ায়, আবার ছোট জিনিষকেও, খুব নিকটে আনিয়া দেখিতে পারিলে দৃষ্টিরেখাগুলি পরস্পর হইতে বেশ একটু বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তখন জিনিষটা ও উহার অভ্যন্তরের ফাঁকগুলি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। একখানি আতসী কাঁচ নিকটে আনিয়া দেখিবার পক্ষে সহায়তা করে। চোখের সামনে একখানি আতসী কাঁচ ধরিয়া জিনিসটাকে খুব নিকটে আনিয়া দেখিলেও চক্ষুযন্ত্র অযথা নিপীড়িত হয়না। এইরূপে ব্যবহৃত আতসী কাঁচকে বা এইরূপ ২।৪ খানা কাঁচ সহযোগে নির্ম্মিত যন্ত্রকে অণুবীক্ষণ বলে।

৩০। ফলকথা, জড়দ্রব্য যে নিরেট নহে, ফাঁকময়, ইহা সাধারণ পর্য্যবেক্ষণ হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। ফাঁকগুলি আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না সত্য, সূক্ষ্মতায় উহারা অণুবীক্ষণের ক্ষমতাকেও পরাস্ত করিয়াছে সত্য, কিন্তু ফাঁক্ যে রহিয়াছে, জড়ের সঙ্কোচনশীলতাই তাহার প্রমাণ।

৩১। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, ফাঁকময় হইলে জড় আপনি কণাময় হইয়া পড়ে; কেননা কোন পদার্থের অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ফাঁক থাকিলে ঐ ফাঁকগুলিই পদার্থটাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া ফেলে। ফাঁকময় হইলে জড় আপনি কণাময় হয় এবং ফাঁক্গুলি খুবই সূক্ষ্ম হইলে কণাগুলিও খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয়।

৩২। এখন জড়দ্রব্য যে ফাঁকময় এবং ফাঁকগুলিও যে খুব সূক্ষ্ম,তাহা জড়ের সঙ্কোচনশীলতা হইতেই আমরা বুঝিতে পারিয়াছি; কাজেই খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা লইয়াই যে জড়দেহ গঠিত, এইরূপ অনুমানই যুক্তিযুক্ত, সন্দেহ নাই।

৩৩। কিন্তু কোন একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে একটু ভাবিয়া দেখা উচিত। জড় ফাঁকময়, কাজেই কণাময়, বেশ কথা। কণায় কণায় ফাঁক্ ও ফাঁকে ফাঁকে কণা—সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ফাঁকের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা, বেশ কথা। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলেও, প্রশ্ন হইতে পারে, কণাগুলির সূক্ষ্মতার দৌড় কত? ক্ষুদ্রতায় উহারা সসীম না অসীম? ফাঁকের অস্তিত্ব দেখিয়া কণার অস্তিত্ব বুঝিতে পারি, আবার ফাঁকগুলির ক্ষুদ্রত্ব দেখিয়া কণাগুলিও যে ক্ষুদ্র,ইহা অনুমান করিতে পারি, কিন্তু কণাগুলি কত ক্ষুদ্র, তাহাও অনুমান করিতে পারিনা—উহাদের সূক্ষ্মতার সীমা আছে কিনা, তাহাও বুঝিতে পারিনা।

৩৪। যাহা ক্ষুদ্র অথচ ক্ষুদ্রতায় সসীম, তাহাকেই কণা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। যাহা অসীম ক্ষুদ্র, তাহার আয়তন থাকেনা, হয়ত জড়ত্বও থাকেনা—উহা একেবারে

জ্যামিতির বিন্দু হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই উহাকে আর কণা বলা চলেনা। না চলুক, কিন্তু জড়পদার্থ যে এইরূপ কতকগুলি বিন্দুর সমষ্টিমাত্র নহে, তাহার প্রমাণ কি? কণায় কণায় ফাঁক থাকিতে পারে, আবার বিন্দুতে বিন্দুতেও ফাঁক থাকিতে পারে,—ফাঁকে ফাঁকে বিন্দু বিন্দুতে ফাঁক, এইরূপ কতগুলি জড়বিন্দু লইয়াও জড়দেহ গঠিত হইতে পারে। এইরূপ পদার্থকে বিন্দুময় বলিতে পারি, কিন্তু ঠিক কণাময়ত বলিতে পারিনা। এক একটা বিন্দুর আয়তন নগণ্য বটে, উহার জড়ত্বও নগণ্য হইতে পারে, কিন্তু সংখ্যাতীত বিন্দু একত্রিত করিলে উহার আয়তন বা জড়ত্ব আর নগণ্য হইবেনা, কাজেই জড়কে অসংখ্য বিন্দুর সমষ্টিরূপে গ্রহণ করিলেও ত কোন দোষ দেখা যায়না।

৩৫। ফলে দেখা যায়, শুধু ফাঁকের অস্তিত্ব বুঝিয়া জড়কে কণাময় বলা ঠিক নহে—গোটা গোটা কণা, যাহাদের এক একটা বিশিষ্ট আকৃতিও আয়তন রহিয়াছে, যাহারা অবয়ব বিশিষ্ট, এইরূপ অর্থে কণাময় বলা ঠিক নহে। বলিলে, হয়ত কণার মাহাত্ম্য ঘুচিয়া যায়, কণা অর্থে শুধু বিন্দু বুঝিতে হয়।

৩৬। জড় পদার্থকে কতগুলি বিন্দুর সমষ্টিমাত্র মনে করা জড়বাদীর পক্ষে কষ্টকর; কিন্তু এরূপ কল্পনাও বিজ্ঞান জগতে একান্ত দুর্লভ নহে; অন্ততঃ একজন বৈজ্ঞানিক এইরূপ একটা কল্পনাই প্রচার করিয়াছিলেন। ইঁহার নাম বস্কোভিচ্।

৩৭। বস্কোভিচের মতে জড়ের ক্ষুদ্রতম অংশগুলি বিন্দুমাত্র; এই বিন্দুগুলিই পরমাণু। ইহাদের অবস্থিতি আছে, কিন্তু বিস্তৃতি নাই। ইহারা অসীম ক্ষুদ্র ও অবিভাজ্য, কিন্তু একেবারে জড়ত্ববিহীন নহে। এই জড়বিন্দুগুলি ও জড় ধর্ম্মা। এবং ইহাদের জড়ত্ব লইয়াই গোটা জড়ের জড়ত্ব। গোটা জড়ের ন্যায় এই বিন্দুগুলিও কখন স্থির থাকে, কখনও বা চাপিয়া বেড়ায়, আবার গোটা জড়ের ন্যায়, এই বিন্দুগুলিতেও বেগ উৎপন্ন করিতে বল প্রয়োগের আবশ্যক হয়। এক একটা জড়ের মধ্যে এইরূপ কত কোটি বিন্দু রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই, তথাপি ইহাদের সংখ্যা অসীম নহে। এই জড় বিন্দুগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন, বিন্দুতে বিন্দুতে ফাঁক রহিয়াছে; আবার দূরে দূরে থাকিয়াই এক বিন্দু অপরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। আকর্ষণের ফলে বিন্দুগুলির একেবারে গায়ে গায়ে মিলিয়া যাইবার কথা। এইরূপ ঘটিতে পারিলে, জড় পদার্থের আয়তনই থাকিত না, কেননা লক্ষ বিন্দুও একত্র হইলে মোট আয়তনটা গণনার মধ্যেই আসে না। কিন্তু বিন্দুগুলি যে একে অপরের অঙ্গ স্পর্শ করিবে, এরূপ সম্ভাবনা নাই; কারণ, উহাদের মধ্যে যেমন আকর্ষণ রহিয়াছে, সেইরূপ বিকর্ষণও রহিয়াছে। দূর হইতে এক বিন্দু অপরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, আবার খুব কাছাকাছি হইয়া পড়িলেই, উভয়ের মধ্যে আকর্ষণের পরিবর্ত্তে বিকর্ষণের সুরু হয়। তারপর, উভয়ে যতই পরস্পরের সান্নিধ্যে আসিতে থাকে, বিকর্ষণের মাত্রাও ততই বাড়িতে থাকে; কাজেই, বিন্দুর সহিত বিন্দুর একেবারে স্পর্শ ঘটিবার যো নাই, দুইটা বিন্দুর মধ্যে কিছু না কিছু ফাঁক থাকিয়াই যায়। বিন্দুতে বিন্দুতে এই যে দেশের ব্যবধান, ইহা শুধু বিকর্ষণের ফল, আর বিন্দুতে বিন্দুতে এইরূপ ব্যবধান আছে বলিয়াই গোটা জড়ের যা কিছু আয়তন। এইরূপ, বিন্দুর সমষ্টি হইয়াও, জড় দ্রব্য আয়তন বিশিষ্ট হয়—জড়

পদার্থ, উহার প্রধান ধর্ম্ম—ব্যাপ্তি ধর্ম্ম পায়।

৩৮। এইরূপে বস্কোভিচ্ কেবল কতগুলি বিন্দু মাত্র উপাদান লইয়াই খাঁটি জড় পদার্থ নির্ম্মাণের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। বস্কোভিচের এই পরমাণুবাদ বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু ইহা হইতে আমরা এটা বেশ বুঝিতে পারি, যে জড় পদার্থকে কতকগুলি বিন্দুর সমষ্টি রূপে কল্পনা করিলেও, কল্পনাটা নিতান্তই বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ হয় না। বুঝিতে পারি, নিরেট না হইলে যে জড় কণাময়ই হইবে, বিন্দুময় হইবে না, এইরূপ সিদ্ধান্তের কোন মূল্য নাই।

৩৯। জড় কণাময় না বিন্দুময়, কেবল কল্পনার সাহায্যে ইহার মীমাংসা হইল না। এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্যও জড় প্রকৃতির পর্য্যালোচনা আবশ্যক। তবে দেখা যায়, আমাদের নিতান্ত পরিচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি লইয়া বিচারে বসিলেও অনেক সময়ে এক একটা তথ্যে উপনীত হইতে পারা যায়। এইরূপ বিচারের ফলেই আমরা দেখিয়াছি, জড় নিরেট নহে, ফাঁকময়; আবার এইরূপ বিচারের ফলেই আমরা হয় ত দেখিব, জড় পদার্থকে বিন্দুময় বলা ঠিক নহে, কণাময় বলাই ঠিক।

৪০। একটু কড়া গন্ধক লইয়াই বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। গন্ধক আমাদের খুব পরিচিত পদার্থ। ইহা কঠিন, পীতবর্ণ ও দাহ্য এবং বিশিষ্ট পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, গন্ধক একটা মূল পদার্থ অর্থাৎ দেখা গিয়াছে, বিশ্লেষণ ঘটাইয়া উহার মধ্যে হইতে দুই চারি রকমের পদার্থ বাহির করিতে পারা যায় না। গন্ধকের মধ্যে আছে কেবল গন্ধক, আর কিছুই নহে। এই গন্ধকের টুকরাখানাকে খলে গুঁড়া করিয়া উহাকে লক্ষ খণ্ডে ভাগ করিতে পারি। এই লক্ষ খণ্ডের এক খণ্ড তুলিয়া লইলে দেখা যাইবে, উহাও গন্ধকই বটে, গন্ধক ছাড়া আর কিছু নহে। কোটি খণ্ডে ভাগ করিলে খণ্ডগুলি আরও ছোট হইবে; কিন্তু শত গুণ ছোট হইলেও খণ্ডগুলি গন্ধকই থাকিবে, কেননা গন্ধক একটা মূল পদার্থ। খলে আর গুঁড়া করা না চলিতে পারে, কিন্তু মনে মনে উহাকে আরও সূক্ষ্মতর অংশে ভাগ করিতে পারি। মনে মনে ভাগ, যত ইচ্ছা ভাগ করা চলে—শুধু মনের বল চাই; কিন্তু অনন্ত খণ্ডে ভাগ করিলেও প্রতি খণ্ডকে গন্ধক ছাড়া আর কিছু কল্পনা করিতে পারি না, কেননা মনে খাঁটি বিশ্বাস, গন্ধক একটা মূল পদার্থ।

৪১। আবার পারদও আমাদের পরিচিত জিনিস। পারদ একটা ধাতব পদার্থ, কিন্তু তরল ও অত্যন্ত ভারী। বিশিষ্ট পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, এই ভারী ও তরল ধাতুটাও একটা মূল পদার্থ। কেবল পারদ নহে, জানা গিয়াছে, ধাতব পদার্থ মাত্রেই এক একটা মূল পদার্থ। আবার এক টুক্‌রা গন্ধকের ন্যায় খানিকটা পারদকেও মনে মনে অসংখ্য ভাগে ভাগ করিতে পারি, কিন্তু অনন্ত ভাগে ভাগ করিলেও উহার প্রত্যেক অংশকে পারদ ভিন্ন আর কিছু মনে করিতে পারি না; কেননা মনে খাঁটি বিশ্বাস রহিয়াছে, পারদও একটা মূল পদার্থ।

৪২। এই মূল পদার্থ গন্ধকের সহিত যদি এই মূল পদার্থ পারদ একত্র করিয়া জাল দেওয়া যায়, তাহা হইলে একটা নূতন পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে—উহা পারদও নহে; গন্ধকও নহে, উহা সিন্দূর। সিন্দূরও আমা-

দের খুব পরিচিত জিনিস। সিন্দুর একটা যৌগিক পদার্থ। উহা রক্তবর্ণ ও কঠিন এবং উহার ধর্ম্ম পারদ বা গন্ধক হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; কিন্তু উহা গন্ধক ও পারদের সংযোগেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং বিশ্লেষণ ঘটাইয়া উহা হইতে গন্ধক ও পারদই পাওয়া যাইতে পারে।

৪৩। এখন, মূলপদার্থ গন্ধক বা পারদের ন্যায় এই যৌগিক পদার্থ সিন্দুরকেও মনে মনে অসংখ্য ভাগে ভাগ করিতে পারি; কিন্তু ভাগ করিতে যাইয়া এখন একটা খট্‌কা উপস্থিত হইল। ভাগ করিতে কেহ বাধা দিবার নাই, কিন্তু সিন্দূরের সিন্দূরত্ব বজায় রাখিয়া উহাকে আর অনন্ত খণ্ডে ভাগ করিতে পারি না। ভাগের ফল সিন্দূরের কণাগুলি খুব সূক্ষ্ম হইতে থাকিবে, কিন্তু যত সূক্ষ্মই হউক, প্রতি সূক্ষ্ম কণার মধ্যেই এক টুকরা গন্ধক ও একটুখানি পারদ রহিয়াছে, মনে করিতে হইবে। ঐ গন্ধকের টুকরাটা জড় পদার্থ ও ঐ পারদ টুকুও জড় পদার্থ এবং যেখানে একটা জড়, সেখানে অন্য জড়ের স্থান নাই। ফলে, প্রতি সূক্ষ্ম সিন্দুর কণার মধ্যে একটুকরা গন্ধক ও একটুখানি পারদ পাশাপাশি অবস্থান করিতেছে, এইরূপই মনে করিতে হইবে। কাজেই, ক্রমাগত ভাগ করিতে থাকিলে, এই কাল্পনিক বিভাগেও একটা খট্‌কা উপস্থিত হয়; কেননা যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ গন্ধকের টুকরা ও ঐ পারদ টুকু পরস্পর হইতে পৃথক না করা যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভাগ কার্য্য শেষ হইয়াছে, ইহা বলা চলেনা; আবার উহাদিগকে পৃথক করিয়া ফেলিলেও সিন্দুরের সিন্দুরত্ব বজায় থাকে না। কল্পনার সাহায্যে আমরা সিন্দুরকে অনন্ত খণ্ডে ভাগ করিতে পারি বটে, কিন্তু অনন্ত ভাগে ভাগ করিতে যাইয়া গন্ধক ও পারদকে ছাড়াছাড়ি করিতে হয়—সিন্দূরের সিন্দূরত্ব লোপ করিতে হয়।

৪৪। সিন্দূর সম্বন্ধে যে কথা, অন্যান্য যৌগিক পদার্থ সম্বন্ধেও সেই কথা। যৌগিক পদার্থকে ভাগ করিতে যাইয়া এমন সকল ক্ষুদ্র অংশের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে, যাহাদিগকে ভাগ করিতে গেলেই একটা সমস্যার মধ্যে পড়িতে হয়। তখন নিতান্ত কঠিন হৃদয়েও একটু না একটু করুণার উদ্রেক হয়; কেননা ভাগ করিতে যাইয়া তখন ঐ পদার্থটার ধর্ম্মলোপ করিতে হয়, উহার নাম লোপ করিতে হয়—উহার বিশ্লেষণ ঘটাইয়া উহার উপাদান গুলিকে পৃথক করিয়া ফেলিতে হয়।

৪৫। বিশ্লেষণ না ঘটাইয়াও যৌগিক পদার্থকে খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে ভাগ করা যাইতে পারে—চোকে দেখা যায় না, অথবা অনুবীক্ষণের সাহায্যেও দেখা যায় না, এরূপ সূক্ষ্ম অংশেও ভাগ করা যাইতে পারে, কিন্তু বিশ্লেষণ না ঘটাইয়া উহাকে ক্রমাগত ভাগ করা যায় না—শেষ পর্য্যন্ত কতগুলি খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে পঁহুছিয়া ভাগ কার্য্যে নিবৃত্ত হইতে হয়। জড়ের এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি,—যাহারা ক্ষুদ্র হইলেও গোটা জড়টার মতই যৌগিক পদার্থ, যাহাদের অন্যান্য ধর্ম্মও হয়ত গোটা জড়ের অনুরূপ, যাহাদের সকলেরই একধর্ম্ম, একজাতি, যাহারা বিভাজ্য, অতএব যাহারা আয়তন-বিশিষ্ট, অথচ যাহাদিগকে ভাগ করিতে গেলেই পদার্থটার বিশ্লেষণ ঘটে—জড়ের এই অংশ গুলিকে বিন্দু বলা ঠিক নহে; ইহাদিগকে কণা বলাই সঙ্গত। ফলে যৌগিক পদার্থ মাত্রই যে কণাময়, বিন্দুময় নহে, ইহা অনেকটা অসঙ্কোচেই বাহ্য বলা যাইতে পারে।

৪৬। এইরূপ আমাদের পরিচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা গুলি লইয়া বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাইব,যৌগিক পদার্থ মাত্রেরই বিভাজ্যতার এক একটা স্পষ্ট সীমা রহিয়াছে। এই সীমায় পঁহুছিলে আমরা কতগুলি খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সাক্ষাৎ পাই। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলিকে আমরা ঐ যৌগিক পদার্থটার অণু বলিব। এই অণুগুলি খুব সূক্ষ্ম; অর্থাৎ গোটা জড়টার তুলনায় সূক্ষ্ম,অথবা আমাদের দেহের তুলনায় সূক্ষ্ম, উহারা জ্যামিতি শাস্ত্রের বিন্দু নহে। ছোট হইলেও অণুগুলির এক একটা বিশিষ্ট আয়তন আছে এবং এক একটা বিশিষ্ট পরিমাণের জড়ত্ব রহিয়াছে। একটা অণুর আয়তন কতখানি? অত ক্ষুদ্র আয়তন মাপিতে পারা যায় কি? অসম্ভব নহে। লর্ড কেলবিনের প্রতিভা অণুর আয়তন মাপিতে অগ্রসর হইয়াছিল; কেলবিনের প্রতিভাই আবার নক্ষত্র জগতের পরিধি পরিমাপে নিয়োজিত হইয়াছিল। অণুর তুলনায় আমরা কত বৃহৎ, ইহা নিরূপিত হইয়াছে, আবার এই পরিদৃশ্যমান জগতের তুলনায় আমরা কত ক্ষুদ্র, তাহাও নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু হায়! ঐ নক্ষত্র জগৎটাই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড নহে, অণুগুলিও ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রতম অংশ নহে। অণুর অণু আছে, মহতেরও মহৎ আছে। মানব! আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিয়া হতাশ হইও না, বড় মনে করিয়া স্ফীত হইও না। তোমার উভয় দিক অনন্ত বিস্তৃত, তোমার স্থান মধ্যে। তুমি উভয় দিকে তাকাও ও বিস্ময়াভিভূত-চিত্তে মস্তক অবনত কর। তুমি দৃষ্টির সীমা বাড়াইতে শিখ, তোমার বিস্ময়ের মাত্রা ক্রমে বাড়িয়া যাইবে; ইহাতেই তোমার মনুষ্য জীবনের সার্থকতা।

৪৭। সাব্যস্ত হইল, প্রত্যেক যৌগিক পদার্থকেই কতকগুলি অণুর সমষ্টিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এই অণু গুলিও যৌগিক পদার্থ; ইহাদের ধর্ম্মও হয়ত গোটা পদার্থটার অনুরূপ। সিন্দূরের অণু সিন্দূরই বটে; একটুখানি ছোট সিন্দূর—এত ছোট যে উহার চেয়ে ছোট সিন্দূর মিলে না। এইরূপ বহু কষ্টে সীমান্ত ধারণ করিয়া প্রাচীনারা গৌরব অনুভব করিত না। নব্যারাও বহু কোটি না হউক, বহুলক্ষ সিন্দূরের অণু সাদরে ললাটে ধারণ করিয়া থাকেন। বহু লক্ষেরও প্রয়োজন নাই; এয়োতির চিহ্ন বজায় রাখিবার পক্ষে একটা মাত্র অণুই যথেষ্ট; কিন্তু সাবধান! অণুর ভগ্নাংশ ললাটে তুলিও না, তাহা হইলে কপালে জুটিবে শুধু একটুকরা গন্ধক বা এক বিন্দু পারদ।

৪৮। সিন্দূরের অণু ভাঙ্গিয়া ফেলা গিন্নিদের পক্ষে শোভা পায়না, কিন্তু কর্ত্তাদের পক্ষে ঐ কার্য্য অশোভনীয় হইবে না। কর্ত্তারা সিন্দূরের অণু ভাঙ্গিবেন এবং যে দুই উপাদানে লইয়া অণু, উপ গঠিতটা ঐ গন্ধকের কণা ও ঐ পারদ কণাকে পরস্পর হইতে পৃথক করিয়া ফেলিবেন, এবং প্রশ্ন তুলিবেন, অতটুকু গন্ধক বা অতটুকু পারদকে আরও ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায় কিনা?

৪৯। এবার প্রশ্ন দাঁড়াইল, একটু ভিন্ন রকমের। সিন্দূরের অণু ভাঙ্গিয়া এক টুকরা গন্ধক ও একটু খানি পারদ পাইয়াছি, অর্থাৎ দুই রকমের দুইটা মূল পদার্থ পাইয়াছি। প্রশ্ন এই, অতটুকু মূল পদার্থকেও ভাগ করা যায় কি না এবং যদি যায়, তবে উহা অনন্ত খণ্ডে বিভাজ্য হইবে কি না? এখানে

কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোন ফল নাই। মনে মনে ভাগ করিলে ভাগের সীমা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবেনা। এখানে প্রশ্ন হইতেছে, শুধু কল্পনার সাহায্যে যতদূর অগ্রসর হওয়া যায়, প্রকৃতির বিধান মানিয়া চলিলে ততদূর পর্য্যন্তই অগ্রসর হওয়া যায় কি না? হয়ত মনের তুলনায় দেহের বল তত প্রকাণ্ড নয়; হয়ত ভাগ করিবার পক্ষে প্রকৃতিতে যত-গুলি অস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, উহারা তত তীক্ষ্ণধার নয়, হয়ত প্রাকৃতিক অস্ত্র গুলির সাহায্যে ক্রমাগত ভাগ করিতে থাকিলে একটা সীমায় পঁহুছিয়া থামিতে হয়। ফলে প্রাকৃতিক অস্ত্র গুলির তীক্ষ্ণতা নিরূপণ না করিয়া ভাগের সীমা আছে কি না, ইহার উত্তর দেওয়া যায় না। কাজেই প্রাকৃতিক অস্ত্র গুলির সহিত পরিচয় স্থাপনই সর্ব্বাগ্রে আব-শ্যক হইয়া পড়ে।

৫০। ভাগ করিবার পক্ষে কতগুলি অস্ত্র প্রকৃতিতে বিদ্যমান? সবগুলি হয়ত আমরা জানিনা—কিন্তু অনেক গুলির সহিত আমাদের পরিচয় আছে। যথা এক নম্বর— ছুরি, কাঁচি, বঁটি ইত্যাদি। ইহাদের সাহায্যে ভাগ করার নাম কর্ত্তন। ইহাদের অপেক্ষা ক্ষমতাশালী অস্ত্রের কথাও আমরা জানি; যথা দুই নম্বর—ঢেঁকি, যাঁতা, খল ইত্যাদি। ইহাদের সাহায্যে ভাগ করার নাম পেষণ বা চূর্ণন—। ইহাদের অপেক্ষাও তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রকৃতিতে বিদ্যমান; যথা তিন নং জল। জলস্পর্শে অনেক পদার্থকেই—গলিয়া যাইতে হয় এবং খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িতে হয়। এইরূপে বিভক্ত হওয়ার নাম দ্রবণ। জলে দ্রব হইলে পদার্থটা একেবারে অণুতে বিভক্ত হইয়া পড়ে, এইরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে। তারপর চারি নং—তাপ ও তাড়িত প্রবাহ। ইহাদের সাহায্যে যৌগিক পদার্থকে আরও সূক্ষ্মতর অংশে বিভক্ত করিতে পারা যায়— অর্থাৎ উহার অণুগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, উহার মূল উপাদান গুলিকে পৃথক করিয়া ফেলিতে পারা যায়। জড় পদার্থকে ভাগ করিবার পক্ষে এই সকল অস্ত্রই আমাদের জানা আছে। হয়ত ইহাদের সকলের ক্ষমতা সসীম। কাল্পনিক বিভাগের অস্ত্র যতই তীক্ষ্ণধার হউক, প্রকৃতি বিভাগে ইহাদেরই কোন না কোন অস্ত্র আমাদিগকে প্রয়োগ করিতে হইবে।

৫১। কোন পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ নির্ণয় করিতে চাহ? তাহা হইলে তোমার পরিজ্ঞাত এই অস্ত্র সমূহের মধ্যে যেটি সর্ব্বা-পেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী, উহার সাহায্যে পদার্থটাকে চূর্ণ কর—অস্ত্রের ক্ষমতায় যতটা কুলায়, ততটা সূক্ষ্ম অংশে চূর্ণ কর। এই চূর্ণগুলিই ঐ পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ, এইরূপ বলিতে তোমার অধিকার জন্মিবে। ভবিষ্যতে যদি কেহ ক্ষমতাশালী কোনও অস্ত্রের আবিষ্কার করিয়া জড়কে আরও সূক্ষ্ম-তর অংশে বিভক্ত করিতে পারেন, তবে ঐ সূক্ষ্মতর খণ্ডগুলিই তখন হইতে ঐ পদার্থটার সূক্ষ্মতম অংশ বলিয়া গৃহীত হইবে। কিন্তু এইরূপ আবিষ্কার যতদিন না ঘটিতেছে, ততদিন তোমার কথা কাহারও অবহেলা করিবার উপায় নাই।

৫২। এখন মানুষ কেবল অস্ত্রের আবিষ্কার করিতে পারে, উহা সৃষ্টি করিতে পারে না—উহার উপাদান বা ধর্ম্ম কোনটারই সৃষ্টি করিতে পারে না। কলম্বস্ আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আমে-রিকা সৃষ্টি করেন নাই। নিউটন গ্রহে গ্রহে

আকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন ; গ্রহগুলি বা আকর্ষণের নিয়মটা নিউটনের আদেশে উদ্ভূত হয় নাই। একখানা কাঁচের কলমের সাহায্যে নিউটন সূর্য্যের সাদা আলোক ভাঙ্গিয়া উহা হইতে বিভিন্ন রং বাহির করিয়াছিলেন ; নিউটন ঐ বর্ণ গুলির বা কাঁচের ঐ বিশ্লেষণ ক্ষমতার সৃষ্টি করেন নাই। শুধু আবিষ্কারেই মানবের অধিকার, তোমার আমার সকলেরই অধিকার আছে ; সৃষ্টি কার্য্যে অধিকার কাহারও নাই।

৫৩। শুভ্র আলোকের অন্তর্গত রক্ত, নীল, পীত প্রভৃতি বর্ণগুলিকে পৃথক করিয়া ফেলিবার পক্ষে একটা কাঁচের কলম একখানা খুবই ধারাল অস্ত্রের কাজ করে। নিউটনের পূর্ব্বোক্তও ইহা একখানা তীক্ষ্ণ অস্ত্র ছিল, নিউটনের পরেও—ইহা একখানা তীক্ষ্ণ অস্ত্রই রহিয়াছে ; কিন্তু উহা যে তীক্ষ্ণ অস্ত্র, ইহা দেখিবার জন্য নিউটনেরই আবশ্যক হইয়াছিল। সেইরূপ জড় পদার্থকে খণ্ড খণ্ড করিবার পক্ষেও জল, বায়ু, তাড়িত প্রভৃতি অস্ত্রগুলি প্রকৃতিতে বিদ্যমান রহিয়াছে ; কিন্তু ইহারা যে এক এক খানা প্রকৃষ্ট অস্ত্র, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে নিউটন জাতীয় লোকেরই আবশ্যক হইয়াছিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পুরাতন।

(১)

ভাঙ্গা হাটে কি হইবে আর,
বেপারী তোমার
পুণ্যগুলি গুটাও এবার,
পুরাতন ভেঙ্গে যাক, নূতন উঠুক এ সংসার।

(২)

ওই আসিতেছে শতধার
শত দিক হ'তে
হের কত নব নব পথে
জাহ্নবীর ধারা সম পূত বারি নব বরষার।

(৩)

হাসি হাসি তরঙ্গ তুলিয়া,
নবীনতা ল'য়ে,
আশার বারতা কয়ে কয়ে,
ঊর্দ্ধ মুখে ছুটে আসে দেখ চাহি নয়ন মেলিয়া।

(৪)

সয়ে যাও আজি পুরাতন,
ধূলি মলরাশি
যুগে যুগে জমেছে যে আসি
ধুয়ে যাক্ মুছে যাক্ নূতনে হাসুক এ ভুবন।

(৫)

বসন্তের নবীন ঊষায়
সহস্র কিরণ
স্নেহধারা করে বরিষণ
অই যে ধরণী পৃষ্ঠে সে যেন গো বৃথা নাহি যায়।

(৬)

জীর্ণ বাস শীর্ণ তনু তুমি
অক্ষম দুর্ব্বল,
ক্ষীণ দৃষ্টি চোখে আসে জল,
কি ফল ক্রন্দনে তবে বল আর সিক্ত করি
ভূমি ?

(৭)

ওই আসে মহাশক্তিধর
আপনার পথ
ভেঙ্গে চুরে করি মনোমত
নূতন-দিগন্তে অই গর্জ্জে তার শোন কণ্ঠস্বর।

(৮)

নূতনেরে বরি লও আসি
ভগ্ন গৃহে তব,
যে কিছু সুন্দর আছে সব,
স্নেহে ধরি কর তার উপহার দেহ আজি হাসি।

(৯)

খোল তব বিরাট মন্দির,
মুক্ত কর দ্বার,
হয়ে যাক জীর্ণের সংস্কার,
পর নববাস, ফেল পূতিগন্ধি সে মলিন চীর।

(১০)

হের নবদীক্ষা দিনে আজি
উঠেছে হাসিয়া
আনন্দের আহ্বান শুনিয়া,
উৎসুক নয়ন ধরা দীক্ষার নবীন সাজে সাজি।

(১১)

হের মন্ত্র লভিবে আশায়
কি শুভ্র বরণে
কান্তি তার ভাতিছে বদনে
উৎসবের দিনে তবে দাঁড়াওনা হয়ে অন্তরায়।

(১২)

নূতন সে কোমর বাঁধিয়া
নূতন জগতে
খাটুক এ কর্ম্মময় পথে
তোমার ত গেছে দিন দূরে, তবে দেখ
দাঁড়াইয়া।

(১৩)

তুমি এবে লহ গো বিশ্রাম,
লোলচর্ম্ম ল'য়ে,
ক্ষীণ করে, নতশির হ'য়ে
অপরের বিঘ্নরূপে কি হবে খাটিয়া অবিরাম?

(১৪)

হের ওই নব জাগরণ,
নব নব আশা,
অতৃপ্তের আকুল পিপাসা,
ভগ্ন কলসীর জলে পারিবে কি করিতে পূরণ?

(১৫)

শৈবালে জড়িত তব বারি
ফেল ত্বরা করি
ওই আসে পূর্ণ কুম্ভ ভরি,
স্বপেয় লইয়া কক্ষে নব রাণী, দেহ পথ ছাড়ি।

(১৬)

মধু যদি করেছ সঞ্চিত
দেহ ঢালি তবে
আজিকার বসন্ত উৎসবে
পূর্ণ কুম্ভে নবীনার, 'তৃপ্তি' হ'ক 'মধুরে'
মিলিত।

(১৭)

দর্পভরে তুমি একদিন
এমনি করিয়া
এসেছিলে নাচিয়া নাচিয়া
জয়ের পতাকাখানি উচ্চে হেথা করিয়া উড্ডীন

(১৮)

সে কর্ত্তব্য করেছ সাধন,
হাসি আজি তবে
তব স্মৃতিচিহ্ন রাখি ভবে
বিজয়ী বরের মত চলে যাও ওহে পুরাতন।

(১৯)

চক্রে গাঁথা তুমি পুরাতন
নূতনের সনে,
কিবা লাজ তব আগমনে,
নূতন পুরাণ ল'য়ে পূর্ণ এই সৃষ্টির বন্ধন।

(২০)

নূতন ত তব পরিণাম,
অবিরাম গতি
বিশ্বে লয়ে ছুটিছে নিয়তি
অনন্ত কালের পথে,এ যে তার ক্ষণিক বিশ্রাম

(২১)

এ বিবর্ত্তে তোমারি মঙ্গল,
ঘুচিবে এবার
ভুল ভ্রান্তি আছে যা তোমার,
নূতন সোহাগা যোগে গলি তুমি হইবে উজ্জ্বল।

(২২)

আজি তবে দাঁড়াও সরিয়া
হে পলিত-কেশ!
নবীনেরা করুক প্রবেশ
চেয়ো না কুটিল মনে তার পানে ভ্রূকুটি করিয়া।

(২৩)

উঠিয়াছে দুন্দুভি বাজিয়া
কর যে শ্রবণ,
লক্ষ কণ্ঠ গাহে আবাহন,
জেগেছে জগৎ আজি নূতনেরে লইবে বরিয়া।

(২৪)

যৌবনের সৌন্দর্য্য তোমার
দুরন্ত সময়
চেয়ে দেখ করিয়াছে ক্ষয়
একটী একটী করি খসি পড়ে সম্পদ শোভার।

(২৫)

ওই তব পুষ্প আভরণ
পড়িছে ঝরিয়া,
পত্রগুলি গেছে শুকাইয়া,
গন্ধ তব লুটে নিক নূতনের মত্ত প্রভঞ্জন।

(২৬)

ওই শোন বাণী দেবতার—
এসেছে নূতন
দিতে সবে নবীন জীবন,
কে আর শুনিবে তবে সেই চির কাহিনী তোমার?

(২৭)

তোমার ত যেতে হ'বে সরে
আদেশ তাঁহার,
কি কাজ বিলম্বে তবে আর,
নূতন দাঁড়ায়ে দ্বারে মানবের মঙ্গলের তরে।

(২৮)

ঢাকি তবে ফেল আপনায়
ওহে পুরাতন,—
ব্রীড়ানতা বধুর মতন,
নূতনের অন্তরালে বিকাইয়া সরবস্ব তায়।

শ্রীনলিনীনাথ দাসগুপ্ত।

বিবেকানন্দ স্বামী।

ভারতভূমি চিরদিনই ধর্ম্মপ্রাণ। এ জাতি চিরদিনই শাস্ত্র ও আচারানুরাগী। এখানকার যুদ্ধের নাম ধর্ম্মযুদ্ধ, যুদ্ধক্ষেত্রের নাম ধর্ম্ম-ক্ষেত্র, সংসার-সঙ্গিনীর নাম ধর্ম্মপত্নী। অত্যাচারীর প্রবল উৎপীড়নে বারম্বার পর্য্যুদস্ত হইয়াও এ জাতি আপনার ধর্ম্ম বিক্রয় করে নাই, দেশজয়ী বিধর্ম্মীর অধীনতা স্বীকার করিয়া এ জাতি আপনার সমাজ বিজিত হইতে দেয় নাই। নূতনের আকর্ষণে, লোভে বা মোহে সহজে আত্মহারা হইয়া সনাতন আচার পদ্ধতি ত্যাগ করা এ জাতির প্রকৃতি নহে। এখানকার তপস্বীরা হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে তপঃফল সঞ্চিত রাখে, এখানকার ব্রাহ্মণপল্লীর নিস্তব্ধ ছায়াতলে ধর্ম্মধন আগুলিয়া বসিয়া থাকে। এই অধঃপতিত যুগেও জীবন্মুক্ত ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভক্ত সাধক রামপ্রসাদের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছে। এই দুর্দ্দশাপন্ন দেশেও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের অমূল্য উপদেশ সজীব মন্ত্রের মত কার্য্য করিতেছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পুণ্যময়ী ভাব-জ্যোতিঃ লাভ করিয়া তিনি দেশ বিদেশে সনাতন ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, দেশের ধর্ম্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে কোন নূতন ধর্ম্ম সম্প্রদায় গঠন না করিয়া, যিনি প্রকৃত মহাপুরুষের অবলম্বিত পথ গ্রহণ করিয়াছেন, —সেই বিশ্ব-বিশ্রুত-কীর্ত্তি মান মহাত্মা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও তাঁহার ধর্ম্ম মতের আলোচনা করিবার জন্য আমরা আজ উপস্থিত হইয়াছি। আমরা দেখাইব, স্বামীজী বেদ-সংহিতার অনুশাসন মাথায় করিয়া, সনাতন ধর্ম্ম ও আচারের জয় ঘোষণা করিয়া, বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রামাণ্য মানিয়া, দেশের প্রকৃতি অনুসারেই ধর্ম্মোপদেশ দিয়া গিয়াছেন। জাতির গঠন করিতে যাইয়া জাতির ধ্বংস সাধন করা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, রামকৃষ্ণ দেবের ভাবের দ্যোতনায় চালিত হইয়া স্বজাতির মধ্যে একটী নবীন জাগরণের ভাব ফুটাইয়া দেওয়াই তাঁহার কার্য্য ছিল।

বিবেকানন্দ—শত শত উন্মার্গগামী যুবককে সংযম ও ধর্ম্ম পথে আনয়ন করিয়া, আচার-ভ্রষ্ট, উপেক্ষিত, জন-সমূহকে সেবা-ব্রতে দীক্ষিত করিয়া, দেশ বিদেশবাসীগণকে বেদান্ত ধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা স্বীকার করাইয়া তিনি উনবিংশ শতাব্দীর অবতারের মত পূজ্য হইয়া আছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব ব্রাহ্মণ, ম্লেচ্ছদেশে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে উপনিষদ ধর্ম্মে অনুরক্ত করা তাঁহার পক্ষে ঠিক ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য হইবে না বলিয়াই কি তিনি বিবেকানন্দকে নিজ হাতে গড়িয়াছিলেন? মাতৃভক্ত প্রভু আপনার অলৌকিক শাক্ত সাধনার ফল জলন্ত উদ্দীপনা আকারে বাহির করিয়া নিদ্রিত আপামর সাধারণকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য কি বিবেকানন্দকে নব শক্তি দান করিয়াছিলেন? অনেক তপস্বীরা জগতের কোলাহল, স্বার্থপরতা, রমণিকাঞ্চন-সেবা ও প্রতিযোগিতা হইতে দূরে থাকিয়া সাধারণের অনুসরণের অতীত হইয়া থাকেন। বিবেকানন্দের গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব সংসারে থাকিয়া নির্লিপ্তবৎ অবস্থিতি করিয়া সর্ব্ব সাধারণের চক্ষের উপর আপনার মাহাত্ম্য প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন, বিশ্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া মঙ্গলের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া দিয়াছেন। আত্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জগতের ভাবনা ভাবিয়া, অভাব আকাঙ্ক্ষার দিকে লক্ষ্য করিয়া সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে তিনি একটী নবীন ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ দেবের ভাবই কর্ম্মরূপে বিবেকানন্দে প্রকাশ পাইয়াছিল। রামকৃষ্ণ দেবের সাধনা মূর্ত্তি ধরিয়া পতনের নিম্নতম গহ্বর হইতে দেশকে টানিয়া তুলিবার জন্যই বিবেকানন্দের আশ্রয় লাভ করিয়াছিল।

এতদিন ইউরোপ বিজিত, পদানত ভারতবাসীকে বিলাসের বাহ্য ভাবের দানবীয় অভ্যুদয়ের চিত্র দেখাইয়া অল্পে অল্পে আকৃষ্ট করিতেছিল, ধীরে ধীরে ভারতবাসীকে খ্রীষ্টধর্ম্মের মদিরা পানে বিহ্বল করিয়া, তাহাদের স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব নষ্ট করিবার যত্ন পাইতেছিল; আর আজ রামকৃষ্ণের মাহাত্ম্যে, বিবেকানন্দের প্রাণপন যত্নে ভারতের ধর্ম্ম সপ্ত সিন্ধু পার হইয়া আজি ইউরোপকে আক্রমণ করিয়াছে। আপনার জিনিষ কত বড়, তাহা দেখাইয়া দেশের শিক্ষিত যুবকগণকে পাশ্চাত্যের প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া স্বামীজী প্রকৃত যে কি

মহাকার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা একবাক্যে বলিয়া শেষ করা যায় না।

তাঁহার কথা দেশ শুনিবে না? ইয়ুরোপ আমেরিকা যে সাদরে শুনিয়াছে। বাঙ্গালী-বিদ্বেষী কত সাহেব হ্যাটকোট খুলিয়া গৈরিক বসন গ্রহণ করিয়াছে, বাইবেল ফেলিয়া গীতা ধরিয়াছে, খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ছাড়িয়া আর্য্য ধর্ম্মের সেবা করিতেছে। এ সকল কথা যখন মনে হয়, তখন ভাবি, কি অতুলনীয় অমৃতময়ী মহতী প্রতিভা লইয়াই স্বামীজী এই অলস নিষ্ক্রিয় বাঙ্গালী জাতির মধ্যে দেবতার কল্যাণের মত অবতরণ করিয়াছিলেন?

(২)

১২৬৯ বঙ্গাব্দের ২৯ শে পৌষ, সোমবার, স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতার সিমলা নামক স্থানে এক কায়স্থ কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বিশ্বনাথ দত্ত একজন হাইকোর্টের এটর্ণি ছিলেন।

তখনও প্রভাত হয় নাই। রজনীর তমোময়ী যবনিকা ভেদ করিয়া উদয়, তোরণ দ্বারে তপনের রম্যবর্ণ তখনও আত্ম প্রকাশ করে নাই। দিবারাত্রির সন্ধি পুণ্যময়ী ঊষায়, নিশাবসানে শুকতারার মত বিবেকানন্দের আবির্ভাব। দত্তবাটীর অন্তঃপুরে মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি শুনিয়া কে ভাবিয়াছিল যে, সূতিকা-গৃহের এই স্বর্ণরাগে একদিন সারা বিশ্ব রঞ্জিত হইয়া উঠিবে, কে ধারণা করিয়াছিল, এই নবজাত শিশু একদিন বিশ্বের প্রাঙ্গণে অবতরণ করিয়া অলৌকিক খেলা খেলিবে?

বিশ্বনাথ পুত্রের নাম রাখিলেন, নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্র বাল্যকালে বড় চঞ্চল, বড় দুরন্ত ছিলেন। একদিন যাঁহার দেহে অনন্যসাধারণ শান্ত গাম্ভীর্য্য উপরে বাহিরে ফুটিয়া বাহির হইত, তাহার কোন চিহ্নই সেই শিশুতে দৃষ্ট হয় নাই। নরেন্দ্রের চাঞ্চল্যে ও দুষ্টামীতে সকলেই কৌতুকই অনুভব করিত, কাহাকেও বিরক্ত দেখা যাইত না। বিদ্যালয়ের সকল বালক অপেক্ষা নরেন্দ্রের বুদ্ধি, নরেন্দ্রের প্রভাব প্রতিপত্তি অধিক ছিল, শিক্ষকেরা তাঁহার বুদ্ধি, প্রতিভা ও চিত্তবল দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার যুক্তিতর্ক শুনিয়া অনেক বৃদ্ধের মাথা ঘুরিয়া যাইত।

নরেন্দ্র যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এ-ফে পড়িবার জন্য জেনারল অ্যাসেমব্লি কলেজে ভর্ত্তি হইলেন, তখন ইংরাজী শিক্ষার নাস্তিকতায় প্রায় ছাত্র মাত্রকেই অল্প বিস্তর আক্রান্ত দেখা যাইত। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব নরেন্দ্রকেও বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ধর্ম্মজীবন গঠনের কতকগুলি উপাদান তিনি ইংরাজী শিক্ষা হইতেই লাভ করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার দ্বন্দ্ব-চঞ্চল চিত্ত এক বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইতে পারিত না বলিয়া, তাঁহাকে কখন "ব্রাহ্ম সমাজে", কখনও পাদ্রী সকাশে, কখনও বা মৌলবী মসজিদে লইয়া যাইত। বসন্তের পুষ্পবিলাসী মধুপের মত তিনি সম্প্রদায়ের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার গতি ছিল, ব্রাহ্মসমাজে। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণের বক্তৃতায় তাঁহার তদানীন্তন ধর্ম্মমত গঠিত হইয়াছিল। যুক্তিহীন অন্ধ সংস্কার তাঁহার উপর প্রভুত্ব করিতে পারিতেছিল না। ভবিষ্যতে যাহাকে জগতের শিক্ষার জন্য হিন্দুর বেদোপনিষদের

মত দার্শনিক সিদ্ধান্তকে আধুনিক বিজ্ঞানের ছাঁচে ঢালিয়া শিক্ষিত নর নারীর উপর প্রভুত্ব স্থা করিতে হইবে, এখনই তাহার সূচনা দেখা ইতেছিল।

(৩)

এই বয়সে নরেন্দ্র ঘোর সংশয়বাদী। কোন ধর্ম্মেই তাঁহার তাদৃশ আস্থা জন্মে নাই; কোন ধর্ম্ম-প্রচারকের বক্তৃতাই তাঁহার সন্দেহ নিরাস করিতে পারে নাই, কোন পণ্ডিতের যুক্তিই তাঁহার প্রাণে লাগে নাই—কাজেই নরেন্দ্র ঘোরতর সংশয়বাদী। কেহ স্বীয় অমার্জ্জিত বুদ্ধির জড়তার জন্য সংশয়বাদী, কেহ কুতার্কিকের তর্ক শক্তির নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া সংশয়বাদী; নরেন্দ্র সেরূপ সংশয়বাদী ছিলেন না। সকল ধর্ম্ম মত গুলি তন্ন তন্ন রূপে বিশ্লেষণ করিয়া শেষ মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারিয়া নরেন্দ্র সংশয়বাদী হইয়া পড়েন। তাঁহার সেই কোমল অন্তরে এমন একটী তীব্র ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল—যে ব্যাকুলতা তাঁহার সুকুমার জীবনকে ভবিষ্যতে ঈশ্বরনিষ্ঠ করিয়াছিল। এই ব্যাকুলতার জন্যই একদিন প্রভু রামকৃষ্ণের কৃপালাভ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিতে দেখা যায়।

একদিন যাঁহাকে সমগ্র সভ্য জগতের পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে আপনার পায়ে ভর দিয়া দণ্ডায়মান হইতে হইবে, তাঁহাদের নানা মতজালের মধ্যে আপনার ধর্ম্মমতকে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে, তাঁহাকে যাবতীয় ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব গুলি বিশেষরূপ আয়ত্ত না করিলে চলিবে কেন?

নরেন্দ্র কিশোর বয়সে মৌলবী, ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-প্রচারক,পাদ্রী ও সাধু সন্ন্যাসী দেখিলেই জিজ্ঞাসা করিতেন, "আপনারা কি কেহ পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ করিয়াছেন?" উত্তরে শুনিতেন "না"। তাঁহার আকুল অন্তঃকরণ সে উত্তরে স্রোতের মুখে বেতস লতার মত নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িত। বাল্যকাল হইতে তিনি সাধু সন্ন্যাসীর ভক্ত ছিলেন, সাধু সন্ন্যাসী দেখিলেই তাঁহাদের সম্মুখে দীন শিষ্যের মত উপস্থিত হইতেন; কিন্তু কোথাও তাঁহার সংশয় মিটিত না, দ্বিধা ঘুচিত না। এই সময়ে তিনি কতকটা নাস্তিক-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন। এইরূপ সংশয় বিপ্লবের চক্রব্যূহে দিশাহারা নরেন্দ্র যখন "কোথা পথ, সত্য কি"—ইহার সন্ধানে ছুটাছুটি করিতেছিলেন, সেই সময়ে—যৌবনের সন্ধিক্ষণে—সেই পবিত্র মাহেন্দ্র মুহূর্ত্তে—মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ লাভ করেন। রামকৃষ্ণ দেব প্রথম দর্শন দিনেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন—ইহলোকের কর্ম্মক্ষেত্রে এতদিনের পর তাহার উত্তর সাধক মিলিয়াছে;—তাহার ভাব কর্ম্মের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত করিবার মত মহাপ্রাণ মহাজন জুটিয়াছে।

এই কাম-দুহ কল্পদ্রুমের স্নিগ্ধ চরণচ্ছায়াতলে বসিয়া নরেন্দ্রের অভীপ্সিত ফললাভ। এই তত্ত্বদর্শী ঈশ্বরলীন মাতৃভক্ত মহাগুরুর প্রসাদে তাঁহার দীক্ষা ও সাধনা।

নরেন্দ্রকে দেখাইয়া প্রভু রামকৃষ্ণদেব অন্যান্য ভক্তদের বলেন—

"এই ছেলেটাকে দেখছ,এখানে একরকম দুরন্ত ছেলে, যখন বাবার কাছে বসে, জুজুটি আবার চাঁদনীতে যখন খেলে, তখন আর এক মূর্ত্তি। এরা নিত্যসিদ্ধের থাক, এরা সংসারে কখনও বদ্ধ হয় না, একটু বয়স হইলেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে

চ'লে যায়। এরা সংসারে আসে জীবশিক্ষার জন্য, এদের সংসারের কাজ কিছু ভাল লাগে না—এরা কামিনীকাঞ্চনে কখনও আসক্ত হয় না।"

প্রভু রামকৃষ্ণদেবের সহিত নরেন্দ্রনাথের পরিচয়, আত্মায় আত্মায় পরিচয়; জ্ঞান ও কর্মের মিলন। রামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রকে বড়ই ভালবাসিতেন। এ ভালবাসায় মন্দারের মধু মাখান ছিল! স্বর্লোকের অমৃত থেকে এ ভালবাসা স্নিগ্ধ ছিল, আশীর্ব্বাদের নির্ম্মাল্য-কুসুম-সৌরভে ইহা সুগন্ধিপূর্ণ ছিল। নরেন্দ্রনাথের হৃদয় আকাশবৎ উদার ও মহৎ। নরেন্দ্রনাথের মন তত্ত্বানুসন্ধিৎসায় ব্যাকুল; নরেন্দ্রনাথের প্রাণ দেশবাসীর দুঃখে দ্রবময়। রামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রের "তৃণীকৃতজগৎত্রয়সত্ত্বসারা" দৃষ্টির মধ্যে শান্তির নির্ম্মল নির্ঝরিণী প্রবাহিতা দেখিতেন, ইহার দেহের অভ্যন্তরে আর্যজ্যোতির লহরী-লীলার পানে সস্নেহ লোচনে তাকাইয়া থাকিতেন। প্রভু যথার্থই বুঝিয়াছিলেন, এই মৃণ্ময়ের ভিতর চিন্ময়ের লীলা দেখিয়া নিখিল সংসার ধন্য হইবে, ভারতবাসী নূতন শিক্ষালাভ করিয়া মানুষ হইয়া দাঁড়াইবে।

নরেন্দ্রের কণ্ঠস্বরে নৃত্যপরায়ণা অপ্সরার নূপুর সিঞ্জিতের আভাস পাওয়া যাইত; দূর হইতে শুনিলে সহসা কিন্নরীকণ্ঠ বলিয়া ভ্রম হইত। সেই কিন্নরীসম সুমিষ্ট কণ্ঠে—দক্ষিণেশ্বরে জাগ্রত মা কালীর সম্মুখে যখন মায়ের নাম গীত হইত, তখন নাস্তিকেরও মনে হইত, সেই মন্দিরস্থিত পাষাণ প্রতিমায় কে যেন প্রাণের স্পন্দন বহাইয়া দিত। রামকৃষ্ণদেব তন্ময় হইয়া সেই জীবন্ত সঙ্গীত উপভোগ করিতেন, মায়ের মুখে অস্পষ্ট হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিতে দেখিতেন, সমাগত সকলকার দেহেই অনির্ব্বচনীয় ভক্তিভাবের তড়িৎ-কম্পন অনুভূত হইত।

রামকৃষ্ণদেবের লীলা যতদিন মর্ত্ত্যে প্রকট ছিল, ততদিন নরেন্দ্রের ভক্তভাব, শিষ্যের অবস্থা। এ মূর্ত্তি বড় করুণ, বড় মর্ম্মস্পর্শী। এ মূর্ত্তি বুকে টানিয়া লইতে ইচ্ছা করে—যেন মনে হয়, কত আপনার। প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। রামকৃষ্ণ ভক্ত-শিষ্যের নামকরণ করিলেন, "বিবেকানন্দ স্বামী"। বিবেকানন্দ এই নামটী শুনিলেই চিত্তে একটী কোমল শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব জাগে, আবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়-মিশ্রিত একটী অব্যক্ত ভাবও ফুটিয়া উঠে। মনে হয়, এ হিমাদ্রির অপেক্ষা উন্নত, মহাসমুদ্রের অপেক্ষা অতলস্পর্শ, স্বর্গলোকের চেয়েও পবিত্র। সে উচ্চতার নাগাল পাওয়া যায় না, সে গভীরতা মাপা সম্ভব নহে; সে পবিত্রতার ইয়ত্তা একরূপ হয়ই নাই। রামকৃষ্ণদেবের দীক্ষাগুণে আমাদের নরেন্দ্রনাথ আজ জগজ্জয়ী বিবেকানন্দ। ইঁহার পতাকা-মূলে আজ সমস্ত পৃথিবীবাসী সমবেত। রামকৃষ্ণের সরল উপদেশগুলি দার্শনিক যুক্তির ভিতর দিয়া ওজস্বিনী ভাষায় পৃথিবীতে প্রচার করাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। স্বার্থপর আপনাদের ভোগময় যুগে নিঃস্বার্থ সেবাব্রতের প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহার প্রাণের বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল। সে আরব্ধ সাধনা যে আজি প্রকৃতই ফলপ্রসূ, সে বিশ্বব্যাপী মহাসভ্য প্রচার যে স্বপ্ন নহে, তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিতেছেন।

(৪)

বিবেকানন্দের ধর্ম্ম-প্রচার।—সে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার! সে এক আশ্চর্য্য

দৃশ্য! পাশ্চাত্যের সর্ব্বোন্নত মস্তক প্রাচ্যের নিকট সসম্ভ্রমে আজ বিনত হইতেছে, ভোগের, বিলাসের ও প্রবৃত্তির কুয়াসা আজ ত্যাগের, শান্তির ও নিবৃত্তির তপনোদয়ে বিলীন হইয়া যাইতেছে। সনাতন ধর্ম্মের জয় আজ উচ্চরবে উদ্ঘোষিত, ভারতের গৌরব আজ মূর্ত্তি ধরিয়া দণ্ডায়মান। সে ধর্ম্মপ্রচারের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত দেওয়া ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নহে। তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার আমেরিকায় বিখ্যাত চিকাগো সভায় প্রথম আরব্ধ হয়। এই সভায় বক্তৃতাই তাঁহাকে বিশ্বের নিকট পরিচিত করিয়াছিল। সেই সভাতে জগৎ বিবেকানন্দকে চিনিতে পারিল।

স্বামীজী ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে প্রথম ব্রতী হইয়া পাশ্চাত্য দেশে গমন করেন। পাশ্চাত্যের পরিচয়পত্র না আনিলে আজকে কেহ তাঁহাকে বড় বলে না, দেশবাসী যে তাঁহার সে কথা মন দিয়া শুনে না। যাহা হউক, স্বামীজীর ম্লেচ্ছদেশ গমন সময়ে অনেকেই তাঁহার কার্য্য হিন্দুধর্ম্মের অনুমোদিত নহে বলিয়া আপত্তি তুলিয়াছিলেন, বিশেষতঃ দেশ যাহার অনুকরণ করিবে, যাহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইবে, যাহার আদর্শে মানুষ হইবার চেষ্টা পাইবে, সেই সাধু সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যের ম্লেচ্ছদেশে গমন বিধেয় নহে বলিয়া দেশের সংবাদপত্রে আন্দোলন হয়। ম্লেচ্ছদেশে গমন করিলে অখাদ্য ভক্ষণ একপ্রকার স্বাভাবিকই। শাস্ত্রেই বলে—নির্ব্বিকার জ্ঞানীগণ শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের অতীত, পাপ-পুণ্য তাঁহাদের স্পর্শ করে না; তাহাদের চিত্ত সর্ব্বদা পরম ব্রহ্মে লগ্ন, সংসারে ভোগের মধ্যে পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত নির্লেপভাবে অবস্থিত। নিম্নোক্ত গল্পটী সত্য হইলে তাঁহাকে জ্ঞানী না বলিয়া থাকা যায় না।

স্বামীজীর পরমভক্ত একজন সাহেব বক্তৃতা প্রসঙ্গে একদিন এই গল্পটী করেন। "একদিন স্বামীজী আহারে বসিতে যাইবেন, এমন সময়ে দেখিলেন যে, একজন মেথর বিষ্ঠাধার লইয়া চলিয়া যাইতেছে। স্বামীজী তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন "ওরে এক কাজ কর, দেখি, ঐ বিষ্ঠার হাতে আমার ভাত মেখে দিয়ে যা।" স্বামীজীর আগ্রহাতিশয্যে মেথর সে আদেশ পালন করিল। স্বামীজী সেই অন্ন অম্লানবদনে মহাতৃপ্তির সহিত ভোজন করিতে লাগিলেন। আহার সমাধার পর স্বামীজী বলিয়া উঠিলেন যে, "এইবার আমি বিলাত যাইতে পারিব, ইহাতে আমার কোন পাপ হইবে না" ইত্যাদি।"

সাধারণের পক্ষে অখাদ্য ভক্ষণ যে পাপকার্য্য,ইহা স্বামীজীর বিশ্বাস ছিল। খাদ্যাখাদ্যের সহিত ধর্ম্মের যে সম্বন্ধ আছে, উহা আমাদের নিকট নূতন নহে। তবে অনেকের নাকি ধারণা, স্বামীজী ওসব মানিতেন না। আমরা তাঁহার বক্তৃতা হইতে দেখাইব, স্বামীজীর মত কি ছিল? তিনি কি মানিতেন বা না মানিতেন।

একদিন স্বামীজীর ধর্ম্ম প্রচার-ভেরীর উদাত্ত স্বর এসিয়া হইতে আমেরিকা, আমেরিকা হইতে ইউরোপ মাতাইয়া তুলিয়াছিল। এই ধর্ম্ম প্রচারের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কত শিক্ষিত নরনারী স্বামীজীর জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। স্বামীজীর কত ভক্ত ও অনুবর্ত্তী শিষ্য প্রশিষ্য আজ ক্রমেই ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। স্বামীজী পাশ্চাত্য জাতির নিকট বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছেন,

তাই আজ বেদান্তের প্রভাব পাশ্চাত্য দেশে এত অধিক। সারা পৃথিবী আজ বেদান্তের নিকট নতশির! কি আনন্দের কথা আমাদের! কি গৌরব এ জাতির! স্বামীজী যে যে স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, সেই সেই স্থলে বহু ব্যক্তি তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কত যুবক—কত উচ্ছৃঙ্খল ইহলোকসর্ব্বস্বযুবক স্বামীজীর ব্রত উদ্যাপনের জন্য আপনাদের অমূল্য ধন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। চাহিয়া দেখ, পৃথিবীর কত স্থানে আজ রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম স্থাপিত, রোগীর রোগ যন্ত্রণা দূর করা, দুঃখীর দুঃখ অপনোদন করা, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দেওয়া পরম ধর্ম্ম। এই আদর্শ লোক-চক্ষুতে প্রকট করিবার জন্যই যে রামকৃষ্ণ-দেব রোগী ও দুঃখী হইয়া এই পৃথিবীতে আসেন। কলির ব্রাহ্মণের মধ্যেও ব্রাহ্মণের মধুর জ্যোতি, ভগবানের মঙ্গলময়ী করুণা যে দৃষ্ট হইতে পারে, তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ দেখাইবার জন্য যে রামকৃষ্ণ দেব আবির্ভূত হন, সরল উপদেশ দিয়া সমন্বয়ের পথ নির্দ্দেশ করিবার জন্য প্রভু যে আপামর সাধারণকে সরল মিষ্ট কথামৃত বিতরণ করেন, সেই আদর্শ ব্রাহ্মণের, সেই পরম ভক্ত তত্ত্বদর্শীর শিষ্য ও ভক্ত বিবেকানন্দ গুরুর উপদেশেই ধর্ম্ম প্রচার করেন, দীন ব্রত গ্রহণ করিবার জন্য দেশকে উদ্বুদ্ধ করেন। স্বামীজী মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার যাহা কিছু সবই গুরুর কৃপায়। তাঁহার সাফল্য, যশ ও সম্মান, সবই রামকৃষ্ণ দেবের বরে।

বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে সেবা-ব্রতের ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে, আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়ার পর্য্যন্ত তাঁহার ধ্বনি শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। এই মহত্তম উজ্জ্বল আদর্শের পানে সারা পৃথিবী চাহিয়া আছে। পরিণামে জগতের সমবেত আকুল দৃষ্টি এই মহত্তম ব্রত পালনে, এই দীন সেবা-কার্য্যে যে পতিত হইবে, তাহা আকাশকুসুম নহে।

স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী শুদ্ধানন্দ—প্রভৃতি কত শিষ্য যে নীরবে আপনাদের ধর্ম্মপালন করিতেছেন, ইহা চাহিয়া দেখিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন। তাঁহাদের প্রাণপাত সেবা দেখিলে বাস্তবিকই তাহা-দিগকে প্রকৃত দয়াবীর বলিতে হয়। শিষ্য-গণের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতার সর্ব্ব প্রধানা। বিবেকানন্দের সাধু চরিত্র, দেশ-সেবা-ব্রত ও অলৌকিক মহত্ত্বে আকৃষ্ট হইয়া দেবী নিবেদিতার স্বদেশের সুখৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া তপস্বিনী উমার বেশে ভারতের চরণে শরীর মন নিবেদন করিতে আসিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা আসন স্বর্গে সতীকুঞ্জের মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া আছে।

স্বামীজীর বক্তৃতাগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায়—তাঁহার উৎসাহ কি জ্বলন্ত অধ্যবসায়পূর্ণ ও কি সজীব ছিল। জগতের জন্য তাঁহার প্রাণ বস্তুতই কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। ভারতবাসীর হিতের জন্য তাঁহার মন সর্ব্বদাই অবহিত থাকিত। তাঁহার আশা কি গগনস্পর্শী, তাঁহার বিশ্বাস কি অটুট, ভগবানের উপর নির্ভর তাঁহার কি অসীম! তাঁহার সহানুভূতি-স্নিগ্ধ উদার দৃষ্টি সমস্ত জাতি নির্ব্বিশেষে দেবতার করুণার মতই বর্ষিত হইয়াছে।

(৫)

আমেরিকার চিকাগো নগরে এক বৃহতী সভা আহূত হয়। সে সভায় পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণ সমাগত হন। এরূপ

বৃহতী সভা, এরূপ ধর্ম্ম-সম্মিলন জগতে আর কোথাও কখন হইতে শুনা যায় নাই। মান্দ্রাজ এসোসিয়েশনের অর্থ-সাহায্যে স্বামীজী সেই সভায় গিয়া উপস্থিত হন। যাইয়া দেখেন, সে এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। সেই অসাধারণ সভায় বক্তৃতা কি আনন্দের! সফলকাম হইতে না পারিলে কি বিষাদ! স্বামীজী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই সে সভায় যান। কি উপায়ে সেই সভায় বক্তৃতা করিতে পাইবেন, তাহা ভাবিয়া স্বামীজী ব্যাকুল হইয়া পড়েন। পাথেয় নিঃশেষিত, সে দেশে কেহ ভিক্ষা দেয় না, ভিক্ষা করিলে সমর্থ ভিক্ষুক তথায় রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়, এমনই নিয়ম। সকলেই অপরিচিত, কে ঋণ দিবে? দেশ বরফাবৃত, শীত অসহ্য, শীতনিবারণোপযোগী গাত্র-বস্ত্রেরও অভাব, সেই দুঃসময়ে মান্দ্রাজবাসীরা অর্থ-সাহায্যে স্বামীজীকে প্রেরণ করিয়া ভারতের মুখ উজ্জল করিয়াছিলেন।

সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তি সম্মুখে কাষ্ঠখণ্ড দেখিতে পাইল, অন্ধকারাচ্ছন্ন বিজন অরণ্যে আলোক-রশ্মি দেখা দিল—স্বামীজীর ভরসা হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে গরিফা-নিবাসী স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় চিকাগো মহাসভায় নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। স্বামীজী দীন ভিখারীর মত মজুমদার মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। সেই সপ্ত সাগরের পারে প্রবাসে সেই নিঃসহায় অবস্থায় স্বামীজী মজুমদার মহাশয়ের নিকট কোনরূপ সাহায্য প্রাপ্তি দূরে থাক, একটী সহানুভূতিপূর্ণ আশ্বাস, একটী মিষ্ট কথা পর্য্যন্ত পাইলেন না! স্বামীজী চক্ষে আঁধার দেখিলেন, তাঁহার উৎসাহ-দীপ্ত মুখমণ্ডল হতাশ-বেদনায় কালিমাময় হইয়া উঠিল। তাঁহার গৌরবোন্নত বক্ষ সে মর্ম্মভেদী আঘাতে দমিয়া গেল। স্বামীজীর ধারণা ছিল, ব্রাহ্মেরা সাধারণত উদার; সে ধারণা ঘুচিয়া গেল।

অল্প ব্যয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে বলিয়া স্বামীজী "কষ্টম" নামক একটী পল্লীতে বাস করার সংকল্প করিলেন। কষ্টমের এক বরফাবৃত পথে—স্বামীজী অনাথের মত পতিত। সে দৃশ্য দর্শন করিলে চক্ষু জলে ভরিয়া আইসে। গৈরিক বসন পরা ভারতীয় যুবকের অবস্থা দেখিলে পাষাণেও উৎস ছুটে, কিন্তু তথাকার লোকেরা চাহিয়াও দেখিল না।

কষ্টমের এক দয়াময়ী প্রৌঢ়া রমণী স্বামীজীর দুঃখে কাতরা হইয়া তাঁহাকে গৃহে স্থান দিলেন। সেই দেবীস্বরূপিণী মহিলার কৃপায় স্বামীজী চিকাগো সভায় প্রবেশাধিকার পাইলেন। দর্শমিনিটমাত্র বক্তৃতার সময় পাইয়া স্বামীজী হাতে স্বর্গলাভ করিলেন।

বক্তৃতা করিতে উঠিয়া স্বামীজী যখন সভার নরনারীকে "আমার ভ্রাতা ও ভগিনী-গণ" এই সম্বোধন করিলেন—তখনই সকলে করতালিদ্বারা সেই মহাত্মার অভিনন্দন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সকল ধর্ম্মপ্রচারকের বক্তৃতার শেষে মাত্র দশমিনিট সময় বক্তৃতা দিবার জন্য স্বামীজী উঠিলেন।

বক্তৃতা আরম্ভ হইল। জলদগম্ভীরস্বরে স্বামীজী বৈদিককালের কথা পাড়িলেন। শ্রোতারা নূতন কথা শুনিল। পৃথিবীর পর-পারে কোন্ অজেয় স্থান হইতে যেন সেই কথাগুলি আসিতেছে। দৈববাণীর মত স্বর্গীয় দেবদূতের আদেশের মত সে কথা সকলে একমনে শুনিল। শ্রোতৃবৃন্দের সেই অসমাপ্ত কথা শুনিবার জন্য প্রবল তৃষ্ণা ও আকুলতা দেখিয়া সভাপতি বক্তৃতার সময় বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। স্বামী ওজস্বিনী ভাষায় গম্ভীরস্বরে বিশ্বের নূতন, পাশ্চাত্যের কাছে অপূর্ব্ব বেদান্ত-

তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন; হিন্দুর জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটী রত্ন খুলিয়া দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। সেই সভা তখন নিস্তরঙ্গ সমুদ্রবৎ, শ্রোতৃমণ্ডলী চিত্র-পুত্তলিকাবৎ অবস্থিত। শ্রোতৃমণ্ডলীর জয়-গানের যশোমাল্য স্বামীজীর মস্তকে নিরন্তর বর্ষিত হইতে লাগিল, সকলের উৎসুক দৃষ্টির রজত কিরণধারা তাঁহার মুখমণ্ডলকে আরও জ্যোতির্ম্ময়, আরও মনোহর করিয়া তুলিল। তাঁহার আদরের আর ইয়ত্তা রহিল না। ভারতের সনাতন ধর্ম্মের জয় ঘোষণা হইয়া গেল।

(৬)

স্বামীজী আকুমার ব্রহ্মচারী। তাঁহার মেঘধ্বনিবৎ গুরুগম্ভীর স্বর, প্রতিভাময়, জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডল, আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টি সকলকে মোহিত করিয়া দিল। পাশ্চাত্য-দেশের তপ্তকাঞ্চনবর্ণা সুন্দরী রমণীরা তাঁহার রূপগুণের পক্ষপাতিনী হইয়া পড়িলেন। বিদ্যুৎভরা মেঘমালা চন্দ্রমাকে ঘিরিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিল।

আমেরিকার কোন ধনবতী সুন্দরী যুবতী একেবারে মুখ ফুটিয়া স্বামীজীর নিকট পরি-ণয়ের প্রস্তাব করিলেন, তাঁহার চরণের দাসী হইবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন। স্বামীজী কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী সন্ন্যাসী, বিবাহ করিবার অধিকার যে তাঁহার নাই—ইহা বলিয়া আপনার অসম্মতি ধীরে ধীরে ব্যক্ত করিলেন। প্রেমযাচ্ঞা বিফল হইলে পর রমণীহৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে। রমণী স্বামীজীকে কহিলেন "যদি আপনার চিরকৌমার্য্য ব্রতগ্রহণ করাই জীবনের সংকল্প ছিল, বিবাহ করিবেন না, ইহাই যদি স্থির ছিল, তবে কেন আপনি পুনঃপুনঃ আমার মুখের পানে চাহিয়াছিলেন? আমি আমার প্রাণ পুষ্পাঞ্জলির মত আপনার চরণে অর্পণ করিতেছি, আপনি তাহা গ্রহণ করিয়া কেন দাসীকে কৃতার্থ করিবেন না?

স্বামীজী হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন, আমি আমার ভারতীয় জননী ও ভগিনী-গণকে দেখিয়াছি, আজ আবার আমেরিকা-বাসিনী জননী ও ভগিনীগণকে দেখিতে-ছিলাম। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি, প্রকৃতিগত ব্যবধান কি? তাহারই অনুসন্ধান করিতেছিলাম। আমি পবিত্র দৃষ্টিতে অনু-সন্ধিৎসা ও কৌতূহল বশেই আপনাদের পানে চাহিয়াছি, উহাতে লালসা বা সৌন্দর্য্যস্পৃহা কিছুই ছিলনা। আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

স্বামীজীর বক্তৃতা (চিকাগো) পুস্তকা-কারে প্রকাশিত হইয়াছে। সে ইংরাজী বক্তৃতার অনুবাদও বাহির হইয়াছে। তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি ভারতের বহুস্থানে যে সকল বক্তৃতা করেন, সে গুলিও অনূদিত হইয়া "ভারতে বিবেকানন্দ" নামক পুস্তক সঙ্কলিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জ্ঞানযোগ প্রভৃতি কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থ এই ভাষার গৌরব স্বরূপে বিদ্যমান। গ্রন্থ গুলি বঙ্গভাষা-ভাণ্ডারে মহামূল্য রত্নসমষ্টি। স্বামীজী সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য "উদ্বোধন" নামক মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হইয়া থাকে।

(৭)

স্বামীজী প্রতিমা-পূজক সাকারবাদী। স্বামীজী ৺রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য। গুরুর সাধ-নার বলে শিষ্যের অভ্যুদয়। গুরুদেবের কালীভক্তি স্বামীজীতে কিছু ছিল। একদিন ভক্ত শিষ্য নরেন্দ্রনাথ গুরুপদে নিবেদন করিলেন, "কয়দিন ত মায়ের নাম জপ করিলাম, কিন্তু দর্শন পাইলাম কৈ?" (রামকৃষ্ণ কথামৃত)

রামকৃষ্ণ দেবের তিরোধানের পর স্বামীজীকে উপদেশ দিতে শুনিয়াছি, "এই কালীই লীলাময়ী ব্রহ্ম।" * কালীই যে লীলাময়ী ব্রহ্মস্বরূপা, কালীও যে, ব্রহ্মও সে, প্রভাত যে, তেজও সেই—এইরূপ ধারণা তাঁহার বদ্ধমূল ছিল। বক্তৃতা প্রসঙ্গে একস্থানে তিনি বলিয়াছেন "অন্য দেশের মহামহা শিক্ষিত ব্যক্তিগণও নাক সিঁট্‌কাইয়া আমাদের ধর্ম্মকে পৌত্তলিকতা নামে অভিহিত করেন। আমি তাঁহাদিগকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি। তাঁহারা স্থির হইয়া এইরূপ ভাবেন না যে, তাঁহাদের মস্তিষ্কে কি ঘোরতর কুসংস্কার বর্ত্তমান!" (স্বামীজীর বক্তৃতা) ভারতে বিবেকানন্দ)।

স্বামীজী দেশহিতকর সংস্কারের প্রবর্ত্তয়িতা, সমাজ-সংস্কার করাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সমাজ-সংহার করা তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। সমাজ মধ্যে বিপ্লবের ঝঞ্ঝাবাত আনিয়া সামাজিকগণের চিত্তে একটী বিভীষিকার সৃষ্টি করা, তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। যাহার যাহা ধর্ম্মমত, তাহা পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন ধর্ম্মমতের দিকে তাহাকে লইয়া যাওয়ার অভ্যাস তাঁহাতে দেখা যায় নাই। স্বামীজী একদিকে অবশ্য ব্রাহ্মণকে জাত্যভিমান ও ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কার ত্যাগ করিতে বলিতেন, অপর দিকে আবার শূদ্রকেও ব্রাহ্মণের উপর ভক্তি রাখিতে পরামর্শ দিতেন। ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ-প্রচার আজি কালি যেন একটী অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষ ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ প্রদর্শন করা যেন কত সাহসিকতা, কত উদারতা, কত নির্ভীক সত্যপরায়ণতার পরিচয়। স্বামীজী উপদেশ দিয়াছেন, "ব্রাহ্মণই আমাদের আদর্শ।......ব্রাহ্মণেতর জাতির ব্রাহ্মণের উপর বড় রাগ।...... সুবিধা পাইলেই ব্রাহ্মণ জাতিকে আক্রমণ করিতে যাইওনা।" (ভারতে বিবেকানন্দ)।

পাশ্চাত্যের কর্ম্ম জীবনের সহিত প্রাচ্যের ধর্ম্ম জীবনের সমন্বয় করাই তাঁহার সংকল্প ছিল। যেরূপে হউক, যে মতই পোষণ কর না কেন, আসল ধর্ম্ম পালন করিয়া যাও, মানুষ হইয়া দাঁড়াও, জগতের বক্ষে সগৌরবে দাঁড়াইয়া থাক—ইহাই তাঁহার উপদেশ।

স্বামীজী জাতি-নির্ব্বিশেষে জ্ঞান চর্চ্চার পক্ষপাতী ছিলেন। আমাদের শাস্ত্রেও শূদ্রের পুরাণাদি শ্রবণের, কোথাও পুরাণাদি পাঠের অধিকারের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণাদি পাঠ ও পুরাণাদি শ্রবণের ফলে যে জ্ঞান জন্মে, তাহার সহিত তুলনা করিলে আজিকালি সাধারণ ব্রাহ্মণদের জ্ঞান তুচ্ছ বলিয়াই বোধ হয়।

স্বামীজী জাতিভেদ-ধ্বংসকারী ছিলেন না, বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহার বাসনা ছিল। তবে জাতিভেদের বর্ত্তমান আকার অবশ্য তাঁহার মনঃপূত ছিল না। আমরাই কি স্বীকার করি না যে, বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠা এক্ষণে নাই। আমরা কি বলি না যে, আজি কালি প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য-তেজ-সম্পন্ন ব্রাহ্মণের একান্ত অসদ্ভাব। জাতি কেবল মাত্র জন্মমূলক নহে, কর্ম্মমূলকও বটে। জন্ম ও কর্ম্ম, দুই দিকেই তাহার দৃষ্টি ছিল। আমাদের সংহিতা ও পুরাণে জাতি, জন্ম ও কর্ম্মমূলক বলিয়াই অভিহিত আছে। জাত কর্ম্ম, অন্নপ্রাশন ও উপনয়নাদি যাবতীয় সংস্কারই জন্মমূলক জাতির অপেক্ষা করে। শিশুর পক্ষে জন্মমূলক জাতি ব্যতীত কর্ম্ম-মূলক জাতি নির্ণীত হইতে পারে না বলিয়াই অবশ্য জন্মমূলক জাতির প্রাধান্য। অগ্রে

* রামকৃষ্ণ-কথামৃত।

জন্মমূলক জাতি, পশ্চাৎ গুণকর্ম্মমূলক জাতি —ইহা শাস্ত্রের কথা। আমাদের শাস্ত্রেই আছে,—

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণঃ" জাতিভেদ সম্বন্ধে স্বামীজীর মত—"আমি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই জাতিভেদ দেখিয়াছি, কিন্তু এখানে (ভারতবর্ষে) ইহার উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ, কোথাও তদ্রূপ নহে। অতএব যখন জাতিভেদ অনিবার্য্য, তখন অর্থগত জাতি অপেক্ষা পবিত্রতা নিমিত্ত আত্মত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত জাতিভেদ বরং ভাল বলিতে হইবে" (ভারতে বিবেকানন্দ)। প্রেমের বন্ধনে জাতিভেদ দাঁড় করানই আমাদের মত। "গুণ নাই, কেবল কুলোপনা চক্র" আমরাও চাহি কি? বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে স্বামীজীর অভিপ্রায় "স্ব স্ব বর্ণকে নিম্ন করিয়া আহার বিহারে যথেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিয়া কিংবা ভোগসুখের জন্য স্ব স্ব বর্ণাশ্রমের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া জাতিভেদ সমস্যার মীমাংসা হইবে না।" (ভারতে বিবেকানন্দ)

স্বামীজী আধুনিক ভোগসুখের জন্য অনাচার, উশৃঙ্খলতা ও যথেচ্ছারিতার আদৌ প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি তারস্বরে বলিয়াছেন "সহরের সব লোক মিলে যেখানে যাকে ইচ্ছা বিবাহ করুক, আর দেশটাকে একটা পাগলা গারদে পরিণত করুক।" (ভারতে বিবেকানন্দ গ্রন্থ)।

আজিকালি সংহিতা ও স্মৃতি শাস্ত্রকারগণের উপর গায়ের ঝাল ঝাড়া, গালিপাড়া, সঙ্কীর্ণ ও পক্ষপাতী বলিয়া যাহা ইচ্ছা তাই বলা, কতগুলির অত্যুদারমন্য শিক্ষিতদের সাংক্রামক ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংহিতা ও স্মৃতিকারগণের উপর স্বামীজীর কি গভীর শ্রদ্ধা ছিল, ইঁহাদের মতের উপর স্বামীজীর কি উচ্চ বিশ্বাস ছিল, তাহা একস্থলে বক্তৃতা শুনিলেই উপলব্ধি করা যায়। "এক্ষণে আমাদিগকে যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহার প্রত্যেকটী আমাদের প্রাচীন স্মৃতিকারেরা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছেন।" (ভারতে বিবেকানন্দ)।

বেদ অপৌরুষেয়—ইহা আর্য্যপণ্ডিতগণের কথা। আর্য্যপণ্ডিতগণ যে কি যুক্তিতে বেদকে অপৌরুষেয়, নিত্য ও ঈশ্বর-মুখ-নিঃসৃত কথা বলিয়াছেন, তাহা বলিবার স্থান এ প্রবন্ধে নাই। ইহার জন্য স্বতন্ত্রভাবে প্রবন্ধ লেখা ব্যতীত বুঝাইবার উপায় নাই। স্বামীজীর ধারণাও তাই ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী-শিক্ষিত, নব্যশিক্ষিত যুবকদের শুনাইয়া স্বামীজী বলিয়াছেন "বেদ কখন লিখিত হয় নাই, বেদের উৎপত্তি নাই। বেদ অপৌরুষেয় ......অনৈতিহাসিকতাই বেদের সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ" (ভারতে বিবেকানন্দ)

যুগে যুগে অশরীরিণী বাণী ঋষি ও সাধক বৃন্দের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া জনসমাজে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাই "বেদস্মর্ত্তার ঋষয়ো ন কর্ত্তারঃ" ঋষিগণ বেদের স্মর্ত্তা, কর্ত্তা নন" এইপ্রকার শাস্ত্রবচন দেখা যায়।

স্বামীজী স্থির জানিতেন যে, চিরাচারিত সনাতন প্রথাগুলির উচ্ছেদ সাধন করিয়া, শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান সমূহের ইতিকর্ত্তব্যতা না মানিয়া নূতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ভারতে সম্ভব নহে। সম্ভব হইলেও তাহা ব্যাপক হইবে না, উপধর্ম্মরূপে খ্যাত হইয়া পড়িবে। কালের কষ্টিপাথরে তাহার রেখা উজ্জ্বল রহিবেনা। এই কারণেই রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে সেবক হও, স্বামীজীর মঠে প্রবেশ কর, দেখিবে হিন্দুর প্রবেশের কোন বাধা নাই। হিন্দুআচারের বিরুদ্ধ যদি কিছু পাও, বলিবে, তাহা ব্যক্তিগত। হিন্দুর

আচার-বিরুদ্ধ কোন কার্য্য যে তোমাকে করিতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। রামকৃষ্ণদেব ও বিবেকানন্দ-ভক্ত এমন দুই চারিজন ব্রাহ্মণকে আমরা জানি, তাঁহারা বিশিষ্ট হিন্দু ব্রাহ্মণ্যাচারপালক ও কালিকা-পূজারত। সনাতন ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে, সনাতন আচার পদ্ধতি দূরে ফেলিয়া নূতন আচার গ্রহণ করিতে হইবে, এরূপ নিয়ম থাকিলে দেখিবে, ইহা ক্রমে বিলীন হইবারই উপক্রম দেখা দিবে।

(৮)

কোন কোন বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মতের সহিত হিন্দু-সাধারণের মতানৈক্য থাকিতে পারে, কিন্তু ইনি যে একজন উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্মপ্রচারক ও সংস্কারক, অসামান্য প্রতিভাশালী, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই শতাব্দীর ধর্ম্মপ্রচারকবর্গের মধ্যে ইনি আকুমার ব্রহ্মচারী, সংসারত্যাগী গৈরিকধারী সন্ন্যাসী। সংসার-মায়ায় আবদ্ধ থাকিয়া স্ত্রীপুত্রের ভাবনা ভাবিয়া জীবিকা উপার্জ্জনের চেষ্টা করিয়া প্রকৃত লোক শিক্ষা দেওয়া একরূপ অসম্ভব। অন্ততঃ দুর্ব্বলচিত্ত মায়ামুগ্ধ মানবের পক্ষে সহজ কথা নহে।

১৩০৯ বঙ্গাব্দে ২০শে আষাঢ় কলুষ-নাশিনী ভাগীরথীর পবিত্র তীরে মহাত্মা নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আজিও সেইস্থানে প্রতিবৎসরে মহাসমারোহের সহিত উৎসব হইয়া থাকে, এই স্থানটীর নামই সর্ব্বজন-পরিচিত বেলুরমঠ।

ধর্ম্ম প্রচারের জন্য দেশকে অবনতির কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া অভ্যুদয়ের সূর্য্যোকরোজ্জ্বল উচ্চভূমিতে আনয়ন করার জন্য স্বামীজী কি কঠোর সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে শ্রদ্ধায় হৃদয় মন ভরিয়া উঠে। তিনি বীরের মত কর্ত্তব্য পথে চলিয়াছেন, সহস্র প্রতিবন্ধকতা একদিনের তরে তাঁহার উদাসীনতা ও অনাশ্বাস জন্মাইতে পারে নাই। দেশের মঙ্গলের জন্য তিনি তাঁহার দেহ-মন-প্রাণ সকলই উৎসৃষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ একাগ্রতা, অধ্যবসায় অনন্যপূর্ব্ব ছিল। দেশ তাঁহার অনুসরণ করুক, ভারতে নরনারী আবার অতীতের জ্ঞান-মাহাত্ম্য লাভ করুক। জগৎস্বামীর সম্মুখে তাঁহার জাতি প্রকৃত মানুষের মত মানুষ হইয়া দাঁড়াক, এজন্য তিনি কি না করিয়া গিয়াছেন। ঐ শোন, স্বামীজীর কণ্ঠস্বর এখনও এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্
নিবোধত"

শ্রীরামসহায় বেদান্ত-শাস্ত্রী।

পত্রাবলী।

পত্র নং ১৯

Monai Tea Estate,
Biswanath.

প্রিয় ক্ষীরোদ,

তোমার ১৫ই তারিখের পত্রখানি পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। গোধন প্রকাশ করিয়া প্রকারান্তরে আমার নাম দিয়াছ, ভালই করিয়াছ। মাসের মধ্যে অন্ততঃ দুইটী article লিখি এরূপ শক্তি নাই, আর অবসরও নাই। দেশের লোকের রুচি কিরূপ, তাহা তোমরাই ভাল জান। আর পত্রিকা প্রকাশের কি উদ্দেশ্য, তাহাও তোমরাই বলিতে পার। আমি

বাহিরের লোক হইয়া কিরূপে Suggestion করিয়া পাঠাইব? লণ্ডনে Daily Telegraph নামে এক কাগজ আছে। দেশীয় লোক কুরুচি পোষণ করে বলিয়া তাহার গ্রাহক সংখ্যা অনেক, লক্ষাধিক হইবে। কিন্তু Daily News দেশে কদাচার ও কুনীতির বিরোধী বলিয়া তাহার গ্রাহক সংখ্যা অনেক কম, ৭০,০০০ হইবে।

তোমাদের উদ্দেশ্য ও শিক্ষিত বা অৰ্দ্ধ-শিক্ষিতদের রুচি অনুসারে পত্রিকা চালিত হইবে।

আমার বোধ হয়, শিবনাথবাবু তত্ত্ব-কৌমুদীতে "কন্যাচতুষ্টয়" নামে যে প্রকার সামাজিক গল্প লিখিয়াছিলেন, সেইরূপ সুরুচি-সঙ্গত গল্প থাকিলে গ্রাহক সংখ্যা অনেক বাড়িবে। আর আরম্ভ হইতে বাঙ্গালাভাষার কবি ও গ্রন্থকারদের গ্রন্থ সম্বন্ধে রজনীবাবু অথবা অপর কাহারও দ্বারা ক্রমে ক্রমে Critical Essays প্রকাশিত হইলেও পত্রিকার খ্যাতি বাড়িতে পারে।

আর রাজনীতি বিষয় তোমরা কি মন্ত্রে দীক্ষিত, জানি না। অপরাপর দেশের রাজদ্রোহিতার বিবরণ পাঠে তত উপকার মনে করি না। জনব্রাইটের ন্যায় যাহারা রাজদ্রোহী না হইয়া স্বদেশে অতি নিষ্ঠুর ও প্রজাপীড়ক নিয়ম সমূহের পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের বিস্তারিত বিবরণ পাঠে উপকার হইবে, মনে করি। তাঁহাদের উদাহরণ আজকাল দেশের অনেকেরই অনুকরণীয়।

আমাদের পুরাতন বন্ধু যোগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে ইতিপুর্ব্বেই পত্রদ্বারা পরিচয় হইয়াছে।

তোমার—শ্রীনাথ।"

সঙ্গণিকা।

(৩৩)

মহাত্মা তিলক বলেন, "আমরা স্বায়ত্ত শাসনের পক্ষপাতী. আমরা দেশ শাসন করিব, কিন্তু দেশ রক্ষা করিবে কি জাপান চীনের লোকের আসিয়া?" তিনি সৈন্যশ্রেণী ভুক্ত হইতে দেশবাসীদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার একমাত্র পুত্রকে সৈনিকশ্রেণীতে দিতেছেন। আরও কত কত মহাত্মা অগ্রসর হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সি, আর দাস মহাশয়ের পুত্রকে সৈনিকশ্রেণীতে দিবেন, কাগজে পড়িয়াছিলাম, শেষে তাঁহাকে আলমোরা পাঠান হইল, শেষে তিনি বিলাতে প্রেরিত হইলেন! সর্ব্বাধিকারী ও মল্লিক যদি আত্মীয়দিগকে সৈন্যশ্রেণীতে দিয়া দৃষ্টান্ত দেখাইতেন, তবে কত কাজ হইত! শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজে কি? নেতারা যদি কথায় এবং কাজে এক হন, তবে অনেক কাজ হয়, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা হইবে কি?

শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন, "দেশরক্ষা-আইনের কঠোর বিধানে এদেশের ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে, এই অবস্থায় সৈনিকশ্রেণীভুক্ত হইতে লোকদের আগ্রহ হইবে কেন?" বাস্তবিক এদেশের লোকদিগকে বিশ্বাস করিলে তাঁহারা প্রাণপণ করিত, কিন্তু সে দিন অনেক দূরে।

মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় কঠোর আইনের প্রতি-বিধানের জন্য লাট-সমীপে গণ্যমান্য প্রতিনিধি-গণ যাইয়া অপমানিত হইলেন; এদিকে করভারের চাপে ভারত ম্রিয়মাণ। ঘরে ঘরে

দুঃখ, আর্ত্তনাদ করিয়া ফিরিতেছে! ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ, লোকের আয় নাই বলিলেও হয়। ঘরে ঘরে বিষাদের ছায়া! এই অবস্থায় ভারতবর্ষ কাতরভাবে শুধু বিধাতাকে ডাকিতেছেন—হায়! এ কাল-সমর কবে শেষ হইবে, কবে সুদিন আসিবে! কে জানে, কবে!!!

(৩৪)

মানুষ অন্যকে ধার্ম্মিক করিতে যত অগ্রসর, নিজে ধার্ম্মিক হইতে তত প্রস্তুত নন্। যদি তাহা হইত, ব্যবসাদারী ধর্ম্ম জগতে লোপ পাইত, ঘরে ঘরে পুণ্যোজ্জ্বল লোকের আবির্ভাব হইত। এখনকার ধর্ম্ম সাধন যেন পয়সা রোজগারের একটা উপায়মাত্র। কত কত সম্প্রদায় উঠিয়াছে, কতকত স্বামী ও গিরির অভ্যুদয় হইতেছে, কত কত ধর্ম্মপ্রচারক সৃষ্ট হইতেছেন, তাঁহারা কেবল অর্থ সংগ্রহের জন্য লালায়িত। সেদিন এক ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, "স্বামী বা গিরিগণ কেবল বড় বড় লোকের বাড়ী ফেরেন কেন? শুধু টাকাই কি উদ্দেশ্য নয়? এ এক বেশ রোজগারের উপায় আবিষ্কার হইয়াছে।" ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ সমাজ হইতে টাকা পান, আবার কত অবস্থার পোষকতায় শিষ্য প্রশিষ্যের নিকট হইতে ভেট আদায় করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ব্যবসাদারী প্রচারক কমাইয়া গৃহস্থ প্রচারক বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। কিন্তু যে সব কেটিকিষ্ট শ্রেণীর প্রচারক আছেন, তাঁহারা জোঁকের ন্যায় লোকদিগের রক্ত শোষণ করিতেছেন। ইহা কি সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ থামাইতে পারেন না? না, সে সব জানেন না? চক্ষু থাকিতে তাঁহারা অন্ধ হন কেন? জেনেরেল বুথের আত্মীয়দিগকে তিনি প্রচারক করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণের ছেলেদিগকে প্রচারক না করিয়া অন্য পথে চালিত করেন কেন? এবং সেজন্য অর্থ ভিক্ষাই বা করেন কেন? সাধনার অঙ্গ যদি প্রচার হয়, তবে বংশপরম্পরায় সেপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয় না কেন? যজন যাজন, পূজা অর্চ্চনা এখন কেবল পয়সা-রোজগারের অবারিত-দ্বার ফন্দিতে পরিণত হইয়াছে? হায়, সমাজের পরিণাম কি?

(৩৫)

এদেশে কতকগুলি চিন্তাহীন লোক আছে, যাহারা হই-চই করিতে পারিলেই যেন বাঁচিয়া যায়। তাহাদের নাম করিলে সুখের হইবেনা, কিন্তু সর্ব্বত্র এশ্রেণীর লোক দেখা যাইতেছে। সহৃদয় পাঁচকড়ির তীব্র লেখায়ও কিছুতেই সে সব থামিতেছেনা। যখন "স্নেহলতা" আত্মহত্যা করিলেন, এমনই তাঁহারা হই-চই করিয়া উঠিলেন। কোথায় কোন গুরু কোন মেয়েকে মজাইয়াছিলেন, সেই কথা লইয়া কিছুদিন খুব হই-চই চলিল। যে যুদ্ধ সর্ব্বপ্রকারে পৃথিবীর সর্ব্বনাশ করে, সেই যুদ্ধে সম্বন্ধে কত কি হই-চই চলিতেছে। যেন সকলে দালালির পাট্টা পাইয়াছে। আজকাল আবার "স্বায়ত্তশাসন" লইয়া একটা হই-চই চলিতেছে। শাশ্বতী যাহাকে বলেন, বড়দিনের "রঙ্গতামাসা";—তাহাকেই আমরা হই-চই বলি। স্বায়ত্ত শাসন আয়রল্যাণ্ড পাইল না, আর ভারত পাইবে? বড় বুকের পাটা. চরিত্র পাইলে না, নিঃস্বার্থতা কাহাকে বলে, বুঝিলেনা, দরিদ্র নারায়ণদিগের আর্ত্তনাদে কাণ দিলেনা, অথচ তোমরা দেশ শাসন করিবে? "তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে" হাজার পা-চাটিলেও কিছু হইবে না।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমলোচনা।

৪৪। গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যনীতি। ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু, এম-বি সম্পাদিত, মূল্য তিন আনা। এক এক জন ক্ষণ-জন্মা পুরুষ আসেন, তাঁহাদের জীবনের ব্রত শুধু দশের এবং দেশের মঙ্গল করা। শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু মহাশয় সেই শ্রেণীর লোক। এই মহাত্মা কতরূপে যে দেশের মঙ্গল সাধন করিতেছেন, ভাবিলে অবাক হইতে হয়। সে সব বিবৃতির এস্থান নয়। এইরূপ পুস্তক প্রচার তাঁহার অন্য প্রকার কীর্ত্তি। এই পুস্তকে আধুনিক সময় পর্য্যন্তের সার তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ঘরে ঘরে এই পুস্তক আদৃত হইবার যোগ্য।

৪৫। স্বাস্থ্যনীতি (ব্যক্তিগত) উপরোক্ত গ্রন্থকার প্রণীত, মূল্য দুই আনা। এখনিও উপাদেয় পুস্তক। প্রতি ছাত্রছাত্রীর পাঠ করা বিধেয়।

৪৬। তাপসী। শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত, মূল্য এক টাকা। পুস্তকখানিকে মহিলাদিগের পাঠ্য তালিকা ভুক্ত করা যায় কিনা, ভাবিতেছিলাম। মহাজনদিগের অর্থ সাহায্যে ইহা মুদ্রিত, এজন্য অনেক আশা করিয়াছিলাম। মীরাবাই, সংঘমিত্রা, তপস্বিনী রাবেয়া, সেন্ট টরেসা, সেণ্ট এলিজাবেথ, সেন্ট ক্যাথেরিণ, ম্যাডাম গেয়োঁ, ব্রহ্মবাদিনী কুমারী কব, রাণী শরৎসুন্দরী ও দেবী অঘোরকামিনীর জীবন-কথা। গ্রন্থকার চেষ্টা করিলে এবং একটু যত্ন করিলে গ্রন্থখানিকে মহিলাদের পাঠ্যের উপযোগী করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা হয় নাই। ভাষা আরও মার্জ্জিত হওয়া উচিত ছিল"এখনো.তখনো" প্রভৃতি কথা পরিবর্জ্জিত হইবে নাকি? এই প্রকার কথারই উল্লেখের প্রয়োজন কি, যথা—"তখন কুমারের বয়স সবে মাত্র এগার কি বার বৎসর। দিদি শাশুড়ী সম্পর্কীয়া বর্ষীয়সী মহিলাগণ প্রায়ই বালিকা বধূকে বালক স্বামীর কাছে লইয়া গিয়া ভারি কৌতুক করিতেন। বালিকা তখন স্বামীর কাছে যাইতে মোটেই লজ্জা বোধ করিতেন না; স্বামীকে "লালপাত্র"বলিয়া ডাকিতেন। এক একবার মেয়েরা তামাসা করিয়া বউটিকে কাঁদাইতেন।" এই প্রকার কথায় জীবনের বিশেষত্ব কি যে প্রস্ফুট হয়, আমরা বুঝিনা। এইরূপ অসার কথা আজকালকার ব্রাহ্মসমাজের অনেক জীবনী-লেখকের বড় বড় পুস্তকেও পাওয়া যায়। রক্ষা এই,তাঁহারা সমালোচনার জন্য কাহাকেও পুস্তক দেন না। বিনা সাধনায় ও পড়াশুনায় কখনও কি ভাষা-জ্ঞান জন্মে এবং ভাল লেখক হওয়া যায়? সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গতবর্ষের সভাপতি মহাশয়ের তীব্র মন্তব্য সকলের প্রতি প্রযুজ্য কিনা, ভাবা উচিত। অমৃতলালের নিকট যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, তাহা না পাইয়া আমরা বাস্তবিকই দুঃখিত হইয়াছি। তাঁহাকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের "রাজকবি" করার কথা হইয়াছে। বন্ধু স্তাবকতায় না ভুলিয়া সতর্ক হইবেন। আশা করি,এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত হইলে ইহা "মহিলা-পাঠ্য" হইতে পারিবে।

৪৭। হিন্দু নারীর কর্ত্তব্য। শ্রীবদ্রীদাস গোয়েনকা-পুরস্কার প্রবন্ধ। শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত, বি-এল প্রণীত। মূল্যের কথা নাই। নারী জীবনের আদর্শ,কুমারী জীবনের কর্ত্তব্য" বিবাহের উদ্দেশ্য, জননীর কর্ত্তব্য, গৃহিণীর কর্ত্তব্য—প্রভৃতি বিষয় অতি সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভাষা মার্জ্জিত হইলে ভাল হইত। এই পুস্তকখানি একাধারে সচ্চিন্তা, গবেষণা এবং সহৃদয়তার ফল। এই পুস্তকখানি মহিলাগণের অবশ্য-পাঠ্য গ্রন্থ। বিধাতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।

সংশোধনী।

নব্যভারত ২৪শ খণ্ড ১০ম সংখ্যা।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬০৪	১	৪	অনর্থক বিষয়েরও	আবশ্যক বিষয়েরও
"	"	৭	বৈদিক সঙ্গীত	উপাদেয় সঙ্গীত
"	২	১৯	ইংরাজীতে বাঙ্গালা	ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা
৬০৫	২	২৫	স্যর গুরুদাস বলেন	স্যর গুরুদাস ছিলেন।
৬০৮	১	২৮	সর্ব্বসংগ্রহ করিবার	অর্থ সংগ্রহ করিবার
"	১	১১	তোষামোদকারীগণের প্রীতিকর	তোষামোদকারিগণের প্রতি করা
৬১০	১	১৬	সহযোগী ছিলেন	সহযোগী হইলেন
	২	২৮	বদলাইয়া লইবার	ঝালাইয়া লইবার

গীতোক্ত-ব্রহ্মতত্ত্ব।

(ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যার এক অংশ)

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথমে ভগবান্ জ্ঞান ও অজ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইয়া, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া, যাহা জানিলে অমৃতত্বলাভ হয়, সেই জ্ঞেয় কি, তাহা বুঝাইয়াছেন। সেই জ্ঞেয় তদাখ্য পরম ব্রহ্ম। এস্থলে অভিপ্রায় এই যে, যখন জ্ঞান অজ্ঞানমুক্ত হয়, তখন সেই জ্ঞানেই এই তদাখ্য পরম-ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন। অজ্ঞান বা অবিদ্যা দূর না হইলে, ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন না—ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আদৌ উপস্থিত হয় না। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন—

"জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ-
পরম্॥" ৫।১৬

ইহার অর্থ আমরা যথাস্থানে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। সংক্ষেপে ইহার অর্থ এই যে জ্ঞানের দ্বারা যাহাদের অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, তাহাদের অন্তরে সেই তদাখ্য পরম জ্ঞান প্রকাশিত হয়। এই শ্লোকোক্ত অজ্ঞান কি এবং জ্ঞান কি, তাহা এই অধ্যায়ের ৭ম হইতে ১১শ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে, তাহা দেখিয়াছি। সুতরাং এস্থলে উক্ত অমানিত্বাদি জ্ঞানের দ্বারা যখন তাহার বিপরীত মানিত্বাদি অজ্ঞান দূর হয় অর্থাৎ যখন অমানিত্বাদি সাধন দ্বারা চিত্তের মলিনতা ক্রমে দূর হইতে থাকে এবং সেই সঙ্গে মানিত্বাদি অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, তখন সেই নির্ম্মল স্বচ্ছ সাত্ত্বিকচিত্তে পরম জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অনেক ব্যাখ্যাকারের মতে উক্ত শ্লোকের অর্থ এই যে, যখন জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নষ্ট হয়, তখন সেই জ্ঞান "তৎপরম্" অর্থাৎ তদাখ্য পরম ব্রহ্মকে প্রকাশ করে। আমরা এই অর্থ গ্রহণ করি নাই; কারণ, ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ। এস্থলে এই প্রকাশের উপমা দেওয়া হইয়াছে—'আদিত্যবৎ।' সূর্য্য যেমন অন্ধকার দূর করিয়া উদয় হইলে, আপনাকে আপনি প্রকাশ করে, এবং সেই সঙ্গে অন্য সকলকে প্রকাশ করে, সেইরূপ নির্ম্মল জ্ঞানে ব্রহ্মরূপ জ্ঞান-সূর্য্য প্রকাশিত হইয়া আপনাকে প্রকাশ করে এবং অন্য সকলকে প্রকাশ করে। সুতরাং জ্ঞান 'তৎ-পরম্' ব্রহ্মকে আপনি প্রকাশ করিতে পারে না। সাংখ্যমতে বুদ্ধির যে জ্ঞানভাব, তাহা জড়। তাহার প্রকাশের সামর্থ্য নাই। এজন্য আমরা বলিয়াছি যে, অজ্ঞানমুক্ত জ্ঞানে জ্ঞানস্বরূপ পরম ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। আমাদের জ্ঞান অজ্ঞানমুক্ত হইলে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। তখন ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন।

বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্র—'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'। এই সূত্রের 'অথ' এই শব্দের অর্থ—অনন্তর। যখন শমদমাদি সাধনার দ্বারা অধিকারী হওয়া যায়, তখনই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা উদয় হয়। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, যাহার অব্যবহিত পরেই ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অবশ্য সম্ভব হইতে পারে, তাহা কি? নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক। ঐহিক ও আমুষ্মিক ভোগে বৈরাগ্য। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা, মুমুক্ষুত্ব এই সকল গুণ বা এই সকল সাধন

থাকিলে, ধর্ম্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বে ও পরে উভয় কালেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়।” গীতোক্ত অমানিত্বাদি জ্ঞান ও এই বৈরাগ্যাদি চতুর্ব্বর্গসাধন এক অর্থে এক। তাইই বলিয়াছি যে, জ্ঞেয়কে জানিলে অমৃতত্বলাভ হয়; সেই জ্ঞেয় ব্রহ্মই এই অজ্ঞানমুক্ত জ্ঞানে জ্ঞেয়। যখন ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ-জ্ঞান হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ আপনাকে ক্ষেত্র হইতে পৃথক্ জানিতে পারে এবং ক্ষেত্রের মলিনতা আপনাতে আরোপ না করে ও অমানিত্বাদি জ্ঞান লাভ করে, যখন জন্ম-মৃত্যু-জরাব্যাধি-দুঃখদোষ অনুদর্শন করে ও মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হয়, তখনই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় ও ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন।

বুদ্ধি এইরূপ সাত্ত্বিক ও নির্ম্মল হইলে, যখন এই জ্ঞানস্বরূপ হয়, যখন ইহা প্রধানতঃ এই তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনরূপে স্থিত হয়, তখন ইহা কিরূপে পরমমুক্তির কারণ হয়, তাহা এই জ্ঞানতত্ত্ব বুঝাইয়া পরে ভগবান্ বলিয়াছেন। সে জ্ঞান তখন আপনার প্রকৃত জ্ঞেয় কি, তাহা জানিতে পারে। ভগবান্ বলিয়াছেন, সেই জ্ঞেয়ই ব্রহ্ম। তিনিই এই জ্ঞানের একমাত্র জিজ্ঞাসার বিষয়। ব্রহ্ম—এই জ্ঞানে জ্ঞেয় বা জিজ্ঞাসার বিষয় হইলে, তাহার ফলে এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে পুরুষ সেই ব্রহ্মস্বরূপত্ব লাভ করে। (“ব্রহ্মৈব সন ব্রহ্মাপ্যেতি”—ইতি বৃহদারণ্যক ৪।৪।৬, ৪।৪।২৫)। তাহার পরম নির্ব্বাণরূপ পরম-পুরুষার্থসিদ্ধি হয়। তখন পুরুষ আপনার বস্তুস্বরূপ নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ চিত্তদর্পণে দর্শন করিয়া জানিতে পারে। নির্ম্মল স্বচ্ছ সাত্ত্বিক জ্ঞানস্বরূপ বুদ্ধিতে সে তখন স্বরূপ দেখিতে পায়। সেই জ্ঞানস্বরূপ বুদ্ধিতে জ্ঞেয় ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিভাত হইলে বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে পুরুষ সেই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মরূপ হয়। ইহাই চরম মুক্তি।

ভগবান্ এ স্থলে পরম ব্রহ্মকে জ্ঞেয় বলিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে জ্ঞানের জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিভাগ উল্লেখ করিয়াছি। শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা অনুসারে আমরা দেখিয়াছি যে, ক্ষেত্রজ্ঞ ‘অহং’ই জ্ঞাতা, আর ক্ষেত্র বা ‘ইদং’ই জ্ঞেয়। এ স্থলে জ্ঞেয় সে অর্থে গৃহীত হয় নাই। এ স্থলে যাহা জ্ঞেয় তাহা ব্রহ্মাখ্য পরম ব্রহ্ম। এই পরম ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। তিনি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই। তিনি জ্ঞাতৃরূপেই প্রধানতঃ জ্ঞেয়। যাহা জ্ঞানের বিষয়, তাহাই জ্ঞেয়। আত্মা বা ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় বলিয়া তিনি জ্ঞেয়। শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-দর্শনের অধ্যাস-ভাষ্যে বলিয়াছেন,—

“আত্মা যে নিতান্তই অবিষয়—কোনও প্রকারে বিষয় (জ্ঞানগোচর) নহেন, এমত নহে। এখন তাঁহাতে (এই জীবাবস্থায় তাঁহাতে) অস্মৎ প্রত্যয়ের বিষয়তা আছে এবং অন্তরাত্মরূপে প্রসিদ্ধ বা প্রতীত হওয়ায় অপরোক্ষতাও আছে। আত্মা যখন ‘অহং’ ‘আমি’ এতদ্রূপ জ্ঞানের বিষয়, তখন আর তাঁহাকে একান্ত অবিষয় বলা যায় না, এবং পরোক্ষ (অপ্রত্যক্ষ) বলাও যায় না। অভিপ্রায় এই যে, চৈতন্যমাত্রস্বভাব পরমাত্মা বস্তুকল্পে নিরুপাধিক ও অবিষয় হইলেও অবিদ্যাকল্পিত ‘অহং’ উপাধিদ্বারা বিষয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিবেককালে বা অনধ্যাস-কালে তিনি নিরুপাধিক ও নিরংশ; কিন্তু অবিবেককালে তিনি সোপাধিক ও সাংশ। অবিদ্যাকল্পিত অহং যতকাল থাকিবে তত-

কালই তিনি অহং-বৃত্তির পরিচ্ছেদ্য বা বিষয়। সুতরাং অবিদ্যাকল্পিত 'অহং' উপাধির বিলোপ বা বিগম না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি একান্ত অবিষয় নহেন। অর্থাৎ আত্মা এখন অহং-বৃত্তির বিষয়।" (পণ্ডিতবর কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় অনূদিত শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের বেদান্তভাষ্য উপক্রমণিকা) অতএব ব্রহ্ম অপরোক্ষ-অনুভব দ্বারা জ্ঞেয়। আত্মার আত্মা বা জ্ঞাতার জ্ঞাতৃরূপে তাঁহাকে জানা যায় বলিয়া তিনি জ্ঞেয়। ভগবান্ বলিয়াছেন যে পরমব্রহ্ম জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা অধিগম্য পরম জ্ঞাতৃরূপে তিনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। অতএব পরমব্রহ্ম যেমন জ্ঞেয়, সেইরূপ জ্ঞাতাও বটে এবং জ্ঞানস্বরূপও বটে। আমরা পূর্ব্বে দ্বাদশ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি; এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বেদান্ত-দর্শন অনুসারে শুদ্ধ জ্ঞানের তিন রূপ; জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান। ব্রহ্ম—শুদ্ধ চিৎরূপ। তিনিই মায়াশক্তি হেতু এই তিন রূপে অভিব্যক্ত হন। নির্ম্মল বুদ্ধিতেই এই তিন রূপের প্রতিবিম্ব পতিত হয়; সুতরাং বুদ্ধিও এই তিন রূপ হয়। যখন জ্ঞান উক্ত তিন রূপযুক্ত হয়, তখন ব্রহ্ম তাহার জ্ঞেয় হন। ব্রহ্ম জ্ঞেয় হইলে জ্ঞান সেই ব্রহ্মরূপ হয়, জ্ঞেয়ের সহিত জ্ঞান একীভূত হয়। তখন জ্ঞাতৃরূপ ও এই জ্ঞানের মধ্য দিয়া জ্ঞেয় ব্রহ্মরূপ হয়। তখন জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান একাকার হয়। ইহাই নিত্যবোধস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্মের প্রকৃত তত্ত্ব। জ্ঞানের মধ্য দিয়া এই জ্ঞেয় ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তিই জ্ঞানের পরা নিষ্ঠা (১৮।৫০। এইরূপে ব্রহ্মস্বরূপে পুরুষের প্রতিষ্ঠাতেই পরম-মুক্তি হয়। এইজন্য ভগবান্ জ্ঞানের স্বরূপ বুঝাইয়া এই জ্ঞানের জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন।

আমরা দেখিয়াছি যে, গীতায় এই ব্রহ্মতত্ত্বের বিবরণ সংক্ষেপ। ১২শ হইতে সপ্তদশ শ্লোক পর্য্যন্ত এই জ্ঞেয় পরম ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। এই ব্রহ্মতত্ত্ব বেদসংহিতার ব্রহ্মসূত্রপদে যেরূপ বিবৃত হইয়াছে, তাহাই গীতায় সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। উপনিষদ এই ব্রহ্মপ্রতিপাদক। ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদেই বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যাই পরা বিদ্যা। এই জন্য আমরা পূর্ব্বে উক্ত ১২শ হইতে ১৭শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উপনিষদ্ হইতে গীতোক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব বিস্তারিতভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং আমরা সংক্ষেপে মাত্র এ স্থলে গীতোক্ত এই ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা করিব। গীতার অনেক স্থলে ব্রহ্ম শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। ব্রহ্ম অর্থে শব্দব্রহ্ম বা বেদ; ব্রহ্ম অর্থে ভগবানের যোনিরূপা প্রকৃতি। কিন্তু এ স্থলে জ্ঞেয় 'পরম' ব্রহ্মতত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে। তাহার অর্থ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

আত্মার ন্যায় ব্রহ্ম নানা অর্থে ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু পরমাত্মা বা পরম ব্রহ্ম বলিলে সেই পারমার্থিক মূল তত্ত্বই নির্দ্দিষ্ট হয়। গীতায় এ স্থলে পরম ব্রহ্ম-তত্ত্বই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহা শ্রুতিপ্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব ও বেদান্তদর্শনে জিজ্ঞাসার বিষয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব—'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই তটস্থ লক্ষণ দ্বারা যিনি জ্ঞেয়, 'ওঁতৎসৎ' যাঁহার নির্দ্দেশক তিনিই গীতোক্ত পরম ব্রহ্ম। এস্থলে সেই পরম ব্রহ্ম-তত্ত্বই সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। কোন কোন ব্যাখ্যাকারের মতে এস্থলে

ব্রহ্ম জীবাত্মা। কেহ বলেন, ব্রহ্মই মূল প্রকৃতি তাহাই ভগবানের মহদ্‌যোনি। কেহ বলেন, এই ব্রহ্মই ভগবানের পরা ও ও অপরা প্রকৃতি বা ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র-তত্ত্ব। সে জন্য তাঁহারা এই শ্লোকের অর্থ করেন যে, ব্রহ্ম 'অনাদি' এবং 'মৎপর' অর্থাৎ ভগবানের অধীন। ভগবান্ এই ব্রহ্মের অতীত তত্ত্ব। তাই ভগবান্ বাসুদেব পরব্রহ্ম।

এ অর্থ যে আদৌ সঙ্গত হইতে পারে না, তাহা আমরা যথাস্থানে বিবৃত করিয়াছি। এস্থলে গীতায় পরম ব্রহ্ম তত্ত্ব বা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে।

ইহা 'তৎ ব্রহ্ম' তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ' (৭।২৯) 'কিং তৎ ব্রহ্ম' (৮।১), ইত্যাদি স্থলে এই 'তৎ'-পদবাচ্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আছে। ভগবান্ বলিয়াছেন, এই তদ্‌ব্রহ্ম 'অক্ষর ব্রহ্ম পরম্।' (৮।৩) এই অক্ষর পরমব্রহ্ম কি, তাহা উক্ত ৮।৩ ব্যাখ্যায় সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে যে ব্রহ্মকে উক্ত জ্ঞানের জ্ঞেয় বলা হইয়াছে, তাহা এই তদাখ্য অক্ষর পরম ব্রহ্ম—"অনাদিমৎ পরমব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে।" (১৩।১২)।

এই পরমব্রহ্ম সম্বন্ধে ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন—

'পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যো ব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥"
(৮।২০-২১)

এই পরমব্রহ্ম বা পরম পদ সম্বন্ধে ভগবান্ অন্যত্র বলিয়াছেন—

"যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে।"
(৮।১১)

ভগবান্ পরেও বলিয়াছেন,—

"পদং তৎ পরিমার্গিতব্যম্
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।"
(১৫।৪)

ইহা "তৎপদমব্যয়ম্" (১৫।৫)

ভগবান্ আবার বলিয়াছেন,—

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥
(১৫।৬

এই জ্ঞেয় ব্রহ্ম অক্ষর পরমব্রহ্ম, ব্রহ্মই এই অব্যয় পদ, ইহাই ভগবানের পরম ধাম। এই অক্ষর অব্যক্তের উপাসনার কথা ১২শ অধ্যায়ে ৩।৪ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

অতএব এ স্থলে ভগবান্ নিম্মল অমানিত্বাদি রূপ ও তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনরূপ জ্ঞানের জ্ঞেয় যে ব্রহ্ম বলিয়াছেন,—তাহা যে গীতা অনুসারে এই অক্ষর পরম ব্রহ্ম, এই ভগবানের পরম ধাম, পরম অব্যয় পদ ব্রহ্ম সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। এই শ্লোক হইতেও এই তত্ত্ব স্পষ্ট জানা যায়। ভগবান্ বলিয়াছেন জ্ঞেয় ব্রহ্মকে জানিলে অমৃতত্ত্ব লাভ হয়। (১৩।১২)।

এই জ্ঞেয়—অনাদিমৎ পরম ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম সৎ বা অসৎ-বাচ্য নহে। ইহার অর্থ আমরা দ্বাদশ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এই ব্রহ্ম সর্ব্বস্বরূপ অথচ সর্ব্বাতীত। এ বিশ্বে যত ভূত বা স্থাবরজঙ্গমাত্মক সত্তা আছে—সেই চরাচরের তিনি সমষ্টিরূপ।

এজন্য তিনি সর্ব্বতঃ পাণিপাদ, সর্ব্বতঃ অক্ষিশিরোমুখ, সর্ব্বত্র শ্রুতিমৎ। তিনি লোক সমুদায় আবৃত করিয়া স্থিত—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্" (ঈশ ১) তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত হইয়াও সর্ব্বেন্দ্রিয় আভাস অর্থাৎ কারণ বা বীজস্বরূপ ও প্রকাশক। অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বকারণ ও সর্ব্বরূপ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। তিনি এই বিশ্বের ভরণকর্ত্তা, সর্ব্বগুণভোক্তা। ব্রহ্ম সর্ব্বস্বরূপ হইয়াও সর্ব্বাতীত। তিনি অসক্ত ও নির্গুণ।

ব্রহ্ম চরাচর সর্ব্বভূতের বাহ্য ও অন্ত; তিনি দূরে, তিনিই নিকটে; তিনি সূক্ষ্ম হেতু অবিজ্ঞেয়। তিনি অবিভক্ত হইয়াও সর্ব্বভূত সম্বন্ধে বিভক্তের ন্যায় স্থিত। তিনি ভূতকর্ত্তা ও সর্ব্বপালনকারী, সর্ব্বগ্রাসকারী ও সর্ব্বসৃজনকারী।

এই পরমব্রহ্মই স্বপ্রকাশ—সর্ব্বজ্যোতিষ্কের জ্যোতিঃ, তিনি তমসপারে অবস্থিত, তিনিই জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্যরূপে সর্ব্বহৃদয়ে অবস্থিত।

এইরূপে সংক্ষেপে এই জ্ঞেয় পরম ব্রহ্মতত্ত্ব এই অধ্যায়ে ১২শ হইতে ১৭শ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম অনির্ব্বাচ্য—তাঁহাকে সৎ বা অসৎ বলা যায় না, তিনি সূক্ষ্ম হেতু অবিজ্ঞেয়—তিনি অপ্রমেয়। তিনি সগুণ (immanent manifest) রূপে সর্ব্ব—বিশ্বরূপ, আর তিনি নির্গুণ (Transcendent) রূপে unmanifest) সর্ব্বাতীত। তিনি সগুণরূপে বিভক্তের ন্যায় হইয়া স্থিত—সর্ব্বভূতরূপে, তাহাদের ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গুণরূপে স্থিত, সর্ব্বভূতের অন্তরে, বাহিরে, দূরে নিকটে সমুদায়ই ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে অবস্থিত, ব্রহ্মসত্তাতে সত্তাযুক্ত, ব্রহ্মশক্তিতে সৎরূপে বিবর্ত্তিত ও বিধৃত। আবার ব্রহ্ম এ জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা। ব্রহ্মই এ জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ—সর্ব্বকারণ।

ব্রহ্মতত্ত্বে সকল বিরোধের সমন্বয় হয়, সকল বিপরীত ভাব একীভূত হয়। তিনি নির্গুণ অথচ সগুণ, সর্ব্বেন্দ্রিয়যুক্ত অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত, তিনি অতি দূরে অথচ অতি নিকটে। law of contradiction অনুসারে জ্ঞানের বিকাশাবস্থায় যে কিছু বিপরীত ভাবের (thesis এবং antithesis এর অথবা antinomy র (বিকাশ হয়, ব্রহ্ম যে সমুদায়ের সমন্বয় (synthisis) হয়। (law of identity দ্বারা সমুদয় বিরোধী ভাব তাঁহাতে একীভূত হয়।

ব্রহ্ম সূক্ষ্ম হেতু অবিজ্ঞেয় হইলেও—এই সর্ব্বভূতমধ্যে—এই অনন্ত বহুত্বপূর্ণ জগতের মধ্যে যে এই একত্বের অনুভূতি হয়—যে এই সকল বিভক্ত ভাবের মধ্যে এক অবিভক্ত ভাবের অনুভূতি হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানা যায়। আরও তাঁহাকে এ জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা বা জগতের মূল কারণরূপে তটস্থ লক্ষণ দ্বারাও জানা যায়। তাঁহাকে জ্যোতিরূপে—সর্ব্বপ্রকাশক তেজোরূপে এই শব্দাত্মক জগতের মূল একাক্ষর ব্রহ্ম—ওঙ্কাররূপে ধ্যান বা ভাবনা করিতে হয়। আর ব্রহ্মকে অধ্যাত্মজ্ঞানে নিজ আত্মাতে পরমাত্মস্বরূপে ধ্যান ও ধারণা করিতে হয়। ধ্যানপরিপাকে আত্মাতেই ব্রহ্মদর্শন হয়। ব্রহ্ম অবিজ্ঞেয় হইয়াও যে এইরূপে জ্ঞেয় হন, তাহার কারণ এই যে, ব্রহ্ম সর্ব্বভূতের জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞান-গম্যরূপে অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই ত্রিপুট-

রূপে অবস্থিত। যখন এই জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয়-তত্ত্ব অনুধ্যান করিয়া তাহার স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করা যায়, যখন এই তিনের একত্ব ধারণা করা যায়, যখন এই তিন এক হইয়া নির্ব্বিশেষ জ্ঞানরূপে একীভূত হয়, তখন অন্তরে এই ব্রহ্মতত্ত্ব অনুভব করা যায়, তখন ব্রহ্মস্বরূপ লাভ হয়। এ সকল বিষয় আমরা পূর্ব্বে উক্ত কয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

যাহা হউক, আমরা ব্রহ্ম সম্বন্ধে উল্লিখিত তত্ত্বগুলি সংক্ষেপে গীতায় উক্ত শ্লোক হইতে জানিতে পারি। জ্ঞান যখন নির্ম্মল হয়, তখন সেই 'জ্ঞান' ব্রহ্মস্বরূপ হয়, তখন 'জ্ঞেয়' ব্রহ্মস্বরূপ হয়, আর তখন 'জ্ঞাতা'ও ব্রহ্মস্বরূপ হয়। অহং ইদং এক হয়। তখন 'অহং' থাকে না সোঽহং জ্ঞান হয়। যখন জ্ঞাতা ব্রহ্মস্বরূপ হয়, তখন এই জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় একীভূত হইয়া অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান—ব্রহ্মভাব লাভ হয়—অমৃতত্বসিদ্ধি হয়।

এই ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত ঈশ্বরতত্ত্বের এবং মায়া ও প্রকৃতি তত্ত্বের স্বরূপ কি, তাহা পূর্ব্বে সপ্তম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা-শেষে বিবৃত হইয়াছে। ফির অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোক ও একবিংশ শ্লোকে এই ব্রহ্মতত্ত্ব স্থির হইয়াছে। তাহার পর দ্বাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই ব্রহ্মতত্ত্ব ও তাহার সহিত ঈশ্বরতত্ত্বের সম্বন্ধ পুনরালোচিত হইয়াছে। এ অধ্যায়ের উক্ত ১২শ হইতে ১৭শ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা উক্ত শ্লোক সকলের ব্যাখ্যায় বিস্তারিতভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা গিয়াছে।

এই ব্রহ্মতত্ত্বের এইরূপ বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই পরম-মুক্তিলাভ হয়। আর এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা অতি কঠিন। ব্রহ্মতত্ত্ব গুহ্যতম, অতি দুর্ব্বোধ্য। ব্রহ্মবিদ্যাই পরা বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা 'অক্ষর' অধিগম্য হয়। ব্রহ্ম-তত্ত্ব দুর্ব্বোধ্য তাহার পুনঃ পুনঃ আলোচনা ব্যতীত তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। ইহা ব্যতীত আমরা দেখিয়াছি যে, এই গীতোক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে। বিভিন্ন শ্রুতি বচনই এই মত-ভেদের কারণ। বেদান্ত-দর্শনে এই সমুদায় বিভিন্ন শ্রুতি সমন্বয় করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। তথাপি তাহাতেও এই বিভিন্ন বাদের স্থান আছে। অদ্বৈ-তবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধ দ্বৈতবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন বাদ অনুসারে যেমন এই বেদান্ত-দর্শন বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেইরূপ এই গীতা-শাস্ত্রও তদনুসারে বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উক্ত কয় শ্লোকে ব্রহ্মতত্ত্বের এই বিভিন্ন বাদ অনুসারে ব্যাখ্যা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি।

যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের উপরের ভূমিতে যাইলে এই দ্বৈত (thesis) ও অদ্বৈত (antithesis এই উভয়বাদ সমন্বয় (snthe-sis করিলে, তবে এই ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায়। ইহাই সর্ব্ব-সমন্বয়ের শেষ সমন্বয় (last synthesis) গীতার যে দ্বৈত ও অদ্বৈত-বাদ উভয়েরই সমন্বয় হইয়া যে পরম অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা কোন বাদ অবলম্বন, না করিয়া গীতায় সমগ্র-ভাবে—সর্ব্বসামঞ্জস্য করিয়া আলোচনা করিতে বুঝিতে পারা যায়।

আমরা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা-ভূমিকায় বলিয়াছি যে, এই ব্রহ্মতত্ত্বই গীতার মূল সূত্র। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। আমরা সে স্থলে বলিয়াছি যে, ব্রহ্মকে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষভাবে বুঝিতে হয়। সবিশেষ ব্রহ্মের দুই ভাব;—সগুণভাব ও নির্গুণ ভাব। সগুণ ব্রহ্মই পরমেশ্বর, নির্গুণ ব্রহ্ম পরম অক্ষর, অব্যক্ত, অনির্দ্দেশ্য, কূটস্থ, অচল ও ধ্রুব; নির্গুণ ব্রহ্ম এইরূপ বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত আর ব্রহ্মের যে নির্ব্বিশেষ ভাব, তাহা অনির্ব্বাচ্য, অজ্ঞেয়, নিরুপাধিক, কেবল 'নেতি নেতি' দ্বারাই নির্দ্দেশ। পরম ব্রহ্মের এই নির্ব্বিশেষ নির্গুণ ভাব 'তৎ'-শব্দবাচ্য আর তাঁহার সগুণ ভাব 'সঃ'-শব্দ-বাচ্য। বলিয়াছি ত, তিনি পরমেশ্বর। গীতায় এই সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব পূর্ব্বে দ্বিতীয় ষট্‌কে ব্যাখ্যাত হইয়াছে দেখিয়াছি। এই অধ্যায়ে এই কয় শ্লোকে প্রধানতঃ 'তৎ'-আখ্য নির্ব্বিশেষ ও নির্গুণ পরম ব্রহ্মতত্ত্ব হইয়াছে।

গীতা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, যিনি পরম ব্রহ্ম, তিনি সৎ বা অসৎবাচ্য নহেন। তিনি অনির্ব্বাচ্য নির্ব্বিশেষ। তাঁহাকে নিষেধমুখে 'নেতি নেতি' দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে হয়। ইহা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। এই ব্রহ্মতত্ত্ব সূক্ষ্ম অবিজ্ঞেয়। আমরা বলিয়াছি, আমরা ব্রহ্মকে দুই রূপে নির্দ্দেশ করি,—এক সগুণরূপে আর এক নির্গুণরূপে। এক Immanent রূপে আর এক Transcendent রূপে। স্বরূপতঃ ব্রহ্ম এই দুই ভাবের অতীত, এই উভয়ের সমন্বয় করিলে তাঁহার এই নির্ব্বিশেষ ভাব ধারণ করা যায়। পরমার্থতঃ ব্রহ্ম সগুণও নহেন, নির্গুণও নহেন; তিনি উভয়ের অতীত, অথচ উভয় ভাবে অভিব্যক্ত। নির্গুণরূপে তিনি অক্ষর, অব্যক্ত, অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বত্র, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব (১২।৩) ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্টরূপে বাচ্য ও নির্দ্দেশিত হন, আর সগুণরূপে ঈশ্বরভাবে তিনি আমাদের সমগ্র জ্ঞেয় হন। তিনি এ জগতের স্রষ্টা, পাতা, নিয়ন্তা ও সংহর্ত্তা মায়াশক্তিযুক্ত ঈশ্বর। তিনিই অব্যক্ত প্রকৃতিরূপ। তিনি সগুণরূপেই দ্রষ্টা ও দৃশ্য হন; জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় হন। জ্ঞাতৃরূপে তিনি পুরুষ ও জ্ঞেয়রূপে তিনি প্রকৃতি। সর্ব্বজ্ঞাতৃরূপে,সর্ব্ব নিয়ন্তৃরূপে তিনি পরমেশ্বর পুরুষোত্তম, আর পরিচ্ছিন্ন জ্ঞাতৃরূপে তিনি প্রকৃতিবদ্ধভাবে জীব বা ভূত। পরমেশ্বরের নিয়ন্তৃত্বে প্রকৃতির পরিণাম হইয়া এই জগতের অভিব্যক্তি হয়; তাহা জীবভোগ্য হয়। প্রকৃতি হইতে জীবদেহ উৎপন্ন হয়। এইরূপে ব্রহ্মই সগুণরূপে নিয়ন্তা ঈশ্বর, ভোক্তা জীব ও ভোগ্য জগদ্রূপে অভিব্যক্ত হন। অতএব ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অজ্ঞেয় হইলেও তাঁহার নির্গুণ অক্ষরভাব, এবং সগুণ ঈশ্বর জীব ও জগদ্‌ভাব কতকটা ধারণা করিতে পারা যায়। গীতা হইতে পরম ব্রহ্মকে এই ভাবে বুঝিতে পারা যায়। উপনিষদের মধ্যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ইহা উক্ত হইয়াছে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ হইতে আমরা ইহা সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রথমে আছে ঃ—

"সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে
তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরয়িতারঞ্চ মত্বা
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ॥" (১।৬)

অর্থাৎ "হংস বা জীব আপনাকে ও প্রেরয়িতা ঈশ্বরকে পৃথক্ মনে করিয়া সেই

সর্ব্বজীবাধার ও সর্ব্বলয়স্থান বৃহৎ ব্রহ্মচক্রে ভ্রাম্যমান হয়। পরে প্রেরয়িতা দ্বারা জুষ্ট বা উপকৃত হইয়া বা তাঁহার কৃপায় অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়।" কিরূপে এই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা পরবর্ত্তী মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যথা—

"উদ্গীতমেতদ্ পরমন্তু ব্রহ্ম
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তা।"(১৷৭

অর্থাৎ "এই পরম ব্রহ্মই উদ্গীত। অর্থাৎ বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহাতে তিন এবং অক্ষর সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। ব্রহ্মবিদ্ এই সম্বন্ধে যে প্রভেদ, তাহা জানিয়া, যোনিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মে লীন হয়।" এইরূপে এই মন্ত্র হইতে ব্রহ্মের অক্ষর স্বরূপ ও অন্য তিন রূপ জানা যায়। এই অন্য তিন রূপ যাহা ব্রহ্মেই সুপ্রতিষ্ঠিত,তাহা কি, সে তত্ত্ব এ স্থলে বিবৃতহইয়াছে। এই তিন রূপ ক্ষর, অক্ষর ও ঈশ্বর।—

"সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥"(১৷৮

অর্থাৎ 'ঈশ্বর এই পরস্পর সংযুক্ত ক্ষর অর্থাৎ প্রধান বা প্রকৃতি এবং অক্ষর বা জীবাত্মা—এই উভয়কে (১৷১১) বা ব্যক্ত অব্যক্ত এই সমুদয়কে (বিশ্বকে) ভরণ করেন—বা তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া তাহাদের নিয়ন্তা হন। এই জীবাত্মা অনীশ, এই ঈশিত্ব শক্তি বিহীন হইয়া ভোক্তৃভাব হেতু (সুখদুঃখাদিতে) বদ্ধ হয়। সে দেবকে বা ঈশ্বরকে জানিয়া সর্ব্বরূপে সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্ত হয়। আরও উক্ত হইয়াছে—

"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশা-
বজা হ্যেকা ভোক্তৃ ভোগ্যার্থ যুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্ত্তা
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ॥"(১৷৯)

অর্থাৎ এই 'জ্ঞ'স্বরূপ ঈশ্বর ও অজ্ঞ জীব—এই দুই ভাব অনাদি (অজ)। ইহা ব্যতীত আরও এক অনাদি (অজা) ভাব আছে—তাহা ভোক্তা জীবের ভোগার্থযুক্ত। জীব স্বরূপতঃ আত্মার্থ অনন্ত অকর্ত্তা—বিশ্বরূপ। যাহা হউক, জ্ঞানী যখন এই (ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতিরূপ) তিনকে ব্রহ্মরূপে জানিতে পারেন, ও ঈশ্বর অভিধ্যান দ্বারা তাঁহার সহিত একত্ব অনুভব করিতে পারেন, তখন তাঁহার বিশ্বমায়া নিবৃত্তি হয়। (১৷১০) যাহা হউক, ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, পরম ব্রহ্মে যে এই অক্ষর কূটস্থ ভাব ব্যতীত এই তিন ভাব সুপ্রতিষ্ঠিত—সেই তিন ভাব এই প্রেরয়িতা ঈশ্বর, ভোক্তা জীব ও ভোগ্য প্রকৃতি এই তিন ব্রহ্ম—

"ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরয়িতারঞ্চ মত্বং
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥" (১৷১)

পরম ব্রহ্মের এই তিন ভাব ব্যতীত তাঁহার যে অক্ষয়ভব শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পরে উক্ত হইয়াছে।—

"যদাতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি-
র্নসৎ চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।
তদক্ষয়ং তৎসবিতুর্বরেণ্যং
প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী॥"
(শ্বেতাশ্বতর, ৪৷১৮)

অর্থাৎ যখন 'অতম' হয় অর্থাৎ সর্ব্বরূপ অজ্ঞান দূর হইয়া জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তখন এই 'অক্ষয়' ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। তখন দিবাও নহে, রাত্রিও নহে, সৎও নহে, অসৎও নহে, তখন কেবল শিবরূপ প্রকাশিত থাকেন। তিনিই অক্ষর তিনিই সবিতৃমণ্ডলাধিষ্ঠিত

দেবের ও সম্ভজনীয়। তাঁহা হইতেই পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃত হইয়াছে।

"নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চ ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ॥"
(শ্বেতাশ্বতর, ৪।১৯)

অর্থাৎ ইঁহাকে উর্দ্ধে, অধোদেশে বা মধ্যে ধরিতে পারে না। যাঁহার নাম মহদ্‌যশঃ, তাঁহার প্রতিমা নাই।

"ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্॥
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এন-
মেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥"
(শ্বেতাশ্বতর, ৪।২০)

অর্থাৎ দর্শনযোগ্য প্রদেশে (সন্দৃশে) ইঁহার রূপ নাই। কেহ তাঁহাকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না। যাঁহারা হৃদয়ে ও মনন দ্বারা হৃদিস্থিত ইঁহাকে জানেন, অর্থাৎ হৃদয় সংশয়রহিত বুদ্ধি ও সম্যগ্ দর্শনরূপ গমন দ্বারা এ ভাবে ইঁহাকে দর্শন করেন (শ্বেতাশ্বতর, ৪।১৭), তিনি অমর হন।

ইহাই অক্ষর পরম ব্রহ্মের স্বরূপ। তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন, তাঁহা হইতে পুরাতনী প্রজ্ঞা প্রসৃত, তিনি উর্দ্ধে, মধ্যে ও অধোদেশে নহেন বলিয়া প্রপঞ্চাতীত, তাঁহার কোন প্রতিমা (বা তুলনা) নাই। তিনি অবাঙমানসগোচর। এইরূপে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পরম ব্রহ্মের অক্ষয় ঈশ্বর জীব ও প্রধান বা প্রকৃতরূপ ভাব উক্ত হইয়াছে।

মাণ্ডূক্য উপনিষদেও পরম ব্রহ্মের বা পরমাত্মার চারি পাদের কথা উক্ত হইয়াছে। অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে ওঁকারতত্ত্ব-বিবৃতিকালে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। পরম-ব্রহ্মের যে অমাত্র, অব্যবহার্য্য, প্রপঞ্চোপশম, শান্ত, শিব, অদ্বৈত, অদৃষ্ট, অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য একাত্মপ্রত্যয়সার চতুর্থ বা তুরীয় পদ উক্ত হইয়াছে, (মাণ্ডুক্য উপঃ ৭, ১২) তাহা এই 'অক্ষর অব্যক্ত' পরম ব্রহ্মের এই চতুর্থ ভাব।

গীতা হইতেও আমরা এই পরম ব্রহ্মতত্ত্ব —তাঁহার অক্ষর অব্যক্ত পরম ভাব, পরমেশ্বর ভাব, জীবাত্মভাব ও বিশ্বরূপভাব জানিতে পারি। এ স্থলে তাহা বিস্তারিতভাবে বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই। বলিয়াছি ত, পূর্ব্বে দ্বাদশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যায় অষ্টম অধ্যায়ের একবিংশতি ও দ্বাবিংশতি শ্লোকের ব্যাখ্যায় ও সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে এই অক্ষর পরম ব্রহ্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, ও এই উভয় তত্ত্বমধ্যে সম্বন্ধ বিবৃত হইয়াছে। এ স্থলে তাহা দেখিতে হইবে।

১৮শ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, (পূর্ব্বে ১৭ শ্লোক পর্য্যন্ত) ক্ষেত্র জ্ঞান ও জ্ঞেয় সংক্ষেপে যেরূপে উক্ত হইয়াছে, ঈশ্বর-ভক্ত সেই তত্ত্ব জানিয়া ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানের স্বরূপ জানিয়া সেই জ্ঞানে স্থিতি হইলে, তাহার দুই ফল হয়। সেই জ্ঞানে ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ যে পৃথক্, তাহা প্রতিভাত হয়, এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে মুক্তি হয়। এইজন্য ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রথমে বিবৃত হইয়াছে, এবং পরে ১২শ হইতে ১৭শ শ্লোক পর্য্যন্ত অনির্বাচ্য 'তৎ'-পদনির্দ্দেশ্য পরম ব্রহ্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। এই 'তৎ'-পদবাচ্য ব্রহ্ম জ্ঞেয় হইলেও, সমগ্র ব্রহ্ম-তত্ত্ব নহে। এই 'তৎ'-পদবাচ্য পরম ব্রহ্ম এক অর্থে তাঁহার প্রপঞ্চাতীত ভাব মাত্র। আমরা জানি যে, উপনিষদে ব্রহ্মের দুই ভাব প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে—সগুণ ও নির্গুণ অর্থাৎ অপর ও পরব্রহ্ম। এইভাবে উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব

প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মতত্ত্বই সর্ব্বোপনিষদসার।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—

"তৎ ব্রহ্মোপনিষদং পরং তৎ ব্রহ্মোপনিষদং পরম্।" (১।১৬)

এই ব্রহ্মতত্ত্বই—

"বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্॥ (শ্বেতাশ্বতর, ৬।২২)

এই ব্রহ্মতত্ত্বই উদ্‌গীত। ব্রহ্মতত্ত্ব কিরূপে জানিতে হইবে, তাহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রথমেই আছে—

"উদ্‌গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরং যোনিমুক্তাঃ॥"
(১।৭)

ইহা হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম এই প্রপঞ্চ সম্বন্ধে অক্ষর ও উক্ত তিনরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে এইরূপেই জানেন এবং যিনি এইরূপে ব্রহ্মকে জানেন ও ব্রহ্মপরায়ণ হন, তিনি যোনিমুক্ত হন—তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। প্রকৃতি-পুরুষ-জ্ঞানও এই ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তর্গত, ইহা পরে বিবৃত হইবে। ১১শ হইতে ১৭শ শ্লোক পর্য্যন্ত নির্ম্মল (৭ম হইতে ১১শ শ্লোকোক্ত) জ্ঞানে জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্বের মধ্যে তৎপদ নির্দ্দেশ্য অনির্ব্বচনীয় পরম ব্রহ্মতত্ত্ব প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু উক্ত ত্রিবিধ ব্রহ্মস্বরূপ বিবৃত হয় নাই। আমরা দেখিয়াছি যে, বেদান্ত অনুসারে ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ। কিন্তু সমগ্র সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব পূর্ব্বে বিবৃত হয় নাই। এই সগুণ ব্রহ্মই এই ত্রিবিধ। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ অনুসারে সগুণ ব্রহ্মের এই তিন রূপ—ভোক্তা জীবাত্মা, ভোগ্য জগৎ এবং প্রেরয়িতা ঈশ্বর। আমরা দেখিয়াছি যে, এই ত্রিবিধ ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

"ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরয়িতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।"

অতএব এই ঈশতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও জগতত্ত্ব স্বরূপতঃ ব্রহ্মতত্ত্বেরই অন্তর্গত। এই তিন তত্ত্বই ব্রহ্মে সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহাদের মধ্যে 'ভোগ্য'ই প্রধান বা প্রকৃতি,—ইহা ক্ষর, অজ, এক ও সর্ব্বভোগার্থযুক্ত (শ্বেতাশ্বতর ১।৮।১০)। এই ভোক্তা—জীবাত্মা। অজ, অক্ষর, অব্যক্ত, ইহা অনীশ আত্মস্বরূপ, ইহা অজ্ঞ হইলেও অনন্ত, অমৃত, বিশ্বরূপ, অকর্ত্তা। (শ্বেতাশ্বতর ১।৮-১০)। ইহা গীতোক্ত সংসারী জীবাত্মা—ক্ষর পুরুষ। আর এই প্রেরয়িতা—পরমেশ্বর। তিনি এক, দেব, হর, ক্ষরাক্ষর ও ব্যক্তাব্যক্ত বিশ্বের বা অজ ক্ষর প্রধানের এবং অজ অক্ষর জীবাত্মা—সকলের নিয়ন্তা ও ভরণকর্ত্তা পরমেশ্বর (শ্বেতাশ্বতর ১৮-১০)। এই পরমেশ্বরই পরমপুরুষ বা উত্তমপুরুষ। এইরূপে ব্রহ্মই এই প্রকৃতি এবং (দ্বিবিধ) পুরুষরূপ। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানেই মুক্তি হয়। ভোক্তা জীবাত্মা যখন আপনাকে, এই জগৎকে ও ঈশ্বরকে—এই ত্রিবিধকে ব্রহ্মরূপে জানিতে পারে, তখন পরমেশ্বরের অভিধ্যান যোজনা (সংযোগ) এবং তত্ত্বভাব (ব্রহ্মৈকত্বভাব) হইতে অন্তে নিঃশেষে বিশ্বমায়া নিবৃত্তি হয় ও পরমেশ্বরকে জানিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি হয়, সর্ব্বক্লেশ ক্ষীণ হয়, ও জন্মমৃত্যুর নিবৃত্তি হয়।

"তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ॥
জ্ঞাত্বা দেহং সর্ব্বপাশহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহানিঃ॥
(শ্বেতাশ্বতর, ১।১০-১১)।

এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া যিনি পরমেশ্বরকে ধ্যান করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করেন, তিনি দেহভেদান্তে বিশ্বৈশ্বর্য্যযুক্ত তৃতীয় পদ প্রাপ্ত হয় এবং তদনন্তর 'কেবল' বা সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত নিরুপাধিস্বরূপ হইয়া আপ্তকাম বা বা পূর্ণানন্দময় হন।

"তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবলমাপ্তকামঃ॥"
(শ্বেতাশ্বতর, ১।১১)।

এইরূপে পরমেশ্বর অনুধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলে যে ফল হয়, তাহা অষ্টম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে, এবং সেই অধ্যায়ের অবশেষে মুক্তিতত্ত্বে ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই মুক্তির জন্যই ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ ভাব; বিশেষতঃ পরমেশ্বরভাব জ্ঞেয় হইলেও পরম অক্ষররূপে তাঁহাকে অন্তরাত্মাতেই জানিতে হইবে। তিনিই পরমতত্ত্ব।

"এতজ্ জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।"(১।১২)

এই পরম অক্ষর ব্রহ্ম আত্মসংস্থ। ইঁহাকে জানিতে হইলে অন্তরেই ইঁহাকে অনুসন্ধান করিতে হয়। তিলে যেমন তৈল থাকে, দধিতে যেমন ঘৃত থাকে, স্রোতে যেমন জল থাকে, কাষ্ঠে যেমন অগ্নি থাকে, এবং যেমন তিলকে শোধন দ্বারা তৈল নির্গত হয়, মন্থন দ্বারা দধি হইতে ঘৃত পাওয়া যায়, ও অরণিকাষ্ঠ হইতে অগ্নির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ তপস্যা ও ধ্যান দ্বারা আমাদের অন্তরাত্মাকে মন্থন করিলে ব্রহ্মকে গ্রহণ করা যায়।

'তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পি-
রাপঃ স্রোতস্বরণীষু চাগ্নিঃ।
এবামাত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ
সত্যেইননং তপসা যোঽনুপশ্যতি॥"
(শ্বেতাশ্বতর, ১।১৫)।

ধ্যান দ্বারা এইরূপে আত্মাতে পরব্রহ্মদর্শন হয়। সে ধ্যানের প্রণালী এই—

"স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ॥"
(শ্বেতাশ্বতর, ১।১৪)।

অতএব মুক্তির জন্য এই পরম ব্রহ্ম জ্ঞেয়। তাঁহা ব্যতীত অন্য বেদিতব্য আর কিছুই নাই। পরম ব্রহ্ম যখন 'তৎ'পদনির্দ্দেশ্য, অনির্ব্বাচ্যরূপে জ্ঞেয়, সেইরূপ ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই ত্রিবিধভাবে সগুণরূপেও তিনি জ্ঞেয়। সগুণরূপে তাঁহাকে না জানিলে, তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন হয় না এবং পরম ব্রহ্মতত্ত্বও জ্ঞেয় হয় না। এজন্য এই পরম ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পূর্ব্বে এই ত্রিবিধ ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে হইবে। এই কারণ এই অধ্যায়ে নিগুর্ণ পরম ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইবার পর ১৯শ শ্লোক হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই ত্রিবিধ ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে এবং পরের দুই অধ্যায়ে তাহা বিস্তারিত হইয়াছে। প্রথমে ১৯শ শ্লোকে ব্রহ্মের পুরুষ ও প্রকৃতিরূপ বিবৃত হইয়াছে—এবং ইহাতেই পরম পুরুষ, অক্ষরপুরুষ ও ক্ষর প্রকৃতি এই ত্রিবিধ সগুণ ব্রহ্মতত্ত্বই সূচিত হইয়াছে।

ক্রমশঃ।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

সবিনয় নিবেদন

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহোদয় "নব্য-ভারতের" বিগত ফাল্গুন সংখ্যায় এই অধমের 'উপনাম' শিরোনাম করিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়া বাস্তবিক বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। এরূপ ব্যক্তিগত ভাবে প্রবন্ধাবতরণ তাঁহার ন্যায় প্রথিতযশাঃ সাহিত্যরথী হইতে আশা করি নাই। বিশেষতঃ তাঁহাকে আমি একজন পরম সুহৃদ্‌ভাবে দেখিয়া আসিতেছি, কেননা আজ পাঁচবৎসর হইল ৺কামাখ্যা ধামে উত্তর-বঙ্গ সাহিত্যসম্মিলনের অধিবেশন উপলক্ষে তাঁহার সঙ্গে একটা বড়ই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। অপিচ গতবর্ষে রঙ্গপুরে সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে তিনি ও আমি একত্র দুই দিন থাকিয়া অনেক কথার আলোচনা করিয়াছিলাম—যাহা প্রায় এই বর্ত্তমান বিষয় সম্বন্ধেই অনেকটা বটে। এমত অবস্থায় তাঁহার এক্ষেত্রে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করাই শোভন ছিল।

যাহা হউক, তদীয় প্রবন্ধে যখন কোনও প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা আমার কোনও বাক্যের খণ্ডন নাই, তখন ইহার উত্তর আমি দেওয়া অনাবশ্যক মনে করিতাম—বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয়ের সঙ্গে প্রকাশ্যে বাগ্‌যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ভাল দেখায় না। কিন্তু তিনিই আমাকে "নব্যভারতের পর সংখ্যায়ই" লিখিতে আদেশ করিয়াছেন—তদনুসারেই এই প্রবৃত্তি। যখন শাধ্য হইয়াই কলম ধরিতে হইল, তখন তদীয় প্রবন্ধের একটু বিস্তারিত আলোচনাই করিব।

মল্লিখিত "বাঁকীপুর সাহিত সম্মিলন" প্রবন্ধে নাকি এমন কথা আছে যাহা আমার লেখা উচিত ছিল না। সেই কথাগুলি বোধ হয় স্যার্ আশুতোষ ও রায়সাহেব দীনেশচন্দ্র সম্বন্ধীয় কথা। তাহাতেও তিনি যেন কেবল নিন্দাবাদই দেখিয়াছেন। কিন্তু নিরপেক্ষ পাঠক মহোদয়গণ দেখিবেন যে আমি তাঁহাদের যথেষ্ট প্রশংসাবাদ মুক্তকণ্ঠেই করিয়াছি। দোষে গুণে মানুষ—যে ব্যক্তি কেবল দোষই দেখে সে নিন্দক; এবং যে ব্যক্তি দোষসত্ত্বেও কেবল গুণই দেখে, দোষ বলিবার ন্যায্য স্থল পাইয়াও তাহা চাপিয়া যায়, সে স্তাবক। আমি যথাসাধ্য উভয়দিক্ পরিহার করিয়াই গিয়াছি। এবং শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহোদয় যদি মল্লিখিত পূর্ব্বতন আটবৎসরের সম্মিলন বিবরণ অবধানপূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখেন, তাহা হইলে দেখিবেন যে ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, স্যার্ জগদীশচন্দ্র বসু, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মহাশয়দেরও যে যে স্থলে ত্রুটি দেখিয়াছি, বলিতে ছাড়ি নাই; কেননা, তাহা না, বলিলে বিবরণ যথাযথ ভাবে প্রদত্ত হয় না অথচ ভবিষ্যতে তাদৃশ ত্রুটি ঘটিবারও সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। তারপর দীনেশবাবু সম্বন্ধে নিন্দাবাদই বা কি হইয়াছে? তিনি অভিজ্ঞতা ও লেখাপড়ার হিসাবে শাস্ত্রীমহাশয়ের সমকক্ষ নহেন, একথাই মাত্র বলা হইয়াছে, এটাতো শশধর বাবু স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন; কেননা, তিনিই বলিয়াছেন, শাস্ত্রী মহাশয় সম্বন্ধে যত কথা বলিয়াছি, তাহা "সবই সত্য"। তবে তিনি যে বলিয়াছেন, "তথাপি আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য যে ভাবে

গড়িয়া উঠা উচিত, জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের গতি যে দিকে চালিত হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে প্রণিধান করিয়া কেহ যদি দীনেশবাবুকে রীডারের কার্য্যে অধিকতর যোগ্য মনে করেন তবে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সঙ্গে যে বিষয়ে মতভেদ হইল এইমাত্র। যদি মতভেদই হয় তবে যাহার সঙ্গে যে বিষয়ে মতভেদ হইবে সে তাহা অপ্রশংসার বিষয় বলিতে পারে কিনা ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মহোদয়গণ বিচার করিয়া দেখুন। তবে শাস্ত্রীমহাশয়কে "চাপিয়া রাখিবার প্রচেষ্টা"একটা যে আছে, (এবং ইহা বলাতেই বোধহয় শশধর বাবু "কুটিল অভিসন্ধির আরোপ" অনুমান করিয়াছেন), তৎসম্বন্ধে, শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন এই আশা করি। এই সেদিন মাত্র 'কারমাইকেল্ প্রফেসর' নিযুক্তি উপলক্ষে যাহা হইয়া গেল তাহাও যেন একটু দেখেন।*

অতঃপর যে বাক্য প্রত্যাহৃত করিবার জন্য শশধর বাবু আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বলিব। আমি লিখিয়াছিলাম "আমারও বোধ হয় কাজটা বড় হঠাৎ করা হইয়াছে। স্যার আশুতোষের এই প্রস্তাবে বিশেষ অনুকূলতা পরিলক্ষিত হইল। হয়তো তাঁহারই ইঙ্গিতে প্রস্তাবটি এই ভাবে উপস্থাপিত ও পরিগৃহীত হইয়াছে।" ইহার একটু আগেই ছিল— "এতাদৃশ নূতন প্রস্তাব বিষয় নির্ব্বাচন-সমিতিতে উপস্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে সমালোচিত হইলে পরে সম্মিলনে পেশ্ করা উচিত ছিল। কিন্তু যতটা বোঝা গেল স্যার আশুতোষ কার্য্যবশতঃ সেই দিনই চলিয়া যাইতেছেন, আর আসিবেন না— অথচ তিনি সভাস্থলে বর্ত্তমান থাকার সময়েই ইহা পেশ্ ও পাশ্ করিতে হইবে, তাই এই রীতির ব্যতিক্রম ঘটিল।" অপিচ, পাঁচ জন সভ্য নিয়া কমিটি গঠিত হইল, অথচ প্রস্তাবক শশধর বাবু তাহাতে থাকিলেন না—স্যার আশুতোষ রহিলেন। এখন নিরপেক্ষ পাঠক মহোদয়গণ বিবেচনা করিয়া দেখুন 'ইঙ্গিত' কল্পনার কোনও যুক্তি যুক্ত কারণ আছে কি না। স্যার আশুতোষের সঙ্গে তাঁহার আজকাল বিশেষ ঘনিষ্টতা—যাঁহারা স্যার আশুতোষকে সাহিত্যসম্মিলনাদি ব্যাপারে সমাগত হইতে প্ররোচনা করণের জন্য ধন্যবাদ পাইবার যোগ্য—তন্মধ্যে শশধর বাবু একজন প্রধান। এবং যাঁহারা স্যার আশুতোষকে এইকার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকেন, তন্মধ্যেও শশধর বাবু একজন। রঙ্গপুরের অভিভাষণে তাঁহার সহায়তা ছিল, একথা;

* কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষে শাস্ত্রী মহাশয় সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম (নব্যভারত আষাঢ় ১৩২১)—"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে পণ্ডিত হরপ্রসাদের ন্যায় অথরিটি দ্বিতীয় নাই। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য তিনি তদ্বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে রীডার হইতে পারেন নাই। তাঁহার উপরে গ্রহদেব সুপ্রসন্ন থাকিলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যানসেলার হইতেন—যেমন বোম্বের ভাণ্ডারকর হইয়াছিলেন। সে দূরের কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবিলী উপলক্ষে নানা দিগ্দেশ হইতে লোক ডাকিয়া ডক্টর উপাধি দেওয়া হইল। আর বাড়ীর কাছে হরপ্রসাদ উপেক্ষিত হইলেন।" ইহাতে বড় ভাণ্ডারকরের সঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা তুলিত হইয়াছিল। এখন কারমাইকেল প্রফেসর নিযুক্তিতে শাস্ত্রী মহাশয় ছোট ভাণ্ডারকর দ্বারা পরাভূত হইলেন!! (এটা যদি নেহাৎ "কাকতালীর ন্যায়" হয় তবে বড়ই আশ্চর্য্যের কথা।)

আমার যতদূর স্মরণ হয় তিনি স্বয়ং আমাকে বলিয়াছিলেন; এবং রঙ্গপুরে লর্ড কারমাইকেলের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে স্যার আশুতোষ বঙ্গভাষায় যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন আমারই সাক্ষাতে বসিয়া শশধর বাবু তাহা লিখিয়া দিয়াছিলেন। * এতদূর ঘনিষ্ঠতা যাঁহার সঙ্গে, তাঁহার ইঙ্গিত অর্থাৎ অভিপ্রায় মতে শশধর বাবু একটা প্রস্তাব করিবেন, এই কথা অনুমান করিলে তিনি যে কেন এত উত্তেজিত হইবেন, বুঝি না। আবার তিনি বলিতেছেন যে 'গত চারি পাঁচ বৎসর' যাবৎ তিনি এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিতে সমুৎসুক ছিলেন—"এবার সুসময় বোধ করিয়া" তিনি তাহার উপস্থাপন করিয়াছেন। আমিতো দেখিতেছি 'সুসময়টা' কেবল স্যার আশুতোষের সভাপতিত্ব দরুণই ঘটিয়াছে; নচেৎ বঙ্গের বাহিরে যে সম্মিলন—যাহাতে সভাপতি মহাশয়ের বিষয় নির্ব্বাচন সমিতিতে উপস্থিত থাকিবার বিঘ্ন ছিল—যে স্থলে ঐ সমিতিতে পূর্ব্বে প্রস্তাবটির আলোচনা হইতে পারিল না—সেই সম্মিলনে ইহা উত্থাপিত না করাই উচিত ছিল। যদি ৫।৬ বৎসর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন, তবে আর একটা বৎসর অপেক্ষা করিলে কি দোষ হইত? যাহা হউক যখন তিনি বলিতেছেন যে প্রস্তাবে স্যার আশুতোষের কোনও ইঙ্গিত ছিলনা, আমি তাহা বিশ্বাস করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং তাহা যে আমি অনুমান করিয়া তাঁহার মনে ক্লেশ উৎপাদন করিয়াছি তজ্জন্য অনুতাপ প্রকাশপূর্ব্বক কথাটা প্রত্যাহৃত করিতেছি, আশা করি তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন।

তিনি যদি পরমার্থতঃ এইরূপ বলেন যে আমি শাস্ত্রী মহাশয়ের ইঙ্গিতে প্রবন্ধ লিখিয়াছি, তাহা হইলেও আমি তাঁহাকে কোনও রূপ মন্দ বলিব না। এবিষয়ে একখানি পত্র অংশতঃ উদ্ধৃত করিতেছি:—"আপনার পত্র ও প্রেরিত 'নব্যভারত' পত্রিকার গত মাঘ মাসের সংখ্যা পাইয়াছি। * * * প্রবন্ধের বিষয় সম্বন্ধে আমার কিছু বলা উচিত নহে কারণ তাহা আমাকে লইয়াই। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, এ প্রবন্ধটী না লিখিলেই আমার পক্ষে ভাল হইত। * * * * আপনি যাহা লিখিয়াছেন সত্যের অনুরোধেই লিখিয়াছেন, তাহা আমি জানি। আমি ইহাও জানি যে আমি আপনাকে লিখিতে অনুরোধ করি নাই,

* অভিভাষণাদি অপরের দ্বারা লেখান বিশেষ দোষাবহ নহে। ইহা নিয়া কোনও কোনও সংবাদ পত্রে নানারূপ সমালোচনা হইয়াছে। অবশ্য শ্রীহর্ষাদে র্ধাবকাদীনামিব ধনম্' বলিয়া মম্মট ভট্ট মহারাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী হর্ষবর্দ্ধনকে একটু কটাক্ষ করিয়াছেন; কিন্তু সমুদ্রাগম চক্রবর্ত্তী স্যর আশুতোষকে তাদৃশ অধিক্ষেপ করা অনুচিত। হর্ষ কবি যশঃ 'প্রার্থী' হইয়াছিলেন—স্যর আশুতোষ 'গরজ' করিয়া এ সকল সম্মিলনে অধিনায়কত্ব করিতে যান নাই—বরং তাঁহাকে বহু উপরোধ করিয়াই নেওয়া হইয়াছে—এমনকি যশোহরের সভাপতিত্ব—তিনি স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন,একথা আমরা জানি বাধ্য হইয়া যখন অনভ্যস্ত কাজে তাঁহাকে যাইতে হইয়াছিল, তখন তদুপযোগী রচনার জন্য তৎকর্ত্তৃক অপরের সহায়তা গ্রহণ বরং প্রশংস্যই মনে করি। তবে ইংরাজীতে যিনি এমন সুন্দর বলিতেও লিখিতে পারেন, তাঁহার মাতৃ ভাষায় তাদৃশ দখল না থাকা আক্ষেপের বিষয়—বিশেষতঃ যখন তাঁহাকে বঙ্গভাষায় রীডার নিয়োগ, পাঠ্যে নির্ব্বাচন এমন কি প্রশ্ন পরীক্ষণ ইত্যাদি কার্য্য ও করিতে হইতেছে।

এবং আমি আরও জানি আপনি কাহারও অনুরোধে কোনও কথা লিখিবার লোক নহেন। কিন্তু যাহারা আপনাকে ও আমাকে না জানে তাহারা সহজেই মনে করিতে পারে আপনি আমার অনুরোধে এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, কারণ এরূপ লেখা অনেক স্থলেই ব্যক্তিবিশেষের অনুরোধে হইয়া থাকে, সত্যের অনুরোধে হয় না। * * * * " (পত্রের তারিখ ২৯শে ফাল্গুন ১৩২৩)

পত্রলেখকের নাম পশ্চাৎ বলিব। কিন্তু শশধরবাবু দেখিবেন যে, এইপ্রকার অনুমান খুবই স্বাভাবিক; তবে যদিও তিনি প্রকৃত-পক্ষে একথা বলেন নাই * এবং আমাকে যাঁহারা সম্যক্ জানেন তাঁহারা দয়া করিয়া ওরূপ বলিবেন না। তথাপি যখন শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম উঠিয়াছে, তখন তাঁহার উপলক্ষ্যে দুএকটা বিষয় এখানে বলিব, আশা-করি অবান্তর হইলেও তাহা ক্ষমার্হ হইবে।

১৯০৭ খৃঃ অব্দের এপ্রিলমাসের মধ্যভাগে (ঠিক তারিখ এখন স্মরণ নাই তবে সেদিন বৃহস্পতিবার ছিল, বারবেলায়ও বটে) কলিকাতার ডিরেক্টর সাহেবের অফিসে সংস্কৃত পরীক্ষা বোর্ড গঠন উপলক্ষে এক সভায় আমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম। তখন শাস্ত্রীমহাশয় টোলের পরীক্ষায় সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। কোনও কোনও ব্যক্তি উদ্যোক্তা হইয়া বোর্ড স্থাপন সম্বন্ধে আবেদন করেন, তাহারই ফলে এই সভা হয়। একজন অপেক্ষা দশজনের পরামর্শে কাজ ভাল হই-বারই কথা; এই বিশ্বাসে উপস্থিত সভ্য সকলেই বোর্ডগঠনে মত দেন। তখন সংস্কৃতকলেজের প্রিন্সিপাল বোর্ডের সম্পাদক থাকিবেন ঠিক হয়। কিন্তু সভাপতি কে হইবেন তাহা নিয়া বিতর্ক হয়। একজন প্রস্তাব করেন যে স্বয়ং ডিরেক্টর সাহেব প্রেসি-ডেন্ট হইয়া। ডিরেক্টর বাহাদুর (তখন স্যর আর্চ্চডেল আর্ল) বলেন তাঁহার অবসরা-ভাব। ডাঃ থিবো প্রেসিডেন্ট হউন। এই এই অধম তখন বলিয়াছিল যে ইংরেজী অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভূয়িষ্ঠ বোর্ডে একজন এতদ্দেশীয় ব্যক্তি সভাপতি হইলেই ভাল হয়—তিনি আচারবান ব্রাহ্মণ হইলে আরো শোভন হয়। ডিরেক্টর সাহেব এতাদৃশ কাহাকে প্রস্তাবার্থ আমাকে অনুজ্ঞা করেন, আমি স্যর শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের নাম করি। তিনি নিজের অসামর্থ্য বিজ্ঞাপিত করিলে অপর একজন দ্বারবঙ্গের মহারাজ বাহাদুরের নাম করেন। মহারাজ অস্বীকৃত হইয়া স্যর আশুতোষের নাম নির্দ্দেশ করেন। আমি সানন্দে তাহা সমর্থন করিলে স্যর আশুতোষ ঐ পদ গ্রহণে অঙ্গীকার করেন। বলা আবশ্যক তখন স্যর আশুতোষ বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি সমাজ সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই। এবং সে সময়ে স্যর আশুতোষের তথা শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ

---

* শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বন্ধে একটু সহানুভূতি ঐ প্রবন্ধে প্রকটিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ ইহাই এই অনুমানের সূত্র হইত; কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে কলি-কাতা সাহিত্য সম্মিলন বিষয়ক প্রবন্ধ হইতে যেটুকু উদ্ধৃত করিয়া একটা ফুটনোট দেওয়া হই-য়াছে, তাহাতেও তাদৃশ কথাই দেখা যাইবে। সেই প্রবন্ধ ও শাস্ত্রী মহাশয়ের ইঙ্গিতে লেখা হইয়াছিল, একথা বলা চলে না, কেননা তাহাতে তদীয় অভিভাষণের নানা ভুলভ্রান্তি প্রদর্শিত হইয়া-ছিল। (নব্যভারত—আষাঢ় ১৩২১।১২২।১২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পরিচয়ও অতি সামান্যই ছিল। * সে যাহা হউক, ঐদিনে আমি এইটুকু বুঝিয়াছিলাম যে একটা দলাদলি কলিকাতায় আছে—এবং তাহাতে অনেক অপ্রীতিকর ও অযশস্কর ব্যাপার ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। তবে শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাগ্যনদীতে এমন ভাঁটা পড়িয়াছে—যাঁহাদিগকে তিনি প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন, হয়তো যাঁদের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইতে গিয়া নিজে অযশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন, এমন কেহ কেহ আজ তাঁহার বিপক্ষে গিয়া সৌভাগ্যশীল ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আমি মধ্যে মধ্যে প্রত্নতত্ত্বাদি বিষয়ের উপদেশ যাথার্থে শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকটে গিয়া থাকি—কথা প্রসঙ্গে এই সকল অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয় ব্যথানুভব করিয়াছি—তাই কোনও কোনও প্রবন্ধে তাঁহার জন্য অক্ষেপ করিয়া দু একটা কথা বলিয়া ফেলিয়াছি, এই মাত্র।

যাঁহার পত্রাংশ ইতঃপূর্ব্বে (বর্ত্তমান-প্রবন্ধে) উদ্ধৃত করিয়াছি তাঁহার ইঙ্গিতের কোনও উল্লেখ যে শশধরবাবু করেন নাই তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। সমালোচ্য প্রবন্ধে তাহার একটু সূত্র ও ছিল। প্রবন্ধের একস্থলে ছিল "* * এতদ্বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কল্পে একটি কমিটি গঠিত করা হয়, তাহাতেও স্যর গুরুদাস বলেন—এবং সত্যের অনুরোধে বলা আবশ্যক যে স্যার আশুতোষ ঐ কমিটিতে ছিলেন।" (নব্যভারত, মাঘ ১৩২৩, ৬০৫ পৃঃ, দ্বিতীয় স্তম্ভ)। ইহা হইতে কেহ হয়তো বুঝিতে পারিতেন, যে স্যর গুরুদাসের সঙ্গে এই সকল কথা নিয়া আমার আলাপ আলোচনা হইয়াছিল, তাই তিনি ঐ কমিটিতে স্যর আশুতোষের থাকার কথা বলিয়াছিলেন।" এবং তাহা হইলে বাঁকীপুর সম্মিলন প্রবন্ধে ঐ সকল কথা আমি স্যর গুরুদাসের ইঙ্গিতেই লিখিয়াছি, ইহাও বলিলে অন্যায় হইত না। কিন্তু আমার হাতের লেখার দোষে একটি মাত্র শব্দ অশুদ্ধ মুদ্রিত হওয়াতে ঐরূপ অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। তাই মাঘের 'নব্যভারত' খানি পাইবামাত্র আমি সম্পাদক মহোদয়কে এই কথা জানাইয়া সংশোধন ছাপাইতে বলি, এবং সুখের বিষয় 'ফাল্গুন' সংখ্যাতে নব্যভারতের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে ঐ সংশোধন মুদ্রিত হইয়াছে। অর্থাৎ 'বলেন'—না হইয়া হইবে "ছিলেন"—স্যর গুরুদাস ঐ কমিটিতে ও ছিলেন ইত্যাদি। এই অশুদ্ধি—যাহাতে এইরূপ অনর্থক অপবাদের সম্ভাবনা—পাঠ করিলে স্যর গুরুদাস বিরক্ত হইতে পারেন, এই আশঙ্কা করিয়া, একখানি 'নব্যভারতে' আবশ্যক সংশোধন করিয়া তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করি। তিনি যে উত্তর দিয়াছেন, তাহারই অংশ বিশেষ বর্ত্তমান প্রবন্ধে পূর্ব্বতন পৃষ্ঠা বিশেষে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয়ের শেষ কথা, এই যে যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা প্রচলন সম্বন্ধে স্যার আশুতোষকে ধন্যবাদ দেন, আমি তাঁহাদের "মত খণ্ডন" করিতে পারি নাই। তাঁহাদের 'মত' টা কিরূপ

* যাঁহারা স্যর আশুতোষের সংস্কৃত বোর্ডে সভাপতিত্বে অসন্তোষের ভাব পোষণ করেন, এমন কেহ কেহ আমাকে এইজন্য দায়ী করেন। তাই অবান্তর হইলেও ঐ ব্যাপার সম্পর্কিত সমস্ত এস্থলে বিস্তারিত ভাবে লিখিলাম। ইহা হইতেই আমার উক্তাদি সকলেই সম্যক্ বুঝিতে পারিবেন।

যুক্তি প্রমাণের উপর অবস্থিত তাহা আমি অবগত হইলে 'খণ্ডন' করিতাম। তাঁহারা তো কেবল বলেন যে স্যর আশুতোষ বাঙ্গালা ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন আর তজ্জন্য তাঁহাকে প্রভূত পরিমাণে 'ধন্যবাদ' দেন। পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা ছিল না—স্যর আশুতোষ চেষ্টা করিয়া তাহা আনিয়াছেন, এইটুকু যুক্তি প্রমাণ দিয়া বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। অপর পক্ষে আমি নানা কাগজপত্র হইতে তথ্যোদ্ধার পূর্ব্বক * দেখাইয়াছি যে বঙ্গভাষা প্রথমতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ ভালরূপই ছিল; তারপর মধ্যযুগে ইহা পুরুষ পরীক্ষার্থিগণের জন্য রহিত-প্রায় হইয়া যায়; তৎপর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আন্দোলনে তাহা স্বেচ্ছায় গ্রহণীয় রচনার বিষয়রূপে বি, এ, ও এফ্, এ পরীক্ষাতে প্রবর্ত্তিত হয়; সর্ব্বশেষ ইউনিভার্সিটিস্ কমিশনের রিপোর্টে এবিষয়ে যাহা লিপিবদ্ধ হয় তদনুসারেই স্যার আশুতোষ রেগুলেশন্‌স্ এ বাঙ্গালাভাষার সংস্থাপন করেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে হইলে দেখান উচিত ছিল (১) তিনি এ বিষয় কমিশনের রিপোর্টের অন্যথাচরণ করিতেও পারিতেন কিনা, এবং (২) তিনি বঙ্গভাষার উপকারার্থে ঐ রিপোর্টে অননুজ্ঞাত কোনও বিধান করিয়াছেন কিনা। শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় সে দিক্ দিয়া যান নাই। স্যর আশুতোষ যাহা করিয়াছেন তাহাকে "প্রবর্ত্তন" বলেনা—তিনি গবর্ণমেণ্টের আদেশে এক্ট ও (Act) কমিশনের নির্দ্দেশ অনুসরণ ক্রমে কার্য্য করিয়াছেন। * সংক্ষেপে বলিতে গেলে 'হুকুম তামিল' করিয়াছেন।' তিনি যে তাহা সুচারুরূপে করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি তাঁহার নিয়োগকর্ত্তৃগণের ধন্যবাদের এবং সাধারণের প্রশংসারও পাত্র হইতে পারেন—কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধুনা যে ভাবে বাঙ্গালা ভাষা চলিতেছে তজ্জন্য কমিশনের সদস্য স্যর গুরুদাস—যিনি পরিষদ্ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বত্রই এতজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই প্রধানতঃ আমাদের ধন্যবাদের পাত্র, তার পরে সাহিত্যপরিষদ। শশধরবাবু "স্যর গুরুদাস, সাহিত্যপরিষদ্, এমন কি বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ও এ বিষয়ে ধন্যবাদ পাইতে পারেন" এইটুকু লিখিয়া স্যর গুরুদাস তথা সাহিত্যপরিষদের প্রতি যে ভাব প্রদর্শন

* বাঁকীপুর সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় দিবস অপরাহ্নে সাহিত্য শাখায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় "বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গভাষা" এই শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহা হইতে স্যর গুরুদাস ভাইসচ্যান্সেলার স্বরূপ যে বক্তৃতা দেন, তাহার উদ্ধৃতাংশ, এবং কমিশনের রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃতাংশ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেকাল্টি অব্ আর্টস এর অধিবেশন তারিখটাও অবগত হইয়াছিলাম। আমার উচিত ছিল পূর্ব্ব প্রবন্ধেই এই ঋণ স্বীকার করা! কিন্তু কোনও কারণে তাহা কার্য্যতঃ বিরত ছিলাম—সেই কারণ তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত জনৈক আত্মীয়াকে জানাইয়া অনুরোধ করিয়াছিলাম তিনি যেন অক্ষয়বাবুকে তাহা জানান। যাহা হউক ইদানীং শুনিলাম অক্ষয়বাবু নাকি আমার উপর একান্ত বিরক্ত হইয়াছেন তাই আমি তাঁহার নিকট ত্রুটি স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

* শশধর বাবুর মত অবলম্বন করিলে সারাঘাটেরপুল যে এঞ্জিনীয়ারের ডিজাইন অনুসারে তৈয়ার হইয়াছে, তাঁহাকে 'নাইট' না করিয়া কণ্ট্রাক্টার দিগকে পুরস্কৃত করাই উচিত ছিল বোধ হয়

করিয়াছেন, তাহা এস্থলে আর খুলিয়া বলিলাম না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—শশধর বাবুর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দুঃখিত হইয়াছি। পরন্তু তাঁহাকে কটু বলিব না—কেননা তিনি আমার শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ, জ্ঞানবয়োবৃদ্ধ পদস্থ ব্যক্তি। তিনি যেন এভাবে আর আসরে না নামেন, ইহাই আমার সবিনয় নিবেদন। ইতি—

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মণঃ।

বেদোক্ত অধিকারী ভেদের কারণ।

(কর্ম্মকাণ্ড)

ব্রহ্মের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সত্ব, রজঃ ও তমঃগুণের ভিন্নতাই, বেদোক্ত অধিকারী ভেদের কারণ। তবে কেবল মায়াবিলসিত জগতের জন্যই উপদিষ্ট হওয়ায়, সমাজের কল্যাণার্থে কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ—"শূদ্রের যজ্ঞে অধিকার নাই; অগ্নিষ্টোম বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণই করিবেন; ক্ষত্রিয়ই রাজসূয়ের অধিকারী" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বর্ণভেদে অধিকারী স্থির করায় সেই সেই স্থিরীকৃত বর্ণ ব্যতীত অন্যের অধিকার না থাকিলেও, যখন গুণানুসারেই বর্ণ ভেদ স্থিরীকৃত হইয়াছে, তখন অবশ্য বর্ণোচিত গুণ লাভ করিতে পারিলেও, আছে। ভগবান্ বলিয়াছেন—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ।" অর্থাৎ আমি যে চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা কেবল তখনকার ব্যক্তিগত গুণ ও কর্ম্মের বিভাগদৃষ্টে—চাতুর্ব্বর্ণ্যের বিভাগদৃষ্টে নহে; যেহেতু, তখন অর্থাৎ "আদিতে বর্ণও একমাত্র ছিল।" ভাগবত, ৯ম স্কঃ, ১৪ অঃ। গৌতম সংহিতাতেও দেখা যায়—"ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্। তমেব ব্রাহ্মণম্ মন্যে শেষাঃ শূদ্রাঃ ইতিস্মৃতাঃ॥ অগ্নিহোত্রব্রতপরান্ স্বাধ্যায় নিরতান্ শুচীন্। উপবাসরতান্ দাণ্ডাংস্তান্ দেবা ব্রাহ্মণান্ বিদুঃ॥ ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ। চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥" অর্থাৎ ক্ষমাবান্, দমশীল, জিতক্রোধ এবং জিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়-কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে, আর সকলে শূদ্র; যাহারা অগ্নিহোত্রব্রতপর, স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, উপবাসরত ও দান্ত, দেবতারা তাহা-দিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন; হে রাজন্! জাতি পূজ্য নহে—গুণই কল্যাণকারক, চণ্ডাল ও সচ্চরিত্র হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। আবার মহাভারতে বন-পর্ব্বের চতুর্দ্দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়ে আছে—"পাতিত্যজনক কুক্রিয়াসক্ত, দাম্ভিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্র সদৃশ হয়; আর যে সকল শূদ্র সত্য, দম ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত, তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি; কারণ, ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়।" সুতরাং গুণানুসারেই বর্ণভেদ স্থিরীকৃত হইয়াছে; বর্ণানুসারে নহে।

পূর্ব্বে সেই জন্যই উচ্চবর্ণস্থ হীনগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিরা নীচবর্ণে নিক্ষিপ্ত, এবং নীচ বর্ণস্থ সদ্‌গুণশালী পুরুষেরা উচ্চবর্ণে উত্তোলিত হইত। শূদ্রকুলোৎপন্ন বশিষ্ঠ, নারদ, সত্যকাম, ব্যাস; ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব ঋষভের একাশীটি পুত্র, বিশ্বামিত্র ঋষ্যাদি বিদ্যাবলে ব্রাহ্মণত্ব এবং অজ্ঞাত-পিতা কৃপ, দ্রোণ, কর্ণাদি বাহুবলে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আবার দ্বিজবন্ধু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকুল হইতে পতিতেরা শূদ্র মধ্যে পরিগণিত হইত;—"স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ীনশ্রুতিগোচরা।" অতএব বর্ণভেদ সত্বেও যখন গুণের যথেষ্ট ব্যভিচার দেখা যাইতেছে, তখন আর বর্ণভেদকে গুণভেদের কারণ বলা যায় না; বলিলে শাস্ত্র, যুক্তি—এমন কি, প্রত্যক্ষের ও অপলাপ করা হয়। বর্ণভেদ সত্বেও গুণের যথেষ্ট ব্যভিচার হয় দেখিয়াই, মহাভারতের বনপর্ব্বে একোনাশীত্যধিক শততম অধ্যায়ে রাজর্ষি নহুষ বলিতেছেন—"বেদমূলক সত্য, দান, ক্ষমা, আনৃশংস্য, অহিংসা ও করুণা শূদ্রেও লক্ষিত হইতেছে; যদ্যপি সত্যাদি ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম শূদ্রেও লক্ষিত হইল, তবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে।" তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, "অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণ লক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্র লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, অতএব শূদ্রবংশ্য হইলে যে শূদ্র হয়, এবং ব্রাহ্মণবংশীয় হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে; কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত না হয়, তাহারাই শূদ্র।" বাস্তবিক বর্ণভেদ দ্বারা কোন মতেই গুণকে ব্যভিচার দোষ হইতে রক্ষা করা যায় না বলিয়াই, অর্থাৎ এক বর্ণের গুণ অন্য বর্ণে হওয়ার অবশ্যম্ভাবিতা দেখিয়া, মনু মহাশয় বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণ শূদ্র, এবং শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়; ক্ষত্রিয় শূদ্র, এবং শূদ্রও ক্ষত্রিয় হয়; বৈশ্য শূদ্র, এবং শূদ্রও বৈশ্য হয়;—"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্। ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈবচ॥" কারণ, বর্ণভেদের মুখ্য উদ্দেশ্যই গুণ ব্যভিচার না হওয়া। কিন্তু যখন বর্ণভেদ সত্বে ও তাহার অসদ্ভাব নাই, তখন গুণানুসারে অধিকার দেওয়া না হইলে বর্ণভেদের কোন অর্থই থাকে না। তবে বর্ণভেদই উক্ত ব্যভিচার দোষ নষ্ট করিবার একমাত্র উপায় বলিয়া, গুণ লাভ সত্বেও গুণোচিত বর্ণে উত্তোলিত না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ণোচিত যাগযজ্ঞাদিতে অধিকার দিলে ঐ একই দোষ রহিয়া যায় দেখিয়া কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ কেবল বর্ণভেদেই অধিকারী স্থির করিয়াছেন; কিন্তু তদ্দ্বারা এরূপ বলা হয় নাই যে, গুণানুসারে বর্ণাধিকার নাই। ছান্দোগ্যোপনিষদে "সত্যকামের আত্মবিদ্যা" হইতেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ আদৌ গুণানুসারে বর্ণাধিকার নিষেধ করেন নাই; কেবল বর্ণানুসারে কর্ম্মাধিকারই নিষেধ করিয়াছেন। যথা—"জবালাতনয় সত্যকাম বেদাধ্যয়নার্থ ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে গুরু গৃহে বাসেচ্ছায় জননীকে স্বীয় গোত্র জিজ্ঞাসা করেন; তদুত্তরে জবালা বলেন, আমি যৌবনাবস্থায় অনেকের পরিচর্য্যা করিতাম, তদবস্থায় তোমায় লাভ করিয়াছি; সে কারণ আমি তোমার গোত্র জানি না। তবে এইমাত্র জানি যে, আমার নাম জবালা আর তোমার নাম সত্যকাম। অনন্তর সত্যকাম হরিদ্রুমানের তনয় গৌতমের সমীপে উপস্থিত হইয়া অভিলষিত বিষয় প্রকাশ করায়,

গৌতম গোত্র জিজ্ঞাসা করেন। অজ্ঞাত গোত্র সত্যকাম জননী প্রমুখাৎ যাহা জ্ঞাত হইয়াছিলেন—অকপটে তাহাই বলায়, গৌতম প্রীত হইয়া বলেন—বৎস, তুমি যখন সত্য হইতে বিচ্যুত হও নাই, তখন আমি তোমাকে উপনীত করিব—তুমি সমিধ আহরণ কর। এই বলিয়া গৌতম ঋষি সত্যকামকে উপনীত করিয়া তদনন্তর অধিকার প্রদান করেন।" অর্থাৎ,দ্বিজবর্ণত্রয় কর্ত্তৃক অনুলোম ক্রমে অনন্তর বর্ণজা পত্নীর গর্ভসম্ভূত মাতার হীন-জাতীয়তা প্রযুক্ত পিতৃজাতি প্রাপ্ত না হইয়া তৎসদৃশ জাতি হইয়া থাকে ;—"স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্ সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥" সুতরাং দাসী-পুত্র সত্যকাম ও শূদ্র। তবে ব্রাহ্মণোচিত গুণ থাকায়; গুণোচিত বর্ণে অধিকার না থাকিলেও উপনয়ন দ্বারা সংস্কৃত করতঃ সেই বর্ণে উত্তোলিত না হওয়াপর্য্যন্ত ; বর্ণোচিত কর্ম্মাদিতে অধিকার নাই দেখিয়া গৌতম ঋষি উপনীত করিয়াছিলেন। অনেকে শ্রুতির "নৈতদব্রাহ্মণো"—"অব্রাহ্মণ কখনই এরূপ সত্যকথা বলিতে পারে না" এই বাক্যকে লক্ষ্য করিয়া সত্যকামকে ব্রাহ্মণ বলেন বটে,কিন্তু তাহাতেও শ্রুতহানি ও অশ্রুত কল্পনা এই দুই দোষ হয়। অর্থাৎ শুনিবা মাত্র যে অর্থ বোধগম্য হয় সে অর্থ ত্যাগ করিলে শ্রুতহানি দোষ এবং যে অর্থ শব্দের শক্তিতে লভ্য হয় সে অর্থ ত্যাগ করিয়া অন্য অর্থ কল্পনা করিলে অশ্রুত কল্পনা দোষ হয়। বাস্তবিক সত্যকামের যখন গোত্র সম্বন্ধে কিছুই শুনা যায় না কেবল সদ্গুণের পরিচয়েই উপনীত হইয়াছিলেন, তখন আর শ্রুত বিষয় অর্থাৎ সদ্গুণ ছাড়িয়া অশ্রুত বিষয় অর্থাৎ গোত্র কল্পনা করা উচিত হয় না। আর গৌতম ঋষি ও যখন সত্যকামকে "কিংগোত্রোনু সৌম্যাসীতি"—"সৌম্য! তোমার গোত্র কি ?" এই বাক্য দ্বারা সত্যকামকে গোত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন অবশ্য তিনিও সত্যকামের গোত্র জানিতেন না। ফল কথা—যখন আদিতে বর্ণভেদ ছিল না পরে গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ দৃষ্টে বর্ণভেদ নির্ণীত হইয়াছে, তখন আর সত্যকাম স্বীয় সদ্গুণের পরিচয়ে ব্রাহ্মণত্বে উত্তোলিত না হইবেন কেন ? অর্থাৎ যখন গুণানুসারেই বর্ণভেদ স্থিরীকৃত হইয়াছে, তখন ব্রাহ্মণবংশ্য না হইলেও ব্রাহ্মণোচিত গুণ থাকিলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা যায়। এস্থলে এরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে,ব্রহ্মবিদ্যার্থী সত্যকামকে যখন ব্রহ্মবিদ্যার্থই উপনীত করা হইয়াছিল এবং সত্যকাম ও ব্রহ্মবিদ্যারই অনুশীলন করিয়াছিলেন, তখন জ্ঞানাধিকারের কথা কর্ম্মাধিকারে কেন ? সুতরাং তদুত্তরে বলা যায়—কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদের ন্যায় জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে, উপনয়ন সংস্কার ও বর্ণভেদের অপেক্ষা নাই। অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে যেমন যজ্ঞোপবীত ভিন্ন যজ্ঞে এবং স্ববর্ণোচিত যজ্ঞাদি ভিন্ন অন্য বর্ণোচিত যজ্ঞাদিতে অধিকার নাই জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে সেরূপ নহে। জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে যে উপনয়ন সংস্কার এবং বর্ণভেদের আদৌ অপেক্ষা নাই, তাহা আমরা জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদোক্ত ব্রহ্ম বিদ্যার অধিকারীর আলোচনায় দেখিতে পাইব। তবে গৌতম ঋষি যে সত্যকামকে উপনীত করিয়াছিলেন, তাহা কেবল ব্রাহ্মণ বর্ণেও ব্রাহ্মণ বর্ণোচিত যাগ যজ্ঞাদিতে অধিকার দেওয়ার জন্য। তাই ছান্দোগ্যোপনিষদোক্ত "উপকোশলের আত্মবিদ্যায়" দেখিতে পাওয়া যায়, সত্যকাম সাগ্নিক "ব্রাহ্ম-

ণোচিত যজ্ঞাগ্নির পরিচর্য্যা এবং আচার্য্যের কার্য্যাদি করিতেছেন। আর পূর্ব্বেও এই জন্যই বলা হইয়াছে—সত্যকাম ব্রাহ্মণত্বে উত্তোলিত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক প্রবৃত্তি ত্যাগ করিতে অশক্ত ব্যক্তিদিগের চিত্তশুদ্ধির জন্যই কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে যাগ যজ্ঞাদির বিধান হওয়ায় এবং সত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের ভিন্নতানুসারে প্রবৃত্তিও ভিন্ন ভিন্ন হইতে বাধ্য বলিয়া, কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে প্রবৃত্ত্যনুসারে বর্ণভেদের এবং কোন এক নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন দ্বারা উক্ত বর্ণচতুষ্টয়কে পরিচিত করিবার জন্য উপনয়ন সংস্কারের প্রয়োজন আছে বটে; কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে তাহা নাই। কারণ, জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম "একমেবাদ্বিতীয়ম্;" এবং তাহাও কেবল নিবৃত্তিমার্গীয় পথিকদের জন্যই উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং নিবৃত্তির ভাবও অদ্বৈত বলিয়া, জ্ঞানকাণ্ডের অধিকারীদের মধ্যে পার্থক্য না থাকায় উপনয়ন এবং বর্ণভেদের প্রয়োজন নাই। আর কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে যে কেবল উপনয়ন সংস্কার এবং বর্ণভেদেরই অপেক্ষা আছে, তাহা নহে; দেবতা ও গোত্র না থাকিলেও অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাই দেবতাদের দেবতা ও উপনয়ন না থাকায় এবং ঋষিদিগের ঋষি অর্থাৎ গোত্র না থাকায় কর্ম্মকাণ্ডে অধিকার নাই। এ স্থলে "অধিকার নাই" না বলিয়া, প্রয়োজন নাই বলাই যুক্তি সঙ্গত। কারণ চিত্তশুদ্ধির জন্যই যজ্ঞাদির আবশ্যক; কিন্তু দেবতা ও ঋষিদের যখন তাহার অভাব নাই, তখন অবশ্য প্রয়োজনও নাই। তাই লিঙ্গ পুরাণে লিখিত আছে—জ্ঞানামৃত পরিতৃপ্ত পুরুষের কর্ম্মে প্রয়োজন কি?—"জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কর্ম্মণা প্রজয়া চ কিম্।" অতএব আমরা দেখিলাম যে, গুণানুসারেই, বর্ণভেদ স্থিরীকৃত হওয়ায় গুণলাভ করিতে পারিলে গুণোচিত বর্ণে অধিকার আছে বটে; কিন্তু উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ণোচিত যজ্ঞাদিতে অধিকার নাই। তাই "নীচাদপ্যুত্তমা বিদ্যা স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি"; অর্থাৎ নীচ হইতে উত্তম বিদ্যা এবং দুষ্কুল হইতে গুণবতী স্ত্রী গ্রহণযোগ্য হইলেও, স্ত্রীলোকের উপনয়ন সংস্কার না থাকায় বর্ণোচিত যাগ যজ্ঞাদিতে আদৌ অধিকার নাই। এক্ষণে চিন্তার বিষয় এই যে, গুণলাভ করিতে পারিলে যখন গুণোচিত কর্ম্ম স্বতঃই হইয়া থাকে, তখন অবশ্য "উপনয়ন ব্যতীত অধিকার নাই" বলিলে, তাহাকে সাহসোক্তিই বলিতে হয়। বাস্তবিক গুণলাভ হইলে, গুণোচিত কর্ম্ম স্বতঃই হইয়া থাকে; কেহ তাহাকে বাধা দিতে পারে না। তাই জমদগ্নি, জামদগ্ন্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ছিলেন; অথচ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মী। আবার ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় হইয়াও, ব্রাহ্মণোচিত গুণলাভ করিয়াছিলেন। ফলকথা—গুণভেদই অধিকারী ভেদের পরমার্থতঃ কারণ; তবে ব্যবহারিক জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হওয়ায়, বর্ণাদি ব্যবহারিক মাত্র।

(জ্ঞানকাণ্ড)

আমরা কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদোক্ত অধিকারীর আলোচনায় দেখিয়াছি যে, তত্বতঃ গুণভেদই অধিকারী ভেদের কারণ—আদৌ উপনয়ন ও বর্ণাদি কারণ নহে। তবে কেবল ব্যবহারিক কল্যাণোদ্দেশেই আদিষ্ট হওয়ায় সত্যতঃ কারণ না হইলেও কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ ব্যব-

হারিক ভাবে উপনয়ন ও বর্ণাদিকে কারণ বলিয়াছেন; এবং তাত্ত্বিক কারণ সত্ত্বেও ব্যবহারিক কারণ ব্যতীত অধিকার না দেওয়ায় ব্যাবহারিক কারণই কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে মুখ্য এবং পারমার্থিক কারণ গৌণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদোক্ত বর্ণভেদের মুখ্য উদ্দেশ্যই গুণ ব্যভিচার না হওয়া। সুতরাং সত্ত্ব, সত্ত্বরজঃ, রজস্তমঃ ও তমঃগুণযুক্ত ব্যক্তিদিগকে ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্যের বিভাগ দ্বারা পৃথক্ পথক্ ভাবে না রাখিলে, এবং বর্ণভেদ সত্ত্বেও একবর্ণের গুণ অন্যবর্ণে হওয়ার অবশ্যম্ভাবিতা আছে দেখিয়া, অর্থাৎ উক্ত বর্ণাদিও তত্ত্বতঃ গুণভেদের কারণ নহে বলিয়া, গুণানুসারে বর্ণাধিকার দেওয়া না হইলেও উক্ত ব্যভিচার দোষ রক্ষিত হয়না। কাযেই কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ উক্ত উভয়কেই কারণ বলিয়াছেন; এবং গুণানুসারে বর্ণাধিকার না দেওয়া পর্য্যন্ত বর্ণোচিত কর্ম্মাদিতে অধিকার দেওয়া হইলে বর্ণভেদের অভাব হেতু সেই পূর্ব্বদোষই থাকিয়া যায় দেখিয়া বর্ণ-ভেদকেই মুখ্য কারণ বলিয়াছেন। আর কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদের ওরূপ বলিবার শক্তিও আছে। কারণ, গুণলাভ হইলে গুণোচিত কর্ম্ম স্বতঃই হইতে থাকিলেও তদ্দ্বারা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইতে পারে না; যে হেতু, যজ্ঞাদি একমাত্র বেদাধ্যয়ন সাপেক্ষ। সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে ওরূপ নির্দেশ সঙ্গত হয়। কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে একমাত্র গুণ ব্যতীত বর্ণ, উপনয়ন, দেবতা ও গোত্রকে অধিকারী ভেদের কারণ বলা যায় না; বলিলেও তাহা অসঙ্গত হয়। কারণ, কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদের প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম অর্থাৎ যাগ যজ্ঞাদি, একমাত্র কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদাধ্যয়ন সাপেক্ষ; এবং উক্ত বেদাধ্যয়ন ও উপনয়ন সাপেক্ষ। সুতরাং গুণ সত্ত্বেও কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদাধ্যয়ন ব্যতীত যজ্ঞাদি সম্পাদিত হইতে পারে না। তাই আদৌ উপনয়ন সংস্কার না থাকায়, গুণ সত্ত্বেও স্ত্রীজাতির কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে অনধিকার প্রযুক্ত যাগ যজ্ঞাদিতে অধিকার নাই। কিন্তু জ্ঞান-কাণ্ডীয় বেদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যা একমাত্র বৈরাগ্য সাপেক্ষ—বৈরাগ্য ব্যতীত শত অধ্যয়নেও ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায় না; তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন"—"এই আত্মাকে বেদাধ্যাপন দ্বারা লাভ করা যায় না, মেধা দ্বারা বা বহু শাস্ত্র শ্রবণেও লাভ করা যায় না।" ছান্দোগ্যোপনিষদের নারদ সনৎকুমার সংবাদে দেখা যায়—দেবর্ষি নারদ চারি বেদ প্রভৃতি সমুদয় অধ্যাত্ম-শাস্ত্র পাঠ করিয়াও ব্রহ্মকে লাভ করিতে না পারিয়া ভগবান্ সনৎ কুমারের নিকট ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বাস্তবিক বৈরাগ্যই ব্রহ্মবিদ্যা লাভের একমাত্র কারণ। তবে বেদাধ্যয়ন করিতে করিতে শুভ প্রাক্তন-বশতঃ দৈবাৎ কোন সৌভাগ্যযুক্ত পুরুষের সংসারের অনিত্যতা অনুভব হইয়া আসিলে তদনন্তর শমদমাদির সাধন দ্বারা বৈরাগ্যোদয় হইতে পারে বলিয়া বেদাধ্যয়নকেও ব্রহ্মবিদ্যালাভের কারণ বলা যায় বটে; কিন্তু যাবৎ না বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাবৎ বেদাধ্যয়ন দ্বারাও লাভ করা যায় না। আবার কর্ম্মক্ষয় ব্যতীত শমদমাদির সাধন দ্বারাও বৈরাগ্যলাভ করিবার উপায় নাই; কারণ, সংসারে জন্ম কর্ম্মক্ষয় জন্য; সে কারণ কর্ম্মক্ষয় না হইলেও বল-পূর্ব্বক শমদমাদির সাধন করিতে যাইলে

সঞ্চিত কর্ম্ম ক্ষয়িত না হওয়ায় মুক্তিলাভ ত দূরের কথা, পরন্তু ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদিরূপ কঠোর কার্য্যে মৃত্যু হওয়াই সম্ভব। তাই আচার্য্য শঙ্কর তদীয় বিবেক চূড়ামণিতে বলিয়াছেন "এতয়োর্মন্দতা যত্র বিরক্তত্ব মুমুক্ষয়োঃ। মরৌ সলিলবৎ তত্র শমাদের্ভানমাত্রতা॥" "বিষয়-বৈরাগ্য ও মুমুক্ষুত্ব না থাকিলে মরু-ক্ষেত্রে জলের ন্যায় সেই ব্যক্তিতে শমাদি-সম্বন্ধীয় কথা বলা বৃথা কল্পনামাত্র হইয়া থাকে।" অতএব, যাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধনার ফলে স্বতঃই বৈরাগ্যোদয় হইয়া থাকে তিনিই ব্রহ্মবিদ্যালাভের যথার্থ অধিকারী বলিয়া, বৈরাগ্যই ব্রহ্মবিদ্যালাভের একমাত্র কারণ। আরও, আচার্য্য শঙ্কর বেদান্তের "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" সূত্রটীর ভাষ্যে স্পষ্টই বলিয়াছেন—"বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই মানুষের ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা হয় এবং কৃত-কার্য্যও হয়।" বাস্তবিক, মনোবৃত্তির পরমোপশান্তির নামই মুক্তি বা ব্রহ্মসাযুজ্য; তাই পতঞ্জলি মুনি বলিয়াছেন—"যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ।" সুতরাং বৈরাগ্যোদয়ে স্বতঃই সাধন চতুষ্টয়ঃ * আয়ত্তীকৃত হইতে থাকিলে ক্রমে যখন "বশীকার" অবস্থায় চিত্তের সূক্ষ্ম ঔৎসুক্যটুকুও থাকে না, তখন স্বতঃসিদ্ধ মনোলয়ে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া একমাত্র বৈরাগ্যবান্ পুরুষই ব্রহ্মবিদ্যার যথার্থ অধি-কারী; এবং বৈরাগ্যের চরম অবস্থায়, অর্থাৎ "পরবৈরাগ্য" উপস্থিত হইলে স্বতঃই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে বলিয়া, জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে উপনয়ন, বর্ণ, দেবতা ও গোত্র অধিকারী ভেদের কারণ নহে। কারণ, "যেন বিনা যৎ ন ভবতি তৎ তস্য কারণম্।" অর্থাৎ যাহা ব্যতীত যাহা আত্মলাভ করে না, সে তাহার কারণ। সুতরাং বৈরাগ্য জন্মিলে যখন স্বতঃই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে—কেহই তাহাকে বাধা দিতে পারে না, তখন আর গুণ অর্থাৎ বৈরাগ্য ভিন্ন অন্য কোন কিছু জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদোক্ত অধিকারী ভেদের কারণ নহে। ছান্দোগ্যোপনিষদে সত্যকাম ও উপকোশলের আত্মবিদ্যায় দেখা যায়, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার-কারিণী মতিলাভ করিলে সত্যকাম ও উপ-কোশলের আপনা হইতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। আর বাস্তব পক্ষে কথাও তাই। কারণ, জীবই ব্রহ্ম; কেবল

---

* কোন্ বস্তু নিত্য, কোন্ বস্তু অনিত্য, তাহা বিবেচনা করা; ঐহিক ও পারলৌকিক ফলভোগে বৈরাগ্য উৎপাদন করা; আত্মাতে শমদমাদি ছয় প্রকার গুণের উদ্রেক করা; এবং মুমুক্ষা। এই চারিপ্রকার আত্ম ব্যাপারের নাম সাধন অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের উপকারী।

নিত্যানিত্য বিচার।—একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত যাহা কিছু আছে সমুদয়ই অনিত্য—এই জ্ঞান সম্যক্ উপলব্ধি করা।

বৈরাগ্য।—বৈরাগ্য সম্বন্ধে পাতঞ্জলের মতটী সমীচীন বোধ হওয়ায় এ স্থলে লিপিবদ্ধ করা হইল।—"দৃষ্ট বিষয় ও শাস্ত্র প্রতিপাদিত বিষয়, যুগপৎ উভয় বিষয়েই সম্পূর্ণরূপে নিস্পৃহ হইতে পারিলে, "বশীকার" নামক বৈরাগ্য জন্মে। অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগেচ্ছা ত্যাগ করিতে পারিলেই উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য হয়।" ইহা আবার অবস্থাভেদে চারি প্রকার। যথা—"প্রথম যতমান, দ্বিতীয় ব্যতিরেক, তৃতীয় একেন্দ্রিয় ও চতুর্থ বশী-কার। চিত্তের বিষয়ানুরাগ নষ্ট করিবার চেষ্টা জন্মিলে তাহা যতমান; অনন্তর কোন্ অনুরাগ নষ্ট হইল, কোন্ অনুরাগই বা সজীব থাকিল, তাহা পরীক্ষার দ্বারা জ্ঞাত হইয়া সজীব অনুরাগগুলিকে দগ্ধ করিবার চেষ্টার নাম ব্যতিরেক; ক্রমে যখন চিত্ত ম.র

চিত্ত মালিন্য হেতু তাহা জানিতে পারা যায় না সুতরাং পর বৈরাগ্যের উদয় হইলে উক্ত মালিন্য একেবারে দূর হওয়ায় তখন স্বতঃই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়। অতএব, গুণলাভ হইলে যাহা স্বতঃই আসিয়া থাকে, সে বিষয়ে আর উপনয়ন, বর্ণ, দেবতা ও গোত্রের অপেক্ষা আছে বলা যায় না; বিশেষতঃ যখন শূদ্র হইয়াও বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ, স্ত্রীলোক হইয়াও মৈত্রেয়ী ও গার্গী, দেবতা হইয়াও

কোন বিষয়ে অনুরক্ত হয় না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ ঔৎসুক্যমাত্র জন্মে, তখন তাহাকে একেন্দ্রিয়; এবং যখন সূক্ষ্ম ঔৎসুক্যটুকুও থাকিবে না, তখন তাহাকে "বশীকার" কহে। আর যখন বশীকার দৃঢ় হয়, তখন তাহা "পরবৈরাগ্য" নাম ধারণ করে। সেই পরবৈরাগ্যই নির্ম্মল জ্ঞানের চরমসীমা বা মুক্তি।" তাই মহামুনি পতঞ্জলি বৈরাগ্য বলিতে বশীকারকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—"দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয় বিতৃষ্ণস্য বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।"

শম।—অন্তরেন্দ্রিয় যে মন তাহাকে বশীভূত করা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের অনুপযোগী বৃথা বিষয়ে মনের গতিরোধ করা।

দম।—চক্ষু প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়গণকে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বিষয়রাশি হইতে নিবৃত্ত করা।

উপরতি।—বিষয়ানুভব হইতে বিরত হওয়া; অথবা বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করা। বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ অর্থে—"বৈরাগ্যের প্রাবল্যে আপনা হইতে যে কর্ম্মত্যাগ হয়।" নচেৎ বৈরাগ্যহীন ব্যক্তির বলপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ কখনই বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ নহে।

তিতিক্ষা।—শীতোষ্ণ, মানাপমান ও শোকহর্ষ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা; অর্থাৎ ঐ ঐ বিষয়ে উদ্বিগ্ন না হওয়া।

সমাধান।—ব্রহ্মে চিত্তের একতানতা উৎপাদন।

শ্রদ্ধা।—গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস।

মুমুক্ষা।—মুক্ত হইবার ইচ্ছা।

—ইহাই সাধন চতুষ্টয়ের যথার্থ তাৎপর্য্য।

ইন্দ্র ও অগ্নি এবং ঋষি হইয়াও গৌতম ও শাণ্ডিল্য প্রভৃতি সকলেই ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। আবার কঠোপনিষদে দেখা যায়—যম নচিকেতাকে ব্রাহ্মণ জানিয়াও, যে পর্য্যন্ত না বৈরাগ্যবান্ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন সে পর্য্যন্ত ব্রহ্মোপদেশ করেন নাই। সুতরাং জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে একমাত্র গুণই অধিকারী ভেদের কারণ; আদৌ উপনয়নাদি কারণ নহে। তাই ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের একোনত্রিংশ অধ্যায়ে ভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন—"সখে উদ্ধব! তুমি এই ব্রহ্মরাজ্য দাম্ভিক, নাস্তিক ও শঠকে, কিম্বা শ্রবণ করিতে অনিচ্ছুককে, অভক্তকে এবং দুর্ব্বিনীতকে দান করিও না; পরন্তু শ্রদ্ধালু শূদ্র এবং স্ত্রীলোককেও অর্পণ করিবে।"

কেহ কেহ বলেন, বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিলেন; সেইহেতু শূদ্র হইলেও তাঁহাদের ব্রাহ্মণ জন্মের জ্ঞান অনিবার্য্য বলিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। নচেৎ শূদ্র জন্মে ওরূপ জ্ঞান হওয়া সম্ভবপর নহে। প্রকৃতপক্ষে এটী কিন্তু সম্পূর্ণই ভুল সিদ্ধান্ত। কারণ, বেদান্তের "তদন্তর প্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্" সূত্রটীর শাঙ্করভাষ্যে দেখা যায়, বৃহদারণ্যকোপনিষদের "তদ্ যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বান্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরত্যেবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গময়িত্বান্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরতি" যেমন জলায়ুকা তৃণান্তর গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্ব গৃহীত তৃণ ত্যাগ করে, তদ্রূপ জীবও দেহান্তর গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করে;" এই বাক্যটীর সহিত স্বীয় ভাষ্যের সামঞ্জস্য প্রতিপাদনের নিমিত্ত আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"জীব মরণকালে এতদ্দেহেই ভবিষ্যদ্দেহ বিষয়ক

জ্ঞানলাভ করতঃ প্রাণত্যাগ করে ; মরণ যন্ত্রণা তাহার এতদ্দেহের অভিমান ও কার্য্যকলাপ ভুলাইয়া দেয়।" তাই ভগবান ও বলিয়াছেন —যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরন্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্‌ভাব ভাবিতঃ॥" "জীব মৃত্যুকালে যে ভাব ধ্যান করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করে, হে কৌন্তেয়, সে সর্ব্বদা তদ্ভাব ভাবিত হওয়ায় সেই লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" সুতরাং বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধের ব্রাহ্মণ জন্মের জ্ঞান অবিচ্ছিন্নভাবে শূদ্র জন্মে হওয়া শ্রুতি ও স্মৃতি বিরুদ্ধ বলিয়া অপ্রামাণিক অর্থাৎ বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ হইলেও মৃত্যুকালে শূদ্রোচিত কর্ম্মাশয়ের প্রাবল্য হেতু, শূদ্র-যোনি প্রাপ্ত হওয়ায় তখন আর ব্রাহ্মণভাবের সম্পর্ক বা লেশমাত্র ছিল না। আবার যখন সম্পূর্ণরূপে শূদ্রভাবাপন্ন হইলেও তজ্জন্মেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তখন অবশ্য শূদ্র জন্মেই ব্রাহ্মণ্যভাবের কর্ম্মাশয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া মুক্তি দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল বুঝিতে হইবে। অতএব, কর্ম্মাশয় যখন আদৌ সামাজিক জাতিভেদের অপেক্ষা করেনা, অবশ্য "শূদ্র জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করা যায় না অথবা ব্রাহ্মণ জন্মে যায়," এরূপ বলিলে তাহা ভুলই। আর জীবের আদি ও অন্ত অব্যক্ত বলিয়া তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন, "অব্যক্তাদীন ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত। অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেব না॥" হে ভারত, ভূত সকলের আদি ও অন্ত অব্যক্ত বলিয়া তাহা জানা যায় না কেবল মধ্য ব্যক্ত বলিয়া জানা যায় ; অতএব, তাহাতে আবার শোক বিলাপ কি ? সুতরাং "বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিলেন" বলিলে, তাহা সাহস ভিন্ন আর কিছুই নহে। বাস্তবিক, কর্ম্মাশয় অর্থাৎ গুণকর্ম্ম আদৌ দেশকালপাত্রের অপেক্ষা করে না। তাহা কোন্ সময়, কোথায় এবং কিরূপ অবস্থায় কোন্ ফল দিতে প্রবৃত্ত হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—"গহনা কর্ম্মণো গতিঃ"—"কর্ম্মের গতি বা প্রভাব অতীব গহন।" আমরা যে এইমাত্র অতি উচ্চবর্ণের মধ্যেও অসদ্ভাবাপন্ন এবং অতি নীচ বর্ণের মধ্যেও সদ্‌গুণশালী ব্যক্তির পরিচয় পাইলাম, তাহার কারণ কি ? তাহার কারণই "কর্ম্মাশয়।" কেহ কেহ ইহাকে দৈব বলেন। বস্তুতঃ দৈব ও প্রাক্তন ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তবে প্রত্যক্ষের অবিষয় বলিয়া, কর্ম্মাশয়কেই দৈব,অপূর্ব্ব এবং অদৃষ্ট প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়। এই কর্ম্মাশয় প্রভাবেই বেশ্যাপুত্র বশিষ্ট ও নারদ, ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র প্রভৃতি তদ্দেহেই ব্রাহ্মণত্বলাভ করিয়াছিলেন। আবার কতশত সহস্র যোগী এই কর্ম্মাশয় প্রভাবেই যোগভ্রষ্ট হইয়াছেন। ইহার প্রভাব বা গতি বাস্তবিকই অতীব গহন। অতএব শুভাশুভ কর্ম্মাশয় যখন আদৌ জাতিভেদের অপেক্ষা করে না, এবং বৈরাগ্য নামক পরমকল্যাণকর কর্ম্মাশয় উদিত হইলে যখন স্বতঃই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়, তখন আর জ্ঞানকাণ্ডীয়বেদে জাত্যাদি অধিকারী ভেদের কারণ নহে। বাস্তবিক উপনয়ন ও বর্ণভেদাদি কেবল কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদের জন্যই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে; জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের জন্য নহে। কারণ, পরমতত্ত্বদর্শী ঋষিরা ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রম দ্বারা মানব জীবন চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া তদুপযোগী গ্রন্থ চতুষ্টয় অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর জন্য সংহিতা, গৃহীর জন্য ব্রাহ্মণ, বানপ্রস্থীর জন্য আরণ্যক

ও সন্ন্যাসীর জন্য উপনিষদের ব্যবস্থা করিয়াছেন; এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুই মূলভাব ভিন্ন জীবের অন্যভাব না থাকায় বেদকে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞান এই দুই কাণ্ডে বিভাগ করতঃ সংহিতা ও ব্রাহ্মণকে কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে এবং আরণ্যক ও উপনিষদ্‌কে জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে অর্পণ করিয়া কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা ব্যবহারিক হিত এবং জ্ঞানকাণ্ড দ্বারা পারমার্থিক হিত সাধন করিয়াছেন। সুতরাং যাহা পারমার্থিক সৎ তাহাই জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের প্রতিপাদ্য বলিয়া কেবল পারমার্থিক কারণ গুণই জ্ঞান-কাণ্ডীয় বেদে অধিকারী ভেদের কারণ; আদৌ উপনয়ন ও বর্ণাদি কারণ নহে। তবে ব্যবহারিক হিতার্থ উপদিষ্ট হইলেও, গুণই সত্যতঃ অধিকারী ভেদের কারণ বলিয়া কর্ম্ম-কাণ্ডীয় বেদ গুণকেও কারণ বলিয়াছেন। কিন্তু ব্যবহারিক নিয়মাদির বাহিরে অর্থাৎ অরণ্যে পঠিত এবং একমাত্র প্রবৃত্তি সম্বন্ধ রহিত অর্থাৎ বৈরাগ্যবান্ পুরুষের জন্য ব্যবস্থাপিত হওয়ায়, পারমার্থিক হিতোপদেষ্টা জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদ তাহা বলিবেন কেন? আর সেইজন্যই জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদ বক্ষ্যমাণরূপে অধিকারী স্থির করিয়াছেন;—"শান্ত, দান্ত, বিষয় হইতে উপরত, দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু, ও একাগ্র-চিত্ত হইয়া আত্মাতে পরমাত্মা দর্শন করিবে।" অপিচ, "যে ব্যক্তির চিত্ত শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, বহিরিন্দ্রিয় সকল বশীভূত হইয়াছে, কাম ক্রোধাদি মনোদোষ সকল দূরীভূত হইয়াছে, যে আপনাতে সদ্‌গুণ চতুষ্টয় আধান করিয়াছে; এমন ব্যক্তি যদি অনুগত হয়, তবে তাহাকে এই ব্রহ্মবিদ্যা অবশ্য প্রদান করিবে।" বাস্তবিক, জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে যদি উপনয়ন ও বর্ণাদি অধিকারী ভেদের কারণ হইত, তাহা হইলে জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদ আদৌ গুণোল্লেখ করতঃ উক্ত বিশেষণে বিশেষিত ব্যক্তির কথা না বলিয়া কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদের ন্যায় বর্ণোল্লেখই করিতেন। অতএব, জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে গুণই অধিকারী ভেদের একমাত্র কারণ; উপনয়ন ও বর্ণাদি গৌণভাবেও কারণ নহে।

আমরা দেখিয়াছি যে, জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের আরণ্যক বানপ্রস্থীর জন্য এবং উপ-নিষদ সন্ন্যাসীর জন্যই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদ কেবল সংসারত্যাগী অরণ্যাশ্রয়ীদের আলোচ্য বিষয় বলিয়া একমাত্র অরণ্যাশ্রমেই পাঠ্য। আর সেই জন্যই জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের একটী সার্থক নাম আছে—"আরণ্যক।" তাই শ্রুতিও বলিয়াছেন —"ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনীভূত্বা প্রব্রজেৎ; যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা।" "ব্রহ্ম-চর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহস্থ হইবে, গার্হস্থ্যান্তে বানপ্রস্থী হইবে, বানপ্রস্থের পর প্রব্রজ্যা করিবেক; যদি ব্রহ্মচর্য্যকালেই বৈরাগ্য জন্মে তবে ব্রহ্মচর্য্যের পরেই প্রব্রজ্যা করিবেক; অথবা গার্হস্থ্য হইতে কিম্বা বানপ্রস্থ হইতে প্রব্রজিত হইবেক।" যদিও শ্রুতি ক্রমান্বয়ে আশ্রমত্রয়ের কার্য্যশেষে প্রব্রজ্যা করিতে বলিয়াছেন বটে, তথাপি কিন্তু বৈরাগ্য ব্যতীত কাহারও প্রব্রজ্যা গ্রহণের অধিকার নাই। তাই শ্রুতি "বনাদ্বা" বাক্যে বানপ্রস্থীকেও বৈরাগ্য জন্মিলে তবে প্রব্রজ্যা করিতে বলিয়াছেন। বাস্তবিক বৈরাগ্য জন্মিলে "উপরতির" প্রাবল্যে স্বতঃই নৈষ্কর্ম্মের অবস্থা আসিয়া থাকে; সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তিদ্বারা আর অপরাশ্রমের কার্য্যাদি যথাবিধি সম্পাদিত না হওয়ায় প্রত্যবায় আছে বলিয়া শ্রুতি

বৈরাগ্যবান্‌কেই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। কারণ, সন্ন্যাসাশ্রমে বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান নাই; বরং বিধিপূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। সুতরাং বৈরাগ্য জন্মিলে আর তাদৃশ ব্যক্তির দ্বারা যথাবিধি কার্য্যাদি অনুষ্ঠিত হইতে পারে না বলিয়া শ্রুতি একমাত্র বৈরাগ্যবান্‌কেই প্রব্রজ্যা করিতে বলিয়াছেন। যথা—"অথ পুনরেবা ব্রতী বাহব্রতী বা স্নাতকো বাহস্নাতকে বোৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকো বা।" "অনন্তর ব্রতাচারী হউক, অব্রতাচারী হউক, স্নাতক হউক, অস্নাতক হউক, মৃতভার্য্য হউক, অবিবাহিত হউক, প্রব্রজ্যা করিবেক।" "অথ পরিব্রাট্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ শুচিরদ্রোহী ভৈক্ষাণো ব্রহ্মভূয়ায় ভবতি।" "অনন্তর প্রব্রজ্যা গ্রহণ, বিবর্ণবস্ত্র পরিধান, মস্তক মুণ্ডন, বিত্তাদি স্পৃহা পরিত্যাগ, শুদ্ধ স্বভাব থাকা, পরাপকার বর্জ্জন ও ভিক্ষান্ন ভোজন করায় ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে সমর্থ হয়।" যদিও বানপ্রস্থের পর সন্ন্যাস কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখানে শ্রুতি "অনন্তর" শব্দে বৈরাগ্যের অনন্তরই বলিয়াছেন। কারণ, বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ ব্যতীত সন্ন্যাসে অধিকার জন্মে না; এবং বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ অর্থে বৈরাগ্যোদয়ে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করা। সুতরাং বৈরাগ্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত বানপ্রস্থীরও স্বাশ্রম বিহিত প্রতীকোপাসনা ও শমদমাদির সাধন করিতে হয় বলিয়া, এখানে বৈরাগ্যের অনন্তরই বুঝিতে হইবে। তাই এ সম্বন্ধে আচার্য্যদিগের মত এই যে, "যাবৎ বিশুদ্ধসত্ব ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগো যোগারূঢ়ো ভবতি তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি"

"যতদিন না বিশুদ্ধ সত্ব, ঐহিক পারত্রিক ভোগবিলাসে নিস্পৃহ এবং যোগারূঢ় হইতে পারিবেন, ততদিন স্বাশ্রম বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন।" আবার শ্রুতি ও বলিয়াছেন। যথা—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্যথে তোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥" অর্থাৎ দেহাভিমানী নর স্বাশ্রম বিহিত কর্ম্মে রত থাকিয়া শত বর্ষ বাঁচিবার ইচ্ছা করিবে; মনুষ্যাভিমানীর ঐ ভিন্ন অন্য উপায় নাই, যাহাতে তদীয় আত্মা কর্ম্ম লিপ্ত না হয়। অতএব, আরণ্যক ও উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয় অর্থাৎ বিবেক বৈরাগ্য ও ব্রহ্ম বিদ্যা যখন জাতি নির্ব্বিশেষে স্বতঃই আসিয়া থাকে, এবং ক্রমান্বয় গার্হস্থ্য শেষ করিয়া বান-প্রস্থাশ্রমে ইন্দ্রিয় নিরোধক শমদমাদির সাধন দ্বারা বিবেক বৈরাগ্য লাভ করিতে অথবা ব্রহ্মচর্য্য কিম্বা গার্হস্থ্য কালে স্বতঃই বৈরাগ্য জন্মিলে প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিতে যখন সমাজ ত্যাগ অবশ্যম্ভাবী, তখন অবশ্য উপনয়ন ও বর্ণাদি তত্বতঃ কারণ নহে বলিয়া জ্ঞানকাণ্ডীয়বেদে উপনয়ন ও বর্ণাদি কারণ নহে। তাই গুণের পরিচয় না পাওয়া পর্য্যন্ত, ব্রাহ্মণ জানিয়াও যম নচিকেতাকে ব্রহ্মোপদেশ করেন নাই। এতদ্ভিন্ন, জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় এক ও অদ্বিতীয়; এবং অধিকারীরাও সকলে সমভাবাপন্ন। তাই জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের সার সিদ্ধান্ত "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "এখানে ভেদ নাই, সবই এক।" সুতরাং জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের অদ্বৈত তত্বানুসন্ধিৎসাই সকল রকম ভেদ জ্ঞানের নিবারক বলিয়া, জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদাধিকারীরা সকলেই এক বর্ণ। বাস্তবিক গুণই পরমার্থ; সুতরাং গুণবানের পক্ষে জাত্যাদি কোনরূপ বিধি নিষেধ নাই। তাই মহাবাক্য রত্নাবলীর সান্ধ্যাস্তিক বাক্যে উক্ত হইয়াছে;—"আত্মান মাত্মনা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-

বুদ্ধ্যা সুনিশ্চলম্। দেহ জাত্যাদি সম্বন্ধান্ বর্ণাশ্রম সমন্বিতান্। বেদ শাস্ত্র পুরাণানি পদপাংশু—মিব ত্যজেৎ।" অর্থাৎ ব্রহ্মবুদ্ধি দ্বারা আত্মা কর্ত্তৃক পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইলে, বর্ণাশ্রমে সম্যক্ প্রকারে অন্বিত যে দেহ জাত্যাদির সম্বন্ধ তাহা এবং বেদ শাস্ত্র ও পুরাণ সকল পদধূলির ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। অতএব আমরা বেদোক্ত অধিকারীর আলোচনায় দেখিলাম যে, গুণই পরমার্থ বলিয়া গুণেরই পূজা বা আদর হইয়া থাকে, জাত্যাদির পূজা বা আদর নাই;—"গুণাঃ পূজা স্থানং গুনিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।"

শ্রীঅহিভূষণ চৌধুরী।

অণু ও পরমাণু—(৩)।

৫৪। এইরূপ একজন লোক ছিলেন জন্ ড্যাল্টন। ড্যাল্টন জানিতেন, তাপ ও তাড়িতের প্রভাবে জড় দ্রব্যের সংযোগ ও বিশ্লেষণ উভয়ই ঘটিয়া থাকে। ইহা অনেকেই জানিতেন। ড্যাল্টন আরও জানিতেন এই রাসায়নিক সংযোগ ও বিশ্লেষণ কতগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন হইয়াই ঘটিয়া থাকে। সুধু ড্যাল্টন নহে, ড্যাল্টনের সময়ে আরও অনেকে এই নিয়ম গুলির অস্তিত্ব কতক ২ অবগত ছিলেন। কিন্তু ড্যাল্টন দেখিলেন এই নিয়মগুলির অন্তরালে একখানা তীক্ষ্ণ ছুরিকা অলক্ষ্যে খেলিয়া বেড়াইতেছে—দেখিলেন, জড়ের বিশ্লেষণ কার্য্যে তাপ বা তাড়িত প্রবাহই একখানা খুব শাণিত অস্ত্রের কার্য্য করিয়া থাকে। ড্যাল্টন বুঝিলেন, এই অশরীরী অস্ত্রের প্রভাবে জড়দেহ কতগুলি খুব ক্ষুদ্র ২ অংশে বিভক্ত হইয়া থাকে এবং ইহারই ফলে সংযোগ ও বিশ্লেষণের এই নিয়ম সমূহ।

৫৫। ড্যাল্টন আরও দেখিলেন, জড়কে ভাগ করিবার পক্ষে এ পর্য্যন্ত যে সকল অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, এই ছুরিখানা তীক্ষ্ণতায় সকলকেই পরাজিত করিয়াছে। ড্যাল্টন ভাবিলেন, ইহা অপেক্ষা ক্ষমতাশালী অস্ত্রের হয়ত আর সন্ধান পাওয়া যাইবে না, এবং সাহসে ভর করিয়া বলিলেন, এই অস্ত্রের সাহায্যে জড়কে যতটা সূক্ষ্ম ২ অংশে ভাগ করা চলে উহারাই জড়ের ক্ষুদ্রতম অংশ—উহারাই অ্যাটম্ বা পরমাণু। ড্যাল্টন আবিষ্কৃত এই অস্ত্রখানার ক্ষমতার পরিচয় পাইতে হইলে আমাদিগকে রাসায়নিক সংযোগ ও বিশ্লেষণের নিয়ম কয়েকটা জানিতে হইবে—দেখিতে হইবে, কোন্ কোন্ নিয়মের অধীন হইয়া দুইটি মূল পদার্থ পরস্পরে সংযুক্ত হইয়া থাকে।

৫৬। এই নিয়মগুলি লইয়া ড্যাল্টনের সমসাময়িক রসায়নবিদগণের মধ্যে তর্ক চলিতেছিল। প্রশ্ন উঠিয়াছিল, যখন দুইটা বিভিন্ন পদার্থে রাসায়নিক সংযোগ ঘটে—যখন দুইটা মূল পদার্থ পরস্পরে সংযুক্ত হইয়া একটা যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে, তখন ঐ পদার্থ দুইটার মধ্যে একটা পরিমাণগত সম্বন্ধ থাকে কিনা? অর্থাৎ যখন 'ক' তে ও 'ট' তে মিলন ঘটে তখন 'ক' এর একটা নির্দ্দিষ্ট

পরিমাণের সহিত 'ট' এর একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণই মিলিত হয়, কিম্বা একটামাত্র না হোক, 'ট' এর কয়েকটা বিশিষ্ট পরিমাণই মিলিত হইয়া থাকে, না পরস্পরের মিলনে এমন কোন নিয়ম নাই—'ক' এর সহিত 'ট' যে কোন পরিমাণেই মিলিত হইতে পারে?

৫৭। কেহ ২ বলিলেন * না, কোনই নিয়ম নাই। 'ট' যদি 'ক' এর সহিত মিশে তবে সকল পরিমাণেই মিশিবে—একটা বা পাঁচটা বিশিষ্ট পরিমাণে মিশিবে এমন কোন কথা নাই। যেখানে মিল আছে সেখানে সকল পরিমাণেই আছে, আর যেখানে মিল নাই সেখানে কোন পরিমাণেই নাই। জল, তেলের সঙ্গে মিশেনা,—কোন পরিমাণেই মিশেনা, কিন্তু দুধের সঙ্গে বেশ মিশিয়া থাকে। দুধের সঙ্গে জল সকল পরিমাণেই মিশিয়া থাকে, এবং মিশে বলিয়াই সর্ব্বত্রই পাওয়া যায় জ'লো দুধ—খাঁটি জ'লো দুধ। রাসায়নিক সংযোগেই ইহাই নিয়ম, অর্থাৎ সকল নিয়মের অভাব। অক্সিজেন, হাইড্রোজেনের সহিত মিশিয়া থাকে,—সকল পরিমাণেই মিশিয়া থাকে, একটা বা পাঁচটা বিশিষ্ট পরিমাণেই মাত্র নহে; এবং মিশিয়া সর্ব্বত্রই উৎপন্ন করে খাঁটি জল। অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে।

৫৮। কেহ ২ বলিলেন, না, ইহা সম্ভব নহে। হাইড্রোজেনের একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের সহিত অক্সিজেন মিশে মাত্র গোটাকত বিশিষ্ট পরিমাণে এবং ইহার প্রত্যেক মিলনেই একটা বিশিষ্ট পদার্থের উদ্ভব হইয়া থাকে। এইরূপে মিলনের একটা বিশিষ্ট অনুপাত হইতে জলের উৎপত্তি, এবং মিলনের আরও কয়েকটা বিশেষ ২ অনুপাত হইতে আরও কয়েকটা বিশেষ ২ যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে।

৫৯। কিছুদিন ধরিয়া রসায়ন বিদগণের মধ্যে তর্ক চলিল, কিন্তু পণ্ডিতগণ বুঝিলেন বিনা পরীক্ষায় প্রশ্নটার মীমাংসা হইবে না। তখন রসায়ন পরীক্ষাগারে সবে মাত্র নিক্তির ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণে পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা সবে মাত্র উপলব্ধি হইয়াছে। নিক্তির প্রচলন হইতে পণ্ডিতগণ তর্কে বিরত হইলেন—ফাঁকা অনুমান ত্যাগ করিয়া পরিমাপ কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তখন দেখা গেল, বস্তুতঃই 'ক' এর সহিত 'ট' এর মিলনে একটা পরিমাণগত সম্বন্ধ থাকে; দেখা গেল, 'ক' ও 'ট' দুধ ও জলের ন্যায় নিতান্ত বেনিয়মে মিশে না। পরীক্ষার ফলে পণ্ডিতগণ যাহা দেখিতে পাইলেন তাহা এই:—

'ক' এর একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের সহিত 'ট' মিশিয়া থাকে মাত্র গোটা কয়েক বিশিষ্ট পরিমাণে—যথেচ্ছ পরিমাণে নহে; এবং যে কয়েকটা বিশিষ্ট পরিমাণ লইয়া 'ট' 'ক' এর সহিত মিশিয়া থাকে উহার প্রত্যেক মিলনেই একটা নূতন পদার্থের উদ্ভব ঘটে। অর্থাৎ, মিলনের এক একটা বিশিষ্ট পরিমাণে এক একটা বিশিষ্ট পদার্থেরই উদ্ভব ঘটে এবং মিলনের ভিন্ন ২ পরিমাণ ক টাতে কয়েকটা বিশেষ বিশেষ পদার্থেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে।

৬০। উদাহরণ:—'ক' এর একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণকে বলা যাউক 'কা' এবং 'ট' এর কতগুলি যথেচ্ছ পরিমাণের নাম দেওয়া যাক্ টা, টি, টু, টে, টৈ, টো, টৌ ইত্যাদি। এখন দেখা যাইবে 'ট' এর এই ভিন্ন ২ পরিমাণ গুলির মধ্যে 'কা' মিশিয়া থাকে কেবল টা ও টি ও টের সঙ্গে; ফলে, কয়েকটা

* বার্থেলো প্রভৃতি।

যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি ঘটে—কাটা ও কাটি ও কাটে। আরও দেখা যাইবে, 'ট' এর বাকী সহস্র পরিমাণ গুলির কোনটার সঙ্গেই 'কা' মিশেনা—দেখা যাইবে টু বা টের সঙ্গে অথবা টো বা টৌ এর সঙ্গে কা একেবারেই মিশেনা; ফলে কাটু বা কাটে অথবা কাটো বা কাটৌ ইত্যাদি পদার্থ গুলির অস্তিত্বই নাই।

৬১। কাটু বা কাটোর অস্তিত্ব নাই, কিন্তু কাটা, কাটি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পৃথিবীতে যত রাজ্যের কাটা আছে উহাদের সকলের মধ্যেই 'টা' রহিয়াছে, আবার যত রাজ্যের কাটি আছে, তাহার সকলের মধ্যেই টি রহিয়াছে। দেখা যায় 'কাটা'কে কাটিলে 'টা'ই পাওয়া যায় 'টি' পাওয়া যায়না এবং 'কাটি'কে কাটিলে 'টি'ই পাওয়া যায়, 'টা' পাওয়া যায় না।

৬২। এইরূপে যখন পণ্ডিতগণ রাসায়নিক সংযোগ ও বিশ্লেষণ ব্যাপারে পরিমাণের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছিলেন তখন ড্যাল্টন একটা নূতন কথা বলিলেন। ড্যাল্টন বলিলেন, দেখ, 'ক' এর একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের সহিত 'ট' এর কয়েকটা বিশিষ্ট বিশিষ্ট পরিমাণ মিশিয়াই কয়েকটা বিশিষ্ট যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি ঘটায়—কাটা ও কাটি ও কাটে, ইহা ঠিক কথা। কিন্তু দেখ, 'ক' এর এই যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণটা যাহাকে বলা গিয়াছে 'কা', এই পরিমাণটা বড় হইলেও চলে, আবার খুবই ছোট হইলেও আপত্তি নাই—ইহা সের, ছটাকের মত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইলেও চলে, আবার চোখে দেখা যায়না বা অনুবীক্ষণের সাহায্যেও দেখা যায়না অতটা ক্ষুদ্র হইলেও চলে। ফলে, 'ট' এর ঐ বিশিষ্ট পরিমাণগুলি ঐ টা ও টি ও টে, যাহারা প্রত্যেকে 'কা' এর সহিত মিশিয়া কাটা, কাটি ইত্যাদির উৎপত্তি ঘটায়, উহারাও সেই হিসাবে ক্ষুদ্র হইতে কোন আপত্তি নাই। আবার দেখ, এই যে টা ও টি ও টে, ইহারা কেবল মূলপদার্থ 'ক' এর সহিতই মিশিয়া থাকে এরূপ নহে। ইহারা যেমন 'ক' এর একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের সহিত মিশিয়া কাটাকাটি উৎপন্ন করে, সেইরূপ 'খ' বা 'ঘ' বা 'হ' এর ও এক একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের সহিত মিশিয়া খাটাখাটি বা ঘাটাঘাটি বা হাটাহাটিরও উৎপত্তি ঘটায়।

৬৩। আবার এইটা দেখিয়াই অবাক্ হইলে চলিবেনা। আরও দেখ, 'ট' এর এই যে বিশিষ্ট পরিমাণগুলি—এই টা ও টি ও টে —যাহারা 'ক' বা 'খ' এর অথবা 'ঘ' বা 'হ' এর এক একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের সহিত মিশিয়া বিশেষ ২ যৌগিক পদার্থের উদ্ভব ঘটায়, ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ দেখ। দেখিতে পাইবে, ইহাদের মধ্যে 'টা' ই হইতেছে সকলের চেয়ে ছোট এবং 'টা' যত বড়, 'টি' হইতেছে ঠিক তাহার দ্বিগুণ এবং 'টে' ঠিক তাহার তিনগুণ। তবেই দেখ, যৌগিক পদার্থে কাটা বা খাটা অথবা ঘাটা বা হাটার মধ্যে যে 'টা' রহিয়াছে, এইরূপ দুইটা 'টা' লইয়াই কাটি, খাটি ইত্যাদি যৌগিক পদার্থের টি হইয়াছে এবং এইরূপ তিনটা 'টা' লইয়াই কাটে, খাটে ইত্যাদি যৌগিক পদার্থের 'টে' হইয়াছে। অর্থাৎ কিনা, বুঝিতে হইবে, মূলপদার্থ 'ট' এর গঠনে কেবল সংখ্যা লইয়া কারবার। বুঝিতে হইবে, মূলপদার্থ মাত্রই অংশময়—কতগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র, অথচ সমান ২ অংশ, যাহাদিগকে ১, ২, ৩, ৪ করিয়া গণিয়া যাওয়া চলে, যাহারা একক অথবা দুইটা বা

তিনটা একত্রযোগে অন্যান্য মূল পদার্থের সহিত মিশিয়া বিশেষ ২ যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে, প্রত্যেক মূল পদার্থই এইরূপ কতগুলি অংশ বা কণার সমষ্টি। কাজেই বুঝিতে হইবে, মূল পদার্থের বিভাজ্যতায় একটা সীমা আছে। ইহা তাপ ও তাড়িতরূপ অস্ত্রের প্রভাবে কতকগুলি সমান ২ অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে —কতগুলি ক্ষুদ্র ২ কণা, যাহারা ওজনে বা বস্তু পরিমাণে পরস্পরের সমান, এইরূপ কতগুলি কণায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। বুঝিতে হইবে, তাপ বা তাড়িত খুব ক্ষমতাশালী অস্ত্র হইলেও ইহার ক্ষমতা অসীম নহে। এই তীক্ষ্ণ অথচ তীক্ষ্ণতার সসীম অস্ত্রের ক্ষমতায় যতটা কুলায় মূল পদার্থটা ততটা সূক্ষ্ম অংশেই বিভক্ত হইয়া পড়ে। ফলে, আমরা কতগুলি কণার সাক্ষাৎ পাই—গোটা ২ কণা, যাহাদের সকলের একই ধর্ম্ম, একই ওজন, যাহারা স্বীয় ২ ওজন বজায় রাখিয়া পরস্পরে মিলিত হয় ও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, যাহাদের অপেক্ষা কম ওজনের কোন কণার মধ্যে এই সংযোগ ও বিয়োগ, এই মিলন ও বিচ্ছেদ ব্যাপার লক্ষ্যই করা যায়না, অতএব যাহারা কিছুতেই বিভক্ত হইবার নহে, এইরূপ কতগুলি কণার সাক্ষাৎ পাই। এই কণাগুলিই হইতেছে, ঐ মূল পদার্থটার ক্ষুদ্রতম অংশ— উহার অ্যাটম্ বা পরমাণু। বিশিষ্ট ওজনের এইরূপ কতকগুলি পরমাণু লইয়া মূল পদার্থ 'ট' গঠিত হইয়াছে এবং বিশেষ বিশেষ ওজনের এইরূপ কতগুলি পরমাণু লইয়াই 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' ইত্যাদি অন্যান্য মূলপদার্থ গঠিত হইয়াছে। এই মূলপদার্থগুলি আবার পরস্পরে সংযুক্ত হইয়া—একটায় কতগুলি পরমাণু, অপর একটার কতগুলি পরমাণুর সহিত মিলিত হইয়া এক একটা যৌগিক পদার্থ গঠিত করিয়াছে। এইরূপ কাটা, কাটি হইতে হাটা, হাটি পর্য্যন্ত যাবতীয় যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি।

৬৩। আরও দেখ, এই যে যৌগিক পদার্থগুলি—এই যে কাটা ও কাটি বা হাটা ও হাটি, ইহাদেরও বিভাজ্যতার এক একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এই যৌগিক পদার্থগুলির গঠন প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য কর। দেখ খুব ছোট রকমের একটি কাটা গড়াইতে হইলেও চাই 'কা' ও 'টা' অর্থাৎ অন্ততঃ পক্ষে 'ক' এর একটা পরমাণু ও 'ট' এর একটা পরমাণু। দেখ, কাটা গড়াইবার পক্ষে এই দুইটা পরমাণুই যথেষ্ট, কিন্তু ইহার কোনটাকে বাদ দিলে আর কাটা গড়ান যায় না। বুঝিতে হইবে একটা 'কা'র সহিত একটা 'টা' যোড়া দিলে যে কাটাটা পাওয়া যায়, উহার চেয়ে ছোট কাটা গড়ানই চলে না। লক্ষটা 'ক'র সহিত লক্ষটা 'টা' যোড়ায় যোড়ায় মিলাইয়া একটা বড় কাটাও গড়ান যাইতে পারে কিন্তু খুব ছোট করিয়া কাটা গড়াইতে হইলেও একটা 'কা' ও একটা 'টা' চাইই। আবার ঐ বড় কাটাটাকে শত বা সহস্রভাগে ভাগ করিয়া উহা হইতে শতটা বা সহস্রটা ছোট ছোট কাটা পাওয়া যাইতে পারে। উহাকে লক্ষ-ভাগে ভাগ করিয়া উহা হইতে আরও ছোট ছোট, লক্ষ কাটাও পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু লক্ষের উপর আর উঠিতে পারা যায় না। লক্ষভাগ করিলে যে ছোট কাটাগুলি পাওয়া যায় তাহার প্রত্যেকটার মধ্যে থাকে কেবল একটা 'কা' ও একটা 'টা'—একটা 'ক' এর পরমাণু ও একটা 'ট'এর পরমাণু। লক্ষের উপর উঠিতে গেলেই এই 'কা' ও 'টা'কে পৃথক্ করিয়া ফেলিতে হয়—ছোট

কাটাগুলির বিশ্লেষণ ঘটাইয়া উহাদের নাম লোপ করিতে হয়। তবেই দেখ, এই যে ছোট কাটাগুলি, যাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে কেবল একটা 'কা' ও একটা 'টা' উহারাই হইতেছে 'কাটা' নামক যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ।

৬৫। এই ক্ষুদ্রতম অংশগুলিকে কাটার পরমাণু বলা যাইতে পারে। ড্যাল্টন এস্থলে ও পরমাণু বা অ্যাটম্ শব্দই ব্যবহার করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণ যৌগিক পদার্থের এই ক্ষুদ্রতম অংশগুলিকে উহার molecule বা অণু বলিয়াছেন। আমরা ও ইহাদিগকে কাটার অণু বলিব, কেননা অণু কথাটা আমরা পূর্ব্বেই ব্যবহার করিয়াছি এবং যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছি, এই ক্ষুদ্রতম অংশগুলিও সেই অর্থই জ্ঞাপন করে।

৬৬। এইরূপে 'ক'এর একটা পরমাণুর সহিত 'ট'এর একটা পরমাণু মিলিয়া কাটার অণু গঠিত হইয়াছে। এইরূপে আবার 'ক' এর একটা পরমাণুর সহিত 'ট'এর দুইটা বা তিনটা পরমাণু মিশিয়া কাটি বা কাটের অণু গঠিত হইয়াছে। বুঝিতে হইবে, অণুগুলি এইরূপে গঠিত হইয়াছে বলিয়াই 'ট'এর পরিমাণ কাটাতে যত কাটিতে তাহার দ্বিগুণ এবং কাটের মধ্যে তাহার তিনগুণ।

৬৭। বুঝিতে হইবে একটা মূল পদার্থের গঠনে, চাই কেবল কতগুলি পরমাণু—একই ওজনের, একই ধর্ম্মের, একই জাতীয় কতগুলি কণা। সেইরূপ একটা যৌগিক পদার্থের গঠনেও চাই কেবল কতগুলি অনু—একই ওজনের, একই ধর্ম্মের, এক জাতীয় কতগুলি কণা। উভয় ক্ষেত্রেই চাই কেবল কতগুলি কণা—কেবল কণার দল, কেবল সংখ্যার খেলা। কিন্তু উভয় জাতীয় কণা লইয়া গোল বাধাইওনা। অণুও কণা, পরমাণুও কণা; কিন্তু কণায় কণায় ভুল করিও না। পরমাণু ছোট কণা, অণু একটু বড় কণা। পরমাণু মূল পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা, সুতরাং মূল পদার্থ; অনু যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা সুতরাং যৌগিক পদার্থ। পরমাণু অবিভাজ্য, কিন্তু অণু বিভাজ্য—অণুকে ভাঙ্গা চলে এবং অণু ভাঙ্গিলে পরমাণু পাওয়া যায়।

৬৮। মোটের উপর কথা দাঁড়াইল এই। পরীক্ষার ফলে আমরা রাসায়নিক সংযোগ ও বিশ্লেষণ ব্যাপারে গোটা দুই বিশিষ্ট নিয়মের অস্তিত্ব দেখিতে পাই, যথা:—

১। যখন দুইটা মূল পদার্থ পরস্পরে মিলিত হইয়া কোনও যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে, তখন একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের সহিত অপরটার একটায় একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মিশিয়াই ঐ বিশিষ্ট যৌগিক পদার্থটা উৎপন্ন হইয়াই থাকে; অর্থাৎ কিনা, ভিন্ন ভিন্ন মূল পদার্থ, এক একটা বিশিষ্ট অনুপাতে মিলিত হইয়া এক একটা বিশিষ্ট যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি ঘটায়। ইংরাজিতে এই নিয়মটাকে বলে Law of definite Proportion. আমরা ইহাকে বলিব বিশেষানুপাতের নিয়ম।

২। যখন দুইটা মূল পদার্থ, ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে মিলিত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে, তখন একটায় একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের সহিত অপরটায় যে সকল ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ মিলিত হইয়া থাকে, উহাদিগকে ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি অখণ্ড সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; অর্থাৎ কিনা, দুইটা মূল পদার্থ, ১, ২, ৩, ৪, প্রভৃতি সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে এইরূপ কতগুলি অখণ্ড অনুপাতে মিলিত হইয়াই বিশেষ ২ যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করিয়া থাকে।

এই নিয়মটাকে ইংরাজীতে Law of Multiple proportions বলে; আমরা ইহাকে বলিব অধগুণানুপাতের নিয়ম।

৬৯। এই বিশেষানুপাতের নিয়ম ও এই অধিগুণানুপাতের নিয়ম অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহারা পরীক্ষা-লব্ধ সত্য। এই নিয়ম দুইটা হইতে আমাদিগকে অনুমান করিতে হয়, মূল পদার্থ মাত্রেই কণাময়। সমান সমান ওজনের কতগুলি কণা লইয়া এক একটা মূল পদার্থ গঠিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন মূল পদার্থের কণার ওজন ভিন্ন ভিন্ন। অনুমান করিতে হয়, যখন দুইটা মূল পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ ঘটে তখন বিশিষ্ট ওজনের এইরূপ কতগুলি কণা, বিশিষ্ট ওজনের অপর কতগুলি কণার সহিত মিলিত হইয়া থাকে। বুঝিতে হয়, রাসায়নিক সংযোগের অর্থ, কণায় কণায় মিলন—একটা মূল পদার্থের ১টা কণার সহিত অপর একটা মূল পদার্থের ১টা বা ২টা বা ৩টা বা ৪টা কণার মিলন। এইরূপে দুইজাতীয় মূল কণার বিভিন্ন অনুপাতে মিলনের ফলে আবার কতগুলি বৃহত্তর কণা গঠিত হইয়াছে—কতগুলি যৌগিক কণা, যাহাদিগকে তাপ বা তাড়িতের সাহায্যে পুনরায় বিশ্লিষ্ট করিতে পারা যায়, এবং বিশ্লেষণ ঘটাইলে যাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে দুইটা বিশিষ্ট মূল পদার্থের বিশেষ বিশেষ অনুপাতে মিলন দেখিতে পাওয়া যায়, আবার পর পর চলিয়া গেলে, যাহাদের মধ্যে মিলনের এই অনুপাতগুলি ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি সংখ্যাক্রমে বাড়িয়া যাইতে দেখা যায়, এরূপ কতগুলি যৌগিক কণা গঠিত হইয়াছে। বুঝিতে হয়, যৌগিক পদার্থের গঠনেও কতগুলি কণা লইয়া কারবার। বুঝিতে হয়, বিশিষ্ট ধর্ম্মেরও বিশিষ্ট ওজনের এইরূপ কতগুলি যৌগিক কণার বহুর সমষ্টি লইয়াই এক একটা যৌগিক পদার্থ গঠিত হইয়াছে।

৭০। মোটের উপর বলিতে হয়, প্রত্যেক মূল পদার্থকে কতগুলি সমান ধর্ম্মের, সমান ওজনের কণার সমষ্টিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে এবং বিভিন্ন মূলপদার্থকে কতগুলি বিভিন্ন ধর্ম্মের বিভিন্ন ওজনের কণার সমষ্টিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে—গোটা গোটা কণা, যাহারা স্বীয় স্বীয় ওজন বজায় রাখিয়া পরস্পরে মিলিত হয় ও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, যাহারা এই মিলন ও বিচ্ছেদ ব্যাপারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায় না, অতএব পরস্পরের মিলনে যাহারা অবিভাজ্য; এবং এইরূপে মিলিত হইয়া যাহারা আবার যাবতীয় যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণাগুলি গঠিত করিয়াছে—এইরূপ কতগুলি কণার সমষ্টিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ফলে মূলপদার্থমাত্রেরই বিভাজ্যতার একটা সীমা আরোপ করিতে হইবে, এবং সেই সীমার উপর নির্ভর করিয়া যৌগিকপদার্থ সমূহেরও বিভাজ্যতার সীমা নির্দ্দেশ করিতে হইবে। অর্থাৎ কিনা প্রত্যেক মূলপদার্থকে কতগুলি পরমাণুর সমষ্টিরূপে প্রত্যেক যৌগিক পদার্থকে কতগুলি অণুর সমষ্টিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই ডাল্টন কথিত পরমাণুবাদ।

৭১। দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে বিচারপ্রণালীর উপর ডাল্টনের এই পরমাণু-বাদ প্রতিষ্ঠিত তাহার মূলে কয়েকটা পরীক্ষা লব্ধ সত্য—রাসায়নিক সংযোগ ও বিশ্লেষণের কয়েকটা বিশিষ্ট নিয়ম বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই নিয়মগুলি বুঝিতে যাইয়াই আমাদিগকে পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। পরমাণু না মানিয়াও এই নিয়মগুলি বুঝিতে

পারা যায় কিনা, সে ভিন্ন কথা। যদি ভিন্ন উপায়ে এই নিয়মগুলি বুঝা চলিত তাহা হইলে হয়ত পরমাণুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হইত না। তবে কথা এই যে, যাহারা কণাবাদের পক্ষপাতী তাহারা রাসায়নিক সংযোগের এই নিয়মগুলি অবলম্বনে যে এইরূপ যুক্তিরই অবতারণা করিবেন ইহা স্বাভাবিক। ড্যাল্টন স্বয়ং কণাবাদী ছিলেন। ড্যাল্টন দেখিলেন, এই নিয়মগুলি অবলম্বনে একটা বিশিষ্ট ধরণের কণাবাদ দাঁড় করান যায়; ফলে ড্যাল্টন পরমাণুবাদ প্রচার করিলেন এবং এই পরমাণুবাদকে ভিত্তি করিয়াই আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের এই প্রকাণ্ড সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

এসো।

রাত দুপুরে আকাশ ভরে
উঠবে যখন হাজার তারা,
স্তব্ধ হ'বে জগৎ ঘুমে
থাকবে না আর শব্দ সাড়া,
আঁধার মাখা আলোর মাঝে
বাগান ভরে ফুটবে ফুল,
দুয়ারে মোর লতার কাণে
দুলবে হেসে সোণার দুল,
মুক্ত পথে গন্ধ ল'য়ে
আসবে বায়ু চুপে চুপে,
পালিয়ে যাবে প্রাণের মাঝে
জাগিয়ে দিয়ে তোমার রূপে,
তখন এসে হৃদয় গৃহের
গোপন দুয়ার মুক্ত করে
মন ভুলান মধুর রূপে
নয়ন দুটি দিও ভরে।
মনের কথা প্রাণের ব্যথা
কইব তোমার কাছে বসি,
ভয়, ভাবনা, অনুতাপ আর
সরমের বাঁধ পড়বে খসি।
আবার যখন ঊষার হাওয়ায়
জেগে উঠে নড়বে শাখী,
—জাগিয়ে ধরা মধুর সুরে—
কুলায়ে তার গাইবে পাখী,
এস্ত হ'য়ে গৃহস্থের বউ
পড়বে উঠে ঘুমের ঘোরে,
বাজিয়ে বলয় উঠান খানি
গোবর ছড়ায় দিবে ভরে,
ঠাকুরমাদের পূজার লাগি
ছবির মত মেয়ের দল
জুটবে এসে, উঠবে হেসে
সেফালিকা গাছের তল,
শান্ত রসে চিত্ত ভোলে,
শান্তি নীরে জগৎ ভাসে,
তখন এসে প্রাণের সখা
বসিও মোর শয্যা পাশে।
দেখব তোমার মোহন ছবি,
প্রাণের মাঝে রাখব এঁকে,
নূতন জ্ঞানে নূতন প্রাণে
জগৎ মাঝে উঠব জেগে।
আবার যখন দুপুর বেলায়
অলস দেহে দেখব চেয়ে
ঘন কৃষ্ণ নিবিড় মেঘে
নীল আকাশটী গেছে ছেয়ে,

গর্জ্জনে তার চমকি শিশু
মায়ের কোলে যাচ্ছে ছুটি,
পশু পক্ষী থমকে দাঁড়ায়
আহার ফেলে পালায় উঠি,
কল কল কল জলের ধারে
মাঠ ঘাট সব যাবে ভেসে,
নিরালা মোর গৃহের কোণে
তখন সখে দাঁড়িও এসে।
দেখব যদি দুর্ব্বল এই—
বাহু দুটীর আলিঙ্গনে
বাঁধতে পারি তোমায় আমি
অযোগ্য এ প্রাণের সনে।
সাঁঝের বেলায় আঁধার কাল
নামবে যখন ধরার বুকে,
শূন্যপথে শতেক পাখী
ছুটবে কুলায় অভিমুখে,
দুলিয়ে পাখা ওপার হ'তে
এপারে এসে বাদুড়গুলি
দোল খেলিবে গাছের ডালে
চরণ যুগল ঊর্দ্ধে তুলি,
উঠবে জ্বলে দেউটি শত
প্রাসাদ-শিরে কুটীর তলে,
ফুলের মতন ফুটবে কত
নৌকা মাঝে নদীর জলে,
তখন এসে ওহে আমার
এ জীবনের চির সাথি!

আপন হাতে হৃদয় মাঝে
জ্বালিয়ে দিও প্রেমের বাতি।
দেখব আমি আমার পাশে
দাঁড়িয়ে তুমি মোহন বেশে,
তাই চরণের দিব্য আলোয়
নিখিল জগৎ গেছে ভেসে।
সুখের আশায় মত্ত হ'য়ে
মরব যখন ঘুরে ঘুরে,
কুপথ বেয়ে তোমা হ'তে
পড়ব সরে বহু দূরে।
বাহির হ'বার পথ পাব না,
জড়িয়ে যাব মোহ জালে,
অধীর হ'য়ে দুহাত তুলে
ডাকব তোমায় বিপদকালে,
তখন এসে বিপদ বারণ
ডাকিও মোরে সখা বলে,
কাটবে বিপদ, ঘুচবে মোহ
ভয় ভাবনা যাবে চ'লে।
আমার যখন যম তাড়নায়
ভুগব সখে শেষের দিনে,
কেউ রবে না এসংসারে
সহায় আমার তুমি বিনে,
তখন এসে মাথায় আমার
হাত বুলিও মধুর বোলে,
ভুলে গিয়ে সকল জ্বালা
লাফিয়ে যাব তোমার কোলে।

শ্রীনলিনীনাথ দাসগুপ্ত এম, এ, বি-এল

-ঃOঃ-

বেদান্ত দর্শন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

:০:-

আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, সাংখ্যের প্রকৃতি-বাদ নানাবিধ অযৌক্তিক কথায় পরিপূর্ণ। প্রকৃতি, জগতের মূল কারণ; এবং জড়, স্বাধীন প্রকৃতিতে আপনা আপনি স্বভাবতঃ ক্রিয়ারম্ভ হইয়া, জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে,—সাংখ্যকারের এই সিদ্ধান্তের দোষ দেখাইয়া, আমরা চেতন ব্রহ্মবস্তুকে জগতের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। একই মূল কারণ এই জগতের বিবিধ কার্য্যাকারে দেখা যাইতেছে। ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত। স্বাধীন, নিত্য প্রকৃতি-শক্তি, নানা বস্তুর আকারে পরিণত হইয়াছে। এই সাংখ্যের সিদ্ধান্তে একটা দোষের কথা এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে। নিত্য প্রকৃতি, সংসারে সুখ-দুঃখাদি বিবিধ বিকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে। আমার যাহা সুখকর, আমার যাহা অনুকূল, আমি তাহাকে পাইতে চাই। সেই বস্তুর আমি প্রার্থী হই। আর যাহা আমার অপ্রীতিকর, যাহা আমার অনুকূল নহে, আমি সে বস্তুর প্রার্থী হই না। যে বস্তুকে আমি চাই তাহাকে 'অর্থ', এবং যাহা আমার অপ্রীতি-কর, যাহাকে আমি চাই না, তাহাকে 'অনর্থ' শব্দে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু এজগতে সুখকর বস্তু সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প; আর যাহা দুঃখজনক, তদ্রূপ বস্তুর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। সুতরাং, 'অর্থ'কেও 'অনর্থের' মধ্যেই গণনা করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এ জগৎ অনর্থ-বহুল। অনর্থ বস্তু আমাদিগের পীড়া উপস্থিত করে; উহা আমাদিগকে তাপ দেয়, আমাদিগের তাপ উৎপাদন করে। সুতরাং অনর্থকে তাপক বলাই অধিকতর সঙ্গত। জগতের সকল বস্তুকেই তাপক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। উহারা আমাদের তাপ উৎপাদন করে, সুতরাং আমাদিগকে তপ্য শব্দে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তপ্য জীব, পর্য্যায়ক্রমে অর্থ ও অনর্থের দ্বারা সম্বদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব তপ্য জীব এবং তাপক বস্তুগুলি —পরস্পর ভিন্ন। তপ্য ও তাপক —উভয়কে যদি একই বস্তু বল, উভয়ের মধ্যে যদি ভেদ স্বীকার না কর, তাহা হইলে তাপকের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের আশা থাকে না। তাপক বস্তুটী যদি, তপ্য জীব হইতে স্বতন্ত্র বস্তু না হয়, তাহা হইলে তাপক বস্তুটীত নিত্যই বর্ত্তমান রহিয়াছে, এ অবস্থায় উহা হইতে মুক্তিলাভ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? তপ্য ও তাপক—এই দুইটী পরস্পর আপেক্ষিক বস্তু। সাপেক্ষ বস্তুদ্বয়ের মধ্যেই বিয়োগ বা সম্বন্ধ হইতে পারে; নিজেরই নিজের সহিত সম্বন্ধ বা বিয়োগ ঘটিতে পারে না। অতএব, তপ্য ও তাপক—ইহারা পরস্পর ভিন্ন বস্তু। সাংখ্যকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া পারেন না। সাংখ্যমতে প্রকৃতি স্বাধীন ও নিত্য। প্রকৃতির যাহা বিকার, তাহাও সত্য এবং নিত্য। সুতরাং তাপক পদার্থও নিত্য। অতএব, এই নিত্য তাপক বস্তু

হইতে জীবাত্মার মুক্তিলাভের সম্ভাবনাও থাকে না। তাপক যখন নিত্য-বস্তু, তখন উহা চিরদিনই জীবের তাপ উৎপাদন করিবে। সাংখ্যমতে তাহা হইলে, জীবের মুক্তিলাভ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে। যদি বলা যায় যে, তমঃশক্তির প্রাবল্য থাকিলেই, তপ্য ও তাপকের মধ্যে সম্বন্ধ উপস্থিত হয়; এই তমের প্রভাব নষ্ট হইলেই, সম্বন্ধ চলিয়া যাইবে। কিন্তু সাংখ্যমতে, তমঃনামক দ্রব্যটী নিত্য; সুতরাং উহা নষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং জীবের মুক্তিও অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। আর, সাংখ্যমতে, সত্ত্ব,তমঃ ও রজঃ—ইহাদের কোনটী কখন অভিভূত থাকে, কোনটী কখন প্রবল হইয়া উঠে। সুতরাং যদি বল যে, তমঃ দ্রব্যটী যখন অত্যন্ত অভিভূত থাকিবে, তখনই জীবের তাপক হইতে মুক্তিলাভ সম্ভব হইবে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কখন কোন্‌টী যে প্রবল হইয়া উঠিবে তাহার ত কোন নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং মুক্তিলাভেরও অনিশ্চিত হইবার সম্ভাবনা অপরিহার্য্য। আর এক কথা আছে। নির্ব্বিশেষ আত্মাতে তাপ উৎপন্ন হইতে পারে না। যদি বল যে, আত্মার যে চিত্ত বা সত্ত্বদ্রব্যটী আছে, তাহাতেই তাপক, তাপ উৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু এ স্থলেও জিজ্ঞাস্য এই যে, আত্মার সঙ্গে কি জড়-চিত্তের একতা বা অভিন্নতা ঘটিয়া উঠে? তাহা কখনই হইতে পারে না। তবে কেমন করিয়া আত্মায় তাপ উৎপন্ন হইবে? তবেত তপ্য-তাপক সম্বন্ধই সিদ্ধ হইতে পারিতেছে না। চিত্তেরই প্রকৃতপক্ষে তাপ বা বিকার উপস্থিত হয়; এই চিত্তের বিকারের অনুরোধে আত্মারও যেন বিকার বা তাপ উপস্থিত হইলে এই প্রকার প্রতীতি জন্মে। ইহাই অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আমরা এইরূপই স্বীকার করিয়া থাকি। প্রকৃতপক্ষে, পরমার্থতঃ, আত্মার কোন তাপ আসিতে পারে না। আমরা, অর্থ, অনর্থ, তাপক প্রভৃতি বিকারবর্গকে সাংখ্যকারের ন্যায়, সত্য বস্তু বলিয়া স্বীকার করি না। শ্রুতির সিদ্ধান্ত এই যে, পরমার্থতঃ বিকারের প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। উহা আমাদের বুদ্ধি ও বাক্যের ভ্রম প্রতীতি মাত্র। এক পরম-কারণ ব্রহ্ম-চৈতন্য ব্যতীত, অপর কোন বস্তুরই স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা নাই। সুতরাং, ব্রহ্মবস্তু এক বলিয়া, বিষয় ও বিষয়ী বিভাগটীও অসত্য। সুতরাং তাপক বলিয়া কোন বিকারও প্রকৃতপক্ষে থাকিতে পারে না। বিকার বা খণ্ড প্রতীতি, আমাদের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের ভ্রমবশতঃ হইয়া থাকে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে (Metaphysical view) এক পরম-কারণ আত্মা ব্যতীত স্বতন্ত্র স্বাধীন কোন বস্তু নাই। কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে (Emperical view), তপ্য-তাপকাদি সকল সম্বন্ধই যথাযথরূপে অবস্থিত থাকিতে পারে। তাহাতে কোন প্রকার অসঙ্গতি নাই।

আমরা এতদুরে সাংখ্যমতের আলোচনা শেষ করিলাম। সাংখ্যের প্রকৃতিকে জগতের মূলকারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে যে সকল দোষ হয়, তাহা যুক্তিদ্বারা প্রদর্শন করিলাম। এখন আমরা পরমাণুবাদের দোষ দেখাইব।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী,
বিদ্যারত্ন, এম্‌-এ,।

নবযুগের সাহিত্য সম্রাট।

আমার সতীর্থ ও প্রিয়বন্ধু শ্রীমান বিনয় কুমার সরকার জাপান হইতে তাঁহার নব প্রকাশিত গ্রন্থ Love in Hindu Literature আমাকে উপহার পাঠাইয়া দিয়াছেন। বিনয়কুমারের আধুনিক সকল গ্রন্থেই যে আশার বাণী প্রচারিত হইতেছে, এস্থলেও সেই বাণী তারস্বরে ধ্বনিত হইয়াছে। তাঁহার লেখনী ধন্য হউক।

আপাততঃ তাঁহার গ্রন্থ সম্বন্ধে একটি মাত্র কথার অবতারণা করিব। গ্রন্থকার ঠাকুর কবির চিত্রা সম্বন্ধে বলিতেছেন :—"This tiny lyrical play or dramatic lyric is indeed the most human and eminently readable of all Tagore's efforts in English. The real "lyric of love and life" is not the Gardener but Chitra....It has the Petrarchan Italianated atmosphere of Romeo and Juliet"

চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধে বাঙ্গালা মাসিকে যে তুমুল লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা পুনর্ব্বার জাগাইবার ইচ্ছা আমার নাই। তবে চিত্রাকে উপলক্ষ করিয়া ঠাকুর-কবি সম্বন্ধে বিনয়কুমার বলিতেছেন :—The humanism revived by Aurobindo Ghose, Coomar-Swamy and Tagore has a special significance for Hindu culture. Hindu classicism and Indian Mediavalism are feeding the omnivorous Romanticism of young India. This Romanticism does not exhaust itself however in antiquarian and archaeological revivals and in brooding over the dead past, but is a vitalising force, and constructs from far and near new ideas of life and art to inspire the present ...The deeper meaning of the Hero and the Nymph, "The Idylls of Radha" and "Chitra" to young India is that Hindu culture has been brought in line with the present day tendencies in literature and art."

বিনয়কুমারের এই কথাগুলি কি সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য? রবীন্দ্রনাথকে "প্রাচ্যের সাহিত্য-সম্রাট" 'ভারতের জাতীয় কবি" ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করা হইয়া থাকে। স্বয়ং বিনয়কুমারও তাঁহার গ্রন্থের উপসংহারে ঠাকুর-কবিকে এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন —The criticism of life, finally in the humanist art presented Tagore Coomarswamy and Aurobindo Ghose is—Forward Ho!

জাতীয় সাহিত্যিক কে? সমসাময়িক জগতের নিরাকার ভাবরাজিকে যিনি সুন্দর সাকারে পরিণত করেন তিনিই সেই যুগের বিশিষ্ট সাহিত্যিক। বিশ্বের বিশাল রঙ্গমঞ্চে নব নব যুগের নূতন পটক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভাবরাজির সমাবেশ হয়। তৎকালীন সকল ব্যক্তিই সেই সকল ভাবগুলিকে অব্যক্তভাবে অনুভূতি করেন, কিন্তু মূকের

সঙ্গীত স্পৃহার ন্যায় জনসাধারণের মনোমধ্যে সেই ভাবরাশি "উঠে পড়ে মিলাইয়া যায় নব নব স্বপ্নবৎ"। সহসা সেই যুগের সাহিত্যিক তাঁহার মায়াদণ্ডের স্পর্শে সেই ভাবগুলিকে মোহন আকারে দৃশ্যমান করিয়া তুলেন, তখন জনসাধারণ বলেন "একি! এতো আমাদিগেরই মনের কথা! লেখক বহির্জগতে প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র!" তখন তাঁহার সাহিত্য সকলকে মাতাইয়া তুলে, ও তিনি সেই যুগের বিশিষ্ট সাহিত্যিক নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন।

ইহাই হইল আধুনিক মত। কার্লাইলের সিদ্ধান্ত অন্যপ্রকার—যথা, কালধর্ম্মে সাহিত্যিক নিয়মিত হয়েন না, সাহিত্যিক তাঁহার কালকে ধর্ম্মদান করেন।

যে মতেই আমরা বিশ্বাস করি, ইহা মানিতেই হইবে যে বিশিষ্ট সাহিত্য তৎকালের ভাবরাজিই পাওয়া যাইবে। তৎকালের বিকৃত চিত্র কোন সাহিত্যিকের বিশেষতঃ কোন "সাহিত্য সম্রাটের" আঁকিবার অধিকার নাই।

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "ক্ষুধিত-পাষাণ ও অন্যান্য গল্পের" ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই অনুবাদ প্রকাশের অর্থ কি আমরা জানি না। কার্লাইলের মতে পুস্তক প্রকাশে কেবল তাঁহারি যথার্থ অধিকার আছে যাঁহারা হৃদয়ে এমন কোনও ঐশ্বরিক-বাণী ধ্বনিত হইয়াছে যাহা জগতের উন্নতি-কল্পে প্রকাশ করা একান্ত কর্ত্তব্য। এমত স্থলে "Had I but two potates in the world and one true idea, I should hold it my duty to part with one potate for paper and ink, and live upon the other till I got it written."

"গল্পগুচ্ছে" এই—"true idea"র বা Hindu culture having been brought into him with the present day tendencies in liturature and art" এর কোন প্রমাণ আমরা পাই নাই।

যদি গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য আর্থিক হয় তবে কার্লাইলের মতে তাহা পণ্যব্যবসার মাত্র। এরূপ গ্রন্থের উপযুক্ত ব্যবস্থা মাইকেল বহুপূর্ব্বেই দিয়া গিয়াছেন। "ক্ষুধিত-পাষাণ ও অন্যান্য গল্প" সম্বন্ধে গত ১২ই জানুয়ারীর *statesman*এ জনৈক ইংরাজ এই সমালোচনা লিখিয়াছেন। সমালোচনাটী অতি সমীচীন বোধে আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

Assuming art he is writing seriously and candidly of family-life in Bengal, we have amazing side-lights on the position of the women in households where the male-members consider themselves civilised......Now in the name of all that is humorous, who is sir Rabindra Nath laughing at? Is it himself or is it his Bengali friends? Or, is it even us? We feel sure some one should be laughing!

Closing the book the reader may feel his desire for information an Indian about Indians gratified a little. Bnt he will not feel that the stories have thrown a bridge across the gulf between East and West. The book has rather, trimming its own edge of the gulf,

increassed the distance. We read ourselves into *Gitanjali* and find common human nature in the other poems. But here Sir Rabindra Nath Tagore, and his not very felicitously chosne translator Mr. Andrews,seem to alienate us. *They succeed in creating rather repellant pictures of Indian life.* We would like to believe happeir things, we do not think anyone will be tempted to carry *Hungry stones* about in his pocket as W. B. Yeats carried *Gitanjali.* We were a little hungry, but we seem to have got the grit of the stones in our teeth."

আমরা যদৃচ্ছাক্রমে "গল্পগুচ্ছের" কয়েকটী গল্প পরীক্ষা করিয়া দেখিব।

"কঙ্কাল"—একটী বালবিধবার জ্বর হইয়াছে। ডাক্তার তাহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। বিধবা বলিতেছেন তিনি আমার জ্বরের উত্তাপ বুঝিলেন। আমিও তাঁহার অন্তরের নাড়ি কিরূপ চলিতেছে কতকটা আভাস পাইলাম।.........আমি গোপনে সন্ধ্যাকালে একটী বাসন্তি-রঙের কাপড় পরিতাম, ভাল করিয়া খোঁপা বাঁধিয়া মাথায় একগাছি বেলফুলের মালা জড়াইতাম একটী আয়না হাতে লইয়া বাগানে গিয়া বসিতাম।"

এই ভাবে একতরফা "গোপন-প্রেম" চলিতে লাগিল। অবশেষে ডাক্তারের বিবাহ উপস্থিত।

"যাত্রার সময় হইয়াছে। ইতিমধ্যে আমি গোপনে ডাক্তারখানায় গিয়া খানিকটা গুঁড়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম, এবং সেই গুঁড়ার কিয়দংশ ডাক্তারের গ্লাসে মিশাইয়া দিয়াছিলাম। কোন গুঁড়া খাইলে মানুষ মরে ডাক্তারের কাছে শিখিয়াছিলাম।

বাঁশি বাজিতে লাগিল। আমি একটী বারানসী সাড়ি পরিলাম। যতগুলি গহনা সিন্দুকে তোলা ছিল সেগুলি বাহির করিয়া পরিলাম। সিঁথিতে বড় করিয়া সিন্দুর দিলাম। আমার সেই বকুলতলায় বিছানা প্যাতিলাম।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এরূপ transpontane melodrama, এমন কাঁচা হাতের purple patches সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী পরিবারের এমত অসম্ভব চিত্র, যিনি লিখিতে পারেন, তিনিই "বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য-সম্রাট"! আবার "তাও ছাপালি দাম করিলি নগদ মূল্য একটাকা!"

(ক্রমশঃ)।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

ভূত-দয়া। *

"শৃণ্বন্তরে অমৃতস্য পুত্রাঃ" অমৃতের সন্তানগণ, তোমরা শোন, সর্ব্বজীব হিতৈষিনী ভগবতী শ্রুতি উদ্বোধন করিয়াছেন—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব॥

এই সচরাচর বিশ্ব, এই মনুষ্য আদি যাবতীয় প্রাণী একই পরমাত্মার বিকাশমাত্র। তিনিই মূর্ত্তিভেদে সকলকার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট, সকল আকারে প্রতিভাত। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥

বিশ্বের মধ্য দিয়া, জীবের ভিতর দিয়াই তাহাকে জানিতে, বুঝিতে, উপলব্ধি করিতে হইবে। বিশ্বের হিত, বিশ্ববাসীর সেবা করিয়া ভগবানের অভিপ্রেত, মানব-জন্মের আকাঙ্ক্ষিত পরম ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। ইহার দ্বারাই তাঁহার পূজা, তাঁহার প্রীতি—এই বিশ্বাসে ভাইসকল কার্য্য করিয়া যাও। ফলাফল তাঁর, আমরা শুধু যন্ত্র মাত্র। জীবকে ছাড়িয়া তাঁহার সেবা, তাঁহার স্তুতি, তাঁহার পূজা কখনই সম্পূর্ণ হয় না। যে জীবকে আপনার বলিয়া ভাবে না, ভগবানের প্রিয় সন্তান বলিয়া সেবা করে না, পরমাত্মশক্তিতে বিধৃত বলিয়া বিশ্বাস করে না, তাহার সাধনা নিষ্ফল। তত্ত্বজ্ঞানের অধিকার তাহার কাছে সুদূরপরাহত। সর্ব্বজীবে সমজ্ঞান, সর্ব্বভূতে দয়া, সকলের মধ্যে একের বিকাশ উপলব্ধি করাই যে তত্ত্বজ্ঞান।

দয়া অন্তরের একটি দ্রবীভূত কোমল অবস্থা। এই মরুভূমির মত কঠোর নীরস হৃদয়-বৃত্তির অভ্যন্তরে কদাচিৎ তাহার ক্ষুদ্রতম বিকাশ দৃষ্ট হয়। এই আন্তর ভাব-বৃত্তিকে স্থায়ীরূপে সকলের উপর সমভাবে ফুটাইতে হইবে, সেবাদ্বারা, সাধনার দ্বারা এই বৃত্তিকে সর্ব্বতোমুখী সর্ব্বতোপরিব্যাপ্ত করিবার যত্ন পাইতে হইবে। এ দয়া শুধু আমার জাগিলে চলিবে না, সকলের অন্তরে জাগাইতে হইবে। শুধু নিজেরদিকে বিস্তৃত দেখিলেই সম্পূর্ণ হইল বলিয়া ভাবিলে চলিবে না, সকলকার হৃদয়ে বিস্তৃত করিবার ব্রত লইতে হইবে।

তাই আমাদের সমবেত অনুষ্ঠান, দল বাঁধিয়া ব্রতের আয়োজন, ঢাকঢোল বাজাইয়া পূজার ব্যবস্থা করা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ভগবানেরই প্রীতি, ভগবানের সেবাই ভগবানেরই কার্য্য। আমাদের এ তুচ্ছ আত্মতৃপ্তি, এ তুচ্ছ সুখ্যাতি, এ তুচ্ছ নিঃস্বার্থ অনুষ্ঠান হইতে পারে, ইহার আরম্ভে যশোলিপ্সা বর্ত্তমান, কিন্তু ইহা ধ্রুব সত্য যে, ইহারই অনুশীলন পরিণামে পরমার্থ-তত্ত্বলাভে অধিকারী করিবে। হইতে পারে, বহুকালের অত্যাজ্য সংস্কার, শাস্ত্র পরিচালিত কর্ত্তব্যবুদ্ধি, স্বার্থরঞ্জিনী বৃত্তির পরিপুষ্টি ও ভাবের অনুপ্রেরণা ইহার প্রযোজক, এই পূজার প্রযোজক। কিন্তু ইহাই আবার ক্রমে সেই

* জাষ্টিস্ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ইচ্ছাপুর অনাথ সেবা ভাণ্ডারের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

"নিত্যোনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং" ব্রহ্মচৈতন্যের স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধি দ্বারা কৃতার্থ করিবে। অগ্রে স্থূল, পরে সূক্ষ্ম। অগ্রে সূত্রে মিশ্রিত ব্রাহ্মণ্যের বহিশ্চিহ্ন সূত্র, পরে জ্ঞানসূত্রাত্মক যজ্ঞোপবীত। অগ্রে মৃণ্ময়ী শেষে চিন্ময়ীমূর্ত্তি। দীপ্ত প্রভাময়ী পবিত্র জ্যোতি চক্ষুর সম্মুখে দেদীপ্যমান রাখিয়া পূণ্যপূত যজ্ঞবেদিকার তলে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে, নিষ্কাম নিঃস্বার্থ আনন্দের আলোকময় জ্যোতিলাভের আশায় সমুৎসুক হইতে হইবে। ইহা একটি বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান। এই যজ্ঞের হোতা ও ঋত্বিক নিষ্কাম নিস্পৃহ দেশের বালক যুবক নির্ব্বিশেষে সকলেই। এ যজ্ঞের যজমান দেশের মহানুভব রাজন্যবর্গ, ধনী সমাজ, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, দীনদরিদ্র সকলেই, ইহার ফল ভোক্তা দীন,দুঃস্থ, আতুর, ক্ষুধার্ত্ত, পীড়িত, নিরাশ্রয় সকলেই।

ইহাই জ্ঞান-যজ্ঞ। এই যজ্ঞে ঘৃতাহুতি লোলুপ লেলিহান অগ্নি শত শিখায় ধক্ ধক্ জ্বলিয়া উঠে না, যূপবদ্ধ নিরীহ পশুর মরণকালীন মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে এ যজ্ঞ-বেদিকা কম্পিত হয় না। এ যজ্ঞে আহুতি দিতে হইবে, ঐহিক স্বার্থ, জঘন্য অহমিকা, সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা। দূর করিতে হইবে লজ্জা,সঙ্কোচ। উন্মোচিত করিতে হইবে তুচ্ছ অর্থোপার্জ্জনলভ্য ঘৃণ্য বাসনা তৃপ্ত কণ্টক। এই জ্ঞানাগ্নিই আমাদের মানসমালিন্য কাষ্ঠরাশির মত নিঃশেষে পুড়াইয়া ফেলিবে, ইহারই ঊর্দ্ধ প্রসৃত রশ্মি আমাদিগকে দেবযান-মার্গে লইয়া গিয়া স্বর্গধামে পৌঁছাইয়া দিবে, অসহায় দীন দরিদ্র পীড়িত বিপন্ন ব্যক্তিগণের কল্যাণ সাধনই ইহার উদ্দেশ্য। দেশের অনুরাগ, সজ্জনের সহানুভূতি, রাজপুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ ইহারই স্থায়িত্ব বিধানের জন্যই আবশ্যক। এই ধর্ম্মময় পবিত্র সারযজ্ঞ জাত্যভিমানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, আত্মাভিমানে পরিপুষ্ট নহে। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি ভদ্র, কি অভদ্র সকলেই ইহার ফলে অধিকারী। দুঃস্থ সাত্বিক, গরীব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, গ্রাসাচ্ছাদনহীন অনাথ শিশু, পতিপুত্র আত্মীয় বিহীনা বিধবা, কন্যাদায়গ্রস্ত জনক জননী—ইহারা, আবার অন্ধবধির, আতুর অক্ষম, খঞ্জ কুষ্ঠী প্রভৃতি সকলেই জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে হবির্লাভের যোগ্যপাত্র। এ যজ্ঞে বিঘ্ন করিবার জন্য রাক্ষসেরা দলে দলে বাহির হইতে আসিবে না। তবে যদি আমাদের দুর্ব্বলতা, ঔদাস্য, অবসাদ, স্বার্থপরতা আসিয়া উপস্থিত হয়, তবেই বিঘ্নের সম্ভাবনা, নচেৎ নহে।

সত্ত্বগুণে যাহার উৎপত্তি, নিঃস্বার্থপরতায় যাহার স্থিতি, আত্মবিসর্জ্জনে যাহার পরিণতি, তাহার বিঘ্ন হইতে পারে না। স্বপ্রকাশ জ্যোতি কখন বাধাপ্রাপ্ত হইবে না।

ভূতে ভূতে দয়াই ভূত-দয়া। ভূত বলিতে মানবাদি প্রাণী ও এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ তাবৎ জীবই ইহার বিষয়। ইহা উপনিষদোক্ত উপাসনা। দয়া, দান, দম। দয়ধ্বং দত্তধ্বং, দমধ্বং এই ত্রিবিধ উপাসনা মানবের জন্যই ব্যবস্থিত।

দয়াবৃত্তির অনুশীলনই অগ্রে চাই। দয়া না জন্মিলে পীড়িতের শুশ্রূষা,অনশনক্লিষ্টকে অন্নদান, বিপদাপন্নের রক্ষা হইবে না। তার পরেই দাতার দান। দান না পাইলে আমাদের বলবতী বাসনা হৃদয়েই বিলীন রহিবে, অক্লান্ত চেষ্টা ব্যর্থতার মধ্যে হাহাকার করিবে, আরব্ধব্রত উত্থাপিত হইবার আশাই থাকিবে না; এই অনুষ্ঠান কখনই সম্পূর্ণতা লাভ করিবে না। দানই এই

যজ্ঞের হবিঃ, এ পূজার পুষ্প চন্দন। তার পর দম—বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের দমন। ইহা বড় রকমের সংযম। এই সংযম শিক্ষা করিতে না পারিলে ইহা স্থায়ী হইবে না, আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ, কল্যাণে চরিতার্থ হইবে না। এই সংযমই আমাদিগকে প্রকৃত নিষ্কামকর্ম্মী করিয়া তুলিবে। কাম,ক্রোধ,লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ষড় রিপুর কবল হইতে রক্ষা করিবে। সংযমেই মনুষ্যত্ব, সংযমের বলেই মানুষ দেবতা।

ভূতে ভূতে এই চৈতন্য—এই পরমার্থ তত্ত্ব লক্ষ করিয়াই কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে। "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" এই ধারণা বদ্ধমূল রাখিয়া চলিতে হইবে। কেহ অনাশ্বস্ত হইওনা। এই মহত্তম অনুষ্ঠানের ঊর্দ্ধে নিম্নে অন্তরে বাহিরে মঙ্গলময় ভগবানের পুণ্য কোমলা অভয়বানী বিরাজমান। দেশের দশের সহানুভূতিতে, ধনীর সাহায্যে, রাজন্য-বর্গের পৃষ্ঠপোষকতায়, দরিদ্র গৃহস্থের মুষ্টি ভিক্ষায় এই অনুষ্ঠান সজীব থাকিবে। তৃণ অপেক্ষা নীচু হইয়া, তরুর মত সহিষ্ণু থাকিয়া ইহার জন্য মন প্রাণ নিয়োজিত করিতে হইবে।

এই কর্ম্মময়ী নদী কোথাও গঙ্গা কোথাও পদ্মা, কোথাও বা অন্তঃসলিলা সরস্বতী। এই ভূত দয়াও কোথাও সেবা, কোথাও দান, কোথাও বা শুশ্রূষা। সেবা শুশ্রূষা আতিথ্য উপকার সাহায্য দান প্রভৃতি সকলই এই ভূত দয়ার অন্তর্ভূত। আমরা দরিদ্র; অক্ষম, সঙ্কীর্ণ,স্বার্থপর,আমাদের মধ্যে সহৃদয়তা নাই,সমবেদনা নাই,মহাপ্রাণতা নাই—এ সকল ভাবিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। সত্য বটে, আমাদের স্নেহ প্রীতি সবই কেবল পরিজনে যেখানে স্বার্থ সম্বন্ধ, সেইখানেই আমাদের যা কিছু। কিন্তু চিরদিনই কি কূপমণ্ডূকের মত আমরা থাকিব? আমাদের কার্য্য কি বরাবরই ইহাতেই বিনিবদ্ধ রহিবে? আমরা কি ভাবিব না যে, আমরা কি ছিলাম, কি হইয়াছি? চিরকালই কি এইরূপ থাকিতে হইবে? ভূত দয়ার চরমোৎকর্ষ সাধিত করিয়া আমরা কি আবার ভারতীয় আর্য্য বীরের সমকক্ষ হইব না?

পত্নী পুত্র, আত্মীয় স্বজন অবশ্য আমাদের প্রতিপাল্য। যে নিজের গর্ভধারিণীকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, জানি, সে জননী জন্মভূমির সেবার অনধিকারী, জগজ্জননীর সন্তান হইবার অনুপযুক্ত। জানি, অবশ্য প্রতিপাল্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা অগ্রে কর্ত্তব্য। কিন্তু এই দৃষ্টিকেই দূরপ্রসারিনী করিতে হইবে; গ্রাম দেশ মহাদেশ শেষ ভূমণ্ডল লক্ষ্যে পরিচালিত করিবার জন্য আমরণ সাধনা করিতে হইবে। দেখি, সহস্রের মধ্যে একজনও সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারে কি না? সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য না হইলেও অর্দ্ধেক বা সামান্য কৃতকার্য্য কি আমরা হইতে পারিব না? সামান্য সাধনা কখনও নিস্ফল হয় না।

মানব না পারে কি? উপরে অনন্ত আকাশ। নিম্নে অতল বারিধি, আর কোথায় জানি না সম্পূর্ণ পরোক্ষ পরলোক সমস্তই মানবীয় জ্ঞানেরই বিষয়। পুষ্পের ক্ষুদ্রতম সৌন্দর্য্য হইতে স্রষ্টার মহত্তম সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা মানবের সাধ্যাতীত নহে। অমৃতের সন্তান মানব কি না পারে?

হইতে পারে আমাদের অনুষ্ঠান ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম, সামান্য ফুৎকারে তৃণের মত উড়িয়া যাইতে পারে। পারে? কখনই নয়। এ যে ভগবানের নিজের কার্য্য। কাজেই

ইহা মহাগিরির মত সুদৃঢ় থাকিবে। ইহা কি অলীক স্বপ্ন যে, এই ক্ষুদ্র কার্য্যই একদিন সার্ব্বভৌম মহা কার্য্যে পরিণত হইবে। কে বলিতে পারে, দেশের ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র সকলের সহানুভূতিতে, রাজার রাজপুরুষের সাহায্যে, সর্ব্বোপরি ভগবানের অপার করুণায় ইহা হিমালয়ের মত আপন গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে না?

এক্ষণে আমরা চাই কি? যশ, প্রতিষ্ঠা, সম্মান ও নামের প্রত্যাশা করি না। আমরা চাই, ভগবানের অভিপ্রেত নির্দ্দিষ্ট নিয়মে নির্ব্বিঘ্নে চলিতে; আমরা চাই, ফলাফল গণনা করিয়া সতেজে মহোৎসাহে কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা করিতে। সভা সমিতি আড়ম্বরের চিহ্ন, তাহা জানি, ইহা যে সত্ত্বগুণ প্রয়োজনক নহে, তাহা বুঝি; তথাপি নিদ্রিত মনোবৃত্তিকে জাগাইতে, আচ্ছন্ন দেশকে নবীনভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে সভা সমিতির আবশ্যকতা আছে, ব্যবহারিক জগতে ইহার অস্তিত্ব সার্থকতা চিরদিনই স্বীকৃত থাকিবে। উৎসাহ অধ্যবসায় স্থিরতর করার জন্য, কার্য্যের প্রসার বাড়াইবার জন্য, সারা দেশকে ঐ উদ্দেশ্যে টানিয়া আনিবার জন্যই আমাদের এই নিবেদন, আড়ম্বর, চীৎকার ও রোদন। সত্ত্বগুণে কার্য্য আরম্ভ করি আর রজোগুণেই করি, কার্য্যতো সৎকার্য্যও মহৎ। এ কার্য্য ত ভগবানেরই সেবা। সদুদ্দেশ্য অন্তরে রাখিয়া সৎকার্য্যের মধ্যেও যদি রজোগুণের আশ্রয় গ্রহণই করিতে হয়, তাহা এই ব্যবহারিক জগতে কি অসমীচীন? সত্ত্বে আরম্ভ, সত্ত্বে স্থিতি, সত্ত্বেই পরিণতি আদর্শ। আদর্শ কিন্তু একদিনেই হয় না সম্পূর্ণতা এক রাত্রেই গড়িয়া উঠেনা।

বলিয়াছি ইহাই আমাদের উপাসনা। ইহাই আমাদের প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম। যাহা জগদ্বিধারক, সৃষ্টি রক্ষার হেতু, তাহাই ধর্ম্ম। জীব রক্ষায়ই জগতের স্থিতি। দরিদ্রকে অনশন হইতে, মুমূর্ষুকে মৃত্যুমুখ হইতে, বিপদাপন্নকে বিপৎ হইতে, আর পতনোন্মুখকে পতন হইতে রক্ষা করিলেই মানবের রক্ষা। মানব রক্ষায়, মানবের ঐহিক আধ্যাত্মিক উন্নতির উপরই বিশ্বের যাবতীয় মঙ্গল অবস্থিত।

দুর্ভিক্ষের করাল কবলে পড়িয়া, মহামারীর জ্বলন্ত আগুণে ঝাঁপ দিয়া, বিপদ্ ব্যাত্যায় দিশাহারা হইয়া কত সহস্র মানব যে কার্য্যক্ষেত্র ত্যাগ করিতেছে, আপনাদিগকে পাপের মহাসমুদ্র-গর্ভে পতিত করিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করিয়া যাইতেছে—এ কথা কাহারা ভাবেন? ভাবিয়া তাহার উপায়াবিষ্কারে কয়জন আকুল হন? মানব জাতির অভ্যুদয়ের উজ্জ্বল চিত্র যদি আমরা দেখিতে চাই, মানবজীবনের সাধনা ফলবতী করিতে চাই, ধরার বক্ষে গোলোকের রশ্মিপাত দেখিয়া জীবন ধন্য করিতে চাই—তবে এই ভূত-দয়ারই সাধনা, অনুশীলনও অভ্যাস করিতে হইবে। শ্রুতি তারস্বরে বলিয়াছেন—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো না বিজুগুপ্সতে॥

এই ভূতদয়ার অনুশীলন সাধনা ও অভ্যাস অনেক প্রকারে হইতে পারে। ধনী ধন সাহায্যে, বলী বল প্রয়োগে, মনীষী চিন্তা সহযোগে, পণ্ডিত উপদেশ দানে, সাধারণে শ্রম গুণে এই ভূতদয়ার সাধন করিতে পারেন। যাহার যেটুকু শক্তি, তিনি সেই টুকু প্রয়োগ করুন। যতটুকু সাধ্যের অনতিরিক্ত, ততটুকুরই তিনি সদ্ব্যবহার করুন। হরিশ্চন্দ্রের পৃথিবী ছিল, পৃথিবী দান করেন। আমাদের

তণ্ডুলকণা যাহা আছে, তাহা দরিদ্রের মুখে কেন না দিই? দাতাকর্ণ অতিথির জন্য পুত্রের শিরচ্ছেদ করিতে পারিলেন, আর আমরা অন্ন ও বাসস্থান দিয়া দিনান্তে একটি অতিথিরও উপকার করিতে পারি না কি? শিবিরাজ আশ্রিত রক্ষার জন্য নিজ অঙ্গদানে কাতর হন নাই, তবে আমরা সামান্য শারীরিক কষ্ট সহ্য করিতে এত কাতর হই কেন? রাজা, ধনবান্, অন্নসত্র খুলিয়া সহস্র মানবকে অন্নদান করিতে পারগ, প্রকাণ্ড চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে সক্ষম,—আর আমরা দরিদ্র হইলেও সেই রাজা ধনীদেরই নিকট অর্থ ভিক্ষা করিয়া, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া চাঁদা লইয়া, দরিদ্র সংসারীর প্রদত্ত মুষ্টি ভিক্ষা একত্র করিয়া সেইরূপ আরও অন্নসত্র, আরও চিকিৎসালয় করিতে কি সমর্থ হইনা? আমাদের সমবেত চেষ্টায় আমাদের নিবেদিত মনপ্রাণের সাধনায় লোকস্পৃহনীয় আদর্শ কি একটি গড়িয়া তুলিতে পারি না? এমন মধুচক্র রচনা করা আমাদের পক্ষে এতই কি অসম্ভব, যাহার মধুপানে দেশের কয়জনকেও তৃপ্ত করিতে পারি। আমাদের যদি সত্যই প্রাণ থাকে, তবে আমরা নিশ্চয়ই গৌরবের এমন পিরামিড রচনা করিতে পারিব যে, জগতের উৎসুক দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে তাহার পানে চাহিয়া দেখিবে।

অনেকে ভাবেন আমাদের মধ্যে পরোপচিকীর্ষা বৃত্তি নাই। কে বলে, নাই? সকলকার ভিতরে ভগবান্ আছেন আর সাধু বৃত্তি নাই? অবশ্যই আছে, আমরা কেবল জাগাই না, জাগাইবার মত লোক নাই, অনুকূল অবস্থা উদ্বোধন কারণের অভাবে কেবল বৃত্তি জাগিতে পায় নাই। বল, সহিষ্ণুতা সে ত বাহিরের, সে আপনিই দেখা দিবে। প্রাণ জাগিলে প্রবৃত্তি জাগিলে ওসব আপনিই আসিবে।

আমাদের বিদ্যাদান, আমাদের ধর্ম্ম শিক্ষা, আমাদের অর্থ সাহায্য, আমাদের পরোপকার প্রবৃত্তি—কেবল যশ মান প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের জন্য। যশোলিপ্সা এমতই আমাদের অস্থি মজ্জায় জড়াইয়া আছে যে, নিষ্কাম কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে স্বভাবতঃই মন তাদৃশ ব্যগ্র হয় না। কিন্তু অভ্যাসে সকাম অনুষ্ঠান করিতে করিতে ও একদিন নিষ্কামভাব ফুটিবে, সৎ কর্ম্মের পরিণাম ভাল হইয়াই এক সময়ে না এক সময় দেখা দিবে।

নিঃস্বার্থ দানে লোকের আগ্রহ নাই। যাহাতে নাম নাই, রাজপুরুষের বাহবা নাই, উপাধি লাভের প্রচ্ছন্ন আশা নাই, এমন ভাবের দাতা দুর্লভ। তাই আমাদিগকেও বর্ত্তমান সময়ের সাজে সাজিতে হইবে, বর্ত্তমান ভাবেরই অন্ততঃ ভাণ করিতে হইবে।

তাহা হইলেও কি আশানুরূপ সাহায্য মিলিবে না? জানি, ধনীরা সাধারণতঃ বিলাস শয্যায় শায়িত, আপনাদের আহার বিহারেই ব্যস্ত। তথাপি আমরা তাঁহাদের গৃহ-দ্বারে দাঁড়াইয়া অনশন ক্লিষ্ট দরিদ্রের কাতর অবস্থা বর্ণন করিয়া চক্ষুতে অশ্রু আনিতে পারিব না? নীরস চিত্তে সহানুভূতির মন্দাকিনী ধারা বহাইতে পারিব না? দুর্ভিক্ষের জলন্ত চিত্র দেখিলে কোন্ মানুষের তৃষ্ণতরল চক্ষু কাতর হয় না? কোন্ নীরব হৃদয়ে সমবেদনা জাগে না? মানুষ মানুষের মত চক্ষু মনপ্রাণ লইয়াই জন্ম গ্রহণ করে। তবে সেই মানুষের মধ্যে মানবত্বের প্রতিষ্ঠা করা কি অসম্ভব?

আজ আমরা দেশের ধনী মধ্যবিত্ত সকলেরই নিকট ভিক্ষার ঝুলি লইয়া সমুপস্থিত,

সকাতর আবেদনে তাঁহাদের উদাসীন উপেক্ষাময়ী দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য সমুৎসুক। দেখি আশা পূর্ণ হয় কি না? আমরা প্রাণপণ কার্য্য দেখাইয়া, দেশের দুরবস্থার চিত্ত অঙ্কিত করিয়া, দুর্ভিক্ষ মহামারীর মর্ম্মভেদী অবস্থা লোক চক্ষুর উপর ফুটাইয়া দিয়া দেশবাসীকে এই ভূতদয়ার অন্ততঃ নিম্ন আদর্শেও উপনীত করাইতে চাই, আপামর সাধারণকে এই মহামন্ত্রে জাগ্রত করিতে চাই, কল্পনার সুখস্বপ্নে (কল্পনার বল ক্ষতি নাই) সত্যযুগ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিতে চাই। এই আদর্শ আমাদের চক্ষুতে প্রদীপ্ত রাখিবার জন্য প্রভু রামকৃষ্ণ রোগী ও দীন সাজিয়া আসিয়াছিলেন। মহাত্মা বিবেকানন্দস্বামী ইহারই প্রতিষ্ঠার জন্য কায়-মন-প্রাণ নিয়োগ করিয়াছিলেন, দেশকে জাগাইবার জন্য বক্তৃতার তীব্র তড়িৎ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা প্রভু রামকৃষ্ণের ছবি সম্মুখে রাখিয়া, বিবেকানন্দের শুভ সদিচ্ছা স্মরণ করিয়া আসুন অগ্রসর হই। কলিকালের অন্ধকার রাজ্যে সত্যের আলোক-রশ্মি দেখা গিয়াছে। আসুন আমরা ঐ লক্ষ্যে অগ্রসর হই; ভূত-দয়ার ব্রত গ্রহণ করিয়া ধন্য হই। এই যজ্ঞে ঐহিক স্বার্থ, জঘন্য কামনা, তুচ্ছ স্বার্থপরতা, বৃথা কর্ত্তৃত্বাহঙ্কার পূর্ণাহুতি দিই। অতীতের জ্ঞানধর্ম্মগুরু ভারতবর্ষ উহার নিজ উন্নত পদবী আবার গ্রহণ করুক। অমৃতের সন্তান আবার অমৃতের সন্তান হইয়া দাঁড়াই। ঐ শুন মার আহ্বান—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধিত"

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা

শান্তিশতকম্।

দিবানিশি দুই কূল করি বিদারিত
ভয়াল কালের স্রোতঃ বহে অনিবার,
এই স্রোতে একবার হইলে পতিত
না আছে আশ্রয়, নাহি পথ ফিরিবার।
হায়রে এসব আছে যা'দের বিদিত
তাহাদেরও মন হয় মোহ কলুষিত!৬০।
বহুকাল ধরি' যদি ভুঞ্জ অর্থ ধন,
একদিন তবু তাহা যাইবে নিশ্চয়,
তাহার বিয়োগে তবে কি আছে এমন,
স্ব-ইচ্ছায় যাহে মন না ছাড়ে বিষয়?
বিষয় আপনা হ'তে যদি চলি' যায়
ঘোর পরিতাপ মনে করে অধিকার,
স্বয়ং যদ্যপি কেহ ত্যাগ করে তা'য়
তাহার হৃদয়ে রাজে আনন্দ অপার!৬১।
এই ভবারণ্য ভীম, ওহে জনগণ
দেহগৃহ শতচ্ছিদ্র জানিও নিশ্চয়,
ভীষণ তস্কর কাল করয়ে ভ্রমণ,
মোহ-রাত্রি সদা হেথা অন্ধকারময়!
সন্ন্যাস ফলক যা'র হেন জ্ঞান-অসি,
শীল-বর্ম্ম অঙ্গে তব করিয়া ধারণ,
সুস্থির নয়ন করি,' স্থিরভাবে বসি'
সমাহিত-মনে কর সদা জাগরণ!৬২।
পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে চোর প্রবেশ করিয়া

অল্পমাত্র ধন যদি করিলা হরণ,—
একথা শুনিলে লোক সতর্ক হইয়া
আপন নিলয় সদা করয়ে রক্ষণ।
শরীর ভবন হতে করি' আকর্ষণ
প্রতিদিন কত নরে যেবা লয়ে যায়,
সেই যম নহে কিরে ভয়ের কারণ,
সাবধান, সাবধান, জন সমুদায়!৬৩।

তোমরা আমার কেবা, আমি তোমাদের?
এসংসার সীমাশূন্য সাগরের প্রায়,
উঠে, পড়ে কত হেথা উর্ম্মি করমের,
মিলিত আমরা তাহে ফেণপুঞ্জপ্রায়!
জগতের যাহা কিছু সকলই নশ্বর,
তা'সবে কি হেতু চিত্ত দেহ, পুত্রগণ
জগতের অন্তরাত্মা, অনন্ত ঈশ্বর,—
সর্ব্ব কর্ম্ম সনে তাঁ'তে হও নিমগন।৬৪।

যৌবন-মোহেতে মজি' নারী-দেহ-সরে
কেনরে মানস-হংস যাও বারবার,
দেখনা কি বিধি তব বাঁধনের তরে
রমণী-জরূপে পাশ করেছে বিস্তার?৬৫

শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য।

তুমি।

(অপ্রকাশিত বৈশাখী হইতে)

১

তুমি যে আমার জীবন-কাননে
মধুর বসন্ত হেন,
তুমি যে আমার হৃদয়-গগনে
শারদ-চন্দ্রমা যেন।

২

তুমি যে আমার মরম-বীণায়
ঊষার পূরবী তান,
তুমি যে আমার অন্তর রূপে
প্রাণের হওরে প্রাণ!

৩

তুমি যে আমার নয়নে নয়ন
লক্ষ্য-পথে ধ্রুবতারা,
তুমি যে আমার হরষ-আরাম
কিবা স্নিগ্ধ সুধা-ধারা।

৪

তুমি যে আমার সাধনার ধন
স্বর্গ, মোক্ষ, ধ্যান,জ্ঞান,
তোমারি মূরতি ধরিয়া হৃদয়ে
লভিব যে নিরবাণ।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

বাসন্তী।

ফুল ফুটেছে গঙ্গার বনে
চাঁদ উঠিছে পূবে,
বানার নদী উজল করে
পিছে তপন ডুবে!
আফিস ঘরের দূরে দূরে
বন ফুলের হাসি!
তার হাসিটী মনে পড়ে
যারে ভালবাসি!
মুহু মুহু "কুহু কুহু"
কোকিল "কুহু" গায়!
এ বসন্তে আজ্‌কে বধূর
লজ্জা রাখা দায়!
ওই, কলসী কাঁকে, নোলক নাকে
ধীর গতিতে চলে,
কাঁচা সোণার তরল লহর
খেল্‌ছে নদীর জলে!
মলয় দিছে ঘোম্‌টা তুলে
ফুট্‌ছে মধুর হাসি,
গঙ্গার দেশে উঠ্‌ছে ফুটে
গোলাপ টগর রাশি!

পিছে পিছে আস্‌ছে ছুটে
পাড়ার কতক মেয়ে,
তাদের আরো কদর বেশী
গোলাপ, বেলীর চেয়ে!
গগণ কোণে মুচ্‌কি হাসে
আকাশের এক চাঁদ,
শত চন্দ্রের রূপ লাবণ্য
তাদের মুখের ছাঁদ!
নয়ন কোণে ভালবাসা
প্রেম-পিয়াসা প্রাণে,
বসন্তের বাসন্তী যত
তারাই যেন আনে।
দিগ দিগন্তে পাপিয়ার বোল
দয়েল ডাকে বনে,
বসন্তে বাসন্তী-হাওয়া
বইছে খণে খণে!
আকুল প্রাণ ব্যাকুল হয়ে
কি যেন আজ চায়,
মনে হয় জীবন-যৌবন
বিলিয়ে দেই পায়।

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত।

জাগরণ।

১

কি অপূর্ব্ব শুভক্ষণে হে স্বদেশ! হে মোর স্বদেশ!
সুপ্তি ধীরে টুটে আসে—চিত্তে নব চেতনা-আবেশ!
একি জ্যোতিঃ নিরমল! কি গৌরব ভুবন-বিস্ময়!
তব সনে পলে পলে হইতেছে সত্য-পরিচয়!

২

"জাগ, উঠ, চল ত্বরা কর্ম্মোজ্জ্বল সম্মুখে মহান্!"
পূর্ণ করি সারা প্রাণ জাগিছে এ কাহার আহ্বান!
হে আমার জন্মভূমি! হে প্রত্যক্ষ দেবতা আমার!
অন্ধকার কারাগারে রহিতে নারিব রুদ্ধ আর!

বিশ্বের আচার্য্য তুমি—তুমি কভু সামান্যত নহ!
তোমার সন্তান মোরা কেন গ্লানি সহি অহরহঃ!
প্রচণ্ড রবির প্রভা কতকাল করে রাহু গ্রাস,—
কে পারে থামায়ে দিতে সমুদ্রের তরঙ্গ-উচ্ছাস!

হে নিষ্কাম কর্ম্মযোগী! আসে বুঝি ইঙ্গিত ধাতার,—
মুক্ত করি দাও আজি তব গুপ্ত-ভাণ্ডারের দ্বার!
শৌর্য্যে বীর্য্যে জ্ঞানে ধর্ম্মে দীক্ষা সবে দাও পুনরায়
তব যোগ্য-সুত হয়ে স্থান যেন লভি এ ধরায়!

তোমারি বাণিজ্য-পোত ব্যবসায়ী নন্দননিকর
আনন্দে বাহিয়া যাক্ তরি' সিন্ধু দেশ-দেশান্তর!
তব শান্ত তপোবনে যে সৌন্দর্য্য উঠিছে গুঞ্জরি;
দিক সবে তা'রি বার্ত্তা—ধনরত্ন আসুক্ আহরি'!

৬

আমরা দাঁড়াব আজি আত্ম-বলে করিয়া নির্ভর—
বিশ্বের কল্যাণ-সেবা ধ্রুব-লক্ষ্য হবে নিরন্তর!
তোমারি বিজয়-ধ্বজা উড়াইব হিমাদ্রির শিরে
আশ্বাসি' জগতে কেবা ভাসে সদা তপ্ত আঁখি-নীরে!

৭

হে ভারত! আর্য্য-মহাঋষিদের পবিত্র কুটীর!
অতুল সাধনা-সাধ তব মাঝে সঞ্চিত গভীর।
আজি যেন লভিতেছি অন্তরের নিভৃত ভবনে
তা'রি পুণ্য-পরিশন বাঁধিবারে সবে আলিঙ্গনে!

৮

জীবন সার্থক হবে! সফল হইবে আজি পণ!
কে রবে পশ্চাতে পড়ি'—প্রবাহ ফিরাবে কোন্‌জন?
তুমি আমাদের হবে—মোরা শুধু হইব তোমার—
স্রষ্টার অলঙ্ঘ্য বিধি—আশীর্ব্বাদ এসে দেবতার!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

১ম চিত্র

কড়াইশুঁটী গাছের শিকড়।

১, ২, ৩, ৪. চারটী ফুলোকে চিহ্নিত করিতেছে।

২য় চিত্র।
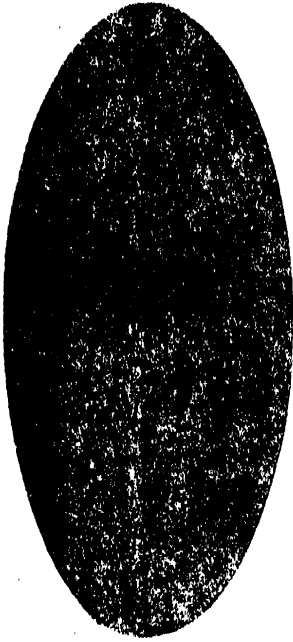
ব্যাসিলস্ র্যাডিসিকোলা।—ইহাদিগকে সিম-জাতীয় গাছের শিকড়ের ফুলোগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের দণ্ডাকৃতি শরীর যেন কতকগুলি দানার সমষ্টি, (beaded)। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ইংরাজী Y বা V অক্ষরের আকার ধারণ করে।

৩য় চিত্র।

আজোটোব্যাক্‌টের ক্রক্কসম।—ইহাদিগকে সব উর্ব্বর জমীতেই দেখিতে পাওয়া যায়। সব রকম বৃক্ষলতার খাদ্যোপযোগী যবক্ষার-জান বিশিষ্ট খাদ্য ইহারা প্রস্তুত করিতে পারে ও করে। পতিত জমীকে ইহারা ধীরে ধীরে যবক্ষারজান বিশিষ্ট খাদ্যে অধিকতর ধনী করিতে পারে ও করে। ইহারা ডিম্বাকৃতি।

আমাদের সার্ম্মণ।

(কড়াই শুঁটী গাছের শিকড়।)

"ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাম ভূতানাং মধ্বস্যৈ
পৃথিব্যৈ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু।"

(এই পৃথিবী সমস্ত প্রাণিগণের মধু, আবার সমস্ত প্রাণী এই পৃথিবীর মধু)।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্। ২। ৫।১ ॥

"And this brings us to the true conclusion implied throughout the foregoing pages—the conclusion that it is one and the same Ultimate Reality which is manifested to us subjectively and objectively."

Herbert Spencer's Principles of Psychology Vol. I, sec-273.

অনেকেই সার্ম্মণ (sermon) দিতে ভালবাসেন, তা পারুন আর না পারুন। আমরাও তাহা ভালবাসি, তা পারি আর না পারি। পারি ত ভালই, না পারি ত সহৃদয় পাঠক মাপ করিবেন। আমাদের আজকার সার্ম্মণের বিষয় অতি তুচ্ছ;—কড়াইশুঁটী গাছের শিকড়। সেই শিকড় হস্তে আজ আমরা আমাদের সার্ম্মণ প্রিচ্ করিব।

সার্ম্মণ দিতে গেলে অনেকেই ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে একটী টেক্সট্ (text) লইয়া তাহাকে ভিত্তি করিয়া সার্ম্মণ দেন। আমরাও সেই প্রাচীন প্রথার অনুসরণ করিব। প্রিয় পাঠক আমাদের টেক্সট্ উপরে দেখিতেই পাইতেছেন। ঐ টেক্সট্ সম্বন্ধে দুই একটী কথা গোড়াতেই বলা আবশ্যক। বৃহদারণ্যক একটী শ্রেষ্ঠ উপনিষদ্,—অনেক স্থান অতি গভীর ভাবে পূর্ণ। সেই উপনিষদের "মধুবিদ্যা" আবার একটী অতি শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। সেই "মধুবিদ্যার" প্রথম ছত্রই আমাদের উক্ত টেক্সট্। "মধুবিদ্যা" বৈদিক ঋষিদিগের অত্যন্ত আদরের ধন ছিল। বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ দুই ভাগেই খুব প্রশংসিত;—ইহা হইতেই বোঝা যায় কত আদরের ধন ছিল। ঐ "মধুবিদ্যার" অন্তর্নিহিত ভাবটী অতীব নিগূঢ়। উহা অপেক্ষা গভীরতর, শ্রেষ্ঠতর, সত্যতর ভাব মানব-মস্তিষ্ক কখনও ভাবে নাই; উহা অপেক্ষা উচ্চতর, ব্যাপকতর কথা মানব কণ্ঠ কখনও উচ্চারণ করে নাই। কোন কোন পাঠক হয়ত স্বভাবতই জিজ্ঞাসা করিবেন মধুবিদ্যার সেই কথাটী কি। সেই কথাটী এই:—এই যে সব জড় পদার্থ (matter) পৃথিবী, জল, বায়ু ইত্যাদি; এই যে সব শক্তি (force বা energy) বিদ্যুৎ, তেজ ইত্যাদি; এই যে সব প্রাণ, বিশিষ্ট পদার্থ (living matter) বৃক্ষ, লতা, পশু-পক্ষী, মানব ইত্যাদি; আর এই যে জিনিসটী যাহাকে চৈতন্য (consciousness), বল;—এ সকলই স্বরূপতঃ ও মূলতঃ এক 'নেতি' "নেতি" স্বরূপ, "অগৃহ্য" (incomprehensible), "অপ্রাণ", "অমনা", অনন্ত অস্তিত্বে (ব্রহ্মে) একীভূত। এই যে হৃৎকম্পনকারী, মস্তিষ্কবিঘূর্ণনকারী, বিশ্বব্যাপী, সর্ব্বগ্রাসী একত্ব (Universal Synthesis) ইহা বোঝা যায় কিরূপে?

উপনিষদ্ বলিতেছেন ইহা বোঝা যায় এইরূপে যে এই যে জড়, শক্তি, প্রাণ, চৈতন্য—ইহারা সকলেই পরস্পর পরস্পরের সহিত কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, উপকার্য্য উপকারক সম্বন্ধে গ্রথিত। ইংরাজীতে এক কথায় বলিতে গেলে বলা যায় ইহারা পরস্পর পরস্পরকে originate বা affect করে। ঐসবপদার্থ মূলে এক না হইলে ওরূপ করিতে পারিত না। ইহাই হইল "মধুবিদ্যার" নিগূঢ়ভাব, সার-মর্ম্ম। সুবিজ্ঞ পাঠক দেখিবেন ঐ অন্তর্নিহিত সুগম্ভীর তত্ত্বেরই দিকে এক ভাবে না এক ভাবে জগতের সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন ধর্ম্ম ধীরেধীরে কিন্তু সুদৃঢ় পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে। হার্বার্ট স্পেন্সারও তাঁর উপরি উদ্ধৃত উক্তিতে উপনিষদের সহস্র সহস্র বৎসর পরে ঐ মহা তত্ত্বেরই পুনঃ নির্দ্দেশ করিলেন। ঐ তত্ত্বই বোঝাইবার জন্য "মধুবিদ্যা" প্রথমে জড় ও প্রাণের একত্ব দেখাইবার নিমিত্ত বলিতেছেন "পৃথিবী প্রাণিগণের মধু * অর্থাৎ উপকারক, আর প্রাণিগণ পৃথিবীর মধু অর্থাৎ উপকারক।

কোন কোন পাঠক হয় ত এখানে বলিবেন ধান ভানূতে এ শিবের গীত কেন। আমরা তাহা হইলে বলিব, প্রকৃতিস্থ মানব ধানই ভানুক আর নাড়াই কাটুক শিবের গীত না গাইয়া থাকিতে পারে কই? এই বিশ্বব্যাপার কি শিবের এক অনাদি অনন্ত গীত নহে? আর যদি কোন বৈজ্ঞানিক পাঠক আমাদের প্রতি কটাক্ষপাত করেন, তাহা হইলে—তাঁহাকে বিজ্ঞান-রাজ্যের এক রাজার কথা স্মরণ করাইয়া দিব। প্রফেসার হক্সলি বলিতেন যে, যে বৈজ্ঞানিক কেবল shell আর sulphuric ocid লইয়াই থাকেন,—যিনি সাধারণ সত্যে (general truths এ) উঠিতে পারেন না, তিনি বিজ্ঞান রাজ্যের মুটে (hodman) তিনি বিজ্ঞানের মোটই বহেন; বিজ্ঞানের রস আস্বাদন করিতে পারেন না।

পৃথিবী যে প্রাণিগণের (আমরা এখানে "প্রাণী" অর্থে পশু পক্ষী ও ধরিব, বৃক্ষ লতাও ধরিব; বৃক্ষ লতারও প্রাণ আছে) উপকারক তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে; কেননা পৃথিবী (মাটী) না থাকিলে অধিকাংশ বৃক্ষ লতাই থাকিত না, শস্যাদি হইত না, কাযেই এখনকার মত স্থলবিহারী নানারকম জন্তুও (animals) থাকিত না। অন্যদিকে প্রাণিগণ যে পৃথিবীর উপকারক, তাহা তত স্পষ্ট বোঝা না যাইলেও একটু চেষ্টা করিলেই বোঝা যায়। পশু পক্ষীরা যে তাহাদের মল মূত্র দ্বারা পৃথিবীর উপকার করে অর্থাৎ পৃথিবীকে অধিকতর "সারযুক্ত" এবং উর্ব্বরা করে তাহা আমরা সকলেই জানি। বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী মরিয়া পচিয়া মৃত্তিকাসাৎ হইয়াও পৃথিবীকে উর্ব্বরা করে। শুধু তাই নয়। এই যে পাথুরে কয়লা (coal),—ভূপৃষ্ঠের শত শত, সহস্র সহস্র হস্তব্যাপী অনেক স্থান এই পাথুরে কয়লার দ্বারা গঠিত। পাথুরে কয়লা কিন্তু পরিবর্ত্তিত উদ্ভিদ্ শরীর ব্যতীত আর কিছুই নহে। আরও দেখুন পৃথিবীর শত শত, সহস্র সহস্র ফিট্ গভীর অনেক স্তর চা খড়ির (chalk এর) দ্বারা নির্ম্মিত। ঐ চা খড়ির একটী প্রধান উপাদান কিন্তু জীব জন্তুর খোসা (shell) বা কঙ্কাল। আরও দেখুন

* এখানে "মধু" শব্দের অর্থে 'কার্য্য' ও ধরিতে পারেন, "উপকারক"ও ধরিতে পারেন। ফলে একই দাঁড়াইবে। শঙ্কর "মধু" শব্দটী দুই অর্থেই লইয়াছেন। আমরা এখানে 'উপকারক" অর্থে লইলাম।

ছোট ছোট ফুলের মত দেখতে এক রকম জন্তু (coral polyps) কত দ্বীপ নির্ম্মাণ করিয়াছে ও আজও করিতেছে। আর ডারউইনের সেই সুপ্রসিদ্ধ আবিষ্কার—কেঁচো (earth-worm) মাটী খাইয়া, তাকে তার পেটের মধ্যে দিয়া লইয়া গিয়া, গুহ্য দ্বার দিয়া আবার বাহির করিয়া, ঐ মাটীকে বেশ মিহি করিয়া তাহাকে (অর্থাৎ ঐ মাটীকে) বৃক্ষলতা উৎপাদনে সাহায্য করিতেছে; লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া পৃথিবী ব্যাপিয়া এই কায করিয়া আসিতেছে—ডারউইনের এ আবিষ্কার সকলেই জানেন। এ সকল দৃষ্টান্ত দেখিলে বেশ বোঝা যায় প্রাণিগণ কিরূপে পৃথিবীর মধু অর্থাৎ উপকারক:—প্রাণীরা পৃথিবীকে সারযুক্ত করিতেছে, অধিকতর উর্ব্বর করিতেছে, কোথাও কোথাও পৃথিবীর কোন কোন অংশ নির্ম্মাণপর্য্যন্ত করিতেছে।

পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলি অপেক্ষাকৃত স্থূল,—উহাদের অনেক ব্যাপারই শুধু চর্ম্ম চক্ষেই দেখা যায়। আজ কিন্তু আমরা একটী দৃষ্টান্তের কথা বলিব যাহা অতি সূক্ষ্ম, যাহার অনেক ব্যাপারই শুধু চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না; অনুবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রাদির প্রয়োজন। আমাদের আজকার সার্ম্মনের বিষয়ই ঐ দৃষ্টান্তটী। এ দৃষ্টান্তের প্রাণিগণ অতি ক্ষুদ্র, সুতীক্ষ্ণ অনুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত শুধু চর্ম্ম চক্ষে দেখা যায়না। ইহারা এক শ্রেণীর উদ্ভিজ্জাণু (Bacteria) *। ইহারা সাধারণতঃ মাটীতেই থাকে। ইহারা পৃথিবীর উপকার বা পৃথিবীকে affect করে কিরূপে? ইহারা পৃথিবীকে অর্থাৎ মাটীকে উর্ব্বরা করে;—ইহারা সাধারণ বৃক্ষ লতার একটী অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য প্রস্তুত করিয়া সেই খাদ্য পৃথিবীকে অর্থাৎ মাটীকে দান করে। * বৃক্ষ লতা আবার সাধারণতঃ

* "উদ্ভিজ্জাণু" নামটী খুব প্রচলিত বলিয়া আমরাও ব্যবহার করিলাম। কিন্তু যাহাদিগকে উদ্ভিজ্জাণু বলা হয় তাহাদিগকে উদ্ভিদ্ জগতে (vegetable worldএ) ফেলা উচিত, কি জন্তু জগতে (animal worldএ) ফেলা উচিত—এ প্রশ্নটী অতি কঠিন প্রশ্ন। ইহারা উদ্ভিদ্‌ও (plants ও) বটে, জন্তুও (animal ও) বটে, আবার উদ্ভিদও নয়, জন্তুও নয়। ইহারা এক কিম্ভূত কিমাকার জগতের লোক। সাধারণ বৃক্ষ লতা যেমন তাদের পত্রস্থ বা শরীরস্থ সবুজ রংএর সাহায্যে বায়ু হইতে অঙ্গার (carbon) গ্রহণ করিয়া নিজেদের শরীর পোষণ করে, এই তথা-কথিত উদ্ভিজ্জাণুরা তাহা পারে না। আবার সাধারণ জন্তুরা যেমন শক্ত খাদ্য—(solid food) খাইয়া নিজেদের শরীর পোষণ করে এই উদ্ভিজ্জাণুরা তাহা পারে না॥ বোধ হয় পৃথিবীতে যখন প্রথম জীবোৎপত্তি হইয়াছিল তখনকার সব জীবই (living organisms) দুয়েরবেরে গোছের ছিল,—না উদ্ভিদ্, না জন্তু। তারপর তাদেরই বংশধরদের মধ্যে কতকগুলি ধীরে ধীরে, শেষে স্পষ্টরূপে উদ্ভিদের আকার প্রকার, গঠন, ধরণ, ধারণ লাভ করিয়া উদ্ভিজ্জগৎ স্থাপন করিল; আর কতকগুলি আরও ধীরে ধীরে, শেষে স্পষ্টরূপে জন্তুর আকার প্রকার, গঠন, ধরণ, ধারণ লাভ করিয়া জন্তুজগৎ স্থাপন করিল। কিন্তু তৃতীয় কতকগুলি বিশেষ কোন দিকে গেল না,—তাদের সন্তান সন্ততি বর্ত্তমান কালের উদ্ভিজ্জাণু। এইরূপ ভাবে উদ্ভিজ্জাণুদিগকে দেখিলে সব দিকে রক্ষা পায়।

* আমরা পরে দেখিব এই উদ্ভিজ্জাণুদের

মাটী হইতে সেই খাদ্য গ্রহণ করিয়া নিজেদের শরীর পোষণ করে ও জীবন ধারণ করে। বৃক্ষ লতার এই খাদ্যটী যবক্ষারজান বিশিষ্ট খাদ্য (Nitrogenous food)। পশু, পক্ষী, মানুষ প্রভৃতি জন্তুদের (animal দের) যেমন যবক্ষারজান বিশিষ্ট খাদ্য (চাল, ডাল, আলু, গম, দুগ্ধ, মাংস প্রভৃতি) নিতান্ত প্রয়োজনীয়, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি উদ্ভিদেরও (plants এরও) তেমনি যবক্ষারজান বিশিষ্ট খাদ্য দরকার। তবে জন্তু ও উদ্ভিদের উক্ত খাদ্যের রাসায়নিক গঠনটা কতকটা ভিন্ন রকমের বটে। কিন্তু মূল কথা হইতেছে—জন্তুদের খাদ্যেও যবক্ষারজান (Nitrogen) থাকা চাইই; উদ্ভিদের খাদ্যেও যবক্ষারজান থাকা চাইই ;—না থাকিলে জন্তুও মরিবে উদ্ভিদও মরিবে। এখন কথা হইতেছে উপরে যে বলা হইল এক জাতীয় উদ্ভিজ্জাণু সাধারণ বৃক্ষ লতার জন্য যবক্ষারজান বিশিষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করে, তা ঐ উদ্ভিজ্জাণুরা যবক্ষারজান পদার্থটী পায় কোথা হইতে? পায় মাটীতে যে বায়ু (soil-air) আছে, সেই বায়ু হইতে। (মাটীর ভিতরেও বায়ু—atmospheric air—কতকটা প্রবেশ করে)। আর বায়ুতে যে যবক্ষারজান যথেষ্ট পরিমাণে আছে তাহা সকলেই জানেন। পাঠক এখানে বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিবেন পশু পক্ষী মানুষ যেমন বায়ু সাগরে নিমজ্জিত থাকিলেও উহার অসংযুক্ত (free, chemically uncombind) যবক্ষারজানকে গ্রহণ করিয়া শরীর পোষণ করিতে পারে না, সাধারণ বৃক্ষলতাও তেমনি বায়ু সাগরে নিমজ্জিত থাকিলেও উহার অসংযুক্ত যবক্ষারজান গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। ঐ বায়ুস্থ অসংযুক্ত যবক্ষারজানকে পূর্ব্বোক্ত উদ্ভিজ্জাণুরা অঙ্গার (carbon), অম্লজান (oxygen), উদজান (hydrogen) প্রভৃতি মৌলিক পদার্থের (elementsএর) সহিত এক অদ্ভুত রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা সংযুক্ত করিয়া একটী যৌগিক পদার্থ-(chemical compound) * প্রস্তুত করিলে পর তবে তাহা সাধারণ বৃক্ষলতার যবক্ষারজান বিশিষ্ট খাদ্য হয়। এই শ্রেণীর উদ্ভিজ্জাণুদিগকেই ইংরাজীতে Nitrogen-fixing Bacteria বলে। আমরা উহাদিগকে যবক্ষারজান-সংযোগকারী উদ্ভিজ্জাণু বলিব। আর উক্ত প্রকার সংযুক্ত করণকেই ইংরাজীতে Nitrogen fixation বলে।

এখন আসুন ঐ তথ্যটীর আরও একটু বিশেষ ভাবে অনুশীলন করি। এখানে পাঠককে অনুরোধ করিতেছি তিনি যেন অতি যত্নের সহিত একটী কড়াই শুঁটী—গাছের (অথবা অন্য কোন সিমজাতীয় —Leguminosæ—গাছের) সমস্ত শিকড়টী —ছোট বড় লইয়া সমস্ত শিকড়টী উত্তোলন করেন। আমরা তাহাই করিয়াছি ও তাহারই

মধ্যে একটী জাতি উক্ত খাদ্য প্রস্তুত করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই (directly) সিম জাতীয় গাছ (Leguminosae) দিগকেও দেয়

* উক্ত উদ্ভিজ্জাণুদের স্বতন্ত্র চাষ করিলে অর্থাৎ অন্যান্য জাতীয় উদ্ভিজ্জাণুদের সঙ্গে মিশ্রিত ভাবে চাষ না করিলে, উহাদের শরীরের চতুর্দ্দিকে এক প্রকার হড়্‌হড়ে পদার্থ (slime) উৎপন্ন হয় ঐ হড়্‌হড়ে পদার্থের প্রায় সমস্তটাই উক্ত যবক্ষারজান বিশিষ্ট 'যৌগিক পদার্থ।'

চিত্র(১ম চিত্র)দিলাম। ঐশিকড়ে পাঠক দেখি-বেন এখানে ওখানে একটী একটী ফুলো (nodule) আছে,—চিত্রে ১, ২, ৩, ৪ চিহ্নিত অংশ গুলি। ঐ ফুলো গুলি কি? অদ্ভুত কথা!—ঐ ফুলো গুলি যবক্ষারজান সংযোগকারী উদ্ভিজ্জাণুর মধ্যে ব্যাসিলস্ র্যাডিসিকোলা(Bacillus Radieicola)নামক এক জাতীয় উদ্ভিজ্জাণুর আড্ডা স্থান। এই র্যাডিসিকোলারা সাধারণতঃ দণ্ডাকৃতি,—rod-shaped। ইহাদের মধ্যে কতগুলির আকার ইংরাজী Y বা V অক্ষরের মত। আমাদের ২য় চিত্র দেখুন। এই র্যাডিসি-কোলারা মাটী থেকে চারা চারা কড়াই শুঁটী গাছের শিকড়কে আক্রমণ করে, শিকড়ের ভিতর প্রবেশ করিয়া ঐ ফুলো গুলি উৎপাদন করে, এবং উহাতেই আড্ডা স্থাপন করিয়া নিজেদের শরীর পোষণ করে ও বংশবৃদ্ধি করে। ঐ উদ্ভিজ্জাণুরা যে কড়াইশুঁটীর গাছটীর শিকড়কে আক্র-মণ করে সেই গাছের সহিত একটী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। চুক্তিটী এই—উদ্ভিজ্জাণুরা নিজে-দের জীবন ধারণ উপযোগী চিনি (sugar), লবণ (salts) প্রভৃতি খাদ্য গাছের নিকট হইতে লইবে, আর তার বদলে উহারা (অর্থাৎ উদ্ভিজ্জাণুরা) বায়ুস্থ যবক্ষারজান লইয়া তাহাকে পূর্ব্বোক্তরূপে অঙ্গারাদির সহিত সংযুক্ত করিয়া এক সুন্দর যবক্ষারজান বিশিষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করিয়া উক্ত গাছকে দিবে। বলা বাহুল্য চুক্তিটী রক্ষিত হয়—অর্থাৎ চুক্তি অনুসারেই কিছুদিন কার্য্য হয়। (উদ্ভিজ্জাণু ও কড়াইশুঁটীর গাছ এত সুসভ্য—"civilized"—হয় নাই যে চুক্তি ভঙ্গ করিবে!) কিছুদিন পরে যখন ফুলো গুলিতে উক্ত উদ্ভিজ্জাণুর বংশ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় আর গাছও অপেক্ষাকৃত বড় হয়, তখন গাছ ঐ উদ্ভিজ্জাণুদেরই কতকগুলিকে দ্রবী-ভূত করিয়া আত্মসাৎ করে। "সর্ব্বম্ অতি-রিক্তম্ গর্হিতম।" কড়াইশুঁটীর গাছ উদ্ভিজ্জাণুদের অত বাড়াবাড়ি তখন আর সহ্য করিতে পারে না। তারপর গাছ যখন শুকাইতে আরম্ভ হয়, তখন অবশিষ্ট উদ্ভিজ্জাণুগুলি ফুলো থেকে আবার মাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। যাহা হউক ফলকথা, কড়াইশুঁটীর গাছ তার যবক্ষার-জান বিশিষ্ট খাদ্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে (directly) প্রধানতঃ তার শিকড়ের ফুলোগুলিতে অধিবাস করে এমন উদ্ভিজ্জাণুর নিকট হইতে লয়॥ আর এই পরীক্ষালব্ধ তথ্যটীও এই সঙ্গে মনে রাখিবেন যে, যে জমীতে একবার কড়াইশুঁটীর গাছের চাষ করা যায় সে জমী যবক্ষারজান বিশিষ্ট খাদ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ধনী হয়। দ্বিতীয়বার সে জমীতে কোন ফসল উৎপাদন করিতে যাইলে তাতে আর যবক্ষারজান বিশিষ্ট সার দিবার প্রয়োজন হয় না। এই যে কার্য্যটী—উক্ত জমীকে উক্তরূপে অধিকতর উর্ব্বর করা—এই কার্য্যটী অবশ্য উক্ত ব্যাসিলস্ র্যাডিসিকোলার কার্য্য। কড়াই-শুঁটীর গাছ—সিমজাতীয়,—Leguminosae orderএর। উপরে কড়াইশুঁটীর গাছ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা সমস্ত সিম-জাতীয় গাছ সম্বন্ধেই খাটে।

ভাল, সিমজাতীয় গাছের বিশেষত্ব টুকু বুঝিলাম;—তারা যেন তাদের শিকড়ে ব্যাসিলস্ র্যাডিসিকোলাকে আশ্রয় দিয়া ঐ উদ্ভিজ্জাণু দ্বারা নির্ম্মিত যবক্ষারজান বিশিষ্ট খাদ্য শিকড়স্থ ফুলোগুলি হইতে গ্রহণ করে। কিন্তু অন্যান্য জাতীয় বৃক্ষ

লতার দশা কি? তারা ত সকলেই এইরূপ কোন উদ্ভিজ্জাণুকে নিজ শরীরে আশ্রয় দেয় না, আর তাদের শিকড়ে ফুলোও দেখিতে পাওয়া যায় না। হাঁ, তাদের জন্য অন্য সেবক নিযুক্ত আছে। ব্যাসিলেস্ ব্যাডিসিকোলা ছাড়া প্রায় চারি জাতির (speciesএর) যবক্ষারজান—সংযোগকারী উদ্ভিজ্জাণু আছে, যাহারা অন্য বৃক্ষ লতার শরীরে আশ্রয় গ্রহণ না করিয়াই আপনা আপনিই মাটীতে থাকিয়াই বংশবৃদ্ধি করে,—আর মাটীতে যে বায়ু থাকে সেই বায়ুর অসংযুক্ত যবক্ষারজান লইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অঙ্গারাদির সহিত সংযুক্ত করিয়া যবক্ষারজান বিশিষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করে এবং প্রস্তুত করিয়া মাটীকেই দেয়। আর মাটী হইতে পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষলতারা (অর্থাৎ যারা সিম-জাতীয় নয় তারা) উক্ত খাদ্য গ্রহণ করে। পূর্ব্বোক্ত চারি জাতীয় উদ্ভিজ্জাণুর মধ্যে এক জাতির নাম আজোটোব্যাক্‌টের ক্রুককসম (Azotobacter Chroococcum) ইহাদের আকার প্রকার পাঠক তৃতীয় চিত্রে দেখিবেন। উহারা ডিম্বাকৃতি আর দল বাঁধিয়া থাকিতে ভাল বাসে

পাঠক মনে করিবেন না যে, এই যে যবক্ষারজান সংযোগকারী (Nitrogen fixing) উদ্ভিজ্জাণুদের কথা বলা হইল কেবল ইহারাই যবক্ষারজান বিশিষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করিয়া জমীর উর্ব্বরতা সম্পাদন করে। আরও তিন চার রকমের উদ্ভিজ্জাণু মাটীতে আছে যাহারা সকলে মিলিত হইয়া উক্তরূপ খাদ্য প্রস্তুত করণের জন্য মৃত্তিকাস্থ বায়ুর (soil-airএর) যবক্ষারজান ব্যবহার করে না, কিন্তু বৃক্ষ, লতা, পশু পক্ষীর মৃত-দেহ আর গোবর, মলমূত্র প্রভৃতিতে যে যবক্ষারজান আছে সেই যবক্ষারজান ব্যবহার করে। ইহাদের মধ্যে এক দল ঐ মৃতদেহাদির যবক্ষারজান বিশিষ্ট পদার্থ সকলকে (pro-tidsকে) বিশ্লেষণ (decompose) করিয়া অ্যামোনিয়া (Ammonia,—যাহাতে যবক্ষারজান আছে) বাহির করে; বাহির করিয়া দ্বিতীয় দলকে দেয়। এই দ্বিতীয় দল আবার ঐ অ্যামোনিয়ার সহিত অক্সিজেন সংযুক্ত করিয়া এক প্রকার নাইট্রাইট্ (nitrite) প্রস্তুত করে; প্রস্তুত করিয়া তৃতীয় দলকে দেয়। এই তৃতীয় দল আবার ঐ ন্যাইট্রাইটের সহিত আরও একটু অক্সিজেন সংযুক্ত করিয়া দিয়া ন্যাইট্রেট্ (Ammonium Nitrate, Calcium Nitrate ইত্যাদি) প্রস্তুত করে। * এই ন্যাইট্রেট্ গুলি সোরার জাতির পদার্থ। এগুলিতে যবক্ষারজান যথেষ্ট পরিমাণে আছে আর উহারা জলে সহজে দ্রবীভূত হয়। আর সেই জন্যই উহারা বৃক্ষলতার সুন্দর যবক্ষারজান বিশিষ্ট খাদ্য মধ্যে পরিগণিত। পাঠক এইরূপে দেখিবেন নানা জাতির উদ্ভিজ্জাণু বৃক্ষলতার জন্য যবক্ষারজান বিশিষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করিয়া পৃথিবীকে অর্থাৎ মাটীকে দান করিয়া তাহাকে উর্ব্বর করিতেছে। প্রাণিগণ (উক্ত

---

* এই চারি জাতির উদ্ভিজ্জাণুরা অন্য এক প্রকারে পৃথিবীকে (মাটীকে) বৃক্ষলতা উৎপাদনে সাহায্য করে। আজ সে কাহিনী থাকুক।

* উক্ত প্রথম দলকে ইংরাজীতে Putrefactive Bacteria বলে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলকে Nitrifying Bacteria বলে। ইহারা সকলেই অবশ্য Nitrogen-fixing Bacteria হইতে ভিন্ন।

উদ্ভিজ্জাণুরাও অবশ্য প্রাণী) বাস্তবিকই পৃথিবীর 'মধু' অর্থাৎ উপকারক। আর একথাও নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে যে, এই যে কোটী কোটী অযুত অগণ্য বৃক্ষলতা পৃথিবী-বক্ষে বিধৃত রহিয়াছে ইহাদের সকলের প্রায় সমস্ত যবক্ষারজান বিশিষ্ট খাদ্যই উক্ত উদ্ভিজ্জাণুরা প্রস্তুত করিতেছে,—মাটির মধ্যে থাকিয়া অলক্ষিতভাবে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া এক মহা যজ্ঞ করিতেছে।

পাঠক হয় ত বলিবেন, এত বড় কার্য্য—এত বড় যজ্ঞ কি এই নগণ্য, চক্ষের অগোচর অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিজ্জাণুর দ্বারা সাধিত হওয়া সম্ভব? তা যদি বলেন, তাহা হইলে আমরা বলিব, উহারা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও সংখ্যায় যে ঐ ক্ষুদ্রতাজনিত অভাবপূর্ণ করিতেছে। পাঠক জানেন অনেক উদ্ভিজ্জাণুই নিজ শরীরকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া বংশবৃদ্ধি করে,—একটী দুটী হয়, দুটী চারিটী হয়, চারটী আটটী হয়, ইত্যাদি। এইরূপে দ্বিভাগে বিভক্ত হইতে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা লাগে। এই হারে একটী উদ্ভিজ্জাণু এক দিনে ২৮০,০০০,০০০,০০০,০০০ উদ্ভিজ্জাণুর জন্ম দিতে পারে!! (পতিত ভারতের পূর্ব্ব গৌরব সংস্থাপনের জন্য যাঁহারা বদ্ধ পরিকর তাঁহারা এই ক্ষুদ্র উদ্ভিজ্জাণুর ব্যাপার হইতে এক মহা শিক্ষা লাভ করিয়া আশ্বস্ত হইতে পারেন না কি!) পাঠক হয় ত উদ্ভিজ্জাণুদের এই অত্যদ্ভুত, অভাবনীয় বংশবৃদ্ধির কথা শুনিয়া বলিবেন "তবে ত মাটীতে এই উদ্ভিজ্জাণুরা "গিজ্ গিজ্" করিতেছে! হাঁ, তাহাই করিতেছে। পাঠক কি বিশ্বাস করিবেন বেলে মাটী যাহাতে কেহ চাষবাস করে না, যাহাতে অপেক্ষাকৃত কম উদ্ভিজ্জাণুই থাকে, সেই বেলে মাটির এক মুষ্টিতে (এক ছটাকে) চৌষট্টি লক্ষ (৬৪০০,০০০) উদ্ভিজ্জাণু বাস করিতেছে? আর আপনার বাগান হইতে এক মুষ্টি মাটী লউন, দেখিবেন তাতে প্রায় দশ কোটী (১০০,০০০,০০০) উদ্ভিজ্জাণু বাস করিতেছে!! আবার এক মুষ্টি নর্দ্দমার মাটী লউন, তাতে দেখিবেন ছয় শত কোটী (৬,০০০,০০০,০০০) উদ্ভিজ্জাণু বাস করিতেছে!! * পাঠক এসব কথায় বিশ্বাস করিতে চান আর না চান এ সকল পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সত্য!! বিজ্ঞানের কাছে যত "আষাঢ়ে" গল্প—"গাঁজাখুরী" গল্প সব তাদের "আষাঢ়েত্বেও"—"গাঁজাখুরীত্বেও" হার মানিয়া যায়। পাঠক একবার ভাবিয়া দেখুন

* এই যে সংখ্যাগুলি দেওয়া গেল তাহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে ঐ সংখ্যাগুলি কেবল যবক্ষারজান বিশিষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করণে নিযুক্ত উদ্ভিজ্জাণুরই সংখ্যা। তাহা নয়। মাটীতে নানা রকমের, নানা জাতির উদ্ভিজ্জাণু বাস করে;—ভাল মন্দ; কেযো অকেযো; অনেকগুলি পূর্ব্বোক্ত মহাযজ্ঞ সম্পাদনে নিযুক্ত, আবার কতকগুলি উক্ত যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদনে ও নিযুক্ত; অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক আবার পশু পক্ষী মানবের রোগও জন্মায়। ঐ, সংখ্যাগুলি এইরূপ মিশ্রিত অধিবাসীরই সংখ্যা। তাহা হইলেও ঐ মহা যজ্ঞে নিযুক্ত উদ্ভিজ্জাণুরা যখন ঐ মিশ্রিত অধিবাসীগণের একটী বিশিষ্ট অংশ (a very considerable proportion) তখন উহাদের সংখ্যাও বড় কম হইবে না। পৃথিবী বক্ষে কত কোটী কোটী মন মাটী (soil) আছে; সেই মাটীর এক ছটাকের অধিবাসীর সংখ্যা এইরূপ; তাহা হইলে পৃথিবীর সমস্ত মাটীর অধিবাসীর সংখ্যা কিরূপ! এখানে সংখ্যা-শাস্ত্র পরাস্ত হয়। কল্পনা-শক্তিও পরাস্ত হয়!! পাঠক এখন, বোধ হয় আর সন্দেহ করিবেন না উদ্ভিজ্জাণুরা পূর্ব্বোক্ত মহাযজ্ঞ সাধনে পারক কি না।

যবক্ষারজান বিশিষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করণে নিযুক্ত উদ্ভিজ্জাণু সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত সত্যগুলি অনেক বৈজ্ঞানিকের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। পাঠক হয়ত বলিবেন "তাহা যেন হইল; উক্ত সত্যগুলি পুঁথিতেই বদ্ধ না মানুষের কাযে লাগাইবার চেষ্টা করা হইতেছে?" হাঁ, বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে, এবং অনেক স্থলে পরীক্ষার ফলও দিন দিন অধিকতর সন্তোষজনক হইয়াছে ও হইতেছে। মানুষ এখানে আর কি করিতে পারে? ঐ পূর্ব্বোক্ত সত্যগুলির সাহায্যে স্বভাবের (Natureএর) সহায়তা করিতে পারে। মানুষ তাহাই করিতেছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। উক্ত গবর্ণমেণ্ট ল্যাবরেটরিতে পূর্ব্বোক্ত ব্যাসিলস্ র‍্যাডিসিকোলার একটি ভাল বংশের (healthy strainএর) খুব বংশবৃদ্ধি করাইতেছেন। আবার এমন দ্রব্যে (mediumএ) উহাদের বংশবৃদ্ধি করান হইতেছে যাহাতে যবক্ষারজানের নামগন্ধ নাই; তার ফলে এই দাঁড়ায় যে উক্ত উদ্ভিজ্জাণুগুলির বায়ু হইতে যবক্ষারজান লইবার ক্ষুধা বা শক্তি আরও বৃদ্ধি হয়। এইরূপ সদ্বংশ সম্ভূত অথচ ক্ষুধার্ত্ত উদ্ভিজ্জাণুদিগকে যৎকিঞ্চিৎ মাটীর সহিত মিশাইয়া উক্ত গবর্ণমেণ্ট মোড়া, (packet) মোড়া চাসীদের বিতরণ করিতেছেন। চাসীরা উক্ত উদ্ভিজ্জাণুদিগকে তাদের জমীতে ছড়াইয়া কোন কোন স্থলে জমীকে এরূপ উর্ব্বরা করিতেছেন যে, যেখানে এক মন সিম্, কড়াইশুঁটী প্রভৃতি হইত সেখানে দেড় মন দুই মন উৎপাদন করিতেছেন। জার্ম্মণিতেও এইরূপ পরীক্ষা খুব চলিতেছিল। তবে বর্ত্তমান যুদ্ধের কারণ বোধ হয় সে সব স্থগিত আছে॥ ইংলণ্ডে অধ্যাপক বটম্‌লি (Prof. Bottomly) পিট্‌কে (peatকে) * এক প্রকার উদ্ভিজ্জাণুর দ্বারা পচাইয়া তাহাকে বৃক্ষ লতার জন্য এক অতি উপাদেয় যবক্ষারজান বিশিষ্ট খাদ্যে পরিণত করিয়াছেন। ঐ খাদ্যটী নিজেই একটী সুন্দর সার (manure) হইয়াছে। উক্ত অধ্যাপক ইহার সহিত আবার সোণায় সোহাগা যোগের ন্যায় সদ্বংশ সম্ভূত পূর্ব্বোক্ত ব্যাসিলস্ র‍্যাডিসিকোলা ও আজোটো ব্যাকটের ক্রুককৃসম্ জাতীয় উদ্ভিজ্জাণু মিশাইয়া এক খুব ভাল সার প্রস্তুত করিয়াছে। ঐ সার ইংলণ্ডে বাগানাদিতে যাঁহারা [illegible] পূর্ব্বক ও বিবেচনার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই বলিতেছেন ঐ সার দ্বারা ফসলের পরিমাণ বেশ বৃদ্ধি হয়,—কোন কোন স্থলে দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়। ঐ সার অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করিবার জন্য ইংলণ্ডে কলকারখানা বসিয়া গিয়াছে। গত বৎসর "টাইম্‌স্" প্রভৃতি সমস্ত বিলাতী সংবাদ পত্র যে নূতন সারের আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই সার। ইহার ইংরাজী নাম হিউমোজেন (Humogen)। আর আমরা পূর্ব্বে যে বলিয়াছি যে, কোন জমিতে সিম্ জাতীয় গাছ চাস করিলে তাহাতে যবক্ষারজান বিশিষ্ট খাদ্যের বৃদ্ধি হয় সুতরাং সে জমী অপেক্ষাকৃত অধিকতর উর্ব্বর হয়;—এই তথ্যটীর ইউরোপ আমেরিকায় বহুল প্রচার হওয়াতে ঐ তথ্য অনুসারে কার্য্য করিয়া ঐ সব দেশের চাসীরা উপকার পাইতেছেন।

* পিট (peat) এক প্রকার মস্ (moss জাতীয় উদ্ভিদ্। পৃথিবীর নানা স্থানে মাটীতে যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া আছে